সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড



অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড



অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

.সরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রথম খণ্ড

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

SERA BHRAMAN KAHINI
A compilation of travelogues

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ৩১০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০০৬ মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০
তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০০৯ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০
চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১৪ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

ISBN : 978-81-86891-37-7

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in

মুদ্রক
বর্ণনা
৬/৭, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০ ০৩২

হরফ বিন্যাস
স্বর্ণাক্ষর

ভূমিকা

বাংলা ভ্রমণসাহিত্য গুণে হিমালয়তুল্য হয়েও পরিমাণে বিন্ধ্যপর্বতও নয়, বড়জোর মাঠাবুরু কি মেঘাতাবুরু । কিংবা গুণে যদি গঙ্গা, তো পরিমাণে- গোদাবরী? মনে হয় না, খুব বেশি হলে বাঁকুড়ার কংসাবতী বা, ঝাড়গ্রামের ডুলুং বললেই ঠিক হয় । এ যেন সমুদ্রপরিমাণ খিদে মেটাতে এক মুঠো খুদের জোগান ।

ভ্রমণগ্রন্থের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয় হবার একটা কারণ নাকি এর কম ক্রেতা । 'ভ্রমণ' পত্রিকার সূচনায় দেখেছি গরিষ্ঠ পাঠকশ্রেণী চান ভ্রমণ-গাইড, ভ্রমণকাহিনীতে তাঁদের আগ্রহ কম । এই মর্মান্তিক আবিষ্কারে এক সময় 'ভ্রমণ' প্রকাশ বন্ধ করার কথাও ভেবেছি । তারপর ভ্রমণ-গাইডের পাশাপাশি নিয়মিত দুয়েকটি ভ্রমণকাহিনী পরিবেশন করে শেষ পর্যন্ত শারদীয় সংখ্যায় শুধুই ভ্রমণকাহিনী ক্রমশ অধিক পাঠককে আকর্ষণ করছে দেখে আমরা আহ্লাদিত । তবে, ভ্রমণসাহিত্যে আমাদের যদি কিছুমাত্র অবদান কোথাও থাকে তা হয়তো ভ্রমণকথারচনার গঙ্গাকে মহাদেবের জটা থেকে মর্তে নিয়ে আসায় । এভাবেই 'ভ্রমণ' পত্রিকা বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের জয়যাত্রায় হয়তো অজান্তেই সামিল হয়ে গেছে ।

দশ বছরের 'ভ্রমণ' থেকে নির্বাচিত একশোরও বেশি ভ্রমণকাহিনী নিয়ে এই বৃহৎ ভ্রমণকথাসংকলন । সম্ভবত, বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ভ্রমণকথামৃত । একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় যে কোনও একটা বইয়ে ভূ-ভারতের এত বেশি স্থানের ভ্রমণকাহিনী এর আগে আর সংকলিত হয়নি । সেদিক থেকে আমাদের এই বইকে ভ্রমণের মহাভারত বলা যায়, হয়তো ।

তবে বিপুল এই ভ্রমণগ্রন্থ সংকলনের মহাভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে 'ভ্রমণ'-এর বর্তমান সম্পাদক মহাশ্বেতা আমাকে সশ্রম সাহায্য না করলে কাজটি চিরকাল কল্পনা হয়েই থেকে যেত, কখনও সম্পূর্ণ করতে পারতাম বলে মনে হয় না । পাঠকের ভালো লাগলে তবেই আমাদের সকলের সব শ্রম সার্থক ।

সূচিপ.

মেঘালয়ের দাউকি
আমাদের ছোট নদী : লিডার
লাসা
২ নম্বর লোভালোয়া স্ট্রিট
অযোধ্যা পাহাড়

অর্ধশতাব্দীর আগের বদ্রীনাথ যাত্রা

প্রতাপকুমার রায়

বদ্রীনাথে প্রথম গিয়েছিলাম পঞ্চাশ বছর আগে । তারপর আরও কয়েকবার বদ্রীনাথ গিয়েছি । প্রথম যাত্রার কথা যেমন স্মৃতিতে উৎকীর্ণ হয়ে আছে, তেমন স্পষ্ট নয় পরের যাত্রার ঘটনাগুলি ।

প্রথম যাত্রার কিছুদিন আগেই প্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত রচনা বেরিয়েছে-'মহাপ্রস্থানের পথে' । বিজ্ঞাপনের ভাষায় সাড়া জাগানো বই । সবাই আকুল হয়ে পড়েছে । রোমাঞ্চকর সে অভিজ্ঞতার বুঝি তুলনা ছিল না । অবশ্যই আমরা জানতাম উত্তরে হিমালয়ের গভীরে, অগম্য উচ্চতায় শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠা করা সর্ব-তীর্থসার বদ্রীনাথের মন্দির । কঠিন যাত্রা, অনেকেরই সাধ্যাতীত । প্রবোধকুমার সান্যালের বইতে পথহীন পথ দিয়ে যাত্রার সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনা তখনও আমাদের কল্পনার বাইরে । এ তো জলধর সেনের ভ্রমণ বিবরণ হিমালয় নয়, এ হল ভ্রমণ-কাহিনী । ভ্রমণ ও কাহিনীর মিলনে অনাস্বাদিত যৌগিক ফল ।

প্রবোধকুমার সান্যাল নিজেকে বাস্তববাদী বলতেন । সে বিষয়ে বিতর্কের স্থান নয় এই রচনা । কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে প্রবোধবাবু আবেগ-আশ্রিত লেখায় অদ্বিতীয় ছিলেন । তাঁর বর্ণনা কতটা বাস্তব-অনুরাগী, বদ্রীনাথ যাত্রার আগে জানতে পারিনি ।

দূর এবং দুর্গমের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ । আশ্চর্য নয় যে 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়তে পড়তে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হই । পর্বতগাত্রে পথ নেই, শুধু পথের চিহ্নটুকু ধরে চলেছে তীর্থযাত্রীরা । তাঁরা তীর্থে চলেছেন, তাই কোনও বাধাই তাঁদের কাছে অনতিক্রম্য নয় । বিশাল বনস্পতিরা অরণ্যপথ ঢেকে রেখেছে । প্রায়ান্ধকার শ্বাপদসঙ্কুল অগম্যভূমিতে সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছে তীর্থাকাঙ্ক্ষীরা । কারণ, প্রত্যেকটি মুহূর্তই অনিশ্চিত । প্রকৃতির আদিম চারণভূমির ওপর দিয়ে যাত্রা । নিচে গভীর খাদ । পদস্খলন হলেই জীবন-সংশয় ।

বর্ণনা পড়তে পড়তে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়েছি । ওই পরিবেশ রহস্যময়ী 'মহাপ্রস্থানের পথে'র আবির্ভাব আমাদের রোমাঞ্চিত করেছিল ।

সেই সময় বিয়েবাড়িতে ফুলশয্যার উপহারে ডজনখানেক 'মহাপ্রস্থানের পথে' পাওয়া যেত, যেমন সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক বছর পরে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতের' ।

ভালো করে কোনও খবর নেওয়া হয়নি । রওনা হবার কদিন আগে গাড়োয়ালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা চিঠি লিখেছিলাম । আমি আর আমার বন্ধু বদ্রীনাথের পথে যাত্রা করছি । তিনি কি পথের ডাকবাংলোয় রাত্রিবাসের জন্য ব্যবস্থা করতে পারবেন । সদ্য দৈনিক কাগজের উচ্চপদে যোগ দিয়েছি । নিজেকে নিয়ে কিঞ্চিৎ দম্ভ ছিল বৈকি । তবু উত্তর পাব এমন বিশ্বাস ছিল না । কিন্তু আশ্চর্য কদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের । সাহেব অতিশয় ভদ্র । খবরের কাগজের পদকে মর্যাদা দিয়েছেন । লিখেছেন, আপনারা আসছেন জেনে আনন্দিত । কিন্তু এখন আসবেন না । প্রবল বর্ষায় মোটর গাড়ির রাস্তা বহু স্থানে নিশ্চিহ্ন হয়েছে । বদ্রীনাথ তো অনেক দূরের পথ, দু-দশ মাইল যাওয়াও প্রায় অসম্ভব ।

ভদ্রলোকের চিঠি পড়ে আমি হতবাক । আমার সঙ্গে যাবে আমার বন্ধু নীরেন যিনি উত্তরকালের প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । দুজনে যাত্রার আয়োজন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি । হোল্ডল এবং প্রয়োজনীয় ক্যাম্বিশের জুতোও কেনা হয়ে গিয়েছে । যাওয়া হবে না, এমন কথা আমার মন মানতে চায় না । অথচ, হয়তো এখন যাওয়া আদৌ সমীচীন হবে না । এত আলোচনা, এত মানসিক প্রস্তুতির পর থেমে যাওয়া অসম্ভব ।

স্থির করলাম ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির কথা নীরেনকে বলব না । সে সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ । এই খবরের পর কিছুতেই যেতে চাইবে না । তাকে কিছু না বলাই ভালো । তাছাড়া আমাদের কোটদ্বার পর্যন্ত যাবার টিকিট করাও হয়ে গিয়েছে ।

প্রচলিত পথ হৃষীকেশ দিয়ে না গিয়ে কেন কোটদ্বার এবং শ্রীনগর হয়ে বদ্রীনাথ যাত্রায় গিয়েছিলাম, এখন আর মনে নেই । কার বুদ্ধিতে আমরা হৃষীকেশ দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ বাদ দিয়ে সোজা শ্রীনগর চলেছি, বলতে পারব না । হয়তো তখনও দেবপ্রয়াগ বদ্রীনাথ শ্রীনগর যাবার মোটর রাস্তা তৈরি হয়নি ।

এক সন্ধ্যায় উৎফুল্ল নীরেনকে সঙ্গে নিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেসে উঠলাম । নিরুদ্বিগ্ন নীরেনকে দেখে আমার অশান্তি আরও বাড়ছে । কতদূর পর্যন্ত যেতে পারব জানি না, কোথা থেকে ফিরে আসতে হবে, নানা দুর্ভাবনায় আমি জর্জরিত । তার ওপর নীরেনকে না বলে বন্ধুকৃত্যের অপলাপ করেছি, তার যন্ত্রণা ।

আমাদের সঙ্গে মোটঘাট সামান্য । দুটি হোল্ডল, তার মধ্যে বিছানা কম্বল তোয়ালে ইত্যাদি । একটা মাঝারি মাপের টিনের তোরঙে আমাদের জামাকাপড় । পথে কত ঠান্ডা হবে বুঝতে না পেরে সঙ্গে যথেষ্ট শীতবস্ত্র । খাবার জিনিস সামান্যই নেওয়া হয়েছে ।

সোনামুগের ডাল, এক শিশি গাওয়া ঘি, দু প্যাকেট বিস্কুট, সামান্য চা পাতা ও চিনি, গুটিকয় পাঁপড়, দু প্যাকেট চানাচুর ।

শুনে এসেছি কোটদ্বার থেকে বাসে চড়ে আমরা পিপলকোঠি যাব । সেখান থেকে মাইল চল্লিশ পথ পদব্রজে । তাই মোটঘাট বেশি নিইনি । একটি কুলিই যথেষ্ট হবে । ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি পড়ে বুঝেছি আমাদের জন্য ডাকবাংলোর ব্যবস্থা করা হয়নি । অর্থাৎ সাধারণ্যের সঙ্গে পথের ধারে চটিতে রাত্রি কাটাতে হবে । এখনও সঠিক জানি না চটি বলতে কী বোঝায় ।

সন্ধ্যার মুখে লখনউ-চারবাগ স্টেশনের মুসলিম রেস্টুরেন্ট থেকে রুটি গোস্ত কিনে আনা হল । এমন অপূর্ব সুস্বাদ ছাগ মাংস পূর্বে কখনও খাইনি । এরপর দশ-বারোদিন মৎস্য-মাংসাদি পাওয়া যাবে না । আর এক পাত্র মাংস খেয়ে নিলে ভালো হত । মনস্থির করবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল ।

সূর্যোদয়ের আগে নাজিবাবাদ স্টেশনে নেমে পড়লাম । প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে । আমি আরও দমে গেলাম । আমি তো জানতাম এমন হবে, তবু কেন এলাম, এ অনুশোচনা ঘোচাতে পারি না । অন্যদিকে নীরেন পরম আনন্দের সঙ্গে বৃষ্টির তারিফ করছে । এই নাকি শুভযাত্রার চিহ্ন ।

অনেক বছর পরে নীরেন একটা কবিতা লিখেছিল । আমার মনে হয়, আমার মনের কথা সেখানে ব্যক্ত করেছিল । কবিরা নাকি মানুষের অন্তরের কথা জানতে পারেন । লিখেছিল:

যাব আমায় যেতেই হবে পথের অতল খুঁজে খুঁজে

থাকব না এই ব্যর্থ ভালোবাসার বিবরে মুখ গুঁজে ।

যাব আমার জীর্ণ মনোরথের রজ্জু থরো থরো

যাব, আমায় যেতেই হবে পথের প্রদীপ তুলে ধরো ।

ভাগ্যিস কবিতাটা তখন পড়িনি । কে আমার জন্য পথের প্রদীপ তুলে ধরবে । সেই মুহূর্তে আমার মনোরথের রজ্জুতেও আর টান নেই । একটা ব্যর্থযাত্রা মাঝপথে শেষ করে ব্যর্থ দুই অভিযাত্রী ফিরে আসছি ভেবেই তখন আমার কষ্ট হচ্ছে ।

নাজিবাবাদ থেকে কোটদ্বার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে পড়লাম । ভালো মনে পড়ছে না, ঘণ্টাখানেকের রেলযাত্রা ছিল বোধহয় । জানলা দিয়ে নীরেন বৃষ্টির ঝর ঝর দেখছে, আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে । আর আমি শঙ্কিত মনে প্রত্যাবর্তনের দিন গুনছি ।

কোটদ্বার আমাদের সঙ্গে অন্যান্য কামরা থেকে কিছু গোর্খা জওয়ান নামল। হঠাৎ দেখি বৃষ্টি থেমে গেল। মাথার ওপর পরিচ্ছন্ন আকাশ। মনে হল এটাই সত্যিকার শুভ লক্ষণ। পাশের প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে বেরবার রাস্তা, দেখি গোর্খা সৈন্যে পূর্ণ, যেন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছে। এরা কোটদ্বারে কেন জানবার চেষ্টা করতেই আমাকে পুরো দমিয়ে দেবার খবর পেলাম।

প্রতিদিন দু-একশো গোর্খা সৈন্য ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য কোটদ্বার স্টেশনে নামে। সেখান থেকে তারা বাসে উঠে গাড়োয়ালের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু গত তিনদিনের প্রবল বর্ষায় রাস্তাঘাট ধুয়ে মুছে গেছে, নানা স্থানে পাহাড় ধসে পড়ে প্রকাণ্ড গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। বাস চলাচল বন্ধ। কয়েকটা বাস পথে আটকে পড়েছে। তাই গাড়োয়ালের সৈন্যেরা এখানে প্ল্যাটফর্মে জমা হচ্ছে। আর কোথায় যাবে?

সৈন্যেরা যেখানে সেখানে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা ক্ষীণজীবী মানুষ, আমরা কোথায় থাকব? কতদিন থাকব? বাস চলাচল শুরু হবে কি? কবে?

প্রশ্ন শুনে একজন সবজান্তা মানুষ বললেন, বাস এখন সপ্তাহখানেক চলবে না। আগে রাস্তা মেরামত হোক, ধস নামা পাহাড়ে নতুন করে রাস্তা করা হোক, তবে তো?

নীরেনের পাংশু মুখ দেখে আমার মন অনুশোচনায় ভরে গেল। একজন নিষ্পাপ নিরীহ মানুষকে প্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে আনা উচিত হয়নি।

সবজান্তা ভদ্রলোক যখন জানলেন যে আমাদের অভীষ্ট বদ্রীনাথের মন্দির, বললেন, ওখানে যাবার আশা ছেড়ে দিন। বদ্রীনাথজি ডাকলে তবেই তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। আপনাদের ডাক আসেনি।

আরও বললেন, আপনারা এক কাজ করুন, এখান থেকে হরিদ্বার চলে যান, সেখানে হর-কি-পৌড়িতে ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। আর যদি আজই না ফিরে যেতে চান, তাহলে এখানে এক রাত্রি কাটাতে পারেন। শিবের বিখ্যাত মন্দির আছে। সেখানে পূজাপাঠ করতে পারেন, হোটেল ভালো কিছু নেই কোটদ্বারে। ডাকবাংলোয় একটা রাত থাকতে পারেন।

আমরা স্টেশন ছেড়ে ডাকবাংলোর দিকে চললাম। ডাকবাংলো অপ্রত্যাশিতভাবে শহরের মধ্যেই। শুভযোগ বলতে হবে, সেখানে পৌঁছেই মালিকে পাওয়া গেল এবং সে বিনা প্রতিবাদে একটি ঘর আমাদের খুলে দিল। দুই ব্যর্থ-মনোরথ অভিযাত্রী নীরবে স্নান করে তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্টের সন্ধানে বাংলো থেকে বেরলাম। কাছেই বড় রাস্তার ওপরে একটি ব্যস্ত রেস্টুরেন্ট। সামনে উঁচু, চওড়া দাওয়া। সেখানে প্রথমে চা ও ওমলেট খাওয়া

হল । এই ভোজনশালা ওমলেট তৈরি করায় অত্যন্ত পটু । পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা সহযোগে অসাধারণ একটি ডাবল ডিমের ওমলেট গ্রহণ করে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করেছিলাম । রাস্তায় নানা কাজে নানা লোক চলেছে সারাদিন, আমরা উঁচু দাওয়ায় বসে মানুষের চলাচল দেখে দুপুর পার করে দিলাম । ভাত, রুটি, রসুন দিয়ে সাঁতলানো ডাল, দুটো সবজি-এর থেকে ভালো কিছু আশা করিনি ।

দুয়েকজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা হচ্ছে । কেউ আশার কথা বলছে না, আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছে । আমরা দুবার বাস অফিসে ঘুরে এলাম । তালাবন্ধ । খবর দেওয়ার কেউ নেই কোথাও । বৈকালিক চা এবং নৈশভোজনও খুব সুখের হল । দুঃখের মধ্যে ওইটুকু সান্ত্বনা । এই ভোজনশালায় আমিষ বলতে ডিম, তার ওপরে কিছু নেই । আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা কমে গিয়েছে । ভবিষ্যৎ চিন্তায় দুজনেই আকুল ।

পরের সকালে স্নানাদির পর আমরা আবার আমাদের ভোজনশালায় পৌঁছলাম । বুঝতে পারছি ফিরে যেতেই হবে । ওমলেট আদেশ করেছি । কলকাতায় স্কটিশের উল্টোদিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর চিত্তবিশ্রাম নামে চা-টোস্ট-ডিমের একটি ক্ষুদ্র রেস্টুরেন্ট ছিল । তাদের ওমলেট আমাকে বহুদিন আনন্দ দিয়েছে । এখানের ওমলেট একেবারে সেই শ্রেণীর, অতি উত্তম । এমন সময় এক খদ্দের ওমলেট আদেশ করে দাওয়ার ওপর আমাদের পাশে চেয়ার নিয়ে বসলেন । বললেন, তোমাদের ওমলেট আমার মনোমত হয় না । আজ আমি নিজে ওমলেট বানিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দেব, ওমলেটে কত স্বাদ আনা যায় ।

আমার বিস্ময়ের শেষ নেই । বলেন কি এই ভদ্রলোকে । এখানের ওমলেট খেয়ে আমরা বিমুগ্ধ । এই ভদ্রলোকের কাছে সেটা নগণ্য । আমরা উন্মুখ হয়ে তার ওমলেটের সৃষ্টি দেখতে লাগলাম । ভদ্রলোক আমাদের কৌতূহল দেখে বললেন, আপনারা কলকাতার লোক আপনারাই ওমলেটের মর্যাদা জানেন । এই পাহাড় দেশের মানুষরা কি ওমলেট বানাবে । আমার তো কলকাতাতেই শেখা । কিন্তু আমি কি কলকাতার ওমলেটের ধারে কাছে পৌঁছতে পারব ।

অযাচিত অকারণ কত প্রশংসাই না পাওয়া যায় । অত দুঃখের মধ্যেও একটু রোদের ঝিলিক দেখলাম ।

এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল যে গাড়োয়াল মোটর কোম্পানির একটা বাস কাল চামোলি যাবার চেষ্টা করবে । সেই বাসে পোস্ট অফিসের জমে থাকা ডাকও যাবে । রেস্টুরেন্টের মালিক বলল, এখনই টিকিট কাটবার চেষ্টা করুন ।

অন্য অতিথির ওমলেট তৈরি করা দেখা হল না । আমরা তৎক্ষণাৎ বাস অফিসে দৌড়লাম । সবে ভিড় জমতে শুরু করেছে । জানা গেল, বাসের যাবার কথা পিপলকোঠি কিন্তু যেতে পারবে না । চামোলিতে যাত্রা শেষ । মাঝরাস্তায় একটা বাস বুঝি খাদে উল্টে পড়েছে । দুজনে টিকিট করে ফেললাম । রিজার্ভেশন বলে কোনও পদার্থ নেই । কাল এলেই যে জায়গা পাব তারই বা কি ঠিক । বাস কখন ছাড়বে তাও কেউ বলতে পারল না ।

আমরা পরদিন সকালে উঠে তড়িঘড়ি ছটার পরই বাক্স বিছানা নিয়েই বাসস্টেশনে পৌঁছে গেলাম । তখনও কেউ আসেনি । নৈশভোজনের সময় শুনেছিলাম যে বাস যাচ্ছে বটে চামোলি কিন্তু এই বাস যাবে না । কিছুদূর গিয়ে গুমখাল । যেখানে ধস নেমে বাসের রাস্তা মুছে গেছে সেখানে এটি থামবে । আমাদের ধস পেরিয়ে গিয়ে ওপাশে আরেকটা বাস ধরতে হবে । তখনও বুঝতে পারিনি কাজটা কত কঠিন । এটুকু বুঝেছিলাম মালপত্র নিয়ে ওই ধস পার হতে পারব না । কাজেই বাক্স বিছানা এখানেই ফেলে দিয়ে প্রয়োজনীয় কম্বল এবং কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে রওনা দেওয়া বুদ্ধির কাজ । পরে ভাবলাম এখানে বাক্স বিছানা ফেলে যাওয়ার কি সুবিধা । যেখানে আটকে যাব সেখানেই বাক্স বিছানা ফেলে যাব ।

আমাদের নিয়ে বাস নটা নাগাদ রওনা দিল । ক্রমশ উঁচুতে উঠতে লাগলাম । দোগাড্ডা গিয়ে দেখি ডানদিকে ল্যান্সডাউন যাবার রাস্তাটা খুলে গিয়েছে । বাঁদিকে পউরি শ্রীনগরের পথের সঙ্গীন অবস্থা । বাস ড্রাইভার সবাইকে নেমে যেতে বলল । সে খালি বাস নিয়ে ভাঙা জায়গাটা পার হলে তারপর আমরা উঠব । এবারে বাস থামল গুমখালে । দুদিকে উঁচু পাহাড় মাঝে একটা যোগসূত্র, একেই কি পর্বতশিরা বলে থাকে, ইংরিজিতে বলে স্যাডল । সামনে প্রকাণ্ড ভাঙন । পাহাড়ের গায়ে সিকি মাইল রাস্তা নিশ্চিহ্ন । আমরা বাসযাত্রীরা ছাড়া আরও অনেক লোক জমে আছে । একটা ছোট মেলার আকার ধারণ করেছে জায়গাটি । একপাশে ভোজনশালার বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল । নদী থেকে মাছ ধরে সকলের জন্য রান্না করা হবে । একজন বাস কোম্পানির কর্তা মতো লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমরা ওপারে গিয়ে আরেকটা বাস পাব । আমরা এই টিকিট দেখিয়েই সেই বাসে উঠতে পারব । আমরা স্যুটকেস বিছানা নিয়ে ভাবিত হয়েছি দেখে বলল, ডাক নিয়ে যাবার জন্য আমার কুলি আছে তারাই আপনার বিছানা নিয়ে যাবে ।

একটি ব্রাহ্মণ ভোজনশালায় সদ্য ধরা মাছের ঝোল এবং তপ্ত ভাত দিয়ে নীরেনকে খুশি করা গেল । আমি মৎসাশী নয় বলে আমাকে শুধু ঝোলেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ।

বড় বড় পাথর, পাহাড় প্রমাণ মাটির এপাশ ওপাশ দিয়ে বহু কষ্টে ভাঙনের ওপাশে পৌঁছলাম । পোস্ট অফিসের কুলিরা ততক্ষণে আমাদের বাক্স বিছানা সেখানে নিয়ে এসেছে ।

দীর্ঘক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম । দুই ভাঙনের মাঝখানে একটা বাস এসে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে । কিন্তু সেই বাস আর আসে না । যাত্রীরা অধীর এবং বিরক্ত । এমন সময় একটা ট্রাক এসে পৌঁছল । বাস কোম্পানির সেই কর্তাব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসেছেন । তিনি সবাইকে বললেন, আপনারা ট্রাকে চড়ে পরবর্তী ভাঙনের মুখে চলে যান । সেই ধস পার হলে আবার ভালো বাস পাবেন । বিরক্ত যাত্রীরা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, তারা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছে, তারা নোংরা মালবাহী ট্রাকে চড়তে নারাজ । আমি আর নীরেন সবেতে রাজি, আমাদের গন্তব্যে পৌঁছনো নিয়ে কথা । বাস কোম্পানির কর্তাব্যক্তি আমাদের ট্রাকে তুলে দিলেন । দেখাদেখি আরও কয়েকজন ট্রাকে উঠল । কর্তাব্যক্তি নিজেও উঠলেন । পরবর্তী ধসের মুখে পৌঁছে দেখলাম এই ভাঙন দৈর্ঘ্যে কম । ওপারে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে তাও দেখলাম । সেই কর্তাব্যক্তি এবারে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করলেন । তিনি বাস কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার । তার নাম বর্থওয়াল । তিনি আমদের ব্যবহারে মুগ্ধ । বললেন, আপনারা অতিশয় ভদ্রলোক । আমাদের কোম্পানির বাসের ভাড়া নেওয়া শোভা পায় না । আমাদের টিকিট দুটো ফেরত নিয়ে টাকাটা আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল ।

বর্থওয়ালের লোকেরাই আমাদের মালপত্র ধসের ওপারে পৌঁছে দিল । নতুন একটা বাসে উঠলাম । ড্রাইভার বলল, এরপর আর ধস নেই । রাস্তা খারাপ, তাই দ্রুত যাওয়া চলবে না । পথে উল্লেখযোগ্য স্থান পউরি, জেলা শহর । আকাশে তখন মেঘ নেই আমরা তখন শহরের ঠিক নিচে দিয়েই যাচ্ছি । হঠাৎ সামনেই সমস্ত দিগন্ত জুড়ে বরফের চূড়া দেখতে পেলাম । মনে হল ওই তো বদ্রীনাথ পৌঁছে গিয়েছি । প্রাণে এত আনন্দের জোয়ার যে নীরেনকে বলেই ফেললাম যে তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ তঞ্চকতা করেছি । সন্ধে হয়ে গেল । আজ রাতে আমাদের থাকতে হবে শ্রীনগরে । সেখানে পৌঁছতে রাত প্রায় নটা । অন্য যাত্রীরা নেমে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল । আমরা কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না, কোথায় আছি কোথায় থাকব । বাস ড্রাইভারের সৌজন্যে আমরা বাস অফিসের বারান্দায় হোল্ডল বিছিয়ে শোবার জায়গা পেলাম । সকালে শ্রীনগর থেকে বাস আবার রওনা হল । চামোলি পৌঁছতে দ্বিপ্রহর । পথে বর্ষার অত্যাচারের চিহ্ন, ভাঙা রাস্তায় ছোটখাটো ধস পার হয়ে বেলা একটা নাগাদ চামোলি পৌঁছলাম । চামোলি অলকানন্দার ওপর । নদীর ওপারে দেখলাম প্রকাণ্ড ধস নেমেছে । আমাদের ঠিক ওখান দিয়ে পার হতে হবে না । গাড়ির রাস্তাটা ঠিক কোথায় ছিল বুঝতে পারা গেল না । বাস থামামাত্র একদল কুলি প্রায়

ঝাঁপিয়ে পড়ল । তারা যাত্রীদের মোটঘাট বদ্রীনাথ নিয়ে যাবে । কদিন কোনও কাজ পায়নি । ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে । কিছু মানুষ, কিছু যাত্রী অবশ্য বর্ষার মধ্যেও এসেছে । তারা তীর্থপদযাত্রা করছে, সবরকম কষ্ট সহ্য করে তারা চলেছে । এদের কারও কুলির দরকার নেই, আর তাছাড়া যার দরকার সে আগেই বন্দোবস্ত করে চামোলি এসেছে । কুলিদের দতিয়াল বলে । এরা বুঝি নেপাল থেকে আসে তীর্থের মরসুমে । মাস ৫ যাত্রীর মোট বয়ে তারপর দেশে ফিরে যায়, আবার পরের বছর আসে । যে ছেলেটি আমাদের মোট নিয়ে যাবে বলল, আমাদের মোট ওজন করবার দরকার নেই । সামনেই ওজন করবার বন্দোবস্ত রয়েছে । এক মনের বেশি হলে কুলিরা বেশি টাকা পায় । আমাদের সঙ্গে ৫০ টাকায় রফা হল । ছেলেটার নাম রূপসা । বলল যে ওই ৫০ টাকা ছাড়া আমাকে মকামে অর্থাৎ গন্তব্যস্থানে খাই খরচ দিতে হবে । বদ্রীনাথে বুঝি খাওয়াদাওয়ার খরচ বেশি পড়ে । তাই কুলিরা চায় খাওয়াদাওয়ার খরচ মালিকরা বহন করুক । আমরা রাজি হয়ে গেলাম । অনুমান করেছি আমাদের চামোলি ফিরে আসতে ৭ দিন বা ৮ দিন লাগবে । রূপসা মোটঘাট পিঠে বেঁধে রওনা হল । বলল আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গে নাও থাকতে পারি । পাকদণ্ডী এবং কঠিন পথ দিয়ে আমি যাব, যেখানে দূরত্ব কম হয় । আপনাদের সঙ্গে পিপলকোঠির ঢোকবার মুখে দেখা হবে ।

সামনে ১০ মাইল পথ । কিছুই চিনি না । বিশেষ লোকজনও দেখতে পেলাম না । দুপুরে এই সময়টা রান্না করে এবং বিশ্রাম করে । আমরা চামোলিতে পুরি তরকারি খেয়ে নিয়েছি । নির্জন চড়াই উতরাই ভেঙে আমরা চলেছি । এই মুহূর্তে মনে কোনও দুর্ভাবনা নেই । আকাশ পরিষ্কার । পিপলকোঠি থেকে বদ্রীনাথ ৪০ মাইল । সে পথ অনায়াসে চলে যাওয়া যাবে । আমাদের অধ্যবসায় দেখে বদ্রীনাথ নিশ্চয়ই আমাদের ডেকেছেন । এই যে এতখানি পথ এসেছি সমস্তক্ষণ একটা যন্ত্রণা মনকে পীড়া দিচ্ছিল । হয়তো পৌঁছতে পারব না । ফিরে যেতে হবে । এখন আর সে যন্ত্রণা নেই । মনোরথ পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় আমরা হাঁটছি ।

প্রবোধকুমার সান্যালের ভয়ঙ্কর করালবদন পথ আমরা এখনও পেরোইনি । গভীর অরণ্য দূরে থাক খুব বেশি গাছপালা দেখিনি । অলকানন্দার বামতীর দিয়ে যেতে যেতে মনে হল আর কোনও ভীষণ ভয়ঙ্কর না থাকলেও যাত্রা বিপদসঙ্কুল । পাহাড়ের গায়ে ক্ষীণ রেখার মতো সরু একটি পথ এঁকেবেঁকে চলেছে, পাঁচ-সাতশো ফুট নিচে নদী, পদস্খলন হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত । রূপসা একটু আগে সামনে ছিল । এখন কোথায় হারিয়ে গেল ।

কাউকে একটু জিজ্ঞাসা করব এমন মানুষ কোথাও নেই । বিশাল এই পৃথিবীতে যেন আমরা দুটি মাত্র প্রাণী । কখনও দেখি নদীর অপর পাড়ের পাহাড় গাছে ঢাকা আছে ।

কিন্তু আমাদের দিকের পাহাড়ে গাছপালা অনেক কম। কোনও বন্যজন্তু আছে বলে ভয় হল না। এখানে পথ হারালে আমরা কাউকে খুঁজে পাব না। আমাদেরও কেউ খুঁজে পাবে না। কেমন যেন অসহায় নির্জনতা তার নীরবতার মধ্যে আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। এ পথে কত তীর্থযাত্রী হাজার বছর ধরে চলেছে। কে যে কিসের আকাঙ্ক্ষায় যায়, কী প্রার্থনা করে সে কথা তাদের মনের গভীরে থাকে। তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানা যায় না। তবু হাজার বছর ধরে অবিরাম যাত্রা চলেছে এই পথ ধরে।

পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে থাকা যে সংকীর্ণ পথ আমাদের অভীষ্টে পৌঁছে দেবে তাও মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বর্ষার প্রবল বর্ষণ ছোট বড় উঁচু নিচু কাউকে মার্জনা করে না। অনেক নিচে অলকানন্দার ওপরে দড়ির পোল দেখা যায় মাঝে মাঝে। এপার ওপারের সম্পর্ক ওই জীর্ণ দড়ির পোলের ওপর নির্ভর। মানুষের বসতি কোথাও দেখছি না। না এপারে না ওপারে।

আমাদের পথ যখন ক্ষণিক সমতলের মধ্য দিয়ে যায় তখন দূরে মানুষের বাসের দুয়েকটা চিহ্ন দেখেছি। কতদূর এসেছি জানি না। ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা বলবার কেউ নেই। প্রায় ৩ ঘণ্টা চলার পর দুয়েকটা মানুষ দেখা গেল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পিপলকোঠি পৌঁছব। পিপলকোঠি যে কত দূর তা অবশ্য বোঝা গেল না। প্রায় জনহীন সেই পথ ধরে সূর্যাস্তের কিছু পরে একটি বড় জনপদে পৌঁছলাম। পিপলকোঠি।

এবারে আমাদের পথ চলেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রথম যে মিষ্টান্নের দোকানটি পাওয়া গেল সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে আজকের রাত কাটানোর জন্য। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমাদের রাত কাটানোর জায়গাটা ঠিক করা দরকার।

দিনেরবেলা গরম ছিল না। এখন মনে হচ্ছে রাতটা ঠান্ডাও হতে পারে। আরও দুয়েকজন খদ্দের ইতিমধ্যে পৌঁছেছে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে হালুইকর বললেন, মুদির বাড়িতে জায়গা আছে। সে যদি স্থান দেয় তাহলে সকলের সুবিধা হবে।

একটা ভিড় ইতিমধ্যে জমেছে। তার মধ্যে একজন আমাদেরকে মুদির কাছে নিয়ে যেতে চায়।

মুদির দোকানটি ছোট। দশ-বারোটি টিন সাজিয়ে বসে আছে। আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। বায়নাদার ছোট ছেলের মতো বলল, আমি কিন্তু ৫ টাকা নেব। আমরা মুখে ৫ টাকা অনেক বেশি বলতে থাকলেও রাজি হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে

এসেছে । মুদির বাড়ির দোতলায় কাঠের ওপর খড় পেতে আমাদের শোবার জায়গা । ইতিমধ্যে রূপসা এসে পৌঁছে ছিল মিঠাইয়ের দোকানে । সে আমাদের হোল্ডল দুটো খড়ের ওপর বিছিয়ে দিল ।

আমরা ক্লান্ত । কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি করা দরকার । হালুইকরের দোকানে গিয়ে পুরি ভাজি চাইলাম । আমাদের অনুরোধে সে গরম পুরি ভাজতে রাজি হল । আরও ৫-৬ জন গ্রামবাসী এসে পৌঁছেছে । হয়তো গল্প করতে অথবা অজানা অতিথিদের দেখবার জন্য । কলকাতা তাদের কাছে মহা বিস্ময়ের জায়গা । কখনও সেখানে যাবে বলে আশা করে না । কিন্তু না জানি সে কোন স্বর্গদ্বার । আমাদের দুর্বলতা আমাদের প্রথম সুযোগেই জানিয়ে দিলাম । আমরা খবরের কাগজে কাজ করি । গ্রামবাসীরা খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল । নদীর ওপর একটা সরকারি দড়ির সেতু ছিল, কবে ছিঁড়ে গেছে । বহু আবেদন নিবেদন করে আর সেতু তৈরি করেনি সরকার । আমরা পত্রকারেরা যদি মন্ত্রীজিকে বলে দিই তাহলে হয়তো সুরাহা হতে পারে । ইতিমধ্যে গ্রামের মোড়ল এসে গিয়েছেন । তিনি বললেন, আপনারা একটা চিঠি লিখে দিন । মন্ত্রীজিকে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন ।

চিনি না একথা বলতে পারি না । আবার চিনি বললেও আরও পীড়াপিড়ি হবে । কেউ বলল তার থেকে টেলিগ্রাম লাইন চালু হলে আপনারা কাল একটা টেলিগ্রাম করে দিন । টেলিগ্রাম করবার জন্য কাগজ ও কালি এসে গেল । বহু কষ্টে সে রাতে উদ্ধার পেয়েছিলাম । স্থির হল সকালে বসে টেলিগ্রাম মুসাবিদা করা হবে । শয্যার আরামে নয়, আমাদের মনের আরামে সুখনিদ্রা নিশ্চিত ছিল । কিন্তু টেলিগ্রাম করার কণ্টক আমাদের অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিয়ে দিল । আমরা মুদিকে তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে রূপসাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম । মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখি কেউ আমাদের টেলিগ্রামের মুসাবিদা করবার জন্য কাগজ কালি নিয়ে অনুসরণ করছে কিনা ।

সকালটা ভারি প্রসন্ন ছিল । আকাশ নীল । লঘু মেঘ ভাসছে । আমরা প্রতি পদক্ষেপে বদ্রীনারায়ণের নিকটবর্তী হচ্ছি । আবার তখনই এক পশলা বৃষ্টি হয় । আমাদের বর্ষাতি নেই । পথের ধারে পত্রবহুল গাছ পাওয়া যায় না । আমরা নিরুপায় ভিজি । কখনও আকাশ কালো হয়ে এসে আমাদের ভয় দেখায় । আমরা দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করি ।

দুপুর হওয়ামাত্র একটি চটিতে থেমে গেলাম । এই চটির নাম মনে নেই । চটি মানে পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে গা লাগিয়ে একটা ওপরে ঢাকা বারান্দা মতো জায়গা । তার তিনদিক খোলা । পিছনে পাহাড় । পাশে একটি ছোট ঘরে মুদির দোকান । ওই ঢাকা বারান্দায় তীর্থযাত্রীদের ব্যবহারে পয়সা লাগে না । বিনিময়ে যাত্রীকে কিনতে হয় তার খোরাকি মুদির কাছ থেকে । বাসনপত্র নগণ্য ভাড়ায় তারই কাছ থেকে পাওয়া যায় ।

আমরা হোল্ডল বিছিয়ে তার ওপর বিশ্রাম করতে লাগলাম। রূপসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাসনপত্র পরিষ্কার করতে লাগল। চটির সামনে জলের কল। উঁচু কোনও ঝরনা থেকে পাইপে করে সরকারের ব্যবস্থা করা এই জল। সব চটির সামনে এই ধরনের কল দেখেছি। কোনও চটিতে একটার বেশি দোকান দেখিনি। আমাদের চটিতে ৫-৬টি উনুনের মতো ছিল। এইখানে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করবে যাত্রীরা। মুদির কাছ থেকে জ্বালানি কাঠ কেনা হয়েছিল। রূপসা একটা উনুনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রশিক্ষণহীন আমি সেই উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে খিচুড়ি রন্ধনে প্রবৃত্ত হলাম। দোকানে ভালো চাল পাওয়া গিয়েছিল এবং আলু। আমাদের আনা কপির এবং সোনামুগের ডাল সহযোগে খিচুড়ি তৈরি হল। পরিমাণের জ্ঞান নেই। তাই অনেক হয়ে গেল। আমরা রূপসাকে যথেষ্ট খিচুড়ি দিলাম। সে ভারি খুশি হয়ে খেল। মোট জিনিসপত্রের দাম লেগেছিল এক টাকা।

রূপসা খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিল। আমাদের ক্ষুধা এবং ক্লান্তির মুখে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল। কারণ আমরা কোনও নিন্দা করিনি। রূপসা বাসন মেজেও ফেলল। নীরেন আমাদের থালা দুটি নিয়ে যাচ্ছিল। রূপসা নিজে এসে সে দুটি নিয়ে গেল।

ভোজনের পরে বিশ্রামের প্রয়োজন। সময় বেশি নেই। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পরে যাত্রা শুরু করতে হবে। পরের চটিতে সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছতে হবে।

আবার সেই কঠিন যাত্রা। আরোহণ অবরোহণের ক্লান্তি মাঝে মাঝে ছেঁকে ধরে। পরের চটিতে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ দেখি তুষারমণ্ডিত কয়েকটি শৃঙ্গ। আবার উৎসাহী হয়ে চলতে থাকি। এবারে যে চটিতে পৌঁছলাম তার নাম গুলাব চটি। সেই একচালা বারান্দা, পাশে সেই মুদির দোকান। সদ্য পরিচিত সেই আয়োজন।

গুলাব চটির মুদির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রান্নাবান্নার কাজ শুরু করা গেল। ইতিমধ্যে মুদি তার দোকান বন্ধ করে পাহাড়ের ওপরে তার বাড়িতে চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেল এটা নিরাপদ স্থান। আমাদের ভয় পাবার কারণ নেই। তবে হ্যাঁ, কাল সন্ধেবেলা নদীর অন্য তীরে একটা ভালুককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। চিতাবাঘও, আছে কিন্তু তারা বড় একটা আসে না।

এদিকে খিচুড়ি ফুটছে না-জানি-কতক্ষণ। চাল সিদ্ধ হতে চায় না। যখন আর অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই তখন কম সিদ্ধ খিচুড়ি পরিবেশন করে আমরা আহার শেষ করলাম। নীরেন আবার দুটি থালা ধুতে চেয়েছিল। রূপসা এগিয়ে এসে ধুয়ে দিল। সঙ্গে পাঁপড় ছিল। কিন্তু সেঁকবার ধৈর্য ছিল না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারলে হয়। শোবার পর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মেঘের হাঁকডাকও শোনা গেল। এই জনহীন নির্বান্ধবপুরীতে নীরেন আর আমার একমাত্র সহায় ও সাহস রূপসা। ঘুম এসে গেল।

হঠাৎ নীরেনের একটা হাউমাউ শব্দে জেগে উঠলাম । কোনও একটা জন্তু আমাদের বারান্দায় উঠেছে । টর্চ জ্বেলে দেখি প্রচুর লোমওয়ালা একটা কুকুর । নীরেনের ভালুকের গল্প শোনার পর লোমশ কুকুরকে ভালুক মনে করা অস্বাভাবিক নয় । আবার ঘুমিয়ে পড়া গেল । রাতে বৃষ্টি হয়েছে । চালা থেকে মাঝে মাঝে গায়ের ওপর জল পড়েছিল । বিছানা এদিক ওদিক সরিয়ে আত্মরক্ষা করেছি ।

সকালে মুদি দোকান খুলেছে । তার কাছে চা পাওয়া গেল । পাওনাগণ্ডা আগেই মেটানো ছিল । এখন বাসনপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম ।

সেদিন দুপুরে আমরা একটা অতি দীর্ঘ ধসের কাছে পৌঁছলাম । এইখানে পাহাড় অর্ধচন্দ্রাকার । মাঝখানে অনেকখানি ধসে গেছে । আমাদের সঙ্গে যারা গিয়েছে তাদের পায়ে পায়ে একটা পথের ইশারা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে । নিচে ৫০০ ফুট গভীর খাদ । ভাবিনি এই জায়গাটা পার হতে পারব । বদ্রীনাথের কৃপায় ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম । তখনও আমি ভয়ে বিধ্বস্ত । এই স্থানটির নাম পাতালগঙ্গা । এখানে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । তাদের একজন তিনবার এই যাত্রা করেছে । সে বলল, এইখানে মাটিটা কাঁচা । প্রতিবছরই এমনই ভেঙে যায় । এবারে গতকাল একযাত্রী খাদে পড়ে গেছে । তার মৃতদেহের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি । মনে মনে ভাবলাম এই মানুষটির কী এমন প্রার্থনা যে বদ্রীনারায়ণের কাছে একে তিনবার আসতে হয়েছে । আমার শরীর তখনও ভয়ে কাঁপছে । ওই মরণফাঁদ পার হয়ে আসতে পেরেছি বিশ্বাস হয় না ।

বদ্রীনাথের পথে পাহাড়গুলিতে বড় গাছ কম । যে ধরনের অরণ্যের ভূমি দেখব বলে আশা করেছিলাম তেমন কিছু দেখতে পেলাম না ।

মস্ত একটা চড়াই উঠতে হল যোশিমঠে । আমরা মাঝে মাঝে চা পানের জন্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছাড়া থামছি না । অনেক উতরাইয়ের পর বিষ্ণুপ্রয়াগ । দুপুরে কোথায় খিচুড়ি চড়িয়েছিলাম মনে নেই । সন্ধ্যার পরে যে চটিতে থামলাম তার নাম বগোদর । সেই একই রুটিনে এখানে রাত্রিযাপন হল । সকালে আবার যাত্রা শুরু । তখন আমাদের মন অধীর । আজ বিকেলের আগেই পৌঁছে যাব আশা করছি ।

মাঝে মাঝে কোনও যাত্রীদলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি আবার কখনও কোনও যাত্রীদল আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে । ওদিক থেকেও কিছু যাত্রী আসছে । সব দলের মুখে এক আওয়াজ ‘জয় বদ্রীবিশাল কী’ ।

কোটদ্বার পৌঁছবার পর থেকে যে দুর্ভাবনা ও টেনশন শুরু হয়েছিল এখন হঠাৎ তার থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছি । আর কোনও বাধা আমাদের আটকাতে পারবে না ।

অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নেই, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মনে শেষের দশ মাইল পার হচ্ছি। শুনেছিলাম পথে বরফ পাব। কিন্তু প্রবল বর্ষণে রাস্তার ওপর থেকে বরফ ধুয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের ওপরে, আমাদের নিচে, নদীতে নামবার পথে এখনও বরফ জমে আছে। ওপারের পাহাড়ের ওপর বরফ ছোট ছোট হিমবাহ তৈরি করেছে। যাত্রীসংখ্যাও বেশি দেখছি এখানে। সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষুকের সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ মানুষেরাও হেঁটে চলেছেন পাশাপাশি। সবারই এক অভীষ্ট, বদ্রীনাথ। মুখে জয় বদ্রীবিশাল কী ধ্বনি। দুটি সম্পন্ন মারোয়াড়ি পরিবার চলেছেন দাস-দাসী সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের গৃহিণীরা ডুলিতে, পুরুষরা পদব্রজে, অল্পবয়সীরা টাট্টু নিয়েছে, শিশুরা দাসদাসীদের কোলে। সবাইকে প্রফুল্ল দেখছি। আশপাশে মানুষজন, প্রকৃতি-যা দেখছি সবার মধ্যেই প্রফুল্লতা সঞ্চারিত হয়েছে। এমনই হয়, অনেক কষ্টের পর আকাঁ পূর্ণ হলে আনন্দের সীমা থাকে না। সবাইকে সেই আনন্দের ভাগ দেবার ইচ্ছা হয়।

হনুমান চটি থেকে শেষ পাঁচ-ছ মাইল প্রচণ্ড চড়াই। শরীরের কষ্ট হৃদয়ের আনন্দকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তবু কারও ক্লান্তি নেই, যত দ্রুত পারে হেঁটে চলেছে।

এখানে সূরজপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হল। সে বদ্রীনাথ মন্দিরের পাণ্ডা। বদ্রীনাথ থেকে এতখানি এগিয়ে এসেছে যজমান ধরবার জন্য। মানুষটি ভালো। বলল, আপনাদের আর কিছু ভাবতে হবে না। আমি আপনাদের ভার নিয়েছি, আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা আমার কাজ। আমরা পাঁচ পুরুষের পাণ্ডা।

সূরজপ্রসাদ আমাদের দেখভালের কোনও ত্রুটি রাখেনি। তার বাড়িতেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আমরা আরও ভালো জায়গা চাওয়াতে, সেই আমাদের অন্ধ্র ধর্মশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক ওপরেই এই বাড়িটি। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল মুনশিজির জন্য গত বছরই তৈরি হয়েছে। দুটিমাত্র শয়নকক্ষ। তারই একটায় আমরা উঠেছিলাম।

ঈশ্বর বোধহয় মানুষকে অনেক কষ্ট দেন, তার সুখের স্বাদ গভীর করবার জন্য। আমরাও যখন আর চড়াই উঠতে পারছি না, তখন হঠাৎ দূরে, কিছু নিচে সবুজের ছোঁয়া মাখা উপত্যকার এক প্রান্তে আমাদের আরাধ্য দেখতে পেলাম। সূরজপ্রসাদ বলল, এই স্থানটির নাম দেবদেখানি। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাহলে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হল। বিশ্বাস হতে চায় না, বরফমণ্ডিত দুই শিখরের নিচে, ছোট্ট মন্দিরটি বদ্রীনাথের। হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এই মন্দিরে আসার জন্য প্রাণ বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না, ভক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাদের টেনে আনে।

সামনে সেই বদ্রীনাথের মন্দির। সমস্ত অবসাদ যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। দুপুরের সূর্য যেন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে নীলকণ্ঠ পর্বতে। তার নিচে বদ্রীনাথের সোনার চূড়া।

জয় বদ্রীবিশাল কী।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

স্বর্গের সিঁড়ি ভেঙে গেছে

মানস অভয়ারণ্য

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

বাঘের ঘরবাড়ি

এদীনা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জায়গা তো বিস্তর । কিন্তু মানসে গেলে যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে । মরার জায়গা পৃথিবীতে বোধহয় ওই একটাই । মানস । সেটাও বন্ধ হয়ে গেল ।

সেই ১৯২৮ সাল থেকে মানস সংরক্ষিত বনাঞ্চল । বেশ চলছিল । কেউ যেত না । জানত না । গোল বাধল প্রখ্যাত বনবিশারদ ই-পী-গী 'ভারতের বন্যপ্রাণী' (ওয়াইল্ড লাইফ ইন ইন্ডিয়া) নামে বইটি লেখার পর, যা বেরোয় ৫০ দশকের মাঝামাঝি । বন্ধুবর জওহরলাল নেহরু লিখলেন ফোরওয়ার্ড । শ্রীযুক্ত গী ওই বইতে মানস সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখলেন । তিনি লিখলেন, সোনালি লোমে-ভরা দীর্ঘদেহী হনুমানদের কথা (গোল্ডেন লেঙ্গুর) যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই । মানসকে তিনি ঘোষণা করলেন 'পৃথিবীর সুন্দরতম স্যাংচুয়ারি' বলে ।

বাস! রে-রে করে সাহেবরা উড়ে আসতে লাগল, সঙ্গে মেম । যদিও সৌভাগ্যের বিষয়, সাহেবদের পছন্দ হল নদীর ওপারে ভুটান সরকারের মস্ত ও আধুনিক ট্যুরিস্ট বাংলোটি । নদীপাড়ে ক্যাম্প ফেলে থাকতে তাঁরা আরও পছন্দ করেন । তাঁরা প্রাণী-নিরীক্ষণ করেন গোলাকার রাবার বোটে ভেসে যেতে যেতে । অবশ্য, তাঁদের একটা সুবিধা এই যে ভারতীয় বাঘ সম্ভবত সাহেবদের খায় না । নইলে তো, রুদ্রপ্রয়াগের চিতাটা কবেই করবেটকে সাবাড় করে দিত ।

একবার একজনা লাফ দিয়েছিল বটে করবেটের দিকে । তৎক্ষণাৎ শূন্যে মৃত্যু, থ্রি-নট-থ্রি'র মাত্র একটি গুলিতে । আমি মোহনের মানুষ খেকো'র কথা বলছি ।

আসলে, সেই কোম্পানির আমল থেকেই ওরা জানে, খাবে তো, কেলেকুলে দেখে খাও । কেউ কিছুটি বলবে না । কিন্তু, সাহেব খেয়েছ কি মরেছ । পুলিশ-দারোগা আসবে ।

মিলিটারি আসবে। তখন কেলেঙ্কারি! কিম্বা কে জানে, হয়তো সাহেবদের খেতে বিচ্ছিরি। নইলে অত সুযোগ পেয়েও এবং যথেষ্ট ক্ষুধিত থাকা সত্বেও (বিশেষত জালিয়ানওয়ালাবাগের পর) কই, একটা-কেও তো পুড়িয়ে খাইনি আমরা?

মানসে বাঘের সংখ্যা প্রচুর। তাই এ বাঘের কিসসা।

বাঘ-সুমারিতে সুন্দরবন ফার্স্ট। মানস দ্বিতীয়। মানসে গেলেন, তবু বাঘ দেখতে পেলেন না, এমনটা হতে পারে। উনি স্বয়ং দেখা না দিলে কেউ তাঁর দেখা তো পায় না! তবে, মানসে তিনদিন থাকলেন, অথচ ব্যাঘ্রগর্জনে রাতের বাংলো একদিনও কেঁপে উঠল না, শার্সি ঝনঝনিয়ে উঠল না, এমন ঘটনা মানসে না ঘটারই সম্ভাবনা।

কেননা, মানসের বাংলোটি বনবিভাগের ভাষায়, কোর এরিয়ায়। যেখানে বাঘের ঘরবাড়ি।

এক আকাশে চন্দ্রসূর্য

মানসে আমি প্রথমবার যাই ১৯৮১ সালে। সঙ্গী বন্ধুবর পার্থসারথি চৌধুরী ও নিমাই সেন। 'যাই' না বলে বলা উচিত ভ্রমপূর্বক অনট প্রত্যয় যোগে (ভ্রম Ô অনট ñ ভ্রমণ) আমরা ওখানে গিয়ে পড়ি। সারা আসাম টো-টো করতে করতে, হঠাৎ। মানস সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই তখন জানতাম না।

অবশ্য, পরে মানস যাওয়া জলভাত হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেস। পরদিন বিকেলে বরপেটা রোড স্টেশনে। বরপেটা থেকে সেদিনই মানসে-ট্যাক্সিতে ৪০ কিলোমিটার।

তখনও নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ নেমে, মিটার গেজে যেতে হত বরপেটা রোড। আমরা যখন যাই। রাতে থাকতে হত ওখানে। পরদিন মানস।

মানস স্যাংচুয়ারির বাংলো যে-জায়গায়, তার নাম মথানগুড়ি। মথানগুড়িতে দুটি বাংলো। আপার ও লোয়ার। বলা বাহুল্য বাংলোটি কাঠের। আপার বাংলোটি দোতলা। টিলার ওপর। সুসজ্জিত। এমনকী, একটি বিশাল গ্লাস-প্লানেল-ওয়ালা পর্যবেক্ষণ কক্ষও রয়েছে। পাহাড়ি সিঁড়িশ্রেণী নেমে গেছে ৫০০ ফিট নিচে বেঁকি নদী পর্যন্ত। ওপারে ভুটানের পাহাড় ও অরণ্যানী।

লোয়ার বাংলো টিলার নিচে। দুই বাংলোতেই অনেকগুলো ঘর আছে। তখন ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। এছাড়া আছে নদীর ধারে ল্যা-কেবিন।

জানুয়ারি ১৯৮১-র গোড়ায় আমরা তিন হরিহর (আত্মা) যখন এখানে পৌঁছই, তখন বিকেলবেলা। যে সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম, ভাষায় তার বর্ণনা হয় না। সাধে বিভূতিভূষণ বারবার লিখেছেন, 'এ অপূর্ব দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, তাহাকে কী বুঝাইব!' সেদিন ছিল পূর্ণিমা। তখন ভুটান হিলসের পিছনে চাঁদ উঠে পড়েছিল, যদিও তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। একই আকাশে চাঁদ ও সূর্য-তাদের মেশামেশি আলোয় যে রং তৈরি হয়ে ঝরে পড়ছিল, মানস ও বেঁকি নদীর মিলন-মোহনায়, নানাভাবে, তাকে 'স্বর্গ-রং' ছাড়া আর কী বলব?

স্বর্গের রাজধানীতে এসে পড়েছি বলে মনে হয়েছিল।

ওপারেতে সর্বসুখ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস/ ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। নীল নৌকায় চেপে ওপারে ভুটানে গেলে অবশ্য, দীর্ঘশ্বাস সহ, একথা মনে না পড়ে পারে না। নদীতীর ছেড়ে কিছুটা ওপরে উঠলেই দেখা যাবে, কমপক্ষে ফুট পাঁচেক সোনা-লোমের ল্যাজ ঝুলিয়ে (হরিদ্রাভ বা সোনালি নয়) গোল্ডেন লেঙ্গুরের দলবল। ডান দিকে বনপথের প্রবেশমুখে অবিশ্বাস্য পথ-ফলক-To The Bar! সেখানে পৌঁছলে রঙিন ছাতার নিচে বেতের সাদা চেয়ার-টেবিল। পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়, এক নরমাংস ছাড়া, থরে-থরে সাজানো। ইতস্তত কিছু সোনালি মানব-মানবী। হাজার দুই ফুট নিচে গর্জের (GORGE) মধ্য দিয়ে নেমে আসছে সরু মানস নদী। পাহাড়-কাটা সিঁড়ি তদবধি নেমে গেছে।

অথচ, মথানগুড়ির বাংলোয় আরামদায়ক ঘর পাওয়া গেলেও, সুন্দর কিচেন থাকা সত্ত্বেও খাবার-দাবার সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। প্রথম রাতে আমাদের ডিনার বলতে ছিল এক বোতল ভুটানি রাম ও এক কেজি লেড়ো বিস্কুট। আমাদের ফুড পয়েজনিং হয়। যা পরদিন ওপারের সর্বসুখ বিফ স্টেক ও কাঁচা কর্বুশিয়ের খেতে হবে সারে।

প্রথম রাতে দুই-বাংলোর একটিতেও আমরা জায়গা পাইনি। মানস এমনিতে আদৌ কোনও ভিড়-ভাট্টার জায়গা নয়। কিন্তু, সেদিন শিলং থেকে নববছরে কলেজের একটা পুরো ক্লাস এসে পড়েছিল।

নদীর ধারে সাত-আটটি লজ-কেবিন। এম ভি হর্ষবর্ধনের কেবিনের চেয়ে অনেক ছোট। পাশাপাশি দুটি বাঙ্ক কোনওমতে। মাঝখানে টি-পাই। কমন টয়লেট-কক্ষ। প্রথম রাতে আমরা তিনজনে সেখানেই গুঁজে যাই। কারণ, ওই যে বললাম, কোর-এরিয়া।

বাঘের ঘরবাড়ি । (বনবিভাগের জিপে আমরা এসেছি । সঙ্গে ছিল, দিনেরবেলাতেও, একজন রাইফেলধারী ফরেস্ট গার্ড) ।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে । কেবিন থরথর করে কাঁপছে । ভূমিকম্প? না । বাঘ? না । কেবিনের পোর্ট হোলের হিমাদ্র কাচ হাত-ওয়াইপার দিয়ে মুছে আমরা দেখলাম, একটি চিত্রল পুরুষ-হরিণ তার সুদীর্ঘ বাঁকা শিং ঘষছে কেবিনের গায়ে ।

সেই থেকে জীবজগতের কাছে আমি ঋণী ।

মানস, পুনর্বার

মানসে দ্বিতীয়বার ১৯৮৩ সালে ।

এক আমেরিকা ছাড়া, আমি যেখানেই গেছি, ভালো লাগলে দু'বার করে গেছি । আমেরিকা ভালো লাগেনি ।

এবার মে মাসের শেষের দিকে ।

এবার পাকাপাকি ব্যবস্থা । আপার বাংলোর দোতলায় বুক করা ছিল তিন তিনটি ঘর ।

ছিল তিন দিনের মতো চাল-ডাল, ডিম ও তৈজসপত্র । এবং প্যাকেট-কুড়ি মশলা-ম্যাগি । স্ত্রী-কন্যা সহ আমি আগের দিন থেকে আছি । ২৪ মে রাত সাতটা-কুড়িতে গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট থেকে এসে পৌঁছল বন্ধুবর বরুণ চৌধুরী । সঙ্গে স্ত্রী মীনা ও ছেলেমেয়ে জয় আর রাখি । গুয়াহাটি থেকে প্রলয়পয়োধি ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে ১৬৮ কিলোমিটার পথ রাইনো ট্র্যাভেলস-এর ঝরঝরে অ্যাম্বাসাডরে চেপে (ড্রাইভার মাতাল) ওরা সেদিন শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল । এটা ঘটনা ।

মানসে ওদের আবির্ভাবের মুহূর্তটি বরুণ চৌধুরীর ভাষায় এরকম:'টিলার মাথায় মানস নদীর দিকে পিঠ বেঁকিয়ে ওই সেই স্বপ্নের বাংলো । শুধু পৌঁছবার মইটা কেউ সরিয়ে রেখেছে । ঘনঘোর অন্ধকারে অঝোর বৃষ্টির মধ্যে আকাশ-প্রদীপ (হ্যারিকেন) দুলছে বারান্দায় । ওপরে পৌঁছনোর রাস্তা ছিল না কিছুতেই । রিনা আর সন্দীপের আর্তকণ্ঠ উড়ছে গর্জনকারী হাওয়ায় । তৃণার হাতে দু-সেল টর্চের সিগনাল!

'শেষ পর্যন্ত রৈ-রৈ । হৈ-হৈ । মহামিলন । ঘড়িতে তখন সাতটা-কুড়ি ।'

'রাত আটটায় দুই স্যাঙাৎ আপার বাংলোর ইনস্পেকসান ঘরে । মাঝখানে এক বোতল তরল সোনা । যেন, আজ নয় । চল্লিশ মিনিট আগে নয় । কতকাল এসেছি! রান্নাঘর থেকে রিনার তৈরি খিচুড়ির সুগন্ধ ।' (কলকাতার কাউবয়) ।

পরদিন দুটি হাতির পিঠে চেপে আমরা বন্যজন্তু প্রদর্শনে যাই । তখন দুপুরবেলা । একটিতে মাহুত, আমি, রাখি ও মীনা যথাক্রমে । অন্যটিতে মাহুত, জয়, তৃণা ও রিনা । বরুণ গেল না ।

বাঘ ছাড়া সবারই দেখা এখানে মেলে । ১৪০ জন তারা । কোথায় যে থাকে! অথচ, সাহেবদের জন্য যথেষ্ট পোজ দিয়েছে । এক বেলজিয়ান বাংলোর রেজিস্ট্রারে লিখে গেছে: ‘টাইগার অ্যাট ফোর পি-এম ।’ মায়, ফটোও খিঁচেছে । ২৯-৪-৮২’র অপর একটি এন্ট্রিতে দেখলাম: ‘ড্যাড, ইটস স্টিল রেইনিং । -জিম ফুলার । সাউথঅল । লন্ডন ।’ তার বাবা যখন এসেছিল, সে বহুবছর আগে, বুঝলাম, সেদিনও বৃষ্টি পড়ছিল । মনে হল, ইতিমধ্যে যে ‘ইতি ভাগ্যহীন’ হয়েছে । ডেম এডিথ সিটওয়েলের ক’টি উক্তি আমার মনে না এসে পারে না:

‘স্টিল ফলস দা রেইন

ডার্ক অ্যাজ আওয়ার লস

লাইক নাইনটিন হানড্রেড অ্যান্ড ফিফটি নেলস

আপন দ্য ক্রশ....’

বলা বাহুল্য কবিতাটি ১৯৫০ সালে লেখা ।

এক অমূল্য চলচ্চিত্র

তো, যা বলছিলাম ।

যেতে-যেতে গভীর বনের মধ্যে আমাদের এক একা-বাইসনের সঙ্গে দেখা । মানসের একা-বাইসন কুখ্যাত । এদের খুরের ব্যাস দেড় ফুট এবং বৃন্তের পর বৃন্তে গোলাকার শিং সাত ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে । এরা শিঙে তুলে নাকি বাঘও ছুড়ে ফেলে দেয় । (দ্রঃ ই-পি-গী’র গ্রন্থে মানস-অধ্যায়) ।

মাত্র একশো গজ দূরে সে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ।

পিছন থেকে মিনতি-মাখা গলায় মীনা বলল, ‘সন্দীপন, আর-একটু এগিয়ে চল ।’

মীনা ই-পি-গী পড়েনি । কিন্তু সে তো মাহুতও পড়েনি । সে শুধু মুখে তর্জনী তোলে । অর্থাৎ, চুপ ।

পাশের হাতি থেকে মেয়ে তৃণার চাপা গলা, 'বাবা, ফিরে চল ।' হাতির মুখ ঘুরিয়ে মাহুতও হাতিকে নিয়ে-যাবার খোঁচা দিল ।

কিন্তু, মীনার ওই কথা, কথা । যদিও, আরও চাপা স্বরে, 'আর-একটু এগিয়ে যেতে বল মাহুতকে । আমি আর-একটু কাছ থেকে দেখব ।'

দেখবার মতো দৃশ্যই বটে । নির্জন নদীতীরে একা-বাইসন, তার মাথায় জড়ানো কতদিনের লতাপাতার মুকুট, পিছনে একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে ।

কুড়ি গজের মতো এগোতে হল মাহুতকে ।

'আর-একটু চল সন্দীপন । ওকে বলো প্লীজ ।'

কিন্তু, হাতি এবার পা তোলার প্রয়াস করামাত্র-বনের দখল-নেওয়া বিকট এক রণভেরী বাজাল সে, দলছুট একা-বাইসন! সে রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে । এই চাঞ্চল্য ভয়াবহ । এ-দিকেই যে ছুটে আসবে, তা বোঝার জন্য ই-পি-গী'র দ্বারস্থ হবার আর দরকার পরে না । এবং ছুটে সে কিছুটা এলও । তারপর কী যে হল, কেন সে, কী মনে করে আর এগোল না-তা জানি না । হঠাৎ থেমে পড়ে ও এক প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পিছন ফিরে হাতি-ঘাসের জঙ্গলের দিকে দিল দৌড় । অগণন নুড়ি ও বোল্ডারের ওপর দিয়ে খুরধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে । ওপারে উঠল । তারপর সোজা ছুটতে লাগল । সূর্য অস্ত যাচ্ছিল ওদিকেই । বোধহয় তার শিংয়ে খোঁচা খেয়েই দিগন্তে সূর্যও উঠল ঈষৎ লাফিয়ে ।

হাকোয়া নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে তার মাথা থেকে খসে পড়া লতাপাতার মুকুট । এই অমূল্য চলচ্চিত্র চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই ।

মানস একটি কবিতা

এই তো গেল মানসের গল্প । গল্পই; যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে মানস একটি কবিতা । যদি মানসের শাখানদীগুলি, বেঁকি, সাঙ্কোশ ও হাকোয়ার অববাহিকা ধরে বর্তুল সাদা-লাল রাবার-বোটে করে ভেসে যাওয়া যায় । তীরে গাছগাছালি সব দাঁড়িয়ে পড়েছে । অবাক চোখে, আপনি নয়, হরিণ, সম্বর, হাতি, গণ্ডার, বাইসন-মায় কপালে থাকলে বাঘ-বাঘিনীও আপনাকেই যেন দেখতে এসেছে ।

এবং যদি নির্জন নৌকায় চেপে অপরাহ্ণের নদী পেরিয়ে, ওপারে ভুটানে যাওয়া যায় । জল বরফ-নীল । ওখানে শাখায় শাখায় স্বর্ণমৃগ । গোল্ডেন লেঙ্গুর । তারা তো এপারে আসে না । তারা তো কোথাও যায় না । পৃথিবীর আর-কোথাও তারা তো নেই!

আর, ওপারে ভুটানের রাজবাড়িটি! মন্দ্রিয়নের এঁকে যাওয়া আনফিনিশড ক্যানভাস যেন একটি! আজ তার কত কোটি ডলার দাম কে জানে! একবার দেখলে মাথা-গ্যালারিতে জীবনভর ঝুলে থাকবে ।

তাই বলছিলাম । বেঁচে-থাকার জায়গা? সে তো অনেক । কিন্তু মরে যাবার জায়গা ওই একটাই । মানস । সেটাও বন্ধ হয়ে গেল!

ভ্রমণ মার্চ, ১৯৯৩

জলদাপাড়া অরণ্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডুয়ার্স নামটা কোন শব্দ থেকে এসেছে, সে সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই। অনেক নামেরই উৎপত্তি বেশ রহস্যময়। এমনকী কলকাতা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়েও নানা মুনির নানা মত। অনেক সময়ই স্থানীয় কোনও দুর্বোধ্য শব্দকে সংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে।

বইপত্রে লেখা থাকে, ডুয়ার্স এসেছে দুয়ার থেকে। অর্থাৎ ভুটানের প্রবেশদ্বার। ঠিক বিশ্বাস হয় না। দ্বার, দোর, দরজার তুলনায় দুয়ার একটা কবিত্বময় শব্দ। এই অঞ্চলে ওঁরাও, মুণ্ডা, রাভা, টোটো এই রকম নানা উপজাতির বাস। তারা দুয়ার শব্দটা ব্যবহার করত? ইংরেজরা সেটাকে ডুয়ার্স করে দিল?

ডুয়ার্স অঞ্চলটি আমাকে খুব টানে। সমুদ্রের তুলনায় পাহাড় ও জঙ্গল অনেক বেশি নাটকীয়। চোখও বেশি জুড়োয়।

কিছু একটা সাহিত্য সমাবেশে গিয়েছিলাম কোচবিহার। সেখান থেকে হাসিমারায় এক বন্ধুর বাড়িতে। সে বাড়িতে আগে থেকেই বসে আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বসে আছে বলাটাও ঠিক হল না, উঠোনের একটা খাটিয়ায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। শুনলাম, প্রায় তিনদিন ওই খাটিয়া ছেড়ে প্রায় নড়েইনি। আমাকে দেখে অবশ্য তড়াক করে উঠে বসল, শুরু হল নানান পরিকল্পনা।

এর আগে আমি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পাশ দিয়ে বেশ কয়েকবার গেছি, কিন্তু ভেতরের কোনও বাংলোতে থাকা হয়নি। সে কথা শুনে শক্তি এমনভাবে তাকালো, যেন জলদাপাড়ায় রাত্রিবাস না করলে আমার জীবনটাই বৃথা।

এত কাছে এসে এই সুযোগ সদ্ব্যবহার না করারও কোনও মানে হয় না। আমাদের অন্য বন্ধুটি যেতে পারবে না, তার অফিসের বস আসবেন পরিদর্শনে, সুতরাং তার জায়গা ছাড়ার উপায় নেই। তবে, সে একটা জিপ গাড়ি জোগাড় করে দিল। সেটি দুদিন থাকবে আমাদের সঙ্গে। এছাড়া কিছু খাদ্য-পানীয়ও সঙ্গে নেওয়া হল, এসবই শক্তির ব্যবস্থাপনা। শক্তি সঙ্গে থাকলে কোনও ভ্রমণেই আমাকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয় না।

বেরিয়ে পড়ার আগেই একটি দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। হলং ফরেস্ট বাংলোতে জায়গা পাওয়া যাবে না। সেখানে সদলবলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এমনিতেই হলং বাংলোর জন্য অনেকদিন আগে থেকে রিজার্ভেশন করে রাখতে হয়। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা। মুখ্যমন্ত্রীদের ওসব রিজার্ভেশনের ঝামেলা পোহাতে হয় না। এমনকী আগে থেকে যাদের ঘর বুক করা আছে, তাদের রিজার্ভেশন বাতিল করেও মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন। এইটুকু সুযোগ-সুবিধা না পেলে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে লাভ কী?

রিজার্ভেশন ছাড়াই অনেক ফরেস্ট বাংলোতে আমরা আগে থেকেছি। তার একটা কায়দা আমাদের জানা আছে। এবারে সে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। অন্য মন্ত্রী কিংবা বড় গোছের আমলা হলেও কথা ছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এমন সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে যে কাছে ঘেঁসতেই দেবে না।

অগত্যা মাদারিহাটের ট্যুরিস্ট লজে যাওয়া যেতে পারে। সেখানে পৌঁছে জায়গাটি ঠিক মনঃপূত হল না। এটা জঙ্গলের বাইরে, কাছেই বড় রাস্তা, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ। এখানে অরণ্যের অনুভব নেই। এখান থেকেও ভোরবেলা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাত্রিবাসের রোমাঞ্চই তো আসল।

শক্তি যত হলং বাংলোর গুণপনার বর্ণনা দিতে লাগল, আমি ওকে তত শোনাতে লাগলাম আসামের মানস রিজার্ভ ফরেস্টের জঙ্গল-বাংলোর কথা। শক্তি সেখানে যায়নি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৪ কিলোমিটার গেলে মানস নদীর ধারে সেই অপরূপ বাংলো, রাতের বেলা বারান্দায় বসে বসেই ঘাই হরিণীর ডাক শোনা যায়। 'ঘাই হরিণী' জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে ধার করা, সবাই বলে বার্কিং ডিয়ার, মানসে সে ডাক সত্যিই আমি অনেকবার শুনেছি, তবে হরিণ না হরিণী ছিল, তা বলতে পারব না।

মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজের ভেতরে না ঢুকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এর চেয়ে গরুমারা স্যাঙ্কচুয়ারিতে যাওয়াও অনেক ভালো। আমরা দুজনেই আগে সেখানে গেছি যদিও, তবু ওখানে বারবার যাওয়া যায়।

জিপে স্টার্ট দেবার পর শক্তি বলল, যাবার পথে তোমাকে একবার শুধু হলং বাংলোটা দেখিয়ে নিয়ে যাব। ওখানে বসে এক কাপ চাও খাওয়া যেতে পারে।

যদি পুলিশ ঘিরে থাকে? কাছে যেতেই না দেয়?

শক্তি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। যেন দুনিয়ার কোনও পুলিশই ওকে আটকাতে পারবে না।

সেখানে আমাদের জন্য একটা দারুণ চমক অপেক্ষা করছিল।

জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবছি, কোথায় ঘাপটি মেরে পুলিশ বসে আছে, কোথায় আমাদের আটকাবে। বাংলোর একেবারে কাছে পৌঁছে দেখি চতুর্দিক ভোঁ ভোঁ! কোথায় মুখ্যমন্ত্রী, কোথায় পুলিশ? একটা গাড়ি পর্যন্ত নেই। আমাদের জিপটা দেখে দু-তিনজন অবাক চোখে কাছে এল।

তখন জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রীর আজ সকালে এসে পৌঁছবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি এদিককার সফর বাতিল করেছেন, তাঁর সঙ্গীরাও কেউ আসেনি। বাংলো একেবারে ফাঁকা।

যে-কক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা ছিল, আমরা সেটারই দখল নিলাম। ফুল টুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো, এসব যেন আমাদেরই জন্য। একদিন কা বাদশা হতে ক্ষতি কী? চা চাইতেই সঙ্গে চলে এল টা হিসাবে গরম গরম ফিস ফিঙ্গার।

মনে আছে, সন্ধেবেলায় অনেকক্ষণ শক্তি ও আমি তর্কে মেতে ছিলাম স্থানীয় নাম-রহস্য নিয়ে। গরুমারা নামের মানে বোঝা যায়, তাহলে হাসিমারা মানে কী? ‘রাজাভাতখাওয়া’র মতো এমন অদ্ভুত নাম কে দেয়? কাছেই ‘জয়ন্তী’, কী সুন্দর নাম। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে দুর্জয় লিঙ্গের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে কি? সবচেয়ে বিস্ময়কর ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’। এর আদিনাম হয়তো অন্য কিছু ছিল।

একটু বেশি রাতে আমরা বেরিয়ে আসি বাংলোর বাইরে। অরণ্যের নির্জনতার সঙ্গে অন্য নির্জনতার তুলনা হয় না। এখানে নীরবতা বাঙ্ময়। মাঝে মাঝে একটা পাখি ডাকছে দূরে। শক্তির মতে, ওটা জলতরঙ্গ পাখি। সুন্দরবন অঞ্চলে ওই নামটা আমিও শুনেছি, পাখিটাকে চোখে দেখিনি।

ভোরবেলা হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমাদের। সেটা গ্রহণ করিনি। মানস স্যাঙ্কচুয়ারিতে হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ওরকম একবারই যথেষ্ট। মোটেও আরামদায়ক নয়। গদাই লস্করি চালে হেলতে দুলতে চলে হাতি, তার ওপরে বসে কখন কোন জন্তু-জানোয়ার দেখা যাবে সে জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। জঙ্গলে গিয়ে জন্তু-জানোয়ার খোঁজার ব্যাপারে আমার কখনও আগ্রহ হয়নি।

শক্তি অত ভোরে উঠতেই চায় না!

আমাদের সঙ্গে জিপ আছে, একজন গাইডকে নিয়ে আমরা নিজেরাই ঘোরাঘুরি করতে পারি। চা খেয়ে একটু বেলার দিকে বেরিয়ে পড়া গেল।

জলদাপাড়ায় সবাই দেখতে যায় একশৃঙ্গী গণ্ডার। এই প্রাণীটি ক্রমশই দুর্লভ হয়ে আসছে। তবু দু-চারটি গণ্ডার পর্যটকদের প্রতি মায়াবশত দেখা দেয় শুনেছি। আমরা দেখিনি। এত বেলায় হরিণ এমনিতেই দেখা যায় না। জিপগাড়ির আওয়াজে বাঘই বা কাছে আসবে কেন? ডুয়ার্স অঞ্চলে বুনো হাতি অনেক সময় রাস্তার ওপরেই দেখা যায়, একবার লঙ্কাপাড়া চা-বাগানে একসঙ্গে প্রায় পনেরোটা হাতি দেখেছিলাম।

এ যাত্রায় আমরা জীবজন্তু দেখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না, দেখাও পাইনি। অনেকটা ভগবানের মতো, খুব ভক্ত না হলে ওরা দেখাও দেয় না। শুধু দূরে গোটা কয়েক মোষ চোখে পড়েছিল, সেগুলি সাধারণ মোষ না বাইসন, তা বোঝা গেল না। আমাদের গাইডটি অবশ্য সোৎসাহে বোঝাতে লাগল, এগুলো বাইসনই বটে।

বরং এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাওয়া ময়ূর অনেক বেশি দৃষ্টি-নন্দন। এখানকার গাছগুলি লম্বা লম্বা। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জঙ্গলেই এত লম্বা গাছ নেই। পরগাছাও অনেক বেশি। এত সবুজের সমারোহের মধ্যে একটা গাছ বাজে পোড়া, একটিও পাতা নেই, কালো। সেই কালো রঙের নিঃস্ব গাছটার ডগায় একটা ময়ূর বসে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আপসোস হল, কেন আমি একেবারেই ছবি আঁকতে পারি না!

এক জায়গায় একটা ছোট্ট কাঠের সেতু, তার তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটা কুলকুলে নদী। অতি স্বচ্ছ জল। সঙ্গে সঙ্গে জিপটা থামাতে বললাম।

গাড়ি থেকে নামার ব্যাপারে গাইডের খুব আপত্তি। সে এই জঙ্গলের বিপদের গুরুত্ব বোঝাতে চায়। কিন্তু কাছাকাছি কোনও হিংস্রতার গন্ধ নেই। তাছাড়া, কেমন যেন একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে, জন্তু-জানোয়ারের দাঁতে আমাদের মৃত্যু নেই। মানুষের হিংস্রতাই বেশি ভয়াবহ।

একটা নদী দেখেও উপেক্ষা করে চলে যাব, এমন পাষণ্ড কি হতে পারি?

শক্তি প্রথমেই ঘোষণা করল, এ নদীর নাম তোর্সা।

গাইডটি মিনমিন করে বলল, না স্যার, এটা মালঙ্গী।

শক্তি তা মানতে চায় না। নদীর নাম কোথাও লেখা নেই, সুতরাং এ ব্যাপারে এখনই কোনও মীমাংসা করা গেল না। কিন্তু নদীটি বেশ পছন্দ হল।

এমন নিরালা নদী সহসা দেখা যায় না। দুদিকে জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে আপনমনে বয়ে চলেছে। মাঝখানে বড় বড় পাথর, তার ওপর দিয়ে অনায়াসে টপকে যাওয়া যায়। খুব

কাছেই একটা বাঁক। বড় নদীর তুলনায় ছোট নদীর বাঁক বেশি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে।

সেই বাঁকের কাছে একটা গাছ ভেঙে পড়ে আছে। অর্ধেকটা জলের মধ্যে। পাতাগুলি এখনও সবুজ। হাতিরা নাকি গা চুলকোলে এরকম একেকটা গাছ ভাঙে। ইস, এ গাছটাকে যদি আবার বাঁচিয়ে তোলা যেত।

আমরা কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করলাম বটে, কিন্তু এ কাজ আমাদের অসাধ্য। তারপর কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেই নদীর ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে। আমাদের চারপাশে ঝিমঝিম করতে লাগল অরণ্য।

ভ্রমণ জানুয়ারি, **১৯৯৯**

জলের ধারে ঘর

নবনীতা দেব সেন

‘চিরকালের ইচ্ছে’ বলে একটা কথা আছে না? আমার তেমনই একটা চিরকালের ইচ্ছে ছিল । মা বলতেন, প্রাণপণে যদি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া যায়, সেটা শেষপর্যন্ত তিনি দিয়ে দেন । তবে ছোট জিনিস চাইতে নেই । অন্যের ক্ষতি চাইতে নেই । এমন কয়েকটা নিয়মকানুনও আছে বৈকি চাইবার । জীবনভর তো আমি নিয়ম মেনে কিছুই ঠিকঠাক করে উঠতে পারলাম না । হঠাৎ ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার বেলাতেই বা পারব কেন? তবে এই ‘চিরকালের ইচ্ছে’-টা আমার ‘ছোট জিনিস’ না ‘বড় জিনিস’ তা আমি নিজেই জানি না । ইচ্ছেটা হল, ‘জলের ধারে ঘর’ । শহরের মেয়ে আমি, হিন্দুস্থান পার্কে ‘ভালো-বাসা’ বাড়ির তিনতলায় জন্মেছি । আমার ছোটবেলাতে কেয়াতলার অস্তিত্ব ছিল না । বারান্দা থেকে লেকের জল, লেকের ওপারের কু ঝিক ঝিক ট্রেন দেখা যেত । লেক হাসপাতালের মাথার ওপর দিয়ে । লেকের জলের দূরবর্তী ক্ষীণ রুপোলিতে আমার মন ভরত না । কেবল মনে হত এই বাড়িটা কেন এক লাফে ওই জলটার ধারে চলে যেতে পারে না? গাছপালা, মাটি, জল আমি ছোট থেকে ভালোবাসি । খুব ইচ্ছে ছিল গঙ্গার তীরে একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকব । কিংবা যে কোনও জলের ধারে । বারবার চেষ্টা করেছি, গত বিশ বছর ধরে । কোন্নগরে, বারাকপুরে, শান্তিনিকেতনে তালতোড় বাঁধের ধারে, কোপাইয়ের ধারে-কোথাও হয়নি । প্রত্যেকটা চেষ্টা বিফল হয়েছে ।

কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় । তিনি জলের ধারের নিজস্ব বাসাটি বাঁধতে কোনওদিনই দেবেন কিনা জানি না বটে কিন্তু জলের ধারে বাস করার আকাঙ্ক্ষা বারবার পূর্ণ করেছেন ।

দিল্লির মডেলটাউনে আমাদের ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ি ছিল হ্রদের ওপরেই । সামনে আবার একটা ছোট্ট দ্বীপ । ভোরবেলা তা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যেত । আর সন্ধেবেলা কিচিরমিচির ডাকে পাড়া মাতিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ফিরত । সারাদিন সূর্যের সঙ্গে খেলা চলত জলের-কতরকমই যে রং বদল হত । বন্ধুরা বলেছিল, ‘সারাদিন তো আমি তোর এই বারান্দাতেই বসে থাকতে পারি রে! এতরকম রং! তুমি কাজকম্মো করো কী করে?’ সেই বাড়িতে বছর দেড়েক । রাস্তা পেরলেই জল ।

আবার জলের ধারের বাসায় থাকা হল ছোট মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়ে। কেম্ব্রিজ মাসাচুসেটসে-চার্লস নদীর তীরেই তার চারতলার ফ্ল্যাট-নদীর সুন্দর দুটি বাঁকের মাঝখানে এক-এক ঋতুতে নদীর একেকটা রূপ। দুধারের গাছের সারির রূপ বদল হয়, রং বদল হয়, নদীর জলেরও চেহারা পাল্টে যায়। হেমন্তের লাল-হলুদ পাতার ছায়া বুকে নিয়ে তার রং লাল-সোনালি। শীতের সময় তো চার্লস নদীর বুকে বরফের স্থির চাদর ঢাকা পড়ে, যেন আয়না। বুকে আকাশটা ধরে রাখে। মাঝে মাঝে জলের ঝিরঝিরে কাঁপনের টুকরোতে বন্দী হাঁসেরা আশ্রয় নেয়। নৌকাবাইচ বন্ধ থাকে। পুরোটা নদী, তার ওপারে বোস্টন শহর দেখা যায়, গাছেরা তখন নগ্ন, আকাশ তখন উন্মুক্ত। আবার বসন্তে কচিপাতার সময়ে, বরফ গলে গিয়ে নদীর যেন নবীন প্রাণ আসে। আয়নার স্থির অংশটা ক্রমশ কমতে থাকে। ঝিরঝিরে জলের ফিতেটা বাড়তে থাকে। আর গাছে যত পাতা ঝরে, নদী ততই ঢাকা পড়তে থাকে সবুজ পর্দার আড়ালে। একসময়ে গ্রীষ্ম আসে, জলে নৌকাবাইচের ভিড় জমে, ভ্রমণকারীদের স্টীমার চলে, জলের রং ছায়াঘন সবুজ হয়ে যায় গাছের ছায়া বুকে নিয়ে। হাঁসেরা আবার মুক্ত! বোস্টনও লুকিয়ে পড়ে। ওই বারান্দাটা 'আমার স্বপ্নের বারান্দা, সেই আমার 'চিরকালের ইচ্ছে'র বারান্দা। চারতলা নেমে, রাস্তা পেরিয়ে গেলেই নদীর তীর। ওটা আমার আস্তানা নয় বটে, ওখানে আমার চিরকালের ঠিকানা নেই, তবু যতটুকু সময় থাকি খুব আহ্লাদে কাটে নদীর ধারের বাসা! ঈশ্বর অল্প-অল্প করে কিস্তিতে ইচ্ছেপূরণ করেন। সেই ভালো। একসঙ্গে নাইবা হল। আমার নিজস্ব বলে সত্যি তো জগতে কিছু নেই। নাইবা থাকল জলের ধারে নিজস্ব বাসা। জলের ধারে বাস করার শখটা তো মিটিয়ে দিচ্ছেন!

ভিলাসের বেলোনিতে পাঁচ সপ্তাহের রাকফেলার রেসিডেন্ট ফেলো হয়ে গিয়েছিলাম গত বসন্তকালে। বেলাজিও গ্রামটি কোমো হ্রদের তীরে। লেক কোমোর পাড়াটাই সারা ইতালিতে বিখ্যাত অঞ্চল, লম্বার্ডির সেরা জায়গা, ইউরোপের ধনীদের সামার প্যালেসে ভর্তি, সেই মধ্যযুগ থেকে। এমনকী আরও আগে, রোমান যুগ থেকেই লেক কোমোর তীরে বিলাসী মানুষের বাগানবাড়ির শখ ছিল। প্লিনির দু-দুটো বাড়ি ছিল এদিকে। প্লিনি থেকে এই সেদিনের মুসোলিনি পর্যন্ত-পণ্ডিত থেকে সৈনিক সকলেরই স্বপ্নের পাড়া ছিল এটা। নেপোলিয়নও এসেছেন, আবার লংফেলোও এসেছেন। লেক কোমোর জলের ধারে ধারে মধ্যযুগীয় গ্রামের ফাঁকে ফাঁকে বিশাল বিলাসবহুল প্রাসাদ, আর প্রাসাদ মানেই তো বাগান! আগে বাগান, তারপরে বাড়ি। বাগান নেমে আসে জল অবধি।

এই ভিলা সেরবেলোনিও তেমনই ইতিহাসে নামলেখানো প্রাসাদ। এর অবস্থিতি পাহাড়ের চুড়োয়। একটা ছোটখাটো নিজস্ব পাহাড়ের চুড়োয়। টিলাও বলতে পারা হয়তো যেত, তবে হাঁপানিরোগীর কাছে পাহাড়ই। কলকাতার লোকের কাছেও পাহাড় বটে! ষাট

একর বাগানের একটা দিক নেমে এসেছে নিজস্ব সৈকতের ধারে । সেখানে ভিলার নিজস্ব সাঁতারের জায়গা, নৌকা বাঁধার ঘাট রয়েছে । কিন্তু গ্রামে যেতে হলে অন্য পথ ধরতে হবে । সেই পথে নেমে গেলে, হাট-বাজার, পোস্ট অফিস । এবং ফেরিঘাট!

এখানে দুটো ঘর আমার, একটা পড়ার ঘর, একটা শোবার ঘর (রাজকীয় ব্যবস্থা, বলাই বাহুল্য, বাড়িটা যখন প্রাসাদ!) একসঙ্গে লাগোয়া-আর বিলাসবহুল ঘরও নিজস্ব । আমার ঘরগুলোতে তিনটে আশ্চর্য সুন্দর জানলা আছে । ফ্রেঞ্চ উইনডোর মতোই বিশাল মেঝে থেকে দরজার সমান উন্মুক্ত জানলা, কিন্তু তাতে বারান্দার মতো কোমর পর্যন্ত রেলিং দেওয়া । যেন তিনটি ব্যালকনি কেউ আমার ঘরের মধ্যে ভরে দিয়েছে । আর জানলা দিয়ে সামনে সমুদ্দুরের মতো লেক কোমো । লেক কোমোর ধারে এই প্রাসাদ, অনেক উঁচু না হলেও বেশ উঁচুতে । যখন-তখন ছুট্টে জলের ধারে চলে যাওয়া যায় না । দিনে একবারও যেতে পারব কিনা, প্রথমে ভাবতে পারিনি । কিন্তু জল আমাকে ডাকে ।

১৯৮৮-তে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে ‘ইন্টারন্যাশনাল সামার ইনস্টিটিউট অব সোমিওটিক অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল স্টাডিজ’-এ গিয়েছিলাম যখন, সেখানেও তাদের সেই নকল দুর্গের মতো হস্টেলে আমাকে দুটি ঘরের যে অ্যাপার্টমেন্টটি দিয়েছিল, ছ-সপ্তাহের জন্য-এমনই বিশাল সমুদ্র-পাহাড়ের স্বপ্নদৃশ্যে আঁকা পিকচার-উইনডো ছিল তাতেও । শুধু তফাত এই, সে-জানলা জানলাই । সে কাচগুলো খোলে না । আর সেই যে আশ্চর্য নীল সমুদ্র, আর ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বিখ্যাত ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ভরা সবুজ দ্বীপপুঞ্জ । আর দূরে ভেসে যাওয়া জাহাজ-অতখানি আকাশ, অতটা জল, সবই যেন সিনেমার মতো দেখাত । কেমন যেন সুদূর, অবাস্তব, আমার সঙ্গে অসংযুক্ত । জানলাই খোলা যেত না, সমুদ্রের বাতাস বইত না ঘরে, আর ঘর থেকে বেরিয়ে জলের কাছে যাওয়াও সম্ভব ছিল না । যদি টিলটিলরা গাড়ি নিয়ে এসে কোনওদিন বেড়াতে নিয়ে যেত, তবেই । সমুদ্র, দ্বীপ, আকাশ সবই জানলার মধ্যে বাঁধা পড়লেও নাগালের মধ্যে ছিল না । তবু, সেইবারও আমার চোখের তৃষ্ণা মিটেছিল বৈকি-সারাদিনে সমুদ্রটা নীল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে গোলাপি, সোনালি, বেগুনি হয়ে যেত সূর্যের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে । আর তারপর কালো । শুধু অজস্র জাহাজের আলোকবিন্দু রাতভর ভেসে যেত । দূরে একটা লাইটহাউসের অদৃশ্য আলোর ছন্দ থেকে থেকে ঝলসে উঠত । তাই জানি, সমুদ্রটা আছে ।

লেক কোমোতে তা নয় । সারা রাত সেখানে আলোর মেলা বসে । এ তো অকূল সমুদ্র নয় । পাড়ে ঘেরা হ্রদ । চারদিকে গ্রামভর্তি রাস্তার আলো সারারাত জ্বলে । আর হ্রদের জলে তাদের লম্বা লম্বা রঙিন ছায়া সারারাত কাঁপে । আমি যখন নৈশ আড্ডার পরে ঘরে ঢুকি, তিনটে খোলা জানলা দিয়ে রঙিন আলোর উৎসব আমাকে একসঙ্গে অভ্যর্থনা

করে। প্রত্যেক রাতেই আমার হঠাৎ মনটা খুশি হয়ে ওঠে। ‘একলা আছি’ এমনটি মনেই হয় না। ‘এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে, কী উৎসবের লগনে/সব আলোটি ফেল আমার মুখের পরে/তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে।’-একলা কোথায়? একমনে চাইলে সবই পাওয়া যায়। অল্পদিনের জন্য পেলেই বরং বেশি ভালো। তার দামটা বেড়ে যায়। বুকের মধ্যেটা বেশি করে ভরে ওঠে। আবার যখন ফুরোয়, বুকের মধ্যেটা বেশি করে ফাঁকা হয়ে যায়। আমার তাতে আপত্তি নেই। এটাই তো আমাদের হওয়ার কথা। চিরকাল তো কেউই থাকে না, কিছুই থাকে না। না প্রেম, না ঘৃণা। জলের ধারের ঘরই বা চিরকাল থাকবে কেন? মাঝে মাঝে যে আসে, আমাকে ভরে দিয়ে যায়, এই তো যথেষ্ট। ‘চিরকালের ইচ্ছে’ তাই চিরকাল ধরেই রয়ে যায়। এই তো ভালো!

জলের ধারে আরেকবার ঘর বেঁধেছিলাম-দুদিনের জন্য। ভূপালে গিয়ে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন ছিলাম একটি গেস্টহাউসে। গেস্টহাউসটি ঠিক বড়া তালাওয়ের ওপরে, এক টিলার মাথায়। আমার ঘর থেকেই দিনভর জলে রঙের খেলা দেখতাম, রাতে ঠিক এমনই দীর্ঘ রঙিন আলোর রেখা ভাসত বড়া তালাওয়ের অন্য পারের জলে। ওপারে রাস্তা, ওপারে নগরী। আর এপারে? ঠিক আমার বারান্দার নিচে ছিল জেলেদের গাঁ, জাল বোনার। আর জাল শুকুতে দেওয়ার ছবি। ছোট্ট ছোট্ট জেলে নৌকাগুলি ছাড়ত সারাদিন। ভ্রমণকারীদের প্রশ্নই নেই! সরু রাস্তা দিয়ে কলসি মাথায় রঙিন মেয়েরা হেঁটে যেত। সাইকেলে তিনজন বসে মাথায় বড় খাট নিয়ে যেত। আর আমার ঝুলবারান্দার ঠিক বাইরে এক জোড়া কালো নাম না-জানা ছোট পাখি ঝগড়া করতে-করতে উড়ে বেড়াত। বোধহয় বাসা বেঁধেছিল বারান্দার আলসেতে। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল ওই বড়া তালাওয়ের বুকে প্রত্যেকটি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। সূর্যের মতিগতি বোঝার জন্য আবার একটা আশ্চর্য নৈসর্গিক ব্যবস্থাও ছিল। একটি নিঃশব্দ সবুজ দ্বীপ। তাতে জেলেরাও যায় না। দ্বীপটি ভোরের আলোর সঙ্গেই ভেসে উঠত যেন সূর্যিঠাকুর বসবেন বলে আসন পেতে দিচ্ছে। আর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো হতে হতে মিলিয়ে যেত। যেন সেও জলে ডুবে গেল। একটিও আলো ছিল না তাতে। সূর্যই তার অস্তিত্বের পরিচয়বাহক। এই লেক কোমোতেও একটি দ্বীপ আছে। ইসোলা কোমাচিনা। সেটি এখান থেকে দেখা যায় না। কিন্তু তার ইতিহাস জানি।

লেক কোমোর ধারে ধারে যেমন প্রাসাদের সারি, তেমনই প্রাসাদের আশপাশে ছোট্ট-ছোট্ট খুব পুরনোদিনের গ্রামও আছে। আর সেইসব গ্রামের অনেকগুলি এখনও মধ্যযুগীয় চেহারাতে রয়ে গেছে। জল থেকে সোজা পাহাড়ের গায়ে তাদের পথগুলি উঠে গেছে খাড়া সিঁড়ির মতো, গাড়িটাড়ি চলবে না। শুধুই পায়ে চলার পথ। এই সিঁড়িপথের দুধারে দোতলা বাড়ি-হলুদ আর মেরুন রঙের দেওয়াল, প্রায় প্রত্যেক বাড়ির জানলা-দরজার

তিনধারে আলপনার মতো কী সুন্দর ছবি আঁকা। গাড়িটাড়ি নেই। সাইকেলও চলে না। আজকাল এইসব গ্রামেও একটা করে বড় রাস্তা হয়েছে-ফেরিঘাট থেকে খানিক দূরে যায়-যেখানে ট্যুরিস্টদের যাবার কথা, সাধারণত সেখান পর্যন্ত। কেননা সব ট্যুরিস্ট তো হাঁটতে চায় না! ফেরি-নৌকাতে তাদের গাড়ি, কিম্বা সাইকেল চাপিয়ে নিয়ে আসে তারা। এই অঞ্চলটা গরিব নয়, কিন্তু ভ্রমণকারীদের ওপরে নির্ভর করে আছে সেই মধ্যযুগ থেকেই। প্রধানত জেলেদের গ্রাম, কিছু গ্রামে মদ তৈরি হয়। কিছু গ্রামে মদের পিপে, জেলেদের নৌকা (এখন আবার আসবাবপত্তরও), আর এখানকার প্রসিদ্ধ রোদে-শুকোনো মাছ। আমার ভিলা সেরবেলোনির ঘর থেকে বাঁয়ে ফেরিঘাটটা দেখা যায়, আর ডাইনে বেলাজিও গ্রামের গির্জার গোল চুড়ো। নীল রং তার। এখানে সমস্ত গির্জার ঘণ্টাগুলো সুরে বাঁধা, সেই ঘণ্টা বাজানো শিখতে হয় অন্যসব বাদ্যযন্ত্রের মতো। সারাদিন কী যে সুন্দর বাজনা বাজে এখানে ঘণ্টায়, আধ ঘণ্টায়। রাতে বন্ধ। জলে নৌকা নিঃশব্দে ভেসে যায়। গাড়ির শব্দ আসে না। (কটাই বা গাড়ি বেলাজিওতে?), মাঝে মাঝে অবশ্য প্রচণ্ড ভটভট শব্দে স্পোর্টর্স মোটরবোট নিয়ে লেক কোমোর জল তোলপাড় করে রেসিং প্র্যাকটিস করে কেউ-কেউ। আকাশ-বাতাস মনপ্রাণ যেন ছিঁড়েখুঁড়ে একশা করে দেয়। মানায় না, মানায় না, তোমাকে একদম মানায় না হে এখানে। কোথা থেকে যে তেতে আসো তুমি, এই শান্ত ঘুমন্ত গ্রামগুলোকে মনে মনে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাও। জানি না একটাই মোটরবোট, না অনেকের-পাঁচ সপ্তাহে হয়তো তিনদিন এসেছে। কিন্তু অসহ্য কষ্ট দিয়েছে। যেমন ওই যখন খুশি জলে নেমে পড়তে পারা, তলপেটে নৌকা আঁটা হেলিকপ্টারগুলো যখন উড়ে যায়, অদ্ভুতদর্শন কোনও প্রাগৈতিহাসিক ফড়িংয়ের মতো। গুনগুন শব্দই করে, কিন্তু সেটা গুঞ্জন নয়, গর্জন। এ পাড়ায় গর্জন একদম বেমানান। এখানে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কেবল অশ্রুত এক গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছে, ইতিহাসের সঙ্গে নিসর্গ এখানে হাত মিলিয়েছে। আর তার সঙ্গে, অন্তত আমার ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের করুণা। নইলে আজ আমি এলাম কেমন করে? ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সমুদ্র, দ্বীপ, আকাশ, জাহাজ, পাহাড়, বনমালা-দূর থেকে দেখেও ঠিক মনে হয়েছিল অহৈতুকী কৃপা। টুম্পার বারান্দায় বসেও মনে হয় এ কী করুণা। আর এই ভিলা সেরবেলোনিতে তো প্রতিটি বাসিন্দাই সর্বক্ষণ মুখে উচ্চারণ করছেন, 'কী সৌভাগ্য! আমি কি এর যোগ্য?' আস্তিক-নাস্তিকে এখানে ভেদ নেই, মনের কথাটা একই, সেখানে শুধু পৌঁছনোর পথ দুটো আলাদা। একটা যুক্তির, আরেকটি ভক্তির। এখানে যে জনা বিশেক আমন্ত্রিত অতিথি আছি-কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ আইনজ্ঞ, কেউ চিত্রকর, কেউ বা কবি-সকলেই স্পষ্টত কৃতার্থ বোধ করছি। কোনও 'যেন'-র প্রশ্ন নেই।

জলের ধারে ঘর। ঘরের মধ্যে ব্যালকনি। ব্যালকনিতে লেক কোমো। আর অজস্র ফেরিনৌকা খেয়া পারাপার করছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার তো এটাই রাস্তা।

যেমন শুনেছি বরিশালের নদীতে নদীতে। যেমন দেখেছি ভেনিসে। এখানে কেবল নদীও নয়, নালাও নয়। একটিই বিস্তৃত জলরাশি-লেক কোমো। হ্রদটি অবশ্য খুব চওড়া নয়। সবদিক থেকেই তো পাহাড়ঘেরা। পাহাড়গুলি আবার ফার, পাইন, জুনিপার গাছের বনে সবুজ। সেইসব পাহাড়ের গায়ে ঝুলে আছে ছোট ছোট, যেন পুতুলখেলার বাড়ি। সে বাড়ির জানলায় আর কাঠের বারান্দায় ফুলগাছের টবে রঙিন ফুল উপচে পড়ছে। পাহাড়টাকে বলে Pre-Alps, কিন্তু বাড়িগুলি দিব্যি Alpine Cottageই। যদিও জলের ধারের বাড়ির চরিত্র একেবারেই আলাদা পাহাড়ি বাড়ির চেয়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু সরু পায়ে-হাঁটাপথ আছে, আর সেইসব পথ উঠে যায় পাকদণ্ডীর মতো আশ্চর্য সব মধ্যযুগীয় পাথরের গির্জায় অথবা দুর্গে। দুর্গের চৌকো মিনারে, আর গির্জার ঘণ্টাবাঁধা রঙিন মিনারে পাহাড়ের ঢালু গা যেন গয়না পরে আছে। যে দুটি শক্তি মধ্যযুগের ইতিহাস, রাষ্ট্র এবং ধর্ম এখানে তা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এতসব দেখা যায়, যেমন দেখা যায় আকাশে রোদ-মেঘের খেলা। এখন এখানে ক্ষণে রোদ ক্ষণে বৃষ্টি; এই বসন্তকালের এটাই বৈশিষ্ট্য।

আমার জানলার সামনে একসারি জারুলগাছ ফুলে ফুলে ছাওয়া। নাম ইন্ডিয়ান চেস্টনাট। সত্যিই জারুল কিনা জানি না বাপু। আমি তো বটানিস্ট নই, তবে ঠিক জারুলের মতোই মঞ্জরি। জানলার নিচের রাস্তাটার একদিকে আমাদের বাড়ি, অন্যদিকে জারুলবীথি। আরেকদিকে, ঠিক আমার জানলার তলায় দুটি ঘনশ্যাম গুল্ম। লালচে-সবুজ পাতা-কী গাছ? আমার চেনা গাছ নয় তো? মালির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে-কানের দুল পড়ে গিয়েছিল বাগানে। ষাট একর জমির ওপর বাগান। সেখান থেকে সোনার মাকড়ি খুঁজে এনে দিয়েছে মালি পাওলো। পাওলোর কাছে নাম জানা গেল। (দোভাষীর মাধ্যমে পাওলো বাংলা বলে না, আমিও ইতালীয় বলি না। সে ইংরিজিও বলে না!) লরেল। যে লরেলপাতার মালা পরিয়ে 'পোয়েট লরিয়েট' হয়? সেই লরেল। যে ঘন লরেল ঝোপের ছায়া দেখলে পেত্রার্কের মন কেমন করে উঠত লরা'-র জন্য, সেই লরেল। সেই 'মহান লরেল'। লরেল আবার দুরকমের হয়। সহাম এবং হীন। হীন লরেলের নাম বে-লীফ। ভালগার লরেল। বে-লরেলও বলে। এখানেও রান্নাবান্নায় কাজে লাগে। বাংলা দেশেও তাই। তেজপাতা আর কি! মহান লরেলের মতো রহস্যময় নয় তার রূপ। হালকা সবুজ, সাধারণ চেহারা। এ পাড়ায় বেড়া দেওয়া হয় বে-লরেলে। গিন্নি বেড়া থেকেই তেজপাতা ছিঁড়ে রান্নায় ফোড়ন দেন।

এ অঞ্চলে অলিভ বাগানও কম নয়। আমাদের এই ভিলাতেই আছে অলিভবাগান, নিজস্ব অলিভ অয়েল তৈরি হয়। ইতালীয় রান্নার গুণ তো অলিভ তেলেই। ভিলার বাগানে আছে দ্রাক্ষাকুঞ্জও। নিজস্ব ওয়াইনও তৈরি করে এই ভিলা সেরবেলোনি। এ এক আশ্চর্য

ঠাঁই। এখানে ছোট্ট একটা মধ্যযুগীয় গির্জা আছে বাগানের মধ্যে, সেটা এখন আর কাজে লাগে না। মধ্যযুগীয়ও নেই। যুগে যুগে তাতে ভেঙে নতুন করে গড়া হয়েছে। সতেরো শতকের বেশ কজন পাদ্রীকে কবর দেওয়া হয়েছে তার 'ক্রিপ্ট'-এর দেওয়ালে। তাঁদের নাম, সাল-তারিখ সমেত। শুধু ক্লয়েস্টারটি এখনও আছে মধ্যযুগীয় চেহারার-আর বাইরের দেওয়ালে সূর্যঘড়ির চিহ্ন। ওপরে যেখানে কামরায় কামরায় পাদ্রীরা বসবাস করতেন সেখানে এখন বাস করেন ভিলা সেরেবেলোনির কর্মীরা। এতবড় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দুজন। শ্রীমতী জিয়ানা চেল্লি থাকেন এখানেই। আর শ্রী পাসকোয়ালে পেসকে থাকেন অন্য একটি ছোট বাড়িতে, সেই বাড়ির হলুদ দেওয়াল বেয়ে উঠেছে রকমারি গোলাপি-সোনালি-লাল-হলুদ-কমলা রঙের গোলাপের লতা। বড় বড় গোলাপগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, যেন পদ্মফুল। আর যেখানেই দাঁড়াই, জল দেখতে পাব। সামনে তাকালেই লেক কোমো। নীলে নীল। জলের ধারের ঘরে থাকার সাধ আমার বারে বারেই মিটিয়ে দেন তিনি। মানুষের সব সাধ পূরণ করা যাঁর হাতে।

বাগানের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয় এঁদের। পাহাড় কেটে বাগান তো? ইতালীয়ান ফরমাল গার্ডেন-সেই যার কথা বোকাচ্চিওর ডেকামেরনে পড়েছি। যেরকম ভিলাতে ডেকামেরনের গল্প সাজিয়েছেন বোকাচ্চিও এ যেন ঠিক তেমনই, পাহাড়ের ওপরে ধনীর বাগানবাড়ি। উদ্যানবাটিকা। সাজানো বাগান। আর মর্মর প্রাসাদ। আর ঠিক ঘণ্টা ধরে, নিয়মমাফিক দিনযাপন।

এরই ফাঁকে ফাঁকে জল। আর আকাশ। বাগানের অনেকখানি জংলা রাখা আছে ইচ্ছে করে-সেখানে জংলী ফুল ফুটে আলো করে আছে। পাহাড়ি অংশটাতে যেখান দিয়ে উঠে গেলে দুর্গ প্রাচীর-এই বেলাজিওতে ভিলা সেরবেলোনির পাহাড়ের চুড়োতে দুর্গ ছিল। এর আরেকটি জোড়া দুর্গ আছে ভারেন্না গ্রামে। ভারেন্না গ্রামের দুর্গটি এখনও অক্ষত, সম্পূর্ণ, মধ্যযুগীয় অহংকারে অবস্থান করছে পাহাড়চুড়োতে। বেলাজিওর দুর্গ ভেঙে গেছে। চুড়োতে ছোট্ট সবুজ লন, সেখানে নিয়মিত ঘাস কাটা হয়। কেমন করে লন মোওয়ার নিয়ে যাওয়া হয় সেই পাহাড়চুড়োয়, সেটা আমার কাছে রহস্যই থেকে গেছে। যেখানে আমি কষ্ট করে পাকদণ্ডীর মতো পথ দিয়ে উঠি, পাওলোরা সেই পথে অত ভারি যন্ত্র ঘাড়ে করে ওঠে। একবার শিখরে উঠে এলে কিন্তু আশ্চর্য দৃশ্য। সিন্ধুসারসের বাসা পাহাড়ের গায়ে গায়ে, গাছের ডালে। ডিম দেওয়ার সময় এটা। পাখিরা বাসার কাছাকাছি উড়ছে। আর লেক কোমো তো দুইভাগে ভাগ হয়ে যায় ঠিক এই বেলাজিও থেকেই। একটা দিক যায় কোমো শহরের দিকে অন্যটি লেক্কো শহরের দিকে, অনেকটা নীল একটা পাজামার মতো দেখতে লেকটার মানচিত্র। এখান থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। দুদিকই দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য এখানে দুর্গ তৈরি করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ভারেন্নার

দুর্গের সঙ্গে বেলাজিওর দুর্গের সংকেত বিনিময় হত এককালে। ভারেন্নায় এখনও দুর্গটি রয়ে গিয়েছে এবং ভারেন্না নিজেও এখনও রয়ে গেছে শান্ত, মধ্যযুগীয় গ্রাম হিসেবে। ভিলার মধ্যে, পাহাড়ি পথের মধ্যে কত গুহা, ছোট ছোট ঝরনা (আবার নকল গুহাও আছে, নকল ঝরনাও!) যাকে ‘গ্রোটো’ বলে, ইতালীয়দের অতি প্রিয় সেই গুহা বাগানের শোভা বাড়াচ্ছে ইতি-উতি। আছে টানেল, পঞ্চমুখী সুড়ঙ্গ। কী নেই? মাঝে মাঝে কুঞ্জবন, ফোয়ারা, পাথরের বেঞ্চি। কমলার গাছে কমলালেবু ফলে আছে, গাছে যেন আলো জ্বলছে দিনেরবেলায়। ছোট ছোট পাথরের চৌবাচ্চা, যেন জলকুণ্ড পাহাড়ের গায়ে। তাতে লাল মাছেরা আনন্দে সাঁতার কাটছে বলেই বুঝতে পারি জলকুণ্ড নয়, চৌবাচ্চা। ছোট ছোট নিরীহ বন্যপ্রাণীও ঢের আছে। যা নিরীহ নয়, তা একমাত্র এই আমরাই। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি, শরীর ভালো লাগলে নেমে যাই, সোজা ফেরিঘাটে। একটা টিকিট কেটে উঠে বসি-খোলা ডেকের বেঞ্চিতে। ওঠার আগে হ্রদের পাড়ের যে-কোনও একটা গ্রামের নাম বলি, সেই নামটা পাঞ্চ করে দেয়, নইলে সর্বত্রই একই দাম টিকিটের। আট হাজার দুশো লিরা। যদি না বড় নৌকায় চড়ো-যা উড়িয়ে নিয়ে যাবে, ময়ুরপঙ্খী নাও। তার ভাড়া তিনগুণ।

এই অঞ্চলটা মধ্যযুগের এবং রেনেসাঁসের ইতালির সমস্ত রং-রস ইতিহাস নিয়ে জেগে বসে আছে। এই সব প্রাসাদ সেই সময়কার সাক্ষী, সেইসব পারিবারিক শত্রুতার আর কলঙ্কের, অবৈধ, উন্মত্ত প্রণয়ের। আর ধনৈশ্বর্যের প্রতিযোগিতার যথেচ্ছ লুঠতরাজ আর হিংস্র অত্যাচারের, দম্ভের আর দারিদ্র্যের। ইসোলা কোমাচিনা যখন আক্রান্ত হয়েছিল সেই ভীত, দারিদ্র, উদ্বাস্তু মানুষগুলি এসে গড়েছিল ছোট ভারেন্না গ্রাম, জলের ধারেই ঘর বেঁধেছিল আবার। দ্বাদশ শতকে তৈরি এই গ্রামটির বাড়িগুলির তাই একই চেহারা। গলির ভেতরদিকে তিনটে করে জানলা, লেকের দিকে দুটো। গায়ে গায়ে লাগা দোতলাবাড়ির সারি। শুনতে যেমন বোরিং, দেখতে কিন্তু তেমন নয়। আজকের আকাশচুম্বী যত মৌচাকে বাসা বাঁধা শহুরে মানুষের চোখে ভারেন্নার এই ছোট ছোট বাড়ি, তথাকথিত দারিদ্র্যের সাক্ষী নয়, শান্তির ছবি।

একদিন চলেই গেলাম ভারেন্নায়। বেলাজিওর মতো দোকানদারের হই-হট্টগোল নেই। জল থেকে গ্রামে সরু সরু ‘সালিতো’ খাড়া সিঁড়ি-গলি উঠে গেছে। বাড়িগুলো পরস্পরের গায়ে গা এলিয়েই শুধু নেই, ঘন লতায়-পাতায় ফুলে-সুবাসে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। বাড়িতে-বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোট্ট সেতু, সিঁড়িপথের মাথার ওপরে। তোরণের মতো দেখায়। সেগুলো কখনওবা খুব ছোট সরু প্রায় গোপন সুড়ঙ্গের মতো সমান্তরাল গলিপথ। আর কী সব বেড়াল এখানে! কুকুর দেখি না কোথাও। শুধু আহ্লাদী, লোমফোলানো বেড়াল রাজকীয় চালে পাঁচিলে হাঁটছে।

ফেরি-নৌকা নিয়ে হঠাৎ ভারেন্নায় চলে এসেছি, ফেরার তাড়া আছে আজ-অথচ এত সুন্দর গ্রামে কি আমি আগে কোনওদিন গেছি? মনে তো পড়ে না। বেগুনি, ফুল্ল-কুসুমিত উইস্টেরিয়ায় ঢেকে আছে বাড়িঘর, পথ, রেলিং। হ্রদের ধারে ধারে চলেছে একটি রট আয়রনের কারুকার্যকরা রেলিং ঘেরা পুরনো পায়ে হাঁটার পথ। সন্ধ্যাবেলায় বেড়ানোর রাস্তা-প্রসেনাদ। এ রাস্তা ভেঙে যায় মাঝে মাঝেই। সৈকতে, সিঁড়িতে, নৌকাবাঁধা ছোট ছোট ঘাটে। ঘাটলা বলাই ভালো। জলের ধারে ছোট ছোট কাফে। নুড়িবিছানো একটুখানি ছোট বেলাভূমিতে রঙিন রঙিন নৌকা উল্টোনো। তাদের নামই কত রকমের। কিছু ইতালীয়, কিছু ফরাসি, কিছু বা মার্কিনি। রেসের ঘোড়াদের যেমন নাম থাকে, এই নৌকাদের নামের চরিত্রও অনেকটা তেমনই চমকিলী। আমি হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ি। নামগুলোর ম্যাজিকে আটকে থাকি খানিকক্ষণ। কখনওবা উইস্টেরিয়ার গন্ধে মাতাল হয়ে প্রাণ ভরিয়ে শ্বাস টানি, সৌরভ আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে, নেশা ধরায়। এক জায়গায় একটা তীব্র, অতি পরিচিত গন্ধ পেয়ে খুঁজে দেখি, গলির মধ্যে ছোট এক টুকরো বাগানে যুঁইলতা। যুঁইফুলের মতো দেখতে নয়, মালতীর মতো দেখতে, কিন্তু সুবাসটি যুঁইয়ের। কী নাম? কী নাম? জাসমিন। বলেন টুলে বসে নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে খবরের কাগজ-পড়ুয়া বৃদ্ধ।

ভারেন্না গ্রামের মাঝখানে সবচেয়ে পুরনো অঞ্চলে গ্রামের চক, তার দুদিকে দুটো প্রাচীন গির্জা। একটা গোল, পুরোপুরিই রোমানেস্ক, দ্বাদশ শতাব্দীর। অন্যটিতে এতবার হাত পড়েছে যে, তার নিজস্ব আরও কোনও চরিত্র নেই। খানিক রোমানেস্ক, খানিক গথিক, দেওয়ালে (বাইরের) যিশুর ফ্রেস্কোতেও নানা যুগের রং। মার্বেল, ইট, কাঠ, নানা উপকরণের মেলা। সদ্য এখানে একটা বিয়ে হয়েছে। মনে হয়-তাজা ফুলে ফুলে সাজানো এখনও বেদিগুলো। গ্রামের পথের ধারে ধারে জলসত্রের ব্যবস্থা। পাথরের বেসিন আর নল থেকে জল পড়ছে। বেসিনের গায়ে দাতার নাম আর বছরটি খোদাই করা। বেশি পুরনো নয়। এই আঠারো শতক-উনিশ শতক।

আমি হাঁটতে হাঁটতে থামি। অঞ্জলি পাতি, জলপান করি। পাহাড়ের জল। ঠান্ডা। তেষ্টা মেটে। একজনকে জিজ্ঞেস করি, রোমানেস্ক গির্জাতে চাবি দেওয়া কেন? এটা একটা কাঠের কারখানা, যাঁকে জিজ্ঞেস করি তিনি কলের করাত চালাচ্ছেন। বললেন, ‘ওই বড় গির্জার বেল বাজাও, চাবি খুলে দেবে।’ না। ভাঙা ইংরিজিতে নয়, অঙ্গভঙ্গির ভাষাতে। আমিও সেইভাবেই প্রশ্ন করেছি। বেল বাজাই। কেউ দরজাই খোলে না। হঠাৎ দেখি একজন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নামলেখা গাড়িতে উঠছেন-দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরি। তিনি ইংরিজি জানেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু গাড়িতে না উঠে, কোথাও চলে গেলেন, আমাকে অপেক্ষা করতে বলে। একটু বাদেই চাবি নিয়ে ফিরে এলেন। এবং

গির্জা খুলে দিলেন । আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম-ভেতরে গির্জার ইতিহাস ৪টে ভাষায় লেখা আছে ছোট করে । প্রচুর ফ্রেস্কো আছে অক্ষত অবস্থায় । রাজবেশী যিশুর ছবিটিই প্রধান । ১২ শতকে তৈরি, ১৪ শতকে একবার সারানো হয়েছিল, ১৭ শতকে আরেকবার । এই ইতিহাসও তখনকার তারিখেই লেখা । ভালো করে দেখা হল না গ্রামটা, ছুটে পালাতে হল । ফেরি-নৌকার সময় হয়ে যাচ্ছে, দে দৌড় ঘাটের দিকে । এখনও মস্ত মস্ত না দেখা বাগানে অজস্র সৌরভ অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য, আর অনেক মূর্তি । এখানে কি কেবল উদ্ভিদেরই উদ্যান? মর্মর মূর্তিরও উদ্যান আছে না? আবার ফিরে আসতেই হবে এই জলের ধারের গ্রামে, এই সুন্দরী ভারেন্নায় । ফেরি-নৌকো বাঁক নিল । তৃপ্তি হল না । আসব, আবার ফিরে আসব, ভারেন্না, তোমার জলের ধারের ঘর দেখতে ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৩

জয়ন্তীর মহাকাল মন্দির

উষা সেন

বহু বছর পূর্বের এক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা আজ লিপিবদ্ধ করছি । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভূগোলের অধ্যাপক আমাদের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন উত্তর বাংলার ভুটান সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি বিশেষ জায়গা দেখার জন্য । তাঁরা জানিয়েছিলেন ১০ দিনের মধ্যেই এমন কয়েকটি স্থান নাকি দেখা যাবে যা অন্য কোথাও পাওয়া দুর্লভ । এরমধ্যে জয়ন্তীর চুনাপাথরের গুহাগুলি নাকি অদ্ভুত ও ভৌগোলিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তবে উত্তর বাংলার কোনও স্থানেই বর্ষাকালে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য, তাই আমাদের এপ্রিল-মে মাসেই বিশেষভাবে যেতে বলেন ।

কিন্তু এপ্রিল মাসে হল না-বর্ষা এসে যাওয়ায় ও অনেকদিন স্থায়ী হওয়াতে । গতবছর পুজোর সময়ও যাওয়া হল না । সুতরাং ডিসেম্বর মাসে যেভাবেই হোক যেতেই হবে-এই বলে রওনা দেওয়া গেল । কথা হল, জয়ন্তী ভুটানের পারো ও থিম্পু এবং সময় হলে গারো পাহাড়ের তুরা এইসব অঞ্চলে যাওয়া হবে ।

জয়ন্তী জলপাইগুড়ি-ভুটান সীমান্তে একটি স্থান, জয়ন্তী নামে ছোট একটি নদীর ধারে অবস্থিত ভারত সীমান্তের সর্বশেষ স্টেশন । এই জয়ন্তী নদী ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসে তোর্সার একটি উপনদী শির তোর্সাতে মিশেছে । ছোট নদী হলে কী হয়, এর প্রতাপ অনেকখানি । জয়ন্তী স্টেশনে যেতে হলে আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া, বক্সার দুর্গ প্রভৃতি স্টেশন পার হয়ে যেতে হয় । আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে সকালে ও বিকেলে ১টি করে ছোট লাইনের ট্রেন অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে । চুনাপাথর ও অন্যান্য প্রস্তর খণ্ডের জন্য কয়েকটি কোম্পানি জয়ন্তীতে আছে, বনাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কাষ্ঠ ছেদনের জন্যই এই স্টেশনের গুরুত্ব । স্থানীয় ভুটিয়া অধিবাসী ও রেলের লোকজন ছাড়া স্থানীয় বসতি অতি কম । তবে স্থানটি অতি সুন্দর বলে আলিপুরদুয়ার থেকে বড়দিনে ও নববর্ষে বেশকিছু লোক সমাগম হয়ে থাকে পিকনিক ও বেড়াবার উদ্দেশে ।

যাই হোক, শিলিগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে জানলাম, অধ্যাপকরা সকলেই প্রায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য চলে গেছেন । তবে জয়ন্তীতে চুনাপাথরের ব্যবসায়ীদের ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে গেছেন । অবশ্য নিউ জলপাইগুড়িতে আসবার

সময় একজন রেল কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তিনিও স্থানীয় রেল কর্মচারীদের উদ্দেশে একটি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন । আমি ও আমার বান্ধবী, দুজনেই যা থাকে কপালে বলে রওনা দিলাম । প্রথমে বাসে শিলিগুড়ি থেকে মাল ও নিউ মাল স্টেশনে গেলাম । জলপাইগুড়ি ও উত্তর বাংলায় এখন 'নিউ' বা নয়া স্টেশনের ছড়াছড়ি । সমস্ত উত্তরবঙ্গের পরিবহন ব্যবস্থা এখন নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে । মাল ও নিউ মাল স্টেশনগুলি সমস্ত অরণ্যের মধ্য দিয়ে, খেতের মধ্য দিয়ে, চা-বাগানের মধ্য দিয়ে চলে গেছে । আলিপুরদুয়ারে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছলাম । রাত ৮টায় জয়ন্তীর ট্রেন ছাড়বে, সুতরাং ওইখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে ট্রেনে চড়লাম । জয়ন্তীর যাত্রীসংখ্যা খুবই কম, মাল বহনের জন্য এই গাড়িগুলি প্রধানত ব্যবহৃত হয় । পথেই শুনলাম, রাজাভাতখাওয়াতে একটি বাঘ গ্রামবাসীদের গরু, ছাগল মারতে শুরু করেছে এবং ভূতপূর্ব আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর কন্যা সহ সেদিন বাঘ মারার জন্য মাচা বেঁধে আছেন । পরে জেনেছি বাঘটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছে ।

রাত ৯টা নাগাদ জয়ন্তীতে এসে পৌঁছলাম । গাড়ি এসেছে বনের মধ্য দিয়ে, চারদিক অন্ধকার ছিল । স্টেশনও তদ্রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন । স্টেশন মাস্টার একটি হ্যারিকেন নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন । স্থানীয় কয়েকজন নেমে তো তাঁদের বাড়ির উদ্দেশে চলে গেলেন- আমরা কোথায় যাব? সেই রেল ইনস্পেক্টর যে পরিচিতিপত্রখানি দিয়েছিলেন তা নোটবই-এর মধ্যে ছিল এবং কোথায় তা পড়ে গেছে । কিন্তু খানিক পর মাল তদারক করে স্টেশন মাস্টার বিনা জিজ্ঞাসাতেই বললেন-'এত রাতে আর কোথায় যাবেন? আমার ঘরেই থাকুন বা গার্ডস অথবা রার্নিং রুমে ব্যবস্থা হতে পারে ।' আমরা অবশ্য তাঁর ঘরেই সে রাতে এবং পরদিন রইলাম । ইনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুই স্টেশনই দেখাশোানা করেন । অতি সজ্জন ব্যক্তি, এঁর সাহায্য না পেলে আমাদের কতদূর যাওয়া হত তা বলা কঠিন । শুধু ইনি নন, যেখানে গিয়েছি সমস্ত জায়গাতেই স্থানীয় লোকের সহৃদয়তা ও সহযোগিতা না পেলে আমাদের হয়তো গারো পাহাড় প্রভৃতি কঠিন ও দুরূহ অঞ্চলগুলি যাওয়াই হত না । এই সাহায্য তাঁরা করেছেন এত স্বাভাবিকভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশও দেননি । পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) বহু অধিবাসী বর্তমানে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি স্থানে আছেন ।

জয়ন্তীর প্রথম রাতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল-রাতে একটি হাতির আগমন । স্থানীয় লোকেরা একে গণেশ হাতি বলে অর্থাৎ এর একটি মাত্র দাঁত, তা বাঁদিকে । কিছুদিন ধরে এ অঞ্চলে সে উৎপাত করছে । হাতিটিকে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে বনবিভাগ থেকে । তখনও অবধি কিছু হয়নি । রাতের অন্ধকার ও শোরগোলে উঠে

শুনি হাতিটি কলাগাছ খেতে প্রায়ই আসে লোকালয়ে । আরও রোমাঞ্চকর ব্যাপার হল, জয়ন্তী নদীর চড়ায় পরদিন বহু পার্টি চড়ুইভাতি করতে এসেছিলেন, রান্না প্রায় শেষ, খেতে বসবেন এমন সময় বেলা তিনটে নাগাদ পাশের পাহাড় থেকে ১২টি হাতি বাচ্চা সহ সহসা তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত আর সকলে রান্না ইত্যাদি ফেলে চম্পট । বাংলোর লোকেরা হাতিগুলি গুনেছিলেন । আমরা তখন ফিরেছি মাত্র । দূর থেকে দেখে খুবই মজা লাগল । জয়ন্তী যাবার পথেও বড় বড় হাতির পায়ের ছাপ দেখেছি । নদীর ধারের লোনা মাটি ও জল খেতে আসে এরা । তাদের পায়ের দাপটে একেক জায়গা নিচু হয়ে গেছে । সেই দিনই রাতে আবার মালগাড়ির কাছে রাত ৯টায় গণেশ হাতির আগমন-বনবিভাগের অফিসার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন । আমরা তাড়াতাড়ি বার হয়ে তাকে পালাতে দেখলাম ।

এখন চিন্তা এবার জয়ন্তীর গুহাতে কী করে যাওয়া যায়? স্টেশন মাস্টার একজন গাইড দিয়ে দিলেন । তার নাম চেংটু মহারাজ । বছর কুড়ি একুশের একটি ছেলে । এত গম্ভীর ছেলে যে আমরা অবাক হলাম । স্থানীয় একটি খাবার দোকানের মালিকের ছেলে । জীবন দর্শন তার গভীর । অবশ্য তার সঙ্গে পথ চলতে চলতে এসব কথা জেনেছি । মাস্টারমশাই জানালেন যে নদীতে এখনও সব জায়গায় পুল বাঁধা হয়নি, কয়েকদিন আগেও নাকি ভ্রমণকারী দল ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন । আমরা তাতেও দমবার পাত্রী নই । অধ্যাপকরা বর্ণনার সময় বলে দিয়েছিলেন, জয়ন্তী যাবার পথে কোথাও কোথাও শিকল ধরে যেতে হয়, এত দুর্গম চড়াই! এবং গুহাগুলি নাকি তিনতলা সমান উঁচু, মই বেয়ে উঠতে হয় ।

বলতে বাধা নেই, সেগুলিই ছিল এপথের অন্যতম আকর্ষণ । জয়ন্তীতে চুনাপাথরের কারখানা আছে, কমলালেবুও হয় যথেষ্ট, কিন্তু সেগুলি আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় নয় । তবে এই গুহাগুলি ভৌগোলিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ । ভারতে চেরাপুঞ্জি, অমরনাথ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ছাড়া এধরনের গুহা নেই । চেরাপুঞ্জিতে লম্বা সুড়ঙ্গ চলে গেছে গুহাতে, কিন্তু এত ঝুলন্ত চুনাপাথর নাকি আর কোথাও নেই, অবশ্য স্থানীয় লোকেরা একে মহাকালের মন্দির বলে থাকেন । ওপর থেকে বৃষ্টির ও ঝরনার জল পড়ে পড়ে পর্বতের অভ্যন্তর ক্ষয় হয়ে ওপরে লম্বমান শিলাস্তম্ভ (স্ট্যালাকটাইট) ও নিচে স্তরীভূত শিলাস্তূপ (স্ট্যালাগমাইট)-এর সৃষ্ট গুহাগুলি এদের মতে মহাকালের নিজের তৈরি । আমরা লাভবান হলাম এইজন্য যে এসেছিলাম ভৌগোলিক দৃশ্য দেখতে, ভাগ্যে মহাকাল দর্শন হয়ে গেল । সুতরাং প্রবল উৎসাহে ভোর ৬টায় চেংটু মহারাজকে নিয়ে রওনা হওয়া গেল ।

সেদিন ছিল হাটবার, যতই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছি, ভুটিয়া বস্তির স্থানীয় লোকদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে । বেশিরভাগেরই কাঁধে লম্বা ঝুড়িতে কমলালেবু ও কাঠ ।

আমাদের গাইড একজন গাঁও-প্রধানকে জিজ্ঞেস করল পথ কীরকম, যাওয়া যাবে কি না। সে তার ভাষায় ও ইশারা করে উত্তর দিল, সব পুল এখনও বাঁধা হয়নি, ২-৩টা বাকি আছে। যেখানে গভীর জল ও স্রোত বেশি সেখানে শিগগির হবে এবং সেখানে বুক বা গলা অবধি জল। আমরা কি যেতে পারব? কিন্তু 'কুছ পরোয়া' নেই ভাবে এগিয়ে চললাম। জয়ন্তী পাহাড়ি নদী, বেশ উঁচু জায়গা থেকে আসছে, দুদিকেই পাহাড় মাঝে মাঝে বেশ উঁচু (৫০০০-৬০০০ ফুট)। নদী বেশ গভীর স্থানে স্থানে, হঠাৎ পাহাড়ি ঢল নামলে জল বেড়ে যায়। তাই বর্ষায় এখানে আসা মুস্কিল, পুল সব ভেঙে যায়, প্রতি বছর নতুন করে পুল বানাতে হয়। স্থানীয় লোকেরাই সরস্বতী পুজোর আগে এসব শেষ করে রাখে। শিবরাত্রির আগে ও পরে কয়েকদিন ধরে মেলা হয়। গ্রামের ও ভুটানের লোকেরা ২-৩ দিন এই মহাকাল মন্দিরের আশপাশে থাকে। মহাকাল খুব জাগ্রত দেবতা, বহু ধর্না দেওয়া হয় শিবের মন্দিরে। অবশ্য পুল মানে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সিঁড়ির মতো ধাপ কেটে কেটে আড়াআড়ি বা উঁচু থেকে নিচে কিংবা সাধারণ বাঁশের অবলম্বন সহ নিয়মিত লতাপাতা দিয়ে পুল বাঁধা হয়। তারই নিচে খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। মাইল খানেক যাবার পর ভুটান রাজ্যের অধিকারে এসে গেলাম। ৫-৬ মাইল যেতে হবে কিন্তু এখানে পথ বলে কোনও পদার্থ নেই। কখনও নদীর স্রোতের ওপর বা প্রস্তর খণ্ডের ওপর লাফ দিয়ে, গাছ ধরে ওঠানামা করতে করতে যেতে হচ্ছে।

চারদিকে ফুলের সমারোহ, তবে কাঁটারও কমতি নেই। আর ভয় হচ্ছে কখন হয়তো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাতির পাল দেখতে পাব, যেতে যেতে তো অনেক পায়ের ছাপ দেখলাম কাদার ওপর, নদী খুব এঁকেবেঁকে চলেছে, পথও তদ্রূপ, সুতরাং খুব খাড়া চড়াই না হলেও যেতে বেশ দেরি হচ্ছে। এমনভাবে যেতে যেতে ২-৩ মাইল দূরে একটা বাঁকে এসে পৌঁছলাম যেখানে নদী তিনটি জায়গায় বাঁক নিয়েছে। খুব চওড়া এবং খরস্রোতা বলে এবছর এখনও পুল বাঁধা হয়নি। কিন্তু আগেই বলেছি যে আমরা ফিরে যাব বলে আসিনি। নদী যেখানে শান্ত প্রবাহিনী সেখান দিয়েই পার হতে হবে, কিন্তু গভীর জল। পরিষ্কার-তলা অবধি দেখা যাচ্ছে। আমরা কিছু কাপড় চোপড়, জুতো ছেড়ে, ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিয়ে সেই গভীর জলের জায়গাটি প্রায় সাঁতরে পার হলাম, মাথার ওপরে শুকনো কাপড়চোপড় ও ক্যামেরাটি সাবধানে ধরে। এর পরেই দুটি বাঁক, চওড়া কম হলেও সেখানে জলস্রোত ও আবর্ত এত বেশি যে স্থানীয় লোকেরা মোটা গাছের গুঁড়ি এপার ওপার ফেলে রেখেছে, তাকে অবলম্বন করে যাবার জন্য। তাই ধরে কোনওমতে অগ্রসর হওয়া গেল। নিচে স্রোতের টান এত বেশি যে একবার হাত ছাড়লেই ভেসে চলে যেতাম। শীতকাল, জলও ঠান্ডা তারপর সেদিন ছিল খুব মেঘলা। ওপারে পৌঁছে ভেজা কাপড়গুলি একটি বড় পাথরের নিচে লুকিয়ে রেখে শুকনো কাপড় পরে চললাম। চেংটু

মহারাজ ভরসা দিল ওই জঙ্গলে ‘মধুবাবা’ বলে একজন আছেন, তাঁর ধুণীতে চা খাওয়া যাবে । এর পরেই পথের কাঠিন্য শুরু হল । কত উঁচু হবে জানি না-তবে পাহাড় ৫-৬ হাজার ফুটের বেশি তো হবেই না, কিন্তু পথ খাড়া উঠে গেছে । তাই কোনও পয়সাওয়ালা তীর্থযাত্রী দুটি পাশাপাশি লোহার সিঁড়ি বা মই স্থাপিত করেছেন । সেইসব মই-এর পাশে লোহার শিকল আছে-তাছাড়া কোনও জায়গায় শুধু শিকল আছে । এইসব মই ও শিকলের সাহায্যে চড়াইগুলি ওঠা গেল । পা ক্ষতবিক্ষত, কারণ আমাদের গাইডের পরামর্শে জুতো নদীর পাড়ে পাথরের তলায় ছেড়ে এসেছি । এইভাবে ক্রমশ উঠছি । অরণ্য ক্রমশ ঘন ও নিশ্ছিদ্র হয়ে আসছে, তবু দৃশ্য মহান । গম্ভীর মেঘলা দিন, বেলা ১২টা বাজে তবু অন্ধকার । ক্রমশ উঠতে উঠতে সেই বিখ্যাত মহাকালের মন্দির বা চুনাপাথরের গুহাগুলি দেখা গেল । প্রথমে খানিকটা চৌকো মাটির প্রাঙ্গণ আছে । সেখানে অস্থায়ী কয়েকটি উনুন দেখা গেল । কিন্তু নির্জনস্থানবাসী ‘মধুবাবা’ কোথাও নাই! চেংটু মহারাজ জানাল যে তিনি মাঝে মাঝে থাকেন, মাঝে মাঝে চলে যান । সুতরাং অত পরিশ্রমের পর চা ইত্যাদি আর খাওয়া হল না, ধারেপাশে কোথাও লোকালয় নেই, সে সব দুধারের পাহাড়ের পিছনে বহু দূরে! সেই উচ্চস্থানে বসে নিচের নদীর বাঁকগুলি, তুমুল গর্জন ও ছোট ছোট জলপ্রপাত মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম । কিন্তু তাড়া আছে ফেরবার, অল্প অল্প দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে । একবার বৃষ্টি হওয়া শুরু হলে হঠাৎ যদি নদীতে জলস্ফীতি ঘটে যায়, তাহলে আর নদী পার হয়ে স্টেশনে যাওয়া যাবে না । বাঁদিকে আবার সেই মই ও শিকল । ওপর থেকে অনবরত কোন অদৃশ্য ঝরনা দিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে । সমস্ত জায়গাটা ভিজে, স্যাঁতসেঁতে ও মেঝেতে জমে থাকা জল মিলে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । এই জল ও বৃষ্টির জল চুনাপাথরের এলাকায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে শিলা ক্ষয় করে পথ নিয়েছে । ক্ষয়ের ফলে গুহার সৃষ্টি হয়েছে । এখানে প্রায় ছোট বড় চারটি গুহা আছে । যে গুহাটি মহাকালের মন্দির বা শিবের মন্দির বলা হয় তার ভেতর ঘোরতর অন্ধকার । সেখানে ভেতরে বেশ জায়গা আছে, ১০-১২ জন অনায়াসেই দাঁড়াতে পারে । প্রবেশ করতে ভয় হল । চেংটু মহারাজ বলল, সাপও থাকে, তবে কখনও কামড়ায় না । শেষ পর্যন্ত ভেতরে কোনওমতে ঢুকে অস্পষ্ট আলোয় ৩টি বিভিন্ন শিলাস্তম্ভ দেখা গেল । এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর । মাঝেরটি দীর্ঘ, তিনিই মহেশ্বর । আলোয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে কয়েকটি রঙের দ্যুতি দেখা গেল । এর পরে বার হয়ে একটি বারান্দা দিয়ে বাঁপাশে মহাকালীর গুহা বা মন্দিরে গেলাম । এখানে গুহামুখটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত । এখানেও একটি শিলাস্তম্ভ আছে । কিন্তু বারান্দা বা গুহা মন্দিরের বাইরে ঝোলানো শিলাস্তূপের চারদিকব্যাপী বিন্যাসে বাস্তবিকই মনে হয় মহাকালী তাঁর কালো কেশরাশি ছড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসের আরাধনায় মত্ত । মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনাও তাই ছিল, গুহাগুলির চারপাশে শিবের জটা ও মহাকালীর কেশরাশি বিস্তৃত হয়ে রয়েছে-মুগ্ধ হয়ে

তাকিয়ে রইলাম । কখনও জীবনে এমন দেখিনি । কালীকে ভৈরবী বলে কেন তা এখন বুঝলাম । ওপরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা, নিচে এই ঝুলন্ত শিলাস্তূপের জটাজাল । কিন্তু আলো নেই, ছবি নেওয়া গেল না । এইসব গুহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানি । যদি প্রচুর পরিমাণে চুন মিশ্রিত জল চুয়ে পড়ে তবে গুহার ওপর থেকে নানা আকারের ঝুলন্ত শিলাস্তূপের সৃষ্টি হয়, ঝুলে থাকে বলে সেগুলি ক্রমশ সরু হয়ে যায়, ইংরিজিতে এদের বলে স্ট্যালাকটাইট । যখন এই চুন মিশ্রিত জল গুহার মেঝেতে পড়ে, সেখানেও শিলাস্তম্ভের বা স্ট্যালাগমাইট-এর সৃষ্টি হয় । কখনও ওপরের স্তম্ভের সঙ্গে নিচের স্তম্ভ মিলে যায় । তাতে একটি দীর্ঘ থামের আকার দেখা যায় । এখানে যে ঝুলন্ত শিলাস্তূপ আছে তার আকার নানারূপ । চেংটু মহারাজ জানাল, যেসব স্কুলের ছেলেরা আসে তারা ঢিল ছুড়ে ভেঙে এসব শিলাস্তম্ভের নমুনা নিয়ে যায় । তাতে তার খুব দুঃখ । কারণ সে এবং স্থানীয় লোকেরা এই চুনাপাথরের অদ্ভুতাকৃতির স্তম্ভগুলিকে অতি পবিত্র মনে করে এবং যেভাবে অন্য জায়গার শালগ্রামকে পুজো করা হয়, সেভাবেই তারা এগুলিকে পুজো করে । প্রত্যেকের বাড়িতে একটি করে অন্তত আছে । এদের আরও বিশ্বাস মহাকালের এই ত্রিতল মন্দির অর্থাৎ তিনটি বিভিন্ন উচ্চতার গুহা অরণ্যের ওপর পর্বতে প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি-মানুষের এখানে হাত পড়েনি । তাই মানুষের এখানে হাত লাগানোই উচিত নয় । এর পর পাগলাবাবার (শিব) গুহা-সেখানে প্রবেশপথটি এত ছোট ও নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে বা শুয়ে যেতে হয়-সুতরাং সেখানে ঢোকা আর সম্ভব হল না । এখানে নিচের শিলাখণ্ডগুলি দেখবার সুযোগ ঘটল । যেন কোনও সুদক্ষ শিল্পী নিপুণ হাতে আলপনা এঁকে দিয়ে স্থানটি অলংকৃত করেছেন । কোথাও অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেদীর ওপরে পদ্মের পাপড়ি বিছানো, কোথাও স্বাভাবিক বেদীর সৃষ্টি হয়েছে-শুধু জল চুয়ে পড়ে যে এত সুন্দর আকৃতি হতে পারে তা বিশ্বাস করা যায় না । প্রকৃতির সৃষ্টির কাছে মানুষের কাজ কত নগণ্য!

এবার ফেরার পালা । সামান্য কিছু খেয়ে রওনা দিলাম । পা রক্তাক্ত হয়ে গেল কাঁটার দাপটে । আকাশের অবস্থা ভালো নয় । যে-কোনও সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হতে পারে । আবার সাবধানে সেই জলে ভেজা পিছল পর্বত গুহা থেকে মই ও শিকলের সাহায্যে নামতে হল এবং অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ি পথে এসে নামলাম । মহাকালের গুহা কবে স্থাপিত হয়েছে বা পর্বতোপরি এই ত্রিতল গুহাগুলি কত উচ্চ তার সঠিক কোনও খবর নেই । তবে গুহাগুলি ৩০০০-৪০০০ ফুটের মধ্যেই হবে বলে মনে হয় । এই মন্দির নিয়মিত দেখাশুনো করা হয় না । শিবরাত্রির আগে ভুটান সরকারের পুরোহিতরা আসেন এবং পুজোপাঠ করেন ও যা কিছু আয় হয় তা নিয়ে ভুটানে জমা দেন । এ অঞ্চল ও আশপাশের অঞ্চল ভুটান সরকারের অধীন । অবশ্য এতে স্থানীয় লোকের দুঃখ আছে ।

কিন্তু এঁকে এরা সকলেই খুবই জাগ্রত দেবতা বলে মেনে থাকে । সেখানে ভুটানি, পাহাড়ি, বাঙালি সকলেই একমত । অবশেষে বেলা তিনটেয় ভেজা কাপড়ের বোঝা নিয়ে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে স্টেশনে ফিরলাম ।

ভ্রমণ জুন, ২০০১

তাহিতি

হরপ্রসাদ মিত্র

একটানা নোনা হাওয়ায় ভেসে আসে দূরে কোরাল রিফের ওপর আছড়ে পড়া ঢেউয়ের আওয়াজ । লেগুনের টলমল শান্ত জল ঘিরে চাঁদের ফালির মতো সোনালি বালুচর । পিছনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকা নারকোলশ্রেণীর পত্রমর্মর । নিশীথ জ্যোৎস্নায় মারে-এর পাষাণ চত্বরে অনাবৃত-দেহা তরুণীদের অনায়াসসাধ্য হুলা নাচ আর তার সঙ্গে ঘাটহীন এসরাজের মতো গলায় যতিচ্ছেদহীন একটানা সুরেলা গান । প্রশান্ত মহাসাগরের কোন গহনে লুকোনো আছে এই দেশ ।

ইউরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পৃথিবী পরিক্রমার পথ প্রথম দেখিয়েছিলেন পর্তুগিজ নাবিক ম্যাগেলান । সে হল ১৫২০ সাল । তারপর এ পথে বহু নাবিক আনাগোনা করেছেন-মেডানা, ডি কিরো, টাসম্যানে, রজোভিন-কিন্তু পলিনেশিয়ার বহু বিস্তৃত দ্বীপগুলির লূতাতন্তু বেয়ে প্রায় কেন্দ্রস্থল তাহিতিতে পৌঁছতে সভ্যতার আরও আড়াইশো বছর লেগেছিল । ইতিমধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতেরা গুনে-গেঁথে বলেছিলেন যে পূর্বে নিউজিল্যান্ড এবং পশ্চিমে ইস্টার আইল্যান্ডের মাঝখানে যে বিরাট ফাঁকা জায়গাটা, যার কোনও ম্যাপ এখনও তৈরি হয়নি, ওখানে লুকিয়ে আছে আস্ত একটা মহাদেশ । থাকতেই হবে, না হলে ভারসাম্যহীন লাট্টুর মতো পৃথিবীটা কবে কেৎরে একদিকে বেরিয়ে যেত । সেই নাম না-জানা দেশ, টেরা অস্ট্র্যালিস ইনকগনিটোর খোঁজে পর পর তিনজন এলেন-১৭৬৪ সালে ক্যাপ্টেন জন বায়রন, কবি বায়রনের পিতামহ । ১৭৬৭ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে এলেন ক্যাপ্টেন ওয়ালিস আর ক্যাপ্টেন বুগেনভিল ।

তাহিতিতে প্রথম নোঙর করবার সম্মান ওয়ালিসের প্রাপ্য হলেও বিদগ্ধ ফরাসি ভূপর্যটক বুগেনভিলই এ স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান ইউরোপকে দেন । এর আগে বায়রন বিফলকাম হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন । এখানকার পুষ্প সুবাসিত বাতাস, অবারিত সমুদ্র পাহাড় জঙ্গলের রূপ রস বর্ণ এবং সর্বোপরি এ দেশের মেয়েদের সহজ হৃদ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, এ যে দেখি নতুন সিয়েরা । প্রাচীন গ্রিসের সিয়েরা দ্বীপের আকাশে বাতাসে এই রকমই প্রণয়ের যাদু মেশানো ছিল । লোকে বলত ভালোবাসার দেশ । ভালোবাসার এই নতুন দেশটি কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জানা পথ থেকে এত দূরে এবং

আড়ালে যে আজকের উড়োজাহাজের যুগেও এক লাফে ওখানে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। দু-তিনবার প্লেন বদলাতে হবে, কখনও বা পথে রাত্রিযাপন করতে হবে কারণ আপনার নির্ধারিত উড়ানটি হয়তো পরের দিন পাবেন। এ সব উড়ানের অনেকগুলিই দৈনিক নয়। ভারতবর্ষ থেকে পূর্বমুখে গেলে দিনের হিসেব করতে হবে। নিউজিল্যান্ডের পর আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পার হলেই গতকাল হয়ে গেল। ২৯ তারিখ রওনা হয়ে যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন সেখানে তখনও হয়তো ২৮ তারিখ চলছে। তাহিতিতে হোটেল বুক করার জন্য পৌঁছবার দিনটি সঠিকভাবে জানা দরকার। ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য এখানে একটা সতর্কবাণী। ট্র্যাভেল এজেন্ট বা এয়ারওয়েজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে উড়ানের তারিখ এবং সময় সংক্রান্ত সব তথ্য নিজে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া উচিত। আরেকটি কথা, তাহিতি তথা ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার ভিসা ফরাসি দূতাবাস থেকেই পাওয়া যায় কিন্তু সে ভিসার অনুমোদন আনতে হয় তাহিতি থেকে। ১৫-২০ দিন সময় লাগে।

তাহিতি যাবার সহজতম উপায় হল কোয়ান্টাস বা এয়ার ফ্রান্স বা এইরকম কোনও দক্ষিণ গোলার্ধগামী উড়ান কোম্পানির মাধ্যমে পৃথিবী পরিক্রমার টিকিট কাটা। আমরা এয়ার ফ্রান্সের আতিথ্য নিয়েছিলাম এবং একদিন সিডনি, অকল্যান্ড হয়ে তাহিতির পথে রওনা দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগর যে বিরাট, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে যে তার বিস্তৃতি, এ কিছু নতুন কথা নয় কিন্তু সে যে কত বিরাট তার ধারণা করতে গেলে এর এপার থেকে ওপার উড়ে যেতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যিখানে বসে চোখ বস্তুর অবলম্বন খোঁজে কিন্তু কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। গতির মৃদু কম্পনে শরীর অভ্যস্ত হয়ে গেলে হঠাৎ মনে হয় যেন আমরা কোথাও থেকে আসিনি, কোথাও যাচ্ছি না, অনাদি অনন্তকাল ধরে যেন শূন্যে স্থাণু হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে হয়তো চোখে পড়ল কড়ে আঙুলের ডগার মতো ছোট্ট একটা দ্বীপ সমুদ্রে মাথা তুলে আকাশের দিকে উঁকি মারছে। মুহূর্তে সময় বোধ ফিরে এল।

টেবিল জোড়া সাদা কাগজের ওপর কলম ঝাড়া কালির ফোঁটার মতো প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিউগিনি থেকে ফিজি পর্যন্ত বিষুবরেখার উত্তরভাগে মাইক্রোনেশিয়া, দক্ষিণে মেলানেশিয়া। ফিজির পরে উত্তর-দক্ষিণ সব জুড়ে সেই আমেরিকার কূল পর্যন্ত পলিনেশিয়া। মেলানেশিয়ানরা অস্টালয়েড কৃষ্ণবর্ণ, ঠোঁট মোটা, কোঁকড়া চুল, মাইক্রোনেশিয়ানরা মালয় আর মঙ্গোলিয়ান মেশানো। কিন্তু মেলানেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়ার তিনগুণ আয়তন সেই হাওয়াই থেকে ইস্টার আইল্যান্ড পর্যন্ত ছড়ানো যে পলিনেশিয়া তার মানুষগুলো কোথা থেকে এল তা নিয়ে পণ্ডিতদের কচকচি আজও শেষ হয়নি। আরও আশ্চর্য এই যে অন্য দুটি এশিয়ার দ্বীপগুলিতে নানা রীতি, নানা ভাষা প্রচলিত থাকলেও সমস্ত পলিনেশিয়া জুড়ে মোটামুটি

এক রীতি, এক ভাষা । এই সূত্রে মনে পড়ে থর হাইডরহালের বিখ্যাত কনটিকি অভিযানের কথা । বালসা গাছের ভেলায় চড়ে তিনি এবং তাঁর দলের লোকেরা পেরু থেকে তাহিতি পাড়ি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পলিনেশিয়ানদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছিলেন । কাঠামো এবং রঙে আমেরিকার তথাকথিত রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে পলিনেশিয়ানদের কিছু সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু রীতিনীতিতে অনেক তফাত । যাই হোক আমাদের এত হিসেবনিকেশ করবার দরকার নেই । বরং যেখানে যাচ্ছি সেখানকার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলি ।

দক্ষিণ পলিনেশিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় মোটমাট ১৩০টি দ্বীপ নিয়ে ফ্রান্সের পলিনেশিয়ান রাজত্ব । রাজত্বটি কায়েম করেছিলেন সেই বুগেনভিল । নামে ১৩০টি দ্বীপ হলেও সামগ্রিক ভূপৃষ্ঠের পরিমাপ মাত্র ৪০০০ বর্গ কিলোমিটার, মানে আধখানা সিকিম, কিন্তু যে জায়গা জুড়ে দ্বীপগুলি ছড়ানো আছে তার ভেতরে গোটা ইউরোপটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় । তাহিতিই বৃহত্তম দ্বীপ, প্রায় ১০০০ বর্গ কিলোমিটার পুরো রাজত্বের লোকসংখ্যা দুলক্ষের মতো এবং তার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগই থাকে তাহিতিতে । প্রধান শহর এবং রাজধানীর নাম পাপিতে এবং পাপিতের কাছেই ফা-আ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট আমাদের গন্তব্যস্থান ।

পাপিতে যখন পৌঁছলাম তখন স্থানীয় সময় রাত সাড়ে এগারোটা । মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল । বিদেশ বিভুঁই । ভাষা জানি না । ওই রাতদুপুরে পৌঁছে ট্যাক্সিওয়ালার পাল্লায় পড়ে ধন-প্রাণের কী দশা হবে । তাছাড়া সিডনি থেকে যখন টেলিফোনে হোটেল বুক করি, ওরা খালি নামটা আর পৌঁছবার তারিখটা জেনে নিল । না দিল কোনও কম্পিউটার নম্বর, না চাইল ক্রেডিট কার্ড রেফারেন্স-এখন এই নিশিরাতে যদি দেখি হোটেলের দরজা বন্ধ (এমন কিছু পাঁচতারা হোটেল নয়), অথবা ওরা যদি বলে কবে বুক করেছিলে, নামটা লেখা নেই তো-তখন মালপত্তর, গিন্নিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব । কিন্ত পূর্বসূরিরা বৃথাই পলিনেশিয়ান আতিথেয়তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যাননি । অত রাতেও এয়ারপোর্ট জমজমাট । ইমিগ্রেশন, কাস্টমস নামমাত্র, এ সবের মাঝেই পুরনো রীতি অনুযায়ী দেশি পোশাকে মাথায় গলায় ফুলের গয়না পরা কয়েকটি তরুণ-তরুণী অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়েছে-'আলোহা', কানে পরিয়ে দিয়েছে ওদের জাতীয় পুষ্প টিয়েরার কর্ণভূষা ।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই ছোটখাটো দৈত্যের মতো ঝাঁকড়াচুলো দেশীয় ড্রাইভার টেনে হিঁচড়ে মালপত্তর গাড়িতে তুলে বললে 'চলো' । চেহারা যেমনই হোক ওর হাসিমুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই । তবু জিজ্ঞাসা করি, 'ভাড়া কত পড়বে?'

'পাপিতে যাবে তো? সে তো তিনশো ফ্রাঙ্ক ।' তিনশো তাহিতিয়ান ফ্রাঙ্ক মানে দশ ডলারের মতো । হোটেলে পৌঁছে দেখি আরেক হাসিমুখো দৈত্য ডেস্ক আলো করে বসে আছেন । নাম শুনেই চটপট হাতে একটা চাবি ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'ওই দোতলায় তোমাদের জন্য সমুদ্রমুখী ভালো ঘর রেখে দিয়েছি, চলে যাও ।' এও ডিপোজিট চাইল না বা ক্রেডিট কার্ড দেখতে চাইল না । মালপত্র নিয়ে আমরা বুড়োবুড়ি একটু মুশকিলে পড়েছি দেখে সাঙ্গোপাঙ্গদের কী যেন বলল । ওদের দুজন আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল । টিপস দিতে গেলে নিল না । পলিনেশিয়ানরা লম্বা, চওড়া প্রমাণ সাইজের মানুষ, ইংরিজিতে যাকে হেফটি বলে কিন্তু মুখের মৃদুভাবে ওদের অন্তরের সারল্য ফুটে ওঠে ।

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে শুনি এক ঝাঁক শালিক পাখির ঝামেলা । তাড়াতাড়ি পেন্টুলুনে পা গলিয়ে বাইরে এসে দেখি ফুটপাত জুড়ে সত্যিই ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক । পরে জেনেছিলাম যে পলিনেশিয়াতে পাখির রকমফের এবং সংখ্যা কম হওয়াতে শ-দুই বছর আগে আমাদের কিছু দেশি শালিক ছেড়ে দেওয়া হয় । এখন তাদের দৌরাত্ম্যে ওদেশের পাখিগুলো লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে । শুধু শালিক কেন পলিনেশিয়ার বহু প্রাণী, গাছগাছড়া, ফুল, লতা-এমনকী নারকোল গাছ পর্যন্ত সাম্প্রতিক আমদানি । পুরনো পৃথিবীর লোকেরা শোভা বা সুবিধার জন্য নিয়ে এসেছে । কখনও কখনও তাতে বিপরীত ফলও হয়েছে । যেমন কুকু আইল্যান্ডের প্রবাসী বাসিন্দারা পোকামাকড়ের উপদ্রব কমাবার জন্য বাইরে থেকে ব্যাঙ নিয়ে এল । এখন ব্যাঙই সেখানকার মস্ত উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে । এবার বুঝি সাপ আমদানি করতে হয় । দেশজই হোক বা আমদানিই হোক পলিনেশিয়াতে গাছপালা, ফুল, লতা-গুল্মের বাড়বাড়ন্ত খুব । কোনাচে খোঁচওয়ালা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সবুজের সমারোহ । নিচে সোনালি বালির চর ঘিরে নীল সবুজ বেগুনি শান্ত সমুদ্রের জল ।

আমাদের হোটেল রয়্যাল পাপিতের সামনেই পাপিতের জাহাজঘাটা-কিন্তু চেন, পুলি, ক্রেন, ট্রাক, ওয়াগনের কুশ্রী কদর্যতা, ধাতু সংঘাতের উচ্চ আওয়াজ, ভিড়, কোলাহল কিছু নেই । এ ঘাটে কেবল যাত্রীবাহী জাহাজ ভেড়ে, দুশো গজের মতো চওড়া শান বাঁধানো স্ট্র্যান্ড এত পরিষ্কার যে তার ওপর নিজের ছায়া দেখা যায় । গাছপালা, লতা, ফুলে সাজানো ঘাসে ঢাকা জমিতে সিমেন্টের বেঞ্চি পাতা । তারই ফাঁকে ফাঁকে রঙিন কাপড়ে ঘেরা স্টল, এত সকালে ওরা এখনও চোখ খোলেনি । স্ট্র্যান্ডের গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে হাঁসের মতো সাদা বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজ, যার গায়ে বিশাল নীল অক্ষরে লেখা Club Mediterranian Pacific tour No. 1, এরাই আসল প্রশান্ত মহাসাগর দেখে । অকল্যান্ড থেকে বেরিয়ে তিন থেকে ছ সপ্তাহ মতো দ্বীপ থেকে দ্বীপ ঘুরে বেড়াবে । জাহাজের অনেক উঁচুতে রেলিং দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুয়েকজন সাহেব ঘুমন্ত পাপিতে

দেখছেন। স্ট্র্যান্ডের অন্য দিকে কিছুটা কর্মব্যস্ততা দেখা গেল। বারো মাইল দূরে মুরিয়া দ্বীপের প্রথম ফেরি ছাড়ছে। ফেরিঘাটের পাশেই চায়ের স্টলটি খুলেছে। শান্ত সমুদ্রের মোলায়েম হাওয়ায় রংবেরঙের ছাতার তলায় বসে উষ্ণ মধুর চায়ের কাপটি যেন কানে কানে কথা কইল।

হোটেলে ফিরে সেজেগুজে যখন বেরোলাম তখন পাপিতে জেগে উঠেছে। হোটেল আর স্ট্র্যান্ডের মাঝখানে তাহিতির শেষ রাজবংশের নামে বিরাট চওড়া রাস্তা বুলেভার্ড পমারে সমুদ্রের ধার দিয়ে শহরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চলে গেছে। প্রথমে চাই একজন ট্র্যাভেল এজেন্ট যে আমাদের অন্য দুয়েকটি দ্বীপে যাবার হদিশ দিতে পারবে। ট্র্যাভেল এজেন্ট অচিরে পাওয়া গেল, আমাদের হোটেল বিল্ডিংয়েই নুভেল ফ্রন্টিয়ারস। অভ্যস্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ইংরিজি-ভাষী ফরাসি যুবকটি পথপঞ্জি বানিয়ে দিল: মোটে পাঁচদিন সময়। তাহলে এই সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের ভেতরে থাকাই ভালো। টুয়ামোটু, মার্কুইস- এগুলি বহুদূর হয়ে যাবে আর তা ছাড়া যদি সমুদ্রক্রীড়ার শখ না থাকে তো ও সব জায়গায় গিয়েই বা কী হবে। কালকে চলে যান হুয়াহিনে, পরশু বোরাবোরা, তার পরদিন ফিরে আসুন মুরিয়ায়, দুরাত্রি ওখানে কাটিয়ে আবার পাপিতে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটারের মতো যন্ত্রটায় চাবি টিপে চলেছেন, 'ওদিন বোরাবোরা থেকে সোজা মুরিয়ায় আসতে পারবেন ভায়া পাপিতে করতে হবে না।' এয়ার তাহিতির উড়ানগুলো বুক করে ভদ্রলোক বললেন, 'হুয়াহিনের কানেকশন পাচ্ছি না, আপনাদের হোটেল ঠিক করে দিতুম, তা এক কাজ করুন না, ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে আসুন। ততক্ষণে সব ঠিক হয়ে যাবে।' জিজ্ঞেস করলাম, 'যা বুক করেছেন তার জন্য কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাব কি?'

'কী দরকার। সব একসঙ্গে দেবেন, আপনারা তো পালাচ্ছেন না।'

মানুষের প্রতি মানুষের এই সহজ বিশ্বাসবোধ পলিনেশিয়ার সর্বত্র দেখেছি।

পাপিতে শহর দেখার জন্য কিছু গাড়ি ঘোড়ার দরকার হয় না। দুঘণ্টায় পায়ে হেঁটে ঘুরে এলাম। বাড়িঘর, দোকানপাট আর পাঁচটা মফস্বল শহরে যেমন হয়, শুধু লোকগুলো অন্যরকম। ছেলেদের প্রায় সবারই পরনে পেন্টুলুন, গায়ে হাওয়াইয়ান শার্ট বা টি শার্ট, সবই রংচঙা। মেয়েদের মধ্যে বেশ কজন বড় বড় ফুল তোলা রঙিন কাপড়ের দেশি পোশাক পারেয়ো পরে আছে, গায়ে অনুরূপ রঙিন কাপড়ের ঢিলাঢোলা জামা। সেলাই করা ঊর্ধ্বাঙ্গের আবরণ ইউরোপের আমদানি। তার আগে পলিনেশিয়ানরা ওই এক পারেয়ো দিয়েই লজ্জা নিবারণ করত। ছেলেরা বস্ত্রখণ্ডটি বাঁধত কোমরে। মেয়েরা বগলের নিচ দিয়ে বেড় দিত। পোশাকের রং ছাড়াও ভালো লাগল এদের মনের রং।

অনাবিল আনন্দরস । একমাত্র চিনে দোকানদারগুলো ছাড়া কারও পেঁচামুখ দেখলাম না । উচ্চশ্রেণীর এক দোকানে ঢুকলাম তাহিতির একান্ত নিজস্ব জিনিস জগৎবিখ্যাত কালো মুক্তো দেখতে । ঢুকেই বলেছি, 'বাবা, আমরা কিছু কিনতে আসিনি, শুধু দেখতে চাই, কী সে রাজার ঐশ্বর্য ।' কত যত্ন করে মেয়েটি আমাদের নানারকমের নানা সাইজের মুক্তো এবং মুক্তোর আভরণ দেখাল!

পাপিতেতে প্লাস্টিকের ছাদ দেওয়া বহুতল বাজারটি দেখবার মতো । আয়তনে শিয়ালদা স্টেশন । একতলায় কাঁচাবাজার । ফলের স্টলে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল । আনারস, আম, পেঁপে, কলা, পেয়ারা, তরমুজ, খরমুজ, গোলাপজামের মতো একরকমের ফল, আর কত রকম রং তাদের । লাল কলা, হলদে কলা, সব যেন গাছ থেকে সবে পেড়ে এনেছে । অগুনতি, অজস্র । ফুলের লাইনেও সমান জেল্লা । সবই আমাদের দেশি ফুল । এক জায়গায় ডাঁই করে ডাব বিক্রি হচ্ছে । বয়স্ক খরিদ্দার অনেকেই আমাদের দেশের মতো ডাবের কাটা মুখে মুখ লাগিয়ে চোঁচোঁ করে জল খাচ্ছে । অল্পবয়স্করা সবাই স্ট্র ব্যবহার করে । সবজির বাজারেও সব দেশি সবজি টাটকা তোলা । যেন শীতকালের গড়িয়াহাট মার্কেট । দোতলায় টানা বারান্দা জুড়ে দোকানের পর দোকান । বেশিরভাগই কাপড়-জামা, ট্যুরিস্টদের জন্য পারেয়ো, তাহিতি মার্কা টি শার্ট, টুপি, দ্বীপবাসীদের তৈরি কাঠের খেলনা, টটেম-কিছু সস্তা অলঙ্কারের দোকান । তিনতলা ভর্তি খাবার জায়গা । চারতলায় আবার দোকান ।

বাজার থেকে বেরিয়ে এ গলি সে গলি করে বুলেভার্ড পমারের দিকে এগোতে এগোতে মনে হল তাহিতির পাহাড় বন সমুদ্রের টলমল বন্যায় শহরের বাড়িগুলো যেন সেই বেদান্তোক্ত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডগুলির মতো বেমানান বিসদৃশ । কোনও ছিরিছাঁদ নেই । সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য বহিরাভরণ কিছুই নেই । ইট, কাঠ, কাচ, লোহার তৈরি কতকগুলো চৌকো খাঁচা একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে মানুষের মাথা গোঁজবার জায়গা করা হয়েছে । পলিনেশিয়ানদের দোষ দিই না । ওদের অনাড়ম্বর মুক্ত জীবনে মন্দির, মসজিদ, ক্যাথিড্রাল, কেল্লা, প্রাসাদ কিছুরই প্রয়োজন হয়নি । চাঁদের আলোয়, নারকোলকুঞ্জের মর্মরে অনাবৃত আকাশের তলায় ওদের দেবতারা নেমে আসতেন, তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বড় বড় পাথরের চাঙড়ে গাঁথা বেদীই (ওদেশি ভাষায় মারে-এ) যথেষ্ট ছিল । কেল্লাই বা কী হবে যখন গোষ্ঠীর সব সম্পদে সকলের সমান অধিকার! আর নিজেদের জন্য পাথরের মেঝে, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, পাতা ছাওয়া কুটির তো আছেই । তাহিতির শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় এ পর্ণকুটিরগুলি এখনও সমান আরামপ্রদ । দোষী করব তাদের, যারা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে শুধু কুড়োতে এসেছিল । সারা পাপিতে শহরে সুদৃশ্য বাড়ি বলতে বোধহয় একটিই আছে । Hotel-De-Ville মানে ওখানকার মিউনিসিপ্যাল অফিস ।

ইদানীং কয়েকটি পাঁচতারা, সাততারা হোটেল, নানাধরনের অট্টালিকা তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু সেগুলি শহর এবং রাজপথ থেকে দূরে নিজ নিজ বৃক্ষবাটিকার মধ্যে এমনভাবে লুকোনো যে চেষ্টা করে খুঁজে বের করতে হয় ।

কত যুগ-যুগান্তর আগে আদিম পৃথিবীর সমুদ্রতল ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরিটা আকাশে মাথা তুলেছিল । তার ধূম্রশীর্ষ অগ্ন্যুদগারী মুখ থেকে গলিত ধাতু প্রস্তর লাভা, ব্যাসাল্টের স্রোত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের কূল পর্যন্ত । তারপর কতকাল ধরে বর্ষার ছুরিতে, বাতাসের উকোয়, নির্বাপিত পাহাড়ের গায়ে খাঁজের পর খাঁজ পড়ল, লাঙলের ফলার মতো শৃঙ্গগুলির গা ঘেঁসে স্বল্পকায় ছোট ছোট উপত্যকা । ছাই, মাটি, পাথরের আস্তরণের ওপর সবুজের ঢল নামল-তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষাদি । সমুদ্রও সে সময়ে বসে ছিল না । তার আহ্বানে হাত ধরাধরি করে ছুটে এল প্রবালের দল । নবসৃষ্ট দ্বীপটিকে ঘিরে প্রবাল-বেষ্টনী তৈরি হল । এই হল তাহিতি এবং সমধর্মী দ্বীপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

সারা দ্বীপ জুড়েই পাহাড় । মানুষের বসবাস সমুদ্রের ধারে ধারে পাহাড়তলির স্বল্প পরিসর জায়গাটি নিয়ে । সেই সূত্রে দ্বীপের চারদিক ঘিরে চক্রাকার রাস্তা আছে । আমাদের ইচ্ছে ছিল সারা দ্বীপটা চক্কর দিয়ে আসব কিন্তু এত বেলায় ট্যুরিস্ট বাসেরা বেরিয়ে গেছে । পাবলিক বাসে করে দ্বীপ ঘুরে আসতে (১১৪ কিলোমিটার) সন্ধে হয়ে যাবে, বাস বদলাতেও হবে । গৃহিণী বললেন, ‘চলো একটা বাসে চড়ে যতটা পারি ঘুরে আসি’ । এই সূত্রে তাহিতি তথা ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার জাতীয় পরিবহন ল্য ট্রাকের সঙ্গে পরিচয় হল । এগুলোকে বাস না বলে ট্রাক বলা হয় এই জন্যে যে চেসিসটা ছোট ট্রাকের । তার ওপর যাত্রী বহনের জন্য রংচঙে কাঠের কেবিনগুলো তাহিতিতেই তৈরি হয় । বসবার বেঞ্চিগুলো কিন্তু আড়াআড়ি নয় । লম্বালম্বি । তাতে ঝাঁকানি বেশি লাগলেও, পায়ের কাছে মালপত্র রাখবার অনেক জায়গা থাকে । সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তা মোটামুটি একই রকম । বাগান, বাড়ি, ছোট ছোট দোকান । তারপর নারকোলশ্রেণী পেরিয়ে বালুবেলা, লেগুনের স্থির জল । এক জায়গায় কন্ডাক্টার আমাদের হাত তুলে দেখাল, ওই দিকে ভেনাস পয়েন্ট । তাহিতির উত্তরতম অংশ, যেখান থেকে ক্যাপ্টেন কুক ১৭৬৯ সালে পূর্ণগ্রাস সূর্যের ওপর দিয়ে শুক্র গ্রহের গতিসময় মেপেছিলেন । মিউটিনি অব দি বাউন্টির ক্যাপ্টেন ব্লাইও এখানে প্রথম নেমেছিলেন ।

ল্য ট্রাক চলছে থামছে । লোক উঠছে নামছে । একদল স্কুলের মেয়ে উঠেছে । তাদের কী হাসি আর গল্প! আমাদের পাশেই একটি যুগল তখন থেকে খুনসুটি করছে । মেয়েটির হাতে মাথায় কানে ফুলের বাহার, ছেলেটির নীল ড্রাগন মার্কা লাল শার্টের বোতাম খোলা, বয়সের ভারে নুয়ে এক বুড়ি কোনায় বসে চোখ পিট পিট করছে জোড়াটির দিকে, তার

ওপাশে ক্লান্ত মায়ের বুক আঁকড়ে রুগ্ন ছেলেটা কাতরাচ্ছে। বোধহয় শহরের হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। চারদিকের যাত্রীদের চোখে সমবেদনার দৃষ্টি। ঘণ্টা খানেক পরে ট্রাক এসে থামল ছোট্ট একটি গ্রামে। এখান থেকেই ওরা পাপিতে ফিরে যাবে। পাণ্ডোনা উরু (ব্রেড ফ্রুট ট্রি), আম, নারকোল, কলাবাগানের ছায়ায় ঘেরা গ্রামটি, পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরবাড়ি। টিনের ছাদের তলায় গোটাতিনেক দোকান, তার মধ্যে একটা খাবার জায়গা। ভাবলাম এই গ্রামে কিছুক্ষণ থাকি, ওই দোকানটায় কিছু খাই, পরের বাসে ফিরে যাব। কিন্তু পরের বাস কখন যাবে তা কেউই বলতে পারল না। প্রশ্নটাই যেন অবান্তর। পরের বাস যখন আসবে তখন ফিরে যাবে, তার আগে তো যেতে পারে না। যুক্তি অনস্বীকার্য। আমরা দেখলাম এখন যে ট্রাকটা ফিরে যাচ্ছে, তাতে উঠে পড়াই ভালো। খাওয়াদাওয়া না হয় পাপিতেতে ফিরে গিয়েই হবে। তাছাড়া আমাদের অন্য অন্য দ্বীপ ভ্রমণের টিকিটগুলো নিয়ে নিতে হবে অফিস বন্ধ হবার আগে।

সেদিন সন্ধেবেলা হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি যে সামনে স্ট্র্যান্ডের ওপর ত্বরিৎ-খাদ্যের মেলা বসে গেছে। যে স্টলগুলো সকালে বন্ধ দেখেছিলাম সেগুলো তো খুলেছেই, তার পাশে পাশে ভিড় করে এসেছে মোটর ট্রাকে সাজানো খাদ্যসম্ভার। চিনা খাবারই বেশি, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকান বার্গার, স্টেক অ্যান্ড চিপস, ইটালিয়ান পিৎজা। কয়েকটি ইংরেজ ছেলেমেয়ের ক্রেপসের দোকানে বেজায় ভিড়। চা-কফি-আইসক্রিমের জন্য আলাদা স্টল, সেখানে পথিকদের যাতায়াত। অন্যগুলিতে বসবার জায়গা আছে। বার বা পানশালা চোখে পড়ল না। তা না থাক। হাসি, গল্প, গান, আলো, খোলা উনুন, হট প্লেট, তাওয়ার ওপর সামনে তৈরি খাদ্যের সুঘ্রাণে জায়গাটা তাজা হয়ে আছে। আমরা রাতের খাওয়া এখানেই সারলাম। দশটা নাগাদ যখন হোটেলে ফিরছি তখন দেখি হোটেলের আশপাশে নাইট ক্লাবগুলোতে সবে চেয়ার টেবিল গোছগাছ করছে। দুয়েক জায়গায় পোস্টার রয়েছে যে রাত বারোটায় হুলা নাচের আসর। যারা নাচতে চায় বা নাচ দেখতে চায় দু-দলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আমাদের পরদিন বেশ সকালে উড়োজাহাজ ধরতে হবে। হুলাকে পাশ কাটিয়ে হোটেলে ঢুকলাম।

ভারি মালপত্র হোটেলে জমা রেখে দুজনে দুটি হাত-পোঁটলা নিয়ে যখন ট্যাক্সিতে উঠলাম সূর্য তখনও পাহাড়ের আড়ালে। মালের রসিদ চাইতে হোটেল ডেস্কের লোকটি বললে, 'রসিদ আবার কী? তোমরা যে ঘরে মাল রেখে গেলে ফিরে এসে সেখান থেকে আবার তুলে নেবে। এরমধ্যে কোনও লেখাপড়ার দরকার নেই।' ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। ফা-আ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের পাশেই এয়ার তাহিতির ল্যান্ডিং স্ট্রিপস। মিনি এয়ারপোর্টটি পরিপাটি সাজানো। কাউন্টারগুলিতে ফুলের বেড়া, ওপাশে চা কফি কোকাকোলার স্টলটি ফুলের গহনায় কনেবউ সেজে বসে আছে। আমাদের গন্তব্য

হল সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে কাছের দ্বীপ হুয়াহিনে, কিন্তু ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই চোখ আটকে গেল বিপরীত দেওয়ালে বোরাবোরার বিরাট ছবিতে । সার্থক সেই ফটোগ্রাফার যার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে স্বল্পায়তন দ্বীপের সবুজ সমতল থেকে খাড়া উঠে যাওয়া মাউন্ট ওটেমাপুর ভ্রূকুটিকুটিল ভয়াল মূর্তি । খালি চোখেও এ দৃশ্য দেখা যায় কেবলমাত্র একটি বিশেষ কোণ থেকে যেখানে লেগুনের জল খাড়ি বেয়ে প্রায় পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছেছে । বসে বসে দেখলাম ছোট দুটি ডানা মেলে, গুড়গুড়ে চাকায় ভর করে মিনিবাস সাইজের একটি প্লেন ওয়েটিং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল ।

এবার আর নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র নয় । মাঝে মাঝেই ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ, কুমিরের পিঠের মতো নিমজ্জিত শৈলের শীর্ষভাগ চোখে পড়তে লাগল । কোনওটাতেই লোকবসতি নেই । তবু ডাঙা তো । আধঘণ্টার পথ সহজে শেষ হল, পাঁচ হাজার ফুট নিচে হুয়াহিনে যেন নীল ফ্রেমে আঁটা একটি সবুজ ছবি । আগাগোড়া পাহাড়ি দ্বীপ, ওপর থেকে বোঝা যায় যে আসলে হুয়াহিনে দুটো দ্বীপ, কজওয়ে দিয়ে জোড়া । একই কোরালের বলয় দুটো দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে । সোসাইটি দ্বীপবাসীদের ভেতর হুয়াহিন-ওয়ালাদের গোঁয়ার বলে খ্যাতি আছে । উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন এসব দ্বীপের দখল নিয়ে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের ভেতর ঝটাপটি চলছিল তখন হুয়াহিনের গোবিন্দরা বলে বসলেন, আমরা তোমাদের কাউকে চাই না । শুধু তাই নয়, এক ফরাসি হানাদার বাহিনীকে স্রেফ বল্লমের খোঁচায় আর মুগুর দিয়ে পিটিয়ে হটিয়ে দিল । জেদ অবশ্য স্থায়ী হয়নি কিন্তু এই দ্বীপগুলির মধ্যে হুয়াহিনেই ফরাসি দখলে আসে সকলের শেষে ১৮৯৭ সালে । বইতে পড়েছিলাম যে অপর সব দ্বীপ বিদেশি ট্যুরিস্ট নিয়ে নাচানাচি করলেও, হুয়াহিনে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে তার কৃষিবহুল গ্রামীণ জীবন নিয়ে । একদিনে সে জীবনের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু সমস্ত হুয়াহিনেতে বড় গ্রাম মাত্র একটি-ফারে-এ, এয়ারপোর্ট, জাহাজঘাটা ঘেঁসে । শহর বলতে কিছু নেই । পাঁচতারা, সাততারা হোটেলও নেই ।

আমাদের গেরস্থপোষা হোটেল রিলে মাহানা দ্বীপের অন্য প্রান্তে । উড়োজাহাজ থেকে নেমে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সমুদ্রের খাঁড়ি ঘুরে ঘুরে সেখানে পৌঁছলাম । দুটি দ্বীপের মাঝখানে কজওয়ে পার হবার সময়ে দুদিকে সমুদ্র । হোটেলটি যেন কণ্বমুনির আশ্রম । ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কয় ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি নিয়ে এক ফরাসি পরিবার হোটেলটি চালাচ্ছেন । সবাই হোটেলে কাজ করে । সুখের বিষয় যে মুনি স্বয়ং ধ্যান তপস্যা না করে কোনও ক্লায়েন্টের সঙ্গে শর্টস পরে টেনিস খেলছিলেন । দুপাশে দুটি ইউক্যালিপ্টাস গাছের তোরণ পেরিয়ে লেগুনের ধার জুড়ে বাগান । তারই মাঝে প্রত্যেক অতিথি বা অতিথি-যুগলের জন্য আলাদা আলাদা পলিনেশিয়ান টাইপের কুটির, স্থানীয় ভাষায় ফারে-এ টাওপি । কুটিরে একটি করে প্রমাণ সাইজের শোবার ঘর, সংলগ্ন বাথরুম

। সামনে ঢাকা বারান্দায় আরাম করে বসবার বেতের চেয়ার । বারান্দার কোলে দুজনের একান্ত নিভৃতের জন্য ছোট্ট একটি বাগান । কুটিরের মেঝে সিমেন্ট, দেওয়াল ইটের কিন্তু ছাউনিটি পাতার-নারকোল, পান্ডোনাস, নানারকম ঘাস, লতা, নারকোল দড়ি দিয়ে শক্ত করে গাছের ডালপালার ফ্রেমে বাঁধা ।

ভাগ্যক্রমে লেগুনের ওপরে প্রথম সারিতে একটা ঘর পেয়ে গেলাম । বোঝা নামিয়ে, হালকা জামাকাপড় পরে এসে বসলাম বারান্দায় । এখানে রিফের ভেতরে ছোট ছোট শিলাখণ্ডের মতো দ্বীপ, ওদেশি ভাষায় মোটু । কখনও সমুদ্রে প্রেমিক-যুগল সাঁতার কাটে বা রবারের ভেলায় চেপে ওখানে গিয়ে নিরিবিলি সূর্যস্নান করে । কোথাও কোনও মৎস্যাশী জলের ধারে অচঞ্চল বকের মতো বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কাচের চেয়েও স্বচ্ছ জলে বহু দূর পর্যন্ত মাছের ঘোরাফেরা দেখতে পাওয়া যায় । পলিনেশিয়া ছিপের ব্যবহার জানত না, যদিও গাছের ছাল দিয়ে তৈরি জালের বহুধা প্রচলন ছিল । লেগুনের টলমলে জলে দূরে-কাছে নানা রকমের জলযান, মোটরবোট, স্পিড বোট । কিন্তু সবচেয়ে চোখে পড়ে পলিনেশিয়ার যা বৈশিষ্ট্য সেই বিখ্যাত আউটরিগার ক্যানো । আমাদের দেশের তেলো ডোঙার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে । কেবল নৃত্যপরা সমুদ্রের ঢেউতে স্থির থাকবার জন্য দুটি কাঠের খুঁটি ক্যানোর ওপরে আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে । সেই খুঁটি দুটির প্রান্তে মানে ক্যানো থেকে পাঁচ-ছ হাত তফাতে আরেকটি কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা লাগানো, যেটা জল স্পর্শ করছে । সব বাঁধাবাঁধির কাজ নারকোল দড়িতে । পেরেকের ব্যবহার নেই । ভাবলাম বারান্দার সামনে স্বল্প পরিসর বালিয়াড়িটি পেরিয়ে একেবারে জলের কিনারে গিয়ে ঝিনুক কুড়োই । কিন্তু ফিরে আসতে হল । সারি সারি মুক্তবক্ষা এবং ক্বচিৎ মুক্তদেহা রমণী বালিতে তোয়ালে বিছিয়ে সূর্যস্নান করছেন । সেখানে আমার মতো আবৃতদেহ পুরুষের ঘুরে বেড়ানোটা অনধিকার প্রবেশ হবে । পরে হোটেলে খেতে গিয়ে ওখানকার জনৈকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হুয়াহিনে মানে কী । তিনি জবাব দিলেন, কামিনীর কামকলা ।

হুয়াহিনেতে যেখানে আমরা ছিলাম সেখানে দোকানপসার, হাটবাজার কিছু নেই । দুবেলাই হোটেলের আহার । ফরাসি রান্না । তবে আমাদের মতো ইতরজনের জন্য স্যান্ডউইচের বন্দোবস্ত আছে । দুপুরে পয়সা বাঁচাবার জন্য তাই খেলাম । রাত্রিতে পরিপাটি ফরাসি খানা । অভাব ছিল খালি সুরার । পলিনেশিয়ার এসব দ্বীপ ফরাসি অধ্যুষিত হলেও সুরা মহার্ঘ্য । সুরা সূত্রে জানিয়ে রাখি যে, পলিনেশিয়ানরা সুরাঘটিত পানীয় তৈরি করতে জানত না । ওদের আনন্দের ভাণ্ড ছিল এবং এখনও আছে গোলমরিচের লতাপাতা বেটে তৈরি কাভা । অ্যালকোহল নয়, এলকালয়েড । নেশাটা সিদ্ধির মতো । আমাদের সোমরস আর কী । পলিনেশিয়ানদের খাদ্য ছিল স্বচ্ছন্দ বনজাত

ফল, মূল, কন্দ, কলা, টাবো, ইয়াম, রাঙা আলু আর সকলের ওপরে উরু বা ব্রেড ফ্রুট। ভুতো বোম্বাই আমের সাইজে চিরসবুজ ফলগুলি আগুনে সেঁকে খোসা ছাড়িয়ে খেলে পাউরুটির আস্বাদ আসে। চারদিকে ছড়ানো অজস্র গাছে পাউরুটি ফলে আছে। আমরা ব্রেড ফ্রুট, ব্রেড ফ্রুট গাছ সবই দেখলাম কিন্তু ফলটি আস্বাদ করার সুযোগ হল না। তখন ফলগুলি কাঁচা। এছাড়া রয়েছে লেগুনের জলে অফুরন্ত মাছ, কাঁকড়া, গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, পলিনেশিয়ার সবুজ কচ্ছপ। কচ্ছপের পবিত্র মাংসে (সুস্বাদুও বটে) মেয়েদের অধিকার ছিল না। মেয়েদের মন রাখবার জন্য এখানে একটা কথা বলি। মার্কুইস দ্বীপের লোকেরা দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি দিত। নারীদের বলি হবার অধিকার ছিল না। ইউরোপিয়ানরা আসার আগে এ সব দ্বীপে মাংসের খুব চল ছিল না। মাংস জোগাবার মতো বড় প্রাণীরও উৎপত্তি হয়নি এসব ছোট ছোট দ্বীপে। এদের পূর্বপুরুষরা এদেশে বসবাস করতে আসার সময়ে যে কটি শুয়োর এবং কুকুর আনতে পেরেছিল, তাদেরই লালন পালন করে মাংসের অভাব মেটাত এরা।

সন্ধেবেলা হোটেলের লাউঞ্জে দেখি, যে ড্রাইভার আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছিল সে বসে আছে। কালকেও ও-ই কাণ্ডারী। কথায় কথায় জানলাম যে একটু আগে বেরোলে এবং সামান্য বেশি খরচ করলে ও আমাদের রাস্তায় ফারে-এ গ্রাম আর তার কাছে হুয়াহিনের বিখ্যাত মারে-এ দেখিয়ে দেবে। ফারে-এ গ্রামে এমন কিছু দেখবার জিনিস নেই। জাহাজঘাটাকে ঘিরে কতকগুলো টিনের দোচালা-চিনেদের দোকান, দুটো কফিখানা, কোপরা মানে রোদে শুকনো নারকোলের শাঁস চালান দেবার ডিপো, নারকোল দড়ি পাকানো এবং নারকোল দড়ির তৈরি পাপোশ, ব্যাগ ইত্যাদি বানাবার কারখানা-এই নিয়ে ফারে-এ। ঘাটে জাহাজ লাগলে যা একটু হৈ চৈ, বাকি সময় রোদে শুয়ে বসে ঝিমোনো। কিন্তু মারে-এ তে পৌঁছে মনে পড়ল হৃতগৌরব বৃদ্ধ সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দীর পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রের কথা। লেগুনের কিনারায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আস্ত আস্ত পাথরে গাঁথা আহু বা দেবক্ষেত্রের পাঁচিল। ভেতরে এক ধারে স্টেপস পিরামিডের আকারে মানুষ প্রমাণ উঁচু চতুষ্কোণ ধর্মবেদী, যার মাথায় প্রশস্ত চাতালে জল, মাটি, আকাশের দেবতা এবং পূর্বপুরুষদের জন্য খাদ্য পানীয় সম্ভার রাখা হত। ধর্মবেদীর চারপাশে ছোট বড় নানারকম পাথর পোঁতা, এগুলো হয়তো বা সমাধিচিহ্ন। অন্য জায়গায় স্থানে স্থানে মানুষ বসবার বেদী,পাথর বাঁধানো আঙিনা, কোথাও বা চালাহীন খুপরি খুপরি ঘর। মারে-এ তো কেবল দেবস্থল নয়, এটা একাধারে চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বৃদ্ধদের জটলার জায়গা, আবার পর্বদিনের উৎসবক্ষেত্রও বটে। সারা গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল মারে-এ। এখন সে প্রাণচঞ্চলতা আর নেই। একশো বছরের অবহেলায় ভেঙে পড়েছে ধর্মবেদী,

ধর্মক্ষেত্রের পাঁচিল, তবুও লেগুনের অবিশ্রান্ত জলকল্লোল, প্রাচীন মহীরুহদের বনমর্মর একইরকম আছে ।

পলিনেশিয়ানরা ভাষাকে অক্ষরের বন্ধনীতে ধরে রাখতে শেখেনি । ফলে গত দুশো বছরে ক্যাপ্টেন কুক প্রমুখ ইউরোপিয়ান নাবিক এবং পর্যটকরা যা লিখেছেন তার বাইরে এদের কোনও লিখিত ইতিহাস নেই । আবার অক্ষরহীন সমাজ যে শ্রুতি ও স্মৃতি-পূর্বপুরুষের মুখে শোনা কথা-কাহিনী, ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য-বজায় রাখে তাকে সমূলে বিনাশ করল আত্মম্ভরী, সংকীর্ণমনা, খ্রিস্টান মিশনারিরা । ম্যম তাঁর বিখ্যাত ‘রেন’ নামে বড় গল্পে দক্ষিণ প্যাসিফিকে মিশনারিদের কঠোর অত্যাচারের পরিচয় দিয়েছেন । কাজে কাজেই গ্রামে গ্রামে মারে-এর বদলে এল ছিটেবেড়ার দেওয়ালে টিন লাগানো চার্চ । দেশি পুরোহিতের জায়গা নিলেন দেশি ও বিদেশি পাদ্রীরা । সুখের বিষয় এই যে ফরাসি পলিনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা ফ্রেঞ্চ হলেও, পলিনেশিয়ানরা নিজেদের ভেতরে নিজেদের ভাষায় কথা বলে । এবং সে ভাষা এখন লেখাও হচ্ছে রোমান হরফে । পলিনেশিয়ান ভাষা বাংলা ভাষার মতোই শ্রুতিমধুর । কারণও এক । স্বরবর্ণের প্রাধান্য । যে কোনও দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝখানে একটি স্বরবর্ণ থাকবেই এবং শব্দের শেষ অক্ষরটিও স্বরবর্ণ হবে । হসন্ত নেই । ক্রাইস্ট ওদের ভাষায় কিরিসতো ।

বিখ্যাত ভূপর্যটক এবং লেখক জেমস মিচেনারের মতে, বোরাবোরা পৃথিবীর সুন্দরতম দ্বীপ । সতর্কবাণী হল এই যে ‘হে পথিক যদি পৃথিবীর সুন্দরতম দ্বীপটিকে সমগ্রভাবে দেখতে চাও তাহলে এয়ারপ্লেনের বাম ভাগে বসিবা’ । এসব প্লেনে সিট নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা নেই । এয়ারপ্লেনের দরজা খুলতেই আমি ছুটে গিয়ে বাঁদিকের এক জোড়া সিট দখল করলাম । একটু পরেই গিন্নি হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হলেন । মিনিট পনেরো পরেই বাঁদিকে সবুজ উপকূল রেখা-পাহাড় বন দেখা গেল । কিন্তু এ তো সে নয় । এ যে অনেক ছড়ানো হাত পা খেলানো দ্বীপ । ততক্ষণে মাইক্রোফোনে পাইলটের আওয়াজ এল । এখন আমাদের বাঁদিকে যুগ্ম দ্বীপ রাইয়াটিয়া এবং তাহা-সা । দুটি দ্বীপ ঘিরে একক কোরাল-বেষ্টনীটি লক্ষ করুন । সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জে তাহিতির পরেই রাইয়াটিয়ার স্থান এবং এক সময়ে রাইয়াটিয়া সমস্ত অঞ্চলটার প্রধান ধর্মকেন্দ্র ছিল । আর দশ মিনিট পরে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সুপরিচিত মূর্তি । স্বল্পবাসা নর্তকীর ফাঁপানো স্কার্টের মতো জমি থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে মাউন্ট ওটেমালু আর পাহিয়ার যুগল শৃঙ্গ । এবারে কিন্তু ভয়াল মনে হল না ।

বোরাবোরার এক চিলতে দ্বীপে এরোপ্লেন নামার মতো সমভূমি নেই । প্লেন নামল মাইল তিনেক দূরে কোরাল রিফ ঘেঁসে অন্য একটি দ্বীপ মোতু মোতায় । এয়ার তাহিতিই

বন্দোবস্ত করে সেখান থেকে মোটর লঞ্চে করে মেন ল্যান্ডে নিয়ে গেল । ওপারে পৌঁছে ল্যে ট্রাকে করে যে যার ঠিকানায় যাবে । বোরাবোরা পুঁচকে দ্বীপ হলে কী হবে, এ হল কোটিপতিদের লীলাভূমি । এখানকার পাঁচতারা হোটেল বোরাবোরা বা মোয়ানা বিচ পার্ক রয়্যাল পৃথিবীর যে কোনও বিলাসবহুল হোটেলের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে, আর হালে খুলেছে জাপানি পরিচালনায় বোরাবোরা লেগুন রিসর্ট, পুরো একটা মোটু নিয়ে । এ হোটেল এত নাক উঁচু যে এখানকার কর্মচারীদের মধ্যেও দিশি মুখ খুব কম চোখে পড়বে । এদের হোটেলের যে লঞ্চ অতিথিদের পারাপার করে তাতে দেশি লোককে উঠতে দেয় না । আমাদের অত সাধ বা সাধ্য নেই । আমরা গিয়ে উঠলাম বোরাবোরা মোটেলে । তাও, ওদের বাংলো বা ফারে-এ তে নয় । আমরা রইলাম পাশাপাশি দুটো কামরার কোঠা বাড়িতে । অবশ্য প্রত্যেক কামরাই পরিপাটি সাজানো । প্রত্যেকটির সঙ্গেই একটি করে কিচেনেট, বাথরুম এবং তার বাইরে সমুদ্রমুখী খোলা বারান্দা ।

হুয়াহিনের মতো নিঃসঙ্গপুরী নয় এটা । মোটেলের দুপাশেই অন্য অন্য হোটেল । সামনে বেশ কয়েকটা দোকান রেস্টুরেন্ট । রাস্তায় দেশি-বিদেশি লোকের যাতায়াত । দলবেঁধে সাইকেল যাত্রা । দুপুরে রেস্টুরেন্টে খেয়ে একটু গড়িয়ে বিকেলের আলোয় বেড়াতে বেরোলাম । আধ মাইলটাক যেতেই দুদিকের বাড়িঘর পাতলা হয়ে এল । ঝোপঝাড়, কলাগাছের জঙ্গল, তার মাঝে হঠাৎ একটা হলদে কাঠের বোর্ডে লাল অক্ষরে লেখা কাফে মোয়ানা । চায়ের সময়ও হয়েছে । বেড়ার মধ্যে ঢুকে দেখি ফালি মতো একটা পাতায় ছাওয়া ঘর, হাই বেঞ্চির মতো কাউন্টার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত । তার ওপাশে চা-কফির জোগানদার সাজসরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে । সামনে মোটা মোটা কাঠের কুঁদোর ওপর বসবার জায়গা । রং কালো হলেও লোকটার মাজা ঘষা একহারা চেহারা, বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ । কিছু এশিয়ান রক্ত থাকা অসম্ভব নয় । ভাঙা ইংরিজি বলে । চা খেতে খেতে গল্পগাছা হল । ওরা বোরাবোরার মানুষ । মাঝখানে কয়েক বছর পাপিতেতে ছিল । সেখানেই ইংরিজি শেখা । এই চায়ের দোকানের পিছনেই খানিকটা খোলা জায়গায় ওর বাড়ি, বাগান । সেখানে বউ আর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ওর সংসার । বড় ছেলেমেয়ে দুটি স্কুলে যায় । সরকারি স্কুল । বাস আছে । তবে কি জানো, সব কিছু ফরাসি ভাষায় শেখানো হয় । নিজেদের ভাষার কোনও চর্চা নেই, এমনকী বিদেশি ভাষার ক্লাসও নেই । ছেলেমেয়েগুলো যা তৈরি হচ্ছে । ভাষা ফরাসি, ধর্মে খ্রিস্টান আর টিভির কল্যাণে আচারে ব্যবহারে আমেরিকান । নিজ দেশের কিছুই পেল না ওরা । জিজ্ঞেস করলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে বহু দ্বীপ তো স্বাধীন হল, তাহিতি পিছনে পড়ে রইল কেন । ওর মতে, স্বাধীন যারা হল সে সব জায়গায় বিদেশিদের আর পোষাচ্ছিল না । অন্যদিকে দেখ গুয়াম,

সামোয়া আমেরিকানদের তাঁবেই থাকতে চায় আর হাওয়াই তো নাম লিখিয়ে পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে গেল। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে!

আমি কিন্তু হতাশ হইনি। দেড়শো বছরের পরাধীনতা, মিশনারি এবং সরকারি কর্মচারীদের হাতে দেশের ধর্ম, কর্ম, রীতি, নীতির নির্দয় দলন দুলক্ষ লোকের দ্বীপগুলিতে বাৎসরিক দশলক্ষ ট্যুরিস্টের আনাগোনা সত্ত্বেও তাহিতির লোকেরা বজায় রেখেছে তাদের স্বাতন্ত্র্য, সহৃদয়তা, স্বভাব ও আচরণের মৃদুতা যার উল্লেখে ১৮৩৯ সালে চার্লস ডারউইন মন্তব্য করেছিলেন, এদের বর্বর কে বলে? বুদ্ধি বিবেচনায় এদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত। বিদায় নিয়ে যখন উঠছি, লোকটি টুক করে ভেতরে গিয়ে পাঁচটি সুপক্ক রম্ভা নিয়ে এল। 'আমার বাগানের কলা। তোমরা খেয়ো। এর দাম দিতে হবে না।' চিরকালের পলিনেশিয়া।

সেইদিন সন্ধেবেলা বিদেশিদের কাছে আরেক রকম গল্প শুনলাম। গৃহিণীর একটা পারেয়ো কেনবার শখ। ঝলমলে এক কাপড়ের দোকানের মালিক মেমসাহেব। পরিষ্কার ইংরিজি বলেন। উনি এবং ওঁর স্বামী দুজনেই আর্জেন্টিনার লোক, তবে ওঁর স্বামী সিনেমা টেকনিশিয়ান হিসাবে বহুদিন হলিউডে ছিলেন। ২০-২৫ বছর আগে টাইফুনের ছবি তোলার জন্য এক সিনেমা দলের সঙ্গে ওঁরা তাহিতিতে আসেন এবং এখানেই মানে বোরাবোরায় থেকে যান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তখন আমাদের সেই ছেলেবয়সে, পৃথিবী পরিক্রমার বাইরে এই চির বসন্তের দেশে থেকে যাওয়াটা বেশ মজার মনে হয়েছিল। এখন ঠেকে শিখেছি যে ভালো করিনি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধা নেই, সমাজ নেই, সঙ্গী নেই, অসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই-আর জিনিসপত্রের কী দাম, এর তুলনায় ইউরোপ সস্তা, আমেরিকা আরও সস্তা।'

'জিনিসের যদি এত দাম তো দেশি লোকেরা চালায় কী করে?'

'ওরা! ওদের আবার কিছু কিনতে হয় নাকি। গাছে কলা, নারকোল, ব্রেড ফ্রুট, রাঙা আলু, লেগুনে মাছ, বাড়িতে মুরগি, হাঁস, শুয়োর পোষে। বাড়ি তো নিজেরাই তৈরি করে পাথর, গাছের ডালপালা পাতা-লতা দিয়ে। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের জমি বাগান আছে। কিনতে যদি হয় তো বড়জোর দু-চার টুকরো কাপড়। আগেকার দিনে তাও লাগত না, নরম গাছের ছাল পিটিয়ে নিজেদের পরবার জন্য টাপা কাপড় তৈরি করে নিত।'

ক্যাপ্টেন কুকের খেদোক্তি মনে পড়ল, 'আমাদের একেবারে না জানলে এদের আরও ভালো হত।'

ম্যাপে মুরিয়া দ্বীপকে দেখায় ঠিক যেন একটি প্রজাপতি পাখা মেলে রয়েছে। দুদিকে নাকের খাঁজ-দুই খাড়ি, একটি কুকস বে অন্যটি ওপুনহু বে। দুই খাড়ির মাঝখানে আড়াই হাজার ফুট উঁচু মাউন্ট রোতুই যেন জলের ভেতর থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে। দ্বীপের চারদিক ঘিরে রাস্তা এবং এই সব রাস্তার ধারে ছোট ছোট গ্রামবসতি, হোটেল রিসর্ট। মুরিয়ায় কোনও শহর নেই। এয়ারপোর্ট মুরিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে। হোটেল মুরিয়া ভিলেজ উত্তর-পশ্চিমে। লম্বা রাস্তা ধরে খাড়ি দুটি ঘুরে হোটেলে পৌঁছলাম বেলা প্রায় বারোটায়। বেশ জায়গাটা। একটু ট্যুরিস্টি বটে, তবে জীবন্ত। লেগুনের কিনারা ঘিরে কয়েকটা হোটেল। হাইরাইজের জটলা নেই। নিজের বিস্তৃত এলাকায় ছোট ছোট ব্লক, কুটিরের সমষ্টি। তার ওপরে আছে ক্লাব মেডিটারেনিয়ানের তিনশো কুটির নিয়ে সুবৃহৎ পান্থনিবাস। এদের দেখাশোনা করবার জন্য রাস্তার ধারে আধ মাইল ছড়িয়ে দোকান, বাজার, সুপার মার্কেট, বার, রেস্টুরেন্ট। হালে তৈরি হয়েছে প্যতিত ভিলেজ শপিং সেন্টার। আমেরিকান ম্যালের মতো হলেও, তার বহিরাবরণ অত কুৎসিত নয় এবং সব একতলা। এখানেই প্রথম দেখলাম দুটি পিকচার গ্যালারি। দেশি-বিদেশি আর্টিস্টদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। বহু ছবিকার পাপিতের গণ্ডগোল থেকে পালিয়ে এখানে বাসা করেন।

এখানেও আমরা লেগুনের ধারে কুটির পেলাম। দুপুরে খাওয়া, শোয়া, তারপর কুটিরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ অলস বিলাসে কাটিয়ে চা খাবার নাম করে বেরোলাম। পয়সা বাঁচাবার জন্য সুপার মার্কেটে একটা ক্রোয়াসঁ (সুস্বাদু ফরাসি ব্রেড রোল) কিনে চায়ের স্টলে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের স্টলে চায়ের সঙ্গে বাইরে কেনা জিনিসটি খেতে পারি কি না। স্বচ্ছন্দে। কিন্তু চা আসবার পরে ক্রোয়াসঁটি মুখে দিয়ে ভালো লাগল না। কেমন যেন শক্ত পোড়া পোড়া। চাওয়ালাকে বললাম, ‘বাপু তোমাদের দেশে ক্রোয়াসঁটি সুবিধার নয়।’

‘ওটা তো তোমরা সুপার মার্কেটের ক্রোয়াসঁ খাচ্ছ। আমার নিজের বেক করা জিনিসটি খেয়ে দেখো।’

দেখলাম। সত্যিই ভালো। ততক্ষণে অবশ্য লক্ষ করেছি যে লোকটি পলিনেশিয়ান তো নয়ই। ইউরোপিয়ানও নয়, অথচ ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, একহারা হিলহিলে চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ। ওর জন্ম কায়রোর কাছে নীল নদের ধারে কোনও গ্রামে। সেখান থেকে রুজি রোজগারের সন্ধানে যুগোস্লাভিয়া গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের উৎপাতে যুগোস্লাভিয়া থেকে গেল অস্ট্রেলিয়া। ওখানে খুব সুবিধা হল না বলে মুরিয়াতে এসে দোকান খুলেছে। আমরা ইজিপ্ট গিয়েছি শুনে খুব খুশি। বললে, আমিও দেশে ফিরে যাব। মুরিয়াতে

দোকানটা ভালো চলছে না । ভাবছি ফিজি চলে যাব । সেখানে না হয়, ম্যানিলা, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর আছে । কোথাও কিছু না হলে দেশে তো কয়েক কাঠা জমি-জিরেত যা হয় আছে । আমার মনে হল লোকটা জন্ম-যাযাবর । কোথাও নোঙর ফেলতে চায় না ।

পরদিন বাস কোম্পানিকে বলে রেখেছিলাম দ্বীপ ভ্রমণে যাব । দ্বীপ ঘোরা তো হবেই, তার সঙ্গে ওরা নিয়ে যাবে মুরিয়ার মাঝ বরাবর সুবিশাল ক্যাথিড্রালের মতো দেখতে আড়াই হাজার ফুট উঁচু মাউন্ট মুরারোয়ার গায়ে তৃণভূমির ওপরে, বেলভিডিয়ারে । এখানে দাঁড়িয়ে সারা মুরিয়ার বনতৃণপর্বতভূমি দেখা যাবে । আর দেখা যাবে প্রাচীন দিনের একটি মারে-এ যেটাকে পুনর্নির্মাণ করে নবকলেবর দেওয়া হয়েছে । এর ওপর বোনাস হল মুরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে যাওয়ার সময় বড় মাছের পিঠের কাঁটার মতো পাহাড়ের খাঁজকাটা গিরিশ্রেণীর এপার থেকে ওপারে বারো মাইল দূরে তাহিতির উপকূল পর্বতমালার দৃশ্য । তবে লোকে বলে তাহিতির দিক থেকে মুরিয়ার উপকূল আরও সুন্দর দেখায়, বিশেষ করে সূর্য অস্ত যাবার সময় ।

কিছুই হল না । পরদিন সকাল থেকে বৃষ্টি । গাছের ডাল নোয়ানো, পাতা ঝাঁকানো শন শন হাওয়া । মেঘে মেঘে সামনের পাহাড়টার আধখানা ঢেকে গেল । সকাল থেকে সেজে গুজে বসে আছি । সাড়ে আটটা, নটা, সাড়ে নটা । বাস আর আসে না । দশটা নাগাদ হোটেল থেকে বললে যে ট্যুর বাস আজকে আর বেরোবে না । বেরিয়েই বা কী করবে । বৃষ্টির ঝাপটে কোথাও নামা যাবে না । কিছু দেখা যাবে না । কী আর করি । হোটেল থেকে একটা ছাতা ধার করে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম । রাস্তায় আসতে না আসতে একটি ল্য ট্রাক এসে থামল । দুঘণ্টা অন্তর অন্তর এরা ক্লাব মেডিটারেনিয়ানের সামনে থেকে জাহাজঘাটায় যায় । জাহাজঘাটাই সই । তারপর সেই পুরনো রাস্তা ধরে ওপুনোহা বে, কুকস বে পেরিয়ে জাহাজঘাটা প্রায় একঘণ্টার রাস্তা । রাস্তায় পাপেটোয়াই গ্রামে বাস একটু থামল । মুরিয়ায় ভ্যানিলা চাষের কেন্দ্র এটি । একটি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট আছে । কিন্তু বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে নেমে কিছু দেখা হল না । জাহাজঘাটায় এমন কিছুই দেখবার নেই, তবে ওখানে পৌঁছে একটা বহু পুরনো কথা মনে পড়ল । অনেক ছেলেবেলায়, এক ভোরে ঝাঁঝাঁ স্টেশনে ট্রেন থামতে, তখনকার মুগ্ধ চোখে দেখেছিলাম কেমন স্টেশনের পাশ ঘেঁসে পাহাড়টা সোজা ওপরে উঠে গেছে । এখানে জেটির পাশে রাস্তার ওপারে তেমনই একটা পাহাড়, আরও সবুজ আরও উঁচু । জাহাজঘাটায় ডাব বিক্রি হচ্ছে । একটা চাইতে ডাবের মুখ কেটে সেখানে একটা সাদা ফুল গুঁজে হাতে তুলে দিল । স্ট্র-এর বাক্সে হাত দিয়েছে, আমি তাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করে ডাবের মুখে মুখ লাগিয়ে চোঁচোঁ করে খেতে শুরু করলাম । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাণ্ড দেখে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের চোখ কপালে ওঠে আর কি!

পরদিন আবার তাহিতি। যে প্লেন আমাদের তাহিতি নিয়ে এল সেটা মিনিবাসও নয়, বরং মারুতি ওমনি। পাশাপাশি দুজন করে মোট আটটি লোক বসে প্লেনের মাঝখানে। প্লেনের দুদিকে দরজা। দুজন করে লোক দুদিক থেকে ওঠে। সিঁড়ির দরকার হয় না। পাইলট প্লেনের সামনে অটোরিকশার মতো সিটে। প্লেনে মাইক্রোফোন দরকার হয় না। সবাই উঠতে পাইলট বলল, তোমাদের মালপত্র আমাদের পরের ফ্লাইটে বড় প্লেনে, মানে মিনিবাসে আসবে মিনিট পনেরো পরে।

আরও তিনটি জিনিস দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময়াভাবে প্রথম দুটি দেখা হয়ে উঠল না। প্রথমটি হল গঁগা মিউজিয়াম। এটি দ্বীপের উল্টোদিকে মাতাইয়া গ্রামে, যেখানে গঁগা কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। ট্যাক্সিতে দুঘণ্টার রাস্তা। গঁগার পেন্টিং এখানে কিছুই নেই তবে তাঁর নিজের ব্যবহারের কয়েকটি জিনিস, কাঠখোদাই কাজ, সিরামিক্স রেখে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি, মার্লোন ব্র্যান্ডোর দ্বীপ। ১৯৬২ সালে ব্র্যান্ডো তাহিতিতে আসেন দ্বিতীয় 'মিউটিনি অব দি বাউন্টি' ছবিটি তোলার জন্য। তাহিতির মুক্ত জীবনযাত্রা ব্র্যান্ডোর এত পছন্দ হয় যে তিনি তাঁর ছবির নায়িকা তাহিতির মেয়ে তারিতাকে বিয়ে করে তাহিতি থেকে আধঘণ্টা দূরে কয়েকটি মোটু কিনে সেখানে বসবাস করেন। এ ভালোবাসার পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর হয়েছিল, কিন্তু সে অন্য গল্প। ব্র্যান্ডো এখন আর নেই। ১৯৮৩ সালের হ্যারিকেন তাঁর সুখাবাসের বহু অংশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তারিতা এখনও সেখানে বাস করেন। যেটুকু অংশ বাকি আছে ট্যুরিস্টরা এখনও তা দেখতে যায়। তৃতীয় দর্শনীয় বিষয়টি হল তাহিতির উত্তর-পশ্চিম উপকূলে বসে মুরিয়ার মাছের পিঠের কাঁটার মতো খাঁজকাটা গিরিশ্রেণীর ওপারে সূর্যের অস্তগমন দেখা। এটি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সূর্যাস্তের বহুল বর্ণনা দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না, কিন্তু যখন পাহাড়ের এপারের আকাশ অন্ধকার হয়ে অস্তসূর্যের ম্যাজেন্টা রং ওপারে ছড়িয়ে পড়ল তখন মনে হল দ্বীপের আদি অধিবাসীরা ঠিকই বলত। দ্বীপের মৃত আত্মারা এই সময়েই অন্ধকার থেকে চির আলোর দেশে চলে যায়।

তাহিতির কথা শেষ করবার আগে, আরও দুটি বিষয়ে সামান্য কিছু বলা দরকার। এক হল ভুবনবিখ্যাত হুলা নাচ। অন্যটি হল গাত্রচর্মের ওপর কালির ফুটকি দিয়ে ছবি আঁকা ট্যাটু। ট্যাটু শব্দটাই এসেছে পলিনেশিয়া থেকে। আঠেরো শতকের আগে ইউরোপে ট্যাটুর প্রচলন ছিল না এবং তখনকার নাবিকেরা পলিনেশিয়ানদের বিচিত্রিত অঙ্গশোভা দেখে চমৎকৃত হয়েছিল। আর সে অঙ্গশোভা সারা শরীর জুড়ে, বিশেষ করে পুরুষদের। মার্কুইস আইল্যান্ডে জিভেও ট্যাটু করা হত। আসলে বসনবৈচিত্র্যের অভাব পলিনেশিয়ানরা মিটিয়েছিল ট্যাটু দিয়ে। আর নাচ হল পলিনেশিয়ানদের জীবনধারার অভিব্যক্তি। গ্রামের ছেলেবুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে এ নাচ নাচত, এমনকী নপুংসকরাও

বাদ যেত না। তবে নপুংসকদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে নাচবার অধিকার ছিল না। আর সে কত রকমের নাচ। পূজা, যুদ্ধবিগ্রহ, অতিথি অভ্যর্থনা-প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা নাচ ছিল। হুলা নাচ হত সৃষ্টিদেবতার উদ্দেশে এবং তাতে কিছুটা আদিরসও মেশানো থাকত। পৃথিবীর নানা দেশের নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু বিশেষজ্ঞ না হয়েও বলতে পারি যে পলিনেশিয়ান হুলার মতো এত তরল অঙ্গ সঞ্চালন আর কোথাও দেখিনি। ক্ষুদ্রমনা মিশনারিদের গোঁড়ামিতে সারা উনিশ শতক ধরে ট্যাটু এবং হুলা দুইই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুখের বিষয় যে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পলিনেশিয়ান ভাষার মতোই এসব বিদ্যার চর্চা আবার শুরু হয়েছে।

পরদিন তাহিতির পালা শেষ করে রওনা। এয়ার ফ্রান্সের বিশালকায় জাম্বো জেট সগর্জনে আকাশে উঠে গেল। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তাহিতি দ্বীপ। যেন কখনও ছিল না।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

মার্কে. য় গঙ্গার উৎস সন্ধানে

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

এবছর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকার ওপর ভাগে অভিযান চালানোর জন্য IMF-এর অনুমতিপত্র হাতে পেলাম তখনই প্রবল বর্ষণে নিম্ন মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকা বিপর্যস্ত হবার খবর সংবাদপত্রের শিরোনামে এল । খবরে পড়লাম নিম্ন মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকার লেঙ্খ, মনসুনা, উখিমঠ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবল ধস ও ব্যাপক ধ্বংসলীলার কথা । খবরে আরও জানলাম লেঙ্খ গ্রামের নিচে বিশাল এক ধসে মদমহেশ্বর গঙ্গার গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জলাশয়ের, যার ফলে ওই অঞ্চলে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গিয়েছে । যদি কোনওভাবে ওই অবরোধ মদমহেশ্বর গঙ্গার জলরাশির চাপে ভেঙে যায়, তাহলে লেঙ্খ-মনসুনা-উখিমঠ তো বটেই, এমনকী কালীমঠ, কুণ্ডচটি, চন্দ্রপুরী, সিয়ালসোর, অগস্ত্যমুনি ইত্যাদি মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে আমাদের অভিযান কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ রইল না ।

১ অক্টোবর ১৯৯৮ চেপে বসলাম দুন এক্সপ্রেসে । ৩ অক্টোবর রাত কাটালাম হৃষীকেশের যাত্রা বাসস্ট্যান্ডের হোটেল দিগ্বিজয়ে । খোঁজ নিয়ে জানলাম মনসুনা যাবার বাস পরদিন ছাড়বে না । অগত্যা ৪ অক্টোবর ভোর চারটেয় উঠলাম GMOU-এর রুদ্রপ্রয়াগগামী এক বাসে । সকাল সাড়ে নটায় রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে পেয়ে গেলাম উখিমঠগামী একটি বাস । প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে বাসটি রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করল সকাল সাড়ে এগারোটায় । বেলা একটায় উখিমঠ পৌঁছতেই হোটেলের দালালরা ছেঁকে ধরল । দুয়েকজনের মুখে ভ্রমণ-এর নামও শুনলাম । উখিমঠে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে মনসুনাগামী জিপে আমাদের মালপত্র চড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম মনসুনা । মনসুনায় ভোজন সেরেই শুরু হল হাঁটা । পথ প্রথমেই নেমে চলে নদীখাতে । মধ্যাহ্নের রোদ মাথায় নিয়ে আমরা নদীর পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলতে থাকি লেঙ্খ গ্রামের উদ্দেশে । একটু পরেই এসে পড়ি প্রকৃতির ব্যাপক ধ্বংসলীলার একবারে মাঝখানে । দেখি জুগাসু পুলের কোনও চিহ্নই নেই, জুগাসুর ঠিক ওপরেই পাহাড়টার গা থেকে বিশাল ধস নেমে অবরুদ্ধ মদমহেশ্বর গঙ্গার পথ । গাছের গুঁড়ি দিয়ে

তৈরি ছোট্ট সেতু দিয়ে মদমহেশ্বর গঙ্গা পেরিয়ে লেঙ্খ-এর চড়াই পথ ধরি । বিকেল সাড়ে তিনটেয় লেঙ্খ-এ পৌঁছে আশ্রয় নিই পুরনো বন্ধু শিব সিং নেগীর বাড়িতে । শিব সিংয়ের বাড়ি থেকেই স্পষ্ট দেখা যায় মদমহেশ্বর গঙ্গার ওপর সৃষ্ট বর্তমান জলাশয়টি । আরও দেখা যায়, ধসের বুক চিরে মদমহেশ্বর গঙ্গা নিজের পথ করে নিয়ে বয়ে চলেছে । অবরোধ ভেঙে গিয়ে নিম্ন উপত্যকায় বন্যার ভয় এখন তাই কিছুটা কম । সরকার থেকে তবুও লেঙ্খ গ্রামাঞ্চলকে বিপদগ্রস্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের অঞ্চল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

৫ অক্টোবর সকাল সকাল লেঙ্খ থেকে বেরিয়ে পড়লাম । সঙ্গে আছে শিব সিংয়ের করা রুটি আর কুমড়োর তরকারি । লেঙ্খ গ্রামের সীমানা ছাড়াতেই তিনটি বড় বড় ধস পেরোতে হল । ওনিয়ানা, রাঁসি, গোন্ডার ছাড়িয়ে অবশেষে বানতোলি পৌঁছলাম বেলা আড়াইটেয় । লেঙ্খ থেকে বানতোলির দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার । এখানে বীরবল সিংয়ের ব্যবস্থাপনায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই । রাতে খাওয়ার পর হাঁটতে বেরোই । কোজাগরীর চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে উপত্যকা । মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি মদমহেশ্বর গঙ্গা ও মার্কণ্ডেয় গঙ্গার সঙ্গমের দিকে ।

পরদিন, ৬ অক্টোবরের পথ মাত্র ৯ কিলোমিটার, কিন্তু আগাগোড়াই চড়াই । ৩ কিলোমিটারের পর নানুতে থামি জলপানের উদ্দেশে । পুরনো বন্ধু সুন্দর সিং পাঁওয়ার আমাদের পথ চেয়েই বসে ছিল । ওর সঙ্গে কিছু দরকারি কথা সেরে নেওয়া গেল, কারণ পরশু থেকে ওই হবে আমাদের সঙ্গী । নানু থেকে মদমহেশ্বর ৬ কিলোমিটার পথ বেশ ভালোই চড়াই । ব্যাপকভাবে গাছ কাটায় রোদে পুড়েই পথ চলতে হয় । বেলা দেড়টা নাগাদ মদমহেশ্বর পৌঁছে যাই । দর্শনমাত্রই শারীরিক ও মানসিক কষ্ট উধাও হয়ে যায় । আশ্রয় নিই মন্দির কমিটির যাত্রীনিবাসের একটি ঘরে । বিকেলের পড়ন্ত রোদে আমি ও আমার সঙ্গী গা এলিয়ে দিই বুড়া মদমহেশ্বরের ঢালে । চা চলে আসে রাকেশ পাঁওয়ারের দোকান থেকে । যেচে গিয়ে আলাপ করি পূজারীজির সঙ্গে । ত্রিশোর্ধ্ব যুবক, মহারাষ্ট্রে বাড়ি । গল্প করে কিছুটা সময় কেটে যায় । স্বপ্নভঙ্গের মতো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জনা-ত্রিশেকের দুটি দল উপস্থিত হয় । একটি দল শ্যামবাজারের, অপরটি সালকিয়ার । তাদের সকলেরই বয়স ত্রিশের মধ্যে । মদমহেশ্বর মন্দিরকে নিয়ে তারা বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তুলতে থাকে । নৈঃশব্দ্যের স্বর্গপুরী যেন এক লহমায় পরিণত হয় কোলাহলমুখর জনপদে । দলদুটির উচ্ছৃঙ্খলতা মনকে আহত করে ।

পরদিনও আমরা মদমহেশ্বরেই থাকলাম । তার একমাত্র কারণ শরীরকে উচ্চতা এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া । আমাদের এবারের অভিযানের মূল উদ্দেশ-উচ্চতর

মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকার কিছু অজানা, অচেনা অঞ্চলের পথ খুঁজে বার করা । ব্যাপক এলাকা আজও অজ্ঞাত পর্যটকের কাছে । যাই হোক, সারাদিনটা টুকিটাকি নানা কাজের মধ্য দিয়ে কেটে গেল । সকালেই গতকাল আসা দলদুটি নেমে গেল । সারাদিন তাই আবার আমরা একা । সন্ধ্যায় অন্ধকারে সুন্দর সিং আরেকজন কুলি নিয়ে হাজির হল ।

পরদিন বেরতে বেরতে সাতটা বেজে গেল । আমি আর সঙ্গী সুব্রত কুলিদের আগে চললাম । গত বছরও আমরা এইপথে এসেছি । তাই পথ চিনতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না । এই পথ মূলত ভেড়াওয়ালাদের । মদমহেশ্বর মন্দিরের পিছন দিয়ে রাস্তা প্রবেশ করেছে গভীর জঙ্গলে । জঙ্গলের মধ্যে এঁকেবেঁকে পথ উঠে চলে । কিছুক্ষণ পরেই ট্রি-লাইন ছাড়িয়ে প্রবেশ করি ছায়াহীন রুক্ষ পাহাড়ের ঢালে । পথ এখানে আরও চড়াই । বলতে গেলে এখানে কেবলই ওঠা । চারদিকে থোকা থোকা হলুদ ঘাসের রাজত্ব । বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছই নন্দবারারি খড়কে । এই জায়গার উচ্চতা প্রায় তেরো হাজার ফুট । এটি ভেড়াওয়ালাদের একটি রাত কাটাবার প্রিয় জায়গা । কুয়াশায় চারদিক ঢেকে যায় হঠাৎই । স্টোভ জ্বালিয়ে আমরা কফি এবং ছাতু খাই । আবার শুরু হয় পথ চলা । নন্দবারারি খড়কের পর রাস্তা কিছুটা উতরাই, অজস্র ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে । তারপর শুরু হয় কাচনি খালের চড়াই । কুয়াশার মধ্যে বেলা দুটো নাগাদ উঠে আসি কাচনি খালের মাথায় । কাচনি খাল একটি গিরিপথ । এর উচ্চতা তেরো হাজার পাঁচশো ফুট । মদমহেশ্বর থেকে নন্দীকুণ্ড বা পাণ্ডুসেরা যেতে এই কাচনি খাল পেরোতে হয় । খালের মাথায় বসে সুন্দর সিংয়ের আনা কাঁকড়ির সদ্ব্যবহার করি । তারপর আবার হাঁটা শুরু । পাণ্ডুসেরার দিকে না নেমে আমরা উত্তর দিকে চলতে শুরু করি । কিছুটা খাড়া (২০০ ফুট) ঢাল বেয়ে ওঠার পরই একটি সমতল জায়গা পাই । পাশেই বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি জলের ধারা । তাঁবু খাটাবার আদর্শ জায়গা । আবহাওয়া খারাপ হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়া শুরু হয় । আমরাও তাঁবু লাগাই । বড় পাথরের আড়ালে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয় পাকশালা । হাতে হাতে গরম টমেটো স্যুপের কাপে জমে ওঠে আড্ডা-আগামীকালের পরিকল্পনা ।

পরদিন ভোরবেলা তাঁবুর বাইরে এসে পা রাখলাম সারারাতের জমে থাকা বরফে । তাঁবুর বহির্গাত্রে পুরু বরফের আস্তরণ ঝরিয়ে দিতে থাকলাম সকলে । দক্ষিণে বহু নিচে দেখা যাচ্ছে সমগ্র নিম্ন মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকা । উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত ঝলমল করছে বিষ্ণুগড়ধার গিরিশিরা । অজস্র নামহীন তুষারশৃঙ্গের বরফগলা জলে সৃষ্ট অগুনতি নালা মিলে সৃষ্টি হয়েছে মদমহেশ্বর নালার । সেই ধারা পাণ্ডুসেরার সবুজ উপত্যকার পাশ দিয়ে বয়ে নেমে গেছে গভীর অরণ্যের পথে । বানতোলিতে এই মদমহেশ্বর নালার সঙ্গেই মিলিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় গঙ্গা । আমরা চলেছি সেই মার্কণ্ডেয়

গঙ্গার উৎস সন্ধানে । সূর্যের প্রথম কিরণ আমাদের শিবিরে পড়ামাত্র আমরা প্রাতরাশ সেরে চলা শুরু করি । উত্তরে, আরও উত্তরে । আমাদের পরিকল্পনা ছিল আজ দুনম্বর শিবির স্থাপন করব মাইন্দাগাল্লা তালের ধারে । সেইমতো এগোতে থাকি । আজ থেকে কোনও পথের চিহ্ন নেই । বিশাল এক বোল্ডার জোন ধরে এগনো । কম্পাস দেখে দিক ঠিক রাখা । পাথরের খাঁজে খাঁজে অজস্র ব্রহ্মকমল, ফেনকমল ফুটে আছে । আমরা যেন এগিয়ে চলেছি কোন অমরাবতীর অমোঘ আহ্বানে । বেলা এগারোটা নাগাদ উপস্থিত হলাম মাইন্দাগাল্লা তালে । এই তালের উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুট । কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলাম তালে এক বিন্দু জল নেই । তাই এখানে শিবির করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে এগিয়ে চললাম উত্তর-পূর্বদিকে । পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে আরও প্রায় পাঁচশো ফুট উঠে এলাম । এখানে পাথরের খাঁজে বরফ জমে আছে । মোটামুটি কম ঢাল দেখে এক জায়গায় দুনম্বর শিবির স্থাপন করা হল । পাথরের খাঁজে জমে থাকা বরফ পাত্রে নিয়ে চাপানো হল স্টোভে । কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো কফির আমেজে আমরা মশগুল হলাম । আজ আমাদের মধ্যে উত্তেজনার অন্ত নেই । কারণ, আজ আমরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছি, সেখানে এর আগে কোনও পর্যটকের পা পড়েনি । এখানে প্রয়োজন নেই কোনও গাইডের । কারণ মদমহেশ্বর উপত্যকার কোনও মানুষই কোনওদিন আসেনি এ পথে । এখানে পথ ঠিক করছি আমরাই মানচিত্র ও কম্পাসের সাহায্যে । সুন্দর সিংও যথেষ্ট উত্তেজিত । কারণ, আগামীদিনে ও-ই হতে চলেছে এ পথের এক এবং একমাত্র গাইড । রাঁসি গ্রামের শিউরাজ সিং ছিল এতদিন এ অঞ্চলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ গাইড । কিন্তু শিউরাজ সিংও এ পথ চেনে না । তার প্রমাণ আমরা গত বছর পেয়েছি । স্থানীয় গাইড বা কুলিরা মাইন্দাগাল্লা তাল পর্যন্ত চেনেন । তাই অতীতে পর্যটকদের গতিবিধি সেখানেই সীমিত থেকেছে ।

পরদিন ভোরে কিছু শুকনো খাবার, ফল ও জল নিয়ে আমরা উঠে চলি উত্তর-পূর্বদিকে । আমাদের মানচিত্র অনুযায়ী এই পথেই আমরা পাব এক দুরূহ গিরিপথ যা পেরিয়ে পৌঁছনো যাবে এক অদৃষ্টপূর্ব উপত্যকায়-:মার্কণ্ডেয় গঙ্গার উৎস যেখানে । একটু পরেই বরফের ঢাল শুরু হয় । কঠিন বরফের খাঁজে পা রেখে চলতে বেশ সুবিধাই হয় । একটু পরেই দেখতে পাই আমাদের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত গিরিপথ । সকাল আটটায় এসে দাঁড়াই গিরিপথের মাথায় । এই স্থানের উচ্চতা পনেরো হাজার পাঁচশো ফুট । দুনম্বর শিবির থেকে এখানে উঠতে আমাদের এক ঘণ্টার কিছু কম সময় লাগে । বাকরুদ্ধ আমাদের তিনজনের । এই প্রথম কোনও পর্যটকের পদচিহ্ন পড়ল গিরিপথের বরফে । আমরা এই কল বা গিরিখাতের নামকরণ করলাম আমাদের ক্লাবের নামে ORION COL । কলের উত্তরদিকের অনেকটা জুড়ে আছে বিখ্যাত চৌখাম্বা শিখর শ্রেণী । আর উত্তর থেকে উত্তর-

পূর্বে গোল হয়ে ঘিরে অজস্র অনামী শৃঙ্গরাজি । চারদিকে শুধু বরফ । ধীরে ধীরে চোখ নিচের দিকে নামাতেই আরেক বিস্ময় । পান্না সবুজ এক বিশাল সরোবর । চৌখাম্বার সমতলে যেন ধ্যানমগ্ন । আমরা বিস্মিত, কারণ এর উল্লেখ কোনও মানচিত্রে নেই । আমরা সাবধানে নামতে থাকি সরোবরের দিকে । ছবির পর ছবি তুলতে থাকি । চৌখাম্বা এবং আশপাশের শৃঙ্গের বরফগলা জলে সৃষ্ট এই সরোবরের থেকেই সৃষ্টি মার্কণ্ডেয় গঙ্গার । সরোবরের পাশ থেকে এগিয়ে যাই আরও উত্তরে-উন্মুক্ত হয়ে দেখা দেয় মান্দানি শৃঙ্গ ও উপরি গান্ধারপোঙ্গী বা মার্কণ্ডেয় গঙ্গা উপত্যকা । চৌখাম্বার গায়ে অ্যাভালাঞ্চ নামে গুমগুম শব্দে । আমরা তুষারক্ষেত্রে নিথর, নিঃশব্দ তিনটি বিন্দু । সরোবরের জলপান করতে গিয়ে দেখি স্বচ্ছ তুষারের স্তর ঢেকে রেখেছে গোটা সরোবর । বরফ কুঠার দিয়ে বরফ ভেঙে জলপান করি । মনে হয় এমন সরোবরের নাম না রাখলেই নয়! আমাদের পরমপ্রিয় প্রয়াত পর্বতারোহী, প্রকৃতিপাগল শ্রী সুজল মুখোপাধ্যায়ের মুখ ভাসে চোখের সামনে । মুহূর্তের মধ্যে মনে আসে 'সুজল সরোবর' নাম । সুজল সরোবর অবধি পথে উৎসাহী পদযাত্রীরা যেতে পারেন । তবে পথে তাঁবু, স্টোভ, কেরোসিন তেল, স্লিপিং ব্যাগ ও ভারি উলের জামাকাপড় রাখা জরুরি । গাইডের জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়:

সুন্দর সিং পাঁওয়ার, গ্রাম-গোণ্ডার, পোঃ রাউলেঙ্খ

জেলা-রুদ্রপ্রয়াগ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ।

গাইডের রেট দেড়শো টাকা প্রতিদিন । সাধারণ কুলি একশো টাকা রোজ-এর মধ্যে পাওয়া যায় । মনসুনা বা উখিমঠ থেকে কুলি নিতে পারেন । আশা রাখি ভবিষ্যতে সুজল সরোবর একটি উল্লেখযোগ্য গন্তব্য হয়ে উঠবে ।

ভ্রমণ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

কেদার বদ্রী

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়িয়া মানুষরা বিশ্বাস করে যে হিমালয় ডাক দিলে সাড়া দিতেই হয় । আমার বেলা এই ডাক এসেছিল একবারেই হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধনের মতো । স্বাস্থ্যের কারণে উচ্চতা আমার আওতার বাইরেই ছিল । তাই মনের মধ্যে অঙ্কুরের মতো ইচ্ছে জাগলেও তাকে আমল দিইনি । প্রতিবেশীরা ঠিক পুজোর আগে বাইরে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন । অনেকদিন ধরেই কেদার-বদ্রী যাওয়ার ইচ্ছে কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছিল না । এবার তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে দেবদর্শনে যাবেনই । কেদার-বদ্রীর নাম শুনলে মন চঞ্চল হয় না এমন বাঙালি বোধ হয় খুব কমই আছে । আমিও কোনও কিছু না ভেবেচিন্তে ঠিক করে ফেললাম, যাবই । ডাক্তারের পরামর্শে আমার সঙ্গে যাবার জন্য সেই ছোটবেলার ফিরিওলার বাক্সের হরেকরকমবার মতো একটি ওষুধের বাক্স তৈরি হল । সবকিছু বাঁধাছাদা, বাক্সে শুধু তালাচাবিটি পড়তে বাকি । এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত ।

যে ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আমাদের যাবার কথা তারা যাত্রার আগের আগের দিন টেলিফোন করে জানাল যে রান্নার লোকেরা স্ট্রাইক করায় যাত্রা বাতিল । খুবই দমে গেলাম । বুঝলাম যে ডাকটা অবেলায় এসেছিল । সব থেকে খারাপ লাগল আমার প্রতিবেশী বন্ধুদের জন্য । তাঁরা খুবই ভেঙে পড়লেন । নারায়ণ না ডাকলে নাকি এই ভাবেই সব কিছু পণ্ড হয়ে যায় । তাঁদের চাঙ্গা করতেই আমি কথাচ্ছলে বললাম, ‘দরকার কি ওদের সঙ্গে যাবার । আমরা তো তিনজনে মিলেই যেতে পারি ।’ যেমন কথা তেমন কাজ । প্রথমেই আমরা দিল্লির টিকিট কাটলাম কারণ দেরাদুন এক্সপ্রেসে জায়গা নেই । এমনিতে এই ট্রেনে হরিদ্বার অবধি গিয়ে বাসে করে হৃষীকেশ যেতে হয় । আবার দিল্লি থেকেও বাসে যাওয়া যায় । তারপরেই আমরা গেলাম গাড়োয়াল বিকাশ নিগমের কলকাতা শাখায় । বি বা দী বাগে জি পি ও ছাড়িয়ে আরেকটু গেলেই ওদের অফিস (মহাকরণের পিছনে) । তাঁরা আমাদের আশ্বাসবাণী দিলেন যে হৃষীকেশ থেকেই আমরা পছন্দমতো ভ্রমণসূচি পেয়ে যাব ।

ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও হিমালয়ের ডাক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না । নয়াদিল্লি থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাসে । চেপে বসলাম এক

অতি লজঝড় বাসে । পথে যেতে খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাস মুখ থুবড়ে পড়বে । মীরাটে যখন থামল মনে হল হিমালয় অনেক দূরে । এত নোংরা ও হতশ্রী শহর বড় একটা চোখে পড়ে না । যাই হোক মীরাট ছাড়িয়ে যাবার পর জনবসতি কমতে লাগল । দুধারে শুধু আখের খেত । দুটি খেতের মাঝে সরু পায়ে চলার পথ । রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ । বেশ কিছুক্ষণ ধরে খালি আখের খেত দেখতে দেখতে যখন একঘেয়ে লাগছে তখন হঠাৎই সবুজের গায়ে ঝলসে উঠল রঙের ছটা । ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই নীল গলা তুলে রাজকীয় ঠাটে এক খেত থেকে আরেক খেতে ঢুকে পড়ল ময়ূর । মনটা খারাপ হয়ে গেল । ভালো করে দেখার আগেই সে চোখের আড়াল হয়ে গেল । তখন কি জানি হিমালয়ের ডাক নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর পথের পাশ দিয়ে যাবে । কি উজ্জ্বল মসৃণ তাদের রং ও পেখম । মীরাট মুজফফরনগরের সব নোংরা ও কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে গেল রঙের ছটায় । বাসে ঘুমোতে পারি না বলে আমিই রয়ে গেলাম এই দৃশ্যের সাক্ষী । বাদবাকিরা সবাই এক ঘুমে নিমগ্ন ।

রুরকির পর পথের দুধারে দৃশ্য ক্রমশই ছবির মতো সুন্দর হতে লাগল । দিনান্ত বেলার আলোয় দুপাশে খেত ও গাছপালা মোহময়ভাবে পাল্টে গেল । হরিদ্বার আসার আগেই অন্ধকার নেমে এল । পাহাড়ের দেশের বিকেলে একটা হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া ছিল । যা দুপুরের গরমের পর খুবই মনোরম । এখানে অন্ধকার ঝুপ করে আসে না । শেষ বেলার আলো অনেকক্ষণ থাকে । বাসের জানলা দিয়ে যখন হরিদ্বার (স্থানীয় লোকে কিন্তু হরদোয়ার বলে) শহরের আলোগুলো দেখলাম তখন আরেকবার হিমালয়ের ডাক শুনলাম ।

হৃষীকেশ পৌঁছতে আমাদের আটটা বেজে গেল । ছোট জায়গার পক্ষে বেশ রাত । বাসস্ট্যান্ডের কাছেই হোটেল পাওয়া গেল, অবশ্য শুধু থাকার জন্য । মোটামুটি পরিষ্কার । তবে সে রাতে খুব খাওয়ার কষ্ট হয়েছিল । কারণ কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি শুকনো শক্ত রুটি ও ডাল ছাড়া ।

আমরা সকালবেলাই ছুটলাম আসল কাজে । গাড়োয়াল বিকাশের অনেক রকমের সফরসূচি আছে । চার ধাম (কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী) দুই ধাম (কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী), পঞ্চকেদার (রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, মুক্তনাথ, ভৈরব ও কেদারনাথ) । আমরা নিজেদের পছন্দের সফরটির টিকিট কেটে নিয়ে চলে গেলাম মুনি কি রেতিতে ঘর ঠিক করতে । এই জায়গাটি হৃষীকেশের একটু বাইরে । নিরালা পরিষ্কার ও ছবির মতো সুন্দর । তখনও সেখানে অটোর ফটফটানি আরম্ভ হয়নি । টাঙাই ভরসা । বেশ মজা লাগে চড়তে । ঘোড়ার কপকপ খুরের আওয়াজের একটা নিজস্ব ছন্দ আছে ।

আমাদের যাত্রা শুক্লপক্ষে হওয়ায় চাঁদের আলো আমাদের রাতের সঙ্গী হয়েছিল । মুনি কি রেতি থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত যে জ্যোৎস্নালোক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তা কল্পনারও বাইরে, একমাত্র স্বপ্নেই সম্ভব । মুনি কি রেতির বাংলোর সামনে রাস্তা একটি পাহাড় ঘিরে চলে গেছে । কয়েক পা হাঁটলেই নদী । ওপারে লছমন ঝুলা । দশমীর জ্যোৎস্নায় আলোছায়া ঘেরা পরিবেশে একা হাঁটতে একটুও ভয় করে না । পাহাড়িরা অপরাধপ্রবণ নয় । যদিও স্থানীয় লোকেরা খুবই গরিব । কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরিশ্রমী ।

আমাদের সফরসূচি সাত দিনের । মুনি কি রেতি থেকে সকাল সাতটায় যাত্রা আরম্ভ হল । রীতি অনুযায়ী আগে কেদারদর্শন তার পরে বদ্রীনাথ । দীর্ঘ চড়াই ভেঙে এক পর্বতমালার গা ঘেঁসে আরেক পর্বতমালার কাছাকাছি আসা । পিছন ফিরে নিচের দিকে তাকালে চোখে পড়ে ফেলে আসা রাস্তা মোটা অজগরের মতো পড়ে আছে । কেদার ও বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে যে যাত্রার শুরু তা হিমালয়ের ডাকের মতো মনে হল ।

যাত্রা পথের প্রথম বিরতি ব্যাসিতে । জায়গাটি এমনিতে সুন্দর । কিন্তু অমন সুন্দর জঙ্গল থেকে গাছপালার টাটকা নিজস্ব গন্ধের বদলে নাকে এল দুর্গন্ধ । জঙ্গলই এখানে তীর্থযাত্রীদের শৌচাগার । ব্যাসিতে ব্যাসদেবের একটি বড় মূর্তি আছে । পাহাড়ের পথে জানলার ধারে বসাটাই বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দ । সমান্তরাল এক প্রবহমান জীবন যা আমাদের আগেও যারা এপথে গেছে দেখেছে যারা পরে আসবে তারাও দেখবে । বড় বড় গাছে বাঁদরদের ঘরকন্না দেখার মতো । কোথাও বা চলছে পরস্পরের গা থেকে উকুন বাছা, কোথাও বা মা পরিচর্যা করছে শিশুর । তাকে গভীর মমতায় দুধ খাওয়াচ্ছে গা-হাত-পা পরিষ্কার করে দিচ্ছে । কিছু বাঁদর দল বেঁধে ফলটা পাকুড়টা পেড়ে নিচে একটু বড় শিশুর হাতে তুলে দিচ্ছে । বিকট শব্দ করে তাদের পাশ দিয়ে বিশালকায় বাস, ট্রাক একের পর এক চলেছে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই । বাঁদরদের বাঁদরামিও যে কত মজার হতে পারে তা কি দেবপ্রয়াগের এই পথে না এলে জানা যেত?

পুণ্যার্থীদের কাছে দেবপ্রয়াগের মাহাত্ম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখানে অলকানন্দার গর্জন এসে মিলে যায় ভাগীরথীর কলতানের সঙ্গে । এই মিলিত যাত্রা সিতলে আসে হরিদ্বারে । এখানে পূর্বপুরুষের তর্পণ করলে তাদের নাকি অনন্ত মোক্ষলাভ হয় । অলকাপুরী হিমপ্রবাহের স্বচ্ছ জল নিয়ে প্রবাহিত অলকানন্দা মেশে গোমুখ থেকে উৎসারিত গঙ্গার গাঢ় খয়েরি জলের সঙ্গে । আমরা ফিরে যাই রামায়ণের কালে । এখানকার অতি প্রাচীন রামমন্দিরে রাম তপস্যা করেছিলেন । ব্রহ্মহত্যার পাপস্খালনের জন্য । অর্থাৎ রাবণ হত্যার জন্য । স্থানীয় মানুষ এমনভাবে ‘রামজি’র কথা বলে যে মনে হয় যেন তিনি তাদের

পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ। এবং ঘটনাও যেন এই সেদিনকার। দেবপ্রয়াগ থেকে আরম্ভ হয় নিরামিষ খাওয়া। এর আগে হৃষীকেশে ডিমটা চলত। কেদার-বদ্রী যাত্রায় আহার ভোজন বিলাসীদের পক্ষে দুঃস্বপ্ন। অবশ্য রুদ্রপ্রয়াগের ভোরবেলায় চা ও জিলিপির স্বাদ বহুদিন স্মৃতিতে থাকে। গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের পথের ধারে ছোট্ট ভোজনালয়ের ডালের চাটনি তো অপূর্ব। সেইসঙ্গে দোকানের পিছনে হাত ধুতে গিয়ে আদিগন্ত ধানের খেত। শ্রীনগরের উচ্চতা ১,৭০০ ফুট। এখানে কমলেশ্বরের মন্দিরেও ঘরের মানুষ 'রামজি'র কথা শোনা গেল। কমলেশ্বর মন্দিরে শিবের আশীর্বাদ প্রার্থী রাম তাঁকে বন্দনা করেন ১,০০০টি পদ্মফুল দিয়ে। শিব যখন একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন তখন রাম ঘাটতি পূরণ করে তাঁর একটি চোখ দিয়ে। কার্তিক মাসে এখানে বড়সড় মেলা বসে।

এরপরের দর্শনীয় স্থান রুদ্রপ্রয়াগ। এখানেই প্রথম হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য চোখে পড়ে। পাথুরে রুক্ষতার সঙ্গে শ্যামলিমার মেলবন্ধন। আরেক মিলন স্থলের জন্যও জায়গাটি স্মরণীয়-স্বর্গের নদী মন্দাকিনী এখানেই মিলিত হয় অলকানন্দার সঙ্গে। পাথরের আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট পর্ণকুটিরের দরজায় দেখা যায় রংবেরঙের পোশাকে গাড়োয়ালি নারী ও শিশু। হাত নাড়লে তারাও হেসে উত্তর দেয়। নিচের দিকে তাকালে মন্দাকিনীকে একফালি সিল্কের মতো মনে হয়। এখান থেকে রাস্তা কেদারনাথের দিকে ভাগ হয়ে যায়। পথে পড়ে গুপ্তকাশী। এখানেই আছে বিখ্যাত শিবের এবং অর্ধনারীশ্বরের মন্দির। যখন পাণ্ডবরা জ্ঞাতি-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য শিবের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন তখন শিব এখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় বাতাস কনকনে ঠান্ডা। রোদে আসে উজ্জ্বলতা কিন্তু তাপবিহীন। অসংখ্য পাহাড়ি ঝরনা কলকলিয়ে গিয়ে মন্দাকিনীতে বিলীন হয়ে যায়। রং-বেরঙের নানা মাপের পাখি উড়তে উড়তে ঝরনার জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়। শোনপ্রয়াগে আবার দুই নদীর মিলন-শোনগঙ্গা হারিয়ে যায় মন্দাকিনীতে। গেটবন্ধ হবার আগে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছতে হয়। কারণ রাস্তা খুবই সরু। তার আগে পড়ে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির। এখানে শিব-পার্বতীর বিয়েতে পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সাক্ষী নারায়ণ। যে অগ্নিসাক্ষী রেখে মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে সাত পাক ঘুরিয়েছিলেন তার আগুন এখনও জ্বলছে। কারণ প্রতি পুণ্যার্থী একটি করে কাঠ আগুনে নিক্ষেপ করেন।

দেহত্যাগ করে দক্ষকন্যা সতী হিমালয় ও মেনকার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। উমা শিবকে স্বামী রূপে পাবার জন্য তপস্যায় বসার আগে মন্দাকিনীর জলে স্নান করেন শুদ্ধ হতে। সেই জায়গাটিতে উমাদেবীর মন্দির আছে এবং পাশেই উষ্ণকুণ্ড। ৫,৫০০ ফুট উচ্চতায় গৌরীকুণ্ড ঘিরে গভীর জঙ্গল ফার ও পাইনের। শ্যামলিমা জায়গা ছাড়তে থাকে রুক্ষতাকে। এখান থেকেই শুরু হয় ১৪ কিলোমিটার কেদারের পথ।

প্রথম পড়ে রামবাড়া । এর পরে ক্রমশই পথ চড়তে থাকে । বড় বড় ঝোপঝাড়ের কোণ ঘেঁসে ফুটে থাকে নাম না-জানা বনফুল বিভিন্ন রঙের সমারোহে । হলদে, সবুজ, লাল, গোলাপি, বেগুনি, সাদা এবং নানা রঙের নীলের জটলায় চোখ মুগ্ধ হয়ে যায় । এই ফুল হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে ভয় করে তোলা তো দূরের কথা । মনে হয় পাহাড়ের জিনিস পাহাড়েই থাক । পথে দেখা যায় ধবধবে সাদা ঘোড়ার বাচ্চা মাটিতে গড়িয়ে খেলা করছে । বোধ হয় এরা পক্ষীরাজের ছানা । কোথাও কোনও আওয়াজ নেই । ঘোড়ার গলার ঘণ্টার টুং টুং ছাড়া, মাঝে মাঝে ভেসে আসে মেয়ে গলার গান দূরের পাহাড় থেকে ।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে গরুড়চটির বাঁক নিলেই দূরে কেদারনাথের মন্দির দেখা যায় । বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বাহন নাদেশ্বর । পাণ্ডবদের চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্তকাশী থেকে শিব এখানে মোষের ছদ্মবেশ ধরে লুকিয়ে পড়েন । ভীম তাঁর চাতুরি ধরতে পেরে নিজেকে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ান যাতে সব মোষকে তাঁর পায়ের ফাঁক দিয়ে যেতে হয় । সব মোষই পার হল, একটি ছাড়া । সেই মোষ লুকোবার জন্য পাতালে ঢুকতে গেলে ভীম তার পিছনের পা দুটি চেপে ধরেন । তখন তাঁদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব পাণ্ডবদের জ্ঞাতি-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত করেন । ১১,৬৭৩ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই । হীরের নাকছাবি শোভিত গুজরাটি গিন্নি এবং রাজস্থান গুজরাটের গ্রামের দরিদ্র নারীপুরুষ সবাই লিঙ্গ স্পর্শ করে জীবন ধন্য করে । পথশ্রমের কষ্ট তাদের সার্থক হয় ।

কেদারে রাত্রিবাস অনন্য অভিজ্ঞতা । গাড়োয়ালে লজ ও হোটেল হিমলোক মন্দিরের ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে অবস্থিত । মধ্যরাতে হাড়-কাঁপানো শীতকে জয় করে বাইরে এসে দাঁড়ালে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া মন্দির ও পরিবেশ মনে হয় এ জগতের নয় । এই সৌন্দর্য রমণীয় নয় । কিন্তু নৈঃশব্দ্যে ও গাম্ভীর্যে অসাধারণ । পাহাড়ের সূর্য লুকোচুরি খেলতে ওস্তাদ । চোখে চাঁদ নিয়ে আমরা শুতে গেলাম । সকালে উঠে দেখি মুষলধারায় বৃষ্টি । তারই মাঝখানে ছাতায় প্লাস্টিকে নিজেকে মুড়ে নিচে নামা খুবই কষ্টকর । ভিজে কাক হয়ে বাধ্য হয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম একটি ছোট চায়ের দোকানে । আমাদের সঙ্গী হল বিরাটকায় পাহাড়ি কুকুর । এদের আকারের সঙ্গে প্রকৃতির কোনও মিল নেই-এত নিরীহ আর শান্ত ।

বৃষ্টির মধ্যেই আমরা রওনা হলাম । রাত কাটবে শোনপ্রয়াগে তাঁবুতে মন্দাকিনীর ধারে । সেখানে মস্তবড় রান্নাঘরের উনুনের গরমের আরামে দেখা পাওয়া গেল বাংলা বলা এক রাঁধুনির সঙ্গে । সে চমৎকার খিচুড়ি রাঁধতে জানে ।

সকালে আবার চারদিক রোদে ঝলমল। বৃষ্টির কোনও চিহ্নই নেই। এবার যাত্রাপথ বদ্রীনাথের দ্বারে। পথে পড়ল কর্ণপ্রয়াগ। এখানেই সূর্যদেব কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল দান করেছিলেন। দুই নদীর সঙ্গমস্থল কর্ণপ্রয়াগ (২,২০০ ফুট)। পিণ্ডারগঙ্গা ও অলকানন্দা নদীর এখানে ভয়ালরূপ। বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে সগর্জনে ধেয়ে চলেছে। ফেরার পথে এখানেই নদীর ধারে বাংলোয় রাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। আরেকটু উঁচুতে (২,৫০০ ফুট) নন্দপ্রয়াগ সমাহিত সুন্দর। এক সাধক নন্দবাবার নামে জায়গার নাম।

বদ্রীনাথের ঠিক আগে রাতের জন্য আমরা থামলাম যোশিমঠে। ৫,০০০ ফুট উঁচুতে এক বটবৃক্ষের নিচে বসে আদি শংকরাচার্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বৃক্ষটিকে স্থানীয় মানুষ কল্পবৃক্ষ বলে। শীতে যখন বদ্রীনাথে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তখন স্থানীয় নরসিং মন্দিরে তাঁর ঠাঁই হয়। এখান থেকে রাস্তা চলে গেছে গোম কুণ্ডের দিকে। এখানেও দুটি নদী বিষ্ণু ও ধৌলিগঙ্গা অলকানন্দায় আত্মসমর্পণ করে। পথে পড়ে পাণ্ডুকেশ্বর, যেখানে পাণ্ডু তাঁর জীবনের শেষদিনগুলি কাটিয়েছিলেন। এই পথ ধরেই পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হয়েছিলেন।

বদ্রীনাথের উচ্চতা ১০,৪০০ ফুট। মন্দিরটি পথের যেখান থেকে দেখা যায় সেই জায়গাটিকে বলে দেওদেখনি। খাঁটি ভক্ত যিনি তিনি এখানে নেমে পড়ে বাকি পথটুকু হেঁটে যান। অবশ্য ৩০/৩৫ বছর আগে পুরো পথই হেঁটে উঠতে হত। সেই পাকদণ্ডীটি এখনও আছে। হরিদ্বার থেকে কেদারের দূরত্ব ছিল ২৪৮ কিলোমিটার এবং বদ্রীনাথের ৩৩২ কিলোমিটার। বদ্রীনাথের পথের দুপাশে সাদা না গলা বরফের টুকরোগুলিকে Ice Bridge বলা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে 'বুঢ়া বরফ'। দুপাশের ধস তাদের বর্ণনায় 'পাহাড় গিরা হায়'। নরনারায়ণ পর্বতের গায়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আদি শংকরাচার্য। বিষ্ণু ধ্যানস্থ হলে লক্ষ্মী কুল বনের (বদ্রী) রূপ ধরে তাঁকে আড়াল করেন। বদ্রীনাথেই আছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানে স্নান করতেই হয়।

আমাদের সাতদিন প্রায় শেষ হবার মুখে। এখানেও গাড়োয়ালের চমৎকার লজ ও হোটেল আছে-দেবলোক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরের দিন সকালে রওনা হয়ে আমরা দুপুর নাগাদ যখন যোশিমঠে থামলাম এক পাহাড়ি শালওলা আমার পরনে তিব্বতি বাকু দেখে ছলছল চোখে তার ছেড়ে আসা দেশের কথা বলা ও আমায় অবিশ্বাস্য কম দামে শাল বিক্রি করল। যোশিমঠের এক বাঁক থেকে শেষবারের মতো হিমালয় দেখে আমরা কর্ণপ্রয়াগ রওনা হলাম। হিমালয় সবারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। ভক্ত পায় তার দেবতাকে, ভ্রমণপিয়াসী উপভোগ করে নতুন জায়গা আর প্রকৃতিপ্রেমী হারিয়ে ফেলে নিজেকে। এত প্রবাদ কিংবদন্তী গল্পকথা আর অন্য কোনও স্থানকে এইভাবে জড়িয়ে নেই। আমাদের

মহাকাব্য জীবন্ত হয়ে ওঠে । পৌরাণিক চরিত্রও রক্তমাংসের রূপ পায় । তাঁদের কথা স্থানীয় মানুষ এমনভাবে বলে যেন তাদের সঙ্গে ওদের ওঠাবসা আছে । বিকেলবেলায় মুনি কি রেতিতে যখন এলাম মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল । আবার কি হিমালয় ডাকবে?

ভ্রমণ শারদীয় সংকলন, ১৯৯২

তেহরানি হয়রানি

অমিতাভ চৌধুরি

আগে বলতুম পারস্য, এখন বলি ইরান। সাইরাস, দারায়ুসের রাজত্ব ছিল পারস-এ। তাই থেকে পারস্য। তারপর ইরান। ইরানি তরুণীর চোখে বাঁকা বিদ্যুতের কথা আমরা অনেকদিন থেকেই বাংলা কবিতা মারফত জানি। ওদেশের গোলাপ ফুল তো আমাদের অতি প্রিয়।

সেই পারস্য বা ইরানে আমি গিয়েছিলাম ১৯৭৫ সালে। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। শেষ রাত্তিরে দিল্লি থেকে প্লেনে চড়ে ভোরে ভোরে তেহরান বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলাম। কাছেই পাহাড় আল-বুরুজ। তার ফাঁক দিয়ে সেদিন সকালবেলা লাল সুরুজের আবির্ভাব অসাধারণ লেগেছিল।

ইরান দেশের কাজি-র গান যতই আমরা গাই না কেন, ইরানি বুলবুল বলে কারও গানের সমঝদারি যতই করি না কেন, ওই দেশটি সম্পর্কে আমাদের যতই কৌতূহল থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু দেশটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, জানি শুধু ইরানের শাহ, খোমেইনি মোসাদেক প্রভৃতি রাষ্ট্র নেতাদের নাম। না, অজান্তে আমরা কথ্য বাংলায় ব্যবহার করি অসংখ্য ফার্সি শব্দ। প্রমথ চৌধুরী মশাই বলেছিলেন, আরবি-ফার্সি বাদ দিলে বাংলা বলে কোনও ভাষাই থাকে না। ঠিক কথা। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'অতএব কহি ভাষা, যাবনী মিশাল।' এই যাবনী মিশাল না হলে আমাদের কথাবার্তা হত যাচ্ছেতাই। বিশেষ করে ফার্সি যাঁদের মুখের ভাষা, তাঁরা তো আমাদের দেশে রাজত্ব করেছে সাতশো বছর।

সে যাক গে, এবার স্রেফ ফার্সি মুলুক অর্থাৎ ইরান দেশে হাজির হই। বহু বছর আগে ইরান থেকে এসেছিলেন বহু লোক ওই খাইবার-পাস দিয়ে। তৈরি হল ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা গোষ্ঠী। তারপর নবাবের পর নবাব বাদশাহের পর বাদশাহ। দিল্লির তখত তাঁদের হল একচেটিয়া। আমাদের দেশে সরকারি ভাষা হয়ে গেল ফার্সি। নাদির শাহ জবরদস্তি করে নিয়ে গেলেন দিল্লির ময়ূর সিংহাসন। -দিল্লি থেকে তেহরান যেতে যেতে এইসব নানা চিন্তা আমার মাথায় ভিড় করে আসছিল।

আমি চলেছি ইউ এন ও আয়োজিত হ্যাবিটাট কনফারেন্সে। আমাদের দলনেতা অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরি। আর আছেন জগমোহন, জগন্নাথন, আশিস বসু প্রভৃতি নামীদামি লোক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিই আছেন। এমনকী পাপুয়া-নিউগিনি থেকেও। পাপুয়ার প্রতিনিধি চেনে আমাদের শান্তিনিকেতনের বন্ধু, পাপুয়ায় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তীকে। আর কেনিয়া থেকে যিনি এসেছেন, তাঁর চেনা আমার শান্তিনিকেতনের রুমমেট জোমো কোনিয়াট্টার সচিব টমাস ওকেলোকে। আমি কুচকুচে কালো ওকেলোকে ডাকতাম ও-কেলো। ওকেলো ভালো ফুটবল খেলত খালি পায়ে। আর একজন শান্তিনিকেতনের আফ্রিকান ছাত্র এডওয়ার্ড কুফুর এখন ঘানার প্রেসিডেন্ট।

সে যাই হোক, তেহরান এয়ারপোর্টে ভোরবেলা নেমে আমার চক্ষু চড়কগাছ। রোদে আকাশ তামাটে, সবুজ আর নীলের দেখা মেলে কদাচিৎ। গায়ে লাগা আল-বুরুজ পাহাড়টাও তাই। কাস্টমস ভিসা পাসপোর্টের ঝামেলা চুকিয়ে সামনে এগোতেই দেখি ওয়াকি-টকি হাতে বেশকিছু ইরানি তরুণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বুকে লেবেল আঁটা-'হ্যাবিটাট সেভেন্টি ফাইভ।' ইংরিজি আর ফার্সিতে। 'হ্যাবিটাট' কথাটা লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কথা। অর্থাৎ 'আবাসন' নিয়ে কথাবার্তা হবে এই আলোচনাচক্রে।

একটু এগিয়ে জনৈক ইরানি তরুণকে পাকড়াও করতেই সে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভাঙা ইংরিজিতে বলল-'ও, আপনি চউধারি, আপনার ব্যবস্থা হয়েছে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, ওই লিমুজিন নিয়ে চলে যান।' আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, নামের তালিকায় 'চৌধুরির' আগে 'এ' নেই, আছে 'বি ডি এন'। আমার সন্দেহ হল, কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে ঠেলে পাঠাবেই। যত বলি আমার নাম এ চৌধুরি, ভদ্রলোক ততই বলেন-দ্যাটস অল রাইট দ্যাটস অল রাইট। কিন্তু আমার সংশয় যায় না। গাইডটি যে আমাকে বি ডি নাগ চৌধুরী ভেবেছে, তাতে ভুল নেই। তাছাড়া ওরা না জানে ইংরিজি, আমি না জানি ফার্সি। কাঁহাতক আর হাত নেড়ে তর্ক করা যায়।

অগত্যা লিমুজিন চেপে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসে হাজির, পেল্লাই হোটেল। তেহরানের সেরা। যেমন হাঁকডাক, তেমনই জাঁকজমক। এখানে থিতু হলে থাকতেই লাগবে রোজ আটচল্লিশ মার্কিন ডলার। আর আমি ইউ এন কর্তাদের কাছে পাব রোজ সাঁইত্রিশ ডলার। কর্তাদের তো পাত্তাই নেই। ভয়ে ভয়ে হোটেলে ঢুকলুম। আমার জন্য আলাদা একটি ঘরেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু সইসাবুদ করেও আমি ঘরে যাই না।

লাউঞ্জে বসে এদিক ওদিক তাকাই, আর ফোন করার চেষ্টা করি নিমন্ত্রণকর্তা কাউকে, কিন্তু টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে নম্বর বের করা কি সোজা কাজ -সব যে ফার্সিতে লেখা।

রিসেপশন কাউন্টারে ইংরিজি জানা একজনের সঙ্গে ভাব জমালুম। মাই ডিয়ার লোক, কিন্তু আমি যত বলি, আমাকে বরাদ্দ ঘরের রোজ ভাড়া কত, ততই সে জানতে চায় ভারতে 'ব্রাহ্মণ' কাদের বলে? বললুম, তোমাদের পূর্বপুরুষদের। এই ইরান থেকে যেসব আগন্তুক ভারতে গিয়ে আস্তানা গাড়ে, ভাষাও অনেকটা নিয়ে যায়, তারাই নিজেদের উঁচু জাত বলে মনে করত নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দিত। উত্তর ভারতীয়র ভাষা ইন্দো-ইরানিয়ান গ্রুপের।

সে যাক গে, ওদিকে আমি যে টাকার দুঃখে মরি। আমি পাব কুললে সাঁইত্রিশ ডলার, তাই দিয়ে থাকা খাওয়া ঘোরাফেরা সব কিছু। এই হোটেলে থাকতে হলে কমসে কম ষাট ডলার চাই। আমি রিসেপশন কাউন্টারের সেই ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বললুম। সে বললে, 'আর, কোথায় যাবে। এই নাও চাবি, তোমার জন্য আটতলার এই ঘরটি বরাদ্দ করলুম। অনেক সস্তা, আর শোনো, রাতে তোমার ঘরে খুবসুরৎ মেয়ে পাঠিয়ে দেব। বিউটিফুল গার্লস! ওই যে লাউঞ্জের কোণে কফি পার্লার দেখছ, সেখানে সন্ধেবেলা যে-কটি মেয়ে এসে বসে সবাই হোটেল-অতিথিদের সন্ধ্যা-সঙ্গিনী হতে চায়, তোমার জন্য একটা পাঠিয়ে দেব।'

মাথা খারাপ! আমি মরছি ডলারের চিন্তায়, আর উনি দেখাচ্ছেন মেয়েমানুষ। কিন্তু এদিকে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। ইনফরমেশন বিভাগের কেউ জানে না ইংরিজি, আমি জানি না ফার্সি, কথা আর এগোয় না, শেষমেষ 'রেগেমেগে' স্যুটকেস হাতে ঢুকে পড়লুম আটতলার সেই ঘরে। চমৎকার ঘর। জানলা দিয়ে তেহরান শহরটা দেখা যায়। কী চমৎকারই না লাগছিল। স্নান করলুম, জামাকাপড় পাল্টালুম, ছেলেকে একখানি চিঠি লিখলুম এবং তারপর ফিটফাট সেজে আবার নামলুম নিচে, রিসেপশন কাউন্টারে।

কিঞ্চিৎ ইংরিজি-জানা সেই ভদ্রলোককে বললুম, ভাইরে, ফোনে হ্যাবিটাটের কাউকে ধরে দিন। তিনি তখনও রঙ্গরসে ভরপুর। বললেন, 'দূর, কোথায় যাবে, তোমাকে আরও পাঁচ ডলার কনসেশন করে দিচ্ছি, এখানেই রাত কাটাও-'বিউটিফুল নাইট, বিউটিফুল গার্লস।'

নিকুচি করেছে বিউটিফুল গার্লস, হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমার কাছে ইউনাইটেড নেশনস থেকে পাঠানো নিমন্ত্রণপত্র রয়েছে। দেখি তো, তাতে ফোন নম্বর আছে কিনা, ঠিক তাই-আছে, আছে আছে-হ্যাবিটাট কনফারেন্সের পি আর ও-র নাম ও তেহরানের ফোন নম্বর আছে। এবং কী বরাত আমার, শেষমেষ তাঁকে হিলটন হোটেলে

পেয়ে গেলুম। ওপার থেকে তাঁর মার্কিনি গলা-মিস্টার চৌধুরি, হোয়্যার আর ইউ? আপনার জন্য হোটেল কমোডোরে ব্যবস্থা করা হয়েছে, ওখান থেকেই বলছেন তো?

আমি আমার অসহায় অবস্থা জানাতেই তিনি চিৎকার পাড়লেন-ননসেন্স! দ্যাট ইরানিয়ান ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট ইজ রিয়েলি ওয়ার্থলেস। প্লিজ মুভ টু হোটেল কমোডোর, দ্য রুম ইন ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইজ বুকড ফর মিস্টার নাগচৌধুরী। হি ইজ কামিং বাই টুমোরোজ ফ্লাইট। ও কে-বাই বাই।'

ব্যস, আমাকে আর পায় কে। রিসিভার রেখে উঠে গেলাম আটতলার সেই ঘরে। সেখান থেকে মালপত্র নামিয়ে এনে কাউন্টারে বললুম-ভাইরে, তোমাদের ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের জন্য আমার এই ফ্যাসাদ। এবার আমাকে বাঁচাও। আমি তো আধঘণ্টাটাক হোটেলের ঘরে ছিলুম। কোনও চার্জ টার্জ করো না। আর হোটেল কমোডোরে কী করে যেতে হয়, তার রাস্তাটা বাৎলে দাও।

ভদ্রলোক, সত্যি ভদ্রলোক। সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে ফার্সিতে কী সব কথাবার্তা বলে আমাকে ওই টাকার দায় থেকে রেহাই দিলেন এবং হোটেল কমোডোরের ঠিকানা দিলেন। ভাঙা ইংরিজিতে জানালেন, আমাকে যেতে হবে তখৎ-ই-জামসিদ অ্যাভেনিউয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হলুদ রঙের ট্যাক্সি দেখতে পেলেই হাত দেখাবেন, তুলে নিয়ে যাবে।

তাই হল, আমি শত কোটি সালাম জানিয়ে স্যুটকেস হাতে সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম এবং একটি হলুদ ট্যাক্সি ধরে চলে এলুম সোজা হোটেল কমোডোরে। ফোর স্টার হোটেল। সেখানে এক ঘরে ঠাঁই হয়েছে আমার আর ব্যাংককের প্রতিনিধি অনুস্মরণ নামে এক থাই যুবকের। বাঁচলুম।

তেহরান ইদানীং নিউ ইয়র্ক, টোকিওকে টেক্কা দিয়েছে। আমাদের দৈনিক বরাদ্দ নিউ ইয়র্কের হিসেবে। তেহরান নিউ ইয়র্কের বাড়া, তা ছাড়া জিনিসপত্রের দামও বাড়া। আর শহর? তুলনা নেই। আমার আজ কাজ নেই তেমন। তাই লাগোয়া এক ছোট্ট রেস্তোরাঁয় ভেড়ার মাংসের ঝোল আর ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। চমৎকার রাস্তা। এবং এত বিশাল রাস্তা। রাজপথ না বলে বলা উচিত মহারাজপথ। নাকি শাহী রাস্তা?

রাস্তায় আমার সঙ্গী অনুস্মরণ। দেখি প্রথমে দোকানের সারি, আলো ছাড়াই ঝলমল করছে। পসরা আর সুন্দরী তরুণীদের জন্য। দোকানের গায়ে ফুটপাত। তারপর গাছের সারি। গায়ে লাগা জলের ধারা। সরু নালা বয়ে চলে যাচ্ছে। আবার গাছের সারি। আবার ফুটপাত। আবার গাছের সারি। তারপর দশ লেনের বিরাট ঝকঝকে বড় রাস্তা।

অন্যদিকেও সেই একইভাবে । দোকান-পাট, ফুটপাত, গাছ নালা গাছ ফুটপাত আর গাছ ইত্যাদি । নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন, প্যারিস বার্লিন লন্ডন রোম আগে দেখেছি, কিন্তু এমন নয়ন মনোহর রাস্তা আর কোথাও দেখিনি ।

ঘুরতে ঘুরতে যাই তেহরান জাদুঘরে । শাহ বাড়ির মণিমাণিক্য দেখে আমার চোখ ঝলসাল, টাওয়ার অব লন্ডনে যেমন বার্কিংহাম প্যালেসের সব রত্ন থাকে সাজানো, তেমনই এই জাদুঘরে ইরানি বাদশাহের যাবতীয় ধনরত্ন সাজানো রয়েছে । লন্ডনে যেমন কোহিনূর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তেমনই তেহরানের এই জাদুঘরে নয়ন সার্থক করলুম ময়ূর সিংহাসন দেখে । নাদির শাহর ভারত থেকে লুঠ করে আনা এই রত্নখচিত অপরূপ সিংহাসনটি ঝলমল করছে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর । আমার সঙ্গী ছিল সৈয়দ মুজতবা আলির ভাইপো সৈয়দ মুস্তাফা আলি, যার ডাকনাম খসরু, ‘খসরু বাবাজীবনকে’ লেখা মুজতবা আলির একটি দীর্ঘ কবিতা পড়ে আনন্দ পেয়েছিলাম, এবার তার সঙ্গ পেয়ে আরও ভালো লাগল । চমৎকার ভদ্রলোক । সে ছিল ম্যানিলায় প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার বড় কর্তা । বছর কয়েক হল সে আর আমাদের মধ্যে নেই । আমার সঙ্গী সেদিন আরেকজন ছিলেন । তিনি হলেন রাওয়ালপিন্ডির ‘ডন’ কাগজের চিফ মনসুরি । তিনি আমার বয়সী । আগে ছিলেন জাকির হোসেন প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিলিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র । কী চমৎকার বন্ধু-বৎসল লোক । পাকিস্তান থেকে এসেছেন আরও দুজন । অতি সজ্জন ওঁরা । বাংলাদেশ থেকে তিনজন । তাছাড়া পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে আরও অনেকে । দিল্লি থেকে এসেছেন আরও একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি-অধ্যাপক আশিস বসু; শিলচরের বিখ্যাত চন্দ-ভ্রাতাদের ভাগ্নে । আমি তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ । বেস্ট স্পিকার । আর ভালো লাগল জোসো কেনিয়াট্টার জামাই, কেনিয়ার দলনেতার-নামটা ভুলে গেছি-বক্তৃতা ।

আরেকটি জায়গায় গিয়েছিলাম বেড়াতে । তোরণের পর তোরণ সেখানে । লিফট দিয়ে তরতর ওপরে ওঠা যায় । সেখানে-সেই বিরাট প্রদর্শশালায়-ইরানের রাজবংশের কীর্তিকাহিনী চলচ্চিত্রায়িত । সাইরাস ও দারায়ুস থেকে বর্তমান আর্যমিহির শাহেন শাহ পর্যন্ত । আশ্চর্য, প্রাচীন পারস সাম্রাজ্যের সঙ্গে বর্তমান অধীশ্বরের কী সম্পর্ক । সাধারণ এক সেনার পুত্র, দৈবক্রমে বর্তমানে রাজা, অথচ দেখানো হয়েছে প্রাচীন পারস সাম্রাজ্যের রাজা বাদশাহের সঙ্গে বর্তমান শাহ-র নাড়ির সম্পর্ক, ইতিহাসের বিকৃতি আর কাকে বলে!

বিদেশে গেলেই আমার গণ্ডগোল বাধে খাওয়াদাওয়া নিয়ে । আগেই বলেছি, তেহরানে সে গণ্ডগোল নেই । গরম ভাত, ভেড়ার মাংস আর চাটনি-আর কী চাই । আর ইরানের হাউজিং মিনিস্টার যেদিন পার্টি দিলেন, সেদিন মেনু দেখে আমি মূর্ছা যাই আর কী,

আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত রাম শাঠেও শামিয়ানা টাঙিয়ে উত্তম একটি পার্টি দিয়েছিলেন ।

তবে আমি বিপদে পড়েছিলাম হিলটন হোটেলে, কলম্বিয়ার কৃষিমন্ত্রী মিঃ পেনেলোজার লাঞ্চ পার্টিতে । চমৎকার পানাহারের ব্যবস্থা-বেস্ট ওয়াইন, বেস্ট ফুড । খেতে খেতে আমার ছোট বাথরুম পেল, আমি ছুটলাম লাগোয়া বাথরুমে । কাজ সেরে বেরোতে যাব, কিন্তু ভীষণ বিপদ, দরজা আর খোলে না । এটা টিপি, ওটা টানি, কিন্তু দরজা নড়েও না, চড়েও না । কী করি । দরজার খিল কোনটা? উঁহু, কিছুতেই খোলে না । ইয়া আল্লা । আমি কি এই বাথরুম বা রেস্টরুমে বন্দী অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করব? আমার কালঘাম বেরোতে লাগল । সেকেন্ড যায়, মিনিট যায়, আমি তাহলে আর বেরোতে পারব না এই বন্ধকূপ থেকে? এই 'বন্ধকূপ হত্যা'র জন্য আমি নিজেই তাহলে দায়ী থাকব । শেষমেশ দরজার খিল ছেড়ে আমি কমোডের ওপর উঠে ছোট্ট জানলা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করলাম । ওমা জানলার বাইরে টুকরো টুকরো কাচের ছড়াছড়ি । না, ওখান দিয়ে লাফাতে পারব না । কী করি-চিৎকার পাড়লেও বাইরে থেকে কেউ শুনবে না । যদি অন্য কেউ এই ছোট্ট ঘরে আসার তাগিদ অনুভব করে, তাহলে বেঁচে যেতেও পারি । শেষমেশ মরিয়া হয়ে আবার ছিটকিনিতে জোরে টান দিলাম এবং কী আশ্চর্য, দরজা এবার খুলে গেল, আমি তাহলে বেঁচে গেলাম । বেরোলাম । এই দশ মিনিট মনে হল দশঘণ্টা, নাকি দশদিন । বেরিয়ে কাউকে কিছু বললাম না, আবার শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলাম ।

তেহরান থেকে কাবুল । দেখলাম সৈয়দ মুজতবা আলির 'দেশে বিদেশে' পড়া বিখ্যাত বাজার । দেখলাম বাবরের সমাধি এবং আধঘণ্টার প্লেন জার্নিতে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি-যা আজ আর নেই । কিন্তু সে অন্য কাহিনী । কাবুল থেকে দিল্লি । দিল্লি থেকে কলকাতা । আবার সেই পরিচিত পরিবেশ । আঃ, কী আরাম!

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

শোনপুরের মেলায়

বরুণ দত্ত

একাই চলেছি শোনপুরের মেলায় । শীতের রাতের ট্রেন । কম্পার্টমেন্টের অনেকই শুয়ে পড়েছেন । কেউ কেউ শোবার ব্যবস্থা করছেন । শুনেছি বহু মানুষ এই মেলায় যান । তাই সারা কম্পার্টমেন্টটা খুঁজে এলাম যদি একজন বাঙালি পাই । নিরাশ হয়ে এসে বসলাম নিজের জায়গায় ।

এই মেলায় এমন সব জিনিস কেনাবেচা হয় শুনেছি যা অন্য কোনও মেলায় হয় না! এই মেলায় কোটি টাকার ব্যবসা হয় । শুনেছি হাতি, ঘোড়া, উট, গরু ইত্যাদির সঙ্গে মানুষও নাকি বিক্রি হয়!

দশ-এগারো বছর আগে একজন নামকরা সাংবাদিক এই মেলা থেকেই তো একটি মেয়ে কিনে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন । পার্লামেন্টেও এ বিষয়ে কথা হয়েছে, তর্ক উঠেছে । অবশ্য পরিণামে ওই সাংবাদিক ভদ্রলোককে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল । এবং হুবহু এই ঘটনা নিয়েই নাটক ও সিনেমাও হয়েছে ।

ভোর হয়ে আসছে । আজ রাস পূর্ণিমা । ভোরের আকাশে পাখা মেলেছে অসংখ্য পাখি । সূর্য উঠছে । মাঠে মাঠে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে এই সকালেই । মাঠে মাঠে চলছে ধান ঝাড়াই । আবার বাঁকে করে, গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে পাকা ধানের বোঝা চলেছে গ্রামের পথে । নবান্নের মাসের পূর্ণতা চারদিকে ।

রাতে ট্রেন লেট চলছিল, এখন স্পীড ভালোই । হাতিয়ারার ঠিক পরেই পেলাম লোহার বিশাল রেলব্রিজ । প্রায় এক মাইল লম্বা । তলায় কী নদী? সহযাত্রী বৃদ্ধ বললেন- গঙ্গা আর নারায়ণীর সঙ্গম ।

সঙ্গম মানেই তো পুণ্যক্ষেত্র, আজ পুণ্যতিথিও বটে । সুতরাং অসংখ্য মানুষ পুণ্যস্নান করছে । বালির চড়ায় চলছে চড়ুইভাতির আয়োজন । মানুষ পায়ে পায়ে পারাপার হচ্ছে । বেশিটাই বালির চড়া ।

ব্রিজ পেরিয়েই রাজেন্দ্রপুল । সিমারিয়া, বারাউনি পেরলাম । ডুবায় বৈশালী সুপারফাস্ট আমাদের থামিয়ে এগিয়ে গেল দুরন্ত গতিতে ।

একসময় লক্ষ লোকের ভিড়ে পূর্ণ শোনপুর স্টেশনে নামলাম। ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। মানুষ আর মানুষ। ধুলো-শব্দ-ব্যস্ততা।

বৃথাই এই ভিড় ঠেলে বোঝা বয়ে বেড়ালাম। ভিড় ঠেলে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে হচ্ছে। মাইল দেড়েক অযথা হয়রানি হল।

শোনপুর স্টেশনের আগে অন্তত মাইল দুয়েক আগে থেকে চোখে পড়েছে মেলার বিশাল ব্যাপ্তি।

আমাকে দেখে মণি মহারাজজির (স্বামী সত্যেশ্বরানন্দ) কী আন্তরিক আপ্যায়ন! সন্ন্যাসীদের কাছে এমন ব্যবহার পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে মূক হতে হয়। এসেছি মেলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের চিকিৎসাকেন্দ্রে।

স্বামীজি তাঁর সেবক তপন নামে এক যুবককে বললেন রিকশার জন্য। আর বললেন, রিকশা তো এতদূরে আসতে পারবে না, আমবাগানের মুখে রেখো। আর এঁকে নিয়ে গিয়ে স্নানাহারের ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি। তারপর একটু বিশ্রাম করেই নিয়ে চলে আসবে এখানে। অভিজিৎকে বলে রেখেছি ওকে মেলাটা ঘুরিয়ে দেখাবে।

মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা ধরে রিকশা ছুটে চলেছে। ঘোড়াপট্টি, সরকারি কিছু অফিস-কাছারির বন্ধ বাড়ি, মেলার জন্য বসানো বনদপ্তর, মেলাদপ্তর, ভলান্টিয়ার ও পুলিশদের বহু টেন্ট-বিশাল বিশাল আমগাছের ছায়ায় ছবির মতো লাগছে টেন্টগুলোর রংবাহার।

স্বামীজির আশ্রয়ে পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্নানাহার শেষ করে বেরিয়ে পরলাম। হাঁটাপথে পৌঁছলাম স্বামীজির দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রে। সময়মতোই অভিজিৎ এল আমার জন্য, সঙ্গে ওর বন্ধু অবোধ গুপ্তা। পরিচয়পর্ব শেষে আমরা মিশে গেলাম মেলার ভিড়ে।

রাস্তার দুপাশে অসংখ্য দোকানপাট। পুলিশ ভলান্টিয়াররা খুবই ব্যস্ত ভিড় সামলাতে। খড়ের দোকান বোধহয় কয়েক একর জুড়ে। সেইসঙ্গে ভুষি, খইল, গুড় আর মাটির বিশাল বিশাল ডাবা-যাতে গরু-মোষকে জাবনা দেওয়া হয়। মাটির হাঁড়ি, কলসি, গ্লাস, থালা, হাতা ইত্যাদিরও প্রচুর দোকান। গরিব মানুষরা মেলায় এসব কিনেই সাময়িক সংসার সামলাচ্ছে। এরপরেই ছাতু, ছোলা, গুড়, চিঁড়ে, দইয়ের দোকান। এবার গরু, বাছুর, মোষ, ছাগল, শুয়োর, মুরগি, হাঁসের বাজার। গন্ধে টেকা দায়। বাঁদিকে পাঞ্জাবি গরুর বাজার। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনই গরু-বাছুরগুলোর চেহারা-চোখ ফেরানো যায় না।

হাতিবাজার দুটি-সওদাগরি আর জমিদারি। প্রথম বাজারের হাতি ভারি কাজের জন্য, দ্বিতীয়টি থেকে হাতি খরিদ করেন সম্পন্ন গৃহস্থ বা জমিদার শ্রেণীরা। দুই বাজারেই হাতি

এসেছে প্রচুর। একটিও শিশু হাতির দর্শন পেলাম না।

এরপর মিনাবাজার, কালীমন্দির, কালীঘাট (মন্দিরসংলগ্ন ঘাট) ঘুরে ঘুরে এসে পৌঁছলাম হরিহরনাথজির মন্দিরের সামনে। আটকে পড়েছি পুলিশের দড়ির ব্যারিকেডে।

তপনকে সঙ্গে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু স্বামীজিই বলেছিলেন 'আমরা এখানে এসেই মন্দির দর্শন ও মেলা দেখা সেরে নিয়েছি।' সুতরাং আর বলতে পারিনি। অবিবাহিত, সহজ, আন্তরিক যুবক তপন আশ্রমের কাজে সবসময়েই এক পায়ে খাড়া। তাই স্বামীজির খুবই স্নেহের পাত্র।

লক্ষ মানুষের ভিড়, মাইকের বিভিন্ন বিচিত্র চিৎকার, মানুষের আনন্দ-বিষাদ, লাভ-লোকসানের হিসেব দেখতে দেখতে ভুলে গেলাম তপনের কথা। কি বিশাল আয়তন মেলার!

এতক্ষণ আটকে থেকে অভিজিৎ বলল, এভাবে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে চলুন আমরা মেলার আরও কিছুটা দেখে নিই, ভিড় একটু কমুক।

আমার সামনে অভিজিৎ, পিছনে অবোধ। পুরনো রেলব্রিজের তলা দিয়ে গঙ্গার পার ধরে মূল মেলার দিকে এগিয়ে চলেছি হাতিবাজার ডানদিকে ফেলে। মেলায় জলের ব্যবস্থা, ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার দেখার মতো। কিন্তু পয়ঃপ্রণালী এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। ধুলো, ধোঁয়া, অসংখ্য মানুষের মিলিত কোলাহল, মাইকের চিৎকারে, কারুর কথাই কেউ শুনতে পাচ্ছি না।

নাটক, পুতুলনাচ, বাঈনাচের আসর, এছাড়াও আছে নানারকম 'গানা'-'বাজনা'-র আসর। দরিদ্র, খঞ্জ, ভিখারি, লেংটিসর্বস্ব সাধুর যেন মিছিল এদিকটায়। সেইসঙ্গে জটলা। ফিসফাস কথা। চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভীতভাব। তবে কি...

আমার প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গীবন্ধুরা বলল, 'না, এখন আর ঠিক এমন কিছু হয় না। আগে হয়তো হত-' ওদের কথার সুরে যেন একটু ক্ষোভের প্রকাশ পেলাম।

রাস্তার দুপাশ জুড়ে ময়লা। অবোধ বলল-রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলুন, না হলে ময়লায় পা দিয়ে ফেলবেন।

আবার এক জায়গায় দেখলাম ওইরকমই জটলা। গরিব কটি ছেলেমেয়ে কিশোরী বসে আছে খড়ের বিছানায় খোলা আকাশের নিচে ঝোপের পাশে, সকলেরই ম্লানমুখ। সঙ্গের বয়স্ক মানুষরা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বাতচিত করছে। আমাকে শিশুদের দিকে এগোতে দেখেই সঙ্গী দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল-ও কিছু না, মেলা দেখতে আসা

দেহাতি মানুষ-হারিয়ে যাবার ভয়ে এক জায়গায় জড়সড় হয়ে রয়েছে। দেখছেন তো এই শীতেও কিছু নেই ওদের গায়ে! চলুন, আমরা এবার মন্দিরের দিকে যাই-সন্ধ্যাপুজো দেখা যাবে।

পা এগোতে চায় না তবু এদের কথায় এগিয়ে চললাম। অজানা থেকে গেল এই পর্বটা। ওরা আমাকে থামতে বা কৌতূহলী হতে দিল না। জিলাইবি পুরির দোকান থেকে দামি রেস্টুরেন্ট। শয়ে শয়ে দোকান-খুন্তি থেকে তরোয়াল, শাল-শাড়ি-কম্বল-রেডিমেড পোশাক। যাত্রা-থিয়েটারের রাজা-রানির রাজকীয় জরির পোশাক, বাঁশি থেকে মাদল, লোহার বেড়ি থেকে বর্শা, বল্লম, কাঠ আর স্টিলের আলমারি থেকে ভারি জমিদারি সিন্দুক। কাচের চুড়ি থেকে রুপো, ঝুটো থেকে খাঁটি মুক্তো, হজমি গুলি থেকে বাত-ভালো, রামায়ণ-মহাভারত থেকে কামশাস্ত্র শিক্ষা, পুজোর বিশাল বিশাল বাসনকোসন, পুজোর সামগ্রী, খাট-পালঙ্ক, ছাতা-ছড়ি-লাঠি। ভাত-মাছ-মাংস-রুটি-পরোটার দোকান। ভিড়ে ভিড়। ঠেলাঠেলি। তরুণী বধূকে মেলা দেখতে আনা অতিরিক্ত স্মার্ট যুবক, কোলে-কাঁখে-হাতে সন্তান নিয়ে হতদরিদ্র মা। পুলিশ ভলান্টিয়ারদের অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা। আবার পুলিশের দড়ির বেড়াজাল। এবার মন্দিরের বাঁদিকের সরু রাস্তাটুকু দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম মন্দির চত্বরে। এদিকে পুজোর ভোগ এবং ফুল, ধূপ, বাতি ইত্যাদির দোকান। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এত বড় মেলা আর আয়োজন যাকে নিয়ে সেই হরিহরনাথজির মন্দিরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আর আলোকসজ্জাও খুবই নগণ্য। আলো-ছায়া সমান সমান।

মাঝখানে মন্দির, মন্দিরের চারদিকে বাঁধানো উঠোন। উঠোনের চারদিক ঘিরেই মন্দির কমিটির একতলা বাড়ি, অতিথিশালা ইত্যাদি। একপাশে দোতলায় খানতিনেক ঘর-এগুলি মন্দিরের প্রধান মোহান্ত স্বামী অবোধ কিশোরজির গদি। উঠোনের একপাশে পুলিশ ক্যাম্প। উচ্চ পদাধিকারীরা এখন ক্যাম্পে আছেন। মন্দির-বাড়ির ছাদেও সর্বত্র পুলিশ পাহারা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন পুলিশেরই কোনও অনুষ্ঠানক্ষেত্র এটি।

অনুমতি নিয়ে ছাদে ওঠা গেল। মন্দিরের কারুকার্য স্থাপত্য আর পাঁচটা মন্দিরের মতো হলেও চূড়ার দিকটা প্রথম দর্শনে মসজিদের মতোই লাগছে। অবশ্য মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল, মঙ্গলঘট ধর্মধ্বজা ইত্যাদি দেখে সে ভ্রম দূর হয়। সুবেদার রাজা মান সিং একসময় ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরের সংস্কার করিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই কি মুসলিম স্থাপত্যরীতির কিছুটা প্রভাব পড়েছিল!

পরবর্তীকালে অবশ্য বিহারের এক ধনী জমিদার রাজা রামনারায়ণও মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছিলেন। এবং ইদানীংকালে বিড়লারাও অনেক কিছু করেছেন। তবু মন্দিরের আদলটি পূর্ণ হল না কেন!

কয়েকজন ভক্তপরিবৃত হয়ে মোহান্তজি কথাবার্তা বলছেন। দীর্ঘ ঋজু চেহারা, মাঝারি রং, সুন্দর শান্ত চোখ-মুখ। গায়ে খ্রিস্টান ফাদারের মতো আলখাল্লা-তবে ক্রিমরঙের। গলায় ঝুলছে ছোট রুদ্রাক্ষের মালা।

অভিজিতের কথায় মোহান্তজি সানন্দে রাজি হলেন আমাকে কিছুটা সময় দিতে। সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন ওঁর অতিথিশালায়। চায়ের ব্যবস্থা করলেন। হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলছেন। বেশ আধুনিক শিক্ষিত এবং খোলা মনের মানুষ।

মোহান্তজি বেশ আন্তরিকভাবে কথা বলছেন, প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন। বললেন, মেলা তো এখন পঁচিশ শতাংশ মাত্র বেঁচে আছে।

সবিস্ময়ে ভাবছি এই যদি মাত্র পঁচিশ ভাগ হয় তবে অতীতের সে সম্পূর্ণ মেলার বিস্তৃতি ও জাঁকজমক কেমন ছিল! অন্যান্য আড়ম্বর আয়োজনের সঙ্গে পরমাসুন্দরী সুকণ্ঠী বহু নামী বাঈজি যেমন আসত, তেমনই আসত রূপোপজীবিনীরা। তখনকার দিনের ধনী শৌখিন ব্যক্তিদের মধ্যে পড়ে যেত এইসব মেয়েদের নিয়ে প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতায় কখনও কখনও বহু প্রাণ, সম্পদ, আভিজাত্য জ্বলে পুড়ে যেত। যাইহোক, মোহান্তজির কাছ থেকে শোনপুরের মেলা তথা হরিহরনাথজির পৌরাণিক কাহিনী শুনতে চাইলাম। মোহান্তজি সানন্দেই শোনালেন যতটা সম্ভব।

পুরাণে হরিহরক্ষেত্রকে ‘মহাক্ষেত্র’ বলা হয়েছে, কারণ এখানে ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ হরি এবং হর (শিব)-এর মূর্তি বিরাজ করছে। হরি এবং হরের মিলনক্ষেত্র বলেই এই স্থানকে হরিহরক্ষেত্র বলা হয়।

শ্রীভগবানের লীলার সময় শ্রীহরি তাঁর গোধন নিয়ে এই পুণ্যক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্বর্গীয় মিলন হয়েছিল এই পরমস্থানে। আর হরি এবং হরকে তো সকল দেবতারই প্রয়োজন! সুতরাং, সকল দেবতার উপস্থিতিতে এস্থান দেবময় হয়ে উঠেছিল।

হরিহরনাথজির মন্দির ছাড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দির, শঙ্কর-উমার মন্দির ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হয়। পাশেই আছে চ্যবন কুণ্ড। মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম ছিল। পুরাণে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি বেদশিরাজি মহারাজ গঙ্গার তটে গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। মহর্ষির সে কঠিন তপস্যায় বজ্রধারী ইন্দ্রের আসনও টলে উঠেছিল। তাই মহর্ষির তপস্যা ভঙ্গের জন্য মঞ্জুঘোষ নামে এক পরমাসুন্দরী অপ্সরাকে নিয়োগ করেন ইন্দ্র। অপ্সরা নানাভাবে মহর্ষির তপস্যা বিনষ্ট করার চেষ্টায় বিফল হয়। মহর্ষি প্রথমে হিমালয়ের মতো স্থির অটল শান্ত

গম্ভীর থাকলেও অপ্সরার বারংবার চেষ্টায় অপ্সরা কিঞ্চিত সফল হয় তার উদ্দেশ্যে। মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হলে মহর্ষি অপ্সরাকে অভিশাপ দিলেন-'তুই তরঙ্গিনী হয়ে যা' বলে।

অপ্সরা মহর্ষির অগ্নিমূর্তি দর্শনে এবং অভিশাপ শ্রবণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মহর্ষি শেষপর্যন্ত কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, 'অভিশাপ তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তোমার তরঙ্গে বহু পবিত্রতার স্পর্শে তুমি ধন্য হবে। তোমার গর্ভে (নদীগর্ভে) ভগবান বিষ্ণুর নিবাস হবে। অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার রূপে ভগবান বিষ্ণু তোমার উদরে উৎপন্ন হবেন এবং এইভাবে তুমি 'শালিগ্রামী' নামে অভিহিত হবে।'

এই শালিগ্রামীর উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণ অংশ 'মহাক্ষেত্র' নামে খ্যাত। হরিহরনাথজির মন্দির-সন্নিকটেই শালিগ্রামী পতিতপাবনী গঙ্গায় মিলিত হয়েছেন, ফলে এই স্থান পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েছে।

বরাহক্ষেত্র, কুষাবর্ত আদিতীর্থ, কুম্ভক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, হরিহরক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে স্নান-দান পুজো-যজ্ঞ করলে পাপী পাপমুক্ত হয়। হরিহরক্ষেত্র যে সকলপাপহারী এবং সর্বমনস্কামনা পূর্ণকারী তার অপর কারণ এই মন্দিরের নিকটেই শালিগ্রামের অপরপাড়ে 'কোনহারা' ঘাট আছে। ওই স্থানে গজ এবং গ্রাহের (কুমির) প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। যে লড়াই থেকে গজকে রক্ষা করতে স্বয়ং বিষ্ণু এই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

গ্রাহা হলেন অভিশাপগ্রস্ত রাজা ইন্দ্রবদন। একদা শ্বেতদ্বীপের এক মনোরম সরোবরে শ্রীদেবলমুনি স্নানরত ছিলেন। তখন 'হা হা' নামে গন্ধর্ব ক্রীড়াচ্ছলে মুনির পদ বেষ্টন করে রাখে। মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বকে অভিশাপ দেন-'তুমি গ্রাহা (কুমির) হয়ে থাক।'

ওদিকে রাজা ইন্দ্রবদন তাঁর মন্ত্রীদের রাজ্যভার দিয়ে গিরিগুহায় মৌনভাবে তপস্যায় মগ্ন হন। ভক্তরাজ ঋষিশ্বর শ্রীঅগস্ত্যজি মহারাজকে কৃপা করার জন্য ওই স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু রাজা অতিথির যথাযোগ্য আপ্যায়নে বিফল হন। ফলে মুনি 'তু গজেন্দ্র হো যা' বলে অভিশাপ দিলেন। সেই থেকে তপোভ্রষ্ট রাজা গজেন্দ্ররূপে ওই মহাক্ষেত্রের অরণ্যে বিচরণ করতে থাকেন। একদিন গঙ্গা গণ্ডকের সঙ্গমে পরিবার সহ জলপান ও স্নান-উদ্দেশে গমন করলে গ্রাহারূপী গন্ধর্ব গজের একটি পা কামড়ে ধরে গভীর জলে নিয়ে যেতে থাকে। গজ জলের মধ্যে নিরুপায়। তথাপি কথিত আছে, গজ এবং গ্রাহার এই যুদ্ধ সহস্র বৎসরব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল।

গজের করুণ প্রার্থনায় ব্যাকুল শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁর সুখশয্যা ত্যাগ করে ছুটে আসেন গজকে রক্ষার জন্য। তিনি এমনই ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর দিকে

দৃষ্টিপাত করেননি, লক্ষ করেননি তাঁর পার্ষদদিগকেও । ভুলে গেছেন তাঁর ভূষণাদি সহ কৌস্তভমণি ধারণে । ওই নিরাভরণ অবস্থায় তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুতবেগে গজরাজের বিপদস্থলে উপনীত হন । এবং ক্ষণকালের মধ্যে গ্রাহার প্রাণনাশ করে গজকে বিপন্মুক্ত করেন । মন্দিরের বাঁদিকের দেওয়ালে এই চিত্র অঙ্কিত আছে । শ্রীহরির কৃপাধন্য 'কোনহারা' ঘাট তাই খুবই পবিত্র । এই ঘাটে স্নানান্তে গজ দর্শন করলে পুণ্যার্জন হয় । কোনহারা ঘাট নামকরণের কারণ হল-জলাশয়ে গ্রাহা দেবলমুনির শ্রীপদে দংশন করলে তিনি 'কৌন হ্যায় রে' বলে চিৎকার করে ওঠেন । তারই অপভ্রংশ এই 'কোনহারা' । ওই ঘাটের কাছেই রামঘাট । কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষণজি সহ মুনিবর বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে এই ঘাটে নৌকা বেঁধেছিলেন । এখান থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন বৈশালীনগরে । সেখানকার রাজা সুকৃতি এঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা করেছিলেন ।

এছাড়া বৌদ্ধসাহিত্যে আছে যে বুদ্ধদেব এখানে তাঁর চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছিলেন । ফলে ওই নির্দিষ্ট দিনে (সম্ভবত কার্তিক পূর্ণিমায়) বিশাল জনসমুদ্র এখানে মিলিত হত, ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বিশাল মেলা ও উৎসবের । আবার জৈনশাস্ত্রেও বর্ণনা আছে যে, জৈনধর্মের স্রষ্টা মহাবীর বর্ধমানের জন্মভূমিও ছিল বৈশালীতে । বৈশালীর কাছাকাছি হাজিপুরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে-সেই মন্দিরে তাঁর পদচিহ্ন পূজিত হয় । কথিত আছে যে এই পদচিহ্ন তাঁর জনকপুরে যাওয়ার সময়ের । মন্দিরের নাম রামচৌরা (রামচূড়া) । প্রতিবছর রামনবমীতে বিরাট মেলা হয় ।

এতক্ষণে আমাদের খেয়াল হল যে বহু মানুষও এই পুরাণ কাহিনী শুনছিলেন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে । আশাতীত অনেকটা সময়ই পেয়েছি আমরা । আমার পাশে পুলিশের এক বড়কর্তা দাঁড়িয়ে আছেন, অপেক্ষমাণ রয়েছেন মোহান্তজির ভক্তশিষ্যের দল । খুবই লজ্জিত হলাম এতটা সময় ওঁকে আমাদের সঙ্গে ব্যস্ত রাখায় । কৃতজ্ঞতা সহ প্রণাম জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম । মোহান্তজি হাসিমুখে বললেন-একটু অপেক্ষা করলে দেবতার রাজবেশের সময় মন্দিরে গিয়ে পূজারতি দেখতে পাবেন-ফটোও তুলতে পারবেন ইচ্ছে হলে । মোহান্তজির এমন সহৃদয়তায় অভিভূত হলাম । প্রণাম করে তখনকার মতো বিদায় নিলাম আমরা ।

অভিজিৎ বলল, রাজবেশের এখনও অনেক দেরি আছে । ততক্ষণে কালীমন্দির, হরগৌরীর মন্দির, গঙ্গার ঘাট, বিখ্যাত বট, শিবমন্দির, মোহান্তজির আবাস ইত্যাদি ঘুরে আসা যায় ।

সর্বত্রই মানুষের স্রোত । সে স্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁশ আর শালখুঁটির শক্ত বেড়া যেদিকে তাকাই সেদিকেই । আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল । এতক্ষণে জ্যোৎস্না উঠেছে কিছুটা হেমন্তের মেঘলা আকাশ আর কুয়াশাকে ফাঁকি দিয়ে । তাতেই আমরা পথ চলছি স্বচ্ছন্দে

। এদিকেও পুলিশ আর পুলিশ ক্যাম্প। পথের পাশে পাশে এবং যেখানে যতটুকু ফাঁকা মাঠ আছে, সেখানেই গরিব মানুষরা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নৌকার ছইয়ের মতো করে তার ওপরে সামান্য খড় বা ছেঁড়া চট, ছেঁড়া কাপড়, পলিথিন শীট যার যেমন জুটেছে তাই দিয়ে বানিয়ে নিয়েছে সাময়িক আশ্রয়। কুয়াশা ভেজা হাড়কাঁপানো শীতের রাত কাটিয়ে মেলা দেখার এমন উৎসাহ-না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সবই দেখা হল মোটামুটি। তবে শোনপুরের মেলার সেই বিখ্যাত নৌকার পুল আর নেই। ব্রিজ হওয়ার ফলে নৌকার পুলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এপার থেকে ওপার পর্যন্ত গায়ে গায়ে বাঁধা থাকত অসংখ্য নৌকা। তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলত পারাপার। কালীমন্দিরের ভাঙা পাড়ে তার চিহ্নটুকু রয়ে গেছে শুধু-কটি ভাঙা নৌকার কঙ্কাল নিয়ে। এখন হালকা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে দূরে, দূরে দুয়েকটি নৌকা। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় কালীমন্দিরে। ছোট মন্দির। পুরনো বাড়ির অল্প পরিসরের একখানা ঘর বললেই ভালো হয়। অত্যন্ত অল্প আলোয় কিছুই প্রায় বোঝা যায় না। তবে নিতান্তই ছোট, মায়ের মূর্তিখানি বড়ই সুন্দর। দেখা আর হাঁটার বিরাম নেই। গরিব মানুষদের সেই ছইগুলি ঘিরে লোক জমেছে, আশপাশে কজন পুলিশও ঘোরাফেরা করছে। ডানদিকে সামান্য তফাতে আবার রংমাখা মেয়েদের আস্তানা। কী নেই এ মেলায়!

ভিড় ঠেলে এবার আমরা দ্রুতপায়ে সংক্ষেপ পথে মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। বিশাল লাইন পড়েছে ভক্তদের হরিহরনাথের রাজবেশ ও আরতি দেখার জন্য।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নানা বাদ্যযন্ত্র সরব হয়েছে। ধূপের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছে, ধূপ ও ফুলের গন্ধে-বর্ণে সে এক অবর্ণনীয় পরিবেশ। এমন সময় পাশেই পেলাম মোহান্তজিকে। আন্তরিক হেসে বললেন-'একটু অসুবিধে হল, না!'

না, না। এখানে যে আসতে পেরেছি-এই তো পরম ভাগ্য স্বামীজি।

মন্দিরের পুরোহিত এলেন। বয়স আশির কাছাকাছি, প্রকৃত গৌরবর্ণ না স্বর্ণকান্তি কী বলব! ঊর্ধ্বদেহে কোনও আবরণ নেই। ধুতিখানি মালকোচা দিয়ে পরেছেন। পাকানো শীর্ণ শরীরে শুভ্র উপবীত, মাথায় মানানসই শিখা। প্রথমে একটি বিরাট শাঁখ নিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে থাকলেন। একেকবার সে সুর ধরে রাখছেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তারপর যুক্তকরে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করলেন, যা নানা বাদ্যধ্বনির জন্য শুনতে বা বুঝতে পারছি না। কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি, মনে হয় এখানকার ক্ষমতাবান পুরুষ, তাঁরাও সশ্রদ্ধায় ছন্দে ছন্দে হাততালি দিয়ে মাথা দুলিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে এখন শ্বাস টানার মতো অবস্থা নেই। বৃদ্ধ পুরোহিত এবার মাটির দুটি বড় ধুনুচি তুলে নিয়ে আরতি আরম্ভ করলেন। বাজনার ছন্দও পাল্টে গেছে। দুপাশের মানুষ ওই ধুনুচি

দুটিতে মুঠো মুঠো গুঁড়ো ধুনো ছড়িয়ে দিচ্ছেন-ধুনুচি জ্বলে উঠছে দাউ দাউ করে । তবু পরিপূর্ণ নৃত্যশৈলী বজায় রেখে আরতি চলছে ।

এত ঘুরেছি এই পাঁচ ঘণ্টায়, তবু যে পথেই যাই মনে হয় একই পথে যেন ভুলভুলাইয়ায় ঘুরছি । আর যেমন ভিড়, তেমন ধোঁয়া, তেমনই শব্দ । মেলায় আসা হাজার হাজার মানুষ ঘুঁটে, কাঠ, পাতা, খড় জ্বালিয়ে রাতের রসুই পাকাচ্ছে । সেই ধোঁয়ায় চোখে অন্ধকার লাগছে, চোখ জ্বলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন অবস্থা ।

হাতিবাজারের পাশ দিয়ে যখন আসছি, পথের পাশে সেই আবছা অন্ধকারে যে জিনিস লক্ষ করলাম তাতে অতীত সবকিছু মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়াও খুব সহজ নয় । কোথায় যেন একটা জানা-অজানার, প্রকাশ-অপ্রকাশের বিরোধ চলেছেই । অনেক অসহায় নির্বোধ ও দরিদ্রের কান্না ঢাকা পড়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের আনন্দ-কোলাহলের বন্যায় ।

এদিকটায় প্রচুর মূল্যবান সামগ্রীর বাজার । বেনারসী থেকে গহনা কী চাই! একজন রাজস্থানি হাতে ছোট্ট মাউথপিস নিয়ে প্রচার চালাচ্ছে কবিরাজি জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকার । একেবারে হাতে গরম বিক্রি হচ্ছে ।

বড় বড় দোকানগুলোয় জ্বলছে পেট্রোম্যাক্স । বিদ্যুৎ বোধহয় সবটুকুই বরাদ্দ হয়েছে বড় থিয়েটার কোম্পানি, সার্কাস, বিশাল নাগরদোলা, রইস আদমিদের মৌজের জায়গায় মিনাবাজারে । প্রমাণ সাইজের মূর্তি দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের সচল প্রদর্শনী ।

এখানকার নিঃশুল্ক চিকিৎসালয় চালানোর জন্য মেলার সময় কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে আসেন মণি মহারাজ কলকাতা থেকে । বৃদ্ধ সেই হিসেবেই এসেছেন । স্বামীজিই সকলকে রান্না করে খাওয়ান । সকাল-বিকেল মিলিয়ে স্বামীজি নিজে অন্তত আধঘণ্টা কেন্দ্রে বসেন ।

পরদিন আমি চললাম এবার মেলার পথে একাই । গঙ্গায় দুজায়গায় হাতি স্নান করানো হয়-আমার লক্ষ্য সেই দুটি স্নান সহ পুণ্যার্থীদের স্নানঘাট । নতুন ব্রিজের তলায় এবং পুরনো ব্রিজের ডানদিকে বেশি মানুষ পুণ্যস্নান করেন । তারপর স্নানের ভিড় হয় কালীঘাটে । আমি চলেছি প্রথমে নতুন ব্রিজের দিকে । অসংখ্য মানুষ প্রাতঃকৃত্য শেষ করছে উন্মুক্ত সীমাহীন ও আব্রুহীন মাঠে । স্ত্রী-পুরুষ, কচিকাঁচা, যুবতী, কিশোরীর কোনও ভেদ নেই । একেবারে আদিম অবস্থা । কুয়াশাই যা এদের আব্রু রক্ষা করছে ।

মেঘ-কুয়াশার বুক ভেদ করে দিনমণি উঁকি দিচ্ছেন । সে ছায়া গঙ্গার বুকে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে । নৌকা চলছে যাত্রীবোঝাই । যাক, হাতির স্নানপর্ব আরম্ভ হল । তবে দল বেঁধে নয় । একেকবার মাত্র একটি হাতিকেই জলে নামানো হচ্ছে । খানিকক্ষণ জলে

ভিজিয়ে তারপর ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে শুকনো চামড়ায় কিছুটা সতেজ ভাব ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । তারপর ডাঙায় তুলে তেল দিয়ে ভিজে শরীর দলাইমালাই করে চলছে বয়স কমানোর চেষ্টা । এরপর ডোবায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে শুঁড়-কান-কপালে রং দিয়ে আঁকা হচ্ছে নানা নকশা । কারুর কারুর পিঠে চাপানো হচ্ছে মখমলের ঝালর । যেন কনে সাজানো! এবার প্রাতরাশ । আয়োজন কম নয়-আখ, আধপাকা ধান সহ ধানের বোঝা, কলাগাছ, আম-বট ইত্যাদির পাতা । প্রাতরাশের পর কনে দেখানোর পালা । খরিদ্দারের সঙ্গে বাতচিত । ক্রমে ভিড় বাড়ছে হাতিবাজারে । কাছাকাছিই উটেরও বাজার । হাতির তুলনায় উটগুলোর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য বেশি ।

আমবাগানে সারি সারি শৌখিন তাঁবু পড়েছে হাতিবিক্রেতাদের । তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মারুতি, কন্টেসা, অ্যাম্বাসাডর, জিপ ইত্যাদি । মালিকরাও বেশ সেজেছেন আধুনিক মূল্যবান পোশাকে । কিং সাইজ দামি সিগারেট খাচ্ছেন অথবা ফরাসি নলে তামাকু সেবন করছেন । দরদাম ঠিক হচ্ছে তাঁবুর ভেতরে । কখনওই হাতির সামনে নয় । কোনও কোনও হাতিকে আবার মেলা ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে ক্রেতা আকর্ষণের জন্য । এমনই একটি হাতি (এটিই এবার মেলার বৃহত্তম)-কে চার পায়ে শিকল পরিয়ে, দুপাশে শক্ত কাছি (জাহাজবাঁধা দড়ি)-তে চারজন লোক টেনে নিয়ে চলেছে । সঙ্গে বল্লম হাতে দুজন পাহারাদার । মাহুতের অঙ্কুশের আঘাতে কপাল, কান আর চোখের কোল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে । ফোটা বেয়ে নামছে চোখের জল । মনটা কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠল, তবু ছবি তোলার চেষ্টা করতেই কজন লোক চিৎকার করে উঠল-হঠ যাও-মার দেঙ্গে-পরে শুনেছি এটি মত্তহস্তি । কিন্তু মালিক সাংঘাতিক চালাক । বার বার ঘোষণা করতে থাকে যে-‘এ মেলায় এমন খরিদ্দার নেই যে এই বিশাল হাতি কেনে ।’ একথা কানে যায় স্থানীয় এক মাফিয়ার । সে সাত-পাঁচ বিবেচনা না করেই একদামে কিনে নিয়ে যায় হাতিটি নিজের অহংকার বজায় রাখতে ।

মেলায় দেখছি নব্বই ভাগই গরিব অতি সাধারণ মানুষ । অবিরাম চলছে সেই দরিদ্র মানুষের মিছিল পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে । সম্পূর্ণ একেকটি পরিবারই যেন উপড়ে নিয়ে এসেছে গৃহকর্তারা এই মেলায় ।

নার্সারি এলাকায় এলাম ঘুরতে ঘুরতে । লিচু, আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা, নারকেল, সুপুরি, কমলালেবু-বিভিন্ন গাছের একেকটা এলাকা । টবে কমলালেবুর কলমের গাছ পাকালেবু সমেত শোভা পাচ্ছে । ফুল গাছের তো কথাই নেই । একা গোলাপই যে কত জাতের কত রঙের! সাইজও প্রদর্শনীতে দেবার মতো । শীতের ফুলের যেন স্বর্গ! গন্ধে মাতাল চারদিক । সবজির নানারকম গাছও টবে টবে সাজানো ফলন্ত অবস্থায়-

ফুলকপি থেকে পটল, লঙ্কা থেকে ক্যাপসিকাম। কাঁদিসুদ্ধ কলাগাছ পাঁচ-সাত রকমের। বিস্কুট, কেক, মোগলাই, সাহি মিষ্টির একটা গ্রাম যেন-কত দোকান! বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর-এই এলাকার খুশবুই আলাদা। এরপর কাঠের এলাকা। কাঠের হাতা থেকে টেবিল, চেয়ার, সিন্দুক, পালঙ্ক থেকে লাঙলের কাঠ, দরজা-জানলা, বিশাল বিশাল কড়িকাঠ। এতসব মেলায় বয়ে নিয়ে আসতেই তো খরচ হবে হাজার হাজার টাকা! কাঠও কত রকমের। বিক্রিও হচ্ছে বেশ। কিনে নিয়ে গিয়ে পছন্দমতো প্রয়োজনমতো সব কিছু করা যাবে।

চিড়িয়াবাজার এবং ছোট পশুর বাজার পাশাপাশি। দর্শক এবং ক্রেতা প্রচুর। জোগানও প্রচুর। কী নেই! হনুমান, বাঁদর, বেজি, সাপ, মুরগি, চিনে মুরগি, অনেকরকম হাঁস, পায়রা, টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া, বাটর, কোকিল, শালিক, কাঠঠোকরা। দুটি মাত্র কাকাতুয়া। দাম নাকি দুহাজার টাকা করে। ময়ূরের বাচ্চা আর কাকাতুয়া দুটিকে ঘিরে প্রচুর মানুষের ভিড়।

কুকুরও অনেক জাতের। বিড়ালও বিক্রির তালিকায় রয়েছে। ভারি সুন্দর দেখতে কিন্তু। তবে সব বাজারেই দরাদরি হয় খুব। যেমন দেড় হাজার টাকার অ্যালসেসিয়ান কুকুরের বাচ্চা বিক্রি হল তিনশো পঁচিশ টাকায়।

সারাদিন খোলা আছে জ্যান্ত পশুর জ্যান্ত চিড়িয়াখানা। একঘণ্টার দেখাশোনা। দর্শনী এক টাকা মাত্র। হিন্দি ভাষায় চলছে জোর প্রচার।

স্বামীজির মুখে শুনেছি ১৯৩২ সালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা গুরু মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজি এসেছিলেন এই শোনপুরের মেলায়।

মানুষের অসহায়তা দেখে খুবই বিচলিত হন গুরু মহারাজ। এবং তখনই লেগে যান সেবাকাজে।

স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছেলে, এমনকী পাটনা থেকেও ভলান্টিয়ার জোগাড় করে কাজ শুরু হয় সুষ্ঠুভাবে। তখন পাটনায় বহু প্রতিষ্ঠিত 'ধনী বাঙালি' ছিলেন। যাদের মধ্যে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সরকারি উচ্চপদাধিকারী, উকিল, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী সব শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেবের ইচ্ছায় সবরকম সাহায্যই জুটে গেল অত্যল্প সময়ের মধ্যে। খোলা হল সেবাদল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র। সাধারণ মানুষ দারুণ উপকৃত হল, খুশি তো হলই। লঙ্গরখানাও খোলা হল দরিদ্রনারায়ণের সেবায়।

আগে মেলা বসত হাজীপুরে । ১৮৩৭ সালের গণ্ডকের বন্যায় পাটনার কাছাকাছি সাহেবদের ঘোড়দৌড়ের মাঠ বিলীন হয়ে গিয়েছিল । ওই সময়ের আগে থেকেই নীলকর সাহেবরা বিহারের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । হাজীপুর-শোনপুর অঞ্চলের নীলকর সাহেবরা মিলে তৈরি করেছিল এই শোনপুরেই তাদের নাচঘর আর ঘোড়দৌড়ের মাঠ ।

হরিহরনাথের মন্দিরেরও সংস্কার সাধন হল । কেটে পরিষ্কার করা হল আশপাশের বনজঙ্গল । ক্ষত্রিয়প্রধান এই অঞ্চলেই তারপর থেকে জমে উঠল মেলা । সেই মেলাই এই আজকের মেলা ।

কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বাবা বালানন্দজির মন্দির । হরিহরনাথজির মন্দিরের পশ্চিমদিকে তিন ফার্লং দূরে নদীর ধারে এই স্থান । এখানে রাজা ঈক্ষবাকুর পুত্র রাজা নেমিও তপস্যা করেছিলেন ।

বিজলপুর নদীর ধারে একটি বিরাটাকৃতি পাথর আছে-এটিই জড়ভরৎ নামে খ্যাত । প্রচলিত বিশ্বাস, প্রচণ্ড দাবদাহের সময় পাথর নিজেই গঙ্গায় নেমে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে আবার নিজেই স্বস্থানে ফিরে আসেন ।

সারাদিন প্রায় একভাবেই কাটল । অভিজিৎরা এল খবর নিতে । নানারকম আলোচনা হল । সন্ধ্যায় বেরোলাম ঠাকুরের নাম স্মরণ করে মেলার পথে । শেষ পরিক্রমার উদ্দেশে ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ১৯৯৪

এলেম নতুন দেশে

কমলা মুখোপাধ্যায়

এবার প্রায় একটি অজানা দেশে যাবার সুযোগ ঘটেছিল-যদিও তা আমাদের ভারতেই অবস্থিত । কিন্তু সমগ্র ভারতকে আমরা কতটুকুই বা জানি! বহুদিন ধরেই পশ্চিম সীমান্তের কচ্ছের ‘রণ’ অঞ্চল দেখবার ইচ্ছা ছিল, এবার যোগাযোগও ঘটে গেল । ১৯৮১ ও ৮২ সালের সমগ্র ভারতীয় পদযাত্রা শিবিরে (দিল্লি ইউথ হস্টেলের প্রযোজনায়) গুজরাট তথা কচ্ছের তরুণ অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তারা সাদরে আমন্ত্রণ জানাল কচ্ছ প্রদেশটি দেখবার । -তবে সেখানে যাবার প্রকৃত সময় হল শীতকাল । সুতরাং ২-৩ বছর ধরে চেষ্টা করেও যেতে যেতে ১৯৮৫ এসে গেল । দেশটি মরুভূমিসদৃশ-গ্রীষ্মকালে যাওয়া কষ্টকর, সুতরাং যেতে হলে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেই যাওয়া ভালো । রাতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রিতে নেমে গেলেও দিনে বেশ গরম ।

যাহোক কচ্ছ দেখবার প্রাথমিক আকর্ষণ ছিল দুটি-একটি এখানকার বিখ্যাত ‘রণ’ অঞ্চল-ছোট ও বড় রণ-যার বিষয়ই মাত্র ভূগোল বইতে পড়ানো হয়-এর বাইরে যে কচ্ছের আরও কত প্রাচীন ইতিহাস আছে-এর জীবজন্তু গাছপালা চাষবাস-জনসাধারণের জীবনযাত্রা-যেসব বিষয়ে কোনও কিছুই ভূগোল বইয়ে নেই । দ্বিতীয় আকর্ষণের বিষয় হল শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্লেমিঙ্গো পাখি রণ অঞ্চলে ভিড় করে এসে থাকে কয়েক মাস । ডিম পাড়ে, বাচ্চার জন্ম হলে ও কিছুটা বড় হলে আবার শীতের শেষে উত্তরে চলে যায়-একটা অঞ্চল সেজন্য ফ্লেমিঙ্গো সিটি বলেই বিখ্যাত ছিল-কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই, আধুনিক সভ্য জগতের যত প্রসার ঘটছে-ততই প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, ফলে গাছপালা পশু পাখি-সকলের ওপরই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । এখন এদের দেখতে পাওয়া যাবে শুধু লিটল রণের রিজার্ভ জলাশয়ে, জামনগরের কাছে তিজারিয়া পক্ষিনিবাসে, নল সরোবরে এবং ভরতপুরে । এছাড়া এখানকার বিখ্যাত বুনো গাধার সৌন্দর্যও বিখ্যাত-এদের চামড়া মসৃণ ও চকচকে-দৌড়ের বেগ বোধহয় ঘণ্টায় ৩২-৩৩ মাইল । এখন মাত্র লিটল রণের কোনও কোনও জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায় । হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কিয়াঙের সঙ্গে এরা তুলনীয় । বুনো গাধাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে-এদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চলছে । তবে এখানকার ভারবাহী গাধারাও দেখতে ভালো-আমাদের দেশের তুলনায় ।

ভূগোল ও পশুপাখি সম্পর্কে হয়তো আরও কিছু বলা যায়-কিন্তু সেখানকার মানুষরা? তাদের বিষয় তো সর্বাগ্রে বলা দরকার! অথচ তাদের বিষয় এক লাইনও পাঠ্য বইয়ে নেই, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজের বইয়ে। শ্রীরায় সিং রাঠোর ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পদযাত্রা শিবিরে আলাপ হলেও বিশেষ ধারণা করতে পারিনি ওই দেশবাসী সম্পর্কে-কিন্তু গিয়ে দেখলাম এ অঞ্চলের দেশবাসী, তাদের প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী কাহিনী, প্রাচীন স্থাপত্য ও ধ্বংসাবশেষ সমস্তই চিত্তাকর্ষক ও জানবার মতো। সীমান্ত প্রদেশ বলে কোনও কোনও অঞ্চলে যেতে অনুমতিপত্র লাগে বটে কিন্তু প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছিলেন ভূগোল শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে যেতে কোনও অসুবিধা নেই। সুতরাং এই নতুন অজানা দেশে যেতে বিশেষ কিছু অসুবিধা তো হলই না বরঞ্চ তাদের যথাসাধ্য আতিথ্যে অভিভূত হয়ে বিশেষ ভালোভাবে জানতে পারলাম দেশটাকে। নতুন দেশে বন্ধুও জুটল অনেক।

কচ্ছের প্রধান শহর ভুজ। আমেদাবাদ এক্সপ্রেস আমেদাবাদ হয়ে সোজা গান্ধীগ্রাম হয়ে ছোট লাইনে ভুজ পর্যন্ত যায়। গান্ধীগ্রাম থেকে বাসে কয়েক মাইল গেলে কচ্ছ উপসাগরের তীরে ভারতের অধুনা প্রধান বন্দর কান্ডলা। করাচি বন্দর দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে চলে যাবার পর কান্ডলার গুরুত্ব এখন খুব বেশি। অতীতে কচ্ছ জুরাসিক যুগে কাছিমের পিঠের মতো একটি দ্বীপ ছিল। এটি সম্পূর্ণ পার্বত্য দেশ-হিমালয়ের জন্মের বহু যুগ আগে এর সৃষ্টি-সমস্ত অঞ্চল জুড়ে বিরাট বিরাট অ্যামোনাইট ও সামুদ্রিক জীবের ফসিল দেখা যায়-বৃহৎ থেকে ছোট ছোট সামুদ্রিক ঝিনুক পাথরের মধ্যে সংগ্রথিত হয়ে আছে-কিন্তু বহু যুগের প্রাচীন বলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উচ্চতার হ্রাস পেয়েছে, এখন কোনও অংশই ২০০০ (আনুমানিক) ফুটের বেশি উঁচু নয়। সমভূমি কম-পাহাড়ি এলাকাই বেশি। পূর্বে আরব সাগরের একাংশ উত্তর-পূর্বদিকে প্রবেশ করে একে ঘিরে ছিল। সিন্ধু নদীর এক প্রশাখা প্রাচীনকালে পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল-ফলে মিঠা জলের জোগান ছিল ওই অঞ্চলে। কিন্তু বরাবরই স্থানটি ছিল ভূমিকম্পপ্রবণ, ফলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হত। এইরকম এক ভূমিকম্পের সময় সিন্ধু নদীর ওই প্রশাখা আরও পশ্চিমদিকে সরে গিয়ে বর্তমান খাতে প্রবাহিত হতে থাকে-ফলে উত্তর-পূর্বদিকে বালুচর জমতে জমতে ক্রমে এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। দক্ষিণদিকটা কচ্ছ উপসাগর বলে পরিচিত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত বৃহৎ রণের আয়তন ৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এদেশ পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর অবস্থিত তাই এর গুরুত্বও খুব বেশি। বোধহয় বছর দশেক আগে এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে খনিজ তেল পাবার সম্ভাবনার ফলে পাকিস্তান এ অঞ্চল আক্রমণ করে, অবশ্য বিদেশি বিশেষজ্ঞরা তাদের বলেছিলেন ওখানে তেল পাবার সম্ভাবনা আছে, ভারতকে বলেছিলেন-এখানে তেল পাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এখন বৃহৎ রণের

পশ্চিমাঞ্চলে লাখপত নগরে ও এন জি সি-র সদর দপ্তর খোলা হয়েছে । সীমান্ত ইটের গাঁথনি দিয়ে চিহ্নিত করা হলেও যাতায়াত বা চোরাচালানীদের কিছুমাত্র অসুবিধা নেই-বহু দূরের বিস্তীর্ণ গতিবিধি কোনও পাহাড় থেকেই দেখা যায় তবে ধরা মুশকিল । তাছাড়া চোরাবালির ভয় আছে । বর্ষাকালে বৃহৎ রণ অঞ্চল জলের তলায় থাকে-তাই অগম্য-শীতের সময় জেগে ওঠে চর অঞ্চল বা বেটগুলি । আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে মাইলের পর মাইল ব্যাপী লবণাক্ত শুভ্র ভূমি দেখতে পেলাম তারও পরে নীলের আভাস-দূরে একদিকে 'ইন্ডিয়া পুল' বা ঘাঁটি । ভেড়া বা গরুর পদচিহ্ন ধরেই সেই লবণাক্ত জমি পার হলাম-তারপর সীমান্ত চেকপোস্ট ।

ক্ষুদ্র রণ অবশ্য প্রায় ৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত-অভ্যন্তর ভাগে স্থিত আমেদাবাদ থেকে বাসে সহজেই যাওয়া চলে-অনুমতির ব্যাপার নেই । এখানে সংরক্ষিত কর্দমাক্ত ভূমি ও জলে (অভয়ারণ্য) ফ্লেমিঙ্গোরা আসে ।

কচ্ছিদের লিখিত কোনও ভাষা নেই কিন্তু বহু যুগ ধরে এদের প্রাচীন ইতিহাস চারণদের গানে লোকগাথায়, উত্তরে সিন্ধুদেশের বিজয়ী মুসলমান রাজা, গুজরাটের কাথিয়াবাড় ও সৌরাষ্ট্রের রাজাদের শাসনকালীন লিখিত অনুশাসন ও তৎকালীন ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়-তবে পুরুষানুক্রমে এখানকার চারণদের কাছ থেকেই বহু কাহিনী উদ্ধৃত করা গেছে ফলে কয়েকটি গ্রন্থও গুজরাটি ও ইংরিজিতে এখন প্রকাশিত হয়েছে । উত্তরের সিন্ধুর শাসকদের ও সৌরাষ্ট্রের রাজাদের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল এই কচ্ছ অঞ্চল-এর ইতিহাসের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে তাই সৌরাষ্ট্রের ইতিহাস ও জনগণ সংযুক্ত-আলাদা করা মুশকিল । মুসলমান বিজেতারা সিন্ধুদেশ জয় করার পর জনসাধারণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করলেও হিন্দু ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা যায়নি । দক্ষিণের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের 'যাদব' বা বর্তমান 'জাডেজা' শাসকবৃন্দ বহুকাল ধরেই এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে কচ্ছকে শাসন করেছেন । এই 'জাডেজা'রা রাজপুত বংশীয় বলে দাবি করেন । শেষ রাজা মদন সিংজির পিতামহ খেঙ্গরজি (৩) এই কচ্ছ প্রদেশের বিখ্যাত রাজা । যেটা আমাদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল এখানকার হিন্দু-মুসলমানদের মিশ্রিত সংস্কৃতি । পীর ও ফকিরদের আধিক্য ও মাহাত্ম্য । পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ের সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া এদের বিবাহের যৌতুকে যে সুন্দর কাচ বা পুঁতি বসানো হাতে তৈরি বর ও কনের পরিচ্ছদ (যা এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে) সেগুলি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় । কনের হাতে বিরাট মোটা হাতির দাঁতের বালা-যা অবশ্য এখন প্লাস্টিকের বালায় পরিণত হয়েছে তা বিবাহিতা মেয়েদের হাতে সর্বত্র দেখেছি । এমনকী তা আমেদাবাদেও গুজরাটিদের মধ্যে প্রচলিত । এখানকার পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘাঘরা ও ওড়নার সঙ্গে রাজস্থানি ও গুজরাটি পরিচ্ছদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে-

তবে কে কাকে প্রভাবিত করেছে তা বলা মুশকিল । ওদের চেহারাতেও সংমিশ্রণ স্পষ্ট-সাধারণ লোকেদের রং কালোর দিকেই ঘেঁসে । এখানকার দেবদেবীরাও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর থেকে স্বতন্ত্র-জাডেজা রাজবংশের আশাপুরা দেবীই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী-তাঁর আরও তিন বোন আছেন । ভুজের পশ্চিমে নারায়ণ সাগরের কাছে আশাপুরা দেবীর প্রধান মন্দির-মাঘ মাসে বিশেষ উৎসব হয় । হিন্দু-মুসলমান জনগণের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে পীর ফকির সাধু সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশ কিছুটা দেখা গেল সর্বত্র । সাম্প্রদায়িক বিরোধও কিছু নেই । পরিবারের এক ভাই হিন্দু সাধু হিসেবে পূজা পাচ্ছেন ও অনেক শিষ্য আছে-তেমনই পাশেই তাঁর অন্য ভাই ফকির বা পীর-তাঁরা সকলেই তাঁদের শিষ্যবর্গ নিয়ে শান্তিতে সহাবস্থান করছেন ।

অতীতকাল থেকেই বালুকাপূর্ণ মৃত্তিকা, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের জন্য চাষবাসের ওপর এরা কখনওই নির্ভরশীল ছিল না । পশুপালনও একটা সমস্যা-কারণ প্রচুর ঘাস বা পশুখাদ্য জন্মায় না এখানে । শুধু গুল্ম জাতীয়, কাঁটা জাতীয় বাবলা বা ওই ধরনের তৃণ গুল্ম হয় যা উটরাই কেবল খেতে পারে-সেজন্য উটই এখানকার প্রধান পরিবহন চালায় । এরা পশুপালন করে বটে কিন্তু নিকটে সমুদ্র থাকায় নৌ-বিদ্যায় এরা বেশ পারদর্শী হয়ে পড়ে । সমুদ্রে যাতায়াত এদের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত ছিল । পূর্ব আফ্রিকা, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর (Gulf) অঞ্চল অবধি এদের নৌ-বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল । সেকালে নির্মিত জাহাজগুলির গঠনশৈলী বেশ উন্নতমানের ছিল-যার মডেল এখানকার মিউজিয়ামে রাখা আছে, তা দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয় । এখনও দুবাই অঞ্চলে এখানকার বহু লোক কাজ করতে যায়-পথেঘাটে এক বিশেষ ধরনের নকশাদার স্কার্ফ পরিহিত লোক দেখলেই বোঝা যায় যে এরা দুবাই ফেরত । সেখানে এরা যথেষ্ট টাকা রোজগার করে । এদের জাহাজ সৌরাষ্ট্রের জামনগর, ওখা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করত-নাবিক হিসাবেও এদের বেশ সুনাম । আমাদের আমন্ত্রণকারী রায় সিংজির ঘরে প্রাচীন হরপ্পা মহেঞ্জোদারো যুগের যে বসতিগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার বহু নমুনার সংগ্রহ দেখলাম-সে যুগের লোথাল যা মহেঞ্জোদারোর নদীবন্দর ছিল-সেটি তো এখন সম্পূর্ণভাবে খনন করে তার প্রাচীন ইতিহাস উন্মুক্ত হয়েছে-সেটি আমেদাবাদ থেকে ২-৩ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র-কচ্ছ উপসাগরের কিছু উত্তরে । সে কাহিনী স্বতন্ত্র । প্রাচীন বন্দরগুলির মধ্যে মাণ্ডবী, মুন্দ্রা, জাখাউ, কোটেশ্বর ও লাখপতের নাম উল্লেখযোগ্য । তবে এগুলি স্থানীয় বন্দর-খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এখন-কাউলাই হল এখন প্রধান ।

ভুজ প্রদেশের ৯টি জেলা-ভুজ, মাণ্ডবী, জাথোর, মুন্দ্রা, লাখপত, অঞ্জার, নক্ষত্রাণা, তেরা, আদাবাসা । মাণ্ডবী বেশ বড় শহর হলেও সমুদ্র সরে যাওয়াতে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর

স্থানীয় বন্দর। ভুজিয়া পাহাড়ের ওপর ভুজ শহর-পাশেই একটি বৃহৎ সরোবর-সমস্ত শহরটি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত। জলাভাবের জন্য এখানকার রাজা ও শাসকবৃন্দ বৃহৎ সরোবর খনন করে দিতেন, অতীতকাল থেকেই তার চিহ্ন সর্বত্র মিলবে। এখন মরুভূমিতে জন্মাতে পারে এরকম ঘাস ও বৃক্ষাদি লাগানো হয়েছে-বহু কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। মাটির নিচে, যেখানে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়েছে সেখান ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কেটে একটি এলাকার নালার সঙ্গে অন্য এলাকার নালার সংযোগ করা হয়েছে।

ভুজের রাস্তাগুলি আঁকাবাঁকা গলি হলেও স্কুটার বেশ সহজেই প্রবেশ করে-এর মধ্যে আশাপুরা দেবী ও স্বামীনাথ (কৃষ্ণ)-এর মন্দির বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রধান রাস্তায়। সমস্ত ধরনেরই দোকান ও রেস্তোরাঁ রয়েছে, ইডলি ধোসার দোকানটি দেখলাম বেশ জনপ্রিয়। আমাদের স্থানীয় বন্ধুরা এক অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে চা খাবার জন্য স্টোভ দুধ পেয়ালা পিরিচ ইত্যাদি দিয়ে গেলেন-মায় লেপ বিছানা অবধি-কোনও ভাড়া নেওয়ার কথাই উঠল না। এই কতকগুলি অতিথিশালা আছে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ইউথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশনের একাধারে সম্পাদক এবং পি আর ও রাঠোরই এ সমস্ত ব্যবস্থার সংগঠক। ইনি আবার একজন চিত্রকরও।

ভুজে স্থানীয় মিউজিয়াম, রাজার প্রাসাদ-মিউজিয়াম, আয়না মহল প্রভৃতি দেখে পরদিন সকালে উত্তরদিকে বাসে চেপে লৌরিয়া সুমরামার গ্রামে রাঠোরজির ভাই দৌলত সিংহর স্কুলে পৌঁছলাম-ছেলেমেয়েরা তো আমাদের দেখে আশ্চর্য। একটু বিশ্রাম করে-দৌলত সিংহ ও আরও ২ জনের সঙ্গে জুরা পাহাড় অঞ্চলে গেলাম-এটি প্রাচীন পাহাড়, ফসিলে ভর্তি। প্রথমে ২-৩টি আমোনাইট ফসিল তুলতে গিয়েছিলাম-তারপর দেখি বিরাট বিরাট সব আমোনাইট ছড়ানো, এর গায়ে ছোট ছোট ঝিনুক প্রভৃতি গেঁথে রয়েছে। দৌলত সিংহ দিল্লি ইউথ হস্টেলের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে গেছেন, ভূগোলের জ্ঞানও বেশ আছে। পর্বতারোহণের ট্রেনিংও নিয়েছেন। বেলা ১টার সময় রোদে ক্লান্ত হয়ে তাঁর বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজন সেরে আরও উত্তরে বাসে খাওড়া বলে এক গ্রামে পৌঁছলাম। আগেই বলা ছিল-এখানে একটি ছেলে গাইডের কাজ করে বিদেশি পর্যটকদের। রাতে পঞ্চায়েত ভবনের অতিথিগৃহে বিশ্রাম নিয়ে-সকালে গ্রাম দেখতে বেরোলাম। এদের হাতে তৈরি ছাপানো চাদর চাকনি কিছু কেনা হল। লোকসংখ্যা বেশি নয়, তবে সরকারি নীতি হল সর্বত্র গ্রাম বসিয়ে ভূমির উপযোগী ফসল লাগানো ও তার জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করা। জুরা পর্বতের পাশেই ছিল ধীনোধর (ধৈর্যধর) পাহাড়-বিখ্যাত সাধু ধর্মনাথের (৬৪২ খ্রিস্টপূর্ব) ক্রোধের ফলে নাকি এ জায়গা এত শুষ্ক হয়ে যায়-স্থানাভাবে সে সব কাহিনী দেওয়া গেল না। এখানকার বসতি এলাকাটাই বেশ সমৃদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।

সুমরাসার ও জুরা থেকে ক্রমশ উত্তরে যাব। এবারকার যাত্রা দক্ষিণ থেকে উত্তরে বৃহৎ রণের পচ্ছাম এলাকায়। পূর্ব-পশ্চিমে সুবিধা হলে পরে যাব। আমাদের গাইড ঘনশ্যাম খুব চটপটে, তার সঙ্গে বেলা ৯টার বাসে দ্রুবানা বলে গ্রামে গিয়ে ব্যবসায়ীদের আড়তে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হল কারণ এখান থেকেই উট নিতে হবে। চারদিকে লবণের ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বস্তা। ১টি উট আছে মাত্র। বেলা হয়ে গেছে। উটরা সব জিনিসপত্র নিয়ে বার হয়ে গেছে। আমরা ৪ জন, ২ জন করে একটি উটে যাওয়া চলে, কুঁজের সামনে ও পিছনে বসতে হয়, সে আসন মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু আমার দুই সঙ্গিনী হাঁটতে নারাজ। অগত্যা একটা উটে তাদের উঠিয়ে আমরা দুজন হেঁটেই চললাম। দূরে দেখা যাচ্ছে কালাডুংরি বা Black Hill। গ্রাম ছাড়িয়ে শুরু হল তেপান্তরের মাঠ। উটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না-সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হঠাৎ একা হয়ে গেলাম। অনেক ডাকাডাকি, পরে দেখি আমার বাঁদিকে দিগন্ত রেখায় উটের দল। পরে ঘনশ্যাম বুঝিয়ে দিল যে পাথরে সাদা চুনের দাগ দেওয়া আছে-সে সব দেখে চলতে হবে-না হলে মুশকিল। প্রান্তর ছাড়িয়ে এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ-প্রতিপদে ঠোক্কর খেতে হচ্ছে-সামনের নিশানা পচ্ছাম ঘরানার গুরু দত্তাত্রেয়ের শুভ্র চতুর্মুখ মন্দির। ৭ কিলোমিটার নাকি পথ, ৪ কিলোমিটার যাবার পর লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আগামী শিবরাত্রিতে মেলা, সেইজন্য পথঘাট তৈরি করা হচ্ছে। এখানে আরেকটি উট পাওয়া গেলে আমরা তাতেই উঠে পড়লাম-ইচ্ছা তাড়াতাড়ি মন্দিরে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করে সেদিনই ৯ কিলোমিটার নেমে আসব। কিন্তু পৌঁছতেই প্রায় বেলা ২টো হয়ে গেল, নামতে নামতে ৯ কিলোমিটার পথ সন্ধে হয়ে যাবে, অতএব সন্তরাম সিংয়ের মন্দির প্রাঙ্গণেই রাত কাটাতে হল। তখন পূজারী নেই-লালা বলে মন্দির রক্ষক সযত্নে আমাদের দেখাশোনা করল। নিচের গ্রাম থেকে বহু লোকজন আসে, মেলায় থাকার ব্যবস্থা আছে। ৫০০ মতো কাঁথা ভাণ্ডারে মজুত থাকে, আমরাও সেসব রাতে ব্যবহার করলাম। এখানকার উচ্চতা মাত্র ১,৪৭০ ফুট, কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে রাতেও বেশ শীত। পচ্ছাম ঘরানার পীর হলেন এখানকার গুরু দত্তাত্রেয়। গিরনারের ৭টি পাহাড়ের মধ্যে ষষ্ঠটিতে মুসলমান পীরের স্থান-সপ্তমটি গুরু দত্তাত্রেয়র। পূজারী জাডেজা বংশীয়-তবে এখানে জাতিভেদ বিশেষ আছে বলে মনে হল না। মন্দিরে গুরুর পায়ের ছাপ আছে। রাম সিং (সাধু) এখানে ১৪৬০ সালে থাকতেন-চোখ বুজে ধ্যানে বসলে শিবরাত্রির দিন গিরনারে পৌঁছে যেতেন-কেউ উট থেকে পড়ে গেলে বা রাস্তা হারালে ওপর থেকেই বুঝতে পারতেন-এসব বহু কিংবদন্তী আছে। জুনাগড় থেকে এখানে সুড়ঙ্গ ছিল, এখন নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁর ধ্যান করার ঘর, ধুনি-ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দেখলাম। প্রতি সন্ধেবেলা 'লং লং' বলে ডাকলে কয়েকটি শিয়াল খেতে আসে-তারা না আসলে সেদিনের পূজা ব্যর্থ। রাম সিংয়ের সমাধি ছাড়াও তাঁর শিষ্যদের সমাধিও ক্ষুদ্রাকারে আছে।

কাহিনী যাইহোক, সারা বিকেল ও সন্ধেবেলায় উঁচু পর্বত থেকে চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী খুব সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে দেখা গেল । চতুর্দিকে লবণক্ষেত্র-শুভ্র বিস্তৃত ক্ষেত্র, রণে এখন জল নেই । এরকম মাইলের পর মাইল, তারপর একটু নীলের আভাস, অর্থাৎ সমুদ্র । সীমান্তে পুলের (চেকপোস্ট) অস্পষ্ট লাইন, কাল যে কোন পথ দিয়ে নামব জানি না । কেলাসিত সাদা বিস্তীর্ণ লবণক্ষেত্র-এখানকার লোকদের তো নুন কিনতে হয় না কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এখান থেকে ভারতে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল-এসব বাইরে যেত । বোধহয় তাই কাথিয়াবাড়ের গান্ধীজির মনে লবণ আইন অমান্য করার কথা মনে হয়েছিল । রাতের অন্ধকারে পথজানা লোকদের যাতায়াত করা সহজ হয়তো, চোরাবালি থাকা সত্বেও । তবে ওপর থেকে গতিবিধি সবই দেখা যায় । ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পূর্বে কদিন নাকি খুব লোক চলাচল হয়েছিল ।

রাতে দুধরুটি খেয়ে গভীর রাতে কাক-জ্যোৎস্নায় উঠে অপ্রস্তুত-ভোর হতে বেলা ৮টা এই পশ্চিমের দেশে । এবার কিছুটা উটের পিঠে চেপে নামার পালা-পাহাড়ি পথে পায়ে হাঁটাই সুবিধা । তবে আমার সঙ্গিনীদ্বয় অটল, গা ছড়ে গেলেও কিছুতে হাঁটবেন না । বালুকাময় কাঁটা গাছের মধ্য দিয়ে পথ পাহাড় থেকে নেমে গেছে-তবু সীমান্তে পৌঁছতে বেলা ১১টা হয়ে গেল-মাঝে মাঝে ছোট দুয়েকটা বাড়ি বালুর ও গাছের মধ্যে-এইভাবে লবণক্ষেত্রের কিনারায় এসে পড়া গেল । একদল ছাগল ও গরু ওদিক থেকে উঁচু ঢিবির অন্তরাল থেকে চলে আসছে দেখে আমরা বিপরীত দিক থেকে ওই পথেই চললাম । ঝকঝকে সাদা কেলাসিত লবণ-অনেক চাঙড় তোলা হল-কিছুদূরে সীমান্ত ইন্ডিয়া পু বা দেওয়াল । বেলা বাড়ছে ফিরতেই হল । গ্রামে পুলিশ চেকপোস্ট । কাগজপত্র দেখে ছেড়ে দিল । সূর্যের রশ্মিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে । বেলা ১টা নাগাদ কোটরা বা কুরন গ্রামে ক্লান্ত দেহে এসে পৌঁছলাম । মুসলমানদের গ্রাম এটি, খুব দরিদ্র গ্রাম, কেবল আখের গুড় ও মাপা জল খেয়েই ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাতে হল । জলাভাব আছে বোঝা গেল কিন্তু গ্রামের দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় লোকগুলি খুব অতিথিবৎসল । মুসলমান সিন্ধিদের সঙ্গে খুব মিল । মুসলমানদের বিয়ে দুপুরে হয়-সেদিন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, মেয়েরা রঙিন ঘাঘরা পরে জল আনতে যাচ্ছে, দেখে তো বোঝাই যায় না কোন জাতের । গ্রামবাসীদের কৌতূহল মেটাতে আর বিশ্রাম করা হল না, আমরা কোথা থেকে এসেছি সব জানতে চায় । তাদের গ্রামে স্কুল আছে মাস্টার নেই-যেন আমরা সদরে গিয়ে বলি-ইত্যাদি নানা কথাবার্তায় বেলা শেষ । ৫টায় বাস এল, বর তার দীর্ঘ দেহ ও যৌতুকের ২-৩টি পুঁটলি (বিয়ের জন্য তৈরি জামাকাপড়) ও ক্রন্দনরতা বৌকে নিয়ে একই বাসে উঠলেন ও পরের গ্রামে নেমে গেলেন । আমরা ধাওড়াতে থেমে চা ইত্যাদি পান করে অনেক রাতে ভুজে এসে পৌঁছলাম । প্রতি উটের দুদিনের ভাড়া ৬০ টাকা মোট-বেশ একটা অভিজ্ঞতা হল ।

এখানকার ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে বেট বলে-আমরা পচ্ছাম বেটের ওপরে কালাডুংরি থেকে ফিরলাম-অদূরে রয়েছে খদির বেট । এবার আমরা ভুজ থেকে পচ্ছাম এলাকা দিয়ে উত্তর সীমান্তেই ছিলাম বেশিদিন ।

এর পরদিন প্রাক্তন মহারাজার সেক্রেটারির ছেলে গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন-প্রতি কিলোমিটার ১ টাকা করে । ভুজকে কেন্দ্র করে ১৮৪ কিলোমিটার ভ্রমণ করা হল । এর মধ্যে গ্রামের পাঠশালা, আহীরদের গ্রাম, আশাপুরা দেবী ও তাঁর তিন বোনের মন্দির এবং মেকর দাদার স্মৃতিমন্দির ও তীর্থ দেখা হল । এই মেকর দাদা বাঁক কাঁধে করে জল নিয়ে এবং একটি কুকুর নিয়ে ঘুরতেন । গাধার পিঠেও জল থাকত-কুকুর অসহায় তৃষিত ব্যক্তির খোঁজ দিলে এঁরা তাদের জল খাওয়াতেন-এই মরুভূমির দেশে এ ধরনের সেবার কাজ কম নয় । তাই দেবতাতুল্য মানুষ, পশু দুটি-সবারই স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে সমাধিক্ষেত্রে । কিছুদূরেই এঁর ভ্রাতা স্থানীয় একজন মুসলমান পীরের ও সাধুর সমাধিক্ষেত্র । তাঁর শিষ্যরাও মুসলমান-চা না খাইয়ে ছাড়ল না । কচ্ছের ইতিহাস তো বহু প্রাচীন-প্রাচীন রাজাদের ও অন্যান্য বহু কীর্তির নিদর্শন আছে সর্বত্র । রুদ্রমাতার মন্দিরে মহিষমর্দিনী মূর্তি-কাছেই রুদ্রসাগর বাঁধ-যতদূর সম্ভব গাছপালা লাগানো হয়েছে, পথের দুপাশে মরুভূমি বলে মনেই হয় না । বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সমস্তটাই ধরে রাখার প্রয়াস চলেছে, ফলে পানীয় জল ও সবুজের অভাব কমছে । পাকা রাস্তা দূর দূর গ্রামেও তৈরি হয়েছে-তার দুপাশে গাছপালা । কয়েকটা গ্রাম ও মন্দির দেখার পর কোটেই গ্রামের এক সূর্যমন্দির দেখলাম । অতি সুন্দর কারুকার্য, অনেকটা ওড়িশার মতো, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এক আহীর গ্রামে দুপুরের খাওয়া না খাইয়ে ছাড়বেন না পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্ত্রী । এখানকার বাড়িগুলি বেশ দূরে দূরে । সবারই গরু-ছাগল আছে-তাদের খাদ্য জোটানোই বড় সমস্যা । এখানকার প্রাচীন বিখ্যাত রাজা লাখো ফুলানির রাজধানী কেরার (Kera) শিবমন্দিরটিও খুব সুন্দর ও কারুকার্যমণ্ডিত-তাঁর মা ছিলেন যাযাবর বংশীয়া এক সুন্দরী মহিলা । রাজার নামেই বর্তমানের লাখপতনগর । মাণ্ডবীর আগের গৌরব না থাকলেও ছোটখাটো স্থানীয় বন্দর হিসাবে নাম আছে-দেখলাম রাসায়নিক সার এসেছে বিদেশ থেকে, তাই বোঝাই হচ্ছে ডকে । আধুনিক যুগে উত্তরণ হয়েছে কচ্ছের-চতুর্দিকের ব্যস্ততা দেখলে তা বোঝা যায়-তবে এর জন্য মহারাজাদের তিন-চার পুরুষের কৃতিত্ব খুব । ক্ষমতা হস্তান্তরে আগে যিনি ছিলেন সেই মদন সিংজির নাম তো ক্রিকেট জগতে বিখ্যাত । এঁরা কচ্ছের জনসাধারণের জন্য ও দেশের জলাভাব মিটিয়ে আধুনিকীকরণ করার জন্য বহু প্রচেষ্টা করে গেছেন ভারত ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত-তার পরের দায়িত্ব তো ভারত সরকারের । সীমান্ত অঞ্চল বলে সরকারের বেশ মনোযোগ দিতে হয় ।

এখানে আবার আসব-পুব থেকে পশ্চিম অঞ্চল ঘোরা বাকি এখনও । -এক নতুন অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের স্বাদ নিয়ে ফিরলাম ।

ভ্রমণ মার্চ, ২০০২

ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলে

মস্কো থেকে সাইবেরিয়া হয়ে পিকিং

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা বলতেন, বাঙালি জাতটা যখন তৈরি হয় তখন ভগবান তাদের পায়ে রসিকতা করে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়েছিলেন ।

ভগবান পরে নিশ্চয় পস্তেছিলেন । কেননা, তাঁর এই রসিকতার ফলে গোটা বাঙালি জাতটা যখন সাত কোটি থেকে সতেরো কোটিতে দাঁড়াল, তখন তারা ভ্রমণতাড়িত হয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল । দুই বাংলায় ভাগ হয়ে গিয়েও সে বাতিক কমা তো দূরের কথা, যেন বেড়েই চলল । আর সেই কারণেই যে 'ভ্রমণ' পত্রিকার জন্ম এটা হলফ করে বলতে পারি ।

এখন আমার ওপর নির্দেশ এসেছে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে কীভাবে একজন যাত্রীকে মস্কো থেকে বেজিং-এ পৌঁছে দিতে পারে তার বিবরণ লিখে ফেলা । ভেবে দেখুন!

কমবয়েসের চরকি-ঘোরা সেইসব দিনগুলোর কথা মনে করতে অবশ্য ভালোই লাগে । দৃশ্যগুলো চোখে ছবির মতো ভেসে ওঠে । সেবার যেতে হচ্ছে বেজিংয়ে (তখন পিকিং বলা হত) শিশু-রক্ষার দায়ভার নিয়ে আমরা তিন তরুণী আগেভাগে চলেছি মস্কো থেকে চিনের দিকে, সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে । তখন ছিল হিন্দি-রুশি ভাই-ভাই আর হিন্দি-চিনি ভাই-ভাইয়ের যুগ । আমরা বয়েসে তরুণ হলেও খাতির পাচ্ছিলাম প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার মতো ।

আমরা তিনজনই ছিলাম এশিয়ার মেয়ে । ইরানের মেয়ে ১৯ বছরের তুরান ছিল সবচাইতে ছোট । ছোট্টখাট্ট পুতুলের মতো ছিল ভিয়েতনামের হো-থি-মিন । আর আমি ভারতের ছটফটে বাঙালি ।

মস্কো থেকে ছাড়ে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলগাড়িটি । ময়াল সাপের মতো পড়ে থাকে স্টেশনগুলোয় । যখন চলে তখন বোঝাই যায় না এ সেই স্টেশনে পড়ে পড়ে ঝিমনো

ট্রেন। হু-হু গতি আর হি-হি শীতের মধ্যে এর চলার কায়দাই আলাদা। সাতটি দিন ধরে কেবল চলতেই থাকবে চিনের দিকে। মাঝখানে পড়বে অসংখ্য শহর আর গ্রাম, বন আর পাহাড়, হ্রদ আর থমথমে আকাশ। আর যদি শীতকালে যান, তাহলে সত্যিই বিদেশ আসার মজা পাবেন বরফের খেলা দেখে।

ইভান ইভানোভিচের ওপর ছিল আমাদের দেখভালের ভার। মস্কো থেকে আমাদের জন্য যাচ্ছে তিন মন ওজনের রকমারি খাবার। এছাড়া ট্রেনের যাত্রীদেরও কিছু-না-কিছু দেবার মতো জিনিস ছিল। সকলেই এই লম্বা সফরে আমাদের মতো তিনটি বিদেশিনী পেয়ে মহা খুশি।

অজগরের মতো বিরাট ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলগাড়িতে ভেতরটার তাপ নিয়ন্ত্রিত। গরম কামরায় বসে সেই নভেম্বরের শীতে আমরা সাইবেরিয়ার ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারছিলাম না। আমার গরম জামাকাপড়ের ওপর যে ওভারকোটটা ছিল তা শুনলাম নাকি হেমন্তকালীন, শীতকালীন নয়। সেটা যে কেন এত ভাবনার বিষয় হল তখন বুঝিনি। পরে বেশ মালুম হয়েছিল।

ওরা আমাকে বলত সূর্যের দেশের মেয়ে। কেননা, আমার সত্যিই শীতবোধটা ছিল কম। আমার ইন্টারপ্রেটার ছিলেন প্রাভদার করেসপন্ডেন্ট ওলগা চেচটকিনা। ভারতে এবং কলকাতায় একাধিকবার এসেছেন যুব-প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি হেসে রুশি বন্ধুদের বলতেন, ওর কিচ্ছু হবে না এই শীতে। ও ভারতের সূর্য ধরে এনেছে ওর রক্তে।

ট্রেন যেদিন সাইবেরিয়ায় পৌঁছে থামল ইস্পাত শহর সভার্ডলভস্কে, সেদিনটি ছিল থমথমে আর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। বন্ধুবান্ধব, ওলগা কেউই নামতে চাইল না স্টেশনে। অথচ আমি তো ঠিকই করে রেখেছিলাম সাইবেরিয়ায় পৌঁছে আইসক্রিম খাব। দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধবদের বলতে হবে না? মাইনাস তিরিশ ডিগ্রিতে আইসক্রিম না খেলে তো অ্যাডভেঞ্চারই হল না। শুনে এক ইঞ্জিনিয়ার আমাকে আইসক্রিম খাওয়ালেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ওঁর অবশ্য ব্যাপারটা তেমন কিছু লাগেনি। গল্প শুনে পরে পিকিংয়ে আমাদের এক আফ্রিকান মহিলা প্রতিনিধি বলেছিলেন, বলিহারি যাই তোমাকে, আমি তো মরেই যাব ভেবেছিলাম। জানো, জীবনে আর দেশে ফিরে কখনও বলব না সাইবেরিয়ার মতো ঠান্ডা হাওয়া বইছে। বাপরে বাপ!

পরদিন ভোরে কুপেতে শুয়ে-শুয়ে মনে হল আবহাওয়াটা যেন কীরকম-কীরকম। ওলগা শুয়েছিলেন নিচের বাঙ্কে। ওপর থেকে নেমে মনে হল খালি পায়ের পাতার নিচে কীসব যেন কচমচ করে উঠল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি কেমন যেন ঝাপসা-ঝাপসা ঘষা কাচের মতো দেখাচ্ছে সব কিছু।

ট্রেনের কুপ থেকে করিডরে এসে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঠান্ডা সেদিন মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ছাড়ি-ছাড়ি করছে। বাইরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি-ওই তো পৃথিবীর বৃহত্তম বৈকাল হ্রদ। আমাদের ট্রেন চলেছে তার গা ঘেঁসে। অপূর্ব! এত ঠান্ডা, তবু জল বরফ হয়ে যায়নি তখনও। ফেরার পথে, চারমাস পরে, আমি একা ফিরছিলাম। হ্রদটা কোথায় বুঝতে পারিনি। সমস্ত জল তার জমে বরফ হয়ে একটা সাদা মাঠের মতো দেখিয়েছিল।

বৈকাল হ্রদকে হ্রদ না বলে সমুদ্র বললেই মানায়। সেটা পেরোতে আমাদের কদিন লেগেছিল মনে নেই। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, দুদিন তো বটেই। আমার মনে হয়, যারা শীতকাতুরে তাদের এসব দেশে গরমকালে আসাই ভালো। তাছাড়া ফুল, গাছপালা, প্রাকৃতিক শোভা সবই হিম হয়ে থাকে শীতের সময়। অবশ্য আমায় জিজ্ঞেস করলে বলব, সাইবেরিয়ায় আমি শীতেই যেতে চাই।

চিতা স্টেশনে পৌঁছতে হইচই করে লোকে ট্রেন থেকে নামতে লাগল। চিন, চিন। চিনের বর্ডার টাউনে পৌঁছে গেছি।

বাইরে সেদিন একটু ব্লিজার্ড অর্থাৎ বরফ-ঝড়ের লক্ষণ। আমরা সেদিন আর কেউ দেশি পোশাক পরিনি। ভেতরে মোটা-মোটা গরম জামা। ওপরে মোটা ওভারকোট (আমারটা ধার করা)। পায়ে স্নো-শু। কিন্তু হায়! চিতা স্টেশনে নেমে দেখি ঠান্ডা হাওয়া আমাদের পেড়ে ফেলার জন্য তৈরি হয়ে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে দেহের হাড় অবধি তার অবাধ গতিবিধি। দেখতে-না-দেখতে চোখের পাতা, ভুরু সব সাদা-সাদা হয়ে উঠল। এমনকী চোখের জলও যেন জমে উঠতে থাকল। আমরা শীতের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে বড়ই কাবু হয়ে পড়ছিলাম।

বাঁশি বেজে উঠল। আমরা এবার সোভিয়েতের সীমানা ছেড়ে চিনের দিকে এগিয়ে চলেছি। গজেন্দ্র গতিতে ঢিলেঢালাভাবে সীমানা পেরোতেই ওই-ওই চিন ওই-ওই। বরফজমা ট্রেনের জানলার কাচে নাক লাগিয়ে, খানিকটা অংশ হাত দিয়ে ঘঁষে নিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, দূরে ইস্টিশান মাঞ্চুরি। সেখানে চিনের তারা লাগানো লাল পতাকা। পতাকার নিচে অসংখ্য মানুষজন। ছেলে-মেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে।

মাঞ্চুরি ছেড়ে পিকিংয়ের দিকে যাবার পথে প্রতি স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে লোকে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগল-ফুল, পুতুল, উপহার ডাঁই হয়ে উঠল আমাদের কামরায়। ওন-ওন-সি স্টেশনটা মনে পড়ে। ছোট্ট-ছোট্ট বাচ্চারা স্টেশনেই ইয়াকো নাচ নাচছে বিরাট খঞ্জনীর তালে-তালে। অনেক রাতে চাও-ডাং স্টেশনে পৌঁছে দারুণ অবাক হয়ে

গেলাম। মাঞ্চুরিয়ার শীত অগ্রাহ্য করে রাতদুপুরে অনেক লোকজন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে।

পিকিং পৌঁছবার আগে, এক স্টেশনে, একজন বৃদ্ধা আমার হাত ধরে কেঁদেছিলেন। কেন জানি না, আমারও চোখে জল এসেছিল। আজ সেইসব হাসিকান্না কোন হাঁড়িতে ঢালা আছে তাই ভাবি।

সাতদিনের এই লম্বা ভ্রমণের সত্যি বলতে কী, আর জুড়ি নেই।

ভ্রমণ অক্টোবর, **১৯৯৩**

পাতাল-ভুবনেশ্বর

বিশ্বদীপ দত্ত

পাতাল-ভুবনেশ্বর গুহায় এখন জেনারেটারে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। অন্ধকারে নিচে নামা বেশ বিপজ্জনক ছিল। আলো দেওয়াতে দর্শনার্থী সমাগম বেড়েছে। নেমে যেতে পারছে ছোট ছেলেমেয়েরাও।

গুহার সামনে বসে দেখছিলাম দর্শন সেরে বেরিয়ে আসা যাত্রীদের। ছবি তুলে রাখার মতো মুখের চেহারা একেক জনের। যেন ফিরে আসছেন দ্বিগিজয় করে। নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দটাও চাপা থাকছে না।

খুবই আগ্রহ হচ্ছিল গুহাটা দেখার জন্য। কিন্তু বসে থাকতে হচ্ছিল গাইড নেই বলে। মাত্র একজনই গাইড কাজ করছেন সেদিন। অন্যরা অনুপস্থিত। আর গাইড ছাড়া গুহায় ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায় না। তবে ভালোই লাগছিল চাতালের রেলিংয়ের ধারে চেয়ারে বসে থাকতে। গাছের ছায়ায় দুপুরের রোদটাও গায়ে লাগছে না। চারপাশে পাহাড়ের ঢাল জুড়ে দেওদার বন। হাওয়ায় কাঁপছে দেওদারের ঝিরিঝিরি পাতা। লম্বা লম্বা ডাল ছড়িয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একেকটা গাছ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে গাছের নিচে আলো আঁধারিতে পরিবেশ মোহময়।

পাহাড় ঘুরে গুহার কাছে পথ এসেছে শিব আর শক্তির প্রাচীন মন্দিরের সামনে দিয়ে। ৮ কিলোমিটার দূরের গুপ্তরি থেকে কাঁচাপথে গাড়িও চলে আসে আজকাল সেই মন্দির পর্যন্ত। তারপর কংক্রিটের রাস্তায় মিনিটপাঁচেক হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যায় গুহায়। আগে গুপ্তরি থেকে আসতে হত পাহাড়ি পথে হেঁটে। পুণ্যার্থীরা আসতেন গঙ্গোলিহাটের কালীমন্দির দেখে মহাদেবের এই গুহা দর্শনে।

চাতালের এক কোণে বসে ভাণ্ডারীজি যাত্রীদের তদারক করছেন। নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হচ্ছে গুহায় ঢোকার আগে। ফিরে এসে প্রণামী দেওয়া নিয়ম তাঁর কাছে। আমাদের গাইড পেতে এত দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন ভাণ্ডারীজি। কথায় কথায় জানাচ্ছিলেন গুহার মাহাত্ম্যের কথা। মানসখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, অযোধ্যার সূর্যবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণ শিকারে বেরিয়ে বন্যবরাহের পিছনে ধাওয়া করে প্রথম এই গুহায় এসে পৌঁছন। ক্ষেত্রপালের নির্দেশে গুহায় ঢুকলে নাগকন্যারা তাঁকে নিয়ে যায় পাতালরাজ শেষনাগের

কাছে। শেষনাগ তাঁকে পাতালগুহা দর্শন করান। তাঁর বরে দিব্যদৃষ্টি পেয়ে ঋতুপর্ণ দর্শন পান পাতাল-ভুবনেশ্বর মহাদেবের।

ভাণ্ডারীজির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম গুহা দেখে বেরিয়ে আসছে আরেকটা দল। হাতে পায়ে কাদা অথচ দিব্যজ্যোতিতে ঝলমল করছে পরিদর্শকদের মুখ। ফটোগ্রাফারের আদর্শ সাবজেক্ট হয়ে বেরিয়ে আসছেন একেকজন। গাইড পেয়ে যাওয়াতে একটু পরেই আমরাও ফটোগ্রাফারের সাবজেক্ট। যদিও গুহাপথে ছবি তোলা দুষ্কর।

যেভাবে নামতে হচ্ছিল, জয়ন্তীর মহাকাল গুহার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেখানেও এরকমই সংকীর্ণ পাথরের ফোকর দিয়ে নিচে যেতে হয়। কিন্তু এত গভীরে নামতে হয় না সেখানে। ঢোকার আগে একজন বলেছিলেন খুব বেশিক্ষণ নিচে যেতে হবে না, পাওয়া যাবে সমতল গহ্বর। তাই মনে মনে তৈরি ছিলাম সেরকমই। আর প্রত্যেক ধাপে অবাক করে দিয়ে আরও লম্বা হতে হতে চলেছিল সুড়ঙ্গপথ। চলেছিল পাতাল লক্ষ করে।

কুয়োর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে না সেই গুহাকে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে বাঁক নিয়ে এগিয়েছে গুহাপথ, একটু পরে মনে হল যেন স্বয়ং শেষনাগ দাঁড়িয়ে আছে ফণা তুলে। আমরা বেয়ে নামছি সেই মহাসর্পের মুখ দিয়ে ঢুকে।

রাজা ঋতুপর্ণকে নিশ্চয়ই মশাল নিয়ে নামতে হয়েছিল পাতালপুরীতে। এখন টিমটিমে বিজলি আলো জ্বলছে। কিন্তু বড়ই অপ্রতুল সেই আলো। বাল্ব লাগানো হয়েছে যেখানে পারা গেছে। মাথা তুলেই দাঁড়ানো যায় না যেখানে, সেখানে আলো লাগাবে কোথায়! তাছাড়া সামনে পিছনের যাত্রীর আড়ালে পড়ে থেকে থেকেই পথ ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ নিয়ে আসা উচিত ছিল। আলো আছে ভেবে টর্চ আনেননি কেউই।

আট-দশজনের দলকে নিয়ে চলেছেন গাইড। লাইন করে পরপর নেমে চলেছেন যাত্রীরা। অসমান পিছল পাথর। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকেছে চুনা পাথরের গুহায়। ওপরের পাথর থেকে মাথা বাঁচিয়ে নামতে হচ্ছে প্রায় উবু হয়ে বসে বসে। লোহার শিকল রয়েছে ধরে নামার জন্য। দুপাশ দিয়েই চলেছে শিকল, কিন্তু এমনভাবে মাটিতে লেপটে আছে যে সামনে পিছনের লোকের টানাটানিতে শিকল-ধরা হাত পাথরে ঘষে যাবার ভয়। না ধরেই চলার চেষ্টা করছি, ঋতুপর্ণ যখন এসেছিলেন তখন তো যেতে হয়েছিল শিকল ছাড়াই। পিছনের ভদ্রমহিলা শিকল ধরতে গিয়ে পাথরে ঘষা খেয়ে মৃদু অভিযোগ জানাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে, একবার অন্ধকারে ভুল করে পাশের ইলেক্ট্রিক লাইন ধরে ফেলে কঁকিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করলেন পিছনের সঙ্গীদের। অবশ্য হাত পড়লেও ভয়ের কিছু নেই, সেদিক থেকে যথেষ্ট সুরক্ষিত ইলেক্ট্রিক লাইন চলেছে শিকলের পাশে পাশে। পিছনে তাকিয়ে দেখি ভদ্রমহিলা নামছেন পুরোপুরি পাথরে বসে, সুন্দর সালোয়ার

কামিজের মায়া ত্যাগ করে জল কাদায় মাখামাখি হয়ে । মুখে আর্তনাদের মতো জয়শঙ্কর ধ্বনি । বারবার অনুরোধ করছেন তাঁকে সাহায্য করতে, আর গাইডের উদ্দেশে চলেছে গালিগালাজ । গণ্ডগোল বুঝে গাইড অপেক্ষা করছিলেন বাঁকের মুখে । ভদ্রমহিলার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন সামনে হেঁটে তাঁকে সাহায্য করতে । কিন্তু ভদ্রমহিলা কারও ভরসাতেই আর এক পাও এগোতে চান না । ফিরে যেতে চান সেখান থেকেই । কিন্তু যাবেন কী করে! তাহলে ফিরতে হয় পুরো লাইনটাকেই । 'আউর থোরাসা' বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চললেন গাইড ।

অতল গুহার তল পাওয়া গেল অবশেষে । নেমে আসা গেল একটা পাথরের ঘরের মতো জায়গায় । সেখান থেকে এপাশে ওপাশে আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে সুড়ঙ্গপথ । প্রায় সাত-আটতলা বাড়ির সমান সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে হাঁপ ছাড়লেন যাত্রীরা । গাইডকে ঘিরে দাঁড়ালেন সেই পাতালপুরীর কাহিনী শোনার আগ্রহে ।

পুরাকালে লোকের ধারণা ছিল না কত গভীর এই পৃথিবী, বললেন গাইড । ঋষিরা ব্যাসদেবের কাছে জানতে চেয়েছিলেন পাতাল কত দূরে, পৃথিবীর শেষ কোথায় । ব্যাস বলেছিলেন, মহাজ্ঞানী বশিষ্টর মতো মুনিরাও সে কথা জানেন না । তাঁরা শুধু ততটাই জানেন যতটা পাতাল-ভুবনেশ্বরে গেলে জানা যায় । যেখানে মহাদেব থাকেন । পুণ্যবলে রাজা ঋতুপর্ণ দেখে এসেছেন সেখানে স্মর, সুমেরু, স্বধম নামে তিন আশ্চর্য গুহা । পাপীরা যেতে পারে না সেখানে । কলিযুগে বন্ধ হয়ে যাবে সেই গুহার বিভিন্ন দিক ।

ঋতুপর্ণ গুহায় মর্কটমণি জ্যোতি ঘিরে ঋষিদের তপস্যা করতে দেখেছিলেন । মাঝখানে বসে কপিলেশ শিবলিঙ্গের সামনে ধ্যান করছিলেন কপিলমুনি । গহ্বরের নানা জায়গায় ছিল বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ, গণনাথ শিবলিঙ্গ, সতীশ্বর শিবলিঙ্গ, সৌরেশ্বর শিবলিঙ্গ । আশপাশে ছিল ভয় জাগানো দৈত্য দানবের ভবন । পার হয়ে এসে চন্দ্র, তারা, গন্ধর্বদের দেখা পেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ । দেখেছিলেন অনন্তসর্প মাথায় ধারণ করে আছে পৃথিবী । সুড়ঙ্গপথে হেঁটে স্মরগুহায় এসে মহাদেব আর পার্বতীকে পাশা খেলতে দেখেছিলেন । অন্য দেবতারা স্তুতি করছিলেন তাঁদের । দিব্যদৃষ্টি নিয়ে ঋতুপর্ণ গুহাপথে মানস সরোবর, রামেশ্বর, কাশী, উজ্জয়িনী, গঙ্গাসাগরের মতো পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করে এসে সুমেরু গুহায় বাঘছাল পরা জটাধারী শিবকে শয়ন করতে দেখেছিলেন । পাশে বসেছিলেন উগ্রতারাদেবী । স্বধম গুহায় নিয়ে গিয়ে শেষনাগ তাঁকে তেজময় জ্যোতি দেখিয়েছিলেন । সেই জ্যোতি থেকেই সৃষ্টির আদিকালে উৎপন্ন হয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর । গুহাতলে বয়ে চলা পুণ্য উদকস্রোত থেকে জল পান করে ঋতুপর্ণ কেদারযাত্রার পথ ধরে কেদারনাথ দর্শন করেছিলেন ।

আরও নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলেন ঋতুপর্ণ গুহার কন্দরে। দেখেছিলেন মুণ্ডহীন গণেশের দেহ, বহুপদ ঐরাবত হাতি, মহাদেবের বিশাল জটা। ব্রহ্মদ্বার গুহায় ছিল কামধেনু। তার দুধ গড়িয়ে এসে নিচে তৈরি হয়েছে শিবকুণ্ড। সেখানে অবগাহন করছিলেন অন্য সব দেবদেবীরা। সেই জল পান করলে মহাদেবের ত্রিশূলাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। রাজা ঋতুপর্ণ মহাদেবের আজ্ঞায় শিবকুণ্ডের জল পান করে অমরলোকে স্থান পাওয়ার যোগ্য হয়েছিলেন।

কাহিনী শেষ করে গাইড দর্শনার্থীদের নিয়ে গেলেন গুহার একপাশে। আঙুল দিয়ে দেখালেন, শেষনাগ। একদিকে ঢালু হয়ে নেমেছে গুহার ছাদ। সেদিকে তাকিয়ে দর্শনার্থীরা হতবাক। দেওয়াল বেয়ে ছাদের গায়ে ফণা মেলেছে মহাসর্প। বিষের থলিও রয়েছে, ছাতার মতো ফণার ভেতরে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন গাইড। পাথরের গায়ে আপনা থেকেই তৈরি হয়েছে এই ভাস্কর্য। এখানেই তবে পাতাল অধিপতি শেষনাগের দেখা পেয়েছিলেন রাজা ঋতুপর্ণ!

গাইড নিয়ে চললেন গুহার ভেতরে। যেতে যেতে মাটির দিকে ইশারা করে দেখালেন, শেষনাগের স্কেলিটন। মেঝেতে মসৃণ পাথরের ঢালে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড সাপের কঙ্কালের মতো ছাপ। তার ওপরেই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কেউ কেউ, গাইডের কথায় চমকে সরে এলেন। অবিকল সাপের শিরদাঁড়ার দুপাশে কাঁটার মতো হাড়ের সারি খোদাই হয়ে রয়েছে। বিস্মিত যাত্রীরা সন্তর্পণে পার হয়ে এলেন জায়গাটাকে।

গুহার খাঁজে শিবলিঙ্গের আকারের চার পাথর দেখিয়ে গাইড বলছিলেন সেগুলো চার যুগের প্রতীক। স্থির হয়ে আছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। বেড়ে উঠছে কলিযুগ। চুনাপাথরের গুহায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলের ফোঁটা জমে তৈরি হয় এরকমই নানা আকৃতি, বুঝিয়ে বলছিলেন গাইড। তাদের ছেড়ে এগিয়ে গেলাম গুহার আরও ভেতরে। দল ছেড়ে এলে নির্জন পাতালপুরী আরও রোমাঞ্চকর। চারপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শুধু পাথরের স্রোত। বড় বড় ঢেউয়ের মতো মেঝে আর ছাদ। দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে নানা চিত্র-বিচিত্র প্রতিকৃতি। কল্পনা করা কঠিন নয়, দৈত্য দানব দেবদেবীরা ভিড় করে আছেন চারদিকে। বিজলি আলোয় দেখতে সুবিধা হলেও কমে গেছে রহস্যময়তা। অন্ধকার গুহায় মশাল নিয়ে যখন যেতে হত তখন দেওয়ালের আনাচে-কানাচে মশাল তুলে হঠাৎই পাওয়া যেত আবিষ্কারের চমক। গুহা থেকে গুহায় ঋতুপর্ণ খুঁজে পেয়েছিলেন চমকের পর চমক। পরিচিত জগৎ থেকে বহু বহু দূরে পাতাল গুহার নিচে দেবদেবীর প্রতিকৃতির অলৌকিক আবিষ্কারে রাজা ঋতুপর্ণের দিব্যদৃষ্টির উন্মোচন অস্বাভাবিক নয়।

গাইড এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন দলটাকে অন্যদিকে। ফিরে গিয়ে যোগ দিলাম দলে। গণেশদ্বার দিয়ে ঢোকার পথে দেখা গেল মুণ্ডহীন গণেশের মূর্তি। ছাদ থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে তার ওপরে। জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা হতে হতে বড় হয়ে উঠছে কলেবর। ঠিক গলার মাঝখানেই টপ টপ করে ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা। তৈরি হচ্ছে গণেশের মাথা। তবে হয়তো সময় লেগে যাবে হাজার হাজার বছর। এভাবেই জমে জমে স্ট্যালাগমাইট শিবলিঙ্গ তৈরি হয়ে আছে গুহার নানা জায়গায়। পার হয়ে অন্য গুহার দ্বারপথে দেখা দিল বিশাল শিবের জটা। ছাদ থেকে জল গড়িয়ে আসছে জটা দিয়ে। ভাঁজে ভাঁজে পাথরের কারিকুরি বিস্ময়কর। ভক্তিতে নতজানু যাত্রীদল।

ছাদের ওপরে দেওয়ালের খাঁজে সাপের প্রতিকৃতি হয়ে আছে নানা জায়গায়। এক দেওয়ালে দেখা গেল সরু সরু সাপেরা যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে নিচের গর্তে। জন্মেজয়ের যজ্ঞকুণ্ড, বললেন গাইড। পুরাকালে সর্পমেধ যজ্ঞ করেছিলেন রাজা জন্মেজয়। তপস্যাবলে যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীর সর্পকুল। বহুপদ ঐরাবত হাতি দেখারও সৌভাগ্য হল দর্শনার্থীদের। ছাদ থেকে পরপর ঝুলে আছে স্ট্যালাকটাইট সংগঠন। অবিকল পেটের নিচ থেকে হাতির পায়ের মতো দেখাচ্ছে তাদের। পৌরাণিক কাহিনীর একের পর এক আবিষ্কারে যাত্রীরা তখন মন্ত্রমুগ্ধ। গাইড নিয়ে গেলেন আরেক গুহায়। দ্বারপথে সেখানে যেন পাথরের কারুকার্যময় পেলমেট। দেশলাই জ্বালিয়ে আলো ফেললেন গাইড। ফোঁটা ফোঁটা দুধ গড়িয়ে আসছে পেলমেট থেকে। কামধেনুর দুধ, গাইড জানালেন। এটাই রাজা ঋতুপর্ণের দেখা ব্রহ্মদ্বার গুহা। এখানেই শিবকুণ্ডের জল পান করেছিলেন তিনি।

'নৈনিতালে যে সাহেবগুলো বেড়াতে আসে তাদের সবাইকে এখানে পাঠানো উচিত', রেগে রেগে ফিসফিস করে বললেন এক সহযাত্রী ভদ্রলোক। 'দেখে যাক সবাই ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্য। দুদিনের কালচার নিয়ে ভারত গর্ব করে না'। ভদ্রলোকের বাড়ি হলদোয়ানির কাছে। কুমায়ুনের ঐতিহ্য নিয়ে তিনি বিশেষভাবে গর্বিত। অনেক কিছু দেখেছেন তবে পাতাল-ভুবনেশ্বরে প্রথমবার এলেন। এই পুণ্য থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন কপালের দোষে। ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় সব সময়। ভজন-পূজন প্রায় হয়েই ওঠে না। প্রণাম করতে আদেশ দিলেন তিনি সহধর্মিনীকে। জোড় হাত কপালে ঠেকালেন সবাই।

এদিকে কামধেনুর দুধ স্পর্শ করে আরেক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত বিচলিত। হাত দিলে দুধ জল হয়ে যাচ্ছে। কলিযুগের পাপে জল ঝরছে কামধেনুর পয়োধর থেকে। ভয়াতুর যাত্রীরা আর নিচের শিবকুণ্ডের জলে হাত দিলেন না। সেখানে নিমজ্জিত আছেন অন্য সব

দেবদেবীরা । বিনা আজ্ঞায় জল ছুঁলে শিবের ত্রিশূলাঘাতের কথা মনে ছিল । এগিয়ে চললেন কপালে হাত ঠেকিয়ে ।

পিছল পাথরে টাল সামলে সংকীর্ণ ফাটল দিয়ে গাইড নিয়ে এলেন একপ্রান্তের ছোট্ট আরেক গুহায় । সেখানে রয়েছে পাতাল ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ । গাইডের নির্দেশে শিবকে ঘিরে বসলেন যাত্রীরা । প্রার্থনা করলেন মনস্কামনা পূরণের আশায় । সামান্য দক্ষিণা রেখে ফিরে চললেন সবাই নিঃশব্দে ।

গাইড বলছিলেন, আরও অনেক বড় ছিল এই গুহা । যাওয়া যেত বহুদূর । কলিযুগে সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে তার নানা পথ । তবু এখনও যোগ আছে গঙ্গোলিহাটের মহাকালী মন্দিরের কাছের পাতালগঙ্গার সঙ্গে । এরকমই প্রাকৃতিক গুহা আছে সেখানেও । ফেরার পথে একটা গর্ত দেখালেন গাইড, যেখান দিয়ে ঢোকা যেতে পারে আরও ভেতরে । মাটির কাছাকাছি ছোট্ট সেই সুড়ঙ্গে ঢুকতে হবে শুয়ে পড়ে । যাত্রীরা আর উৎসাহী নন । আলোও নেই সেদিকে । যা দেখা গেছে তাই যথেষ্ট । ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে চললেন সবাই ।

পিছল গুহায় নামার চেয়ে উঠে আসা কম কষ্টকর । বেরিয়ে আসার তাগিদে শিকল ধরে ধরে দলটা ওপরে উঠে এল চটপট । দিনের আলো কত আনন্দের তা বোঝা যায় এরকম একটা গুহার বাইরে এলে । ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এসে সামনের বারান্দা, পাহাড়, দেওদারের জঙ্গল, ভাণ্ডারীজির হাসি আরও মনোরম ।

দর্শনী দিতে হবে বাক্সে । জমা রেখে যাওয়া ব্যাগ জুতো নিতে হবে । গাইডকেও দিতে হবে দক্ষিণা । কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । পাঁচ-দশ টাকা যা অভিরুচি দিয়ে চলে যাচ্ছেন অনেকে । অন্তত জেনারেটার চালানোর তেলের খরচটাও যে উঠছে না, তাতেও আপত্তি করছেন না মন্দির কমিটি । হাত পায়ের কাদা ধুতে হবে । পাশের কলের কাছে গামছা-সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছেন একজন । ভালো করে সাবান ঘষে কাদা ধুয়ে আলাদা গামছায় পা হাত মুছে তাঁকে দিচ্ছে সবাই দক্ষিণা । না দিলেও কিছু না, তিনি শুধু দাঁড়িয়ে আছেন হাত জোড় করে । বিকেলের আলোয় পাহাড়ের দেওদার বন অসাধারণ । তার ওপর ব্যবস্থাপকদের আচরণে, দিনের বেলাতেই চারপাশে গঞ্জিকা সেবনে ঢুলু ঢুলু ব্যক্তিত্ব দর্শনে যাত্রীরা অভিভূত । ফিরে যাচ্ছেন সবাই খুশি খুশি মনে । যাওয়ার পথে ঘুরে যাচ্ছেন চন্দ্ররাজাদের তৈরি শিব আর শক্তির প্রাচীন মন্দির থেকে । সামনের ঝুপড়ি দোকানে খেয়ে যাচ্ছেন চা আর ঘুগনি ।

ফিরতে হবে সবাইকে গুপ্তরি হয়েই । কাছাকাছি থাকার হোটেল আছে গুপ্তরি থেকে ৬ কিলোমিটার দূরের গঙ্গোলিহাটে । সেখানে জাগ্রত মহাকালী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন দূর দূর থেকে পুণ্যার্থীরা । জনশ্রুতি, আগে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল সেই মন্দিরে ।

মন্দির থেকে ধ্বনি শোনা যেত, দেবী ডাকছেন কীর্তি বাগেশ্বর মহাদেবকে । সেই ডাক যে শুনতে পেত অনিবার্য ছিল তার মৃত্যু । দেবীর রক্তরোষে দূরে পালাচ্ছিলেন আশপাশের গ্রামের মানুষেরা । জনশূন্য হয়ে পড়েছিল সরযূ আর রামগঙ্গা নদী ঘেরা প্রাচীন গঙ্গাবলী পরগনা । আদি শঙ্করাচার্য স্বয়ং এসে তপস্যা করে নিবারণ করেন দেবীর নররক্ত পিপাসা । আবার শ্রী ফিরে পায় গঙ্গোলিহাট । পাতাল-ভুবনেশ্বর আর গঙ্গোলিহাট ঘুরে যাওয়া যায় আলমোড়া কিংবা পিথোরাগড় থেকেও । ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকায় জিপ রাজি হয়ে যায় দিনে দিনে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাসে আসতে চাইলে রাতে থাকতেই হবে কাছাকাছি কোথাও । সাধারণ হোটেল আছে গুপ্তরির ১৯ কিলোমিটার উত্তরে বেরিনাগ শহরেও । সেখান থেকে হিমালয়ের তুষার শিখরের দৃশ্যও অসাধারণ । শহরের দেড় কিলোমিটার ওপরে আছে নাগনাথের প্রাচীন মন্দির । মন্দিরের কাছ থেকে আরও সুন্দর দেখায় তুষার হিমালয় আর তার নিচে পাহাড়ের ঢালে বেরিনাগ শহরের দৃশ্য । তবে বেরিনাগের হোটেল খুব পছন্দসই হবে না । থাকার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা বেরিনাগ থেকে আরও ১০ কিলোমিটার দূরের চৌকরি । সুন্দর পরিবেশে ট্যুরিস্ট বাংলো আছে সেখানে । ইংরেজ আমলে চা-বাগানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল বেরিনাগ-চৌকরি অঞ্চল । এখন চৌকরি কুমায়ুনের পর্যটন মানচিত্রে এক নতুন আকর্ষণ । সবুজ পাহাড়ের ঢালে নির্জন চৌকরির ট্যুরিস্ট লজ থেকে শরতের নীল আকাশে ঝকঝকে রুপোলি হিমালয় মনে হয় যেন ছুটে গিয়ে ছোঁয়া যাবে । আলমোড়া থেকে বাগেশ্বর হয়ে বাস ছাড়াও শেয়ারের জিপ আসছে চৌকরিতে ঘণ্টাছয়েকে । চৌকরি থেকেও বাসে বা শেয়ারের জিপে বেরিনাগ হয়ে চলে আসা যায় ২৯ কিলোমিটার দূরের গুপ্তরিতে । গুপ্তরি থেকে পাতাল-ভুবনেশ্বর গ্রামে যাওয়ার শেয়ার জিপ পাওয়া যায় । তবে শেয়ার জিপে এলে মন্দিরে পৌঁছতে হাঁটতে হবে কিলোমিটার দুয়েক । পুরো জিপ ভাড়া করে এলে চলে যাওয়া যায় মন্দির পর্যন্তই । খাওয়া-দাওয়ার তেমন ব্যবস্থা নেই পাতাল-ভুবনেশ্বরে । পিকনিকের মেজাজে দিনটা সেখানে কাটাতে চাইলে সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়ে আসতে হবে । গুহা আছে কুমায়ুন পাহাড়ের নানা জায়গাতেই । কিন্তু পাতাল-ভুবনেশ্বরের সঙ্গে তুলনা চলে না অন্য কোনও গুহার । এখনও তীর্থযাত্রীদের কাছেই বেশি পরিচিত এই জায়গা । নৈনিতাল-আলমোড়ায় বাইরে থেকে যত লোক বেড়াতে আসেন তার একভাগও এসে পৌঁছন না পাতাল-ভুবনেশ্বরে । তবে নির্জনতার টানে যাঁরা চৌকরিতে আসেন তাঁরা সবাই ঘুরে যান এদিক থেকে । চৌকরির বরফচুড়োর কাছে আয়েশী বাংলোতে একরাত কাটিয়ে পাতালগুহা দেখে যাওয়ার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকে কুমায়ুন ভ্রমণে ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

ইছামতীর মশা

শ. ঘোষ

এটা লিখবার কথা ছিল নবনীতার, নবনীতা দেবসেনের। কিন্তু পঁচিশ বছর পেরিয়ে যাবার পরেও যখন লিখলেন না তিনি, অগত্যা তখন আমাকেই বলতে হয় গল্পটা।

গল্প অবশ্য এর মধ্যে কিছু নেই, আর ভ্রমণ তো একেবারেই নয়। কজন বন্ধুবান্ধবের একসঙ্গে নাজেহাল হবার একটা বৃত্তান্ত শুধু। হয়েছিল কী, ১৯৭৫ সালে একবার বনগাঁ যেতে হয়েছিল আমাদের। এই নিয়ে স্মৃতি।

বনগাঁ কেন হঠাৎ? কথাটা তাহলে শুরুর থেকেই শুরু করতে হয়।

১

বাংলাদেশ থেকে আমাদের এক বন্ধু এসেছেন নার্গিস আখতার। অল্পদিনই থাকবেন, এসেছেন তাঁর ডাক্তারির কাজে। ওরই মধ্যে কলকাতার সংস্কৃতি-জগতের প্রত্যক্ষ খানিকটা ছোঁয়াও পেতে চান বলে এখানে ওখানে ঘুরছি তাঁকে নিয়ে। আর সেইভাবেই এক সন্ধ্যায় গানের এক অনুষ্ঠান শুনতে হাজির হয়েছি রবীন্দ্রসদনে।

গান শুরু হবার অল্প আগে, আসনের সামনে এসে দাঁড়ান এক দীর্ঘাঙ্গ যুবা। বলেন তিনি: 'আপনাকেই খুঁজছিলাম, খুব ভালো হল পেয়ে গেলাম এখানে।'

'খুঁজছিলেন? কেন খুঁজছিলেন?'

'আপনাকে একবার বনগাঁ নিয়ে যেতে চাই আমরা। যেতেই হবে কিন্তু। সামনের শনিবারে গাড়ি করে নিয়ে যাব, ফিরিয়ে দিয়ে যাব রবিবারেই। বাড়িতে যেতাম, কিন্তু পেয়ে গেলাম এইখানেই-'

'কেন হঠাৎ নিয়ে যাবেন?'

'ওখানে একটা কবি-সম্মেলন আছে। ওখানকার কবিরা করবেন, অনেক বড় করে। কলকাতা থেকেও কজনকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে ওরা পাঠিয়েছে।'

‘সম্মেলনে তো আমি যাই না বড়-একটা। আমাকে ছেড়ে দিন, অন্য কারও সঙ্গে কথা বলুন।’

‘অন্যদের সঙ্গে কথা তো হয়েইছে। ওঁরা সবাই যাবেন বলেছেন। শক্তিদা যাবেন, সুনীলদা যাবেন। আপনাকেও যেতেই হবে।’

‘শুনুন, সম্মেলনে কবিতা পড়তে আমার একটু অসুবিধে হয়। হয়তো ঠিক জানেন না আপনারা-’

‘না না, জানব না কেন, জানি। আপনাকে পড়তে হবে না। শুধু গেলেই হবে। ওখানে সবাই খুব অপেক্ষা করে থাকবে। ‘না’ বলবেন না। না নিয়ে যেতে পারলে আমি খুব লজ্জায় পড়ে যাব।’

‘দেখুন, আমার আরও অনেক অসুবিধে আছে। এই যে দেখছেন আমার এক বন্ধু, ঢাকা থেকে এসেছেন দু-চারদিনের জন্য, তাঁকে ফেলে রেখে আমি চলে গেলাম বনগাঁয়ে -এ কি হয়?’

আমার কুনো স্বভাবটা পুরো জানা নেই বলে মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে ওঠেন নার্গিস: ‘তা হবে না কেন? আমি প্রতিমাদির সঙ্গে দিব্যি থাকতে পারব। ঘুরে আসেন-না আপনি।’

তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই যুবকটি বলে ওঠেন: ‘তা কেন, ফেলে রেখে যাবেন কেন, ওঁকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন না। তাহলে তো আরওই ভালো হয়। যাবেন, দিদি? চলুন-না? আপনার তাহলে বনগাঁ দেখাও হয়ে যাবে।’

‘সত্যি তো, তা তো গেলেই হয়’-বলেন নার্গিস-‘সেইসঙ্গে এখানকার কবি-সম্মেলন কেমন হয় সেটাও বেশ দেখা হয়ে যাবে।’

কথাটা অবশ্য মন্দ নয়। কমাস আগেই এঁদের আতিথ্যে বাংলাদেশের এখানে-ওখানে দিব্যি ঘুরে এসেছি-তার বদলে এঁকে যদি অন্তত বনগাঁটাই দেখিয়ে দেওয়া যায়, সেটাই-বা কম কথা কী! উপরন্তু শক্তি-সুনীল! ভেতরে ভেতরে নিজেকে তৈরি করে খানিকটা সন্দেহের স্বরে যুবকটিকে প্রশ্ন করি: ‘কিন্তু কবিতা পড়তে বলবেন না তো আমাকে?’

‘না না, কখনওই নয়। তাহলে কিন্তু ওই কথাই রইল। শনিবার বিকেলে গাড়ি নিয়ে আপনার বাড়িতে চলে যাব। আপনারা কিন্তু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে থাকবেন। আটটার মধ্যে পৌঁছতে হবে বনগাঁয়ে। ঠিক আছে? আচ্ছা চলি।’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল গান।

২

‘আচ্ছা, একরাত্রি থাকতে হবে বলে আমাদের তো সঙ্গে কিছু নিয়ে নেওয়া উচিত?’ শনিবার বিকেলে জিজ্ঞেস করেন নার্গিস ।

‘আমার কিছু দরকার হবে না । আপনি একটা ছোট ব্যাগে টুকিটাকি কিছু নিয়ে নিতে পারেন ।’

‘কিছু তো নিতেই হবে । অন্তত আমার ওষুধ তো নিতে হবে । দশটা নাগাদ একটা ওষুধ খেতে হয়, তার একটা টেনশনও হয়-ও, আচ্ছা, ছেলেটি তো বলল আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাব-তাই তো?’

‘মনে হয় । খুব তো বেশি দূর নয় এখান থেকে । দু-আড়াই ঘণ্টা লাগবে বড় জোর ।’

‘তাহলে কোনও সমস্যা নেই । ছেলেটি আসবে তো সময়মতো?’

‘একেবারে সময়মতো কি আর আসবে? বলা-সময়ের সঙ্গে আধঘণ্টা অন্তত জুড়েই নিতে পারেন ।’

তৈরি হয়ে বসে থাকি আমরা । যুবকটির আধঘণ্টা দেরিও হতে পারে, কিন্তু আসবার পর তাঁর যেন সময় নষ্ট না হয় সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য । আটটা না হোক, অন্তত দশটার মধ্যে তো পৌঁছতেই হবে নার্গিসকে ।

কিন্তু না, আধঘণ্টা একঘণ্টা দুঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরেও সে-যুবকের কোনও হদিস নেই । নার্গিস তখন বলতে শুরু করেছেন: ‘আচ্ছা, ওই ছেলেটিকে আগে কখনও দেখেছেন আপনি?’

‘না তো ।’

‘তাহলে কে না কে একটা কথা বলল, তাও আপনার বাড়িতে নয়, রবীন্দ্রসদনে-আর অমনি আপনি নেচে উঠলেন? এ আবার কীরকম ব্যাপার? ঢাকায় এরকম রাজি হবে না কেউ ।’

‘কী মুশকিল, আমি কোথায় নেচে উঠলাম । আপনি বললেন বলেই তো রাজি হতে হল ।’

‘দূর, ব্যাপারটাই বাজে । ধোঁকা দিয়ে গেছে আপনাকে । ছাড়েন তো, কাল আমরা নিজেরা-নিজেরাই বনগাঁ চলে যাব, প্রতিমাদিকে নিয়ে ।’

'আরে যাবই যদি তো বনগাঁ কেন যাব? অন্য কি কোনও জায়গা নেই?'

ওভাবে রাজি হয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি বুঝে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে কথা বলতে থাকি অন্য নানা প্রসঙ্গ নিয়ে, যেন আমাদের কোথাও যাবার কথা ছিলই না কখনও, যেন এইভাবেই একটা সান্ধ্য আড্ডার জন্যই বসে আছি আমরা ।

এমন সময়ে, রাত যখন প্রায় সাড়ে আট, ঘণ্টি বাজল দরজার । কিছুটা বিস্রস্ত শরীরে যুবাটি ঘরে এসে দাঁড়ালেন । ক্ষীণ হেসে বললেন: 'আপনারা তৈরি তো?'

ফুঁসে উঠলেন নার্গিস: 'আচ্ছা লোক তো আপনি । তিন ঘণ্টা পরে এসে জিজ্ঞেস করছেন আমরা তৈরি কি না । না, তৈরি না । এখন রওনা হলে তো দশটার মধ্যে পৌঁছনো যাবে না, আমার একটু অসুবিধে আছে তাতে । যেতে পারছি না আমি । কিছু মনে করবেন না ভাই ।'

'সত্যি, আমার খুব দেরি হয়ে গেল । অনেক জায়গায় ঘুরতে হল তো । গাড়ি আসবার কথা ছিল দুটো, কিন্তু পাওয়া গেছে একটা । সব জায়গাতেই দেরি করে দিল । দিদি, যাবেন না?'

'না ভাই, আমার কোনও উপায় নেই । আর তাছাড়া আমার যাওয়াটা তো কোনও ব্যাপারও না, শঙ্খদা গেলেই হল ।'

'না, এমন অবস্থায় আমিও আর যেতে পারি না । বলেই তো ছিলাম আপনাকে ফেলে রেখে যাব না ।'

'আপনি তো কথা দিয়েছিলেন ।'

'ঠিকই । কিন্তু আপনি আপনার কথা রাখেননি । এই কি আপনার বিকেল?'

এর পর ঘরে অল্প একটু নীরবতা । তার পরে তাকিয়ে দেখি, শক্তসমর্থ সেই যুবকের দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে নামছে জল ।

'আরে আরে, এটা কী করছেন । এতে এত ভেঙে পড়বার কী আছে । আমাকে দিয়ে তো আপনাদের কাজও কিছু হত না । আমি না গেলে কী অসুবিধে?'

'কিন্তু আমি কী করে বনগাঁয়ে ফিরব? আমাকে যে ওরা একেবারে মেরে ফেলবে! কলকাতা থেকে আপনারা কেউই যদি না যান-'

'কেউই কেন যাবে না । অন্যরা তো যাচ্ছেন?'

'না, যাচ্ছেন না। শক্তিদার বাড়িতে গিয়ে দেখি শক্তিদা নেই। সুনীলদাও এখন বলছেন কী-যেন-সব অসুবিধে আছে। অনেক কষ্টে শুধু নবনীতাদিকে রাজি করিয়ে ধরে এনেছি, এখন আপনি না গেলে উনিও যদি বেঁকে বসেন, আমি কী করব তখন-'

'ধরে এনেছেন মানে? কোথায় এনেছেন?'

'নীচে গাড়িতে বসে আছেন ওঁরা। নবনীতাদি, অজিতেশদা-'

'সে কী কথা! গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছেন আর বলেননি এতক্ষণ? ছি-ছি-ছি। চলুন চলুন, যাই-বা-না-যাই একটু দেখা তো করতে হবে ওঁদের সঙ্গে।'

ঝাঁপ দিয়ে ওঠেন নার্গিসও। 'নবনীতা দেবসেন? অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? বলেন কী! দেখতে পাব এঁদের? যাব একটু সঙ্গে?'

সবাই মিলে নেমে এলাম সার্কুলার রোডের ওপর, উল্টোদিকের ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শাদা একখানা অ্যামবাসাডর।

একেবারে হৈহৈ করে উঠলেন অজিতেশ: 'আসুন আসুন, চলে আসুন।'

আমি বলি: 'না না, আসছি না আমি। সেই কথাটুকু জানাতেই শুধু নেমে এলাম।'

'সে কী? যাবেন না? এরা তো মহা মুশকিলে পড়ে যাবে তবে।'

প্রত্যাশিতভাবেই নবনীতা বলেন: 'বা রে, আপনি যাবেন বলেই তো আমাকে ধরে নিয়ে এল। এই ছেলে, এসব কী ব্যাপার?'

ছেলেটি অবশ্য চুপ। মিথ্যেবলার অপবাদ থেকে ওকে বাঁচাবার জন্য বলি: 'আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওঁর আসবার কথা ছিল ঘণ্টাতিনেক আগে। মুশকিল হয়েছে কী, এত দেরিতে আমার এই বাংলাদেশের বন্ধুটির অসুবিধে। এঁরও যাবার কথা ছিল। আলাপ করিয়ে দিই-এঁর নাম নার্গিস আখতার-ঢাকা থেকে এসেছেন-'

অজিতেশ বলেন: 'হ্যাঁ হ্যাঁ ওঁর কথাও তো বলেছে। তা উনি যাবেন না কেন? নার্গিস-নার্গিসই তো নাম বললেন-চলে আসুন চলে আসুন। বেশ মজা করা যাবে-'

'মজা তো করা যাবে। কিন্তু রাত দশটায় আমার একটা ওষুধ খাবার সমস্যা আছে।'

'রাখুন তো! কোনও সমস্যাই সমস্যা নয়।'

'গাড়িকে তখন অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে।'

'থাকবে দাঁড়িয়ে। সবাই আছি সঙ্গে, সমস্যা আবার কী! চলুন, উঠে আসুন শঙ্খদা।'

‘উঠে যে আসব, বুঝতে তো পারছি না জায়গা হবে কেমন করে।’

‘জায়গা কেন হবে না? আমরা তো সবাই সুজন! আর দেখুন তো ড্রাইভারসাহেব, আপনার তেঁতুলপাতায় নজন কি হচ্ছে?’

শেষ পর্যন্ত, যাওয়াই সাব্যস্ত হল। অজিতেশের সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী রত্না, রত্নার সঙ্গে তাঁর তবলার মাস্টারমশাই, আছেন নবনীতা আর নার্গিস, আছেন গাড়ির বিশালবপু চালক, পথের দিশারি দীর্ঘদেহী যুবা আর সেইসঙ্গে আমি। এপর্যন্ত হিসেব করলে আটজন, তবু নজনই শেষমেশ দাঁড়াল। সেটা একারণে নয় যে গাড়ির মধ্যে অনেকেই ছিলেন শরীরে বেশ ফুল্ল এবং স্ফূর্ত, কারণটা এই যে রত্নার হারমোনিয়ামটা গাড়ির ডিকির মধ্যে ধরে গেলেও তাঁর তানপুরাটা টানটান করে রাখতে হয়েছিল গোটা গাড়ির মধ্যবর্তী এক সেতু হিসেবে, সামনের সিটে ড্রাইভারের বাঁপাশ দিয়ে পিছনের সিটে অজিতেশের কাঁধ পর্যন্ত লম্বালম্বি।

তেঁতুলপাতা নড়তে শুরু করল নটা নাগাদ, বনগ্রামের পুণ্য অভিমুখে।

৩

ঠাসাঠাসি যতই হোক, পথটা যে খুব ভালোই কাটবে সে-বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না। একদিকে অজিতেশ অন্যদিকে নবনীতা, কথার দুই ফুলঝুরি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নার্গিসও এমনভাবেই জড়িয়ে গেলেন গল্পে, মনে হল এঁরা অনেকদিনের চেনা। নতুন বাংলাদেশের কথা চলছে। নার্গিস বলছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কীভাবে তাঁরা দিন কাটিয়েছেন ঢাকায়, তার উত্তেজক নানা কাহিনী। অজিতেশ বলছেন তাঁর নাটকের গল্প।

‘এ-রাস্তাটার কী নাম?’ জানতে চান নার্গিস।

‘যশোর রোড।’

‘যশোর রোড? যশোর রোড কেন আপনাদের এখানে? যশোর তো আমাদের দেশ!’

সত্যি তো! যশোর তো ওঁদের দেশ!

এই রাস্তাটার ওপর পা রাখলেই সেকথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে দেশে যাবার পথে রানাঘাটের ট্রেনবদল বনগাঁর ট্রেনবদল আর তারপর বনগাঁ-যশোর-খুলনা হয়ে স্টিমারে উঠে গ্রামের বাড়ির পথ। যশোর রোড যেন সেই আমাদের দেশের পথের নিশানা হয়ে জেগে আছে, যে-পথের নাম শুনেই নার্গিস আজ বলেন ‘আমাদের দেশ’!

গাড়ি চলছে। ফিকে একটা আলো আছে আকাশে। বসতি ছেড়ে এখন দুধারে ছড়ানো প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে যশোর রোড, দূরে-চলে-যাওয়া সটান লম্বা পথে হেডলাইটের আলোয় দুপাশের গাছগুলিকে দেখায় যেন সাজানো তোরণ, যেন সেই অন্তহীন তোরণের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। যেন কোনও বড়-একটা অভ্যর্থনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশ।

হঠাৎ মনে হল, বেড়াতে গেলে যে অনেক দূরেই যেতে হবে তার কী মানে আছে। এই যাওয়াও কি অনেকখানি নয়? অনেকখানি নয় এ তোরণ? জোর করেছিলেন বলে মনে মনে যুবকটির ওপর খুশিই হয়ে উঠি। অনেকদিন মনে থাকবে এই যাওয়া।

এমন সময়ে অজিতেশ বলে বসেন: 'এই-যে ভাই, দোকানপাটের রাজ্য তো সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। কোথাও নেমে একটু খেয়ে নিলে হত না? শুধু কাব্য করলে তো চলবে না, খিদে তো পেয়েছে সবারই-'

যুবা বলেন: 'না না, এখানে কেন, খাবেন তো আপনারা ওখানে গিয়ে। ওখানে সব ব্যবস্থা করা আছে-'

'সে তো থাকবেই। তবে পৌঁছতে তো অনেক দেরি-'

'আমি ফোন করে দিয়েছি যে দেরি হবে আমাদের, সেটা কোনও অসুবিধা নয়।'

কিছুক্ষণ প্রতিহত রাখা গেল অজিতেশকে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ওই দূরের মোড়ে একটা চায়ের ঝুপড়ি দেখা যায় যেন। অজিতেশ বলেন: 'ড্রাইভারসাহেব, একটু থামান তো ওখানে। অন্তত একটু চা খেয়ে নিই। একটু হাতপা ছড়িয়ে নেওয়া যাবে। কী বলেন নবনীতা? নামবেন?'

'সে আর বলতে! শুধু হাতপা ছড়ানো? মাঠের ওপর একটু দৌড়োদৌড়ি করে নিলেও হয়। সুজন হই আর যাই-ই হই, গায়ে যে বেশ ব্যথা ধরে গেছে সেটা ঠিক।'

নামা হল পথের পাশে চায়ের দোকানে। এত রাতে একসঙ্গে এত খদ্দের পেয়ে দোকানি বেশ খুশি। জিজ্ঞেস করেন: 'কেবলই চা, না অন্যকিছুও দেব সঙ্গে?'

'অন্য কী আছে ভাই?'

'কচুরিটচুরি আছে কয়েকখানা। তবে ঠান্ডা হবে একটু।'

'ঠান্ডা তো হবেই। আমরা আসব বলে আপনি কি আর গরম গরম ভেজে রেখেছেন? নাঃ, এখন কচুরি খেলে খিদেটাই নষ্ট হয়ে যাবে। দরকার নেই। আপনি বরং কয়েকখানা

বিস্কুট দিন। আর চা। চা-টা গরম হবে তো?'

চা-বিস্কুট নিয়ে গল্প করছি আমরা। নবনীতা বলছেন, অজিতেশ বলছেন, মাথা নিচু করে শুনছি আমি। দেরি হচ্ছে বলে যুবকটি মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করছেন সবাই। এরই মধ্যে, আধখানা কথার মাঝখানে একেবারে হঠাৎ বলে ওঠেন অজিতেশ: 'চলুন আমরা যাই।'

মাথা তুলে দেখি আমাদের চারপাশে বেশ হৃষ্টপুষ্ট উৎসুক একটা ভিড়। এত রাতে এত লোক জমল কোথা থেকে? কোথা থেকে এসে পৌঁছল এরা? কারা এরা?

অজিতেশ বললেন: 'চলুন চলুন, উঠে পড়ি গাড়িতে।'

ভিড়টাকে একটা বৃত্ত করে নিয়ে, কেন্দ্র হয়ে, অজিতেশ চললেন গাড়ির দিকে। আমরা আছি পিছনে। সবাইকে নিয়ে গাড়ি যখন চলল শেষপর্যন্ত, মুগ্ধ স্বরে বলি: 'সত্যি, এইসব লোকেরাও আপনার নাটক দেখেছে! গ্রুপ থিয়েটারের আজকাল তবে এতটা দৌড়?'

'কী যে ভাবেন! এরা কি কেউ থিয়েটারের অজিতেশকে দেখছে?'

'দেখছে যে, সে তো দেখাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে, তবে ওরা এসেছে ফিল্মের ভিলেইনকে দেখতে। জানেন তো, বেশ কয়েকখানা ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছি এর মধ্যে? এ হল তারই পাওনা।'

'যারই পাওনা হোক' -নবনীতা বলেন-'আমার কিন্তু একটু হিংসেই হচ্ছিল বাপু। আচ্ছা, সঙ্গে আমরা এতগুলি মেয়ে আছি, আমাদের তো একটু নায়িকাটায়িকাও ভাবলে পারত।'

খুব হতাশ একটা শ্বাস ফেলে নার্গিস বলে: 'হায় আল্লা! আমি কী ভাবলাম জানেন তো? ভাবলাম কতদূরই-না এগিয়ে গেছে ইন্ডিয়া। কয়েকজন কবিকে দেখবার জন্য এত রাতে এত ভিড়!'

শুনে অজিতেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন। কথা ঘুরিয়ে নেন অন্যদিকে।

যেমন হয়, যাত্রাপথের শেষ দিকে একটু ঝিম ধরে যায়। অজিতেশ বলেন: 'কী গো ভাই, পথের যে আর শেষই হয় না। এ যে প্রায় দেড়টাই বাজিয়ে দিলে।'

'আপনারা মাঝে মাঝে থামলেন তো! তাই একটু দেরি হল। এতটা তো হয় না। তবে আমি ফোন করে দিয়েছি ওদের।'

'আর কতক্ষণ?'

'এই তো প্রায় এসে গেছি।'

প্রায় দুটোর সময়ে গাড়ি এসে পৌঁছল নিশানায়। চারদিকে তারের বেড়া দেওয়া প্রকাণ্ড একটা মাঠ, তার মাঝখানে এক চিলতে লম্বামতো বাড়ি। মাঠের গেট দিয়ে ঢুকে গাড়ি দাঁড়াল বাড়িটির সামনে, সে-বাড়িতে আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। মনে হয় ছেড়ে-দেওয়া কোনও স্কুলবাড়ি। সাদরে সেখানে আমাদের নামিয়ে যুবকটি ডাকতে শুরু করেন দুয়েকটি নাম। সাড়া মেলে না কোনও। ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই আমরা টের পাই সারি সারি কয়েকখানা মাদুর পাতা আছে মেঝের ওপর, এমনকী তার সঙ্গে বালিশও যেন আছে কয়েকখানা।

'কোথায় যে গেল সব' -বিড়বিড় করেন যুবা।

অজিতেশ বলেন: 'শোবার ব্যবস্থা তো ভাই বুঝতে পারছি। কিন্তু খাবার ব্যবস্থাটা কোথায় বলো তো? তখন যে বললে খাবার সব রেডি করা আছে, তা সেসব কোথায়?'

'সবই তো থাকবার কথা এখানে। একটু দেরি হয়ে গেল কি না। আচ্ছা দেখছি আমি। আপনারা একটু হাত-পা ধুয়ে নিন। আমি ওদের ডেকে আনি।'

'দত্তা' উপন্যাসে রাসবিহারী যেমন সামনের একটা থামকে 'বিলাস' কল্পনা করে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, মাঠের গেটটাকে তেমনই একটা অলীক নামে ডাকতে ডাকতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যুবকটি। এই পঁচিশ বছর জুড়ে আর তাঁর কোনও দেখাই পাওয়া গেল না!

৪

বসে থেকে আর লাভ কী, তাহলে শুয়েই পড়া যাক। এই বিবেচনায় টান-টান শুয়ে পড়ি সবাই। এত রাতে কোনও খাবারের দোকানের হদিস পাওয়া যাবে না, এ নিয়ে সংশয় নেই।

নার্গিস জিজ্ঞেস করেন: 'আপনাদের এখানে কবি-সম্মেলন বুঝি এইভাবেই হয়?'

'কী করে বলব, আগে তো আসিনি কখনও। অবশ্য সম্মেলন দেখতে তো এখনও বাকি আছে। সে তো কাল ভোরবেলাকার ব্যাপার।'

অজিতেশের গলা শোনা যায়: 'আচ্ছা, কার কার এখন সেই ঠান্ডা কচুরিগুলির কথা মনে পড়ছে না, হলফ করে বলুন তো?'

নিজের গায়ে চটাস চটাস কয়েকটা চাপড় দিয়ে নবনীতা উত্তর করলেন: 'আমার কিছুই মনে পড়ছে না, কেবল এই মশাগুলির কথা ছাড়া। বনগাঁ বলে কি এতই গাঁ, মশারিও মেলে না? অন্তত কটা মশারির তো ব্যবস্থা রাখবে এরা!'

'মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! ঘুমোবার চেষ্টা করুন, সব সয়ে যাবে।'

'ঘুম?' অজিতেশ বলেন: 'ঘুম অসম্ভব। এ-রকম তাগড়াই তাগড়াই মশা দেখেছেন কখনও? যাকগে, কতটাই-বা আর বাকি আছে রাত। গল্পে গল্পেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

'সারা রাত জেগে কাল ভোরে গান গাইব কেমন করে? এ তো মহা মুশকিল হল।' -রত্নার গলা।

'সকালবেলা উঠেই পালিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'তা বোধহয় পারা যাবে না, তখন বোধহয় আটকে দেবার জন্য ওদের লোকজন থাকবে। পেট্রোলের দাম নেই?'

কথায় কথায় রাত গড়ায়। আমরা কখনও বসি কখনও শুই। যাদের গলা শুনতে পাই না, ধরে নিই তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারিফ করি তাদের ক্ষমতার।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হয়, ঘুম তো নয়, দল থেকে দুজন মহিলা উধাও। নবনীতা আর রত্না। কোথায় গেলেন এঁরা?

'বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছে হয়তো। এই গরমে, এই মশায়, শোয়াবসা কি সম্ভব?'

কই, বারান্দাতেও নেই তো?

'আরে, দুজন সমর্থ মহিলা, এত উদবেগের কী আছে? আছেই কোথাও না কোথাও।'

'কিন্তু এত রাতে, অচেনা জায়গা, উদবেগ নেই?'

'বেড়াচ্ছে নিশ্চয় বাইরে।'

হবেও-বা। আমরা আবার শুরু করি কথা। খানিক পরে দূর থেকে আবছা দেখা যায় গেট পেরিয়ে মহিলা দুজন ঢুকছেন এসে মাঠে। বারান্দায় এসে পৌঁছতেই প্রায় অভিভাবকের স্বরে জিজ্ঞেস করি: 'ব্যাপারটা কী? কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমরা?' শিশুসরল হাসিতে নবনীতা বলেন: 'আমরা গিয়েছিলাম থানায়।'

'থানায়? এই রাতে থানায়? নালিশ করতে?'

‘না না তা নয় । মশার জ্বালায় ঘুমোতে পারছিলাম না তো । তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম থানায় । আসার পথে দেখলেন না খুব কাছেই একটা থানা আছে?’

‘সে তো দেখলাম । কিন্তু কেন গেলেন সেখানে?’

‘ঢুকে গেলাম দুজনে । ঢুকে দেখি সব শুনশান । চোর ধরবে আর কে! শুধু দুজন কনেস্টবল বন্দুক পাশে রেখে ঘুমোচ্ছে । আমরা হাঁকডাক করলাম অনেক-“এই-যে মশাইরা, শুনছেন? একটু কি উঠবেন দয়া করে?” বেশকিছু চ্যাঁচামেচির পর ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল দুজন । উঠে তো চোখের সামনে জ্যান্ত দুজন মহিলা দেখে ওদের চোখ একেবারে কপালে । ভয় পেয়ে গিয়ে বলছে-“কে? কে? আপনারা কারা? এখানে কেন ঢুকেছেন? কী চান এত রাতে?” আমরা বললাম-“ভাই, ওডোমস আছে?” শুনে তো তারা থ । অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শেষ অব্দি তারা বলে-“ওডোমস? আপনারা ওডোমস খুঁজতে থানায় এসেছেন?” “নেই?” সগর্জনে বলে তারা “না, নেই ।” “ও, তা সেকথা বললেই হয় । এত রাগ করবার কী আছে? আচ্ছা চলি ভাই ।” বলে, চলে এলাম আমরা । কী আর করব । এইসব করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেল!’

৫

ওঁরা দুজন ঢুকে গেলেন ভেতরে । অজিতেশ আর আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ । অল্প পরে অজিতেশ বললেন: ‘আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? ঘুম যখন হবেই না তখন তো আমরা ইছামতীর পাড়ে বসেই গল্প করতে পারি । নদীটাও দেখা হয়ে যাবে । কাছাকাছিই হবে নিশ্চয়? চলুন, হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই ।’

কী আশ্চর্য, একথাটা আগে মনে হয়নি কেন? ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে ইছামতীর খোলা হাওয়ায় বসে থাকা তো চোখেরও পক্ষে অনেক আরামের । ইছামতী পদ্মা নয়, তবু তো নদী, তবু তো জলের সামনে বসে সূর্য-ওঠাটা দেখতে পাব ।

এক-একটা নামের সঙ্গে কত-কত অনুষঙ্গ জড়ানো । ইছামতী বললেই বিভূতিভূষণ । মাছরাঙা পাখি, নলবন, কাঁটাকুমুরে লতার গন্ধভরা ফুল আর শান্ত সন্ধ্যায় কালো নিথর নদীজলে মনের শুশ্রূষা! সেই ইছামতীতে না গিয়ে কেনই-বা এখানে বসে আছি আমরা? চলুন চলুন ।

গিয়ে পৌঁছতেই অবশ্য সমস্ত আহ্লাদ থমকে গেল । কোথায়-বা নদী, কোথায়-বা জল! যতদূর চোখ যায়, শুধু থিকথিকে কচুরিপানা । ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের যে খাল

দেখেছি, সেও তো এর চেয়ে বড়, সেও তো এর চেয়ে সাবলীল। যে-দৃশ্যে যে-গন্ধে ভরে আছে এই নদীতীর, সেটা আমাদের পক্ষে উপাদেয় কোনও পরিত্রাণ নয়।

তারই মধ্যে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসতে বসতে অজিতেশ একটু স্বপ্নালু গলায় বলছেন তাঁর ভাবী নাটকের পরিকল্পনা। ঘরে যদি মশা থাকে তাহলে এখানে থাকবে না এমন ভাবা ভুল। মশার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই অজিতেশ বলছেন কেন এখন তিনি টলস্টয় নিয়ে মেতে আছেন, কেন করতে চাইছেন তাঁর লেখা থেকেই অভিনয়। মনে পড়ছে কদিন আগে কেয়ারও সঙ্গে কথা হয়েছে এই টলস্টয় নিয়েই। শুধু লেখক হিসেবে নন, তাঁর কাছে প্রিয়তম মানুষও এখন টলস্টয়। অজিতেশ বলছেন: 'হ্যাঁ, জানি সেই কথা, এক সঙ্গেই আমরা ভাবছি তাঁকে নিয়ে।'

ইছামতীর ধারে, মশার বেষ্টনের মধ্যে বসে, বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে, চোখের সামনে অল্পে অল্পে খুলতে লাগল আলো। ভোর হল।

আর ঠিক সেই সময়েই দলের মহিলারা এসে হাজির হলেন নদীতীরে, বলতে লাগলেন: 'বাঃ, বেশ তো মশাই আপনারা! আমাদের একটা ঘুপচির মধ্যে ফেলে রেখে নিজেরা এখানে দিব্যি বসে হাওয়া খাচ্ছেন!'

'আমরা কি আর খাচ্ছি? আমাদেরই খাচ্ছে। এই দেখুন না-' বলে অজিতেশ তাঁর সুঠাম দীর্ঘ হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেন সামনে। হাতের ওপর লেপটে আছে সারিবাঁধা রক্তাক্ত আর মৃত কয়েকটা মশা!

এরও পরে অজিতেশের আবৃত্তিসুদ্ধ কবি-সম্মেলনটা কেমনভাবে ঘটল, কেমনভাবে-বা বেঁচেবর্তে ফিরে এলাম আমরা, সে অবশ্য ভিন্ন এক গল্প।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

নিকোবরের দ্বীপে

তিলকরঞ্জন বেরা

আন্দামান পৌঁছনো থেকেই একটার পর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছিল অবিরাম। নানান সব অদ্ভুত তথ্য জানতে পেরে জায়গাটা লাগছিল যতটা বিচিত্র ততটাই আবার মজার।

কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার উড়োজাহাজে লাগে মাত্র দুঘণ্টা। অথচ মস্ত জাহাজে কালাপানির সমুদ্র পেরিয়ে আন্দামান পৌঁছতে লাগে আস্ত চারটে দিন। বিশাল সে জাহাজে কটা দিন কাটাবার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। উড়োজাহাজের দৌলতে মস্ত জাহাজে চেপে বহুদিন ধরে সমুদ্র পেরিয়ে বিলেত যাবার দরকার এখন আর হয় না। কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের চারদিনের জাহাজ যাত্রাই এখন ভারতবাসীর কাছে জাহাজে চাপার অভিনব অভিজ্ঞতা করার একমাত্র সুযোগ।

পোর্ট ব্লেয়ারের অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ি শহর ঘুরতেও ভালো লাগে যথেষ্ট। গাছের আড়াল থেকে তীর ছোড়া কালো আন্দামানিজরা বিদেয় হয়েছে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বহুদিন হল। এখন এ শহর ঝকঝকে এক আধুনিকা। মেনল্যাণ্ডের সমস্ত পণ্যই আজ শশরীরে হাজির শহরের সব ঝকমকে বিপণন দপ্তরে। মাটিজ থেকে মার্সিডিজ-সবই ছুটছে এখন পোর্ট ব্লেয়ারের উঁচুনিচু রাস্তায়।

আবার ঢেউ খেলানো ধানখেতের মধ্য দিয়ে মসৃণ রাস্তা চলে যায় ওয়াণ্ডুরের জেটির দিকে। ওখান থেকে ছোট বোটে জলিবয়ের কোরাল দ্বীপে ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা তো ভোলা যায় না জীবনভর। সে যেন জলের তলায় এক স্বপ্নের দেশ। রংবাহারি কোরাল আর অদ্ভুত সব বাহারি মাছের সে যেন প্রকৃতির হাতে গড়া এক শখের বাগান।

আন্দামানের আধুনিক ইতিহাস বড়জোর দেড়শো বছরের পুরনো। তার আগের ইতিহাস সবই একেবারে অন্ধকারে ঢাকা। কালো কিছু জংলী মানুষ থাকে ঘন জঙ্গলে ভরা সে সব দ্বীপে, এই ছিল আন্দামান সম্বন্ধে ততদিন পর্যন্ত সভ্য মানুষের জ্ঞান। বহুযুগ ধরে সভ্য দেশের নাবিকেরা আন্দামানের অন্ধকার যুগের সে সব কালো মানুষ দেখেছে দূর সমুদ্র থেকে। সযত্নে তারা এড়িয়ে গেছে সে সব দ্বীপ প্রাণে মরার ভয়ে। এমনকী আন্দামানের আদি মানবদের মানুষখেকো অপবাদ দিতেও তারা ছাড়েনি। বিষমাখা তীর ছোড়ার গপ্পো তো খুবই চালু। অথচ আদিম যুগের সে সব সরল মানুষ তীর ছুড়তে

জানলেও বিষের ব্যবহার নাকি এখনও জানে না । নানান কারণে কখনও কখনও মানুষ মারলেও মানুষখেকো অবশ্যই তারা ছিল না । অন্তত এমন কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি । কিন্তু কে শোনে কার কথা । কত সব রোমাঞ্চকর মানুষ মারার কাহিনী প্রচলিত তাদের ঘিরে । এমন সব গপ্পো নিয়ে সিনেমা বায়োস্কোপও হয়ে গেছে যথারীতি । মোদ্দা কথা, আন্দামান সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায়, আস্ত এই আন্দামান ঘিরেই যেন রহস্যের এক মেঘ ।

তবে মজার কথা হল, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সে সব আদিম জাতির মানুষ আন্দামানিজ আর জারোয়ারা চলে গেলেও জারোয়াদের এখনও দেখা পাওয়া যায় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ঘণ্টা তিনেকের দূরত্বে ঝিরকাটাং আর বারাটাংয়ের জঙ্গলে । জারোয়াদের জঙ্গল পেরিয়ে আন্দামানের উত্তরের দ্বীপ মায়াবন্দর যাবার পথে মিডল স্ট্রেটের জেটিতে দিব্যি মোলাকাত হয় প্রায়শই এক দল আদি মানব জারোয়ার সঙ্গে । আধুনিক সভ্যতার লজ্জা নামক রোগটি তাদের ছুঁতে পারে না তেমন । তবে সে জারোয়া রাজত্বে পর্যটকদের যাবার নানারকম বিধিনিষেধ এখন প্রয়োগ করা হয়েছে ।

আন্দামানের এত বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে সব বৃত্তান্ত আমায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তা হল নিকোবরের নানান সব অদ্ভুত কাহিনী । পোর্ট ব্লেয়ারে বসেই শুনলাম নিকোবরে নাকি কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল রানির রাজত্ব । তবে রানির খবর আন্দামানের সবার জানা থাকলেও তার থেকে বেশি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা নেই আন্দামানের অনেকেরই । রানির গপ্পো শুনে মজা পেলাম যথেষ্ট । নিকোবর সম্বন্ধে শুনলাম আরও নানান সব অদ্ভুত কথা । তবে যাবার ইচ্ছে হলেও নিকোবরের দ্বীপ ঘোরা মুখের কথা নয় । যথেষ্ট রাস্তাঘাট আর বোটের বন্দোবস্ত থাকায় আন্দামানের অনেক জায়গা ঘোরা সম্ভব হলেও নিকোবরের নানান দ্বীপ ঘোরা নেহাতই কষ্টের । সপ্তাহে একবার মাত্র জাহাজ যায় আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নিকোবরে । টেন ডিগ্রি চ্যানেলের উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নিকোবরের জাহাজযাত্রা নেহাত কম কষ্টেরও নয় । আবার অন্তত দিন পনেরো হাতে না থাকলে ও পথে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় । তায় আবার নিকোবরের বারোটা জনবসতিপূর্ণ দ্বীপের এগারোটাই আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় পর্যটকদের জন্য নিষিদ্ধ । তার মানে এত কষ্টের পরেও নিকোবরের কেবল গ্রেট নিকোবর দ্বীপেই পর্যটকরা যেতে পারেন বিশেষ অনুমতি নিয়ে ।

আন্দামানের দক্ষিণে অবস্থিত নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জ । আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জকে আলাদা করে একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত টেন ডিগ্রি চ্যানেলের সমুদ্র । ভৌগোলিক কারণে প্রায় সারা বছর ধরেই টেন ডিগ্রি চ্যানেলের সমুদ্র

থাকে উত্তাল। বিশাল সব ঢেউয়ের মাথায় জাহাজ এখানে উথালিপাতালি নাচে সারাক্ষণ। তাই টেন ডিগ্রি চ্যানেলের বেজায় বদনাম।

আন্দামানের দিক থেকে গেলে টেন ডিগ্রি চ্যানেলের সমুদ্র পার হতে প্রথমেই আসে নিকোবরের কার নিকোবর দ্বীপ। নিকোবরের বাইশটা দ্বীপের বারোটা দ্বীপে মাত্র মানুষের বাস। কোথাও দুশো-পাঁচশো আবার কোনও দ্বীপে হাজার-দুহাজার। তার মধ্যে কেবল কার নিকোবর দ্বীপেই প্রচুর লোকের বাস। প্রায় কুড়ি হাজার নিকোবরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে অদ্ভুত সুন্দর কার নিকোবর দ্বীপের গোটা পনেরো গ্রামে। নিকোবরের প্রধান দপ্তরও সব এই কার নিকোবর দ্বীপে। তাই সভ্যতার ছোঁয়া কিছুটা হলেও-তাও পৌঁছয় এই কার নিকোবরে। কিছুটা দেরিতে হলেও তাই কার নিকোবরের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে পারে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সমাজকে। তবে নিকোবরের অন্য দ্বীপের সঙ্গে সভ্যতার সংস্পর্শ নেহাতই কম। কালেভদ্রে সে সব নিকোবরি আসে পোর্ট ব্লেয়ারে।

কার নিকোবরে মোট পনেরোটা গ্রাম। মুস, চুকচুষা, লাপাতি, কিমইউস-মজার সব নাম। সমুদ্রের ধার বরাবর একটা পাকা রাস্তা আছে সারা দ্বীপটা জুড়ে চক্রাকারে। সব গ্রামই ওই রাস্তার ওপরে। দ্বীপের মাঝের অঞ্চলটা জুড়ে নারকোলের বাগান। সব গ্রামেই পড়েছে আধুনিকতার ছাপ। পুরনো নিকোবরি ধাঁচের বাড়ি এখন আর কার নিকোবরে তেমন দেখাই যায় না। গ্রামের অর্ধেক বাড়িই পাকা। মাথার ওপরে অন্তত শক্ত টিনের চাল। বেশ কয়েকটা ঢালাই করা কলামের খোলে বানানো বাড়ি। অথচ পুরনো ধাঁচের নিকোবরি হাটের গঠন ছিল যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। কার নিকোবরে তাদের বাকি আছে মাত্র কয়েকটা। আরংয়ের গ্রামের মাঝে দেখেছিলাম একটা। তবে দুর্গম সব দ্বীপে অমন বাড়ি এখনও যথেষ্ট আছে। শক্তপোক্ত খুঁটির ওপর বানানো অর্ধ গোলাকার গঠন তার। দূর থেকে দেখে মনে হয় বুঝি বা খড়ের চাল। অথচ ধান তো নিকোবরে তেমন হয় না, খড় আসবে কোথা থেকে। হবে হয়তো কোনও গাছের শুকনো পাতায় ছাওয়া।

প্রতিটা গ্রামেই আর আছে সুন্দর বড় স্কুল। বিশাল সব মাঠ প্রায় প্রতিটা স্কুলের প্রাঙ্গণেই। মুস গ্রামের চার্চ আবার সবচেয়ে বিখ্যাত। ফাদার রিচার্ডসনের গ্রাম মুসের থেকে ক্রিশ্চান ধর্ম ছড়ায় সারা নিকোবরে। ফাদার রিচার্ডসন নিকোবরের এক কিংবদন্তী পুরুষ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে একদিকে যেমন নিকোবরে হয় শিক্ষার প্রসার-তেমনই আবার নিকোবরের সমস্ত দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে ক্রিশ্চান ধর্ম। নিকোবরের নানান দ্বীপে ফাদার রিচার্ডসনের আমল থেকেই শিক্ষার এমনই প্রসার হয় যে নিকোবরিরা আন্দামানের অন্য সব উপজাতির থেকে এগিয়ে যায় অনেক। আজ তারা পড়াশুনো শিখে একরকম সভ্য জগতের বাসিন্দা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছে কয়েকজন তাদের মধ্যে দিব্বি।

সংসারের সবাই মিলে একসঙ্গে থাকাই নিকোবরি সমাজের রীতি । তাদের সম্পত্তিও থাকে সব একসঙ্গে । সারা পরিবারের শুয়োর, নারকোলের বাগান সবই থাকে একসঙ্গে । আজও তারা পছন্দ করে না বাইরের লোকের তাদের দ্বীপে বিশেষ যাওয়া আসা ।

কার নিকোবর দ্বীপ ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে ঘন নীল সমুদ্রের মাঝে আসে অপূর্ব সুন্দর চওড়া দ্বীপ । সবুজ দ্বীপের চারদিকে ঘন নীল সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ে গড়িয়ে যায়, সাদা ফেনা হয় । সে কোরাল দ্বীপের সমুদ্রের রঙের বাহার সারা জীবনে ভোলার নয় । সর্বসাকুল্যে হাজার খানেক লোকের বাস সে দ্বীপের ছড়িয়ে থাকা কটা গ্রামে ।

আন্দামানে ভারতীয় পর্যটকদের যথেচ্ছ ঘোরার স্বাধীনতা থাকলেও নিকোবর প্রায় নিষিদ্ধ । বিশেষ কারণ বিনা নিকোবরের দ্বীপগুলোয় এমনকী ভারতীয়দেরও অনুমতি ছাড়া যাওয়া মানা । তবে নিকোবরের একমাত্র গ্রেট নিকোবর দ্বীপে পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় । আসলে গ্রেট নিকোবরে কিছু প্রাক্তন সৈনিক সেটলার্সদের বসানো হয়েছে কিছুকাল হল । নিকোবরের অন্যান্য দ্বীপে শুধুই নিকোবরি উপজাতীদের বাস । তবে নিকোবরকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে কিছুদিন হল ।

সহস্রাব্দের গোড়ায় নিকোবরের কাছাল দ্বীপের সূর্যোদয় হুলস্থূল ফেলে দিয়েছিল জগৎ জুড়ে । পৃথিবীর যে কয়েকটা জায়গা থেকে সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে সুদূর নিকোবরের অখ্যাত এই কাছাল দ্বীপও ছিল । সেই সুবাদে কাছাল দ্বীপের পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে জায়গা পাওয়া । তবু তখনও পর্যটকদের কাছাল দ্বীপে নামতে দেওয়া হয়নি । মস্ত স্বরাজ দ্বীপ থেকে জাহাজে করে পর্যটকদের কাছাল দ্বীপের কাছে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয় সমুদ্রের মাঝে । ওখান থেকেই দেখেন তাঁরা বিখ্যাত সেই সূর্যোদয় ।

চওরা ছাড়িয়ে টেরেসার লম্বা ঘাসবনে ভরা দ্বীপ পার হতেই আসে কাছাল দ্বীপ । মিলেনিয়াম সান রাইজের আগে কখনও শুনিনি সে দুর্গম দ্বীপের কথা । অথচ জাহাজ জেটিতে ভেড়ার আগেই মন ভরে যায় তার অপূর্ব সৌন্দর্যে । দ্বীপের চারদিকেই জলের তলায় কোরালের বন । দ্বীপের চারদিক জুড়ে বেশ কয়েকটা সোনালি বালির সৈকত । নীল-সবুজ জল আছড়ে পড়ছে তারই আঁচলে । প্রায় হাজার পাঁচেক নিকোবরি আদিবাসীর বাস এই কাছালের দ্বীপময় ছড়িয়ে থাকা নানান গ্রামে ।

কাছাল দ্বীপের পূর্বে দেখা যায় বিশাল এক দ্বীপ । অথচ আস্তে আস্তে তার কাছে গেলে বোঝা যায় ওখানে তিনটে দ্বীপ একসঙ্গে কাছাকাছি থাকায় অমন বড় দেখায় । ওদেরই একসঙ্গে বলা হয় নানকৌড়ির দ্বীপ । শুনেছি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওখানে ছিল নানকৌড়ির রানির রাজত্ব । তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপটার নাম কামোর্তা, আর তার

পূর্বে ট্রিনকেট। কামোর্তার পশ্চিমে মাত্র মাইলখানেক দূরেই আরেকটা ছোট দ্বীপ। হয়তো সেই দ্বীপেরই নাম একসময় ছিল নানকৌড়ি। এখন স্থানীয় লোকেরা বলে চ্যাম্পিয়ন। ওখানেই রানি পরিবারের বাড়ি। অথচ অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না চ্যাম্পিয়ন দ্বীপের নাম। ওখানকার তিনটে দ্বীপকে একসঙ্গে বলা হয় নানকৌড়ির দ্বীপ।

নানকৌড়ির রানি লছমির একসময় এ অঞ্চলে ছিল বেজায় প্রতিপত্তি। এমনকী ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীরা আন্দামানে সফরে এলে-একবার অন্তত যেতেন নানকৌড়ির দ্বীপে রানি লছমির সঙ্গে দেখা করতে। বছর দশেক আগে তাঁর মৃত্যুর পর এখন অবশ্য তাদের আর সে রমরমা নেই।

নানকৌড়ির দ্বীপ ছাড়াতেই এসে পড়ে জঙ্গলে ভরা লিটল নিকোবর দ্বীপ। থাকে কিছু নিকোবরি অধিবাসী সে দুর্গম দ্বীপেও। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসা জাহাজও ভেড়ে সেখানে মাসে দু-তিনবার। জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে দিব্যি আছে সুখী মানুষ সে সব গ্রামে। আপন ছন্দে চলেছে তাদের জীবনযাত্রা। আশপাশে আরও বেশ কয়েকটা দ্বীপ আছে সমুদ্রের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সুন্দর সোনালি সৈকত তাদের চারদিকে। সে সব দ্বীপের নামও ভালো করে জানে না অনেকেই। ম্যাপের থেকেও উদ্ধার করা তেমন সহজ নয়। জনমানব থাকে না সেখানে। হয়তো বা মিষ্টি জলের কোনও প্রস্রবণ না থাকায়।

অবশেষে জাহাজ ভেড়ে নিকোবরে তার অন্তিম গন্তব্য গ্রেট নিকোবর দ্বীপে। বিশাল এই গ্রেট নিকোবর দ্বীপই ভারতের শেষ দ্বীপ। গ্রেট নিকোবরের দক্ষিণতম অংশ বা পিগমেলিয়ান পয়েন্টই ভারতের দক্ষিণতম ভূখণ্ড। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নামে এই অঞ্চলের নতুন নামকরণ হয়েছে ইন্দিরা পয়েন্ট। কন্যাকুমারীর অনেক দক্ষিণে অবস্থিত এই অঞ্চল। তাই কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রক ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু হলেও এই ইন্দিরা পয়েন্টই হল ভৌগোলিক ভাবে ভারতের দক্ষিণতম অঞ্চল।

গ্রেট নিকোবর দ্বীপের জেটি অঞ্চলের নাম ক্যাম্বেল-বে। আন্দামানবাসীর কাছে তাই গ্রেট নিকোবর ক্যাম্বেল-বে নামেই পরিচিত। সর্বসাকুল্যে হাজার সাতেক লোকের বাস এই দ্বীপে। তার মধ্যে ক্যাম্বেল-বে'র লোকালয়েই থাকে হাজার চারেক মানুষ। স্কুল, ছোট হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, অফিস-কাছারি মিলে ক্যাম্বেল-বে'ই গ্রেট নিকোবরের প্রাণকেন্দ্র। দুটো পিচরাস্তা যায় ক্যাম্বেল-বে থেকে দুদিকে। একটা যায় সমুদ্রের ধার বরাবর দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ইন্দিরা পয়েন্টে। আর অন্যটা যায় জঙ্গল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিম উপকূলে নিকোবরি গ্রাম কোপেনহিটে। ইন্দিরা পয়েন্টের রাস্তায় তাও কিছু

লোকবসতি থাকায় গাড়ি-বাস যায় দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে । কোপেনহিটের রাস্তায় গাড়ি যায় নেহাতই কদাচিৎ ।

ঊনসত্তর সালে কিছু প্রাক্তন সেনানীকে এনে বসানো হয় ভারতের দক্ষিণের শেষ দ্বীপ এই গ্রেট নিকোবরে । পাঞ্জাব, কেরালা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র থেকে আসা সেসব প্রাক্তন সেনানীদের সেটেলমেন্ট সমুদ্র বরাবর ইন্দিরা পয়েন্টের রাস্তায় । প্রথম ক'বছর প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হলেও আজ তাঁরা যথেষ্ট সচ্ছল । দেদার নারকোল আর সুপারি ফলে তাঁদের খেতে । ভারতের মেনল্যান্ড থেকে ব্যবসায়ীরা এসে নিয়ে যায় তাঁদের ফসল । ঘরে বসেই দিব্যি বেচে দেন তাঁরা সারা বছরের ফসল । বাসরাস্তার ওপর ছোট ছোট পাকা বাড়ির মাথায় ডিস অ্যান্টেনার বহর দেখলেই অনুমান করা যায় তাঁদের আজকের স্বচ্ছলতা । তবে যাতায়াতের নেহাতই অসুবিধে সেই দুর্গম দ্বীপ থেকে । মাসে সর্বসাকুল্যে তিনটে অথবা চারটে বোট যায় ক্যাম্বেল-বে থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে । পথের অন্যান্য দ্বীপ ছুঁয়ে সে জাহাজের পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে লাগে দিন তিনেক । বড় হাসপাতাল, বাজার বলতে সবই পোর্ট ব্লেয়ারে । এখন অবশ্য মাঝে মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে চেন্নাই যাবার পথে দুয়েকটা বড় জাহাজ ছুঁয়ে যায় গ্রেট নিকোবরের ক্যাম্বেল-বের জেটি । সহজেই তখন যাওয়া যায় মেনল্যান্ডের চেন্নাই শহরে মাত্র দুদিনে ।

ইন্দিরা পয়েন্টের লাইটহাউসের মাথায় দাঁড়ালে দেখা যায় আরেক অপূর্ব দৃশ্য । দক্ষিণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে মনে হয় ওই তো দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার দ্বীপ । আসলে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের দূরত্ব ইন্দিরা পয়েন্ট থেকে মাত্র নব্বই মাইল । ভারত স্বাধীন হবার আগে ওখান থেকেই দিশি নৌকা আসত নিকোবরের থেকে নারকোল নিয়ে যেতে । নিকোবরের আদিবাসীরাও হয়তো এসেছে অমন ভাবে । নিকোবরের দুটো উপজাতি নিকোবরি আর শম্পেনরা মঙ্গলয়েড শ্রেণীভুক্ত । ধরা হয় মালয়, ইন্দোনেশিয়া আর বর্মার দিক থেকেই তাদের আবির্ভাব । ওসব অঞ্চলের সঙ্গে নিকোবরের যোগসূত্র প্রাচীনকাল থেকেই ।

ক্যাম্বেল-বে থেকে ইন্দিরা পয়েন্টের রাস্তার মাঝে পড়ে গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যান । গ্যালাথিয়া নদী এখানে সাউথ-বের সৈকতে গিয়ে মেশে সমুদ্রে । গ্যালাথিয়া নদী বেয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে গা সিরসির করে । বিশাল সব নোনা জলের কুমিরের বাস সে জলে । আবার সাউথ-বে সৈকতে শীতের রাতে ডিম পাড়তে আসে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক কচ্ছপের দল । বাহারি নাম তাদের জায়েন্ট লেদার ব্যাক টার্টল । ওজনে তারা অনায়াসে একেকটা পাঁচশো-ছশো কেজি । জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শীতের সময় মাঝরাতে ওঠে তারা সৈকতের বালিতে সন্তর্পণে ডিম পাড়তে । রাত জেগে প্রকৃতির সে সব কাণ্ড

কারখানা দেখতে মজা লাগে নিশ্চয়ই, তবে তার ঝক্কি কিছু কম নয় । একে তো শীতের সময় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ক্যাম্বেল-বে ঘুরে আসাই প্রায় দশ-পনেরো দিনের ধাক্কা । তায় ক্যাম্বেল-বের হাতে গোনা তিন-চারটে গাড়ির মধ্যে বন্দোবস্ত করে রাত সৈকতে কাটিয়ে আসা মুখের কথা নয় । নাছোড়বান্দা প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটকদের জন্য ক্যাম্বেল-বে যাবার অনুমতি দেওয়া হলেও ট্যুরিজম বন্দোবস্ত ওখানে একেবারেই নেই । অবশ্য ক'ঘরের APWD বাংলো আছে একটা থাকার জন্য ।

গ্রেট নিকোবরের জঙ্গলে থাকে শ'তিনেক শম্পেন আদিবাসী । গ্যালাথিয়া নদীর দুদিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যেই তাদের বাস । চাষবাসের ধার ধারে না তারা । জঙ্গলের ফল-মূল, মধু-সুপারিই তাদের খাদ্য । আর আছে সমুদ্রের অফুরন্ত মাছ । বহু বছর চেষ্টা করেও তাদের সভ্য জগতের মাঝে টেনে আনা যায়নি । এমনকী বিপদে-আপদেও তারা ক্যাম্বেল-বের লোকালয়ে আসতে নারাজ । কয়েকশো বছর ধরে সভ্য মানুষের কাছে থেকেও তারা পছন্দ করেছে জঙ্গলের আদিম জীবন । হয়তো বা তথাকথিক সভ্য মানুষের অসভ্য আচরণে তারা ভরসা করতে পারে না তেমন । ফিরে যায় তারা তাই প্রকৃতির কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

তিরতিরে নদী আর শাল জঙ্গলের দেশে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমরা যখন কলকাতা থেকে কোথাও যাই, তখন আসলে কলকাতার দিকেই আবার যাত্রা করি-ঘুরে তো সেই কলকাতাতেই আসতে হয় । একটু ঘুরপথে আবার সেই কলকাতায় ফিরি । বললাম বটে এটা ঘুরপথ, কিন্তু এই পথে ঘোরার মধ্যে একটু আনন্দ রয়েছে । কলকাতা থেকে যে কারণে আমরা পথ ধরে বেরিয়ে পড়ি, তার তো একটা উদ্দেশ্য আছে । সেই উদ্দেশ্যটা খুব একটা সিদ্ধ হয় না, যখন আমরা আবার কোনও বড় রকমের শহর-টহরে যাই ।

আমার নিজের বেড়াতে খুব ভালো লাগে, ছোটখাটো মফস্বল শহরে । খুব ছেলেবেলায় বাবা আমাদের প্রত্যেক বছর বাইরে নিয়ে যেতেন । আমাদের তো দেশের বাড়ি ছিল । দেশ বলতে পুববাংলার গ্রামের বাড়ি । সে-ও ছিল খুব চমৎকার ব্যাপার । দেশের বাড়িতে গিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা-সেটা খুব মজার ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে ।

পুজো যখন এসে পড়ছে-তখন দেশের বাড়ি থেকে ঠাকুমা চিঠি লিখতেন আমার কাছে যে তোমার বাবা-মায়ের হয়তো কেনাকাটা করে আসতে দেরি হবে । কিন্তু তুমি তাই বলে দেরি করো না । তুমি তোমার যে-কোনও কাকার সঙ্গে আগে-আগে বেরিয়ে পড়ে চলে এসো আমাদের বাড়ি ফরিদপুরে । আমার মনে আছে ওই ছেলেবেলায় ভোরবেলায় ট্রেন একটা ছাড়ত শিয়ালদা স্টেশন থেকে-চিটাগঙ এক্সপ্রেস । চিটাগঙ এক্সপ্রেস-এটা দুপুর পেরিয়ে রাজবাড়িতে পৌঁছত । রাজবাড়ি হচ্ছে গিয়ে গোয়ালন্দের হেডকোয়ার্টার । রাজবাড়িতে আমার মামারবাড়ির কোয়ার্টার । রাতে তখন ঘুম হত না । গোলাপ ফুল আঁকা সে কালের টিনের সুটকেসের মধ্যে রাতারাতি সমস্ত জিনিস গোছগাছ করে তাড়াতাড়ি সাত সকালে, রাত না কাটতেই, কাকুনকে (আমার এক কাকাকে) ঠেলে তুলে দিতাম । তারপর ভোর না হতেই রাস্তায় তখনও গ্যাসের আলো জ্বলছে, আমরা কাকা-ভাইপো দৌড় লাগাতাম ইস্টিশানের দিকে । শিয়ালদা ইস্টিশানে ।

সেই বয়সে ট্রেনে করে কোথাও যাওয়ার একটা মজা ছিল । তখন এত ভিড়ভাট্টা ছিল না । আর চিটাগঙ এক্সপ্রেস ভোরবেলায় ছাড়ত বলে ভিড়ও হত না বিশেষ । এই পথে

যেতে যেতে চারদিকে দেখতে দেখতে যাওয়া। রেললাইনের পাশে একটা খেলার মাঠ, সেখানে ছেলেরা খেলছে, টেলিগ্রাফের তারে একটা পাখি বসে রয়েছে। দূরের গাছপালাগুলো খুব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কাছের গাছপালাগুলো একেবারে পড়িমরি উল্টোদিকে ছুট লাগাচ্ছে। এসব দেখতে খুব ভালো লাগত।

আমরা দুপুরবেলা রাজবাড়িতে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন পাল্টে চলে যেতাম ফরিদপুরে। ওখান থেকে বেশি দূর নয় ফরিদপুর। শহর থেকে আমরা পুজোর সময় নৌকো কিংবা লঞ্চে করে চলে যেতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। ফরিদপুর শহর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে।

তবে, পুজোর সময় আমাদের দেশের বাড়িতে খুব একটা যাওয়া হত না। পুজোয় কম যেতাম, তার কারণ, আমাদের গ্রামে কোনও পুজো ছিল না। গ্রামের পুজো না থাকলে সেই গ্রামের ছেলেপুলেদের বড় কষ্ট। যখন পুজোর সময় দেশের বাড়িতে যেতুম তখন আমাদের গ্রাম থেকে ছ'মাইল দূরে একটা গ্রাম, সেখানে আমার বাবার মামার বাড়ি, সেখানে চলে যেতুম। সেখানে খুব বড় করে পুজো হত। তবে সাধারণত আমরা গরমের সময় দেশের বাড়িতে যেতাম, বড়দিনের ছুটিতে দেশের বাড়িতে যেতাম। আমার বাবা তো কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তার ফলে বছরে তিনটে বড় ছুটি পাওয়া যেত। পুজোয়, গ্রীষ্মে আর বড়দিনে।

সাধারণত পুজোর ছুটিতে পশ্চিমে যাওয়া হত। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের এরকম একটা চলে এসেছে। পুজো আসছে আসছে, এই সময়টা-বৃষ্টিটা কমে এসেছে, আকাশটা মাঝে মাঝে খুব নীল হয়ে যাচ্ছে। এই সময়টায় আমরা বুঝতে পারতাম, বাড়ির কাকারা খোঁজখবর লাগাচ্ছেন কোথায় বাড়ি পাওয়া যায়। তখন এই সমস্ত হোটেল-টোটেলে থাকার ব্যবস্থা ছিল না। একজন লোক গেলে হোটেলে গিয়ে থাকতে পারত। গোটা সংসার যাচ্ছে, অতএব আমাদের বাড়ি চাই। তখন এত হোটেল ছিল না, এত হলিডে হোম-টোমও ছিল না, ফলে পুজোর প্রায় মাসখানেক আগে থেকে একটা ছুটোছুটি শুরু হয়ে যেত বাড়ি ঠিক করবার জন্য।

তার ওপরে বাড়ি আবার যে-কোনও রকমের পেলে হবে না। আমার মায়ের আবার এসব ব্যাপারে খুব বায়নাক্কা ছিল। আমার কাকারা মাকে খুব মান্যি করে চলতেন। আমার বাবার চাইতে কাকারা বয়েসে অনেক ছোট। এঁরা মাকে খুব ভয়ও পেতেন, ভালোও বাসতেন। এঁদেরই কাউকে মা পাঠিয়ে দিতেন, যাও তুমি গিয়ে দেখে এসো। কিংবা, যাও তুমি পুরী চলে যাও, তুমি চলে যাও দেওঘর-এইভাবে মা কাকাদের পাঠিয়ে দিতেন। ওঁরা বাড়ি ঠিক করে আসতেন। মায়ের কতকগুলো ব্যাপার বলে দেওয়া থাকত

। খোঁজ নেবে এর আগে বাড়িতে কোনও কঠিন অসুখের রোগী মারা গেছে কিনা তাহলে সেই বাড়িতে যাওয়া চলবে না । বাড়ির কোনও দুর্নাম আছে কিনা-সেটা দেখে আসতে হবে । দুর্নাম মানে কোনও ভূতটুত আছে কিনা । হানাবাড়ি কিনা । এগুলো সমস্ত জেনে আসতে হবে । বাড়িটা একেবারে ভীষণ ভিড়টিড় জায়গায় শহরের মাঝখানে হলে চলবে না । আবার শহর থেকে বেশি দূরে হলেও চলবে না । এত রকমের দাবিদাওয়া মিটিয়ে বাড়ি পাওয়া শক্ত । চার-পাঁচটা বাড়ির খোঁজ আসত, তার মধ্যে একটা বাড়ি পছন্দ হত । তারপর আমরা একদিন দুগগা দুগগা বলে চলে যেতাম ।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে যাওয়াটাও একটা পর্ব ছিল ।

তখনকার দিনে এইসব হোল্ডঅল-টোল্ডঅলের চল বিশেষ ছিল না । প্রচুর ছেলেপিলে আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত-সেকালের অধ্যাপক ছিলেন তো আমার বাবা । প্রচুর ছেলে । তারাও যেমন আছে । আমরাও সে'রকম থাকতাম । ঘরে পাশাপাশি শতরঞ্চি পড়ে রয়েছে-একটা শতরঞ্চি একটা বালিশ আর একটা পাতলা চাদর-টাদর । সকালবেলা সেই বিছানাটাকে পাটিসাপটা পিঠের মতো পাক দিয়ে তার ওপর বই রেখে পড়াশুনো করত সকলে । আমাদের ওপর একটা হুকুম ছিল যে ওই ছাত্ররা, যখন কলেজে চলে যেত, দুপুরবেলায়, তাদের শতরঞ্চিগুলো জোগাড় করা । এটা কাকার অর্ডার ছিল । আমাদের এই কাকা বাঁধাছাঁদার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ ছিলেন । তাঁর হুকুম, শতরঞ্চি পাঁচ ছ'খানা যে করেই হোক, জোগাড় করে ফেলো । তারা ফিরে এসে হয়তো চেঁচামেচি করবে, আমার শতরঞ্চি কোথায় গেল বলে, কিন্তু সে আর কি করা যাবে । তো পাঁচ সাতখানা শতরঞ্চি আমরা গায়েব করে ফেলতাম । সেই শতরঞ্চিতে সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করা হত । কাকা বিশাল বড় করে একটা বেডিং করতেন । তার মধ্যে কী যে থাকত না বলা মুশকিল । প্রথমে তো তিন-চারটে তোরঙ্গ ভরে ফেলা হত এটা-সেটা গরম জামা কাপড়ে । তারপরেও মা এসে বলতেন এটা নেওয়া হল না সেটা নেওয়া হল না, সেগুলো সমস্ত চলে যেত বেডিং-এর মধ্যে-সব থেকে শেষে সেটা বাঁধা হত । ফলে সেটা একটা ঢাউস চেহারার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত । লেপ কাঁথা কম্বল সব তার মধ্যে । বালিশ, মশারি । তার মধ্যে আমার ক্রিকেট ব্যাটও ঢুকে যেত । ঢুকত আমার ছোট ভাইয়ের ট্রাইসাইকেল । মায় আমার ছোটকাকা ডাক্তারি পড়তেন, তাঁর গ্রে'জ অ্যানাটমিটাও । সে এক বিশাল কাণ্ড । একবার আমার ছোটভাই বায়না ধরেছিল যে তার ক্যারাম বোর্ডটাও ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে । তাতে কাকা অবশ্য রাজি হননি । বলেছিলেন, না না, ক্যারাম ঢোকানো যাবে না তাহলে বেডিংয়ের শেপ খারাপ হয়ে যাবে । মা ভয় পেতেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন । কাকা সব সময় একটাই বেডিং করতেন, দুটো করতেন না ।

মা বলতেন, দুটো কর। দুটো কর। কাকা বলতেন, না একটা। তাহলে আবার মাল বেড়ে যাবে।

ফলে, যা হবার, এক বছর তাই হল। সেবারে আমরা ময়ূরভঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে-তখন সেটা ছিল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে-রূপসা নামে একটা জংশন আছে। রূপসা থেকে একটা লাইট রেলওয়ে ছিল। বারিপদা হচ্ছে গিয়ে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী। রূপসা থেকে ওই পর্যন্ত ঝিক-ঝিক ঝিক-ঝিক করে সে ট্রেনটা যেত শাল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। এই ট্রেনটা সকালবেলা রওনা হত। এর আবার কোনও ছাদ-টাদ ছিল না। ওয়াগনের মতো দেখতে। ফলে দরজা দিয়ে না ঢুকলেও ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া যায়। গেলাম ঠিক। ফিরতি পথে আরও প্রচুর মালপত্র বেড়ে গেল। যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই কিছু কিছু করে জমে যাচ্ছে। সেগুলো নিয়ে বেডিং আরও ঢাউস হয়ে গেল। আমরা তো টুক টুক করে এলাম রূপসায়। ওখান থেকে মাঝরাত্তিরে ট্রেন। ম্যাড্রাস মেল। কলকাতায় আসছি। এক মিনিটের বেশি ট্রেন থামে না। সেই ট্রেনে উঠতে গিয়ে বেডিং গেল দরজায় আটকে। আর ভেতরে ঢোকে না। দু-পাশের দেওয়ালের মাঝখানে সেটা স্যান্ডউইচ হয়ে গেল। কিছুটা ঢুকল, ঢুকে আটকে গেল। এবার না আসছে এদিকে, না ওদিকে। আমি আগেই ঢুকে গেছি। আমাকে ডেকে কাকা বললেন, চেন ধরে ঝুলে পড়ো। তাই পড়লাম, খানিক গিয়ে খ্যাঁচ করে ট্রেন আটকে গেল। তখন তো সব লালমুখো গার্ড-টার্ড, তারা এসে মহা হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিল। পাঁচ মিনিট ওইখানে ম্যাড্রাস মেলকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। তার মধ্যেই কাকুন যে কি করে একটা বেডিংকে পঞ্চাশটা করে ফেললেন। সব ছত্রখান করে ভেতরে ঢোকাচ্ছেন। কুলি-ফুলি এসে সবাই মিলে টেনে হিঁচড়ে তাড়াতাড়ি সব ভেতরে ঢোকাল। ভেতরে লোকজন ঘুমিয়ে রয়েছেন। সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। খেপে অস্থির তাঁরা। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙানো হয়েছে তো! সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

যা হোক এইরকম জায়গাতে ঘুরে বেড়াতেই কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগে। দেওঘরের কথা মনে পড়ে। চিত্রকূটে যাওয়া, বাড়ির বারান্দায় বসে থাকা, লোকজন হাটে যাচ্ছে, একটা তিরতিরে নদী-সেটা হেঁটে লোক পার হয়ে যাচ্ছে। এসব দেখা। যারা হাটে যাচ্ছে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়িতে তাদের আটকে তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেনা-এর মধ্যে একটা মজা আছে। আজকাল এটা খুব একটা হচ্ছে না। সবাই যায়-এক শহর থেকে আরেক শহরে। এসব জায়গায় গিয়ে লোকেরা আর মজা পাচ্ছে না, লোকে খুব যেতেও চাইছে না। একটু নিরালা জায়গায় লোকে খুব একটা যেতে চায় না। অবশ্য আরও একটা কথা ভাববার আছে, নিরালা জায়গা খুব একটা নেইও আর আগের মতো। পুজোয় আমরা এমন কোথাও গিয়েছি যে সেখানে বালির মধ্যে প্রচুর আতাগাছ নেই, এমন

আমি ভাবতে পারছি না । বাড়ির মধ্যে পেঁপে গাছ রয়েছে, আতা গাছ রয়েছে-এরকম গাছগাছালি ভরা যে বাড়ি, তা-ও তো আজকাল আর দেখি না ।

ট্রেনে করে আসানসোল কি বরাকর পেরোলেই দেখবে হাওয়াটা একদম বদলে গেছে, গোটা ভূ-প্রকৃতিটাই অন্যরকম । আসানসোল থেকে যদি সীতারামপুর জংশন দিয়ে চলে যাই, পরপর কারমাটার পড়ছে, মধুপুর পড়ছে, গিরিডি পড়ছে-এইরকম আরও কিছু । ধর গিরিডিতে গেলাম, সেখান থেকে বাসে ধানবাদ, ধানবাদ থেকে চলে গেলাম রাঁচি কি হাজারিবাগে । অপরদিকেও আছে-চক্রধরপুর কি চাইবাসা । সাঁওতাল পরগনা আর ছোটনাগপুর, এই দুটো জায়গায় ছোট ছোট জায়গাগুলোতে যশিডি, মধুপুর, ঝাঁঝা, শিমুলতলা-প্রত্যেকটা জায়গাতেই আগে একটু সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের নিজেদের বাড়ি ছিল এবং তাঁরা সময় পেলেই সেখানে যেতেন । সে-সব বাড়ি এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । কারণ, যাঁরা সে-সব বাড়ি বানিয়েছিলেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম আর ওখানে যায় না । তারা রেলগাড়িতেই চাপে না, এরোপ্লেন করে ঘুরে বেড়ায় । এরোপ্লেন তো আর ওসব জায়গায় নামে না ।

আমার মনে আছে বি এ পরীক্ষা দিয়ে আমি আর আমার এক বন্ধু, সে এখন আমেরিকায় অধ্যাপক, দুজনে দুটো ঝোলা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়েছিলাম । কলকাতা থেকে প্রথমে মধুপুর, সেখান থেকে গিরিডি, গিরিডি থেকে ধানবাদ-গোটা এলাকাটা আমরা একেবারে টৈ টৈ করে ঘুরেছিলাম । ঠিক এই ধরনের ঘোরার নেশা এখন আর কারও দেখি না ।

বড় বড় শহরেই যেন যাবার ঝোঁকটা বেশি । পুরী কিংবা দার্জিলিংয়ের মতো বড় শহরে গেলে আমার মনে হয় পটলডাঙা কি পটুয়াটোলাই যেন সটান উঠে এসেছে । পুরীতে যদি আমি যাই কখনও তো স্বর্গদ্বারে উঠি না, উঠি চক্রতীর্থে । ওদিকটা এখনও পর্যন্ত নিরিবিলি ।

পুরী যাই । কারণ, অমন সমুদ্র তো গোটা পৃথিবীতেই দুর্লভ । আমার মোটামুটি গোটা বিশ্বজগৎটা দেখা হয়ে গেল । সেই কারণে বুঝি যে এর কোনও তুলনা হয় না । নর্থ সী কি আটলান্টিক কিংবা ধরো ইংল্যান্ডের ব্রাইটনের সমুদ্রের তো এত নাম শুনি । পুরীর কাছে ওসব কিছু না । তবে হ্যাঁ, ওরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে জানে । আমরা তা জানি না । ফারাকটা এইখানেই । আবার উল্টোদিকেও বলি যে অত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার দরকারই বা কি! খুব বেশি সাজানো গোছানো জিনিস ভালো না ।

১৯৫৩য় আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে ছিলাম হিমালয় ভ্রমণে । দুশো কিলোমিটার হেঁটেছিলাম । তখন বদ্রী পর্যন্ত বাস যেত না, যেত চামোলি অবধি । সেখান থেকে প্রায়

পঞ্চাশ কিলোমিটার আমরা হেঁটে গিয়েছি। বর্ষাকাল, ধসের সময়। আমি আর সেই বন্ধু হেঁটে হেঁটে ঘুরেছি। একেকটা চটিতে থেকেছি। রাত কাটিয়েছি। লোক নেই জন নেই- অমন নিরালা নির্জন জায়গায়। গিয়েছিলাম বদ্রীনাথ ছাড়িয়ে বসুধারায়। সেখানে বহু ওপর থেকে পড়ছে একটা জলের ধারা। যমুনোত্রী যাওয়ার সময় আমাদের সায়না চটি থেকে বাইশ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছিল। এইভাবে যে যাওয়া-এটাই হল আসল যাওয়া। যমুনোত্রী থেকে ফেরার সময় বরকোট বলে একটা জায়গা পড়ে। এই বরকোট আর উত্তরকাশীর মাঝখানে ডুনডা ভ্যালি বলে একটা জায়গা আছে। অসাধারণ সুন্দর লেগেছিল সে বার। মনে পড়ে, বিকেলের পড়ন্ত আলো পড়েছে লাল টালির ছাদে। ডানদিকে সরু গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, বাঁদিকে হিমালয়। এক সুন্দর ভ্যালি, মনে হয়, এখানেই তো জীবনটা কেটে যেতে পারত।

দেশের বাইরে যে যাই, এরোপ্লেনে একটা শহর থেকে উড়ে আরেকটা শহরে গিয়ে নামি। মাঝখানে কী যে পেরিয়ে গেল কিছুই বোঝা হয় না। এক শহরে মিটিং সেমিনার সেরে হয়তো আবার উড়ি আরেক শহরের দিকে। অবশ্য কয়েকদিন আগে বিদেশে গিয়েছিলাম মাস চারেকের জন্য। সকালে বেরিয়ে পড়তাম, একটা খবরের কাগজ কিনে পার্কে গিয়ে বসতাম। নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতাম। আমার ল্যান্ডলেডি খাবার বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতেন। আমার যখন সময় হত ফিরে গিয়ে খেয়ে নিতাম। এই বেড়ানোটাই আমার পছন্দ। আমি কোনও একটা জায়গায় গিয়ে একটু ঘুরে বেড়াতে চাইছি আপনমনে। কোনও চাপ থাকবে না। নিজেকে গড়ে তোলার একটা চেষ্টা ভেতরে ভেতরে চলে এই সময়। যাতে, আমি কলকাতায় যখন ফিরে আসব তখন একটু নতুন হয়ে যেন ফিরতে পারি।

কলকাতায় থাকতে যে টেনশনগুলো আমাদের সঙ্গী, অনেকে বাইরে যায় সেই টেনশনগুলো মাথার মধ্যে নিয়েই, সেটা ঠিক না।

মনে পড়ছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে টিলার ওপরে একটা গেস্টহাউস। তার বারান্দায় আমি বসে আছি। নিচে শালজঙ্গলের ভেতর দিয়ে রেললাইন। সেখানে একটা ট্রেন ঝিকঝিক ঝিকঝিক করে চলে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে। এরকমই আমি চাই। এর বেশি বাহুল্য মাত্র।

সাক্ষাৎকার: যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

ভ্রমণ শারদীয় সংকলন, ১৯৯২

আমার ভ্রমন

মহাশ্বেতা দেবী

১৯৯৮ থেকে খাণ্ডালা-লোনাভালা-পুনে অন্তত বিশবার আপ-ডাউন করেছি। চিনতেই পারি না। ১৯৫০-এর দশকের খাণ্ডালা কোনও শহরই ছিল না। পশ্চিমঘাটের কোলে কিছু বিচ্ছিন্ন বাংলো। রীতিমতো সাহেবি আমলের বাংলো, টালির ঢালু চাল, চওড়া ঢাকা বারান্দা, বড় বড় ঘর।

গ্রামবাসীদের বস্তি দূরে দূরে। 'ডেকান কুইন' যখন দাঁড়াত (স্মৃতি থেকে লিখছি), তখন আদিবাসী মেয়েরা পাতার ঠোঙায় বুনো জাম, টকমিষ্টি করঞ্জা ফল জলের দামে বেচত। খাণ্ডালায় কোথাও সেদিনের অভিনেত্রী নিরূপা রায়ের বাংলো ছিল। সে সময়ে উনি সিনেমায় দুর্গা, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, কালী-এসব সাজতেন। উনি বম্বে থেকে আসতেন একটু জুড়োতে। আর হাঁটতে বেরোলেই কাছা দিয়ে রঙিন কাপড় পরা গ্রামের মেয়েরা ওঁর পায়ের কাছে নারকোল বা ফুল বা ফল রেখে প্রণাম করত।

আজকের খাণ্ডালা আর সেদিনের খাণ্ডালার আকাশপাতাল তফাত। সে তো আজকের কলকাতা আর আমার ছোটবেলার কলকাতাও অন্য রকম। এ শহরে আমার চেনাজানা কী বা আছে!

১৯৯৮ থেকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে অন্য কাজের জন্য বেজায় ঘুরেছি, বছরে আট মাস। গেছি তো দূরদূরান্তের গ্রামে-জঙ্গলে-পাহাড়ে। সে সব অন্য কখনও বলা যাবে।

বেড়াবার জন্য বেড়ানো যদি বল, তাও ঘুরেছি অনেক একদা। তবে একটা সময় ছিল, বেরিয়ে পড়াটাই আনন্দের। কোথায় যাচ্ছি, তাতে কী! সে ছিলেন আমার মা। 'চলো যাই' বলে বেরিয়ে পড়লেই হল। বেরিয়েছ, সেটাই তো আনন্দের। জায়গাটা কি নাম করা? প্লেনে যাচ্ছ, না ট্রেনে? হোটেলে থাকছ, না অন্য কোথাও?

বড় ভালো কেটেছে সে সব দিন। ১৯৪৪ সালে মা বললেন, চল আমরা বাদকুল্লা যাই।

বাদকুল্লা কেন? আমার বাবা মণীশ ঘটক, কার যেন বুদ্ধিতে বাদকুল্লায় ৪০ বিঘা ধানজমি, আর ১ বিঘা বসতজমি কেনেন। টাকা দিয়েই খালাস। জায়গাটা কোথায়,

কীভাবে যাব, সে সব নিয়ে চিন্তা নেই ।

মা তো ছিলেন দুর্ধর্ষ সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী । বাবা যেই রংপুরে বদলি হলেন, মা আমাদের আট ভাইবোনকে নিয়ে চললেন বাদকুল্লা, সুরভিস্থান-এ । গরুর গাড়িতে ধানখেতের মধ্য দিয়ে পৌঁছলাম । পাকা ধানের সুগন্ধ, আর তেমনই শীত । বিশাল উঁচু এক খড়ের ঘর, তাতে বড় বড় তক্তপোশ ।

সুরভিস্থান ফার্মের লোকজনের কী যত্ন, কী সেবা! ফার্মের গরুর দুধ এক বালতি আর গরম রসগোল্লা এক বালতি নিয়ে এলেন । সামনে তিরতিরে অঞ্জনা নদী । সেখানে হাত মুখ ধুই, স্নান করি কি না, মনে নেই । দুবেলা সুরভিস্থানের কিচেন থেকে আসে ওখানকার লাল চালের ভাত, ঘন মুসুর ডাল, সব একেক বালতি, আরেক বালতি বাগানের নানা সবজির ঘণ্ট । সারাদিন খেল, বেড়াও, ছোটগুলোকে সামলাও ।

মাঝে মাঝে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে মা কেনেন চিংড়ি আর চুনো মাছ । মাটির কড়াইয়ে রাঁধেন, তার স্বাদ কী অপূর্ব! সকাল-বিকেল দুধ আর রসগোল্লা তো থাকেই ।

সাতটা দিন যেন ‘সব পেয়েছির দেশ’-এ ছিলাম । অবশ্যই ‘সুরভিস্থান’-এর পরের খবর জানি না । বাবার সে ধানজমি আর বাস্তুজমিও আর দেখিনি । কিন্তু ঘর ছেড়ে অজানা জায়গায় যাবার যে আনন্দ, সে তো তুলনাহীন ।

১৯৮৫ থেকে বেশ কবার বিদেশ গেছি । যথেষ্ট ঘুরেছি । কিন্তু পৃথিবীবিখ্যাত সৌধ, মিউজিয়াম, জলপ্রপাত দেখার সময়ে অল্প বয়সের মনটাই নেই, স্মৃতিতে তারা ঝাপসা ।

অল্পবয়সের মন ব্লটিং কাগজের মতো । যা পারে, শুষে নেয় । কাদের বলি এ সব কথা! ব্লটিং কাগজ কি, তা আজ কে বুঝবে!

বেরিয়ে পড়াটাই আনন্দের ।

এক সময়ে পালামৌ-এর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কতদূর চলে যাই! সেদিনের পালামৌ-এ বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর, কী ছিল না?

শাড়ি এবং কেডস পরে, জুন মাসে যখন বরফ গলছে, তখন সেই নরম বরফ দিয়ে হেঁটে রোটাং পাসে যাওয়া সে কি ভুলে যাব? সত্যি বলতে কী, রোটাংয়ের নরম বরফে আমাদের তলিয়ে যাওয়ারই কথা!

মন যখন বলছে, চল যাই!

যাওয়াটাই আনন্দের। আর কত যে ভ্রমণ ম্যাডভেঞ্চার, তা বলতে গেলে শেষ হবে না।

'ভ্রমণ' আমার প্রিয় কাগজ। এ কাগজের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেসব ভ্রমণকথা বলতে পারলে খুশি হতাম। শরীরের অবস্থার জন্য এবার তা সম্ভব হল না। কোনওদিন বলব।

দেওজীরার গহন জঙ্গলে ফরেস্ট বাংলোর কথা বলব। যার অর্ধেকটা শাল গাছের পুরু তক্তায় গাঁথা।

-কেন?

চৌকিদারের সস্নেহ জবাব, 'ওদিকে বাঘ এসে শোয় মাঝে মাঝে। আমরা এদিকে থাকি।'

এ তো ১৯৯৮ জুলাইয়ের কথা, অথবা এ বছর মার্চ মাসের।

'ভ্রমণ' বলতে আমি বুঝি মনের খুশি। ধানের শিষে শিশির দেখেই খুশি থাকি, বলতে পার।

সেইসব ভ্রমণের কথাই মনে পড়ে, যতবার পিছনে ফিরে তাকাই। এমন একটা পরিবার আমাদের, এমন স্বভাব আমারও, যে যত ম্যাডভেঞ্চার, আমাদের বাড়িতেই হত। যেমন, ১৯৪৫ সালে শান্তিনিকেতন থেকে বহরমপুরে যাওয়া।

১৯৪৪ সালের শেষে বাবা রংপুরে। তখন যুদ্ধের সময়, ঠিক হল আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হব। বয়স তখন সবে আঠারো। রংপুর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন, বাবা 'তুই পারবি' বলে আমাকে ট্রেনে তুলে দিলেন। আজ ভেবে পাই না। কী করে পেরেছিলাম। যা আরও ভেবে পাই না, বাবা মা আমার বিষয়ে অত ভরসা কেন পেতেন।

তা শান্তিনিকেতনে পড়ছি। চিঠিতে জানলাম, বাবা বদলি হয়ে বহরমপুরে এসেছেন। চিঠি পেয়েই আমার বেজায় মন কেমন করল। লিখলাম, আমি দোলের ছুটিতে বহরমপুর যাব। কেমন করে, কোন পথে যাব। তা কিন্তু বাবা কিছুই জানাননি। খুকু যখন লিখছে, ও চলেই আসবে, এইরকম একটা ভাব।

অনেক খোঁজ নিয়ে বোলপুর থেকে আমেদপুর এলাম। শেষে বোলপুর-আমেদপুর, আমেদপুর-কাটোয়া, কাটোয়া-বারহারোয়া লাইনের ট্রেনে এলাম খাগড়াঘাট। দোলপূর্ণিমার রাত। সময় সাড়ে দশটা হবে। নেমে দেখি সব শুনশান। স্টেশন মাস্টার, সুটকেস হাতে

আমাকে নামতে দেখে বেজায় অসন্তুষ্ট। যা জানা গেল, আশপাশে কেউ নেই। খাগড়াঘাট থেকে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে রাধারঘাট পৌঁছতে হবে। নদী পেরোতে হবে হেঁটে, অবশ্য জল তেমন নেই। ওপার থেকে লালদিঘি, হেঁটেই যেতে হবে।

যে সময়ের কথা লিখছি, তখন মফস্বলে যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি। সাইকেল-রিকশা তখন অজানা বস্তু। এ তো চুয়ান্ন বছর আগেকার কথা!

স্টেশনমাস্টার আমাকে যথেষ্ট বকলেন। যুদ্ধের সময়। রোজ এ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় না। নামলাম, তো এত রাতে থাকব কোথায়? এই ছোট্ট স্টেশনে কোনও ব্যবস্থাই নেই।

সেদিনের খাগড়াঘাট ছোট্ট স্টেশন, দুপাশ বনজঙ্গলে ঢাকা, তার মাঝে না-কাঁচা, না-পাকা, বলতে পার আধপাকা রাস্তা। স্টেশনমাস্টার ঘর বন্ধ করে লণ্ঠন হাতে বাড়ি রওনা হচ্ছেন। আমি বললাম, বেশ! সুটকেস নিয়ে একাই যাব।

এই সময়ে, অন্ধকারের ঝাঁপার মুড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পরে জেনেছি, তাঁর নাম মণিপাঁচু, পদবি ভুলে গেছি। ওঁর পরিবারের সকলের নামের পর ‘চন্দ্র’ বা ‘নাথ’ বা ‘কুমার’-এর বদলে পাঁচু যুক্ত হত। বহরমপুরের ব্যাপারই আলাদা। আমরা যাঁকে ‘কাকা’ বলতাম, তার নাম ছিল অশোক উপেন্দ্র মল্লিক। অর্থাৎ মধ্যবর্তী ব্যাপারটা ‘উপেন্দ্র’।

যাক, এ ভদ্রলোক বোধহয় স্টেশনেই রাত কাটাতেন। বললেন, মণীশবাবুর বাড়ি তো? চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

দোলের রাতেও তীব্র শীত। সেদিনের বহরমপুর-কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর, শাল-সেগুনের জঙ্গল ছিল। আমিও, তখন ভাবতে পারতাম না, আমার কোনও বিপদ হবে, আজও তেমন গোঁয়ার-নির্বোধ রয়ে গেছি বলতে পার। যাক, ১৯৪৫ সালে ফিরে যাই। ভদ্রলোক আমার সুটকেসটা নিলেন, আমিও, যাঁকে চিনি না-জানি না, তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম।

যেমন শীত, তেমন জঙ্গল, দুপাশে। কখন বোলপুর থেকে ট্রেনে উঠেছি, এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে, আমরা হাঁটছি তো হাঁটছি। ভদ্রলোক বললেন, পথটা তো ভালো নয়, আপনি একলা যাবেন...।

না, সেদিন চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদির ভয় ছিল না। ছিল চিতাবাঘের ভয়। সে সময়ে বহরমপুরে জজকোর্টে, স্টেশনের কুলিবস্তিতে চিতাবাঘ হানা দিত, মারাও পড়ত। আমাদের লালদিঘিতেও তারা ঘুরে যেত।

এই ভদ্রলোকের মতো মানুষ আরও দেখেছি । এঁরা মানুষকে সাহায্য করতে সদাই তৎপর । এঁর বাড়ি তো খাগড়া, আমরা থাকি লালদিঘি, মাঝে নিশ্চয় দুই বা তিন মাইল পথ । আমাকে পৌঁছে উনি ফিরবেন হেঁটে হেঁটে । এসব কথা তখন ভাবিনি ।

চাঁদের আলো পথে পড়ে না যেন । দুপাশে জঙ্গল । মাঝরাত পেরিয়ে নদীর ঘাটে পৌঁছলাম । নদীর ওপারে পথে গ্যাসের আলো, কী যেন মেলা হচ্ছে । এবার হাঁটু অবধি কাপড় তুলে ভাগীরথীতে নামলাম । বালি ঠেলে ঠেলে ওপারে উঠলাম । শুনলাম, লালদিঘি না কি এক ক্রোশ, অর্থাৎ দুমাইল । আবার হাঁটো, আবার চলো । আমার, বলতে নেই, বাড়াবাড়ি রকম শক্তিসামর্থ্য ছিল । ক্লান্তি জানতাম না । তখন কিন্তু আর যেন পারছি না ।

লালদিঘি তখন এত্তটুকু জায়গা । বাঁদিকে দুটো একতলা বাড়ি, ডানদিকে দুটো । বাঁদিকে প্রথম বাড়ির কড়া নাড়লাম । রাত তখন দুটোই হবে । তখন তো জানি না ওটা কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়ি । আর ওঁর গলাও বেশ ভারি । কড়া নাড়তেই উনি বললেন, কে?

আমি ধাক্কা দিচ্ছি আর বলছি, তুতুল! আমি! শীগগির দরজা খোলো ।

রাত দুটোয় একটা মেয়ের গলা? তখনি শুনলাম, না না, এখানে কোনও তুতুল নেই ।- ওঁর বা দোষ কী? সে সময়ে এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড হতই না ।

অগত্যা পাশের বাড়িতে ধাক্কা । তুতুলই দরজা খুললেন । খুলেই বললেন, এসে গেছিস?

তারপর মণিবাবুর সঙ্গে একটু কথা বললেন । আমাদের বাড়ি কী সৃষ্টিছাড়া তাই ভাবি । তুতুল বা মা একটুও অবাক হলেন না । নতুন শহরে, রাত দুটোয় কেমন করে এলাম, ট্রেন বদল করতে করতে, কখন বেরিয়েছি, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করা নেই । আহা আহা তো একদম নেই । মা বললেন, পা ধুয়ে ভাইবোনদের বিছানায় ঢুকে যা ।

পরের দিন প্রতিবেশীরা এ হেন দজ্জাল মেয়ের কাণ্ড নিয়ে অনেক বলেছিলেন ।

তুতুল বললেন, বেশ করেছিস!

চুয়ান্ন বছর কেটে গেছে । সেদিনের কোনও কিছুই আগের মতো নেই । আমার প্রথম বহরমপুরে অবতরণ এরকমই । অনেক ভ্রমণের মতো ম্যাডভেঞ্চার ।

এখন তেমন যাত্রা করাই যাবে না । ভূগোলই পাল্টে গেছে । আজ এই পর্যন্ত । এমন ম্যাডভেঞ্চার অনেক করেছি, আর এখনও বিশ্বাস করি, 'এলেম নতুন দেশে', এরকম মন নিয়ে যদি হাটবহিরগাছিও যাও (আমি গিয়েছি), ভ্রমণের আনন্দ পাবেই পাবে । আনন্দ

তো মনের ব্যাপার, আর তৃষ্ণার্ত চোখে দেখার ব্যাপার । কাছে, না দূরে, তাতে কি আসে যায় বল?

ভ্রমণ অক্টোবর, **১৯৯৯**

সুন্দরবন

হীরক নন্দী

হাতে টানা ডিঙিতে খাঁড়িতে ঢুকছিল ওরা তিনজন । সবাই বনবিভাগের লোক । সঙ্কীর্ণ খাঁড়ি, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় সতর্ক ছিল প্রত্যেকেই । হয়তো সেই কারণেই বাঁকের মুখে ঝলসে ওঠা হলুদের আভাসটুকু চিনতে ভুল হয়নি হরিনন্দন মাঝির । ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নিমেষের মধ্যে দেহটাকে ছুড়ে দিয়েছিল খাঁড়ির জলে । মানুষখেকোর থাবা পিঠে পড়েও তাই ধরে রাখতে পারেনি ভাগ্যবান মানুষটাকে । জলে পড়েই ডুব দিয়েছিল হরিনন্দন । হাতের বৈঠাটা খাঁড়ির মাটিতে গেঁথে চুপচাপ পড়ে ছিল যতক্ষণ শ্বাস থাকে । সীমাহীন আতঙ্কে অনুভব করেছিল মাথার ওপরে ঘোলা জলে বাঘের তোলপাড় । ফুসফুসের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে ভেসে উঠে দেখেছিল বাঘও নেই, নৌকোও নেই । প্রাণপণে হাঁক দিতে সামনের বাঁক ঘুরে ফিরে এসেছিল সন্ত্রস্ত সঙ্গীরা । নৌকোর পাটায় উঠে জ্ঞান হারিয়েছিল হরিনন্দন । বহুদিনের চিকিৎসা আর বিশ্রামে সেরে উঠেছিল আবার । 'দেখবেন সেই থাবার দাগ?' পরনের জামাটাকে হাট করে খুলে ধরেছিল প্রৌঢ় হরিনন্দন মাঝি । ভেবেছিলাম শিউরে উঠব, কিন্তু অবাক হলাম । বুক-পিঠের কাঁকড়ার গর্তের মতো ফুটোফাটা আর ইতস্তত আঁচড়ের গভীর ক্ষত অবলীলায় মিশে গেল আশপাশের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে । মনে হল এটাই স্বাভাবিক -এই ভয়ংকর অরণ্যের আশ্চর্য সুন্দর পটভূমি মানুষটার দেহটাকে সুদ্ধ আপন করে নিয়েছে ।

একই ধরনের অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে সুন্দরবনের সর্বত্র । যেখানে যখন যাওয়া, কান পাতলেই মানুষ আর মানুষখেকোর গল্প । মানুষগুলো বীর, যদিও বীর্যবান বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখে ভাসে, তা কিন্তু নয় । বুকের পাটার জায়গায় বুকের খাঁচা, দৃপ্ত ঋজুতার পরিবর্তে কোলকুঁজো ছোটখাটো চেহারা, লালচে ঘোলাটে চোখে দীপ্তির বদলে ডাঙায় পড়া মাছের শূন্যতা । তবু এরা দুর্জয় । ঝড়ে, জলে, বাদাবনের বিস্তীর্ণ বাদাড়ে ।

এই মানুষগুলোকে চোখে না দেখলে সুন্দরবন দেখা সম্পূর্ণ হয় না । জেলে, মউলে, কাঠুরে আর নিছক চাষী -এই চতুর্বর্ণের সমাজ । বর্ণসংকর প্রায় সবাই, কখন যে জেলে আর কখন কাঠুরে তা বোঝা দায় । এই একই মানুষটা বীজ বোনে আবার মধুও ভাঙে । এরই মাঝে আরও দুটো গোত্রের মানুষ-ডাকাত আর বাউলে । প্রথমটা ভক্ষক আর

দ্বিতীয়টা রক্ষক । প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলোকে চেনা যায় না, আর দ্বিতীয় শ্রেণীটা খোঁজখবর করলে দেখা যায় । বাউলেরা মানুষের বিশ্বাসে গড়া দেশজ মনস্তাত্বিক, মানুষকে ভরসা দিয়ে যমের মুখেও লড়িয়ে দিতে পারে । তন্ত্রমন্ত্রের কথা বলতে পারি না, তবে এদের বাঘের মতো মনোবল, তাই বাঘের সামনেও অক্লেশে রুখে দাঁড়ায় । সুন্দরবনের মাটিতে এরা প্রকৃতির পুরোহিত ।

সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘বনবিবি’ । তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সাধারণ তালিকার বাইরে তাঁর অস্তিত্ব । ধর্মভেদ আর শাস্ত্রবিধির বেড়া ডিঙিয়ে মানুষের সহজাত সংস্কার আর বিশ্বাস দানা বেঁধে কীভাবে মূর্তি ধারণ করতে পারে-বনবিবি তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । হিন্দু হোক মুসলমান হোক, জঙ্গলে যারাই পা ফেলেন তারা বনবিবির শরণাগত । বনবিবি আর তাঁর ধর্মপুস্তিকা জহরনামার নামে তাই একাধিক ধর্মের মিলনের সুর । বাঘ তাঁর বাহন, ‘শা-জঙ্গলি’ তাঁর ভাই, আবার সেনাপতিও বটে । ‘দুখে’ তাঁর আশ্রিত সাধারণের প্রতিভূ । এছাড়াও আছেন দক্ষিণরায়, যিনি বাঘেদের দেবতা-বাঘরূপ ধারণ করে বিপদের কারণ ঘটান । জঙ্গলের মোম আর মধুর তিনিই সৃষ্টিকর্তা । দুখেকে বাদ দিলে, এঁরা সবাই লোকদেবী আর লোকদেবতা । পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে বনবিবির পুজো, যে পুজোর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা জঙ্গলেরই মাটিতে । আজকাল লোকালয়েও পুজো হয় । বনবিবির পুজোয় উৎসর্গ হয় দেশী মুরগি । বলি নয়, জ্যান্ত মুরগি জঙ্গলের মধ্যে মুক্তি পায় । সুন্দরবনের বাদায় নাকি বনমুরগি ছিল না । আজকে যেগুলো দেখা যায়, সবই উৎসর্গের বংশ ।

সুন্দরবনের কাঁচাখেকো দেবতা বাদাবনের বাঘ । ‘রয়্যাল বেঙ্গল’ মানেই সুন্দরবনের রাজা-বাঘ । লোকের ধারণা, তাদের কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, একেকটা থাপ্পড় দিলে দু-দশটা হাতি মাথা ঘুরে পড়বে । কিন্তু সুন্দরবনের বাঘেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্বজাতির তুলনায় আকারে সাধারণত ছোট, আর সবাই যে মানুষ দেখলেই ধরে ধরে খায় -তাও নয় । দোষের মধ্যে বাঘগুলো মানুষকে বোঝে বেশি, সাঁতার কাটে অসাধারণ আর প্রতিকূল বনাঞ্চলে বেঁচে থাকার দায়ে অতিরিক্ত রকমের সাবধানী । এই কয়েকটা কারণে আর ক্ষেত্রবিশেষে নরঘাতী স্বভাবের গুণে, বাদার বাঘ কিংবদন্তী । সুন্দরবনের জল ছোঁয়া প্রতিটা পর্যটক তাই অক্লান্ত চোখে খুঁজে বেড়ায় ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা একটাই প্রতিচ্ছবি । যে দেখে সে ভাগ্যশালী, অধিকাংশই ফেরে শূন্য মনে । দুয়েকজন ছাড়া বনের বাকিটুকু কেউ ফিরেও দেখে না ।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে যাতায়াতের যেটা চালু নিশানা সেটা ক্যানিং থেকে বাসন্তী-গোসাবার ঘাট ছুঁয়ে দুর্গাদুয়ানি খালের বাঁকাচোরা জলপথে । কেউ কেউ বাসে কি গাড়িতে

চেপে সোনাখালি (বাসন্তী) গিয়ে জলযানে ওঠে, আবার কেউ বা ক্যানিং থেকেই গা ভাসায় । জলযাত্রার খোলামেলা স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণে অন্য মাত্রা আনে । প্রকৃতিকে প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়ার যে বিচিত্র সুখ, সবাই তার পিছনেই ছোটে ।

ক্যানিং থেকে দুর্গাদুয়ানি এই পথটুকুতে সুন্দরবন সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার ধারণা হয় না । নদীবাঁধের একপাশে বাদাবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দশমিক, দু-চারটে গরান কি বাইনের অপভ্রংশ । নদীবাঁধের ওপাশে লোকালয় । সুন্দরবনের যত লোকালয় এই নদীবাঁধ দিয়ে ঘেরা । দেখতে অনেকটা কানা উঁচু পদ্মথালার মতো, ভাসমান কিন্তু স্থির । পূর্ণিমা-অমাবস্যার আশপাশে ভরা কোটালের জল গ্রামের জমি ছাড়িয়ে উঠে নদীবাঁধে মাথা আছড়ায় । একবার গ্রামে ঢুকলে সর্বনাশ । অন্তত দু-তিন বছর অজন্মা । ফসল বলতে মোটামুটি ধান আর লঙ্কা । এখান থেকে লঙ্কা ওঠে বস্তা বস্তা । কলকাতায় গিয়ে 'ভাগা' হয় আর চটে চেপে খদ্দের খোঁজে । ধানও মন্দ হয় না, কিন্তু শুধু ওই খেয়ে আর কেনাবেচা করে লোকের পেট চলে না । তাই ঘুরে ফিরে জঙ্গলই এদের ডেকে নেয় ।

গত বছর পনেরো-কুড়ি ধরে এদের নতুন একটা পেশা বা নেশা হয়েছে বাগদা চিংড়ির মীন ধরা । মীন হল 'আর ছোট হলে চেনা যাবে না' ঠিক এইরকম আকারের অতিশিশু অথচ স্বাধীন চিংড়ি । সুন্দরবনের ছেলে-বুড়ো-মা-মেয়ে, সব মশারির জাল টেনে কোমর জলে হেঁটে বেড়ায়, নয়তো নৌকোয় বসে জল ছাঁকে । জালের ফুটোর থেকে বড় মাপের যা কিছু জীব সব জালে ফাঁসলো । এবার তার থেকে শুধু বাগদার মীনগুলো খুঁটে হাঁড়িতে ভরা । বাকি জীবগুলোর সাধারণত গতি হয় ডাঙায় পড়ে পুনর্জন্মের পথে পা বাড়ানো । বাস্তুতন্ত্রের দিক দিয়ে চরম ক্ষতি, কিন্তু গণতন্ত্রের মুখের দিকে তাকালে এই জীবিকা অপ্রতিরোধ্য । সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে তাই এও এক দর্শনীয় । পাঁচ বছরের কচি ছেলে টিনের রেলগাড়ির বদলে জাল টেনে জলে চলেছে । দিকশূন্য, ভয়শূন্য-শূন্য হাঁড়িটা শুধু ভরে তোলার আশায় ।

দুর্গাদুয়ানি খালের শুরু গোসাবা থেকে । এই পথে গোসাবাই শেষ বড় লোকালয় । থানা, হাসপাতাল, বাজার, হ্যামিল্টন সাহেবের ঐতিহাসিক দপ্তর মিলিয়ে যথেষ্ট রমরমা । গোসাবার একটা বৈশিষ্ট্য স্থানীয় সব বেকারির হরেকরকমের বিস্কুট আর টাটকা তুলতুলে পাউরুটি । দুর্গাদুয়ানি খালে অসংখ্য ছোট ছোট বাঁক । গোসাবা ছাড়িযে খাল ধরে ঘণ্টাখানেক গেলে তবে বড় নদীর মুখ আর সেই সঙ্গে আসল জঙ্গলের মুখবন্ধ । লঞ্চ ভেসে চলে লোকালয় আর জঙ্গলের প্রায় মাঝখানে । এই বড় নদীর স্থানীয় নাম গোঙর; কেউ বলে গোমতী, কেউ বলে বিদ্যা । দুর্গাদুয়ানি যেখানে এসে গোঙরে মিশেছে সেখান থেকে আরও এক ঘণ্টার পথে সজনেখালি । জঙ্গল সঙ্গে চলে পুরোটাই । ভাঁটার

আশপাশে যারা সজনেখালি পৌঁছয়, এইটুকু পথেই তারা হরিণ দেখে অনেক সময় । ভাঁটায় চরা পড়ে জঙ্গলের গা ঘেঁসে, তাই জন্তু দেখা সোজা । জোয়ারের সময়ে বাইরের সারির গাছগুলোর আধখানা ডুবে থাকে জলে । তখন দেখার মধ্যে শুধু মগডাল, পাখি, জল আর জলজন্তু । সজনেখালিতে বসেও হরিণ আর বাঁদর দেখাটা খুবই সহজ, বরং না দেখাটাই আশ্চর্যের ।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় জঙ্গলের মধ্যে একমাত্র থাকার ব্যবস্থা সজনেখালিতে । পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ইংরিজি 'এল' আকারের ট্যুরিস্ট লজে ৩০টা দুশয্যার ঘর । পুরো বন্দোবস্ত মোটামুটি স্বচ্ছন্দ । খাবার ব্যবস্থা লজের মধ্যেই । থামের ওপরে বসানো দোতলা বাড়ি; সন্ধ্যার পরে মাটিতে নেমে ঘোরাঘুরি করায় বাধানিষেধ আছে । রাতে বারান্দা থেকে জঙ্গলের গায়ে আলো ফেললে হরিণের চোখ জ্বলে ওঠে যেখানে সেখানে । সজনেখালিতে একটা ওয়াচ টাওয়ারও আছে, ট্যুরিস্ট লজ সংলগ্ন ফরেস্ট অফিসের হাতায় । এছাড়া আছে মিষ্টি জলের পুকুর যার চারপাশে সকালে বিকালে হরিণ আর বাঁদরের প্রায় নিশ্চিত আনাগোনা । ১৯৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত 'ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার' তৈরি হয়েছে আবার নতুন করে, তার সাজগোজ এখনও চলছে । হাতে অফুরন্ত সময় থাকলে নদীর ঘাটে বা ওয়াচ টাওয়ারে বসে থাকলেই সময় কেটে যায় । কোনও কিছুর প্রত্যাশায় না থাকলে, আর যাই হোক হতাশা আসে না ।

সজনেখালির উল্টো পারে পাখিরালা বা পাখিরালয় গ্রাম । গোসাবা থেকে ভ্যানরিকশায় চেপেও সরাসরি আসা যায় পাখিরালয়, তারপর খেয়া পার হয়ে সজনেখালি । পাখিরালয়ে কিছু রাত কাটাবার বন্দোবস্ত হয়েছে আজকাল, সেইসঙ্গে খাবার জায়গাও । অবশ্য জেলা পরিষদের বাংলো এখানে অনেকদিনই ছিল । পর্যটক যাঁরা সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে আসেন তাঁরা বেশিরভাগই সজনেখালিতে থাকেন, আর তা নয়তো লঞ্চে বা বড় নৌকোয় রাত কাটান । লঞ্চে থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা । বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা কমবেশি খরচে এই ধরনের বন্দোবস্ত করে থাকে । এখানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থাই সব থেকে ভালো আর সুরক্ষিত । আগে যে লঞ্চটা যেত তার নাম ছিল 'মধুকর', আজকাল যায় 'চিত্ররেখা'ও । ফুটফুটে রাজহাঁসের মতো ভেসে বেড়ায় এখানে সেখানে । থাকার ব্যবস্থাও ভালো । লঞ্চই হোক, ভটভটিই হোক, জলযানে চেপে জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতাই আলাদা । ভটভটি বলতে মোটর লাগানো নৌকো । মোটরের অবিশ্রান্ত শব্দের সুবাদে নামকরণ । পর্যটকের ছোট ছোট দলের পক্ষে ভটভটি অনেক সাশ্রয়কর । ভটভটির আরেকটা সুবিধা যে ছোটখাটো খাঁড়িতেও স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে । গতিতে লঞ্চ আর ভালো ভটভটি দুই-ই সমান । মসৃণ, সহজ তালে জল আর জঙ্গল পিছনে হাঁটে । প্রতিটা বাঁকের মুখে ভরা উত্তেজনা । সারেঙের গালগল্পে আগ্রহ বাড়ে বই কমে না । এরই মধ্যে

রান্না চাপে, হালকা হাওয়ায় আড্ডার মেজাজ । কখনও সখনও হৈ-চৈ চিৎকার, হেঁতাল পাতার বাঘ, বাইন কাঠের কুমির, রোম্যান্স আর রোমাঞ্চ সব মিলিমিশে একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস ।

সুন্দরবন কথাটা নাকি 'সুন্দরী' থেকে এসেছে । আজকের সুন্দরবনে, অন্তত এপার বাংলায়, সুন্দরী গাছের সংখ্যা কম, যদিও প্রতিটা গাছই কমবেশি সুন্দর । অদ্ভুত গড়ন বাদাবনের গাছগাছালির । ক্ষয়াটে রুক্ষ শিকড়গুলো মাটি আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে, সাতপুরুষের ভিটের প্রতি মানুষের যা টান তার থেকেও গাঢ় প্রয়াসে । ঠাসবুনুনি নিশ্ছিদ্র মাটিতে বাতাসের বড় অভাব । নিম্নগামী শিকড় যথাসাধ্য এগিয়ে তাই উঠে আসে আবার নয়তো অংশবিশেষ ঠেলে দেয় প্রশ্বাসের আশায় । কোথাও এক বিঘত, কোথাও এক হাত-মাটির ওপরে উঁচিয়ে থাকে এই শ্বাসমূলের গোড়া । স্থানীয় মানুষেরা একেই বলে শুলো । শুলোর জন্য খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় বাদাবনের মাটিতে-বাঘকেও আবার মানুষকেও । ঊর্ধ্বগামী আর নিম্নগামী শিকড়ের ফলে রোধ হয় ভূমিক্ষয় । গাছগুলোও খাড়া হয়ে টিকে থাকতে পারে । সাগর থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের কাছে তাই বাদাবন একটা মস্ত বাধা । এমনকী সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস পর্যন্ত পথ পায় না এই সৃষ্টিছাড়া গোলকধাঁধায় । কলকাতা শহরটা যে এরকম বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে তার একটা বড় কারণ উপকূল ধরে বাদাবনের বর্ম ।

সুন্দরবনের বিখ্যাততম গাছ হল হেঁতাল । এই হেঁতালের যষ্টি হাতে ধরে চাঁদ সদাগর কত কিছুই না করেছে । খেজুর গাছের মতো পাতা, শুকনো হলুদ, কাঁচা সবুজ আজ হাল্কা আলোছায়ার দৌলতে বাঘের নিশ্চিন্ত আশ্রয় । গায়ে বড় বড় কাঁটা আর ঝোপের তলায় তলায় সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক । বাঘের বেশিরভাগ বাচ্চাই নাকি বড় হয় হেঁতাল বনে । হেঁতাল ছাড়া গোলপাতাও অনেকটা একই ধরনের গাছ, শুধু খেজুরের বদলে ধাঁচটা নারকোল পাতার মতো । গুঁড়ি আর কাণ্ড বস্তুটা চোখে পড়ার মতো নয় । এছাড়া আছে বাইন, গরান, পশুর, খলসি, গর্জন, বনধুঁধুল, কাঁকড়া-এইসব নানা গাছ আর তাদের সব উপপ্রজাতি । গর্জন গাছের শিকড় অনেকটা ঠেসমূল ধরনের, তাই গাছটা সহজেই আলাদা করে চোখে পড়ে । অন্যান্য গাছগুলো চিনে নিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরকার । হঠাৎ ঘুরতে যাওয়া পর্যটকের চোখে সুন্দরবনের সবুজ তাই অনেকটা একঘেয়ে । মনটা ঘুরে বেড়ায় চারপেয়ে প্রাণী আর দুপেয়ে পাখিদের ঘিরে ।

সুন্দরবনে বড় জন্তুর প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম । এই প্রতিকূল অদ্ভুত পরিবেশে যারা শক্তপোক্ত আর সহিষ্ণু, তারাই কেবল টিকে আছে । আধুনিক জীববিজ্ঞান ইঙ্গিত করে, এক সময় গণ্ডার আর বারাশিঙ্গার বসবাস ছিল এই অঞ্চলে, এখন যার কোনওটাই নেই ।

মোটামুটি মাঝারি থেকে বড় আকারের স্তন্যপায়ী যারা এখনও আছে, তারা হল-বাঘ, চিতল হরিণ, রেসাস বাঁদর, বুনো শুয়োর, ভোঁদড়, এক বা একাধিক প্রজাতির বনবিড়াল যেমন বাঘরোল বা ফিশিং ক্যাট, আর গঙ্গার শুশুক । সরীসৃপের মধ্যে সাপ, গোসাপ আর কুমির । এই কুমিরগুলো বাঘের থেকে কম যায় না । এরা নোনাজলের প্রজাতি, পৃথিবীর সরীসৃপদের মধ্যে সব থেকে বড় আকারের প্রাণী, প্রয়োজনে বা সুযোগ পেলে মানুষ খায় । জঙ্গলের খাঁড়ি ধরে ঘুরতে থাকলে হরিণ, বাঁদর আর শুয়োর ভালোই চোখে পড়ে, বাকিরা কমবেশি ভাগ্যের খেলা । শীতকালে কুমির খুব একটা নিরাশ করে না । কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় এরা চরায় উঠে গা গরম করে । গোসাপ ঝোপেঝাড়ে বড় একটা দেখা যায় না, তবে মাঝে মধ্যেই গলা তুলে জল সাঁতরায় । শুশুক দেখা যায় বড় বড় নদীতে, জলের ওপরে উঠে নেমে মিলিয়ে যায় কালো কালো ঢেউয়ের মতো । শীতকালের তিন-চারটে মাস জলে ভেসে বেড়ায় আরেক সরীসৃপ । এরা মহাসাগর থেকে আসা অতিথি কচ্ছপ । ডিম পাড়ে উপকূলেই, মাঝে মধ্যে ঢুকে আসে অনেকটা ওপরে । ছোটখাটো প্রাণীদের মধ্যে চোখে পড়বেই পড়বে ফিডলার ক্র্যাব আর মাড স্কিপার । মাড স্কিপার মাছ হয়েও উভচর, চরের মাটিতে বুকে হেঁটে বেড়ায় । এক আঙুল লম্বা পিছল দেহটা, পিঠে পতাকার মতো পাখনা আর মাথার প্রায় ওপরে বসানো দুটো গোল গোল চোখ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না । এরা বাদাবনের এক নম্বর অধিবাসী, সেই ক্যানিং থেকে বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত এদের দখলে । এছাড়া আছে ছোটখাটো হাঙরের মতো কামট । প্রাণীটাকে জালে না জড়ালে, চোখে দেখা যায় না । কালেভদ্রে জেলেদের জলে ডোবানো আঙুল কি পায়ের গোছ থেকে মাংস তুলে নেয় । জলে নামার এই আরেকটা ভয় সুন্দরবনে ।

সুন্দরবনে পাখি চোখে পড়ে প্রচুর । আসলে অসংখ্য প্রজাতি আছে যেগুলো জলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায় আর খাবার খুঁটে খায় । স্বাভাবিকভাবেই এই পাখিগুলো একটু নজর করলেই দেখা যায়, যেমন নানান ধরনের স্যান্ডপাইপার, কারলিউ, স্নাইপ ইত্যাদি । কারলিউ আর হুইমব্রেল-এর ঠোঁট বেশ লম্বা আর কাস্তের মতো বাঁকানো, তাই চেনা মোটামুটি সোজা । বড় পাখিদের মধ্যে হোয়াইট বেলিড সি ঈগল এমন একটা পাখি যেটা দেখতে পেলেই ভালো লাগে । আরেকটা যথেষ্ট বিরল পাখি হল গোলিয়াথ হেরন । এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির স্টর্ক, হেরন, ইগ্রেট, করমোর্যান্ট আর গাছে বসা ছোট-বড় পাখিরা যাদের তালিকা এখন সবেমাত্র তৈরি হচ্ছে বনদপ্তর আর বেসরকারি পাখি-পড়ুয়াদের মিলিত উদ্যোগে । সজনেখালির কাছে একটা হেরনারি বা হেরন জাতীয় পাখিদের প্রজননক্ষেত্র ছিল এক সময়ে । কোনও অজ্ঞাত কারণে গত প্রায় বছর আষ্টেক সেটা সরে গেছে ঝিল্লা অঞ্চলে অর্থাৎ অনেকটা পুবের দিকে । আর দেখার মধ্যে আছে পরিযায়ী হাঁস জাতীয়

পাখি । স্থানীয় আর দূর-পরিযায়ী বুনোহাঁসের বিভিন্ন প্রজাতি সুন্দরবনে শীত কাটায় বেশ ভালো সংখ্যায় । এদের দেখার আদর্শ জায়গা ক্যানিং থেকে বাসন্তীর মধ্যে মাতলা নদীর জলে । জঙ্গলের আনাচে-কানাচে আরেকটা পাখি যেটা চোখে পড়বেই পড়বে সেটা হল মাছরাঙা । সুন্দরবনে একযাত্রায় আটটা আলাদা প্রজাতির মাছরাঙা দেখেছিলাম । জলের মাছ আর গাছের মাছরাঙা-এই নিয়ে সুন্দরবন ।

পর্যটকদের মাটিতে পা রাখার খুব একটা অবকাশ নেই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে । ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার প্রকল্পে ১২৫৫ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলে পর্যটকদের অধিকার, বাকিটা 'কোর এরিয়া' তাই যাত্রা নাস্তি । নেতিধোপানি, সুধন্যখালি, বুড়িরডাবরি, ঝিঙেখালি, সজনেখালি-এই ধরনের কতগুলো জাল দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত ওয়াচ টাওয়ারে ছাড়া নামার অনুমতি নেই । তাই জলযাত্রার স্মৃতিটাই আসল স্মৃতি ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

ওপারবাংলার সু. রবনে

সমীর সেনগুপ্ত

বিশাল নদীর এক কোল ঘেঁসে দক্ষিণ মুখে চলেছি । আমাদের ডাইনে ঘোলা জল ধু-ধু করছে, তার শেষ সীমায় শিরশির করে কাঁপছে দিগন্তরেখা । বাঁয়ে পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে বেলাভূমি । প্রায় জলের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে হেঁতাল, গোলপাতা, গরান, কেওড়া ও সুঁদরিগাছের দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গল । স্থান বাংলাদেশ, খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ । কাল গত বছর অষ্টমীপুজোর দিন, বেলা আন্দাজ দেড়টা । খুলনা শহর ছেড়ে বেরিয়েছে বেলা দশটায়, ঘণ্টা দেড়েকে পৌঁছেছি মঙ্গলা বা মংলা বন্দরে-সেখান থেকে লঞ্চে । আমাদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে দেখা ।

সুন্দরবন আমার প্রিয় জায়গা, সুযোগ পেলেই একবার ঘুরে আসি । কিন্তু তার সত্যিকার আরণ্যক চেহারাটা যে কীরকম, এইদিককার জঙ্গল না দেখলে সেটা অপরিচিতই থেকে যেত । প্রথম, যে সুন্দরী বা সুঁদরিগাছ থেকে সুন্দরবনের নাম সে গাছ পশ্চিমবঙ্গে নেই-ই বলা চলে । কোনও-কোনও সুদূর বনদপ্তরের আঙিনায় আদর করে এক-আধটা গাছ লাগানো থাকতে দেখেছি । আর এখানে মাইলের পর মাইল শুধুই সুঁদরিগাছ । আর বন এত ঘন, এত বিশাল! পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে তিরিশ ফুটের চেয়ে বড় গাছ চোখে পড়ে না-তাই দেখে দেখে আমার ধারণা ছিল ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে গাছের উচ্চতাই বুঝি এই । এখানে দেখি কেওড়া, গরান ও সুঁদরিগাছ ঠেলে উঠেছে পঞ্চাশ-ষাট ফুট, আর কী স্বাস্থ্য সেসব গাছের! গোলপাতাও আরেকটি গাছ যা পশ্চিমবঙ্গে দুষ্প্রাপ্য । প্রায় অবিকল নারকেল চারার মতো চেহারা, পাতাও তাই-এর নাম কেন গোলপাতা হল বোঝা দুষ্কর ।

যে অরণ্য আমাদের পাশ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বয়ে চলেছে তা চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের মতো মাঝে মাঝে গ্রামের দ্বারা বিভাজিত নয় ।

অনেক রাতে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দশদিগন্ত, লঞ্চের ছাদে বসে সামনের অন্ধকার বনভূমির দিকে তাকিয়ে আছি । লঞ্চ বাঁধা আছে কটকা বনদপ্তরের ঘাটে । খুলনা জেলার দক্ষিণতম বিন্দু এটা । দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর, দুই কিলোমিটারের মধ্যে । কোনওদিকে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে লোকালয় নেই, নিশ্ছিদ্র আদিম বনভূমি, কেবলমাত্র নদীজলের দ্বারা দ্বীপ থেকে দ্বীপ বিচ্ছিন্ন । কেওড়ার ফল অবিরল খসে পড়ছে

জলে। এ কেওড়া কিন্তু যার থেকে সুগন্ধী তৈরি হয় সেই কবিপ্রসিদ্ধ কেয়া বা কেতকী নয়, গোপালপুর যাবার পথের দুপাশে যার ঘন বন চোখে পড়ে। এ সুন্দরবনের কেওড়া, দেখতে অনেকটা অর্জুনগাছের মতো। জোয়ারের জলে রাশি রাশি কেওড়া ফল তীরে উঠে আসে-জোয়ার নেমে যায়, ফলগুলি তীরে উঠে আসে-দলে দলে চিতল হরিণ কেওড়া ফল খেতে বেলাভূমিতে নেমে আসে। বনের তলায় ঘন অন্ধকারে যেখানেই টর্চ ফেলি শত শত হরিণচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। জেটি থেকে বনবিশ্রামগৃহের দূরত্ব একটা বাসস্টপের চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর এই পথটুকু একা অতিক্রম করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, বনরক্ষীরাও যেতে চায় না। কারণ হরিণের দলের পিছনে, নিয়তির মতো বাঘ থাকবেই।

সুন্দরবনের বাঘ সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা ধারণা আছে যে, এখানকার সব বাঘই বুঝি মানুষখেকো। কথাটা আংশিকমাত্র সত্য। বাঘের মানুষখেকো হবার যেসব স্বাভাবিক কারণ-বুড়ো হওয়া, আহত হওয়া ইত্যাদি, তাছাড়া সুন্দরবনে আরও কতগুলি কারণ বর্তমান। এখানে দীর্ঘদিন, হয়তো আট-দশ শতাব্দী ধরে মানুষ আর বাঘ পাশাপাশি বাস করছে, ফলে মানুষ এখানে বাঘের কাছে অচেনা প্রাণী নয়। বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হরিণ ও শুয়োর মানুষে মারতে মারতে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে বহু জায়গায়, বিশেষত এ বঙ্গে। আমি নিজেই একবার বনলগ্ন কুমিরমারি নামক গঞ্জে 'মাংস-ভাত পাওয়া যায়' বিজ্ঞাপন দেখে হোটেলে ঢুকে হরিণের মাংস পেয়েছিলাম। এই কারণে, এবং বনের মধ্যে কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ বা মাছ ধরার কাজে নিঃসঙ্গ মানুষ দুর্লভ নয় বলে সুন্দরবনের বহু এলাকায় বাঘ অভাবে পড়ে মানুষ মারতে অভ্যস্ত। মায়ের কাছ থেকেই শাবকরাও শিখে যায়। কিন্তু এই অঞ্চলে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য হরিণের এমন প্রাচুর্য এবং মানুষ এত বিরল যে এখানে বাঘে মানুষ মারার ঘটনা খুব একটা শোনা যায় না। পশ্চিমবাংলায় চামটা, ঝড়খালি, সজনেখালি, কলস ইত্যাদি অঞ্চলে একদিনমাত্র ঘুরলেও এ দৃশ্যটা আপনার চোখে পড়বেই-নির্জন নদীতীরে একটি গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা, তার থেকে একফালি ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে। বাঘে কোথাও মানুষ নিলে তার সঙ্গীরা সেখানে এই চিহ্নটি রেখে যায়, যাতে পরবর্তী পথিক সাবধান হতে পারে। প্রথাটি উভয়বঙ্গের সুন্দরবনেই প্রচলিত, কিন্তু কটকা অঞ্চলে তিন-চারদিন বহু মাইল ভ্রমণ করেও চিহ্নটি চোখে পড়েনি। তবু অবশ্য সাবধান থাকতেই হয়।

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিঙিতে করে বেরনো গেল-উদ্দেশ্য, জঙ্গলকে ক্লোজ-আপে দেখা। বড় নদী থেকে ছোট নদী, ছোট নদী থেকে খাঁড়ি-এত সরু যে হাত বাড়ালে পাড়ের গাছ স্পর্শ করা যায়। কথাবার্তা বন্ধ, ধূমপান বারণ, মাঝি এত আস্তে বৈঠা ফেলছে যাতে জলে কোনও শব্দ না ওঠে। নিঝুম বিশাল আদিম অরণ্যের পেটের ভেতরে ঢুকে এসেছি আমরা-যে অরণ্য জুরাসিক যুগে যা ছিল এখনও তাই আছে। জলের

কিনারায় লক্ষ লক্ষ ফিডলার ক্র্যাব ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরশোলার চেয়ে সামান্য বড় লালচে রঙের কাঁকড়া, তার একটিমাত্র দাঁড়া। নৌকা বাঁক নিতে প্রায় পায়ের তলা থেকে দুটি অদ্ভুত ধরনের মাছরাঙা উড়ল-সাদার ওপর কালো বুটি, ড্যালমেনিয়ান কুকুরের মতো।

জানা গেল, এ জঙ্গলে মাছরাঙাই আছে ন-রকম। মাছরাঙা, বক, সারস, কাদাখোঁচা, মেছো শঙ্খচিল-জলনির্ভর পাখিদের অজস্র প্রজাতি এই সুন্দরবনের, এই বন বার্ড ওয়াচারের স্বর্গ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

আরেকটা বাঁক ঘুরেই চমকে উঠি। জলের ধারে দাঁড়িয়ে কী পাখি-ওটা? মাটি থেকে মাথা পর্যন্ত খাড়াই অন্তত পাঁচ ফুট। দীর্ঘপক্ষ বিশাল পাখি, পিঠটা ঘন কালচে, পেটের দিকটা উজ্জ্বল বাদামি। ওজন শুনলাম পনেরো কেজিরও বেশি। অ্যাডজটেন্ট স্টর্ক, স্থানীয় নাম মদনটাক। আমাদের দেখে কর্কশ কাঁররররর-শব্দে বিরক্ত জানিয়ে উড়াল দিল।

ফেরার পথে ওয়াচ টাওয়ার দেখতে নামলাম-এখানে আজ আমরা কয়েকজন রাত্রিবাস করব। কাঠের তৈরি ছোট্ট একটি খেলনার মতো জেটিতে নৌকা লাগিয়ে আমরা তীরে উঠি। জেটি থেকে শখানেক মিটার দূরে চারতলা সমান উঁচু কাঠের ওয়াচ টাওয়ার। ঘুরে-ঘুরে সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে আন্দাজ সাত ফুট ব্যাসের গোলাকৃতি জলটুঙ্গি, মাথায় কাঠের ছাদ, চারদিকে খোলা। টাওয়ারের তিনদিকে ঘন বন, একটা দিক মাঠের মতো খোলা। দূরে দূরে হরিণ চরছে দল বেঁধে। জলের সীমানায় একটি দুটি হরিণ কিন্তু চরছে না, স্থির দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে এদিক ওদিক দেখছে, কানদুটি বায়ুমোরগের মতো ঘুরছে। সামান্যতম বিপদের আভাস পেলেই ঠককর-ঠককর করে বিপদসঙ্কেত জানাবে-অ্যালার্ম কল। আর মুহূর্তের মধ্যে হয়তো পঞ্চাশটি হরিণের একটি দল স্রেফ হালকা হাওয়ায় উবে যাবে। নিচে নেমে দেখি গত রাতে যে নাটক এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তার চিহ্ন পড়ে আছে বালির ওপর তখনও। দ্রুতগতি হরিণের পদচিহ্ন-দ্রুতগতি, কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে চারটি করে খুরের ছাপ একসঙ্গে পড়েছে, গ্যালপ করলে যেমন হয়, সামনের দিকটা গভীর পিছনদিকটা হালকা। বালি পেরিয়ে পাশের হাঁটুসমান কুশবনে ঢুকে গেছে। আর তার ওপরেই পড়েছে বাঘের পায়ের ছাপ-তেমনই সামনের দিকটা গভীর, পিছনদিকটা হালকা। কুশবন ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু যেখান দিয়ে পায়ের ছাপগুলো ঢুকেছে সেখানটা লণ্ডভণ্ড।

দুপুরে সমুদ্রে স্নান হল নতুন-জাগা দ্বীপ এগ আইল্যান্ডের পাশে লঞ্চ লাগিয়ে। জেলে নৌকা থেকে কেনা সদ্যধরা ইলিশ মাছে ভুরিভোজ হল-কিনতে তার দাম পড়েছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১২ টাকা কিলো। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলা দরকার এই মূল্যমান

সুন্দরবনের সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে যত সত্য, ঢাকায় এমনকী খুলনায়ও তত সত্য নয় । সন্ধ্যার একটু পরে আমরা চার-পাঁচজন গিয়ে ওয়াচ টাওয়ারে উঠলাম ।

রাত বাড়ল, মাথার ওপর মহানবমীর চাঁদ । সে অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না । একটা সত্যিকার আদিম জঙ্গল, যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন কদাচিৎ পড়ে এমন একটা জায়গায় বসে আছি-দুর্গমতায়, নির্জনতায় ও ভয়াবহতায় কঙ্গোর জঙ্গলের সঙ্গে যার বিশেষ পার্থক্য নেই । রাতচরা হট্টিটি পাখি ডাকছে মাঝে মাঝে । এই একটা পাখি যার ডাক ছোটবেলা থেকে শুনছি কিন্তু পাখিটা কখনও দেখিনি । কোটি কোটি ঝিঁঝির ডাক । যিনি জঙ্গলে কখনও রাতে কাটাননি তাঁকে বোঝানো যাবে না একটা গভীর ট্রপিক্যাল অরণ্য মধ্যরাত্রে কেমন একইসঙ্গে নিঃশব্দ ও শব্দময় হতে পারে । মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে চিতলের অ্যালার্ম কল ভেসে আসে, ঠককঃ-ঠককঃ-। কাচের মতো স্বচ্ছ বাতাস, জ্যোৎস্নায় মায়াময় বনভূমি রুসোর ছবির মতো অপ্রাকৃত, অর্ধসত্য ।

রাত প্রায় একটা । শিশির পড়ে স্লিপিং ব্যাগ ভিজে গেছে । আমরা ফিসফিস করে আলোচনা করছি, বইয়ে পড়া গেছে কাছাকাছি বাঘ বেরলে নাকি ঝিঁঝির ডাক থেমে যায়, কখনও পরীক্ষা করবার সুযোগ হয়নি-এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল । যেন মন্ত্রবলে এক কোটি ঝিঁঝি হঠাৎ একসঙ্গে চুপ করে গেল ।

খানিকক্ষণ আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম । তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে হান্টিং টর্চটা ফেলা হল । কিছু নেই । টর্চের আলোকবৃত্ত বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘনসংবদ্ধ বৃক্ষরাশির তলা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে-প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরল, সামনে জেটি, তারপর আরও প্রায় নব্বই ডিগ্রি খোলা মাঠ-তারপর আবার জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে ।

জেটির দিকে যাবার সোজা শুঁড়িপথটার ওপর আলো পড়ল । ফুটবল মাঠের সাইডলাইন থেকে সেন্টার যতটা দূরে, ততটা দূরে একটা বৃহৎ জানোয়ার দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এল বাঁদিকের জঙ্গল থেকে । চলন থেকে বোঝা গেল প্রাণীটি তৃণভোজী নয় । তৃণভোজী প্রাণীর একেক দিকের সামনের ও পিছনের পা একসঙ্গে পড়ে, মাংসাশী প্রাণীর পড়ে বাঁদিকের সামনের পায়ের সঙ্গে ডানদিকের পিছনের পা । চলনভঙ্গির পার্থক্যটা এতই স্পষ্ট যে অন্ধকারেও বোঝা যায় । দ্রুত এগিয়ে আন্দাজ ত্রিশ মিটার ফাঁকা জমি পার হয়ে সে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল । তাকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম দেড় সেকেন্ড-দু সেকেন্ডের বেশি কিছুতেই নয় । গায়ের ডোরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু সুন্দরবনে মাংসাশী প্রাণী বলতে ওই একটিই আছে ।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি । সত্যি কি আমি সুন্দরবনে বাঘ দেখলাম? কারণ এটা যে কত বড় ব্যাপার তা সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা যার নেই তাকে বোঝানো যাবে না ।

সুন্দরবনের বাঘকে যে দেখে, সাধারণত ফিরে এসে গল্পটা বলার সুযোগ তার হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে ধূর্ত, সবচেয়ে নিঃশব্দ, সবচেয়ে বিদ্যুৎচারী বাঘ হল সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল।

তাকেই কি দেখলাম সেদিন? সে ছাড়া আর কী হতে পারে? পাঁচ জোড়া চোখ তো আর একসঙ্গে ভুল করতে পারে না? সর্বোপরি, সেই ঝিঁঝির ডাক?

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঝিঁঝির ডাক আবার আরম্ভ হল।

পরদিন বিজয়া দশমী। সেদিন সন্ধ্যায় কটকা বনদপ্তরের জেটির ওপর আমাদের বিজয়াসম্মিলনী হল। নির্মেঘ আকাশে সন্ধ্যা থেকে জ্বলছে বাঘের মুড়োর মতো চাঁদ। আমরা বারো-চোদ্দজন স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, কিশোর-যুবক ও তত-যুবক-নয় মানুষের সমাবেশ। তাদের কেউ ফরেস্ট গার্ড, কেউ লঞ্চের সারেং, কেউ কেরানি, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা দূরদর্শনের কারিগর। লঞ্চের বিজলিবাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনওদিকে কোনও মানুষ নেই আর বনের সীমানায় জ্বলজ্বল করছে চিতল হরিণের চোখ।

মাঝে মাঝে গান, গান থামলে হাসি ও কলরব। এর মধ্যে সেই জ্যোৎস্নালোকে নৈশাহার পরিবেশিত হল, লঞ্চের মাঝিরাও এসে আহার গ্রহণ করল আমাদের সঙ্গে। এমন বিজয়াসম্মিলনী আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?

পরদিন ফেরা। ফেরার পথে বিকেলে চাঁদপাই বলে একটা ছোট্ট গ্রামে লঞ্চ থামল তেল নিতে-খুদে একটি তেলের ডিপো আছে সেখানে। ধান খেতের মাঝে মাঝে কয়েকটি করে কুঁড়েঘর।

পরদিন সন্ধেবেলা ফিরে এলাম চিরকালের চেনালোকের কলকাতায়। এসে দেখলাম কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

যাবার উপায়

বাংলাদেশ বেড়াতে যাওয়া কিছু কঠিন নয়। পাসপোর্ট লাগবে-ঠিকমতো ফর্ম ভরে আবেদনপত্র জমা দিলে সাধারণত মাস দুইয়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রি ডাকে পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেন। তারপর ভিসা, অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি। দৈনিক পাঁচ ডলার (প্রায় ১৬০ টাকা) খরচ করতে পারবেন এমন প্রমাণপত্র দেখালে ভিসা পাওয়া যায়। ডলার কিনতে পারবেন অনুমোদিত ডিলার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। বাংলাদেশ

ডেপুটি হাই কমিশনে সকালে ভিসার আবেদনপত্র জমা দিলে সাধারণত সেদিনই বিকেলে ভিসা পাওয়া যায় ।

হাসন মনসুরের ভ্রমণসংস্থা দি গাইড ট্যুরস বাংলাদেশে নানা ধরনের সফরের আয়োজন করে থাকেন । বিশদ জানতে চেয়ে যোগাযোগ করলে সানন্দে সহযোগিতা করবেন । একা যাওয়ার চাইতে কয়েকজন মিলে গেলে খরচ অনেক কম পড়ে । এবং খরচে পোষালে ওঁরা পর্যটকদের চাহিদামতো যে-কোনও ধরনের ভ্রমণসূচি তৈরি করে তাকে সার্থক করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন ।

ভ্রমণ এপ্রিল, ১৯৯৪

সাইকেলে পাঁচ বছরে ভূ-পর্যটন

ভূপর্যটক বিমল দে

১৯৬৭ সালের ২০ ডিসেম্বর আমার জীবনের এক শুভ লগ্ন । সেদিন কলকাতার রাজভবন থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম দুচাকায় দুনিয়া চক্কর দেওয়ার জন্য । যদিও একক চেষ্টা, তবুও তৎকালীন ও প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও প্রফুল্ল ঘোষ আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন । যাত্রা হোক সফল, ফিরে এস দিগ্বিজয়ী হয়ে- সামান্য দুটো কথা । কিন্তু মনে হল, একটা ব্রত পালনের জন্য তাঁরা আমাকে ঠেলে দিলেন এই পৃথিবীর রাস্তায় । অনুষ্ঠানে কোনও জাঁকজমক ছিল না; মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজনের উপস্থিতিতে সেদিন শুরু হয়েছিল আমার যাত্রা । সকাল ৭টায় ইছাপুর থেকে যখন রাস্তায় বেরোই তখন পকেটে ছিল মাত্র ১৬ টাকা । পাঁচ বছর লেগেছিল আমার সেই ভ্রমণ-ব্রত সাঙ্গ করতে, ফিরে এসেছিলাম ১৯৭২ সালে ।

বছরখানেক যাবৎ 'ভ্রমণ' পত্রিকায় আমার তখনকার দুষ্প্রাপ্য বইয়ের কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হচ্ছে আর সেইসঙ্গে পাচ্ছি অনেক চিঠিপত্র । এই লেখায় ভূ-পর্যটনের কিছু অজানা তথ্য জানাচ্ছি যা আমার কোনও বইতেই লেখা হয়নি । কোথায় কতদিন থাকলাম, কতটা দূরত্ব পার হলাম এবং যেসব দেশে গেলাম সেখানকার বৈশিষ্ট্য ও দ্রষ্টব্যস্থানের বিশদ বিবরণ এ-লেখায় পাওয়া যাবে না, তার অনেকটাই 'ভ্রমণ' পত্রিকায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ।

সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণ কথাটা একটু ভেবে দেখা দরকার । সাইকেল সাঁতার কাটে না, ওড়ে না । কাজেই নদ-নদী-সাগর-মহাসাগর পার হবার জন্য সাহায্য নিয়েছি জলযানের আর পাহাড়-পর্বত ও নিষিদ্ধ এলাকার জন্য অধিকাংশ সময় উড়োজাহাজের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম । গ্রিনল্যান্ড গিয়েছিলাম হেলিকপ্টারে আর সমুদ্রগর্ভ দেখেছি সী স্কোপের মাধ্যমে ।

ভারতের বাইরে যেতে হলে চাই ভারত সরকারের অনুমতি, যাকে বলে পাসপোর্ট । আর যে দেশে যাব সেই দেশের সরকার দেবে প্রবেশপত্র, যার নাম ভিসা । ভারতের উত্তরে হিমালয় ডিঙিয়ে তিব্বত ও চিনে যাবার চিন্তা করা যায় না, আর মায়ানমার হয়ে পূর্বদিকে যাওয়া মানে সাগরের কাছে গিয়ে থেমে যাওয়া । ভারতের তিনদিকে

বঙ্গোপসাগর, আরসবসাগর আর ভারত মহাসাগরের বাধা, কাজেই ইউরোপে আসতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ইরান, তুরস্ক হয়ে যাওয়া । এখানেই প্রথম বাধা পেলাম । পাকিস্তান সাইকেলে করে দেশ দেখার জন্য কিছুতেই অনুমতি দিল না । তাই বাধ্য হয়েছিলাম বোম্বাই থেকে খোরামসাহের (ইরান) পর্যন্ত জাহাজে আসতে । বম্বের পামবিচ হাই স্কুলে দেড়মাস কাজ করে জাহাজের ভাড়া তুলেছিলাম । ভারত ছাড়লাম জলপথে । ইরান থেকেই আমার সত্যিকারের সাইকেলযাত্রা আবার শুরু করেছিলাম । অবশ্য কলকাতা থেকে বোম্বাই সাইকেলেই এসেছিলাম দিল্লি ও রাজস্থান হয়ে ।

জাহাজে আরবসাগর ছেড়ে চারদিন পর পারস্য উপসাগর পেরিয়ে পৌঁছলাম শাট-এল আরবের খোরামসাহের বন্দরে । নদীর দুপাশের খেজুরগাছের বন আর তারই মাঝে মাঝে গ্রামীণ দৃশ্য অতি চমৎকার । ইরানে পৌঁছে আবদান-শিরাজ পার হতে লাগল আরও কয়েকদিন । পথে খোরাসান ভূমিকম্প এলাকায় কাটালাম প্রায় একমাস । ইস্পাহানে পৌঁছবার আগেই সেখানকার যাযাবরদের সঙ্গে থেকে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম । এখানকার রাস্তাঘাট অনেকটা রাজস্থানের মরুভূমি এলাকার মতো । তবে ঠিক মরুভূমি নয় । ইস্পাহানের ইয়ুথ হস্টেলে উঠলাম । কথায় বলে ইস্পাহান দেখলে পৃথিবীর অর্ধেক দেখা হয় । জপদি নদীর ধারে ইস্পাহান অনেকটা মরূদ্যানের মতো । ইস্পাহানের কার্পেট আর মসজিদ আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল । বিশেষ করে সাফাবিদ স্কোয়্যারের শাহ মসজিদ এবং লুৎফুল্লদ মসজিদ দেখবার মতো । ইস্পাহান ও তার চারপাশে ঘুরে তারপর এলাম ইরানের রাজধানী তেহরানে । তেহরানে প্রথম উঠি ওখানকার স্কাউট হাউসে তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ভাই মাখখন সিং তাঁর গুরদোয়ারা গেস্টহাউসে রাখেন তারপর ইরান ভেজিটারিয়ান সোসাসটির প্রেসিডেন্ট ও স্বনামখ্যাত লেখক জাহাঙ্গির ইরমেন তাঁর বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান । সেখানে সপ্তাহখানেক ছিলাম । তেহরানে দেখবার অনেক কিছু আছে । পৃথিবীর যে কোনও রাজধানীর মতোই এখানে দ্রষ্টব্যস্থানের অভাব নেই । যাদুঘর, মসজিদ, পার্ক-রাজবাড়ি ইত্যাদি । এখানেই আমি প্রথম পেলাম আধুনিক ইউরোপের গন্ধ । অতি আধুনিক রাস্তাঘাট, অফিস, পরিবহণ আর উন্নত ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা । বারোশো শতকের একটি বর্ধিষ্ণু শহর, ১৭৮৮ সালে মোহম্মদ শা কাদজার-এর আমলে পরিণত হয়েছিল ইরানের রাজধানীতে । এখানকার ট্রেজারি হাউসে দেখলাম ভারতের ময়ূরসিংহাসন ।

উত্তর ইরানের পার্বত্যাঞ্চল আর দক্ষিণের পারস্য উপসাগরীয় সমতলভূমি । মাঝে রয়েছে অসমতল উপত্যকা । যাঁরা সাইকেলে ইরান ঘুরবেন তাঁদের বহু দৈহিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে । কাজেই সাবধান ।

দিল্লি থেকে ইরান-তুরস্ক-গ্রিস ও রাশিয়ার ভিসা নেওয়া ছিল। ভেবেছিলাম, তেহরান হয়ে সরাসরি ক্যাস্পিয়ান সাগর হয়ে রাশিয়ায় পৌঁছব। কিন্তু রুশ দূতাবাসে গিয়ে হোঁচট খেতে হল। রাশিয়ায় যে কোনও সীমান্ত দিয়ে আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমাকে মস্কোয় সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব স্পোর্টস আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং আমার ভিসাতে এন্ট্রি লেখা হয়েছে আফগানিস্তান হয়ে তাসখন্দের দিক দিয়ে। কাজেই আমাকে যেতে হবে আফগানিস্তানের দিকে।

বাধ্য হলাম আবার ইস্পাহানে ফিরে যেতে। আমি এ পর্যন্ত যেসব বড়সড় শহর পার হয়েছি তাদের নাম যথাক্রমে খোরামসাহের, আবদান, শিরাজ, ইস্পাহান, তেহরান। আবার ইস্পাহান তারপর যেতে হবে মেশেদ হয়ে আফগানিস্তানের হিরাট শহরে। মেশেদ সীমান্তশহর। রাশিয়া যাবার ভিসা থাকায় আফগানিস্তানের সীমান্তপুলিশ আমাকে কোনওরকম হয়রানি করেনি। মেশেদে একটি স্কুলে রাত্রিবেলা ছিলাম। আফগানিস্তানের হিরাট শহরটা দক্ষিণ ইরানের মতোই। সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে সরাসরি কাবুল পর্যন্ত গিয়েছে। ইরান এবং আফগানিস্তানের মাইলস্টোন ধরে চলা মুশকিল কারণ অধিকাংশ সময়েই মাইলস্টোনের অক্ষর বোঝা যায় না। হয় অস্পষ্ট নয়তো পুস্ত ভাষায় লেখা।

আফগানিস্তানে ছোট-ছোট হোটেলের অভাব নেই। চায়ের দোকানেও রাতে কিছু পয়সা দিলে দোকানঘরের টেবিলেই কম্বল বিছিয়ে শোয়া যায়।

হিরাট থেকে পাহাড়ি রাস্তায় অতিকষ্টে কাবুলে পৌঁছতে লাগল প্রায় উনিশ দিন। কাবুল নদীর ধারে কাবুল শহরটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম-পুরনো শহরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক শহর। লোকজনদের দেখে মনে হয়েছিল অনেকটা পাকিস্তানের কাশ্মীরি। কাবুল থেকে কান্দাহার হয়ে ইরান যাওয়া যায় কিন্তু সাইকেলে অত্যধিক কষ্টকর। বিশেষ করে ১৯৬৮ সালে আঠারো বা কুড়ি গিয়ারের সাইকেল ছিল না। আমার সাইকেলটি ছিল মাত্র তিন গিয়ারের। কাবুলে এসে বুঝলাম যে, পাকিস্তানের ভিসা পেলেও ১,০৬৭ মিটার উঁচু ও সাংঘাতিক খাইবার পাস দিয়ে এই সাধারণ সাইকেলে করে আসা সম্ভব ছিল না। কাবুলে এসে আবার অপেক্ষা করতে হল নয়দিন। কাবুলের রুশ দূতাবাস আমার কাগজপত্র দেখে টেলিগ্রাম পাঠালেন মস্কোতে। সেখান থেকে কনফার্মেশন আসার পর আমাকে তাঁরা জানালেন, সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব স্পোর্টস রাশিয়া যাবার সব বন্দোবস্ত করেছে বটে; তবে সাইকেলে নয়, প্লেনে। আমার জন্য অ্যারোফ্লোট এয়ারওয়েজ-এ কাবুল-তাসখন্দ-মস্কো ও লেনিনগ্রাদে ট্যুর প্রোগ্রাম করা হয়েছে। প্লেনে

মস্কো ও লেনিনগ্রাদ ঘুরব একদিকে আনন্দসংবাদ আর অন্যদিকে ভাবছি প্লেনে গেলে রাশিয়া দেখা হল কই? কিন্তু আমার করার কিছুই নেই। রাজি হয়ে গেলাম।

কাবুল থেকে প্লেনেই উঠলাম। লেনিনগ্রাদে পৌঁছলাম বিকেল চারটেয়। এয়ারপোর্টেই একজন সরকারি প্রতিনিধি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর নাম কমরেড সোকোলোভ। তিনিই একাধারে আমার গাইড ও ইন্টারপ্রেটার। তাঁকে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে লেনিনগ্রাদ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তবে সাইকেলে নয়, সাধারণ ট্যুরিস্ট হিসাবে। সাইকেলটাকে বিমানবন্দরে রেখে আসতে বাধ্য হলাম।

লেনিনগ্রাদ শহরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ যেন অন্য এক জগতে সে পড়েছি। রাস্তাঘাট-মানুষ-ঘরবাড়ি সবই ইরান বা কাবুলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইউরোপের এক আজব শহর এই লেনিনগ্রাদ। যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। প্রথমেই নজরে পড়ে এখানকার বিরাট বিরাট চার্চের সোনালি ডোম। এই ধরনের বাস্তুকলাকে বলে বারোক অর্থোডক্স স্টাইল। দেখার অনেক কিছু আছে, মিউজিয়াম, সরকারি বাড়ি, অতি সুন্দর সাজানো রাস্তা, ফুলে ভরা বাগান আর সবচেয়ে ভালো লাগে এখানকার বাজার। বারবার আপসোস হচ্ছে, এমন সুন্দর একটি শহরে সাইকেলে ঘুরতে পারছি না। সোকোলোভ আমার পিছনে আঠার মতো লেগে আছে। লেনিনগ্রাদেই বুঝলাম যে ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে ঘোরায় কোনও আনন্দ নেই। সরকার থেকে আমাকে খাওয়াদাওয়ার জন্য কুপন দেওয়া হয়েছে। সেই কুপনগুলো তাদের নির্ধারিত দোকান বা রেস্তোরাঁতে দেখালেই খাবার মেলে। লেনিনগ্রাদের বাইরে যেতে হলেও আমাকে আলাদা ভিসা নিতে হবে। আমি বাউণ্ডুলে তাই এইসব আইনকে বন্দীজীবনের অঙ্গ বলে মনে হয়, লেনিনগ্রাদ যত সুন্দরই হোক না কেন আমার আর সেখানে ভালো লাগল না। সোকোলোভকে তাই অনুরোধ করলাম আমার ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে। অ্যারোফ্লোটের টিকিট তৈরিই ছিল। স্বাধীনতা হারিয়ে আমার মস্কো দেখারও ইচ্ছা নেই। ছদিনের দিন আমাকে লেনিনগ্রাদ থেকে প্লেনে তুলে দিয়ে সোকোলোভ বিদায় নিল। সোভিয়েত দেশের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় হল না। পরে আবার আসব বলে বিদায় জানালাম।

কাবুলে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাবুল থেকে আবার ধরলাম ইরানের পথ, আফগানিস্তান গরিব দেশ কিন্তু মানুষের আতিথেয়তার কথা ভোলার নয়।

আফগানিস্তান থেকে আবার এলাম ইরানে, একের পর এক পার হলাম জাহেদান, কেরমান। শিরাজে পৌঁছে ঠিক করলাম যে, বুশের হয়ে বাহরেন বোটে যাব বাহরিন-এ। তারপর সেখান থেকে যাব মক্কা ও মদিনার দিকে। বাহরিন পৌঁছতেই মনে হল ভারতের

মাটিতে এসে পড়েছি । সেখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীমহল আমাকে নিয়ে মেতে উঠল । থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হল না । শুধু তাই নয়, তাঁরা আমার হাতে বেশ কিছু টাকাও তুলে দিলেন । সৌদি আরবের পথেঘাটে চলতে চলতেই চারদিকে নজরে পড়ে মসজিদের ছড়াছড়ি, নমাজপাঠ আর আল্লার মহিমাকীর্তন । দেশটা মরুভূমিতে ভরা । রুক্ষ ও গরম আবহাওয়া পর্যটকদের আকৃষ্ট করে না । কিন্তু কী অদ্ভুত এই রুক্ষ আবহাওয়াতেই আল্লার অবতার হজরত মোহম্মদ এসেছিলেন তাঁর বাণী নিয়ে । আরবের মক্কার মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অবতার মোহম্মদ আর মাটির তলায় ছিল জগতের অন্যতম সম্পদ পেট্রল । তাই সৌদি আরব আজ দুদিক থেকেই ধনী । রাস্তায় চলতে চলতে চারদিকে নজরে পড়ে বেদুইন ও গরিব দেশবাসী । উট এখানকার প্রধান বাহন । এখানকার তিনটি প্রধান শহর মক্কা, জেদ্দা ও মদিনা । মক্কা শহরে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মিশ্রণ, চারদিকে দোকান ও হোটেল লোহিতসাগরের ধারে জেদ্দা শহরে তিনটি নতুন এয়ারপোর্ট তৈরি হচ্ছে । একটি আন্তর্জাতিক বিমানের জন্য, একটি সৌদি আরবের ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য আরেকটি শুধু হজ-এর জন্য ।

সৌদি আরবের উত্তর ও মধ্যাঞ্চল মরুভূমিতে ঢাকা । প্রচণ্ড গরম । দক্ষিণাঞ্চল পাহাড়ি । লোহিতসাগরের হাওয়ায় গরমটা হাল্কা হয়ে আসে । সাইক্লিং করতে খুব অসুবিধা হয় কিন্তু এখানকার সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সবসময় উৎসাহ পাওয়া যায় । এই অঞ্চলেই আমি মরুঝড়ে পড়েছিলাম ।

রিয়াদ, তাইফ, মক্কা, জেদ্দা, মদিনা ও হাইদ হয়ে আমি এসে পৌঁছলাম ইরাকের সীমানায় । হাইদকে চলতি কথায় বলে হাইল । রাস্তা ভীষণ কষ্টের । মরুভূমির রাস্তা জনমানবশূন্য, ছায়া নেই কোথাও, শুধু বালি আর বালি । হাইল-এর পর শ-খানেক মাইল দূরে আলমাইয়া শহর । আলমাইয়ার লোকেরা আমার সাহস দেখে অবাক । দিনের প্রচণ্ড উত্তাপে সাইক্লিং করা প্রায় অসম্ভব ছিল, সন্ধের পরই বেশি চলতাম । আলমাইয়ার পর লিনাহ হয়ে সীমান্তশহর রাফহাতে কয়েকদিনের জন্য থামলাম । পকেটে পয়সা নেই । শরীর প্রায় কঙ্কালসার তবুও মনের জোরে টিকে আছি । আমার এই দুরবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন । নাম মালেক । কিছুদিন বিশ্রাম করে তারপর ঢুকলাম ইরাকে । আলজুমাইমা হয়ে আন নাফাজ-এ পৌঁছলাম । সেখান থেকে কারবালা শহরে এসে আবার থামতে বাধ্য হলাম । একটা রেস্তোরাঁতে বাসন ধোয়ার কাজ পেলাম । ভারতের বাইরে এই প্রথম চাকরি ।

বাগদাদ ইরাকের রাজধানী । দেশের লোকসংখ্যা প্রায় চোদ্দ মিলিয়ান, ইরাকে ঢোকার পর একটা জিনিস লক্ষ করলাম-এখানে মুসলমানদের মধ্যে দুটো ভাগ । অধিকাংশ শিয়া

হলেও রাজ্যের শাসনভার সুন্নিদের হাতে । সাধারণ ট্যুরিস্টদের চোখে সহজেই এই দলভাগ নজরে পড়ে । দশদিন পর বাগদাদে এলাম । নদীর ধারে সুন্দর শহর বাগদাদে দেখার অনেক কিছু আছে । সবচেয়ে আকর্ষণীয় এখানকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস । ব্যাবিলন-মেসোপটেমিয়ার কথা এখানকার পাথরে গাঁথা হয়ে আছে । ইরাকের ভাষা আরবি । দক্ষিণের কিয়দংশ মরুভূমি এলাকা, যেখানে সাইক্লিং করা কষ্টকর । দক্ষিণের শাট-এল-আরবের উর্বর সমতলভূমিতে সাইক্লিংয়ের মজা আছে কিন্তু উত্তরে পাহাড়ি এলাকা । এতদিনে হিসাব করে দেখলাম যে, গত তিনমাসে আমি প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছি । দিনে গড়ে ১০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছি মাত্র । সৌদি আরব থেকে আসার পর শরীরটা খুব ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে । খাওয়াদাওয়াও ঠিকমতো হয়নি । রুটি, সবজি, মাংস, খেজুর যখন যা জুটেছে খেয়েছি । অনেকদিন উপোসও থাকতে হয়েছে । বাগদাদে তাই চারদিন না ঘুরে যতটা সম্ভব বিশ্রাম করে শরীরটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করেছিলাম । বাগদাদের একটা যুব সংস্থা আমার বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেছিল । সেখানেও কিছু পকেটমানি সংগৃহীত হয়েছিল । আর মক্কা থেকে সাইকেলে বাগদাদে এসেছি-এখবর স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় আমার যাত্রাপথ অনেকটা সুগম হল ।

বাগদাদ থেকে আমি এবার রওনা হলাম তুরস্কের পথে । সহজ পথ হল সানানদাদি হয়ে তাব্রিজ । অর্থাৎ আবার ইরান হয়ে তুরস্কের পথে সরাসরি উত্তরে । চারদিন পরই অনেক দূরের মাউন্ট আরারাত চোখে পড়ল । অনেকটা জাপানের ফুজি পাহাড়ের মতো দেখতে ।

আমি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢুকলাম তুরস্কের আরারাত পাহাড়ের পাশ দিয়ে এরজুরুম শহরে । এখানে হঠাৎ যেন সব পাল্টে গেল । আরবি ভাষায় লেখা হঠাৎ উধাও হল । তুরস্কের ভাষা আরবি হলেও কিন্তু লেখা ল্যাটিন হরফে । বুঝতে না পারলেও পড়তে অসুবিধা হয় না । এখানে এসেই মনে হল যেন আমি ইউরোপের পথে নেমে পড়েছি । এরজুরুম, সিভাস, কেইসেরি শহর পেরিয়ে দশদিনের মধ্যেই পৌঁছলাম রাজধানী আংকারাতে । আংকারায় ডাঃ গুলতেকিন জয়মাস নামে একজন আমাকে তাঁর বাড়িতে সাদর আহ্বান জানালেন । ভদ্রলোক বহুদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী আমেরিকান । ডাঃ জায়মাস ভারতদরদী । সেখান থেকে কেনিয়ায় তুরস্কের মেভলানা উৎসবে যোগদান করলাম, তারপর ধরলাম ইস্তাম্বুলের পথ । তুরস্কের মধ্য দিয়ে চলার আনন্দ আছে, কারণ, এখন শীত পড়েছে; সাইকেল চালাতে আগের মতো আর কষ্ট হয় না ।

ইস্তাম্বুলে ঢুকতেই মুখোমুখি হলাম রয়টার প্রেসের । তারা সংবাদপত্রে আমার বিরাট ছবি সহ সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের কথা লিখল । তাতে সুবিধাই হল । এখানকার ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হলাম । ওরাই আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করল । কয়েকদিন পর স্থানীয় ডাক্তার হাসান বাসরি কারাহানের সঙ্গে দেখা করতে যাই, কারণ আমাকে সর্দি-কাশি ভীষণভাবে কাহিল করেছিল । ডাঃ কারাহান আমার সব কথা শুনে আমাকে রেখে দিলেন তাঁর কাছে । বললেন, শীতকালে সাইকেল চালালে আমি আর বাঁচব না । তাঁর অতিথি হয়ে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমি তাঁকে ডিসপেন্সারিতে টুকিটাকি সাহায্য করতাম । ইস্তাম্বুল অতি সুন্দর শহর । বসফরাসের তীরে বাইজানটাইন রীতির ব্লু মস্ক (Blue Mosque)-এর কথা কে না জানে । এখানকার আমেরিকান কলেজের প্রফেসর বেকটেল আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে । ইস্তাম্বুলের পারিবারিক আবহাওয়ায় আমার শরীরটা সেরে উঠল । ডাঃ কারাহান হয়ে উঠলেন আমার প্রিয় বন্ধু ।

কিছুদিন বাদে বরফ পড়া শুরু হল । ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকলাম । তারপর জানুয়ারিতেই আবার রওনা দিলাম গ্রিসের পথে । বরফ পড়া এখনও থামেনি । ইস্তাম্বুল থেকেই শুরু হয়েছে ইউরোপ । আমি এশিয়া ছাড়লাম । ঢুকলাম ইউরোপে । প্রথমেই গ্রিস । আলেকসান্দ্রোপলিশ সীমান্তের প্রথম শহর । হঠাৎ যেন মুসলমান রাজত্ব ছেড়ে ঢুকলাম খ্রিস্টান রাজত্বে । ভাষা ও ধর্ম দুটোই নতুন । গ্রিসের সবাই অর্থোডক্স খ্রিস্টান । গ্রিসে ইয়ুথ হস্টেলের ছড়াছড়ি । খুব ভালো বন্দোবস্ত । আমাকে আর রাস্তায় শুয়ে কাটাতে হবে না । কুমেদিনি ও কাভালা পেরিয়ে পেলাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের দেশ থেসালনিকি । প্রাচীন ম্যাসিডনিয়া । এখানেও উঠলাম ইয়ুথ হস্টেলে । সেখানে দুদিন থেকে তারপর অলিম্পাস পাহাড় ডিঙিয়ে লারিসা হয়ে পৌঁছলাম এথেন্সে । এথেন্সের মতো এত সম্মান এবং আদর আপ্যায়ন এর আগে আর কোথাও পাইনি । স্থানীয় খবরের কাগজ ‘তা-নেয়া’ পরপর তিনদিন আমার নামে সম্পাদকীয় কলমে লিখল । কেউ বলল দার্শনিক, আবার কেউ বলল গ্লোবট্রটার । আমন্ত্রণ পেলাম রেডক্রস সোসাইটির তরফ থেকে । রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, গভর্নর অব কোরিনথ সবাই আমাকে ডাকছে গল্প শোনার জন্য । ডাক এল গ্রিসের ধনী ব্যবসায়ী অ্যারিস্টটল ওনেসিসের তরফ থেকেও । মিঃ ওনেসিস আমার ভূ-পর্যটনের কথা শুনে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলো ঘোরার জন্য বিনা পয়সায় সব বন্দোবস্ত করে দিলেন । অর্থাৎ জাহাজে ফার্স্ট ক্লাসে চেপে আমি ভূমধ্যসাগরের যে কোনও বন্দরে যেতে পারি । পিরাও বন্দর থেকে গেলাম ক্রিট ও রোডোস হয়ে দক্ষিণে ইজিপ্ট পর্যন্ত । জাহাজ ছাড়লাম আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে । সেখান থেকে শুরু করলাম আবার সাইক্লিং । ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম নীলনদের সৌন্দর্য আর রহস্যাবৃত পিরামিড । নীলনদের ধার

ধরে সাইক্লিং শুরু করলাম । দেখতে লাগলাম কায়রো, কোমোমবো, আবু সিমবেনের বিখ্যাত নীলনদের উপত্যকা । নীলনদ ধরে সরাসরি ঢুকে পড়লাম সুদানে । সময় লাগল প্রায় একমাস । সুদানের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হলাম । পরিচিত হলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ নুবিয়ানদের সঙ্গে । ঘুরে ঘুরে দেখলাম দোংগলা, কারিয়েমা ও আবু হামিদ । তারপর পৌঁছলাম সুদানের রাজধানী খার্তুমে । খার্তুমের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব আমাকে সম্বর্ধনা জানাল । তারপর আবার নীলনদ ধরেই উঠে এলাম উত্তরে ইজিপ্টে । প্রায় দুমাস পর আবার এলাম আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে । জাহাজের যে টিকিটটা পেয়েছিলাম তার মেয়াদ ছিল একবছরের, কাজেই আবার ফিরে এলাম এথেন্সে । আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম মিঃ ওনেসিসকে । এবারে পরিচিত হলাম গ্রিসের স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ কস্তা করিলোসের সঙ্গে । তিনি আমাকে সরাসরি তাঁর বাড়িতে তুললেন । তাঁর ছেলেও আমার বয়সী । ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল । দেখতে লাগলাম ঐতিহাসিক দেশ গ্রিস । গ্রিসে প্রায় আড়াই মাস কাটালাম । থাকা-খাওয়ার জন্য একটা পয়সাও খরচ হয়নি । শরীর ও মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে । উৎসাহে মনের জোর দ্বিগুণ বেড়েছে । গ্রিসের টেলিভিশন প্রোগ্রামে ভারত ও তার দর্শন সম্পর্কে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়ে ভালো পয়সা ও প্রশংসা দুই-ই পেলাম । গ্রিসের বিভিন্ন শহর দেখে আবার জাহাজে চাপলাম । করিনথোস, পাত্রাস ও কিরকিরা হয়ে ইটালির ব্রিন্দিসি বন্দরে এসে পৌঁছলাম । সেখান থেকে শুরু হল আবার সাইক্লিং ।

ইটালিতে পৌঁছেই বুঝলাম যে, গ্রিকরা যেমন দর্শন ভালোবাসে ইটালিয়রা তেমনই ভালোবাসে সাইক্লিং । ব্রিন্দিসি ও বারি হয়ে রোমে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে প্রেসের লোকেরা হইচই শুরু করল । রোমের ভারতীয় দূতাবাস আমাকে সম্বর্ধনা দিল আর বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক রোজালিনি আমাকে একটা পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালেন । সেখানেই পরিচিত হলাম মিসেস রোজালিনির সঙ্গে । তিনি শান্তিনিকেতনের মেয়ে । ডাকনাম সোনালি ।

রোম সম্রাটের শহর । এখানকার ভাটিকান সিটি, মিউজিয়াম আর বড় বড় প্রাচীন বাড়ি ও স্কোয়্যার দেখবার মতো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আর পোপের আশীর্বাদধন্য এই রোম শিল্পীদের পীঠস্থান ।

রোম, ভেনিস ও মিলানো হয়ে তারপর ধরলাম পাহাড়ি পথ দোমোদোসোলা । শুরু হল আল্পস অভিযান । রোম থেকে আমি দশ গিয়ারের সাইকেল উপহার পেয়েছিলাম, দিয়েছিলেন রোমের অলিম্পিক কমিটি । তা সত্ত্বেও ভীষণ কষ্ট । প্রফেশনাল সাইক্লিস্ট

ছাড়া এই পথে ওঠা অত্যন্ত কঠিন । অধিকাংশ সময়েই হেঁটে উঠেছি । আল্পস পার হতে লাগল চারদিন । আল্পসের নয়নাভিরাম দৃশ্য সব কষ্ট ভুলিয়ে দিল ।

ইউরোপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে, এখানকার লোকেরা শ্রমের দাম দিতে পারে আর পরিশ্রমীদের উৎসাহ দেয় । ইউরোপের যে কোনও দেশে ভারতীয়দের ভিসা পাওয়া মুশকিল । একবার ভিসা পেলে বাকি সমস্যার সমাধান সহজে হয়ে যায় । খবরের কাগজে ভূ-পর্যটকের কথা উঠলে ভিসা পেতে অসুবিধা হয় না, এথেন্স থেকেই ইটালি, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের ভিসা সংগ্রহ করেছিলাম । আল্পস পার হয়ে এসে পৌঁছলাম সুইজারল্যান্ডে । এখন মে মাস । রাস্তায় বরফ নেই । সুইজারল্যান্ডে ঢুকেই বুঝলাম যে এটি একটি সাজানো দেশ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা । বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ, লোক আর চারদিক সবুজে ঢাকা । সুইজারল্যান্ডে ঢুকলাম সিমলা দিয়ে । আস্তে আস্তে পার হলাম ব্রিগ মনত্রো । তারপর লেকের ধার ধরে পেলাম লজান আর লেকের শেষ অংশে পেলাম জেনেভা শহর ।

জেনেভা আন্তর্জাতিক শান্তিকামী শহর । দেখেই ভালো লেগে গেল । এমন শহরে থাকাটাও যেন ভাগ্যের কথা । এখানকার ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়েই পরিচিত হলাম ভারতদরদী মিস গ্রাঁজোর সঙ্গে ।

সুইজারল্যান্ডে কয়েকদিন থেকে ধরলাম ফ্রান্সের পথ । ফ্রান্স-সীমান্ত জেনেভা শহরকে ছুঁয়েছে । কাজেই অসুবিধা হল না । ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী । এখানে সবাই সবাইকে সম্মান করে । আমি ফ্রান্সের দক্ষিণে রওনা হলাম । আবার ভূমধ্যসাগরের দিকে । পথে পড়ল আনেসি, গ্রনোবল, মঁপলিয়ে ও পেরপেনিয়াঁ । তারপর ধরলাম স্পেনের পথ ।

ফ্রান্সের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে । জনসাধারণ শিক্ষিত উদার আর বাঙালিদের মতোই আড্ডাবাজ । দেশটি আমার মতো পরিব্রাজকদের স্বর্গরাজ্য । এখানে রাতে থাকার কোনও অসুবিধা নেই । মিউনিসিপ্যালিটি বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেই ব্যবস্থা হয়ে যায় । ইটালি ও ফ্রান্সের লোকেরা সাইক্লিস্টদের বেশ সমীহ করে । ইউরোপে আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছি, এখানে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলে মোটামুটি রাস্তা চলার মতো পয়সা উঠে যায় । গ্রনোবলের পরই রাস্তা সমতল । দিনে ২০০ কিলোমিটার অনায়াসে পার হওয়া যায় ।

জেনেভা থেকে স্পেনের ভিসা নিয়ে নিয়েছিলাম, কাজেই সরাসরি পাড়ি দিলাম স্পেনের দিকে । স্পেনের ফিগুয়েরাস পাড় হয়ে এসে পৌঁছলাম বার্সিলোনায় । বিরাট শহর । সেখানে করিদা খেলা দেখার সুযোগ হল । ঘোড়ায় চড়ে ও হাতের ছোট বর্শা দিয়ে

শক্তিশালী ষাঁড়কে নিহত করার খেলা। স্পেনের এটা জাতীয় ক্রীড়া বলা যায়। একটা অবলা জন্তুকে হাজার হাজার দর্শকের সামনে নিহত করার মাহাত্ম্য আমি কিছু বুঝলাম না।

বার্সিলোনা থেকে আমি মরক্কোর ভিসা পেলাম। জিব্রাল্টার পার হবার জন্য আর কোনও ট্রানজিট ভিসার প্রয়োজন হল না। বার্সিলোনা থেকে ভ্যালেনসিয়া মালাগা হয়ে জিব্রাল্টার। জিব্রাল্টার পার হলাম ফেরিবোটে। সময় লাগল প্রায় দুঘণ্টা। মরক্কোর তানজে বন্দরে এসে আবার সাইক্লিং শুরু করলাম। মরক্কোতে সবাই প্রায় ফরাসি ভাষা জানে। ইংরিজির বিশেষ প্রচলন নেই। এখানকার রাস্তাঘাট খুব উন্নত। দেশটির বেশ কিছু অংশে মরুভূমি আছে। মরক্কোর বড় বড় শহরগুলিতে ট্যুরিস্টদের জন্য খুব সুন্দরভাবে সাজানো হোটেল রয়েছে। কেনিত্রা, রাবা, কাসাব্লাঙ্কা, মারাকেশ, বেনিমেল্লাল ও ফেজ ঘুরে তিন সপ্তাহ পর আবার ফিরে এলাম জিব্রাল্টারে। সৌদি আরব, ইজিপ্ট, সুদান ও মরক্কো ঘোরার পর আর আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাওয়ার ইচ্ছা হল না। আমি তাই আবার ফিরে এলাম জিব্রাল্টার হয়ে ইউরোপে।

ইউরোপে আস্তে আস্তে সব দেখতে লাগলাম। ইয়ুথ হস্টেল, বিভিন্ন শিক্ষাশিবির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চলার পথে যোগাযোগ করতে লাগলাম। আর সেইসঙ্গে দেখাতে লাগলাম এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। স্পেনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম উত্তরের দিকে। সান্তামারিয়া, সেভিই, মেরিভা, মাদ্রিদ, সারাগোজা হয়ে আবার এসে পড়লাম ফ্রান্সে। তারপর পো, অরলিয়াঁ-প্যারিস, বেভিই হয়ে এসে পৌঁছলাম ক্যালে। প্যারিসে জঁন পিয়ার নামে একজন উকিলের বাড়িতে আটদিন ছিলাম। সেখানকার সাইক্লিস্ট ফেডারেশন আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপা হওয়াতে রাস্তায় নতুন করে আর পরিচয় দিতে হয়নি।

ক্যালে থেকে ডোভারে যাই বোটে। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাসে আটদিন ছিলাম। বি বি সি থেকে দুবার ডাকল অনুষ্ঠান করার জন্য। তাতে কিছু পয়সা পেলাম। ব্রিটিশ সাইক্লিং ফেডারেশন সমস্ত গ্রেট ব্রিটেন ঘোরার জন্য সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিল। তারপর ঘুরলাম অক্সফোর্ড, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুল। সেখান থেকে বোটে করে এলাম ডাবলিন। সেখানে দেবলা মার্ফি আমাকে নদিন রাখলেন। মিস দেবলা মার্ফি লন্ডন থেকে দিল্লি সাইকেল সফর করেছেন। আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হল। আমি খুব উৎসাহিত হলাম। সেখান থেকে এলাম বেলফাস্ট। সেখান থেকে বোটে করে এলাম পোর্ট প্যাট্রিক, তারপর গ্লাসগো, কারনিসল, শেফিল্ড, কেম্ব্রিজ হয়ে আবার লন্ডনে।

লন্ডনের অনতিদূরে ব্রাইটনে দুমাস ছিলাম । সেখানে একটি হঠযোগ কেন্দ্রে যোগ শেখাবার জন্য কাজ করি ।

এরপর কার ধরে এলাম উস্টেন্ডে । অর্থাৎ প্রবেশ করলাম বেলজিয়াম । সেখান থেকে আসি ব্রুসেলসে । সেখানে একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে দুসপ্তাহের জন্য কাজ করলাম । তারপর লিয়েজ হয়ে পশ্চিম জার্মানির আখেন শহরে ঢুকলাম । বন-এর ভারতীয় দূতাবাস তদানীন্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের আগমন উপলক্ষে আমাকেও সম্বর্ধনা দিল । সেখানকার টেলিভিশনে পরপর তিনবার ডাক এল অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য । পকেটে কিছু পয়সাও এল । তারপর আবার শুরু করলাম ভ্রমণ । জামার্নিতে অধিকাংশ সময়ে ইয়ুথ হস্টেলেই রাত কাটিয়েছি । ডার্টমুন্ড, হ্যানোভার হয়ে এলাম ব্রিমেনে । সেখানে এক জার্মান পরিবারে সপ্তাহখানেক কাটিয়েছি । তারপর সেখান থেকে হামবুর্গ হয়ে কিয়েল । কিয়েল ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় দর্শনের ওপর চারদিন চারটে বক্তৃতা দিয়ে কিছু পয়সা পেলাম । ইউরোপে চলার পথ এখন আমার কাছে খুব সুবিধাজনক হয়ে গেছে । এখানে প্রচারেই সব কিছু হয় । জার্মানির খবরের কাগজগুলোতে আমার ট্যুর সম্পর্কে এত প্রচার হয়েছে যে, আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছি । জার্মানি থেকে বোটে করে এলাম ডেনমার্কে । কোপেনহেগেনে চারদিন থেকে চলে গেলাম সুইডেনে । ঘুরে বেড়ালাম হেলসিংবুর্গ, হাস্কিয়ার্না, জোংকোপিং, নারকোপিং, স্টকহোম । স্টকহোম ইয়ুথ হস্টেলে বিনা পয়সায় থাকার বন্দোবস্ত হল । এক ভদ্রলোক তাঁর রেস্তোরাঁতে বিনা পয়সায় রোজ খাওয়াতেন । সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেও খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল । থাকলাম দুসপ্তাহ ।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর ভিসা সীমান্ত থেকেই পেলাম, কোনও অসুবিধা হয়নি । ইংরিজি জানলেই চলে । সাধারণ মানুষরা হাসিখুশি বটে তবে খুব ঠান্ডা ধরনের, কম মিশুকে । স্টকহোম থেকে ওরেব্রো, কালসবাদ, আর্সাকম হয়ে এলাম নরওয়ের অসলো শহরে । রাজধানী হিসাবে শহরটাকে ছোটই মনে হল । অসলোর নোবেল কমিটি আমাকে ডেকে একদিন চা খাওয়ালেন ও উৎসাহিত করলেন । সেখানকার টেলিভিশনে বক্তৃতা দেওয়ার পরদিনই নর্থপোল যাবার আমন্ত্রণ পেলাম । নর্থপোল ঘুরে এলাম রেজিনা মাগনা বোটে । তাঁরা আমাকে ট্রমসোতে নামিয়ে দিলেন । সেখান থেকে আবার সাইক্লিং শুরু করলাম ট্রনটাইম, ভিত্তেদাল, ওল্ডেন হয়ে স্টাভেনজ-এ এসে পৌঁছলাম বহু কষ্টে । শীত এবং পাহাড়ি রাস্তায় খুব কষ্ট হয়েছে । কোপেনহেগেনে ফিরে এসে আবার থামলাম দুসপ্তাহের জন্য, স্থানীয় এক ভদ্রমহিলার অতিথি হয়ে ।

এরপর আবার এলাম জার্মানিতে, পার হলাম পূর্ব জামার্নির রস্টক, পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন, লিপজিগ, তারপর এলাম পশ্চিম জার্মানির মিউনিখে । পাসপোর্টে লেনিনগ্রাদের স্ট্যাম্প ছিল বলে ইস্ট ব্লকগুলোতে ভিসা পাওয়ার কোনও অসুবিধা হয়নি । মিউনিখ থেকে ঢুকলাম সালসবার্গ অর্থাৎ অস্ট্রিয়ায় । বড় বড় শহর ছাড়া ইয়ুথ হস্টেল নেই কাজেই অধিকাংশ সময়েই রাতে রাস্তার ধারে দরজায় ধাক্কা মেরে অনুরোধ করতে হয়েছে রাতের আশ্রয়ের জন্য । অধিকাংশ সময়েই হতাশ হতে হয়েছে অথবা সামান্য দক্ষিণা দিয়ে বোঝাপড়া করতে হয়েছে । কাসবুর্গ, ভিয়েনা, গ্রাজ, ভিলাস হয়ে এলাম ইটালির ত্রিয়েস্তা শহরে । সেখানে দশদিন থাকলাম একটা ছোট্ট ইয়ুথ হস্টেলে । তারপর ঢুকলাম যুগোস্লাভিয়ায় । ত্রিয়েস্তা শহরটি অস্ট্রিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার খুব কাছে । লুবিয়ানা, জাগ্রেব, দুব্রোভেনিক, স্কপিয়া পার হলাম । তবে পথ সুবিধার নয় আর জনসাধারণের কাছ থেকেও সহযোগিতা পাইনি । তাই ওই পথে আবার ফিরে না গিয়ে সরাসরি ঢুকে পড়লাম আবার গ্রিস । থেসোলিনিকা শহর থেকে আবার চলে এলাম এথেন্সে । গ্রিসে ডাঃ কারলোস আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে তুলে নিলেন । এইবার গ্রিসে থাকলাম দেড়মাস । ডাঃ কারলোস বললেন, আর একই পথে সাইক্লিং করতে হবে না, তিনি আমার হতে একটি পিরাও-জেনোয়ার টিকিট ধরিয়ে দিলেন । অবশ্যই জাহাজের টিকিট । রাজসিক হালে এসে পৌঁছলাম ইটালির জেনোয়া বন্দরে । জেনোয়া থেকে আওস্ট হয়ে পার হলাম ইউরোপের সবচেয়ে লম্বা টানেল, মঁ ব্লাঁ । সাইকেল চালানো নিষেধ । তাই বাস ধরতে হল । ইটালির দিকে পায়ে হেঁটেই উঠেছিলাম ওপরে আল্পস পেরোবার জন্য । অত্যধিক কষ্টকর টানেল শেষ হয়েছে ফ্রান্সের শাঁমোনিতে । সেখান থেকে আনমাস হয়ে আবার এলাম জেনেভায় । মিস গ্রাঁজো আমাকে তুলে নিলেন নিজের ঘরে ।

ইউরোপ ট্যুর শেষ করলাম । এবার তৈরি হতে লাগলাম মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য । ইউনাইটেড স্টেটস-এ যাবার জন্য চাই প্রচুর টাকা । প্লেনভাড়া, হাতখরচা ও সেখানে ঘেরাফেরার জন্য যথেষ্ট টাকা না দেখালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দেবে না । শুরু হল চাকরির চেষ্টা । ভাগ্য ভালো, জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আমাকে একটা কাজ দিল । তিন মাস চাকরি করার পর পেয়ে গেলাম আমেরিকার ভিসা । শুধু তাই নয়, আইসল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মিঃ বেনেডিক্ট আইসল্যান্ড হয়ে নিউইয়র্ক যাবার খুব সস্তায় টিকিট পাইয়ে দিলেন । লুক্সেমবুর্গ থেকে আইসল্যান্ডে এসে রাজধানী রেকজাভিকে থাকলাম কয়েক সপ্তাহ । এই আইসল্যান্ড থেকেই আমি যাই গ্রিনল্যান্ডে । আইসল্যান্ডের হেকলা ক্যাম্পিং-এও কিছুদিন ছিলাম ।

আইসল্যান্ড থেকে পরে এসে পৌঁছলাম নিউইয়র্কে । নিউইয়র্কে শিল্পমেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল । নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, পিটসবার্গ, ক্লিভল্যান্ড, বাফেলো,

ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক যোগ সংস্থা (International Yoga Federation) এবং শ্রীমতী রুবি ব্রু আমাকে খুব সাহায্য করেছেন । বাফেলো থেকে চলে যাই কানাডায় । কানাডা থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে টরেন্টো অটোয়া হয়ে আসি মন্ট্রিলে । সেখানে উত্তরের কাবোংগা এস্কিমোদের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল । মন্ট্রিলের অনতিদূরে ভালো মরিন নামক স্থানে স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দাশ্রমে আশ্রম সংগঠনের জন্য তিনমাস থাকলাম । সেখানেই পরিচিত হলাম পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে ।

কুইবেক থেকেই আবার যাই গ্রিনল্যান্ড, আংগমাগশালিক ও গডসহাব । ঘুরে বেড়াই এস্কিমোদের সঙ্গে । তারপর ফিরে আসি আবার কানাডায় । কুইবেক থেকে ভ্যাংকুভার পর্যন্ত সাইক্লিং করি ক্যানাডিয়ান ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে । তারপর সেখান থেকে দল ছেড়ে চলে যাই আলাস্কার কাচিকান শহরে । আলাস্কা থেকে প্লেনে ফ্রি রাইড পেয়ে চলে আসি চিকাগোতে ।

চিকাগোতে প্রফেসর বেকটেলের বাড়িতে দুমাস কাটাই, ইস্তাম্বুলে এই প্রফেসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল । এই দুমাস হুইটন কলেজে ও অন্য ক্যাম্পিং এরিয়াতে কাজ করি । এখন থেকেই দক্ষিণ আমেরিকা যাবার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করি । বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করবার সুযোগ পাই এবং তাঁরাই প্রেস পাবলিসিটির মাধ্যমে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তাঁরা আমাকে দুবার বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন । ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছিল । আমেরিকায় সবসুদ্ধ ছিলাম দুবছর । তারপর আবার শুরু করি সাইক্লিং ।

সেন্ট লুইস, কানসাস, র‍্যাপিড সিটি, ব্ল্যাক হিল, সল্ট লেক সিটি, সানফ্রান্সিসকো, সান্তা বারবারা, লস অ্যাঞ্জেলস, লাস ভেগাস, গ্র্যান্ড ক্যাপিয়ন, আলবুকার্ক ফোনিক্স, তিসকন হয়ে ঢুকে পড়ি মেক্সিকোতে । মেক্সিকো থেকে শুরু হয় আবার নতুন অভিযান । মেক্সিকোর মায়া স্থাপত্য আর সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা দেখে অবাক হয়ে যাই । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত কাছে অথচ সম্পূর্ণ এক আলাদা জগৎ । মেক্সিকোর নোগাল, গুইমাস গুয়াদালাজারা, মোরেলিয়া হয়ে মেক্সিকো সিটিতে এসে থামলাম । প্রায় কুড়ি দিন মেক্সিকো সিটির চারদিকে ঘুরে আবার রাস্তা ধরলাম, মেক্সিকোর লোকেরা খুব হাসিখুশি ও আমুদে । এরা গরিব কিন্তু ভীষণ পরোপকারী । গান-বাজনা করেই এরা বেশি আনন্দ পায় । এখানে ডলারের মূল্য কম । পুয়েবলো, ভেরাক্রুজ, পালেংক, মেরিদা, চিচেন পার হয়ে এলাম গুয়াতেমালায় । ইউনাইটেড স্টেটস থেকেই এইসব দেশের ভিসা নেওয়া ছিল, কাজেই কোনও অসুবিধা হল না ।

গুয়াতেমালার স্যান জোসে ঘুরে আস্তে আস্তে দক্ষিণদিকে পা বাড়ালাম । ছোট ছোট দেশ । এখানকার মূল ভাষা স্প্যানিশ তবে ইংরিজি জানা থাকলে কোনও অসুবিধা হয় না । জনসাধারণের হাবভাব খুব মিশুকে । এল সালভাডোরের সান সোনাটিও এবং সান সালভেডোর ঘুরে এসে ঢুকলাম মানাগুয়ায় । সেখানকার পনতারেলাস ও সান জোসে পার হয়ে এলাম পানামায় । পানামা বরডার টাউন ডেভিড তারপর বোথেন । এখানে এসে আমি থামতে বাধ্য হলাম । দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, পেরু, চিলি, বলিভিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে সাইক্লিং করার জন্য ভিসা পেলাম না । সিকিউরিটির দোহাই দিয়ে আমাকে নিরস্ত করল । অন্য উপায় না পেয়ে অনেক খোঁজখবর করে শেষে একটা ফ্রেঞ্চ মার্চেন্ট নেভিতে চাকরি পেলাম, থাকা-খাওয়া আর সামান্য হাতখরচার বিনিময়ে দেশ দেখা যাবে ।

কাজেই আমার কাছে একটা বিরাট পাওয়া । জাহাজে চারমাস ঘুরলাম । কলম্বিয়ার কারতাগেনা ও তান্তা মারিয়া । তারপর এলাম ভেনিজুয়েলায় । ঘুরলাম কারাকাস ও কুসানা । তারপর ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেন । শেষে আবার ফিরে এলাম পানামায় । পানামায় পরিচিত হলাম সমুদ্রবিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন কুবের সঙ্গে । তিনি আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমাকে তাঁর দলভুক্ত করে নিলেন । তাঁর ইয়টে করে ঘুরলাম প্রশান্ত মহাসাগরের বহু জানা ও অজানা দ্বীপ । বিশেষ করে চিলির অন্তর্ভুক্ত গালাপাগোস ও তাহিতি । ফরাসি পলিনেসিয়ার তাহিতি দ্বীপে আমি বেশ কিছুদিন থাকি । দ্বীপবাসীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কথা চিরদিন মনে থাকবে ।

তাহিতির পর এলাম অভিশপ্ত দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ড, যার নাম ফরাসিতে ইল-দ্য-প্যাক, স্প্যানিশ ভাষায়-ইসলা দ্য-পাসকুয়া । যেখানে বিরাট বিরাট রহস্যময় স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে । প্রায় ছ-মাস বিভিন্ন দ্বীপে এদিক-ওদিক ঘুরে ইস্টার আইল্যান্ড থেকে প্লেনে এলাম নিউজিল্যান্ডের রাজধানী অকল্যান্ডে । এখানে পেলাম প্রচুর উৎসাহ । বন্ধুত্ব হল অনেক পর্বতপ্রেমিকের সঙ্গে, বিনিময় হল অভিজ্ঞতা । নিউজিল্যান্ড অতি সুন্দর দেশ । বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সুইজারল্যান্ড । নিউজিল্যান্ডের সাইক্লো-ট্যুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আমাকে উপহার দিল আবার আসার একটা টিকিট । সেখান থেকে এলাম প্লেনে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে । অস্ট্রেলিয়ান স্কাউটদের নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম । ব্রিসবেন ও কেপ ইয়র্কে । অস্ট্রেলিয়া থেকে জাকার্তায় এলাম কোয়েন্তাস এয়ারওয়েজে । সেখানে দুদিন ঘুরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সিঙ্গাপুর হয়ে এলাম মাদ্রাজে ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব উ থান্ট আমাকে বারবার করে বলেছিলেন যে ভূ-পর্যটন শেষ হলেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি । তিনি চান যে, আমি আন্তর্জাতিক মহলে কাজ করি । আবার ওদিকে সুইজারল্যান্ডের মিস গ্রাঁজো জেনেভায় আমার জন্য একটা

কাজের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন । সিডনিতে থাকতেই টেলিফোনে কথা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন জেনেভায় যাই ।

কাজেই মাদ্রাজ থেকে কলকাতা সাইকেলে না গিয়ে বিমানে কলকাতায় এসে আমার ভূ-পর্যটনের অধ্যায় শেষ করি । কলকাতায় যাঁরা সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করব অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস-এর প্রাক্তন সম্পাদক শম্ভুনাথ মল্লিক, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের তরফ থেকেও অনেকেই এসেছিলেন । এক্সপ্লোরার ক্লাবের সভ্য-সভ্যারা । ভারতীয় স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

আঙ্কোর ভাট

প্রীতি সান্যাল

গতবছর জুলাইয়ের গোড়ায় গিয়েছিলাম কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর ভাট মন্দির দেখতে । মন্দিরটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় স্থান পেয়েছে । ভগ্নস্তূপ সংস্কার করে অতীতের গৌরবময় রূপ ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা এই বিশ্বসংস্থার দায়িত্বে । এই উদ্দেশ্যে আঙ্কোর ভাটে ইউনেস্কোর পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে । অন্যতম প্রতিনিধি ডাঃ বিকাশ সান্যাল । এবার তাঁর আমন্ত্রণ এল সস্ত্রীক । আঙ্কোরের ওপর লেখা ফরাসি পর্যটকদের বই পড়ে অধীর অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে রইলাম ।

কাম্বোডিয়ার Khmer ভাষায় নাম কাম্পুচিয়া । এদেশের রাজা প্রিন্স সিহানুক, যিনি আজও জাতির পিতা, জাতীয় সংহতির প্রতীক বলে স্বীকৃত, বলেছিলেন, এ দেশের নাম এসেছে সংস্কৃত শব্দ কাম্বুজা থেকে । উত্তর ভারতের এক উপজাতির নাম ছিল কাম্বু স্বয়ম্ভু । তাদেরই এক রাজকুমার কাম্বু এদেশে এসেছিলেন । নামের সঙ্গে যুক্ত হল জা, সংস্কৃত অর্থ জাত । কাম্বোডিয়ার অধিবাসী Khmerরা ওই রাজকুমারের উত্তরসূরী । ইংরিজিতে দেশটিকে ডাকা হয় কাম্বোডিয়া, ফরাসি ভাষায় কাম্বোজ । এর উত্তরে থাইল্যান্ড ও লাওস, পুব আর দক্ষিণে ভিয়েতনাম, দক্ষিণ পশ্চিমে সিয়াম উপসাগর ও থাইল্যান্ড ।

ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে রয়্যাল কাম্বোজ প্লেন ধরে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন-এ যাচ্ছি । উড়োজাহাজ যখন পোচনটং এয়ারপোর্টে নামছে নিচে দেখতে পাচ্ছিলাম মেকং, বাসাক, টনলেসাপ নদী । ধানের খেত । খড়ের চালা । পরে শহরে দেখেছি প্রাচীন স্থাপত্যে তৈরি প্রাসাদ, সিলভার প্যাগোডা, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, চাতোমুখ হল, ফরাসি ঔপনিবেশিক বাড়ি, আধুনিক ছিমছাম অফিস বাড়িঘর । নমপেন এয়ারপোর্টের দরজার ওপরে সাতমাথার ফণাতোলা নাগরাজ, কাঠের খোদাইয়ে । রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে বেঁকে গাড়ি অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল । এই রাজপ্রাসাদের পিছনের বাগানে মাত্র এক সপ্তাহ আগে মিনি যুদ্ধ হয়ে গেছে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরোদম রণরিধ আর দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হুনসেনের দেহরক্ষীদের সঙ্গে । অফিসের দোতলার জানলা থেকে দেখছি বাইরে রাজপথ সিহানুক রোডে রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে । পথঘাট নির্জন । মাঝে মাঝে দুয়েকটি মোটরবাইক আর সৈন্য ভর্তি জিপ গাড়ি চলে যাচ্ছে । দূরে প্রাসাদের বাগানে সবুজের সমারোহ ।

এককোণে পবিত্র বটগাছের নিচে বেদিতে শান্ত সমাহিত বুদ্ধমূর্তি, থেরাবাদা বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব । কিছুক্ষণ পর রামা ইন হোটেলে যাওয়ার পথে দেখি খাকি পোশাকে সঙ্গিন উদ্যত করে চলে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনী । অথচ এখানকার মানুষের মুখে কী কোমল লাবণ্য । মেয়েদের মসৃণ ত্বক, কলুষহীন মুখ ।

সমপত ছিল আমাদের গাড়ির চালক কাম গাইড । খুব ভাঙা ইংরিজিতে অনেক কিছু জানাবার চেষ্টা করত । শহর দেখাত । বিকেলে গেলাম খেলার মাঠে । সেখানে ছেলেমেয়েরা খেলছে ছা ওল ছুয়ং । গামছার মতো কাপড় জড়িয়ে নারকোল সাইজের বল তৈরি করেছে, এক টুকরো কাপড় দড়ির মতো ঝুলে আছে । এর নাম হল ছুয়ং । বল ছুড়ে দিচ্ছে ছেলেদের দল থেকে একজন বিরোধীপক্ষের মেয়েদের দলটির দিকে । ছেলেটি ছুয়ং ছুড়তেই অন্য দলের মেয়েটি ধরে ফেলে আর ছুড়ে দেয় তার পছন্দের ছেলেটির দিকে । যাকে লক্ষ করে ছোড়া হল সে যদি ধরতে না পারে তা হলে তাকে মেয়েদের দলে গিয়ে গান গাইতে হবে । অনেক লোক জমেছে ওদের ঘিরে মজার মজার গান শোনার জন্য । সমপত একটি পুরনো গান অনুবাদে শোনাল-

ছুয়ং দিলাম ছুড়ে, ওগো আমার সখী,

সাবধান যেন ছোঁয় না কো সে মাটি ।

যদি মাটি ছোঁয় ভাবছ কেন কন্যে

গান গাইব শুধু তোমার জন্যে ।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গানের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনলাম, যদিও ভাষা অজানা । সকলের গলায় ক্র্যামা, চেক কাটা স্কার্ফের মতো । সুতি অথবা রেশমে বোনা । আমাদের দেশের গামছার মতো এর ব্যবহার । রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচানো, মুখ ঢেকে ধুলো বাতাসের হাত এড়ানো, মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে মাল বওয়া । সারং অর্থাৎ স্কার্ট, সামপত মানে লুঙ্গি, কখনও অ্যাপ্রন, কখনও হাফপ্যান্ট । মেয়েরা ক্র্যামায় শিশুকে জড়িয়ে পথ হাঁটছে । গিঁট দিয়ে থলি বানিয়ে বাজার করে আনছে । দুপুরে গাছের তলায় রিকশাচালক হ্যান্ডেলে জড়িয়ে বালিশের মতো মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে । ক্র্যামা যেন এদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ । প্রতিটি প্রদেশের নকশা আলাদা । খেলার দলের ছেলেমেয়েদের গলায় নানা রঙের নানা ডিজাইনের ক্র্যামা জড়ানো ।

এর পরদিন গেলাম নমপেন শহর থেকে একটু দূরে রেশম শিল্পের জন্য খ্যাত কাম্পং চং গ্রামে । ঘরে ঘরে তাঁত । মেয়েরা রঙিন সুতোয় ফুটিয়ে তুলছে অসাধারণ নকশা । সোনারুপোর সুতোয় বোনা আনালুহ জরির ঘেরে কখনও বা দীর্ঘ রেখায় বাইয়ন মন্দিরের

দেবরাজের মুখ, অপ্সরাদের নাচের ভঙ্গিমা। ভেষজ রঙে রাঙানো রেশমের কাপড়ের ওপর আঙ্কোর ভাট মন্দির থেকে নেওয়া ডিজাইন-ফুল ময়ূর কেয়ূর কঙ্কন শঙ্খ পদ্ম অপ্সরা, উদ্যত-ফণা জোড়া সাপ, যূথবদ্ধ হাতি, যুঁই কনকচাঁপা। রেশমশিল্পীদের মুখও যেন অপ্সরাদের মতো। রেশমশিল্পী থিলকা সানের নির্দেশে তারা পুরনো এক গান শোনাল অতিথিদের-

পুরনো কালের মতো সাজো, সুখ খুঁজে পাবে।

রবিবারে লাল রং, সোমবার গভীর হলুদ

মঙ্গলে বেগুনী আর বুধবার তামাটে সবুজ,

বৃহস্পতিবার পরো হালকা সবুজ

শুক্রবার গাঢ় নীল রং

শনিবারে উদ্ধত গোলাপি।

সঙ্গে জলতরঙ্গের মতো বাজনা বাজাচ্ছিল আরেকজন তরুণী শিল্পী কনিয়্যা সান।

সন্ধেয় বাসাক নদীর ওপর জাপানিদের উপহার কাম্বোডিয়ার শান্তির ব্রিজ পেরিয়ে পরপর দুসন্ধ্যায় গিয়েছি আমাদের বন্ধু ডাঃ সুপথের সঙ্গে নৈশভোজের এক আশ্চর্য জগতে। রেস্তোরাঁর স্বর্গভূমি। কী ভিড়! গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা পাওয়াই মুশকিল। একটি রেস্তোরাঁয় নদীর ধারে টেবিল নিলাম আমরা। যেন উৎসব হচ্ছে এখানে। আলোর মালায় লোকজনের হৈচৈয়ে মনেই হচ্ছে না, দিনে এই শহরেই বলয়িত হচ্ছে অসন্তোষের ধোঁয়া যা ছড়িয়ে যাবে সাতদিনের মধ্যে গোটা দেশে।

মাছ খেলাম। ত্রে দামরেই। হস্তীমৎস্য। কাম্বোডিয়ার আদি জাতি নাগেরা এই মাছের পুজো করত বলে এখনও প্রাচীন-প্রাচীনারা এই মাছ ছোঁন না। পঞ্চাশ বছর আগে বিজয়ী ভিয়েতনামীরা খেতে শুরু করে। সেই থেকে চালু। এরপর এল মিষ্টি জলের গলদা চিংড়ি। এ রকম সুস্বাদু চিংড়ি বহুদিন খাইনি। সঙ্গে কাঁচা আম কু রিয়ে সস। তারপর কাঁঠালের কোয়া লিচু আনারস। অপ্সরার মতো সুন্দরী কমবয়সী মেয়েরা কাজ করছে, টেবিলে অভ্যর্থনা করে বসাচ্ছে, পরিবেশন করছে। বয়স সতেরো আঠারোর বেশি হবে না। এরা রাতে কাজ করে কিন্তু নটায় বাড়িতে ফিরতেই হবে। রেস্তোরাঁর গাড়ি এদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পোশাকে আশ্চর্য শালীনতা, ব্যবহার স্নিগ্ধ। হাত জোড় করে নমস্কারের নম্রতায় ঝুঁকে দাঁড়ানো সবখানেই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেশে। চল্লিশের ওপর যাদের বয়স তাদের অনেকেই গ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে লেখাপড়া শিখেছেন। ডাঃ

সুপথের বাল্য ও কৈশোর এভাবে কেটেছে। শিখতে হয়েছে আচার ব্যবহার সহিষ্ণুতা ও নম্রতা। অথচ এ দেশেই বারবার বয়ে গেছে রক্তের নদী।

পরের সন্ধ্যায় নাচের প্রোগ্রাম দেখতে গিয়ে একই কথা মনে হয়েছে। বড় উঁচু কাঠের মঞ্চে কাম্বোডিয়া জাতীয় নৃত্যসংস্থা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে নৃত্যপরিবেশনে। বাঁ পাশে অর্কেস্ট্রায়। জলতরঙ্গের মতো কাঠের বাজনায় টুংটাং বাঁশের বাঁশি আর ঢাক। সুর একই, অপরিবর্তিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। নাচের মূল বক্তব্য রামায়ণের কাহিনী ঘিরে। রাম সীতার বিয়ে, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, বালী সুগ্রীবের লড়াই। আবার মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট ছবিও নাচের ছন্দে। নায়ক নায়িকার মান অভিমান ধানকাটা মাছধরা চাষবাস সব কিছুই। নর্তকীদের মুখ ও দেহভঙ্গি আঙ্কোরের মন্দিরের গায়ে খোদাই অপ্সরার মতো। এদের লাবণ্যময় মুখ আর তন্বী শরীর আশ্চর্য করে। ১৯০৬ সালে, প্যারিসের ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে এই নাচ দেখে শিল্পী রদাঁ মুগ্ধ হয়ে যান। বলেছিলেন, ওরা যেন স্বপ্ন জগতের নারী। জগতের অনুপম সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে ওরা চলে যায় নাচের শেষে সব শূন্য করে। এদের নাচের প্রতিটি ভঙ্গিই যেন পূজার প্রণতি।

আজ সকালে নমপেনের কাম্বোডিয়ানা সোফিতেল হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে মেকং নদী। আগামীকাল সিয়েমরিপে যাওয়ার কথা। স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ আঙ্কোর ভাট দেখার স্বপ্ন চোখে। কাল রাতে ফরাসি পর্যটক আঁরি মুয়তের লেখা 'আঙ্কোর মন্দির আবিষ্কার' ডায়েরি পড়ছিলাম-এই নদীর জল আকণ্ঠ পান করেছি। এর কোলে কখনও দোল খাওয়া কখনও আমার ধৈর্যের পরীক্ষা। মেকং প্রান্তিকে পাহাড় রেখে রাজমহিমায় বয়ে যায় যেন এক অকূলের নদী। কখনও সে কাদায় হলুদ। অতি কদাকার ভয়ংকর তার রূপ। প্রকৃতিবিজ্ঞানী মসিয়ঁ্য মুয়ৎ, ১৮৬০ সালে আঙ্কোর ভাট মন্দির আবিষ্কার করেন। তাঁর ডায়েরি থেকে ইউরোপ জানতে পারে গভীর জঙ্গলে ঢাকা রহস্যময় গম্ভীর সৌন্দর্যের মন্দিরের কথা। মেকং নদীর উত্তরমুখী উৎসধারা খুঁজতে গিয়ে নদীর ধারে জঙ্গলে মুয়ৎ মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ডায়েরিতে এই কথাগুলি লেখেন। কাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম লাওস এসব দেশের ইতিহাস যুদ্ধের ইতিহাস, প্রাণক্ষয় রক্তসংগ্রাম মৃত্যুর ইতিহাস। এইসব দেশগুলির মধ্য দিয়ে সততই বয়ে চলেছে চার হাজার কিলোমিটারের দীর্ঘ নদী মেকং।

সিয়েমরিপ ছোট্ট এয়ারপোর্ট। খুব একটা ভিড় নেই। বছর ত্রিশ বয়সের ছিপছিপে যুবক থল এসেছে ড্রাইভারের সঙ্গে। এ কদিন থলই আমাদের আঙ্কোর মন্দির দেখাবে। মোটামুটি ইংরিজি বলতে পারে। গাড়ি চলেছে সিয়েমরিপের রাস্তা দিয়ে। গ্রামই বলা যায়। ধানের খেত, নারকেল, তাল গাছের সারি, চায়ের দোকান, দুঃখী বাজার, হোটেল ট্যুরিস্ট

। গোল্ডেন আঙ্কোর ভিলেজ হোটেলে এলাম । শাড়ি-পরা বলে এত উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম কি না কে জানে । ভারতবর্ষ কাম্বোডিয়ান জীবনে এমন ভাবে জড়ানো, হতেও পারে । মালিকের বৌ সিতা সানের বাচ্চা হবে । কী সুন্দর নিচু হয়ে নমস্কারের অভ্যর্থনা! মুখের হাসিটি উজ্জ্বল । দুতিনটি কিশোরী পরিচারিকাও নমস্কার জানাল । প্রতিনমস্কার আমাদের তরফ থেকেও । পরিচ্ছন্ন হোটেল । বাইরে বাগান । সেখানে, ছোট্ট মন্দিরের ভেতর গেরুয়া বসনে দুই দেবী মূর্তি । বুদ্ধের মতো মুখ । ধূপ জ্বলছে । দেবীদ্বয়ের গলায় যুঁইয়ের মালা । পায়ের কাছে পদ্মের গোছা । হোটেল থেকে বেরোতেই দেখি, সিয়েমরিপ নদী একটু দূরে খালের মতো তিরতির বয়ে যাচ্ছে । দুধারে জঙ্গল, দীর্ঘ গাছের সারি । Khmer বাড়িগুলি কাঠের থামের ওপর দোতলায় । বাইরে পেঁপে গাছে প্রচুর পেঁপে ।

সিয়েমরিপ কথাটায় অর্থ পরাজিত শ্যামদেশ । বিক্রমশালী রাজার হাতে প্রাচীন কালে, থাই সৈন্যরা এখানে পরাজিত হয়েছিল । এখান থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে আঙ্কোরের মন্দির । প্রাচীন ইতিহাসে, আঙ্কোরের নাম ছিল নাখন । সংস্কৃত শব্দ নগর থেকে এসেছে । আঙ্কোর সভ্যতার ভাষা ছিল সংস্কৃত ।

কাল আঙ্কোর ভাট দেখতে যাব ভোরবেলায় । দ্বাদশ শতকের আঙ্কোর ভাটে পৃথিবীর বিষ্ণুমন্দিরটি বৃহত্তম হিন্দুমন্দির । কাম্বোডিয়ার প্রতিটি অফিসে, বাড়িতে, রাস্তার স্মৃতিস্তম্ভে, জাতীয় পতাকায়, জাতীয় প্রতীকে সবসময় আঙ্কোর ভাট মন্দিরের চূড়াগুলির ছবি । আমাদের ড্রাইভার হিরোহিমা আর গাইড থল বিকেলে এল সিয়েমরিপে দুটি মন্দির দেখাতে । গ্রামের পথ ধরে এলাম রয়্যাল ক্রুসেড ফর ইনডিপেন্ডেস-এর বাগানে । বড় খুকি আর ছোট খুকির মন্দিরে উজ্জ্বল কালোরঙের মূর্তিদুটির পায়ের তলায়, পদ্ম-যুঁই-চাঁপার অঞ্জলি । ধূপ মোমবাতি জ্বলছে । প্রতিদিনের মতো আজও এসেছে ভক্তরা । সন্ন্যাসী, ভিক্ষু সাধারণ মানুষ । সারা কাম্বোডিয়ায় এঁদের পুজো হয় । এঁদের দৈব ক্ষমতায় মানুষের অগাধ বিশ্বাস । মূর্তিদুটি ব্রোঞ্জের তৈরি । আশ্চর্য লাবণ্যময় ভঙ্গিতে দাঁড়ানো-করতলের রেখায়, প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষর আর রেখাচিত্র । গেরুয়া-পরা দেবীদের মুখে অবলোকিতেশ্বরের শান্ত ছাপ । দূর দূর থেকে মানুষ আসে আরোগ্য প্রার্থনায়, দুর্ভাগ্যের কালোছায়া ঘেরা জীবনে সৌভাগ্যের কামনায় । আনে উপচার, জল দিয়ে ধোয়ায় দেবীদের করতল । থল আমার হাতে একমুঠো কনকচাঁপা ফুল দিল । দেবীদের পায়ের কাছে রেখে দেশটির সৌভাগ্যের আশীর্বাদ চাইলাম । আর যেন রক্ত না ঝরে, আর যেন প্রাণক্ষয় না হয় । থল ও হিরোহিমা সমবেত প্রার্থনায় মগ্ন । ওদের চোখে জল ।

হোটেলে ফিরে এলাম সন্ধে নামতে । গর্ভবতী সিতা, মধুর হাসিতে আপ্যায়ন করল । সবসময় সে কিছু না কিছু খাচ্ছে লক্ষ করেছি । খাবারের থালা হাতে থাকে দিনেরাতে ।

সকালে দেখেছি, মোড়ায় বসে একথালা ভাজাভুজি খেতে । ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলাম, খাবারটি কী? মনে হল কুচো চিংড়িভাজা । বেশ লোভনীয় লেগেছিল । এই সন্ধেয় দেখি, করিডরে প্রশস্ত বারান্দায় লাফাচ্ছে বিশাল বিশাল আরশোলার মতো পতঙ্গ । এত পরিচ্ছন্ন হোটেল, এত আধুনিক, সব গোলমাল করে দিল ওই উড্ডীন পতঙ্গের দল । থল বলে উঠল, সকালে সিতা সানকে যা খেতে দেখে তোমার জিভে জল এসেছিল এই সেই আরশোলা । ওর বর ঝাঁটা দিয়ে সংগ্রহ করছে । একটা বালতিতে রাখবে, তারপর ডানা ছিঁড়ে পেট পরিষ্কার করে গরম তেলে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভাজা হবে ।

পরদিন ভোরে উঠে আঙ্কোর ভাটের দিকে যাচ্ছি । দুধারে জঙ্গল । শিমুল, পিপুল, জাকারান্ডা, বট, তেঁতুল, ডুমুর গাছের সারি । জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে । মাঝে মাঝে চাঁপা গাছ থেকে ঝরে পড়ছে সাদা ফুল । ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ, কুবো পাখির ডাকের মতো এক অচেনা পাখি ডেকে চলেছে বনে । ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে । থল বলল রমদুয়ল ফুলের সুবাস । গাড়ি মোড় ঘুরে দাঁড়াল এক বিশাল জলাশয়ের সামনে । দিঘি এত দীর্ঘ যে নদী মনে হচ্ছে । দূরে ছাইরঙা এক প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ভোরের আকাশে পাঁচটি দীর্ঘ চূড়া বিদ্ধ করে দাঁড়ানো । থল বলে উঠল, Naghon Wat । আমরা আঙ্কোর ভাট প্রাসাদের সামনে দিঘির ধারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের ভগ্নস্তূপের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম । সকালের সূর্য ততক্ষণে পড়েছে প্রাসাদ চূড়ায় । আঙ্কোর ভাট জাগছে । ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটে এসে পাখার হাওয়া দিচ্ছে, বিদেশি অতিথির গরম লাগতে পারে । ওদের কচি হাতে তালপাতার পাখা, বিক্রির জন্য । বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চার বছরের বাচ্চাটি, ভাঙা ইংরিজিতে বিক্রি করতে চাইছে বাঁশের বাঁশি । কেউ বা পিকচার-পোস্টকার্ড । প্রাসাদ-মন্দিরের সৌন্দর্য যেমন সময়ে মলিন, তেমনই ম্লান বর্তমান সময় । এরা সব দুঃখের সংসার থেকে উঠে আসা শিশু । সারাদিন ট্যুরিস্টদের পিছনে পয়সা রোজগারের ধান্দায় । ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, উদোম গা । তবে ভিক্ষা চাইতে দেখিনি একজনকেও । দূরে এক বৃদ্ধ এসরাজের মতো যন্ত্রে ছড়ি চালিয়ে করুণ সুর বাজাচ্ছেন । সাত আট বছরের রুক্ষ চুলের চার বালিকা নেচে চলেছে অপ্সরার নাচ ।

দিঘির পাশ দিয়ে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছি । প্রাসাদ-মন্দির; এক জটিল রহস্যপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারের ঐশ্বর্য চোখের সামনে দাঁড়ানো । একশো কুড়ি বর্গমাইল জুড়ে মন্দির । শুধুমাত্র ত্রিশটি ঘুরে দেখা যায় । মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা, গাছের ডাল দেওয়ালে । বাকি জঙ্গলের আগ্রাসী কবলে চোখের আড়ালে । স্থাপত্যশিল্পের অনুপম সৌন্দর্যের কাছে মাথা নত হয়ে যায় । এই ভগ্ন মন্দিরে তীর্থযাত্রীরা এসেছে, প্রার্থনা করেছে বৌদ্ধভিক্ষু, সাধারণ মানুষ । বিষ্ণু, লক্ষ্মী, দুর্গা, রামচন্দ্র, ব্রহ্মা, বোধিসত্বের পায়ে আজও রাখে পুষ্পার্ঘ্য

। পূজা হয় ধূপ জ্বালিয়ে প্রদীপের আরতিতে, ভগ্নস্তূপের লুকনো মন্দিরে । আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ।

এদেশের বৃহত্তম হ্রদ টনলেসাপ আর কুলেন পর্বতমালার মাঝখানে, এক উর্বর মাটিতে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ে, প্রাচীন Khmer রাজারা এক বিশাল রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন । শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, ওই প্রাচীন সভ্যতার পরিশীলিত অভিব্যক্তি আঙ্কোরের প্রাসাদ-মন্দির সৃষ্টির শিল্পে । এই নগর, প্রাচীন মন্দির, রাজপথ, তীক্ষ্ণ দুর্গচূড়ায়, প্রাকারে, কারুকার্যময় প্রবেশদ্বারে, সে যুগে, কী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় ফুটেছিল তাই ভাবছি । আঙ্কোর ভাটের মন্দির তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতকে, রাজা সূর্যবর্মণের সময় । বিষ্ণুর উপাসক রাজা । প্রাসাদচূড়ার ঘরে পূজার বেদীতে বিষ্ণু মহিমময় ভঙ্গিতে দাঁড়ানো । এই মন্দিরগুলির স্থাপত্য এবং অলংকরণ দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের ওপর । হিন্দু পুরাণ, সৌরজগতের ঐশ্বর্য, আচার বিধি পালনের রীতিনীতি, সবই শিল্পে উৎকীর্ণ । এক পবিত্র ধর্মের আদর্শ ও চিন্তাধারায় যুক্ত মন্দিরটি যেন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক । যখন, প্রাসাদের একতলা থেকে ধীরে ধীরে এক এক তলায় উঠি, মনে হয় এই পার্থিব জগৎ থেকে এক ঊর্ধ্বলোকের দিকে যাত্রা । যেন মানুষের আর দেবতার জগতের মধ্যে এক সেতু বাঁধা ।

পশ্চিম দরজা দিয়ে ওপরে উঠছি । দুটি পাথরের বিশাল সিংহমূর্তি পাহারায় । পনেরোশো অপ্সরা দেওয়ালে খোদিত । এদের কবরীসজ্জা, অলঙ্কারের শিল্পসুষমা, দেহের বঙ্কিম ভঙ্গি আর স্মিত রহস্যময় হাসির অধর দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । স্বর্গের আলোর পরীর দল প্রস্তরীভূতা । এরপর রামায়ণ মহাভারতের গ্যালারি । দুই মহাকাব্যের কাহিনী দেওয়ালে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-কৌরব ও পাণ্ডবদল । ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত । নিকটে পঞ্চপাণ্ডব জোড়হাত প্রার্থনায় নতজানু । দ্রোণাচার্য তীরধনুক হাতে দাঁড়ানো । কর্ণ মাটিতে প্রোথিত চাকা টেনে তোলার ব্যর্থ প্রয়াসে ক্লান্তমুখ । রথের সারথি কৃষ্ণ, অর্জুন জ্যা তুলে ধরেছেন । তূরী, ভেরী, শঙ্খ বাজানো দুদলের সৈন্য এগিয়ে আসছে । আরেক দেওয়ালে রামায়ণ । সীতার স্বয়ম্বরসভা, অগ্নিপরীক্ষা, স্বর্ণমৃগের দিকে রামচন্দ্র তীর ছুড়ছেন । হনুমান, বালী, সুগ্রীব, তারা, মন্দোদরী, লঙ্কার যুদ্ধ, কৈলাস পর্বত কাঁধে নিয়ে দাঁড়ানো রাবণ-কী নেই! পাথরে খোদাইয়ের সূক্ষ্ম কাজে, প্রতিটি কাহিনী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ।

পুব গ্যালারিতে, ভাগবত পুরাণ থেকে নেওয়া সমুদ্র-মন্থন কাহিনী । দেবতা ও দানবের মন্থনে উঠবে অমৃত । তিনভাগে দৃশ্যটি ধরা হয়েছে । নিচে সামুদ্রিক জীবেদের খেলা । তারা কখনও বাস্তব কখনও পৌরাণিক, রূপক মূর্তিতে । সর্পদেবতা ঘিরে আছে তাদের ।

মাঝের অংশে, বিরানব্বইজন স্ফীতচক্ষু হেলমেটের মতো শিরস্ত্রাণ পরা দানবেরা, অপর দিকে আয়তচক্ষু শঙ্খের মুকুট পরা দেবতারা । রূপসী অপ্সরাদের বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি । ক্ষীর সমুদ্রে, মন্দার পর্বতে বাসুকীনাগকে জড়িয়ে অমৃতমন্থনের জন্য দুদিকেই প্রবল টান । লক্ষ্মী উঠে আসছেন অমৃতকুম্ভ হাতে । তৃতীয় ধাপে বিষ্ণু নানা অবতারে খোদিত । দীর্ঘ দেওয়াল জুড়ে বহুবার শোনা পৌরাণিক কাহিনীটি কী অসামান্য শিল্প-লাবণ্যে খোদাই করা আছে!

থলকে কথা বলতে বারণ করলাম । এখন মন দিয়ে দেখা, প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি । দূরে অলিন্দের কোণে একজন কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে । Khmer বাঁশির সেই উদাস সুর প্রাচীরের ঐশ্বর্যসম্ভারকে ঘিরে আমাদেরও ছুঁয়ে যাচ্ছে । প্রতি কোণেই অপ্সরাদের দাঁড়িয়ে থাকা নৃত্যভঙ্গিমা চেয়ে দেখার মতো । অলিন্দের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চিকরি কাটা হয়ে বারান্দায় । বিষ্ণুমূর্তি ঘিরে পুজো হচ্ছে । এক বৃদ্ধা হাত জোড় করে বসে কী এক মন্ত্র গাইছেন, প্রাণ ছুঁয়ে যায় ।

এরপর গেলাম বাইয়ন মন্দির দেখতে । দ্বাদশ শতকে, সপ্তম জয়বর্মণ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে । আঙ্কোরের মন্দির থেকে একটু দূরে নির্জন বাইয়ন মন্দিরের সৌন্দর্য বিস্ময়ে অভিভূত করে । স্থাপত্য-শিল্প মৌচাকের মতো দাঁড়ানো । শিল্পকাজ প্রতিটি কোণে । একটার মাথার ওপর আরেকটা । সব মিলিয়ে শিল্পের ভিড় বলা যায় । তিনতলার মন্দির । পুব দিক দিয়ে ঢুকতেই দেখি সৌন্দর্যের পশরা সাজানো অপ্সরাদের দেহভঙ্গিমায় । দেওয়ালে পদ্মপাতা ফুল বাহারি নকশা খোদাই করা চারদিকে । এখানে পৌরাণিক কাহিনীগুলি উৎকীর্ণ আছে আঙ্কোর ভাটের মতোই । কিন্তু অনেক বেশি প্রাত্যহিক জীবনের ছবি দেখতে পাচ্ছি । মাছ ধরা, বাজারহাটে বিকিকিনি, মোরগ লড়াই, যাদুকরের যাদুখেলা দেখতে লোক জমেছে । নারকেল গাছে বাঁদরেরা বসে আছে । কোথাও খোদিত নৌকা, দেওয়াল ঘিরে বেঁকে গেছে নদীর স্রোতের সঙ্গেই যেন । একটি মেয়ে বসে আরেকজনের মাথার উকুন বাছছে, মা খেলছে শিশুদের সঙ্গে; প্রসবের যন্ত্রণামুখে নারী শিশুর জন্ম দিচ্ছে, হাসপাতালে রোগীর করুণ মুখ, শিকারি, সামনে বিশাল প্রাণীটিকে তীরবিদ্ধ করতে ধনুকে জ্যা পরাচ্ছে । পাথরে খোদাই বনজঙ্গল । ধান গুঁড়ো করছে মেয়েরা, কুলোয় ঝাড়া হচ্ছে, বাঘের ভয়ে দৌড়ে গাছে উঠছে মন্দিরের পুরোহিত । সার্কাস হচ্ছে, কুস্তি হচ্ছে, বাঁশি ভেঁপু ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা রাজপথে । শিব দশহাতে দাঁড়ানো । পাশে নন্দী । কামদেব শিবের দিকে গাছের আড়াল থেকে শর নিক্ষেপ করছেন; পার্বতীও আছেন । উড়ন্ত অপ্সরা পাখিদের সঙ্গে আকাশে । জীবনের ছন্দসুষমা পাথরে কথা বলছে । অনন্ত শয়নে শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি কী শান্ত! কেউ এইমাত্র ধূপদীপ জ্বালিয়ে গেছে; পদ্মের ডালি । তার নিচের

ধাপের দেওয়ালেই আবার রাজা জয়বর্মণের সঙ্গে চম্পাসৈন্যদের যুদ্ধ, মৃত্যুর বীভৎস রূপ খোদাই করা। আর আছে, চুয়ান্নটি চূড়ায় দুশো খোদিত মুখ; তাদের ঠোঁটে এক আশ্চর্য রহস্যময় হাসি। চতুর্মুখের বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর। ঠোঁট ঈষৎ বঙ্কিম, চোখের পাতা নিচু হয়ে মুখে একটা ছায়া ফেলছে, যেন কিছু বলতে চায়। চওড়া কপাল, স্ফুরিত নাসা, পুরু ঠোঁট ঈষৎ হাসিতে দুধারে কুঞ্চিত-সব মিলিয়ে আঙ্কোরের রহস্যময় হাসি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই প্রাসাদ-মন্দির প্রথম খুঁজে পান ফরাসি লেখক পীয়ের লতি। তাঁর ভাষায়-চলে যাওয়ার আগে চোখ তুলে ওপরের মন্দির-প্রাসাদের চূড়াগুলির দিকে তাকাতেই গা শিউরে উঠল। গোধূলি আকাশ। জঙ্গলে অন্ধকার নামছে। ঈষৎ আলোয় দেখি, একটি মুখ বিস্তৃত হাসি ঠোঁটে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির হাসি। তারপর আরেকটি মুখ-তিনটি, চারটি, অজস্র মুখ সবখানে। এই রহস্যময় হাসি আমাকে কিছু বলতে চায়? তারা চারদিক থেকে আমাকে দেখছে। যেন শূন্যে ভেসে থাকা মুখ। এমনই বিশাল মহিমময় যে একটু সময় লাগে বুঝতে ওরা পাথরে খোদাই করা মুখ। এই অনুধাবনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের দিকে তাকালে মেরুদণ্ডে শিহরন বয়ে যায়। চারদিকে গড়া অজস্র মন্দিরের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাইয়ন মন্দির পীয়ের লতির মতো অনেককেই অভিভূত করে।

দুপুরের রোদ চড়া হয়ে উঠছে। আঙ্কোর দিঘি পেরিয়ে, তা প্রম ভগ্নস্তূপ দেখতে চলেছি। (Ta Prohm)। তা প্রমকে গাছের মন্দির বলে ডাকা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত এই মন্দিরে যেন এক ঐশ্বরিক উপস্থিতি। ডুমুর, পিপুল, বট গাছের দীর্ঘ শিকড় পাথরে ছড়িয়ে আছে কত যুগ থেকে; জড়িয়ে রেখেছে মন্দিরের চূড়াগুলি আর দেওয়াল। একটি পাথরে দেবনাগরী লিপি খোদাই করা আছে। গাছেরা এমনই আড়াল দিয়ে রেখেছে এগনোই কঠিন। মাঝে মাঝে অন্ধকার অলিন্দ। থলের ইশারায় পথ চলা। মন্দিরটি রাজা তাঁর মাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এখন চারদিকে, মোটামোটা শেকড় নামিয়েছে বিশাল বিশাল গাছ। পাথরের উদ্ধত সিংহের মাথা মাটিতে লুটানো। পৌরাণিক চরিত্রের মূর্তিগুলো ভেঙে পড়ে আছে এখানে ওখানে। কোথাও কোনও মূর্তির পায়ের তলায় মুখে নরম সবুজ শ্যাওলা জমে আছে।

টনলেসাপ হ্রদের দিকে চলেছি। পৃথিবীর এক আশ্চর্য হ্রদ। এখানে, প্রতি বর্ষায়, মেকং, টনলেসাপ আর সিয়েমরিপ নদীর জল একটি নদীর স্রোত অন্য দিকে ঘোরায়। টনলেসাপ নদী, ফুলে ফেঁপে বিপরীতমুখী হয়ে বয়। মেকংয়ে না পড়ে হ্রদের জলে এসে মেশে। সবথেকে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ। বন্যার জল ছড়ায় বনে জঙ্গলে। মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। পলিমাটিতে ফলে সোনার ফসল। আঙ্কোর সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল এই উপচে পড়া ঐশ্বর্যের ওপর। বন্যার জল থেকে দেশকে রক্ষা করা আর খরার সময় দিঘি পরিখা কেটে

জল সঞ্চিত করে খেত মাটি সিঞ্চিত করার অভিনব কৌশল আঙ্কোরের রাজারা আয়ত্ত করেছিলেন।

গ্রামের পথ ধরে গাড়ি চলছে। ট্রাক ভর্তি সৈন্যরা উদ্যত সঙ্গিনে চলে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। পরপর চারটি কনভয় গেল। থলকে জিজ্ঞেস করলাম, বিপদের অশুভ ইঙ্গিত নয় তো! রহস্যপূর্ণ হাসিতে মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর দিল। চোখে ভয়ের ছাপ দেখলাম। থলের অভিজ্ঞতা আছে সময়ে ঝড়ের সঙ্কেত দেখতে পাওয়ার। Khmer Rouge-এর নিষ্ঠুরতায় দেশে যখন রক্ত ঝরেছে থল তখন কিশোর। থলের চোখের সামনে মারা গেছে ওর প্রিয়জন, বুলেটের আঘাতে, অনাহারে। কাম্বোডিয়ার টরচার মিউজিয়ামে দেখেছি, বুদ্ধিজীবীদের ওপর কী ভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল পলপট সরকার! সেই দিনের ছায়া নামবে আবার এদেশে? থল গুনগুন করে এ সব বলে চলেছে। পথের দুদিকে দিঘিতে, পদ্মফুল ফুটে আলো হয়ে আছে। ধানের খেত যেন ছাঁটা লন। পথে একটি পাহাড়ের চূড়ায় কামান রাখা আছে; সেখানেও সৈন্যদের জিপ দাঁড়ানো। এই কামান থেকেই পলপটের সময় আগুন ঝরেছিল? থলের দিকে প্রশ্নের দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে দেখি সে আমার ক্যামেরায় মন দিয়ে দূরে কুলেন পাহাড়ের ছবি তুলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝেই সৈন্যরা গাড়ি থামাচ্ছিল। ইউনেস্কোর পতাকা দেখে ছেড়ে দিচ্ছিল ঠিকই; কিন্তু চোখে, সন্দেহের ছায়া ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখেছি অনেকবার। টনলেসাপ হ্রদের ধারে মাছের ভেড়ি। মাচা পেতে মাছের ঝুড়ি নিয়ে বসেছে পসারিনী। বেশ নোংরা আর দুঃখী জায়গা। কেনাবেচা চলছে। থল নামতে বারণ করল। গাড়ি থেকেই ওই অকূলের হ্রদ আর জীবনের কোলাহল মুখরিত বন্দর দেখে হোটেলে ফিরছি। পথে খোলা বাজার বসেছে। পদ্মবীচি, কাঁঠাল, লিচু বিক্রি হচ্ছে। পাশেই মাচার ওপর ঝিকমিক করছে সোনার অলংকার, রুবি, নীলা, রত্নখোচিত গয়না। সন্ধে হয়ে এসেছে। হোটেলের উঠোনে দেবীদেউলে ধূপ জ্বলছে। কাল এখানে শেষ দিন। খুব ভোরে যাব আঙ্কোরে Phnom Bakhen মন্দির দেখতে।

ভোরে ড্রাইভার আর থল এল। আবার আঙ্কোরের পথে। প্রায় অন্ধকার রাস্তা। অত ভোরেও সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও জানি না এই সিয়েমরিপেই দুদিন পর দুর্যোগের ঝড় নামবে। গা ছমছম করছিল। আঙ্কোর ভাটের উত্তরে এই শিবের মন্দির। দশম শতকে এই মন্দির তৈরি করেন রাজা যশোবর্মণ। এখান থেকে আঙ্কোর ভাটের পাঁচটি চূড়া দেখা যায়। আঙ্কোরের নির্জনতম জায়গা। ভোর পাঁচটা। তখনও আঙ্কোর ভাটের সামনে দিঘির ওপর কুয়াশা। সোজা রাস্তা অনেকটা উঁচুতে, জঙ্গল বিদ্ধ করে উঠে গেছে আকাশের দিকে। যেন এক তীর্থযাত্রা। বেশ কষ্ট হচ্ছিল উঠতে। কিন্তু সব পরিশ্রম

সার্থক হল ওপরে উঠে। সময় যেন এখানে থেমে আছে। শূন্যে আকাশে ভাসমান এক পৃথিবীর ছাদে দাঁড়িয়ে আছি মনে হচ্ছে। কী শান্ত চারদিক।

হঠাৎ দেখি অন্ধকার কেটে আলো ফুটছে। মন্দিরের চূড়ায়, বেদীতে, খোলা চত্বরে, শিবলিঙ্গে আলোর ছটা। যেন ইন্দ্রজালের মায়া। অনেক নিচে পড়ে আছে Khmer সাম্রাজ্য তার পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে। খুব মন দিয়ে দেখলে, দূরে দুর্গম মন্দির Prha Vihear দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্বে আঙ্কোর ভাটের সুতীক্ষ্ণ চূড়াগুলি আবছা দেখা যাচ্ছে। বেলা বাড়ছে। পাল্টে গেল আকাশের রং। কমলা, হলুদ, লাল, গোলাপি, সোনালি। ঝলমল করছে আঙ্কোর ভাট। দিঘির জলেও সেই রঙের খেলা।

নামবার পথ খুব সরু। কোনও রাস্তাই নেই। মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে পাহাড়ের পাথর ভেঙে অনেক নিচুতে রাস্তা পড়ে আছে। পাথরের খাঁজে পা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ একাগ্রতায় আমরা নামতে শুরু করলাম।

ট্রপিকাল জঙ্গলে শেকড় ও গাছের ডালপালায় আবদ্ধ মন্দিরে কাজ চলছে। মন্দির তৈরিতে পাথর জোড়া দেওয়া হয়নি। স্তরে স্তরে, পাথর কেটে সাজিয়ে চূড়ার মতো প্রাসাদগুলি উঠে গেছে। গাছে শেকড় এই দেওয়ালে বহুদিন ধরে এমন ভাবে প্রোথিত যেন যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে কারুকার্যখচিত তোরণ, বুদ্ধের যুক্তপাণি, অপ্সরার কবরীসজ্জা। এই ভগ্নস্তূপ আজ মানুষের ইতিহাসে, এক বিশেষ উত্তরাধিকার তালিকায় ভুক্ত। জঙ্গল যেমন মন্দিরে আপন প্রতাপ ছড়িয়েছে, মানুষের হাতও কম ক্ষতি করেনি। কত মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। বিক্রি হয়ে চলে গেছে বিদেশি সংগ্রাহকদের হাতে। তবে কঠিন শত্রু হল নিচে বয়ে যাওয়া জল। শ্যাওলা আবদ্ধ জল আগের মতো বয়ে যেতে পারছে না। তাতেও পাথরে ঘুণ ধরছে। চেষ্টা চলছে নানাভাবে এই ঐতিহাসিক প্রাসাদ-মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার। ১৯৮৬ সালে, ভারত ছয় বছরের পরিকল্পনায় রক্ষণকাজে হাত দিয়েছিল। ফরাসিদের কুশলী দলটিও কাজ করেছে। বর্তমানে, ইউনেস্কোর World Monument Fund ও অন্যান্য আরও সংস্থা এই রক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। নাম অপ্সরা পরিকল্পনা।

পাঁচশো বছর ধরে, আঙ্কোর এবং সমগ্র দেশটিই প্রাচীন Khmer-দের এক অসাধারণ কীর্তি স্বাক্ষর-স্মৃতি বহন করে। ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে এলাম। মন্দিরের চাতালে, সৈন্যরা দাঁড়ানো। কোন দলের? একই তো পোশাক! কারা প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সৈন্য, কারা দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর, বোঝা যাচ্ছে না। একই পোশাকের সৈন্যরা রাইফেল নিয়ে ঘুরছে। ওদের পায়ের বুটের শব্দ, মন্দিরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে। তবু এখনও ঝিঁঝির ডাক, কোকিলের কুহুধ্বনি, কুবো পাখির ডাক নিয়ে শান্ত সৌন্দর্যে দাঁড়ানো আঙ্কোর।

বেশিদিন এই শান্তি থাকবে না বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সিয়েমরিপ ছাড়ব। বাক্স গোছাচ্ছি। সিতা সানের পিতামহ বাইরে রোদে বেতের চেয়ারে বসে থাকেন প্রায় সময়। সারাদিন এই হোটেলের সামনে দিয়ে মার্চ করে গেছে বন্দুকধারী সৈন্যরা। অভিজ্ঞ বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলাম থলের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বিপদের কোনও অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছেন কি না। বললেন, অনেক যুদ্ধ দেখলাম। লন নলের সঙ্গে পলপটের যুদ্ধ, সিহানুকের সঙ্গে আমেরিকার, ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিরোধী সংগ্রাম, আমেরিকার লড়াই পলপটের সঙ্গে, পলপটের যুদ্ধ ভিয়েতনামের সঙ্গে। আটাত্তর বছর বয়স হল; সব কি আর মনে আছে? আরেকটা যুদ্ধও আসবে, আর কী! বেশি দিন বেঁচে থাকলে সহ্য করতে হয় অনেক কিছু। ক্র্যামার খুঁটে, চোখ মুছলেন। সিতা সানকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলাম। Joom reap leah বিদায় বিদায়, আবার দেখা হবে। করজোড়ে নমস্কার জানাল সবাই। থলের চোখে আশঙ্কা দেখে মন খারাপ করে উঠল। আঙ্কোরকে যেমন বিদায় জানানো যায় না, এ কদিনের সঙ্গীদেরও যেন বিদায় বলতে পারলাম না গাঢ় বিশ্বাসে।

ব্যাঙ্ককে ফিরে এলাম। পরদিন হোটেলে সন্ধেবেলায় টেলিভিশন খুলতেই খবর পেলাম কাম্বোডিয়ায় কু দে তা হয়েছে। ৪ জুলাই, হুনসেনের সৈন্যরা রাজধানী দখল করেছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাসনে।

থল আঙ্কোরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের শোনাত পলপটের সময়কার রক্তমাখা কাম্বোডিয়ার ইতিহাস। বাবা মায়ের সঙ্গে মাঠে সারাদিন পরিশ্রমী ধান চাষ। ডুমুরের পাতা সেদ্ধ খেয়ে থাকা। মাসে একবার মাত্র ভাত খেয়েছে কি না সন্দেহ। সেই দুঃসময় আর নয়। আঙ্কোরে পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়টি শেষ হলেই সে পড়তে যাবে। তিনবছর পড়ার পর গাইডের ডিপ্লোমা অর্জন করবে।

এসব গত বছরের কথা। যুদ্ধও এখন অতীতের ঘটনা। পর্যটকদের জন্য কাম্বোডিয়া আবার দরজা খুলেছে। আঙ্কোর ভাটের মন্দির আজকাল ব্যাঙ্কক থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরেও দেখে আসা যায়।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

হিমালয়ের সাতকাহন

ত্রিদিব বসু

সহসা হিমালয়

হিমালয়কে আচমকাই প্রথম দেখে ফেলেছিলাম ১৯৬৮ সালে-দার্জিলিংয়ের নিচে লেবং রেসকোর্সের গেটের পাশে একা একা দাঁড়িয়ে । মে মাস । আকাশে যথেষ্ট মেঘের আনাগোনা । তিন দিন আগে দার্জিলিংয়ে এসেছি । তারপর থেকে স্বর্ণশিখর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতেই পাইনি । একটা অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম । কোনও মানুষকে কেউ চারদিক থেকে যতই দেখুক, যতক্ষণ তার মুখ না দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে দেখা যেমন সম্পূর্ণ হয় না-হিমালয়ের ক্ষেত্রেও তেমনই তুষারমণ্ডিত কোনও শৃঙ্গ না দেখলে তাকে দেখা সম্পূর্ণ হয় না । আড়াল সরিয়ে অনেকটা নতুন বউয়ের মুখ দেখার মতো ।

দার্জিলিং থেকে হাঁটতে হাঁটতে লেবংয়ের মাঠের গেটের কাছে যখন সকালবেলা পৌঁছেছিলাম তখনই সহসা কী মন্ত্রবলে কয়েক মুহূর্তের জন্য জমাট মেঘের আবরণ একটুখানি সরে গেল-আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘার অলকস্পর্শী সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল । জীবনে প্রথম দর্শন-আমি একা-আর এমন মহিমময় দৃশ্য-রাস্তার ওপর যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে গেলাম । কয়েক মুহূর্ত । আবার মেঘের অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা । সম্বিত ফিরে এল । ম্যল থেকে তিব্বতী বস্তির পাশ দিয়ে যে পথে নেমে এসেছিলাম সেই পথে না গিয়ে গাড়ি চলা ঘোরা পথে ধীরে ধীরে দার্জিলিং শহরের দিকে ফিরছিলাম । তখনও হিমালয়ের 'মুখ আমি দেখিয়াছি'র মতো ভাবে বিভোর আমি ।

অনেকটা আসার পর দেখি রাস্তার ঠিক পাশেই আন্দাজ ৫০-৬০ ফুট উঁচু একটা অনাবৃত শিলাস্তরের মাঝ বরাবর একজন লোক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে এবং তিনি খুব ধীরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন । 'রক ক্লাইম্বিং' কাকে বলে তখনও আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না । ভাবলাম এত জায়গা থাকতে ওই কঠিন জায়গাটায় উনি খামখা যেতে গেলেন কেন! উনি কী করেন সেটা দেখার জন্য পাহাড়ি রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে যে সাদা কালো রং করা পাথরের চওড়া বেঞ্চের মতো সামান্য উঁচু আরক্ষণ থাকে তারই একটাতে

বসে পড়লাম। লোকটি দেখলাম একটু পরেই সুন্দর ওপরে উঠে গেলেন। উঠেই রাস্তার দিকে ফিরে তিনি সেই শিলাস্তরের মাথায় ভালোভাবে বসলেন। বসেই নিচে আমাকে একা দেখতে পেয়ে ডান হাত নাড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। উনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কী করবেন! আমি তো এতক্ষণ হাঁ করে ওঁরই দিকে তাকিয়ে ওঁর বাহাদুরি দেখছিলাম। প্রত্যুত্তরে আমিও হাত নাড়লাম। আর নাড়তে নাড়তেই ওঁনার মুখটা ভালো করে দেখতে পেয়ে মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল-আকে এঁকে তো আমি চিনি-অনেক দিন ধরেই চিনি। তেনজিং নোরগে।

বাকি রাস্তায় ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম তেনজিং-এর মতো পর্বতারোহী, সেও কিনা ছাত্রদের রক ক্লাইম্বিং-এ প্রশিক্ষণ দেবার আগে নিজেকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে নিচ্ছেন-যেমন যোগ্য অধ্যাপক ক্লাসে ঢোকার আগে নিজে পড়াশুনা করে আসেন। প্রতিভার সঙ্গে নিষ্ঠার এবং সততার এক বিরল সম্মিলন।

তারপরই মন চলে গেল অনেক পিছনে সেই ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়। তখন ক্লাস ওয়ানে পড়ি। সকালে স্কুল। হঠাৎ শুনলাম এই ক্লাসটার পরেই ছুটি হয়ে যাবে। অন্য সময় ছুটি হলে কে কার আগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশে খেলার মাঠে পৌঁছবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। আজ কিন্তু তা হল না। উল্টে সবাই মিলে মাস্টারমশাইকে চেপে ধরলাম-কেউ বাড়ি যাবে না, যার জন্য ছুটি হয়েছে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

এভারেস্ট জয়ের পরে বিশেষ আমন্ত্রণে তেনজিং বাটানগরে এসেছিলেন। এবং তাঁরই সম্মানার্থে আমাদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। বাটানগরে আমাদের স্কুলের কাছেই বাটা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো। আর সেই মুহূর্তে তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। আমাদের জেদাজেদিতে মাস্টারমশাই আমাদের লাইন করিয়ে নিয়ে চললেন সেই বাংলোর দিকে। বাংলোর সামনে এসে আমাদের চেঁচামেচিতে তেনজিং বাংলোর দোতলার বারান্দায় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। হাত নাড়লেন। যেমন করে নেড়েছিলেন একটু আগে রাস্তার ধারে পাথরটার মাথা থেকে। আমরাও সবাই একসঙ্গে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগলাম। কিন্তু তাতে আমাদের মন ভরল না। আমরা তাকে নিচে নেমে আসার জন্য হাত দিয়ে ডাকতে লাগলাম। এতগুলো কচি প্রাণের আহ্বান তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। নেমে এসে বাংলোর গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ালেন। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। হাতের পাঁচটা আঙুল একটু ফাঁক করা। আমরা লাইন করে এগিয়ে পাঁচজন পাঁচজন করে আমাদের ভাগের একেকটা করে আঙুল ধরে হ্যান্ড শেকের কাজ সেরে পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম।

এতদিন পরে মনে হল সেদিন সেই সদ্য বিজয়ী বিশ্ববন্দিত পর্বতারোহীর হাত স্পর্শ করে আমরা প্রকারান্তরে এভারেস্টকেই স্পর্শ করার আনন্দ পেয়েছিলাম ।

আর তাই আজকে ধাঁধায় পড়ে গেলাম-হিমালয়কে প্রথম কবে দেখেছি, কবে তাকে প্রথম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি-আজ না পনেরো বছর আগে শৈশবের বাটানগরে!

হিমালয়ে হনিমুন

এই দার্জিলিং আমার বড় প্রিয় শহর ছিল-অন্তত সত্তরের দশকে তো বটেই । তাই সেই সময় ছোটবেলাকার বন্ধু দিলীপ বিয়ের পর যখন জিজ্ঞেস করেছিল হনিমুনে কোথায় যাবে, তখন আমি চোখ বুজে দার্জিলিংয়ের নাম বলে দিয়েছিলাম । 'হনিমুন' হিমালয়ের ঠান্ডা ছাড়া কোথাও জমে না ।

দার্জিলিং থেকে ফিরে দিলীপ কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখাই করল না । তারপর হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হতেই অভিযোগের সুরে যেই বললাম-কি রে, তুই তো আর দেখাই করলি না! দার্জিলিংয়ের হিমালয়ে হনিমুন কেমন কাটালি বল?

দিলীপ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল-নিকুচি করেছে তোর হিমালয়ের-এটা একটা জায়গা হল! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-কেন কী হয়েছে? আরও বিরক্ত হয়ে দিলীপ বলল-রাস্তায় একটু স্বস্তিতে হাঁটার উপায় নেই! হয় নামো নয় ওঠো । নামলেই উঠতে হয়, আবার উঠলেই নামতে হয় । আমার 'হনিমুন'টাই মাঠে মারা গেল । শতকোটি নমস্কার তোর হিমালয়কে ।

বড় বিস্ময় লাগে

১৯৭৬-এর অক্টোবরে আমার প্রথম হিমালয় অভিযান । তখনও আজকের মতো কৈলাস-মানস সরোবরের রাস্তা খুলে যায়নি । সেই সময় আমাদের অভিযানের গতিপথ ছিল-কাঠগুদাম থেকে বাসে পিথোরাগড়, সেখান থেকে ধরচুলা হয়ে তাওয়াঘাট । তাওয়াঘাট থেকে ট্রেক শুরু-পাঙ্গি, সিরখা, জিপটি, মালপা, বুধি, গারবিয়াং, গুঞ্জি হয়ে কুটি গ্রাম পর্যন্ত । সেখান থেকে আমরা যাব সামজুর্কচেন হিমবাহ সমীক্ষায় । এখন এই গুঞ্জি গ্রাম থেকেই ডানদিকে লিপুলেখ গিরিপথ হয়ে চলে গেছে মানস সরোবরের পথ । গুঞ্জি গ্রাম থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে কুটি নদীর উত্তর তীর বরাবর ২১ কিলোমিটার হাঁটলে আমরা এ প্রান্তের শেষ গ্রাম কুটিতে পৌঁছব । প্রায় ১০০ কিলোমিটার ট্রেক ।

ট্রেক শুরু হওয়ার পর থেকেই হিমালয়ের অপার ঐশ্বর্য প্রতি পদক্ষেপে উন্মোচিত হতে লাগল । জীবনের প্রথম ট্রেক করছি বলে কিনা জানি না, প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিস্ময়ের ডালি নিয়ে সে হাজির । আমরা সকলে মুগ্ধ চিত্তে তার রসাস্বাদন করেই চলেছি । প্রথমেই নারায়ণ স্বামী মন্দির, তারপর রং লিং টপের ঘন জঙ্গল, গভীর গিরিখাত সহ কালী নদীর ভয়ঙ্কর রূপ, নাজাং জলপ্রপাত, বুধির আগে পাতলা সাদা শাড়ির মতো উড়তে থাকা পেলস্টি জলপ্রপাত, ছালেগে হলুদ ফুলের বুটি দেওয়া সুন্দর ঘাসের আস্তরণ, গুঞ্জির পর হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে যাওয়া কুটি উপত্যকা জুড়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া কুটি নদীর শান্তশ্রী, গুঞ্জির ওপর দিয়ে দেখা নেপালের সমুদ্ধত আপি গিরি শৃঙ্গ অথবা সামজুর্কচেন হিমবাহের ওপর থেকে দুরন্ত গতিতে ধাবমান সাবু দানার মতো তুষার-মনকে একের পর এক বিস্ময়ে অভিভূত করে চলেছে ।

ধরচুলা, তাওয়াঘাট হয়ে গুঞ্জি পর্যন্ত সবকটি জায়গাতেই আমরা থাকার জন্য সরকারি বাংলো পেয়েছিলাম । রান্নার ব্যাপারে সেই বাংলোর চৌকিদারদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাও পেয়েছিলাম ।কিন্তু গুঞ্জি এসে শুনলাম কুটিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না । কোনও বাংলো নেই সেখানে । তার ওপর গুঞ্জি থেকে কুটির দূরত্ব প্রায় ২১ কিলোমিটার । একই দিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে । ফলে কোথায় থাকব, কে রান্নার কাঠ, জল ইত্যাদি জোগাড় করে দেবে সে বিষয়ে চিন্তিত ছিলাম ।

যেহেতু আমাদের অভিযানটা নিতান্তই মামুলি ট্রেক ছিল না বরং বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মালমশলা জোগাড় করতে করতে আমাদের চলা-আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় সন্ধের মুখে কুটি পৌঁছলাম । উচ্চতার জন্য সেই গ্রামে তাপমাত্রাও তখন শূন্যাঙ্কের সামান্য ওপরে । গতকাল নাকি সামান্য বরফও পড়েছে । আমাদের শ্রান্ত বিধ্বস্ত শরীরটা নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেই যখন সেখানকার সীমান্ত রক্ষীদের বললাম- থাকার কোনও ঘর পাওয়া যাবে কি না, তারা তখন গ্রামের সকলের কাকী বলে পরিচিত এক মহিলার বাড়ি নিয়ে গেল । আমাদের কিছু বলতেও হল না । তিনি আমাদের দেখামাত্রই স্নেহশীলা মা-কাকীমার মতোই তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন । বললেন, আরাম করো । আমি এখুনি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি । আমরা তাঁর বসার ঘরের পাথরের মোটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম । মধ্যে কাঠের আগুন জ্বলছে । স্থানীয় পশমের তৈরি মোটা কার্পেটের ওপর বসে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে তাপ নিতে নিতে বেশ আরাম লাগছিল । কাকীর আশ্বাসবাণী-চা পাঠিয়ে দিচ্ছি-শুনে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ পরিক্রমার পর নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি । চা দিতে দিতে কাকী বললেন, তোমাদের সঙ্গে রেশন যা আছে তার থেকে রাতের খাবারের মতো যা লাগে বার করে দাও, আমি রান্নার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি । আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম ।

কুটিতে আমরা তিন দিন ছিলাম । কাকীর অসীম দয়া বলতে হবে, আমাদের আর কিছু করতে হয়নি । কাকীর লোকজনই আমাদের সব রান্না করে দিত ।

একদিন বাদে রাতে এমন বরফ পড়ল কুটির সমস্ত বাড়ির ছাদ সাদা, সমস্ত চাষের জমি একেবারে সাদা । কুটির সকলেরই ধরচুলাতেও আরেকটা করে বাড়ি আছে । গরমের সময় অর্থাৎ জুন থেকে অক্টোবর-এই মাস পাঁচেক তারা কুটিতে থাকে, চাষবাস করে, ভেড়া পুষে তার লোম কেটে বিক্রি করে । কম্বল, চাদর বানায় । তারপর অক্টোবরের শেষে যখন বরফ পড়তে শুরু করে তখন সমস্ত ঘরদোর বন্ধ করে বাড়ির দরজা গাছের জাল পাতা দিয়ে আটকে, অপদেবতার হাত থেকে যাতে তার বাড়ি ঘর রক্ষা পায় তার পুজো করে গরম কম্বল, কিছু খাবার, টাকা পয়সা, গরু ভেড়া এমনকী পোষা কুকুরটা পর্যন্ত কোলে নিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করে । যেখানে জল আছে সেখানে শুধুমাত্র সেই গরম কম্বল সম্বল করে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার যাত্রা শুরু । ইংরিজিতে একে বলে transhumance । বাংলায় 'মানব-সঞ্চরণ' বলা যায় বোধ হয় ।

গ্রামে অবশ্য তরুণ কিছু ছেলে গ্রাম পাহারা দেবার আর অথর্ব যারা নিচে ১০০ কিলোমিটার রাস্তার প্রচণ্ড চড়াই উতরাই ভাঙার ক্ষমতা রাখে না, তাদের দেখভাল করার জন্য থেকে যায় । ভালো বরফ পড়া শুরু হয়েছে দেখে অনেক পরিবারই নিচে ধরচুলার পথে রওনা দিল । কাকীরও যাবার কথা ছিল কিন্তু আমাদের জন্য তিনি যেতে পারলেন না । বললেন, তোমাদের এখানে ফেলে যাই কী করে? তোমরা যাবার পর আমি যাব । কাকীকে কীভাবে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছিলাম না ।

কাকীর সঙ্গে সন্ধেবেলা কথা বলে বুঝতে পারলাম হিমালয়ের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে পড়ে থাকলেও যথেষ্ট আধুনিক তিনি । কয়েক বছর আগে তার স্বামী মারা গেছেন । তার দুই মেয়েকে তিনি মানুষ করছেন । তারা নৈনিতালের কলেজে পড়ে । তাদের ছবি দেখালেন । তিনি কন্যাকুমারী অবধি ঘুরে এসেছেন । দিল্লিতে আকাশবাণীতে নিজের অঞ্চল আর তার মানুষজনের সংস্কৃতি ও সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন । এমনকী ছবি দেখিয়ে বললেন, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলছেন । আমাদের বিস্ময়ের শেষ ছিল না ।

যেদিন আমরা চলে আসব তার আগের দিন পূর্ণিমা ছিল । আকাশ পরিষ্কার । চারদিকে স্নিগ্ধ আলোর বন্যা । কাকী বললেন, আজ রাতের জন্য তোমাদের আর রেশন বার করতে হবে না । আজ আমার বিশেষ পুজো আছে । পুজোর প্রসাদেই তোমাদের রাতের খাবার হয়ে যাবে । পাহাড়ের ঢালে একটা খচ্চর রেশনসুদ্ধ পড়ে যাবার ফলে রেশনে আমাদের একটু টানাটানিই ছিল । ফলে কাকীর এই প্রস্তাবে আমরা খুশিই হলাম ।

বিশেষ পুজো দেখার জন্য যখন ওঁর বড় শোবার ঘরে ঢুকলাম, দেখি, ঘরের এক কোণে আমাদের বাড়ির মতো ঠাকুরের আসন পাতা । এই অঞ্চলের লোকেদের ভোটিয়া বলে । তিব্বতী প্রভাব আছে । বুদ্ধের ভক্ত এরা । তাদের ঘরে বাঙালি ঘরের মতো ঠাকুরের আসন দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু অবাক হবার তখনও আরও অনেক বাকি ছিল । ঠাকুরের আসনের সামনে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি-একি! আমি ভুল দেখছি না তো! যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দ মনকে নাড়া দিয়ে গেল । আমি অবাক চোখে কাকীকে না বলে থাকতে পারলাম না-এ কী কাকী! ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এখানে এলেন কী করে? কাকী আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে উত্তর দিলেন-ভগবানের কি কোথাও যাবার বাধা আছে? তিনি যে ভাবে সব জায়গায় যান, এখানেও সেই ভাবেই এসেছেন ।

বুঝলাম মূর্খের মতো একটা প্রশ্ন করে ফেলেছি । সত্যিই তো তাঁর তো কোথাও যাবার বাধা নেই! আর কোনও প্রশ্ন কাকীকে করতে সাহস পেলাম না । মন্ত্রমুগ্ধের মতো হিমালয়ের গহন গভীর উপত্যকায় ঠাকুরের পুজো দেখলাম । প্রসাদ পেলাম । হিমালয় ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ ।

সামবডি হ্যাজ এনটার্ড

এর কয়েক বছর পর আবার হিমালয়ের পোকা মাথার মধ্যে নড়েচড়ে বসল । যাদের সঙ্গে জীবনের প্রথম ট্রেক করেছিলাম তাদের কয়েকজন আর নতুন দুজনকে নিয়ে দল এবার চলল সুন্দরডুঙ্গার পথে । শেষ গ্রাম জাতোলি । ঢাকুরি থেকে সকালে রওনা দিয়ে বিকেলের মধ্যে সেখানে আরামসে পৌঁছে গেলাম । পদম সিং-এর ওপরের ঘরটা পুরো আমাদের দখলে । ঘরের সামনের দিকটা আমাদের শোওয়ার জন্য রেখে পিছনের অংশে সব মালপত্র সাজিয়ে রাখা হল ।

নিচে রান্নাঘরে আমরা চায়ের কাপ নিয়ে পরের দিনের যাত্রাপথ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন । এমন সময় পদম সিং আমাদের চায়ের আসরে ঢুকে পড়ল । পদম সিং অভিজ্ঞ লোক । আমরা ওকেও মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করছিলাম । কিন্তু আমাদের আলোচনা শেষই হচ্ছে না দেখে ও উসখুশ করতে লাগল । শেষে থাকতে না পেরে বলল-বাবুরা, আপনাদের আলোচনা কতক্ষণ চলবে বুঝতে পারছি না । আমার একটা জরুরি কথা ছিল-যদি কিছু মনে না করেন তবে এখন সেটা বলে ফেলি ।

আমরা শশব্যস্ত হয়ে প্রায় একসঙ্গেই সবাই বলে উঠলাম-নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বলুন পদমজি কী বলবেন । পদম সিং আস্তে আস্তে বললেন-আমাকে একটা জিনিস আপনাদের

দিতে হবে । এবং সেটা কালই লাগবে । আমরা একটু অবাক হলাম । দলনেতা বললেন-কি জিনিস চাই আপনার?

-এক কিলো চিনি । আমাদের প্রায় সবার মুখ দিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে এল চি-নি!!

কিন্তু কেউ উত্তর না দিয়ে দলনেতার দিকেই তাকিয়ে রইল । নেতা অতি বিচক্ষণ । সবে তিন দিন ট্রেক হয়েছে । এখন হিমালয়ের গহন গভীরে ঢোকার পালা । সেখানে দোকানপাট কিছুই নেই । কিসে কী হয় কেউ বলতে পারে! আর চিনি একটা দারুণ প্রয়োজনীয় জিনিস । আমাদের সবার যদি ডায়াবেটিস থাকত তাও বুঝতাম । সুতরাং নেতা সঠিক পথে পদম সিংকে নরম করে সাফ জানিয়ে দিলেন-না দাদা, এ যাত্রায় এক কিলো চিনি দিতে পারছি না । ফেরার সময় যদি কিছু বাঁচে তখন দিতে পারব । ব্যাপারটা ভালো হল না খারাপ হল সেটা বোঝার আগেই পদম সিং মুখ ব্যাজার করে চায়ের আসর থেকে বেরিয়ে গেল ।

এর পরের দৃশ্য-পদম সিং-এর গৃহের ওপরের কক্ষ । সময়-শেষ রাত্রি ।

কক্ষের সম্মুখ ভাগে কলিকাতা আগত হিমালয় অভিযাত্রীগণ পাশাপাশি শুইয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন । কক্ষের এক কোণায় মাত্র পাঁচ-ছয় ধাপের এক ছোট্ট সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে । তাহার পরেই কপাট । বাহির হইতেই এই কপাট খুলিয়া উপরের কক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব । পূর্ণিমা রাত্রি, চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে । বিশ্ব চরাচর নিস্তব্ধ । হঠাৎ এক গগন-বিদারী চিৎকার ‘সামবডি হ্যাজ এনটার্ড’-‘সামবডি হ্যাজ এনটার্ড ।’ কাঁচা ঘুম হইতে জাগরিত হইবার পর চাঁদের সামান্য আলোর আভাসে চশমাবিহীন অবস্থায় অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখিলাম-আমাদের অন্যতম সদস্য চাঁদু যে সিঁড়ির এবং ঘরের এক মাত্র কপাটের পাশে প্রথমে শুইয়া ছিল সে গলা হইতে হস্তযুগল এবং পদযুগল পর্যন্ত আবৃত ফুটফুটে সাদা আর চাপা ড্রয়ার এবং উলিকট পরিহিত অবস্থায় একটা ছোট্ট টর্চ জ্বালাইয়া সামবডি হ্যাজ এনটার্ড, সামবডি হ্যাজ এনটার্ড এই কথা উচ্চৈস্বরে বলিতে বলিতে ভূতের মতো নৃত্য সহযোগে সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । কাহাকেও কোথাও না পাইয়া সে শেষ পর্যন্ত প্রদীপের উদরে একটি পা ফেলিতেই প্রদীপ ওরে বাবারে মারে বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিল । সেই সঙ্গে বাকি সকলে । অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত টর্চ যখন চাঁদুর মুখমণ্ডলে ফোকাস করা হইল তখন দেখা গেল প্রচণ্ড ভীত চাঁদুর চাঁদপানা মুখটি ভয়ে শুকাইয়া আমসি হইয়া গিয়াছে এবং সেই মুখমণ্ডল হইতে চক্ষুরত্নের মহারত্নটি ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে ।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নাটকের ক্লাইমেক্সের আকস্মিকতা কেটে যাবার পর আমরা চাঁদুকে বসিয়ে ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে জল খাইয়ে প্রকৃতিস্থ করলাম । ও একটু ঠান্ডা

হলে জিজ্ঞেস করলাম-বল এবার তোর কী হয়েছে? চাঁদু তখনও হাঁপাচ্ছে । এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও ও দরদর করে ঘামছিল । তারপর ধীরে ধীরে যে কাহিনী বলল তা হল এই-

গতকাল রাত্রে নিচে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা যখন ওপরে শুতে আসি তখন সেই সিঁড়ি লাগোয়া কপাট বন্ধ করতে গিয়ে দেখা গেল কপাটে কোনও ছিটকিনি, আগল বা শেকল কিছুই নেই । কী আর করা । আমরা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যে লাঠি ছিল তাই আড়াআড়ি ভাবে বন্ধ কপাটের ওপর চাপিয়ে রাখলাম-এই আশায় যে কেউ যদি ঢুকতে চায় হুড়মুড় করে সবগুলো লাঠি পড়বে আর আমরাও জেগে যাব ।

কপাট আর সিঁড়ির পাশে প্রথমে শুয়েছিল চাঁদু । ওর পাশে আমি, তারপর বাকিরা । খুব পাতলা ঘুম ওর । হঠাৎ শেষ রাত্রে খুট করে শব্দ হতেই ওর ঘুম ভেঙে যায় । ও চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল । চোখ খুলতেই দেখতে পেল-একটা লম্বা চওড়া হাত কপাটটা একটু ফাঁক করে আড়াআড়ি ভাবে রাখা লাঠিগুলো এক এক করে ধরছে আর নিঃশব্দে বার করে নিচ্ছে । এই সময়েই একটা লাঠির সঙ্গে কপাটের সামান্য গুঁতো লেগে খুট করে শব্দ হয়েছিল । কপাটটা পুরো খুলে যাবার পর পেছনে চাঁদের আলোর পশ্চাদপটে ও দেখল এক দৈত্যাকৃতি লোক দাঁড়িয়ে । বুঝল, যমদূত প্রবেশ করতে চাইছে তাদের ঘরে । আলো না থাকায় শরীরের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না । কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা গেল আজ মৃত্যু অবধারিত । এই অবস্থায় চিৎকার করে আমাদের যে ডাকবে তাও পারছে না । আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া বোধ-বুদ্ধি সব গ্রাস করেছে । মনে হচ্ছে গলাটা কে যেন চেপে ধরে আছে । পাশে আমি শুয়ে আছি, হাতটা একটু বাড়িয়ে আমাকে ঠেলতে গিয়ে ওর মনে হল হাত-পা কে যেন বেঁধে রেখেছে । এই পরিস্থিতিতে সেই 'যমদূত' যখন বোঝার চেষ্টা করছে ঘরের কোথায় কে শুয়ে আছে তখন চাঁদু বুঝে গেল ওকেই প্রথম মৃত্যু বরণ করতে হবে । ও চিৎ হয়ে শুয়েছিল বলে, ওর মনে হল, ছোরাটা বুকে বিঁধলে বেশি লাগবে । ও তাই অনেক কষ্টে-আবার কী দেখে ফেলবে-সেই কারণে চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে উপুড় হয়ে শুল । কিন্তু কী আশ্চর্য ওর পিঠে কেউ ছোরা মারল না । একটু বাদেই পাশ থেকে চাপা গলায় আওয়াজ এল-আঃ আঃ । চাঁদুর মনে হল যমদুতটা ওকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে মারল বোধহয় । (আসলে এই সময় বুকে হাত দিয়ে শোওয়ার জন্য প্রদীপকে বোবায় পেয়েছিল । তারই ফলে ওই আওয়াজ) । কিছুক্ষণ এইভাবে চোখ বন্ধ করে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার পরেও যখন কিছু হল না তখন চাঁদু আস্তে আস্তে সম্বিত ফিরে পেল । ধীরে ধীরে উঠে বসল । কেউ কোথাও নেই অথচ কপাট হাট করে খোলা । তারপরেই শুরু হয়ে গেল সতীবিহীন শিবের প্রলয় নৃত্য-সামবডি হ্যাজ এনটার্ড ।

সকাল হল । আমরা মালপত্র গোছাতে শুরু করলাম । কোয়ার্টার মাস্টার প্রবাল হঠাৎ দেখল চিনির প্যাকেট যে বস্তায় ছিল সেটা খোলা । আর তার গোনা প্যাকেটগুলো থেকে একটা প্যাকেট হাওয়া ।

তদন্ত নিষ্প্রয়োজন ।

সংযম

হিমালয় অভিযানের স্বাদ পাল্টাবার জন্য একবার ঠিক হল স্পিতিতে যাওয়া হবে । নানা দিক ভেবে মনিরং শৃঙ্গ আর তার উল্টো দিকে এক অনামা শৃঙ্গ বেছে নেওয়া হয়েছে । আমি পর্বতারোহী নই তবু শৃঙ্গ বেছে দেবার নজরানা হিসেবে আমাকেও দলভুক্ত করা হল । আমার অবস্থাটা হল ঠিক হংস মধ্যে বক যথা ।

কলকাতা থেকে সিমলা, সেখান থেকে রামপুর, তাবো, পো হয়ে কাজার আগে সিজলিং-এ আমরা নেমে গেলাম । সিজলিংয়ের চারদিকের শোভা দেখে মনে হল আর কোথাও যাবার দরকার নেই । এইখানেই খেয়ে বসে শুয়ে আর পাশেই স্পিতির স্বচ্ছ জলে পা ভিজিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় । সিজলিংয়ের ওপরেই বিখ্যাত ডাংখার গুম্ভা । লাদাখে যেমন হেমিস, স্পিতিতে সমান মর্যাদায় তেমনই ডাংখার । আগে এই অঞ্চলের রাজধানীর মতো ছিল । সিজলিং থেকে সকালে গিয়ে সব দেখে বিকেলে ফিরে আসা যায় । যে দিন আমরা সিজলিং এলাম সেই দিনই চারদিকে পাহাড়ের মাথায় প্রাক-শীতের প্রথম বরফ পড়ল । যে তাপমাত্রা কলকাতায় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তা সিমলায় ১৩ ডিগ্রি, সিজলিং-এ সন্ধেবেলা ৬ ডিগ্রি এবং পরদিন ভোরে ২ ডিগ্রিতে নেমে গেল ।

সিজলিং থেকে স্পিতি নদী পার হয়ে ৬০০ ফুট ওপরে মানে গ্রামে একটু বিশ্রাম নিয়ে সোজা চলে গেলাম ইয়াং হ্রদের ধারে । সেপ্টেম্বরের শেষ বলে হ্রদে এখন খুব একটা জল নেই । থাকলে ট্রাউট মাছ পাওয়া যেত । হ্রদের পিছন দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে । একটা লম্বাটে পরোটার আকার নিয়েছে । জল নেই বলে তলার মাটি এক বিরাট ফুটিফাটা সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে । তার ওপর দিয়ে আরামে হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের অন্যপ্রান্তে চলে গেলাম । পাহাড়ের গা ঘেঁসে আমাদের তাঁবু পড়ল । বেসক্যাম্প ।

এই পথের একটা ছোট্ট ইতিহাসও আছে । আমাদের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে বৌর্ন অ্যান্ড শেপার্ডের যে ফটোর দোকান আছে, সেই বৌর্ন হিমালয়ের ছবি তোলার জন্য এই পথে এসেছিলেন । বৌর্নের জন্ম ১৮৩৪ সালে । ছিলেন ব্যাঙ্কের ক্লার্ক, হয়ে গেলেন ফটোগ্রাফার । ভারতে আসেন ১৮৬৩ সালে । ১৮৬৩, ১৮৬৪ এবং ১৮৬৭ তে পর পর

তিনটি অভিযানে তিনি হিমালয়ে যান। শেষের অভিযানটি ছিল সিমলা থেকে নারকান্ডা, জালোরি গিরিপথ, কুলু, নগ্গর, হামতা গিরিপথ, কুনজুম গিরিপথ, লোসার হয়ে কিবার। তারপরেই এই মনিরং গিরিপথ হয়ে কিন্নরে নেমে সিমলায় ফেরা। সেই সময়ে তার তোলা ১৮,৬০০ ফুট উঁচুতে মনিরং গিরিপথের ছবি ১,৮৮০ সাল পর্যন্ত একটা রেকর্ডের দাবিদার ছিল। তখন পর্যন্ত এত উঁচুতে আর কারও তোলা ছবি ছিল না। বৌর্নকে আমরা শুধু একজন ভালো ফটোগ্রাফার হিসাবেই চিনি। কিন্তু এটা জানি না যে তার ভেতর একজন অসীম সাহসী হিমালয়প্রেমিক অভিযাত্রীও লুকিয়ে ছিল।

আমাদের বেসক্যাম্পের পাশেই কিন্তু অনেকটা সমান জায়গা ছিল বলে হাওয়ার তীব্রতা সব সময় বেশি। তাপমাত্রাও বেশ কমের দিকে। রাতে তো বটেই, দিনেই শূন্যের নিচে তাপ আমাদের রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত করে রাখল। সন্ধের মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁবুর ভেতর ঢুকে যাওয়া হবে ঠিক হল। কিন্তু দেখা গেল তিনজনের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্পিতি অঞ্চলে গাছপালা কম থাকার দরুন বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম। তাই একবারে অনেকটা উচ্চতায় চলে এলে উচ্চতাজনিত অসুস্থতার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সিজলিং থেকে একদিনে ইয়াং হ্রদে না এসে নিচের গ্রামে থাকলে ভালো হত। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে কাজ নেই। তিনজনেই সারা রাত মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করল। আমার আবার কোনওরকম যন্ত্রণা না হলেও বুঝতে পারছিলাম শরীরটায় স্বস্তি পাচ্ছি না।

পরদিন আর না এগিয়ে বেসক্যাম্পেই থাকা ঠিক হল। শুধু দুজন সদস্য এগিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তা কেমন এবং পরবর্তী ক্যাম্প কোথায় হবে সেটা দেখে এল। এর মধ্যে দুজনের শরীর ঠিক হয়ে গেলেও আশিসের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। মাথা যন্ত্রনা তো ছিলই। এখন বমিও শুরু হয়ে গেছে। আমার অবস্থাও তথৈবচ। না উন্নতি না অবনতি।

পরদিন সকালেও আশিসের অবস্থার যখন কোনও হেরফের হল না, তখন দলনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন আশিসকে নিচে নেমে যেতে হবে। নিচে মানে একেবারে সমতলে। কিন্তু ওকে তো আর একা একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই সঙ্গে কে যাবে সেই প্রশ্ন উঠতে আমিই এগিয়ে গেলাম। কেননা আর যাই হোক আমি পর্বতারোহী নই। তার ওপর আমিও অল্পবিস্তর অসুস্থ। নিজেদের মালপত্র সব গুছিয়ে আমরা দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে মানে গ্রামে নেমে এলাম। দুদিন আগে গ্রামের ভেতর দিয়ে ওপরে ওঠার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বারবার বলেছিলেন তার বাড়িতে থাকার জন্য। সেখানেই উঠলাম। ভদ্রলোকের ঘরের ভেতরে গিয়ে আমাদের তো চক্ষু ছানাবড়া। ঘরটা

প্রায় ১৫ ফুট বাই ৪৫ ফুট হবে। পুরোটা সুন্দর কার্পেট মোড়া। দুদিক দুটো মোটা তোশকের ওপরে চাদর বিছিয়ে সামান্য উঁচুতে বিছানা করা। নিচু কাঠের টেবিল, তার ওপর বড় বড় ফ্লাস্ক, প্লেট, গ্লাস, চামচ। গোটা তিনেক বড় বড় বাতিদান। জানলায় সুন্দর পর্দা ঝুলছে, দেওয়ালে তিব্বতী ছবি। একতলার ঘর থেকে একটা বড় টিনের চোঙার মতো বস্তু ছাদ ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে। এটা আসলে ঘর গরম রাখার দেশজ পদ্ধতি। নিচের ঘরে আগুন জ্বালালে তার উত্তাপ এই চোঙাকে অবলম্বন করে ওপরের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে এতকিছু বোঝবার উপায় নেই।

সারাক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আড্ডা মারলাম আমরা। জেনে নিলাম স্থানীয় লোকজনের দৈনন্দিন জীবনের কথা। কুটির মতো এই গ্রামের মানুষেরা শীতের সময় নিচে নেমে যায় না। প্রায় ছয় মাস ঘরেই বন্দী থাকে। ভদ্রলোক বললেন, ওই সময় আসুন, বাইরে যখন বরফ জমে থাকবে, আমরাও ভেতরে ছমাস জমিয়ে আড্ডা দেব। প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। সেই রাতে তাঁর আতিথেয়তার কথা কোনওদিন ভুলব না।

পরদিন খুব ভোরে প্রচণ্ড ঠান্ডার ভেতরেই আমরা বিদায় নিলাম। কেননা কাজা থেকে সিমলাগামী বাস ধরার জন্য এখনও আমাদের ছ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। সিজলিংয়ে নামতেই মনে হল আমরা আবার অসুস্থ ছিলাম কবে! যাইহোক বাস ধরলাম। ওয়াংটুতে এক রাত থেকে পরদিন সিমলা। কালকা মেলের টিকিটও পাওয়া গেল পরদিনের।

সকালবেলা ছোট ট্রেনে যাত্রা হল শুরু। খুব একটা ভিড় ছিল না। আমাদের উল্টোদিকেই এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সপরিবারে সিমলা ভ্রমণ শেষে কলকাতায় ফিরছেন। ফলে মুহূর্তে আলাপ জমে উঠল। ফলে কে কোথায় থাকি, কী করি পর্বের পরেই প্রশ্ন হল আমরা কোথা থেকে আসছি। যেই শুনলেন পর্বতারোহণের কথা অমনই সোজা হয়ে বসলেন। আর আমাদের গায়ে তখনও অর্ধসমাপ্ত হলেও পর্বতারোহণের গন্ধ লেগে আছে বুঝতে পেরে উনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন।

আসলে উনিও খেলাধুলার জগতের লোক। কলকাতার কোনও এক মাঝারি মাপের ফুটবল ক্লাবের কর্মকর্তা। ফুটবল আর তাঁর খেলোয়াড়দের বিষয়ে অনেক কিছু জানলেও পর্বতারোহণ এবং পর্বতারোহীদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার যে একবারে শূন্য ছিল তা তাঁর প্রশ্নের ধরন দেখেই বুঝে গেলাম। আমি অবশ্য এই প্রশ্নোত্তর পর্বের গোড়াতেই ওঁকে সবিনয়ে জানিয়ে রাখলাম-দেখুন আমি কিন্তু পর্বতারোহী নই। গোলেমালে এদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর যা দেবার ওই আশিসই দেবে। যতদূর মনে পড়ছে সিমলা-কালকা ছোট ট্রেনে ১৩৩টা সুড়ঙ্গ পার হতে হয়। ভদ্রলোক এতদিন পরে

আশিসের মতো এক আস্ত পর্বতারোহীকে সামনে পেয়ে প্রায় সমসংখ্যক প্রশ্নবাণে ওকে ধরাশায়ী করবে বলে মনে হল ।

কারা পর্বতারোহণে যায়, কত বয়সে যায়, কখন যায়, হিমালয়ের কোথায় যায়, সেখানে কী কী করতে হয়, কী কী অসুবিধা সেখানে ভোগ করতে হয়, জামাকাপড় কী লাগে, বিশেষ যন্ত্রপাতি কী লাগে, সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়, তার কত দাম, আপনাদের ক্লাব কীভাবে চলে, ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে মূল পার্থক্য কী, সরকার থেকে কিছু সাহায্য পান কিনা, কী ধরনের বিপদ এই খেলায় আসে, শরীর ঠিক রাখার জন্য কী ধরনের ব্যায়াম এবং খাবারের প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি । ভদ্রলোক যেমন আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আশিস তার থেকেও বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকটার যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছে । আমার গর্বে বুকটা ভরে উঠছিল-পৃথিবীতে অন্তত একজন লোকও আমাদের পর্বতারোহীদের সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং তিনি আমাদের কথা শুনে যারপরনাই তৃপ্ত । আর কী চাই! আমরা পর্বতারোহীরা গরিব হতে পারি কিন্তু অন্য খেলাধুলার থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ঈর্ষণীয় ।

এতদূর হবার পর ভদ্রলোক আশিসকে আরেকটা অত্যন্ত নিরীহ প্রশ্ন করলেন-আচ্ছা আপনি সারাদিন সময়টা কাটান কীভাবে?

-কেন? সকালে ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটায় উঠে এক ঘণ্টা পাড়ার মাঠে জগিং করি, একটু ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করি । অফিসে যাই, বিকেলে সাঁতার কাটি, নয়তো যোগ ব্যায়াম করি । সন্ধ্যায় মাউন্টেনিয়ারিং, ট্রেকিং, রক -ক্লাইম্বিং-এর ওপর বইপত্র পড়ি । মঙ্গল আর শনিবার অফিসের পর ক্লাবে যাই । রাত নটার মধ্যে খেয়ে ১০টার মধ্যে ঘুম । রবিবার একটু অন্যরকম হয় ।

-রবিবার ছুটির দিন বাদে সব কটা দিন এইভাবে কঠিন নিয়মে কাটান? আশ্চর্য! আমি না যতই শুনছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি । আমাদের ফুটবলের ছেলেগুলো এর খানিকটাও যদি নিতে পারত, আজ বাংলার ফুটবল অন্য জায়গায় চলে যেত ।

ট্রেন দ্রুত নেমে যাচ্ছে স্বপ্নের হিমালয় ছেড়ে সমতলের দিকে । ট্রেন-পথে সবদিক থেকে এমন উপভোগ্য ভ্রমণ অনেকদিন করিনি । কিন্তু ঠিক এই সময় আশিস একটা কাণ্ড করে বসল । এবং সেটা এত নিঃশব্দে যে তখন তখন বুঝতেও পারলাম না ।

ও ভদ্রলোকের শেষ কথার উত্তরে আমতা আমতা করে বলল-আজ্ঞে না, সপ্তাহের সব কটা দিন মোটামুটি একই নিয়মে কাটালেও শুক্রবার বিকেলটা এর থেকে বাদ ।

ভদ্রলোকের দ্বিগুণ কৌতূহল । কেন, শুক্রবার বাদ কেন?

-ওইদিন আমি একটা সিনেমা দেখি ।

-সিনেমা? সে আর এমন কী কথা!

-না মানে, শুক্রবার কোনও না কোনও বই যখন রিলিজ করে তখন সেটা আমার দেখা চাই-ই ।

-সে তো দেখতেই পারেন । প্রথম দেখার একটা আলাদা মজা আছে ।

-না মানে, দরকার হলে ব্ল্যাকেও বেশি দামের টিকিট কেটে দেখি । সেদিন আমাকে যে করেই হোক সিনেমা দেখতেই হবে-বলে গুণমুগ্ধ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে হেঁ হেঁ করে দাঁত বার করে হাসতে লাগল ।

এইবার দেখলাম ভদ্রলোক হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন । আশিসের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন । ভদ্রলোকের মুখের জিওগ্রাফি দ্রুত পাল্টাতে দেখে আশিসেরও দাঁত বুজে এল । ভদ্রলোক এরপর সেই যে মাথা ঘুরিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে হিমালয়ের শোভা দেখতে লাগলেন, আশিসের সঙ্গে আর একটা কথাও বললেন না ।

বুঝতে না পেরে, অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে, উল্টোদিকে একটা সিট খালি হতেই আশিস উঠে গেল । আমি একা কুম্ভ পতনোন্মুখ দুর্গ রক্ষা করার জন্য হতভম্বের মতো বসে রইলাম । কালকা প্রায় পৌঁছে গেছি । মালপত্র ঠিক করার জন্য ভদ্রলোক মাথা ঘোরাতেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম-আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বললেন-আপনাদের সম্বন্ধে আমার একটা উঁচু ধারণা তৈরি হয়েছিল । আপনার বন্ধুর একটা কথা শুনে নিমেষে তা লোপও পেয়ে গেল ।

-কেন ও কী এমন বলল যাতে-।

-বলে কিনা, শুক্রবার সিনেমা দেখার জন্য, দরকার হলে, ব্ল্যাকেও টিকিট কাটেন উনি! এতবড় একটা খেলার খেলোয়াড় হয়ে-এত ভাবে নিজেকে তৈরি করার পরেও সামান্য একটা সিনেমা দেখার জন্য ব্ল্যাকে টিকিট কাটতে হয় ওঁকে! এইটুকু সংযম নেই! আর, তা যদি নাই থাকে, বৃথাই ওর নিজেকে খেলোয়াড় বলে দাবি করা । সংযম ছাড়া কোনও খেলোয়াড় খেলোয়াড় পদবাচ্যই নয় । আমার আর কিছু বলার নেই । বলেই তিনি ট্রেন থামতেই মালপত্র নিয়ে আমাদের আর কিছু না বলে সোজা হাঁটা দিলেন ।

একবার পর্বতারোহী বন্ধুরা মিলে ধরল, তুমি এমন একটা উপত্যকা আর শৃঙ্গের হদিশ দাও যেখানে আজ পর্যন্ত কেউ কখনও যায়নি । কেউ যেখানে যায়নি তার হদিশ কোনও পর্বতারোহী বা অভিযাত্রীর কাছ থেকে আর পাওয়ার উপায় থাকল না । ভরসা শুধুমাত্র মানচিত্র-অভিযাত্রীর তৃতীয় নয়ন । সেই তৃতীয় নয়নের ওপর নির্ভর করেই সেই ১৯৮৫ সালে সুপিন উপত্যকা ধরে থিমলোগা শৃঙ্গ অভিযানে আমরা বার হলাম ।

এই অভিযানের প্রথম থেকেই একটা অশুভ ছায়া আমাদের তাড়া করে ফিরছিল । কলকাতা থেকে দেরাদুনে আমরা সব সদস্য নানা কারণে একসঙ্গে পৌঁছতে পারলাম না । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেরাদুনের পর থেকেই রাস্তা এত খারাপ যে একদল আগে বেরিয়ে যাবার পর, পরের সদস্যদের বাস গেল উল্টে, যে পথে বাস যায় সে পথে সময় ও শক্তি আর পয়সা নষ্ট করে হেঁটে যেতে হল-এ সবই অবশ্য হিমালয়ের নিয়মের মধ্যেই পড়ে ।

অগ্রবর্তী দলের সদস্য হিসেবে দেরাদুন থেকে পুরোলা হয়ে মোরিতে পৌঁছে আমাদের পাঁচদিন অন্য সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল । এই ক'দিন অবশ্য বসে না থেকে মোরির আশপাশে যা কিছু দেখার ছিল সব দেখে ফেলেছিলাম । অনন্ত রূপরাশি নিয়ে হিমালয় এমন এক মহার্ঘ্য বস্তু, এত ঐশ্বর্যমণ্ডিত যে এ সহজে ফুরায় না । কোথা দিয়ে যে পাঁচদিন কেটে গেল বোঝাই গেল না । মোরির ধারে তন্বী তমসার দৃপ্ত গতির ভঙ্গিমা, তার দুপাশে অসংখ্য পাখি সহ পাইনের নির্জন বন, পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে আসা নির্ঝর ঝরনা-আর সবার ওপরে উদার নীল আকাশ নয়তো মেঘের ভয়াল ভ্রূকুটি-আমাদের পাঁচদিন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিল ।

সাকরিতে গিয়েই আমাদের প্রথম বড় ধাক্কা খেতে হল । যাকেই জিজ্ঞেস করি সুপিন উপত্যকার কথা, মানচিত্র থেকে উদ্ধার করা কয়েকটা গ্রামের কথা, সেই বলে-আরে উস তরফ জানে কা জরুরৎ ক্যা হ্যায় । মর জায়গা আপলোগ । জানা হ্যায় তো হর-কি-দুন যাইয়ে ।

শেষ পর্যন্ত এক লালাজিকে ধরে করে দুজন মালবাহক আর কয়েকটা খচ্চর পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল । খচ্চরওয়ালা যাবার দিন সকালে এসে বলল-ওর ভালো খচ্চরগুলো মোরি চলে গেছে মালপত্র আনতে । এখন আর কোনও ভালো খচ্চর নেই । আর ওরা পরশু ফিরলেও পরের গ্রাম জাখোলের পর আর যাবে না-কেননা খচ্চর যাবার মতো রাস্তা নেই । দুটো দিন নষ্ট হবার ভয়ে আমরা বললাম-তোমার কাছে যে খচ্চর আছে তাই দাও ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাই করল-একটু দেরিও হল সেগুলোকে সাজগোজ করাতে। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আমাদের গতকালের কথোপকথন-'মর জায়গা আপলোগ' এই সব কথা খচ্চরগুলো আড়ি পেতে শুনেছিল কিনা কে জানে! তারা কিছুতেই যাবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পরে তারা ব্যাজার মুখে একটু নড়েচড়ে ধীরলয়ে চলতে শুরু করল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু খচ্চরগুলো অতটা ভদ্রলোক ছিল না। সতেরো বছর আগে ব্রেক ড্যান্স কী তখনও জানতাম না। দেখা তো দূরস্থান। এতদিন পরে সেদিনের কথা ভাবলে মনে হয় খচ্চরগুলোর শিক্ষা-দীক্ষার যথেষ্ট অভাব থাকলেও ওই বিষয়ে তারা প্রত্যেকে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিল। দশ পা যেতে না যেতেই তারা সব কটা হাত পা ছুঁড়ে এমন নৃত্য শুরু করে দিল যে আমরা সবাই এক লাফে খচ্চরওয়ালার পিছনে লুকোলাম। একটু পরে দেখি আমাদের সযত্নে প্যাক করা জিনিসপত্র চতুর্দিকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় আর পাহাড়ের ঢালে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর খচ্চরগুলো এমন গা-জ্বলুনি স্টাইলে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি।

পরদিন অবশ্য কুলির পিঠে মাল পৌঁছে গেল জাখোলে। সেখান থেকে খচ্চর বা কুলি না পেয়ে স্থানীয় স্কুলের বেশ কিছু জোয়ান ছেলে আমাদের মাল নিয়ে চলল পরবর্তী গ্রাম লেওয়ারির দিকে। পথে পড়ল ফিতারি গ্রাম। সেখানকার লোকেদের কী কৌতূহল! কোনওদিন শহরের লোকজন দেখেনি। আমাদের কথা শোনার পর ওদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে হল। সুখের কথা প্রায় হলই না। নানা দুঃখের গল্পমালার এক দুঃখের নায়ক একটি বাচ্চা ছেলে। বছর পাঁচ-ছয় বয়স হবে। কবে পড়ে গিয়ে মাথায় একটু কেটে গিয়েছিল। সেটা পেকে পুঁজ জমে এক মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাকানো যাচ্ছে না। বাচ্চাটা নির্বিকার। আমাদের সময়ের টানাটানি ছিল। তবু এই বাচ্চাটার কষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব না করলে ভগবান আমাদের ক্ষমা করতেন না। তাই ডাক্তার অঞ্জন প্রয়োজনমতো চুল কেটে, গরম জল করে ভালো করে ধুয়ে, ওষুধ গজ দিয়ে জায়গাটা মেরামত করে দিয়েছিল। ফেরার সময় দেখেছিলাম মাথাটা একেবারে পরিষ্কার। কে বলবে এইখানে একটা মারাত্মক ক্ষত ছিল! এত ভালো লাগছিল! এই অভিযানে আমাদের কার কী উপকার হয়েছিল জানি না, কে কী জয় করেছে তাও জানি না। কিন্তু বাচ্চাটা, তার পরিজন এবং সেই সঙ্গে গ্রামের সমস্ত লোকজনের মন যে আমরা জয় করেছিলাম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শেষ গ্রাম লেওয়ারি পৌঁছে পরদিন সকালে দেখলাম গ্রামের এক কর্মব্যস্ত রূপ। এই কর্মযজ্ঞের আসল কারিগর অবশ্য সবই মেয়েরা। কেউ ছাগল ভেড়া গরুর জন্য ঘাসপাতা কেটে আনছে, কেউ ঝরনা থেকে খাবার জল নিয়ে আসছে, কেউবা জ্বালানির শুকনো ডালপালার বোঝা নিয়ে আসছে। সবই দড়ি বেঁধে আনা। দড়ি বোঝার একদিক থেকে

এসে কপাল ছুঁয়ে বোঝার অন্যপ্রান্তে মিলিত হয়েছে । পাহাড়ি মেয়েদের এই কপালটাই সব থেকে খারাপ । ছেলেরা যখন রোদে আরাম করে বসে তামাক সেবন করছে, মেয়েরা তখন এই কপালগুণেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে । অনন্তকাল বোধহয় এই ভাবেই কাটাতে হবে ওদের । সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলেই মোটামুটি এই একই চিত্র । সর্বংসহা এই নারীকুলের অবস্থা ফেরানোর কোনও পথই বোধহয় খোলা নেই ।

লেওয়ারি থেকে দুদিন হাঁটার পর সুপিন উপত্যকার শেষ প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেলাম । ঘাসে ছাওয়া মোটামুটি এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র । উচ্চতা চার হাজার মিটারের সামান্য কম । এখানেই মূল শিবির পড়ল ।

সবাই যখন মূল অভিযানে অংশ নিতে আরও দুর্গম, পার্বত্য, হিমবাহ অঞ্চলে উঠে যেত, আমি তখন সারাদিন একা একা এই শিবির সামলাতাম । সন্ধের আগেই অবশ্য ডাক্তার অঞ্জন এবং আরেকজন মালবাহক মূল শিবিরে ফিরে আসত । সঙ্গে ওপরের অভিযানের অগ্রগতির সংবাদ আর এখান থেকে পরদিন কী কী জিনিস ওপরে লাগবে তার একটা ফর্দ । আমি সেটা গুছিয়ে মালবাহককে দিতাম । পরদিন খুব সকালে ও আর ডাক্তার আবার চলে যেত ওপরের শিবিরে । আমি আবার একা । দুদিকে গগনচুম্বী গিরিশিরা, মধ্যে এই প্রশস্ত প্রায় সমতল জমি, যার মধ্য দিয়ে সুপিনের বহুধাবিভক্ত ধারা মেয়েদের চুলের বিনুনির মতো এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে । জলের গভীরতা খুবই কম । এক হাঁটুও হবে না । কিন্তু অসম্ভব ঠান্ডা । হিমবাহের মুখ এখান থেকে খুবই কাছে । ওই হিমবাহের পিছনে দেখা যেত এক শ্বেতশুভ্র উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ । এই বরফের রাজ্য নানা সময়ে, কখনও কুয়াশায়, কখনও মেঘের আড়ালে, কখনও বা ভোরের নরম আলোয়, কখনও মধ্যাহ্নের তীব্র রোদে অথবা কখনও চাঁদের মোহিনী আলোয় নানা রূপ ধারণ করত । সব মিলিয়ে এই প্রত্যন্ত প্রদেশে, অসম্ভব প্রাণবন্ত অথচ প্রশান্ত নির্জন পরিবেশে, সারাদিন প্রায় একা থাকার ফলে এই অনুপম প্রকৃতির পবিত্র প্রসন্নতা প্রতি পলে প্রবাহিত হত আমার মনের গভীরে ।

একদিন অঞ্জন সকালে আর ওপরে গেল না । দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বলল-চলুন একটু ঘুরে আসি । আমাদের শিবিরের উত্তরে যে পাহাড়ের ঢাল, আমরা তাই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম । যত ওপরে উঠছি ঠান্ডা হাওয়ার তীব্রতা তত বাড়ছে । তাঁবু নিয়ে নিচে পুরো অঞ্চলটা আমাদের চোখের সামনে খুলে গেল । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাজারও ফুলের মেলা । যত ওপরে যাচ্ছি ততই ফুলের পরিমাণ কমে আসছিল । ডাক্তার বরফের রাজ্যে যেতে চাইছে । আমি তাই নিচে যেদিকে ফুল বেশি সেদিকেই চললাম । এ যেন আরেক ‘ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স’-অল্প ঘাসের সঙ্গে শুধু ছোট ছোট হাঁটু সমান ফুলের গাছ । আমার

মনে আছে একটা পাথরের ওপর বসে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে আমার হাতের নাগালের মধ্যে আমি পনেরো-ষোল রকমের ফুল দেখেছিলাম । আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ফুলের মেলায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি । এমন সময় দেখি একটু দূরে একটা ছোট্ট ঝোপের ওপর কম করে পঞ্চাশ-ষাটটা হাল্কা আকাশি রঙের মাঝারি মাপের অদ্ভূত আকারের ফুল ধরে আছে । এতক্ষণ ধরে যে ফুল দেখেছি তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা । আমি সেই ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলাম । হাত বাড়িয়ে যেই একটা ফুল ছুঁতে গেছি, তখনই এই অনন্যা প্রকৃতির এক আশ্চর্য কবিতা রচিত হল । আমাকে অবাক করে দিয়ে সেই আকাশী ফুলগুলো, যা আসলে প্রজাপতি ছিল, নিঃশব্দে হাসতে হাসতে উড়ে গেল । মনে হল যেন অনেক ফুলের পাপড়ি এক সঙ্গে ডানা মেলে দিয়েছে । আমি বিস্ময়ে হতবাক । একটা ঘোরের মধ্যে তাঁবুতে ফিরে এলাম ।

এরপর একদিন অভিযান শেষ হল । আমরা ফিরে এলাম লেওয়ারি হয়ে জাখোল । তার পরদিন বত্রিশ কিলোমিটার পথ একদিনে পার হয়ে নেমে আসতে হবে মোরি । দুপুরে নাইটওয়ারের এক হোটেলে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্ত পায়ে মোরির রাস্তায় হাঁটছিলাম । পাশে পাশে তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে যৌবনমদমত্তা তন্বী তমসা । অন্য পারে শুধু ঘন পাইনের শনশনানি । বিকেলের রোদে কোনও তেজ নেই । যেখানেই ভালো লাগছে সেখানেই পাথরের ওপর বসে পড়ছি । তমসার প্রবহমান স্রোতের দিকে চেয়ে কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছিলাম । আজ যেন অনেকদিন পরে ছুটি পেয়েছি । কোনও দুশ্চিন্তা নেই । উদ্বেগ নেই । ঠিক সময়ে পৌঁছনোর তাড়া নেই । জেতাও নেই । নদীর স্রোতে খড়কুটো যেমন লক্ষ্যহীন ভাবে ভেসে যায়-মাঝে-মধ্যে পাথরে গাছে আটকে গিয়ে একটু থিতু হয়, আবার একটু বাদে জলের তোড়ে আপন মনে ভেসে চলে-আমাদের চলার ধরনটাও ছিল প্রায় সেইরকম । এ যেন, ঘর ছাড়া পথিকের সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে অনন্তের পানে নিশ্চিন্ত ভ্রমণ । এর শুরু হয়তো আছে, শেষ নেই ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

স্বপ্নের পথেই যাওয়া যায়

মহাশ্বেতা দেবী

হয়তো স্বপ্ন, হয়তো স্মৃতি । কিন্তু এ হল সত্যি ভ্রমণ-কথা । আজকের কথা নয়গো । ষাট-বাষট্টি বছর আগে থেকেই শুরু করি । ১৯৩৮-এর শেষে বাবা যদিবা কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন, তখনও আমরা কলকাতায় দুর্গাপুজো কখনও দেখিনি । কারণটা কি, বলতে পারো?

পুজো মানেই তো দেশের বাড়ির পুজো । আমার বাবার এমন ভাগ্যি, যে মামাবাড়িও আমাদেরই গ্রামে । এই যে ভ্রমণের কথা লিখছি, তার কারণ আছে ।

তখন জীবনের ছন্দ ছিল অন্য রকম । আজকালকার দিন নয় যে ঝপাঝপ ব্যাগ কাঁধে ঝোলালাম, আর ট্রেনে-প্লেনে-বাসে চেপে রওনা দিলাম । কিংবা প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরে এলাম ভারতের যে-কোনও প্রান্ত থেকে । রবিবার ফিরলাম, সোমবার অফিসে দৌড়লাম । এখন দূরত্ব কমে গেছে, বৈচিত্র্যের রোমাঞ্চ হয়তো তেমন নেই ।

তখন বাঙালি বেড়াতে হলে হাজারিবাগ, রাঁচি, দেওঘর, মধুপুর যেত । তীর্থ করতে হলে তীর্থস্থানে যেত । দিল্লি-আগ্রা-এলাহাবাদ? সে ছিল পশ্চিমে যাওয়া ।

অথচ ট্রেন-স্টিমার যাত্রা ছিল নিরাপদ । ট্রেনে ছিল প্রথম শ্রেণী (সঙ্গে ভৃত্যদের কামরা), দ্বিতীয় শ্রেণী, ইন্টার ক্লাস এবং থার্ড ক্লাস । সব রকম আর্থিক অবস্থার লোকই যেতে পারত । প্ল্যাটফর্মে হিন্দু চা, মুসলমান চা বিক্রি হত । এ নিয়ে কোনও দাঙ্গা ছিল না । পানি পাঁড়েরা তৃষ্ণার্ত যাত্রীদের জল দিয়ে যেত । জীবনে নিরাপত্তা ছিল ।

ধীর, মন্থর গতিতে চলতাম । পুজোর সময়ে দেশের বাড়ি যাব, সে তো জানা কথা । তখন কি কি সঙ্গে যেতই যেত, তা বলি । জামাকাপড় বোঝাই হত বড় বড় লোহার ট্রাঙ্কে, তাতে তালা ঝুলত । বিছানা বাঁধা হত বড় বড় হোলডল-এ । লেপ, তোশক, চাদর, মশারি, বালিশ সব ঠেসে সেটি গোল করে গুটিয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা হত । একটি ছোট হোলডলে বাচ্চাদের বিছানা যেত, ট্রেনে তো শোবে! সঙ্গে কুঁজো আর গ্লাস । টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই খাবার । এগুলো থাকবেই । আর থাকত তালপাতার হাতপাখা, মায়ের পানের ডিবে ইত্যাদি ।

কলকাতা থেকে যাব নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে। গ্রামটি ঢাকা-পাবনার সীমান্তে। সন্ধ্যারাতে তিন-চারটে ঘোড়ার গাড়ি চেপে শিয়ালদা স্টেশন। তারপর চাপো ঢাকা মেলে। সারারাত ট্রেনে কাটল। ভোরে নামলাম গোয়ালন্দ স্টেশনে। তারপর গিয়ে উঠলাম স্টিমারে। স্টিমারে ফার্স্ট ক্লাস, যেন আশ্চর্য ভালো। তাছাড়া ফার্স্ট বা সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীরা চাইলে শতরঞ্চি পেতে খোলা ডেকে বসতে পারত। ওপরটা ঝকঝকে পরিষ্কার। একতলাটি থার্ড ক্লাস যাত্রীতে বোঝাই। ডেকে বসে বা দাঁড়িয়ে আমরা পদ্মা নদীর বুক দিয়ে চলতাম। পাবনা জেলার দিকের অংশে নদীর নাম যমুনা।

মাঝে মাঝে স্টিমার স্টেশন আসত। একটা ছাউনি দেওয়া কাঠের শক্ত পাটাতন বেয়ে মানুষ পাড়ে উঠত। আর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বাঁশের ওপর খাঁচা বসিয়ে মানুষ পাতক্ষীর ও রসগোল্লা বেচত। কলাপাতায় ঢালা সুমিষ্ট ঘন ক্ষীর, গড়িয়ে পড়ে যেত না। পাতক্ষীর আর রসগোল্লা দিয়ে প্রাতরাশ সারা, সে যে কি স্বর্গীয় ব্যাপার, কি বলি!

নদীই কি কম রহস্যময় ছিল? বর্ষায় নদীর বুক এত চওড়া যে ওপার দেখা যায় না। এ পারেই দেখতাম ঝপাস ঝপাস করে জমি, কুটির, খেত ভেঙে পড়ছে জলে। নগরবাড়ি, আর্চিয়া, নটাখোলা, তারানগর, এমনই সব স্টিমার স্টেশনের নাম।

একবার ভারত বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়, স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে ডেকে সহযাত্রী ছিলেন। আর্চিয়া নেমে নৌকাপথে দেশে যাবেন।

তারানগর-দেওয়ানজি বাড়ি ভেঙে ভেঙে নদীতে পড়তে দেখেছি। মায়ের মাতামহ, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কোচবিহারে জজ-দেওয়ান ছিলেন। ইনিই পৈতৃক গ্রাম তারানগরে বিশাল একতলা ইটের বাংলোবাড়ি করেন। পদ্মাপাড়ে অতি বড় ধনীও ইটের বাড়ি করত না। মাটির বাড়ি, টিনের চালা। ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিলেই দরজা-জানলা-টিনের চালা কেটে নিয়ে গরু-বাছুর-পরিবার, সব নিয়ে মানুষ নদী থেকে অনেক ভেতরে গিয়ে নতুন গ্রাম গড়ে তুলত।

যেমন আমাদের গ্রাম নতুন ভারেঙ্গা। কবে ছিল দৌলতপুর-ভারেঙ্গা, কবে ছিল ধুলজানা-ভারেঙ্গা, তারপর পুরনো ভারেঙ্গা যা ১৯১৫ সালে নদীগর্ভে চলে যায়। তারপর আমার চেনা নতুন ভারেঙ্গা। নতুন ভারেঙ্গা স্টিমার স্টেশনে নামতাম। তারপর সোনাপদ্মার খালে নৌকায় চাপতাম। অনেকটা পথ দিয়ে তবে গ্রামে পৌঁছতাম। বারো থেকে ষোলো ঘণ্টা তো লাগত।

আর আমার মেজোমামা, বাংলাদেশ হবার পরে ঢাকা গেলেন। ফিরে এসে বললেন, খানিক স্টিমার, বাকিটা চমৎকার রাস্তা, গাড়িতে গেলাম। ঢাকায় ব্রেকফাস্ট খেলাম।

নতুন ভারেঙ্গা দেখে এসে স্টিমারে লাঞ্চ খেলাম।

অর্থাৎ, এখন পথঘাট-যোগাযোগ-পরিবহন, সব কিছুতে দ্রুতগতির যুগ।

না, দীর্ঘ সময় ধরে পথ চলার দুলকি চাল আর নেই। না থাকারই কথা। তবু যখন ভাবি, কতটা সময় ধরে পথ চলার আনন্দ উপভোগ করতে করতে যেতাম, সেও তো চমৎকার ছিল।

তবে তেমন ধীরছন্দে নতুন ভারেঙ্গা যেতে হলে স্বপ্নের পথেই যাওয়া যায়, তাই না?

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

.ছাট কৈলাস

সুভাষ দত্ত

তিব্বতের মূল কৈলাস ছাড়া আর যেসব কৈলাস রয়েছে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা করা যায় তাদের পুরো নাম থেকে, যেমন মণিমহেশ কৈলাস বা কিন্নর কৈলাস । ছোটা কৈলাস কিন্তু শুধুই ছোটা কৈলাস । অবশ্য কোথাও কোথাও একে 'আদি কৈলাস' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ।

ছোটা কৈলাস সবদিক দিয়েই অনন্য, একথা যাঁরা বড় ও ছোট দুই কৈলাসই দেখেছেন তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করেন । যদিও ছোটা কৈলাস ও মূল কৈলাস পিকের আকৃতিতে সাদৃশ্য প্রায় ৮০ শতাংশ । সরোবর না থাকলেও এখানে পার্বতীকুণ্ড বলে একটি চমৎকার কুণ্ড আছে । এবং সরকারি কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রা মার্গই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ছোটা কৈলাস পৌঁছতে হলে ।

দুভাবে যেতে পারেন ছোটা কৈলাস-নিজেদের উদ্যোগে অথবা কে এম ভি এন-এর ব্যবস্থাপনায় । যাবার সময় জুন থেকে অক্টোবর । আমরা গিয়েছিলাম ১৯৯৫-এর আগস্টে । প্রতিবছর কে এম ভি এন ছোটা কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকটি কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা করে । এবছরের রেট ছিল সাত হাজার টাকা মাথাপিছু । এ ব্যাপারে বিশদ জানতে লিখুন: Kumaon Mandal Vikass Nigam Ltd., Secretariat Building, Nainital-263 001. ভারত, চিন ও নেপাল, তিনটি দেশের সীমান্ত মিশেছে এখানে । স্পর্শকাতর এলাকা । অনুমতিপত্র ছাড়া প্রবেশ নিষেধ । যাঁরা নিজেরা যাবেন তাঁরা অনুমতিপত্রের জন্য লিখুন পিথোরাগড়ের জেলাশাসককে, লিখতে পারেন ধারচুলায় সহকারী জেলাশাসককেও । পথ ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশনের দিল্লির ঠিকানায় লিখুন । এছাড়া ছবি তোলার অনুমতির জন্য লিখতে পারেন মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সে । ১৯৯৬-তে নির্দিষ্ট সময়ে যেতে চাইলে এখন থেকেই লেখালেখি শুরু করা দরকার । নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র ও ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় ট্রেকিং করতে সক্ষম এরকম সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখবেন ।

ত্রিশ জুলাই রাত নটায় যখন ধারচুলায় এসে পৌঁছলাম তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে । ধারচুলায় বেশ কয়েকটা মাঝারি ধরনের হোটেল আছে । তারই একটায় ওঠা হল ।

একত্রিশ তারিখ সোমবার কাটল ধারচুলার এ ডি এম-এর অফিসে আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতে । পদযাত্রার জন্য অন্তত বারো দিন হাতে রাখুন ও দরকারি খাদ্যদ্রব্য, কেরোসিন ইত্যাদি অবশ্যই সংগ্রহ করুন ধারচুলা বা তার আগে থেকে । পথের ছোট ছোট গ্রামগুলোতে কোনও কিছু পাবার সম্ভাবনা একেবারেই অনিশ্চিত । আমরা বিশেষ কিছু পাইনি । কে এম ভি এন-এর সঙ্গে যাঁরা যাবেন তাঁদের ক্ষেত্রে এসব অবশ্য প্রযোজ্য নয় । তাঁদের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থা ওঁরাই করবেন ।

হাঁটাপথ শুরু হচ্ছে পাঙ্গু (উচ্চতা ৭,৩৮২ ফুট) থেকে । ধারচুলা থেকে পাঙ্গু পর্যন্ত বাস চলছে তাওয়াঘাট হয়ে । বাস চলাচল অবশ্য রাস্তার অবস্থার ওপর নির্ভর করে । আমরা পাঙ্গু পৌঁছনোর পরদিনই তাওয়াঘাটের কাছে ধস নেমে বাস বন্ধ হয়ে যায় । কে এম ভি এন-এর যাত্রীরা অবশ্য হাঁটবেন বা খচ্চরের পিঠে চাপবেন তাওয়াঘাট থেকেই । পুরো পথটাতে মালবহনকারী খচ্চর ছাড়া চড়বার জন্যও খচ্চর পাবেন । কে এম ভি এন-এর বেশিরভাগ যাত্রীই খচ্চরের পিঠে যান কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রীদের মতো । আমার মতে, একেবারে অসম্ভব হয়ে না পড়লে হেঁটে যাওয়াই ভালো । পথের যা অবস্থা তাতে খচ্চরের পিঠে চাপলে সুবিধার থেকে অসুবিধাই বেশি । তীব্র চড়াই-উতরাই পেরোতে হবে পায়ে হেঁটেই-এ সম্পর্কিত সাবধানবাণী মাঝে-মাঝেই চোখে পড়বে । এক ঘণ্টার রাস্তায় কে এম ভি এন যাত্রী পাঁচবার খচ্চরে উঠছেন আর নামছেন এরকমও দেখেছি । ফলে হেঁটে গেলেও প্রায় একই সময়ে পৌঁছবেন ।

১ আগস্ট প্রবল বৃষ্টির মধ্যে পাঙ্গু পৌঁছে খচ্চর ও পোর্টার ঠিক করতেই সেই দিনটা গেল । রাস্তার ওপর দিয়ে তোড়ে জল বইছে । ঝরনাগুলোর চেহারাও অত্যন্ত বিপজ্জনক । পাঙ্গুতে গ্রাম সমিতির একটা ঘর আছে । এখানে থাকতে পারেন । চলে আসার আগে ঘর পরিষ্কার করার জন্য কিছু দিতে হবে । কে এম ভি এন যাত্রীরা থাকবেন কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রা ক্যাম্পে ।

পরদিন সকালে আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি হল । খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল সিরখার উদ্দেশে । রাস্তা মাত্র নয় কিলোমিটার । লোক নির্মাণ বিভাগ, আস্কোটের এই কিলোমিটার হিসাব আগাগোড়াই পাবেন । এদের হিসাব অনুযায়ী পাঙ্গু-ছোটা কৈলাস-পাঙ্গু দূরত্ব হচ্ছে মোট দুশো কিলোমিটার । হাঁটার সময় মাঝে-মধ্যে অবশ্য এই হিসাবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ।

দুভাবে যেতে পারেন সিরখায় । সরাসরি অথবা তিন কিলোমিটার বেশি হেঁটে নারায়ণ আশ্রম দেখে । সরাসরি সিরখা যাবার রাস্তায় যথেষ্ট চড়াই, নারায়ণ আশ্রম হয়ে গেলে অনেকটা কম । আশ্রমটি দেখার মতো । এই অঞ্চলে অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজের

সঙ্গে এঁরা জড়িত। আশ্রমের ফুলের শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবে। পরিচিতি হোন গঙ্গোত্রী মাতাজি ও অন্যান্যদের সঙ্গে।

নারায়ণ আশ্রম দেখে সিরখা পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল। সিরখা (উচ্চতা ৮,০০০ ফুট) বেশ বড় গ্রাম। থাকবার জায়গার কোনও অভাব হবে না। বস্তুত পুরো রুটেই গ্রামে কোথাও না কোথাও থাকবার জায়গা পাবেন অত্যন্ত সামান্য মূল্যে। একমাত্র ছোটা কৈলাস ও জোলিংকং ছাড়া। এখানে কোনও গ্রাম নেই। কে এম ভি এন-এর যাত্রীরা সর্বত্রই থাকবেন যাত্রা ক্যাম্পে।

পরদিন ৩ আগস্ট সিরখা থেকে গালার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতেই বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে ১০,০০০ ফুট উঁচু রুলিং টপে পৌঁছতেই অনেক সময় লেগে গেল। চারপাশে অবিকল যেন ট্রপিকাল রেন ফরেস্ট। বৃষ্টি যখন হচ্ছে না তখনও টুপটাপ জল পড়েই যাচ্ছে গাছ থেকে। কুমায়ুনের অন্যান্য কিছু জায়গার মতো জোঁক অবশ্য এখানে চোখে পড়ল না। রুলিং টপ থেকে নামার পথে এক জায়গায় রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে। একটি রাস্তা গেছে পুল পেরিয়ে গালার দিকে। আরেকটি নিচে নেমে গেছে সিমখোলার দিকে। আমরা সেদিন সিমখোলাতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুটি নালার মধ্যবর্তী স্থানে এই সিমখোলা। আবহাওয়া ভালো থাকলে এখান থেকে স্নো-পিক দেখতে পাবেন।

গালা পেরিয়ে মালপায় চলে এলাম পরদিন। এই রাস্তাটা একটু অন্যরকম বলা যেতে পারে। অন্তত পাঁচ কিলোমিটার লম্বা ও এক থেকে দুফুট চওড়া রাস্তায় পাবেন ডানদিকে গভীর গর্জের মধ্যে নদীর কানে তালা ধরানো আওয়াজ সহ স্প্রে এবং পাবেন জল। জল বইছে রাস্তার ওপর দিয়ে, নামছে পাহাড় বেয়ে-ফোঁটায় ফোঁটায় ও ঝরনার আকারে। ঝরনার জল সরাসরি এসে পড়বে আপনার মাথায়, ফলে আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। খচ্চরের পিঠের জিনিসপত্র বাঁচানোর জন্য প্লাস্টিক শিটে যথাসাধ্য মুড়ে দিন। পিচ্ছিল পথে চলার সময়ও সতর্ক থাকুন। ফেরার পথে এখানে আমার একটি লেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫ আগস্ট শনিবার মাত্র ৯ কিলোমিটার হেঁটে মালপা থেকে বুধি (উচ্চতা ৯,০০০ ফুট) পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। এখান থেকে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গ্লেসিয়ার দেখতে পাবেন। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় বুধি ছাড়াতেই পড়ল ছিয়ালেক টপের চড়াই। কষ্টকর ২ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে ১০,৯৯০ ফুট উঁচু ছিয়ালেক টপে পৌঁছতে দশটা বেজে গেল। ছিয়ালেক টপ যেন এক বিস্তৃত সমতলভূমি। সবুজ ঘাস আর ফুলে ঢাকা এক অপূর্ব জায়গা। অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে সর্বত্র। এখানে ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ক্যাম্পে দেখান আপনার অনুমতিপত্র। এখানে আমাদের একজন সামান্য অসুস্থ বোধ

করায় আমরা আর বেশি না এগিয়ে কিছুটা নেমে গারবিয়াংয়ে রাতের মতো আশ্রয় নিলাম ।

গারবিয়াং (উচ্চতা ১০,৩৩৫ ফুট) প্রায় পরিত্যক্ত এক জনপদ । ল্যান্ডস্লাইডে গ্রামের বেশিটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত । অথচ চিনের তিব্বত অধিকারের আগে গ্রামটি এই অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল । আসবার সময় যাঁরা নারায়ণ আশ্রম হয়ে আসবেন তাঁরা গঙ্গোত্রী মাতাজির মুখে গারবিয়াংয়ের পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন । সামান্য কিছু মানুষ এখনও বাস করছেন এখানে । সঙ্গে তাঁবু না থাকলে এখানে থাকবার অসুবিধা হতে পারে । সুতরাং সকালে যাঁরা বুধি থেকে বেরবেন তাঁরা ১৭ কিলোমিটার দূরে গুঞ্জি চলে গিয়ে সেখানেই থাকুন ।

গারবিয়াং থেকে আমরা ৭ আগস্ট পৌঁছলাম গুঞ্জি পেরিয়ে নাভিতে । গুঞ্জি (উচ্চতা ১১,৪৮৩ ফুট) বেশ বড় জায়গা । এখান থেকেই আলাদা হচ্ছে বড় ও ছোট কৈলাসের পথ । কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রীরা যাচ্ছে নাভিডাং হয়ে লিপুলেখ পাসের দিকে আর ছোটা কৈলাস যাত্রীরা এই রুটেই শেষ গ্রাম কুটির দিকে । গুঞ্জিতে আবার আপনাকে অনুমতিপত্র দেখাতে হবে । যদি নাভিডাং যাবার অনুমতি জোগাড় করতে পারেন তাহলে ফেরার পথে সেখান থেকে ওঁ পর্বত দেখতে পারেন ।

গুঞ্জি থেকে আরও ১৭ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চলুন কুটিতে । ৮ আগস্ট আমরা কুটির উদ্দেশে রওনা হতেই শুরু হল বৃষ্টি । একনাগাড়ে প্রায় সমস্ত দিন চলল । বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে ছোট-বড় পাথর । দুপুরের একটু পরে আই টি বি পি-র তিনজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হল, গুঞ্জিতে যাচ্ছেন ওঁরা । ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বলে সম্ভাষণ বিনিময়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজনের মাথায় মাঝারি এক টুকরো পাথর গড়িয়ে পড়ল ও তিনি তখনই ঘটনাস্থলে মারা গেলেন । বাকি দুজন মৃতদেহের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত না করেই ছুটতে শুরু করলেন । একেবারে মুখোমুখি এই ঘটনা ঘটায় আমাদের একজন অসুস্থও হয়ে পড়লেন । কুটি পৌঁছে আমরাই এই খবর জানাই । পরে জানতে পেরেছি মৃত ব্যক্তি লখনউয়ের বাসিন্দা ছিলেন ও ওয়ারলেস অপারেটরের কাজ করতেন ।

কুটির অবস্থান এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের চেয়ে একেবারে অন্যরকম । তুষারশৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা এক সুদৃশ্য উপত্যকায় কুটি । উচ্চতা ১২,০০০ ফুট । এটিই এই রুটের শেষ গ্রাম । এখান থেকে দেখুন কুন্তী পর্বত ও অন্যান্য শৃঙ্গ । দেখুন ‘পাণ্ডবদের’ খণ্ডহর । দেখুন তিব্বতে যাবার প্রাচীন পথ । পরিচিত হোন স্থানীয় মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে । গ্রামে ঢোকবার ২ কিলোমিটার আগেই দেখবেন ‘ওয়েলকাম টু কুটি’ লেখা সুসজ্জিত তোরণ । আশ্রয় নিন শান্তি কুটিয়াল বা শান্তি কাকির পরিচালিত অতিথিশালায় । কুটি থেকে আরও

এগিয়ে যেতে হলে এই শান্তি কাকির সইয়ের দরকার হবে আপনার । এবং অবশ্যই যোগাযোগ করুন আই টি বি পি-র সুবেদার শ্রীবিজয় সিং যাদবের সঙ্গে । এরকম সহৃদয় ও পরোপকারী মানুষ বিরল । অবশ্য সর্বত্রই আই টি বি পি-র লোকেরা আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন । শ্রীযাদব আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন । আমাদের দলের সবার জন্য পর্যাপ্ত টেন্ট না থাকায় ওঁর পরামর্শে আমরা ৯ আগস্ট কুটিতেই থেকে গেলাম । উনি জোলিংকংয়ে আই টি বি পি-র একটি স্থায়ী টেন্ট পরদিন আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন ।

১০ আগস্ট বৃহস্পতিবার ষোল কিলোমিটার কষ্টকর চড়াই ও উতরাই পেরিয়ে পৌঁছনো গেল জোলিংকংয়ে । কুটির কাছে একটি ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় চার কিলোমিটার রাস্তা বাড়তি হাঁটতে হল । পি ডাব্লু ডি-র তাঁবু দুজায়গায় চোখে পড়লেও ব্রিজ সারাবার কোনও উদ্যোগ দেখতে পেলাম না । জোলিংকংয়ের উচ্চতা ১৫,০০০ ফুট । আই টি বি পি এবং কে এম ভি এন ক্যাম্প ছাড়া জনবসতি নেই । এখানে পানীয় জলের অভাব আছে । গ্লেসিয়ার গলে আসা জল পানের উপযুক্ত নয় । একটিমাত্র পানীয় জলের উৎস রয়েছে আই টি বি পি ক্যাম্প থেকে অনেকটা নিচে । আই টি বি পি-র লোকেরা নানাভাবে সাহায্য করলেন আমাদের । একটি অ্যালুমিনিয়াম টেন্ট পরিষ্কার করে দিলেন আমাদের রাত্রিবাসের জন্য । ক্যাম্প থেকে চা করে নিয়ে এসে খাইয়ে গেলেন । শুকনো পেঁয়াজ ও রাজমাও পাওয়া গেল ওঁদের থেকে । বিনিময়ে চেয়েছেন শুধু ছবি তোলার জন্য নেগেটিভ ফিল্ম, ন্যায্য মূল্যেই-যা ওঁদের কাছে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ।

মেঘ না থাকলে মনে হবে যেন জোলিংকং থেকেই ছুঁতে পারছেন ছোটা কৈলাসকে । সত্যি সত্যি ছোঁয়ার জন্য পরদিন সকালে তিন কিলোমিটার হেঁটে আরও কাছে চলুন । পরিক্রমাও করতে পারেন । এরপর চলুন পার্বতীকুণ্ডে । জোলিংকং থেকে তিন কিলোমিটার দূরে এই কুণ্ড । নামে কুণ্ড হলেও আকার মাঝারি ধরনের । উচ্চতা নিয়ে মতভেদ আছে-আমার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ১৫,৫৬০ ফুট । আশপাশের শৃঙ্গগুলির, বিশেষ করে ছোটা কৈলাসের প্রতিফলন দেখতে পারেন । আই টি বি পি-র লোকেরা ছোট একটা মন্দির করেছেন কুণ্ডের একপাশে, একজন পূজারীও আছেন ।

সব দেখা দুপুরের আগেই শেষ করতে পারলে ফিরতে পারেন কুটিতে । অথবা আরেক রাত জোলিংকংয়ে থেকে পরদিন সকালে ফিরুন ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

পিথোরাগড়ের জেলাশাসক প্রতিবছর খচ্চর ও পোর্টারের রেট ঠিক করে দেন-এব্যাপারে ধারচুলায় খোঁজ নিন । জ্বালানি হিসাবে কেরোসিন ব্যবহার করাই শ্রেয় । ডালপালা নিজেরা জোগাড় করতে পারলে ভালো । গ্রাম থেকে কিনতে চাইলে চড়া দাম দিতে হতে পারে । দরকারি ওষুধপত্র সঙ্গে রাখুন, কোনও গ্রামেই চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগও পাবেন না । বিশেষ প্রয়োজনে আই টি বি পি কিংবা কে এম ভি এন ক্যাম্পে যোগাযোগ করতে পারেন । পথে মাঝে মধ্যে চায়ের দোকানে চাবিটা ছাড়া তৈরি ম্যাগি নুডলস পাবেন দশ টাকায় । জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর বৃষ্টি পাবেন স্বাভাবিকভাবেই, সেইসঙ্গে ধস । তবে রাস্তা সারাবার কাজ চলছে সবসময়ই । চেষ্টা করুন সকাল ছটায় বেরিয়ে দুপুরের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাবার । জুলাই-আগস্টে খুব বেশি শীতের পোশাকের দরকার হবে না । রাস্তায় বরফও থাকে না এ সময়ে ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ১৯৯৬

বালতাল হয়ে অমরনাথ

প্রতাপকুমার রায়

অমরনাথের চিরাচরিত পথ এখনও কষ্টসাধ্য, কিন্তু সে পথে যাত্রীসাধারণের জন্য আয়োজনের ত্রুটি নেই । শুনেছি সে পথ প্রকৃতি সৌন্দর্যে অবর্ণনীয় । পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে সে পথে যাত্রীদের সঙ্গে 'ছড়ি' যাত্রায় নতুন মাত্রার অভিজ্ঞতা । দশ হাজার যাত্রী একসঙ্গে চলেছে, ভাবলেই মনে শিহরণ ওঠে । কিন্তু পহেলগাঁওয়ে ফিরে আসতে পাঁচদিন লাগে । তার ওপর যাত্রাও হবে একটি বিশেষ দিনে যাতে শ্রাবণী পূর্ণিমার সকালে অমরনাথ পৌঁছনো যায় ।

আমার আগ্রহ কম ছিল না, কিন্তু কিছুতেই যাত্রার দিনক্ষণের সঙ্গে আমার সুবিধা ও সামর্থের সংযোগ ঘটাতে পারিনি । এমনি করে কয়েক বছর কেটে গিয়েছে, যেতে পারিনি কিন্তু যাবার আগ্রহ বছরে বছরে যেন আরও বেড়েছে ।

তখন অমরনাথ যাবার দ্বিতীয় পথের কথা জানি না । বস্তুত সরকারি পর্যটনবিভাগও এই পথের কোনও প্রচার করেন না, কেউ যেতে চাইলে বরং নিরুৎসাহ করেন । বলেন, ওই পথে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কোনও আয়োজন নেই, পথ দুর্গম, বিপজ্জনক, ভঙ্গুর ।

হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথায় কথায় অমরনাথের দ্বিতীয় পথের কথা শুনলাম । তিনি স্বয়ং ওই পথে অমরনাথ দেখে এসেছেন । শ্রীনগর থেকে একদিনে যাতায়াত করা যায় । এত সহজ শুনে উল্লসিত হয়েছিলাম । ভদ্রলোক নিরস্ত করলেন । বললেন, পথ অতি দুর্গম, অতি পরিশ্রমের, রাস্তায় সামান্যমাত্র আশ্রয়ও নেই । পাশে হাজার ফুটের খাদ, প্রায়ই মানুষ-ঘোড়া-খচ্চর পড়ে যাচ্ছে, প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে হয় ।

তখন কি জানি এপথ সত্যিই ভয়ঙ্কর । আসলে অনেক জায়গায় পথই নেই । তাই অল্প যাত্রীই এপথে যান । দুর্ঘটনাও হয় প্রতি বছর ।

অমরনাথকে স্মরণ করে শ্রাবণী পূর্ণিমার পরদিন আমরা পাঁচজন শ্রীনগর পৌঁছলাম । আস্তানা নিলাম হাউসবোটে । বোটের মালিক আমাদের অভীষ্ট শুনে বলল, আপনারা রাত দুটোয় রওনা হয়ে যান । আমি ট্যাক্সি বলে রাখছি ।

রাত দুটোয় কেন? আমরা যে শুনেছি শোনমার্গ হয়ে বালতাল পৌঁছতে দুঘণ্টা মতো লাগে? বোটওয়ালা বলল, সকাল-সকাল যাওয়া ভালো । না হলে ঘোড়া পাবেন না । অন্য যাত্রীরা নিয়ে চলে যাবে ।

আমি বোটওয়ালাকে আদৌ আমল দিলাম না । বললাম, আমরা ভোর চারটেয় রওনা হব ।

অতএব আমরা ভোর চারটের সময় রওনা হলাম । শোনমার্গ হয়ে বালতাল যাব । বলা যায় বালতাল অমরনাথের বেসক্যাম্প । ট্যাক্সি অনেক আগেই এসে গিয়েছিল । ডাললেকের ওপার থেকে ট্যাক্সিওয়ালার চিৎকার নিশির ডাকের মতো ভেসে এল । শিকারা তৈরি ছিল । আমরা বোট থেকে শিকারায় ওপারে পৌঁছে ট্যাক্সিতে উঠলাম । আকাশে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ । ডাললেক তরল রুপোর মতো ঝকঝক করছে ।

বালতালে যখন পৌঁছলাম তখন সবে আলো ফুটছে । নদীর ধারে ক্ষুদ্র জনপদ । দুটো-তিনটে যাত্রীবাস, কয়েকটা তাঁবু । অমরনাথ যাবার আর সেখান থেকে ফেরার পথে যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে নেয় । এখান থেকে অমরনাথ ষোল-সতেরো কিলোমিটার । ক্রমে সকাল হল । মানুষজনও কিছু দেখা গেল । কিন্তু ঘোড়া কোথায়? একজন ঘোড়াওয়ালাকেও দেখতে পেলাম না । খোঁজখবর নেব কার কাছ থেকে? এরা বেশিরভাগই যাত্রী । স্থানীয় মানুষও দুয়েকজন ছিল । তারা নানারকম খবর দিতে লাগল । আমাদের এত উৎসাহ নিয়ে এত প্রত্যাশার সঙ্গে এখানে আসা-সব বৃথা হতে চলেছে? শোনা গেল, সব ঘোড়া রওনা হয়ে গিয়েছে । এখন ওপর থেকে ঘোড়া না ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে । আরও শুনলাম, ঘোড়াওয়ালারা সব পুলিশের অত্যাচারে আশপাশের গ্রামে চলে গিয়েছে । তারা আর আসবে না । পুলিশ নাকি ঘোড়া নিজের কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে । ঘোড়াওয়ালাদের কোনও পারিশ্রমিক দিচ্ছে না ।

এত খবর নিয়ে আমাদের কী হবে? ঘোড়া আদৌ পাওয়া যাবে কি না বুঝতে পারছি না । একজন বলল, ঘোড়াওয়ালারা ৫০০ টাকার কমে যেতে রাজি নয়, যাত্রী পাচ্ছেও সেই দামে । অথচ পুলিশ রেট বেঁধে দিয়েছে ১২৫ টাকা । সেই জন্য ঘোড়াওয়ালারা আশপাশের গ্রামে চলে গিয়েছে । এযাত্রায় আর আসবে না ।

কোথাও এতটুকু আশার খবর শুনলাম না । ইতিমধ্যে অমরনাথ থেকে ফেরা কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হল । তাঁরা গতকাল সকালে গিয়েছিলেন । সারারাত হেঁটে আজ সকালে বালতাল পৌঁছেছেন । তাঁরা বললেন, ওপরে কয়েকটি ঘোড়া আছে বটে, আজ হয়তো যাত্রী নিয়ে নামবে । এমন আশাভঙ্গ হতে পারে ভাবতেই পারিনি । আমাদের

কারও মুখে কথা নেই । আমরা নীরবে ট্যাক্সির দিকে ফিরে গেলাম । এগারোটার সময় শ্রীনগর ফেরত ।

হাউসবোটওয়ালা বলল, আপনারা রওনা হতে বড় দেরি করে ফেলেছিলেন । আরেকটু আগে গেলে ঘোড়া পেতেন । শহরে গিয়ে কিছু খোঁজখবরের চেষ্টা করলাম । কেউ কিছু জানে না, তবু খবর দেবার জন্য ব্যাকুল । একজন খবর দিল, পুলিশ বালতালের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে । কয়েকজন যাত্রী ও ঘোড়া খাদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বলে ওপথে কাউকে আর যেতে দেওয়া হবে না ।

আমরা নীরবে শুনছি । সংকল্প করেছি, আরেকবার চেষ্টা করতে হবে । আজ রাতেই । ট্যাক্সি রাত দুটোয় ডাকা হল । বোটওয়ালা এক বড় টিফিন ক্যারিয়ার ভরে গতরাতের মতো খাবার দিয়ে গেল । কাল রাতের খাবার আর খোলা হয়নি । আমাদের কারও খাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না ।

আবার চাঁদের আলোয় নিস্তব্ধ ডাল লেক পার হলাম । ট্যাক্সিতে উঠলাম । কেউ বিশেষ কথা বলছে না । জানি সবার মনে একই প্রশ্ন । আজ ঘোড়া পাওয়া যাবে তো? কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার ভরা জ্যোৎস্নায় শ্রীনগর ছেড়ে ছোট ছোট জনপদ পার হলাম । দুয়েকটা কুকুর ছাড়া প্রাণের লক্ষণ নেই কোথাও । সারা পৃথিবী যেন চাঁদের আলোর ইন্দ্রজালে অসাড়, মূর্চ্ছাবৃত । একসময় শোনমার্গ পার হলাম । তার একটু পরে রাস্তা চেন দিয়ে বন্ধ । ট্যাক্সি ড্রাইভার কাকে ডেকে আনল, কে যেন সেই চেনের তালা খুলল, গাড়ি আবার চলতে শুরু করল । লাদাখের রাস্তা বাঁদিকে রেখে যেখান থেকে নিচে নদীর ধারে বালতালে নামতে হয়, সেখানে আবার পথ বন্ধ । উৎকণ্ঠায় আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে । আবার ট্যাক্সি ড্রাইভার নেমে গেল । কতক্ষণ পরে ফিরল কে বলবে । আমাদের কোনও বোধ নেই । ব্যর্থ হবার ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছি । আবার রাস্তার তালা খুলল । আমরা বালতালে পৌঁছলাম । তখনও সাড়ে চারটে বাজেনি ।

আমরা নীরবে গাড়ির ভেতর বসে থাকলাম । ক্রমে বালতাল জেগে উঠল । কয়েকজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করল আমাদের ঘোড়া চাই কিনা । আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না । এ কি স্বপ্ন, না মায়া? এরা কি দেবদূত? ঘোড়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেল । পাঁচশো টাকা করে ভাড়া । ততক্ষণে কিছু লোকজন জমা হয়ে গিয়েছে । তারা সবাই উপদেশ দিল রেট কিন্তু ১২৫ টাকা, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে ১২৫ টাকা ধরিয়ে দেবেন । পাহারাওয়ালাজির সামনে ১২৫ টাকা ধরিয়ে দিলে ঘোড়াওয়ালারা টুঁ শব্দও করতে পারবে না । আমরা নীরবে সব শুনে গেলাম । বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, শেষবারের মতো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছেন, পাশ না করতে পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এমন সময় খবর এল আপনি প্রথম

হয়েছেন । আমরা সেই ধরনের এক অসাধারণ আনন্দে ভাসছি । সবাই অনর্গল কথা বলছি । চায়ের সন্ধানে গেলেন একজন । টিফিন ক্যারিয়ার খোলার কথাও হল । কিন্তু দেবদর্শনে অভুক্ত যাওয়া উচিত বলে টিফিন ক্যারিয়ার আর খোলা হল না । আমরা ঘোড়া ছাড়া দুজন পিঠ্‌ঠু নিয়েছি । পিঠ্‌ঠু মানে খিদমৎ করবার লোক । তারা আমাদের জলের বোতল, টিফিন ক্যারিয়ার, ওভারকোট ইত্যাদি নিয়ে চলেছে সঙ্গে । আমার পিঠ্‌ঠুকে বলে রেখেছি, আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার প্রাণভয় আছে, সে যেন সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে । ইচ্ছা হলেও বলতে লজ্জা করল, যেন আমাকে একটু ধরে থাকে ।

বেশ প্রশস্ত উপত্যকা দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল । পাঁচ অশ্বারোহীর প্রসেশন । দুকিলোমিটার পরে আরেকটি জনপদে পৌঁছলাম । বড় একটা ধর্মশালা । নদীর তীরে কিছু লোক, উনুনে আগুন পড়েছে, এবারে আমরা ধর্মশালাকে ডানদিকে রেখে পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম । রাস্তা ক্রমশ বেশ খাড়া হতে থাকল । আশপাশে গাছপালার ফাঁক দিয়ে প্রত্যুষের সূর্যালোক এসে পড়েছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছপালার জগৎ পিছনে ফেলে এলাম । দুপাশে বৃক্ষহীন রিক্ত পাহাড় । দুদিকের পাহাড়ের মাঝখানে অনেক নিচে নদীর ক্ষীণধারা ।

ক্রমশ আরও উঁচুতে উঠতে লাগলাম । কেমন যেন অবলম্বনহীন মনে হচ্ছে । যেন শূন্যে ভাসছি । পথে অন্য কোনও যাত্রী নেই । চরাচর নিস্তব্ধ । আমরা সার দিয়ে পরের পর চলেছি । রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ যে ওপাশ থেকে কোনও যাত্রী এলে সহজে পার হতে পারবে না । আসলে রাস্তাই নয় । পিছনে ফেলে আসা রাস্তা দেখলে মনে হচ্ছে রুক্ষ পাহাড়ে কে বুঝি নখের আঁচড় কেটেছে । খুব ঘুরে ঘুরে উঠছি না । সোজাসুজি যেন টাঙিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে । নদী আরও নিচে, অনেক নিচে, হয়তো দুহাজার ফুট হবে । আমার মনে শান্তি নেই । আমার ঘোড়ায় চড়তেই ভয় করে । পড়ে যাবার ভয় । পিঠ্‌ঠু আমাকে বার বার বলছে নিচের দিকে তাকাবেন না, মাথা ঘুরবে । কত যাত্রী নাকি নিচের গভীর খাদ দেখে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছে । পিঠ্‌ঠুকে কী করে বোঝাব, আমার সে ভয় আদৌ নেই, আমার ভয় আমি ঘোড়া থেকে পড়ে না যাই । কত নিচে পড়ব জেনে বা দেখে আমার কোনও হেরফের হবে না । ঘোড়ারও উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি । তার পিঠ আর মাটির সঙ্গে সমান্তরাল নেই, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে আছে, আমি জিন থেকে পড়ে যাবার আশঙ্কায় ঘোড়াকে প্রায় জড়িয়ে আছি, পিঠ্‌ঠু আমাকে ধরেও রেখেছে । খাদের ওপারে পাহাড়ের ঢালুতে ছোট-বড় হিমবাহ দেখতে পাচ্ছি ।

মাঝে-মাঝে ছোট সাইনবোর্ড পড়ছে, পথ বিপজ্জনক, এগিয়ে যাও, থেমে থেকো না। পিঠ্ঠু বলল, এত বড় কাঁচা পাহাড়, ওপর থেকে প্রায়ই পাথর গড়িয়ে পড়ে।

আমি বুঝতে পারলাম না, আমার মতো ভীতু মানুষকে আর ভয় খাইয়ে লাভ কী? চলতে থাকলে পাথর পড়বে না, থেমে থাকলেই পাহাড় ভেঙে পাথর এসে পড়বে, এই বা কেমন যুক্তি। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, পাশে গভীর খাদ, তৃণগুল্মহীন পাহাড়, পদে পদে পাথর গড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা, তার ওপর ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার ভয়। হেলমেট পরে আসা উচিত ছিল। আকাশ পরিষ্কার নীল। ঠান্ডা বাড়ছে। ওভারকোট পরে নিয়েছি। মনে মনে ভাবছি, বিশ্বকর্মার কন্ট্রাক্টরও তাহলে ঠকিয়েছে, নাহলে এমন পল্কা পাহাড় তৈরি হল কী করে, দুনম্বরী মাল দিয়ে?

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক চলার পর একটা মোড়ের মাথায় রাস্তা একটু চওড়া হল। সেখানে একটা বড় পাথরের আশ্রয়ে একজন চায়ের দোকান খুলে বসেছে। জায়গাটার নাম লেখা আছে ব্রারিবার্গ। জনমানবহীন এই বৃক্ষহীন রুক্ষ পাহাড়ের মাঝে স্থানের নাম দেবার কী অর্থ জানি না। বহুকষ্টে প্রায় পিঠ্ঠুর গলা জড়িয়ে ধরে ঘোড়া থেকে নামলাম। হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছে। জয়েন্টগুলো যেন কাজ করতে চায় না। ওপাশ থেকে কয়েকজন যাত্রী এসে পৌঁছলেন পদব্রজে। তাঁরা ভোরবেলা অমরনাথ ছেড়েছেন। বললেন, এ আর কী দেখছেন, কঠিন চড়াই তো এর পরে। আরও খবর দিলেন লিঙ্গ ছোট হয়ে গিয়েছে। এবার শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনও নাকি পাঁচ ফুট উঁচু হয়নি।

আবার ঘোড়ায় উঠে পড়া। পথ বুঝি এবার আকাশ ছুঁতে চাইছে। বাঁকের মুখে পিছনে ফেলে আসা পথ যেন মনে হচ্ছে কোনওক্রমে পাহাড়কে আঁকড়ে আছে। মাঝে মাঝে উতরাই আসছে, কিন্তু প্রধানত চড়াই। ব্রারিমার্গ থেকে ঘণ্টাদেড়েক যাবার পর একটা উতরাইয়ের মুখে এসে ঘোড়াওয়ালা বলল, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লে ভালো হয়, সওয়ারি নিয়ে ঘোড়া এত ঢালুতে নামতে গেলে পড়ে গিয়ে চোট পেতে পারে। আমি নামতে রাজি হলাম না। ঘোড়াওয়ালা লাগাম ধরে। পিঠ্ঠু ঘোড়ার লেজ ধরে ব্রেক কষতে কষতে নামতে লাগল। আমরা ক্ষীণধারা অমরগঙ্গার ধারে এসে পৌঁছলাম। এই নদী পার হবার জন্য নিচে নামতে হল। একটা ছোটপুল পার হলাম। নদী এবার আমাদের বাঁদিকে। পুল পার হয়েই আবার চড়াই। এইখানে পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথের রাস্তা এসে মিশেছে। যাত্রীরা সব শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনই ফিরে গিয়েছে। ওপথে আর কেউ আসছে না। আমরা আবার নিরবচ্ছিন্ন চড়াই ভাঙতে লাগলাম। কত উঁচুতে উঠলাম, কত বাঁক ঘুরলাম, তার আর হিসাব নেই। দেখি সামনে আবার সেই নদী, আরও ক্ষীণ, অমরগঙ্গা, অনেকে অমরাবতী বলে। মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে, বরফের সেতু দিয়ে নদীর ওপারে গেলাম

। এখানে উপত্যকা বেশ প্রশস্ত হয়েছে । নদী আবার আমাদের ডানদিকে, আমাদের সঙ্গে একস্তরে পাশাপাশি চলেছে । কোথাও কোনও মানুষের বাস দেখিনি এখনও পর্যন্ত, এবার একটা-দুটো পাকাবাড়ি দেখতে পেলাম, ধর্মশালা ও সেখানের লোকজনের থাকবার ব্যবস্থা এবং লঙ্গর । যত লোক আসে সবাইকে বিনামূল্যে খেতে দেওয়া হয় । এখন ভাঙা হাট । দু-চারজন মানুষ আছে মাত্র । ইতস্তত অলস ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

আমার সঙ্গীরা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, ওই অমরনাথ দেখা যাচ্ছে । আমি সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেখতে পেলাম না । শুধু দেখলাম অনতিদূরে একটা রুক্ষ বাদামি কর্কশ পাহাড় যেন ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে আছে । কঠিন, নির্দয়, শীতল । একটু পরেই পাহাড়ের গায়ে গুহামুখ দেখতে পেলাম । অমরনাথ । আমাদের অভীষ্ট । সুদূরপরাহত সেই তীর্থে অবশেষে এসে গিয়েছি ।

ক্লান্ত শরীরে যেন শক্তির জোয়ার এসে গেল । বোধহয় আধমাইলও নয় । আমরা দ্রুত চললাম । শেষপর্বে ঘোড়া থেকে নেমে আবার খানিকটা উঁচুতে গুহামুখে পৌঁছতে হবে । মনে হল মহাপ্রস্থানের এই শেষধাপে বুঝি আর উঠতে পারব না । গুহামুখ পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া । সেখানে পৌঁছেই মনে হল সমস্ত অবসাদ চলে গিয়েছে । পাঁচঘণ্টা আগের অনিশ্চয়তা সংশয় উৎকণ্ঠা কাটিয়ে দেবস্থানে এসে পৌঁছেছি । কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল । কৃষ্ণা তৃতীয়াতে শিবলিঙ্গ ছোট হয়ে এসেছে । আড়াই ফুট হবে । পাশে আর দুই দেবতার প্রতীক দুটি বরফের গুহা । ভেতরে আমরা ছাড়া আর চার-পাঁচজন মজুত । পুণ্যার্থীরা দর্শনান্তে কদিন আগেই চলে গিয়েছেন । এখন বালতালের পথের অবশিষ্ট কজন যাত্রী ।

এবার ফেরার পালা । পথের কথা মনে হতে শিউরে উঠলাম । পথ দেখে বিস্মিত হলাম । এই পথ পার হয়ে এসেছি, আমি? অশ্বপৃষ্ঠে? অমরগঙ্গার কাঠের পুলের আগে ঘোড়া থেকে নামতে হল । অসম্ভব ঢালু । তারওপর এখানে কন্ট্রাক্টর আরও ফাঁকি দিয়েছে মনে হল । যেন ধুলোর তৈরি । ঘোড়া থেকে নেমে আমি এক দৌড়ে পুলের কাছে এসে গেলাম । সেই আমার কাল হল । তেরো হাজার ফুট উঁচুতে হাওয়াতে অক্সিজেন কম । সেখানে সামান্য পরিশ্রমের কাজ করেও শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে । ওইটুকু দৌড়েই আমার শরীরে আর কোনও শক্তি ছিল না । চ্যাংদোলা করে আমাকে ঘোড়ায় তোলা হল । আমি গমের বস্তার মতো বসে রইলাম ।

কখন ব্রারিমার্গ এসেছিল জানি না । চায়ের দোকানি অনেক আগেই দোকানপাট তুলে নিয়ে বালতাল রওনা হয়ে গিয়েছে । আকাশে মেঘ ঘনিয়ে উঠল । দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল । এই নিষ্পাদপ রুক্ষ পরিবেশে কোথাও কোথাও আশ্রয়স্থান নেই । বৃষ্টি পড়লে কী

করব? ঘোড়া চলতে পারবে তো? কাঁচা পাহাড় থেকে জলধারায় কত না জানি পাথর গড়িয়ে পড়বে। দ্রুত যাব সে ক্ষমতাও নেই। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। পিঠ্ঠু অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছে। কোনও ভয় নেই, এমেঘে বৃষ্টি হয় না।

পথে কোনও যাত্রীর সঙ্গে দেখা হল না। শুধু দুজন ছাড়া। স্বামী-স্ত্রী। দর্শনান্তে অমরনাথে থেকে দুপুরে পথে বেরিয়েছেন নিচে নামবার জন্য। বয়স্ক মানুষ। স্ত্রীর হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে। চলতে পারছেন না। পথের ধারে বসে পড়েছেন। নির্বান্ধব এই জনহীন বিপদসঙ্কুল স্থানে অসহায় দুটি মানুষকে ফেলে রেখে আমরা চলে এলাম। আমাদের কিছু করবার সামর্থ ছিল না, কোনও ঔষধপত্রও ছিল না সঙ্গে। নির্দয় পাহাড়ে ভাগ্যের আশ্রয়ে তাঁরা পড়ে থাকলেন। আসবার সময় ভদ্রলোক শুধু বললেন, সব বাবা অমরনাথের ইচ্ছা।

বালতাল যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যদেব অস্ত চলেছেন। ঘোড়াওয়ালাদের বিনাবাক্যে পাঁচশো টাকা করে দিলাম। মনে হয় তারা একটু অবাকই হল। পিঠ্ঠুর ষাট টাকার ওপরে আর দশ টাকা দিতে মানুষটি কৃতার্থ হয়ে গেল। আমাকে দেখিয়ে বলল, সাহেবের খুব সাহস। নিচের দিকে তাকিয়েও ভয় পাননি।

পিঠ্ঠুকে কী করে বোঝাব, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার ছোট ভয় আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, খাদে পড়ে যাবার বড় ভয় আমার মনেও আসেনি।

ভ্রমণ জুলাই, ১৯৯৪

১৯৯৪-এর মে-জুনে

মধ্য এশিয়া অভিযান

গৌতম ঘোষ

দিল্লি থেকে তাসখন্দ এসেছি বিমানে। এখান থেকে আমাদের অভিযান শুরু। যাব জিপে চড়ে। উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান হয়ে তাকলামাকান মরুভূমিকে পাশে পাশে রেখে শিনশিয়ান প্রদেশের ইয়ারখন্দ, খাসগড়, উরুমচি, তুরফান, দুনহুয়াং পেরিয়ে তিব্বত। তারপর এভারেস্ট নর্থ বেস ক্যাম্প ছুঁয়ে কাঠমান্ডু হয়ে দেশে ফিরব। মোট ১২,০০০ কিলোমিটার রাস্তা, পুরো দুমাসের অভিযান।

আমাদের দল মোট ১৮ জনের। চিন থেকে আরও চারজন যোগ দেবেন। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার বা মেলবন্ধন। বহু কালের পুরনো সেই সম্পর্কের ভূগোল-ইতিহাসের খানিকটা আঁচ নেওয়া। সেইজন্যই প্রাচীন সিল্করুট ধরে পুরোটাই স্থলপথে যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান, আফগানিস্থানের রাজনৈতিক অবস্থার জন্য তাসখন্দ পর্যন্ত আমাদের বিমানে যেতে হল।

দিল্লি থেকে তাসখন্দ এলাম কাশ্মীর, লাদাখ উপত্যকা, হিন্দুকুশ পর্বত, কারাকোরাম পর্বতমালা পেরিয়ে। এই বিরাট পর্বতমালা, যেদিকেই তাকাই বরফাবৃত চূড়া দেখে আমার মনে হচ্ছিল কী বিপুল সাহস আর ইচ্ছে নিয়ে সেই কতকাল আগে শাসক, পরিব্রাজকরা যুগে যুগে এই পথ পেরিয়েছে। বিমান থেকেই দেখলাম রুক্ষ তাকলামাকান মরুভূমি।

তাসখন্দে জিনিসপত্র গুছোতে আমরা দুদিন থেকে গেলাম। তাসখন্দ এখন বিরাট শহর। পুরনো তাসখন্দের নিদর্শন রয়েছে রেগিস্তান স্কোয়্যার, বিভিন্ন মাদ্রাসা, পুরনো বাড়িগুলিতে। এখানে নানারকম মুখ দেখলাম। কাজাক, উজবেক, কিরঘিজ, রুশ নানা জাতির এখানে মিলেমিশে বাস।

তাসখন্দের বাজার দেখার মতো। এত সস্তায় যে কিসমিস, বাদাম পাওয়া যায়, আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। আমাদের অভিযানের সদস্যরা তো মুঠো-মুঠো কিনে ফেললেন। যদিও শুনলাম দাম এখন অনেক বেড়ে গেছে। এখানকার যানবাহনও খুব

উন্নত। নানারকম ট্রলিবাস, বাস রাস্তায় চলে। এখানকার উজবেকেরা মুসলিম। যদিও ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চোখে পড়ল না।

তাসখন্দ থেকে রওনা হলাম ঐতিহাসিক শহর সমরখন্দ এবং বুখারার দিকে। সমরখন্দ ছিল তৈমুরলঙের রাজধানী। তারও আগে চেঙ্গিস খাঁ এখানে লুঠপাট করেন। সমরখন্দ একটা পুরনো মরূদ্যান। এখানে দেখার যেন আর শেষ নেই। অসংখ্য স্থাপত্য, দেখতে দু-তিনদিন লেগে যায়। সমরখন্দের একটা অংশ প্রাচীন রয়ে গেছে। বাকি অংশের আধুনিকীকরণ হয়েছে, যদিও সব মিলিয়ে একটা প্রাচীনতার স্পর্শ পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর শুরুতে স্থাপত্যগুলির পুনর্নির্মাণ হয়। এখানকার আরেকটা মজার জিনিস চায়ের দোকান-স্থানীয় ভাষায় চায়খানা। এই চায়খানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতে এরা খুব ভালোবাসে।

সমরখন্দ থেকে বুখারা। বুখারায় অসংখ্য মসজিদ আর মাদ্রাসা। এর মধ্যে বিবিখান মাদ্রাসা খুব বিখ্যাত। এখানকার স্থাপত্য দেখার জন্য একদিনের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। বুখারাতে নানা জাতের, নানা ধর্মের লোকের বাস। বুখারার বাজার আর চায়খানা অপূর্ব। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের জন্মস্থান এই বুখারা। এখানে তাঁর একটা মুর্তি আছে, খচ্চরের পিঠে বসে আছেন। এই মূর্তির চারপাশে ছোট ছোট চায়খানা। দেখে মনে হল, এরা সবাই যেন মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প বলছে। বুখারা-সমরখন্দের রাস্তায় রাস্তায় ধ্রুপদী সঙ্গীত শোনা যায়। এইসব শিল্পীরা সারেঙ্গি দোতারা ব্যবহার করেন। ভাষা বুঝলাম না, কিন্তু সুর শুনে মনে হল যেন রাজস্থানি সঙ্গীত শুনছি।

বুখারা থেকে তাসখন্দ ফিরতে আমাদের একদিন লাগল। পথ প্রায় চারশো কিলোমিটার। এই রাস্তায় একদিকে রুক্ষ মরুঅঞ্চল, তাকে ঘিরে আছে তিয়েনশানের বরফ ঢাকা চূড়া, পামীর মালভূমি। অন্যদিকে মাইলের পর মাইল টিউলিপ ফুটে রয়েছে।

অক্টোবর থেকে এপ্রিল এই মরুভূমি বরফে ঢেকে যায়। এইসময় তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। মে থেকে সেপ্টেম্বর বেড়াবার উপযুক্ত সময়।

এরপর আমরা ঢুকলাম কাজাখস্তানে। প্রথমেই পথে পড়ল চিমিকেন্ট বলে একটা ছোট শহর। উজবেকিস্তান থেকে যখন কাজাখস্তানে ঢুকছি সীমান্তরক্ষীরা আমাদের দেখে হাত নেড়ে দিল। নতুন দেশ তো, ভিসা-পাসপোর্ট পরীক্ষা করা এখনও এদের ধাতে আসেনি।

এখান থেকে আমরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলাম । একটা দল ফরঘনার দিকে চলে গেলাম । ফরঘনা তাসখন্দ থেকে স্থলপথে একদিনের রাস্তা । আকাশপথে আধঘণ্টা । ফরঘনা সুলেমান পর্বতশ্রেণী, পামীর, তিয়েনশান পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা । বাবরনামা থেকে জানা যায়, ফরঘনা ছিল ফুলে-ফলে ভরা আশ্চর্য সুন্দর এক রাজ্য । এখানে বৃষ্টি হয় না । চারদিকের পর্বতের বরফগলা জল মাটির তলা দিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল বলে ফরঘনা এত সবুজ । ফরঘনায় আন্দিজান আর ওশ-এই দুটোই বড় শহর । আন্দিজান বাবরের জন্মস্থান । শহরটা দেখলাম ফুলে ভর্তি । রাস্তায় রাস্তায় গোলাপ ফুলের গাছ । সর্বত্র জলের ব্যবস্থা উন্নত । এই কৃত্রিম জলের ব্যবস্থা না থাকলে ফরঘনা মরুভূমি হয়ে যেত । এখানকার ছেলেমেয়েরা দেখতে ভারি সুন্দর । এখানেও নানাজাত মিলে গেছে । ফরঘনায় আমরা রইলাম তিনদিন । এখানেও দেখার জায়গা অসংখ্য, আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে সঙ্গীত । কেউ যদি খেতে নিমন্ত্রণ করেন, খাবারের সঙ্গে একজন পাশে দাঁড়িয়ে গান শোনাবেন । এদের খাবারও খুব অদ্ভুত । শুকনো ফল দিয়ে আরম্ভ । তারপর শোরবা, ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি স্টু । আবার ফল, আবার মাংস, আবার ফল এইরকম চলতেই থাকে । অসংখ্য পদ । ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে সর্বত্র এই রীতি । ফরঘনার মানুষজন খুব অতিথিবৎসল । এখানে সবে ট্যুরিজম ঢুকেছে । ফরঘনার গ্রামগুলিতে একটা এশীয় ছাপ রয়েছে ।

ফরঘনা থেকে কিরঘিজস্তানের বিসকেক । কিরঘিজস্তান পুরোটাই পার্বত্য অঞ্চল, তিয়েনশান পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা । এর একদিকে চিন, একদিকে উজবেকিস্তান, একদিকে কাজাখস্তান । কিরঘিজরা যাযাবর উপজাতি । এদের মধ্যে অনেকেই গরমকালে তাঁবুতে থাকে । এগুলিকে ইয়ুর্দ বলে । ইয়ুর্দে আমরা একটা রাত কাটালাম । আমাদের অতিথি পেয়ে খুব আনন্দিত তাঁবুর বাসিন্দারা । এখনও এদের মধ্যে অদ্ভুত সরলতা । বিসকেকের ওশ বাজার বিখ্যাত । এখানে প্লেনের টিকিট বিক্রি হয়ে যাবার পর নিলাম হয় । ভাগ্যে থাকলে বাসের টিকিটের চেয়েও সস্তায় ছোট ছোট উড়ানগুলির টিকিট পাওয়া যায় । এইসব প্লেনে করে বালতি ভরে ফল নিয়ে ব্যাপারীরা আসে ওশ বাজারে । বিসকেকের হাওয়ায় একটা ইউরোপীয় গন্ধ আছে । বিসকেক থেকে ইসুকুল লেক ঘণ্টাচারেকের পথ । সাড়ে সাত-আট হাজার ফিট ওপরে চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে বিশাল এই ইসুকুল লেক । তার চারদিকে তিয়েনশান পর্বতমালা । এরই একটা পাস দিয়ে ইসুকুলে যেতে হয় । এত সুন্দর জায়গা আমি আর দেখিনি । জেনিভা, কানাডার হ্রদ অঞ্চলের চেয়েও সুন্দর । নোনা জলের হ্রদ । তাই শীতকালে চারদিকে বরফ থাকলেও এই হ্রদের জল জমে না, আর জলের রংও তেমনই-একেবারে টলটলে নীল । এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে । আগে শুধু রাষ্ট্রপ্রধানরা সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে এখানে আসতে পারতেন

। রাজীব গান্ধীও এসেছিলেন । হ্রদের চারপাশে ছোট ছোট কিরঘিজ গ্রাম । এখন গরমকাল বলে প্রচুর অশ্বপালক দেখলাম । তারা অসংখ্য ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ইসুকুল হ্রদে সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের দৃশ্য অকল্পনীয় । মোটর লঞ্চে হ্রদে বেড়ানো যায় । তাছাড়া চারপাশের গ্রামগুলোতে ঘুরে ভালো সময় কাটে ।

ইসুকুল প্রাচীন সিল্করুটের একটা অংশ ছিল । যেসব ব্যবসায়ীরা ককেশাস হয়ে ইউরোপ চলে যেত, তারা এই হ্রদের ধারে বিশ্রাম নিত ।

ইসুকুল থেকে বেরিয়ে আমরা পাড়ি দিলাম চিনের দিকে । চিনা তুর্কিস্তান । যার অন্য নাম শিনশিয়ান । এটি একটি স্বয়ংশাসিত প্রদেশ । এই পথে শিনশিয়ানের আগে পড়ল ছোট্ট শহর নারিন । নারিনের ঠিক আগে আমরা বরফ পেলাম । এটিও একটি মনোরম উপত্যকা, একদিকে রুক্ষ মরুভূমি, অন্যদিকে ঘন সবুজ মরূদ্যান । আর এই প্রথম চোখে পড়ল দুই কুঁজওয়ালা উটের পাল । এখানে প্রচুর ভেড়া চরে বেড়াতে দেখলাম । কিরঘিজরা তাদের পালিত পশুর পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । দূরে একদিকে পামীর, আরেকদিকে তিয়েনশান পর্বতমালা । কিরঘিজ বর্ডারের দৃশ্যও অদ্ভুত । রুক্ষভূমি কিন্তু বরফে ঘেরা । কিরঘিজস্তান আর শিনশিয়ান প্রদেশের মাঝখানে নো ম্যানস ল্যান্ড । এখানে মানুষ না থাকায় প্রচুর বন্যজন্তু স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে । প্রচুর মরূভূমির সরীসৃপ, অসংখ্য পাখি আর বন্য লোমশ দুই কুঁজওয়ালা উটের দল । টানা বারো কিলোমিটার এইরকম । পশুপাখি, কীটপতঙ্গের স্বর্গরাজ্য ।

এর পরের গন্তব্য তোরুগাড পাস (১০,৫০০ ফুট) । এই পথটা অত্যন্ত খারাপ । তার ওপর হঠাৎ বৃষ্টি এল । সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তুষারঝড় । কয়েক মিনিটের মধ্যে চারদিক বরফে সাদা হয়ে গেল । যদিও এই সময় গাড়ি চালানোর ঝুঁকি আছে, তবু এর মধ্য দিয়েই আমরা শিনশিয়ানের সীমানায় চলে এলাম ।

এই অঞ্চলটা এখনও পর্যটকের জন্য নিষিদ্ধ । কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নো ম্যানস ল্যান্ড দিয়ে অনবরত ট্রাক চলাচল করছে ।

চিনে ঢোকার অনুমতিপত্র সংক্রান্ত আইনকানুনের জন্য আমাদের সারাদিন তোরুগাড পাসেই কাটাতে হল । এখান থেকেই চারজন চিনা অভিযাত্রী আমাদের দলে যোগ দিলেন ।

তোরুগাড পেরোতেই আমরা তিয়েনশানের অন্যদিকে চলে এলাম । একেবারে মরুভূমির মধ্যে নেমে এলাম । এই শিনশিয়ান প্রদেশের মাঝখানে তাকলামাকান মরুভূমি । এই তাকলামাকান পরে গোবিতে গিয়ে মিশেছে । তোরুগাড থেকেই দেখতে পেলাম

একদিকে তিয়েনশান পর্বতমালা, অন্যদিকে কুয়েনলুন পর্বতমালা আর দূরে পামীর মালভূমি ।

এই অঞ্চলটা দখল করা নিয়ে রুশ, ইংরেজ এবং চিনাদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলেছিল । কারণ এখান থেকে পুরো মধ্য এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । আর্কিওলজিস্টদের মতে, তাকলামাকানের তলায় তিনশো বৌদ্ধ শহর চাপা পড়ে গেছে । কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বরফগলা জলপুষ্ট নদীগুলি শুকিয়ে গেলে নদীতীরবর্তী মরূদ্যান শহরগুলি ধ্বংস হয়ে যায় । তুর্ক ভাষায় তাকলামাকান শব্দের অর্থ, যে একবার ঢোকে সে আর ফেরে না । এই ভয়ঙ্কর মরুভূমির ঝড়, আঁধি একটা গোটা ক্যারাভানকে শেষ করে ফেলতে পারে । আমরা যখন খাসগড় থেকে ইয়ারখন্দের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ আঁধি শুরু হল । প্রথমেই আমার মনে হল কালো মেঘ তলা থেকে উঠে আসছে । পরে বুঝলাম এটা একটা ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় । বড় বড় পাথর উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে । এই পাথর যদি লাগে নির্ঘাৎ মৃত্যু । আমাদের গাড়িতেও দুয়েকটা ইট-পাটকেল এসে পড়েছিল । স্থানীয় মানুষরা আঁধিকে বুঢ়ান বলে ।

এই মরু অঞ্চলের প্রথম শহর খাসগড় । বাবরনামায় খাসগড়ের উল্লেখ আছে । খাসগড়ের খানিকটা অংশ আধুনিক হলেও, কোথাও কোথাও একটা পুরনো গন্ধ পেলাম । এটা একটা বিরাট উর্বর মরূদ্যান । আমার ধারণা ছিল মরূদ্যান মানে মরুভূমির মাঝখানে কয়েকটা খেজুর গাছ আর কাঁটাঝোপ । তা নয়, মাইলের পর মাইল মরূদ্যান । খাসগড় আর ইয়ারখন্দের মাঝখানের ভয়ঙ্কর মরুভূমি সম্বন্ধে পড়েছিলাম এখানে মানুষের, উটের কঙ্কাল পড়ে থাকে । কিন্তু এখন মানুষের অসীম ক্ষমতায় এই দুই মরূদ্যানের মাঝখানের মরুভূমি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে । এখানকার জলের ব্যবস্থা এত উন্নত বলেই এটা সম্ভব হয়েছে । খাসগড়ে প্রথম দিন আকাশ ঝকঝকে ছিল । কিন্তু তার পরের দিনগুলোয় ধোঁয়াশার জন্য সূর্য দেখা গেল না । এটা এখানকার একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মরুভূমি থেকে মিহি ধুলো এসে সর্বত্র ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে । এখানে দিনের পর দিন এই জন্য সূর্যের দর্শন মেলে না । যদিও স্থানীয় মানুষ এতে 4ক্ষেপও না করে যে যার কাজ চালিয়ে যায় ।

খাসগড় একেবারে প্রাচীন এশীয় শহর । খাসগড়ের মূল মসজিদ একাদশ শতকে তৈরি । খাসগড়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল রবিবারের বাজার । আমরা এখানে শ্যুটিং করেছিলাম । ধুলোর ধোঁয়াশা সত্বেও হাজার হাজার মানুষ এই বাজারে বেচাকেনা করে চলেছেন । কতরকম যে সামগ্রী তা বলে শেষ করা যায় না । নানারকম খাবারদাবার তো আছেই, সেইসঙ্গে হাঁস, মুরগি, ঘোড়া, মায় কামার-কুমোর-সবাই হাজির । সে এক জমজমাট ব্যাপার ।

খাসগড় থেকে আমরা চলে গেলাম ইয়ারখন্দ । এখানে আমরা একদিন ছিলাম । ইয়ারখন্দ থেকেই চোখে পড়তে শুরু করল নৈশ বাজার । বিকেল পাঁচটা বেজে গেলেই নানারকম খাবারদাবার নিয়ে লোকেরা একেকটা পাবলিক স্কোয়্যারে চলে আসে । কাবাব, চিনা খাবারের স্টল ছাড়াও রয়েছে কিছু বিলিয়ার্ড বোর্ড । কাজকর্ম সেরে লোকেরা সপরিবারে এখানে চলে আসে । এখানকার কাবাব বিখ্যাত । মাংসের দোকানের সঙ্গেই কাবাবের দোকান । একই দোকানে মাংস ঝুলছে আবার তা থেকে কেটে নিয়ে মশলাছাড়া সুস্বাদু কাবাব বানিয়ে বিক্রি হচ্ছে । এখানকার লোকেরা দেখলাম বহুক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে নানারকম খাবার খেয়ে আর বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধেটা কাটায় ।

পরদিন ইয়ারখন্দ ছেড়ে চলে এলাম হোতান । হোতানের জেড পাথর বিখ্যাত । তবে ট্যুরিস্টদের ঠকাবার ব্যবস্থাও রয়েছে । হোতান আর কারকাশ নদী সাদা আর সবুজ জেড বয়ে আনে । বাচ্চা ছেলেরা নদী থেকে জেড কুড়িয়ে বিক্রি করে । পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা জেড এখানে পাওয়া যায় । এই নদী থেকে বহু বছরের পুরনো মুদ্রাও কুড়িয়ে পাওয়া যায় । ছোটরা এগুলোও বিক্রি করে । হোতানের মিউজিয়াম দেখার মতো ।

হোতান থেকে নর্দান সিল্করুট ধরে আমাদের পরের গন্তব্য উরুমচি । উরুমচির পথে পড়ে আক্সু । আক্সুর কাছে কুরলা, কুচা প্রাচীন বৌদ্ধ শহর । যদিও এখন এগুলি আধুনিক চিনে শহর । এখানে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া গেছে । এই তেলে চিনের আগামী একশো বছরের তেলের সমস্যা মিটে যাবে । উরুমচি শিনশিয়ান প্রদেশের রাজধানী, বিরাট শহর । এখানে বহু জাতির বাস । উরুমচি থেকে ঘণ্টাদুয়েকের যাত্রায় আমরা গেলাম হেভেনস লেক । ভারি সুন্দর মিষ্টি জলের হ্রদ । এখানে থাকার অনুমতিও আছে । এই হ্রদের ওপরেও তিয়েনশান পর্বত । অদূর ভবিষ্যতে এটি একটি ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে যাবে । উরুমচি থেকে আমি আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট শিয়ান উড়ে গিয়েছিলাম । শিয়ান মূল চিনা ভূখণ্ডের একদম মধ্যে । শিয়ান থেকে হিউয়েন সাং, ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন । শুধু এই জন্যই শিয়ানকে আমাদের অভিযানের বাইরে রাখা সম্ভব হল না । শিয়ান এখন আধুনিক শহর । প্রচুর সাইকেল । এখানে বিগ গুস প্যাগোডা, লিটল গুস প্যাগোডা, হিউয়েন সাঙের সমাধি অন্যতম দ্রষ্টব্য । ভারত থেকে ফিরে বিগ গুস প্যাগোডায় হিউয়েন সাং আঠেরো বছর ধরে ভারতীয় পুঁথি অনুবাদ করেছিলেন । শিয়ানের চারপাশে সবুজ ধানখেত, দেখলে মনে হয় গ্রামবাংলা । শিয়ান শহর প্রাচীরবেষ্টিত । শিয়ানে তিনদিন থেকে আবার উরুমচি ফিরে এলাম ।

উরুমচি থেকে স্থলপথে শিয়ান যাওয়া সম্ভব । প্রাচীন সিল্করুটের হেক্সি করিডর দিয়ে শিয়ান যাওয়া যায় ।

উরুমচি এয়ারপোর্ট থেকে চায়না এয়ারলাইন্সের বিমানে খাসগড়, হোতান যাওয়া যায় ।

উরুমচি থেকে তুরফান । তুরফান উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০ ফুট নিচে । পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চল । আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন । এখানে বাষ্পীভবনের ফলে মাটির ওপরের জল শুকিয়ে যায় । এখানকার জলব্যবস্থা আড়াই হাজার বছরের পুরনো । এর নাম কারেজ । মাইলের পর মাইল মাটির তলা দিয়ে বরফগলা জলের খাল বয় । বাড়িতে বাড়িতে এই জল ব্যবহার করার ব্যবস্থা রয়েছে । এই আবহাওয়ার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীজ ছাড়া আঙুর এখানে জন্মায় । আমরা যখন তুরফান পৌঁছলাম, তখন আঙুর পাকতে তিন সপ্তাহ বাকি । এখানকার কিসমিসও বিখ্যাত । এখানে প্রচুর দীর্ঘায়ু লোক দেখলাম । বেশিরভাগই একশোর ওপরে । তুরফানের গড় আয়ু বেশি । উরুমচির কাছেই পৃথিবীর কেন্দ্র । এই অঞ্চল সমুদ্র থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত । দুহাজার মাইলের মধ্যে কোনও সমুদ্র নেই । এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে । এখানকার লোকেরা সিনেমায় সমুদ্রের দৃশ্য দেখে হল ছেড়ে পালিয়ে গেছিল । জল যে এভাবে এগিয়ে আসতে পারে, তা তাদের কল্পনাতেও ছিল না । তুরফানের বেজেক্লিকে বৌদ্ধ গুহা এক অসাধারণ দ্রষ্টব্য । এত দুর্গম অঞ্চল যে কেন তাঁরা তাঁদের সাধনার জন্য বেছেছিলেন তা রহস্য । এই বৌদ্ধ গুহায় অসংখ্য প্রাচীন পেন্টিং ছিল । এগুলি এখন ইউরোপের মিউজিয়ামে ।

বেজেক্লিক দেখে আমরা চলে গেলাম হামি । আটঘণ্টার পথ । খুব ভালো, একদম সোজা পিচের রাস্তা, মরুভূমির মাঝখান দিয়ে । এই রাস্তায় আমি দুবার দুর্ঘটনা ঘটাতে ঘটাতে বেঁচে গেলাম । এত সোজা রাস্তায় গাড়ি চালানো খুব বিপজ্জনক । একই স্পিডে, স্টিয়ারিং একদম না ঘুরিয়ে বসে থাকতে থাকতে, দুবার ঢুলে পড়েছিলাম ।

তাছাড়া, এই অঞ্চলের দমকা হাওয়া ছোট ছোট পাথর উড়িয়ে নেয় । দুবার এই পাথর লেগে আমাদের জিপের উইন্ড শিল্ড ভেঙে গেল ।

হামি ছোট প্রাচীন শহর । এখানকার নৈশ বাজার বিখ্যাত । স্থাপত্যের ওপর মুসলমান ও চিনা দুয়েরই প্রভাব রয়েছে । মার্কো পোলো হামিতে এসে দেখেছিলেন, এখানকার মানুষ অতিথিবাৎসল্যের চোটে তাদের স্ত্রীদের অতিথিকে দিত সম্ভোগের জন্য । সে অন্ধকার যুগ আর না থাকলেও হামির অতিথিপরায়ণতা এখনও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । কোনও রেস্তোরাঁয় কেউ যদি মন দিয়ে না খায়, রেস্তোরাঁর মালিক অপমানিত হয়ে পয়সা নেয় না ।

হামি থেকে চললাম দুনহুয়াং । দুনহুয়াং প্রাচীন সিল্করুটের একটা অত্যন্ত সম্পন্ন মরূদ্যান । প্রাচীনকালে দুনহুয়াংয়ে ব্যবসায়ীরা বিশ্রাম নিতে থামত । দুনহুয়াংয়ের অন্যতম

দ্রষ্টব্য পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধগুহা মাগাঁও । এখন থেকেই অরেলস্টাইন পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত বই ‘হীরক সূত্র’ খুঁজে বার করেন । মাগাঁও দেখতেই দিনকয়েক লেগে যায় । এখানে মিংশা বালিয়াড়ি আরেক দ্রষ্টব্য । বিশাল বালিয়াড়ি । এখানে নানারকম বালুকাক্রীড়া (Sand Sports) ও উটের পিঠে চড়ার বন্দোবস্ত আছে । দুনহুয়াং থেকে আমরা তিব্বতের উদ্দেশে রওনা হই । প্রায় ছ-দিনের পথ । পথে পড়ে গোলমু । গোলমু থেকে চড়াই শুরু । তিব্বতের গড় উচ্চতা ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ ফুট । আগে উত্তরদিক থেকে তিব্বত পৌঁছনো খুবই কঠিন কাজ ছিল । এই শতকের গোড়া পর্যন্ত কেউই এই পথে লাসা পৌঁছতে পারেননি । আধুনিককালের শিনশিয়ান-তিব্বত হাইওয়ে (প্রায় ৩,৫০০ মাইল) ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক বিস্ময় । এত উঁচুতে এত লম্বা রাস্তা আর কোথাও নেই । অভিযানের এই অংশে প্রথম আমাদের তাঁবু খাটাতে হয় । মাইলের পর মাইল ধারেকাছে কোনও জনবসতি নেই । উত্তর তিব্বত থেকে লাসা পৌঁছতে ছ-সাত দিন লেগে গেল । এই পথে আমরা প্রথম তিব্বতি ইয়াক দেখলাম । এত উঁচুতে গ্রামগুলোও আলাদারকম । এখানকার মানুষরা খুবই ধর্মভাবাপন্ন । প্রায়ই দেখলাম দণ্ডী কেটে তীর্থযাত্রীরা চলেছেন ।

গোলমুতেই সমতল মরুভূমি শেষ দেখেছি, তিব্বত লাদাখের মতো পার্বত্য মরু । পাহাড়গুলি ন্যাড়া । কিন্তু উপত্যকাগুলি দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে । সবুজের মধ্যে হলুদ সর্ষে বা রেপসিড ফুল ফুটে আছে শত শত মাইল । তিব্বতে প্রথম কয়েকদিন উচ্চতাজনিত অসুস্থতা সকলেরই হল । দু-তিনদিনের ব্যাপার ।

অবশেষে দামসুং উপত্যকা পেরিয়ে ষষ্ঠদিনে আমরা লাসা পৌঁছলাম । লাসায় ঢোকার আগে সব গাড়ি ধুতে হয় । বহুদিনের মরুযাত্রায় গাড়িগুলো নোংরা হয়ে যায় বলেই সম্ভবত এই ব্যবস্থা । লাসার মূল দ্রষ্টব্য পোটালা প্যালেস । এটা দলাই লামার প্রাসাদ ছিল । পোটালা ছাড়াও লাসায় দেখার জায়গা প্রচুর ।

লাসায় একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব টের পেলাম । একদিকে আধুনিকীকরণ, অন্যদিকে প্রাচীন তিব্বতি ঐতিহ্য । মনে হয় আধুনিক প্রজন্ম এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আরও কিছুদিন যাবে । তিব্বতের আবহাওয়াও অদ্ভুত । একইদিনে আমরা চারটে ঋতু দেখলাম । লাসায় একদিন দিনেরবেলা বেশ গরম লাগছে বলে টি শার্ট পরে আছি । হঠাৎ ঝড় উঠল, প্রচণ্ড বালির ঝড়; আস্তে আস্তে বালি জমে বরফ হয়ে গেল । তখুনি কাঁপুনি । গরমজামা পরলাম । একটু বাদেই তেড়ে বৃষ্টি এল । তারপর আবার সব স্বাভাবিক । বছরে কয়েকটা মাস তিব্বতের আবহাওয়ার কোনও ঠিকঠিকানা নেই, বাকি সময়টা প্রচণ্ড ঠান্ডা ।

এখানকার গ্রামগুলোকে দেখলে মনে হয় আধুনিকতা থেকে বহুদূরে একটা আদিম জগৎ । ছোট শহরগুলিতে অবশ্য আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ আছে । লাসা থেকে আমরা চলে এলাম শিগাৎসে । এটি তিব্বতের দ্বিতীয় শহর, পাঞ্চেন লামার জায়গা ।

এই পথেও নানা গ্রাম, নানা উপজাতি । এই পথের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ইয়ারলুং সাংপো নদী । সাংপোর ধারেই প্রাচীন তিব্বত গড়ে উঠেছিল । এত উঁচুতে এত চওড়া নদী আমি আর দেখিনি । তাতে চামড়ার তৈরি বড় বড় নৌকা চলে । সাংপো পরে ব্রহ্মপুত্র নামে অরুণাচলে ঢুকেছে ।

শিগাৎসেতে আমাদের অভিযানের ১০,০০০ কিলোমিটার পূর্ণ হয় । পাঞ্চেন লামার প্রাসাদ, উপাসনাগৃহ শিগাৎসের দ্রষ্টব্য । প্রায় দুমাস পর এখানে প্রথম হিন্দি ভাষা শুনলাম ।

শিগাৎসে থেকে চলে এলাম গিয়ানসে । ফ্রান্সিস, ইয়ং হাজব্যান্ডের ইংরেজ অভিযাত্রীদলকে গিয়ানসের উপজাতি প্রথম বাধা দিয়েছিল । এদের হারিয়ে ইয়ং হাজব্যান্ড ১৯০৪ সালে লাসা পৌঁছন । এখানকার জং, কুম্বুম মনাস্ট্রি অবশ্যদ্রষ্টব্য ।

গিয়ানসে থেকে একটা রাস্তা কালিম্পং গিয়েছে । এই পথে শিলিগুড়ি থেকে তিব্বত খুব সহজে যাওয়া যাবে । শোনা যাচ্ছে এই রাস্তাটা পর্যটকদের জন্য শিগগির খুলে দেওয়া হবে ।

গিয়ানসে থেকে রওনা হলাম শেরপাদের গ্রাম টিংরির উদ্দেশে । পৃথিবীবিখ্যাত শেরপারা এই গ্রামেরই মানুষ । টিংরিতে পৃথিবীর উচ্চতম ডাকঘর । এখান থেকে বাড়িতে একটা চিঠি লিখলাম । এরপর আমরা চলে গেলাম এভারেস্ট নর্থ বেসক্যাম্পে (প্রায় ১৮,০০০ ফুট) । এখানে পৃথিবীর উচ্চতম মনাস্ট্রি রংবুক । রংবুকে আমরা দুদিন রইলাম । রংবুকের ঘরগুলোকে অবশ্য ঘর না বলাই ভালো । কোনও কোনওটিতে ছাদ পর্যন্ত নেই । সকাল-বিকেলের আলোয় এভারেস্ট দেখার অভিজ্ঞতা লিখে বোঝাতে পারব না । এত কাছ থেকে এভারেস্ট দেখব কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি ।

এভারেস্ট বেসক্যাম্প থেকে আমরা নেমে এলাম মিলারেপা উপত্যকায় । এখান থেকে একদিকে দেখা যায় রুক্ষ তিব্বত, অন্যদিকে বর্ষাভেজা সবুজ নেপাল । সমস্ত বর্ষামেঘ নেপালের ওপরে, কিন্তু তারা হিমালয় টপকে তিব্বতে আসতে পারছে না । বেশ কতকগুলি গ্রাম পেরিয়ে, ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ পেরিয়ে আমরা নেপাল উপত্যকায় নেমে এলাম । এখানে এসেই গন্ধটা পাল্টে গেল । বহুদিন পর দুপুরে ডালভাত খেয়ে লুম্বিনি হয়ে দেশে ফিরে এলাম ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

পথ হারিয়ে সিকিমের জঙ্গলে

রতনলাল বিশ্বাস

পিছনে পড়ে রইল কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চল । গত কয়েকদিন আমার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা । এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে হাঁটা, নতুন পথ । পথপ্রদর্শক দোরজে ছেত্রীকে সামনে রেখে বরফের পথে উঠে এসেছিলাম নেপাল-সিকিম সীমান্তে সিঙ্গালিলা গিরিশিরার ওপর অবস্থিত চোংপা লা (উচ্চতা ৪,৪৩৬ মিটার) গিরিবর্ত্মের ওপর । কাংলা কাং পর্বতচূড়ার দক্ষিণে এর অবস্থান । পশ্চিম দিগন্তে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে ক্ষণিকের জন্য উঁকি মারে মাকালু, লোৎসে ও এভারেস্ট শৃঙ্গমালা । এক স্বপ্নময় মনোরম দৃশ্য । আর পূর্বে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ । দোরজে দেখিয়ে দেয় আমাদের পরবর্তী পথের নিশানা । চোংপা লা হয়ে রিম্বি যাবার পথ ওর নখদর্পণে । সময় লাগবে মাত্র দুদিন । ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং সরকারি স্কুলের শিক্ষক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় দার্জিলিং থেকে লাসা যাবার পথে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তিব্বত যাবার পথে অতিক্রম করেছিলেন এই অঞ্চলের চুম্বক লা নামে একটি গিরিবর্ত্ম । আমার ধারণা চোংপা লা ও চুম্বক লা একই গিরিবর্ত্ম । এবার নামার পালা ভারতের মাটিতে । তাঁবু ফেললাম পবিত্র জলাশয় রঙিন পোখরির ধারে । এই অঞ্চলের অপর নাম সোদামদং । আজ ৩০ অক্টোবর ১৯৯১ । পূর্বশর্ত অনুযায়ী পরদিন সকালেই ছেড়ে দিতে হবে দোরজেকে । সামনে ভাইটিকার উৎসব । তাই ও বাসপথ অবধি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল না । রাতে ভালো করে পরবর্তী পথের নকশা এঁকে নিলাম ।

ভোর হতেই দোরজে আমাদের বিদায় জানিয়ে চোংপা লার দিকে এগিয়ে চলল । আমরাও সমস্যায় পড়লাম । এই নির্জনপুরীতে কে আমাদের পথ দেখাবে, কেইবা বইবে এত সব মালপত্র । অগত্যা মালপত্রগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলাম । নিজের জিনিসপত্র ছাড়াও আরও কিছু মাল চাপল । প্রায় সমতল পথ । ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বোকতো খরকা (খরকার অর্থ পশুপালকদের অস্থায়ী আস্তানা) । কোনও জনমানবের দেখা নেই । একটু জিরিয়ে আবার পথ চলা । সামনে আরও কয়েকটা শূন্য চালাঘর । মূল পথটা চলে গেছে সম্ভবত তেগ্যাপ লার দিকে । আমরা ডানদিকের এবড়োখেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে উতরাই পথে নেমে এলাম বোকতো চু-এর ধারে (চু-র অর্থ

নদী) । একটুকরো কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে নালা পেরিয়ে একটা পশুপালকদের ঘর । ভাঙা ভেজানো দরজাটা সরিয়ে ঢুকে পড়ি । রান্না খাওয়া করতেই দিন পড়ে এল । সকলের মত, তাঁবুতে না থেকে এ ঘরে একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাক । বহু বছরের প্রচেষ্টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের ও উত্তর-পশ্চিমদিকের মূল শিবির অঞ্চলে এক সফল পদযাত্রা অভিযান করে ঘরে ফেরার পালা । ঠিক ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেকিংয়ের শেষে পূর্ব নেপালের ইয়ালুং ও নিরাংমা উপত্যকা হয়ে কাংলা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পৌঁছে যাব জোংরি কিংবা চোরিকিয়াং হয়ে জোংরি । কিন্তু বাদ সাধল আমাদের পথপ্রদর্শক । ও কাংলার সঠিক পথ জানে না । তাই দোরজে আমাদের চোংপো লা টপকে নামিয়ে দিয়েছিল সিকিমে । আর ৪-৫ দিনের মধ্যে কলকাতা ফিরছি ।

ভোর হতেই চড়াই পথে চলতে শুরু করলাম । প্রোগ্রামের শেষের দিকে এত মাল নিয়ে চড়াই উঠতে বেশ কষ্ট হয় । একটা ছোট্ট নালার ধারে ধারে স্পষ্ট পথে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এলাম এক বুগিয়াল এলাকায় । যেন এক সবুজ গালিচা । ডানদিকের স্পষ্ট পথটা এগিয়ে গেছে লক্ষ্মী পোখরির দিকে । মালপত্র রেখে দোরজে নির্দেশিত পথটা দেখতে গেল এক সদস্য । পূর্বদিকে গিরিশিরাটির শীর্ষে যাবার স্পষ্ট পথ রয়েছে । ওর পিছু পিছু উঠে এলাম গিরিশিরাটির শীর্ষে । স্পষ্ট হল চারদিকের দৃশ্যাবলি । আমরা বিস্ময়স্তব্ধ । ম্যাপ নিয়ে বসে পড়লাম শৃঙ্গমালার নাম উদ্ধারে আর সেই সঙ্গে নিজেদের অবস্থান খুঁজতে । Contour ম্যাপের Xerox Copy নিয়ে বসলাম । কাংলা কাং, কোকতাং, রাথোং, কাবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পাণ্ডিম ও আরও অনেক শৃঙ্গমালা । সব দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে । অনেক দূরে রাথাং চু অববাহিকা ঘন অরণ্য ছাড়িয়ে অস্পষ্ট দেখা গেল জোংরির ডাকবাংলো । আর পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের বনানী অঞ্চলের ওপর ঘন মেঘের আবরণ । আমাদের ধারণা আমরা পৌঁছে গেছি জামলে পাস বা দরুলার ওপর । এখান থেকে জোংরির দিকে যাবার সরাসরি কোনও পথ নেই । সেই মুহূর্তে জোংরি যাবার কোনও পরিকল্পনাও আমাদের ছিল না । আমরা দোরজে নির্দেশিত দক্ষিণমুখো এক সুস্পষ্ট এবং প্রায় সমতল পথে চলতে শুরু করলাম । পাহাড়ের ঢালে বাদামি ঘাসের মধ্য দিয়ে আড়াআড়িভাবে পৌঁছে গেলাম গোপেথাং খরকা । অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনও লোকজনের সাড়া মিলল না । শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই । সবাই গবাদি পশু নিয়ে নেমে গেছে ওদের গ্রামের বাড়িতে । আমাদের দক্ষিণে আরেকটা গিরিশিরার ঢাল নেমেছে । এখান থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে পর পর তিনটে স্পষ্ট পথ চলে গেছে গিরিশিরাটির দিকে । এই গিরিশিরাটি পেরোতে হবে । কিন্তু পথ জানা নেই । ঠিক তখনই দক্ষিণ কোণে দেখতে পেলাম দুজন লোক নেমে আসছে গিরিশিরাটির সর্বোচ্চ পথ ধরে । আমরা চিৎকার করে ডাকতে থাকি । ওরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ে । আমরাও

নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়ে ভয়ে নেমে আসে ওরা। পশ্চিম সিকিমের বাসিন্দা তেগবাহাদুর সুব্বা সঙ্গে একজন মালবাহককে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। নেপালে গিয়েছিলেন তীর্থ দর্শনে। এ অঞ্চলের কয়েকটা পবিত্র জলাশয় দর্শন করে বাড়ি ফিরবেন। এ এলাকার পথঘাট সম্বন্ধে ওঁরা কিছু জানেন না। আমরা জানাই যে আমাদের গন্তব্যস্থল রিম্বি ও নির্দেশিত পথ দক্ষিণ হয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে। সুব্বা জানায় যে ওঁরা ওদিক থেকেই আসছেন। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তবে কি ভুল পথে আবার নেপালের দিকে চলেছি। ক্রমে দোরজে নির্দেশিত পথে আস্থা হারাই। এরই মধ্যে চারদিকটা ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল। দূরের পথঘাট আর কিছুই দেখা যায় না। বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নামা শুরু হল সুস্পষ্ট এক উতরাই পথ ধরে। সঙ্গে ওঁরা দুজন। এপথ দোরজে নির্দেশিত পথ নয় আবার সুব্বার নির্ধারিত পথও নয়। সুব্বার দেওয়া ভুট্টাভাজা খেতে খেতে দ্রুতগতিতে নামছি। ক্রমে ঘাস অঞ্চলের শেষে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট রডোডেনড্রন গাছগুলো অদ্ভুত লাগছে। ঘন কুয়াশায় দিক নির্ধারিত করতে ও পথঘাট খুঁজতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। অনেকক্ষণ চলার পর একটা ছোট্ট নালার ধারে পৌঁছলাম। আমাদের ধারণা এটা নিশ্চয়ই চলেছে রিম্বি চু নদীর দিকে। নালাটি পেরিয়ে বনমধ্যে একটা ভাঙা ঘর। ঠিক হল আরও কিছুটা এগনো যাক। আমরা নালাটির বাঁদিক ধরে নরম কাদামাটি মাড়িয়ে নামতে থাকি। কিন্তু আর কোনও পথ নেই। ফিরে এলাম ঘরটির কাছে। আজ এখানেই থাকা যাক। সুব্বা আশ্বাস দেন ওঁর সঙ্গে পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে, পরদিন সকালে প্রকৃত পথ খুঁজে বের করবেন।

২ নভেম্বর ভোর হতেই সুব্বা বেরিয়ে পড়ল পথ খুঁজতে। কোথাও কোনও স্পষ্ট পথের হদিশ পাওয়া গেল না। এবার ভাবলাম উঠে যাই আবার সেই গিরিবর্ত্মের মাথায়। ফেরার পথে এতসব মালপত্র নিয়ে কয়েক হাজার ফুট ওঠার জন্য কারও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত ঠিক হল এই নালাটি ধরেই নাম যাক। আমাদের আশা যে সামনে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব রিম্বি চু, আর নদী পেরিয়েই তো রামথাং গ্রাম। কখনও নালাটির ডানদিক আবার কখনও বাঁদিক ধরে জুতো ভিজিয়ে পথ চলা। মাঝে মাঝে উঠে আসি স্যাঁতসেঁতে পচা পাতার জঙ্গলে। দ্রুত চলার চেষ্টা। সুব্বা আর ওঁর মালবাহকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলাম না। একটা সময় নালাটিকে ডানদিকে রেখে কিছুটা ওপরে উঠে এলাম। নালাটির ধার ঘেঁসে চলা সম্ভব হচ্ছিল না। সুব্বার হদিশ না পেয়ে চিৎকার করে ডাকতে থাকি। ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল অনেকটা নিচু থেকে। ঘন কুয়াশায় চারদিকটা ঢেকে গেল। রডোডেনড্রন গাছের মধ্য দিয়ে ওঁদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হল না। ওদের সঙ্গ হারালাম। এবার নিজেদের চেষ্টাতেই পথ চলা শুরু। বাঁদিকের পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে শুনতে পেলাম বড় একটা নদীর প্রবাহ

গর্জন। নিশ্চয়ই আমরা রিম্বি চু-এর কাছাকাছি এসে গেছি। নদীগর্ভ অনেকটা নিচে। একঝলক দেখাও যায়। কিন্তু নামার মতো জায়গা নেই। শেষপর্যন্ত খাড়া পিচ্ছিল দেওয়ালে দড়ির সাহায্যে দুটো পর্যায়ে র‍্যাপেল করে নেমে এলাম অনেকটা নিচে। অন্ধকার হয়ে এল। সামান্য একটু সমতল জায়গা পেলাম না যেখানে পাঁচজন কোনওরকমে শুয়ে বসে থাকতে পারি। অবশেষে টর্চের আলোয় একটা হুমড়ি খাওয়া পাথর দেখতে পেলাম আর তারই ধারে এক টুকরো ঢালু জমি। কেউ কেউ লেগে পড়ল আগুন ধরাতে। এই স্যাঁতসেঁতে অরণ্যে এ এক অসাধ্য কাজ। স্লিপিং ব্যাগটা পায়ে ঢুকিয়ে কোনওরকমে শোবার চেষ্টা। গড়িয়ে খাদে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও বাদ দিতে পারছি না। সারাদিন সকলে অভুক্ত। সামান্য কয়েক টুকরো শুকনো খাবার খেয়ে কখন যেন কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ভোর হতেই গোছগাছ করে নামতে থাকি পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পাহাড়ের গা বেয়ে। মাঝে মাঝে পা আটকে যায় গাছের শিকড়ে। একধরনের কাঁটাযুক্ত শক্ত লতানে গাছ মাঝে-মাঝেই আটকে যায় রুকস্যাকে। একে উপেক্ষা করা যায় না। একটা নালা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম মূল নদীটির ধারে। আমাদের ধারণা এটাই রিম্বি চু। কিন্তু কোথায় রামথাং গ্রাম। ঘন অরণ্যে দূরের কিছুই দেখা যায় না। নদী পেরোতে কাজে লাগালাম একটা উপড়ে পড়া গুঁড়ি। তারপর হাত ধরাধরি করে পৌঁছে গেলাম নদীর বাঁদিকে। কিন্তু ওদিককার জঙ্গল আরও ঘন ও পাহাড়টা আরও খাড়া। অনেক চেষ্টা করেও পা রাখতে পারলাম না। ফিরে আসি নদীর ডানদিকে। মারাত্মকভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শুভময়। নাকে মুখে চোটও পেল। প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে হচ্ছে খুবই সাবধানে। ঠিক হল নদীর ডান ধার ঘেঁসেই নামা যাক। গত দুদিনে মাত্র একবেলা খাবার জুটেছে। বসে পড়ি দুপুরের রান্নার আয়োজনে। তাই কাঠ সংগ্রহের পালা। এ স্যাঁতসেঁতে অরণ্যে কোথায় পাব শুকনো কাঠ। অনেক কষ্টে আগুন ধরানো গেল। প্রেশার কুকারে জল চাপিয়ে চাল, ডালের খোঁজ পড়ল। ডালের পুঁটলিটা পাওয়া গেলেও চালের পুঁটলিটা পাওয়া গেল না। অনেকটা চাল ছিল। কারোর অসতর্ক মুহূর্তে চালের পুঁটলিটা পড়ে গিয়েছে রুকস্যাক থেকে। শেষ সম্বলটুকুও হারালাম। এক কাপ ডালের স্যুপ খেয়ে আবার চলা। উঠে আসতে হয় ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের গায়ে। যেখানে সূর্যের আলোর প্রবেশ নেই। হাত দিয়ে গাছের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে আবার কখনও শক্ত লতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে পথ করে চলা। হাতে অজস্র কাঁটা ফোটে। রক্তপাত হয়। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। ঘন রডোডেনড্রন জঙ্গলে সমস্যা আরও বেশি। শক্ত ডালপালা ভাঙা এক অসাধ্য কাজ। তাই কখনও হামাগুড়ি দিয়ে আবার কখনও শুয়ে কিংবা বসে চলতে হচ্ছে। মাঝে-মাঝেই আছাড় খাচ্ছি। নদীর ধারে মানুষের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা। সুব্বা ও তার সঙ্গী যদি

এই পথেই গিয়ে থাকে। কিন্তু ওদের পরিবর্তে পশুর পদচিহ্ন। জল খেতে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট পথে ওরা আসে, ফলে একটাই রাস্তা। ওই রাস্তায় আমাদের চলার প্রয়াস। কষ্টকর, কিন্তু তবু তো একটা রাস্তা। মাঝে-মাঝেই ওদের টাটকা বিষ্ঠা। ভয়ে ভয়ে হাঁটা। বিকেল চারটে নাগাদ চলার বিরতি। রাতের আস্তানার খোঁজ। তাঁবু টাঙানোর মতো জায়গা পেলাম না। একটা পাথরের ধারে কোনওরকমে পলিথিন চাদরটা টাঙিয়ে রাত কাটানো। কাছেপিঠে কোথাও জল নেই। খাড়া নদীগর্ভে নামা সম্ভব হল না। অনেক নিচু থেকে দড়ির সাহায্যে সংগ্রহ হয় সামান্য জল। কোনওরকমে চাপাচাপি করে শুয়ে পড়ি। সারাদিন অনেক কসরতের পরেও চলতে পেরেছি সামান্য পথ। নানা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধে। কীভাবে বের হব এই জঙ্গল থেকে। কোন দিকে গেলে গ্রামের সন্ধান পাব। সকলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। একটুকরো চকলেট আর জল খেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করেও সারারাত ঘুম হল না।

পরদিন ৪ নভেম্বর কাদামাখা জুতো আর মোজা পায়ে চলা শুরু। নদীটাই একমাত্র বাঁচার ভরসা আর পথ দেখাবার নিশানা। আমাদের আশা নদী ধরে নামলে একদিন না একদিন কোনও গ্রাম পাব। মাঝে-মাঝেই ছোট-বড় ঝরনা। সরাসরি ওদের পেরিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। ফলে উঠে আসতে হয় অনেক ওপরে। প্রায় ওদের মাথার কাছে। অনেক পথ, অনেক সময়। প্রায়ই এই খাড়া নদীগর্ভে রয়েছে বড় বড় পাথর কিংবা নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে খাড়া দেওয়ালের ধার ঘেঁসে। তাই উঠে আসতে হয় পাহাড়ের গায়ের স্যাঁতসেঁতে পচা পাতার অরণ্যে। তবুও মাঝে-মাঝে নেমে আসি নদীর ধারে। একটু উন্মুক্ত আকাশ আর দূরের কিছু দেখার চেষ্টা। নদীটির ধারে এলে একটা বাঁচার আশা দেখতে পাই। দুপুর নাগাদ একটা নালার ধারে পৌঁছনোর চেষ্টা করলাম। পথ খুঁজতেই অনেকটা সময় চলে যায়। হঠাৎই দেখলাম নির্মলের বেজায় ভারি রুকস্যাকটা ছিটকে চলেছে অনেকটা নিচে। শেষপর্যন্ত একটা গাছের ডালে আটকে গেল। আরও কিছুটা চলার পর নদীর ধারে নেমে এলাম র্যাপেল করে। ভাগ্যিস সঙ্গে দড়ি ছিল। বেজায় ভারি ও বড় আকারের রুকস্যাক নিয়ে এমন অরণ্যে দ্রুত চলা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই নদীর ধারে আমাদের আলোচনা বসল। কেউ বলল, মালপত্র সব এক জায়গায় ফেলে রেখে শুধু স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে সকলে একত্রে চলতে শুরু করি। কারও ইচ্ছে মূল্যবান আর একান্ত প্রয়োজনীয় টুকিটাকি ছাড়া সব মালই ফেলে দেওয়া হোক। আবার কারও ধারণা তাহলেও দ্রুত চলা সম্ভব হবে না। কারণ এই মুহূর্তে সকলের শারীরিক অবস্থা দ্রুত চলার উপযুক্ত নয়। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে নির্মল ও আলোক স্লিপিং ব্যাগ, দড়ি আর সামান্য টুকিটাকি নিয়ে নেমে যাবে দ্রুতগতিতে, লোক আর খাবারের সন্ধানে। নির্মলের শরীরটা তখনও শক্ত-সমর্থ রয়েছে। হিমালয়ের দুর্গম পথে ওর পদযাত্রার

অভিজ্ঞতা অনেকদিনের। অলোকের অভিজ্ঞতা নেহাত কম হলেও এই অঞ্চলে ম্যাপ এবং রুট নিয়ে ও যথেষ্ট নাড়াচাড়া করেছে। এদিকে আমরা তিনজন মালপত্র সহ এখানে অপেক্ষায় থাকব। আমার সঙ্গের দুজন এবছর নতুন দলে এসেছে, এত বড় ট্রেকে ওরা প্রথম এল। সামান্য ডাল ও নিউট্রেলা অবশিষ্ট ছিল। স্যুপ করে সকলে এক কাপ করে খেয়ে নিলাম। বেলা দুটোয় ওরা চলে গেল নদীটির ডানদিক ধরে। সঙ্গে খাবার মাত্র দুটো ক্যাডবেরি। বাকি স্যুপটা প্রেশার কুকারসুদ্ধ রেখে দিলাম নালার ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে। দূরের একটা বড় পাথরের ওপর তাঁবুর টকটকে লাল আউটার কভারটা টাঙানো রইল। এ জায়গাটা একটু ফাঁকা ও শুকনো। সন্ধে হতেই আগুন ধরানো হল। দুশ্চিন্তা হয় ওদের এভাবে পাঠিয়ে ভুল করলাম না তো। সকলে একসঙ্গে গেলেই হয়তো ভালো হত। রাতে ঘুম নেই, তবুও কষ্ট করে শুয়ে থাকা। ভোরে ওঠার তাড়া নেই, তবু ভোরেই ওঠা।

শুরু হল এক অন্তহীন প্রতীক্ষা। নদীর শব্দ ও পাখির ডাক বুঝিয়ে দেয় আমরা বেঁচে আছি। এই মুহূর্তে চলাফেরা করে কিংবা কথা বলে ক্যালোরি খরচ করাও উচিত নয়। বিকেল হতেই একটা বড় পাথরের ওপর বসে চেয়ে থাকি দক্ষিণদিকে অর্থাৎ নদীর গতিপথের দিকে অন্ধকার হতেই আবার সেই গতানুগতিক আগুন ধরানো। আগুন দেখতে পেলে হিংস্র জানোয়ারেরা কাছে আসবে না। আর আমাদের আশা যদি দূরের কোনও লোকের নজরে পড়ি। তাছাড়া আগুন ধরানোর খেলায় সময়ও কাটে কিছুক্ষণ। আমাদের দুপুরের ও রাতের বরাদ্দ আধ কাপ করে ডালের স্যুপ। আর রয়েছে নদীর পর্যাপ্ত জল। দিন যায় রাত আসে। ক্রমে নদীর শব্দটাও একঘেয়ে আর অসহ্য লাগে। একটা দুশ্চিন্তা অনবরত তাড়া করে যাচ্ছে। এইভাবে কাটে পাঁচটা রাত। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় নির্মল আসছে। প্রতিটি শব্দই মনে হয় নির্মলের পায়ের শব্দ। আশা আর আশাভঙ্গ এই আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। ডালের স্যুপটাও শেষ।

অবশেষে ৯ তারিখ হাঁটতে শুরু করলাম। সঙ্গে নিলাম সকলের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র ও পথের একান্ত প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। বাকি সব পড়ে রইল তাঁবুর মধ্যে। আর সঙ্গে রেখে গেলাম একটা চিঠি। চলার শুরুতেই শুভাশিস মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ও নিজেকে সামলে নিতেই আমরা নদীর ডানদিক ধরে চলতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে নামতে হচ্ছে পিচ্ছিল পাথরের দেওয়াল ধরে। রুকস্যাকগুলো নামিয়ে দিতে হয় দড়ির সাহায্যে আর নিজেদের নামতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। একটা রডোডেনড্রনের ঢাল। হঠাৎ শুভাশিস ভারসাম্য হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল আমার ওপর। নিজেকে সামলানোর আগেই দুজনে আরও কিছুটা গড়ানোর পর থামলাম অনেকটা নিচে। পায়ে সামান্য চোটও লাগল। নদীর ধারের ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে চলা খুবই কষ্টসাধ্য। গাছের ডালে কিংবা শক্ত লতায় রুকস্যাক আটকে যায় বারবার। গ্লাভস পরা হাতে কাঁটাগাছের ডাল

ভাঙছি । তবুও হাত পা ছড়ে যায় । গ্লাভসও ক্ষতবিক্ষত । নদীর ওপরের কয়েকটা পাথর পেরিয়ে এলাম আশ্চর্যভাবে । কোনওটা টপকে আবার কখনও কোনও কোনও ফাটলের মধ্য দিয়ে । সবচেয়ে হতাশ লাগে যখন অনেকটা নামার পর আর নামা সম্ভব হয় না । উঠে আসতে হয় অন্য পথের সন্ধানে । মাঝে-মাঝে কাদামাটির জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে । ট্রাউজার আর জ্যাকেটে কাদা মাখামাখি । এরইমধ্যে পরনের পোশাক শতছিন্ন । সারাদিনে নামতে পেরেছি সামান্যই । তবুও ভালো লাগে । গত পাঁচদিন এক জায়গায় বসে মনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল আজ তা খানিকটা কমেছে । নদীর ধারে কয়েকটা ঝোপ গাছ । নীল আর বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফল ধরেছে । মনে পড়ে ১৯৭৮-এ গাড়োয়ালে রূপগঙ্গা ধরে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নামছিলাম । সেবার আমার পথপ্রদর্শক রাজেন্দ্র সিং এই ফলগুলো তুলে আমায় দিয়েছিল । একটু কষা হলেও বেশ মিষ্টি । তাই ফলগুলো খেতে ভরসা পেলাম । সেবার ফল তুলতে গিয়ে ভাল্লুকের সামনাসামনি পড়তে হয়েছিল । এগুলো খেতেই ভাল্লুক নেমে এসেছিল নদীর ধারে । আজ এখানেই পাথরের চাতালে প্লাস্টিক চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ি । ওপরে চাঁদোয়ার মতো করে টাঙিয়ে দিই তাঁবুর লালরঙের আউটার কভারটা । ততক্ষণে রাতের খাবার তৈরি হয়ে যায় । শুধু নুন জল ।

দিনের আলো ফুটতেই সঙ্গীদের ডাকাডাকি শুরু করি । কিন্তু ক্লান্ত আর অবসন্ন শরীরের জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে সময় লাগে । একইভাবে এগনো । চলতে চলতে যদি কোনও গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি তবে একে একে সকলে মারা পড়ব । কিন্তু তবুও কেউ বসে পড়ব না, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা । সবসময় কোনও ডাকের জন্য কান খাড়া করে আছি । সারাদিনই শুধু নামার চেষ্টা । আমাদের উদ্ধারে যদি কেউ এ অরণ্যে আসে তবে এ বিশাল ঘন অরণ্যে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম । সেদিন রাত কাটাই নদীর ধারে হুমড়ি খাওয়া পাথরের নিচে একটা সুন্দর গুহায় । সহজেই বোঝা যায় এটা জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা । নদীর ধারে বালিমাটিতে নির্মলদের জুতোর ছাপ আর একটুকরো কাগজ । বুঝতে পারি ওরা এপথেই নেমেছে । শুভময়ের পরনে লাল রঙের ট্রাউজারটা ক্ষতবিক্ষত । তার থেকে একটুকরো ছিঁড়ে টাঙিয়ে দিই গুহাটির সামনে ।

১১ নভেম্বর শুরুতেই ঝোপঝাড়ের ডাল ভেঙে পথ চলা । মাঝে-মাঝে গাছের ডাল ধরে নামতে হয় খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে । মস আচ্ছাদিত ডালপালায় ভরসা নেই । ডাল ভেঙে পড়ে গেছি কয়েকবার । কোথাও কোথাও শুকনো কিংবা পচা পাতার নিচে এবড়োখেবড়ো পাথর । ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই । পাথরের খাঁজে পা ঢুকে গেছে কয়েকবার । অনেক কষ্টে টেনে তুলতে হয়েছে শরীরটাকে । মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের

গায়ে টিকটিকির মতো উঠে আসতে হয়েছে ওদের মাথায় । প্রতি পাহাড়ের বাঁকেই মনে হয় এটা পেরোলেই দূরে দেখতে পাব রামথাং গ্রাম । একটা বাঁক শেষ হতেই সামনে আরেকটা বাঁক হাজির । বনমধ্যে নানারকমের ফল ধরেছে কিন্তু খেতে ভরসা পেলাম না । চলতে চলতে শুভময় সংগ্রহ করে চলেছে মাশরুম । আর আমি লেগে পরলাম বিছুটি গাছের ডগা তুলতে । হিমালয়ের পথে মালবাহকের সংগৃহীত মাশরুম খেয়েছি । আর বিছুটি শাক খাওয়ার সুযোগও অনেকবার ঘটেছে । বিকেল হতেই নদীর ধারে কোনওরকমে মাথা গোঁজার মতো জায়গা করে নিলাম । অনেক দরকারি কাগজপত্র পুড়িয়েও ভিজে কাঠে আগুন ধরানো গেল না । সব চেষ্টাই বৃথা । যথারীতি নুনজল খেয়ে শুয়ে পড়ি । আমরা সঙ্গে বয়ে চলেছি কয়েক হাজার টাকা । এই মুহূর্তে সেগুলো কাগজের বান্ডিল ছাড়া আর কিছুই নয় । রাতে বৃষ্টি নামল । আকাশ ধোয়া বৃষ্টি । সব জায়গাটাই তখন একটা নদী । কোনওরকমে বসে থাকা । সবকিছু কাকভেজা । একটু তন্দ্রা, ভোর হতেই চোখ খুলেই দেখি বিছুটি শাক । পরম মমতায় হাত বোলাতে গিয়ে অনুভব করি আঙুলে টান ধরেছে । হাতে পায়ে কেমন একটা আটকে যাওয়া ভাব । সবকিছু শুকিয়ে নিয়ে চলা শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল । সামনে আমাদের পথ আটকে এক বিশাল ঝরনা । উঠতে হবে ওর মাথায় । সরু বাঁশের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্টে উঠে এলাম ঝরনাটির মাথায় । বড় একটা নালা নেমেছে পশ্চিমদিক থেকে । ম্যাপের সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পাই না । ম্যাপ আর ভরসা নয় । ভরসা শুধু নদীর গতিপথ ।

এখান থেকে একটা ফার্নের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলার চেষ্টা । নদীটা অনেক নিচে । নামতে হবে অনেকটা । পাথরের ফাটলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা একটা সরু রডোডেনড্রন গাছ । ডালটা ধরে দেখছি কীভাবে নামা যায় । পিচ্ছিল পাথরের ওভারহ্যাঙ । ওখান থেকে নামা সম্ভব নয় । হঠাৎই পাটা হড়কে গেল । ডালটা ধরা ছিল, তাই না পড়লেও শূন্যে ঝুলছিলাম । অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও দেহটাকে ওপরে তুলতে পারলাম না । রুকস্যাকটাকে ফেলে দেওয়াও সম্ভব হল না । কারণ এক হাতে নিজেকে ঝুলিয়ে রাখতে পারব সে ভরসাও ছিল না । অন্যরাও অনেকটা ওপরে । ওদের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয় । তাছাড়া দড়িটাও আমার কাছে । নিচের দিকটা দেখে নিলাম । সরাসরি পড়লে আর রক্ষে নেই । দেওয়ালের দিকে মুখ করে দুপায়ে পাথরের দেওয়ালটাকে ঠেলে ডালটা ছেড়ে দিলাম । পড়লাম রুকস্যাকের ওপর । ছিটকে গেলাম জঙ্গলের ঢালের দিকে । কয়েকটা এলোপাতারি ডিগবাজি খেতে খেতে চোখটা অন্ধকার হয়ে এল । কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়েছিলাম জানি না । ওই অবস্থায় আরও কতটা নিচে গড়িয়েছিলাম তাও জানি না । ক্রমে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসে । ওরা আমায় ডাকছে । মনে হল অনেক দূরের শব্দ । জ্ঞান ফিরতেই চোখ খুলে দেখি গাছের ডালে আটকে আছি

। চশমাটা ভেঙে দড়িতে ঝুলছে । প্রথমে হাত দুটো, পরে পা দুটো নাড়লাম । বুঝলাম আমি বেঁচে আছি । রুকস্যাকের ফ্রেমটা ভেঙে চুরমার । ততক্ষণে সঙ্গীরা কাছে পৌঁছে গেল অন্য পথে । আমাকে টেনে তুলল । সমস্ত শরীরটা কাঁপছে । কিন্তু আশ্চর্য, আমার কোথাও কোনও মারাত্মক চোট লাগেনি । আইস এক্সটা খোয়া গেল । শেষ হাতিয়ারটাও হারালাম । রুকস্যাকের মধ্যের ক্যামেরাগুলোর কী অবস্থা হল দেখার মতো ইচ্ছে আর নেই । প্রায় ২৫-৩০ ফুট ওপর থেকে পড়েছিলাম । সঙ্গে আরেকটা চশমা ছিল তাই ভরসা । চশমা ছাড়া উঁচু-নিচু পাথুরে জায়গায় আমার পক্ষে এক পাও চলা সম্ভব নয় । ক্রমে নদীর ধারে নামতে থাকি । সেদিন আর বেশিদূর এগনো হল না । গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে নদীর ধারে তাঁবুর আউটার কভারটা টাঙিয়ে নিলাম । সারা শরীরে অনুভব করি অসম্ভব ব্যথা ।

১৩ নভেম্বর বেরোতে যথারীতি দেরি হয়ে যায় । ভাঙা রুকস্যাক নিয়ে শুরু হয় আরেক যন্ত্রণা । দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চলতে শুরু করলাম । নদীটা হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে চলেছে । নদীগর্ভ অসম্ভব খাড়া এবং সরু হয়ে এল । ক্রমে নদীর ধার ঘেঁসে নামা অসম্ভব হয়ে ওঠে । গতকালের দুর্ঘটনার পর পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুতে উঠতে মন সায় দেয় না । তাই দ্বিধাগ্রস্ত ও বেসামাল হয়ে নামার চেষ্টা । শতচ্ছিদ্র নোংরা বেশভূষা, উস্কোখুস্কো চুল, হাতে-পায়ে ময়লার আস্তরণ । কঙ্কালসার শরীর, সব মিলিয়ে সকলের চেহারায় একটা পাগল পাগল ভাব । কাদা মাখানো হান্টার জুতোগুলোর অবস্থা শোচনীয় । ফাটতে শুরু করেছে । ভয় হয় জুতো ছাড়া হাঁটব কী করে? ক্রমশ বাঁদিকের পাহাড়টা শেষ হয়ে আসছে । তারপরই পূর্বদিক থেকে অন্য কোনও নদী এসে মিশেছে এই নদীটির সঙ্গে । আমাদের আজ পৌঁছতে হবে ওই সঙ্গমস্থলের কাছে । সারাদিনই নামার চেষ্টা । কখনও নদীর ওপরের ভিজে আর পিচ্ছিল পাথর টপকে আবার কখনও ঝোপঝাড় ভেঙে । কিন্তু সঙ্গমস্থল এখনও অনেকটা নিচে । আজ আর পৌঁছনো গেল না । এবার রাতের আশ্রয়ে খোঁজ । নদীর ধারে জল আছড়ে পড়ছে । ঠাঁই মিলল না । কর্দমাক্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঠার চেষ্টা । হঠাৎ একটা বাঁশির শব্দ । একটু থমকে গেলাম । হয়তো বা কোনও পাখির ডাক । এর আগে এরকম ভুল হয়েছে কয়েকবার । ওপরের জঙ্গলে কোনও কিছুর চলার শব্দ । ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম । আকস্মিকভাবে ভূত দেখার মতো দেখলাম পাঁচজন লোক কুকরি দিয়ে গাছ আর ডালপালা কাটতে কাটতে নামছে । আমরা চিৎকার করে ডাকতে থাকি । হিন্দি, বাংলা আর নেপালি মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষায় আমাদের সমবেত আর্তনাদ-'আমরা জঙ্গলে পথ হারিয়েছি । অনেকদিন কিছু খেতে পাইনি ।' বলতে বলতে চোখে জল এসে গিয়েছিল । ওরা দ্রুত নেমে আসে । আমার হাতে দেয় একটা চিঠি । নির্মল ও আলোক পাঠিয়েছে । জানতে পারি নির্মলরা এক দুঃসাহসিক

প্রচেষ্টায় আটদিনের শেষে ১১ নভেম্বর পৌঁচেছে ইয়াকসাম । আর ১২ নভেম্বর সকালে পাঠিয়েছে এই উদ্ধারকারীদল । আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না । মানুষ দেখছি না ভূত দেখছি । জেগে আছি না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি । নিমেষে ওদের ধারাল কুকরির ঘায়ে শখানেক সরু গুঁড়ির গাছ শুয়ে পড়ল । জায়গাটা পরিষ্কার করে তৈরি হয় রাতের আশ্রয় । রান্না আরম্ভ হয় । আবার জীবনে ফিরে আসি । ম্যাগির স্যুপ আসে ।

উদ্ধারকারীদলের সঙ্গে আমাদের দেখাটাও এক দৈবাৎ ঘটনা । আমরা যখন রাতের আশ্রয়ের খোঁজে ওপরে উঠার চেষ্টা করেছিলাম ওরা তখন নামছিল নদীর ধারে রাত কাটাবে বলে । ওরা ১১ নভেম্বর ইয়াকসামের নিচে নদীর ওপর পুল তৈরি করে । আর ১৩ নভেম্বর চলে আসে নদীটির ডানদিকে । প্রথমদিনই খুঁজে পায় আমাদের । ওদের কাছেই প্রথম জানতে পারি আমরা যে নালাটি ধরে এতদিন নামছিলাম এর নাম রিম্বি চু নয় । এর নাম রাথাং চু বা বেসক্যাম্প নালা । নিচের সঙ্গমটি হল প্রেক চু-এর সঙ্গে রাথাং চু-এর মিলন । মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারি আমাদের ভুলটা কোথায় । দোরজে ছেত্রী নির্দেশিত পথের ওপর আস্থা হারিয়ে আমরা ভুল পথে নেমে এসেছিলাম রাথাং চু অববাহিকার ঘন অরণ্যে । ওর দেখানো বা বোঝানো ম্যাপ আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি । গোপেথাং খরকা থেকেই হয়েছিল আমাদের ভুল পথে যাত্রা । সঠিক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথ থেকে বিচ্যুতি । উদ্ধারকারীদলের সবচেয়ে বয়স্ক ও শক্তসমর্থ লোকটা নদী থেকে ধরেছে কয়েকটা ব্যাঙ । ব্যাঙের মাংসের স্যুপ খেলাম পরম তৃপ্তি করে । ওদের কাছেই খবর পেলাম, নির্মলের মাথায় দারুণভাবে আঘাত লেগেছে । ও এখন ইয়াকসামে চিকিৎসাধীন । ওর মাথার পিছনদিকটা অনেকটা কেটে গেছে । আর সেই রক্তাক্ত অবস্থায় আঘাত নিয়ে চলতে হয়েছে কয়েকদিন । অবশ্য এখন ও অনেক ভালো, হোটেলে আছে । ঠিক করলাম সমস্ত মালপত্র উদ্ধার করে দু-তিনদিনের মধ্যে ফিরে যাব ইয়াকসাম ।

এবার আসি নির্মল আর অলোকের প্রসঙ্গে । কীভাবে ওরা পৌঁছেছিল ইয়াকসাম । ৪ নভেম্বর আমাদের বিদায় জানিয়ে নির্মল ও অলোক নদীটির ডানদিক ধরে দ্রুতগতিতে নামতে থাকে । কখনও পাথর টপকে আবার কখনও পিচ্ছিল পাথরের গা বেয়ে । সেদিন রাত কাটায় নদীর ধারে খোলা আকাশের নিচে । পরদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছে গিয়েছিল একটা ঝরনার মাথায় । সরু বাঁশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নামার পথে শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি । তাই বেশিদূর আর এগোতে পারল না । তৃতীয়দিন হন্যে হয়ে নামার চেষ্টা । ম্যাপ দেখে ওদের ধারণা হল যে প্রকৃত পথ পাওয়া যাবে ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে । বনজঙ্গল ভেঙে অনেক কসরত করে উঠে এল অনেকটা ওপরে । সঙ্গে ক্যাডবেরি দুটোও শেষ । খাওয়ার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না । বনমধ্যে অনেক রকমের ফলমূল । কিন্তু খেতে ভরসা পেল না । তবুও খিদের তাড়নায় ফল খাওয়ার চেষ্টা । তার ফল হল উল্টো ।

গলার যন্ত্রণা, রক্ত পায়খানা আর বমি হল অলোকের । বেলা পড়ে এল । নদীর ধারে নামতে হবে রাতের আশ্রয়ের জন্য । সামনে পড়ল একটা পাহাড়ের ঢাল । দড়ির সাহায্যে প্রথম পর্যায়ে নেমে এল একটা গাছের ওপর আর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিছুটির জঙ্গলে । অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে পেল একটা প্রকাণ্ড পাথর । তারই ধারে কোনওরকমে রাত কাটানো । হাতে পায়ে তখন বিছুটির যন্ত্রণা ।

চতুর্থদিন নামার পথে ঘটে এক দুর্ঘটনা । পচা পাতা আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা গাছের ডাল ধরে নামছিল নির্মল । হাতে ধরা ডালটা ভেঙে গেল । নির্মল গড়িয়ে পড়ে অনেকটা নিচে । মাথাটা গিয়ে লাগল একটা পাথরে । নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়ায় । হাত দিয়েই বুঝতে পারে মাথার পিছনদিকটা অনেকটা কেটে গেছে । একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা হলেও চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়তে থাকে । ওই অবস্থায় নেমে আসে নদীর ধারে । শেষপর্যন্ত ব্যান্ডেজটা খুলতেই রক্তে ভেসে গেল আঘাতের জায়গাটা । নির্মল কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারায় । নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয় অলোক । ততক্ষণে জামা আর জ্যাকেটটা রক্তে ভেসে গেছে । খোলা আকাশের নিচে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে নির্মল । পরদিন বন্ধ হয় রক্তপাত । কিন্তু আর চলতে পারছিল না । পথ করার দায়িত্বে যায় অলোক । নির্মল বারবার পিছিয়ে পড়ে । সেদিন আর বেশিদূর এগনো হল না ।

৯ তারিখ চলার পথে দেখতে পেল দূরের জঙ্গলে আগুনের ধোঁয়া আর পুবদিক থেকে নেমে আসা একটা নালার ওপর ব্রিজ । নেমে এল নদীর ধারে । নদীটি পেরোতে হবে । অলোক জানায় ম্যাপ অনুযায়ী ওদিকে রামথাং গ্রামে যাবার কোনও পথ নেই । তাছাড়া নদীটাও প্রচণ্ড খরস্রোতা । নদী পেরনোর আশা ছেড়ে দিয়ে নামতে থাকে নদীটির ডানদিক ধরে । পূর্বদিকে দূরের পাহাড়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় চমরী গাই নিয়ে চলেছে লোকজন । চিৎকার করে ডাকতে থাকে । নদীর শব্দে সে আর্তনাদ ওদের কাছে পৌঁছয়নি । পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে বিকেলে দেখতে পায় দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটা পাহাড়ের মাথায় গ্রাম রয়েছে । ওদের ধারণা, ওরা পৌঁছে গেছে রামথাং গ্রামের উল্টোদিকে । যে করেই হোক নদী পেরিয়ে পৌঁছে যেতে হবে ওখানে । সেদিন নদীর ধারে নাম সম্ভব হল না । রাত কাটায় একটা গিরিশিরার ঢালে । কাছেপিঠে কোথাও একফোঁটা জল নেই । খিদে আর পিপাসা পাল্লা দিয়ে চলে । আর জিভ শুকিয়ে আসে । ওষুধের প্যাকেট থেকে বের করল antacid tablet.ওগুলো চুষেও গলা ভিজল না । শেষপর্যন্ত স্বমুত্র পান করেও তেষ্টা মেটাতে পারল না নির্মল । গত চারদিন নুনজল ছাড়া কিছুই পেটে পড়েনি । পরদিন সকালে নেমে এল নদীর ধারে । অলোকের পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা । নিরুপায় হয়ে অভুক্ত

অবস্থায় খেয়েছিল Brufen tablet. ফলস্বরূপ নদীর ধারে পৌঁছে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল অলোক ।

১০ নভেম্বর সকালে ওদের সংকল্প যে করেই হোক নদীটা পেরোতে হবে । উলঙ্গ হয়ে নির্মল নেমে পড়ল হিম শীতল জলে । মাথায় তুলে নেয় প্লাস্টিকের চাদরে মোড়া স্লিপিং ব্যাগ, আর পরনের বেশভূষা । কোমরে বাঁধা দড়িটা ধরে রাখে অলোক । কিছুটা হেঁটে আর বাকিটা সাঁতার কেটে দ্রুত পার হয় নির্মল । এবার অলোকের পালা । অলোক অনেকটা সময় স্রোতের মধ্যে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না । নির্মল ওকে টেনে তুলল দড়ির সাহায্যে । বেশ কিছুক্ষণের জন্য ওদের শরীরে কোনও সাড় ছিল না । এবার পূর্বদিকে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা । বিকেল নাগাদ পৌঁছে যায় একটা রাস্তায় । বুঝতে পারে ওরা চলেছে রামথাং গ্রামে নয় । ওরা চলেছে ইয়াকসামের দিকে । থানা আর স্থানীয়দের ঘটনার বিবরণ দিয়ে পৌঁছে যায় হাসপাতালে । এরইমধ্যে নির্মলের মাথার আঘাতটা পচতে শুরু করেছে । মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই নির্মল ব্যস্ত হয়ে পড়ল উদ্ধারকারীদল তৈরি করতে । আর ১২ তারিখ সকালে ওদের পাঠিয়ে দেয় আমাদের উদ্ধার করতে ।

১৪ তারিখ সকালে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে গাছ কেটে তৈরি হল শক্তসমর্থ একটা পুল । আমাদের ধরাধরি করে নিয়ে চলেছে সেই পুলের দিকে । অজস্র গাছ কেটে তৈরি হল একটা পথ । পুল পেরিয়ে রাথাং চু-এর বাঁদিকে উঠে এলাম একটা হুমড়ি খাওয়া প্রকাণ্ড পাথরের কাছে । উদ্ধারকারীদলে সর্দার উগেন তেন্বা ভুটিয়া সঙ্গে একজনকে নিয়ে নদীটির ডানদিক ধরে এগিয়ে চলল মালপত্র উদ্ধার করতে । আমরা পাথরটার নিচেই সেদিনকার মতো জায়গা করে নিলাম । বিকেলে নদীর ধার থেকে উঠে এল অনেক লোকজন । ১২ জনের আরেকটি উদ্ধারকারীদল । পুলিশ, বনদপ্তর ও ইয়াকসামের যুবক সংঘ সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি ১৪ তারিখ সকালে বেরিয়েছে ইয়াকসাম থেকে । ওরা আরও একটা পুল তৈরি করে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের গতকালের আস্তানায় । বুঝতে পারে আমরা এখন নিরাপদে । আমাদের খবর নিয়ে ওরা ইয়াকসামের দিকে রওনা হল । এদিকে উগেন তেন্বা অনেকটা পথ করেও পৌঁছতে পারল না আমাদের সেই ফেলে আসা তাঁবু পর্যন্ত । ফিরতে ওদের অনেক রাত হল । পথে ওদের ভাল্লুকের সামনাসামনি পড়তে হয়েছিল ।

পরদিন সারাদিনের চেষ্টায় সব মালপত্র উদ্ধার হয় । ভাবতে কষ্ট হয় যে তিনটে লোকের প্রাণ বাঁচাতে এই রাথাং চু অববাহিকার জঙ্গলে কাটা পড়ল শয়ে শয়ে গাছ । ১৬ নভেম্বর বেরিয়ে পরলাম ইয়াকসামের উদ্দেশে । তখন একমাত্র আশঙ্কা কতক্ষণে দেখা হবে নির্মল আর অলোকের সঙ্গে । একটা গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে উদ্ধারকারীদলের সঙ্গে

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উঠে এলাম বাকিম বিশ্রামগৃহে আর ইয়াকসাম পৌঁছলাম বিকেলে । গিয়ে দেখি নির্মল হোটেলের সামনে আমাদের অপেক্ষায় ।

ভ্রমণ মে, ১৯৯৬

নতুন করে পাব বলে

বন্দনা সান্যাল

একেবারে বদ্রীনাথের কোলে সুপ্রিয়া হোটেল, বালানন্দ তীর্থাশ্রমের ঠিক নিচে । হোটেলের লাগোয়া সাদামাটা বাসস্থান । তৈরি করেছিলেন সুপ্রিয়ার স্বামী । এখন তিনি নেই, কিন্তু ঘরের সামনে সকৌতুকে লিখে রেখে গেছেন নিজের নাম-ভ্রমণানন্দ সংসারী । ভ্রমণে আমারও আনন্দ, সংসারী আমিও । কিন্তু আমার কি সাহস হত স্বর্গের কাছাকাছি এই হিমালয়ের চূড়ায় বসে হোটেল চালানোর?

আগেও গিয়েছি, এবারও গেলাম । কিন্তু কোথায় যেন একটা তফাত ছিল । ছিল সেই হাওড়া স্টেশন থেকেই । এবার কেদার-বদ্রী যাত্রায় আমাদের সহযাত্রিণী ছিলেন সপরিবারে স্বয়ং মা দুর্গা । উপাসনা এক্সপ্রেস ছাড়ব ছাড়ব, অথচ তিনি এখনও এসে পৌঁছলেন না । উৎকণ্ঠ আমরা, দশজনের ছোট্ট ট্যুরিস্ট দল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে । অবশেষে মিনিট পনেরো সময় হাতে থাকতে এসে পৌঁছলেন । কেউ একজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, মা এবার ঘোটকে আসছেন কি না!

আমাদের পনেরো দিনের প্যাকেজ ট্যুরে নিয়ে যাচ্ছে চাটুজ্যে পরিবার-সুপ্রিয়া, তার ছেলে নীরব, তার বৌ সোমা এবং তাদের ছ বছরের দুর্ধর্ষ ছেলে নিমু ।

ভ্রমণে স্থানমাহাত্ম্যটা জরুরি তো বটেই, তবে তার পাশাপাশি মানুষের সান্নিধ্যও জরুরি হয়ে ওঠে, বা বলা যায় 'ইন্টারেস্টিং', যদি মানুষগুলো একটু অন্য রকমের হয় । এবারে এরকম অন্য রকম কিছুর সন্ধান পেয়েছিলাম, তাই পুরনো বদ্রীর নতুন কাহানিটা না লিখে পারলাম না ।

প্রথমেই এই সুপ্রিয়া ট্যুরের উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে দু কথা লিখি । ট্যুরিজমের ব্যবসাটা এই বাংলায় জমে উঠেও যেন ঠিক জমছে না । আমরা যারা বেড়াতে ভালোবাসি, প্রায়ই ভাবি আরও কত কী করা যায় । সেক্ষেত্রে, এই যে হিমালয়ের চূড়ায় বসে হোটেল চালায় সুপ্রিয়া, আর তার পাশাপাশি ছোট বড় ট্যুর পরিচালনা করে মাঝারি খরচায়, এতে নিজের সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দিত হওয়া ছাড়াও আমার আনন্দ হয়েছিল একজন বাঙালি মহিলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় । সত্যি বলতে কি, পনেরো দিনের এই ভ্রমণে জায়গা দেখা ছাড়াও এই সব প্রাপ্তিও নগণ্য ছিল না ।

শুনলাম ওরা নাকি প্রত্যেক বছরই কলকাতা থেকে মূর্তি নিয়ে গিয়ে বদ্রীতে দুর্গাপুজো করে। তাই, বলাই ছিল, এই ট্যুরের শেষ পাঁচ দিন টানা বদ্রীতে থাকা হবে। এতে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, বোরিং। আমার কিন্তু এই পাঁচটা দিন মনে থাকবে অনেক কাল। হরিদ্বার থেকে রিজার্ভ করা বাসে মা দুর্গাকে নিয়ে সোজা গৌরীকুণ্ড। সেখান থেকে কেদার হয়ে, কালীমঠ, চোপতা হয়ে যোশিমঠ, সেখানে রোপওয়ে চেপে আউলি দেখে বদ্রীর রাস্তা ধরে বালানন্দ তীর্থাশ্রমে গিয়ে হল্ট। হু হু ঠান্ডা। রাতে নাকি এক পশলা বরফ বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল মন্দির থেকে ভেসে আসা ভজনের আওয়াজে। লেপের মায়া কাটিয়ে উঠে লম্বা করিডরের প্রান্তে বড় কাচের জানলা দিয়ে দেখি নারায়ণ পর্বতের পাশ দিয়ে নীলকণ্ঠ উঁকি দিচ্ছেন। ভোরের আলোয় একটু আবছা, কিন্তু একটু পরেই স্বমহিমায় দৃপ্ত হয়ে উঠলেন। আর তো ঘরে থাকা যায় না। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ছুটলাম মন্দিরের দিকে। নারায়ণের অভিষেক শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে ঘেরা জায়গায় বেশি টাকার টিকিট কাটা সৌভাগ্যবানেরা বসে। আমরা ভিড়ের মধ্যে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ব্যারিকেডের পাশে একদম সামনেই দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ দেখা যাচ্ছে। গর্ভগৃহে কালো জোব্বা সোনালি কোমরবন্ধ পরা সুদর্শন গাড়োয়ালি পূজারী দুধে, ঘিয়ে, অলকনন্দার জলে বিগ্রহকে স্নান করিয়ে, মুছিয়ে, অন্তত দু কেজি ওজনের চন্দনের তাল জঠরে লেপে দিলেন। কি জানি, নারায়ণের এটা কেন প্রয়োজন, জঠরাগ্নি নেভাতে কি? এদিকে কাঁপা কাঁপা গলায় রানিং কমেন্টারি দিয়ে যাচ্ছিলেন আরেক পুরোহিত। গলা কাঁপছে, সে কি ঠান্ডায়, না এটাই মন্ত্রোচ্চারণের রীতি? তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন অভিষেকের নিয়মকানুন, পরিচয় দিচ্ছিলেন দেবতার। সব বুঝলাম না। বুঝলাম না পদ্মাসনে বসে কালো পাথরের উনি বিষ্ণু না বুদ্ধ, যাঁকে অলকানন্দার জল থেকে উঠিয়ে এনেছিলেন স্বয়ং শঙ্করাচার্য। এ সবই ক্রমে অবান্তর হয়ে যাচ্ছিল, এত ভিড়েও একলা হয়ে যাচ্ছিলাম, আর সেই একাকীত্বের ওড়নার তলায় কার সঙ্গে যেন শুভদৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি বুদ্ধ, না বিষ্ণু, না নীলকণ্ঠ, নাকি বদ্রীনাথের রুক্ষ পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়ানো পাথুরে রূপের তরঙ্গ যাঁর পায়ের তলায় তেমনই রূপের তরঙ্গ তুলে নেচে চলেছে অলকানন্দা? বলা মুশকিল।

হিমালয় নাকি দেবতাত্মা। এখানে এলে সেটা অস্বীকার করা যায় না। আমি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গল্পগুজব করার সময় এবার অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনলাম। কুন্তলা বলল, সেবারের ভীষণ ভূমিকম্পের আগে ও বদ্রীতে ছিল। পার্বতী মা, সেই সুন্দরী নেপালি বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী যিনি রোজ ভোর চারটেয় অলকানন্দার বরফ গলা জলে শরীর ডুবিয়ে পূজার্চনা করতেন, প্রণাম করতেই ওকে ডেকে বললেন, বেটি, তোমার পুজো তো সারা হয়ে গেছে, আর দেরি কেন, ঘরে ফিরে যাও। হঠাৎ এ কথা শুনে ওর সারা শরীরে

যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, ও তড়িঘড়ি বাক্সপ্যাঁটরা বেঁধে হৃষীকেশে যেই নামল অমনি হিমালয় মাথা ঝাঁকিয়ে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলেন। সেবার সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ও বেঁচে গিয়েছিল। সোমা বলল, সেবার ও কালীশিলা দেখবে বলে কালীমঠ থেকে রওনা হয়েছিল। অসম্ভব চড়াই, কঠিন রাস্তা, ওর মাথা ঘুরছিল, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছিল। ও যখন একটা পাথরের ওপরে বসে হাঁফাচ্ছে, তখন এক ফুটফুটে পাহাড়ি বালিকা মিষ্টি জল খাইয়ে ওকে বলেছিল, ওঠ! ও উঠে গিয়েছিল কালীশিলায়। কিন্তু সেই বালিকাকে ও আর দেখতে পায়নি। নীরব বলেছিল, কালীমঠে ওর দিব্যজ্যোতি দর্শন হয়েছিল। এ সবই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখানে এ সব বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় না। কলকাতায় ফিরে গেলেই সব অন্যরকম হয়ে যায়। গঙ্গাভারতী নামে সেই সন্ন্যাসী, যিনি বদ্রীর মন্দির থেকে আরও অনেক, অনেক উঁচুতে থাকেন, সব যখন বরফে ঢেকে যায়, মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, তখনও নেমে আসেন না, তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল বছর পঞ্চাশেক বয়স, যদিও চুল দাড়ি সব কাঁচা। ও মা, শুনলাম ওঁর একশো পেরিয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে হল, কারণ যাঁরা ওঁকে অনেক দিন থেকে দেখছেন তাঁদের এটাই হিসাব।

এবার কেদার দর্শনে যাইনি। গেলে ডুলি করে যেতে হবে, সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসতে হবে। রক্ষে করো! এর আগে কেদারে থেকে প্রাণভরে সব দেখে এসেছি। এবার বরং ত্রিযুগীনারায়ণ দেখে আসা যাক। গৌরীকুণ্ড থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে ওপরে উঠে গেলাম, দেখলাম বহু যুগের পুরনো মন্দির। এখানে নাকি হরপার্বতীর বিয়ে হয়েছিল, নারায়ণকে সাক্ষী রেখে। মন্দিরের সঙ্গে খাপ খাওয়া এক জীর্ণদেহী প্রাচীন পুরোহিত সামান্য দক্ষিণা নিয়ে আমাদের দিয়ে আবার হরপার্বতীর বিয়ে দেওয়ালেন, সেটাই পুজোর নিয়ম। তারপর অন্ধকার এক ঘরের মধ্যে প্রজ্বলিত যজ্ঞের আগুন দেখলাম যা নাকি সেই প্রথম বিয়ের দিন থেকেই জ্বলছে। বেশ রোমাঞ্চ হল এ কথা বিশ্বাস করতে, থাক না অবিশ্বাস কলকাতায় পড়ে। মনে অবিশ্বাস নিয়েই তো রায়সাহেব অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির খোলার দিন বদ্রীতে ছুটে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন ছ মাস আগে জ্বালানো অক্ষয় প্রদীপ এখনও জ্বলছে, তাও কী হয়! প্রদীপ কিন্তু জ্বলছিল।

কালীমঠ এবার আমার প্রথম দেখা। অন্যদের কেদার দর্শন সারা হলে রাতটা গৌরীকুণ্ডে কাটিয়ে সকালে ভুখা সড়ক নামে বদ্রী যাওয়ার এক শর্টকাট রাস্তা ধরলাম। এ পথ তৈরি হওয়ার দাবিতে নাকি স্থানীয় অধিবাসীরা অনশন ধর্মঘট করেছিল, তাই এই নাম। কালীমঠ কালীগঙ্গার ধারে এক নিভৃত পীঠস্থান। নারায়ণ ও মহাদেবের স্থান এই হিমালয়ে এটাই একমাত্র দেবী পীঠ। এখানে দেবীর তিন রূপ-বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা। এই পাহাড়ের তিন জায়গায় তাই তিন পীঠ। সবচেয়ে উঁচুতে কালীশিলা, দুর্গম, তাই

যাওয়া গেল না । অনেক নিচে আছেন ধারি মা-দেবীর বৃদ্ধা রূপ । সেখানেও যাওয়া হয়নি । তবে কালীমঠ মনকে ভীষণভাবে টেনেছিল । সেদিন নবরাত্রির উৎসবে মন্দির ঝলমল করছিল, ঢাক বাজছিল, আর অনেক ঘণ্টা । অনেক পাহাড়ি মানুষ পুজো দিতে এসেছে, আমরাও দিলাম । কোনও মূর্তি দেখলাম না, শুনলাম এখানে মায়ের খাঁড়া মাটিতে পোঁতা আছে । কালীগঙ্গার ঠিক ওপরেই চমৎকার গেস্টহাউস । ইচ্ছে হল একবার এসে থাকবার । এত সুন্দর জায়গাটা । ফেরার আগে ছুটলাম গণেশ মন্দিরে । ওখানকার মাটি সংগ্রহে থাকলে নাকি সব কিছুতেই অনিবার্য সিদ্ধিলাভ । ওমা, গিয়ে দেখি সবাই এমন চেঁচেপুঁছে মাটি নিয়ে গিয়েছে, একটুও পড়ে নেই ।

কালীমঠ থেকে বাস চলল যোশিমঠের দিকে, চোপতা হয়ে । চোপতার পথে সারি সারি বরফের পাহাড় দেখা গেল । ভাসা ভাসা নামগুলো শুনলাম-চৌখাম্বা, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী । অপরূপ দৃশ্য, কিন্তু ক্যামেরার শাটার টিপতেই পারলাম না । বাস খালি গোঁ গোঁ করে চক্কর মেরে ওপরে উঠে চলেছে । সেই চোপতা গিয়ে থামল । ততক্ষণে মেঘ এসে পাহাড় ঢেকে দিতে শুরু করেছে । চোপতা বেশ উঁচুতে, হয় তো বারো হাজার ফুটের কাছাকাছি হবে । স্টোভ জ্বালিয়ে চটপট গরম ভাত, তরকারি, পাঁপড় ভাজা, চাটনি তৈরি হয়ে গেল । এত উঁচুতে বসে এমন বাঙালি খানা খেতেও মজা । শুনলাম এখান থেকে খুব কাছেই পঞ্চকেদারের এক কেদার-তুঙ্গনাথ । ঘোড়াওয়ালারা নিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু পথ দুর্গম, সময়ও নেই, তাই এ যাত্রায় আর ওঠা হল না । পঞ্চকেদারের কথা শুনেছি, এবারেই শুনলাম পঞ্চবদ্রীও নাকি আছে । তবে সে সব গল্প এখন নয় । এখন চল যোশিমঠ ।

যোশিমঠ বেশ বড় জায়গা । হোটেলটিও সুন্দর । হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করে নিয়ে নিচে নামলাম বুথ থেকে ফোন করে ছেলেকে আমেরিকায় একটু চমকে দিতে । লাইন পাওয়া গেল না, তবে অপেক্ষা করতে করতে বুথের মালিক আর্মি কন্ট্রাক্টার ছেলেটির নানা আষাঢ়ে গল্প বেশ উপভোগ করা গেল । শুনলাম এখানকার নৃসিংহ মন্দিরে বিশেষ তিথিতে এক ছোটখাটো নররাক্ষস একটা পাঁঠার রক্ত চোঁ চোঁ করে পান করে আস্ত পাঁঠাটা কাঁচাই চিবিয়ে খেয়ে ঘরে ঢুকে আরও কী কী সব খেয়ে প্রচুর জল পান করে বিশ্রাম নেয় । সেদিন সে অন্য মানুষ, পরের দিন থেকে আবার স্বাভাবিক । অবিশ্বাসী এক আর্মি অফিসার নিজে বসে থেকে সবটা দেখে স্বীকার করেছিলেন, হ্যাঁ, এমনটি হয় বটে ।

পরদিন সকালে রোপওয়ে চেপে আউলি গেলাম । লাল টুকটুকে কেবিন, কাচে ঘেরা, তার মধ্যে থেকে বেশ দেখাচ্ছিল চারদিকের পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম । শুনেছিলাম, ছবিও দেখেছিলাম এত উঁচুতে স্কি করার জায়গা আর কোথাও নেই । গিয়ে

একটু হতাশ হলাম, বরফে ঢেকে না গেলে এ জায়গা আর পাঁচটা পাহাড়ি জায়গার মতোই । ফিরে এলাম । তাড়া থাকায় এখানকার শঙ্করাচার্যের মঠটি দেখা হল না ।

এবার বদ্রীর পথে । যোশিমঠ থেকে বদ্রীনারায়ণ, নন্দনকানন, হেমকুণ্ড ইত্যাদির পথ চলে গিয়েছে । বিখ্যাত সব তুষারশৃঙ্গ-কামেট, মানা, নীলকণ্ঠর পথ এই যোশিমঠ থেকেই ।

বদ্রীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট । বিশাল অলকানন্দা উপত্যকার দুই তীর জুড়ে এই তীর্থক্ষেত্র । অলকানন্দার বরফগলা স্রোতের পাশেই রয়েছে তপ্তকুণ্ড । ঋষি মার্কণ্ড এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন বলে একে মার্কণ্ডেয় শিলাও বলে । অলকানন্দার তীরে ব্রহ্মকপাল । এখানে পারলৌকিক কাজ করলে প্রেতাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় বলে বিশ্বাস । কোনও প্রিয়জন লীন হয়ে গেলেন, আর কোথাও থাকলেন না, স্বপ্নেও দেখা দিলেন না-এ সব বিশ্বাস করা খুবই কষ্টের । তবু যুগ যুগ ধরে যে সব বিশ্বাস এ সব জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়েছে, হয়তো বাড়িয়ে তুলেছে ওই পাহাড়ের উচ্চতা, তাকে অস্বীকার করার মতো মনের জোর ছিল না, তাই বসে গেলাম কাজ করতে । নিচে অলকানন্দার নীল রং । ওপরে নীল আকাশ আর চোখ ঝলসানো সাদা নীলকণ্ঠ । মন ক্রমশ স্থির হয়ে এল ।

এদিকে সুপ্রিয়া হোটেলের পাশের ঘরে সাড়ম্বরে শুরু হয়ে গেছে দুর্গাপুজোর আয়োজন । মা অক্ষতই এসেছেন, শুধু কার্তিকের অমন টিকোলো নাকটি গেছে ভেঙে । সোমা অসামান্য দক্ষতায় ময়দার নাক তৈরি করে নিমুর রংয়ের বাক্স থেকে রং লাগিয়ে সব ঠিক করে দিল । অবাক হয়ে দেখলাম দুর্গাপুজো করার মতো কঠিন কাজও কত সহজে করা যায় । ট্রেনের খাঁচাবন্দী কুমারটুলির মূর্তি ক্রমশ ধূপধুনো আচার অনুষ্ঠানে কখন মা দুর্গা হয়ে গেলেন । ওই ছোট্ট ঘরের কোণে একটি মাত্র স্টোভে সুপ্রিয়া আর সোমা মায়ের জন্য পোলাও পায়েস খিচুড়ি মালপোয়া সবই তৈরি করে ফেলল । গাড়োয়ালি পণ্ডিত যুবক রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র বলে আচারনিষ্ঠ পূজার্চনায় আমাদের সম্মোহিত করে রাখলেন । দরিদ্রনারায়ণ সেবা হল । সন্ন্যাসী ভোজন হল । দলে দলে বাঙালি ট্যুরিস্ট এসে অঞ্জলি দিয়ে, প্রসাদ খেয়ে বলতে লাগল, আমাদের কী ভাগ্যি, ভাবতে পারিনি বেড়াতে এসে এমন ভালো পুজো দেখা হয়ে যাবে ।

আমরা একটু করে পুজো দেখি আর একটু করে বাইরে পাতা চৌকিতে রোদ্দুরে বসে নীলকণ্ঠকে দেখি, ওপাশের কুবের পর্বত দেখি যাকে নাকি এখনও কোনও উড়োজাহাজ ডিঙিয়ে যেতে পারেনি । এত তার চৌম্বকশক্তি । শুনলাম নীলকণ্ঠে যারা উঠেছে, খুব কমই তাদের সংখ্যা । তবু তার মধ্যে বাঙালি আরোহী ছিলেন । দেখছিলাম তিব্বত থেকে উড়ে আসা কালো কুচকুচে কাকের দল যাদের ঠোঁট হলুদ, পা লাল, প্রসাদের লোভে ঘুরঘুর

করছে কিন্তু কলকাতার কাকের মতো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে না। ওদের নাকি 'কাংসা' বলে। এখবর দিয়েছিল বিনোদ, আমাদের ছোট্ট গাইড, যাকে সঙ্গে করে আমরা মানা গ্রাম হয়ে সরস্বতী নদী, ভীম পুল, ব্যাসগুহা, গণেশ গুহা-এ সব একদিন দেখে এসেছিলাম। সরস্বতী, যাঁকে এতদিন লুপ্ত বলেই জেনে এসেছি, এখানে প্রবলা, খরস্রোতা। সরস্বতীর মিষ্টি জল ঝকঝকে ঘটি থেকে ঢেলে দিলেন গাড়োয়ালি মহিলা। এরা বেশ আছে, জানে না লাদেন কেমন করে পৃথিবী ধ্বংসের মতলব আঁটছে, জানে না অটলবিহারী প্রাইম মিনিস্টার না চিফ মিনিস্টার। বিনোদ স্কুলে পড়ে ঠিকই কিন্তু বরফ পড়তে শুরু হলে ও লম্বা ছুটিতে নেমে যাবে ওর গাঁয়ে। সেখানে খেতি আছে, গাই আছে-অভাব কিসের? শুধু ওর ইংলিশ পড়তে ইচ্ছে করে, স্কুলে পড়ায় না। বিনোদ, পড়াশোনা করে আমেরিকা যাবে? জিজ্ঞাসা করাতে ও কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে টেনে বলল 'ছি'!

এ সব জায়গা ছেড়ে এইসব লোকেদের ছেড়ে এবার চলে যেতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। যার যেথা ঘর।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

সেবার ব্রেকজার্নি করে

জয়া মিত্র

সাউথে যাচ্ছ? শুধোয় লোকে । ভূগোলে আমার মূর্খতা আকাশপ্রমাণ, কাজেই সম্মতি জানিয়েছিলাম । সাউথ মানে যে আসলে কলকাতা থেকে জয়সলমির যেমন 'নর্থ', সেরকমই, সে কথা তো তখন বুঝিনি । সাউথ ইন্ডিয়া বলতে মাথার মধ্যে একটা আবছা ব্যাপার ছিল যেখানে তাঞ্জোরের নটরাজ, কথাকলি আর মোহিনী অট্টমের ছন্দ, মাইসোর স্যান্ডাল উড, বেলুড়-হ্যালেবিদ আর কন্যাকুমারীর মন্দির মোটামুটি একসঙ্গে পিণ্ডি পাকানো আছে । কোথায় কোথায় যাব ঠিক করতে ম্যাপ আর ব্র্যাডশ' খুলে বসে চক্ষুস্থির ।

শেষে তো এই ট্রেনে উঠে বসা ।

রওনা হবার আগে বন্ধুসজ্জনরা বলেছিলেন দক্ষিণ ভারতে নাকি কেউই প্রায় হিন্দি বলে না কিন্তু সকলেই ইংরিজিতে সড়্গড় । হায়, একথা কি বলেছিলেন যে এই মহামানবের সাগরতীরে তেলুগু ইংরিজি থেকে তামিল ইংরিজি আলাদা, কন্নড় ইংরিজি তামিল ইংরিজি থেকে আলাদা আর সর্বোপরি বাংলা ইংরিজি এই সবগুলো থেকেই আলাদা? বলেননি । ফলে আমরা বেশ বুঝতে পারছি পুরুলিয়া বরাবাজার কিংবা বাঁকুড়ার ছাতনা থানার কোনও মাঠ থেকে উঠে আসা একজন মানুষ যখন ধর্মতলা থেকে বাস ধরে দক্ষিণেশ্বর যেতে চান তাঁর কীরকম অবস্থা হয় ।

কাজেই বহু কষ্টে যখন বিজয়ওয়াড়া বাসস্ট্যান্ডে 'সাগর' লেখা টিকিটখুপরি খুঁজে পাই আর বুঝতে পারি যে ওটাই হল নাগার্জুনকোণ্ডার ডাকনাম, খুশিতে অন্তরাত্মা একেবারে উথলিয়ে উঠেছে । কোনওমতে টাকা গুঁজে দিয়ে দুটো টিকিট পাওয়া গেল । জানবার খুব চেষ্টা করি কটায় বাস কিন্তু সরকারি টিকিট কাউন্টার, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার কাজ নয় । বহু ব্যাকুলতা প্রকাশের পর কাউন্টারের সামনের জটলা থেকে একজন বললেন, 'ফোর ক্লক' । সঙ্গে হাতের চারটে আঙুল তুলে দেখিয়েও দিয়েছেন । সন্তুষ্ট হয়ে চলে আসি । যাক, উপায় একটা হল শেষকালে ।

কী উপায় হল? কটায় বাস? বিজয় গর্বে বলি, চারটেয় (তবে নাকি আমি ভিড়ের ভেতরে ঢুকে টিকিট কাটতে পারব না!) ।

চারটে মানে কি? ভোর চারটে না বিকেল চারটে? কি সর্বনাশ! তা তো জানা হয়নি? ফলে আবার সেই কসরত শুরু, জনে জনে ধরা আর-

প্লিজ-সাগর বাস-অ্যাট হোয়াট টাইম? প্লিজ-প্লিজ ইত্যাদি চলতে থাকে ।

তবে কিনা ট্যুরিস্টদের ভগবান হলেন পাঁচ পাবলিক । কে যেন কী উপায়ে সময়মতো তুলে বসিয়ে দেন বাসে । প্রচুর ভিড়ের মধ্যেও জুটে যায় জানলার ধারে পাশাপাশি দুটো সিট ।

বিকেল সাড়ে চারটেয় বিজয়ওয়াড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে পুলের ওপর দিয়ে রওনা হয় বাস । নিচে কৃষ্ণার থোকা থোকা পাগল-পাগল জল ।

এ সেই ঊনআশি সাল যখন আমরা বেড়াতে যেতাম এরকম এলোমেলো করতে করতেই । কখনও দুজন, কখনও আড়াই জন । একেকবার চিন্তাশঙ্কিত মনে আড়াইয়ের অর্ধাংশটুকুকে আটকে রাখতেন মা । এবারও তাই হয়েছে ।

গোড়ায় কাটা হয়েছিল করমণ্ডলে দুটো এ সি বার্থ রিজার্ভ করা টিকিট । কিন্তু মনে অশেষ কষ্ট । পথে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পড়বে নাগার্জুনকোণ্ডা । স্বপন পেশায় বাস্তুবিদ্যার লোক হলে কী হবে, নেশায় তো পুরাতত্ত্বের ছাত্র । নাগার্জুনকোণ্ডা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক স্বাভাবিক প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর । চলে যাব তার ওপর দিয়ে অথচ নামা হবে না । মাদ্রাজ (এখনকার চেন্নাই) ঠিক এক রাতের দূরত্ব নাগার্জুনকোণ্ডা অর্থাৎ কিনা বিজয়ওয়াড়া থেকে । ব্রেকজার্নি করে নেমে পড়লে টিকিট বজায় থাকবে বটে কিন্তু রিজার্ভেশন থাকবে না তো! তাহলে পুরো রাত যাব কী করে-ইত্যাকার নানা সমস্যায় পড়ে যাত্রা-শুরুতে আমরা মন শক্ত করেছিলাম । নামা হবে না মাঝপথে । দেখতে পাব না নাগাজুনকোণ্ডা । কী আর করা!

কিন্তু বেলা আড়াইটেয় যে করমণ্ডল ছেড়েছিল পরদিন সকাল দশটায় সে গাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরু নামে ছোট শান্ত স্টেশনটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে । দাঁড়িয়েই থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে যতক্ষণ না জানা যায় যে খানিক সামনে এক জায়গায় লাইনে মালগাড়ি উল্টে গিয়েছে সেটা না তোলা পর্যন্ত লাইন বন্ধ । করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে একটু এগিয়ে এনে বিজয়ওয়াড়াতে দাঁড় করানো হবে-যতক্ষণ না গাড়ি আবার চলাচল শুরু করতে পারে । সেটা বিকেল চারটেও হতে পারে সন্ধে ছটাও হতে পারে, ঠিক নেই । আমাদেরও মাথায় সিদ্ধান্ত নেবার দায় রইল না । স্বয়ং নাগার্জুনই দেখা যাচ্ছে পথে এরকম একটা রক্তপাতবর্জিত নির্দোষ অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে ট্রেন আটকে আমাদের দুর্বল দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং বিজয়ওয়াড়া স্টেশনে নেমে পড়ে খুঁজে বার করেছি বাসস্ট্যান্ড ।

বিকেল চারটেয় ছেড়ে সে বাস চলছে তো চলছেই, দুপাশে রুক্ষ মাঠ, গাছ বলতে কেবল বাবলা। মাঝে মাঝে এক-আধটা গ্রাম। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরের চালগুলো ঢালু হয়ে নেমেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত। তার তলায় কাদামাটি বা পাথরে তৈরি কোনও একটা ঘরের কাঠামো আছে কিনা তাও বোঝা যায় না সর্বদা। বাসটা দাঁড়াচ্ছে না বিশেষ। বেশ ভিড়, অনেক লোক দাঁড়িয়েও আছে ঠাসাঠাসি করে। তবে তেমন গরম নেই, আজ দুর্গাপুজোর নবমী।

সহযাত্রীদের কারোরই একটা কথাও বুঝতে পারছি না। কন্ডাক্টর টিকিট দেখল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কখন পৌঁছবে সাগর, সে কোনও উত্তর না দিয়ে ভিড়ের মধ্যে অন্য লোকেদের টিকিট কাটতে লাগল। হয়তো বুঝতে পারল না আমাদের প্রশ্নটা। জানলার বাইরে একই রকম দৃশ্যপট-পাথুরে কাঁকরভরা জমি, মাঠের পর মাঠ ফসলখেতহীন। দূরে দূরে এক-দুটো গ্রাম। ছাগলের পাল কোথাও কোথাও। পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি অঞ্চলের চেহারা যেন। এই তাহলে স্কুলে কিরণ চৌধুরীর ইতিহাস বইয়ে পড়া 'ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা'। সারা দেশের নানা জায়গার লোক একই রকম গরিব।

গুণ্টুর জেলার পালনাড তালুকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা। অদেখা আশপাশে কোথাও দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা। এই কৃষ্ণারই দক্ষিণতীর ছিল নাগার্জুনকোণ্ডা (নাগার্জুনের পাহাড়)। আশপাশের পাহাড়ের মাঝখানে কে জানে কত লক্ষ বছরের পলি মাটি বুলিয়ে বুলিয়ে কৃষ্ণা নদী তৈরি করেছিল এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সেইখানে, বুনো বাবলা আর দুরধিগম্য কাঁটাঝোপে ঢাকা সেই নাগার্জুনকোণ্ডায় ১৯২৩ সালে আবিষ্কৃত হয় এক প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। সেই আবিষ্কার শুরুর গল্পটি আমাদের খুব পরিচিত ছকের। ভারতবর্ষের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রথমে খুঁজে বার করেছেন খুব সাধারণ, গরিব এবং প্রায়ই গ্রামীণ লোকজনেরা। জীবনধারণের প্রয়োজনে নিজেদের অঞ্চলের ঝোপজঙ্গলে, দুর্গম জায়গায় পুকুরে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান এঁরা, খাওয়ার মতো কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে, সেসব জায়গাতে পড়ে থাকা, মাটিতে পুঁতে থাকা, পুকুরের জল থেকে ওঠা, কুয়োর গাঁথনিতে লেগে থাকা নানান 'অন্যরকম' জিনিস তাঁরা বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন আর নিজস্ব বিচিত্র সব পদ্ধতিতে রক্ষাও করেছেন সেগুলোকে। কোথাও 'ঢিবিতে শাবল ছোঁয়ালে মুখে রক্ত উঠে মরে যাবে' 'যক্ষের বাড়ি' এরকম জনশ্রুতি তৈরি করে, কোথাও 'পরীদের জায়গা, গেলে পাগল হয়ে যায়' বলে, আরও নানারকমভাবে জেনে না-জেনে সাধারণ লোকেরা এরকম অঞ্চলগুলিকে এক ধরনের সুরক্ষা দিয়েছেন। ধর্মঠাকুর, মা কালী বা শিব-বিষ্ণুর নামে যে বৌদ্ধ-জৈন ভাস্কর্যের কত নিদর্শন পুজোর সুরক্ষা পেয়ে চালান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। নাগার্জুনকোণ্ডার ধ্বংসস্তূপও প্রথম

খুঁজে পায় অন্ধ্রের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাখালছেলেরা। ঝোপঝাড়ে ছাগল খুঁজতে গিয়ে তারা দেখেছিল সেই বিজনে পড়ে থাকা কিছু পাথরের স্তম্ভের টুকরো। স্থানীয় স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে সেকথা জানায় তারা। মাচেরলার বাসিন্দা সেই মাস্টারমশাই, শ্রীসুরাপারাজু ভেঙ্কটরামাইয়া, ছেলেদের সঙ্গে কাঁটাঝোপ ভেঙে খুব কষ্ট করে ওঠেন রহস্যময় নাগার্জুনের পাহাড়ে। পাথরের স্তম্ভ, পোড়া ইটের স্তূপ দেখে, স্তম্ভের কোনও লিখন পড়তে না পেরে বিহ্বল হয়ে ফিরে আসেন তিনি। একথা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মুখোমুখি হয়েছেন ওই জঙ্গলে। দিনটা ছিল ১৯২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। যা কিছু দেখেছেন তার যথাযথ অর্থ উদ্ধারে অক্ষম সুরাপারাজু সেগুলির বিষয়ে ছোট ছোট নিবন্ধ লেখেন স্থানীয় পত্রপত্রিকায়। সমস্তটা জানান ওখানকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলসকে। এইভাবে হালকা হালকা করে খবরটা ভারত সরকারের শিলালিপি বিভাগের তেলুগু-বিশেষজ্ঞ শ্রী রঙ্গস্বামী সরস্বতীর কানে যায়। পরবর্তীতে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ লং হার্স্টের নেতৃত্বে খননকার্য আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কাজ চলতে থাকে।

প্রথমে পাওয়া যায় মুনস্টোনে খোদাই করা অসাধারণ সুন্দর কিছু মূর্তি, শিলাপটে ও পাথরের স্তম্ভের ওপর খোদাই করা সামান্য কিছু লিপি। এই লিপিগুলিতে ছিল সাতবাহন আর ইক্ষবাকু রাজবংশের নাম। রামায়ণের দৌলতে এই দ্বিতীয় নামটি আবার আমাদের পরিচিত। এইখানে কিছু কিছু খননকার্য হলে পাওয়া যায় বড় বড় বৌদ্ধবিহার চৈত্য স্তূপ। হিন্দু সব দেবমন্দির, দেবমূর্তি। মুদ্রা স্তম্ভ বিমান (মন্দিরচূড়া) মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ। তারপর ছিল মাটি। মনে হয়েছিল তার নিচে আর কিছু নেই। তবু লং হার্স্টের আগ্রহে আরও কিছু কিছু অংশে খোঁড়ার কাজ হতে থাকে। মাটির নিচ থেকে স্তরে স্তরে পাওয়া যায় ক্রমশ বেশি বেশি অতীতকালের সব জিনিস-হাড়ের পুঁতি, চিরুনি, পোড়া মাটির হাঁড়িকুড়ির টুকরো। নানা আমলের মানুষদের নানা ধরনের সমাধিভূমি, প্রাচীন সব অস্থি-অবশেষ। শেষ পর্যায়ে মানে সবচেয়ে নিচে পাওয়া যায় এমনকী প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র। বলা বাহুল্য, কেবল নাগার্জুনকোণ্ডায় নয়, সংলগ্ন সমগ্র উপত্যকাটিতে ছড়ানো ছিল এসব নিদর্শন। নাগার্জুনকোণ্ডা ছাড়াও উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ছড়ানো পাহাড়ের সারি-কুর্নুল জেলার নাল্লামালাই পর্বতমালা, আর দক্ষিণে স্বয়ং মহানদী কৃষ্ণা, এরই মাঝখানে প্রায় ২৩ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত উপত্যকা। কে জানে কত বছর আগে আদি মানুষদের একটি দল এসে পৌঁছেছিল সুজলা সুফলা ওই পর্বতবেষ্টিত উপত্যকায়। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত জিনিসপত্র থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনদিকে পাহাড় আর চতুর্থ দিকে কৃষ্ণা নদীর এই সুরক্ষিত উর্বর এলাকায় মানব সভ্যতার একেবারে আদিম যুগ থেকে মানুষ বসবাস করেছে। হয়তো কিছু সময় পর পর প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয়েছে নদীতে, পলিতে চাপা পড়েছে

বাসভূমি, ঘরবাড়ি । মাটি নিজের নিয়মে ঢেকে রেখেছে মনুষ্যবসতির সে সকল চিহ্ন । বছরের পর বছর গিয়েছে । পুরু হয়ে জমে ওঠা উর্বর পলিমাটি আবার হাতছানি দিয়েছে । ততদিনে কৃষিকাজ শিখে ফেলা, মৃৎপাত্র গড়তে সক্ষম মানুষের দলকে । এমনই চলেছে বার বার, কে জানে কত হাজার বছর ধরে । কৃষ্ণা স্থাপিত করেছে লালন করেছে বিনাশ করেছে । তারও পর কি অদ্ভুত নিয়মে সেইসব বসতিচিহ্ন বুকে করে রক্ষা করেছে । শেষতম, সবচেয়ে ওপরের অংশের ধ্বংস্তূপগুলি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর । বৌদ্ধ দার্শনিক, প্রচারক, শিক্ষক নাগার্জুনের নামধ্বজ সেই নাগার্জুনকোণ্ডার দিকে যাচ্ছি আমরা ।

জানি, পুরাতত্ব বিভাগের সেই পরমাশ্চর্য আবিষ্কার আজকে আর চোখে দেখা যাবে না । কৃষ্ণা নদীতে বিশাল বাঁধ দিয়ে জল জমা করা হয়েছে সেইখানে, যা ছিল কত না অদেখা মানুষের প্রাণচঞ্চল বাসভূমি । কৃষ্ণা তাকে নিমজ্জিত করত প্রাকৃতিক নিয়মে আবার প্রকৃতির নিয়মেই প্রকাশ করত নরম পলির প্রসন্নতা মাখা নতুন ভূমি । কিন্তু মানুষ, প্রযুক্তিমান মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে ভেঙে চিরতরে ডুবিয়ে দিয়েছে ভারত ইতিহাসের এক জীবন্ত প্রত্নকীর্তিশালাকে । যাক, আমরা নিতান্ত সাধারণ লোক, অনেক ওপরতলায় কোনও ভালোর বিবেচনায় কী কাজ হয় তার কীই বা বুঝি!

বাস এতক্ষণ চলে একবার দাঁড়াল । তাও একটা শুকনো মতো চেহারার জায়গা । কিছু লোক নেমে গেল, দু-চারজন উঠল । ফলে ভেতরের ভিড়ের অবস্থা একই রকম । চা-কফি খায় না এখানকার লোক? এত ভিড়, বাসস্ট্যান্ড জায়গা-খাবারের দোকান বলতে কিছু চোখে পড়ে না । কেবল দু-তিনজন লোক সবুজ রঙের কাচের বোতল নিয়ে কী একটা ডেকে ডেকে বিক্রি করছে । বোতলগুলোর মুখের ওপর একটা কাচের গুলি বসানো । 'খাব-খাব' বলে উৎসাহী হচ্ছিলাম, স্বপন নিরস্ত করল ।

ওগুলো সোডাওয়াটার, বিশ্রী খেতে ।

তুমি কি করে জানলে?

আমাদের ওদিকেও আগে পাওয়া যেত । ছোটবেলায় আমরা খুব লোভ করতাম ।

বেশ, থাক তাহলে । এই যে এতক্ষণে থালায় করে কি একটা বড়াভাজার মতো নিয়ে একজন এসেছে । 'রগুভাজে' 'রগুভাজে' বলে ডাকছে । তাকে ডাকা গেল জানলা দিয়ে । তিনটে বড়ার দাম এক টাকা । বাস ছাড়ল । বড়াগুলো বেসনে ডোবানো লঙ্কার । সুবিধা হল না কিন্তু একটা জ্ঞান লাভ হল, জানতে পারলাম তেলুগু ভাষায় রগু মানে লঙ্কা । ভুল জানলাম অবশ্য । 'রগু' মানে তিন-'তেলুগু ভাষা শিক্ষা'র বইতে লেখা ছিল ।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আটটা বাজছে । লোকালয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাস-একটার পর একটা গ্রাম পার হচ্ছে । একটা মজার জিনিস দেখলাম, গ্রামের কাছাকাছি এসে বাসটা হর্ন দিতে থাকে আর অমনি রাস্তার দুপাশের মাটির কুঁড়েঘরগুলো থেকে বাচ্চারা মেয়েরা কচিকোলে তরুণী মা কিংবা বুড়ি মানুষরা বেরিয়ে এসে হাসিমুখে ড্রাইভারকে হাত নাড়ছে । আমরা ড্রাইভারের মুখ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার কেবিনের জানলার দিকে তুলে ধরা অজস্র হাসিমুখের এক বিরল দীপমালা দেখতে পাচ্ছি । অবশ্য দীপমালা আক্ষরিক অর্থেও আছে কোথাও কোথাও-কোনও একটু বর্ধিষ্ণু জনপদ পার হবার সময় চোখে পড়ে নিকোনো দেওয়াল, ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা রাস্তার দুপাশে কোথাও পাটকাঠি ধরনের কোনও সাদা কাঠি কোথাও বা চিলতে চিলতে মোমবাতিতে জ্বলছে আগুন । যতটুকু ছোট আগুন-উৎসবের আলো হতে পারে, তেমন ছোট । হঠাৎ করে মনে পড়ে যাচ্ছে আগামীকাল বিজয়া দশমী । দশেরা উৎসবের শুরু । এরকমই একটি গ্রাম পার হচ্ছিল বাস । আলো জ্বলছে পথে, লোকেরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ড্রাইভারকে । হঠাৎ একটা চিৎকার, তারপর হৈ হৈ । আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি কেননা এই দিকেরই একটা মাটির ঘরের সামনে মায়ের হাঁটুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা এইটুকু, বোধহয় সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চা সটান দৌড় দিয়েছে বিশাল বাসটার তলায় । জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বাস থেমে গিয়েছে । দুপাশের লোকজন ছুটে এসেছে । কেবল সেই মা, আঠেরো-বিশের কালো মেয়েটি, নিজের জায়গা থেকে নড়েনি, কাঁদেনি, কিছু না । একেবারে শূন্য চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বাসটার দিকে । ড্রাইভার খালাসিও নেমে গিয়েছে । একইরকম তাকিয়ে থাকে মা যখন লোকেরা বাসের তলা থেকে টলে মাটিতে পড়ে যাওয়া, অক্ষত বাচ্চাটাকে তার কোলে এনে দেয় । তাকে প্রচণ্ড বকতে থাকে ড্রাইভার আর অন্যেরাও, বোধহয় খেয়ালশূন্য হয়ে বাচ্চার হাত ছেড়ে দেবার জন্য । সে তাকিয়েই থাকে । শেষে জড়ো হওয়া ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে যায় এক সাদা চুলের পাকানো বুড়িমানুষ । ঠাস করে একটা চড় কষায় মেয়েটার গালে, কোল থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নিতে যায় । আর এতক্ষণে হাউমাউ করে জোরে কেঁদে ওঠে মা । দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটাকে । দৌড়ে ঘরে ঢুকে যায় । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাস ছাড়ে । রাত প্রায় সাড়ে নটা ।

একটানা ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছে গাড়ি । ভিড় কম । দাঁড়ানো প্যাসেঞ্জার নেই আর । তার মানে কাছাকাছি লোকালয়ও নেই বোধহয় । চলছেও বেশ জোরে । আর কতক্ষণ কে জানে নাগার্জুনসাগর? আন্দাজে বুঝতে পারছি রাস্তার দুপাশে জঙ্গল । সাড়ে দশটায় হঠাৎ স্বপন ডানদিকে দেখায় । অরনেকটা দূরে উঁচুতে আলোকিত কুয়াশার মতো কী যেন! অত উঁচুতে কী! ওটা কি আকাশে? বাস বাঁক নেয়, আবার সম্পূর্ণ অন্ধকার ।

কিন্তু মিনিট পনেরো পর আবার দেখতে পাই, এবার একটু যেন স্পষ্ট। মন দিয়ে তাকিয়ে থেকে বুঝতেও পারি। নিচের কোন খাদ থেকে ছিটকে ওঠা জলের কণা যাকে বলে শীকর। অনেকখানি। আর তারই ওপরে পড়েছে বড় ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের আলো। নাগার্জুনসাগর বাঁধ। দূর পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে। আরও খানিক পর সারি বাঁধা বড় বড় ফ্লাডলাইটের দীর্ঘ সারিও বোঝা যায় স্পষ্ট। সেই আলোরই আভায় আবছা দেখা যাচ্ছে বাসের দুপাশের জঙ্গলও। স্বপন খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি মনে হয় এই জঙ্গলে বাঘ থাকতে পারে?

এক মুহূর্ত চুপ করে করে থেকে আমি বলি, আমিও সেই কথাটাই ভাবছিলাম।

এবার দুজনেই হেসে ফেলি। এতক্ষণ কেবল ভাবছিলাম কখন পৌঁছব নাগার্জুনকোণ্ডা। এবার, চোখে দেখতে পাবার পর, মনে প্রশ্ন এসেছে যে খানিক পরে এই বাসখানি আমাদের প্রসব করে চলে গেলে তারপর কী করব। জায়গাটা কি লোকালয় না জঙ্গল, থাকবার মতো কোনও জায়গা আছে না নেই-কিছুই জানি না। 'যাওয়া হবে না' ভেবে আসবার আগে রুটচার্ট তৈরি করবার সময়ে এই বিষয়ে কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। না হলে এইসব ব্যাপারে স্বপন খুব পাকা গাইড। তবে তখনও ভ্রমণ শুরু হয়নি বলে হাতের কাছে রেডি রেফারেন্স তেমন পাওয়া যেত না। সুতরাং দুজনে একই কথা ভাবছিলাম-থাকবার কোনও জায়গা না থাকলে অন্তত ওই বাঁধের ওপরে তো থাকা যাবে রাতের বাকি ক'ঘণ্টা। সেক্ষেত্রে ওই প্রশ্নটাই মনে আসবে-আশপাশের ঘন জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে দুই উৎসাহী প্রত্নপিপাসুকে খেয়ে যাবে কিনা।

কৃষ্ণা নদীর ওপরে আলো ঝলমল বাঁধ। দীর্ঘ এবং বিশাল। এমন উজ্জ্বল, অনেক উঁচু স্লুইস থেকে জল পড়ার শব্দে এমন মুখরিত যে শোনা যায় না ওই অনেক নিচে বহমান কৃষ্ণা কোনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিনা। বাঁধ পার করে একটা ছোট মোড় ফিরে বাস দাঁড়াল এগারোটায়। এখন দেখি বাসের অর্ধেক লোক নানাভাবে আমাদের অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেন, কন্ডাক্টার দরজা খুলে ধরে প্রায় অবোধ স্কুলের বাচ্চা নামাবার মতো করে আমাদের নামিয়ে দেয়। হাত দেখিয়ে অদূর নির্দেশ করে বলে নেহরু ইয়ুথ সেন্টার। তারপর বাসে উঠে দরজা বন্ধ করে। কী কাণ্ড! আর আমরা কিনা ভাবছিলাম বিদেশে, বি-ভাষার দেশে বাঘে খেয়ে ফেলবে কিনা সেটা আমাদেরই ভাবতে হবে।

দুখানা রুকস্যাক পিঠে গুটি গুটি পায়ে সেই ইয়ুথ সেন্টারের বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠি। তার একপাশ ঘিরে রিসেপশন। একটু ডাকাডাকি করতে এক যুবক বেরিয়ে এলেন। রাতদুপুরে প্রাণী দুটিকে দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ।

সরি, নো রুম। নো রুম। অ্যাবসলুটলি ফুল।

প্রথমে তাঁকে ইংরিজিতে বোঝাবার চেষ্টা করি, লুক উই হ্যাভ কাম অল টু থাউজ্যান্ড মাইলস টু সি য়োর প্লেস, প্লিজ ডু সামথিং ইত্যাদি। তাতেও যখন সে মানে না, মানে মানবার তার কোনও উপায় নেই, একথাই বোঝাতে চায় তখন আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে স্পষ্ট বাংলাভাষায় বলি, বেশ, ঘর না দিলে তো নাই দিলে। আমরা বাপু একেবারে আধমরা হয়ে গেছি। চাদর পেতে এই খোলা বারান্দায় ঘুমব। যা পার করো-সে আমার কথা বুঝুক না বুঝুক মরিয়াপনাটা বুঝতে পারে হয়তো, আর রুকস্যাক খুলে চাদর বার করাটা চোখেই দেখতে পায়। এবারে একটু ব্যস্ত হয়ে স্বপনকে ডাকে, দ্যাখো ঘর একটা আছে বটে কিন্তু সেটা ভালো নয় তেমন।

পথে এসো, আমি মনে ভাবি। স্বপন বলে, মাথার ওপর ছাদ আছে তো?

তা আছে।

দরজাটা বন্ধ করা যায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ সেসব যায়। একটু গুমোট বলে ব্যবহার করা হয় না। মোটামুটি বারোটায় বিছানায় পড়েই ঘুমোই নাকি ঘুমিয়েই বিছানায় পড়ি বলা মুশকিল।

সকাল দশটায় আর বেলা একটায় লঞ্চ ছাড়বে বাঁধের গা থেকে। নাগার্জুনকোণ্ডা মিউজিয়ামে যাবে। এসে পড়েছি সকালেই। কাল যাকে দেখেছিলাম আকাশে উড়ে পড়ছিল আলোর রেণু হয়ে আজ তাই ছটা খোলা স্লুইস গেট দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া বন্দী নদীর ধারা জল। বাকি স্লুইস বন্ধ। অন্যধারে দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জল। স্থির বিশাল পূর্ণ জলাধার। বাঁধের রিজার্ভার। দূরে সেই জল ভেদ করে উঠেছে একেকটা পাহাড়চূড়া। ওর মধ্যেই কোথাও আছে নাগার্জুনদুর্গম মিউজিয়াম।

বিশাল সেই জলরাশি ভেঙে লঞ্চ চলেছে। মোটামুটি ভর্তি। আমাদের দুজনের বসবার জায়গা একটু দূরে দূরে। ফলে চুপ করে তাকিয়ে আছি জলের দিকে। কত হাজার বছর ধরে বারে বারে সরে গিয়েছে, আবার ফিরে এসে এখানেই বাসভূমি গড়েছে মানুষ। তার বসবাসের চিহ্ন জমা থেকেছে মাটির স্তরে স্তরে। যেন নদী স্বয়ং নিজের সন্তানদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞান লুকিয়ে রেখেছে মাটির নিচে। শেষ পর্যন্ত, সবচেয়ে ওপরে ছিল তারাই সাম্রাজ্য যাতায়াতের ফাঁকে যারা সত্যি মানুষের সভ্যতায় স্থায়ী হয়ে থেকে যায়, রাখাল ছেলের দল আর তাদের ছোট ছোট গ্রাম। কিন্তু সভ্যতার সেই ধারাবাহিক বিকাশের ছন্দ বজায় রাখল না বৃহৎ ক্ষমতা। চাষের খেত, গো-চরের মাঠ, ছোট ছোট কুঁড়েঘর ডুবে আছে এই অতল জলের নিচে। কে জানে কোথায় গেল সেই গ্রামের লোকেরা।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম। চোখে পড়ল লঞ্চের পাশে পাশে উড়ে চলেছে ছোট্ট সাদা প্রজাপতি। বিস্তৃত গভীর সবুজাভ জলে ছায়া ফেলেছে তার ছোট দুটি কাঁপতে থাকা ডানা। স্বপনের পাশে বসা এক ভদ্রলোক কথা বলছেন ওর সঙ্গে। লঞ্চ চলেছে রিজার্ভারের অপেক্ষাকৃত বাঁদিক ঘেঁসে, সেদিকটা পাহাড়। হিমালয়ের মতো নয়, ছোট ছোট পাহাড়চূড়া কিংবা একটু লম্বা পাহাড়ের দেওয়াল জেগে আছে জলের ওপর। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর লঞ্চ দাঁড়াল একটা দ্বীপ-পাহাড়ে। এরই মাথায় আছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের মিউজিয়াম। পুরো উপত্যকা থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সব প্রত্ন বস্তু তুলে ওই দ্বীপে আর মিউজিয়ামের ভেতরে সাজিয়ে রাখা আছে।

পাথরকাটা সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি, আশপাশের প্রায় পুরো জায়গাটাই মিউজিয়ামের অংশ। খোলা আকাশের নিচে অন্তত একটি চৈত্য, একটি স্তূপ সহ নয় খানা মডেল রয়েছে। এসব পাওয়া গিয়েছিল এই উপত্যকার বিভিন্ন অংশে। এত নিপুণভাবে মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে আর এত বড় সেগুলো যে মনেই হয় না এগুলো তৈরি করা জিনিস। তৈরি না করাও আছে-খুঁড়ে আনা চোদ্দখানা বিরাট বড় বড় অংশ-দেওয়াল, মুনস্টোনের ওপর খোদাই করা সাতবাহন বংশের রাজারানির অসাধারণ প্যানেল, বৌদ্ধ পূর্ত শাস্ত্রানুযায়ী যক্ষ দ্বারপাল অপ্সরা ইত্যাদি। আমার সাধারণ দর্শকের চোখে মনে হয় খুব মিল সেই কোন দূরের সাঁচির কাজের সঙ্গে, বিশেষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্থাপনে এবং অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি কর্নাটকের বিখ্যাত বেলুড়-হ্যালেবিদ-সোমনাথপুরার সঙ্গে স্পষ্ট মিলহীনতা। জানি না এটা কি শুধুমাত্র আলাদা আলাদা শিল্পধারার কারণে নাকি শরীর বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবও আছে। ভাঙা অংশগুলোর মধ্যে বারে বারে চোখে পড়ছে জড়ানো প্যাঁচানো এক মাপের নকশা, রিলিফে খোদাই। দেওয়ালের কোনও অংশে, ঘুলঘুলি কিংবা জানলার জাফরি হিসাবে, জল পড়ার নলের মুখের ঠিক ওপরে। গাইড বললেন, এই মোটিফটা নাকি নাগার্জুনের চিহ্ন। এই প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নগুলি নাগার্জুনকোণ্ডার পাহাড়ের মাথার ওপর বিস্তৃত বাগানের মধ্যে ইতস্তত সাজানো রয়েছে। রয়েছে বিশাল মাপের সেইসব মডেলও। এত সুন্দর স্পেসিং করে রাখা সব কিছু যে চোখকে একটুও ধাক্কা দেয় না, যে কোনও প্রত্নচিহ্নের মতোই এদেরও সামনে দাঁড়ালে উদাস বিধুর হয়ে যায় মন। সমস্তটার আশপাশ জুড়ে ছড়ানো রয়েছে কোনও একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

মিউজিয়ামের হলটাও মস্ত বড়। তার বিভিন্ন অংশে সাজানো আছে নব্য প্রস্তর যুগের কিছু অস্ত্র, আরেকটু পরের সময়ে তৈরি ছোট বড় হাড়ের পুঁতি, পাথরে তৈরি তীর কি বল্লমের তীক্ষ্ণফলা। সভ্যতার সমবয়সীই কি সৌন্দর্যসাধন-ভাবি! সবচেয়ে অবাক করে, বিহ্বল করে দেয়, মাটির তৈজসপত্র। হাঁড়ি, সরা, খুরি-ঠিক যেমনটি ব্যবহার করি আমরা

এখনও । সেই পেটমোটা গোলমুখ হাঁড়ি-কোনও কোনওটার তলায় কালির দাগ, তলাটা সরু ছড়ানো মুখ ছোট ছোট খুরি-কোনওটা বা আধভাঙা । অদ্ভুত লাগে । কারা ব্যবহার করেছিল এসব বাসন? কেমন ছিল তাদের চেহারা? কেমন ভাষা? কী নাম হত তাদের? কোথায় চলে গেছে সেসব মানুষ অথচ তাদের স্পষ্ট উত্তরচিহ্ন আজও ব্যবহার করে যাচ্ছি আমরা । আবারও মনে হয় কী বিরাট এই দেশ, কী এক বিশাল মানবগোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে বাস করে আসছে এখানে । বুক ভরে যায় ভালোবাসায় । চিত্রিত সেইসব মৃৎপাত্র, ছোট ছোট খেলনা, লৌহ যুগের জিনিসপত্র, তারও অপেক্ষাকৃত পরের, অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের নগর সভ্যতার সে সব নিদর্শন উঠে এসেছিল প্রত্নতাত্বিকদের সযত্ন খনিত্রের মুখে তার সবগুলিকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবার জন্য তুলে আনা সম্ভব হয়নি । কিন্তু এত যত্নে সেগুলির মিনিয়েচার তৈরি করা হয়েছে যে ভাবা যায় না । ভিক্ষুদের একটি আবাস । তার যে ইটের কোণটি ভাঙা ছিল, এক সেন্টিমিটার মাপের ইটের মডেলটির ঠিক সেই কোণটি ভাঙা । কোথাও দুটো ইটের গায়ে কালির দাগ ছিল, হয়তো বা পঠনকালীন প্রদীপের সে কালি । মডেলের ধানবীজ মাপের ইট দুটির গায়েও নিখুঁত সেই কালির দাগের অনুকরণ । ১৯৫৩ সালে, দেশজোড়া দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর যখন নেহরু সরকার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় সভ্যতার এই প্রাকৃতিক জাদুঘরকে ডুবিয়ে দিতেই হবে বাঁধ তৈরির প্রয়োজনে, ১৯৫৪র আগস্ট মাসে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন তাঁরা সমগ্র উপত্যকার যত বেশি সম্ভব অংশে দ্রুত ও ব্যাপক খননের কাজ চালাবেন । এত আগ্রহ আর পরিশ্রমে আর কোথাও কাজ করেছেন কি আর্কিওজিক্যাল সার্ভে বিভাগ? আমি জানি না । একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ । এক অসম যুদ্ধেই রত হয়েছিলেন তাঁরা । সময়ের সঙ্গে যুদ্ধে । এ যুদ্ধে কেউ কখনও জেতে না কিন্তু প্রত্নতত্ব বিভাগের সাফল্য এই যে নিজেদের লড়াইয়ের চিহ্ন তাঁরা প্রগাঢ় মুদ্রিত করেছেন । ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণে বেশ কিছু জায়গায় আমরা ঘুরেছি দেখেছি প্রত্নতত্ব বিভাগের আরও অনেকগুলি মিউজিয়াম-নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মাত্রার কাজ আর কোথাও দেখিনি । সত্যিই অভাবনীয়, হলের মাঝখানে গড়ে রাখা ডুবে যাওয়ার আগে যেমন ছিল, তিনদিকে পাহাড় ও চতুর্থ দিকে কৃষ্ণা নদী ঘেরা সেই সমগ্র উপত্যকাটির মডেল থেকে শুরু করে ওই যে বললাম, একেকটি ইট পর্যন্ত ।

মডেলে গড়া ছিল, ফটোগ্রাফেও প্রদর্শিত ছিল নদীতে নেমে আসা একটি বিশাল ঘাট । সাদা পাথরে তৈরি । কয়েকটি করে ধাপ তারপর বিরাট চাতাল, আবার কয়েকটি ধাপ । অনেক বড় জায়গা না নিয়েও সুকৌশলে সাজানো সিঁড়ির ধাপগুলো সমস্তটাকে এক বিস্তৃতি দিয়েছে । খুব ছোট ছোট ধাপ । প্রশস্ত কিন্তু উচ্চতায় খুব ছোট, যেমনটি শোভা পায় রাজকুমারীদের সৌকুমার্যে কিংবা দরকার হয় স্থবির জ্ঞানবৃদ্ধ কোনও আচার্যের

প্রবীণতায় । কারা নামতেন এই সিঁড়ি বেয়ে কৃষ্ণার জলে? কাকলিমুখর রাজগৃহবাসিনীর দল? নাকি স্তূপের কাছে মঠে বসবাসকারী বয়োবৃদ্ধ আচার্য আর তাঁদের ঘিরে তরুণ জ্ঞানপিপাসু সংসার ত্যাগী শিষ্যেরা? কোথায় থাকত গ্রামবাসীরা? সম্ভ্রম আর দূরত্ব নিয়ে কোথায় তারা স্নান করত? কেমন করে সেচ দিত নিজেদের ফসল খেতে? ফিরে আসবার পথে সবচেয়ে বেশি করে আমার মনে পড়তে থাকে এই ঘাটটার কথাই ।

এপারে পৌঁছে দিল লঞ্চ । ভালোলাগা না বিষণ্ণতা-নাকি দুটোয় মিলেই কেমন যেন ভার হয়ে থাকে মন । ইয়ুথ সেন্টারে ফিরে স্নান করে খাবার টেবিলে আসি । পাশে এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর স্বামী । লঞ্চেও ছিলেন এঁরা । আমরা একসঙ্গেই ঘুরছিলাম নাগার্জুনদুর্গম মিউজিয়ামে । বয়স্ক দম্পতি । সৌম্য চেহারা, খুব স্নেহময় ব্যবহার । মহিলা হায়দ্রাবাদের কোনও কলেজের অধ্যাপিকা । ইংরিজি বলেন । আমাদের গতকালকের অভিযানের কথা শুনে খুব হাসলেন দুজনেই, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এখান থেকে কোথায় যাবে তোমরা? বাস ধরে বিজয়ওয়াড়া গিয়ে সেখান থেকে আবার মাদ্রাজের ট্রেন ধরব শুনে বললেন, সেকি! এতদূর এসে সালার জং মিউজিয়াম না দেখে চলে যাবে?

কি করব! সব তো একেবারে হবে না ।

না-না-এটা তো একেবারে এসেই পড়েছ । যে বাস তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়েছে সেটাই তো সোজা হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে । ছ ঘণ্টার রাস্তা । যতটা সময়ে বিজয়ওয়াড়ায় পৌঁছবে সেই একই সময়ে পৌঁছে যাবে হায়দ্রাবাদ । তোমরা এত কাণ্ড করে নাগার্জুনকোণ্ডা দেখতে এসেছ, সালার জং দেখবে না? ইট ইজ আ রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স-জানি তো সবই । সালার জং দেখবার ইচ্ছা কি আমাদেরও কম? কিন্তু, এই কিন্তুর খুঁটিটা যেন একটু নড়বড়ে হয়ে পড়ছে ভদ্রমহিলার উৎসাহ সিঞ্চনে । এত সহজ সালার জং যাওয়া! দুপুরবেলা বিজয়ওয়াড়ার বাস ধরার বদলে রাতে হায়দ্রাবাদের বাস ধরা? তাহলেই হায়দ্রাবাদ-তারপরই সেই ইসাবেল যার শ্বেতপাথরের ওড়না বাতাসে উড়ে শ্বেতপাথরের গালে লাগলেও চিবুকের ডৌলটি বোঝা যায়, একই কাঠে পিঠোপিঠি পরুষ আর লাবণ্য, শয়তান ও কুমারী, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যান্ডপার্টি বেরিয়ে আসা ঘড়ি আরও হাজারটা আশ্চর্য জিনিস! কারিগরদের হুনর । সেখান থেকে বিকেল সন্ধের কোনও একটা ট্রেন ধরে পরের ভোরে মাদ্রাজ । কী আর এমন খারাপ? ব্রেক জার্নি তো হয়েইছে । যতটা রাস্তা এসেছি তাতে কাল রাত পর্যন্ত আমাদের টিকিটের ভ্যালিডিটি রয়েই যায় ।

তবে আর কী! তাই ঠিক হল ।

বিকেলে আরেকবার গেলাম বাঁধের ওপর । উত্তরদিকে, বাঁধের রিজার্ভারের পাশ ধরে বিরাট বড় ল্যান্ড ডাইক । মাটির প্রাচীর । তার ওপর ঘাসের সবুজ কেয়ারি দিয়ে

নাগার্জুনসাগর লেখা । এই ডাইকের ভার রিজার্ভারের বিপুল জলের চাপ সামলাচ্ছে । ওপারে ছোট বড় অনেক পাহাড়ের চূড়া । ওরই মধ্যে কোথায় আছে সেই নাগার্জুনদুর্গম । থাকবারও দুটো জায়গা আছে সেখানে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে মিউজিয়ামগুলোর যিনি অ্যাসিস্টেন্ট আর্কিওলজিস্ট তাঁর হাতে একটা । সেটা বোধহয় মূলত সরকারি অফিসারদের জন্য, গুন্টুর জেলায় দক্ষিণ বিজয়াপুরি থেকে তার বুকিং হয় । অন্যটা কিন্তু ভ্রামণিকদের জন্যই, সেটার ব্যবস্থা করে দেন নাগার্জুনকোণ্ডা বাঁধের জনসংযোগ আধিকারিক । তাঁর অফিসের ঠিকানা লেখা আছে বিজয়াপুরী-উত্তর । ও হরি! বিজয়াপুরী তাহলে এই জায়গাটাই! এপারটা নালগোণ্ডা জেলা, ওপারে গুন্টুর । যেমন আমাদের ঘরের কাছের মাইথন, এপারে পশ্চিমবাংলা ওপারটা বিহার ।

কিন্তু এসব কথা যদি কাল জানা থাকত! যদি কোনওরকমে ব্যবস্থা করে আসতাম ওই অতিথিশালায় রাত কাটানোর! ইস, ঘুম ভাঙলেই ‘জলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা’ । থাক থাক বেশি লোভ করতে নেই, যা দেখেছি তাও তো পাবার কথা ছিল না । ওই সাহসটুকু না করলে কী অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকতাম ।

রিজার্ভারের জলের ওপর লাল হয়ে পড়েছে অস্তসূর্যের আলো । ওপাশে কৃষ্ণার বহমান জলে নেমে এসেছে অন্ধকার । গতকাল এমনই সময়ে আমরা আশা করা অনিশ্চিতি নিয়ে ছুটন্ত বাসে বসেছিলাম । আর আগামীকাল এমনই সময়ে আমরা সালার জং দেখে ফেলেছি । যুবকেন্দ্রে ফেরবার মুখে কানে এল পাশের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং । মধুর গম্ভীর শব্দ যেন নিস্তব্ধতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দূর পর্যন্ত চলে গেল । সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে ।

গেটের চৌকিদার মানুষটি বেশ । ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন । বললেন, কোনও চিন্তা নেই, তোমরা খেয়েদেয়ে আটটার সময়ে ঘুমিয়ে পড়, বারোটার সময়ে আমি ঠিক ডেকে দেব । সাড়ে বারোটায় বাস ।

জায়গা পাব বসার?

শোবার জায়গা পাবে । বিলকুল খালি যায় ।

আমাদের কি তেমন পুণ্য, আটটায় খেয়ে শুলেই ঘুমব? বৃদ্ধ ভালোমানুষটি সকলকে নিজের মতো পাপহীন ভেবেছেন । আমরা সুতরাং, সে চেষ্টা না দিয়ে কফি খাওয়া, পিকচার কার্ড কেনা ইত্যাকার কাজে ব্যস্ত হলাম । দশটায় শুয়েছি ঠিকই, ঘুম কি আসে! আর এগারোটায় চোখ লাগতেই সাড়ে এগারোটায় দরজায় ডাকাত পড়া ধাক্কা ।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলি । চৌকিদার ।

সাড়ে বারোটায় তোমাদের বাস যে? তৈরি হয়ে নাও । সে বেচারি তো ঠিকই করেছেন । একঘণ্টা লাগে যদি-এত জোরে তা বলে? কী করা যাবে, মানুষটি নিজে একটু কানে খাটো ।

সাড়ে বারোটায় ঝকঝকে স্টেট বাস এল, সত্যিই ফাঁকা । কিন্তু ট্রেনের ফাঁকা বার্থ পেলেই যেমন শুয়ে পড়া যায় বাসে যে সেটা যায় না এটা শেখা হয়নি আগে । লম্বা লম্বা রেক্সিনে মোড়া ফাঁকা সিট, গদি-আঁটা, দেখে কি খুশিই না হলাম, শোব আর ঘুমোব । জেগে উঠলেই হায়দ্রাবাদ । 'আশার ছলনে ভুলি-' সিন্থেটিক শাড়ি আর সিটের রেক্সিন যে মিলেমিশে ঘুমোনোর বদলে পরস্পরকে ঠেলতে থাকে ভাবিনি । চলতে চলতে বাসের গতি যতবার একটু কম হয় কিংবা বাস ব্রেক কষে ততবার আমি পরশুরামের সেই বর্ণনার মতো 'সড়াক করিয়া' ভূতলে অবতীর্ণ হই । উঁকি দিয়ে দেখলাম স্বপনের সিটে আরও একজন আছেন, দুজনে পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে । যাহোক উঠে বসে নানারকম কায়দায় ঘুম ও ঘুম-ভাঙা করতে করতে হায়দ্রাবাদ । সকাল ছটা ।

কালকের সেই ভদ্রমহিলা বলেছিলেন একটা হোটেলের নাম । বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা রিকশা ধরে সেই হোটেলে গিয়ে হাজির । একটা ঘর দিলেন ওঁরা, এও বলে দিলেন সন্ধ্যাবেলা এখান থেকে মাদ্রাজ যাবার ট্রেন আছে । আমরা সাড়ে ছটায় ঘরে ঢুকেই ঘুম-রাতের শোধ তোলার চেষ্টায় । পরপর দুরাতের অ্যাডভেঞ্চারে চোখ জ্বালা করছে । গা-হাত-পায়ে ব্যথাও করছে খানিকটা তবে মনে খুব উৎসাহ ।

দশটায় জলখাবার খেয়ে রিকশা নিয়ে সোজা সালার জংয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম । মহীশূরে আছে জগমোহন আর্ট গ্যালারি, সে নাকি মহীশূররাজের দেওয়ানের ব্যক্তিগত শিল্পসংগ্রহ । বিশাল বড় নয় সত্যি কিন্তু অসাধারণ সংগ্রহ । অতগুলো রঙিন গগনেন্দ্রনাথ আর কোনও সংগ্রহশালায় আছে কিনা জানি না । তাছাড়াও ছবি আর ভাস্কর্যের মুগ্ধ করে ফেলা সম্ভার । তিনদিন ধরে মহীশূরে আমরা কেবল জগমোহনই দেখেছিলাম । মহীশূর প্যালেস আমার একটুও ভালো লাগেনি । দুশো তিয়াত্তর মন সোনা দিয়ে তৈরি সিংহাসন, সোনার থাম রুপোর দরজা-খুব স্থুল দেখানেপনা মনে হয়েছিল । কল্যাণমণ্ডপের দেওয়ালে কিছু ভালো পেইন্টিং আছে বটে কিন্তু একথা তা ভোলা যায় না যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়া টিপু সুলতান, হায়দার আলির মৃত্যুর পর যারা ক্ষমতা পেয়ে এই সোনা রুপোর সিল্ক ব্রোকেডের ছড়াছড়ি করেছিল সেই রাজবংশ ছিল আসলে ব্রিটিশের পেটোয়া! আনুগত্যের ইনাম হিসাবেই বিদেশি প্রভুদের কাছ থেকে তারা ওই রাজত্ব পেয়েছিল । বিশেষত সে কারণেই ওই প্যালেসের থেকে জগমোহনের ছবি আর ভাস্কর্যের টান আমাদের কাছে

অনেক বেশি প্রবল ছিল। আর সালার জং! বিশালতায়, বৈচিত্র্যে, খ্যাতিতে তার সঙ্গে জগমোহনের তুলনাই হয় না।

বাগানের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। শিকলে জড়ানো বড় বড় তিনখানা তালা ঝুলছে। কী ব্যাপার? এগারোটাতেও মিউজিয়াম খোলেনি? দারোয়ান এগিয়ে আসেন, কোথা থেকে এসেছেন? বঙ্গাল থেকে? ও কালকে সাগরে ছিলেন? শুধু সালার জং দেখতেই এসেছেন? এ হে হে, বড়ি আফসোস কী বাত! এখন তিনদিন মিউজিয়াম বন্ধ। আজকে দশেরার ছুটি, কালকে সোমবার, সেদিন ভারতবর্ষের সব মিউজিয়াম ছুটি থাকে, তারপর দিন মহরম।

একেবারে নিখাদ নির্ভেজাল ক্যাবলা হয়ে তালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

আবার হোটেলে ফেরা। মুখ ব্যাজার হবার ইংরিজি যদি হয় 'মুখ লম্বা হওয়া' তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মুখ আমাদের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়ে গিয়েছিল তখন। হঠাৎ মনে হয় সাংঘাতিক রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। আমাকে হোটেলের লাউঞ্জে বসিয়ে স্বপন যায় এধার ওধার একটু খোঁজখবর নিয়ে আসতে। সন্ধের ট্রেনের রিজার্ভেশন হোটেল থেকেই হয়েছে। এই তাহলে নিজামের হায়দ্রাবাদ, নিজামবিরোধী কৃষক আন্দোলনের জায়গা। এখানেই তাহলে সেইসব বিখ্যাত নিজাম প্যালেস ইত্যাদি। নানারকম শাহী তহজীব এখানকার লোকেরা এখনও অভ্যাস রেখেছেন। তাছাড়া এখনও আছে হায়দ্রাবাদি গোস্ত, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি। শহরে একটা চক্কর লাগানো যাক, বলে আমরা একটা টাঙা নিয়ে বেরলাম। শহর আসলে দুটো, হায়দ্রাবাদ আর সেকেন্দ্রাবাদ। দুটোই বেশ ঘিঞ্জি মতো, পুরনো, অথচ কী একটা আকর্ষণ আছে। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজস (CIEFL)-এ গেলাম, অসামান্য সুন্দর ক্যাম্পাস। এত গাছপালা, সাজানো বাগান, অগোছালো তৃণভূমি তার মধ্যে বাড়ি। জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস দেখলাম বাইরে থেকে। কী বিরাট, কত খোলা ছড়ানো গাছপালা ভর্তি! কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য মন খারাপ তো হবেই। কিন্তু আমি দেখতে চাই পুরনো বাড়িঘর, সেসব টাঙাওয়ালা কিছুই দেখাচ্ছে না, বললে কেবল বলছে, পুরনো হাভেলি সব অনেক দূর দূর জায়গায়। সেসব দেখতে সময় লাগবে। শেষে নিয়ে গেল হুসেন সাগর দেখাতে। বাহমনি আমলে এই বিশাল হ্রদ খোঁড়া হয়েছিল, সেসব বৃত্তান্ত ভ্রমণ-এর পাঠকরা বিলক্ষণ জানেন। আমি কেবল মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম এর বিস্তার। ওপারে হ্রদের গা ঘেঁসে রেললাইন। কাছে দূরে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। একে যে হ্রদ, সরোবর এসব কিছু না বলে সাগর বলে তাতে খুব বেশি অত্যুক্তি নেই। পাখি

উড়ছে জলের কিনার ঘেঁসে। কতদিন হয়ে গিয়েছে, কত মানুষের ব্যবহারের জল আর সৌন্দর্যের শান্তি দিয়েছে এই জলবিস্তার।

দুপুরের রোদ বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ফিরে হোটেলের দরজায় নেমেছি, চোখে পড়ল একটু দূরে লাল-সাদায় রং করা গম্বুজ তোলা কী একটা বাড়ি। তখন থেকে পুরনো প্রাসাদ খুঁজছিলাম, শেষপর্যন্ত কাছাকাছির মধ্যেই একটা দেখা গেল যা হোক। ছোট তো কি হয়েছে? একটু দেখে আসব চট করে? কী সুন্দর লাল-সাদা দুটো গম্বুজ দেখা যাচ্ছে! রিসেপশনের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রাসাদ ওটা?

প্যালেস? এখানে? কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই ফিটফাট ছেলে, আমার নির্দেশমতো ঝুঁকে দেখে সদর দরজার বাইরে। তারপর ভেতরে এসে আমাকে বোধহয় আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইংরিজিতে যাকে বলে ইনডিগন্যান্ট সেরকম মুখ করে বলে, দ্যাটস কাচ্ছিগুডা রেলওয়ে স্টেশন ম্যাম, নো প্যালেস।

বেশ বেশ, তাতে কি হয়েছে? তোমাদেরই বা রেলস্টেশনে অত কায়দার বাড়ি বানানো দরকার কী!

সন্ধে সাতটায় ট্রেন।

অত কাণ্ড করে রিজার্ভেশন করানোর কোনও মানেই হল না, সবগুলো কোচই বেশ ফাঁকা। আটটায় ট্রেন ছাড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম হুসেন সাগরের জলের ওপর ঘন অন্ধকার।

পরদিন সকালে মাদ্রাজ স্টেশনে। ভাঙা যাত্রা শেষ হল। আজ সন্ধ্যায় আগেকার কথামতোই চলে যাব ব্যাঙ্গালোর। মাঝখানে রইল কৃষ্ণার বিপুল জলে ঘেরা, কৃষ্ণার জলে ডুবে যাওয়া নাগার্জুনসাগর।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

চ. ভাগার উৎস চন্দ্রতাল সূর্যতাল

সুনীলকুমার সরদার

চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্র ও ভাগা-এই দুই ধারার মিলনে । চন্দ্র নদীর উৎপত্তি হয়েছে চন্দ্রতাল থেকে । এরপর স্পিতি উপত্যকায় প্রবাহিত হয়ে ভাগা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাণ্ডিতে । উত্তরে লাদাখ সীমান্তে বারালাচা পাসের ঠিক পাশে সূর্যতাল । ভাগা নদীর জন্ম এই সূর্যতাল থেকেই ।

আগস্টের মাঝামাঝি । ভোর ছটায় মানালি থেকে সমস্ত মালপত্র রুকস্যাক নিয়ে চড়ে বসলাম দুটো মারুতি ভ্যানে । আমাদের যাত্রার প্রথমদিনের লক্ষ্য দারচা । গাড়ি আস্তে আস্তে রডোডেনড্রন ও পাইনের জঙ্গল পিছনে রেখে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে রোটাং পাসের দিকে এগিয়ে চলল । ওপর থেকে দেখা যায়, পিছনের ফেলে আসা সবুজ প্রান্তরের মাঝে বয়ে চলেছে সঙ্কীর্ণ বিয়াস নদী । দুধারে উঁচু পাহাড় । নীল আকাশ । তারই মাঝে তুলোর মতো ভেসে চলেছে সাদা-সাদা মেঘ । সব পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি অজানা সুন্দরের টানে । রোটাং পাস অতিক্রম করে হাজির হলাম লাহুল উপত্যকার খোকসার গ্রামে । সেখানে দুপুরের আহার সেরে চন্দ্র নদীর ধার ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল কেলংয়ের পথে । বেশ কিছুটা এগনোর পর দেখলাম চন্দ্র নদী প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ছে অন্য একটা নদীর বুকে । এই নদীটাই সূর্যতাল থেকে আগত ভাগা নদী । জায়গাটার নাম তাণ্ডি । বস্তুত এখান থেকেই চন্দ্রভাগার জন্ম । এই তাণ্ডি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে চন্দ্রভাগা কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করেছে । সেখানে এর নাম চেনাব । এখান থেকে একটা বাসরাস্তা চন্দ্রভাগাকে অনুসরণ করে বাঁদিকে চলে গেছে উদয়পুরের বা উদেপুরের দিকে । আর ডানদিকের রাস্তাটা কেলং হয়ে চলে গেছে দারচায় । গাড়ি ওই পথেই এগিয়ে চলল ।

অবশেষে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এসে পৌঁছই দারচায় । অপূর্ব সৌন্দর্য দারচার । চারপাশ রংবেরঙের পাহাড়ে ঘেরা । দূরে কোনও কোনও পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যায় বরফের আস্তরণ । তারই মাঝে একটা স্বল্পপরিসর সমতলভূমি । একধার দিয়ে কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে জাঁসকার নদী । পাশেই ছোট্ট একটা সবুজ মাঠ । সেখানেই আমরা প্রথম তাঁবু খাটাই ।

এখান থেকে একজন গাইড-কাম-পোর্টার ও মালবহনের জন্য দুটো খচ্চর সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হয়। ঠিক হয় গাইড খচ্চর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আগামীকাল ভোরে বারালাচার উদ্দেশে রওনা দেবে এবং একদিন পর সেখানে হাজির হবে। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ এসে দাঁড়াই রাস্তার ধারে বাস ধরার আশায়। সামনে পাহাড়ের ডানদিকের রাস্তাটা লে-সড়ক। আর বাঁদিক দিয়ে একটা ট্রেকিং রুট সিংগলা পাস অতিক্রম করে চলে গেছে পাদমে। এই পথেই কয়েক কিলোমিটার দূরে শেলং টপকো। ১৯৮৮ সালে এখানেই কলকাতার ছয়জন তরুণ ট্রেকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অপেক্ষা করেও কোনও বাসের সন্ধান পেলাম না। ফলে আমরা চড়ে বসলাম একটা কাঠবোঝাই ট্রাকে। দশ হাজার টাকার পরিবহন খরচে আড়াই হাজার টাকা মূল্যের কাঠ নিয়ে ট্রাকটি চলেছে লাদাখে। আসছে হিমালয়ের মাণ্ডি থেকে।

সামনেই বিশাল পাহাড়। গাড়ি আস্তে-আস্তে ঘুরে ঘুরে মানালি-লে সড়ক ধরে ওই পাহাড়ের মাথায় উঠতে লাগল। এই সড়ক পৃথিবীর সর্বোচ্চ দীর্ঘ হাইওয়ে। এই পথেই হিউয়েন সাং, ফা-হিয়েন ও আরও অনেক পর্যটক তিব্বত থেকে ভারতে এসেছিলেন। এই রাস্তাটা বড়ই রুক্ষ ও বিপদসঙ্কুল। বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালে গাড়ি যাওয়ার মতো সরু রাস্তা। আর ডানদিকে কয়েক হাজার ফুট নিচ দিয়ে প্রবল গতিতে এগিয়ে চলেছে ভাগা নদী। তাকালে ভয় লাগে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বেলা তিনটে নাগাদ গাড়ি এসে থামে তিব্বত প্রভাবিত প্যাটসিওতে। তখন একটা বিরাট মিলিটারি কনভয় লে থেকে এদিকে এগিয়ে আসছিল। ফলে প্যাটসিওতে আমাদের দীর্ঘসময় আটকে থাকতে হয়।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে আমরা আবার চড়ে বসলাম ট্রাকে। গাড়ি বারালাচার দিকে এগিয়ে চলল। শুরু হল অল্প-অল্প বরফপাত। ট্রাকের মাথায় কোনও আচ্ছাদন নেই। কাঠের ওপর বসারও উপায় নেই। পাহাড়ি পথ। গাড়ি সবসময় উঁচু-নিচু পাথরে হোঁচট খাচ্ছে, আর অসমান কাঠের গুঁড়ির কোণাগুলো এসে বিঁধছে আমাদের গায়ে। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। গাড়ি যত ওপরে উঠতে লাগল, ঠান্ডাও তত বাড়তে লাগল। একসময় মনে হল হাত দুটো সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। গাড়ির রডটা পর্যন্ত ধরে থাকার শক্তি নেই।

গাড়ি যখন বারালাচার ওপর পৌঁছয় তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। পাঁচ-ছ ফুট দূরের জিনিসও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড বৃষ্টি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রবল গতিতে ধেয়ে চলেছে তুষারঝড়। হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। ট্রাক থেকে নেমে ওই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাঁবু খাটানো প্রায় অসম্ভব। এমন সময় দূরে কয়েকটা

আলোর বিন্দু দেখে মনে সাহস জাগে। ওইদিকে একটু এগিয়েই চোখে পড়ে একটা ছোট্ট টিনের বাড়ি। ট্রাকের মালিক ও ড্রাইভারের সাহায্যে সমস্ত মালপত্র নিয়ে ওই বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে জানতে পারি, এটা পি ডাব্লু ডির কর্মীদের আবাসস্থল। আমরা ওখানে রাতটুকু থাকার অনুমতি চাওয়ার আগেই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুগ্ধ হয়ে যাই তাদের ব্যবহারে।

সারারাত ধরে চলতে থাকে মুষলধারে বৃষ্টি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব মাঝে মাঝে উঁকি মারছেন। বারালাচার রূপ উপভোগ করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। তাই চালাঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বারালাচা পাসের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। চারধারে বিশাল বিশাল পাহাড়। তারা যেন আকাশকে স্পর্শ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সব পাহাড়ের চূড়াগুলোর ওপর বিছানো রয়েছে শ্বেতশুভ্র বরফের আস্তরণ। সকালের সূর্যের কোমল আলোয় সেগুলি আরও মায়াবী হয়ে উঠেছে। মাঝখানে বিরাট একটা তৃণভূমি। আর সমস্ত ভূমিটা সবুজ মোটা পাহাড়ি ঘাসে ঢাকা। লে-সড়ক ধরে পিছনের দিকে এক-দেড় কিলোমিটার হেঁটে হাজির হলাম উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বিরাট জলাশয়ের কোলে। এই জলাশয়েরই নাম সূর্যতাল-ভাগা নদীর উৎস। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম। কিন্তু মেঘলা আবহাওয়ায় সূর্যতালের পূর্ণ রূপমহিমাকে উপলব্ধি করতে পারলাম না। দুপুর থেকে প্রকৃতি আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি, তুষারঝড়। এই বৃষ্টি মাথায় করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ গাইড তার খচ্চরদুটোকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে হাজির হল। কারণ আগামীকাল এখান থেকে টোপকো গংমা ও টোপকো ইয়ুংমা হয়ে চন্দ্র নদীর উৎস চন্দ্রতালে পৌঁছনোর কথা। কিন্তু প্রবল তুষারঝড় ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তিনদিন বারালাচার ওই ঘর থেকেই বেরোতে পারলাম না। এরই মধ্যে একটা অশুভ সংবাদে আমরা আরও হতাশ হয়ে পড়লাম। গাইড এসে জানাল, সে তার খচ্চর দুটোকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। আর এখান থেকে নতুন কোনও পোর্টার বা খচ্চর পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও নেই। চারদিনের মাথায় পি ডাব্লু ডির কর্মচারীরাও কেলংয়ের পথে ফিরে যাওয়ার আগে আমাদেরও ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিল। তাদের ধারণা, প্রকৃতি দুয়েকদিনের মধ্যে আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করবে এবং প্রবল তুষারঝড়ে সমস্ত পাসটা বরফে ঢেকে যাবে। তখন সামনে এগনো বা পিছনে ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে চন্দ্রতাল যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের ত্যাগ করতে হল। পাঁচদিনের মাথায় আমরা অন্য রুট বাতাল থেকে চন্দ্রতাল-এই পথে যাত্রা করি। এখানে থেকে ট্রাকের পিছনে চড়ে হাজির হই কেলংয়ে। সেখান থেকে চড়ে বসি কাজার বাসে। ছত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে গাড়িতে গোলযোগ দেখা দেয়। তখন রাত প্রায় দশটা। অল্প অল্প

বৃষ্টি পড়ছে । গাড়ির বাইরে ভালো ঠান্ডা । ড্রাইভার আর গাড়ি যাবে না বলে ঘোষণা করল । বাস থেকে নেমে একটা ফাঁকা জায়গায় তাঁবু খাটাব বলে চিন্তা করছি এমন সময় একটা ট্রাক এসে হাজির । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মালপত্র নিয়ে চড়ে বসলাম মালভর্তি ছোট ট্রাকের পিঠে । রাত বারোটা নাগাদ এসে পৌঁছই বাতালের এক ধাবার দোরগোড়ায় । অনেক ডাকাডাকির পর ধাবার মালিক দরজা খোলে । কিন্তু অনেক অনুরোধ করেও আমরা ওইখানে রাতটুকু থাকার অনুমতি পেলাম না । ফলে বাঁদিকে কিছুটা ওপরে উঠে দেখতে পেলাম দরজা-জানলাহীন পি ডাব্লু ডির একটা ভাঙা বাড়ি । অন্ধকারে মনে হল কারা যেন ঘরগুলো আগেই দখল করে আছে । অগত্যা ওই বাড়ির ফাঁকা বারান্দাতেই আশ্রয় নিতে হয় । অবশ্য রাত একটার সময় ওই বারান্দাই আমাদের কাছে রাজপ্রাসাদ বলে মনে হল ।

পরদিন সকালে দেখি-এক মনোরম জায়গা বাতাল । যেদিকে তাকাই বিশাল বিশাল পাহাড় । দূরে দেখা যায় হোয়াইট শেল-এর সাদা ধবধবে চূড়াটিকে । সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় ওটা রক্তিম হয়ে উঠেছে । মাঝখান দিয়ে প্রবলগতিতে বয়ে চলেছে চন্দ্র নদী ।

সামনে চন্দ্র নদীর সেতুটা অতিক্রম করে শুরু হচ্ছে লাহুল ও স্পিতি ডিভিশন । আমরা ব্রিজটা অতিক্রম করে চন্দ্র নদীকে বাঁদিকে রেখে কাজা যাওয়ার বাসরাস্তা ধরে চড়াই ভাঙতে লাগলাম । বেশ কিছুটা হাঁটার পর দেখলাম একটা মোড় থেকে কাজা ও কুনজুম লার রাস্তা ডানদিক দিয়ে ওপরে উঠে গেছে । আর বাঁদিকের রাস্তাটা চন্দ্র নদীর গায়ে গায়ে এগিয়েছে চন্দ্রতালের দিকে ।

দুর্যোগ আমাদের পিছু ছাড়েনি । ঝিরঝির করে অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে । সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । ওই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা পাহাড়ের ঢালে সরু রাস্তা দিয়ে চন্দ্র নদীর ধার ধরে এগিয়ে চললাম । বেশিরভাগ পথটাই বোল্ডারের ওপর দিয়ে । ঢালু পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও চলার পথ খুবই সঙ্কীর্ণ । ঝুরঝুরে আলগা মাটি । একটু অসাবধানতার জন্য দিতে হতে পারে চরম মূল্য । বেশ কিছুটা চলার পর আমরা হাজির হলাম একটা বিরাট ভ্যালিতে । সেখানে হঠাৎ চোখে পড়ে একটা সুন্দর শেফার্ড হাট । এইরকম সুন্দর হাট সচরাচর দেখা যায় না । মনে হল এস্কিমোদের ইগলুর এটা পাথুরে সংস্করণ । টুকরো-টুকরো স্লেটপাথর একটার পর একটা সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে গোলাকার রূপ দেওয়া হয়েছে । ভেতরে স্বল্পপরিসর একটা ঘর । এরমধ্যে কয়েকজন লোক ভালোভাবে থাকতে পারে । মাটিতে বিছানো রয়েছে মোটা ঘাসের আস্তরণ এবং এর ভেতরে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে । এই বিশাল মাঠ অতিক্রম করে হাজির হলাম একটা বড় নালার পাশে । ওই ঝরনার ধার ধরে দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ডানদিকে বেশ কিছুটা

চড়া ভেঙে পৌঁছলাম একটা ছোট গ্লেসিয়ারের ওপর । সেখান থেকে সোজা পথে একটা বোল্ডারে ভরা বিশাল মাঠ পার হয়ে প্রবেশ করলাম একটা সবুজ তৃণভূমিতে । এই মাঠের ঘাসগুলো এতই মসৃণ ও নরম, মনে হচ্ছে আমরা কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি । অতঃপর দূর থেকে দেখতে পেলাম রংবেরঙের রুক্ষ পাহাড়গুলির মাঝে শান্ত শীতল একটা সরোবরকে । এই সরোবরটাই আমাদের বহু ঈপ্সিত চন্দ্রতাল-চন্দ্র নদীর উৎস । চন্দ্রতালের রূপ-সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম । ৪,২৭০ মিটার উঁচুতে এইরকম একটা মনোরম হ্রদ যে থাকতে পার, তা আমাদের কল্পনাতীত । চন্দ্রতালের পাশেই রয়েছে একটা সবুজ মসৃণ ঘাসের মাঠ । আমরা ওই সরোবরের একেবারে গা-ঘেঁসে তাঁবু খাটাই । আস্তে আস্তে সূর্যদেব অস্ত যেতে লাগলেন আর তারই রক্তিম আভায় সরোবরটা আরও মায়াবী হয়ে উঠতে লাগল ।

ঘড়িতে তখন রাত প্রায় ১১টা । পূর্ণিমার রাত । তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়ে গেলাম । উপলব্ধি করলাম রাতেও চন্দ্রতালের একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে । বসতিহীন, নিস্তব্ধ, রুক্ষ পাহাড়গুলির মাঝে চন্দ্রতালের যে এত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী রূপ লুকিয়ে আছে, তা দিনেরবেলায় কল্পনাই করতে পারিনি । নীল আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছে অজস্র নাম না-জানা নক্ষত্র । পূর্ণিমার চাঁদের কোমল আলো ছড়িয়ে রয়েছে সারা চন্দ্রতালের ওপর । আর ওই জ্যোৎস্নালোকিত চন্দ্রতালকে মনে হচ্ছে একটা রুপোর থালা ।

পরদিন ভোরে চন্দ্রতালের রূপ আবার ভিন্ন । রংবেরঙের পাহাড়ে ঘেরা চন্দ্রতাল তখন স্থির, শান্ত ও শীতল । সূর্যদেবের ছোঁয়া তখন এসে পড়েনি লেকের বুকে । দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে চন্দ্রভাগা পাহাড়গুলি । সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় বরফাচ্ছাদিত চূড়াগুলি ঝলমল করছে । ঘন নীল আকাশ । দিন যত বাড়তে লাগল, চন্দ্রতালের সৌন্দর্যও তত বাড়তে লাগল । অপার বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রতালের অতি স্বচ্ছ জলে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে দাঁড়ানো পাহাড়গুলোর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে । প্রথমে দেখা গেল, শুধু চূড়াটার সামান্য একটু অংশ । তারপর ওই সামান্য অংশটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে চন্দ্রভাগা পাহাড়গুলোর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল তালের বুকে । একসময় দেখলাম হাঁসের মতো কিছু পাহাড়ি পাখি ওই সরোবরে মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে । দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে তারা আকাশের দিকে ডানা মেলে দিল ।

এবার আমাদের ফেরার পালা । মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে চন্দ্রতালকে শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে বাতালের পথে ফিরে চললাম । পরিচয় মাত্র একদিনের । কিন্তু এই

একদিনেই চন্দ্রতালের রূপের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি যে, তাকে ছেড়ে চলে আসতে মন চাইছে না। তাই বিদায় জানিয়েও বিষণ্ণ মনে বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি।

বেলা ১২টা নাগাদ কাজা থেকে আগত বাসে চড়ে বসলাম। গাড়ি চন্দ্র নদীর কোল ঘেঁসে মানালির পথে ফিরে চলল।

ভ্রমণ আগস্ট, ১৯৯৪

ওঙ্কারেশ্বর

বিশ্বদীপ দত্ত

ভারি সুন্দর পরিবেশে বেশ পরিপাটি কিছু গুহা দেখেছিলাম নর্মদা তীরের পাহাড়ে, ওঙ্কারেশ্বরে । দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মধ্যপ্রদেশের ওঙ্কারেশ্বর । প্রকৃতির খেয়ালে সেখানে আপনা থেকেই তৈরি হয়েছে নদী জলধারায় ঘেরা ঠিক ওঁ চিহ্নের মতো দেখতে এক আশ্চর্য পাহাড়ি দ্বীপ । শঙ্করাচার্যের সাধনক্ষেত্র দ্বীপভূমির পাহাড়ের সেই গুহা । পাশে রয়েছে তাঁর দীক্ষাদাতা আচার্য গোবিন্দপাদেরও সমাধিস্থান । এখন অসংখ্য সন্ন্যাসী বাস করেন ওঁ-দ্বীপের পাহাড় জুড়ে নানা আখড়ায় আর নর্মদা তীরের গুহাতে । ভাগ্যে থাকলে সেখানে ঠাঁই পেতে পারেন তাঁদের ভক্তরাও । বিদেশি দর্শনার্থীরা এসে ভারতীয় গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটিয়ে যান হামেশাই । নদীপথে নৌকোয় যেতে যেতে পাশের পাহাড়ে পর্দাটানা গুহার ব্যালকনিতে বসে রোদ পোহাতে দেখা যায় তাঁদের । দেখা যায় ত্রিবেণী সঙ্গমের ধারে পাথরের ফাঁকফোকরে গাঁজার কলকে হাতে একাকী বিভোর হয়ে থাকতে । নদী সেখানে ঘন নীল । সঙ্গমের কাছে জলের স্রোতও প্রচণ্ড । পুবদিক রাঙা করে দুই পাহাড়ের সারির মধ্য দিয়ে নর্মদার বুকে সূর্যোদয় হয় সেদিকে । হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া যায় দ্বীপ ঘুরে আরও বহুদূরে । নির্জনে সাধনার অসামান্য পরিবেশ । না হলে দিনভর অখণ্ড অলস অবসর । চারপাশের প্রকৃতি মোহময় ।

পর্যটন মানচিত্রে এখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি ওঙ্কারেশ্বর । তীর্থযাত্রীরাই বেশি যান সেখানে । তাঁদের থাকার জন্য অতিথিশালা করেছেন মন্দির কমিটি । হালে একটা হোটেল তৈরি হয়েছে । আর আছে অজস্র ধর্মশালা । হোটেলটা হওয়ার আগে বাসস্ট্যান্ডের কাছে যাত্রিকা ধর্মশালাই ছিল ওঙ্কারেশ্বরের সবচেয়ে ভালো পর্যটকাবাস । বছর সাতেক আগেও তার ডাবলবেড-অ্যাটাচডবাথ ঘরের ভাড়া ছিল মাত্র ৪০ টাকা । সেবারে যখন ওঙ্কারেশ্বর গিয়েছিলাম তখন মন্দিরে পুণ্যার্থীর ভিড় তো কম ছিল না কিন্তু যাত্রিকা ধর্মশালা আমরা ফাঁকাই পেয়েছিলাম । আর এত সস্তায় একটা ঘর দখল করতে পেরে ওঙ্কারেশ্বরে থেকেও গিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন ।

জ্যোতির্লিঙ্গের জন্য ওঙ্কারেশ্বর পুণ্যতীর্থ সেটা শুনেছিলাম কিন্তু জায়গাটা যে এত সুন্দর, জানা ছিল না আগে । যদিও যাত্রিকা নিবাসটি মন্দির থেকে বেশ দূরে । নদীর

কাছে আসতে হলেও হাঁটতে হয় মিনিট পাঁচেক । দোকান বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার পথটা তেমন আকর্ষণীয় নয় । তবে আমাদের খারাপ লাগছিল না । প্রধান বসতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে হলেও পথটাতে তীর্থক্ষেত্রের ছাপ আছে । নদীর ঘাটের কাছে সেদিকটাকে বলে বিষ্ণুপুরী আর নদীর অন্য পাড়ে শিবপুরী । নদীর ওপর প্রশস্ত ব্রিজ গিয়ে পৌঁছেছে ওপারের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের নিচে । মান্ধাতার আমলে নাকি তৈরি হয়েছিল সেই মন্দির । তাই সেদিকটাকে মান্ধাতাও বলে থাকে লোকে । ব্রিজ পার হয়েই যাওয়া যায় তাছাড়াও অজস্র রঙিন নৌকো যাতায়াত করে এপার থেকে ওপারে । মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণে এসে সেবার অজান্তে মান্ধাতার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছে আমরা একেবারে অভিভূত । যথাসাধ্য উপভোগ করে নিচ্ছিলাম দিনগুলোকে । আলাপও হচ্ছিল স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে, সাধুবাবাদের সঙ্গে, বিদেশি পুণ্যার্থীদের সঙ্গেও ।

সন্ধেবেলা মন্দিরে আরতি দেখে, ত্রিপলের নিচে বেঞ্চে বসে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে, হাঁটতে হাঁটতে ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডের কাছে গুমটি দোকানে পান কিনছিলাম দুজনে । কোন ধর্মশালায় আছি জানতে চাইল পানওয়ালা । যাত্রিকায় উঠেছি শুনে মুখে চোখে বেশ সম্ভ্রম ফুটে উঠল তার । আমাদের মতো পর্যটকের সেখানে থাকাটাই যেন আশা করছিল সে । নিজেরা সম্ভ্রান্ত জানতে পেরে আমরাও যথেষ্ট গর্বিত । হৃষ্টচিত্রে পানের জন্য অপেক্ষা করছি, উল্টোদিক থেকে একদল বিদেশি তরুণ-তরুণীকে হেঁটে আসতে দেখা গেল । আগেও চলতে ফিরতে দেখা হয়েছে তাদের কারও কারও সঙ্গে । আমাদের দেখে হাত নেড়ে সমস্বরে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল তারা । সকালে পাহাড়ের দিকে আবার দেখা হবে এমন ইঙ্গিতও করে গেল । আমরা খুশি, কিন্তু পানওয়ালা গম্ভীর । ‘এইসব থার্ড ক্লাস সাহেবদের সঙ্গে আপনারা কথা বলেন?’ খুব সংযত গলায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল সে । সাহেব আবার থার্ড ক্লাস কী! আমরা হতবাক । বহু আকাঙ্ক্ষিত ফরেন ট্যুরিস্ট বলে কথা! পানওয়ালা অবশ্য সংশয়মুক্ত নয় । ‘থার্ড ক্লাস লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না । মন্দিরের বাইরে কারও কাছ থেকে প্রসাদ নেবেন না । যার তার সঙ্গে মিশবেন না ওঙ্কারেশ্বরে ।’ যাবার আগে আবার সাবধান করে দিল সে ।

মিশছিলাম না আমরা কারও সঙ্গেই । নিজেরাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যথেচ্ছ । পরদিন গিয়েছিলাম ৩ কিলোমিটার দূরের জৈনতীর্থ সিদ্ধকূট দর্শনে । বিকেলবেলা নৌকো নিয়ে ফেরার পথে দেখা হল আরেকটা ছোট বিদেশি দলের সঙ্গে । সূর্যাস্তে তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারদিক । নর্মদা তীরের সেদিকের দৃশ্য অন্যরকম । এক চিলতে বালির চরের পাশে দেখা যাচ্ছে লাল মাটির নিচু টিলার ঢাল । দু-চারটে কুটির রয়েছে ঢালের ওপরে । কুটিরের এদিক ওদিকে কয়েক গুচ্ছ ঝাপড়া সবুজ গাছের দল যেন দাঁড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ লাল মাটির ঢালের রুক্ষ সৌন্দর্যকে আরও প্রকট করে তোলার জন্য । সূর্যডোবা আলোয়

তাক লাগিয়ে দিচ্ছে তৃণশূন্য লাল টিলার উদ্ভাসিত রূপ। নদীর জলে ডুব দিয়ে বসে ছিল এক পাল মোষ। দিন শেষ হয়ে আসায় ফিরে চলেছে চর পার হয়ে টিলার গ্রামের দিকে। তাকে পিছনে রেখে আমরা যাচ্ছি সঙ্গম পার হয়ে ওঙ্কারেশ্বরে। একটানা ভটভট শব্দ করতে করতে ঢেউ কাটিয়ে চলেছে মোটরবোট। সঙ্গমের কাছে জলের ঘূর্ণিতে মাঝি হাল তুলে নিলে নৌকো ঘুরে যাচ্ছে চরকির মতো পাক খেয়ে। সঙ্গম পার হয়ে এসে আবার তরতর করে ছুটে চলতে পারছে শিকারার মতো নৌকোটা। ডানপাশের পাহাড় থেকে জলে ছড়িয়ে পড়া পাথরের চড়ায় দেখা গেল বিদেশি এক পরিবারকে। রঙিন একটা তাঁবু পাতা হয়েছে চড়াতে। আমাদের নৌকো দেখে খুব খুশি হয়ে ছুটে এসে হাত নাড়ছে একটি চার-পাঁচ বছরের বিদেশি শিশু। চেঁচিয়ে বলছে কিছু। শুনতে পাচ্ছি না নৌকোর মোটরের শব্দে। আমাদের হাত নাড়তে দেখে হাত নাড়ছে তার মা-বাবাও। তাঁবু গোটানোর তোড়জোড় করছিল তারা। দিনটা নদীর ধারে কাটিয়ে বেলাশেষে এবার তাদেরও ফিরে চলার পালা। দৃশ্যটা ভালো লাগছিল আমাদের। যেতে যেতে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল দলটাকে। তাঁবু তোলায় হাত লাগিয়েছে শিশুটিও। ক্রমশ পাহাড়ের ছায়ায় ঝাপসা হয়ে আসা নদীচরে মিশে গেল ছবিটা।

ছোট্ট জায়গা ওঙ্কারেশ্বর। দলটার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল পরদিনই মন্দিরের পথে। ফ্রান্স থেকে এসেছে তারা। কয়েক বছর আগেও একবার এসেছিল ভারতে। ছেলে ছিল না তখন। ঘুরতে ঘুরতে দুজনে এসে পড়েছিল ওঙ্কারেশ্বরে। মুগ্ধ হয়েছিল ওঁ-তীর্থ দেখে। এবার এসেছে ছেলের জন্য। এত সুন্দর জায়গা, এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশ, এই আনন্দের ভাগ তো দিতে হবে পরের প্রজন্মকেও! সহাস্যে বলেছিল তারা। উত্তরসুরিকে পৃথিবীটা চিনিয়ে দিতে শুরু করেই নাকি ঠিক করেছিল যে আবার আসবে তারা ওঙ্কারেশ্বরে। আমরাও আসব আবার। ঠিক করেছিলাম তখনই।

কলকাতা থেকে ওঙ্কারেশ্বরে যাওয়া যায় দুদিক দিয়ে। উত্তরের ইন্দোর অথবা দক্ষিণের খাণ্ডোয়া স্টেশন হয়ে। হাওড়া থেকে শিপ্রা এক্সপ্রেস যাচ্ছে ইন্দোরে। আগেরবার সেদিক দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবারে খাণ্ডোয়া হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। সেদিকে যাচ্ছে হাওড়া-মুম্বাই মেল। তবে সেই ট্রেন খাণ্ডোয়া পৌঁছয় মাঝরাতে। অসুবিধে নেই, যাওয়া যেতে পারে বেনারসে ট্রেন বদল করেও। বেনারস থেকে মুম্বাইয়ের সব ট্রেনই যাচ্ছে খাণ্ডোয়ায়। আমাদের পছন্দ হল মহানগরী এক্সপ্রেস। সকাল সাড়ে ১১টায় বারাণসী জংশন ছেড়ে খাণ্ডোয়া জংশনে পৌঁছবে পরদিন ভোর ৪টের সময়। সুসময় বলেই মনে হয়েছিল তখন। রওনা দেওয়া গেল শুভ সহস্রাব্দের প্রাক্কালে। উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে, দিন পনেরোর ছুটিতে।

বেনারস থেকে যাত্রা শুরু হল কিছু মন্দগমনে । এলাহাবাদ পৌঁছতেই ট্রেন একঘণ্টা লেট, জব্বলপুরে পৌঁছতে দুঘণ্টা । বেজে গেল রাত ১১টা । ‘নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন’ বললেন কন্ডাক্টর গার্ড, ‘আপনাদের ভালোই হল । সকালের আগে ট্রেন খাণ্ডোয়ায় ঢুকছে না ।’ কিন্তু যাত্রীর প্রয়োজনে লেট করে না ভারতীয় রেল । কন্ডাক্টর গার্ডের উদ্বিগ্ন ডাকাডাকিতে ঘুমচোখে মালপত্র হাতে যখন খাণ্ডোয়া স্টেশনে নেমে গেলাম আকাশ তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার । ট্রেন পৌঁছে গেছে মাত্র আধঘণ্টা দেরিতে । কম্পার্টমেন্ট থেকে প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ডিসেম্বর শেষের জবরদস্ত ঠান্ডা ।

এই সময়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে গরম চা যে-কোনও রেলযাত্রীর কাছে অবিস্মরণীয় । সময় কাটানো গেল কিছুক্ষণ । আকাশ পরিষ্কার হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই । শীতের দিনে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এত তাড়াতাড়ি সকাল হবে না । অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়া গেল । স্টেশনের কাছেই বাসস্ট্যান্ড । সরকারি গুমটির বাইরে থেকে ছাড়ছে প্রাইভেট বাস । শোনা গেল, ওঙ্কারেশ্বরের একটা বাস রওনা হয়ে গেছে এইমাত্র । ইন্দোর যাওয়ার বাস পাওয়া যাচ্ছে । সে বাসে মোরটক্কা পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে ।

মোরটক্কা নামটা মনে ছিল । খাণ্ডোয়া-ইন্দোর মিটার গেজ রেলপথে ওঙ্কারেশ্বর রোড স্টেশনটা সেখানেই । সড়কপথও চলেছে পাশেপাশে খাণ্ডোয়ার সোজা উত্তরে ইন্দোরের দিকে । মাঝামাঝি জায়গায় মোরটক্কা । সেই মোড় থেকে ডানহাতি আরেক রাস্তা গিয়ে পৌঁছেছে ১২ কিলোমিটার দূরের ওঙ্কারেশ্বরের নদীর ধারে । জানা ছিল ১২ কিলোমিটারের সেই কানাগলিতে দূরপাল্লা ছাড়াও স্থানীয় বাস যাতায়াত করে আধঘণ্টা-এক ঘণ্টা অন্তর । মোরটক্কাতেই যাওয়া যাক তাহলে । বাসটায় ভিড় হয়ে যাচ্ছিল । কন্ডাক্টর আপ্যায়ন করে সামনের দিকেই তিনজনের সিট দিলেন । ভালো বাস । ডিলাক্স ছিল এক সময়ে । এখন যদিও সিটের কাপড় ছিঁড়ে স্পঞ্জ উঁকি দিচ্ছে । তবু তো রওনা হওয়া গেল! শহর ছাড়িয়ে বাইরে এসে বাস যখন ফাঁকা রাস্তা ধরল ততক্ষণে ভোর হতে শুরু করেছে । ধু-ধু মাঠের শেষে গাছের সারির পিছন থেকে গোলাপি থালার মতো সূর্য উঠে আসছে ।

চির পরিচিত সূর্যোদয় । তবু চির নতুন । সারা রাত ট্রেন জার্নির পর দূর বিদেশের অচেনা পরিবেশে অতি সুন্দর সেই মুহূর্ত । যে কোনও ভ্রমণার্থীর স্বপ্নের যাত্রা । কিন্তু ঘোর ভাঙিয়ে দিচ্ছে বাসের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি । এ কী অবস্থা রাস্তার! এ তো দুঃস্বপ্নময়!

খাণ্ডোয়া থেকে ওঙ্কারেশ্বরের দূরত্ব ৭৭ কিলোমিটার । পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল দুঘণ্টায় । কিন্তু মোরটক্কায় হাইওয়ের ধারে ব্রেকফাস্ট সেরে বাস বদল করে যখন ওঙ্কারেশ্বর পৌঁছলাম তখন সকাল ৯টা বাজতে চলেছে । নদীর ঘাট থেকে সিঁড়ি ভেঙে

যখন টিলার ওপর হোটেল ঐশ্বর্যতে ঢুকলাম তখন রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। মালপত্র নিয়ে হেঁটে আসতে ঘাম ছুটে গেছে।

জায়গাটা কিন্তু প্রায় একইরকম রয়েছে। বাসস্ট্যান্ডটার সামান্য উন্নতি হয়েছে। নতুন করে বাঁধানো হয়েছে চত্বরটা। কিছু নতুন দোকানপাট, খাবারের হোটেল হয়েছে। সেখান থেকে এগিয়ে এসে নর্মদার ঘাটের দিকে এখনও সেই পুরনো ছবি। স্নান করছেন পুণ্যার্থীরা। জলে রঙিন নৌকো চলছে। পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাধুবাবাজিরা। দোকানে দোকানে লাল গোলাপি আবিরের ছোট ছোট স্তূপ। সাজানো রয়েছে পুজোর উপকরণ। বাইরে ঝুড়ির পর ঝুড়িতে জড়ো করা রয়েছে নানা আকারের গাঁজার কলকে। পুরি কচুরি মিষ্টির দোকানের পাশেই বিক্রি হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাঙের শরবত। একের পর এক রাজপুত সমাজ, জাঠ সমাজ ধর্মশালাগুলোর রংও যেন আগেরই মতো। আর রঙের জন্যই হুবহু এক দেখাচ্ছে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা কালচে সবুজ নর্মদার অন্য তীরে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের দিকটা। ঘাটের কাছ থেকে পাহাড়ের গায়ে বেশিরভাগ স্থাপত্যেই সেদিকে ছোপ ধরা পাথুরে রং। তারমধ্যে মাথা উঁচু করে উঠেছে সাদা রঙের পাঁচতলা ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। ওপরে দেখা যাচ্ছে পুরনো রাজপ্রাসাদটাকে। পাশ দিয়ে উঠে চলা সিঁড়ির পথটা এদিক থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু পাহাড়ের একেবারে ওপরে গৌরীশঙ্কর মন্দিরের দিকে সোজা উঠে গেছে আরেকটা সিঁড়িপথ। নতুন সাদা রং করার জন্য এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই লম্বা খাড়া সিঁড়িটাকে। ওঙ্কারনাথ পাহাড় প্রদক্ষিণের জন্য যাত্রীরা চলেন সেদিকে। দুপুরবেলায় রোদের তাপে ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে পড়ে ওঙ্কারেশ্বর। বিকেলে দেখি পড়ন্ত আলোয় একইরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মান্ধাতা পাহাড়। এদিক থেকে হলদেটে দেখাচ্ছে ওপারের বাঁক জুড়ে সমস্ত পুরনো স্থাপত্য।

যে হোটেলটায় এবার উঠেছি সেটা একেবারে নদীর ধারে, শিবপুরীর ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের উল্টোপাড়ে। বাসস্ট্যান্ড থেকে এসে বিষ্ণুপুরী ছাড়িয়ে এদিকটাকে বলে ব্রহ্মাপুরী। আরেক জ্যোতির্লিঙ্গ মমলেশ্বর মহাদেব রয়েছেন এই পাড়ে। বাসস্ট্যান্ডের যাত্রিকা ধর্মশালার ভাড়া বেড়ে হয়ে গেছে ১৫০ টাকা। বাইরে থেকে পরিচ্ছন্ন, পাহাড় জঙ্গল লাগোয়া ছাদটা তেমনই আকর্ষণীয়, কিন্তু ঘরগুলো এবারে আর তেমন পছন্দসই মনে হল না আমাদের। ব্যবহারে পুরনো হয়ে মলিন হয়ে গেছে, অথবা বদলে গেছি আমরাই। এই হোটেলটা নতুন। ভাড়া দ্বিগুণ হলেও অবস্থান আর রক্ষণাবেক্ষণের হিসেবে সস্তাই বলা যায়। একচিলতে কার্পেটিও পাতা হয়েছে ঘরে। তবে মালপত্র নিয়ে বিষ্ণুপুরী থেকে সিঁড়ি ভেঙে এখানে আসা বেশ কঠিন। বাসস্ট্যান্ড থেকে আসা যেতে পারে গাড়ি নিয়ে কিছুটা ঘুরপথে। হাঁটতে হাঁটতেই বিষ্ণুপুরীতে আসছিলাম আমরা অন্য কোনও ভালো ধর্মশালা বা পি ডাব্লু ডি বাংলোয় ঘরের খোঁজে। দূর থেকে হোটেলটাকে দেখাল একজন। সিঁড়ি দিয়ে

ঘাটে নেমে আবার উঠে যেতে হবে উল্টোদিকের সিঁড়ি দিয়ে । ভাগ্যিস চলে এসেছিলাম ঝোঁকের মাথায় । বলা যেতে পারে পর্যটকদের থাকার জন্য ওঙ্কারেশ্বরে এখন এটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা । গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদীর দক্ষিণ টিলায় এই হোটেলের সামনে থেকেই এক নজরে দেখা যায় ব্রহ্মাপুরী, বিষ্ণুপুরী ঘুরে ব্রিজ পার হয়ে সামনের শিবপুরীর মন্দিরাঞ্চলের পুরো ছবিটা । ডানদিকে দূরে দেখা যায় মমলেশ্বর মহাদেব মন্দির পার হয়ে উত্তাল নদীসঙ্গম । কাবেরী নদী নর্মদায় মিলেছে সেখানে । বাঁধ তৈরি হয়েছে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ।

স্থানীয় নদী এই কাবেরী । দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কাবেরীর সঙ্গে কোনও যোগ নেই তার । আসলে আলাদা কোনও নদীও নয়, নর্মদারই অন্য ধারা বয়ে গেছে দ্বীপ ঘুরে । পুবদিকে দ্বীপের শুরুতে ভাগ হয়ে আবার এসে মূলধারায় মিশে গেছে দ্বীপের শেষে পশ্চিমে । সেদিকেও তৈরি হয়েছে এক সঙ্গম । মাহাত্ম্য বেশি পুবের সঙ্গমের । হিন্দু, জৈন দেবদেবীর ২৪ অবতারের প্রাচীন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে । রয়েছে কোটিতীর্থ স্নানঘাট ।

নর্মদার দক্ষিণতীরে মমলেশ্বর জোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় ওঙ্কারেশ্বরের অনেক পরে । পৌরাণিক ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা যুবনাশ্বের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত মান্ধাতা যদি ওঙ্কারেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তবে সেই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল পরবর্তীকালে যুগ যুগ ধরে । শ্রীবৃদ্ধি হয় ওঁ-দ্বীপেরও । পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয় প্রকাণ্ড দুর্গ । মুচকুন্দ কেল্লা বলে তাকে এখন স্থানীয় লোকে । তার উত্তরে কাবেরী নদীর অন্য তীরে ঋষিদের সাধনার জন্য খ্যাত সিদ্ধকূট পাহাড় জৈনতীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে । বোঝা যায় এই দ্বীপাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী । যা ধ্বংস হয় ১১ শতকে গজনির সুলতান মামুদের আক্রমণে । আশ্চর্যের বিষয়, মামুদের সেই আক্রমণে পাহাড়ের ওপরের দুর্গ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রক্ষা পেয়ে যায় নিচের ওঙ্কারেশ্বর আর অন্য কিছু মন্দির । যদিও এরপর মোগল আমলে কোনও সময়ে সম্ভবত পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে যায় এই অঞ্চল । কারণ, ঘন জঙ্গলে ছেয়ে যাওয়া পাহাড়ে প্রাচীন ওঙ্কারেশ্বর মন্দির খুঁজে না পেয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে ধরে নিয়ে ১৮ শতকে নর্মদার অন্য তীরে মমলেশ্বর মন্দির স্থাপন করে আবার নতুনভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয় এই পুণ্যভূমিকে । এরমধ্যে যদিও ১৬ শতকে গুরুনানক এখানে এসেছিলেন, আর ওঁ-দ্বীপের পর্বত পরিক্রমাও করেছিলেন বলে বিশ্বাস । সেই স্মৃতিতে গুরুদ্বার তৈরি হয়েছে শিবপুরীতেই । এখন উৎসব উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হন শিখ সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ । এবং আবার জৈনতীর্থের গরিমা ফিরে পেয়েছে সিদ্ধকূট পাহাড় । আর অবশ্যই বহু ভক্ত সমাগমে নিয়মিত পূজিত হচ্ছে ওঙ্কারেশ্বর ও মমলেশ্বর-দুই জ্যোতির্লিঙ্গই ।

শিবরাত্রি আর কার্তিক পূর্ণিমায় লক্ষ লোকের মেলা বসে যায় জাগ্রত তীর্থ ওঙ্কারেশ্বরে। ব্রহ্মাপুরীতে আমাদের হোটেলের পিছন দিকেই রয়েছে সেই বিশাল মেলাপ্রাঙ্গণ। সেখান থেকে রাস্তা চলে গেছে নতুন তৈরি বাঁধের দিকে।

ব্রহ্মাপুরীর এই দিকটা ততটা ভালোভাবে দেখা হয়নি আগেরবার। ব্রহ্মার প্রাচীন মন্দির আছে দেখেছিলাম। দেখা হয়নি জুনা আখড়া, নিরঞ্জনী আখড়ার মতো শতাব্দীপ্রাচীন আশ্রমও। বিষ্ণুপুরীতে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ছাড়া কিছু নতুন মন্দির আছে। মার্কণ্ডেয় যোগ আশ্রমে ঋষি মার্কণ্ডেয়র মূর্তি, যজ্ঞশালা, ভোজনালয়ের কর্মকাণ্ড দর্শনীয়। দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির হয়েছে সেখানে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিবপুরীর ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের দিকটা। অতুলনীয় ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ সেই মন্দির। পাঁচটি তলে স্থাপিত হয়েছেন পাঁচ শিব। প্রথমতলে মান্ধাতা পূজিত প্রণবলিঙ্গ, অর্থাৎ ওঙ্কারেশ্বর। দ্বিতলে মহাকালেশ্বর। তার সামনের দালান থেকে দেখা যায় নদীর দিকের দৃশ্য। ওপরের তলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সিদ্ধনাথ, কেদারেশ্বর, গুপ্তেশ্বর মহাদেব। পুজো দিয়ে ভক্তরা চরণামৃত নিয়ে যান ওঙ্কারেশ্বরের। প্রণবলিঙ্গের নিচে সেখানে জল জমে থাকে সবসময়। মহাদেবের সেই চরণামৃত নর্মদারই পুণ্যবারি বলে বিশ্বাস।

ভক্তদের আনাগোনায় সকাল সন্ধে গমগম করে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের গলিপথ। দোকানপাটে ঠাসা সেই গলিপথটাও শিবপুরীর এক অন্যতম আকর্ষণ। বিক্রি হয় নানা মাপের ডিম্বাকার পাথর। গতবার ওঙ্কারেশ্বরে এসেছিলাম ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী, মাণ্ডু, মহেশ্বর ঘুরে। মহেশ্বরে অহল্যাবাঈয়ের প্রাসাদে রানির পুজোর ঘরে এরকম অসংখ্য পাথরের শিবের সংগ্রহ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ওঙ্কারেশ্বরে এসে দেখা গেল দোকানে দোকানে এমন পাথরের সম্ভার। এখানকার নর্মদার জলের চোরাস্রোতের প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে নাকি তৈরি হয়ে যায় পাথরের এমন আকার। মসৃণতা, উজ্জ্বলতা, রঙের বাহার আর মাপের পার্থক্যে তাদের দামেরও পার্থক্য। স্মারক হিসেবে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওঙ্কারেশ্বরের শ্রেষ্ঠ বস্তু। আর তাহলে দোকানে ঘুরে ঘুরে সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে পছন্দসই পাথরটা সংগ্রহ করা ওঙ্কারেশ্বরে এক বড় কাজ।

বলতে গেলে সেই করতেই কেটে গেল দিনটা। তারমধ্যে কয়েকবার হোটেলে ফিরে আসার জন্য বার বার নর্মদায় নৌকো পারাপার। মাঝিদের সঙ্গে দরাদরি করতে হয় খুব। তবে সম্ভবত পরে দূরপাল্লায় যাওয়ার আশাতেই উল্টোপারে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে যায় মাত্র দু টাকায়। যদিও তৃতীয় কি চতুর্থবার দেখা দিতেই বেঁকে বসলেন একজন। 'আপনারা তো আর দূরে কোথাও যাবেন না, খালি এই পার আর ওই পার করবেন সারা দিন! পাঁচ টাকা দিতে হবে,' ক্ষুব্ধভাবে জানালেন তিনি। অন্যরকম একজনকেও দেখা

গেল । পারাপারটা পুরোপুরি ফ্রি পাওয়া গেল তার কাছে । বড়ই ওস্তাদ সেই ছেলে । বলল, ভগবান শঙ্করজির কাছে যাওয়া আসা করবেন বলে নদী পার হবেন, তার জন্য আবার পয়সা কী! কিছুতেই কিছু দেওয়া গেল না তাকে । অগত্যা তাকে নিয়েই পরদিন উষালগ্নে বেরনো হল নর্মদা বিহারে । কোটিতীর্থ ঘুরে কপিলধারা দেখতে ।

নর্মদার দক্ষিণতীরের পাহাড়ের গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে কপিলধারা নেমেছে নদীতে । তটভূমিতে সেখানে গোমুখ ঘাট । প্রাচীন মন্দির রয়েছে কাশী-বিশ্বনাথের । লোককথায় শোনা যায়, দূর অতীতে সেখানে এক ব্রহ্মরাক্ষস নাকি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল মুনিঋষিদের তপস্যায় । তাঁদের আকুতিতে ক্রুদ্ধ মহাদেব ত্রিশূল দিয়ে বধ করেন রাক্ষসকে । তারপর অশুদ্ধ ত্রিশূল শুদ্ধ করার জন্য তাঁর ত্রিশূল ফেলেন নর্মদার তটে । ত্রিশূলাঘাতে পাহাড় ফেটে গোমুখের আকার নেয় । নির্গত হয় কপিলধারা ।

এমন অনেক গল্প শোনা যায় ওঙ্কারেশ্বরের সাধুবাবাজিদের চ্যালাচামুণ্ডা থেকে শুরু করে সাধারণ লোকের মুখে মুখে । আগেরবার নৌকোয় যেতে যেতে মাঝিও শুনিয়েছিলেন অনেক গল্প । এবারের মাঝি অবশ্য স্পষ্ট বলে দিল যে ওসব কাহিনী সে জানে না, তার বাবা জানে । ওঙ্কারেশ্বরের প্রতিটা পাথর নিয়েই রয়েছে এরকম কাহিনী । এমন মহান জায়গা, ফলে সেসব থাকবেই । না থাকলেও বানিয়ে নেওয়া যায় । কিন্তু বানিয়ে সে বলতে পারবে না । বরঞ্চ নিয়ে যেতে পারে ৬ কিলোমিটার দূরের সপ্তমাতৃকা মন্দিরের দিকে অথবা ৯ কিলোমিটার দূরের কাজলরানি গুহাতে । কাজলরানি এত সুন্দর জায়গা যে একবার গেলে তাজ্জব বনে যেতে হবে । নৌকোর মোটরে অনেক তেল পুড়লেও সেদিকে গেলে নাকি তার দিমাক খুশ হয়ে যায় ।

যদিও যাওয়ার যা ভাড়া শোনা গেল, আমাদের দিমাক তাতে খুশ হল না । দেখা যাবে কাল সকালে । মহেশ্বর যাওয়ার ইচ্ছে আছে । জিপ পাওয়া গেলে মাণ্ডুতেও যাওয়া যেতে পারে । জিপ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিল না । শেষে যখন পাওয়া গেল একটা, সেও ভাড়া চেয়ে বসল প্রচণ্ড । বাসে গিয়ে মহেশ্বর থেকে মাণ্ডু দেখে একদিনে ফেরা যাবে না । ওঙ্কারেশ্বরের মাত্র ৬৩ কিলোমিটার দূরে মহেশ্বর । কিন্তু শোনা গেল রাস্তার অবস্থা এখন ভীষণ খারাপ । তার জন্যই জিপের এত ভাড়া চাওয়া হচ্ছে । একটা দর জানিয়ে দিয়ে এলাম আমরাও । রাজি থাকলে যেন আমাদের হোটেলে চলে আসে পরদিন ভোরে । না হলে নৌকো নিয়ে যাব কাজলরানি গুহাতে । সেদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর গেলাম মন্দিরের ওপরে রাজবাড়িটা দেখতে ।

অন্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গেও পরিচয় হতে শুরু করেছে ততক্ষণে । দেখা যাচ্ছে বিদেশিদেরও । ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা ভবঘুরে পোশাকে খোলা মেজাজে । যদিও গতবারের

মতো তেমন আলাপ হচ্ছে না তাদের সঙ্গে। হয়তো এবার দলে তিনজন হয়ে একটা পরিবারের মতো দেখাচ্ছে বলে আর ততটা ভবঘুরে হিসেবে গণ্য করছেন না আমাদের। সাধুসন্ন্যাসী আর দোকানদারদের সঙ্গেই তাদের বেশি ভাব। মনে হয় যেন সবসময়েই ব্যস্ত আছেন কোনও কিছুর সন্ধানে। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান থেকে স্থানীয় বস্তু সংগ্রহ, সবকিছুতেই তাদের অনুরাগ। অনেকের আবার আত্মমগ্ন ভাব। একজনকে দেখলাম ভিখিরিদের লাইনে বসে আছেন ব্রিজের ওপরে। ঠিক ঘেঁসাঘেঁসি করে নয়। একটু দূরে বসে রয়েছেন তদগতভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে। থার্ড ক্লাস কিনা কে জানে! বলে দেবার লোকটাও নেই। বাসস্ট্যান্ডের পথে পানের দোকানটা পাওয়া যায়নি অনেক খুঁজেও।

ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছ থেকে সিঁড়ি উঠেছে রাজপ্রাসাদে। পুরনো ছাপ ধরেছে পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড বাড়িটাতে। যদিও রাজপরিবার এখনও ব্যবহার করেন বাড়ির একদিক। প্রধান দ্বারপথে উঠোন পেরিয়ে আমদরবার। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ। জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে। ওপাশের জানালা থেকে দেখা যায় মন্দিরের দিকটা। ভেতরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সাদাধুতি সাদা পাগড়ি মাথায় বৃদ্ধ রাজকর্মচারী। প্রাসাদ আমরা দেখেছি আগেই। একজনই নতুন আমাদের মধ্যে। 'আইয়ে ছোটা সাহাব' বলে ভদ্রলোক আদর করে নিয়ে গেলেন তাকে। সাদামাটা দরবার মহল। কিন্তু গম্বুজাকার সিলিংয়ের কারুকাজ দেখার মতো। মেঝের একপাশে ধপধপে সাদা তাকিয়া গদি পাতা। রাজগদি সেটাই। এখানেই আর্জি জানায় প্রজাবৃন্দ। কর্মচারীরা যথেষ্ট আপ্যায়িত করছিলেন আমাদের। বাধা নেই ছবি তোলাতেও। ছোটা সাহাব ঘুরছে তাদের কোলে কোলে। রাজবাড়িতে এমন খাতির পেয়ে বিলক্ষণ উল্লসিত সে। এতটাই যে, উঠোনের একদিকের দরজা খুলে একটা ছোট মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখে, ভুল করে রাজকন্যা ভেবে বসল তাকে।

মহলের এক ছোট্ট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে কথা হচ্ছিল কর্মচারীদের সঙ্গে। রাজা শিউশরণ চৌহানের প্রাসাদ এটা, জানালেন তাঁরা। পাহাড়ের গায়ে অতি চমৎকার জায়গায় তৈরি হয়েছে এই প্রাসাদ। নিচে দেখা যাচ্ছে এপারের ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। দেখা যাচ্ছে অন্য পারের মমলেশ্বর মন্দিরও। ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের সামনে থেকে নর্মদার তীর ধরে পশ্চিমে এগিয়েছে প্রদক্ষিণ পথ। ১১ কিলোমিটার পুণ্যযাত্রায় প্রদক্ষিণ করে আসা যায় পাহাড়টাকে। গতবার গিয়েছিলাম সেই প্রদক্ষিণে। পাহাড় ডিঙিয়ে এতটা হাঁটার ইচ্ছে নেই এবার। দর্শনীয় মন্দির আছে ওপরে। রয়েছে ভেঙে যাওয়া মুচকুন্দ কেল্লার কয়েকটি তোরণ। চাঁদ-সূরজদ্বার, ভীম-অর্জুনদ্বার প্রভৃতি তাদের নাম। দ্বীপের পুবদিকে ভীম-অর্জুনদ্বার দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নর্মদার তীর ধরে হেঁটে আবার ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে ফিরে এসে শেষ হয় প্রদক্ষিণ। ভাবছিলাম

সেদিকটা থেকে ঘুরে আসা যাক আরেকবার। পাহাড়ের ওপরে ভীম-অর্জুনদ্বার থেকে সুন্দর দেখায় পুবের নদীসঙ্গম। সেখানেই নাকি কিরাতার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল পরশুরামের। ওঙ্কারেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে শঙ্করাচার্য গুহা, গোবিন্দপাদের সমাধিমন্দির দেখে উল্টো প্রদক্ষিণ পথে হেঁটে চলে যাওয়া যায় সেদিকে। আরেকটাও রাস্তা আছে, বললেন বৃদ্ধ রাজকর্মচারী। এই প্রাসাদের পাশ থেকেই সিঁড়িপথে উঠে যাওয়া যাবে পাহাড়ের ওপরে। তারপর পুবদিকে হেঁটে হুণ্ডিকুণ্ডিদ্বার পার হয়ে দেখে আসা যাবে সেদিকটা।

ওঙ্কারেশ্বর প্রদক্ষিণ করার পরিকল্পনা তো ছিল না এবার। এই পুণ্যলাভের মায়া ত্যাগ করব বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে! শেষে পুরো পাহাড়টাই চক্কর দিয়ে আসা হল, অথচ নিয়মমতো পরিক্রমার উল্টোপথে।

প্রাসাদ থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা যখন শুরু হল, ভরদুপুরে তখন প্রখর রোদ। ভোরের দিকেই আসতে হয় পাহাড়ে। কিন্তু যেহেতু তখন গোটা পাহাড় হাঁটার পরিকল্পনা নেই, তাই কষ্টটুকু গায়ে মাখছিলাম না আমরা। ছাতার আড়ালে হেঁটে চলে গেলাম ওপরে। এপথে প্রথম প্রাচীন স্থাপত্য দেখা দিল ভেঙে যাওয়া সিদ্ধেশ্বর মন্দির। ভেঙে পড়েছে পুরোটাই। এক জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে অসংখ্য ভাস্কর্য নিয়ে মন্দিরের দেওয়াল স্তম্ভের টুকরোগুলো। পুরাতত্ব বিভাগ বোর্ডে লিখেছেন-১২ শতাব্দীর পূর্বমুখী পঞ্চরত্ন শৈলীর এই মন্দির সম্ভবত ছিল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক প্রতিরূপ। গতবার দেখা হয়নি এদিকটা। দেখিনি তারপরের আশাপুরী মাতার মন্দির, আর হুণ্ডিকুণ্ডিদ্বারও। কেল্লার এই তোরণ তৈরি হয়েছিল গজনির সুলতান মামুদের আক্রমণের অনেক পরে। ১৩ শতকে। সেখান থেকে এগিয়ে পথ ভাগ হয়েছে দুদিকে। এই জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছিল আমাদের। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না যেতে হবে কোনদিকে। আনমনে হেঁটে আসছিলেন এক বিদেশি পর্যটক। কাছে এসে মাথার একপাশে হাত জোড় করে খুব কায়দার এক নমস্কার জানালেন তিনি-হরি ওম। নিজের দেশের পথের হদিশ জানতে ইচ্ছে করে না বিদেশিদের কাছে। উপায় নেই, জিজ্ঞেস করতে হল। 'কোন মন্দিরে যাবেন? কোন তোরণদ্বার? রয়েছে তো দুদিকেই!' নাটকীয় ভাবে দুপাশে হাত মেলে দিলেন তিনি। 'সবই প্রাচীন। সবই সুন্দর। চলে যান যেদিকে ইচ্ছে! আনন্দ করুন। এত আনন্দের জায়গা!' যথাসাধ্য খুঁটিয়ে খবর নিয়ে বিদায় জানালাম ভদ্রলোককে। হরি ওম। জয় শঙ্কর।

সেখান থেকে সামনে পথ গেছে সিদ্ধনাথ মন্দির হয়ে ভীম-অর্জুনদ্বারের দিকে। যেখান দিয়ে গিয়ে শেষ হয় পরিক্রমা। এক চক্কর ঘুরে এলাম সেদিক থেকে। বিকেল হয়ে আসছে তখন। রোদের তেজ কমে গেছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে বয়ে চলা নীল

নদীটাকে । সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে । এমন মনোরম বিকেলে তখনই নেমে যেতে ইচ্ছে করছে না পাহাড় থেকে । আবার ফিরে এলাম আগের পথে । ডানদিকে ঘুরে এবার চললাম চাঁদ-সূরজদ্বারের দিকে । প্রথমে সূর্যদ্বার । বিশাল সেই তোরণের ওপরে উঠে বসেছিলেন প্রফেসর শঙ্কুর মতো দেখতে সেই বিদেশি ভদ্রলোক । আমাদের দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে নাটকীয়ভাবে হাত ছড়িয়ে ওপর থেকেই শুরু করলেন বক্তৃতা । বুঝলাম এর পরেই চন্দ্রদ্বার পার হয়ে ইচ্ছে হলে আমরা পাকদণ্ডী পথে সেদিক দিয়ে শর্টকাটে নেমে যেতে পারি নিচে । অথবা উঠে যেতে পারি ওপরে গৌরী সোমনাথ মন্দিরের দিকে । ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই । ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি কাবেরীর অন্য তীরে জৈনতীর্থ সিদ্ধকূট মন্দির । একটু ঢালু পথে নেমে চন্দ্রদ্বার পেরিয়ে গৌরী সোমনাথ মন্দিরের দিকে উঠে যেতে যেতে বোঝা যাচ্ছে যে পার হয়ে আসছি ওঁ-দ্বীপের ওঁ-এর ঠিক মাঝখানের ভাঁজটা । সীতাদেবীর মন্দির, হনুমান মূর্তির পরে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ড গৌরীশঙ্কর মন্দিরের প্রাচীন স্থাপত্য । তার একদিকে সারি দিয়ে রাখা রয়েছে এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত অসাধারণ সব মূর্তিকলা । পুরাতত্ব বিভাগের এই সংগ্রহ দেখিনি গতবার । পড়ন্ত বিকেলের আলোয় আরও অসাধারণ দেখাচ্ছে মন্দির চত্বর ।

ছবি তুলে সময় কেটে গেল সেই প্রাঙ্গণে বেশ কিছুক্ষণ । ভাবছিলাম সিঁড়িপথে সেখান থেকে নেমে যাব নিচে । পাহাড়ের গায়ে এই সিঁড়িটাকে দেখে রেখেছি নিচ থেকে । কিন্তু ঠিক মন্দিরের কাছ থেকেই শুরু হয়নি সেই সিঁড়ি । হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগোচ্ছিলাম আমরা । গতবার এপথে এসেছিলাম খুব ভোরবেলা । আলো ফোটার আগেই বেরিয়েছিলাম হোটেল থেকে । নদীর ব্রিজ পার হয়ে যখন রওনা হলাম, নর্মদার ওপরে তখন লাল হয়ে উঠছে ভোরের আকাশ । ব্রিজ থেকে মন্দিরের সামনে বাঁদিকে ঘুরে পরিক্রমার শুরু । এবারে ফিরছি উল্টোপথে । পশ্চিমে নদীতীরে নেমে এসে তারপর শুরু হয় পাহাড়ে চড়া । আলো ফুটলে তবেই নদীচরে পা দিতে বলেছিলেন এক সাধু । উপদেশ দিয়েছিলেন পাথরের ওপর লাঠি ঠুকে ঠুকে সাবধানে এগিয়ে যেতে । কারণ বিষধর সাপ থাকে পাথরের ফাঁকে । লোকচলাচল শুরু না হলে বেশ বিপজ্জনক সে পথে যাওয়া । রাস্তা এত ভালো ছিল না তখন । এখন দেখা যাচ্ছে পুরো পথটাই বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে সুন্দর করে ।

‘সিঁড়ি দিয়ে নামবেন তো এদিকে আসছেন কেন আপনারা!’ বললেন এক পথচলতি সাধুবাবা । ‘সিঁড়িটা তো ফেলে এলেন পিছনে । তবে এদিক দিয়েও যেতে পারেন । ঢালুপথ নেমে গেছে পুরোটাই । কষ্ট হবে না ।’

পিছনে আর ফিরলাম না । ভালো লাগছিল দুপাশের গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে । সাধুদের আখড়া আছে এখানে নির্জন পথের পাশে । আর রয়েছে অসংখ্য হনুমান । কাঁধের ব্যাগটাকে টানাটানি করে দু-একবার উপদ্রব করল তারা । এক জায়গায় রাস্তার মধ্যে লেজ বিছিয়ে বসে রইল এক পাল । পথের দুপাশে সার দিয়ে পিছন ফিরে বসে পরপর লম্বা লেজগুলোকে বিছিয়ে তারা জানি না কী রসিকতা করল । এক্কা দোক্কা খেলার মতো, খুব সাবধানে পার হলাম আমরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে । ঘাড় ঘুরিয়ে সারাক্ষণ লক্ষ রাখল তারা লেজে পা দেওয়া হচ্ছে কিনা । কিন্তু নড়ল না এক চুলও । একটু এদিক ওদিক হলেই বোধহয় দুঃখ ছিল কপালে । মনে হল আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে । পার হয়ে এসে দেখি উঠে ঘোরাঘুরি করছে সবকটা ।

উল্টোযাত্রা করছি, কথাটা মনে হচ্ছিল বার বার । এদিকে কেউ ফেরে না । নিয়মবিরুদ্ধভাবে হাঁটা হয়ে গেল ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে । অনেকক্ষণ থেকেই কোলে ওঠার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে সঙ্গের একজন । কোলে চড়ে কেউ ট্রেক করে না, বুঝিয়েও বেশিক্ষণ হাঁটতে রাজি করানো যাচ্ছে না । রীতিমতো হাঁপ ধরে যাচ্ছে বয়ে নিয়ে চলতে । নদীটাকে দেখা যাচ্ছে পাশে পাশে । আশা করছি সামনের বাঁকটা ঘুরেই দেখতে পাব ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের চূড়া । কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে বাঁকের পর বাঁক । গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়েছে রাস্তাটা । ভুলে গেছিলাম যে এতটাই হাঁটতে হবে এদিকে এলে ।

অন্ধকার নেমে আসছে রাস্তায় । তুলনায় আলো বেশি নদীর ওপরে । সবজে নদীর জল চলার পথে পাথরে ধাক্কা খেয়ে মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রেখেছে সাদা ফেনার ঢেউ । শনশন আওয়াজ হচ্ছে ঝুলে পড়া ডালের পাতায় । ধর্মরাজদ্বার পার হয়ে আসার পর থেকে দেখা হয়নি কোনও সাধুর সঙ্গেও । রামকৃষ্ণ আশ্রম ছাড়িয়ে কেদারেশ্বর মন্দিরের কাছে দেখি নিরালা পথের পাশে দাঁড়িয়ে দুই ভক্তকে বাণী দিচ্ছেন একজন । উজ্জ্বল গেরুয়া বসনে অতি চমকদার তাঁর সাজসজ্জা । দাঁড়িয়ে আছেন দৃপ্তভঙ্গিতে এক পা পাথরের ওপর রেখে । আর তাঁর পায়ের কাছে বসে আরও উজ্জ্বল চিত্রবিচিত্র পোশাকে হাসি হাসি মুখে আগ্রহ ভরে তাঁর কথা শুনছেন দুই ভিন দেশি তরুণ-তরুণী । কী এত খুশির বাণী জানার আগ্রহ হচ্ছিল আমাদের । এমন একটা আনন্দময় পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে যে ক্যামরায় ধরে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছিল ছবিটা । দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম । মনে হচ্ছিল অনুমতিও পাওয়া যাবে, এমনই কোমল সর্বংসহ মেজাজে রয়েছেন তাঁরা । কিন্তু দিনের আলো কমে গিয়েছিল, আর তাঁদের আলোচনায় বাধা দিয়ে পরিবেশটা নষ্ট করতেও ভালো লাগল না । চলে এলাম পার হয়ে । তখনও তাঁরা মগ্ন রয়েছেন নিজেদেরই জগতে । কোন অনুকূল স্রোতে ভাসছেন তাঁরা, বোঝা সহজসাধ্য নয় আমাদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত পথপরিক্রমায় ।

দূরে তখন ওঙ্কারেশ্বরের আলো দেখা যাচ্ছে। ব্রিজ পার হয়ে উঠে এলাম বিষ্ণুপুরীর রাস্তায়। সন্ধের খুশির হাওয়ায় সেখানে রাস্তার পাশে ওপেন এয়ার কচুরি জিলিপির দোকানে টেবিল ঘিরে ঘিরে দেশি বিদেশি নানা দলের হুল্লোড়। হাঁপ ছেড়ে বসা গেল। শীতের দিনেও কুলকুল করে ঘামছি তিনজনেই। এক গ্লাস করে শরবত খেলে মন্দ হয় না। সাধারণ শরবত ৮ টাকা। ভাঙের শরবত ১২ টাকা। নিশ্চয়ই ভুল করে ভাঙ দিয়ে দেবে না নিখরচায়! রাতের খাবারও খেয়ে গেলে হয় এখানে। যেখানেই খাই, নিরামিষই খেতে হবে। আমিষ অচল ওঙ্কারেশ্বরে। এই নিরামিষ ডিনারের পর এক গ্লাস ভাঙের শরবত খেয়ে গাঁজার কলকে হাতে আরামেই আছেন দেখছি অনেকে।

'কোথা থেকে ঘুরে আসা হল, বেটা!' জিজ্ঞেস করলেন পাশের বেঞ্চে বসা এক সাধুবাবা। বললাম তাঁকে কোথা থেকে ঘুরে এলাম। বেশ খুলেই বললাম দুঃখটা। উল্টোযাত্রার পরিক্রমায় কোনও লাভ হল কি? এত কষ্ট করে শেষে পুণ্যের বদলে, উল্টো কিছু হয়ে গেল না তো!

বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন বাবাজি। চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ভগবান শঙ্করজির দেশটা তো দেখা হল। সেটাই পুণ্য।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

সুন্দরবনে দুদিন

পবিত্র সরকার

বাঘ দেখতে সুন্দরবন যাইনি আমি । প্রায় আড়াই হাজার বর্গকিলোমিটারে যেখানে মাত্র দুশো তেষট্টিটি বাঘ আছে সেখানে বাঘ যে দেখতে পাব না-তা তো অঙ্কের হিসেবেই বলে । সত্যি সত্যি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ০.১০৫৮৭৭৬টির মতো বাঘ থাকার কথা, কিন্তু আমাদের খুশি করার জন্য আধখানা বাঘও যে থাকবে, তার গ্যারান্টি কোথায়? এম ভি চিত্ররেখা নামে ওই 'লাক্সারি' লঞ্চে সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ রাজেন চক্রবর্তী মশাই এইরকম একটা পরিসংখ্যানই দিলেন । আড়াই হাজার (আসলে ২৪৮৪) বর্গকিলোমিটার হল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা । এর প্রায় দ্বিগুণ অঞ্চল আছে বাংলাদেশে । সেখানে কতজন বাঘ আছেন এবং আমাদের বাঘেরা তাঁদেরই আত্মীয়স্বজন কিনা তা অবশ্য বলতে পারব না । তবে পৃথিবীতে বাঘ আমরা মানুষেরা মেরে শেষ করে এনেছি (বীরত্বে আমাদের বুক ফুলে উঠুক), সুন্দরবন ছাড়া রয়্যাল বেঙ্গল জাতীয় বাঘের দেখা আর খুব বেশি জায়গায় পাওয়া যাবে না । সেরকম দেখা পান ব্যাঘ্রবিশেষজ্ঞরা । আমরা সাধারণ মানুষেরা বাঘের গুজব শুনেই সন্তুষ্ট থাকি ।

আমি সুন্দরবন গিয়েছিলাম শুধু জল আর জঙ্গল দেখব বলে । ভ্রমণ পত্রিকা এবং পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশন ব্যবস্থা করেছিলেন, ফলে গত ৩১ অক্টোবর সকাল সাতটায় পৌঁছে গেলাম ডালহৌসিতে পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের অফিসে । মেরিন ভেসেল চিত্ররেখায় কেবিনে সিট বুক করা আছে, আমাকে তাতে আসীন হয়ে শনি-রবিবারের সুন্দরবন দেখা সেরে আসতে হবে । চমৎকার! কিন্তু আগের দিন কলকাতা বৃষ্টিতে প্রায় ডুবে গিয়েছিল, সকালে যখন বেরোই তখনও আকাশ মেঘাক্রান্ত এবং টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে । ফলে মনে উদ্বেগ ছিল ভ্রমণসূচি আদৌ বজায় থাকবে কি না । ভোর ছটায় ফোন করতে একজন (ভোর ছটাতেই অফিসে এসে গেছেন দেখে ভালো লাগল) ঘুম ভাঙা স্বরে বললেন, 'দ ট্রিপ ইজ অন ।' সুতরাং বাড়ি ছেড়ে বেরোতেই হল । ডালহৌসিতে বৃষ্টি থামল এবং তখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, মেঘ সম্পূর্ণ সরে গিয়ে উজ্জ্বল রোদ উঠবে এবং পুরো দুটো দিন সুন্দরবনের জল জঙ্গল আকাশ বাতাস তাদের পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে আমার সামনে উন্মোচিত হবে?

ডালহৌসিতে আমাদের একটি প্রাইভেট কোচ-এ উঠে বসতে বলা হল। সিটে যেহেতু নম্বর দেওয়া, ফলে সামনে জানলার ধারে বাঁদিকে একটি সিট পেয়ে বর্তে গেলাম। ড্রাইভারের পিছনকার দেওয়ালের মাথায় কেন জানি না একটি লন্ডন ব্রিজের ছবি লাগানো, দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। কয়েকটি গুজরাটি পরিবার উঠলেন, আর বাঙালি বলতে আরেকজন, উনিও প্রবাসী। কানপুরে মানুষ, আর দীর্ঘদিন কানাডার নিউ ব্রানসউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক।

আমি বোকার মতো ভেবেছিলাম যে, এ বাস আমাদের গঙ্গায় চাঁদপাল ঘাটে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে গঙ্গাপথে আমরা সুন্দরবন যাব। দেখলাম ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বাসে যেতে হবে বাসন্তীর এপারে সোনাখালি বন্দরে, সেখানে গিয়ে আমরা এম ভি চিত্ররেখাতে চড়ব। সোনাখালি কলকাতা থেকে আটানব্বই কিলোমিটার, যেতে সাড়ে তিনঘণ্টার মতো লাগবে। শুনলাম প্রাইভেট লঞ্চ ভাড়া করে এই একই পরিক্রমা করা যায়-সেগুলো ছাড়ে ক্যানিং থেকে। তবে তাতে বড় দল হলে ভালো হয়।

বাস ঠিক সাড়ে সাতটায় ছাড়ল আর পার্ক সার্কাস কানেক্টার হয়ে ধাপার পাশ দিয়ে সোনাখালির পথ ধরল। আগে ধাপা কীরকম ছিল সবাই জানেন। একসময় আমাকে দুবেলা তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হত, নাকে রুমালসুদ্ধ হাত প্রায় যান্ত্রিকভাবে উঠে যেত, তাই আমি তার নাম দিয়েছিলাম গন্ধমাদন পাহাড়। এখন আর ধাপাকে সেই নামে ডাকবার উপায় নেই। চমৎকার একটি বাগানে বদলে যাচ্ছে সেই আবর্জনাস্তূপ। খুব শিগগিরই তা কলকাতার আরেক দর্শনীয় জায়গা হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই রাস্তা দিয়ে আগেও গেছি। সেই বানতলা, নতুনবাজার, ঘটকপুকুর ইত্যাদি হয়ে গ্রামগঞ্জের মাঝখান দিয়ে যাত্রা। ঘটকপুকুরে চা হল, তার আগেই কেটারার রসনা চটপট সকলের কোলে জলখাবারের প্যাকেট আর হাতে মিনারেল ওয়াটারের বোতল পৌঁছে দিয়েছিল। বানতলা-ঘটকপুকুর হয়ে ঘুসিঘাটা পর্যন্ত সাধারণ গ্রাম্যপথ-একদিকে বাঁয়ে চলেছে কলকাতার নোংরা জলের নিকাশি নালা, তার কালো স্থির জল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, অন্যদিকে ঘরবাড়ি, কখনও লেদার কমপ্লেক্সের জন্য বড় বড় পাঁচিল ঘেরা জায়গা। তার পিছনে ধানখেত। সবই ঘন সবুজ, আর গতকালকার বৃষ্টিতে আপাদমস্তক স্নান করে গাছপালা সব ফুর্তিতে ঝলমল করছে। নিকাশি খালের ওপারে বাবলা বা সুবাবুলের ঝোপ জলের ওপর ঝুঁকে আছে, রাস্তার ধারে অজস্র শিশু, অ্যাকেশিয়া বা আকাশমণি, কোথাও কোথাও এমনকী ইউক্যালিপ্টাস আর দেবদারু। আর গ্রামের নিসর্গচিত্রের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়ে তা হল ঝোপঝাড়ের ওপর অজস্র লতার রাজ্যপাট-ধুঁধুলের লতা, কুঞ্জলতা, কখনও বা একটা-দুটো স্বর্ণলতায় আক্রান্ত গাছ।

ঘুসিঘাটা থেকে ডানদিকে ঘুরে গেল পথ, আর গ্রামীণ দৃশ্যও বদলাল একটু । এবার যেন রাস্তা একটু নিচে নেমে এল, তার দুপাশে মাছের ভেড়ি, ধানজমি (এগুলোই কি আবার ধান উঠে গেলে ভেড়ি হয়ে যায়?) আর তার মধ্যিখানে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া মোমবাতির মতো চিমনিওয়ালা ইটভাটি । চতুর্দিকেই নানা আয়তনের জলের প্রাচুর্য । বাড়ির চারপাশে জল, সেখানে উঠোনে গাছতলায় বসে বাড়ির বউ ছিপ ফেলছে সেদিনকার মতো আমিষব্যঞ্জনের উপাদান সংগ্রহের জন্য; ধানখেতে ধানগুলো কোমরজলে দিব্যি খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাথায় ঘন শস্যের অলংকরণ । রাজহাঁস থেকে শুরু করে নানা আকারের হাঁস চরছে, রাস্তার ধারে শান্ত গরুবাছুর এই লাক্সারি বাস নামক প্রাণীটার রহস্য বোঝবার চেষ্টা করছে । ভেড়ির প্রশস্ত আয়তক্ষেত্রাকার জল, আর প্রান্তে পাহারা দেবার ঝুপড়ি-মাচান । এদিকে বাড়ির চারপাশে মর্নিং গ্লোরির বেড়া, কখনও-বা রাংচিতা গাছের ঘের । এধরনের রাংচিতার বেষ্টনী এই দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় । গ্রীষ্মে এগুলোতে ভারি সুন্দর লাল ফুল ফুটবে । মালঞ্চতে বড় মাছের বাজার । সেখান থেকে আবার ডানদিকে ঘুরে, রাজবাড়ি সরবেড়িয়া কুলতলি ইত্যাদি হয়ে আমরা প্রায় এগারোটা পঁচিশ নাগাদ সোনাখালি পৌঁছলাম ।

বাস যেখানে থামল সেখান থেকে ঘাট আধ কিলোমিটারও হবে না । আমাদের দলের সঙ্গে জুটে গেল অজস্র প্রত্যাশী দরিদ্র শিশু । তারা হাত বাড়িয়ে মৃদুস্বরে গুঞ্জন করছে, না হয় মাল বহন করে কিছু পাবার অধিকার প্রার্থনা করছে । যাঁদের হাতে বহন করার মতো মালপত্র ছিল তাঁরা সকলেই স্বাবলম্বনকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচনা করলেন । যাত্রী এবং প্রার্থী বালকবালিকাদের মিছিল পারঘাটাতে এসে শেষ হল । তারপর একটি ভটভটিতে চড়ে আমরা হোকর নদীর মাঝখানে নোঙর করে রাখা এম ভি চিত্ররেখা নামে সুন্দর লঞ্চটিতে গিয়ে উঠলাম । লঞ্চটি স্থির, কিন্তু তার ইঞ্জিনটি জেগে আছে, তার একটি ‘হামিং’ আওয়াজ আর মৃদু কম্পন আমরা উঠেই টের পেলাম । কেন জানি না, ব্যাপারটা বেশ ভালো লেগে গেল । এক নম্বর কেবিনে আমার আর অধ্যাপক ব্যানার্জির জায়গা হয়েছিল । কিন্তু আমরা দুজনেই কোনওরকমে কেবিনে ব্যাগ সামিল করে দিয়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ছাদের ডেকে চলে গেলাম । এর পর যে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটবে এই লঞ্চে তাতে এই কেবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কমই থাকবে । কেবল রাতে ঘণ্টা ছয়েক ঘুমের জন্য আমরা খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে তার মধ্যে ঢুকব । এতে কেবিন সম্বন্ধে কোনও নিন্দামন্দ করছি না আমরা । তিন সিটের এই কেবিন চমৎকার সাজানো, ফ্যান, আলো, টেলিফোন, আয়না সবই আছে, বাথরুমটিও আয়না, শাওয়ার ইউরোপীয় কমোড-সজ্জায় সজ্জিত । কিন্তু সুন্দরবন দেখতে এসে কেবিনে সময় কাটায় কোন মূর্খ?

ছাদের ঢাকা ডেকে টেবিল চেয়ার সাজানো রেস্তোরাঁর মতো খাবার জায়গা, আবার পাইলটের ঘরের সামনে আর দুপাশেও চেয়ার। আমরা প্রত্যেকে চেয়ার দখল করে বসে গেলাম, গুজরাটি পরিবারের অর্ধডজন বালক-বালিকা হৈ হৈ করতে লাগল, অনেকের ক্যামেরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে; তারই মধ্যে নোঙর তুলে লঞ্চ ছাড়ল। ইলেক্ট্রিক হর্নের শব্দ করে, হোকর নদীতে পিছনে লম্বা ত্যারছা ঢেউ তুলে তুলে সে এগোতে লাগল। এটা সুন্দরবনের আবাদ হাসিল করা বসতি এলাকা। আমাদের লঞ্চ বসতি এলাকা ছাড়িয়ে আজ ঢুকবে মধ্যস্থ এলাকা বা 'বাফার জোন'-এ। তারপর কাল যাবে কেন্দ্রীয় বনাঞ্চল বা 'কোর এরিয়া'তে।

বসতি অঞ্চলের একটা চিহ্ন হচ্ছে নদীর ধারে ধারে লাল ইটের বাঁধ। এসব বাঁধের ওপর দিকে লাল রং এখনও কিছুটা বজায় আছে। তার তলায় যে স্তরটা তাতে গভীর কালো ছোপ এবং তারও নিচে শ্যাওলা-পড়া সবুজ রং ধরেছে। নিচের দিকে নদীর আঘাতে-আঘাতে বাঁধের দেওয়াল ভেঙে চুরমার, আলগা ইট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, জলের তলায় চলে গেছে কিছু। এখন ভাঁটা চলছে বলেই হয়তো এসব দেখা যাচ্ছে। বাঁধের এদিকেও নদীর পাড় বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বন্যার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে হালকা সবুজ ঘাস-গুল্ম গজিয়েছে। তাতে ছাগল চরছে; কিন্তু ছাগলদের একটা বিশেষত্ব হল, তারা ঘাস ছেড়ে শূন্য কাদাভর্তি পাড়ে কোনও কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত-সেখানে তারা কী খেতে পাবে জানি না। পাড়ে মাঝে-মধ্যে খড়ের চালাঘর, তার পাশে হয়তো একখানা বাঁশের খুঁটিওয়ালা বেঞ্চি-তাতে বসে ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখে চ্যাঁচাচ্ছে আর হাত নাড়ছে। পাশ দিয়ে যেসব ভটভটি যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে, তার ছাদে দাঁড়িয়েও দুয়েকটি শিশু হাত নাড়ছে-আমরাও তাদের দিকে হাত নেড়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আকাশে নীলের ফাঁকফোকর ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে অন্তত এ যাত্রা রৌদ্রের বাহিনী যুদ্ধ জিতে গেল, সূর্য আবার তাঁর রাজ্যপাটের দখল নেবেন। ডেকে চমৎকার ঠান্ডা হাওয়ার প্রলেপ খেতে খেতে আমরা এইসব দৃশ্য দেখছি।

ভাঁটার জন্য নদীর গভীরতা কম। লঞ্চকে অনেক সাবধানে গভীর অংশ ধরে এঁকেবেঁকে এগোতে হচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে দড়ি দিয়ে জল মেপে চলেছে। ফলে প্রথমে যেখানে গিয়ে ভিড়বার কথা-সেই সুধন্যখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পে পৌঁছতে আড়াই ঘণ্টার মতো লাগবে বলে রাজেনবাবু জানালেন। পরদিন জোয়ারে এই রাস্তাটুকুই চল্লিশ মিনিটে চলে এসেছিলাম। যেতে যেতে মধ্যাহ্নভোজন দিয়ে দেওয়া হল, ওপরের কাউন্টারে ছেলেরা সেই ট্রেনের ঘর-ঘর কাটা ট্রেতে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে ফেলল, তারপর টেবিলে টেবিলে সার্ভ করে গেল। আমরা এর মধ্যে দুর্গাদোয়ানি নদীর তীরে গোসাবা

বন্দর ছাড়িয়ে গেলাম। এটি যে হ্যামিল্টন সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা রাজেনবাবু উল্লেখ করতে ভুললেন না।

আমরা সুধন্যখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের দিকে চলেছি, আর মানুষের পৃথিবী ক্রমশ পশ্চাদপসরণ করছে। এগিয়ে আসছে জল আর জঙ্গল, সেখানে গাছপালা, নদী আর আকাশ ছাড়া আর জনপ্রাণীর দেখা নেই। অবশ্য কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি, দুয়েকটি বক, কয়েকটি মাছরাঙা। আমাদের বিনোদনের জন্য কি না জানি না, একটি বাটা জাতীয় ছোট মাছ দুবার জল থেকে কাত হয়ে লাফিয়ে লঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে গেল। ভটভটি বা জেলেডিঙিও বিরল হয়ে আসছে। সকালে বেরোলে নিশ্চয়ই আরও অনেক জেলেডিঙির দেখা পাওয়া যেত। আরেকবার যখন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সভাধিপতি নন্দদার দাক্ষিণ্যে ধেমোখালি থেকে বুড়ির ঢাবু পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলাম তখন সকালে প্রচুর জেলেডিঙি নাইলনের হালকা জাল পেতে বসে আছে দেখেছিলাম। তাদের নৌকোর নোঙরগুলো ছিল খুব অদ্ভুত। একটা মোটা প্লাস্টিকের ব্যারেলের সঙ্গে দড়ি জড়িয়ে দড়ির আরেক প্রান্তে পাথর বা ইট বেঁধে জলে ছেড়ে দাও-ব্যস, সেটা একটা 'বয়া' হয়ে গেল। এবার ওই বয়ার সঙ্গে নৌকোর নাকের দড়ি বেঁধে দিয়ে যতক্ষণ খুশি ভেসে থাকো। ছোট ছোট সাদা বেলুনের মতো বয়াও ভাসতে দেখেছিলাম। নৌকোগুলোতে ভারতীয় পতাকা লাগানো ছিল, শুনেছিলাম বাংলাদেশের যেসব নৌকো আসে সেগুলো থেকে আলাদা করার জন্যই সে ব্যবস্থা। বাংলাদেশের নৌকোও তখন বেশ কয়েকটা চোখে পড়েছিল। তাতে নৌকোর পিছনে তাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে।

আর দেখেছিলাম 'মীনশিকারি'দের। আবালবৃদ্ধবনিতার দল একা একা নদীর ধার ঘেঁসে বুকজলে হেঁটে চলেছে, দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে একটা হাতজাল। সে জালে ধরা পড়বে চিংড়ির মীন, যা ভেড়িতে বা চিংড়িপালনের ফার্মে চড়া দামে বিক্রি হবে। এতে তাদের দৈনিক একশো-দেড়শো টাকা রোজগার হবে। সহযাত্রীরা দুঃখ করছিল, চিংড়ির পোনা বেছে নিয়ে তারা অন্য মাছের পোনাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, এতে প্রচুর মৎস্যসম্পদ নষ্ট হয়।

এবারে দুপুর পেরিয়ে যাওয়া রৌদ্রে এসব দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। অনেক নৌকো শুকনো ডাঙায় তাদের ঘন আলকাতরা মাখানো পিঠ দেখিয়ে কাত হয়ে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছিল, কারও বা পিঠে লাগানো ছিল বাঁশের ঠেকা। তারা ছিল মেরামত ও প্রসাধনের অপেক্ষায়। আর নদীর পাড়ে জলধারা নেমে তৈরি করেছে বহু ছোট বড় খোয়াই, কোথাও বা খাড়ি চলে গেছে ভেতরে। খাড়ি আপাতত শুকনো, তার মধ্যেও বিশ্রাম করছে কিছু নৌকো। খাড়িটি যেন নৌকোর সাময়িক গ্যারেজ। আর আমরা

দেখেছিলাম ভাঁটার টানে জল সরে নেমে আসায় সুন্দরী ও অন্যান্য গাছের অনেকগুলো শিকড় বেরিয়ে পড়েছে, যেন একগাদা শিকড়ের ঠেকনোর ওপর ডালপালা মেলে খাড়া হয়েছে গাছগুলো, তাদের কাণ্ডের দেখা নেই । ভালো কথা, এত বয়স পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট মানেই বুঝি সুঁদরি গাছের জঙ্গল-অর্থাৎ ম্যানগ্রোভ হল সুঁদরি গাছ-যার থেকে নাম হয়েছে সুন্দরবন । রাজেনবাবু জানালেন মোটেই তা নয়, সুঁদরি, ক্যাওড়া, হেঁতাল, গরান ইত্যাদি যাবতীয় গাছের একটা যৌথ নাম ম্যানগ্রোভ । বাড়িতে এসে ওয়েবস্টার সাহেবকে সাক্ষী মানলাম । দেখলাম যে হ্যাঁ, তিনিও লিখেছেন- গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জলাভূমি অঞ্চলে যেসব গাছ ভেজা নরম মাটি আঁকড়ে থাকার জন্য শিকড়ের অধোগামী ডালপালা মেলে দিয়ে মাটির সঙ্গে শক্তপোক্ত বন্ধন তৈরি করে সেসবের সমষ্টিগত নাম ম্যানগ্রোভ । শুধু যে তারা শিকড়ের ডালপালা মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তা নয়, একেবারে ভেতর অংশে দেখলাম মাটির তলা থেকে আবার ছোট ছোট অ্যান্টেনার মতো অজস্র শিকড় মাটি ফুঁড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এগুলো শ্বাসমূল, নোনা জল সরে গেলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয় ।

সুধন্যখালিতে পৌঁছে দেখি, তার ধাপে ধাপে বেয়ে নামা কাঠের সিঁড়িওয়ালা ঘাটটি ভেঙে চুরে হাড়গোড় ভাঙা ‘দ’ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে । চক্রবর্তী মশাই বললেন, এখন সুধন্যখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পে লঞ্চ ভেড়ানো সম্ভব নয়, কাল সকালে ফেরার পথে চেষ্টা করা যাবে ।

এবার চলো সজনেখালি । আরও ঘণ্টা আড়াই পথ । রাজেনবাবুরা বারবার বলতে লাগলেন বাঘ দেখা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে । আমাদের পুরো সফরে এই ভাগ্য একেবারেই পলাতক ছিল, থাকবে যে এরকম আমি জানতাম । বস্তুতপক্ষে পর্যটকদের কাছে বাঘ দেখা যাবে এমন আশা তৈরি করার কোনও অর্থ হয় না । বাঘ ছাড়াই সুন্দরবনের অন্য আকর্ষণ আছে ।

সজনেখালিতে একটি বেশ ভালো যাত্রীনিবাস আছে । ইটের বড় বড় দেওয়ালের ওপর দোতলায় কাঠের ঘর-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সবুজ রং করা । সামনে সুন্দর বাগান । রাজেনবাবু আমাদের সাবধান করে বলেছিলেন, নেমেই সোজা ওয়াচ টাওয়ারের দিকে দৌড়বেন । টাওয়ারে উঠে বাঘ দেখার চেষ্টা করবেন । সত্যি দৌড়ে টাওয়ারে গিয়ে উঠলাম । দেখা গেল, জঙ্গলের মধ্যে গোটা তিনেক জায়গা পরিষ্কার করে যেন তিনটি রাজপথ মতো তৈরি করা হয়েছে । সেসব খোলা অবকাশে বাঘ বেরিয়ে এসে আমাদের ‘গুড আফটার নুন’ বলতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হল না । তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের চোখে জল আসার মতো অবস্থা হল এবং গাছের গুঁড়ি, মাটির স্তূপ,

শুকনো ডাঙা ডাল ইত্যাদি যাবতীয় কিছুকে আমরা বাঘ কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না । শেষে আরেকটা খোলা জায়গায় কিছু হরিণ আর বাঁদর দেখে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল, দুয়েকজন ক্যামেরার টেলিফোটো লেন্স বাগিয়ে ধরলেন । হরিণ দেখা অবশ্য এমন কিছু নয় । আসার পথে নদীর ধারে আমরা আরও দুদল হরিণ দেখেছি-গলা উঁচু করে তারা গাছের পাতা খাচ্ছে । বাঘেদের যেমন লোকলজ্জা, হরিণদের তেমন কিছু নেই ।

টাওয়ার থেকে নেমে আমরা ঘের-দেওয়া কুমিরপুকুরে এলাম । শুনলাম সেখানে চারটি কুমির প্রতিপালিত হচ্ছে । কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য তারা বিশেষ ব্যগ্র বলে মনে হল না । একদল কী-একটা দেখে, 'ওই যে, কুমিরের নাক দেখা যাচ্ছে!' বলে চেঁচিয়ে উঠল । আমার খুব সন্দেহ ওটা আদৌ কুমিরের নাক ছিল কিনা ।

সজনেখালিতে একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার বা বাদাবন সংগ্রহশালা ও পরিচিতি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে । তাতে সংগ্রহ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে, এখন ম্যাপ-ট্যাপ কিছু রাখা হয়েছে । পুরো তৈরি হলে এটা বেশ কাজের হবে । আর ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যে এটিতেই কেবল মধু পাওয়া যাবে বলে শুনলাম । কাজেই ৪৫ টাকা কেজি দরে মধু কেনবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল । একটাই অসুবিধা, পাত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় । অনেকে মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল নিয়ে গেছে । তখন জিজ্ঞাসা করা হল, ওগুলো নোনা জলে ধোয়া হয়েছে কিনা, কারণ মিষ্টি জল লেগে থাকলে মধু নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা । যাই হোক, ওই ঘরেই সাদা প্লাস্টিকের দু-কেজির ব্যারেল কিছু ঝোলানো ছিল । উচিত মূল্যে তা কিনে মধুলোভী কেউ কেউ সমস্যা সমাধান করলেন ।

এম ভি চিত্ররেখার একটি নিজস্ব ছোট মোটরবোট আছে, তাতে চড়েই আমরা লঞ্চ থেকে তীরভূমিতে যাতায়াত করছি । মধু কিনতে কিনতে সন্ধ্যা নামতে লাগল, সজনেখালির সোলার লাইট বা সৌরদীপ জ্বলে উঠল । আজ রাতে লঞ্চ এখানেই নদীর মধ্যে নোঙর ফেলে থাকবে, এখানেই জলের ওপরে আজ আমাদের রাত্রিবাস ।

আবার এসে ওপরের ডেকে একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম । আকাশে ছড়ানো-ছিটানো মেঘ, তারই মধ্য দিয়ে অস্তগত সূর্যের গোলাপি আভা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এল । সামনে নদীর দুদিকে আরও দুটি নদী বেরিয়ে গেছে, তার তীরে তীরে দূরের বনসমাচ্ছন্ন দ্বীপগুলিতে রাত্রি নেমে এল । সমুদ্রের স্বচ্ছন্দ ও শীতল বাতাস শরীরে আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছে । দৃশ্যপট মূলত অন্ধকার, অন্য তীররেখা সামান্য জেগে আছে, সেখানে একটি-দুটি সৌরদীপের আলো ম্লান হয়ে জ্বলছে । সজনেখালির অন্য ঘাটে অন্য একটি বেসরকারি লঞ্চে কিছু যাত্রী এসেছে, সেখানেও কোলাহল স্তব্ধ । তাতে স্পিকারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে,

'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম ।' একেবারে 'মেড-টু-অর্ডার' সন্ধ্যা, সবাই যেন ব্যবস্থা করছে এই সন্ধ্যাটিকে আমার জন্য অসামান্য মনোরম করে তোলার জন্য । একটু পরেই মেঘ নিঃশব্দে সরে গেল, একটা আকাশের চেয়েও মস্ত বড় আকাশ মাথার ওপর ছড়িয়ে গেল, আর তার গায়ে ফুটে উঠল লক্ষ লক্ষ তারার সলমা-চুমকির কাজ । এত বেশি আকাশ আর কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে, এত বেশি গ্রহতারা, এমন দিগন্তব্যাপী আকাশগঙ্গা? আমি তো মনে মনে বলতে লাগলাম-'আর কি কখনও কবে, এমন সন্ধ্যা হবে?' আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে এই সন্ধ্যাকে সমস্ত রোমকূপ দিয়ে আত্মসাৎ করতে লাগলাম ।

অবশ্যই স্তব্ধতায় সকলে অংশ নেয় না, মানবসমাজে তা দীর্ঘায়ু হওয়াও কঠিন । একটু পরে ডিনারের আয়োজন হল প্রখর আলোয় । আর ডিনারের আগে অবশ্যই একটু বিনোদন ছিল । গুজরাটি পরিবারগুলির শিশুরা সারেঙের ঘরের পিছনে উঁচু মতো জায়গাটাকে স্টেজের মতো ব্যবহার করে নানারকম হুল্লোড় করল । কেউ সিলিংয়ের পাইপ ধরে ঝুলতে লাগল সার্কাসের অনুকরণে, দুটি মেয়ে মুম্বই ছবির 'মেরা নাম চিন চিন চু' গানের সঙ্গে চমৎকার পুরোদস্তুর নাচ নেচে দিল । ক্যাসেট বাজিয়ে আরও দুয়েকটি গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সহ নিখুঁত নাচ নাচল তারা । আমি অবাক হয়ে বোকার মতো ভাবতে লাগলাম-'এ তো অসাধারণ ক্ষমতা! একবার-দুবার ছবি দেখেই পুরো নাচটা তুলে নিয়েছে!' পরে বোঝা গেল তা নয়, তাদের বাড়িতে এসব ছবির ভিডিও আছে, তারা বারংবার দেখে কঠোর অনুশীলন করে এই শিল্প আয়ত্ত করেছে । তারপর কিছুক্ষণ হিন্দি ও ইংরিজিতে নানা জোকস বলা হতে লাগল । তারপর ডিনার-সেদিক থেকে অভিযোগের কিছু ছিল না । তারপরেও আমরা অনেকক্ষণ ওই নক্ষত্রপরিকীর্ণ আকাশের নিচে বসে রইলাম ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি চতুর্দিকে জোয়ার । লঞ্চের স্পিকারে সকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে । চা-পর্ব সাঙ্গ হবার পর যখন লঞ্চ ছাড়ল-প্রথমে কালকের না-দেখা সুধন্যখালি এবং তারপর নেতিধোবানির ব্যাঘ্র প্রকল্পের উদ্দেশে, তখন মনে হচ্ছে সমস্ত অরণ্যপ্রদেশ জলের ওপর ভাসছে । গাছগুলির কাণ্ড বা শিকড়বাকড় কিছু দেখা যাছে না, পাড়ে মাটির চিহ্ন নেই । জলে কোনওরকম মাথাটুকু জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব গাছপালা । সুন্দরবনে লম্বা গাছপালা নেই বললেই চলে, ফলে ভয় হচ্ছিল জল আরেকটু বেশি হলেই আর কিছু থাকবে না, তখন 'জল শুধু জল' ।

সুধন্যখালিতে এবার ভিড়ানো গেল মোটরবোট, কিন্তু এখানেও বাঘের দেখা পাওয়া গেল না । টাওয়ারে উঠে বৃথাই দূরবীন কষলেন কয়েকজন । এই ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলোর

একটা মজা হল, এতে মানুষের জন্যই খাঁচার ব্যবস্থা, পশুরা বাইরে পরম ফুর্তিতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় । আমরা ঘাট থেকে তারের জালের ঘের দেওয়া রাস্তা দিয়ে যাই, টাওয়ারে উঠি, আর ওই আপাদমস্তক জালাবরণের রাস্তা দিয়েই ফিরে আসি । অনেকেই দেখালেন পাশে একটি মিষ্টি জলের পুকুর, সেখানে বাঘেরা নাকি জল খেতে আসে, কিন্তু আমরা যখন গেলাম তখন কোনও তৃষ্ণার্ত বা ক্ষুধার্ত বাঘ তার ত্রিসীমানাতেও ছিল না । রাজেনবাবুরা অবশ্য বলেছিলেন যে খুব নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হবে আমাদের, মানুষের একটু সাড়া পেলেই বাঘ গা ঢাকা দেয় । কিন্তু শিশুবাহিনীকে নিঃশব্দ রাখা কি চাট্টিখানি কথা?

নেতিধোবানি ব্যাঘ্র প্রকল্পে যেতে লঞ্চ জলের অলিগলি পথের মধ্যে ঢুকে পড়ল । এ হচ্ছে সেই 'কোর এরিয়া' বা কেন্দ্রীয় বনাঞ্চল, মানুষের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে । বনবিবিভরানি নদী, সেখান থেকে কলসিমারিতে ঢুকে দেখি দুদিকে গাছপালা খুব কাছে এগিয়ে আসছে । কোথাও মাইলের পর মাইল হেঁতালের ঝোপ । কোথাও ঝাঁকড়া গাছে ঘটের মতো ফল ঝুলে আছে-শুনলাম তারও নাম ধুঁধুল । গাছপালা সব গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লঞ্চের ঢেউয়ে দুলছে তাদের ভাসন্ত ডালপালা । পাখি ছাড়া আর কোনও প্রাণী ধারেকাছে নেই । এদিকে শুধু খালি দিয়ে নাম-নদীর হোক, জায়গার হোক । তাই সুন্দরখালি, বিলখালি, গাজিখালি-এইসব নাম যখন স্পিকারে ভেসে আসছিল তখন সেগুলি নদী না জঙ্গল না দ্বীপ সবই মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছিল । তারপর পাঁচটি জলধারার বিশাল প্রশস্ত এক মোহনা এসে পড়ল পঞ্চমুখানি-সেখানে পৌঁছলাম দেউলভরানি নদীর পথ ধরে ।

এই পরিক্রমায় মনে হচ্ছিল, আর কী চাই? এই বিশাল আকাশ, এই অনন্ত জলরাশি, এই সতেজ, অবিরাম আদিম জঙ্গল যার মধ্যে অনেক জায়গাতেই কোনও মানুষের পা পড়েনি-এই কি যথেষ্ট নয় । বাঘ-বাঘ বলে লোকে কেন এত হন্যে হয়? এর আগের বার দেখেছিলাম নদীর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে একটা জামা ঝুলিয়ে রাখা আছে । লঞ্চের লোকেরা বলেছিল, ওটা বাঘে খেয়েছে এমন লোকের জামা । এখানে ঝুলিয়ে লোককে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে, এখানে বাঘের ভয় আছে । একদিকে মানুষ বাঘকে ভয় পাচ্ছে, অন্যদিকে বাঘ মানুষের ভয়ে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে কে জানে । তার চেয়ে শুধু এই নিসর্গ দ্যাখো-প্রকৃতির অকৃত্রিম ঐশ্বর্য-অরণ্য আর জল, আর ওই আকাশ । জীবনানন্দের ভাষায় যাকে বলা যায় 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে ।' এই লঞ্চযাত্রা আমাদের বেশ কিছুক্ষণ ওই অনন্তের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দেয় ।

নেতিধোবানি ব্যাঘ্র প্রকল্প নেতাই নদীর ধারে। তারও কাঠের ধাপ খুব নড়বড়ে অবস্থায় আছে, মাঝখানে পুলটি বেঁকে গেছে। এক বছর আগেই নাকি এ কাঠের পুল তৈরি হয়েছিল। পাশে একটি নতুন কাঠের পুল তৈরি হচ্ছে অবশ্য। যারা কাজ করছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'কদিন টিকবে?' তারা খুব আনন্দিত হয়ে উত্তর দিল, 'এই এক বছর।' আরেকজন আরও একটু উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে ছ মাস বড় জোর।' যাই হোক, আবার সেই জালে ঘেরা পথ ধরে দৌড়ে টাওয়ারে গিয়ে ওঠা এবং আবার হতাশ হয়ে ফেরা। এর কাছাকাছি একটি প্রাচীন মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে দেওয়া হয়েছে, তবে তাঁরা এখনও এটি নিয়ে তেমন কোনও কাজ করে উঠতে পারেননি।

নেতিধোবানি ব্যাঘ্র প্রকল্পে সজনেখালির মতোই একটি বনবিবির মন্দিরও আছে- সামনে হোর্ডিং-এ শা জঙ্গলি বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যানও কিছুটা বলা আছে। এখানেই এমন একটি প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল জনবসতি এলাকায় যার দেখা প্রচুর মেলে কিন্তু এখানে তাকে দেখা একটু আশ্চর্যের। সেটি একটি নধরকান্তি পাঁঠা। বনবিবির কাছে মানত করে লব্ধকাম এক দম্পতি নাকি গত জানুয়ারিতে এই পাঁঠাটিকে বনবিবির পায়ে দিয়ে গেছে। বনবিবির পা থেকে মানুষের পেট পর্যন্ত রাস্তা পাঁঠার পক্ষে খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু এই নিয়ে নাকি প্রকল্পের লোকেরা দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল পাঁঠাটিকে আশু উদরসাৎ করার পক্ষে, অন্য দল মায়ের জিনিস মানুষের ভোগে লাগানোর সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এই স্ট্র্যাটিজিগত সুবিধা নিয়ে পাঁঠাটি দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছে এবং মহানন্দে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। এই পাঁঠাটিকে নাকি বাঘেও ছোঁয় না। যাই হোক, একে দেখে যাত্রীদের অনেকেই বাঘ না দেখার দুঃখ কিছুটা ভুললেন বলে মনে হল।

নেতিধোবানি থেকে আমাদের ফেরার পর্ব। ঢেউডাঙা খাল থেকে বিশাল মাতলা নদীতে পড়লাম, তা থেকে জলের একটি গলি ধরে বিদ্যাতে পড়তে হবে। এখানে নদী বিশাল চওড়া-ওপার ধু ধু দেখা যায়। বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রের খুব কাছাকাছি এসেছি আমরা। চক্রবর্তী মশাই বললেন আর ঘণ্টাখানেক দক্ষিণে গেলেই বঙ্গোপসাগর। কোথাও কোথাও বারো-তেরো কিলোমিটার দূরত্ব এপার আর ওপারের। এই পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যাবলী শেষ হল তারপর কখন আবার ভাঁটার রাজত্বে ঢুকে পড়লাম জানি না। ফিরে এলাম মানুষের চেনা পৃথিবীতে। সেই ইটের বাঁধ, সেই জল সরে যাওয়া শুকনো পাড়ের ওপরে বিশ্রামরত নৌকো, ভটভটি আর মোটর লঞ্চ, সেই ছাগল-চরা নদীর ধার, সেই খড়ের চালের বাসগৃহ দোকানপাট, মাঝেমধ্যে পাকাবাড়ি, আর সেই নদী পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে আসা কংক্রিটের পুল, যার গায়ে ভটভটি গিয়ে ভেড়ে। এইভাবে একসময় সোনাখালি-বাসন্তী এসে পড়ল, আমরা তলপি-তলপা গুটিয়ে ডাঙায় এসে আবার সেই

বাসের গহ্বরে ঢুকে পড়লাম । বৈকালিক চা-জলখাবারে আপ্যায়িত করে সাড়ে সাতটা নাগাদ, অর্থাৎ প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, বাস আমাদের কলকাতায় নামিয়ে দিল । যা পিছনে ফেলে এলাম তা সত্য না স্বপ্ন তাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম ।

ভ্রমণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

মণিমহেশ

কমলা মুখোপাধ্যায়

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে একটি সুন্দর ছোট্ট রাজ্য তার অতীত গৌরব ও সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজমান তা কজনই বা জানেন? কুলু, কাংড়া, বাঁশোলি, ডালহৌসির নামই পরিচিত সবার কাছে । এখানে যে একটি পর্বতশৃঙ্গ আছে যা শিবলিঙ্গেরই মতো-তা কি কেউ জানে? অতএব পাঠানকোট যাচ্ছি শুনেই সকলে ধরে নেয় যে কাশ্মীর যাচ্ছি নিশ্চয় ।

চাম্বা দেশ, তার গদ্দী জনসাধারণ, তার দৃশ্যাবলি-সবই সুন্দর, তার সোনালি রঙের আপেল বিখ্যাত, তার শুভ্রবর্ণ মেষলোম মূল্যবান, সে এখন তার রুদ্ধদুয়ার খুলে ভারতের অপরাপর দেশবাসীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে । নতুন জীবনকে তারা সহজেই গ্রহণ করেছে, তাদের সরল জীবনযাত্রায় আমরা অভিভূত ।

ছোট্ট রাজ্য চাম্বা-অধুনা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত । এর চারদিকে জম্মু, লাহুল ও পাঞ্জাব । হিমালয়ের তিনটি তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী সমান্তরালভাবে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৩০-৪০ মাইল অন্তর অবস্থিত । বহির্হিমালয়ের অংশটি ধওলাধর নামে খ্যাত ও সমভূমির নিকট । দ্বিতীয় শ্রেণীটি মধ্য হিমালয়ের অংশ পীরপাঞ্জাল ও তৃতীয়টি অন্তর্হিমালয়ের অংশ এখানে এটি জাঁসকার নামে বিখ্যাত ও চন্দ্রভাগা আর সিন্ধু নদের মধ্যে জলবিভাজিকা । পঙ্গী পর্বতশ্রেণী চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যে জলবিভাজিকা । প্রধানত চাম্বা রাজ্যটি তিনটি নদী উপত্যকায় বিভক্ত । পাঠানকোট থেকে চাম্বা পর্যন্ত ৭৬ মাইল বাস রাস্তা হয়েছে । সকালে রওনা হলে বিকেলের মধ্যেই পৌঁছনো যায়, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও পায়ে হেঁটে যেতে হত । রাজধানী বর্তমানে চাম্বাতেই স্থিত, কিন্তু চাম্বা যখন দুর্ভেদ্য পাহাড়ি স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন তার রাজধানী ছিল ব্রহ্মপুর বা ভারমুরে । সেখানে যাওয়া এখনও শক্ত, ৪,০০০ ফুট থেকে ৭,০০০ ফুটে চলে গেছে পথ, এখন একটি বাস রাস্তা হয়েছে বটে খড়ামুখ পর্যন্ত কিন্তু তারপরে ১০-১১ মাইল হাঁটতে হয় ভারমুর পৌঁছতে হলে । হয়তো বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এত দুর্গম জায়গায় রাজধানী ছিল । ৭,০০০ ফুট পর্যন্ত মোটামুটি ধান, ভুট্টা, গম ও বার্লি হয়ে থাকে, তার ওপরে মাত্র একটি ফসল হয় । শীতকালে হাডসার (৮,০০০ ফুট) গ্রামগুলিতেও বরফ পড়ে, আগে নাকি আরও নিচুতে পড়ত । খড়ামুখ থেকে ভারমুর যেতে খাড়া ও

অসমান নগ্ন পর্বতগাত্র দেখলে সেই কথাই মনে হয় । সেই সময়ে ওপরের গ্রামগুলি থেকে গ্রামবাসীরা নেমে আসে । আমরা এবার যখন অক্টোবরের প্রথমে যাই তখন তাড়াতাড়ি মকাই, রামদানা শুকিয়ে নিয়ে নিচে আসার তোড়জোড় চলছে ।

চাম্বাতে ইরাবতীর দুটি উপনদী-বুধিল ও তুন্দা । বুধিল এসেছে মধ্য হিমালয়ের কুগতি গিরিপথের পাশ দিয়ে । হাডসারের কাছে এর সঙ্গে মিশেছে মণিমহেশ হ্রদ (১৩,০০০ ফুট) থেকে বার হওয়া ছোট স্রোতস্বিনীটি । দশ মাইলেরও কিছু বেশি পথ বেয়ে এটি ইরাবতীতে এসে পড়েছে, যে সঙ্গমস্থলে খড়ামুখ স্থানটি অবস্থিত । অপর নদী তুন্দা বুধিলের নিচ দিয়ে বয়ে মিশেছে ইরাবতীর সঙ্গে ।

চাম্বাতে ২-৩দিন থাকতে হয়েছিল যাবার ও আসবার পথে, তাই ভালো করে দেখবার সুযোগ হয়েছে । এখানে এখন স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে, চারপাশের অঞ্চলের সঙ্গে বাস মারফত বেশ খানিকটা যোগাযোগও শুরু হয়েছে । রাজধানীর নামও চাম্বা । রাজধানী হওয়াতে নতুন নতুন বাড়িঘর, ট্যুরিস্ট অফিস, রেস্টহাউস তৈরি হচ্ছে । যাত্রীদের খুব একটা ভিড় নেই । সবচেয়ে ভালো লেগেছে ভূরি সিং মিউজিয়ামটি । রাজপুত চিত্রাবলী ও বাগৌলী চিত্রাবলীর আসল চিত্রগুলি দেখবার সৌভাগ্য হল । তাছাড়া নিপুণ কাঠের কাজকরা তোরণ, সিংহাসন প্রভৃতি তো আছেই । ভূরি সিং ১৯০৩-৪ সালে এখানে রাজত্ব করেছেন, তাঁর সময়েই Rose এবং Huchinson যে গেজেটিয়ার রচনা করেন তার মধ্যেই চাম্বার পুরনো ইতিহাস ও তার বিষয়ে বহু তথ্য জানা যায় । বর্তমানে এখানকার লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ, আগে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল । পরে শাহিল বর্মা এই চাম্বা শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেন এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাদের পরাজিত করে ও তাঁর মেয়ে চম্পাবতীর নামে এই শহরের নামকরণ করেন । চাম্বার প্রধান দেবতার মন্দির হল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির । তারপরে গৌরীশঙ্কর মন্দির, ত্রিমুখলিঙ্গ মন্দির ও লক্ষ্মীদামোদর মন্দির । এগুলি প্রায় একই জায়গায় অবস্থিত । রাজপ্রাসাদের কাছে আছে বংশীগোপাল মন্দির ও শহরের বাইরে ভগবতী বজ্রেশ্বরীর মন্দির, আসলে এটি মহিষমর্দিনীর মূর্তি ।

চাম্বার প্রাচীন ঐতিহ্য শৈবধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত-ভারমুর ও মণিমহেশ শিবের স্থান । এ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম এসেছে পরবর্তীকালে । যত ওপরে উঠছি ততই এই শিবের পূজারীদের এবং মন্দিরগুলি দেখে তা উপলব্ধি করছি ।

চাম্বা থেকে খড়ামুখ পর্যন্ত কঠিন পথে বিকেলে বাস থামল-কিন্তু এখনও ওপরে যেতে হবে দশ মাইল । কোনও কুলি পাওয়া গেল না । এখানে যাত্রী বেশি আসেন না, তাই কুলিগিরিকে বৃত্তি হিসাবে কেউ গ্রহণ করেনি । সকলেই নিজেদের খেতখামার ও ভেড়ার পাল নিয়ে ব্যস্ত । ২-৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রাস্তা তৈরি করছিল যে কুলির দল তাদের

সর্দারকে অনুনয় করাতে সে রাজি হল একজন লোক দিতে। কিন্তু ৫টার আগে ছাড়তে পারবে না তাকে কারণ যদি পি ডাব্লু ডি সাহেব এসে পড়েন! তাতেই রাজি না হয়ে উপায় কী? খাবার ব্যবস্থা কিছুই নেই, একটি ছোট চায়ের দোকান ছাড়া। যাই হোক স্বর্ণাভ আপেলের বাক্স নিচে চালান যাচ্ছিল তার থেকেই কিছু কেনা হল। কোথায় লাগে এর কাছে কাশ্মীরের আপেল! শেষপর্যন্ত স্থির হল আমি দিন থাকতেই রওনা হয়ে ওপরের পথের ও গ্রামের প্রান্তে অপেক্ষা করব, আমার সঙ্গী পরে কুলিকে নিয়ে ও মাল নিয়ে আসবেন। ভারমুর পৌঁছতেই সূর্যের আলো শেষ হয়ে গেল। আমি রাতের বাসস্থান খোঁজ করে রাখলাম। কুগতি গিরিপথের একজন বনবিভাগের কর্মচারী (সে স্কুল ফাইন্যাল পড়ে এই চাকরি পেয়েছে) খুব সাহায্য করল। তহশিলদারের বাড়িতে নিয়ে গেল, তহশিলদার ছিলেন না, বাইরে Tour-এ ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেন না, অনেক কষ্টে পরে আসব বলে নিচে নেমে এলাম। কারণ তহশিলদারদের বাড়িটা বেশ কিছু উঁচুতে। গ্রামে ঢুকতেই বহু মন্দির চোখে পড়ে, তার সামনেই চায়ের দোকান। মন্দিরগুলির মধ্যে মণিমহেশ মন্দির, লক্ষ্মণাবতী (দুর্গা), নৃসিংহদেব ও গণেশের অষ্টধাতুর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের ওপরের কাঠের কারুকার্যগুলি সত্যিই দর্শনীয়। বরফে ঢেকে যায় বলে মণিমহেশ পর্বতের নিচে কোনও মন্দির নেই।

ভারমুর বা ব্রহ্মপুর ছিল চাম্বা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। ব্রাহ্মণী দেবীর বাসস্থান পাহাড়ের ওপর; সেখানে মন্দির আছে। তার পাশ দিয়ে যে জলস্রোত বইছে, তা থেকেই শহরের পানীয় জল আসে। এর নাম চৌরাশী ক্ষেত্রও বটে, চুরাশি জন সিদ্ধপুরুষ এখানে এসে মূর্তি ধারণ করেছেন। অত মন্দির আছে কিনা জানি না তবে একই প্রাঙ্গণে বহু ছোট বড় মন্দির আছে। সামনেই একজন পরোপকারী সাধু নাগাবাবার মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর তিনিও দেবতা বলে পূজা পাচ্ছেন এখানে। আঙিনার অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুলটি অবস্থিত। আমাদের সঙ্গে একই বাসে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা চাম্বা থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলে ফিরল। মন্দিরের স্থানীয় পূজারী থেকে শিক্ষক সকলেই অভয় দিয়ে জানাল, আশ্রয়ের অভাব হবে না। মন্দিরের যাত্রীশালা ও স্কুল তো আছেই, এক জায়গায় আস্তানা জুটে যাবে। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, দোকান যা দুয়েকটি ছিল, তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পাহাড়িরা সকাল সকাল শুতে যায়, কোথায় থাকি! নিচে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি কখন কুলি সহ আমার সঙ্গী আসবেন! হয়তো কুলি শেষপর্যন্ত অস্বীকার করেছে আসতে, তবে কী হবে! মনে মনে ঠিক করে ফেলি তাহলে ওই যে মাতৃসমাকে (তহশিলদারের মা) দেখেছি, তাঁর কাছেই রাতে থাকবে।

অবশেষে প্রায় রাত ৮টার সময় সঙ্গী এলেন ক্লান্ত হয়ে। কুলি তার মজুরি নিয়ে তখনই সেই সর্পিল hairpin bend রাস্তা ধরে নেমে গেল কারণ, তাকে ভোরেই কাজে

লাগতে হবে। আমরাও মনোমতো আস্তানা না পেয়ে তহশিলদারের গৃহ অভিমুখেই গেলাম অনেক সঙ্কোচ নিয়ে। কিন্তু কী রাজকীয় অভ্যর্থনা যে পেলাম! গৃহকর্তা নেই, কিন্তু তাঁর মা তাঁর নিজের ঘরটিতে আমাদের থাকতে বললেন ও তখুনি চাকরকে ডেকে খাবার তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তহশিলদার হলেন প্রায় 2nd class magistrate-এর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি ১৫-২০ দিন তাঁর তহশিল পরিদর্শন করেন-তবে তা করতে হয় পায়ে হেঁটে। কারণ ওপরের দিকের পথ এরকম খাড়া যে ঘোড়া পর্যন্ত চলে না। অবশ্য এই সরকারি কর্মচারীরা সবাই প্রায় হিমাচল প্রদেশের লোক এবং স্বভাবতই স্বাস্থ্যবান। বৃদ্ধার ঘরে অপর শয্যায় আমি রাতে শুলাম, অন্য একটি ঘরে আমার সঙ্গী রইলেন। জিনিসপত্র গুছনোর ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধার সাংসারিক সুখ-দুঃখের কাহিনীও শুনতে লাগলাম। একটি ১২-১৩ বছরের নাতনি তাঁর কাছে থেকে পড়ে। খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করেন হয়তো, তাই লোকজন দেখলে তাঁর এই সাদর অভ্যর্থনা; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত, অন্য দেশের লোককে একেবারে আত্মীয়ের মতো গৃহে স্থান দেওয়া, এক অভাবনীয় ব্যাপার! আমরা কি পারতাম! পরদিন সকালে চৌরাশী ক্ষেত্রে বা মন্দির প্রাঙ্গণে নেমে কুলির খোঁজ হল। সেই বনরক্ষক এবারও আমাদের সাহায্য করলেন। বাজারে কুলিদের থেকে একজনকে নিয়ে এলেন ও পারিশ্রমিকও ঠিক করে দিলেন। স্থির হল এখান থেকে শেষ গ্রাম হাডসারে গিয়ে পূজারীদের (গদ্দীদের) গ্রাম থেকে আরেকজন লোক নিয়ে মণিমহেশ যাওয়া হবে। এ পথে ভিড় নেই, আগেই বলেছি, সুতরাং এখানকার কুলিদের নির্দিষ্ট কোনও রেট নেই। বরফ পড়ে যাচ্ছে বলে কেউই এখন মণিমহেশ যায় না। সেখানে একটি চটি বা আশ্রয় থাকলেও শীতের জন্য রাতে থাকা যাবে না কারণ কাঠ কাছাকাছি পাওয়া যায় না। অসময় বলে ১০ টাকা প্রতিদিন হিসাবে রেট ঠিক হল। আমরা পরদিন ৮-৯ মাইল হেঁটে ৭,৮০০ ফুট উঁচু হাডসার গ্রামে পৌঁছলাম ও একজন গদ্দী বা শিবের পূজারীর বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম। সে অনায়াসে একটা ঘর ছেড়ে দিল। রান্নাঘরে রান্না করতে দিল, কোনও ভাড়া ইত্যাদি দাবি করল না। মুক্তিনাথের পথে আকালি গ্রামগুলির সঙ্গে কত তফাত এই সরল গদ্দীদের। আকালীরা প্রত্যেকটি জিনিস পয়সা ছাড়া দেয় না, এতটা ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন তারা।

শীত এসে পড়ছে বলে রাত অবধি ফসল মাড়িয়ে শুকিয়ে তোলার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। পথের ধারে সমস্ত বাড়িগুলির ছাদে মকাই শুকোচ্ছে, শীতের সঞ্চয়। এরা কিছুদিনের মধ্যেই নেমে যাবে। সেইদিন মাত্র ৯-১০ মাইল যেতে হবে বলে দুপাশে ভালো করে দেখে শুনে চললাম। ভারমুর থেকে পথের দুপাশে উঁচু পর্বতে ফসলের খেতের ধাপ, সঙ্গে বাসগৃহ স্থিত। কয়েক মাইল আসার পর এক জায়গায় পথটি দুভাগ হয়ে একটি রাস্তা সামনের দিকে ওপরে চলে গেছে। সেইখানেও গ্রাম আছে, নাংগ্রি (১৩,০০০ ফুট)

হয়ে চোবিয়া গিরিপথ পার হয়ে (১৬,৭০০ ফুট) বুগ্নী হয়ে বারাখাণ্ডা শৃঙ্গ ও গিরিপথ পার হয়ে নেমে ২৩ মাইল বনের মধ্য দিয়ে গেলে বিখ্যাত ত্রিলোকনাথের মন্দির । যেতে কি পারব এবার! যা হোক পথে বহু গদ্দী মেয়েদের সঙ্গে দেখা হল, বহু গদ্দী, মেষপালক ও গ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল । ভারমুরকে গদ্দেরানও বলা হয়, অর্থাৎ গদ্দীদের স্থান । গদ্দীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, থাকু, রাশ্বী সব জাতই আছে । ভারমুরের আশপাশেই এরা বেশি থাকে, তবে অতীতকালে এরা এসেছে বাইরের রাজ্যগুলি পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে । পূজারীরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কোমরে ৪০ হাত মেষলোমের বন্ধনী বা ডোরা পরে । ওইটাই প্রমাণ করে এরা শিবের পূজারী । সকলেই দেখতে খুব সুন্দর । গৌরবর্ণ, দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান । বেশিরভাগ লোকই মেষপালন করে, ধবধবে সাদা মেষ, গ্রামবাসীদের গায়ের কোট, মাথার টুপি সেগুলিও শুভ্রবর্ণের । প্রথম মেষশাবকটি মানত করে রাখে ও কোনও দেবমন্দিরে আবার বলি দেয় । ভারমুর স্থাপিত হয় ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে । বিখ্যাত মেরুবর্মার সময়ই (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ভারমুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নির্মিত হয় । অজেয় বর্মার (এর পরের রাজা) সময়ই গদ্দীরা এখানে এসেছে । বর্মণ রাজবংশ এসেছে কুমায়ুনের তালেশ্বর থেকে । এই রাজ্য ও রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস আছে যার ভিত্তি হল শিলালিপিগুলি । এই Inscriptionগুলি পুরনো মন্দিরগুলিতে আছে । চাম্বার চামুণ্ডা মন্দিরে শক্তি পূজার প্রভাব দেখা যায় । গদ্দীরা সবাই শিবের পূজারী বলে নিজেরাও ৪০ হাত ডোরা পরে । হাডসার হল পূজারীদের শেষ গ্রাম । এখানে একটি শিবের মন্দির আছে ।

পরদিন ভোরে উঠে, ধানচো অভিমুখে রওনা হলাম । প্রায় দশ মাইল পথ! এর পরে আর গ্রাম নেই । এখান থেকে আলু, টমাটো নিলাম । বোঝা কমাবার জন্য অনেক জিনিস ছেড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই শুধু নিয়ে রওনা হলাম । এখানকার উচ্চতা ৯,০০০ ফুট; ঘরবাড়ি নেই । আছে একটি আশ্রয়স্থল, যার আবার দুদিক খোলা অর্থাৎ বৃষ্টি, হাওয়া ঢোকবার প্রচুর সুবিধা আছে । ধানচোর উচ্চতা ৯,০০০ ফুট মাত্র হলে কী হয়, হাডসার থেকে আসার রাস্তা খুবই খারাপ । কোনও কোনও জায়গায় পাহাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কোথাও ৬-১২ ইঞ্চি সরু পথ । এগুলি আসলে মেষপালকদের যাতায়াতের পথ, পাথর ভেঙে কোনও রাস্তা তৈরি হয়নি । আমাদের সঙ্গে বরাবরের সঙ্গী ছিল ইরাবতী নদী । মেষপালকদের দুয়েকজনকে চোখে পড়ছে, যত ওপরে উঠছি ততই চোবিয়া গিরিপথ ও বারাখাণ্ডা শৃঙ্গ (১৭,০০০ ফুট) দৃশ্যমান হচ্ছে । এসব পার হয়ে কুগতি গিরিপথের রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে দেখলাম । এখান থেকে বনপথে স্পিতির রাজধানী কেইলংয়ে যাওয়া যায় । এ গিরিপথটিও ১৬,০০০ ফুট উঁচু । ধানচোর কাছে মণিমহেশ থেকে আগতা নালাটি বুধিলের সঙ্গে মেলবার আগে বেশ একটি সুন্দর তবে ছোটখাটো

জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। সেই নদীস্রোত পার হয়ে আবার উঠতে হল, এবং আবার কিছুটা নেমে ধানচোর আশ্রয়স্থলে পৌঁছলাম। তখনই শীত শুরু হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে গরম পানীয় খেয়ে রাতের খাবার তৈরি করা হল; প্লাস্টিক শীটগুলি দিয়ে চারদিকের ফাঁকগুলিতে পর্দা দেওয়া হল। জল অনেক নিচে, কুলিরা বুদ্ধি করে একটা বড় প্লাস্টিকের থলিতে জল ভরে রেখে দিল। ঠিক হল সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে, আমি সারারাত কাঠ ঠেলে দেব বলে আগুনের পাশেই শুলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি রাত দুটো বেজে গেছে, আগুন নিভে গেছে, চারদিকে ঠান্ডা হাওয়া, কনকনে শীত। কুলিরা আবার আগুন ধরাল। এইভাবে ভোর অবধি কাটল। ঘুম না হওয়াতে শরীর বেশ শ্রান্ত অথচ পরদিন মণিমহেশের চড়াই উঠতে হবে ও ফিরতে হবে। অন্তত ১০ মাইল পথ হাঁটতে হবে। সম্ভব হলে ওই দিনই হাডসারে ফিরতে হবে কারণ ধানচোতে খুবই ঠান্ডা-। পরদিন শুধু পূজারী ও সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে মণিমহেশের পথে যাত্রা শুরু করতে হল। মণিমহেশ প্রায় ১৪,০০০ ফুট উঁচু, সমস্ত পথটাই চড়াই আর এখানে পি ডাব্লু ডি-র লোকে কোনও পথ তৈরি করেনি, মেষপালকরা যে পথে গিয়েছে, সেগুলিই হল পথ, তবে শ্রাবণ মাসে অষ্টমী শুক্লা তিথিতে মণিমহেশের মেলা হয়, তখন বাইরে থেকে বহু তীর্থযাত্রী যান। শীতকালে এসব জায়গা তুষারাবৃত থাকে তাই পাথরগুলি খটখটে। এককে জায়গায় পথ এত সরু যে কোনওমতে এক পা রাখা যায়। এইভাবে সঙ্কীর্ণ পথে চড়াই উঠে একটা উন্মুক্ত উপত্যকার মাথায় এসে দাঁড়ালাম। সেটার সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি উপত্যকা দিয়ে আবার তৃণযুক্ত পাহাড়ের মাথায় চড়তে শুরু করলাম। মাঝে এক জায়গায় একটি অগভীর জলস্রোত-কুলিরা জানাল, ওটি গৌরীকুণ্ড। এখানে একটি পাথর সিঁদুর লেপা আছে। ভেবেছিলাম, ৫ মাইল পথ যেতে কতই বা সময় লাগবে? অবশেষে বেলা ১২টার সময় একটি hump বা কুঁজের নিচে এসে দাঁড়ালাম। এই hump পার হয়ে নিচে নামতে হবে তবেই নাকি মণিমহেশ হ্রদ ও শিবের পূজাস্থান দেখা যাবে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই মণিমহেশ পর্বতশাখার মহিমময় কৈলাস শৃঙ্গ (১৮,৫৬৪ ফুট) দেখা যাচ্ছিল। শিবের স্থান তাই কৈলাস নাম! আবার অমরনাথ থেকে শিব নাকি এখানে পালিয়ে এসেছিলেন এরকম কিংবদন্তী ও আরও বহুরকম কিংবদন্তী আছে। Hump-এর ওপর রাতে বরফ পড়েছিল, এখন গলে গেছে, তাই দ্রুত চলা সম্ভব হচ্ছে না। যা হোক এবারে নিচে নামার পালা। মণিমহেশের হ্রদটির নামও ডাল হ্রদ। একটি লম্বাটে ধরনের অগভীর জলাশয়। চতুর্দিকের পাহাড় থেকে যে বরফ গলা জল এসে পড়ে তাই থেকে এই হ্রদের সৃষ্টি। জলাশয়ের অপর প্রান্তে ত্রিশূল গ্রথিত ও কয়েকটি পতাকা উড়ছে। একটি চতুর্মুখ প্রস্তর মূর্তি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আরেকজন দেবতার মুখ-স্বচ্ছ জলে বরফমণ্ডিত পর্বতশ্রেণীতে ছায়া পড়েছে। আমরা জলাশয় বা হ্রদটির পাশে বসে বিশ্রাম নিয়ে চারপাশে পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন দিক দেখতে পেলাম। আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে বসেছিলাম,

সেখান থেকে ২-৩ হাজার ফুট উঠলেই মনে হচ্ছে শৃঙ্গে পৌঁছনো যায়, এত কাছে মনে হয় । আমার সঙ্গীর পর্বতারোহণে শিক্ষা আছে, তিনি তো খুব উৎসুক । আমাদের পিছনে, মহিমময় কৈলাস শৃঙ্গ সূর্যকিরণে দীপ্তিমান । পর্বতের গায়ে বরফের আস্তরণ, ফাটল সব দেখা যাচ্ছে । কয়েক বছর আগে, খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালে জাপানি ও ভারতীয় (গুজরাতি) মহিলাদের একটি যৌথ দল কুগতি গিরিপথ দিয়ে কৈলাস শৃঙ্গে আরোহণ করেন ।

এদিকে দুটো বেজে গেছে-ফেরার তাড়া; ভাবি, উতরাই পথ বেয়ে আসতে আর কতই বা সময় লাগবে! কিন্তু তৃণময় উপত্যকাগুলি পার হয়ে যখন আবার নগ্ন প্রস্তরপথে পৌঁছলাম, তখন বুঝি, নামাটাও কী প্রাণান্তকর! ক্লান্তিতে ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না, সঙ্কীর্ণ পথে একটু এদিক ওদিক হলেই নিচে পড়ে যাব । আমাদের গদ্দী পূজারী আমার গামছা নিয়ে এক বোঝা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে ফেলল-কারণ, সেদিন রাতেও তো ধানচোতে থাকতে হবে । -অতি কষ্টে বিকেল পাঁচটায় সেই ধানচোতে এসে পৌঁছলাম । অপর কুলি রান্না করে বসে রয়েছে, ভাবছে, আজ রাতে আর শীতের কামড় খেতে হবে না । কিন্তু সেরাতে তো আর দশ মাইল পথ যাওয়া যায় না, অতএব রাতে সেখানেই রইলাম । পরদিন ভোরে রওনা হয়ে বেলা ১০টায় হাডসারে পৌঁছে ভোজনপর্ব সেরে সেদিনই রওনা দিয়ে ভারমুরে পৌঁছলাম । আমাদের পূজারী গদ্দী রয়ে গেল তার আপন গ্রামে । পৃথ্বী সিং ভারমুর পর্যন্ত এসে টাকা নিয়ে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল । এবার নেমে তহশিলদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । সাদরে আহ্বান করলেন তাঁর নিজের বাড়িতে । খুব যত্ন করে খাওয়ালেন এবং আরও একদিন থাকতে বললেন । এত দূরে একজন এরকম সজ্জন ব্যক্তিকে দেখব তা কল্পনাই করিনি । তাঁর কাছেই চাম্বার গেজেটিয়ার দেখলাম ও মোটামুটি এর একটা পরিচয় পেলাম । ভোরে উঠে আবার যাত্রা করতে হবে চাম্বার দিকে ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ২০০২

আমার ভ্রমন

দিকবিদিকে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

হাইওয়ের পাশ দিয়ে কুলিকের নীল জল বয়ে যাচ্ছে । সেই জল লকগেট বসিয়ে পাখিরালয়ের দ্বীপ ঘিরে যে হ্রদ, তাতে চালান করে দেওয়া হচ্ছে । জায়গাটি সোহরা মৌজার মধ্যে । মুখের কথায় বলে রায়গঞ্জ পাখিরালয় । রায়গঞ্জ শহর থেকে শিলিগুড়ি যেতে জাতীয় সড়কের ডান হাতে । ঠিক কুলিক নদী ছাড়িয়ে তারে ঘেরা পাখিরালয় । অবশ্যই সংরক্ষিত । ঢুকতেই বনবিভাগের বাংলো চোখে পড়ে । আর চতুর্দিকেই জঙ্গল । বেশিরভাগই জারুল বন । কিছু পাকুড়ও আছে । বাংলোর সামনেই বাঁধানো ঘাট । ডানদিকে দোতলা মাচানের অবজারভেটরি । সেখান থেকে গোটা জঙ্গলের মাথা নজরে অনায়াস । সবুজ পাতার পরিপ্রেক্ষিত জব্দ করে পাখির ফুল ফুটে আছে । গাছের ডালপালা পাতা কিছুই চোখে পড়ে না । সাদায় সাদা হয়ে আছে বনভূমির সর্বত্র । ইংরিজিতে ওদের নাম ওপেনবিল স্টর্ক, বাংলায় শামুকখোল । বর্ষায় আসে । বাসা বেঁধে, ডিম থেকে ছানা ফুটিয়ে আসামের বিল জলা আর ভারতের পূর্বাঞ্চলে ফিরে যায় শীতের মধ্যে । এরা বর্ষার পাখি, শীতের নয় । এখানে শীতের পাখি আসে না । তারা আসে এই পাখিরালয় থেকে কাছে অন্য একটি ঝিলে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে । বেলে হাঁসের সংখ্যাই বেশি । খন্তে বকও আসে । আসে কিছু হাড়গিলে । কিন্তু সেটা সুরক্ষিত জলাশয় নয় ।

পাখিরালয়ে বাংলো পাওয়া বেশ কঠিন । কলকাতা থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি । বনবাংলো মানেই আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক বিছানা মাদুর । খাবার দাবারের ব্যবস্থা চৌকিদার করে দিতে পারে, অবশ্য আপনাকেই রসদ কিনে আনতে হবে । চা চিনি দুধ সঙ্গে থাকলে তবেই চা পাবেন । অন্যথায় রাস্তার ধারের ঝোপড়ি দোকানেই নির্ভর ।

রেঞ্জারসাহেব থাকেন বালুরঘাটে । জঙ্গলে আছেন শুধুই বিট অফিসার এবং কিছু ফরেস্ট গার্ড । জন্তু জানোয়ার নেই, শেয়াল আছে, আর আছে বুনো খরগোশ । সাপখোপ? নিশ্চয়ই আছে । তবে, বাংলো বা বিট অফিসারের কোয়ার্টার ঘিরে যে বসতি, সেখানে আসতে ভরসা পায় না ।

শামুকখোল ছাড়া এ বছর হাজারখানের নাইট হেবন আর কিছু করমোরান্ট ও ইগ্রেট এসেছিল। সাধারণ বক আর পানকৌড়ি থাকে সম্বচ্ছর। কিন্তু পাখিরা কী খায়? কাটা খালে মাছ চাষ করা হয়। মাছ ধরার নিয়ম নেই। তাছাড়া এরা শামুকই পছন্দ করে বেশি। শামুক থেকে চুন হয় জানি। ওদের পুরীষে চুনের ভাগ মারাত্মকভাবে বেশি, তাই সবুজ পাতা পুড়ে খসে পড়ে। নিচের ডাঙায় ছোট গাছপালা বাঁচে না।

খাদ্যের ভাণ্ডার নিশ্চিন্ত আছে বলেই এরা হাইওয়ের হট্টগোলেও পালায় না। তবে কিছুকাল আগেও এদের ডিম রায়গঞ্জের হাটে বাজারে বিক্রি হত। ধরপাকড় হয়। আজকাল উপদ্রব কমেছে।

এবার গিয়েছিলাম ডিসেম্বরের শেষে। তখন অধিকাংশ পাখিই চলে গেছে। হাজার দুই শামুকখোল সর্বসাকল্যে, বাচ্চাদের ওড়ার কসরৎ শেখাচ্ছে অবিরাম। পাখি-মা পাখি-বাপের গায়ের রং ধূসর ও ক্লিন্ন হয়ে এসেছে। মারাত্মক চুনকামের কাজ হয়েছে, তাই গোটা জঙ্গলে সর্বাত্মক চুনের ফোঁটা। জঙ্গলের চেহারাও কেমন সর্বহারা ভিখিরির মতো।

সামচিতে

জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের সীমান্ত চামুর্চিতেই শেষ। চামুর্চি চা-বাগানের জন্যে বিখ্যাত। আর বিখ্যাত কমলালেবুর জন্য। সপ্তাহে দুবার হাট বসে। সেই হাটে কমলালেবু ছাড়া ভুটিয়া-মাখন আর জামা কাপড়। অর্থাৎ রংদার জোব্বা আর ততোধিক রঙিন মোজাসুদ্ধ জুতো বিক্রি হয়। চামুর্চি পর্যন্ত বাস। তারপর ভুটান সরকারের ল্যান্ডরোভার। নিয়মিত যাতায়াত করে। কিন্তু তাও যায় সামচি বাজার পর্যন্ত।

আমাদের জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে জিপ আসার কথা। ভারত সরকারের সার্ভে অফিসের একটি শাখা ভুটান সরকারকে সাহায্য করছে। ভুটানের মাটির তলায় কোথায় কোন খনিজ রহস্য, তাই উদ্ধারের চেষ্টা।

পাহাড়ি শহর সামচি। চামুর্চি থেকে সামচির দিকে গেলে মাঝখানে নো ম্যানস ল্যান্ড। সারা অঞ্চলে কটিখেত। কাঁচা রাস্তা ওপরে উঠে গেছে। ডলোমাইটের পাহাড় কেটে ডলোমাইট চালান যাচ্ছে ট্রাকভর্তি। চরাচরে ধুলো আর ডলোমাইটের গুঁড়ো। দূরে নীল ভুটান পাহাড়। পাহাড় আকাশে মিশে এক অসহ্য স্বপ্নের দেশ। ওই দেশে যাব। আগেও গেছি বহুবার। এই পাহাড়ি দেশ কখনও পুরনো হয় না।

দুপাশের পাহাড় কেটে চাষ হচ্ছে। একেই বলে জুমচাষ। যৎসামান্য গম, ধান আর কোদোর চাষ হয়। এই কোদো থেকে স্থানীয় মানুষ মদ তৈরি করে, অনেকটা বিয়ারের

মতো । বাঁশের পাত্রে কোদো সিদ্ধ করে ঠাসা । সঙ্গে লাগানো জল টানা পাইপ । আর কেটলিভর্তি গরম জল । কেটলির জল বাঁশের পাত্রে ভর্তি করা । ফুরোলে আবার ঢালা । টানতে টানতে গলা ব্যথা । নেশা ফেশার খোঁজ তালাশ নেই । একটা গোটা দিন অলসভাবে খরচা হয়ে যায় এই পাহাড়ি জনপদে । জুমচাষের মতোই ধাপে ধাপে সরকারি কোয়ার্টার । আমাদের যিনি নেমতন্ন করে এনেছেন, তাঁর বাড়ি একেবারে টুঙিতে । পিছনে ঝপ করে পাহাড় শেষ । নিচে ডায়নার নদীখাত । তারপর আসল পাহাড় শুরু । পাহাড় আর জঙ্গল । হিংস্র জন্তু জানোয়ার আর রহস্যময় মনস্টারির অন্ধকার ।

বাড়িগুলো সবই এক রকমের, একতলা বাংলোর মতো । পাকদণ্ডী বেয়ে যতই উঠি বাড়ে ঠান্ডা হাওয়া আর ঝোড়ো বাতাসের ঝাপট । দুপাশে পাইনের ঝাড় । পাইন আর ধুপি আর চাঁপ । মাঝে মাঝে আনারসের জঙ্গল । একটা ফুড প্রিজার্ভেশনের কারখানা, একটা ব্রুয়ারি, সেন্ট পলস স্কুল, হস্টেল, ডিসির বাংলো, হাসপাতাল । পাহাড়ের চুড়ো ছেঁটে সিমেন্ট বাঁধানো । এটাই সামচি বাজার । চতুর্দিকে মণিহারী দোকান, ছোট ছোট বার, পানশালা । একটির নাম আবার হ্যাঙওভার । বেশ বড় বাজার । কমলার সময়ে ভুটানিদের কমলা । অন্য সময়ে মাড়োয়ারি দোকানদার সস্তায় পসরা সাজায় । এক আধজন কাবলিওলাও দেখা গেল । মাড়োয়ার আর আফগান ব্যাঙ্ক বোধকরি পৃথিবীর সর্বত্র । এবাজারেই কস্তুরী মধু প্রভৃতি নানাবিধ জড়িবুটি নিয়ে আসে ভুটিয়া রমণী । লাল লাল ফুলো গাল, সরল সহজ এই মানুষগুলোকে দেখলেই ভালো লাগে । ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ।

আমি সস্ত্রীক এসেছি কয়েকবার । এখানে যখন তখন আকাশের মুখ গোমড়া হয় । বৃষ্টি নামে । বৃষ্টির সঙ্গে আধলা ইটের মতো বরফশিলা । মাথা বাঁচাতে মানুষ দৌড়োয় এদিক ওদিক । ফসলের ক্ষতি অগ্রাহ্য করেও এই পাহাড়ি সুন্দর শহর ছবির মতো টাঙানো থাকে ভুটান পাহাড়ের কোল জুড়ে । জলপাইগুড়ি থেকে বড় জোর ঘণ্টা আড়াই লাগে সামচি পৌঁছতে । সকালে গিয়ে সন্ধেতে ফেরাও যায় । শীতে ট্রাকভর্তি পিকনিক পার্টি যায় ডায়নার বালিয়াড়িভরা খাদে । যাবার পথে ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ি গয়েরকাটা রাজারহাট হয়ে চামুর্চি । সব জায়গাতেই বাংলো আছে । তবে আগে থেকে চিঠিচাপাটি লিখে ব্যবস্থা সেরে রাখতে হবে । নয়তো মনোকষ্ট ।

মাগুবি জুয়ারির দেশে

মাণ্ডবি জুয়ারি দুটি নদীর নাম । শুনলেই ভালো লাগে । দেখামাত্র ওই নদীর নীল চোখে বসে যাবে । জলে ধোবে না, আগুনে পুড়বে না, স্মৃতির মৌচাকে ভরে থাকবে তাদের কলধ্বনি । চোখে যতদিন দেখা যাবে, কানে যতদিন শোনা যাবে, ততদিন ওই দুই নদী,

দুই নাম । মাণ্ডবি আর জুয়ারি । বহুদিনের স্বপ্ন ওই দুটি নদী চোখ ভরে দেখে আসব । ওই একটুকরো বিদেশি ভারত ।

বম্বে গেলুম ট্রেনে । ঠিক বম্বে নয়, তার আগে ভুসওয়ালে দুদিনের জন্যে নেমে পড়লাম । একটু দম নিয়ে ছুট দেব । আরও একটা মতলব ছিল । ভুসওয়ালে পা দিয়ে অজন্তা ইলোরাটা সেরে নেব । সেখান থেকে সোজা স্বপ্নরাজ্যে ।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছাতার কাপড়ওড়া শিকগুলোর মতো হাওড়ার পোল পেরনো গেল । ট্রেন ছুট লাগিয়েছে । রাতের রেলগাড়ি । গোছগাছ সেরে কামরাটা দুদিনের ঘরের মতো । বাঙ্কে বিছানা পাতা শেষ । সঙ্গে আড়াই বছরের তিতির । আমরা ওপর নিচ দুটি বাঙ্কের মালিক । তিতির ওর মার সঙ্গে শোবে ।

ভুসওয়াল কারখানার শহর । বাড়িঘর, বাজারহাট, চওড়া রাস্তা, সব এক রকমের । এখানে আমি এক বছর থাকলেও নিজের বাড়ি চিনতে পারব না । এমন এক ধরনের বাড়ি আমি ভীষণ ভয় পাই । বৈশিষ্ট্যহীন বাড়ির চেহারা দেখলেই মনটা কেমন করে ওঠে । ভুসওয়ালে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই । মাছ পাওয়া যায় না । দূরে একটা ঝোরা আছে । আর কয়েকটা ফোড়ার মতো টিলা । ওই ঝোরার নাম দিয়েছি নদী । শুনেছি দূরে কোথায় আরও একটা পিকনিক স্পট আছে । অত্যুৎসাহীরা ছুটিছাটার দিনে যায় । ট্রানজিস্টার, টেপ বাজায় । গান গেয়ে গলা ভেঙে ফেলে ।

ভুসওয়াল থেকে অজন্তা ইলোরা যাব । আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিন যাতে জলের মতো গলে না যায়, লাঠি হাতে তার পাহারায় আছি । কোথাও বেড়াতে গেলে আমি স্থির থাকতে পারি না । সকালে এখানে তো দুপুরে অন্যত্র । সন্ধ্যার ঝোঁকে আবার সেই জায়গা ছেড়ে পাখির মতো উধাও কোনও জঙ্গল মহালের দিকে । কিংবা নদীর তীরে জলের ধারে । পায়ের নিচে সরষে । পা ফেললেই গড়ায় ।

ভোরবেলা বাস ধরে জলগাঁও । সেখান থেকে ঔরঙ্গাবাদ হয়ে অজন্তা ইলোরা পরদিন সকালে । তিতির খুবই ছোট । মুখে খই ফোটে, অথচ দুধের গন্ধ । ওকে নিয়ে অজন্তা ইলোরার ব্যাপারটা প্রথম থেকেই আমার না-পছন্দ ।

কিন্তু খবর পাওয়া গেল আগের দিন কংগ্রেস নেতা চ্যবনকে ঘিরে ইট পাটকেল জুতো ছাতা ছোড়াছুড়ি হয়েছে । পুলিশি হাঙ্গামা । ব্যস, সাড়া অঞ্চল জুড়ে বনধ । এবারের মতো অজন্তা ইলোরার আশা ত্যাগ করে সোজা বম্বে । উদ্দেশ্য গোয়া এবং গোয়াই । মাণ্ডবি জুয়ারির দেশে । আর ভুসওয়ালে ফেরা নয় । ভুসওয়াল ভালো । কিন্তু কতটুকু ভালো?

বম্বের বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের কিছু জানাইনি । শুধু জবরদস্ত সাহেব বুড়োকে দুছত্র লিখেছি-অমুক তারিখ নাগাদ যেতে পারি । ভারি কাজ হাতে রাখিস না । আর কাউকে এক লাইনও নয় । জানাজানি হয়ে গেলে কেলেংকারি । অজন্তা ইলোরার মতো গোয়াও পণ্ড হবে । আমি নিজেকে চিনি এবং বন্ধুবান্ধবদেরও চিনি হাড়ে হাড়ে ।

ভেবেছিলাম অজন্তা ইলোরা সেরে টেলিগ্রাম করব । ভুসওয়াল থেকে করা উচিত ছিল । কিন্তু উচিত কাজ আমি কখনই করে উঠতে পারি না ।

যাই হোক ভেসে তো পড়লাম । একটা কিছু হয়ে যাবে । এই বিশ্বাস আমাকে শান্তি দিয়েছে । অসুবিধেয় পড়িনি, এমন নয় । তবে সেগুলো ভুলে যেতে পারি । ভুলতেই হয় । নয়তো প্রকৃতই মুশকিল । হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল । সলিলদাকে ফোন করি । আমাদের বন্ধু প্রিয়জন তিনি । বহুবার কলকাতায় দেখা হয়েছে । উনি আসতে বলেছেন । আমিও ঘাড় কাত করেছি । নিশ্চয় আসব । আর আজ কীভাবে আসা? যাই হোক, একটু গালাগালি বরাতে আছে । কী করা? মীনাক্ষীদের একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি বুথ থেকে সলিলদাকে ফোন করলাম । সঙ্গে সঙ্গে উত্তর । যেখানে আছ, একভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক । নড়াচড়া করবে না । কোথা থেকে ফোন করছ?

বললাম ।

মিনিট সাতেকের মধ্যে গাড়ি নিয়ে হাজির । তারপর যা সব কটুবাক্য বললেন তা না বলাই ভালো ।

সলিলদা কি যবন? যবনের মতো হুমকি হামকি? তবু সেই যবনের হাতেই নিজেদের সঁপে দিলাম । বোম্বাই সলিলদার নিজের শহর । এখানে কলকাতার কোনও খাসদখল নেই ।

বম্বে থেকে গাড়ির সিটে রাতের ঘুমঘোরে গোয়া । চোখের সামনে পাহাড় টিলা, ঘর বাড়ি আর সমুদ্দুর । শহরটাকে সমুদ্র পাহাড় জঙ্গল আষ্টেপিষ্ঠে ঘিরে আছে । যেদিকে তাকাই হলুদ বালি নীল জল । নীল আকাশ, নীল সমুদ্র । এই রঙের মধ্যে ডুব দিয়ে কটা দিন ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে দেব ।

ভ্রমণ আগস্ট, ১৯৯৩

তিস্তানদীর উৎসে

শরৎ ঘোষ

গত বছর নভেম্বর মাসের প্রথমে গিয়েছিলাম উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার । আমরা পাঁচজন সমতলের বাসিন্দা, গাইড-বেঞ্জামিন গুরুং এবং গাড়ির চালক ছোকদুপ লাচেনপাকে (লাচেনপা কথার অর্থ লাচেনের ছেলে) সঙ্গী করে ইয়ুমথাং ইউমেসামডাং ঘুরে যাত্রা করি লাচেনের উদ্দেশে, লক্ষ্য ছোপতা উপত্যকা এবং গুরুদোংমার হ্রদ ।

সকালে লাচুং থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঝকঝকে রোদ্দুর গায়ে মেখে আর লাচেন পৌঁছলাম তুষারপাতের মধ্যে ।

৯,২০০ ফুট উচ্চতায় লাচেনে যখন পৌঁছলাম, তখন চারদিক মেঘে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন । তীব্র ঠান্ডা হাওয়া, সব নিস্তব্ধ নিঝুম । রাস্তা বরফ ও কাদায় মাখামাখি । কোথাও কোনও জনমানুষের চিহ্ন নেই । কিছুদূর এগিয়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়াতেই বিশাল বিশাল লোমওয়ালা কুকুর এগিয়ে এল ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে, আর সেই শব্দে ইতিউতি মানুষের উঁকিঝুঁকি । এমন সময় ওপর থেকে একটি মিলিটারি জিপ নেমে এল আমাদের অবাক করে-জিপের মাথায় অন্তত এক ফুট বরফ জমেছে ।

আজকে আমাদের বিরতি লাচেনে-ছোকদুপের বাড়িতে । গত তিনদিনের ভ্রমণে ছোকদুপ এখন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু । সে স্থানীয় বাসিন্দা । এখানে এবং থাঙ্গুতে তাদের একটি করে বাড়ি আছে । থাঙ্গু হল তার মা-বাবার গ্রীষ্মকালীন আবাস । লাচেনে চার-পাঁচটা থাকার জায়গা আছে কিন্তু ছোকদুপ আগেই আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিল তার মা-বাবা এখন থাঙ্গুতে, তাই বাড়ি ফাঁকা । আমরা সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম-এরকম একটা জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে থাকা এক সুন্দর অভিজ্ঞতা ।

বেশ বড় চত্বর নিয়ে ওদের বাড়ি । নিচের তলায় শীতের প্রস্তুতি হিসেবে জ্বালানি কাঠের ভাণ্ডার এবং পশুদের বাসস্থান । কাঠের সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করলাম বৈঠকখানায়, এটাই ওদের রান্নাঘর, শীতে ঘর গরম রাখার জন্য এই ব্যবস্থা । মেঝে জুড়ে সুদৃশ্য মোটা কার্পেট । দেওয়ালের একদিকে টানা কার্পেটমোড়া সোফার মতো বসার জায়গা । তিন দিকের দেওয়ালে তাকে রাখা ঝকঝকে বাসন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র । কিন্তু ছাদের

দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলো মুরগি এবং আস্ত দুটো ঠ্যাং চামড়া ছাড়িয়ে শুকনো অবস্থায় ঝোলানো। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ঠ্যাং দুটি ইয়াকের এবং শীতের সময় খাওয়ার জন্য আরও সংগ্রহ করা হবে। ছোকদুপ আমাদের চা খাইয়ে দুপুরের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দুপুরে খাওয়ার সময় ছোকদুপের বাবা এসে হাজির থাঙ্গু থেকে, মিলিটারি ট্রাকে চেপে, জানালেন ওপরে ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে। তিনিও আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দিলেন। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতেই তাঁর নিচে আসা। আমরা আগামীকাল গুরুদোংমার যাব জেনে খুশি হলেন এবং উনিও যদি আগামীকাল আমাদের সঙ্গে থাঙ্গু ফেরেন তাহলে আমাদের কোনও আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন। আমরা শুনে অবাক, ওঁর বাড়িতে আমরা কোনও কিছু চিন্তা না করে দখল নিয়েছি, আর উনি নিজের ছেলের গাড়িতে থাঙ্গু যাবেন তার জন্য কত সাত-পাঁচ ভাবনা।

খাওয়ার পর ছোকদুপ ও তার বাবা বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির প্রকোপ বাড়তে থাকায় দুপুর ও বিকেলে আমরা ঘরেই বন্দী হয়ে রইলাম। লাচেনে কিছুই দেখা হল না। ঘরে বসে আগামীকালের যাত্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সন্ধের মুখে ওঁরা ফিরে এসে জানালেন এই আবহাওয়া হচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা, সকালে দেখবেন আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর আমাদের নিয়ে ছোকদুপের বাবা গেলেন উপাসনাগৃহে-বুদ্ধমূর্তি পদ্মাসনে বসা, তার নিচে বিভিন্ন সময়ের লামার ছবি প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত। ঘরের দেওয়ালে মুখোশনৃত্যে ব্যবহৃত কিছু মুখোশ এবং দেওয়াল চিত্রণ ও কিছু পুথি। শান্ত, স্নিগ্ধ, গম্ভীর পরিবেশ। আমাদের বসতে বলে নিষ্ঠার সঙ্গে নিচু স্বরে অনর্গল বৌদ্ধমন্ত্র উচ্চারণে মগ্ন হলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হতে আমাদের দেখে স্মিত হেসে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালেন।

আমাদের উপলক্ষ করেই জ্বালানো হয়েছে বড় উনুনটি, এতে ঘরটি খুবই আরামপ্রদ হয়েছে। আমরা উনুনকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে কফি হাতে বসে গল্পে মেতে উঠলাম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি-বাইরে নিকষ অন্ধকার, অবিরাম বৃষ্টি ও হাওয়ার শব্দ। ভেতরে কজন উনুনের আগুনের আলোতেই উদ্দীপ্ত। আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম ছোকদুপের বাবার জীবনসংগ্রামের কথা। নানা লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী। জানালেন, শীতের সময় লাচেন চলে যায় ৪-৫ ফুট বরফের নিচে, সেই বরফ থাকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এখন ফৌজিদের আনাগোনায় রাস্তা পরিষ্কার থাকে ঠিকই কিন্তু ছোটবেলায় শীতে তাঁরা তুষারপাতে অবরুদ্ধ হয়ে যেতেন পুরোপুরি। তখন পাকা সড়ক ছিল চুংথাং পর্যন্ত। সেখান থেকে লাচেন হয়ে থাঙ্গু ছিল হাঁটাপথ। জঙ্গল ছিল আরও ঘন। তখন তিনি বাবার

হাত ধরে বেরিয়ে পড়তেন সেই বিপদসঙ্কুল পথে । তখন জীবনযাত্রা ছিল অন্যমাত্রার । গল্পে গল্পে রাত হয়েছে বুঝতে পারলাম ছোকদুপের খাওয়ার তাড়ায় । খাওয়া সেরে বাইরে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম-তীব্র কনকনে ঠান্ডা আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি । আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি দেখে একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে শুতে গেলাম ।

ঘুম ভাঙতেই টর্চের আলোয় সময় দেখলাম ভোর ৪টে, চারদিকে কল্পনাতীত নিস্তব্ধতা, আজই আমাদের গুরুদোংমার যাওয়ার কথা, একরাশ কৌতূহল নিয়ে চুপিসারে দরজা খুলে বেরতেই এক অবাক বিস্ময় । আকাশ তারায় ভর্তি, বৃষ্টি থেমে গেছে । কাল লাচেন পৌঁছে থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কিছুই নজরে আসেনি, দেখি আশপাশের পাহাড়গুলো তুষারশুভ্র । গাছের পাতায় পাতায় তুষার জমেছে । সে এক অসাধারণ অনুভূতি । তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম । এই অবস্থায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইল না, মনে ভীষণ আনন্দ-গুরুদোংমারের পথের আবহাওয়াও নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে । এপাশ ওপাশ করে আরও কিছু সময় কাটিয়ে বন্ধুদের সবাইকে ঘুম থেকে ওঠালাম । বাইরে এসে সকলেই খুশি । ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে । সকাল ৬টার মধ্যে আমরা সবাই তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু করলাম গুরুদোংমারের উদ্দেশে । প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও ঝকঝকে সোনা রোদ্দুরে হাত পা ছড়িয়ে লাচেন গ্রাম, সকলেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে গতকালের জড়তা কাটিয়ে ।

লাচেন থেকে কিছুটা এগিয়ে বেশ কিছু নিচে নেমে আমরা জেমু চু (চু মানে নদী) পার হলাম । এই নদীর পার ধরেই বাঁদিক ঘেঁসে ঘুরে গেছে গ্রিনলেকের বিখ্যাত ট্রেকরুট । নদী পার হয়েই গাড়ি উঠতে শুরু করল । গতকালের বৃষ্টিতে সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার, তার ওপর শেষ রাতের বৃষ্টি ভোরের ঠান্ডায় তুষারে পরিণত হয়েছে । যত ওপরে উঠছি পাহাড়ের চূড়াগুলো তত কাছে আসতে থাকে । সবই তুষারপাতে সাদা । ক্রমে আমরা ZEMA-1,2,3 অতিক্রম করলাম । জায়গাটি অপেক্ষাকৃত সমতল এবং এগুলি মিলিটারিদের যাতায়াতের পথে থাকার জায়গা । এরপর আমাদের গাড়ি ভয়ঙ্কর চড়াই ভাঙতে শুরু করল । ছোকদুপের গাড়ি চালানোর পটুতায় আমরা মুগ্ধ । প্রতিটি তীক্ষ্ণ বাঁক যেন তার মুখস্থ । প্রায় ১০ কিলোমিটার চড়াই ভাঙার পর এসে পৌঁছলাম সামাথাং গ্রামে । এখানে দেখি সব কিছুই তুষারে মোড়া । সামান্য একটু চা-পানের বিরতি । ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম ইয়াথাং-উচ্চতা ১২,২০০ ফুট । ক্রমশ গাছপালা কমতে শুরু করেছে, আরও ৩ কিলোমিটার এগিয়ে কালেপ চু অতিক্রম করে পৌঁছলাম কালেপ গ্রামে । সাদায় সাদা-যেদিকে তাকাই শুধুই সাদা । যতগুলি গ্রাম পেরিয়ে এলাম, লক্ষ করলাম সকলেই প্রস্তুতি নিচ্ছে শীতের আগে নিচে নামার । যাদের লাচেনে ঘরবাড়ি আছে তারা সেখানেই শীত কাটাবে আর যাদের নেই তারা আরও নিচে নেমে যাবে । কালেপেও

রয়েছে একটি মিলিটারি ছাউনি । কালেপ ছাড়তেই আমাদের গাড়ি বরফে স্লিপ করতে শুরু করল । আগের জমা বরফ তাই শক্ত হয়ে গেছে । অতি উৎসাহী হয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছবি তুলতে গিয়ে আছাড় খেলাম । এই হঠকারিতার জন্য বকুনিও খেলাম ছোকদুপের বাবার কাছ থেকে । অতি সন্তর্পণে গাড়ি চালিয়ে ৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা থাঙ্গু গ্রামে পৌঁছলাম । গ্রামে ঢোকার আগে ছাউনি হেলিপ্যাড । এখানেই ৩ বছর আগে হিমপ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন বেশ কিছু ভারতীয় জওয়ান । ডানদিকে রয়েছে তাঁদের উদ্দেশে স্মৃতিফলক । সামরিক এলাকা শেষ হতেই শুরু হল গ্রাম । প্রত্যেক বাড়ির ছাদ সাদা মুকুটে সজ্জিত হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল । থাঙ্গুকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম মনে হল । গ্রামবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেরই লাচেনে বাড়ি আছে । থাঙ্গুতে তাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস, উদ্দেশ্য চাষাবাদ ও ইয়াকের প্রতিপালন ।

থাঙ্গু গ্রাম ছাড়িয়ে লাসা চু পার হয়ে কিছুটা দূরে ছোকদুপদের বাড়ি চেবুক উপত্যকায়, বেশ নির্জন জায়গায় কয়েকটি বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে বসতি । ছোকদুপের মা ছেলেকে পেয়ে ভীষণ খুশি । আমাদের আপ্যায়ন করে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন । সকলের হাতে ধরিয়ে দিলেন বিস্কুট ও ধূমায়িত চা । ছেলেকে পেটপুরে খাইয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করিয়ে দিলেন গুরুদোংমার ঘুরে আসতে, কারণ বেলা বাড়লে আবহাওয়া খারাপ হতে পারে, গতকাল দুপুর থেকে সারা রাত এখানে তুষারপাত হয়েছে । কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে রাস্তা উঠে গেছে ছোপতা উপত্যকায় । আমরা এগিয়ে চললাম বরফের রাজ্যের বুক চিরে, পাশে বহমান নদীর গতি শ্লথ, আর কয়েকদিনের মধ্যেই জল জমে বরফ হয়ে যাবে, মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ ।

থাঙ্গুর পর আর কোনও গ্রাম নেই, সবই সামরিক আওতায় । ৬ কিলোমিটার চলার পরে এল ইয়ংডি, উচ্চতা ১৪,২০০ ফুট, মাল রাখার ছাউনি, গাড়ির গ্যারেজ আর একটি চেকপোস্ট । থাঙ্গু পর্যন্ত পারমিট অতি সহজেই মেলে কিন্তু তার বেশি এগোতে গেলে প্রয়োজন বিশেষ অনুমতির, যা আমাদের গাইড গ্যাংটক থেকেই নিয়ে রেখেছিল । পারমিট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আমাদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন । পৌঁছলাম গোগং, সামরিক সূচনায় এই জায়গার নাম লগরেপ, উচ্চতা ১৫,০০০ ফুট, এখানেই এই পথের শেষ চেকপোস্ট যা আসাম রাইফেলস-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে । অফিসার দাঁড়িয়েই ছিলেন, আমাদের বাংলায় কথা বলতে শুনে দাসবাবু নিজের পরিচয় দিয়ে ভাব জমালেন । তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে বললেন । আবহাওয়া যে কোনও সময়ে খারাপ হতে পারে, তাই বিলম্ব নয় ।

চেকপোস্ট পেরিয়ে ধীরগতিতে শুরু হল অন্তিম লক্ষ্যে যাত্রা। বরফের মাত্রা কমতে থাকল। ৪ কিলোমিটার দূরে পৌঁছলাম বরফহীন শুষ্কশীতল বালুকাময় প্রান্তরে। দূরে একটি তুষারশুভ্র চূড়া দেখা যাচ্ছে আর আশপাশে দুয়েকটি টিলার মতো পাহাড়, বাকি সবই সমতল। মনে হচ্ছে সব পাহাড় পেরিয়ে অন্য কোনও জগতে চলে এসেছি। মাঝে মধ্যেই বিচ্ছিন্ন তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা জায়গা দেখে ছোকদুপকে জিজ্ঞেস করে উত্তর পেলাম ওগুলি মাইন পোঁতা আছে। যুদ্ধ লাগলে তারকাঁটাগুলো খুলে নেওয়া হবে। এই অঞ্চলের ইয়াকদের বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। দিগন্তবিস্তৃত শীতল মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। রাস্তার নির্দিষ্ট কোনও সীমারেখা নেই। পাকা রাস্তা বহু পূর্বেই শেষ করে এসেছি। মেঠো পথের মতো একই রকম রাস্তা এদিকে ওদিকে অনেকগুলি চলে গেছে, ওগুলি জওয়ানদের ব্যবহৃত পথ বিভিন্ন পয়েন্টে যাওয়ার জন্য। বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চল দিয়ে তিস্তা নদী চোলামো থেকে উৎপন্ন হয়ে ধীরগতিতে বয়ে চলেছে কুল কুল শব্দে। এই নদীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইয়াক বিচরণক্ষেত্র। অনিন্দ্যসুন্দর এই জায়গাটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে প্রায়শই, মরুঝড়ের সময় ইয়াক চরাতে আসা লোকজনদের তখন মাটিতে মুখ গুঁজে তুষার কণা ও নুড়িপাথর থেকে রক্ষা পেতে হয়। বড় কঠিন এই শুষ্ক, শীতল ও নির্জন অঞ্চলের জীবনধারা। আমরা গোগং থেকে যে তুষারশুভ্র পাহাড়চূড়া দেখেছিলাম অবশেষে পৌঁছলাম তার পাদদেশে। ২২,০০০ ফুট উচ্চতার এই পাহাড়টির স্থানীয় নাম গেউখা-সিকিমবাসীদের কাছে খুবই পবিত্র স্থান। আমরা দাঁড়িয়ে ১৭,০০০ ফুট উচ্চতার বালুকাময় প্রান্তরে, মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ তারই মাঝে দৃশ্যমান আপাদমস্তক বরফে আবৃত পাহাড়গুলি। এই বিহ্বলতা কাটল ছোকদুপের ডাকে-আর দেরি নয়, এখনও ১০ কিলোমিটার পথ বাকি।

আমাদের গাড়ি এবার উত্তর থেকে পূর্বমুখী। দূরে ডানদিকে সাদা বরফের পাহাড় নজরে এল, ওরই পাদদেশে আমাদের কাঙ্ক্ষিত হ্রদ গুরুদোংমার। যতই কাছে যাচ্ছি ততই মনের ছটফটানি বাড়ছে-অবশেষে গাড়ি মূল রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের পথ ধরল, সোজা পথ চলে গেছে চোলামো-তিস্তার উৎস। কিছুটা চড়াই ভেঙে আমাদের গাড়ি থামল মন্দির প্রাঙ্গণে। গাড়ি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, গাড়ি থেকে নেমে হ্রদের কিনারায় গেলাম, ত্রিকোণ আকৃতির ঘন নীল রঙের টলটলে জলের হ্রদ, হ্রদের পিছনে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রুপোলি রঙের বরফাবৃত পাহাড়। তাতে সূর্যের আলো পড়ে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত দ্যুতি। ১৭,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে ঈশ্বর যদি কোথাও থাকেন তবে এখানেই, বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় শাশ্বত শান্তির বাণী।

বিহ্বলতা কাটিয়ে গেলাম মন্দিরে, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান । মন্দিরে লামার সহযোগীর আতিথেয়তায় কিছু শুকনো খাবার সহযোগে চা পান । সামান্য বিশ্রাম নিয়ে হ্রদের কিনারা বরাবর বোল্ডারের ওপর দিয়ে এগনোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ও উচ্চতায় হাঁফ ধরে আসছিল । হ্রদ থেকে একটা ক্ষীণ ধারা ইয়ুম চু নাম নিয়ে গিয়ে মিশেছে তিস্তায় । হাতে সময় ছিল, আবহাওয়াও অতি উত্তম । ছোকদুপ আমাদের প্রস্তাব দিল চোলামো যাওয়ার জন্য, আমরা সানন্দে রাজি । লামার সহকারীকে গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল উত্তর-পূর্ব মুখে, কিছুটা দূর গিয়ে আবার দক্ষিণমুখী হলাম । দিগন্তবিস্তৃত সমতল দেখে ভাবছিলাম পৃথিবীটা বোধহয় এখানেই শেষ । সামরিক গাড়ির আনাগোনায় বুঝতে পারি চিন (তিব্বত) সীমান্ত এখান থেকে খুবই কাছে কিন্তু উত্তেজনা নেই । বাঁদিকে রাস্তা গেছে বিখ্যাত সেসে-লার দিকে । অবশেষে পৌঁছলাম চোলামো । গুরুদোংমার থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ডিম্বাকৃতির হ্রদ । হ্রদ থেকে নীল জলের ধারা নির্গত হয়ে আপনমনে বয়ে চলেছে, এই হল তিস্তা নদী । হ্রদের পিছন দিকে তুষারাবৃত পাহাড়শ্রেণী আগলে রেখেছে এই হ্রদ । কিছুক্ষণ কাটিয়ে গুরুদোংমার ওই লামার সহকারীকে নামিয়ে দেবভূমিকে প্রণাম জানিয়ে শুরু হল ফেরার পালা ।

ধীরে ধীরে গেউখাকে পিছনে ফেলে দুটি চেকপোস্ট পার করে পুনরায় আমরা প্রবেশ করলাম বরফের রাজ্যে । চেবুক উপত্যকার কাছাকাছি এসে ডানদিকে ছোপতা উপত্যকার রাস্তা ধরলাম । বেশ কিছুক্ষণ পর নজরে এল বিশাল এক বরফাবৃত সমতলক্ষেত্র-ছোপতা উপত্যকা । এখানে রয়েছে ইয়াক প্রতিপালন ও প্রজননক্ষেত্র । উপত্যকার গা বেয়ে এই রাস্তা চলে গেছে মুগুথাং-ছোকদুপের ভাষায় সে নাকি স্বর্গোদ্যান-হ্রদ, পাহাড়, নদী, উপত্যকা, বরফ, ফুল ইত্যাদি নিয়ে সে এক অসাধারণ জায়গা । এই পথ ধরেই গাড়ির রাস্তা তৈরি হচ্ছে মুগুথাং যাওয়ার, বর্তমানে ট্রেক করে যাওয়া যায় তবে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন । ভবিষ্যতে মুগুথাং যাওয়ার সুপ্ত বাসনাকে বুকে নিয়ে বিকেলের সোনালি রোদ গায়ে মেখে ফিরে এলাম চেবুক উপত্যকায় ছোকদুপের বাড়িতে । আজ এখানেই আমাদের যাত্রার বিরতি ।

ছোকদুপের মা আমাদেরই অপেক্ষায় ছিলেন । পৌঁছনো মাত্র সকলের হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ ধরিয়ে দিলেন । ধীরে ধীরে সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল । আকাশের তারাগুলিকে মনে হচ্ছে অনেক কাছে নেমে এসেছে । বরফ থেকে এক অদ্ভুত দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে । আজ তার তুষারপাতের চিহ্নমাত্র নেই । কিন্তু তীব্র ঠান্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকা গেল না । স্বল্পপরিসর ঘরে টিনের মধ্যে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে তাপ নেবার সুন্দর ব্যবস্থা । ঠান্ডার কারণে রাতে ঠিকমতো ঘুম এল না । আস্তে আস্তে

ভোর হয়ে এল । আবছা আলো আঁধারিতে তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতি দর্শনে । হাতে বেশি সময় নেই, আজ সন্ধেবেলায় আমরা পৌঁছে যাব গ্যাংটকে ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

গ্যাংটক থেকে স্থানীয় ট্র্যাভেল এজেন্সির মাধ্যমে এই ট্যুর হয়ে থাকে । গুরুদোংমার যেতে হলে-দুরাত তিনদিনের প্যাকেজ, একই যাত্রায় ইয়ুমথাং গেলে-চাররাত পাঁচদিনের প্রয়োজন । আমাদের পাঁচজনের দলে মাথাপিছু খরচ পড়েছিল ৪,৬০০ টাকা, আটজনের দল হলে খরচ কম । এই খরচ গ্যাংটক থেকে গ্যাংটক । গাড়িভাড়া, থাকা-খাওয়া সমেত । অনেক খুঁজে তবেই বেঞ্জামিন গুরুংকে রাজি করাতে পেরেছিলাম গুরুদোংমার যাওয়ার জন্য । এই পথে গাড়ির চালক লাচেনবাসী হলেই ভালো ।

কোথায় থাকবেন

লাচুংয়ে বেশ কিছু ও লাচেনে চার-পাঁচটি থাকার জায়গা আছে । আপনার ট্র্যাভেল এজেন্সি থাকার ব্যবস্থা করে দেবে, তবে থাঙ্গুতে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই ।

যাবার সময়-এপ্রিল-জুন, যদি গুরুদোংমার যাওয়ার পথ বরফে বন্ধ না থাকে । সেরা সময় শরৎকাল (সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি) ।

পারমিটের জন্য বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন:

The Superintendent of Police

Check Post Division of the Sikkim Police Dept., Gangtok

আপনার পারমিট ট্র্যাভেল এজেন্সিই করিয়ে দেবে, তবে পরখ করে নেবেন ।

আমাদের গাইড ও ড্রাইভারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন ।

যোগাযোগের ঠিকানা:

গাইড: বেঞ্জামিন গুরুং, ফ্রেন্ডস ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস ডেভেলপমেন্ট এরিয়া

৯, শপিং কমপ্লেক্স, গ্যাংটক, সিকিম, %(০৩৫৯২) ২৭১১৮ (বাড়ি)

ড্রাইভার: ছোকদুপ লাচেনপা, প্রযত্নে, গিগডাল বিল্ডিং, আপার সিচে, গ্যাংটক

%(০৩৫৯২) ২৭৮০৬, ২৭৩২৫ (বাড়ি) ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

পশ্চিমে হাওয়াবদল

মধুপর্ণা দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমঝরা সন্ধে নামার ঠিক মুখটায় আমাদের ট্রেন ঢুকল খোলামেলা ছোট্ট স্টেশন শিমুলতলায় । আধো আলোয় চারপাশটাকে ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই চোখে পড়ল দেওয়ালে লেখা, ‘কোনওদিন গেছ কি হারিয়ে, হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে/ দিশেহারা মাঠে/ একটি শিমুলগাছ নিয়ে/আকাশের বেলা যেথা কাটে?’ যদিও শুরুতে একটা তুমি লাগানো আছে তবু কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই লাইনকটির ব্যবহারে চমকে গিয়ে দেখি ওটা একটা হোটেলের বিজ্ঞাপন । আমাদের থাকার জায়গার কোনও ঠিক ছিল না, ভাবছি হোটেলের হদিশ নেব কারোর কাছে, এমন সময় কয়েকজন না চাইতেই, ‘ঘর লাগবে? বাড়ি লাগবে?’ বলে এত কথা বোঝাতে লাগল যে মনে হল আমাদের দায়িত্ব এরা প্রায় নিয়েই ফেলেছে । হাতে প্রত্যেকের কার্ড না হয় লিফলেট বিভিন্ন ডেকরেটার্স স্টোর্সের । স্টেশন ম্যানেজার তখন ছিলেন না, রেলেরই এক ভদ্রলোক বললেন এদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ায় কোনও ঝুঁকি নেই । শিমুলতলায় বাড়ি বলতে বেশিরভাগই বাগানঘেরা পুরনো আমলের বাংলো বাড়ি, সেকালের বাঙালিদের তৈরি স্বাস্থ্যনিবাস । এসব বাড়ি এখন প্রায় খালিই পড়ে থাকে । কিছু বাড়ির মালিকানা বদল হয়েছে আর কিছু বাড়ির মালিকরা অবসরে ছুটি কাটাতে আসেন এখনও, বাকি সময় খালি বাড়ি সাময়িকভাবে ভাড়া পাওয়া যায় । রিজার্ভ, হংকং বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের হলিডে হোম বা হোটেল থাকলেও বাগানবাড়িই বেশি আকৃষ্ট করল আমাদের । বাড়িগুলোয় স্বাচ্ছন্দ্য হয়তো একটু কম কিন্তু বনের মাঝে এক বাড়ির আঙিনায় যখন জ্যোৎস্না নামে তখন ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলোই যথেষ্ট । আমরা উঠলাম ‘বিহারিবাবু’-র বাংলোয় । ডেকরেটার্স স্টোর্সের লোকই নিয়ে বাংলো দেখাতে, পছন্দ না হলে আবার অন্য কোথাও নিয়ে যেত, তাতে ওদের বিরক্তি নেই । কিন্তু সন্ধেবেলায় বেশি বাছাবাছিতে না গিয়ে আমরা এখানেই থাকব ঠিক করলাম । বাংলোর ঘরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকলেও কারেন্ট প্রায় থাকে না আর থাকলেও তার যা ভোল্টেজ তার থেকে হারিকেনের আলোয় জোর বেশি । বাড়ির ভাড়া ৮০ টাকা, দুটো ঘরে ৬-৮ জন অনায়াসে থাকা যায় । তবে তোশক, চাদর, বালিশ, কম্বল, বালতি, মগ সবই ভাড়া নিতে হয় ওই ডেকরেটার্সের থেকে । পঞ্চাশ পয়সা থেকে ৩ টাকা ভাড়া জিনিসপত্র

। ওরাই পৌঁছে দিয়ে যায় সবকিছু আবার নিয়েও যায় । থাকার ব্যবস্থা মিটিয়ে যখন বাইরে বেরলাম ঠান্ডা তখন জাঁকিয়ে বসেছে । বাংলো থেকে মিনিট ৫-৭ হেঁটে গেলে স্টেশন রোড পড়ে । সেখানেই রাস্তার দুপাশে যাবতীয় দোকান । চা, সিঙারা, মিষ্টির দোকান বেশ কয়েকটা থাকলেও ভাত-রুটির দোকান মাত্র দুটো, আরাধনা আর তৃপ্তি হোটেল । তাও খাবার তৈরি থাকে না, বললে করে দেয় । আসলে এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা বেশিরভাগ নিজেরাই রান্নাবান্না করেন । তার জন্য স্টোভ, হাঁড়ি, কড়া সব ভাড়া পাওয়া যায় । ফলে খাবার হোটেলের তেমন বাজার নেই । তবে সিজনে (দুর্গাপুজো আর বড়দিন থেকে শুরু করে পুরো জানুয়ারি মাস) নাকি খাবার হোটেলেও ভিড় হয় ।

শিমুলতলার আশপাশে যা কিছু দেখার আছে অল্প সময় নিয়ে পায়ে হেঁটে তা দেখা সম্ভব নয় । সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় কিন্তু তাতেও সবটা ঘোরা সম্ভব নয় তাই আমরা একটা অটো ঠিক করলাম । সকালে সে নিয়ে যাবে হলদিঝরনা, লীলাবরণ, সিকিটিয়া আর দুপুরে ধরারা । সবমিলিয়ে ২২৫ টাকায় রফা । হলদিঝরনা যেতে গেলে রেললাইন পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরতে হয় । লালমাটির ধুলো উড়িয়ে অটো ছুটল । এদিকেও পথের দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তবে গাছপালা একটু কম, একটু যেন রুক্ষ । পথে পড়ে সুন্দর দুটো গ্রাম, বস্টিয়ারি আর বাথনাবরণ । বাথনাবরণ থেকে দুটো বাচ্চা ছেলে আমাদের অটোয় উঠে পড়ল হলদিঝরনা অব্দি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে । একটা টিলায় গিয়ে অটো থেমে গেল, এরপর হাঁটা রাস্তা, শাল, পলাশ, কুঁচ গাছের পাশ কাটিয়ে পাথুরে পথ চলে গেছে আরও গহনে । এত সুন্দর পথের শেষ না জানি কত সুন্দর ঝরনায় । জলকাদা পেরিয়ে একটা সবুজ পাহাড়ের কোলে পৌঁছে থেমে গেল ছেলে দুটো । আঙুল তুলে দেখাল সামনেই একটা ছোট পাথরের ওপর বাঁশের কঞ্চি বেয়ে তিরতিরে এক জলধারা, কর্পোরেশনের জলকলের মতো । ওরাই বলল, এই জলের নাকি অনেক গুণ, খেলে বিমারি সেরে যায় । যাই হোক, হাঁটাপথটা এত সুন্দর যে শুধু এই পথটুকুর জন্যই হলদিঝরনায় আসা যায় । লীলাবরণ আর সিকিটিয়া স্টেশনের কাছাকাছি । দুই জায়গাতেই আছে জলের ধারা । ধরারা শিমুলতলা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে । পথ খারাপ তাই অটোতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায় । তিনটে নাগাদ রওনা হয়েছি আমরা । শীতের আমেজ মাখা রোদ্দুর তখন নরম । খানিকটা চলার পর অটো হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল এক নদীতে । পায়ের পাতা ডোবে এমন নদী হেঁটে পার হলাম, অটোকেও ঠেলে তোলা হল । তারপর আবার পথ চলা উঁচুনিচু মালভূমির উজান বেয়ে । হেলে পড়া সূর্যের আলোয় যেন আরও লাল হয়ে উঠেছে চারদিক । কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ধরারায় । শেষ পথটুকু মিনিট পাঁচেক হেঁটে যেতে হয় গ্রামের পাশ দিয়ে । অস্তগামী সূর্যের আলোয় নদী তখন সোনা হয়ে ঝলকে উঠছে পাথরের বুকে । এখানকার

পাথরগুলো ভারি অদ্ভুত। সাদা-কালোয় রৈখিক আল্পনা কাটা। ওই পাথরে বসেই সূর্যাস্ত দেখলাম। তারপর ফেরার পালা। শীতের সন্ধে ঝপ করে যেই নামল শুরু হল রাতের আলোয় পথ চলা। চাঁদের আলো শাল, মহুয়া, পলাশের পাতায়, নরম ঘাসের ডগায়।

পরদিন সকালে হাঁটা লাগালাম লাট্টু পাহাড়ের দিকে। ছোট্ট একটা টিলার নাম লাট্টু পাহাড় আর তার কাছেই পরিত্যক্ত এক রাজবাড়ি। রাজাও নেই, রাজত্বও নেই তবু ভাঙাচোরা রাজবাড়িটা অনেক সময় নিয়ে নেয়। লাট্টু পাহাড় ছাড়াও দূরে দূরে আরও অনেক নীল পাহাড় চোখে পড়ে রাজবাড়ির ছাদ থেকে।

শিমুলতলা থেকে আমাদের যাবার কথা যশিডি হয়ে মধুপুর। এ অঞ্চলে যাতায়াতের সবচেয়ে ভালো উপায় লোকাল ট্রেন (DMU) ধরা। কথা ছিল দুপুরের DMU ধরে আমরা মধুপুর যাব। সময় লাগবে একঘণ্টা। অন্যান্য দিনে গোটাতিনেক DMU ঝাঁঝা-আসানসোল যাতায়াত করে কিন্তু রবিবার দুপুরে একটাই ট্রেন যশিডি হয়ে বৈদ্যনাথধাম যায়। অগত্যা আমরা আধঘণ্টার রাস্তা পেরিয়ে যশিডিতে নামলাম। সেখান থেকে অটোয় ১০ মিনিটের পথ বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর। ট্রেকারও যায় এই পথে। দারোয়া নদী পেরিয়ে ঢুকলাম দেওঘরে। তারপর সেখান থেকে বাস ধরে মধুপুর। এদিককার বাস রাস্তাগুলো অনেক ঘুরপথে গেছে। তাই ট্রেনে যশিডি থেকে মধুপুর মাত্র আধঘণ্টার রাস্তা হলেও বাসে লেগে গেল প্রায় তিনঘণ্টা। কিন্তু পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে বাসরাস্তার ধকলটুকু নেওয়াই যায়। সারওঁয়া, সারথ, সুমরা বাজার, পাথরোল হয়ে সন্ধেবেলায় বাস পৌঁছল মধুপুরে। পথে পেরোতে হয়েছে অজয় নদ।

বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে সাঁওতাল পরগনার জল-হাওয়া কতখানি স্বাস্থ্যকর তা প্রথম আবিষ্কার করেন বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু নামে এক ভদ্রলোক। তিনি এসেছিলেন মধুপুর-গিরিডি রেললাইন পাতার ঠিকেদারি নিয়ে ১৮৭১ সালে। শাল, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা মধুপুর তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে জমি কিনে বাড়ি করে তিনি এখানে বসবাস শুরু করেন। তারপর শুরু হয় বাঙালিদের পশ্চিমে আসা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র এসে থেকে গেছেন এই অঞ্চলে, স্যার আশুতোষের বাড়ি ছিল মধুপুরে। এখন অবশ্য অল্প কয়েকটা স্মৃতিচিহ্ন বাদ দিলে মধুপুর আপাদমস্তক বিহারি শহর। বাহান্নবিঘায় এবং অন্যান্য প্রান্তে অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে শুধু কিছু পুরনো বাড়ি এখনও আছে যার অনেকগুলোই ধ্বংসাবশেষ। বাহান্নবিঘায় 'সোনার বাংলা' বলে একটি বাড়ি আছে আশু ঘোষের। পথ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে ডঃ আর আহমেদের বাড়ি 'রিভার ভিউ'। তাছাড়া মন্দার, শুভ্রা, অর্ঘ্য, বন্দনা ইত্যাদি নামে আরও অনেক নিরিবিলি বাড়ি আছে। স্টেশনের কাছাকাছি পাথুরেঘাটার মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাড়ি 'টেগোর

কট’ । বাড়িটি এখন হোটেল হয়েছে । মধুপুর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পাথরোল । সেখানকার প্রতিমা জাগ্রতা বলে বিখ্যাত । মধুপুরে আমরা উঠেছিলাম এম্ব্যাসি হোটেলে ।

মধুপুর থেকে গিরিডির দূরত্ব বাসে ৪২ কিলোমিটার আর ট্রেনে ৩৬ কিলোমিটার । গিরিডি মধুপুরের থেকে অনেক বড় শহর, জেলা সদর । গিরিডিতেও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন । বাঙালির স্মৃতিবিজড়িত অনেক বিশ্রামগৃহ এখানেও আছে । গিরিডি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে উশ্রী ফলস আর ৩০ কিলোমিটার দূরে পরেশনাথ পাহাড়ের নিচে মধুবন । দুটো জায়গায়ই যাবার জন্য গাড়ি বা অটো ভাড়া করতে হয় । গাড়িভাড়া ৩৫০-৪০০ টাকার মতো, সিজনে আরও বাড়ে । উশ্রীতে আমরা গিয়েছিলাম ভোরবেলায় । উশ্রী নদী অনেকটা ওপর থেকে দুটো প্রধান ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচে । জলের গর্জনে সব শব্দ ঢাকা পড়ে যায় । একটু দূরে একটা ফরেস্ট রেস্টহাউস আছে, ইচ্ছে করলে থাকা যায় সেখানে, বুকিং হয় গিরিডি থেকে ।

আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল হল কারমাটার । যার নাম এখন ‘বিদ্যাসাগর’ । ছোট্ট স্টেশন । মধুপুর থেকে আসানসোলের দিকে আধঘণ্টার পথ । কারমাটারে থাকার তেমন জায়গা নেই । মধুপুর থেকে এসে ঘুরে যেতে হয় । বিদ্যাসাগর তাঁর শেষজীবনে এখানে এসেছিলেন । স্টেশনের ওপারে সরু গলির মধ্যে একটুখানি ঢুকেই বাঁদিকে চোখে পড়ে ‘নন্দনকানন’ লেখা ফলক । অনেকখানি ফাঁকা জমির মধ্যে একতলা একটা বাড়ি, এখন বিদ্যাসাগরের নামে একটি মেয়েদের স্কুল হয়েছে । স্কুল তখনও শুরু হয়নি, ভাবছি অপেক্ষা করব ভেতরটা দেখার জন্য । এমন সময় প্রায় সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন । নাম তার কার্তিক মণ্ডল । তাঁর পিতামহ কালী মণ্ডল বীরসিংহ গ্রাম থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এসেছিলেন । বিদ্যাসাগরের দেহাবসান হয় ১৮৯১ সালে এখানেই, কিন্তু কার্তিক মণ্ডলরা পুরুষানুক্রমে রয়ে গেছেন এখানে । কার্তিক মণ্ডল আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন বিদ্যাসাগরের ঘর । স্মৃতিচিহ্ন বলতে আছে একটা পালঙ্ক । ফিরছি যখন কার্তিক তখন দাওয়ায় রোদ পোহাতে বসলেন নাতির দুমাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে । সলজ্জ হেসে জানালেন, ওই বাচ্চাটির নাম রেখেছেন বিদ্যাসাগর ।

বিহারের বিভিন্ন জেলায় প্রক্ষিপ্ত অবিভক্ত বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে এখন আর বাঙালিরা সেভাবে নিজেদের ঘর বসাবার কথা ভাবতে পারে না হয়তো । শিমুলতলা বাদ দিলে শাল, মহুয়ার জঙ্গল হার মেনেছে কংক্রিট জঙ্গলের কাছে । তবু জল হাওয়ার একটা গুণ এখনও অবশ্যই আছে । আর তারই টানে প্রতিবছর পুজোয় আর শীতে যে সব ট্যুরিস্ট ছুটে যায় এই টাঁর অঞ্চলে তাঁরা কিন্তু এখনও বাঙালিই ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

হাওড়া থেকে শিমুলতলা রেলপথে ৩৪৮ কিলোমিটার । তুফান এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে নটায় ছেড়ে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছয় । রাতের দূরপাল্লায় ট্রেন শিমুলতলায় থামে না, সেক্ষেত্রে মধুপুরে নেমে বদল করে যেতে হবে । মধুপুর থেকে যশিডি আধঘণ্টা, যশিডি থেকে শিমুলতলা আধঘণ্টা, যাবার মধুপুর থেকে গিরিডি অন্য লাইনে আধঘণ্টা । সময় বাঁচাতে গেলে জায়গাগুলোয় ট্রেনে যাওয়াই ভালো । ট্রেন মানে DMU, একদম ঠিক সময়ে চলাচল করে, বরং দূরপাল্লার ট্রেন লেট চলে । শিমুলতলার কয়েকটি ডেকরেটার্সের নাম গঙ্গা যমুনা ডেকরেটার্স, এইচ এল ডেকরেটার্স, বেঙ্গল ডেকরেটার্স, কাজল ডেকরেটার্স । এদের চিঠি লিখে আগে থেকেও বাড়ির বুকিং করা যায় । ব্যাঙ্কের হলিডে হোম কলকাতা থেকে বুক করা যায়, সৃজনী হোটেলেরও বুকিং করা যায় । মধুপুরে থাকার জন্য হোটেল আছে, উল্লেখযোগ্য এম্ব্যাসি হোটেল, রাজ হোটেল । গিরিডিতে প্রচুর গেস্টহাউস আছে তাছাড়া আছে 'নিখার হোটেল' ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ১৯৯৬

এক টুকরো নীল চাঁদ

সুমিত মুখোপাধ.ায়

সবরকম আইনি অনুমতি সত্বেও এবার স্পিতিতে ঢুকতে হয়েছিল প্রায় সেই প্রাচীন অনুপ্রবেশকারীদের মতোই । রাস্তা ধসে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত । প্রথমে একটা মাল খালাস করা ট্রাকের পিঠে 'চাঙ্গো' তারপর ছোট ক্যান্টার ভ্যানে চেপে 'সামদো' চেকপোস্টে এসে দাঁড়ালাম । ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল । সেই ভোরবেলা রেকংপিও থেকে বাসে চাপার পর পুরো রাস্তাটাই ছন্দপতনের বিলাপ মাত্র । বাস ইয়াংথাং পৌঁছতে দুঃসংবাদ । কাছেই নাকো গ্রামের মুলিং নালা হঠাৎ খেপে উঠেছে । তার উচ্ছল নাচের ধাক্কায় ওই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের বিশাল এক খাবলা একেবারে নিশ্চিহ্ন ।

সামদো এই রাস্তায় স্পিতির প্রথম গ্রাম । কাছেই তিব্বতের পারে চু এবং স্পিতি নদীর সঙ্গম । চেকপোস্টের চেকিং নেহাতই মোলায়েম । ধুলোমলিন আমাদের চেহারাগুলো দেখে এবং কলকাতার শখের পাহাড়ি জেনে একমুখ হাসি । আরও একঘণ্টা ক্যান্টার যাত্রা শেষে হারলিংয়ে পৌঁছতেই সূর্যাস্ত । খবর ছিল একটু পরেই চাঁদ উঠবে শুক্লা দশমীর । একটা দোকানে বসে শুয়োরের মাংসের মোমো খেয়ে অভুক্ত শরীরে প্রায় ষাঁড়ের শক্তি এল । ভাবছিলাম অচেনা চাঁদনি পথে পদযাত্রার কথা । হঠাৎই একটা কেরোসিনের ড্রাম বোঝাই ট্রাক্টর আমাদের এককথায় তুলে নিল । আজকের মতো শেষ গন্তব্য ১৫ কিলোমিটার দূরের বিখ্যাত তাবো গ্রাম ।

ধুলো ধোঁয়া আর ট্রাক্টরের বিকট আওয়াজে নদী-পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটছিলাম সোজা পশ্চিমমুখো । পূর্বদিকে পাহাড় টপকে হ্যালোজেন চাঁদ উঠতে থাকল পাল্লা দিয়ে, রাত দশটা নাগাদ 'তাবো'র লোকনির্মাণ বিভাগের বাংলোর নরম গদিতে শুয়েও সকলেরই ট্রাক্টর হ্যাংওভার চলছিল ।

স্পিতিতে প্রথম সকাল । কাছে চায়ের দোকানে প্রাতরাশ সারলাম । লেখা আছে যে ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে লামা রিঞ্চেন গাংপো প্রতিষ্ঠিত এই 'তাবো' গুম্ফাটি সহস্রতম প্রতিষ্ঠা দিবস পেরিয়ে গেছে । সব ভুলে সাদা চোখে ইতিহাস দেখার ইচ্ছেয় ঢুকে পড়লাম প্রাচীনের অঙ্গনে ।

এই রুক্ষ ধূসর দেশটা একমাত্র লামাদেরই বাসযোগ্য। ধর্মের অনুশাসন আর কঠোর প্রাণধারণের প্রচেষ্টা মিলেমিশে এ এক অকল্পনীয় জীবনধারা। স্পিতির মানুষদের ইতিহাস শুধু অসম্ভব সহিষ্ণুতা আর সংগ্রামের। তাবো গুম্ভার ঠিক উল্টোদিকের খাড়া পাহাড়ের গায়ে এক সারি গর্ত দেখিয়ে এক যুবক লামা বললেন, ওঁদের পূর্বপুরুষেরা ওই গুহাগুলোরই বাসিন্দা ছিলেন। কারণ ধূসর উপত্যকার অধিবাসীরাও যুদ্ধ-লুঠতরাজ-খুনজখমের সাক্ষী। উত্তর লাদাখ আর তিব্বতের শাসকরা দক্ষিণের কুলু ও বাসার (কিন্নর) অঞ্চলে বারবার হানা দিয়েছে এই শান্তিপ্রিয় পরিশ্রমী মানুষগুলোর ওপর। শত্রুর আক্রমণ এড়াতে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা দুর্গম পাহাড়ের চূড়ার ওপর তৈরি করেছিলেন বেশ কয়েকটা গড় বা 'ধানকার'। শত্রুর অনুপ্রবেশ জানতে পারলেই একদল উঁচু পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালাত। সংকেত বুঝেই কাছাকাছি সব গ্রামবাসীরা ছুটে চলে আসত গড়ের মধ্যে। সঙ্গে নিয়ে আসত সবচেয়ে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পত্তি, শিশু এবং নারীদেরও। শত্রুরা কাউকে না পেয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে যেত গ্রামগুলো। বাদ দিত না গুম্ভার অমূল্য সম্পদ এবং অপূর্ব শিল্পগুলোও। কখনও আবার শত্রুদের সঙ্গে কপট বন্ধুত্ব পাতিয়ে সুরায় মত্ত করে মেরে ফেলত। এখনও প্রাচীন এক গড় দাঁড়িয়ে আছে 'লিংটি' গ্রামের কাছে-সবাই চেনে ধানকার গুম্ভা নামে। এইখানেই ছিল স্পিতির পুরনো রাজধানী। দুর্গের ভেতরকার এক কুখ্যাত বন্দীশালায় বা অন্ধকূপ প্রাচীন স্পিতির ভয়ঙ্কর ইতিহাস শোনাতে পারে পর্যটকদের।

স্পিতির সদর শহর কাজাতে পৌঁছলাম সেইদিন বিকেলের দিকে। ছোট হোটেলে জায়গা পেতে অসুবিধে হল না। প্রায় দশ বছর আগে দেখা কাজা বদলেছে অনেকটাই। উন্নয়নের প্রকটতম চিহ্ন হিসেবে মাটি পাথরের ঘরগুলোর মাথায় বসেছে ডিশ অ্যান্টেনা। ঘরবাড়ি দোকানপাটের সঙ্গে রাস্তা জুড়ে ময়লাও জমেছে দ্বিগুণ। নদীর ওপারের গ্রামটার এখন নাম হয়েছে নিউ কাজা, বেশ কয়েকটা পাকা অফিস বাড়ি। ভাঙাচোরা রাস্তায় কয়েকটা মারুতি গাড়ি। দশ বছর আগে সন্ধের পর আর মানুষ দেখা যেত না। এখন ঝলমলে জেনারেটারের আলো। মানুষ বাড়ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে সেই শান্ত গম্ভীর হিমালয়ের গ্রামগুলো।

সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে হোটেলের বারান্দায় একজন স্থানীয় লামা এসে আলাপ জমালেন। উনি তিব্বতী ওষুধের ফেরিওয়ালা। আমরা অবশ্য ওঁর ঝোলা থেকে পেয়ে গেলাম এই 'আজবনগরের' মানুষ-সমাজ-সংস্কার নিয়ে বেশ কিছু লোভনীয় তথ্য মাত্র দুকাপ চায়ের বদলে।

আনুমানিক খ্রিস্টজন্মের তিনশো বছর আগে পশ্চিম হিমালয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রধানতম পীঠস্থান হয়ে ওঠে এই স্পিতি। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতায় সহনশীলতার, সংযমের শিক্ষা দেয় এই ধর্ম। তাই আজও এখানে রয়েছে প্রকৃতি-সমাজধর্মের এক অপূর্ব ভারসাম্য। যেমন এখানকার বহুপতি প্রথা, একদিকে যেমন জনসংখ্যা সীমিত রাখে অন্যদিকে দুর্মূল্য চাষজমিগুলো ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হতে দেয় না। অবশ্য আধুনিক স্পিতির যুবতীরা এখন আর দ্রৌপদীর জীবন মেনে নিতে চাইছে না। আবার এখানকার লামা ধর্মের নির্দেশে পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রকে সাত বছর বয়সে গুম্ভায় পাঠিয়ে দিতে হয়। সংসার, বিবাহ, প্রজনন ও ভোগবিলাস থেকে দূরে। অবাক লাগলেও এখনও স্পিতির প্রত্যেক পরিবারই মেনে নেয় 'ঝোভা'র নির্দেশ। একজন বিদগ্ধ গণৎকার হিসাবে এই ঝোভা বিচার করে দেন একটি মৃতদেহ পোড়ানো হবে, কবর দেওয়া হবে নাকি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে অথবা টুকরো টুকরো করে ফেলে রাখা হবে উঁচু পাহাড়ের ওপর পাখিদের খাদ্য হিসেবে।

কাজায় পুরো একটা দিন চলে গেল অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে। আমাদের এবারের লক্ষ্য শৃঙ্গ অভিযান। বালি ভাগীরথী ক্লাবের উদ্যোগে। এই স্পিতির লিংটি উপত্যকার শেষপ্রান্তে চাউ-চাউ-কাংনিলডা-বাংলায় যার অর্থ 'আকাশের গায় এক টুকরো নীল চাঁদ'। পর্বত অভিযান মানেই উপযুক্ত রসদ আর গাইড পোর্টারের সুবন্দোবস্ত। ডেপুটি কমিশনার থেকে খাদ্য ও রেশন বিভাগ ছোটাছুটি করে চাল-ডাল-আটা-কেরোসিন এক বেলাতেই জোগাড় হল স্থানীয় আধিকারিকদের বদান্যতায়। এমনকী কাজার পুলিশ আধিকারিক স্বেচ্ছায় নানান উপদেশ সহ সাহায্যের হাত বাড়ালেন। কিন্তু আবার সেই ট্রাক্টর ভরসা। কাজা থেকে লাংচা গ্রামে পৌঁছবার ১৮ কিলোমিটার পাথুরে চড়াই এখনও হালকা গাড়ির উপযুক্ত নয়। তাই ট্রাক্টরই এখানে একমাত্র ভরসা। গড়্গাড় করে পাহাড় চড়ে আর হুড়মুড় করে নদী পেরিয়ে যায়। তবে কান ফাটানো আওয়াজ আর হাড়ভাঙা ঝাঁকুনি। মালপত্তর কম হলে হাঁটাই ভালো।

পরদিন সন্ধ্যার মুখে লাংচা (১৪,৫০০ ফুট) গ্রামে পৌঁছে বুকের মধ্যে টের পেলাম হিমালয়ের খাঁটি অন্তরঙ্গতা। ছোট্ট স্কুলবাড়ির আস্তানায় সেদিন সন্ধ্যা আকাশের দিকে তাকিয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর গা এলিয়ে দিলাম। সামনে রাতের আকাশ, পূর্ণিমা গেছে গতকাল। একটা স্বর্গীয় পাখির মতো দুটো ডানা মেলে উত্তরের দিগন্ত ছুঁয়ে বসে রয়েছে আমাদের অভীষ্ট কাংনিলডা শৃঙ্গ।

খাপছাড়া মেঘ আর শীতের জড়তা নিয়ে ভোর হল লাংচা গ্রামে। নিচের দিকে গ্রামের বাড়িগুলোর ছাদ দিয়ে সাদা ধোঁয়া উঠছে। আমাদের পোর্টার চেতন আংরূপ তার 'খতা' (পাহাড়ি ছোট গাধা) নিয়ে আসবে বেলা নটায়। আমাদের লিডার সাহেব একটা হাঁক

ছেড়ে বড় বিস্কুটের টিনটার ওপর বসলেন । প্রথমে ফর্দ অনুসারে সমস্ত খাবার ও যন্ত্রপাতি মিলিয়ে নিতে হবে । তারপর বস্তা বাঁধাবাঁধি । এদিকে এ গ্রামের অভিজ্ঞ গাইড মশাই তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছেন ১৫ কিলোমিটার দূরের রংরিক গ্রামে ।

এরই মধ্যে আমাদের একজন হঠাৎ কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল একটু দূরে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়ানো একদল বাচ্চার দিকে । ওদের সকলের হাতেই নানা আকারের কালো কালো পাথরের ঢেলা মতো কিছু । অল্প সময়ের মধ্যেই ওই বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বিনিময় প্রথায় হাতবদল হয়ে গেল কলকাতার লজেন্স আর স্পিতি হিমালয়ের 'জুরাসিক জীবাশ্ম'-স্পিলবার্গের সিনেমার থেকেও রোমাঞ্চকর । হাতের প্রত্যেকটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ নিচ্ছিলাম প্রায় ১৯ কোটি বছরের পুরনো ওইসব শামুক গেঁড়ি ঝিনুক । আজ যেখানে স্পিতি উপত্যকা সেখানটায় টেথিস সাগরের মজে যাওয়া শেষ জলভাগ একটা বিরাট সরার মতো অঞ্চলে এখনও জমে রয়েছে । বৃষ্টি আর বরফের জলে সেই অগভীর হ্রদের জল আর নোনতা নয় । হ্রদের জল লালচে মাটির পাড়ে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে । ঢেউয়ের তালে তালে মাটি কাদার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ল্যামেলিব্রাঞ্চ (ঝিনুক), অ্যামোনাইট (গেঁড়ি, গুগলি) এবং আরও অনেক প্রাচীন মাছ ও কীট । অবশ্য এই জুরাসিক হ্রদে নেই মহানায়ক ডাইনোসরেরা । ক্রমশ মাথা চাগাড় দেওয়া হিমালয়ের এই উচ্চতা ওইসব দৈত্যদের জন্য যথেষ্ট বাসযোগ্য ছিল না । ফিরে এসে কলকাতার ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে জেনেছিলাম দুষ্প্রাপ্য এইসব জীবাশ্ম মূলত তিব্বতের মানস সরোবরের আশপাশেই পাওয়া যায় । আর এই অ্যামোনাইট জীবাশ্মই প্রাচীনকাল থেকে স্থান করে নিয়েছে আমাদের ঠাকুর ঘরে পবিত্র নারায়ণ শিলা হিসাবে । অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল যে এই জীবাশ্মগুলো সত্যযুগের নারায়ণ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় বেশ কয়েক কোটি বছরের প্রৌঢ় গুরুজন ।

এরমধ্যে ঢং ঢং করে গলার ঘণ্টা বাজিয়ে পৌঁছে গেল চারটি গো-বেচারি প্রাণী । উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট, হালকা বাদামি আর ছাই রঙা চেহারা । মাথাটা তুলনায় বড় এবং কান দুটো আরও । স্থানীয় নাম 'খতা' ।

প্রথমে ঘণ্টাখানেক বেশ ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড় । অবশ্য গাছগাছালি একদম অনুপস্থিত । ছোট ছোট হলুদ কমলা ঘাসফুল আর নীল আকাশ দেখতে দেখতে মনেই ছিল না পিঠের বোঝাটা । পিছন দিকে তখন সকালের একপেশে সোনালি রোদে লাংচা গ্রামটা ঝকঝকে একটা ত্রিমাত্রিক রঙিন ছবি । তবে রাস্তা বেশ মজার । সবটাই যেন সবুজ, বাদামি আর ধূসর প্রলেপ দেওয়া ঢেউ খেলানো মালভূমি । সামনে উত্তর থেকে পুবে কানামো, কাংনিলডা হয়ে শিলা গিরিপথ । সবই শুকনো, জলের দেখা নেই । পিঠের

স্যাকটা নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় দেখা হল একটা বছর দশেকের ছেলে খতার পিঠে ইয়াকের শুকনো গোময় সংগ্রহ করে ফিরছে। আগামী শীতের জ্বালানি। সারামুখে পরিশ্রমের কাঠিন্য-এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই।

দিনের চলা শেষ। ঘড়িতে প্রায় সাতটা। ঢালু, চওড়া মাঠ। দুপাশে দুটো জলের ধারা, অভিযানের মূল শিবিরের একমাত্র আদর্শ জায়গা। দুজন গাইড ও পোর্টার নিয়ে সাতজনের দলটার জন্যে দুটো তাঁবু আর একটা রান্নার জায়গা পাতা হল। সওয়া সাতটায় শিবির তৈরি। সূর্য তখনও ওভারটাইম খাটছে। তবে ওর ছুটি হতেই আমাদেরও জবুথবু অবস্থা। ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বার করে দেখি রাত আটটার সময়ই তাপমান হিমাঙ্কের নিচে। দুপুরবেলায় পারা উঠেছিল প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। খাঁটি আলপাইন মরু প্রদেশের আবহাওয়া। ম্যাপ খুলে দেখলাম জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৫০০ ফুটের মতো এবং আজ আমরা মোট ২১ কিলোমিটার হেঁটেছি। ঘুমের মধ্যে দূরে অ্যাভালাঞ্চের গুড়গুড় শব্দ শুনে স্বপ্ন দেখলাম জুরাসিক পার্কে আছি।

মূল শিবিরে প্রথম সকাল। রোদ এসে আলতো ছোঁয়া দিল টেন্টের গায়ে-তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সুন্দরী কাংনিলডার এক পাশের গালে সোনালি আভা। চোখ ফেরানো যায় না। মনটাও শিখর সমীপে। কাব্য ছেড়ে মন দেওয়া হল দিন অনুযায়ী প্যাকিংয়ে। নিখুঁত চুলচেরা রসদের হিসাব।

পরিকল্পনামাফিক একদিনের বাড়তি খাবার মজুত রাখা হল আলাদা, আগামী তিনদিনের মাথায় শিখর অভিযাত্রীরা ক্লাইম্ব শেষ করে মূল শিবিরে ফিরবে। এক নম্বর শিবির হবে ঠিক ক্লাইম্বিং ফেসের পায়ের কাছে। এখান থেকে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

পরদিন সকাল নটায় আমরা তিনজন আর দুজন হ্যাপ (high altitude porter) রওনা দিলাম পরবর্তী শিবির স্থাপন করে আসবার জন্য। এইরকম মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করলে পরিবেশের সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নিতে খুব সুবিধে হয়। শহুরে শরীরগুলো হিমালয়ের উচ্চতার সঙ্গে পরিচিত হয়। আমরা কাংনিলডা চড়বার প্রচলিত পথ ছেড়ে বেছেছিলাম দক্ষিণমুখো সাদা বরফের ঢালটা। এপথে কাংনিলডার কাঁধে উঠতে কম সময় এবং বেশি পরিশ্রম লাগে। ওখান থেকে শিখর আর মাত্র হাজার দেড়েক ফুট।

আমাদের প্রথম দল তৈরি হল দুজন সদস্য আর দুজন হ্যাপকে নিয়ে। এই দল সফল না হলে দ্বিতীয় দল তৈরি থাকবে পরদিনের জন্য। শেষ শিবির (Summit Camp) রাখা হয়েছে বিশাল একটা হিমবাহের তৈরি বেসিনের এক প্রান্তে, প্রান্ত গ্রাবরেখার (end morain) ওপর। এখান থেকে ঘাড় উঁচু করেও শিখর দেখা যায় না। ভূগোলের ভাষায়

এই জায়গাটার এক দারুণ নাম আছে-glacial amphitheatre, এখানে উচ্চতা ১৮,০০০ ফুট। অতএব চড়তে হবে আরও প্রায় ২,৭০০ ফুট এবং সেইদিনই নেমে আসতে হবে অতটাই। শিবির গুছিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম সামনের চড়াইটা বুঝে নিতে। এবং নেমে আসার সময় অন্য কোনও পথ পাওয়া সম্ভব কিনা। প্রায় ঘুম ছাড়াই রাতটা কাটল। ভোরবেলা স্টোভ জ্বেলে বরফ গলিয়ে একটু স্যুপ আর গতরাতের পাথর হয়ে যাওয়া সুজিকে গরম করতে বেশ হিমসিম অবস্থা। গত রাতের মাইনাস টেনের ঠেলায় ফাইবারের জুতোগুলোও যেন কাঠ। তার তলায় ক্র্যাম্পন (crampon) বাঁধতে ঘাম ঝরল। সকলের পকেটেই কিছু শুকনো খাবার। পিঠে হালকা ন্যাপস্যাকে একটা দেশের ও একটা ক্লাবের পতাকা দলনেতার শুভেচ্ছাসহ। চোখে বরফ চশমা আর হাতে আইস অ্যাক্স। বরফ ঢাল শুরু হতেই চারজন ১২০ ফুট দড়ির মধ্যে একসূত্রে বাঁধা পড়লাম।

পুবের প্রাচীর টপকে সূর্য উঁকি মারতেই চোখ ঝলসে গেল। বহুযুগের শক্ত বরফ নীলচে হীরের চাদরের মতো ঠিকরে উঠল। জুতোর তলায় কাঁটাগুলো ধাতব টংকার তুলে ছিটকে উঠছে। বরফ গাঁইতির ফলাও হার মানছে পদে পদে। ক্রমশ আলো বাড়ছে আর বাড়ছে চড়াই। লাগাতার ৩০ ডিগ্রি থেকে ৫০ ডিগ্রি ঢাল। পা দুটোকে আরাম দিতে হলে ছোট একটা গর্ত কেটে দাঁড়াতে হচ্ছে। পিছন দিকে হাজার পাঁচেক ফুট নিচে দূরে আমাদের মূল শিবিরের নীল কমলা টেন্ট চোখে পড়ছে। ওরা হয়তো পালা করে দূরবিনে চোখ রেখে উৎকণ্ঠায়। এ খেলায় কোনও দর্শক গ্যালারি সমর্থকের জায়গা নেই। নিজেদের মধ্যে দুয়েক টুকরো কথা। গলায় পাথর হয়ে বসা ক্যামেরা দিয়ে ভালোলাগার অবিস্মরণীয় দৃশ্যগুলো তুলে রাখছি মাঝে মাঝে।

প্রায় পাঁচঘণ্টা লাগাতার দেওয়াল চড়ার লড়াই শেষ হল। কাংনিলডার কাঁধে তখন দুপুরের মেঘেরা পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই এল শনশনে হাওয়া। যেন চেকপোস্টে আবার অনুমতিপত্র দেখাতে হবে। আমরা চার অবাধ্য প্রাণী তখন বিশ হাজার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে দেহ-মন-রসদের সঙ্গে সময়ের এক কঠিন ঐকিক নিয়মের অঙ্ক কষতে বাধ্য হলাম। এই খেলায় হারাজেতার তফাৎটা বড় সূক্ষ্ম কিন্তু চরম। কাংনিলডার হাওয়া ধমক দিয়ে জানাল আলো কমে গেলে এ রাস্তায় নামাটা আত্মঘাতী হবে।

সাফল্যের শিখর কাছেই ছিল। কঠিন বাধাগুলোও ছিল অতিক্রান্ত। অতএব কাব্য করলে দাঁড়ায় ‘কাছে থেকে দূর রচিলে-’। আর মোদ্দা কথা আপনি বাঁচলে আবার হবে। প্রায় সারা বছরের আয়োজন। কঠোর বাস্তব বেদনা নিয়ে আবার আমরা ফেরার পথ

ধরলাম । তবে হিমালয় সত্যিই কখনও একদম খালি হাতে ফেরায় না । আমার কাছে হিমালয়ের প্রতিটি মুহূর্তই দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা আর অনন্য এক বোধ ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

কালিম্পং থেকে তিব্বত

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

নভেম্বর মাসের শেষ দিক, কালিম্পং-এ ক্যাম্প করছি । পাঁচদিন ঠাসা কাজে কেটেছে, এবার বাড়ি ফেরা । বারান্দায় হেলানো চেয়ারে বসে বিকেলের পড়ন্ত রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘাদের দিকে তাকিয়ে আছি । এখনও ঝকঝকে রুপোর তৈরি, অল্পক্ষণের মধ্যে হবে আগুনে লাল, তারপরে তামার, তারপর সীসের । উত্তর-পূর্ব আকাশ জুড়ে এই আশ্চর্য উপস্থিতি পৃথিবীর আর কোথাও নেই, এমনকী হিমালয়েরও অন্যত্র কোথাও নয় । কোথাও দেখা যায় চব্বিশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু পাশাপাশি এমন সব অলৌকিক হিমগিরি? আয়াসহীন আলস্যে হাতের কাছে চায়ের কাপ নিয়ে বসে বসে দেখছি বাল্যকাল থেকে আলাদা করে চেনা বিশিষ্ট অনেকগুলো রূপ: কাং, জানু, কাবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পানডিম, সিমভু, সিনিয়লচু, চোমিও মো, কাংচেনজাউ, পাউহুনরি । এই বিস্তৃত, আয়ত তুষারজগতের সমগ্র চেহারা আমাদের এমন অভিভূত করে যে স্বতন্ত্র শৃঙ্গগুলোর অস্তিত্ব ও অবস্থানের প্রশ্ন মনে আসে না । সব মিলিয়ে, সবটাই বাঙালির কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা । সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম থেকে, পিকচার পোস্টকার্ড থেকে, হাজার হাজার দর্শকের তোলা ফটোগ্রাফের একটাই শিরোনামা । আমরা এদের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে দেখতে অভ্যস্ত । আরও অনেক দূর থেকে দেখা যায় । নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আকাশ পরিষ্কার থাকলে জলপাইগুড়ি থেকেও । সে এক আশ্চর্য দৃশ্য আকাশে ভাসছে । সামনের জমিতে কলাগাছ পানাপুকুর কুঁড়েঘর আর পশ্চাৎপটে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্গলোক, একটু আবছা কিন্তু অস্পষ্ট নয় ।

যে সব গিরিশৃঙ্গের নাম করেছি তাদের প্রত্যেকটির শিখরে মানুষ চড়েছে । যে সময়ের কথা বলছি, ১৯৫২ সাল, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা অনেক প্রাণ হরণ করেছে কিন্তু বিজিতা হয়নি । এভারেস্ট বিজয় হয়েছে ১৯৫৩ সালে । তারও অনেক পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ।

এই অতুলনীয় তুষারজগতের আরও কাছে যাওয়া যায় । বরফগলা অসংখ্য স্রোতের ধারা নেমে আসছে, একে অপরের সঙ্গে মিলে নদীর রূপ নিচ্ছে, আরও বড় নদী হয়ে শেষে গিয়ে পড়ছে তিস্তায়, তারপর ব্রহ্মপুত্রে (যার স্থানীয় নাম যমুনা) তারপর পদ্মা মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে । এই সব পাহাড়ি নদীর সূত্র ধরে উত্তরমুখে গেলে পৌঁছনো

যায় একেক স্বতন্ত্র গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে। আরও উত্তরে গেলে পৌঁছনো যায় তিব্বতের মালভূমিতে, যেমন শরৎ দাস গিয়েছিলেন। তাঁরও আগে যেসব সাহেব উত্তর সিকিম অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডগলাস ফ্রেশফিল্ড। এই শতকের প্রথম দশকে তাঁর Round Kangchenjunga বইখানা প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই এভারেস্ট চড়বার পরিকল্পনা। আগ্রহী ও একমাত্র দাবিদার ইংরেজরা। এভারেস্টের অবস্থান নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তে, কিন্তু সেই সময় নেপালে বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং দক্ষিণদিক থেকে এভারেস্ট পৌঁছনো যাবে না। উত্তরদিকটা তিব্বতের অধিকারে, সেইপথ ইংরেজদের কাছে খোলা, কারণ ইয়ংহাজব্যান্ড অভিযানের পর তিব্বত পথ খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। সিকিম ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে এভারেস্টের উত্তর-পাদদেশে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সব পথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। ডগলাস ফ্রেশফিল্ডের অভিযান এইসবের অন্যতম। এই জন্য তাঁর নাম করছি যে উত্তর সিকিম, যে অঞ্চলে প্রধানতম সব গিরিশৃঙ্গ অবস্থিত-দার্জিলিংয়ের দূরত্ব থেকে যেসব দেখে আমরা মুগ্ধ হই- তার জিওগ্রাফি, প্রধান প্রধান হিমবাহের অবস্থিতি ও প্রকৃতি, সব কিছুর প্রাথমিক ও চমকপ্রদ বর্ণনা এই বইটিতে রয়েছে। সঙ্গে ম্যাপ ও তখনকার আমলে তোলা ফটোগ্রাফ। এই বই দার্জিলিংয়ের জিমখানা ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়ে পড়েছিলাম, পরে আর কোথাও এই বই দেখিনি। ইতিমধ্যে হিমালয়-সাহিত্য পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে, Round Kangchenjunga তার নিচে অদৃশ্য।

একলা, কোনও বন্দোবস্ত নেই, কোন পথে যাব। পশমের রাস্তা ধরব নাকি। মধ্য এশিয়ায় যে রকম একটা রেশমের রাস্তা ছিল, বাগদাদ থেকে বোখারা সমরখন্দ উরুমচি তাকলা মাকান গোবি হয়ে চিন পর্যন্ত যে রাস্তায় একসময় উটের ক্যারাভান চলাচল করেছে, যে রাস্তা মার্কোপোলো সাহেব ডাকাতদের চিনিয়ে দিয়েছিলেন, সেইরকম একটা পশমের রাস্তা আছে কালিম্পং থেকে গ্যানটসে লাসা পর্যন্ত, যে রাস্তা জেলেপ-লা গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছে। এই রাস্তা হচ্ছে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের একমাত্র না হলেও প্রধান বাহক। বর্তমানে তিব্বত-ভারত বাণিজ্য অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু ১৯৫২ সালে এই রাস্তা দিয়ে প্রভূত পরিমাণে তিব্বতি ভেড়ার পশম ও কিছু পরিমাণে চমরি গাইয়ের লোম আমদানি হত, অধিকাংশ আসত কালিম্পংয়ের বাজারে, সামান্য কিছু যেত গ্যাংটকে। কালিম্পং শহরের পূর্ব উপান্তে, দশমাইল মাইলপোস্টের আশপাশে (তিস্তা ব্রিজ থেকে দশমাইল) তখন ছিল অনেকগুলি পশমের গুদাম। খচ্চরের পিঠে আসত, এই রাস্তায় দিনমানে যে কোনও সময় দেখা যেত সার সার খচ্চর আসছে, তাদের পিঠে দুপাশে সমান আকারের বোঝা। ফেরবার সময় এই খচ্চররা নিয়ে যেত চাল ডাল কেরোসিন কাপড় কম্বল থেকে আরম্ভ করে যন্ত্রপাতি রেডিও গ্রামোফোন আয়না চিরুনি

পর্যন্ত সব কিছু । দলাই লামার প্রয়োজনে যে দু-তিনটি মোটরগাড়ি পাঠানো হয় তাও অনেকগুলি বিভিন্ন অংশে প্যাক করে খচ্চরের পিঠে এই পথে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে গিয়েছে মিস্ত্রী, লাসায় পৌঁছে সব অংশগুলি যথাযথ জোর লাগিয়ে সম্পূর্ণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । এইভাবে গিয়েছে অনেক জেনারেটর, টিউবওয়েল, লেদমেশিন ও বিবিধ আরও যন্ত্রপাতি । চিনারা তিব্বত অধিকার করার পরেও কিছুদিন এই ব্যবসায়িক লেনদেন অব্যাহত ছিল ।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন তিব্বত-ভারতের এই বাণিজ্য খুবই ফলাও হয়ে উঠেছে । স্বভাবতই, ভারতের তরফে এই ব্যবসার মালিকানা কয়েকঘর মাড়োয়ারির হাতে, যেমন কোডামল জেঠমল, শ্রীরাম নন্দরামরা ও আরও অনেক মেজো-ছোটরা । তিব্বতের সঙ্গে টাকাকড়ি লেনদেন, তথা ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে সর্বপ্রধান ছিল দার্জিলিংয়ের জেঠমল ভোজরাজরা, তারা কালিম্পংয়ের পরিবর্তে গ্যাংটকে স্থিত একটি মস্ত গদি থেকে তাদের এই ব্যবসা পরিচালনা করত । পশমের ব্যাপারে এইসব মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা প্রত্যক্ষভাবে খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে মাল কিনে নগদে চুকিয়ে দিত । যুদ্ধের পর এই ব্যবসার খুব বাড়বৃদ্ধি হয়, কারণ তিব্বতি পশমের একটা মস্ত বড় বাজার ছিল আমেরিকায়, কার্পেট তৈরির জন্য এই সস্তা রুক্ষ পশম সেখানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত । কালিম্পংয়ের দশ মাইলে তিব্বতি খচ্চর ও খচ্চরওয়ালাদের একটি বড় রকম বস্তি । পশম ঝাড়াই গাঁঠবাঁধাই হচ্ছে, ভারতীয় পণ্যসামগ্রী প্যাকিংবাক্সে, বস্তায় ভরা হচ্ছে, ট্রাকের মাল উঠে যাচ্ছে খচ্চরের পিঠে । একদল খচ্চর এসে মাল খালাস করছে, আরেক দল বোঝা পিঠে নিয়ে গুটি গুটি রওনা দিয়েছে তিব্বতের দিকে । তিব্বতি খচ্চরওয়ালা, নেপালি কুলি ও মাড়োয়ারি গোমস্তাদের যেন একটা রাসায়নিক মিশ্রণ বনে গেছে । একমাত্র চালু ভাষা হচ্ছে তিব্বতি, যে ভাষা আমার মনে হয়েছে দশমাইলের মাড়োয়ারিরা তিব্বতিদের চেয়েও ভালো বলে । মানুষে পশুতে মিলিয়ে এই দশমাইল যেন একটা ছোটখাটো খচ্চরের গড়মুক্তেশ্বর ।

১৯৫২ সালে, আমি যখন এদের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্সের কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তখন এই সমৃদ্ধ ব্যবসায়ে মাড়োয়ারিদের একনায়কত্ব একটু টলেছে । কয়েকটি বড় বড় তিব্বতি ফার্ম কালিম্পংয়ে এসে বাসা বেঁধেছে । তাদের মধ্যে মুখ্যতম ছিল দুটি পরিবার, পাংডাংসাং আর সাদু-ৎ সাং । এদের মধ্যে তিব্বতি নীলরক্ত প্রবাহিত । জোত জমি ব্যবসা (দাসব্যবসা সমেত) যাদের করায়ত্ত ছিল এরা তাদের অন্যতম । আরেকটি ফার্ম ছিল বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রেটিং লাদরেং, তিব্বতে যাদের গুম্ভাতে সহস্রাধিক লামা প্রতিপালিত হয় । এছাড়া তখন সবে গজিয়েছে দুটি লিমিটেড কোম্পানি, ইন্ডো-টিবেট লিমিটেড ও উল-এজেন্টস লিমিটেড । এই কোম্পানি দুটি ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত, কিন্তু

এদের অসংখ্য শেয়ারহোল্ডারদের হরেকরকম তিব্বতি নাম, এবং ঠিকানা তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় । কারা এইসব তিব্বতি? গভীর সন্দেহের চোখে তিব্বতি মাড়োয়ারি সকলের দিকে তাকাচ্ছি, তাদের তিব্বতি ভাষায় লেখা হিসাবপত্র ইংরিজিতে অনুবাদ করাচ্ছি । কোনও হদিশই পাচ্ছি না কেন সহসা এতগুলি তিব্বতি কালিম্পংয়ে এসে অধ্যবসায় সহকারে পশমের ব্যবসায় নামল ।

একটা প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্যই আছে । ১৯৪৮ সালে চিনে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হবার পর পরই তিব্বতের প্রতি চিনের আকর্ষণ শুরু হয় । প্রথম দিকটায় ভলান্টিয়ার রূপে দলে দলে খাকি পরিহিত চিনারা তিব্বতে এসে পৌঁছয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । মুখ বুজে খেতখামার, পশুপালন, সেচ ব্যবস্থা, রাস্তা সেতু তৈরি মেরামতের কাজে নিজেদের বিনিয়োগ করে । এই অনুপ্রবেশের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি আমরা এতদিনে সবই জানি । উচ্চবিত্ত তিব্বতিরা, তাদের মধ্যে অনেকে নানাবিধ মঠের অধ্যক্ষ, এক পা এক পা করে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছয় । সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কালিম্পং, তিব্বত সীমান্ত থেকে খচ্চরের পিঠে দুদিনে পৌঁছে যাওয়া যায় । এই সময় একাধিক রাজ্যচ্যুত রাজা (যেমন প্রিন্স পিটার অব গ্রিস), ঘরছাড়া মধ্য-ইউরোপীয় প্রৌঢ়রা, মালয় সিঙ্গাপুর থেকে উৎপাটিত শ্বেত-চিন ব্যবসায়ীরা কিছু সংখ্যায় কালিম্পংয়ে এসে পৌঁছেছেন, ছবির চেয়েও সুন্দর শহরে ছবির মতো বাড়ি তৈরি করে বসবাস আরম্ভ করেছেন । তাঁদের টাকা কোথা থেকে আসছে তা তাঁরা ও ব্যাঙ্ক অব চায়না ছাড়া আর কেউ জানে না । ইনকাম ট্যাক্স অল্পস্বল্প কৌতূহল অনুভব করছে, এই মাত্র ।

কর্মসূত্রে এইসব বিদেশিদের কিছু কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যিনি তাঁর নাম রাজা এস টি দোরজি, ভুটানের প্রধানতম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, কালিম্পংয়ে প্রচুর বিষয় আশয়, ব্যবসা দোকানদারির ধার ধারেন না । ইনি দার্জিলিংয়ে আমার মাতামহের জীবৎকালে তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, বাল্যকালে অনেক দেখেছি, সবসময় ভুটানি পরিচ্ছদ, রুচিতে সংলাপে পাকা ইংরেজ । এঁর দুই কন্যার মধ্যে ছোটটির বিবাহ হয়েছিল ভুটানের রাজার সঙ্গে । বর্তমান মহারাজা এই ছোটটিরই সন্তান । রাজা দোরজির বড় মেয়ে তাসি অবিবাহিতা রয়ে গেছেন । কেন, তা বোঝা মুশকিল । তখন তাঁর কত বয়স তা জানি না কিন্তু চেহারায় একটি সদ্যফোটা চাঁপাফুল, চোখে মুখে সুশিক্ষা ও সহবতের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে । রাজা দোরজির বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো এক সৌভাগ্যের বিষয় । ছোটখাটো পালিশ করা কাঠের বাড়ি, চতুর্দিকে পরিচ্ছন্ন বাগান, অনেকরকম অর্কিড, ফিউশিয়া, হাইড্র্যানজিয়া, অ্যাজেলিয়া । ভেতরের সজ্জা সাবেকি তিব্বতি । উচ্চস্তরের ভুটানিরা তিব্বতি বংশোদ্ভব । বসবার ঘরে কয়েকটি আশ্চর্য তনখা ঝুলছে, মেঝেতে কয়েকটি ছোট সাইজের কার্পেট, যেমন তিব্বত ভুটানে হয়

। এক কোণে তথাগতের জন্য একটু জায়গা, তাঁর সোনালি মূর্তির সামনে মাখনের প্রদীপ জ্বলছে, পিছনের তনখায় তাঁরই ছবি, সামনে উপাসনার জন্য আসন পাতা। ঘরে পুরু উঁচু গদিতে বসবার ব্যবস্থা, সামনে ল্যাকারের কাজকরা নিচু টেবিল, তার ওপর ক্রিম-দ্য-মেনথ পরিবেশিত হয়ে রয়েছে।

এই স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছেন আরেক বৃদ্ধ, তাঁর নাম হেন ফং। মান্দারিন চিনা, জাপানি উৎপাতের সময় থেকে ইনি দেশছাড়া। সিল্কের ব্যবসা ছিল। সাংহাই, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর পর পর এই তিন জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে কালিম্পংয়ে এসে পৌঁছেছেন। বাড়ি করেছেন, তার পরেও ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, যার ফলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ। হেন ফং অশীতিপর বৃদ্ধ, প্রায় অন্ধ। একটি কিশোরী পৌত্রীর হাত ধরে আমার ক্যাম্প অফিসে আসা-যাওয়া করেন। কাঁপা কাঁপা গলায় সুন্দর ইংরিজিতে তাঁর কাহিনী সব আমায় বলেন। ওই পৌত্রীটি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই।

কে জানে এখন এরা সব কে কোথায়। চিন কর্তৃক তিব্বত গ্রাস হয়ে যাবার পর আমেরিকা তিব্বতি পশম কেনা বন্ধ করে দেয়, কমিউনিস্ট দেশে উৎপন্ন সামগ্রী বলে। তাছাড়া তিব্বতিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ ভোগ্যপণ্য, যা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ জোগান দিয়েছে, চিন থেকে সরাসরি তিব্বতে পৌঁছতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যে কালিম্পং-লাসা পশমের লাইনে ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ। নাথুলা জেলেপলা গিরিবর্ত্মে ১৯৬২ সালের পর সৈন্যশিবির ছড়ানো, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

আমার স্টেনোগ্রাফার ব্রজেনকে বললাম গ্যাংটক হয়ে নাথুলা যাচ্ছি, ফিরতে কদিন দেরি হবে, বাড়িতে একটু খবর দিয়ে দিও। ব্রজেন বলল, 'আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?' শুনে আমার খুবই ভালো লাগল। সক্ষম, চঞ্চল যুবক। আমাকে একলা ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

পরদিন সকালে মোটরযোগে কালিম্পং থেকে গ্যাংটক। কালিম্পং থেকে গাড়ি দ্রুত নেমে যায় তিস্তার প্রবাহিকায়, যেখানে রঙ্গিত নদী তিস্তায় এসে পড়েছে। এখানে তিস্তা ব্রিজ, তিনটি প্রধান রাস্তার জংশন। ব্রিজ পেরিয়ে একটি চলে গেছে, তিস্তাকে বাঁদিকে রেখে, শিলিগুড়ির দিকে, দ্বিতীয় রাস্তাও ব্রিজ পেরিয়ে পাকদণ্ডী নিয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে, পেশক ও লোপচু চা-বাগানের মধ্য দিয়ে দার্জিলিংয়ের দিকে, আর তৃতীয় রাস্তা তিস্তা না পেরিয়ে তার আশপাশে চলে গেছে সিংতাম পর্যন্ত। সেখানে অপর একটি সেতু পেরিয়ে রোংগনি নদীর পথ ধরে বেশ চড়াই রাস্তায় গ্যাংটক পৌঁছতে হয়। কালিম্পং থেকে গ্যাংটক মোটরে যেতে ঘণ্টাচারেক লাগে, যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা হবে। কিছু খাদ্যদ্রব্য ও সফরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কেনবার ছিল, রুকস্যাক, ভারি মোজা,

কানঢাকা টুপি, উইন্ডচিটার ইত্যাদি । তখনও আমেরিকান সৈন্যদের পরিত্যক্ত ডিসপোজালের মাল গ্যাংটকের বাজারে প্রচুর পড়েছিল, পাহাড়ে সফরের পক্ষে উপযুক্ত সুন্দর সব জিনিস পেয়ে গেলাম । মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে এবং গুটিদুই পোর্টার সংগ্রহ করে পরদিন সকালে নাথুলার পথে রওনা হয়ে গেলাম । গ্যাংটক থেকে কারপোনাং পর্যন্ত আট-দশ মাইল চমৎকার প্রায় সমতল রাস্তা, পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে চলে গেছে । নভেম্বর মাসের ঈষৎ কনকনে শীত, পরিষ্কার আকাশ থেকে উজ্জ্বল উষ্ণ রৌদ্র পাচ্ছি । কারপোনাং বাংলোতে যখন পৌঁছলাম তখনও মধ্যাহ্ন হয়নি । অল্প বিশ্রামের পর দ্বিতীয় ধাপের পর্যটন শুরু হল । এবার আর ততটা স্বচ্ছন্দ ও সরল নয়, বেশ চড়াই ও বন্ধুর । পরবর্তী গন্তব্যস্থল হচ্ছে ছাঙ্গু, দশমাইল দূরে, কারপোনাং থেকে আরও ৪,০০০ ফুট উঁচুতে । এ রাস্তায় কাঞ্চনজঙ্ঘা বা অন্যান্য তুষারশৃঙ্গ বাঁদিকের পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হয়েছে, ডানদিকে খাদ, যতদূর চোখ যায় নেমে গিয়েছে, তার ওপারে বিবর্ণ ধোঁয়াটে পাহাড়ের ঢেউ । দশ হাজার ফুট উচ্চতার ওপর দিয়ে চলছি, গতি অনেক মন্থর, সারাদিন ধরে পর্যটনে সর্বাঙ্গে ক্লান্তি । আশপাশ তৃণহীন হয়ে আসছে, রডোডেনড্রন ম্যাগনোলিয়া বা অন্য গাছ যা চোখে পড়ে তা সম্পূর্ণ পত্রহীন, কালো বিকৃত ভঙ্গিতে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে । দিগন্তে রুক্ষ, পাথুরে পাহাড় । শীতের প্রাক্কালে অতি নিরস ও নিষ্করুণ হিমালয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি ।

ছাঙ্গুতে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে । এখানে একটি হ্রদ, মাইলখানেক লম্বা, আধ মাইল চওড়া, ১২,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত । শীতে জমে সমতল মাঠ হয়ে গেছে । পরবর্তীকালে, শুনেছি, শীতকালে সৈন্যরা এর ওপর দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়, স্কি চালানোর অভ্যাস করে । এই হ্রদের কোলে একটি ছোট ও অপেক্ষাকৃত জীর্ণ বাংলো দেখতে পেলাম, আমাদের আজ রাতের আশ্রয় । অবসন্ন, ক্ষুধার্ত, শীতে জরজর অবস্থায় ব্রজেন আর আমি এবং আমাদের দুই পোর্টার বাংলোয় প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম ফায়ারপ্লেসে গনগনে কাঠের আগুন জ্বলছে । তাকে ঘিরে বসে আছে তিনজন লোক । সম্ভবত আমাদের কিছু আগে এরা এসে পৌঁছেছে ।

অন্ধকার ঘরের দেওয়ালে ফায়ার প্লেসের আগুন থেকে প্রক্ষিপ্ত মানুষগুলোর ছায়া কাঁপছে । আমাদের সর্বাঙ্গ ভারি জামাকাপড়ে ঢাকা, মাথাঢাকা টুপি । সহসা চেনবার উপায় নেই, ওরা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে । কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম, যার চোখে চশমা চকচক করছে, সে রামেশ্বর । রামেশ্বর আগরওয়ালা, কালিম্পংয়ের একজন প্রধান পশম ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও মার্জিত । আমাদের দেখে রামেশ্বর অবাক । চেয়ার-টেয়ার এল, আগুনকে ঘিরে আমরাও বসে গেলাম । কেটলি ভরা গরম চা, বিস্কুট, আখরোট, বাদাম । ব্যবসা উপলক্ষে রামেশ্বর ইয়াটুং যাচ্ছে, তার সঙ্গী দুজন তিব্বতি । একজন পোশাকে,

সহবতে সম্ভ্রান্ত বলে বোঝা গেল, নামটা মনে নেই, 'কুশো' অর্থাৎ 'মহাশয়' জাতীয় একটা সম্বোধন ব্যবহার করা হচ্ছিল। অপরজন কুশোর কোনও অনুচর। কুশো অল্পস্বল্প হিন্দি ও ইংরিজি বলে, রামেশ্বর ভালো তিব্বতি বলে। পারস্পরিক আলাপের কোনও অসুবিধে হল না। ইয়াটুং যেতে হলে নাথুলার ১৪,৫০০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম পার হয়ে ওপারে তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। আমি জানালাম যে, আমার উদ্দেশ্য নাথুলা পৌঁছে সেখান থেকে ফেরত চলে আসা। তিব্বত আমার পক্ষে নিষিদ্ধ বিদেশ, সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিনা অনুমতিতে তিব্বতে প্রবেশ করা আমার উচিত হবে না। এই যে সিকিমে এসেছি তাও আমার পক্ষে উচিত হয়নি, গ্যাংটকে পৌঁছেই আমার পলিটিক্যাল অফিসার জে এস লালের সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, তা করিনি। তখন, মনে রাখতে হবে, সিকিম ভারতবর্ষের ২২তম রাজ্য হয়নি।

আমার আপত্তি বা দ্বিধার কথা শুনে রামেশ্বর বলল: মুখার্জি সাহেব, শাসন আর আইন কানুনের রাজত্ব থেকে অনেক দূরে ইতিমধ্যেই চলে এসেছেন। নাথুলার চুড়োয় কোনও পুলিশ বসে নেই। স্বচ্ছন্দে আপনি আমাদের সঙ্গে ইয়াটুং চলে আসতে পারেন, আমি ছাড়া আর কোনও সাক্ষী থাকবে না। যাইহোক, রামেশ্বরের দলে সামিল হয়ে যাবার ফলে রাতে আহারাদির ব্যবস্থা ভালো হল। কর্মী ও রসদ তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। খাঁটি ঘি-এ ভাজা পরোটা, আলু কপির ঝাল তরকারি, ঘন ছোলার ডাল ও আচার দিয়ে পরম তৃপ্তির ডিনার উপভোগ করলাম। খাট তোশক কম্বল সব জুটে গেল, সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিছানার বান্ডিলও ছিল। এক ঘুমে রাত কাবার।

পরদিন প্রত্যুষে প্রথমেই গায়ে কম্বল জড়িয়ে ছাঙ্গু লেকের ধারে। তাপমান শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে, লেকে জল জমে আছে, একটা কুয়াশার স্তর ভাসছে। ক্রমশ সূর্যের আলো এসে পড়ল ন্যাড়া ব্রাউন পাহাড়ের মাথায়, কুয়াশা কেটে এল, বৈরাগী হিমালয়ের চেহারা পরিষ্কার হল। আজ একটু পরে নাথুলার দিকে অগ্রসর হব। ছ-মাইল পথ ধরে আড়াই হাজার ফুট উঠতে হবে। রাতের বিশ্রামের পর ক্লান্তি অপনোদিত হয়েছে, পরিষ্কার কনকনে হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা। মানুষ ও পশুর যাতায়াতের ফলে যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা তৈরি হয়েছে তাই অবলম্বন করে ধীর পদক্ষেপে চলেছি। হাওয়ায় অক্সিজেন কমে এসেছে বোঝা যায়। কিছুক্ষণ উঁচুপথ অতিক্রম করার পর সামান্য বিশ্রাম, কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে। এই উচ্চতা থেকে শরীরকে সইয়ে সইয়ে শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘন করাই বিধেয়। রামেশ্বরদের দলে কয়েকটি টাট্টুঘোড়া, সে নিজে একটির ওপর বসে আছে, আমাদের অফার করে রেখেছে। কিন্তু কোনও প্রয়োজন অনুভব করছি না, ধীরে ধীরে চতুর্দিক দেখতে দেখতে বেশ চলেছি। এতটুকু সব ঘোড়া দেখলে মায়া হয়। তার ওপর চড়তে রুচি হয় না। হৃদযন্ত্র ও হাঁটু দুটোর বিরুদ্ধে এখনও কোনও অভিযোগ নেই।

যেমন সব গিরিশৃঙ্গে হয়, শেষ পাকদণ্ডীটা অতি কঠোর । এক পা এক পা করে উঠছি । ব্রজেন অল্পবয়স্ক যুবক । একটানা খানিকটা তরতর করে উঠে গিয়ে হাঁপ ধরিয়ে ফেলে, পাথরের ওপর বসে পড়ে । আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে, পোর্টারদের পিছন পিছন তাদের অনুসরণ করে চলেছি । যত উঁচুতে উঠছি, গতি তত মন্থর হচ্ছে । দূরে, হাজার খানেক ফুট উঁচুতে, দড়িতে টাঙানো নানা রঙের পতাকা দেখা গেল, ওই নাথুলা ।

আরও একঘণ্টা এইরকম এক পা এক পা করে, বসে, দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গিরিবর্ত্মের সমতল শিখরে । তখন বেলা এগারোটা হবে । চতুর্দিকে দিগন্তবিস্তৃত হিমালয় । পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য তুষারশৃঙ্গের লাইন, পূর্বদিক থেকে দেখা তার অন্যরকম প্রোফাইল উঁচুনিচু হয়ে ব্ল্যাক রক নামে এক শিখরে শেষ হয়েছে । পিছনে, অনেক দূরে ছাঙ্গু লেক যেন এক ক্ষুদ্র জলাশয় । দক্ষিণে নিচু হিমালয় ভুটান হয়ে সমতলে নেমে গিয়েছে । আর সামনে তিব্বত-ভুটানের সীমান্তে অত্যাশ্চর্য তুষারশৃঙ্গ চুমু-লাহরি, সাদা বরফের যেন একটি আইসক্রিম কোন । হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে, একটু বিশ্রামের পর এককাপ গরম কফি, শরীরে সাড়া পাচ্ছি, মনে আত্মতৃপ্তি । এখানে লম্বা কাঠের দণ্ডে বাঁধা একেক গুচ্ছ নিশান পথের দুপ্রান্তে দড়ি দিয়ে দুদিক বাঁধা । তার গায়ে ছোট ছোট মন্ত্রলেখা কাপড়, সাদা, হলুদ, লাল, সবুজ । নাথুলায় পৌঁছে তিব্বতি যাত্রীরা ভক্তিভরে বুদ্ধ ভগবানকে স্মরণ করে, স্তোত্র লেখা কাপড়ের টুকরো দড়িতে বেঁধে দেয় । আর পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে স্তূপ বানিয়ে রাখে । আমি কুশোর কাছ থেকে ওইরকম একটি নিশান চেয়ে নিয়ে এক জায়গায় বেঁধে দিলাম, স্তূপে পাথর বসালাম ও বাংলা ভাষায় মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানালাম ।

এখন ব্রজেন ও আমার সামনে একটি প্রশ্ন: তিব্বতে প্রবেশ, অথবা ছাঙ্গুতে প্রত্যাবর্তন । ওরা সব এগিয়ে চলে যাবে, আমরা দুজন ম্লানমুখে ফিরে আসব? সেই ১৪,৫০০ ফুট গিরিবর্ত্ম থেকে দেখছি ঘন নীল নির্মেঘ আকাশে হিমালয়ের লাইন, সামনের পথ নেমে গিয়েছে চুম্বি উপত্যকার দিকে, চুমু-লাহরির দিকে । দ্বিধা বর্জন করে সামনে এগিয়ে যাওয়া স্থির করলাম । চলো ব্রজেন, ইয়াটুংয়ে গিয়ে যা হয় স্থির করা যাবে ।

ম্যাপে দেখা যাবে তিব্বতের একটা সরু ফালি পূর্বদিকে ভুটান ও পশ্চিমদিকে সিকিমের মধ্য দিয়ে কালিম্পং সাবডিভিশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে । এই ফালিটি আমু-ছু বলে একটি নদীর অববাহিকা । আমু-ছু চুমু লাহরির হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে, পথে বিভিন্ন অনেক নদীর জল বহন করে, ভুটানের পশ্চিম অংশের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে এসে পড়েছে । তখন তার নাম হয়েছে তোরসা । ফালিটির নাম হচ্ছে চুম্বি উপত্যকা ।

আধঘণ্টা বিশ্রাম, কিছু উপাহার ও দ্বিতীয় এককাপ কফি খেয়ে নাথুলার অপর প্রান্ত দিয়ে নামতে শুরু করলাম । পায়েচলা একটি পথের রেখা ধরে সটান নেমে যাচ্ছি । অপরদিক থেকে মাঝে মাঝে পশমের বোঝা পিঠে খচ্চরের সারি আর রুক্ষ বলিষ্ঠ খচ্চরওয়ালারা ওপরে উঠে আসছে, কুশো ও আমাদের দেখে লম্বা জিভ বার করে অভিবাদন জানাচ্ছে । পদক্ষেপ সামলে চলেছি, অতি সত্বর চার পাঁচ মাইলে হাজার তিনেক ফুট নেমে এসেছি । ছোটখাটো গাছপালার রাজ্য আবার আরম্ভ হয়েছে, সরস সুন্দর বনভূমি । কখনও সখনও ছোট বড় ঝরনা নেমে এসেছে । রাতের শীতে তাদের জল জমে গিয়েছিল, এতক্ষণে রোদে কিছু কিছু গলছে, কিছু কিছু কাচের মতো স্বচ্ছ জমা জল আটকে আছে পাথরের কোলে কোলে, গাছের গুঁড়ির গায়ে গায়ে আইসিকল ঝুলছে, টপটপ করে বরফগলা জল ঝরছে, এক আধটা ক্ষীণ স্রোতের ধারা প্রায় নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে । কিছুক্ষণ পরে একটি গ্রাম, নাম চুম্বিথাং । কয়েকটা নিচু পাথরের বাড়ি গায়ে গায়ে লেগে আছে । একটা চুড়ো-উঁচু মন্দির, মণিপদ্ম খোদাই করা তামার উপাসনাচক্র, নানা আকারের স্তূপ । খোলা অঙ্গনে ক্রীড়ারত অনেকগুলি শিশু, অন্যরকম মানুষ দেখে খেলা ফেলে ছুটে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে । পাথরের ওপর বসা একজোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা । আশপাশে ভুট্টা, যব, আলুর খেত, জোয়ান মেয়েপুরুষরা সেখানে কাজ করছে । কুশোর অনুরোধে আমাদের কয়েক মিনিটের জন্য ব্রেকজার্নি করতে হল । মন্দিরের চত্বরে একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর বসলাম । মোটা বাঁশের পাত্রে ছাং এল, সরু কঞ্চির নল দিয়ে মুখের মধ্যে টেনে নিতে হয় । ছাংয়ের দুর্গন্ধ আমার আদপেই বরদাস্ত হয় না, ঈষৎ দুয়েক চুমুক কোনওক্রমে পান করে সৌজন্য বজায় রাখলাম । টক ও বিস্বাদ । গ্রামবাসীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করে আবার পথ চলা । নামতে নামতে আমু-ছু নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম । এখানকার উচ্চতা ৫-৬ হাজার ফুটের মতো হবে, বড় গাছপালা কিন্তু শীতের দিন বলে নিষ্পত্র । আমু-ছুর জল কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার । তার পাশ দিয়ে দিয়ে সমতল রাস্তা । ইয়াটুং আর বেশি দূর নয় । পড়ন্ত রোদে নদীর জল ঝকঝক করছে, কানে স্রোতস্বিনীর সঙ্গীত । এইখানেই আমরা চিনা কর্মীদের প্রথম দেখতে পেলাম ।

এইসব চিনা শ্রমিকেরা ছোট ছোট দলে নানারকম কাজ করছে দেখতে পাওয়া গেল । কোনও দল রাস্তা মেরামত করছে । অনেকখানি রাস্তা এমন চওড়া ও সমতল করছে যে তার ওপর চার চাকার গাড়ি চলতে পারে । অন্যান্য দল জঙ্গলের গাছ কাটছে, কাঠ চেরাই ফাড়াই করছে, নিজেরাই মাথায় করে গুঁড়ি তক্তা নিয়ে এসে নদীনালার ওপর ভাঙা সাঁকোগুলো মেরামত করছে । এদের পরনে তুলোর প্যাড দেওয়া জামা, প্যান্ট । সব সুতির, সব খাকি । মাথায় পিক-ক্যাপ, বুকে মাও-সে-তুঙের ছবিওলা ব্যাজ এবং নাম ও নম্বর । অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, মুখ-চোখ ভাবলেশ বর্জিত । আমাদের

বিজাতীয় চেহারা দেখেও চোখে কোনও প্রশ্ন নেই । কাছাকাছি গিয়ে হাসিমুখ দেখিয়ে বাও করার ফলে প্রতিনমস্কার পেলাম । তাদের মুখে কোনও উচ্চারিত ভাষা নেই, কোনও আলাপ সম্ভব হল না । ১৯৫২ সালের কথা বলছি, তখনও হিন্দি-চিনি বৈরীভাবের জন্ম হয়নি । জওহরলাল নেহরু তিব্বতের ওপর চিনের অধিকার পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন ।

যেতে যেতে লক্ষ করলাম আমু-ছু নদীর অপর পারে চিনাদের ক্যাম্প । পরিষ্কার করা অনেকখানি জায়গায় সার সার তাঁবু, কিছু কিছু লগ-কেবিন, গোলপোস্ট লাগানো ফুটবল খেলার মাঠ, বাস্কেটবলের কোর্ট । কুশোর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম চিনারা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রেখেছে । কোনও তিব্বতি গৃহে তারা পদার্পণ করে না । তাদের খাদ্যশস্য প্রধানত আসে নিজস্ব ডিপো থেকে, কাঁচা সবজি, ডিম, ভেড়ার মাংস ইত্যাদি প্রয়োজনমতো ইয়াটুংয়ের খোলা বাজার থেকে কিনে নেয় নগদ টাকা দিয়ে, হয় তিব্বতি নয় ভারতীয় মুদ্রায় । চিনা টাকা তখনও এখানে সচল হয়নি । কুশো জানাল যে সাধারণ তিব্বতি শ্রমিক ও চাষাদের বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই, তিব্বতি মেয়েরা তাদের চিরাচরিত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতায় সংসারধর্ম পালন করে যাচ্ছে, চিনাদের কোনও কুনজর তাদের ওপর পড়েনি । বেশ বোঝা যায় এই অঞ্চলে নবাগত চিনারা তাদের নিচু প্রোফাইল বজায় রাখবার জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছে । আপাতত অতি সুন্দর সহাবস্থান । কুশোর বর্ণনায় কোনও আক্রোশ নেই । কিন্তু সে তিব্বতের ধনিক সম্প্রদায়ের একজন । তার অনেক জোত জমি, ভেড়ার পাল, চমরি গাই, ভারতের সঙ্গে লাভবান ব্যবসায়ে লিপ্ত । একটা আশঙ্কা ও সম্ভাব্য অশনি সঙ্কেত তার সঙ্গে কথাবার্তায় অনুভব করা যায় ।

এইসব চিনা শ্রমিকরা সবাই নিরস্ত্র । নভেম্বর মাসের শীতে তুলোভরা সুতির কোট গায়ে দিয়ে প্রাতঃকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যে যার কাজ করে যাচ্ছে । ছোটখাটো, মেদবর্জিত সব মানুষ । বিশালকায়, মেরুন রঙের পশমি জোব্বাপরা উঁচু টুপি মাথায় তিব্বতিদের তুলনায় তাদের একটু নিরেট ও বিবর্ণ বলে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয় ।

যেতে যেতে ইয়াটুংয়ের বাংলোর লাল ঢেউটিনের ছাদ চোখে পড়ল । আমাদের আজকের গন্তব্যস্থলে এসে পড়েছি । এই বাংলো ব্রিটিশ আমলে সেন্ট্রাল পি ডাব্লু ডি-র তৈরি করা । ডাক-তার বিভাগ, সিকিমস্থিত পলিটিক্যাল অফিসার, সৈন্য বিভাগের কিছু পদস্থ ব্যক্তি কখনও সখনও ঘোড়ার পিঠে লাসায় যাতায়াত করতেন । সেখানে ভারতের একটি কনস্যুলেট অফিস ছিল, যে অফিসে আমার ফালুটের সহযাত্রী দেবশঙ্কর শীল পরে কিছুদিনের জন্য রেডিও অফিসারের কাজ করেছে । ইয়াটুংয়ের পরেও লাসার পথে দু-চারটি এইরকম বাংলো তৈরি করা হয়েছিল ।

প্রথম চিনা সশস্ত্র সৈনিক দেখলাম ইয়াটুং বাংলোর কাছে। একটি ছোট কাঠের কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে স্টেনগান জাতীয় অস্ত্র। পোশাক টুপি দেখে মনে হল একজন অফিসার। এর গায়ে একটি ভারি উলের কোট। অল্প বয়স, শান্ত চেহারা। কুশোর সঙ্গে ভাঙা ভাঙা তিব্বতিতে কিছু কথা বললেন ও শুনলেন। তারপর একটি স্যালুট করে আমাদের বাংলোয় প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

ইয়াটুংকে গ্রাম না বলে একটি ছোটখাটো শহর বলা যায়। আমু-ছু নদীর পশ্চিম পার্শ্বে এই পি ডাব্লু ডি বাংলোটি অবস্থিত। একটু এগিয়ে নদীর ওপর একটি শক্তপোক্ত সেতু। সেটি পেরিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা। দুপাশে দোকানপাট, বসতবাটি। বেশ কয়েকটি পাথরের দোতলা বাড়ি, কোনও কোনওটার সুন্দর চেহারা, জানলায় সিল্কের পর্দা হাওয়ায় উড়ছে, বাড়ির সামনে গেট, ফুলের টব, খোঁটায় বাঁধা সুস্থ চেহারার ঘোড়া। বোঝা যায় সম্পন্ন গৃহস্থদের আবাসস্থল। রাস্তায় অনেক লোকজন, দোকানে কেনাকাটা চলছে। কার্পেট, তিব্বতি পোশাক-আশাক, নানা রকম তিব্বতি জুতো, তামা পেতলের বাসনকোসন, থালা, ঘড়া, ঘটি বিবিধ সাইজের সামোভার। এছাড়া ভারত থেকে আমদানি কম্বল কাপড় থেকে পুঁতির মালা, ছুঁচ সুতো থেকে কেরোসিন স্টোভ। ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। বাংলোয় চা-বিস্কুট খেয়ে, একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়েছি। এখনও কিছুটা দিনের আলো রয়েছে। এই রকম তিব্বতিদের দোকান দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটকে কিছু কিছু বরাবরই ছিল। তিব্বতি কার্পেট, পুরু সিল্কের বখু নামক হাউসকোটের মতো পরিচ্ছদ, অথবা অতি সুন্দর কাজকরা তামা পেতলের বাসন, হাতের, গলার অলঙ্কার ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরেই আদর পেয়ে এসেছে। দার্জিলিং চৌরাস্তার বাজারে অভিজাত দোকানে চড়া দামে বিক্রি হয়। এখন তো দেখি দিল্লির জনপথে তিব্বতি দোকানের লম্বা সারি। যদিও তিব্বত থেকে সরাসরি মাল আসা অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে, তবু লাদাখিরা ও ভারতবর্ষে প্রবাসী কয়েক লক্ষ তিব্বতিরা এইসব শিল্প এখনও যথেষ্ট সজীব রেখেছে।

ইয়াটুংয়ের বাজারে কয়েকটি ভারতীয় দোকান, যারা প্রধানত কালিম্পংয়ের পশম ব্যবসায়ীদের এজেন্ট। আর আছে এ অঞ্চলের সবচেয়ে নামকরা ব্যবসাদার জেঠমল ভোজরাজদের একটি গদি। সেখানে কিছুক্ষণ বসতে হল, আলাপাদির পর যখন ফিরলাম তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। দোকানপাট বন্ধ হয়েছে বা হচ্ছে, রাস্তা প্রায় জনশূন্য। এক ব্যক্তি হাতে একটি হ্যাজাক নিয়ে আমাদের বাংলোয় ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে, তার পিছনে আরেকজন দুহাতে দুটি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে, আমাদের রাতের আহার্য। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা, মাথা কান ঢেকে দ্রুতপদে চলেছি। ইয়াটুংয়ের উচ্চতা ৭-৮ হাজার ফুট হবে, কিন্তু উত্তরে খোলা তিব্বত, নভেম্বর মাস।

রাতে খানার টেবিলে প্রধান আলোচ্য বিষয়: কাল ব্রজেন ও আমি কি দেশে ফিরে যাচ্ছি? অথবা তিব্বতের অভ্যন্তরে আরেকটু? রামেশ্বরকে খুব একটা অনুরোধ উপরোধ করতে হল না । বাংলোয় বসে রাতের নিস্তব্ধতায় আমু-ছুর ঝিরঝিরে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, উত্তর তিব্বত থেকে প্রবাহিত ঠান্ডা নির্মল হাওয়ায় ফুসফুস ভরে আছে । দেশে অবশ্যই ফিরব, কিন্তু আরেকটু এগিয়ে দেখে আসি ।

সকাল হতেই সবাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে ভারি জুতো পরে আবার হাঁটবার জন্য প্রস্তুত । রামেশ্বরও তার ইয়াটুংয়ের কাজ আপাতত মুলতুবি রাখছে, সেসব ফেরবার সময় হবে । এখানে আমরা নিজেদের কুশোর জিম্মায় সমর্পণ করেছি । তার বাড়ি গ্যান্টসিতে, সেখানে আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর । গ্যান্টসি অনেক দূরের পথ, হেঁটে অন্তত আরও সাতদিন লাগবে, তেজী ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেও অন্তত তিন দিন । অত দিন চুরি করব কী করে?

আপাতত আমু-ছুর উপত্যকা অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত সরল রাস্তায় হেঁটে চলেছি । দূরে উত্তর-পূর্বে চুমু-লাহরি কখনও দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাহাড়ের আড়ালে পড়ছে । গাছপালা আবার কমে আসছে, নদীর ধারা শীর্ণতর হয়ে আসছে, দুপুরের রোদে বেশ তেজ । দুপাশে উচ্চাবচ গেরুয়া প্রান্তর । আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল সামচেন নামক একটি গ্রামে, সেখানে রাত্রিবাস । এখানে খানিক বেলা থাকতেই পৌঁছলাম । সাহেবি কোনও বাংলো নেই । কুশোর পরিচিত এক তিব্বতি গৃহস্থের বাড়িতে আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল । অসুবিধে কিছু নেই । পরিচ্ছন্ন একটি ঘরে স্থান পেলাম । অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদি সেরে শয্যাশায়ী ও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ।

পরদিন আমাদের গন্তব্যস্থল ফারি জং, এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর । তিব্বত ভ্রমণকারীদের বইতে এই শহরের অনেক বর্ণনা পড়েছি, লোকমুখেও শুনেছি । একটি প্রাচীন দুর্গকে ঘিরে এই শহর । এককালে এই শহরের দখল নিয়ে বিবিধ সামন্তনেতাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে । লাসা, এমনকী অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী গ্যান্টসিতে কোনওদিন যেতে পারব এমন আশা রাখি না, ফারি জংয়ে প্রবেশ করতে পারলে আমার একটা বাসনা চরিতার্থ হয় ।

অতি প্রত্যুষে সামচেন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি । খুব উৎসাহের সঙ্গে চলেছি যাতে যথেষ্ট দিনের আলো থাকতে থাকতে ফারি জংয়ে পৌঁছনো যায় । কিছুদূর গিয়ে আমু-ছু নদী পেরোতে হয়, পেরিয়ে উত্তরপূর্বে রাস্তা চলে গেছে । এক জায়গায় একটি গ্রামগঞ্জ মতো । বসতি ছাড়িয়ে খানিক অগ্রসর হতে নজরে পড়ল একসার খাকি রঙের তাঁবু, কাঠের কেবিন, খেলার মাঠ এবং চিনা শ্রমিকদের ছোটখাটো দল । যেমন ইয়াটুংয়ে দেখেছি ।

অধিকন্তু বেশ কয়েকজন সশস্ত্র চিনা সৈন্য। আমাদের তিনজনের কালো চেহারা, প্যান্ট সোয়েটার পরা, দেখেই ভারতীয় বলে বোঝা যায়। সৈন্যরা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে শুরু করল। তাদের মধ্যে একজন পরিষ্কার তিব্বতি বলছে। যদিও তার খাকি ইউনিফর্ম তবু চেহারায়, ভাষায় ও হাবেভাবে বুঝলাম সে তিব্বতি, চিনা সৈন্যদলে সামিল হয়েছে। কথাবার্তা হচ্ছে কুশোর সঙ্গে, আমরা আর সবাই চুপচাপ খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে কুশো জানাল যে আমরা তিনজন ভারতীয় ফারি জংয়ে প্রবেশ করতে পারব না, কারণ সঙ্গে কোনও অনুমতিপত্র নেই। সৈন্যদের কথাবার্তায় বা আচরণে কোনও ঔদ্ধত্য অশিষ্টতা নেই। জানলাম, তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ফারি জংয়ে গিয়ে আমরা মুশকিলে পড়তে পারি। সেখানে শহরের প্রবেশপথে মস্ত বড় ছাউনি, অনেক সৈন্য ও অফিসার। আমাদের কোনও অনুমতিপত্র নেই, পাসপোর্ট নেই, কোনও ব্যবসা-ব্যাপারের অজুহাত নেই, ফারির কাছাকাছি আমাদের না যাওয়াই ভালো।

দুঃখিত চিত্তে ফারির পথ থেকে নিবৃত্ত হতে হল। কুশোরও অত্যন্ত মনখারাপ, তার দেশ আমাদের আরও ভালো করে দেখা হল না। যাইহোক এবার কি সোজা ফেরত পথ নিতে হবে? তা তো হবেই, কিন্তু কুশো প্রস্তাব করল ফেরার পথে আমরা ডোংকার মনাস্ট্রিতে একদিন কাটিয়ে আসতে পারি। যেখানে এসে পড়েছি সেখান থেকে খুব দূরে নয়, আজই সন্ধের পূর্বে পৌঁছে যেতে পারি। সুতরাং ফারি জংয়ের পরিবর্তে আমরা ডোংকারের পথ ধরলাম।

অনেক দূর থেকে ডোংকার গুম্ভা দেখতে পাওয়া যায়। একটি পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত, পরিষ্কার রৌদ্রে তার সোনালি চূড়া ঝকঝক করছে। ক্রমে ক্রমে আমরা তার নিচে এসে উপস্থিত হলাম। মস্ত বড় এই মঠ। বিরাট ও বহুতল তার প্রধান মন্দির, আশপাশে ছোট-বড় অনেক তিব্বতি ধরনের বাড়ি, কয়েকশো বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে বসবাস করে। আমাদের দলটিকে দেখে কয়েকটি যুবক ভিক্ষু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল, এবং কুশোর সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময়ের পর সাগ্রহে ও সানন্দে আমাদের মঠে নিয়ে চলল। মঠের সামনের অঙ্গনে এক বর্ষীয়ান লামা কাঠের চৌকির ওপর বসেছিলেন, আমরা নিচু হয়ে তাঁকে নমস্কার করলাম, তিনিও হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। ইনি, পরে জানলাম, মঠের প্রধান অধ্যক্ষ নন, মেজো-সেজো কেউ হবেন। যিনি প্রধান তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন, কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

তিব্বতে ছোট-বড় মিলিয়ে অনেক মঠ মন্দির, তার মধ্যে ডোংকার মঠের একটি ঐতিহ্য আছে। প্রায় প্রতিবছর শীতকালে দলাই লামা কয়েকদিনের জন্য এখানে এসে

থাকেন । তিনি শেষ এসেছেন ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে, লাসা থেকে গোপন পলায়নের পথে । সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি সহচর থাকে । অতিথিদের থাকবার উপযুক্ত কয়েকটি ঘর রয়েছে, তার মধ্যে দুটিতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল । কোনও অসুবিধা নেই । আমার ঘরে নিচু তক্তপোশে কার্পেট পাতা, মেঝেতে কার্পেট, সরু নিচু টেবিল, তার ওপর নানা ডিজাইন ও তিব্বতি অক্ষরে অলঙ্কৃত ব্রোঞ্জের সামোভার, আরেকটি টেবিলের ওপর বেশ বড় একটি পুজোর ঘণ্টা, দেওয়ালে দুটি তনখা ঝুলছে, একটিতে তারা, অপরটিতে বজ্রপাণি । দুটি জানলা, একটি দিয়ে দেখা যায় মাঠ, খেত, রাস্তা, গেরুয়া পাহাড়ের ঢেউ । অপরটি দিয়ে দেখতে পেলাম ভেতরের প্রাঙ্গণ । চারদিকে বাড়ি ঘর দিয়ে ঘেরা একটি পাথর বসানো উঠোন, একটি টেনিসকোর্টের মতো বড় হবে । আট-দশটি কিশোর ও বালক একটা ন্যাকড়ার তৈরি বল নিয়ে অতি আনন্দে লাফালাফি করে খেলছে । এরা সব শিক্ষার্থী লামা, সব মাথা ন্যাড়া, পরিধানে মেরুন রঙের খাটো বখু, অধিকাংশের নগ্নপদ ।

ডোংকার মঠ আশপাশের অনেকখানি জমির মালিক । যেখানে এবং যখন সম্ভব চাষবাস হয়, যব, গম, আলু, রাঙালু, সর্ষে, মুসুর ডাল ইত্যাদি । এই অঞ্চলে উত্তর তিব্বতের মালভূমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিচু, হয়তো ৮,০০০ ফুট হবে । প্রকৃতি এখানে ততটা অকৃপণ নয়, সামান্য বৃষ্টিপাত হয় । উৎপন্ন কৃষিজাত সামগ্রীতে এদের চলে যায়, কিছুটা বিক্রি করে চাল, কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায় । এছাড়া এদের আছে চমরি গাইয়ের পাল, জেবু ও ভেড়া, যে সূত্র থেকে প্রচুর মাখন, পশম, চামড়া আসে । মোটের ওপর মঠের অবস্থা ভালো । রক্ষণাবেক্ষণ, শাসনকার্য, পরিচালনা, আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব মঠাধ্যক্ষের ওপর । তিনি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ বলে তিন-চারজন প্রধান লামাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়েছেন । এই সাবেকি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় লাসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ হস্তক্ষেপ করে না । তাদের যেটুকু কর প্রাপ্য সেটুকু পাওয়ার পর সম্পর্কটা সোজা ধর্মীয় স্তরে পৌঁছে যায়, দলাই লামার প্রতি আনুগত্য । এই স্বায়ত্তশাসন এতদিনে অবশ্যই অন্তর্হিত হয়েছে, কোথায় মঠ, কোথায় সেইসব লামারা আর তাদের খেতখামার কে জানে । যেসব ছোট ছোট ছেলেদের খেলতে দেখেছিলাম তারা সব এখন মধ্যবয়স্ক, কেউ ধর্মশালায়, কেউ সারনাথে বা বুদ্ধগয়ায় বা কর্নাটকে তিব্বতিদের ক্যাম্পে, অথবা তিব্বতেই থেকে গিয়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে ।

চা পানের পরও দিনের আলো খানিকটা অবশিষ্ট ছিল । মঠের নানা অংশ আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হল । অন্ধকার ঘর, গলি গলি রাস্তা, স্বর্ণশিখরভূষিত নানা আকারের স্তূপ, জলের ধারায় ভগবানের নাম লেখা প্রার্থনার ড্রাম ঘুরে যাচ্ছে । ঘরে ঘরে তনখা ঝুলছে, অবতারদের সোনালি প্রতিমূর্তি আর শেষে, সবচেয়ে বড় ঘরে ভগবান

বুদ্ধের মস্ত বড় মূর্তি, হাতে অভয়মুদ্রা, শান্ত স্মিত মুখাবয়ব । সামনে, পাশে, পিছনে অনেক মাখনের প্রদীপ জ্বলছে । দুপাশের দেওয়াল লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা পুঁথিতে ঠাসা ।

সর্বত্র আবছা, বাসি মাখনের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে । বৃদ্ধ, অশক্ত লামারা এখানে ওখানে প্রার্থনার চক্র অথবা জপমালা হাতে ভগবানের নামের সঙ্গে সঙ্গে শেষের ক্ষণগুলিকে গুনে যাচ্ছেন । অল্পবয়স্করা বিবিধ কাজে, কেউ বাসনে অলঙ্করণ দাগছে, কেউ ল্যাকারের কাজ করছে, কেউ তনখাতে তুলি টানছে, কেউ মাখনের প্রদীপ ও বিবিধ স্তূপাকৃতি নৈবেদ্য প্রস্তুত করছে । মঠের মধ্যে সবকিছু কাজ ধর্মের আনুষঙ্গিক । তার সঙ্গে আছে এক প্রশস্ত বিদ্যালয়, যেখানে কয়েকটি ঘরে লেখাপড়ার কাজ চলছে । অতি শিশু থেকে আরম্ভ করে বেশ বয়স্করাও পড়াশোনা করে যাচ্ছে, সযত্নে অতি সুন্দর তিব্বতি হরফে পুঁথি লিখে যাচ্ছে । তিব্বতে রাশি রাশি বই, প্রত্যেকটি মঠে লাইব্রেরি । দীর্ঘকাল ধরে এদেশে পুঁথিপত্র, তনখা, অন্যান্য চিত্র বা কারুকার্যমণ্ডিত সামগ্রী লাদাখের বিবিধ মঠে চলে গেছে । কিছুদিন পূর্বে দিল্লিতে যে তনখার প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে দেখলাম সব এসেছে লাদাখ থেকে, কিন্তু সবই মধ্য ও পূর্ব তিব্বত থেকে আহরণ করা । এখনও তিব্বতে পুঁথি ও অন্যবিধ শিল্পের অপরিসীম ঐশ্বর্য রয়ে গেছে । বর্তমান মালিকদের ব্যবস্থাপনায় নিশ্চয় সেসব বস্তুর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে ।

পরদিন সকাল আটটায় মঠের প্রধান অধ্যক্ষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার স্থির হয়ে আছে । অতি প্রত্যুষে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েছি । সাক্ষাৎকারের পর প্রাতরাশ, তারপর আমাদের ফেরত পথে যাত্রা । নিচে নেমে দেখলাম বড় মন্দিরের সামনে প্রশস্ত অঙ্গনে লামাদের ভিড় গিজ গিজ করছে । সকলের অঙ্গে মেরুন রঙের বখু, মাথায় নানারকম টুপি, অনেকের পায়ে বিচিত্র কাজ করা ফেলটের বুট জুতো । সভা আরম্ভ হবার পূর্বে সর্বত্র যেমন একটা গুঞ্জন শোনা যায় সেইরকম শুনছি । একটা চাপা উত্তেজনা কৌতূহলী সব মুখে মুখে । তার কারণ বুঝতে পারলাম আমার হাতে ঝোলানো মুভি ক্যামেরা । সকলে জেনে গিয়েছে এইসময় রিমপোচের সঙ্গে তাদের ছবি তোলা হবে । রিমপোচে, অর্থাৎ গুরু অবতার । যেমন দলাই লামার মৃত্যু হবার পর তিনি অন্যত্র কোথাও জন্মগ্রহণ করেন, সেইরকম আরও অনেক গুরু আছেন যাঁদের পুনর্জন্ম হয়, বিবিধ লক্ষণ মিলিয়ে তাঁদের আবিষ্কার করতে হয় । ডোংকারের গুরুও এইরকম একজন বোধিসত্ব ।

আমরা অঙ্গনে প্রবেশ করবার পর লামারা দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল । কুশোর পিছন পিছন অবনত মস্তকে আমরা রিমপোচের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম । সভার সবাই আসন গ্রহণ করেছে, স্তব্ধ নম্র আবহাওয়া । আমাদের হাতে একেকটি পাতলা সাদা কাপড় । রিমপোচের স্থূলবপু, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন । শুনলাম

নব্বই বছর অতিক্রম করেছেন। কুশো আমাদের পরিচয় দিলেন, একে একে আমরা তার জানুর ওপর আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, ওই পাতলা সাদা চাদর রাখলাম। মৃদু কণ্ঠে তিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করলেন, হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। পায়ে পায়ে আমরা পিছনে সরে এলাম। তিনি ছবি তোলবার অনুমতি দিয়েছেন, অনেক ছবি তোলা হল। সব বয়সের সবরকম আকৃতি ও প্রকৃতির লামা। তাদের মধ্যে রিমপোচের পরেই যাকে আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে সে একটি তিনবছর বয়স্ক শিশু লামা। তার বাপ-মা সম্প্রতি তাকে মঠে অর্পণ করেছে। জানি না বাপ-মা তাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় সে কতটা কেঁদেছিল। এখন তার হাসিমুখ, সম্ভবত সকলের ভালোবাসা পেয়েছে। বোর্ডিং ইস্কুলে যখন বাচ্চাদের রেখে আসা হয় তখন তাদের কত কষ্ট হয়, তা তাদের অসহায় ছলছলে চোখ দেখলে বোঝা যায়। পুত্রকে দেখেছি, পৌত্রকে দেখেছি। এরা বছরে দু-তিনবার বাড়ি আসে, কৈশোর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মা-বাপের সঙ্গে নাড়ি কাটায় না। কিন্তু মঠে রেখে আসা শিশু তার শৈশব থেকেই সন্ন্যাসী। গ্রাম, বাড়ি, বাপ-মা, খেলার সঙ্গী ভাই বোন সকলের কাছ থেকে চিরজীবনের মতো বিচ্ছিন্ন। মঠ, মনাস্ট্রি, কনভেন্ট; ধর্মজগতের সব বিচিত্র প্রতিষ্ঠান।

তিব্বতি লামাদের যৌথ জীবন, যেমন হিন্দু, জৈন, অন্যান্য বৌদ্ধ বা ক্রিশ্চান মঠ মন্দিরে হয়ে থাকে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে কোনও-কোনও তিব্বতি সন্ত স্বেচ্ছায় একাকীত্ব বরণ করেন। কীরকম একাকীত্ব তার একটা বর্ণনা স্বেন হেডিনের বইতে আছে। তিনি মধ্য তিব্বতের এক মঠে কিছুদিন লামাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। এই মঠে উচ্চকোটির কিছু লামা প্রবীণত্ব অর্জন করার পর একা একদিন এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন এবং তার দরজা চিরতরে তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই প্রকোষ্ঠে একটি ছোট জানলা। দিনে একবার সেই জানলার ধারে কিছু খাদ্য ও জল রেখে আসা হয়। খালি পাত্র সেই জানলা দিয়ে ফেরত আসে। বহির্জগতের সঙ্গে এই একমাত্র সম্পর্ক। সেই লামার সমস্ত সময়, যতক্ষণ তিনি জেগে থাকেন, ধ্যান ও নামজপে ব্যয়িত হয়। এইরকম দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। একসময় আসে যখন জানলায় রাখা খাদ্য ও জল পড়ে থাকে। দু-চারদিন এইরকম পড়ে থাকার পর সবাই যখন নিঃসন্দেহ হয় তখন দরজা খুলে সেই সাধুর মরদেহ বাইরে নিয়ে গিয়ে যথারীতি সৎকার করা হয়। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম'। তিব্বতি বৌদ্ধ শ্রমণদের কথা লিখছি, কিন্তু এই বিশ্বাসের মূল বৃহত্তর ও ব্যাপক হিন্দুধর্মের মধ্যেই নিহিত। সংসার ও সমাজকে বর্জন, সন্ন্যাস, একাকীত্ব ও আত্মলোপের ত্রিপুটি বলয় হিন্দুমানসে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বসে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। গৌতমবুদ্ধের নির্বাণ তারই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

ডোংকার গুম্ভা থেকে বেরিয়ে যথাকালে আমু-ছু নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম, ফেরত রাস্তা ধরে ইয়াটুং বাংলোয় । রাত্রিবাসের পর চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে আবার গাছপালার জগতে । পিছনে পড়ে আছে তিব্বতের রুক্ষ গৈরিক জগৎ, যার প্রায় কিছুই দেখা হল না ।

এবারে আমরা নাথুলার পরিবর্তে নিকটস্থ জেলেপ-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে সিকিমে প্রবেশ করব । জেলেপ-লাও নাথুলার মতো ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় । তিব্বতের দিক থেকে জেলেপ-লার পথ, শেষের পাঁচ-ছ মাইল, অতি কঠিন চড়াই । ধীরে ধীরে, বসে দাঁড়িয়ে যখন পৌঁছলাম তখন শরীর একেবারে জীর্ণ । দীর্ঘ রাস্তা দীর্ঘকাল ধরে হাঁটতে হয়েছে । সন্ধে ঘনিয়ে আসছে । পিছনে চুমু-লাহরি শৃঙ্গে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি । একনজর দেখে আবার পথ ধরলাম । ঘণ্টাখানেক পরে যখন কাপুপ বাংলোতে পৌঁছলাম তখন ঘন অন্ধকার । শেষের দু-তিন মাইল টর্চের আলোয় পথ চলতে হয়েছে । তার পরদিন কাপুপ থেকে ছাঙ্গু, স্বল্প পাঁচ-ছ-মাইলের পথ, গাছপালার মধ্য দিয়ে, অনেক ছোট ছোট স্রোতস্বিনী পাথরে-পাথরে পার হয়ে । প্রথম শীতের বরফ অনেক জায়গায়, বুটের নিচে মচমচ করে ভাঙছে । ছাঙ্গুতে পুরো একবেলার সময়, হ্রদে দুপুরবেলার রোদে খানিকটা বরফ গলেছে । আনন্দে ও অলসপায়ে পরিক্রমণ করা হল । তার পরদিন গ্যাংটক । আর তার পরদিন সকালে ভালো করে খেউরি হয়ে, ডিমটোস্টের ব্রেকফাস্ট এবং তৎপরে মোটরযোগে সোজা জলপাইগুড়ি ।

শীতকাল এসে পড়ল, আমার সদর অফিস জলপাইগুড়িতে অধিকাংস সময় কাটে, পাহাড় পর্বতে ট্যুরের সুযোগ এই সময় কম । তাছাড়া আমার প্রধান কাজ হচ্ছে জলপাইগুড়িতে দেশি মালিকানায় যেসব চা-কোম্পানি আছে, তাদের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট শেষ করে সরকারের প্রাপ্য টাকা ঘরে তোলা । এইসব নিয়ে দিনমানে খুব ব্যস্ত থাকি । আবার সংসার আছে, সমাজ আছে, প্রতিবেশী, বন্ধু টেনিস, ক্লাব সব আছে । আর আছে আমার ফটোগ্রাফি । এর মধ্যেও একটি আকাঁ মনের মধ্যে পোষণ করে চলেছি । সেটি হচ্ছে এই তিস্তা নদীর উৎস সন্ধান ।

জলপাইগুড়ি মানেই তিস্তা নদী । এখন শীতকাল, নদীর ধারা কোথায় কতদূরে সরে গিয়েছে । বিস্তীর্ণ ধু-ধু চর । কিন্তু বর্ষাকালে সারা সিকিম, দার্জিলিং তরাই পশ্চিম ডুয়ার্সের বর্ষাধোয়া সব জল, হিমালয়ের অনন্ত হিমবাহগলা জল প্রবল তাড়নায় পাহাড় থেকে নেমে এসে সমতল জলপাইগুড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় । এখন শুনেছি জলপাইগুড়ি শহরকে রক্ষা করার জন্য লম্বা বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তখন ছিল না । হু-হু করে বন্যার জল নেমে এসে, আধখানা শহর প্লাবিত করে দিত । একবার নয়, এক বর্ষায় বারবার । ১৯৫২ থেকে

তিনটি বর্ষাকাল জলপাইগুড়িতে কাটিয়েছি, প্রতি বর্ষায় এই দুর্যোগ । যেমন কোশী বা গণ্ডক, সেইরকম তিস্তা । সেইরকম জলঢাকা, তোর্সা, সঙ্কোশ । যে তিস্তার ওপর জলপাইগুড়ির বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, তার উৎস সিকিমের উত্তরপ্রান্তে কয়েকটি হিমবাহের গলা জল । সেই জল এসে জমেছে একটি বিস্তীর্ণ হ্রদে, সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটি শান্ত স্রোতে ।

যে অঞ্চলে এই হ্রদ অবস্থিত, তার উচ্চতা ১৮-১৯,০০০ ফুট হবে । মানস সরোবরের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে । মানস সরোবর আমাদের তীর্থস্থান, বহুলোক সেখানে ভ্রমণ করে এসেছেন । চিন কর্তৃক তিব্বত অধিকৃত হবার পূর্বে স্বামী প্রণবানন্দ প্রায় প্রতিবছর সেখানে যেতেন । তাঁদের বর্ণনা এবং বিবিধ ভ্রমণকারীর তোলা ছবির প্রদর্শনীর ফলে কৈলাস ও মানস সারা ভারতবর্ষময় খুবই পরিচিত । প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের বই বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ।

কিন্তু তিস্তা বড়ই উপেক্ষিত । আমাদের ধর্মে তার স্থান নেই, গঙ্গে চ যমুনে চৈব-র শ্লোকে তার উল্লেখ নেই, দীর্ঘ গতিপথের কোনওখানে হিন্দুমন্দির নেই । কেউ কেউ কাব্য করে তিস্তাকে ত্রিস্রোতা বলেছেন, যেমন দার্জিলিংকে বলেছেন দুর্জয়লিঙ্গ । কিন্তু এরা সব আদ্যোপান্ত অসংস্কৃত, তিস্তার আসল নাম দিসতাং, যেমন দার্জিলিংয়ের আসল নাম দোরজি-লিং । শুধু তিস্তা নয় সমস্ত অঞ্চলটা, সিকিম, তরাই ডুয়ার্স সবটা হিন্দু কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কে রহিত । এর আসল ঐতিহ্য জঙ্গল, পাহাড় ও পাগলা সব নদীর মধ্যে নিহিত । ধর্ম, সাহিত্য ও কৃষ্টি যেটুকু এসেছে তা উত্তরের তিব্বত থেকে, দক্ষিণের বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ থেকে নয় । সারা পূর্ব হিমালয়ে এই চরিত্র, পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের অর্ধেকটা পর্যন্ত । পশ্চিম হিমালয় ঠিক এর বিপরীত । মধ্য নেপালে গৌরীশঙ্কর থেকে আরম্ভ হয়ে ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, কেদারনাথ এবং আরও সব নাম হিন্দু ঐতিহ্যবাহী । আলমোড়া, গাড়োয়াল প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে ছাওয়া, সর্বত্র জটাধারী, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী, পুণ্যকামী যাত্রীর দল । তিস্তার পথ ধরে কেউ ধর্মেকর্মে যায় না । সিকিমে দু-চারটি বৌদ্ধগুম্ভা, স্থানীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি বহন করে চলেছে । কখনও কদাচিৎ হয়তো কোনও বৌদ্ধভিক্ষু তিব্বত থেকে তিস্তার অববাহিকা ধরে নেমে আসেন, কালিম্পং-শিলিগুড়ি হয়ে সারনাথ বা বুদ্ধগয়ার উদ্দেশে । এই যা দু-চারজন পথচারী । অন্যথা তিস্তার পাহাড়ি গতিপথ মনুষ্যবিরল, পরিত্যক্ত ।

তিস্তা এবং সিকিম হিমালয় সম্বন্ধে বাঙালির খুব একটা সজীব চেতনা আছে বলে মনে হয় না । দার্জিলিং বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে স্থায়ী বাঙালির সংখ্যা কম নয় । প্রতিবছরের দুটি মরসুমে হাজার হাজার সমতলবাসী বাঙালি দার্জিলিং কালিম্পং ইত্যাদি

জায়গায় আসেন। সিকিম দার্জিলিংয়ের সংলগ্ন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে চার-পাঁচ ঘণ্টায় গ্যাংটকে পৌঁছনো যায়। এইসব পার্বত্য অঞ্চলের সব জায়গা থেকে তুষারাচ্ছন্ন পর্বত শৃঙ্গের অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু আরও এগিয়ে গেলে, আরেকটু কষ্ট স্বীকার করলে যে কী দেখা যায়, তার চেষ্টা খুব একটা হয়নি। অথচ ধর্মের টানে কিনা জানি না, পালে পালে বাঙালি হরিদ্বার হৃষীকেশ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদ্রির পথে বেরিয়ে পড়েন বছর বছর। বেশ কিছু যান মহাগুনাস অতিক্রম করে অমরনাথ, এমনকী কৈলাস মানস সরোবর। এসবের বর্ণনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ, অনেক গল্প উপন্যাস ও সিনেমা স্ক্রিপটের লোকেশন। কিন্তু সিকিম তিব্বত ভুটান অথবা তিস্তা রঙ্গিত তোর্সা সঙ্কোশ বাংলার মধ্যে অথবা এত কাছে হয়েও বাঙালি মানসে প্রায় অনুপস্থিত। যদিও বাঙালির শিরায় ভোট-মঙ্গোল রক্ত যথেষ্ট পরিমাণে বইছে, তবু তার সংস্কৃতি এবং রুচি একেবারেই উত্তর ভারতীয়।

১৯৫৩ সালে তেনজিং-হিলারি কর্তৃক এভারেস্ট বিজয়ের পর নেহরু-বিধান রায়ের চেষ্টায় দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বছর বছর কিছু বাঙালির ছেলে অন্যান্যদের সঙ্গে পর্বতারোহণের শিক্ষালাভ করে থাকে। সিনিয়র শিক্ষার্থীদের কাং-পিক, জোংরি, সেবু-লা চোম্বু ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করার ব্যবস্থা হয়, বিবিধ হিমবাহে পর্যটন করানো হয়। তারা অবশ্য ভাগ্যবান। বিশ্বদেব বিশ্বাস প্রমুখ কিছু বাঙালি যুবক পশ্চিম হিমালয়ের নন্দাঘুণ্টি আরোহণ করেছেন, বই লিখেছেন। আরও অনেক বাঙালি যুবক-যুবতী পর্বতারোহণ করেছেন। প্রায় সবাই কিন্তু পশ্চিম হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন। সেখানেই সবার ভিড়। আসল সিকিম এবং জানু কাবরু পানডিম সিনিয়লচু চোমিয়োমো ইত্যাদি সব পর্বত ব্রিটিশ আমল শেষ হবার পর থেকে এখনও অনাদৃত পড়ে আছে।

উত্তর সিকিম এবং তিস্তার উৎপত্তিস্থল বিষয়ে যখন কয়েকটি বন্ধু ও আমি, ১৯৫২ সালে, বিশেষ মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করছি, তখন ওইসব অঞ্চল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মানুষের খবর পাওয়া মুশকিল। একটা পুরনো বইতে কিছু কিছু বর্ণনা পড়ে চমৎকৃত আছি, সেটি জোসেফ হুকারের হিমালয়ান জার্নাল, ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত। হুকার সেইসময়ের একজন বিখ্যাত বটানিস্ট ও পর্যটক, লন্ডনের কিউ গার্ডেন এবং শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। হুকার প্রধানত পূর্ব হিমালয়ের বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই ভ্রমণের একটা পর্যায়ে তিনি উত্তর সিকিমে গাছপালার রাজ্য পেরিয়ে সুউচ্চ তিব্বতি মালভূমিতে উপস্থিত হন। তিস্তার একটি উপনদী, যার নাম লা-চেন, তাকে অবলম্বন করে অনেকদূর গিয়েছিলেন। পথঘাটের •যদিও পথও নেই, ঘাটও নেই — ও স্থানীয় ভূগোলের অনেক বিবরণ তাঁর

বইতে পাওয়া যায় । পরে পার্সি ব্রাউনের ট্যুরস ইন সিকিম বইতেও সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা দেখেছি । এইসময় দার্জিলিংয়ের তখনকার দিনের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ফটোগ্রাফার মণি সেনের সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হল । তিনি আমার পিতৃবন্ধু, ১৯৫২ সালে তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছে । ব্রিটিশ আমলে চৌরাস্তার কাছে অভিজাত দোকানগুলির সারিতে একটি বিশেষভাবে নজরে পড়বার মতো শপউইনডো ছিল 'বারলিংটন স্মিথ', সেটি মণি সেনের স্টুডিও । এখানে দেখতে পেতাম অন্যান্য আশ্চর্য ছবিদের সঙ্গে, গুরুদোংমার হ্রদে প্রতিফলিত কাংচেনজাউ তুষারশৃঙ্গের ছবি । মণি সেন তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে উত্তর সিকিমে পরিভ্রমণ করেছেন, ভারি ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন, সেইসব ফটোগ্রাফ অবলম্বনে বড় মাপের অয়েলপেন্টিং এঁকেছেন । তাঁর কাছে অনেক খবর পেলাম, অনেক উৎসাহ পেলাম । মণি সেন একজন শ্রেষ্ঠ পর্বতপ্রেমিক ছিলেন । ষাট বছর বয়সে তখন কৈলাস মানস সরোবর পর্যটন করে সবে ফিরেছেন । কিছুদিন পূর্বে দার্জিলিংয়েই তাঁর দেহান্ত হয় ।

এছাড়া, তখন আমার ঘনিষ্ঠতা জমছে আরও দুজনের সঙ্গে, একজন আংথারকে, আরেকজন তেনজিং নোরগে । পর্বতারোহণের রাজ্যে দুটি শ্রেষ্ঠ নাম । তেনজিং তখনও এভারেস্টের শীর্ষে চড়েননি, সেই বছর সুইস দলের সঙ্গে প্রায় শিখর থেকে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন । আংথারকে ফরাসি দলের সঙ্গে অন্নপূর্ণা পর্বতে সাহস ও সহ্যক্ষমতার এক রেকর্ড স্থাপন করে ফিরেছে । এরা দার্জিলিংয়ের তুংসুং শেরপা বস্তিতে থাকে । শহরে এদের নিজস্ব বড় বাড়ি তখনও হয়নি । এদের কাছে সবকিছুর হদিশ: কোথায় নদী, কোথায় সাঁকো নেই, কোথায় পথ অদৃশ্য হয়েছে, কোথায় তৃণটুকুর চিহ্ন নেই, কোথায় হিমবাহ কী নিয়মে নেমে এসেছে, কোথায় হ্রদ এবং কোথায় কোথায় ক্যাম্প করবার জায়গা ।

অক্টোবর মাসে দুর্গাপুজোর দিনকয়েক আগে আমাদের পাহাড়ের দিকে অভিযানের দিনস্থির হয়েছে । তিনজন সঙ্গী কলকাতা থেকে আসছে, শান্তিপ্রিয় ঘোষ, দেবশঙ্কর শীল ও কল্যাণ রায় । এই তিনজন ও আমি চারটি বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির মানুষ, চারজনের চাররকমের জাত । যে একটি জায়গায় আমাদের প্রচণ্ড মিল সেটি হচ্ছে পাহাড় নিয়ে পাগলামি । শিলিগুড়ি স্টেশনে একত্রিত হয়ে মোটরে গ্যাংটক । সেখানে পোর্টার সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে বোঝা বণ্টন করে রওনা হয়ে গেলাম । এবার যাত্রাপথ উত্তরদিকে, কিন্তু এই যাত্রার বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ কিছুদূর এগিয়েই শান্তি ঘোষ ও আমাকে ফিরে আসতে হল । প্রবল ও অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ফলে মধ্য সিকিমের মংগনবাজার অঞ্চলে বৃহৎ ধস নামে, রাস্তাটাস্তা ভেঙে অদৃশ্য হয় । শান্তি ঘোষ ও আমি ফিরে আসি, দেবশঙ্কর ও কল্যাণ রায় কোনওক্রমে এগিয়ে যেতে পারে । তারা উত্তর সিকিমের নানা

জায়গায় সফর সমাপ্ত করে যখন ফিরে আসে তখন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি খানিকটা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম ।

খুব মনখারাপ নিয়ে শান্তি ঘোষ কলকাতায় চলে গেল, আমি জলপাইগুড়িতে ফিরে এলাম । ছাড়াছাড়ির পূর্বে উভয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি যে সামনের বছর আবার আমরা ওই পথে যাচ্ছি । আরও দীর্ঘ ও বিস্তৃত পরিক্রমণের প্ল্যান আমাদের মাথায় । ইতিমধ্যে একবছরের চাকরি ও সংসারধর্মে নিয়োজিত হওয়া যাক । শান্তি তখন দমদম জেলের একজন অধিকর্তা । কয়েক বছর আগে দার্জিলিং জেলে কাজ করার সময় হিমালয়রোগে আক্রান্ত হয় ।

উত্তর সিকিমে বিফলতার গ্লানি কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারা যায় না । দ্বিতীয় সুযোগ আসবে, কিন্তু একবছর পরে । এই অস্থিরতা থেকে নাথু-লা পেরিয়ে তিব্বত প্রবেশের আকর্ষণ জন্মেছিল, যে বিষয়টা একটু আগে লিখে শেষ করেছি ।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ির ইনকাম ট্যাক্স অফিসে একটু অদলবদল হয়ে, একটি যুবক ইনকাম ট্যাক্স অফিসার এসে পৌঁছেছে । তার নাম কৃষ্ণমূর্তি, তামিল ব্রাহ্মণ । অবিবাহিত, শান্ত প্রকৃতির, লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালোবাসে । পূর্বে হিমালয় দেখেনি, কিন্তু দুয়েকবার দার্জিলিং কালিম্পং ট্যুরে যাবার ফলে এবং আমার ছোঁয়াচ লেগে পর্বত রোগটা তারও ধরল । দার্জিলিংয়ে যায়, জিমখানা ক্লাব থেকে পর্বতারোহণের বই ধার নিয়ে আসে, শেরপাদের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে সুদীর্ঘ আলোচনা করে । একবার তাকে সঙ্গে করে টংলু সান্দাকফু গেলাম । তার অভিজ্ঞতা নেই, শরীর অনভ্যস্ত । কিন্তু সান্দাকফু থেকে যে দৃশ্য সে দেখল তাতে সে চিত্রার্পিত ও রুদ্ধবাক । পাহাড়ের নেশা শ্যাম্পেনের মতো তার মাথায় । এরপর সুযোগ পেলেই ছুটি নিয়ে কৃষ্ণমূর্তি পাহাড়ে চলে যায় । একলা, একটি দুটি শেরপা নিয়ে । অন্য কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন সে অনুভব করে না । তার লক্ষ্য কোনও-না-কোনও পর্বতশিখর । একবার সিকিম-নেপালের সীমান্তে কাং পিক চড়ে এল । আরেকবার নারসিং পাহাড়ে চড়বার চেষ্টা করেছিল শেষ পর্যন্ত শিখরে পৌঁছতে পারেনি । আরও একবার চোমিয়োমোর ওপর চড়ছে, এমন সময় একটি বরফের ঝড়ের মধ্যে পড়ল । এইরকম উঁচু পাহাড়ে চড়বার উপযুক্ত ব্যবস্থা, পোশাক-আশাক ও সরঞ্জাম তার ছিল না, যেন নেশার ঘোরে দুটি শেরপার ভরসায় সে শিখরে চড়বার চেষ্টা করছিল । বরফের ঝড় ও তীব্র শীতে আক্রান্ত হয়ে তাকে নেমে আসতে হল । হাতপায়ের আঙুলগুলো, নাক কান জমে পাথর হয়ে গিয়েছে, পুরো তুষারের কামড়ে আক্রান্ত । কোনওক্রমে দার্জিলিংয়ের হাসপাতালে । নাক কান বেঁচে গেল, কিন্তু হাতপায়ের আঙুলের ডগায় গ্যাংগ্রিন এসে গেছে । খানিকটা করে কেটে ফেলতে হল । বেশ কিছুদিন ভুগে কৃষ্ণমূর্তি আবার দাঁড়াল ।

আবার, একলা পাহাড়ের সফর শুরু করল । বছর দেড়েক পরে, আমি তখন দিল্লিতে বদলি হয়ে এসেছি, খবর পেলাম যে সে সরকারি চাকরি ছেড়ে নেপালে চলে গিয়েছে, একটা শিক্ষকতার কাজ নিয়ে । তার আর কোনও খবর পাইনি ।

ক্রমশ ১৯৫৩ সালে জলপাইগুড়িতে বর্ষা নামল । যথানিয়মে এল বন্যা । যে বাড়িতে বসবাস করি, তা তিস্তার অন্য সময়ের কিনারা থেকে অন্তত এক মাইল দূরে, কিন্তু সর্বব্যাপী প্লাবন সেখানেও এসে পৌঁছয় । মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে বাড়ির গাঁথুনি, তাতেও কানায় কানায় জল । জল নেমে গেলে গামবুট পরে সাইকেল রিকশায় গিয়ে উঠি । অফিসে গিয়ে দেখি জলে ভাসছে । বাড়িতে ফিরে দেখি আবার বন্যার জল বেড়েছে । কতবার জল এল, চলে গেল । এইভাবে আরেকটা বর্ষাকাল কাটল, আবার আকাশ পরিষ্কার । আমাদের উত্তর সিকিমে রওনা হবার দিন এগিয়ে এসেছে ।

ইতিমধ্যে শান্তি ঘোষ ও আমি এই দুজনের দলে আরেকজন এসে যোগদান করেছে । তার নাম পার্থ রায়, ২৪-২৫ বছর বয়স, জলপাইগুড়ির একজন নবীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । দীর্ঘ খেলোয়াড়ের শরীর, স্মিতমুখ ও সংযতবাক ।

পোশাক-আশাক, তাঁবু ইত্যাদি প্রায় সব সংগ্রহ হয়ে আছে । প্রত্যেকের জন্য একটি করে স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেস । শান্তির আছে একটি নাইলনের সুইস তাঁবু, তাতে একজন শুয়ে থাকতে পারে । আমারটা একটু বড়, তাতে দুজন ধরে, সেটি পার্থ ও আমার জন্য । এছাড়া নানারকম উপকরণ । ফটোগ্রাফির জিনিসই একগাদা । সাদা-কালোর জন্য রোলিফ্লেক্স, রঙিন স্লাইডের জন্য লাইকা ও তার বিবিধ লেন্স ১৬ মিলিমিটার চলচ্চিত্রের জন্য Bolex-H 16, গাদাখানেক ফিল্ম, স্ট্যান্ড ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক বোঝা । অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে গিয়ে পোর্টারদের ব্যবস্থা করতে হল । আংথারকে তার বাছাই করা ন-জন শেরপা সংগ্রহ করে রেখেছে, তাদের সর্দার নিযুক্ত হয়েছে নোরবু নামধেয় এক প্রধান শেরপা । নোরবু আংথারকের সহকারী হিসেবে উত্তর সিকিমে পর্বতারোহী দলের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে অনেক পরিভ্রমণ করেছে, রোদে জলে বরফের ঝড়ে পাক করা তার বলিষ্ঠ শরীর । অন্যান্য ন-জন তাগড়া যুবক, নাম পাসাং, আংনিমা, দোরজি, ফু-টারকি এইরকম সব । সবাই উৎসাহে টগবগ করছে ।

নির্ধারিত দিনে শান্তি শিলিগুড়ি স্টেশনে এক সকালবেলায় এসে পৌঁছচ্ছে, আমি আর পার্থ আমাদের কিটব্যাগ, রুকস্যাক, রসদের ঝোলাঝুলি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছি । শান্তি এল তার মালপত্র নিয়ে, বিরাট মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ । গত কয়েকদিন যাবৎ দাড়ি কামানো বন্ধ রেখেছে । ট্যাক্সি নিয়ে গ্যাংটক রওনা হয়ে গেলাম । সুন্দর নির্মেঘ দিন, স্বচ্ছন্দে গ্যাংটকের ইনস্পেকশন বাংলোয় পৌঁছে সেখানে মাংসের ঝোল

ভাতের লাঞ্চ। বিকেলে নোরবু ও পোর্টাররা সব এসে পৌঁছল, তারা দার্জিলিং থেকে হেঁটে পেশক রোড দিয়ে তিস্তায় নেমে, কী কী সব শর্টকাট ধরে গ্যাংটকে উঠে এসেছে। এবার সমান ওজনের নটি বোঝা প্রস্তুত করতে হবে, প্রত্যেকটি আন্দাজ ৩০-৩২ সের। নোরবু সর্দারের সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করে ও একটা বিশেষ হিসেব করে আমরা জিনিসপত্র এনেছি। প্রথমত, জামাকাপড়, তাঁবু এয়ারম্যাট্রেস ইত্যাদি যা আমাদের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সঙ্গে থাকবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যবস্তু, যথা চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল, কেক বিস্কুট, টিনের মাংস, ফল ইত্যাদি এবং কেরোসিন তেল যার ওজন ক্রমশ কমতে থাকবে। আমাদের পর্যটন ছাব্বিশ দিনের, তিনজন খাদক। সফরের অর্ধেক সময় তারা অতিশয় ক্ষুধার্ত, অর্ধেক সময়, ১৩-১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়, তারা হয়তো আহারে অনিচ্ছুক। অধিক উচ্চতায় পৌঁছতে পৌঁছতে খাদ্যের ভার খানিকটা লাঘব হবে, কিন্তু সেখানে গাছপালা অদৃশ্য, রান্নার কাঠ পাওয়া যাবে না। বনরেখা অতিক্রম করার পূর্বে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে বহন করতে হবে। সেইসব বোঝার হিসেব। এইসব নানাবিধ হিসেবপত্র করে এবং বোঝার ওজন ও পরিমাপ বিবেচনা করে এই ন-জন পোর্টারের মধ্যে বন্টন করা খানিকটা সময়সাধ্য ব্যাপার। বড় বড় অভিযানে যারা যায় তাদের একশো-দেড়শো পোর্টার লাগে। তাদের ও রসদপত্রের ম্যানেজমেন্ট অভিযাত্রীদের একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের অভিযান তাদের তুলনায় কিছুই নয়, তবু বোঝা তৈরি, তার তালিকা বিবরণ ইত্যাদি সমাপ্ত করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইনস্পেকশন বাংলোর বারান্দায় এই একসার বোঝা প্রস্তুত রেখে এবং নোরবু ও তার সঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে আমরা শয্যাগ্রহণ করলাম। যাত্রার প্রাক্কালে একটু উত্তেজিত ও আশান্বিত।

পরদিন সকাল আটটায় পদব্রজে গ্যাংটক পরিত্যাগ করে যে পথ ধরলাম সেটি দ্রুতগতিতে তিস্তা নদীর খোলে নেমে গিয়েছে। গ্যাংটকের উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট, দশ-বারো মাইল রাস্তা ধরে নেমে যাওয়ার পথে এক জায়গায়, বোধহয় ১,৫০০ ফুট উচ্চতায়, দিক-ছু বলে একটি উপনদী তিস্তায় এসে মিশেছে। সেই সঙ্গমস্থলে একটি ডাকবাংলো আছে, সেইটি আমাদের প্রথমদিনের লক্ষ্যবস্তু। স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, গ্যাংটক থেকে নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুপাশে বনভূমি, কখনও কোনও গ্রাম, থাকে থাকে খেত, খামার, প্রধানত বড়-এলাচ, আলু, সর্ষে। আজ আমাদের সঙ্গে উত্তম লাঞ্চ প্যাকেট, গ্যাংটক বাংলোর খানসামা কর্তৃক প্রস্তুত সামি কাবাব, হ্যামস্যান্ডউইচ ইত্যাদি এবং শান্তির কলকাতা থেকে আনা কড়াপাক সন্দেশ। পাহাড়ি রাস্তায় গাছের নিচে পাথরের ওপর বসে এইরকম সব লাঞ্চব্রেকের স্মরণে এখনও চক্ষু আর্দ্র হয়।

পোর্টাররাও সব আশপাশে বসে তাদের আহার্যের পুঁটলি খুলেছে। হাতে গড়া মোটা রুটি, একটু আচার, একচিলতে শুকনো গোমাংস একটি পেঁয়াজ। প্রচুর কলরব ও

হাস্যপরিহাসে তারা মশগুল । এখানে বলা প্রয়োজন যে, সাধারণভাবে, তাদের খাদ্যব্যবস্থার জন্য অভিযাত্রীদের কোনও দায়িত্ব নেই । তাদের যা মজুরি তারমধ্যে থেকেই তারা নিজেদের খাদ্যবস্তু কিনে আসে । এরজন্য সর্দারকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে রাখতে হয় । ঠিক মনে নেই, তখনকার দিনে মজুরি ছিল সর্দারের দৈনিক পাঁচ টাকা এবং অন্যান্যদের সাড়ে তিন টাকা । এর ওপর, বনরেখার ওপরের উচ্চতায়, অর্থাৎ ১৩-১৪,০০০ ফুটের ওপরে যে কদিন কাটবে তার জন্য এক টাকা করে অতিরিক্ত । পোর্টাররা আমাদের যে ৩০-৩২ সেরের বোঝা বইছে তার ওপর তাদের নিজস্ব কাঁথাকম্বল ও আহার্যের পোঁটলা । এইসব ওজন নিয়ে তারা আমাদের দ্বিগুণ গতিতে পাহাড়ে ওঠানামা করে থাকে ।

দিক-ছুর ডাকবাংলোয় যখন পৌঁছলাম তখনও অনেক বেলা আছে । নদীর ধারে একটু উঁচু জমিতে বাংলো । দুদিকে ঘন বনাকীর্ণ পাহাড় উঠে গেছে, বাংলোটি যেন একটি গহ্বরে বসানো । টানা বারান্দায় ইজিচেয়ার নিয়ে বসে নিচে নদীর গর্জন শোনা এবং চতুর্দিকে পাহাড়ের গায়ে গাছের গা-দোলা দেখা ছাড়া চক্ষু কর্ণের আর কোনও মুক্তি নেই । উষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়া, কীটপতঙ্গের জগৎ । সন্ধে হতে না হতে হ্যারিকেন লণ্ঠনের গায়ে হাজারও রকম পোকার লাফালাফি, ঝিঁঝিপোকার উচ্চতান । সত্বর রাতের আহারাদি সেরে আলো নিভিয়ে দিতে হল । তারপর বুকচাপা অন্ধকারে ক্লসট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত এই বাংলোয় কোনও এক সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম ।

দার্জিলিংয়ের মতো সিকিমেও পি ডাব্লু ডি-র বাংলো অনেক ছড়িয়ে আছে, সেইসব জায়গায় যেখানে অফিসাররা ট্যুরে যান । আমাদের মতো শখের ভ্রমণকারীদের জন্য নিয়ম হল যে, পূর্বাহ্নে নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে এবং অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে বাসের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়, যা আমরা করেছি । বাংলোর চৌকিদারকে অনুমতিপত্র দেখালে সে তালা খুলে দেয়, থাকবার বন্দোবস্ত করে দেয় । ফার্নিচার এবং রান্নাখাওয়ার বাসনপত্র সবই থাকা উচিত । তবে যেসব বাংলোয় অফিসাররা কখনও কদাচিৎ আসেন, বা মোটেই আসেন না, সেইসব অবহেলিত বাংলোর অবস্থা বড়ই করুণ । হয়তো চৌকিদারকেই খুঁজে পাওয়া গেল না, আশপাশের কোনও গ্রামে গিয়ে বসে আছে, পোর্টাররা কেউ গিয়ে ধরে নিয়ে এল । নচেৎ জরাজীর্ণ অথবা ছাংয়ের ভারে মাথা তুলতে পারছে না । সাবধানী পথিকরা এইসব কারণে দলে এমন একজনকে রাখে যে রান্নাবান্নার কাজও করতে পারে । আমরা বাংলোর এলাকা ছাড়িয়ে অনেকদূরে যাব, কদিন পরেই তাঁবুতে বসবাস করতে হবে । এইজন্য ভারবাহী পোর্টারদের মধ্যে এমন একজনকে এনেছি যে রান্নাবান্নার কাজও করতে পারে । তার নাম পাসাং, হাসিখুশি একটি যুবক । সকালবেলার টোস্ট-ওমলেট,

কর্নফ্লেকের পরিজ, দুপুরবেলার পরোটা তরকারি এবং রাতের ভাত মাংস চটপট তৈরি করে দিতে পারে। এছাড়া আছে শান্তি ঘোষ, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাঁধিয়ে।

আহারাদির সরঞ্জাম এবং রসদপত্র, পূর্বেই বলেছি, আমাদের সঙ্গে চলেছে। পথে লোকালয় পড়লে সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয় ডিম, মুরগি, আলু, পেঁয়াজ, সর্ষে শাক।

দিক-ছুর পর তিস্তার অববাহিকা ধরে আমাদের পথ। দশ-বারো মাইল দূরে সিংঘিক বাংলোর দিকে আমরা যাচ্ছি। দুটি কারণে এই রাস্তাটি ভয়াবহ। প্রথম, উপহিমালয়ের অজগর বিজবনের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা। সদ্য শেষ হওয়া বর্ষাকালের সৃষ্ট আগাছা জঙ্গল দুপাশ থেকে রাস্তাকে প্রায় বুজিয়ে ফেলেছে। সাপ-খোপ ততটা দেখিনি, কিন্তু এটি হচ্ছে জোঁকের রাজ্য। আমাদের পায়ে ভারি বুট জুতো, মোজা এবং প্যান্টের ধারিকে বেঁধে পট্টি লাগানো। তাতে নিম্নাঙ্গ বাঁচছে, কিন্তু সামনে পা-বেয়ে, গা-বেয়ে জোঁক উঠছে। আশপাশের পাতালতার থেকে সোজা এসে হাত ধরছে, ঘাড়ে আটকে যাচ্ছে। এর প্রতিকার হচ্ছে জোঁকের গায়ে নুন ছড়ানো অথবা জ্বলন্ত সিগারেটের ডগা চেপে ধরা। কিছুক্ষণ পর পর একটু পরিষ্কার জায়গায় বসে পরস্পরের জোঁক ছাড়াচ্ছি। আমাদের সামনে সামনে পোর্টাররা চলেছে, দেখছি যে তাদের খোলা হাত-পা থেকে বড় বড় কালো পরিপুষ্ট জোঁক ঝুলছে, তাদের বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। উপোসি জোঁককে দেখতে হয় দেড়-দু ইঞ্চি লম্বা কালো সুতোর মতো, বাড়ছে কমছে। মানুষ কি আর কোনও প্রাণীর গায়ে ধরার পর রক্তপান করে ফুলে টোপর হয়ে যায়। জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিলে টুপ করে মাটিতে পড়ে। তারপর জুতো দিয়ে পিষে দিলে গলগলে অনেকখানি তাজা রক্তে তার পরিসমাপ্তি।

এই রাস্তার দ্বিতীয় আপদ হচ্ছে বর্ষাকালের ভাঙন। ছোট, মাঝারি, বড় সব ধস নেমে গেছে, তার নিচে রাস্তা অদৃশ্য। অসংখ্য ঝরনা, ছোট ছোট নদী পার হতে হয় কিন্তু সাঁকো ভাঙা অথবা বিপজ্জনক অবস্থায় নড়বড় করছে। জলে নেমে পাথরে পাথরে লাফিয়ে পার হচ্ছি। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে ঘুর পথে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। নোরবু সর্দার আমাদের সকলের আগে, তার হাতে খোলা কুকরি, কোমরে মোটা দড়ি জড়ানো। গাছপালা ডালপাতা কেটে পোর্টারদের পথ সরল করে দিচ্ছে, এপার-ওপারের গাছে দড়ি বেঁধে সকলের নদী পারের সময় হাত দিয়ে একটা কিছু ধরার অবলম্বন করে দিচ্ছে।

এইভাবে সারাদিন ধরে কল্লোলিনী তিস্তার অববাহিকায় চলে চলে এক জায়গায় এসে চড়াই রাস্তা। তিস্তা নিচে পড়ে রইল, মাইল দূর চড়াই ভেঙে সিংঘিক বাংলোর চত্বরে এসে পৌঁছলাম। এ-জায়গাটির উচ্চতা ৪,০০০ ফুটের মতো। হাওয়ায় ঠান্ডার আমেজ, আর সবচেয়ে বড় কথা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আবার দেখতে পেলাম। প্রায় সটান পূর্বদিক

থেকে দেখছি এই শৃঙ্গের উন্মুক্ত বক্ষপট । সারাদিনের সমস্ত গ্লানি এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হল ।

পরদিন আমাদের গন্তব্যস্থল চুং-থাং নামক একটি গ্রামে । পাহাড়ের গা-বেয়ে-বেয়ে রাস্তা, কখনও তিস্তার খোলে নামছে, কখনও উঠে আসছে । প্রধানত ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কোথাও-কোথাও বড়-বড় ধস নেমে রাস্তা ভেঙে নিয়ে গেছে পাহাড়ের শরীরকে উলঙ্গ করে, সেসব স্থান আলগা মাটির ওপর অতি সন্তর্পণে পা ফেলে অতিক্রম করতে হয় । একবার দুবার হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল । চটচটে কাদায় পথ পিছল, অনবরত গায়ে জোঁক উঠছে, গরম, ঘাম, জিভের ডগা পর্যন্ত তৃষ্ণায় শুষ্ক । এইসব নিচু হিমালয় অঞ্চল পদব্রজে অতিক্রম করা বড় কষ্টকর । তবে পুরস্কারও আছে, এ অঞ্চলের অর্কিড ও পক্ষীজগৎ । তখন অক্টোবর মাস, প্রায় সব অর্কিড গাছে ফুল ফোটা শেষ হয়ে গেছে, কিছু কিছু শেষে ফোটা ফুল তখনও গাছের গায়ে লেগে রয়েছে, ঈষৎ গোলাপী, মভ, সাদা । দেখবার মতো হয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি বড় বড় গাছের গুঁড়িতে, ডালে আশ্রিত ও দোদুল্যমান অর্কিডের সুস্থ, মাংসল পাতা, বিগত বর্ষার জলে তাদের নবজন্ম হয়েছে । এদের বিশেষ কিছু আলাদা করে চিনি না । শুনেছি সিকিমে চারশো রকমের অর্কিড আছে । ফেরবার পথে, যদি পারি, চেনা-অচেনা কিছু অর্কিড গাছ তার আশ্রয়দাতা গাছের বল্কলসমেত দার্জিলিংয়ে নিয়ে যেতে হবে । তখনকার দিনে প্রখ্যাত অর্কিডবিশেষজ্ঞ কাকঝোরার মিঃ ঘোষের কাছে প্রতিশ্রুত আছি ।

এছাড়া মধ্য সিকিমের এই অঞ্চলটি পাখিদের রাজ্যও বটে । প্রাতঃকাল থেকে তাদের ডাকাডাকি শুনছি । সর্বত্র তাদের বহুবর্ণ শরীরের ঝিলিক । শূন্য থেকে সামনের ডালে, সে ডাল থেকে অন্য ডালে, সেখান থেকে অদৃশ্যে । একা, জোড়ায়, দলে দলে । ছোট্ট দুর্গাটুনটুনির মতো উইলো-ওয়ার্বলার, কি চড়াইয়ের সাইজের মিনিভেট থেকে বড় বড় ট্রি-পাই, ফর্কটেল, নীল থ্রাশ । এমন অনেক পাখি যা দার্জিলিংয়ের বার্চ হিল কিংবা সিঞ্চল লেকের আশপাশে জঙ্গলে দেখিনি ।

পথে মঙ্গনবাজার নামে একটি লোকালয় । এখানে মাড়োয়ারিদের গুটি দুই-তিন বেনেতি দোকান । আশপাশের সব পাহাড়ি মানুষ তাদের সবকিছু প্রয়োজনীয় জিনিস এসব দোকানে পায় । লেপচা নামধেয় একটি পাহাড়ি জাতি কোণঠাসা হয়ে এই অঞ্চলে বসবাস করে । এককালে মধ্য ও দক্ষিণ সিকিমের সমস্ত বনে-ঢাকা অঞ্চল লেপচাদের অধিকৃত ছিল । প্রকৃতির সঙ্গে মিশে পশুপাখির অন্তরঙ্গতায় তারা জীবন কাটাত । তিব্বতিরা এসে ক্রমশ তাদের স্থানচ্যুত করে । সিকিমের রাজা চোগিয়াল বংশ, সব সামন্ত জমিদার, সেনাপতি, জমাদার, নায়েব, তহশিলদার অথবা মঠের অধ্যক্ষ বা পরিজন সবাই

তিব্বতি । তারপর এল নেপালি যাদের অধিকারে এখন ব্যবসা, কৃষিকর্ম, শিল্প । অদৃশ্যপ্রায় আদিবাসী লেপচারা এখন মধ্য সিকিমের ঘন জঙ্গলে পশুপক্ষীর সঙ্গে মিলিয়ে গেছে । ব্রিটিশ আমলে লেপচাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল । স্কুলে পড়া, থাকা খাওয়া সব তারা বিনামূল্যে পেত । পরে, যদি না তারা মধ্যপথে পালিয়ে যেত, ম্যাট্রিক পাশ করলেই চাকরি । আমি যখন দার্জিলিংয়ের সরকারি স্কুলে পড়ি, ১৯২৫-৩১ সালের কথা বলছি, তখন হঙ্গু লেপচা বলে একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত । ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত (বর্তমানের বোধহয় ক্লাস সেভেন) উঠল । সেইখানেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তার বয়স ১৮-১৯ হবে । কয়েক বছর ফোর্থ ক্লাসে কাটানোর পর সে পুলিশ হয়ে গেল ।

সিকিমের রাজা চোগিয়ালের উল্লেখে একটি কথা মনে পড়ে গেল যা পূর্বে বলতে ভুলে গিয়েছি । গ্যাংটক ছাড়বার পূর্বদিন অপরাহ্নে আমরা তিনজন কিছুক্ষণের জন্য মহারাজার প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন মনাস্ট্রির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি । যাকে প্রাসাদ বলছি সেটি একটি নাতিবৃহৎ কাঠের তৈরি দোতলা বাংলো । ঝাউগাছ দিয়ে ঘেরা এই পরিমিত ও রুচিকর বাড়িটির সামনে ফুলে ভরা বাগান, দু-তিনটি স্থানীয় উর্দি পরা ছেলেমানুষ-চেহারার প্রহরী । সবকিছুর পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘার সারি । ছবি তুলছি, এমন সময় প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন সিল্কের বখু পরা এক তিব্বতি বৃদ্ধ । ছোটখাটো, ছটফটে । মুহূর্তে বুঝে গেলাম ইনিই চোগিয়াল । আনত নমস্কার করলাম, দুচার কথায় জানালাম আমরা তাঁর রাজ্যের অতিথি, উত্তর সিকিম ভ্রমণে যাচ্ছি । কথায় বার্তায় ভরসা পেয়ে তাঁর ছবি তোলবার অনুমতি চাইলাম । বৃদ্ধ খুব খুশি, বখুর হাতা থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে ফেললেন । তারপর, কী মনে করে হাত তুলে বললেন, দাঁড়াও । বলেই হনহন করে তাঁর বাড়িতে ঢুকে গেলেন । দাঁড়িয়ে আছি, দুমিনিট পরেই চোগিয়াল বেরিয়ে এলেন । তখন তাঁর মাথায় একটা স্টিলের হেলমেট, হাতে স্টেনগান । দেখে আমরা একেবারেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি । কিন্তু চোগিয়ালের মুখে হাসি, পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । ছবি তুললাম । মাথায় হেলমেট, হাতে স্টেনগান, নীল সিল্কের বখু পরা সিকিম মহারাজার সেই রঙিন ছবিটি দেখে এখনও আনন্দ হয় । বার্ধক্যের ফলে মহারাজ তখন যেন শিশুর মতো হয়ে গিয়েছেন ।

পরবর্তী চোগিয়ালের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগও হয়েছিল অনেক পরে, ১৯৭১ সালে । ইনিই শেষ চোগিয়াল, যাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হোপ কুক । সিকিম মাইনিং কর্পোরেশনের কিছু সমস্যা ছিল, সেই সম্পর্কে আমন্ত্রিত হয়ে আমায় সিংতাম মাইনিং ক্ষেত্রে ও গ্যাংটকে আসতে হয় । গ্যাংটক শহরের একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম । অতি ছোট, ঘুমন্ত, খেলনার শহর ছিল । সেখানে বড় বড় বাড়ি, চওড়া রাস্তায় জিপ, ট্রাক সব চলাচল করছে,

বিস্তৃত সেনানিবাস। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘার কোনও পরিবর্তন নেই। রাজা তখন রাজধানীতে ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে দেখা হল ফেরবার সময় বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। ততদিনে এয়ারপোর্টও বদলেছে, একটি ভি আই পি ঘরও হয়েছে। সেই ঘরে চোগিয়াল, হোপ কুক ও তাঁদের দুটি সন্তান। এক ঘণ্টার গল্প সল্প হল, সাধারণ সাংসারিক আলাপ, পুরনো সিকিম, দৃশ্যের পরিবর্তন। খুব সাধারণ চেহারা এই পরিবারের, রাজা রানি বলে মনেই হয় না। চোগিয়াল যে অনতিদূর ভবিষ্যতে রাজ্যচ্যুত হবেন, তার কোনও আভাস তখনও সিকিমের আবহাওয়ায় নেই।

সিংঘিকের ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে আবার তিস্তার লাইন ধরে উত্তরমুখী আরেকদিনের পর্যটন। মাইল দশেক দূরে চুং-থাং নামক একটি গ্রামে আমাদের আজকের যাত্রা শেষ হবে। পথটি ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে সরু পথের রেখা প্রায়শই ছোট বড় পাহাড়ের ধসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন আগের দুদিনে দেখেছি। সেইরকম লতাপাতা, পাখি, প্রজাপতি, ঝিরঝিরে ঝরনার প্রবাহ। সেইরকম জোঁক। কখনও সখনও শরৎকালীন হঠাৎ বৃষ্টির পশলা। এইভাবে সারাদিন হেঁটে বিকেলের দিকে চুং-থাং বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বেশ বড় আকারের মনোহর বাংলো। এটি কোনও পাহাড়ের উচ্চতায় তৈরি না করে এমন এক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে যেখানে দুটি উপনদী এসে মিশ্রিত হয়েছে। একটির নাম লা-চেন, অপরটির নাম লা-চুং। লা-চেন আসছে উত্তর সিকিমের পশ্চিম অঞ্চলের জলধারা বহন করে। এই জলে এসে পড়েছে কাবরু-সিনিয়লচু-কাঞ্চনজঙ্ঘা-জংসং ইত্যাদি তুষারশৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বিবিধ হিমবাহের সৃষ্ট নদীর জল। তার মধ্যে আছে বিখ্যাত দুটি হিমবাহ, জেমু এবং তালুং। দ্বিতীয় নদী লা-চুং উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জলধারা, এতে এসে পড়ছে পাউহুনরি, চোম্বু এবং অন্যান্য শৃঙ্গের বরফগলা জল।

চুং-থাং-এ এই দুটি নদীর সঙ্গম, সেখান থেকে তাদের সাধারণ নাম দিস্তাং, অথবা তিস্তা। এই দুটির মধ্যে লা-চেন বড় নদী, তিস্তার প্রধান উপনদী। সিকিমের সবচেয়ে আধুনিক ও বিশ্বাসযোগ্য যে মানচিত্র আমার কাছে আছে (1969, University of Kentacky, 1 cm-1.5 km) তাতে দেখছি যে এই লা-চেন নদীকে তিস্তা বলা হয়েছে। চুং-থাং থেকে আমাদের গতিপথ ছিল উত্তরদিকে লা-চেন অথবা তিস্তার অববাহিকা অবলম্বন করে।

পরদিন আমাদের গন্তব্যস্থল লা-চেন গ্রামে। এটি চড়াইয়ের পথ, ১২ মাইলে ৪,০০০ ফুট উঠতে হবে। প্রথমার্ধ নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহনীয় চড়াই, পরে ক্রমশ কষ্টকর। এইবার দৃশ্যের পরিবর্তন, জঙ্গল কমে এসেছে, আবহাওয়া শুকনো ও ঠান্ডা,

পাখিরা এখনও অগুনতি কিন্তু জোঁক অদৃশ্য । পরিশ্রান্ত শরীরে পাথরের ওপর বিশ্রামের জন্য বসলে মসৃণ শীতল হাওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যে ক্লান্তি বিদূরিত হয় । ক্রমশ উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় ছোট বাংলোর লাল ঢেউটিনের ছাদ দেখা গেল, আরও দেখা গেল বাংলোর অনতিদূরে গাছপালার মধ্যে লাচেন মনাস্ট্রির সোনালি রং করা শিখর । ক্লান্ত, অবসন্ন চোখে এই দৃশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়ে কম মনোহর মনে হয়নি । যখন বাংলোয় পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হব হব ।

লাচেন বাংলোর উচ্চতা ৯,৫০০ ফুট মতো হবে । প্রাতঃকালে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে গায়ে ভারি সোয়েটার চাপিয়ে ও একেক মগ ধূমায়িত চা হাতে নিয়ে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম । এ এমন এক জায়গা যেখানে দুচার দিন থেকে যেতে ইচ্ছে করে । আমাদের আজই ছেড়ে যেতে হবে । তবু স্থির হল যে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য আশপাশে একটু ঘুরে চরে বেড়ানো হোক । খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমরা তিনজন মনাস্ট্রির দিকে চলে গেলাম । পথে একটি ভুটিয়া গ্রাম, খেতখামার, আপেলের বাগান, গাছে লাল লাল আপেল ঝুলছে । গ্রামের প্রান্তে মনাস্ট্রি, দু-দিনটি বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রার্থনাচক্র ঘুরিয়ে নাম জপছে । ভেতরে স্বর্ণকান্তি গৌতম বুদ্ধ । এইখানে মনাস্ট্রির প্রাঙ্গণে আমরা প্রথম ইয়াক অথবা চমরিগাই দেখতে পেলাম । বিরাট পশু, গা বেয়ে লোমের জঙ্গল নেমে এসেছে ।

তিব্বতে একসময় খ্রিস্টান ধর্ম আনবার চেষ্টা হয়েছিল । সেই সময় লা-চেন-এ ডেনমার্কের একটি মিশন এক ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । দুয়েকটি সাহেব এখানে থাকতেন, যুদ্ধের সময় সবাই চলে যান, আর কেউ তারপর আসেনি । খ্রিস্টান মঠটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে । আশপাশে ক্রুশচিহ্নিত কয়েকটি কবর, আগাছায় আবৃত ।

গাছে আপেল দেখে আমরা কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গ্রামবাসীরা আমাদের এককোঁচড় ফল উপহার দিল, কিছুতেই দাম নিতে চাইল না । বাংলোয় ফিরে আমরাও পোর্টারদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করে দিলাম । তারপর নিজ নিজ রুকস্যাক বা অন্যান্য বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমরা লাচেন পরিত্যাগ করলাম । আজকের পর্যটনের লক্ষ্য থাংগু, প্রায় ১৩,০০০ ফুট উচ্চতায় ।

লাচেন থেকে সাধারণ গাছপালার উচ্চতা কমে আসছে । বিবিধ কনিফার দেখছি, জুনিপার, ক্রিপটোমেরিয়া ইত্যাদি । অধিকাংশ গাছই আমার অজানা । এখনও রডোডেনড্রন গাছে কিছু কিছু ফুল রয়ে গেছে । সব ক্রমশ হ্রস্বাকৃতি হতে হতে চলেছে । এখানে ওখানে হাইড্র্যানজিয়া, স্যাক্সি ফ্রাজ, এজেলিয়ার বিস্তৃত কিন্তু খর্বাকৃতি ঝোপঝাড় । পাখির ডাক কম শোনা যাচ্ছে, প্রজাপতি প্রায় নেই । ১০-১১,০০০ ফুট থেকে উচ্চতার

প্রভাব অনুভূত হয়, আমাদের গতি বেশ মন্থর । তিস্তা ধরে চলেছি, সে এখন শীর্ণকায়া কিন্তু খরবাহিনী ।

দিনের শেষে থাংগু ডাকবাংলো দেখা গেল, সেই লাল টিনের ছাদ । উত্তর সিকিমের পথে এই শেষ বাংলো । পথ বা পথের ভগ্নাবশেষ এখানেই শেষ হয়েছে, এরপর তিব্বতি মালভূমির অপার বিস্তৃতি । থাংগুতে লোকালয় বলতে কিছু নেই, বাংলোর বৃদ্ধ বিশুষ্ক চৌকিদার প্রায় একাই বসবাস করে । বাংলো থেকে অল্প দূরে একটি ছোট পাহাড়ি ঝরনার ধারে তার একটি রুমালের সাইজের আলুর খেত । প্রতি মাসে সে একবার হেঁটে গ্যাংটক যায়, বেতন সংগ্রহ করে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে আসে । দুদিনে যায়, দুদিনে ফিরে আসে । আমাদের এখানে এসে পৌঁছতে পাঁচদিন লাগল ।

থাংগুতে খোলা উত্তরের হাওয়া, বাংলোর কোনও পাশে কোনও গাছের আবরণ নেই । সারাক্ষণ পুরনো দরজা জানলায় খটখট শব্দ, ছুরির ফলার মতো ঠান্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে । চৌকিদার ও নোরবু সর্দার উভয়ে মিলে ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে সেটিকে ঘিরে আমরা সব বসলাম, শেরপারাও সব একেক করে এসে বসে গেল । সাধারণত এইসব বাংলোয় চৌকিদারের ঘরে এবং রান্নাঘরে পোর্টাররা আশ্রয় নেয় । আজ আমাদের পর্যটনের আদি বাংলো পর্ব শেষ হল, এবার তাঁবু পর্বের আরম্ভ, মধ্যে একদিনের বিশ্রাম । প্রথমত, পাঁচদিন একনাগাড়ে হেঁটেছি । কতবার হোঁচট খেয়েছি, কাদায় শ্যাওলা ধরা পাথরে পা-পিছলে পড়ে গেছি, কাঁটা ঝোপে শার্ট প্যান্ট ছিঁড়েছে । গা ছড়ে গিয়েছে । সবারই গায়ে অল্পবিস্তর জোঁক ধরার ক্ষত । এসবের মেরামতির প্রয়োজন । তাছাড়া এই উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেন খানিকটা কমে যায় । মানুষের শরীর সেটা সইয়ে নেয় ঠিকই কিন্তু একটু সময় দেওয়া ভালো, বিশেষত আমাদের বাঙালি শরীরে । পরিশ্রমে হাঁফ ধরে যাওয়া কোনও অসুস্থতার লক্ষণ নয়, এমনকী অল্পস্বল্প মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, অখিদে এবং অনিদ্রাও অস্বাভাবিক কিছু নয় । কিন্তু এসব লক্ষণ একদিন দুদিনে অন্তর্হিত হওয়া উচিত । সৌভাগ্যক্রমে আমার শরীর খানিকটা পাহাড়ে ঝালানো, শান্তি ঘোষের শরীরে তখন একটু মেদের প্রলেপ পড়লেও আসল গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরি, এবং পার্থ রায় অতিশয় তাগড়া কাঁচা বয়সের যুবক । তিনজনেই বেশ আছি এবং বেশ চলেছি । থাংগুতে আমাদের একদিনের বিশ্রামের অর্থ শরীরকে বোনাস দেওয়া ।

ফায়ারপ্লেসে আগুনের এক কিনারায় কালো হয়ে যাওয়া মস্ত লোহার কেটলিতে বিনাদুধের চা ফুটে যাচ্ছে । আমাদের সকলের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের মগ, পোর্টাররাও তাদের নিজ নিজ মগ নিয়ে এসেছে । এক সময় নোরবু সর্দার উঠে সকলের পাত্রে কিছুটা করে ফুটন্ত চা ঢেলে দিল । তারপর শান্তি ঘোষ তাতে যোগ করল দু-আঙুল করে রাম ।

সত্বর শীত বিদূরিত হল, রক্ত চলাচল দ্রুততর হল, এবং জমে উঠল আমাদের পার্টি। কাঠের আগুনের লাল আলোয় জ্বলজ্বল করছে শেরপাদের টান-টান মুখের চামড়া। এই পার্টির মধ্যমণি হচ্ছে নোরবুসর্দার। ধরা-ধরা গলায় সে নেপালিতে বলে যাচ্ছে তার পুরনো পাহাড়ে চড়ার কাহিনী, কবে কোন সাহেবদের সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কোথায় বরফের ধসে তাঁবু সুদ্ধ নেমে এসেছিল, কোথায় পাহাড়ের ফাটলে কে পড়ে গিয়েছিল, কোথায় ইয়েতি দেখেছে। আমরা সব মন দিয়ে শুনছি, তার হাত নাড়া ও বিচিত্র মুখভঙ্গি দেখছি, তার উৎসাহের জোগান দিচ্ছি। আরও গরম চা, আরও দু-আঙুল করে রাম, আরও চিনেবাদাম ও ককটেল সসেজ। তাড়া নেই, কাল আমাদের ছুটি।

পরদিন সকালে সামনে ম্যাপ নিয়ে বসে আছি। কিন্তু ম্যাপ দেখব কী, সবটাই খালি ও একরঙা। শুধু একটি সরু রেখায় তিস্তা উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছে, কিছু কিছু উপনদী এদিক ওদিক থেকে এসে তার সঙ্গে মিশেছে। মধ্যে মধ্যে বিবিধ পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান দেখাচ্ছে ছোট ছোট ত্রিভুজ। একটি ভাঙা লাইন, দেখতে পাচ্ছি, তিস্তার পাশে পাশে চলে গিয়েছে। এই পথ ধরে আমরা যাব, যেদিন যতদূর পারি। নোরবু আমাদের গাইড, তার চেয়ে বড় গাইড তিস্তা নদী। একটি ভয়, মাঝে মাঝে যে সব জলধারা গড়িয়ে এসে তিস্তায় মিশেছে যদি ভুল করে সেইরকম কোনও উপনদী ধরে এগিয়ে যাই তাহলে কোথায় গিয়ে পৌঁছব কে জানে। পথে আমাদের ডানদিকে পড়বে চোম্বু ও তার প্রতিবেশী কিছু তুষারশৃঙ্গ। সেগুলি থেকে একাধিক জলধারা নেমে আসছে। আরও কিছু উত্তরে গিয়ে পাব কাংচেনজাউ, গুরুদোংমার ও অন্যান্যদের, যাদের ডানদিকে রেখে উত্তরে এগিয়ে যেতে হবে। যদি বাঁদিক থেকে, অর্থাৎ তিস্তার পশ্চিমদিক থেকে নেমে আসা কোনও উপনদী ভুল করে অবলম্বন করি তাহলে চলে যাব জংসং তুষারশৃঙ্গের দিকে। এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে আসল তিস্তার গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে বিবিধ পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান বিবেচনা করে। এইসব পাহাড়ের কাছ থেকে দেখা চেহারা হিমালয়ান জার্নালের পুরনো সংখ্যা ও মনি সেনের তোলা ফটোগ্রাফ দেখে দেখে অনেকটা পরিচিত হয়ে আছে।

একদিন বিশ্রামের পর থাঙ্গু থেকে রওনা হয়ে গেলাম। দুচার মাইল এগিয়ে রাস্তার চিহ্ন অদৃশ্য। গাছপালা শেষ হব হব। কদাচিৎ কোনও জুনিপার, খর্বাকৃতি। যে গাছ দুদিন আগে ৩০-৩৫ ফুট লম্বা দেখেছি তারা এখন কোমরের নিচে, তারপর হাঁটুর নিচে। থাঙ্গুর পর বেশ খানিকটা চড়াই, প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতার ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে চলেছি। পশ্চিমে, আমাদের বাঁদিকে তিস্তা, তার অপর পারে বিস্তৃত তৃণভূমি, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইনে দেখা যায় জংসং পিক, লোহন পিক, নেপাল পিক, টেন্ট পিক। কখনও দৃশ্যমান, কখনও আড়ালে অদৃশ্য। পূর্বদিকে, অর্থাৎ আমাদের ডানদিকে চোম্বু ও তার আশপাশের সঙ্গীরা। এদের অনেকটা কাছে এসে পড়েছি। এক জায়গায় এসে চোম্বু

আমাদের সামনে উন্মুক্ত হল। খুব একটা উঁচু শৃঙ্গ নয়, ২১,০০০ ফুট মতো হবে, কিন্তু শিখর থেকে সোজা নেমে এসেছে একটি বরফের দেওয়াল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এর আরও কাছে যাওয়া যায় না? চোম্বু অঞ্চলের নিচে সেবু-লা গিরিবর্ত্ম, সেখান থেকে একটি জলের ধারা নেমে এসে তিস্তায় পড়েছে। আমাদের অনুরোধে আসল পথ ছেড়ে নোরবু আমাদের সেবু-লার দিকে নিয়ে চলল। খানিকদূর গিয়ে ভালো করে চোম্বুকে দেখে আবার ফিরে আসব। কাছে গিয়ে চোম্বুর সোজা খাড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবাক হতে হয় মানুষ এই পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছে ভেবে।

চোম্বুর পাদদেশ থেকে ফিরে আবার তিস্তা ধরে উত্তরের পথ। পাহাড়ি চড়াই উতরাই শেষ হয়ে এসেছে, এখন ঢেউ খেলানো রুক্ষ তৃণভূমি। গাঢ় নীল মেঘশূন্য আকাশ, দুয়েকটি চিল উড়ছে, তিস্তার জলের আশপাশে দুয়েকটি বৃহদাকার তিব্বতি কাক। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। ঝকঝকে রোদ কিন্তু তাতে কোনও তাপ নেই। ক্রমশ রোদ ম্লান হয়ে এল, আর বেশি অনগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বড় একটা পাথরের আড়াল দেখে নোরবু আমাদের ছাউনি ফেলার জায়গা স্থির করল। আমাদের সঙ্গে চারটি তাঁবু। একটি শান্তি ঘোষের একলার, দ্বিতীয়টিতে পার্থ ও আমি। তৃতীয়টি বড় ভারি মোটাকাপড়ের তাঁবু, সেটি সবকটি পোর্টারদের জন্য, চতুর্থটি রান্নাঘর। শেষের দুটি তাঁবু ভাড়া করে আনা হয়েছে। দক্ষ, ক্ষিপ্র হাতে পোর্টাররা চারটি তাঁবু খাড়া করে ফেলল, মালপত্র একপাশে সাজিয়ে রাখল। তারপর রসদ বার করে ডিনারের ব্যবস্থা হতে লাগল। পাসাং শেরপা রান্নাবান্না ভালো জানে, লাচেনে উত্তম খাসির মাংসের রোস্ট রেঁধে খাইয়েছে। কিন্তু আজ আমাদের আহারে রুচির অভাব, উচ্চতার প্রভাব কিছু অনুভূত হচ্ছে। আজ কোনও বাহুল্য নয়। দুপুরে বিশুষ্ক কেক, টিনকেটে বার করা সসেজ সালামি ও আপেলের রস খেয়েছি। এবেলা আমাদের মেনু হল মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়ি, তাতে আলু ও পেঁয়াজ, ডিমসেদ্ধ ও একদলা মাখন। শেষপাতে একখণ্ড চকোলেট। রান্নার একটি সমস্যা এই যে এইবার বয়লিং পয়েন্ট খুব নেমে গিয়েছে, চাল ডাল ফুটছে তো ফুটছেই অথচ ঠিক সেদ্ধ হচ্ছে না। দীর্ঘকাল ধরে ফোটানোর মতো অত আগুনই বা কোথায় পাব। একটি প্রাইমাস স্টোভ, তাতে কেরোসিন তেল র্যাশন করা। কাঠের বোঝা ঘাড়ে করে আনা হয়েছে, খুব হিসেব করে খরচ না করলে মুশকিলে পড়তে পারি। কতদিন তাঁবুতে কাটাতে হবে কে জানে। পোর্টারদের ব্যবস্থা অতি সংক্ষিপ্ত। প্রধানত এইসব শেরপারা সোম্পা, অর্থাৎ যবের ছাতু, শুকনো মাংস এবং কড়া ধরনের তিব্বতি আচার খেয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের স্টকের চাল, ডাল, গম সব নেবার খোলা অনুমতি দিয়ে রেখেছি। দেখলাম, পাসাং চমৎকার হাতরুটি বানিয়ে ফেলছে। যেন তন্দুরি নান। গরম রুটির ওপর একচিলতে চিজ দিয়ে খেতে ভালোই লাগল।

আমাদের রাতের আহারাদি তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় হঠাৎ যেন অন্ধকার নামল । বাতাসে ধূলিকনা নেই, বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা নেই, সুতরাং কোনও গোধূলিস্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাল নেই । দিগন্তে সূর্যাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কালো রাত্রি । দেখতে দেখতে সারা আকাশময় তারায় ছেয়ে গেল । মহালয়ার কিছু আগে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি । আকাশের চাঁদের এক অতি উজ্জ্বল ভগ্নাংশ । বিজ বিজে তারায় পরিচিত রাশি ও নক্ষত্রমণ্ডলরা সব হারিয়ে গিয়েছে । শুধু চিনতে পারছি কালপুরুষকে, আর তার নিকটবর্তী লুব্ধককে । কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হল না, কনকনে শীত, উত্তরের হাওয়া ছুঁচের মতো মুখে চোখে ফুটে যাচ্ছে । সত্বর সবাই যে যার তাঁবুর ভেতরে, আড়ষ্ট হাতে বুটজুতো খুলে ফেলে মাথার ঢাকনাসমেত উইন্ডচিটার গায়ে এবং ডবল মোজা পায়ে একেবারে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে । একটু পরে হাত পা গা গরম হয়ে এল, কিন্তু ঘুম আর আসে না । পার্থ আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি । পার্থর নিচে দুখানা কম্বল, আমার নিচে হাওয়া-ভরা রবারের তোশক, তবু নিচে পাথর থেকে ঠান্ডা উঠে আসছে । এপাশ ওপাশ করছি, পরস্পর দুয়েকটা কথা বলছি । পাশের তাঁবু থেকে শান্তি ঘোষের কাশির শব্দ, হুঁহুঁ হাঁহাঁ শুনছি । কিছু জাগরণে, কিছু ঘুমে, কিছু তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছি । হাওয়ায় তাঁবু দুলছে, ফ্ল্যাপগুলো ফটফট করছে । পোর্টারদের তাঁবু থেকে কিছুক্ষণ হাসি-গল্পের আওয়াজ পাচ্ছিলাম, এখন সব নিঃশব্দ । ক্রমশ হাওয়া পড়ে এল, একবার টর্চ জ্বেলে হাতের ঘড়ি দেখলাম, তখনও রাত নটা বাজেনি । তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে ।

সকালে ঘুম ভাঙল পাসাংয়ের ডাকে । তাঁবুর ফাঁক দিয়ে একখানা বলিষ্ঠ হাত গরম চায়ের মগ ধরে আছে । স্লিপিং ব্যাগের জিপ ফাসটনার অর্ধেক নামিয়ে দিয়ে উঠে বসলাম, কৃতজ্ঞচিত্তে চায়ের মগ ধরে নিলাম । আরেকটি মগ এল পার্থর জন্য । দ্রুত কয়েকটি চুমুকে মগ শেষ । গলায় আওয়াজ ফিরে এসেছে । যুগ্ম গলায় গুডমর্নিং বলে শান্তিকে আহ্বান জানালাম, তার গলার হর্ষধ্বনি শুনলাম । প্রাতঃসূর্যের আলো তাঁবুর কাপড়ে ফিল্টার হয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়েছে । আরেক মগ চা চাই । স্লিপিং ব্যাগ পরিত্যাগ করে বাইরে বেরোবার জন্য জুতো পরতে গিয়ে দেখলাম সে দুটি শীতে জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে । বুঝলাম, এর পরে জুতোজোড়াকে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় দিতে হবে । কষ্টেসৃষ্টে জুতো পরে বেরিয়ে এলাম, শান্তিও বেরিয়েছে । পাশে পোর্টারদের তাঁবুতে কোলাহল, কেটলির পর কেটলি চা তৈরি হচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে । আরও এক মগ চা খেয়ে আমরাও এই নতুন দিনটির জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম । অনির্বচনীয় সকালের রোদ, কাছে দূরে গিরিশিখরে তুষারকে রৌপ্যমণ্ডিত করে রেখেছে, আশপাশের গৈরিক প্রান্তর আলোয় ভেসে যাচ্ছে । এই সকাল এক মুহূর্তে গত রাতের জঞ্জালকে সরিয়ে নিয়ে গেল । আবার আমরা তাজা, আবার সারাদিন হাঁটব ।

প্রাতরাশ এল, এনামেলের বোলে গুঁড়ো দুধ দিয়ে তৈরি কোয়েকার ওটস-এর পরিজ, তার ওপর একখাবলা মার্মালেড ভাসানো, আর দুটি করে সেদ্ধ ডিম। পাথরের ওপর বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, পোর্টাররা তাদের নিজ নিজ খানা শেষ করে তাঁবু গোটাচ্ছে, স্লিপিং ব্যাগ ইত্যাদি প্যাক করে ফেলছে। ঘুম থেকে ওঠার একঘণ্টার মধ্যে সব তৈরি, আমাদের দুপুরের পরোটা-লাঞ্চ সমেত। যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন সাতটাও বাজেনি। নোরবু বলেছে আজ দীর্ঘপথের যাত্রা। গিয়াগং বলে একটি জায়গা, তার আগে সে আমাদের তাঁবু গাড়তে দেবে না। গিয়াগং, শুনলাম, তিস্তার ধারে যাযাবরদের একটি অস্থায়ী আড্ডা। এখানে দু-তিনটি পাথরের কুটির আছে। এটি সিকিম-তিব্বত সীমান্তের অদূরে। সীমান্ত বলে ম্যাপে একটি লাইন দেখানো আছে অবশ্যই, কিন্তু কে জানে কোনটা কোন দেশের সীমান্ত। যেখানে এসে পড়েছি সেখানে জনমানবের কোনও চিহ্ন নেই, কোনওদিন ছিল না। এখানে তিব্বতি মালভূমি সিকিমে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় উচ্চতা ১৪-১৫,০০০ ফুট থেকে ১৬-১৭,০০০ ফুট ঢেউ খেলানো প্রায় সমতল প্রান্তর উত্তরে বিস্তৃত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে যাযাবর তিব্বতিরা তাদের ভেড়া ও চমরিগাইয়ের পাল নিয়ে চলে আসে, থাংগু লাচেন পর্যন্ত চলে যায়। পশু এবং পশুজাত পশম, রোম, চামড়া হচ্ছে তাদের একমাত্র পণ্যদ্রব্য। এ লাইনে কার্পেট, গৃহশিল্পজাত রম্যবস্তু আসে না, সেসবের জন্য বাণিজ্যের লাইন ইয়াটুং জেলেপ লা নাথুলা গ্যাংটক কালিম্পং। এই উত্তর সিকিমে যারা পশু চরাতে আসে তারা তিব্বতের রুক্ষতম ও দরিদ্রতম মানুষ। এপ্রিলের শেষ ও মে মাসের প্রথমে যখন বরফ গলে যায়, তখন থেকে তারা আসতে আরম্ভ করে। তবে এ অঞ্চলে বরফ খুব কম, দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিমের পাহাড় জঙ্গলে মৌসুমী বৃষ্টিপাত প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। বাতাসে আর্দ্রতা নেই। গ্রীষ্মকালের আরম্ভ থেকে শীতের শুরু পর্যন্ত এইসব যাযাবরদের যাওয়া আসা। এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এক তো তিব্বত একটি বিরাট জনশূন্য দেশ, তার ওপর সিকিমের সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের পৃথিবী তৃণহীন, পাথুরে অত্যুচ্চ মালভূমি, খোলা, বর্বর হাওয়ার রাজত্ব। যাইহোক, কিছু লোক আসে আবার ফিরে যায়।

এইরকম একটি দলের সঙ্গে দুপুরবেলা নাগাদ আমাদের দেখা হয়ে গেল। দশ-বারো জন বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ, পাচ-ছটি ছেলেমেয়ে, দু-তিনটি স্ত্রীলোকের পিঠে বাঁধা শিশুদের বাদ দিয়ে। শখানেক ভেড়া, ১৭-১৮টি চমরিগাই। মেয়েগুলির একমাথা অবিন্যস্ত রাক্ষসীর মতো চুল, কিন্তু মুখ রাঙা আপেলের মতো। কিশোর দুয়েকটি ছেলের নরম ও সরস মুখমণ্ডল, কিন্তু বয়স্ক পুরুষগুলি পোশাকে ও আকারে প্রকারে রাক্ষুসে ডাকাতদের মতো। তবু, সামনাসামনি এসে পড়লে তাদের রেখাবহুল মুখ খোলা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জিভ বার করে তাদের সাবেক রীতিতে অভিবাদন করে। ভাষা জানি না, কথা বলবার উপায় নেই। আমাদের সঙ্গী শেরপারাও আসলে তিব্বতি, কিন্তু তাদের ভাষা গোর্খালির

সঙ্গে মিশে অনেক বদলে গেছে। জানলাম তারা থাংগু পর্যন্ত নামবে, হয়তো লাচেন। মাসখানেকের মধ্যে তাদের ফিরতে হবে। সিগারেট দিলাম, পেয়ে মেয়েপুরুষ সবাই খুব খুশি। এই একটি জিনিস যা দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় মানুষকে খুশি করা যায়।

তিব্বতিরা খুশি, ভেড়াগুলিও পথ ছেড়ে দিচ্ছে কিন্তু পর্বতাকার ইয়াকগুলির মেজাজ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আর সবচেয়ে খারাপ হল ভেড়ার প্রহরাদার আপসু কুকুরগুলো। বন্য ও কুৎসিত দর্শন। তাদের সামলে রাখতে হয়েছে, প্রান্তর কাঁপিয়ে তারা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে।

উত্তর-পশ্চিমে চোমিওমো দেখা যাচ্ছিল, ক্রমশ তার অনেক কাছে এসে পড়লাম। যেন একটি হমবুর্গ হ্যাটের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার নিম্নাঙ্গ মেরুন-ব্রাউন, মাথায় বরফের প্রলেপ। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২,৫০০ ফুট মতো। আমরা দেখছি ১৬-১৭,০০০ ফুট থেকে, ম্যাপের হিসেবে দূরত্ব হবে হয়তো ৭-৮ মাইল। কিন্তু অতি বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ আবহাওয়ায় দেখাচ্ছে যেন অতি নিকটে এসে গিয়েছে। যেন দেওঘরের নন্দন পাহাড়, এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে অতি স্নিগ্ধ রেখায় এর নরম চড়াই শিখরের মালভূমিতে পৌঁছে গিয়েছে। সুশ্রী এই পাহাড়ে চড়বার আকর্ষণ উপেক্ষা করা মুশকিল। পাশ দিয়ে দিয়ে চলেছি, পাহাড়ের রূপ ও রং বদলাচ্ছে, আর ভাবছি প্ল্যান বদলে এই পাহাড়ের শিখরে পৌঁছবার চেষ্টা করলে কেমন হয়। আমাদের বর্ণনা শুনে ও বিবিধ কোণ থেকে তোলা ছবি দেখে পরের বছর মে মাসে আমার সহকর্মী কৃষ্ণমূর্তি চোমিয়োমোর শিখরে চড়বার চেষ্টা করেছিল। আগেই লিখেছি তার সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। পাহাড়ের গায়ে অনেকটা চড়বার পর একটা বরফের ঝড়ের মধ্যে পড়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়।

ক্রমশ আমাদের পূর্ব-দক্ষিণে আরও সব অপূর্ব তুষারশৃঙ্গের উত্তর মুখ উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাংচেনজাউ। এটিও ২২,৫০০ ফুটের কিছু ঊর্ধ্বে। দার্জিলিংয়ের অবজারভেটরি থেকে দৃশ্যমান তুষার লাইনের দক্ষিণদিকে প্রায় শেষ বরাবর কাংচেনজাউয়ের দক্ষিণ মুখ ঈষৎ দেখতে পাওয়া যায়, সোজা দৃষ্টিপথে ৭০ মাইল দূরে। সেইরকম দেখা যায় চোমিয়োমোকে এবং পাউহুনরিদের। টেলিস্কোপে বা শক্তিমান বাইনোকুলার দিয়ে না দেখলে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোঝা মুশকিল। আর এখন আমরা এদের উল্টোদিক, তিব্বতের দিকে ফেরানো মুখগুলো দেখতে দেখতে চলেছি। একপাশে চোমিয়োমো, অপর পাশে কাংচেনজাউ, গুরুদোংমার এবং অন্যান্য, মাপে না দেখানো মাঝারি উচ্চতার চূড়া, সব কিছু বরফে আবৃত, গায়ে গায়ে স্থাপিত হিমবাহের নেমে আসা নিশ্চল নদী। মধ্যে প্রান্তরে শিথিলস্রোতা তিস্তার এপাশে ওপাশে আমরা হেঁটে চলেছি।

মাথার ওপর দিগন্তবিস্তৃত ঘননীল আকাশ অপরাহ্নের আলোয় অলৌকিক হয়ে আছে, সামনের গৈরিক প্রান্তরকে আলোয় বিধৌত করে রেখেছে । আর যত উত্তর-পূর্বে চলেছি, কাংচেনজাউয়ের পিছন থেকে গুরুদোংমার উন্মুক্ত হয়ে আসছে, এখন এই যুগ্মশৃঙ্গের দুটিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । কত কাছে, রোলিফ্লেক্সে সাধারণ লেন্স লাগানো, কিন্তু তার ভিউফাইন্ডার স্ক্রীনের সবটা জুড়ে আছে কাংচেনজাউ ।

অন্ধকার নেমে আসবার কিছু পূর্বে আমরা গিয়াগং পৌঁছে গেলাম । নিস্তব্ধ, জনহীন প্রান্তরে কয়েকটি শূন্য পাথরের কুটির । চারখানা দেওয়ালের ওপর কাঠের পাটাতন, তার ওপর পাথর চাপানো, যাতে ঝড়ে না উড়ে যায় । কিন্তু ঝড়ে উড়ে যায়ই, দুটি কুটিরের ছাদ নেই, আশপাশে কাঠ, পাথর পড়ে আছে । যে যাযাবর দলটিকে আমরা পথে পেয়েছি তারা গত রাতে এখানে আস্তানা নিয়েছিল । কয়েকটি আগুন জ্বালানোর চিহ্ন, মানুষ ও পশুদের দেহনিঃসৃত আবর্জনা, একগাছা চমরিগাইয়ের লোমে বোনা দড়ি । তাঁবু খাটানোর খোটা পোঁতবার গর্ত । এরা চমরির লোমের তৈরি তাঁবু নিয়ে পরিভ্রমণ করে । এই কুটীরগুলি থেকে কিছুদূরে আমাদের শিবির স্থাপিত হল । প্রথমে চা বিস্কুট, তার অল্প পরেই আধসেদ্ধ খিচুড়ি, গুঁড়োদুধ দিয়ে তৈরি চিঁড়ের পায়েস ও পিণ্ডিখেজুর দিয়ে ডিনার । রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র শীত ও ঝোড়ো হাওয়ার তাড়না । আমাদের সৌভাগ্য, এখন অক্টোবর মাস, আকাশ মেঘমুক্ত, তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই । আজ বুটজুতো খুলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছি । বিনিদ্র মস্তিষ্কে ফেলে আসা সমাজ ও সংসারের আসাযাওয়া । তারপর ঘুমের নৈঃশব্দে এই অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলাম ।

পরদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমরা জবাকুসুমসন্নিভ সূর্যের আলোয় আলোকিত কাংচেনজাউ ও গুরুদোংমারদের সামনা সামনি । স্তব্ধ ও হতবাক বসে আছি । ক্রমশ সূর্য উজ্জ্বলতর হল । এবার প্রস্তুত হতে হয় । পরবর্তী ক্যাম্পিংয়ের জায়গা ডংকুং, সেটিও যাযাবরদের বিশ্রামস্থান । খুব দূরে নয়, যদিও আমাদের গতি ক্রমশ আরও মন্থর হয়ে আসছে, তবু এখনও সমান প্রান্তর দিয়ে চলেছি, চড়াই-উতরাইয়ের কষ্ট নেই । আজ আমরা একটু অন্যপথ ধরে উত্তরমুখে তিস্তার একটি উপনদী অবলম্বন করে গ্যামসোনা হ্রদ দেখব । এটি চোমিয়োমোর পাদদেশে । ঘণ্টাদুয়েক হাঁটার পর গ্যামসোনায় পৌঁছে গেলাম । শান্ত রুপোলি পাতের মতো পড়ে আছে, চোমিয়োমো প্রতিফলিত । এমন জায়গায় তাঁবু ফেলে এক বা একাধিকদিন কাটাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমাদের সময় কম এবং লক্ষ্যবস্তু আরও অনেক পুবদিকে অন্য একটি হ্রদে, যেখান থেকে তিস্তার উৎপত্তি হয়েছে । গ্যামসোনায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার তিস্তা ধরলাম, ক্রমশ এসে পৌঁছে গেলাম ডংকুংয়ে । সেখানেও কয়েকটি পাথরের কুটির, কিছু বৌদ্ধ স্তূপ, উঁচু খোঁটায় বাঁধা মন্ত্রলেখা

কাপড়ের টুকরো । ডাংকুংয়ে দেখলাম একদল যাযাবর ও তাদের একপাল ভেড়া । আমাদের দেখে এদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, একপাল শিশু এসে আমাদের ঘিরে ফেলল । মনে হল, যেন লোকালয়ে এসে পৌঁছে গেছি । কম্বলের তাঁবু, কম্বলের জামা পরিহিত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু, চমরি আর ভেড়ার পাল নিয়ে ব্যস্ত । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তামার পাত্র নিয়ে ভেড়ার দুধ দোয়াচ্ছে, বিশুষ্ক যবগাছের খড় অথবা রোদে জ্বলে যাওয়া তৃণ খাওয়াচ্ছে, ভেড়াদের পিছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে । হাসি, খেলা, কলরব । স্ত্রীলোকেরা গোল হয়ে বসে কাঠের বড় হামানদিস্তায় শস্য গুঁড়ো করছে, কেউ বা গোলাকার কুলোয় শস্য ঝেড়ে পরিষ্কার করছে । পুরুষরা প্রধানত চমরিদের পিছনে । এরা হয়তো আরও দুয়েকদিন এই শিবিরে অবস্থান করবে । জানলাম, এরা তিব্বতে ফেরবার মুখে ।

খানিকটা দূরে গিয়ে আমাদের তাঁবু পড়ল, সেখান থেকে তিব্বতিদের দেখা যায় না । অদূরে তিস্তার শান্ত জলধারা অস্তগামী সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে । সামনে তুষারশৃঙ্গের সারি, পুবদিকের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ।

পরদিন আমাদের লক্ষ্য গুরুদোংমার হ্রদ, ওই নামের পর্বতশৃঙ্গের ঠিক নিচে । সেই হ্রদের কোলে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দিবা দ্বিপ্রহর । খানিকটা চড়াই ভাঙতে হয়েছে, উচ্চাবচ পাথুরে জমিতে ছড়ানো ছোটবড় নানারকম বোল্ডারের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে অগ্রসর হয়েছি । এসব পাথর কাংচেনজাউ ও গুরুদোংমার পাহাড়ের অংশ । বহুকাল পূর্বে তুষার যুগ যখন শেষ হয় তখন বিশাল সব হিমবাহের সঙ্গে পাহাড় ভেঙে নেমে আসে । এইসব বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তারই অবশিষ্ট, কয়েক যুগের সূর্যরশ্মি, ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাতের ফলে তারা বহুধাবিভক্ত । কাঞ্চনজঙ্ঘা অথবা এভারেস্ট অঞ্চলে, যেখানে হিমবাহের চাপ আরও অনেকগুণ বেশি ছিল, সেখানে এইরকম ভাঙা পাথরের (যাকে moraine বলে) মহানদী নেমে এসেছে । এদের অতিক্রম করে তুষারশৃঙ্গের সানুদেশে পৌঁছনো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ।

গোরুদোংমার হ্রদের প্রান্তে এসে আমরা এক স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেছি । এতদিন যা দেখেছি, এমনকী গ্যামসোনা হ্রদেও যা দেখেছি, এর কাছে সেসব কিছুই নয় । প্রায় ১৭,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদের বিস্তৃতি হয়তো ৫-৬ বর্গ মাইল হবে । মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ, নিচে সামনে হ্রদের জল সবুজে নীলে ধাতব কোবাল্ট । এখন কোনও ঝোড়ো হাওয়া নেই, হ্রদের ধারে ধারে ঈষৎ ভাঙা ভাঙা ঢেউ । আর মধ্যের স্থির জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে রয়েছে যুগ্ম শৃঙ্গ গুরুদোংমার, কাংচেনজাউ ও উভয়ের মধ্যে একটি সুউচ্চ তুষারের সেতুবন্ধনী । চোখ ফেরানো যায় না । আজ আর অন্যত্র কোথাও নয়, এইখানেই তাঁবু । বাকি সারাদিন ধরে এই হ্রদের ধারে ধারে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার

পরম সৌভাগ্য হল। জানি না আর কোথাও এরকম আছে কিনা। মানসসরোবরে যাবার সুযোগ হয়নি, তবে সেখানে শুধু কৈলাস ও গুরলামান্ধাতা, এখানে সারে সারে আরও বিচিত্র সব তুষারশৃঙ্গ। সুইজারল্যান্ডে অনেক লেক ও বরফের পাহাড় দেখেছি, সেসব খুবই মনোহর ও মিষ্টি, দেখে এখানকার মতো হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে যায় না।

পরদিন প্রাতঃকালে এই হ্রদটিকে শেষবার দেখে আবার তিস্তার কোলে নেমে এলাম এবং আবার উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হলাম। আজই আমরা ছো-লামো হ্রদে গিয়ে পৌঁছব, যেখান থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। যত এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের দক্ষিণে গুরুদোংমার ও কাংচেনজাউয়ে দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। চোমিয়োমো পিছনে পড়ে আছে। সামনে ক্রমশ উঠে আসছে আরও কয়েকটি শৃঙ্গ, পাউহুনরি ১, ২ ও ৩, কোনাকৃতি সরু পিরামিড আকাশে উঠে গিয়েছে। ১ নম্বরের উচ্চতা ২৩,৪০০ ফুট মতো, অপরদুটি তার কাছাকাছি। এমন সটান খাড়াই যে শৃঙ্গে ও গায়ে খুব একটা বরফ ধরে রাখতে পারেনি। নগ্ন পাথরের দেওয়াল অনেকাংশে দৃশ্যমান। পাউহুনরির গা থেকে বড় একটি গ্লেসিয়ার নেমে এসেছে, তার প্রান্তে একটি বৃহদাকার হ্রদ, নাম ছো-লামো। এইটি আমাদের আজকের লক্ষ্যস্থল। যত এর নিকটবর্তী হচ্ছি তত বিক্ষিপ্ত পাথরের moraine ঘনতর হচ্ছে। এবার আমরা তিব্বতি মালভূমি ছেড়ে পার্বত্য বন্ধুরতার মধ্যে প্রবেশ করেছি। যে সহজ গতিতে গত তিনদিন আমরা মালভূমি অতিক্রম করে এসেছি তা আর সম্ভব নয়। উচ্চতাও বাড়ছে, ১৭,০০০ ফুটের ওপর দিয়ে চলেছি। অসমান পাথর, ওঠা আর নামা। মুখ বুজে চলেছি, ক্লান্ত মন্থর পদক্ষেপে। তবু একসময় আমাদের আজকের পর্যটন শেষ হল। এবার আমরা ছো-লামো হ্রদের সামনে। যে তিস্তা অবলম্বন করে আমরা এতদূরে এসে পৌঁছেছি, সেই তিস্তার শেষ এইখানে। ছো-লামো হ্রদের একটি প্রান্ত সরু হয়ে বেরিয়ে গেছে, সেইটিই তিস্তা। যে হিমবাহ থেকে ছো-লামো হ্রদের জন্ম, তার নাম দিস্তা-খাংসে।

ছো-লামো হ্রদও, গুরুদোংমার হ্রদের মতো, অপার্থিব সৌন্দর্যের আধার। এটি আকারে লম্বা মতো, আরও বড়, যেন আরও নীল-সবুজ। যেদিকে আমরা দাঁড়িয়ে তার অপরদিকে কোনও উঁচু নামকরা তুষারশৃঙ্গ নেই, পাউহুনরির প্রতিবিম্ব এখানে আমরা পাচ্ছি না। ওপারে শুধু বরফে ঢাকা উঁচু জমি গড়িয়ে গেছে। অবসন্ন দেহে তিস্তার উৎপত্তিস্থলে আমরা পাথরের ওপর বসে আছি। শেষ অপরাহ্নের আলোয় চতুর্দিক মহিমময়, ছো-লামোর জল কালো হয়ে আসছে। বাতাসে তীব্রতা, হ্রদের জলে ছোট ছোট ঢেউ। সন্ধের শীত নামছে, হ্রদের কিনারায় এসে ঢেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জল জমে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সবুজ কালো হ্রদের কিনারায় চওড়া সাদা পাড় এসে জমল।

ইতিমধ্যে শেরপারা অনতিদূরে বড় বড় পাথরের আড়ালে তাঁবু তুলে ফেলেছে । মাথার টুপি ভালো করে এঁটে আমরা সেইদিকে অগ্রসর হলাম ।

ছো-লামোর তীরবর্তী তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের অন্দরে আমরা শয্যাশায়ী । শীতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে । যে ধরনের খাদ্য খেয়ে কদিন কাটছে তার কথা আর বলবার না । রোজই শুয়ে শুয়ে পরস্পর হাহুতাশ করি কেন মরতে এসেছিলাম, আর তো সহ্য হয় না । এইসব বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি । পরদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অন্য মানুষ । আদি দেবতা সূর্যের আশীর্বাদে দেহমনের নবজন্ম হয় ।

ছো-লামোর ক্যাম্প তুলে ফেলা হয়েছে । হ্রদের পাশ দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ যাবার পর পাথর ছড়ানো চড়াইয়ের মধ্যে রাস্তা খুঁজে আমরা ক্রমশ পাউহুনরির গায়ে উঠছি । আজকের পথ বড়ই কঠিন । ডংখিয়ালা নামক ১৮,৫০০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পাউহুনরির দক্ষিণ গাত্র বেয়ে নেমে যাব । নোরবু সর্দার দেখিয়ে দিচ্ছে পাউহুনরি এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন আরেকটি বরফের পাহাড়ের মধ্যে এক জায়গায় একটি খাঁজ, সেইটি ডংখিয়ালা । সবটা বরফে আচ্ছাদিত, সাদা । সেই বরফের চাদর নেমে এসে নিকটবর্তী এক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে । আরেকটু পরেই আমাদের বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চড়াই ভাঙতে হবে । অতি মন্থর গতিতে চলেছি । নোরবুর মুখ গম্ভীর, পশ্চিম আকাশে এক খণ্ড মেঘ আকৃতিতে বাড়ছে । কপাল কুঁচকে তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এবং আমাদের পর্বতারোহণে উৎসাহ দিচ্ছে । ডংখিয়া লা এখনও অনেক দূরে, সেখানে পৌঁছতে আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে । এখন সকাল দশটা, যদি বারোটা নাগাদ এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করতে পারি তাহলে বেলা চারটে নাগাদ মোমে-সামডং নামক একটি ভালো জায়গায় গিয়ে আজকের তাঁবু বসাতে পারি ।

স্থির পদক্ষেপে উঠছি তো উঠছি । কখনও সখনও রুকস্যাক নামিয়ে রেখে দু-পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম, ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক কফি, একখণ্ড চকোলেট । পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি ছো-লামো হ্রদ অনেক নিচে নীল সবুজ একটি মাঠের মতো পাতা রয়েছে । পায়ের নিচে মুড়মুড় করে বরফ ভাঙছে । বাঁদিকে পাউহুনরির গা থেকে নামা দিস্তা-খাংসে হিমবাহ, ডানদিকে বরফে ছাওয়া নানা উচ্চতার পাহাড়, একটু দূরে গুরুদোংমার ও কাংচেনজাউ । পিছনে, অনেক নিচে, সেই ঢেউখেলানো গেরুয়া রঙের তিব্বতি প্রান্তর যার মধ্য দিয়ে তিস্তার রুপোলি ফিতে চলে গিয়েছে ।

কে জানে কতটা উঁচুতে উঠেছি । প্রতি পদক্ষেপে উচ্চতার প্রভাব বুঝতে পারছি । আমাদের তিনজনের প্রত্যেকের মুখে একটু আশঙ্কার একটু কষ্টের ছাপ । এক সময় মেঘ মধ্যাকাশে উঠে সূর্যকে আচ্ছন্ন করল, ক্রুর হাওয়ায় নাক কান ঠোঁট কেটে নিচ্ছে । যদি

ঝড় শুরু হয় তাহলে কোথায় আশ্রয় নেব? চলেছি তো চলেইছি । দেখছি যে জোয়ান শেরপারা অনেকখানি এগিয়ে গেছে । নোরবু আমাদের সামনে, তাকেই অনুসরণ করছি । আমাদের পিছনে আরও কয়েকজন শেরপা । এক জায়গায় এসে নোরবু দেখাল, ওই ডংখিয়ালা । অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে দেখলাম, নাগালের মধ্যে এসে পড়েছি । শুধু তাই নয়, আমরা এখন ডংখিয়ালা থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে । বাকি পথটার অধিকাংশ আমাদের নেমে যেতে হবে, তারপর শেষটায়, ১০০ গজ মতো দূরত্ব থেকে খাড়া চড়াই । একটু বিশ্রাম । আমাদের সৌভাগ্য, যে মেঘ আকাশে জমছিল তা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার মুক্ত সূর্যালোক পেয়েছি । চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখছি উত্তরে নিঃসীম শূন্যতা । পূর্বে পাউহুনরির গায়ে আমাদের দৃষ্টি আটকানো, পশ্চিমে ঢেউখেলানো প্রোফাইলে বিবিধ হিমগিরির লাইন সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে রয়েছে । আর দক্ষিণে, আমাদের সামনে ডংখিয়ালার দেওয়াল ।

অনেক নিচে, আমাদেরই চলে আসা পথে দেখতে পেলাম একসারি চলমান প্রাণী । কয়েকটি তিব্বতি যাযাবর ও তাদের পাঁচ-ছটি ইয়াক । মনে হল, আমাদের ডবল গতিতে তারা পর্বতারোহণ করছে ।

এবার নামছি সন্তর্পণে, নুড়ি এড়িয়ে পা ফেলতে হচ্ছে । কিছুক্ষণের মধ্যে এমন জায়গায় এলাম যেখান থেকে খাড়া চড়াই । ওপরে তাকিয়ে দেখি তিন-চারটি শেরপা গিরিবর্ত্মের ওপর, তাদের বোঝা নামিয়ে রেখে মহা উৎসাহে আমাদের ডাকাডাকি করছে । ক্রমে, বরফের মধ্যে পূর্বগামীদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এই শেষ অতি কষ্টসাধ্য চড়াই অতিক্রম করে আমরা ডংখিয়া-লার গিরিদ্বারে পদার্পণ করলাম । এখানে একটুখানি বরফের আস্তরে ঢাকা সমতল । প্রথমেই নোরবু তার ঝোলা থেকে একমুঠো চাল সংগ্রহ করে কী কী মন্তর পড়তে পড়তে চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিল । তথাগতর কল্যাণদৃষ্টি আমাদের সকলের ওপর থাকুক, ভূত-প্রেত-পিশাচ সব দূরীভূত হোক । এখানেও ছোট ছোট নুড়ির স্তূপ, তাতে আমরাও প্রস্তরখণ্ড যোজনা করলাম, মন্ত্রপূত কাপড়ের টুকরো একটি খোঁটায় বেঁধে দিলাম । তারপর নোরবু একটি ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাস পেতে দিতে সবাই বসলাম । ঘড়িতে দেখলাম সবে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে, ঠিক সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছি । আমাদের মুখে বিজয়ীর হাসি । মাথা থেকে টুপি ও চোখ থেকে গগলস নামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ডংখিয়ার আলোবাতাস উপভোগ করছি । এবার কফি ব্রেক । যার ফ্লাস্কে যতটুকু কফি ছিল সব ঢেলে সবাই ভাগ করে নিলাম । তার সঙ্গে চিনাবাদাম, আখরোট ও চকোলেট । শান্তির চোখ চকচক করছে । বলল, একটা জিনিসের অভাব বড়ই বোধ করছি । আমি বললাম, জানি, শ্যাম্পেন । পার্থ চেঁচিয়ে একলাইন গান গাইবার চেষ্টা করল-আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ ।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকবার উপায় নেই। শনশনে বাতাস এবার বাড়ছে, আশ্রয় নেবার মতো কোনও পাথরের আড়াল নেই। শেরপারাও সব যে-যার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নেমে যাবার জন্য উৎসুক।

এবার সোজা খাড়াই উত্তরণ। ডংখিয়ালার এই দক্ষিণগাত্র একেবারেই বরফমুক্ত এবং বিপজ্জনকভাবে নুড়ি ছড়ানো। এখন হৃৎপিণ্ড বেঁচে যাচ্ছে, কিন্তু হাঁটু দুটো গেল। খটাস করে লাগছে, দুমড়ে যাচ্ছে, মুচড়ে যাচ্ছে। নামছি, নামছি, নামছি। একসময় ওপর থেকে দুড়দাড় শব্দ। পিছনে তাকিয়ে দেখি সেই ইয়াকগুলো নামছে। একেকটি যমদূতের মতো, যেন ঘাড়ে এসে পড়ল। আমরা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে তাদের পথ করে দিলাম। এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ইয়াকের সারি এবং তাদের পিছনে তিব্বতিগুলো আমাদের পেরিয়ে চলে গেল। অবাক হতে হয়, কী শক্তিমান এই পশু ও মানুষগুলো।

আমরা আমাদের নিজস্ব গতিতে নেমে চলেছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বোধহয় দু-আড়াই হাজার ফুট নেমে এলাম। এবার পাহাড়ের গা আবার শ্যামল, আবার গাছগাছালি, পাখি ও পাহাড়ি ঝরনার কলস্বর। হাঁটু আর বইছে না, ক্ষুধায় জঠর জ্বলে যাচ্ছে, এবার আমাদের লাঞ্চ চাই। একটি ঝরনার ধারে পাথরের আড়ালে বসে আমাদের খানার পোঁটলাপুঁটলি খোলা হল। যা পেলাম গোগ্রাসে খেলাম, এক বোতল করে বিস্বাদ ফোটানো জল। আগুন জ্বেলে কফি তৈরি হল প্রত্যেকের জন্য একেক মগ। আর তাড়াহুড়ো নেই, হাঁপধরা চড়াই নেই। ধীরে, ভদ্রলোকের মতো চললেও সন্ধের অনেক পূর্বে আমরা মোমে-সামডং পৌঁছে যাব, সেখানে আজ রাতের ক্যাম্প।

এই পথে আমাদের সঙ্গী ও গাইড হচ্ছে লা-চুং নদী। পাউহুনরির দক্ষিণদিকে এবং সিকিমের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বিবিধ পর্বতশৃঙ্গের গ্লেসিয়ার গলা জল বহন করে চলেছে, শেষে গিয়ে মিশেছে চুং-থাং নামক গ্রামে লা-চেন নদীর সঙ্গে। এর কথা আগেই বলেছি। আমরা লা-চেন অর্থাৎ তিস্তাকে অবলম্বন করে সিকিমের উত্তরপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, এখন লা-চুং অবলম্বন করে নামছি এবং চুং-থাংয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি। মোমে-সামডং একটি বড় জংশন। এখানে চোম্বু ও অন্যান্য হিমবাহের পূর্বদিকে গড়ানো জল লা-চুং নদীতে এসে পড়ছে। একটি পথে আছে যেটা দিয়ে মোমে-সামডং থেকে সেবু-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পশ্চিমে থাঙ্গুতে গিয়ে পৌঁছনো যায়। থাঙ্গু ও চোম্বু গিরিশৃঙ্গের কথা আগেই লিখেছি।

মোমে-সামডংয়ে ঠিকঠাক এসে পৌঁছলাম। এই জায়গাটির উচ্চতা হল ১৪,০০০ ফুট মতো। এখানে একসময়ে আলপাইন ক্লাব দ্বারা একটি কাঠের কুটির নির্মিত হয়েছিল। তার ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। নিকটবর্তী এক জায়গায় আমাদের তাঁবু পড়ল। অতি

মনোহর এই জায়গা । পাহাড়ের গা কিয়দংশ তৃণাচ্ছাদিত, অধিকাংশ মেরুন ও গেরুয়া, তামা, লৌহ ও দস্তার মিশ্রণে এই রং । পর্যবেক্ষণ ও জরিপ হয়েছিল একসময়ে, কিন্তু যতদূর জানি এখান থেকে এইসব খনিজ উদ্ধার করা অথবা কারখানা বসানোর চেষ্টা করা হয়নি ।

এই মেরুন অববাহিকা দিয়ে সেবু-ছু নদীর ক্ষীণ জলধারা গড়িয়ে এসেছে, তারই কোলে আমাদের ক্যাম্প ও রাত্রিবাস । সন্ধের অন্ধকার নামবার পূর্বে আমরা ইতস্তত খানিকটা পরিভ্রমণ করলাম । সেবু-ছু ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে দূর থেকে চোম্বুকে দেখা যায় । পাহাড়ের গা দিয়ে খানিকটা উঠলে দেখা যায় উত্তরে কাংচেনজাউয়ের শীর্ষ । আর পূর্বদিকে লা-চুং নদীর অপরপারে সিকিমের পূর্ব সীমান্ত প্রহরাদার হিমগিরির লাইন ।

এখানে তাঁবুতে রাত্রিবাস আর কষ্টকর নয়, অন্তত অতটা কষ্টকর নয় । তিব্বতি প্রান্তরের নিষ্করুণ ঝোড়ো হাওয়া থেকে মধ্য সিকিমের পাহাড়গুলো আমাদের আড়াল করে রেখেছে । মনে আশঙ্কা নেই, আর ডংখিয়ালা অতিক্রম করতে হবে না । এবং এটিই আমাদের শেষ তাঁবু । কাল, যদি কোনও দুর্যোগ এসে উপস্থিত না হয়, তাহলে আমরা ১১,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ইয়ুমথাং বাংলোয় পৌঁছে যাব ।

পরদিন লা-চুং নদীর অববাহিকা ধরে অগ্রসর হলাম । এখান থেকে একটি ভাঙাচোরা পায়ে চলার পথ পেয়ে গেছি । ক্রমশ গাছপালা বড় হচ্ছে । লা-চুংয়ের অববাহিকা এখানে খুব চওড়া অপর পারে বড় বড় কোনাকৃতি গাছের জঙ্গল । এই রমণীয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বিকেল নাগাদ ইয়ুমথাং বাংলো দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হল । এবারে আবার লোকালয়, পাথরের অথবা কাঠের বাড়িঘর, খেতখামার গরু-ছাগল দেখা যাচ্ছে । মাঠে কর্মরত পুরুষ, পিঠে ঝুড়িবাঁধা মেয়েরা, ক্রীড়ারত শিশুরা, আবার সব ফিরে এসেছে । নদীতে, পাহাড়ে, গাছপালায়, আশপাশের নরম অনুচ্চ তুষারশৃঙ্গে লা-চুং উপত্যকা ঠিক সুইজারল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের মতো । তফাত এই যে এখানকার উচ্চতা ১১,০০০ ফুট, যে উচ্চতায় সুইজারল্যান্ড চিরস্থায়ী বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । তাছাড়া এখানে মোটর চলাচলের মসৃণ পিচঢাকা পথ নেই, চমকপ্রদ কটেজ ও ভিলেজ ছড়াছড়ি নেই, পরিচ্ছন্ন সুবেশধারী ও সুসভ্য ইউরোপীয় নেই । মুষ্টিমেয় যেসব সিকিমি তিব্বতিরা এখানে অল্পস্বল্প খেতখামার নিয়ে বেঁচে আছে তারা অতি দরিদ্র । গায়ে রুক্ষ পশমের ঘরের তাঁতে বোনা একটা ঝোলা মতো ঝুলছে, কোমরে দড়ি বাঁধা । ছেঁড়াখোঁড়া জামার মধ্য দিয়ে কখনওবা গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যায় । প্রথম যৌবনে এদের মেয়েপুরুষদের চেহারা অতিশয় সুশ্রী ও সুঠাম । অতি উচ্চভূমিতে বসবাস করার জন্য, খাদ্যাভাবে, পরিশ্রমে এবং বিবিধ রোগে এদের

অকালবার্ধক্য এসে যায় । তার ওপর আছে আগন্তুক নেপালিদের চাপ । এই ক্ষয়িষ্ণু সিকিমিরা লেপচাদের মতোই ক্রমশ অবলোপের পথে চলেছে ।

ইয়ুমথাং বাংলোয় পৌঁছে আমরা চমৎকৃত হলাম । বৃহৎ সুন্দর বাংলো, বোধহয় এই অঞ্চলের সুন্দরতম । ইংরেজ আমলে লাটসাহেবরা এখানে এসে দু-চারদিন করে কাটিয়ে যেতেন । ভিজিটার্স বুকের পিছনের পাতা উল্টে দেখলে অনেক মহারথীর নাম ও তাঁদের মন্তব্য আবিষ্কার করা যায় । প্রতিটি বাংলোতেই এই ভিজিটার্স বুক একটি দেখবার বস্তু । যেমন লাচেন বাংলোতে দেখেছি, স্মাইথ, শিপটন, টিলম্যান ডাইরেনফার্থ ইত্যাদি প্রাকযুদ্ধ আমলের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহণকারীদের সই, দু-চার লাইন লেখা । তাঁদের বিবিধ অভিযানের পথে এইসব বাংলোয় এক আধদিন থেকে গেছেন । একজন অভিযাত্রী, তাঁর নাম মনে নেই, গ্যাংটক থেকে পায়ে পেডোমিটার বেঁধে বেরিয়েছিলেন । তাঁর পদক্ষেপের সংখ্যা এই মিটারে গোনা হয়ে যেত । দিক-ছু থেকে পর পর বাংলোয় তিনি তাঁর পদক্ষেপের সংখ্যা বাংলোর বইতে লিখে লিখে চলেছেন । পক্ষী বা উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা অতি আহ্লাদের সঙ্গে তাঁদের আবিষ্কারের কথা বড় বড় প্যারাগ্রাফে লিখে রেখেছেন । আরেকজন নদীতে জলধারার চাপ মেপে চলেছেন । এইরকম সব লেখায় ভিজিটার্স বুকগুলি সমৃদ্ধ হয়ে আছে । কে জানে এসব বই এখন কোথায় ।

ইয়ুমথাংয়ে আমাদের বড়া খানা, পরোটা, মুরগির রোস্ট, কনডেন্সড মিল্কের পুডিং সহ । বিলিতি চিনেমাটির প্লেট, গ্লাস, ছুরি কাটা সহ মস্ত ডাইনিং টেবিলে বসে । শান্তি ঘোষের তদারকে চমৎকার রান্নায় আদিম ক্ষুধার সঙ্গে আহার সমাপ্ত করে, ছোট ডাঁটিওয়ালা গ্লাসে অবশিষ্ট ব্র্যান্ডি ভরে নিয়ে আমরা আবার, কতদিন পরে যেন, ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা নিশ্চিন্তে পর্যালোচনা করার সুযোগ পেলাম । গরম ঘর, গদিওয়ালা খাট, সুসভ্য বাথরুমে গরম জল । কেবলমাত্র আমাদের খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ ও নোংরা পরিচ্ছদটাই এই বাংলোয় বেমানান । অনেক বেলা পর্যন্ত অচেতন হয়ে ঘুমে কাটিয়ে যখন উঠলাম তখন পোর্টাররা সব তৈরি, ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে পাসাং আমাদের তাড়া দিচ্ছে ।

ইয়ুমথাং থেকে লা-চুং । সেই নদীর পাশে পাশে রাস্তা, গাছপালা পাখি, আপেল, কমলালেবুর বাগান, আলুর, বড় এলাচের, যবের খেত, পাথরের কাঠের বাড়ি, স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর প্রসন্ন মুখ । এখন পথ নেমে যাচ্ছে, বারো মাইল অতিক্রম করে ৮,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লা-চুং বাংলোয় আমরা অপরাহ্ন তিনটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম । টানা লম্বা বারান্দায় বসে বিকেলের পড়ন্ত রোদে চায়ের পট থেকে ঢালা দার্জিলিং চা ও কেকের প্লেট থেকে বিস্কুট খেতে খেতে লা-চুং নদীর কলধ্বনি শুনতে লাগলাম ও শান্ত হিমালয়ের

ছবি দেখতে লাগলাম । আকাশ ধূসর হয়ে আসছে, বাইরে বসে থাকলে বেশ ঠান্ডা । এবার ঘরের আশ্রয়ে প্রবেশ করতে হবে ।

তার পরদিন চুং-থাং, যেখানে লা-চুং নদী গিয়ে পড়েছে লা-চেন নদীতে । এই সঙ্গমে আমরা দ্বিতীয়বার এসে পৌঁছলাম । পাঠকের মনে পড়বে, বারো-তেরো দিন পূর্বে যাত্রার প্রথম পর্যায়ে, এখান থেকে আমরা পূর্বোত্তরমুখী লা-চেন অথবা তিস্তা নদীকে অবলম্বন করে উত্তর সিকিমের দিকে চলে গিয়েছিলাম । তারপর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের পর বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, শেষে লা-চুং নদীর অববাহিকা ধরে আবার সেই বিন্দুতে ফিরে এসেছি । এক বৃহৎ বৃত্তাকার গতিপথ ধরে আমাদের পর্যটনের শুরু ও শেষ এইখানে । যে তিস্তাকে বহুদূর ছো-লামো হ্রদের এককোণ থেকে নিঃসৃত ক্ষীণ ও মসৃণ জলধারার রূপ দেখে এসেছি, আবার তাকে এখানে পেয়ে গেলাম । এখন সে স্ফীতকায়া, মুখর গর্জনে পাহাড়ি বনভূমি কেটে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে ।

চুং-থাং থেকে সিংঘিক, সেখান থেকে দিক-ছু, সেখান থেকে গ্যাংটক । তিনটি দীর্ঘদিনের পর্যটন, আবার জঙ্গল, জোঁক ভাঙা রাস্তা, ভাঙা সাঁকো । কিন্তু এখন আমরা প্রত্যাবর্তনের মুখে, পিছনে সফল অভিযাত্রার উত্তপ্ত স্মৃতি । গ্যাংটকে পৌঁছে নোরবু ও অন্যান্য পোর্টারদের তাদের সব প্রাপ্য ও পারিতোষিক মিটিয়ে দিয়ে, বেঁচে যাওয়া রসদপত্র বিতরণ করে ও অনেক ধন্যবাদ দিয়ে নিয়ে আমাদের পদযাত্রা সমাপ্ত হল । তার পরদিন শিলিগুড়ি স্টেশনে শান্তি ঘোষের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল, সে চলে যাবে কলকাতায়, আমি আর পার্থ জলপাইগুড়িতে ।

তখনও পুজোর ছুটির কয়েকদিন অবশিষ্ট আছে । বিশুদ্ধ আলস্যে, পায়জামা-পাঞ্জাবি মাছের ঝোলভাত ও দিবানিদ্রায় সে কয়েকদিন কাটল । এবার ডার্করুমে প্রবেশ করতে হবে, একগাদা সাদা-কালো ফিল্ম অপেক্ষমাণ রয়েছে, সেগুলির ডেভেলপ প্রিন্ট করে ফলাফল দেখবার জন্য উৎসুক আছি । রঙিন কোডাক্রোম ৩৫ মিলিমিটার স্থিরচিত্র ও ১৬ মিলিমিটার চলচ্চিত্র মুম্বইতে পাঠিয়ে দিয়েছি, তৈরি হয়ে ফিরে আসতে মাসখানেক লাগবে । এবার আরেকটা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, সাদা-কালো ছবির এনলার্জমেন্ট । সন্ধে হতে না হতে ডার্করুমে ঢুকে পড়ি বাছাই করা নেগেটিভ নিয়ে, বড় বড় এনামেলের ট্রেতে বিবিধ সলিউশন তৈরি করি, এনলার্জারে নেগেটিভ পরিয়ে ছবির ছায়া সাজাই, ১০ ১২ ইঞ্চি ক্লোরো ব্রোমাইড কাগজে যখন ছলছলে ডেভেলপারের মধ্যে ফুটে ওঠে তখন ঘরের আবছা লাল আলোয় সেসব ছবি দেখে আরেকরকমের আনন্দ অনুভব করি । গাছের ফাঁকে তিস্তা, বাঁকা বনপথে চলমান তিব্বতি দম্পতি, ইয়ুমথাং বাংলোর পিছনে তীক্ষ্ণ তুষারশৃঙ্গের সার, গুরুদোংমার হ্রদে প্রতিফলিত যুগ্ম তুষারশৃঙ্গ, কালো আকাশ ছেয়ে

কাংচেনজাউয়ের শ্বেত তুষার বিস্তৃত । কাজ করতে করতে রাত বারোটা-একটা বেজে যায় । ডাকাডাকির পর ক্লান্ত, গলদঘর্ম, সুখি, বেরিয়ে আসি ।

রঙিন ছবিগুলোও এল । দেওয়াল জোড়া বর্ণাঢ্য প্রতিচ্ছবি । চলচ্চিত্র কাটা, সাজানো, টাইটেল যোগ করা । তারপর একদিন জলপাইগুড়ির ইন্ডিয়ান টিপ্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বড় অডিটোরিয়ামে সেই একঘণ্টার ডকুমেন্টারি 'Trek to North Sikkim'-এর মুক্তি । তারপর দার্জিলিংয়ের টাউন হলে, কালিম্পংয়ের গ্রেহামস হোমে ও অন্যত্র ।

এর মাঝে মাঝে পার্থ রায়ের সঙ্গে বসে জল্পনা কল্পনা হয় সামনের বছর কোথায় যাওয়া যায় । কলকাতা থেকে শান্তি ঘোষের চিঠিতে প্রস্তাব আসে এবার কাং-লা পেরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম পাদভূমি ধরে শেরপাদের দেশ থাংবোচিতে চলে গেলে কেমন হয় । কাঞ্চনজঙ্ঘার এই পশ্চিম সানুদেশ তখনও অনেকাংশে অনাবিষ্কৃত, তার ফটোগ্রাফ নিয়ে ফিরতে পারলে, থাংবোচে থেকে এভারেস্ট মাকালু লোৎসে আমা-দাবলাম ইত্যাদি তুষারশৃঙ্গের নিকট দৃশ্য দেখে আসতে পারলে একটা সার্থক কাজ হবে । কিন্তু যদি বা শারীরিক সামর্থের ওপর ভরসা রাখতে পারি, আবার একবছরের মধ্যে এই অভিযাত্রার খরচ কী করে সংগ্রহ করব? পোর্টার রসদ ফটোগ্রাফির সামগ্রী মিলিয়ে ন্যূনতম যা খরচ হবে বুঝতে পারছি, তা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত । তিস্তা অভিযাত্রার খরচে তো কাহিল হয়ে বসে আছি । হবে না । শান্তি, পার্থ রায়, আমি অতিশয় দুঃখিত চিত্তে মেনে নিয়েছি যে সামনের বছর বড়সড় কোনও অভিযাত্রা সম্ভব হবে না ।

তবু টাইমটেবিলের ভ্রমণ চলতেই থাকে । ম্যাপ, ফটোগ্রাফ, দেশি-বিদেশি বই ও পত্রিকার ওপর ঝুঁকে পড়ে অধিকাংশ অবসর কাটাই । দার্জিলিংয়ে ট্যুরে গিয়ে জিমখানা ক্লাবের লাইব্রেরিতে, আলপাইন ক্লাবের স্থানীয় সেক্রেটারি জিল হেন্ডারসনের বাংলোয়, মণি সেনের স্টুডিওতে, তেনজিংয়ের নতুন কেনা বাড়িতে কৃষ্ণমূর্তি, তেনজিংয়ের বিশিষ্ট বন্ধু রবি মিত্র, আমি ও অন্যান্য উৎকেন্দ্রিক কিছু ব্যক্তি মিলিত হয়ে কাল্পনিক হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে পড়ি ।

তেনজিং যে বাড়িটি কিনেছে সেটি স্যার যদুনাথ সরকারের ছিল । দার্জিলিং শহরে পৌঁছনোর কিছু পূর্বে কার্ট রোড থেকে টোঙা রোড নামে একটি চওড়া রাস্তা উঠে গিয়ে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলের ঠিক নিচে অকল্যান্ড রোডে গিয়ে পড়েছে । নির্জন রাস্তা, সুদীর্ঘ বর্ষীয়ান ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছের ছায়ায় ঢাকা । এই রাস্তার ধারে স্যার যদুনাথ একটি অতি মনোরম সবুজ ঢেউটিনের ছাদবিশিষ্ট দোতলা সুইসশ্যালে জাতীয় বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন । কালক্রমে স্যার যদুনাথ চলে গেলেন, আর সব বাসিন্দারাও যথানিয়মে

দার্জিলিং থেকে অপসৃত হলেন। তারপর ১৯৫৪ সাল থেকে এই বাড়ি তেনজিংয়ের। তখন সে এভারেস্ট বিজয় করে ফিরেছে, কিছু টাকা পেয়েছে। রবি মিত্র ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় এই বাড়ি কিনে, মেরামত করিয়ে তেনজিং, তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও দুয়েকটি অনুগত শেরপাদের নিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। দেশবিদেশ থেকে যেসব সামগ্রী উপহার পেয়েছে এবং পাচ্ছে, সেসব সাজানো-গোছানো হচ্ছে, ছবির মোটা মোটা অ্যালবাম। গোছা গোছা চিঠির ফাইল। ক্রমশ এই বাড়িটি যেন একটি মিউজিয়াম হয়ে দাঁড়াল। বহু লোক তেনজিং ও তার বাড়িটি দেখতে আসে। বিনম্র, স্মিতমুখ ও স্বল্পবাক তেনজিং তাদের সব দেখিয়ে বেড়ায়, প্রশ্নের জবাব দেয়।

১৯৭১ সালে আমার শেষবার দার্জিলিং যাওয়া। তেনজিংয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বার্চহিলে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে গেলাম। তখন আমার বয়স পঞ্চান্ন, তেনজিংয়ের আটান্ন। তখন সে অত্যন্ত সজীব ও সুঠাম, মেদহীন শক্ত শরীর। সিনিয়র ছাত্রদের নিয়ে জোংরি, লোহনক, সেবুলা অঞ্চলে ট্রেনিং দিতে যায়। অনেক গল্প হল, অনেক কাপ চা। অতি সম্প্রতি তেনজিংকে শেষ দেখলাম, তার মৃত্যুর পর টেলিভিশন পর্দায়। তার দেওয়া একটি আইস-এক্স এখনও আমি অতি সযত্নে রক্ষা করছি।

ভ্রমণ নভেম্বর, ১৯৯৫

সাইলে. ভ্যালি

শিবনাথ বসু

সারা পৃথিবীতে হাতে গোনা যে কটি রেনফরেস্ট আছে সাইলেন্ট ভ্যালি তার অন্যতম । দক্ষিণ ভারতের এই বনের বয়স নাকি পঞ্চাশ লাখ বছর । মানুষের জন্মের বহু আগে এই অরণ্য তিল তিল করে তৈরি হয়েছিল । সাইলেন্ট ভ্যালি ছাড়া পঞ্চাশ লাখ বছরের অরণ্য সারা পৃথিবীতে মাত্র ওই চারটেই আছে । এই ভ্যালিতে এমন ধরনের গাছ আছে যা সারা পৃথিবীতে একটাই । হাজার-লক্ষ বছরের ফসিল, পোকামাকড়, জীবজন্তুর আশ্রয় এই সাইলেন্ট ভ্যালি । জীবন্ত এক গবেষণাগার বললেও ভুল বলা হয় না । তবে এই সাইলেন্ট ভ্যালিতে কেউ যায় না ।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই একদিন ভিড়ে পড়ি একটা নেচার সংস্থার সঙ্গে । বিপদসঙ্কুল এই পথে কী হতে পারে বা কী হয় না জেনেই রাজি হয়েছি । ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মাদ্রাজ থেকে নীলগিরি এক্সপ্রেসে কোয়েম্বাটুর হয়ে মেট্টুপোলিয়াম এলাম । তারপর টয়ট্রেনে উটি বা উটকামন্ড । সাহেবদের আদরের নাম এখন হয়ে গেছে উধাগামণ্ডলম । দক্ষিণের জনপ্রিয় শৈলশহর । পূর্ব ও পশ্চিমঘাটের সংযোগ জুড়ে নীলগিরি । ধূসর খামে মোড়া নীলগিরির তামিলনাড়ুতে এই উটি । লাভাডেল, ওয়েলিংটন সব সাহেবি স্টেশন পার হয়ে নীল রঙের টয়ট্রেনে চেপে নীলগিরির পথে শেষে কুন্নুর হয়ে উটি বা উধাগামণ্ডলম । উচ্চতা ২,২৪০ মিটার । হাল্কা ঠান্ডা । উটি আমাদের আসতে হয়েছে ডি এফ ও নীলগিরি সাউথ ডিভিশনের কাছ থেকে সাইলেন্ট ভ্যালি যাবার অনুমতিপত্র নিতে । কথা বলতে হবে ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের সঙ্গে । কলকাতা থেকে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল অনুমতিপত্রের জন্য । কিন্তু কিছুই উত্তর পাওয়া যায়নি । সাক্ষাতে সব বুঝিয়েও শেষরক্ষা হল না । আমাদের পরিকল্পনা ছিল, আমরা তামিলনাড়ু থেকে সাইলেন্ট ভ্যালিতে ঢুকব । তারপর সিসপারা পাস পার হয়ে কোর এরিয়ার পথে । শেষে কেরালার মুককালি দিয়ে পালঘাট । ওদের মতে, সাইলেন্ট ভ্যালিতে কারোর যাওয়া উচিত নয়, কারণ, প্রথমত, সাইলেন্ট ভ্যালিকে বলা হয় ল্যান্ড অব কিং কোবরা । দ্বিতীয়ত, এখন ফায়ার থ্রেট পিরিয়ড অর্থাৎ আগুন লাগার সময় । অনুমতিপত্র দেওয়া যাবে না । কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা । তিনদিন ধরে উটিতে চলল নানান কথাবার্তা । শেষে আমাদের অদম্য ইচ্ছে দেখে যেখান থেকে সাইলেন্ট ভ্যালির কোর এরিয়া দেখা যায় সেই সিসপারা পাস পর্যন্ত

যাবার অনুমতি মিলল । আর অনুমোদিত গাইড নিতে হবে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের- এই শর্তে । কিন্তু মুশকিল হল, গাইড বা পোর্টার কেউই ওই পথে যাবে না । অন্য বনে যাবে কিন্তু সাইলেন্ট ভ্যালিতে নয় । আরও একদিন কেটে গেল । কিন্তু গাইড জোগাড় হল না । যাই হোক, শেষে একজন গাইডের খোঁজ পাওয়া গেল । নাম মিঃ শিলভন । কেরালা খ্রিস্টান । কথাবার্তা ইংরিজিতেই । শিলভন সাহেবদের সঙ্গে সার্ভে করার সময়ে সাইলেন্ট ভ্যালিতে ছিল । পরে পুনার একটা সমীক্ষা দলকেও ওই পথে নিয়ে গিয়েছে । তিনজন পোর্টার সঙ্গে করে ও কাল আসবে । সকালে কাঁচা বাজার, চাল-ডাল সব কেনা হল । উটি রেলস্টেশনের কাছেই বাসস্ট্যান্ড । আমরা যাব আপার ভবানী । একটাই বাস বিকেল সাড়ে তিনটেয় । ঘণ্টাচারেক সময় নেয় । কিছুক্ষণ বাসের জন্য লাইনও দিতে হল । নীলগিরির বিস্তীর্ণ চা-কফি বাগান পেরিয়ে এক আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে সন্ধে সাড়ে সাতটায় আপার ভবানীতে বাস এসে থামল । হাজার পাঁচেক ফুট উচ্চতা আপার ভবানীর । কনকন করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে আপার ভবানী পাহাড়ের ওপরে । সামান্য দু-চার ঘর মানুষের বাস । সবই মোটামুটি বনদপ্তরের । বাসস্ট্যান্ড থেকে গেস্টহাউসটা একটু দূরে । আমরা ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের একজনের কোয়ার্টারে উঠলাম । খরচ নেই । আর রান্না তো নিজেরাই করব । রাতটুকু ওখানে কাটিয়ে সকাল ৮টায় শুরু হল তামিলনাড়ুর দিক থেকে সাইলেন্ট ভ্যালির পথে ট্রেকিং । ভবানী নদীর বাঁধের ধারে আপার ভবানীর গেস্টহাউস । দারুণ জায়গা । গেস্টহাউসের ভেতর দিয়েই চলে গেছে সাইলেন্ট ভ্যালির রাস্তা । গার্ড পারমিশন দেখতে চাইল । এছাড়া ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশমূল্য ছাড়াও ক্যামেরা বাবদ কিছু দিতে হয়েছে । নীলগিরি সাউথ ডিভিশনের ১৭৫ টাকার একটা রসিদ ছিল । কতদিন থাকব ওতে বলা আছে । সবকিছু দেখে বাঁধের ছবি না তুলে এগিয়ে যেত বলল আমাদের ।

শুরু হল পথ চলা । প্রথমদিকের জঙ্গল পর্ণমোচী । পাহাড়ি জঙ্গলের নৈসর্গিক দৃশ্য । কিছুটা রুক্ষ । ফেব্রুয়ারিতে ঝরাপাতা উড়ছে চারধারে । সিগারেট খাওয়া একেবারেই বারণ । আবহাওয়া বেশ মিষ্টি । অনবরত পাখির ডাক । কাঁচা রাস্তায় মাঝে-মধ্যে হাতি আর বাঘের পায়ের ছাপ । যদিও সিসপারা পাস পার হলেই মূল সাইলেন্ট ভ্যালি শুরু । অরণ্য ক্রমশ গভীর হচ্ছে । হঠাৎ আস্তে আস্তে সব কুয়াশায় ঢেকে গেল । কিছুই দেখা যাচ্ছে না । হোয়াইট আউট । গা ছমছম করা পরিবেশ এক মুহূর্তেই যেন তৈরি হয়ে গেল । ওরই মাঝে এক রুক্ষ পাহাড়ের কোলে ভবানীপূজা নামে এক জায়গায় থেমে মধ্যাহ্নভোজন । আস্তে আস্তে আবার কুয়াশা কেটে গেল । বেশ পরিষ্কার জায়গা । রান্না হবার ফাঁকে জানলাম কলকাতা থেকে একটা দল একবার সিসপারা পাস পর্যন্ত যাবে বলে এসেছিল । এখানে এক চিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । তাদের

মধ্যে থেকে একজনকে পাওয়া যায় প্রায় তিনদিন পর । পথ হারিয়ে প্রায় তিনদিন তিনি ছিলেন জঙ্গলে ।

খাওয়ার পর আবার পথ চলা । আমরা আজ প্রায় ১৭ কিলোমিটার যাব । জায়গার নাম নাড়ুগানি । ঘনঝোপ আর গুল্মজাতীয় গাছ পেরিয়ে চলা । অসংখ্য ঝোপঝাড় । বেশ চলতে অস্বস্তি হচ্ছে । জানি না চিতার গল্প শুনে কিনা । ঘণ্টাআষ্টেক হাঁটা হয়ে গেল । শেষে এক বিশাল বুশ এরিয়া পেরিয়ে সবুজ ভ্যালি । সামনেই নাড়ুগানি পিক । আজ এখানেই শেষ । রাস্তা ছেড়ে শিলভন মালপত্তর সব বুশের ভেতর নিয়ে গেল । বলল, বাইরে জানোয়ার চলার সোজা রাস্তা । তাই আমরা একটু বুশের ভেতরেই থাকব জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে । টেন্টও এখানে ফেলতে সুবিধা । আর আমরা পাথরের তলায় আগুন জ্বালব । রান্না করব । রাতে অবশ্য শোব না । ওখান থেকেই আপনাদের পাহারা দেব ।

দূরে কয়েকটা সম্বর দেখতে পেলাম । আকাশ লাল হচ্ছে । শিলভন কফি আর চিঁড়েভাজা দিয়ে গেল । কফি মুখে দিতেই দেখি একটু দূরে ঘন ঘাসের ভেতর দিয়ে একটা কিং কোবরা এগিয়ে যাচ্ছে । মুখের কফি মুখের ধারেই ঠান্ডা হল । আস্তে আস্তে বনে অন্ধকার নামল । কী ঘন অন্ধকার । অদ্ভুত অদ্ভুত সব আওয়াজ । সজোরে হঠাৎ এক বার্কিং ডিয়ারের ডাক । কর্কশ আওয়াজ । আগুনের ফাঁকে রাতের খাওয়া সারা হল । ঝিঁঝি থেকে শুরু করে নানান পোকামাকড়ের সিম্ফনি । গাছের পাতার আওয়াজ । ঝরাপাতা উড়ে যাওয়ার আওয়াজ । রাত যত বাড়তে লাগল তত শব্দের বৈচিত্র । মাঝে মধ্যে চিতার ডাক । হঠাৎ বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ । শিলভন চিৎকার করে বলে উঠল, ওয়াইল্ড বোর স্যার ।

বিনিদ্র রজনীর যথারীতি শেষ হল । আজ আমরা সিসপারা পাস পার হয়ে সাইলেন্ট ভ্যালির কোর এরিয়াতে পড়ব । সবাই চললাম একসঙ্গে । গাছপালা ক্রমশ কমে আসছে । দূরে নীলগিরির সব অচেনা-অজানা পাহাড় শৃঙ্গ । ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া । কুয়াশা । সিসপারা শৃঙ্গের রিজে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে সকাল দশটা । একপাশে একদম গাছপালা নেই । ন্যাড়া । আরেক পাশে ঘন সবুজে মোড়া গভীর বন । মাঝে ফায়ার লাইন । ঘাস উপড়ানো রাস্তার মতো । যাতে আগুন লাগতে না পারে । আমাদের পারমিশন কতটা ভুলে গেছি । মন্ত্রমুগ্ধের মতো বনের দিকে এগিয়ে চলি । ঘন নিকষ অন্ধকার দিনেরবেলাতেও । নানারকমের পোকামাকড়, পাখি, ফুল ফাংগাস । একটা অদ্ভুত রকমের পোকা দেখে ঝোপ ঠেলে ক্যামেরা বার করেছি, শিলভন বারণ করল । বলল, জায়গাটা ভিজে হওয়ায় পোকামাকড় ভয়ে কামড়ে দিতে পারে । আর বুশের মধ্যে পা জড়িয়ে গেলে দেখে নেবেন সাপ কিনা । অবশ্য সাপ এমনিতে কামড়ায় না ভয় না পেলে । কিং

কোবরার তো মাত্র ১২ মিলিলিটার বিষ আছে । ও সঙ্গে সঙ্গে চুষে বার করে দেব । ভয় পাবেন না ।

সব ভীষণ চুপচাপ । আমরাও কথা বলছি না, মানে বলার কিছু নেই । হঠাৎ একঝাঁক লায়ন টেল ম্যাকাক দেখলাম । আবার পথ চলা । হঠাৎ রাস্তার ধারে এক টাস্কার । একলা ওই বিরাট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এত কাছ থেকে হাতি ভাবতেই পারি না । ক্যামেরায় হাতটা আপনিই উঠল । হাতিটা আমাকে ভালো করে দেখলও না । শিলভন হেসে বলল, জঙ্গলের জীবজন্তুকে একদমই ভয় নেই । বরঞ্চ সত্যিকারের ভয় জঙ্গলে হঠাৎ দেখা মানুষকে । গন্ধ শুঁকে শিলভন বলতে পারে সামনে কোনও জন্তু-জানোয়ার আছে কিনা । দুপুরের রান্না শুরু করার সময় এল তেড়ে বৃষ্টি । থামার লক্ষণ নেই । অগত্যা ওখানেই রাত কাটানো । শিলভনের ইচ্ছে ছিল ওই দিন ২৪ কিলোমিটার বালাকাড পর্যন্ত হাঁটব । তা আর হল না । যাহোক করে প্লাস্টিক বেঁধে রাত কাটানো । পরদিন ভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় আবার হাঁটা শুরু ।

বালাকাড আসার একটু আগে হঠাৎ নজরে আসে একটা ক্যাম্প । কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পারমিশন দেখতে চাইলেন । কাগজপত্র বার করা হল । দেখে বললেন, এই পারমিশন তো সিসপারা পাস পর্যন্ত । ক্যাম্পের ভেতরে চলুন । ডি এফ ও-র সঙ্গে কথা বলতে হবে । ডি এফ ও প্রথমেই আমাদের এগনো বন্ধ করে ফিরে যেতে বললেন । বনদপ্তরের চিঠি, পরিবেশমন্ত্রীর শুভেচ্ছা থেকে নানান কাগজপত্র দেখিয়ে শেষে ডি এফ ও আমাদের এগোতে বলেন । তবে মুককালিতে যেন অবশ্যই রিপোর্ট করি । আমরা ভাবতেই পারিনি, আর যাওয়া হবে ।

আজ আমরা যাব বালাকাড থেকে পুচিপারা । ভীষণ জঙ্গলের রাস্তা । মাঝে কুন্তী নদী পেরোতে হবে । ওই নদীতে অসংখ্য জোঁক । মোজা খুলে খালি পায়ে নদী পার হয়ে দেখি পা রক্তে ভেসে যাচ্ছে । অনেক কষ্ট করেই জোঁক ছাড়ানো হল । তারপর আবার পথ চলা । ওই জঙ্গলেই রাস্তা । শেষে পাহাড়ি পথ, যদিও এখন জঙ্গল খানিকটা কম । বালাকাড থেকে পুচিপারা ১৭ কিলোমিটার ।

দুপুরের পর পুচিপারাতে এসে পৌঁছলাম । আজ এখানেই বিরতি । বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার । ঘন কালো মেঘ সারা আকাশে । এখানেও ছোট্ট একটা ফরেস্ট ক্যাম্প হয়েছে । ফরেস্ট গার্ডরা ওয়ারলেসে জেনে গেছে আমরা আসছি । তাই একটা ঘর খালি করে রেখেছে । বৃষ্টি থামার পর দেখি সাইলেন্ট ভ্যালির বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ।

মেঘে ভরা আকাশ । ক্যাম্পটার সামনে পরিখা কাটা । তাই ক্যাম্প থেকে একটা ইজিচেয়ার নিয়ে বসতেই মনে হল জীবনে এমন মুহূর্ত একবারই আসে । এই পুচিপারা

থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে সৈরিন্ধ্রি । আজ খুব ভোর ভোরই চলা শুরু হল । মাত্র ৭ কিলোমিটার যাব । কুন্তী নদীকে তিনবার পার হয়ে অপূর্ব আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে এলাম সৈরিন্ধ্রি । এখানে সুন্দর একটা গেস্টহাউস আছে । সাইলেন্ট ভ্যালি কেরালার ম্যাপে একটা ট্যুরিস্ট স্পট । সৈরিন্ধ্রি থেকেও সাইলেন্ট ভ্যালির কোর এরিয়া দেখা যায় । তাই অনুমতিপত্র কেরালার মুককালি থেকে সৈরিন্ধ্রি পর্যন্ত চেষ্টা করলেও পাওয়া যায় । প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ অনেকে এই পর্যন্ত আসেন । সৈরিন্ধ্রি পৌঁছে ব্রেকফাস্ট সেরে গেলাম কুন্তী নদীতে । এই কুন্তী নদীর ওপরই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার জন্য বাঁধ দেওয়া শুরু হয়েছিল অমূল্য সব বনসম্পদ ডুবিয়ে । প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার আন্দোলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই প্রকল্প বাতিল করে ১৯৮৪ সালে সাইলেন্ট ভ্যালিকে ন্যাশনাল পার্কের মর্যাদা দেন । সৈরিন্ধ্রি থেকে আমরা ফিরব মুককালিতে । প্রায় ২২ কিলোমিটার রাস্তা । ঘন বন ছেড়ে আবার আমরা পর্ণমোচী জঙ্গলে পড়ব । জিপও এই রাস্তাতে চলে । আমরা হাঁটা শুরু করি । ঝরাপাতা চারপাশে উড়ছে । চারদিকে বোর্ড, ফায়ার থ্রেট পিরিয়ড, বি কেয়ারফুল । এটা হল আট্টাপারি রিজার্ভ ফরেস্ট । মুককালির কিছু আগে কুরুম্বাস আদিবাসীদের বাস । এই কুরুম্বাসরা আগে ঘন জঙ্গলের মধ্যেই বাস করত গাছের কোটরে । একেকটা গাছ আছে যার কোটরই হল একেকটা গুহার মতো । কিন্তু এখন ওদের সরিয়ে আনা হয়েছে মুককালির কাছে । সরকার থেকে ঘরদোর করে দেওয়া হয়েছে । রাস্তা থেকে ২০০ ফুট নিচে কুরুম্বাস কলোনি । ছবি তুলব বলে ঘুরে এলাম একবার । শেষে মুককালি । ডি এফ ও অফিসে গিয়ে লিখে আসতে হল আমরা নিরাপদে ফিরে এসেছি । মুককালির চেকপোস্টের ধারেই গেস্টহাউস । রাতটুকু এখানে কাটিয়ে আজ আমরা ফিরে যাব । ৯টায় বাস । প্রথমে মান্দারঘাট । ওখান থেকে পালঘাট ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

সাইলেন্ট ভ্যালি যাবার অনুমতির জন্য লিখতে হবে একইসঙ্গে দুজায়গায়:

(১) ডি এফ ও , সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক, পোঃ মান্দারঘাট, জেলা-পালঘাট । কেরালা-৬৭৮ ০০৯ । (২) ডি এফ ও, নীলগিরি সাউথ ডিভিশন, উটি-৬৪৩ ০০১, তামিলনাড়ু ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

মির্জা শেখ ইতেসামুদ্দিনের বিলেত যাত্রা এবং আমি

নবনীতা দেব সেন

সেদিন আশ্চর্য একটা খবর আবিষ্কার করেছি-এই খবরটি জেনে অবধি আমার উত্তেজনার শেষ নেই! আমি তো জানতাম বিলেতে প্রথম ভদ্রলোক ভারতীয় ভ্রমণকারীর নাম রাজা রামমোহন রায় । তার আগে আগে যাঁরা গেছেন তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে যাননি । তাঁরা গিয়েছেন লস্কর হয়ে, বিদেশি জাহাজের সঙ্গে, পর্তুগিজ, ফরাসিদের কর্মচারী হয়ে । স্বাধীন ভ্রমণকারীর পরিচিতি তাঁদের ছিল না ।

কিন্তু এই বইটা হাতে পড়ল, সদ্য বেরিয়েছে-আর আমার সব ধারণা পাল্টে গেল । রাজা রামমোহন তো গেছেন ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩; তাঁর অনেক বছর আগেই আরও একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ এই বঙ্গদেশ থেকেই ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপে পদার্পণ করেছিলেন সেই ১৭৬৬তে! এক নয়, দুই নয়, প্রায় তিন বছর ধরে তিনি ইউরোপ, ইংল্যান্ড ঘুরে বেড়িয়েছেন-প্রাণ ভরে বিদেশি সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, বিজ্ঞান-সব কিছুই বুঝতে, জানতে চেষ্টা করেছেন । সবার ওপরে, সেদেশের মানুষদের সঙ্গে হার্দিক সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন তিনি-শুধু বৌদ্ধিক পরিদর্শনেই শেষ হয়ে যায়নি তাঁর ভ্রমণ । এবং ফিরে এসে একটি চমৎকার বই লিখেছিলেন ফারসি ভাষায় । আমাদের জন্য-‘বিলায়েতনামা’ । সেই বইয়ের সরল ইংরিজি অনুবাদ হয়েছে এতদিনে-ভাগ্যিস, তাই তো আমরা জানতে পারলাম যে নদীয়া জেলার পাঁচনূর গ্রামের তাজুদ্দিনের পুত্র ইতেসামুদ্দিন ‘মির্জা শেখ ইতেসামুদ্দিন’ হয়ে উঠেছিলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে নানা ধরনের দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত থেকেছেন সারা জীবন । এবং সসম্মানে সে সকল দায়িত্ব পালনও করেছেন । কেবল একটি কাজেই তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি! এবং সেজন্য তাঁর হৃদয়ে ক্ষোভের অন্ত ছিল না । যদিও এই না-পারার দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণই লর্ড ক্লাইভের ।

ভারতের মুঘল বাদশা শাহ আলম লর্ড ক্লাইভের কাছে সৈন্য ধার চেয়েছিলেন তাঁর রাজ্য শাসনে নানা বিঘ্ন ঘটছিল বলে । ক্লাইভ বললেন, সৈন্য সাহায্য করবার ক্ষমতা তো তাঁর নেই । সেটা শুধু ইংল্যান্ডের রাজার আছে । তিনি ভাবেননি বাদশার পক্ষে রাজার কাছে আবেদন পাঠানোর কথা ভাবা অসম্ভব নয় । বাদশা স্থির করলেন আবেদনপত্র পাঠাবেন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভেট সহ রাজা তৃতীয় জর্জের দরবারে । রবার্ট ক্লাইভ

ক্যাপ্টেন সুইনটনকে তাঁর সঙ্গী করে দিলেন-দুজনে মিলে রওনা হলেন রাজা তৃতীয় জর্জের উদ্দেশে। কিন্তু বিলেতে পৌঁছেও উদ্দিষ্ট কাজ তিনি করতে পারেননি। লর্ড ক্লাইভ তাঁদের শেষ মুহূর্তে জানালেন, আবেদনপত্রটি পেলেও টাকাটা হাতে আসেনি। তাই টাকাটা পাওয়া গেলে তিনি স্বয়ং আবেদনপত্র সমেত ইংল্যান্ডে যাবেন এবং ওঁদের সেগুলি অর্পণ করবেন। বাদশার খাজাঞ্চিখানা থেকে ইতেসামুদ্দিনকে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল এই যাতায়াতের খরচ বাবদ। অথচ যে জন্য যাত্রা, সেই কাজই হল না। ক্লাইভ পরে এসেছিলেন কিন্তু আবেদনপত্রটি আনেননি। এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বাদশার নামটি না-করে নিজের পক্ষ থেকেই ভেট দিয়েছিলেন।

এই ঘটনায় ইতেসামুদ্দিন যারপরনাই বিচলিত বোধ করেছিলেন এবং মনোদুঃখে ইচ্ছে করে এক বর্ণও ইংরিজি ভাষা শেখেননি। অক্ষরজ্ঞানও অর্জন করেননি। স্বদেশে ফেরার পরে এই নিয়ে তাঁকে কম গঞ্জনা শুনতে হয়নি! এত বড় সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয়? অতদিন ওদেশে থাকলে, এত ভালো ভাষাটা শিখে এলে না? কত সুবিধা হত!

ক্লাইভের কূটচালে তিনি মনোবেদনা পেয়েছিলেন। আসলে ক্লাইভের ইচ্ছে ছিল না কোনও মতেই ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে ভারতের মুঘল বাদশার কোনও যোগাযোগ স্থাপিত হোক! তাই তিনি আবেদনপত্রটি স্রেফ চেপে গিয়েছিলেন। তৃতীয় জর্জকে লিখিত শাহ আলমের সেই না-দেওয়া চিঠিটি এখনও সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

ক্লাইভের নীচতা ও শঠতায় বিড়ম্বিত বোধ করলেও ইতেসামুদ্দিন সাধারণভাবে ইংরেজ জনসাধারণের আচার ব্যবহার, সৌজন্য-সহৃদয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল কোনও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রমণ কথা পড়ছি। ওই যুগটি ছিল ভ্রমণের। নিত্যনতুন সংস্কৃতি, নিত্যনতুন শিল্পজগৎ আবিষ্কারের-পৃথিবী প্রত্যেক দিন বড় হয়ে উঠছিল। ইউরোপীয় বণিকরা সেই ১৫-১৬ শতক থেকে নতুন নতুন দেশে যাচ্ছেন, নতুন মানুষ, নতুন জীবনপদ্ধতি শিখছেন-এ নিয়ে প্রচুর বইপত্র পড়েছি। কোনও ভারতীয়ের লেখা এ ধরনের বই কিন্তু আমার চোখে পড়ল এই প্রথম!

লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখ, উদার মনোভঙ্গি, সব কিছু নতুনকে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখা, কুসংস্কারের পিছনে লুকোতে চেষ্টা না করা-এগুলি আমাকে মোহিত করেছে। এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে তাঁর। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম নিয়ে বিশেষত নারী বিষয়ে ইসলামি মতামত নিয়ে ইতেসামুদ্দিন চমৎকার আধুনিকমনস্ক আলোচনা করেছেন। সে সব কথা অন্যত্র বলা যাবে, আজ কেবল

তাঁর সমুদ্রযাত্রাটুকুনি! আমরা তো বিহারীলাল দত্তের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী পড়েই মুগ্ধ হয়েছি, এ আরেক রকমের ।

১৭৬৬ জানুয়ারি মাসে হুগলি নদী থেকেই তাঁদের পালতোলা জাহাজটি ছেড়েছিল । চারদিন পরে গিয়ে পৌঁছল সাগরে । মোহনার তীরের কাছের জল নোনা-মিষ্টি মেশানো, যত দূরে যাওয়া যায়, জল তত নোনা, আর নীল । রাতে ঢেউয়ের মাথায় ফেনা ঠিক যেন প্রদীপের মতো জ্বলে । ইতেসামুদ্দিন লিখছেন, 'জ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীকে ঘিরে আছে ককেশাস নামে উজ্জ্বল নীল রঙের সুউচ্চ পর্বতমালা, আকাশের নীল রংটি তাদের শিখরের কাছেই ধার নেওয়া, নইলে আকাশ মূলত কাচের মতো স্বচ্ছ । আর সমুদ্রের নীল তো আকাশেরই প্রতিবিম্ব মাত্র ।'-তার প্রমাণ? অঞ্জলিতে যদি সমুদ্রের জল কোষ করে ধরা যায় তখন দেখব জলের কোনও রং নেই । আর সমুদ্রের যে লবণ স্বাদ? সেটা সমুদ্রগর্ভ থেকেই আসে । ইতেসামুদ্দিন লিখছেন, সমুদ্রের বাতাস সুস্থ লোকের পক্ষেও ভালো, অসুস্থের পক্ষেও । তারপর বলছেন নিজের কথা । জাহাজে ওঁর কোনওই অসুখ-বিসুখ করেনি, একবারই শুধু পৈটিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল । সেটা কেবল ইসবগুলের শরবৎ খেয়েই ঠিক হয়ে গেছিল । তারপর পাঠকের মঙ্গল কামনায় ইসবগুলের শরবৎ প্রস্তুত প্রণালীটাও জানিয়েছেন । (ওই আমরা যে প্রণালীটি জানি, সেটাই । কোনও বাদশাহী অভিনবত্ব নেই বা হেকিমি কায়দা!)

সমুদ্রের নীল রং নিয়ে আমারও খুব কৌতূহল ছিল-খুবই অবাক লেগেছিল, প্রথম যখন সমুদ্রকে দেখি । অবিকল ইতেসামুদ্দিনের মতোই দুহাতের অঞ্জলিতে সমুদ্র নিয়ে, দেখেছিলাম তার জলও কলের জলের মতোই স্বচ্ছ, নিরঙা । এটা সমুদ্রের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছিল আমার ।

'-এ মা! নীল রঙের জল নয়, এমনি-ই?' মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । আমি তখন চার বছরের । আর সমুদ্দুরটা ছিল মাদ্রাজের । সাদা ফেনাভর্তি ঢেউগুলো ঠিক যেন এক সারি সাদা তুলতুলে কুকুর ছানার মতো আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে মাথা ঘষছিল বালির ওপরে । আমার প্রথম সমুদ্র দর্শনের স্মৃতিচিত্র, অভিজ্ঞতা এই রকম ।

আর ইতেসামুদ্দিনের?

সমুদ্রের বিপুল বিস্তার, তার তলহীন গভীরতা, ইতেসামুদ্দিনের কাছে মনে হয়েছিল দৈব রহস্যের আধার । আল্লার অসীম সৃজনীশক্তিরই পরিচয় সমুদ্রের অনির্বাণ প্রাণশক্তিতে । এই সমুদ্রের কোলে পৃথিবী ভাসছে, যেন ছোট্ট একটি ডিমের মতো । মহা উৎসাহে তিনি জানিয়েছেন কম্পাস কী বস্তু, কীভাবে প্রস্তুত করা হয়, নাবিকদের তাতে কত সুবিধা

হয়েছে, আলেকজান্ডারের সময়ে কম্পাস ছিল না বলে তাঁদের কত বেশি ঝুঁকি ছিল । জাহাজ কতরকমের হয়? তাদের কী কী নাম? (প্রসঙ্গত জেনে রাখুন এক-মাস্তুল, দুই-মাস্তুল এবং তিন-মাস্তুল-এই তিন রকমের নৌকো হয় । তিন-মাস্তুলটিকেই বলে জাহাজ!) । বিভিন্ন বাতাসগুলি কোনটি কেমনভাবে বয়, নাবিকরা কীভাবে সেই বাতাসদের ওপরে নির্ভর করে জাহাজ চালনা করেন । তাঁদের কী কী ধরনের সমস্যা হয় । জাহাজ ঝড়বাদলে পড়লে অবস্থা কত ভয়াবহ হতে পারে । সব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি । এবং পশ্চিমী মানুষের নৌবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । তাঁদের অভিযানপ্রিয়তা ও দুঃসাহস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল । মাঝে মাঝে হাওয়া বন্ধ হয়ে স্রোত স্তব্ধ হয়ে যায় । তখন দু-তিন সপ্তাহ জাহাজ নড়ে না । শান্ত, স্থির হলে স্থবির হয়ে বন্দী থাকে । একবার এরকম হতে, ইতেসামুদ্দিন খুব ভয় পেয়েছিলেন, জাহাজের নট নড়ন-চড়নে । আর খুব অবাক হয়েছিলেন জাহাজের যাত্রীদের নির্ভাবনায় হৈ চৈ করা এবং মেয়েদের নিয়ে নাচগান হুল্লোড় দেখে । তাঁর মনে ভীতি ঢুকেছিল, ওইখানেই বুঝি বাকি জীবনটা কাটবে । আস্তে আস্তে জল, খাদ্য ফুরিয়ে যাবে । আর বুঝি কোনওদিনই দেশে ফেরা হবে না । কিন্তু সারেংদের, আর বাকি যাত্রীদের হাসিখুশি মনোভাব তাঁর মনে বল জুগিয়েছিল । এই দুঃসময় স্থায়ী হবে না হয়তো! মনে হয়েছিল ।

ইতেসামুদ্দিনের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা পড়তে পড়তে আমারও বালিকা বয়সে ইউরোপ ভ্রমণের ঘটনাগুলো স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে । তাঁর চেয়ে প্রায় দুশো বছর পরে আমার সেই যাত্রা । অনেক বদল হয়েছে পৃথিবীর-তবু অনেক দিক থেকে অপরিবর্তিত রয়েছেন ধরিত্রীও । এবং মানুষ, এবং জীবজগৎ ।

অনেক ধরনের সামুদ্রিক জলজন্তু, মাছের কথা লিখেছেন ইতেসামুদ্দিন । উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক এদিক থেকে লাফিয়ে জাহাজের ওদিকে পড়ছে, শীলমাছের দল নেচেকুঁদে জাহাজকে তাড়া করে সঙ্গে সঙ্গে আসছে একশো মাইল পথ । দুটো হাতির মতো বিশালবপু তিমি মাছ, তাদের নাক থেকে ফোয়ারা দিয়ে জলের ধারা আকাশে ঠিকরে উঠছে, এককেটা খেজুর গাছের মতো উঁচু হয়ে-কখনও জাহাজের আশপাশে কখনও জাহাজের তলা দিয়ে তিমি মাছেরা সাঁতরে যাচ্ছে-সেই সব গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ছিল ১৯৫০-এ স্কুলছাত্রী আমার বাবা মায়ের সঙ্গে প্রথম সমুদ্রযাত্রার কথা । উড়ুক্কু মাছ দেখে সেই প্রবল বিস্ময়-সত্যি সত্যি একঝাঁক মাছ আকাশে উড়ছে-জল থেকে উঠে উড়তে উড়তে আকাশ দিয়ে, আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, উড়ে গিয়ে খানিক দূরে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, উড়ুক্কু মাছের কথা শুনেছিলাম, ভেবেছিলাম কিংবদন্তি । কিন্তু এই দৃশ্য তো সত্যিকারের ম্যাজিক! আমি মুগ্ধ হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি জলের মাছ আকাশে

উড়ছে, জলপরীদের মতোই ডানাওলা কোনও ম্যাজিক মাছ, আমাদের দেখবে বলেই ওরা কৌতূহলে জাহাজের এদিক ওদিকে ওড়াউড়ি করছে নিশ্চয়!

আর ইতেসামুদ্দিন কী লিখলেন সেই আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে? তাঁর মতে, মাছগুলি নিশ্চয় 'ওড়ে' না, কোনওভাবে জলের কাঁপনে ভয় পেয়ে জাহাজের গতিপথ থেকে সরে যাবার জন্য শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, ঝাঁক বেঁধে আত্মরক্ষার চেষ্টায় । কানকো দিয়ে বাতাস কাটে! ওঁর চোখ বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের চোখ-আমার ছিল শিশুর কল্পনা ।

আর যে শূকরমুখো শীলমাছেদের কথা উনি লিখেছেন, যারা জাহাজকে তাড়া করে যেত আশি মাইল, একশো মাইল, তাদেরও দেখেছি আমি । তারা অবশ্য শীল মাছ নয়, ডলফিন । জাহাজের দুই পাশে এবং পিছন পিছন তারা ঝাঁক বেঁধে সাঁতরে চলে-ঠিক রাস্তায় মোটর গাড়িকে যেমন ধাওয়া করে কুকুরের পাল, তেমনই! শূকরমুখো শীলমাছদের আচরণে তাদের ডলফিন বলেই মনে হয় কেননা শীলমাছদের স্বভাব অন্য রকম । আমি তো শীলমাছও কম দেখিনি? ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রতীরে সেই বিখ্যাত 'সতেরো মাইল ড্রাইভ' আছে 'এল বামিনো রেয়াল' হাইওয়ের একটি অংশে-সেখানে দেখেছি শয়ে শয়ে শীলমাছ তীরে জড়ো হয়ে ভীষণ ঘেউ ঘেউ করছে, অবিকল কুকুরের মতো ডাক! ১৯৬৪তে সেই দৃশ্য প্রথম দেখি । জানি না এখনও ঠিক তেমনই আছে কিনা সেই নিশ্চিন্ত শীলমাছদের কলোনিটা ।

আরেকবার আরেক রকমের অবস্থা দেখেছিলাম শীলমাছেদের-আলাস্কায় সমুদ্রভ্রমণ করবার সময়ে ১৯৮৬তে । চারদিকে তুষারগিরি ভেসে আছে, গ্লেসিয়ারের পর গ্লেসিয়ার পেরোচ্ছি-এক জায়গায় দেখি বরফের দ্বীপপুঞ্জ ভাসছে-আর সেই দ্বীপপুঞ্জে গুচ্ছে গুচ্ছে মায়েরা অলস দ্বিপ্রহরে বাচ্চাদের স্তন্যপান করাচ্ছেন! হ্যাঁ, সত্যি কথা । শুধু সেই মায়েরা সবাই শীলমাছ-মা । তারা নিয়মিত ওই বরফের দ্বীপে উঠে এসে সন্তানপ্রসব করে ।-ঝাঁকে ঝাঁকে মা, ঝাঁকে ঝাঁকে শিশু, সকলেই খুব ব্যস্ত স্তন্যদানে ও স্তন্যপানে । আর এদিক-ওদিকে কিছু বিশাল ঈগলপাখি উড়ছে । তারা সেই আলাস্কার বিখ্যাত টেকো-ঈগল, যাদের মাথার মাঝখানটা সাদা, বাকিটা কালচে-খয়েরি । ঈগলপাখিরা এখানে কেন? ওরা কি তবে শীল-বাচ্চা খেতে এসেছে?

না, বাচ্চা খেতে নয়, ওরা খাচ্ছে প্রসূতির দেহনির্গত অন্যান্য আবর্জনা যত, প্লাসেন্টা ইত্যাদি । এ হচ্ছে প্রসূতি মায়ের গৃহিণীপনা-জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তো? খাদ্যও জুটবে ঈগলদের । সেই শীলমাছেদের আঁতুড় ঘরের অপরূপ দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিনি!

ইতেসামুদ্দিনের বর্ণনার তিমি মাছেরাও এখনও তেমনই আছে । যদিও শুনি জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে তিমি শিকার করে তিমির স্টেক খাওয়ার প্রচলন তাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । তিমি শিকার যদিও আইনত নিষিদ্ধ, তবু চোরাশিকারিরা আছেই । ক্রেতারও অভাব নেই ।

আলাস্কার সাগরে দেখেছিলাম (কিলার হোয়েল) খুনি-তিমিদের । তাদের পেটটা সাদা, পিঠটা কালো, শরীরটা অন্য তিমির তুলনায় ছোট লম্বাটে নয়, গোলগাল গড়ন, আর খুবই হাসিখুশি, আমুদে মনে হল তাদের । অনবরত বিপুল ডিগবাজি খাচ্ছে জাহাজের আশপাশে, সার্কাস দেখাচ্ছে যেন আমাদের । জাহাজ দেখে ভয়ের চিহ্ন নেই । বরং দেখানে-পনা দিব্যি আছে! নাম কিন্তু খুনি-তিমি ।

আর বিরাট দীর্ঘদেহী সৌম্য শান্ত-স্বভাব তিমিরাজদের দেখেছিলাম আটলান্টিকে-ফোয়ারার জল ফিনকি দিয়ে শূন্যে তুলছে নাক দিয়ে । সেবার টুম্পার সঙ্গে জাহাজে করে বস্টন হারবার থেকে তিমি-সন্দর্শনে গিয়েছিলাম । সে অন্য গল্প । তিমি দেখতেই সেই যাত্রা । ইতেসামুদ্দিন তো তা নয় । আলাস্কাতেও আমার উদ্দেশ্য ওটা ছিল না-যাচ্ছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় । তিমিদের পাড়া দিয়েই যাওয়া । শীলমাছদের অঞ্চলটাকেও কিঞ্চিৎ ছুঁয়ে যাওয়া-এই!

তুলনা চলবে না, ইতেসামুদ্দিনের মতো অ্যাডভেঞ্চার তো আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয় । তখনও বিজ্ঞান এরকম সর্ব-খর্ব করে দেয়নি, কলাজগতের বেশ মৌরসীপাট্টা ছিল জীবনে ।

নতুন নতুন দ্বীপের দিকে যাচ্ছিলেন ইতেসামুদ্দিন, আর সারেংদের মুখে শুনছিলেন নতুন নতুন গল্প । এও যেন সেই ইউলিসিসের জলযাত্রা! কত কি ভয়াবহ বিঘ্ন ছিল ওঁদের জলপথে! সাইরেনরা ছিল । দানবরা ছিল ।

মরিশাস, পেগু, মালাক্কা-এসব দ্বীপের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন নরখাদক জংলীদের কথা-এরা ছিল মালাক্কায় । তাদের পরনে পশুচর্ম, তারা নানারকম জড়িবুটির চিকিৎসা জানত, রক্তপাত বন্ধ করার, ক্ষতস্থান সুস্থ করে তোলার । কিন্তু জ্বর হলেই মুশকিল । অমনি তার পড়শিরা নাচ-গান সহকারে তাকে খতম করে । তার মাংসের অতি উপাদেয় কাবাব বানিয়ে গ্রামসুদ্ধু সবাই মিলে ফিস্টি করে । তার বাড়ির লোকেরাও নাকি তাতে যোগ দেয় । কী ভয়ানক!

আর মরিশাসে তিনি প্রচুর এন আর আইদের দেখেছিলেন । ওই ডিগ্রিটা তখনও তাদের ছিল না বটে, কিন্তু তারাই বোধহয় জগতের প্রথম এন আর আই-অভিবাসী

ভারতীয় । আঠারো শতকে যেমন ওলন্দাজদের কল্যাণে সুরিনাম দ্বীপেও প্রচুর ভারতীয় অভিবাসীর সৃষ্টি হয়েছিল । প্রভূত সংখ্যক ভারতীয় বিভিন্ন বিদেশি জাহাজে লস্করের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই একটি দল ফরাসি বণিকদের যুবতী ক্রীতদাসীদের বিয়ে করে সংসার পেতেছিলেন মরিশাসে । দেশে ফিরে আসার পরিকল্পনাও ছিল না তাঁদের-কেননা স্ত্রীরা তো আর কোনওদিন মুক্তি পাবেন না! এঁদের দেখে ইতেসামুদ্দিনের খুব মন খারাপ হয়েছিল, যদিও তাঁরা নিজেরা দিব্যি ভালোই ছিলেন । কোনও অভিযোগ ছিল না তাঁদের । এই মুসলমান সারেং ও লস্করেরা গিয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে । মুঙ্গের, ভেলোর, নদীয়া, শাহপুর এবং চট্টগ্রামের মোট সাতজন সারেঙের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল ইতেসামুদ্দিনের ।

এই চট্টগ্রামের সারেঙের কথা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল, আমার জীবনের প্রথম সমুদ্রযাত্রাতে উড়ুক্কু মাছই শুধু নয়, এক চট্টগ্রামের সারেঙের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল আমার ।

পি অ্যান্ড ও কোম্পানির জাহাজে বাবা-মার সঙ্গে বম্বে থেকে রওনা হয়েছি, জুন মাস, সাল ১৯৫০ । আরবসাগরে প্রবল ঢেউয়ে জাহাজ মোচার খোলার মতো নাচছে । বাবা দিব্যি সুস্থ, ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর শোভা সন্দর্শন করছেন । আমি আর মা আমাদেরা কেবিনে শুয়ে শুয়ে প্রবল বমি করছি । মাথা ঘুরছে । সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছি না । খাওয়া-দাওয়া তো দূরস্থান! শুনছি অধিকাংশ যাত্রীরই সেই দুর্গতি হয়েছে! অনশন দু-তিনদিন চলবার পরে বাবা কেবিনে একজনকে ধরে আনলেন । তিনি ওই জাহাজেরই সারেং । বয়স্ক বাঙালি, চট্টগ্রামের মানুষ । মাকে তিনি বললেন, মা কুনোও চিন্তা নেই, শুধু আমি যা দেই, খায়েন! তারপর খুব ঝাল ঝাল লাল লাল গরগরে শুটকি মাছের তরকারি আর ভাত এনে দিলেন আমাদের । তাঁদের নিজেদের রান্না, নিজেদের খাদ্য । সেই পথ্য খেয়েই আমাদের সি-সিকনেস সেরে গেল-সত্যি সত্যি! জীবনে আর কখনও ওরকম সুস্বাদু রান্না খাইনি । সেই চাচা আমাকে ঝাল ঝাল লেবুর আচার আর নোনতা বিস্কুট দিয়েছিলেন, যখনই একটু গা গুলোবে, খেতে বলেছিলেন । যাত্রার শেষাংশে বে অব বিস্কেতে জাহাজ যখন আবার নাচছে, তখন সেই আচার আর বিস্কুট আমাকে বাঁচিয়েছিল । চট্টগ্রামের সারেং শুনলেই তাই আমার বুকের মধ্যে নরম, উষ্ণ কৃতজ্ঞতার স্রোত বইতে থাকে । ইতেসামুদ্দিন সি-সিকনেসের কথা কিন্তু বলেননি ।

এ গল্প শেষ করি ইতেসামুদ্দিনের বলা গল্প দিয়েই । ‘নরখাদকের দ্বীপ’ বলে তিনি যে দ্বীপটির গল্প বলেছেন, এখন ম্যাপ দেখে মনে হয় সেটি ম্যাডাগাস্কার । সেখানে সোনার খনি ছিল । আর সেই দ্বীপবাসীরা নাকি বিদেশি জাহাজের নাবিকদের ভুলিয়ে এনে,

জাহাজটি ধ্বংস করে, নাবিকদের ভোজন করে মহফুর্তি করত। কিন্তু সোনা আছে বলে, স্বর্ণলোভী কিছু সাহেব ব্যবসায়ী ইউরোপ থেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের সঙ্গে নিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সমেত ওই দ্বীপে যেত এবং দণ্ডিত মানুষদের বিনিময়ে সোনার তাল নিয়ে ইউরোপে ফিরত।

ইতেসামুদ্দিন উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ঘুরে ফ্রান্সের বন্দরে পৌঁছেছিলেন। পথে ২৬ দিন ধরে প্রবল ঝড়ের মতো বাতাসে উন্মত্ত দোল খেয়েছিল তাঁদের জাহাজ। ফেরার পথে কেপটাউনে থেমেছিলেন, দুসপ্তাহের জন্য 'হাবসীদের দেশে' বাসও করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ওলন্দাজদের আসার আগে সেই দেশে শুধু বন্য কালো মানুষরা স্বাধীনভাবে বসবাস করত। ক্রীতদাস ব্যবস্থার নিন্দে করেছেন ইতেসামুদ্দিন এই হাবসীদের প্রসঙ্গে।

সাইরেনের গল্প দিয়েই শেষ করি বরং। ইতেসামুদ্দিন লিখেছেন ভয়ঙ্কর জলকন্যাদের কথা, যারা আশ্চর্য সুর শুনিয়ে নাবিকদের ভোলায়। তারপর নিশি ডাকের মতো তাদের নাম ধরে ধরে ডেকে নেয়। একবার ডাকে, দুবার ডাকে, তিনবার। ব্যস, তৃতীয় ডাকের পরে জলে ঝাঁপ দেবেই সেই চিহ্নিত নাবিক। যদিও কেউ ফিরে আসে তো সে জন্মের শোধ বোবা হয়ে আসে। মৎস্যকন্যাদের স্বভাবই যুবক, সমর্থ নাবিকদের নিয়ে নির্জন দ্বীপে সংসার করা। তারপর তাদের মূক করে দেওয়া হয়। যদি বা তারা কোনও দিন ফিরেও যায়, কোনও গল্প করতে পারবে না মৎস্যকন্যাদের বিষয়ে। তারা অর্ধনারী, অর্ধ মাছ। ইতেসামুদ্দিন তাদের দেখা পাননি ভাগ্যিস! পেলে আর তাঁকে ফিরে এসে বিলায়েতনামা লিখতে হত না।

আমিও মৎস্যকুমারী দেখিনি-সেই ডেনমার্কের সমুদ্রতীরের মূর্তিটি ছাড়া। ইতেসামুদ্দিনের সময়ে সে ছিল না। পৃথিবীর আধখানা প্রদক্ষিণ করে সাত সমুদ্দুর পার হয়ে অবশেষে হুগলি নদীর থেকে রওনা হওয়া তিন-মাস্তুলের পালতোলা জাহাজখানি গিয়ে ভিড়ল ফ্রান্সের বন্দরে, ভূমধ্যসাগরের পাড়ে। ছ মাস জলযাত্রার অন্তে জাহাজে ফেরিওয়ালারা ভিড় করে এল ভালো ভালো খাবারদাবার, টাটকা রুটি, চিজ, মাখন, ফলমূল, বিস্কুট নিয়ে, নাবিকদের দল তো আনন্দে উৎসব জুড়ে দিল। কতদিন ধরে তারা তাজা টাটকা খাদ্য পায়নি। ইউরোপীয়রা স্বভাবতই উল্লসিত, তারা স্বদেশের মাটিতে পা দিয়েছে। আর ইতেসামুদ্দিনও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, মাটিতে তো পা দিয়েছেন। '-ছ মাস ধরে কেবলই সমুদ্র আর কেবলই আকাশ-এছাড়া প্রায় কিছুই চোখে দেখিনি। পিঞ্জরে বন্দী পাখির মতোই আমি বসে কেবল জাহাজের পাটাতনে কাঠের তক্তাগুলো গুনে গুনে সময় কাটাতাম। অবশেষে মানুষের ঘরবাড়ি, অবশেষে শুকনো ডাঙা-আমাকে যেন নবজন্ম দিল!'

বিদেশ দেখে তিনি যত খুশি, তাঁকে দেখেও বিদেশিরা তেমনই আহ্লাদিত হয়েছিল। নতুন দেশে ইতেসামুদ্দিনের বিশেষ আনন্দের আরও একটি কারণ ঘটল। সেদেশের নারী-পুরুষ সকলেই তাঁকে দেখে যারপরনাই কৌতূহল বোধ করছিলেন এবং অনাবিল মুগ্ধতা প্রকাশ করছিলেন। বিশেষত নারীরা। ভারতীয় অভিজাতবংশীয় মানুষ বিদেশিরা দেখেননি, তাঁরা ওঁকে রাজাবাদশা মনে করে নিয়ে খুবই মানসম্ভ্রম দিচ্ছিলেন। নিজের পরনের পোশাকের বর্ণনাও দিয়েছেন ইতেসামুদ্দিন, সত্যি রাজাবাদশাদের মতোই, এমনকী কোমরে তলোয়ারটি সুদ্ধু কোমরবন্ধে গোঁজা। মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে আচকান দামি শাল, গলায় রত্নহার। পায়ে জুতো।

ইউরোপের রাজা-প্রীতি সহজে যাবার নয়। ওঁর দুশো বছর পরে আমরা যখন গেলাম বাবার পরনে তো এসব ছিল না। ছিল কালো গলাবন্ধ প্রিন্সকোট এবং কালো ট্রাউজাস। ছ ফুট দৈর্ঘ্য আর বিপুল গুম্ফরাজি-সঙ্গে সিল্কের শাড়ি আর আটপৌরে সোনার গয়না পরা আমার সুন্দরী মা, আর ফ্রক পরা লিকলিকে আমি। (তখনও লিকলিকে!)-বাবাকেও ইউরোপে কিন্তু অনবরতই রাস্তার মানুষে ভারতীয় রাজা মহারাজা ভাবত!

১৯৫০, তখনও ভারতীয় ভ্রমণবিলাসীদের সঙ্গে দেখাই হয়নি ইউরোপের। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে সদ্য গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে পশ্চিম ইউরোপ এবং ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে 'ভারতীয়' খুব স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল, কেউই অবাক হত না আমাদের দেখে। কিন্তু ভারতীয় পুরুষ মানুষরা তখন স্যুট পরতেন বিলেতে গেলে। বাবা জীবনে কোনওদিন স্যুট পরেননি। প্রিন্সকোট তখনও প্রিন্সদের পোশাক ছিল। 'প্রিন্সকোট' তখনও এভাবে চালু হয়নি ভারতীয় পুরুষের 'ফর্ম্যালওয়্যার' হিসাবে। বাবার চেহারাটাও তো রাজকীয় ছিল (নামও নরেন্দ্র) আর রানির মতোই অভিজাত মা-টিও ছিলেন আমার, যদিও বেশ গরিব মানুষ আমরা। বাবা যখনই বলতেন, না না, আমরা রাজা-রানি নই, আমরা কবি, দুজনেই কবি, কৌতূহলী মানুষের চোখে মুখে সেই হতাশা দপ করে লোডশেডিং হয়ে যাবার মতো ফুটে উঠত।

এই তো? অথচ আমাকে ভুলেও কেউ কোনওদিন রাজকন্যা ভাবেনি। আয়রনি এটাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমি বলে দিতাম-'হ্যাঁ'।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

বক্সা বাঘ-প্রকল্প

বুদ্ধদেব গুহ

এই লেখা কিন্তু যতখানি মানসভ্রমণের ততখানি প্রকৃত ভ্রমণের নয় । নয়, এই জন্য যে, বক্সার বনাঞ্চল এখনও সাধারণ ভ্রমণার্থীদের থাকার উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি ।

বক্সা অবশ্য সাধারণ ভ্রমণার্থীদের গন্তব্যও নয় । কিন্তু যাঁরা বনের খবর কিছু কিছু রাখেন, মানে, বনের মনের খবর, তাঁদের যেতে বাধা নেই । ভ্রমণার্থীদের মধ্যে অনেক রকমের স্তর থাকে সব দেশেই । বক্সা সমস্ত স্তরের ভ্রমণার্থীদের জন্য নিশ্চয়ই নয় ।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কোনও ভ্রমণার্থীকেই এখুনি বক্সা নিমন্ত্রণ জানাবে কি না! বনসংরক্ষণ আর বনভ্রমণের মধ্যে চিরদিনই বিরোধ ছিল । ভবিষ্যতেও থাকবে । আজ থেকে একযুগ আগে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি কে বাগচি মশাই আর কানহার ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর লাওলেকার সাহেবের মধ্যে আমার উপস্থিতিতেই তর্কাতর্কি হয়েছে কানহাতে । সেই সময়ে মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগ বাঘ বাড়ানোর ন্যায্য স্বার্থেই চাননি যে, কানহা-কিসলিতে দর্শনার্থীদের নিয়ত ভিড় লেগে থাকুক । কিন্তু সরকারের মদতে বাগচিমশাই জিতেছিলেন ।

মধ্যপ্রদেশের কানহাতে বা কিসলিতে যাঁরা আজকাল বাঘ দেখেন অথবা অসমের কাজিরাঙায় গণ্ডার, তাঁরা ওই দুই প্রাণীর স্বরূপ কখনওই জানবেন না । কৃতী, স্বাধীনচেতা জামাই আর আদরে-গোবরে নদনদে ঘরজামাইয়ের মধ্যে চিরদিনই যা তফাত ছিল, নিছক বনে বাস করা বাঘ বা গণ্ডার এবং প্রকৃত বুনোদের সঙ্গে লালিত-পালিত সহজ খাদ্যপ্রাপ্ত বাঘ বা গণ্ডার বা অন্য বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে সেই রকমই তফাত ।

সব বনেই বাঘ দেখাটা কপালের ব্যাপার কিন্তু প্রায় নিশ্ছিদ্র বক্সা বাঘ প্রকল্পের বনাঞ্চলে বাঘ দেখা প্রায় অসম্ভবই ।

পাঠক, আপনি ভাবতে পারেন যে, বাঘই যদি না দেখা গেল তবে কী করতে মরতে ওই পাণ্ডববর্জিত বাঘ প্রকল্পের বনে আদৌ যাওয়া?

কেন আদৌ যাবেন এবারে তাই বলি ।

আলিপুরদুয়ারে আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘা, কামরূপ এবং অন্যান্য নানা ট্রেনে গিয়েই পৌঁছতে পারেন । প্লেনেও বাগডোগরাতে গিয়ে নামতে পারেন । তবে সেখান থেকে ভাড়াগাড়িতে আলিপুরদুয়ার কোর্টে এসে পৌঁছতে চার-পাঁচ ঘণ্টা তো লাগবেই । কোচবিহারে যখন বায়ুদূতের প্লেন যেত তখন সেখান থেকে আসা খুবই সোজা ছিল । কিন্তু এখন বায়ুদূতের সার্ভিস বন্ধ আছে । কলকাতা থেকে বাগডোগরাতে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের উড়ান সপ্তাহে চারদিন যায় । বিমানবন্দর থেকেই সোজা গাড়িতে রওনা দেওয়াই ভালো । শিলিগুড়ি থেকে মিটার গেজ লাইনের ট্রেনেও যাওয়া যায় ।

আলিপুরদুয়ারে থাকার মতো তেমন ভালো হোটেল নেই বলেই শুনেছি । জানি না, ঠিক কিনা । সার্কিট হাউস, পি ডাব্লু ডি-র বাংলো অথবা সেচ বিভাগের বাংলোতে আগে থেকে বুকিং করা থাকলে থাকতে পারেন ।

রাজাভাতখাওয়া

আলিপুরদুয়ারে নোনাই আর ডিমা নদী আছে । আলিপুরদুয়ার থেকে আধঘণ্টা লাগবে বনের মধ্যের পথ দিয়ে গিয়ে গাড়িতে রাজাভাতখাওয়াতে পৌঁছতে । থাকার জায়গা রাজাভাতখাওয়াতেও সীমিত । রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, ভুটানঘাট, বক্সাদুয়ার এই সবই বনবিভাগের রাজত্ব । সব জমিও বনবিভাগের । রাজাভাতখাওয়াতে বনবিভাগের একটি ভি আই পি রেস্টহাউস আছে । সেখানে সাধারণের জায়গা হবে না । আগে যে বাড়িটি ডি এফ ও-র বাংলো ছিল সেখানে বনবিভাগ একটি ডর্মিটরি করেছেন । কিন্তু সেই বাংলোতে অনেক সময়েই প্রাণীতত্ত্বে পি এইচ ডি করতে আসা ছাত্ররা থাকেন । আমি যখন গিয়েছিলাম তার দু-তিনদিন আগেই একটা হাতির দলের এক হাতিকে রেডিও কলার পরাবার জন্য কলকাতা থেকে টেকনিক্যাল অফিসার সুব্রত পালচৌধুরী গিয়েছিলেন । এ ডি এফ ও কল্যাণ দাসের সহযোগিতাতে একটি মাকনা হাতিকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে ওঁরা তার গলায় গয়না পরিয়ে ছিলেন ।

বুকিংয়ের জন্য লিখে দেখতে পারেন । তবে অনেকই আগে লিখতে হবে । আগের এ ডি এফ ও-র বাংলোটিতে দুটি ঘর জনসাধারণের জন্য অগ্রিম বুকিং-এ পাওয়া যায় । অন্য একটি ঘর বনবিভাগের আমলাদের জন্য সব সময়েই রাখতে তো হয়ই । রাত-বিরেতে তাঁদের কখন যে আসতে হয় তা আগে থাকতে কে বলতে পারে!

এ অঞ্চলের সব বুকিংই দেন ফিল্ড ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার প্রোজেক্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, পিন নম্বর-৭৩৬ ১২২ ।

রাজাভাতখাওয়া জায়গাটি খুবই ভালো লাগবে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একথাবা ফাঁকা জায়গা। ছোট্ট জনপদ। জঙ্গলের আর চা-বাগানের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া ছবির মতো মিটার গেজ-এর রেললাইন। বনবিভাগের কর্মীদের বাড়িঘর, রেল কলোনি, পোস্ট অফিস এবং নবনির্মিত নেচার ইনফর্মেশন সেন্টার। এই ইনফর্মেশন সেন্টারের উল্টোদিকেই আছে WHISPERING TRAIL। ঘন বনের মধ্য দিয়ে সরু পায়েচলা পথ প্রায় পৌনে দু কিলোমিটারের মতো। তাতে সাহস করে যাঁরা যাবেন তাঁরা অগণ্য অচেনা গাছ, অচেনা পাখি দেখতে পাবেন।

এই ইনফর্মেশন সেন্টারটি সত্যিই দর্শনীয়। শ্রী এস এস বিস্ত সাহেব যখন বক্সার ফিল্ড ডিরেক্টর ছিলেন তখনই করে গিয়েছিলেন। ফরেস্ট সার্ভিসের এই দেরাদুনবাসী ভদ্রলোকটি বাংলা শুধু বলেন এবং পড়েনই না, বাংলা আরণ্য সাহিত্যের একজন মস্ত ভক্তও। বক্সার বাঘ প্রকল্প ভদ্রলোকের প্রাণ ছিল।

আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়াতে আসার পথে প্রায়ই নাকি ছিনতাই হয় আজকাল। পুলিশ বা বনবিভাগের জিপকে কিছু বলে না কিন্তু অন্য গাড়ি বা স্কুটারের শব্দ শুনলেই পথপাশের নিশ্ছিদ্র জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তারা ছিনতাই করে। পুলিশের এই ছিনতাই রোধে সক্রিয় থাকা উচিত।

রাজাভাতখাওয়াতে গেলে নেচার ইনফর্মেশন সেন্টারটি অবশ্যই ঘুরে দেখে আসবেন আরও ভেতরে যাওয়ার আগে। রাজাভাতখাওয়ার জনপদে মাঝে মাঝেই হাতি আসে। মানুষে পটকা ফাটায়, চিৎকার করে, নানারকম আওয়াজ করে। আমি থাকতে থাকতেই এক সন্ধেতে একটি একা দাঁতাল হাতি এসেছিল। রেল কলোনির এক কুঁড়েঘরের চারপাশ ঘুরে, কুঁড়েটি অক্ষত রেখে ইনস্পেকশন করে, একটি কলাগাছ উপড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে ফিরে গিয়েছিল নিজের খেয়ালে। পটকা-টটকাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ করে না উত্তরবঙ্গের হাতি।

এ ডি এফ ও-র পূর্বতন কোয়ার্টারের হাতাতে, গেটের পাশেই একটি তরুণ চিকণ গামহার গাছ আছে। মার্চের শেষে হলুদ আর খয়েরি ফুল এসেছিল তাতে। এখানে কতরকম যে গাছ আছে, যা উত্তর ভারতে বা বিহারে বা ওড়িশাতে নেই, তা কী বলব!

জয়ন্তী

রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তীতে আসতেও, আস্তে জিপ চালিয়ে গেলে, ঘণ্টাখানেকেরও কম লাগে। জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে জয়ন্তী নদীর একেবারে ওপরেই জয়ন্তী বনবাংলো। ছবির মতো। মাত্র একটি ঘর পাওয়া যেতে পারে এখানে। নদী আগে ছিল দূরে। কিন্তু

তিরানব্বইয়ের বন্যাতে পি ডাব্লু ডি-র বাংলো এবং নদীর ওপরে যে ব্রিজটা ছিল ভুটানঘাটের দিকে যাওয়ার, তা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে নদী-রেখাকে বহুধা বিস্তৃত করে, যেন বিস্ত সাহেবের আদেশেই, বনবিভাগের বাংলোকে অক্ষত রেখে তার পাদদেশ চুম্বন করে চলে গেছে ।

বাংলোর ছোট্ট হাতার বাইরে বেশিই শাল গাছ । মধ্যে, দুটি কাঠগোলাপের গাছ আছে, একটি কৃষ্ণচূড়া । নদীর দিকে মুখ-করা যে বসার জায়গাটি আছে, সেখানে কাঠের গেট বেয়ে গ্যাঁদাল লতা উঠেছে । ছিঁড়ে শুকনো লঙ্কার সঙ্গে বেটে, ভাত মেখে খেলাম আমরা ।

জয়ন্তী বাংলোর হাতাতে, মিহি জাল লাগানো ছোট্ট বসবার ঘরে, শোবার ঘরে এমনকী স্নানঘরেও জানলা খুলে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে সারা দিন কেটে যায় । রাতও মনে হয় যেন নদীতেই স্নান করছে । অন্ধকারেও নদীর বুক সাদা দেখায় । আর চাঁদনি রাতে তো কথাই নেই!

যাঁরা পাখির ভক্ত তাঁদের পক্ষে জয়ন্তী এক স্বর্গরাজ্য । গাছ-ভক্তদের পক্ষে এই পুরো বক্সা এলাকাই ।

ভোর চারটেতে ঘুম থেকে উঠে জয়ন্তীতে যত পাখির ডাক শুনেছিলাম তার মধ্যে অনেকই আগে শোনা ছিল না । দেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য বনেই আমার পা পড়েছে । একারণেই এবং নিজে পরম মূর্খ বলে, মনের গায়ে এক ঢিলেঢালা গর্বের জামা পরেছিলাম । ভেবেছিলাম যে, গাছেদের বা পাখিদের কিছু আমি চিনি । জয়ন্তীতে এসে বোঝা গেল যে চেনার অনেকই বাকি ।

র্যাকেট-টেইল্ড ড্রঙ্গোদের একটি বাসা ছিল নদী পারের একটি চিকরাসি গাছে । তাদের ডাকেই রোজ ঘুম ভাঙত । কম শোনা অথবা আগে আদৌ না-শোনা পাখিদের মধ্যে ছিল টিবেটান হুপী, বাজা এবং চির ফেজেন্ট ।

রেড-ওয়াটেল্ড ল্যাপউয়িং মাঝরাতে জয়ন্তী নদীর নিস্তব্ধ, রুক্ষ সাদা বুকে চমক তুলে তুলে ডাকত । তবে ওইরকম জায়গাতে ওই প্রজাতির পাখির যত সংখ্যায় থাকা উচিত ছিল সেই পরিমাণে কিন্তু ছিল না ।

অবশ্য বক্সার মতো জঙ্গলে আগে যাইওনি । বক্সাতে ‘ভাবার’ ও ‘তেরাই’ দুরকমেরই বনভূমি আছে । ভাবার জঙ্গলে মাটির অনেক নিচে থাকে জল । নদীরা এ অঞ্চলে পৌঁছেই ডুব দেয় পৃথিবীর গহনে । অন্তঃসলিলা হয়ে কিছুদূর ডুবসাঁতার দিয়ে গিয়ে আবার মাথা তোলে । জলস্তর অনেকই নিচে বলেই এই ভাবার অঞ্চলের গাছেদের শিকড়দের রকমই আলাদা । প্রকৃতি নিজেই তৃষ্ণা সৃষ্টি করে নিজেই নানাভাবে তা নিবারণ করেন ।

সুন্দরবনের বা অন্য ম্যানগ্রোভ বনের সতত নোনা জলের জোয়ার-ভাঁটা খেলা বনভূমির অর্ধেক সময়ে ডুবন্ত গাছেদের শিকড় যেমন বিশেষ প্রকৃতির, ভাবারের গাছেদের শিকড়েরাও তেমনই এক বিশেষ প্রকৃতির । বহু নিচ অবধি গিয়ে পৌঁছয় এই শিকড়েরা জলের সন্ধানে । আর ম্যানগ্রোভ বনের গাছেরা মাটি ফুঁড়ে শিকড়দের ওপরে উঠিয়ে পচন থেকে বাঁচায় নিজেদের । ভাবারের শিকড়দের নাম TAP ROOTS আর ম্যানগ্রোভ বনের শিকড়দের বা শুলোদের বলে RESPIRATORY ROOTS ।

ভাবারের গাছেদের নাম শুনলে খুশি হবেন আপনারা ।

জলপাইগুড়িরই মতো ময়নাগুড়ির নাম শুনেছেন অনেকেই কিন্তু ময়না নামে যে গাছ আছে তা কি জানতেন?

অন্য সব জায়গার নাম হয় গাছের তলা দিয়ে । কুলতলি, বকুলতলা, শিমুলতলা, পলাশতলি ইত্যাদি । কিন্তু উত্তরবঙ্গীয়রা, মনে হয়, গুড়ি ভক্ত । এই ময়না গাছেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হয় । প্রাচীন শিমুলের মতো মসৃণ । কিন্তু কাণ্ডে শিমুলের মতো কাঁটা নেই এবং কাণ্ডর গোড়াটা শিমুলের মতো অতখানি বিভক্ত ও বিন্যস্তও নয়, যদিও মিল আছে ।

লালি নামে একরকমের গাছ হয় এই অঞ্চলে । দুরকম লালি আছে । এমনি লালি আর দুধে লালি । টুন গাছ । লামপাতি । চিকরাসি । পারুল । জারুল । ছাতিয়ান বা ছইতান অর্থাৎ, ছাতিম গাছ । পাতা দেখলেই ভুল হবার উপায় নেই । আকাতরু! সত্যি! তরুর নাম আকাতরু । আরও কতরকম অচেনা গাছ । সহজে চেনা যায় এমন গাছেদের মধ্যে আছে শাল, সেগুন, শিশু, বিজা, গামহার, খয়ের, কুল, বন-কাঁঠাল । এ-কাঁঠালে না হয় এঁচোড় না হয় কাঁঠাল । কিন্তু ভালো আসবাব হয় । ময়নার কথা তো বলেইছি । শাল ও সেগুন এখানের আদি গাছ নয় । বহুযুগ হল বনবিভাগ প্ল্যানটেশান করে করে এই অঞ্চলে এইসব গাছ গজিয়েছেন । সেগুনের প্ল্যানটেশানে বনবিভাগের রোজগার ভালো হয় কিন্তু বন নষ্ট হয় । সেগুনের নিচে কোনওরকম আন্ডারগ্রোথ হয় না । সেই কারণে ECOLOGY বা বাস্তুসংস্থান-এর ভারসাম্য ব্যাহত হয় । লালি গাছ অনেকটা শালেরই মতো । চাঁপ গাছ । কাটুস গাছ । শিরিষ গাছ । শিমুল তো আছেই! অগণ্য ।

লতাও আছে নানারকম । আসামী লতা । আরারিকান্টা । তিনরকম বটানিকাল নাম আছে এদের । ফার্ন, তার মধ্যে আবার ঢেকির মতো ফার্নই বেশি । বিভূতিভূষণের প্রিয় পশ্চিমবাংলার গ্রামে নদীতীরে অযত্নে ফুটে-থাকা ঘেঁটু ফুল যেখানে সেখানে ফুটে থেকে ‘হাম কিসিসে কম নেহি’ প্রমাণ করছে । বেনটিক লতা । বহিনিয়া, জলবাহী লতাও আছে ।

বেত-বন আছে। বর্ষায় হয়তো কেয়াও ফোটে। আর সাপেরা সেখানে খেলা করে। ময়ূরের কেকাধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে পিঠের ওপরে কালো চুল-খোলা ভরা-শ্রাবণের বন।

বক্সাতে পোকামাকড়-প্রজাপতি আছে সতেরো রকমের। তার মধ্য আবার পাঁচশো পঁচিশ রকমের উপভাগ আছে। যেমন মাকড়সা, ঝিঁঝিঁ ও লাফানে পোকা, প্রজাপতি ও মথ, ফড়িং জাতীয়, কাচ পোকা ও গুবড়ে পোকা, মৌমাছি, বোলতা এবং পিঁপড়ে। লম্বা পা-ওয়ালা শিকারি পোকা, ছারপোকা, দু-ডানাওয়ালা মাছি, বাঁকানো-ডানাওয়ালা পতঙ্গ, উই, রোচেস।

হারভেস্টম্যান পোকা আছে চার প্রজাতির। তার মধ্যে লালরঙা লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা প্রজাতিটি ভারি সুন্দর। এর নাম আমি জানি না। লাঠি পোকা ও লতা পোকাও আছে, হোমোপটেরা। সিকার্ড ও লিফ হপারই আছে কুড়ি প্রজাতির।

গাছ-গাছালি সত্যিই বিস্মিত করেছে আমাকে। এই বনে গাছ আছে একশো উনপঞ্চাশ প্রজাতির, ঝোপ (গুল্ম) একশো সাতান্ন প্রজাতির, পাদপ একশো সাতাশি প্রজাতির, লতা উনসত্তর প্রজাতির, বেত আট প্রজাতির, বাঁশ ছ-প্রজাতির। নানারকম ঘাস আছে উননব্বই প্রজাতির, জলতৃণ আছে পঁচিশ প্রজাতির। অর্কিডই আছে একশো বত্রিশ প্রজাতির।

এতরকম পোকামাকড় আছে বলেই পাখির স্বর্গরাজ্য বক্সা। দুশো চৌত্রিশ প্রজাতির পাখি এখানে দেখা গেছে। ভাবুন একবার। দুশো চৌত্রিশ প্রজাতির!

ভারতের প্রায় সব ব্যাঘ্র-প্রকল্পেই গেছি এবং আফ্রিকার অনেকই গেম-পার্ক-এও, কিন্তু ঘরের কাছের বক্সাতে যে গবেষণা বনবিভাগ করেছেন, যেমন যোগ্য আমলাদের ওপরে এর ভার অর্পিত থেকেছে, তাতে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। এই কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার্হ। কারণ, এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ যানবাহন অত্যন্তই পুরনো এবং অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধাই এই প্রকল্পের কর্মীদের নেই। রেডিও ট্রান্সমিশানের সুবিধা অবশ্য আছে। এঁরা কাঠ-চুরি ও চোরাশিকার বন্ধেও যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা যুগান্তকারী।

ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যে জনবসতি থাকলে নানারকমের সমস্যা হয়ই। সেইসব সমস্যার মোকাবিলা মনস্তাত্বিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নানাবিধ নতুন ক্রিয়াকলাপে এঁরা যা করেছেন এবং করছেন তা জেনে এঁদের প্রশংসা না করে কোনও উপায়ই নেই। বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি, প্রকৃতার্থে শিক্ষিত এবং উদ্যোগী শ্রী কল্যাণ বিশ্বাসের প্রশংসায় এঁরা সকলেই পঞ্চমুখ দেখলাম। এবং পূর্বতন ফিল্ড ডিরেক্টর শ্রী এস এস বিস্ত সাহেবেরও। নতুন ফিল্ড ডিরেক্টর সবে কার্যভার নিয়েছেন।

এযুগে এমন অনাবিল গুরু বা প্রভুভক্তি বড় একটা দেখা যায় না।

জয়ন্তীতে গাছ, পাখি ও নদী ছাড়াও আমাকে সত্যিই অবাক করেছে তক্ষকেরা। আমাদের চিরচেনা, ঠিক! ঠিক! ঠিক! বলে আমাদের আশ্বস্ত করা তক্ষকদের ইংরিজি নাম GECKO অথবা TUCKTOO।

অত গাব্দা-গোব্দা, ভয়-পাওয়ানো অগণ্য সাধারণ তক্ষক আর কোথাও দেখিনি। মনিটর লিজার্ড হলেও না হয় অন্য কথা ছিল। জয়ন্তী নদীর ওপার থেকে তক্ষক ডাকলেও রাতের বেলাতে এপার থেকে ডাক শোনা যায় স্পষ্ট। বাংলোর ফলস-সিলিং-এর মধ্যে, হঠাৎ অবাক করে রাতের বাথরুমের জানলার বাইরের দিকে সাদা কাচের ওপরে তাদের আধিভৌতিক শিল্যুট।

জয়ন্তীতে যাবার পরেই আমার মনে হয়েছে যে, বড় বড় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীমাত্রই সম্ভবত পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পরে তক্ষক হয়ে জন্মান নইলে তক্ষকমাত্রই টাক-টু-উ, টুক-টু-উ ডাকার আগে আশ্চর্য প্রক্রিয়াতে অমন গলা সেধে নেবে কেন?

ভুটানঘাট

জয়ন্তী থেকে কার্তিকা রেঞ্জের রেঞ্জার সুধীর দাস সাহেবের জিপে বেরিয়ে, ব্রিজ ভেঙে গেছে বলে, জয়ন্তী নদীর শুকনো বুক মাড়িয়ে, বেঙ্গল লাইম স্টোন ও ডোলোমাইট কোম্পানির নদী পারের বাড়িঘর ছাড়িয়ে জয়ন্তী, চুণিয়া-ঝোড়া এবং ফাসখাওয়া নদী মাড়িয়ে জয়ন্তী ও তুরতুরি চা-বাগান পেরিয়ে কার্তিকা রেঞ্জ অফিসের পথ ডাইনে রেখে ময়নাবাড়ি বিট অফিসের বাঁপাশ দিয়ে ভুটানঘাটের বাংলোর দিকে এগোলাম। জয়ন্তী বাংলো থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। জয়ন্তীর রেঞ্জার বিমান বিশ্বাস জয়ন্তীতে আমাদের সী-অফ করেছিলেন।

বক্সাদুয়ার

ভুটানঘাটে যাওয়ার আগে জয়ন্তী থেকে যে জায়গার নামে এই ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নাম, সেই বক্সাদুয়ারে যাওয়া যায় সান্ত্রাবাড়ি রেঞ্জ অফিস হয়ে। রাস্তাটা ভেঙে গেছে। এখন ট্রেকিং করে যেতে হয়। সান্ত্রাবাড়ির পথে সুন্দর একটা নদী পড়ে। বক্সা-খোলা তার নাম। সান্ত্রাবাড়ি থেকে জয়ন্তীর রেঞ্জার বিমান বিশ্বাস এবং সান্ত্রাবাড়ির রেঞ্জার গোপাল চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এগোলেন। পাঁচ কিলোমিটার মতো চড়াইতে উঠে তারপর বক্সাদুয়ার। এবং বক্সা দুর্গ। সেখানেও রেঞ্জ অফিস আছে। ওখানে একটি বড় ডর্মিটরি

তৈরি হচ্ছে। তরুণ বনপ্রেমীরা কিছুদিন পরেই এসে থাকতে পারবেন। এবং আমি বনবিলাসীদের অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন অবশ্যই বক্সা-দুর্গে যান।

খাড়া চড়াই। তাই কিছুদূর গিয়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। সময়ও বেশি নিয়ে যাইনি হাতে। এর পরের বারে উঠব বক্সাদুয়ারে। বক্সাদুয়ারে না গিয়ে পৌঁছলে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। অপূর্ব দৃশ্য নাকি! প্রত্যেকেই বললেন। ব্রিটিশরা দুর্গম তো বটেই, প্রায় অগম্য নিবিড় ও শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যের এই পাহাড়চুড়োয় আন্দামানের সেলুলার জেলেরই মতো এক জেলখানা বানিয়েছিলেন, মুখ্যত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বন্দী করে রাখারই জন্য। এই জেলখানা থেকে পালানো শ্রীঅরবিন্দর পক্ষেও হয়তো সম্ভব ছিল না। আপনারা বক্সা গেলে, বক্সাদুয়ারে অবশ্যই যাবেন।

তবে এই সব অঞ্চলে ঘুরতে হলে নিজেদের সঙ্গে জিপ বা গাড়ি থাকা অবশ্যই দরকার। আলিপুরদুয়ার থেকে সকালে এবং বিকেলে বাস আসে রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী অবধি। তারপরে বাসও নেই। জয়ন্তীর ওপরের ব্রিজও তো আধখানা ধুয়ে গেছে তিরানব্বুইয়ের বন্যাতে। বর্ষা নেমে গেলে যাতায়াতেরও খুবই অসুবিধা। তবে বর্ষার রূপও যে আলাদা! এই জয়ন্তী ও ভুটান পাহাড়, জয়ন্তী, ডিমা, ফাসখাওয়া এবং রায়ডাক নদীর, এই নিবিড় নিশ্ছিদ্র বনের কী যে রূপ হবে ঘন বরষণের সময়ে তা ভাবলেই আনন্দে আত্মহারা হতে হয়। যখন সত্যি সত্যিই চোখে দেখব, তখন যে কী হবে তা কে জানে!

ভুটানঘাট বাংলোটিও চমৎকার। হাতার মধ্যে একটি STUNTED জারুল গাছ আছে। বনের জারুলেরা দীর্ঘাঙ্গী এবং সুতনুকাই হয় সচরাচর। এমন বেঁটে-মোটা খারাপ ফিগারের জারুল আগে দেখিনি। অর্কিডও আছে বাংলোর হাতার মধ্যেই একটি শিশু গাছে।

রায়ডাক নদীর যে কী অপূর্ব শোভা এখানে তা বলার নয়। একে অসমের মানস এবং বাংলার ও অসমের সীমান্ত চিহ্নিত করা সংকোশের সঙ্গে তুলনা করা গেলেও যেতে পারে। এই তিন জায়গাতেই নদী পেরোলেই ভুটান। তবে ভুটানঘাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার মতো গেলে পীপিং। ওয়াংচু নদীর ওপরের একটি ছোট্ট ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে ভুটানে যায় মানুষে। প্রথম গ্রামের নাম সাখু। ভুটান থেকে পর্বতের সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে যে ওয়াংচু নদী বয়ে আসছে সেই নদীই ভারতে পড়ে সমতলে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে তার নাম হয়েছে রায়ডাক।

কৃষ্ণর গায়ের রঙের মতো কালচে-নীল-রঙা ভুটান পাহাড়ের পটভূমিতে দ্রুতধাবমানা বিচিত্র-রঙা নুড়িময় নদীর এই মার্চ মাসে যা রূপ! এই নীল-রঙা শাড়ি-পরা নৃত্যরতা

নারীর হঠাৎ পাথরের ওপরে লাফিয়ে ওঠায়, তার উছলে-ওঠা সাদা সায়ার আভাস যে কেমন দেখায় তা দেখতে হলে পাঠক, আপনাকেই নিজে যেতে হবে। আমার সাধ্য কি আমি আপনার চোখ হই! এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দের বর্ণনা দেবার মতো কলম ঈশ্বর আমাকে দেননি।

একদিন বেলা পড়লে, নদীতে গিয়েছিলাম অনেকই ঘুরে। নদীর বুক থেকে নুড়ি সংগ্রহ করার জন্য ঠিকাদারের ট্রাক যে পথে নদীতে নামে সেই পথ বেয়ে।

শেষ ট্রাক ফিরে গেছে অনেকক্ষণ, লোকজনও। হাতির এবং বাঘের ভয়ে সন্ধে হওয়া অবধি কেউই থাকে না। নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে জলের পাশে দাঁড়ালাম। বেলা-শেষের গান গাইছে আকাশ। ভুটান-পাহাড়ের গায়ে ফিকে কমলা-রঙা এক বিধুর কোমল চাদর বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি শেষবেলাতে। বীজ-ফাটা শিমুল তুলোর আঁশ উড়ে উড়ে আসছে হাওয়াতে। খরস্রোতা জল পড়ছে, সাবধানে, যেন স্নান করবে বলে। কিছুক্ষণ ভেসেই তলিয়ে যাচ্ছে। এমনই তুলো-ওড়া দেখেছিলাম মানস অভয়ারণ্যে, মানস নদীর পাশে মার্চের শেষে। শিমুল তুলো আলতো হাওয়ায় উড়তে দেখলেই আমার ভুল হয়ে যায়। ভুল হয়ে যায় সবকিছুই।

মস্ত বড় এক জোড়া সাদা-কালো উড-ডাক উড়ে যাচ্ছে পীপিংয়ের দিকে। ওদেরই ওড়ার ধরন বুঝি চুরি করেছে CONCORDE। কী সুন্দর তাদের উড়ানো ঋতি। এমন এমন দৃশ্যর সম্মুখীন হয়েই মনে প্রত্যয় জাগে যে, প্রকৃতির মধ্যে থেকেই আমরা এবং আমাদের সবকিছু উদ্ভুত। প্রকৃতির মধ্যেই আমাদের নিবৃত্তি। প্রকৃতিই আমাদের উৎস। এবং শেষ গন্তব্যও।

স্তব্ধ হয়ে, সেই অপূর্ব দৃশ্যর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। এই প্রজাতির উড-ডাকই শেষ দেখেছিলাম, জোড়াতে নয়, একটিমাত্র, নিম্ন-অসমের গৌরীপুরের কাছে রাঙামাটি পাহাড়ে, এক গ্রীষ্মের চাঁদের রাতে, মরা নদীর ওপরে একটা মরা গাছের মগডালে বসেছিল সে।

দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছিল। একটি বড় লেপার্ড, সবে নদীতে জল খেয়ে, আমরা যে জঙ্গল থেকে এলাম, সেই জঙ্গলেই ঢুকে গেছে। একেবারে টাটকা পায়ের দাগ। অথবা সে ভুটানের দিক থেকেও আসতে পারে নদী সাঁতরে। একটি বড় বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম তারই কাছাকাছি। তবে দিন সাতেকের পুরনো। বালির ওপরে ফেলা পায়ের থাবার ছাঁচ ক্ষয়ে গেছে।

নদীরেখা ধরে, দিনশেষে ভুটানঘাট বাংলোর পিছনদিক দিয়ে পাম্প-হাউসের কাছে এসে উঠব ভেবে, এগোতে এগোতেই হঠাৎ অন্ধকার নেমে এল। ভুটান পাহাড়ের দিকের নদীপার থেকে হাতির দল বৃংহন করে উঠল। চাঁদ ছিল। কিন্তু সেই পাহাড়ের কালোতে এবং নদীর সেই অংশে সাদা পাথর এবং সাদা বালির অভাবে আলো প্রতিফলিত প্রতিসারিত হতে পারছিল না।

সাংঘাতিক সাপের আড্ডায় এসে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে হাচোড়-পাচোর করে প্রায় ঘণ্টা দুই পরে কোনওক্রমে বাংলোতে এসে পৌঁছলাম পিছন দিয়ে, চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন চৌকিদারকে আশ্বস্ত করে।

এবারের মার্চ মাসের যাত্রাতে বক্সাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দর ভাগীদার করল রায়ডাক নদীর বুকের ওপরের সেই শেষ বিকেল এবং রাতটি।

যাঁরা নির্জনতা ভালোবাসেন, বনের সঙ্গে একাত্ম হতে জানেন, যাঁরা নিজেদের কথা শোনাতে নয়, বনের কথা নির্বাক হয়ে শুনতে জানেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ যে একবার ঘরের কাছের বক্সাতে যান।

ভ্রমণ জুলাই, **১৯৯৬**

গানতোক থেকে ইয়ুমথাং

সুতপা ভট্টাচার্য

গানতোক না গ্যাংটক? সিকিমে দেখলাম দুই নামই চলছে পাশাপাশি । কথাবার্তায় সকলেই বলে গ্যাংটক, কিন্তু লেখায়, বিশেষ করে দেবনাগরী হরফে লেখায় সচরাচর গানতোকই থাকছে । তোক মানে সিকিমের ভাষায় পাহাড়চূড়া, আর গানতোক হল সবচেয়ে উঁচু পাহাড়চূড়া ।

আমার গানতোক নামটাই পছন্দ । গানতোক যাওয়া হল এবার, কিন্তু গানতোকের জন্য নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল ইয়ুমথাং । দল মাত্র দুজনের-আমি আর দিদি । দিদি দুবছর আগে, ঠিক এই সময়েই-মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘুরে এসেছে ইয়ুমথাং । সেখানকার ফুলের সমারোহ দেখে থেকে তার ফুল-পাগল বোনকেও দেখাতে ইচ্ছে হয়েছিল । এবারে তার সেই শখ-মেটানো ।

ইয়ুমথাং যেতে হলে আমাদের মতো ছোট দলের বেশ অসুবিধে । বড় দল হলে ভালো । নিজেরা গোটা একটা গাড়ি নেওয়া যায়, ইচ্ছেমতো বেড়ানো যায় । তবে অবশ্য কোনও-না-কোনও ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে । খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা তারাই করে দেয় কি না । হয়তো অল্পদিন পরে ট্র্যাভেল এজেন্সির আর দরকার হবে না, ভ্রমণেচ্ছুরা সরাসরি চলে যাবে লাচুং, লাচুং থেকে ইয়ুমথাং, এমন সব হোটেল থাকবে সেসব জায়গায় যারা সকালবেলার চা থেকে রাতের খাবার সবই জোগাবে । হয়তো সবই হবে একদিন, কিন্তু আমাদের তো ট্র্যাভেল-এজেন্সির কাছেই ধর্না দিয়ে বসে থাকতেই হল!

গানতোকে পৌঁছবার আগে, কালিম্পং থেকেই টেলিফোনে আমরা একটি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম । তারা আশ্বাসও দিয়েছিল, বলেছিল কলকাতা থেকে একটি দল আসছে, আমরা তাদের সঙ্গেই যেতে পারব । কিন্তু গানতোকে তাদের দপ্তরে পৌঁছে দেখি কোথায় কী! ঘণ্টাদুয়েক অফিসে বসিয়ে রেখে এজেন্সি জানাল-কলকাতার দল পুরো গাড়ি রিজার্ভ করেছে, তারা বাইরের লোক নেবে না । আর তাদের কাছে আর কোনও ভ্রমণেচ্ছু দলও সে সময় আসেনি, যাদের সঙ্গ নিতে পারি আমরা । সুতরাং, দুঃখিত, তারা আমাদের জন্য কিছুই করতে পারছে না, আমরা অন্য কোনও ট্র্যাভেল এজেন্সির কাছে গিয়ে দেখতে পারি! কিন্তু আমরা তো আর কারোর নাম জানি না, দিদি এদেরই সঙ্গে

আগে গিয়েছিল। ওই দপ্তরে উপস্থিত একজন ভদ্রলোক তখন অন্য একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ফোন করলেন। জানা গেল, তাদের একটি দল পরদিনই রওনা হচ্ছে ইয়ুমথাং, দলে আছেন তিনজন, আমাদের দুজনের জায়গা হয়ে যাবে। কিন্তু এই তিনজন চেয়েছেন একরাতের ট্রিপ। আমরা চেয়েছিলাম দুরাতের বেড়ানো, সে আর হল না!

পরদিন সকাল নটায় গাড়ি আসবার কথা, তৈরি হয়ে বসে থাকলাম, গাড়ি এল বেলা এগারোটায়। তিনজন বাঙালি ভদ্রলোকের একটি দল রয়েছে গাড়িতে, আর তিনজন আছে ট্র্যাভেল এজেন্সির তরফের-তিনজনেরই বয়স হবে কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। সরল সুন্দর অনভিজ্ঞ তিনটি মুখ। এইখানেই গানতোকের গোলমাল। রাশি রাশি ট্র্যাভেল এজেন্সি রয়েছে শহরে, কিন্তু অভিজ্ঞ কর্মী সম্ভবত তত নেই। আর তাই ইয়ুমথাং বেড়ানো আমাদের মসৃণ হল না। তাই বলে যে খারাপ হল তাও নয়। এও তো আরেকরকমের অভিজ্ঞতা।

আমাদের প্রথম গন্তব্য লাচুং। সেখানে বিকেলে পৌঁছে যাবার কথা। পথের এখানে-সেখানে অসাধারণ সব জলপ্রপাত! হিমালয়ের পথে আরও তো ঘুরেছি, দেখেছি অনেক প্রপাতধারা। কিন্তু উত্তর-সিকিমের পথের প্রপাত-সৌন্দর্য যেন সকলের ওপরে! পৌঁছলাম মঙ্গন, সেখানে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল, আমাদের লাঞ্চ প্যাকেট দেওয়া হল, চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেলাম। এসব সারা হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল গাড়ি। কেন জানি না। সেখান থেকে একঘণ্টা পরে একটা চেকপোস্টের সামনে এসে পৌঁছলাম, জায়গাটার নাম টোং। রাস্তা আটকানো, পাশে পুলিশ-গুমটি। পুলিশ পারমিট পরখ করে তবে গাড়ি যেতে দেবে। ড্রাইভার আর ম্যানেজার গেল গুমটিতে। পারমিটের কাগজ হাতে নিয়ে অফিসার কী বলছেন তাদের, আমরা গাড়ি থেকে কিছুই বুঝছি না। শুধু দেখছি-একের পর এক গাড়ি আসছে, চলে যাচ্ছে, শুধু বসে আছি আমরা। আধঘণ্টা কেটে যাবার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সান্ত্রীটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল গোলমাল কোথায়! আমাদের পারমিটে নাকি অফিসারের সই পড়েনি! গানতোকে প্রতিদিন ছাঙ্গু আর ইয়ুমথাঙের যাত্রীদের রাশি রাশি পারমিট তৈরি হয়, সবারই খুব তাড়া, এই পরিস্থিতে পারমিট বার হয়ে এসেছে অফিসারের সই-ছাড়াই! তাহলে কী হবে? আমাদের যাওয়া কি হবে না? -ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি সান্ত্রীটিকে। সে জানায়, আবার মঙ্গনে গিয়ে সেখানকার পুলিশ-অফিস থেকে সই করিয়ে আনতে হবে পারমিট। তার মানে আরও দুঘণ্টা দেরি হবে লাচুং পৌঁছতে! পাঁচজনের দলের প্রত্যেকেই আমরা নানাভাবে উষ্মা প্রকাশ করতে লাগলাম, ট্র্যাভেল এজেন্সির অপদার্থতা বিষয়ে সকলেই ক্ষুব্ধ। তার ওপর ড্রাইভার বলল, আমাদের এখানে নামিয়ে রেখে খালি গাড়ি নিয়ে সে মঙ্গন ঘুরে আসবে, তাহলে সময় কিছুটা বাঁচবে। জিপের মাথায় বাঁধা-ছাঁদা মালপত্তর, সেগুলোও কি নামানো

হবে? না, সেসব অমনিই থাকবে । অর্থাৎ, আমাদের ফেলে রেখে আমাদের মালপত্তর নিয়ে গাড়ি চলে যাবে মঙ্গন । তারপর, যদি মঙ্গন থেকে গাড়ি না ফেরে, যদি চলে যায় গানতোক? তাহলে কী হবে আমাদের? এসব আশঙ্কা মনের মধ্যে রেখে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ-অফিসের লাগোয়া একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে বসলাম সবাই । ঘরটিতে বসেছিলেন একজন বাঙালি মিলিটারি অফিসার । তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কাছে-পিঠে কোথাও চায়ের দোকান আছে কি না । তিনি জানালেন, না, কোনও দোকান নেই । জানতে চাইলাম তাঁরা চা কোথায় খান । তিনি বললেন তাঁর কোয়ার্টার পাশেই, সেখানে একজন এসে তাঁর রান্না করে দিয়ে যায়, কিন্তু আজ সে এখনও আসেনি । বুঝলাম চা পাবার কোনও আশাই নেই! সেই অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল খুব, দিদিকে বলে বাইরে হাঁটতে বেরলাম ।

পুলিশ-গুমটির পরে আর বাড়িঘর নেই, দু-পা এগিয়েই চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম-গর্জন করে বয়ে চলেছে তিস্তার পান্না-গলানো স্রোত, পিছনে বনভূমি-ছাওয়া গম্ভীর পর্বতশ্রেণী । আশ্চর্য, এতক্ষণ জানতেই পারিনি এত কাছে, ঠিক পাশটিতেই রয়েছে তিস্তা, পুলিশ-মিলিটারির বাড়িঘর আড়াল করে রেখেছিল । সেই নির্জন শ্যামল বনভূমির স্তব্ধতার বিপরীতে দুরন্ত তিস্তার কলস্বরা জলরাশি-এমন ছবিটি তো এখানে না দাঁড়ালে দেখতেই পেতাম না! তিস্তার স্রোতের পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, এমন সময় পিছন থেকে দিদির ডাক-সেই মিলিটারি ভদ্রলোক, যাঁর নাম স্বপন মুখোপাধ্যায়, তিনি তাঁর কোয়ার্টারে আমাদের চা খেতে ডেকেছেন ।

সেখানে গিয়ে দেখি, বেশ পরিষ্কার তকতকে বড় একটি ঘর । মিলিটারি আরেকজন অফিসার রয়েছেন, তাঁর নাম গণেশ ছেত্রী -তাঁর বাড়ি আসামে, যদিও তিনি নেপালি । স্বপনবাবু নিজে হাতেই স্টোভ জ্বেলে সকলের জন্য চা তৈরি করছেন । আমাদের দলের সবারই দেখি রাগ বিরক্তি সব কোথায় চলে গেছে! চা খেতে খেতে গল্পগুজব চলছে । দলের একজন বললেন, ভাগ্যিস এই পারমিটের গোলমালটা হল, না হলে তো আপনাদের সঙ্গে আলাপই হত না । দিদি দার্জিলিংয়ে থাকে বলে নেপালি ভাষায় খুব ভালো কথা বলতে পারে । গণেশবাবুর সঙ্গে নেপালিতে আলাপ চালাচ্ছিল সে । একটি নেপালি কমবয়সী বধূ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল, দিদিকে নেপালি বলতে শুনে সে এসে দিদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল । দিদি আর আমি তার সঙ্গে তার বাসা দেখতে গেলাম । দিদি বলল গাড়িটা যদি রাত করে ফিরতে, তাহলে একটা রাত আমরা এই বোনটির কাছে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারি । কিন্তু তার দরকার হল না, একটু পরেই আমাদের গাড়ি এল, রওনা দিলাম আমরা । কিন্তু স্বপনবাবু, গণেশবাবু আর হাসিমুখ মিষ্টি বধূটিকে আর কোনওদিন দেখব না ভেবে মনটা একটু খারাপই লাগছিল তখন ।

লাচুং পৌঁছতে সাতটা বেজে গেল । এখানকার হোটেলগুলিতে কেবল থাকার ব্যবস্থা আছে । কিচেন আছে, সেখানে রান্নাবান্না করে ট্র্যাভেল এজেন্সির লোকজন । সেই তিনটি তরুণ-তরুণী মহা উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল । প্রথমে চা, তারপর রাতের খাবার । যেখানে খাবার ব্যবস্থা, আমাদের মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা কিন্তু সেখানে হয়নি, যেতে হবে অনেক নিচের অন্য একটি হোটেলে । সারাদিনের ক্লান্তির পর আবার হেঁটে নামতে হবে অনেকটা -ভাবতে ভালো লাগছিল না মোটেই । কিন্তু, খাওয়া-দাওয়া সারা হলে, রাত সাড়ে এগারোটা বেজে যাবার পর গুঁড়ি গুঁড়ি হিম আর ছমছমে অন্ধকারের মধ্যে পথ হাঁটতে মন্দও লাগল না । আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে শুনতে পেলাম জলের গভীর গর্জন, কিন্তু অন্ধকারে দেখা গেল না কিছু । খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম । কী গম্ভীর সুন্দর দৃশ্য! সামনে দিয়ে কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি এক নদী, আর আমাদের হোটেলের পাশ দিয়ে এক প্রপাত ধারা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে সেই নদীর ওপর । পিছনের কত উঁচু এক পাহাড়ের মাথা থেকে নামছে সেই প্রপাত! তাই না এত গর্জন! কাল ভাগ্যে ওপরের হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল না । নিচে ছিলাম বলেই না নদী আর প্রপাতের সঙ্গমস্থানটির পাশে দাঁড়াবার সুযোগ হল!

লাচুং যেন মনে পড়িয়ে দিল অনেকদিন আগে দেখা পহেলগাঁও! পহেলগাঁওতে যেমন লিডারের দুটি ধারা, এখানেও তেমনই দুদিক থেকে দুটি ধারা এসে মিলেছে । জলের কলধ্বনি এমনই শুনেছিলাম পহেলগাঁওতে । তবে পহেলগাঁওতে তুষার-ছাওয়া পাহাড়মালা অনেক দূরে, লাচুংয়ে সেগুলি কাছে অনেক । ওপরের হোটেলে, যেখানে দলের আর সকলে আছেন, সেখানে এসে দেখলাম সম্পূর্ণ লাচুংয়ের দৃশ্য-কত বিচিত্র ধরনের ছোট-বড় পাহাড়ে ঘেরা সবুজ একটি উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নদী, একপাশে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে প্রপাত, কোথাও ছোট ছোট ঘরবাড়ি, কোথাও বা একলা একটি গাছ । চুপ করে এই দৃশ্য দেখেই তো কাটিয়ে দেওয়া যায় কয়েকদিন । ভাবাই যায় না কলকাতার এত কাছে আছে এমন সর্বসুন্দর ছবি । ইয়ুমথাঙের কথা শুনে দেখতে এসেছি, কিন্তু লাচুং যে এমন মন কাড়বে তা তো জানা ছিল না! অন্তত আরেকটা রাত যদি থাকা যেত এখানে!

কিন্তু না, এখনই তো রওনা দিতে হবে ইয়ুমথাঙের দিকে । ফিরে এসে আজই যে আবার গানতোকে নামা । লাচুং থেকে ওপরে উঠতে শুরু করল গাড়ি । বেশ কিছুটা ওঠার পর ফুল দেখা শুরু হল । পথের পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢাল ভরে আছে বামন রডোডেনড্রনের থোকা থোকা সাদা ফুলে । তারপর এল টগর গাছের মাপের রডোডেনড্রন-বেগুনি আর গোলাপি, হালকা আর গাঢ়-কত বিচিত্র রঙের রডোডেনড্রন, তার সঙ্গে ধবধবে সাদা আর টুকটুকে লাল তো আছেই । একদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়া

থেকে তলা পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে পুরু বরফের স্তর, সেই বরফেরই আশপাশে নানা রঙের ফুলের মেলা । রাস্তা চলেছে কোথাও বা হালকা পাতার রক্তিম রডোডেনড্রনের ঘন বনের বুক চিরে, কখনও বা পুরু পাতার গোলাপি রডোডেনড্রনের পাশ কাটিয়ে । ইয়ুমথাং নদীর ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি নামল । গাড়ির ভেতর থেকেই দেখলাম নদীর ওপারে প্রিমুলা ফুল মাটির ওপর ঘন হয়ে ফুটে যেন বেগুনি রঙের গালচে পেতে দিয়েছে! তার ওপারে ঘন বন, তারও পরে গম্ভীর পর্বতমালা! এপারে আমাদের আশপাশেও ফুটেছে প্রিমুলা, কিন্তু আমাদের মতো দর্শকদের পায়ের চাপেই বোধহয় তারা অবচ্ছিন্ন, সংখ্যাতেও কম! নদীর ধারে রডোডেনড্রন বনও রয়েছে, কিন্তু ফুলন্ত নয়, গাছে কুঁড়ি এসেছে যদিও অনেক ।

ইয়ুমথাং নদীর পাশে এক জায়গায় একটি গরমজলের কুণ্ড আছে, বরফের রাজ্যে গরমজল! ইচ্ছে করলে স্নানও করা যায় । সেখানে যেতে গিয়ে আমাদের দলের সমরবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন । ওইরকম ঠান্ডা জায়গাতেও তাঁর গরম লাগছে! তিনি তো খুবই ভয় পেয়েছেন, আমারও যে ভয় লাগছিল না তা নয় । গানতোক থেকে সারা পথ যে মানুষটি প্রবল আগ্রহ নিয়ে পথের সৌন্দর্য দেখেছেন আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নানা ভাবে, সেই মানুষটি হঠাৎ একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন । বারবার কেবল একটাই তাঁর অনুরোধ-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গানতোক পৌঁছতে হবে আমাদের । দিদি বুঝতে পারছিল ওঁর অসুস্থতার কারণ আকস্মিক এতটা উঁচুতে আসা, এছাড়া আর কিছু নয় । ও বারোবার অমরনাথ গেছে, অভিজ্ঞতা অনেক । লাচুংয়ে পৌঁছে ও ব্র্যান্ডি কিনে এনে খাইয়ে দিল সমরবাবুকে, তার প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন ভদ্রলোক । তবু কিন্তু তাঁর ভয় আর যায় না, তিনি ধরেই নিয়েছেন হার্ট-অ্যাটাকই হয়েছে তাঁর, গানতোক না পৌঁছনো অবধি তাঁর শান্তি নেই ।

এদিকে বৃষ্টি বাড়ছে, আমরা ভাবছি এখনই খেয়ে নিয়ে গানতোকের দিকে রওনা দেব । এমন সময়ে, তরুণ ম্যানেজারটি জানালেন, এইবার রান্না চাপাবার আয়োজন শুরু হবে । তখন বেলা সাড়ে বারোটা । রান্না করার জন্য যে ছেলেটি এসেছিল, সে আমাদের সঙ্গে ইয়ুমথাঙে বেড়াতে গেল দেখে আমরা ধরে নিয়েছিলাম রান্নার দায়িত্ব হয়তো আর কারুকে দিয়েছে ওরা । কমবয়সী ছেলেমেয়ে তিনটি, নিজেদের বোধবুদ্ধি অনুসারে ঠিক করে নিয়েছে রান্না পরে করলেও হবে, আগে তো একসঙ্গে বেড়ানো যাক! বৃষ্টির বহর দেখে ড্রাইভার কিন্তু রান্নার জন্য আর সময় দিতে নারাজ, এসব রাস্তায় ধস নামে যখন তখন । সমরবাবুরও ফেরার তাড়া । কাজেই ম্যানেজারকে বলা হল, আমরা ভাত খাব না, এখনই বেরিয়ে পড়ব । ম্যানেজার ক্ষুব্ধ, দায়িত্ব তো তার, আমরা কেন নিজেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি! তাকে বোঝানো যাচ্ছে না এরপর রান্না শুরু করে খাওয়া-শেষে সব গুছিয়ে তুলতে বেলা

দুটো বেজে যাবেই আর দুটোর পর পাহাড়ি আবহাওয়া খারাপের দিকে যেতে থাকে। মঙ্গনে পৌঁছে আমরা চায়ের সঙ্গে পাউরুটি খেলাম। ম্যানেজার যে ছেলেটি, সেও আমাদের সঙ্গে খেল। কিন্তু অন্য ছেলেমেয়ে দুটি কিছু খেল না। বুঝলাম, ওদের খারাপ লাগছে খুব, হয়তো মালিকের কাছে ওরা বকুনিও খাবে। কিন্তু দোষ কি মালিকের নয়? এত কমবয়সী তিনটি ছেলেমেয়ে, যাদের একজনেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাদের এভাবে দায়িত্ব দেওয়াটাই তো অন্যায়। সমরবাবুদের দলের একজন বলছিলেন, আমরা ভাত খেতে পেলাম না, কাজেই আমাদের দেয় টাকা কমাতে হবে। সেটা উচিত-কথা বলে মনে হল না। ওরা তো খাওয়াতেই চেয়েছিল। একবেলা ভাত না-খাওয়ার জন্য আমাদের তত কিছু অসুবিধে লাগেনি, বরং ছেলেমেয়ে দুটি কিছু খেল না বলেই খারাপ লাগছিল। গানতোকে পৌঁছে বিদায় নেবার সময় ছেলেমেয়ে তিনটির হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানালাম, বিনা ভাষায়, জানি না ওরা বুঝল কি না!

এই যে একটু-আধটু গোলমাল-এতে বেড়ানোর ব্যাপারে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না। তবু পরামর্শ দেব-ইয়ুমথাঙে যাঁরা বেড়াতে যাবেন, তাঁরা পারমিটটা নিজেরা দেখে নেবেন, আর ট্র্যাভেল এজেন্সি সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

ইয়ুমথাং বেড়াতে গেলে সবচেয়ে ভালো হয় যদি বেশ বড় দল থাকে। ১৬ জনের দল হলে দুই রাত তিনদিনের প্যাকেজে মাথাপিছু ১,৭৫০-১,৮০০ টাকায় বেড়ানো সম্ভব। তবে দল ছোট হলে মাথাপিছু খরচ বাড়ে। তাছাড়া, বিলাসবহুল রিসর্টে থাকলে খরচ সামান্য বেশি পড়ে। শুধু দুজনের দল বিলাসবহুল রিসর্টে থাকলে খরচ হয় মাথাপিছু ৩,৫০০-৪,৫০০ টাকা।

ইয়ুমথাঙে থাকার জায়গা আছে বেশ কিছু। ইয়াকশে রিসর্ট, ডাবলা ইন, স্নো লায়ন, অ্যাপল ভ্যালি ইন, অ্যালপাইন ইন, লালি গুরাস, ব্লু খাং ইত্যাদি। এছাড়াও বেশ কিছু ছোটখাটো হোটেল আছে।

ভ্রমণ মে, ১৯৯৮

ক্যামেরুন, আগ্নেয়গিরি ও গভীর জঙ্গলের খুদে মানুষেরা

প্রীতি সান্যাল

ক্যামেরুন যাওয়ার আমন্ত্রণ কয়েকবার এসেছিল, আমি যাইনি। যাঁর জন্য নেমন্তন্ন তিনি অনেকবার দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি হয়ে ঘুরে এসেছেন শিক্ষামন্ত্রীর ডাকে। আমার মনে হয়েছিল কী করব সেখানে। দেখার কী বা আছে! শিক্ষাবিদ সঙ্গী তো ব্যস্ত থাকবেন সারাদিন, দেশের মন্ত্রী গোষ্ঠীর সঙ্গে। রাজধানী ইয়ায়ুন্দে শহরে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে আমার প্যারিসে থাকা ঢের ভালো। এই তৃতীয়বারের আমন্ত্রণে ঠিক করলাম, অজানা এই দেশটির কথা 'ভ্রমণ'-এর পাঠক-পাঠিকার জন্য লিখে আনতে পারলে কেমন হয়! প্যারিস থেকে টেলিফোনে সম্পাদককে এই বার্তা জানাতেই তিনি উচ্ছ্বসিত, মনে হল, যেন সেই মুহূর্তেই ক্যামেরুন ঘুরে এসে সেখানকার সব কথা তাঁকে শোনাতে পারলে তবেই তিনি শান্তি পান।

এয়ার ফ্রান্সে চলেছি আফ্রিকা। তখনও জানি না কী বিস্ময় অপেক্ষায় আছে। উড়োজাহাজে বসে পর্দায় ম্যাপ দেখছি। ইউরোপ থেকে খুব দূর নয়। কাসাব্লাঙ্কা, আলজিরিয়া হয়ে সাহারা মরুভূমি পেরলাম। আদ্দিস আবাবা, ডাকার, বাঙ্গুই, ব্রাজাভিল, নাইরোবি বুজুমবুরা, হারারে লিবারভিল আবিদজান কিগালি কিনচাসা, কোতোনু ... নানা দেশের নাম পড়তে গিয়ে বেশ চনমনে লাগছে। সাহারার বিস্তৃত হলুদ রং ছাড়িয়ে ক্যামেরুনের বন্দর শহর দুয়ালায় উড়োজাহাজ নামল কিছুক্ষণের জন্য। নামছি যখন দেখি দুধারে ঘন জঙ্গল... সমুদ্রের নীল একটু উঁকি দিয়ে গেল। ইয়ায়ুন্দে পৌঁছতে সন্ধে। আমাদের নিতে এসেছিলেন শিক্ষাসচিব জোয়েল মুলাঁ সঙ্গে গি সালা, তাঁদের সঙ্গে প্যারিসেই পরিচয়। কূটনৈতিক সুবিধার জন্য এয়ারপোর্টের সুন্দরী মেয়েটি আমাদের কাগজপত্র, স্যুটকেস ইত্যাদি গুছিয়ে এনে লাউঞ্জে বসাল। কোঁকড়া চুল টেনে সোজা করা আফ্রিকার তরুণীদের নতুন ফ্যাশন। তার কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল। রংও তেমন কালো নয়। মাখে নাকি চামড়া ফর্সা করার জন্য বিশেষ সাবান 'মোভাতে', যা তৈরি হচ্ছে আমেরিকা বা ইউরোপে, আফ্রিকার কৃষ্ণকলিদের জন্য! স্কার্টের নিচে পা দুখানি কিন্তু সুন্দর চকচকে কালো। বাইরে অন্ধকার। বিমানবন্দরেও তেমন একটা আলো নেই। একটি কালো ও

আরেকটি সাদা মার্সিডিজ বেনজ গাড়ি দাঁড়ানো । দুটি ভিখারি পয়সা চাইছে । ঘন মেঘ, জোলো হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । মালপত্র উঠিয়ে দুটি গাড়ি আমাদের নিয়ে শহরের দিকে এগোল । অন্ধকার হাইওয়ের দুধারে জঙ্গল, উঁচু গাছের সারি । গাড়ির জানলা খোলা । পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি । কলা গাছ ফলের ভারে নিচু হয়ে, আছে অন্ধকারে তারার মৃদু আলোয় টের পাচ্ছি । অনেকটা পথ এলাম, নির্জন, কেউ বাস করে না যেন এদেশে । হঠাৎ দুয়েকটি আলোর ফুটকি, দুঃখী চায়ের দোকান, শেষ না হওয়া কয়েকটি বাড়ি, তার ভেতরেই মিটমিট করে আলো জ্বলছে... দোকানের সামনে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে । কোনও তাড়া নেই, ছোটাছুটি নেই অথচ রাজধানী কয়েক কিলোমিটার দূরে । ম্যালেরিয়ার কুইনিন, পীতজ্বরের টিকা এসব অস্ত্রশস্ত্রে আগেই সেজেছি । এখন কিনব খনিজ জল । ফরাসি ডাক্তারের বিধান । 'ক্যামেরুন যাচ্ছ, অন্য কোনও জলপান নৈব নৈব চ ।' গাড়ি থামানো হল ছোট্ট একটি মনিহারী দোকানের সামনে । প্রায় বন্ধ দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক বালক লাল প্যাকিং বাক্স নিয়ে নানা কসরতে নাচছিল গান গেয়ে-'মাওয়ানা... নোদোলো ও-ও-এ...এ' ভারি মজা লাগছিল দেখতে । আমি তাকাচ্ছি দেখে চট করে বাক্সটা মাথার ওপর হুডের মতো চাপিয়ে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ নাচল সুর ছাড়াই । বাবা মা দোকান চালায় । বাড়ি ফিরবে একসঙ্গে । অপেক্ষার বিরক্তি কাটাতেই এই নাচ বোধহয় ।

রাজধানীতে ঢুকছি । বেশ মলিন চেহারা । আলো কম । মন্ত্রীভবন, সংসদ ভবন, জাতীয় পরিষদ এসব পেরিয়ে এলাম হিলটন হোটেলে । বেশ সাজানো গোছানো । কিন্তু লবিতে অলস অপেক্ষায় যারা ভিড় জমিয়েছে তারা কেন এখানে তখন বুঝতে পারিনি । পরে দেখেছিলাম নানা ধরনের ব্যবসার কথাবার্তা লবির সোফাতেই ঘটে যায় । স্বচ্ছ স্বল্পবসনে কৃষ্ণকলি মেয়েদের গৌরবর্ণ পুরুষের হাত ধরে ককটেল লাউঞ্জে চলে যেতে দেখি । কী সুন্দর এই মেয়েদের মুখ! দশতলার ওপরে ঘর । জানলা থেকে দেখছি আলো-আঁধারে এক রহস্যময় শহর অপেক্ষায় আছে ।

ভোরে ঘুম ভাঙল । পর্দা সরাতে দেখি আকাশ মেঘলা । বাইরে আম তালগাছ । হলুদ ট্যাক্সি ছুটছে । নীল টুপি পরা কিশোর একা দাঁড়িয়ে । যেন তার এই সকালে কোনও কাজ নেই, কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই । চা খেতে নিচে রেস্তোরাঁয় নামলাম । সুন্দরী সোফি হাসিমুখে জানতে চাইল কোথা থেকে এসেছি, কী দেখার বাসনা । বললাম, 'শহর ।' -'ধুর! শহরে কী আছে! শহরের বাইরে চলে যাও । দেখবে আমার দেশ সবুজের লাবণ্যে কত সুন্দর ।' ওর কথাটা কত খাঁটি একটু পরেই টের পেলাম । লবিতে আসতেই দেখি বেশ লম্বা চেহারার এক মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন । দেলফিন তান । স্কুলে ফরাসি সাহিত্য পড়ান । ক-দিন ছুটি চলছে । আমাকে সঙ্গ দেবেন । জোয়েল মুলাঁ ব্যবস্থা

করেছেন । আলাপ পরিচয় হল । ফরাসি ভাষায় কথাবার্তা । ফরাসি, ইংরিজি দুটিই সরকারি ভাষা, কিন্তু ফরাসি ভাষার প্রাধান্য দেশে । দেলফিনের সঙ্গে অল্প সময়ে আলাপ সহজ হয়ে এল । নিচে নেমে দেখি আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে । বড় একটি গাড়ি আর চালক কাম গাইড আলফনসো দাঁড়িয়ে আছে । আবার ধন্যবাদ জোয়েল মুলাঁকে । হোটেল ছেড়ে শহরে ঢুকছি । বাড়ি আর গাড়ির জঙ্গল । পথঘাট রাজধানীর পক্ষে বেশ সরু । তার মধ্যেই সাইকেল, নামীদামি মোটরগাড়ি, পথচারী, হকারের ভিড় । কী করে এগনো যাবে ভাবছি । হোটেলের কাছাকাছি জায়গাটাই সাজানো গোছানো । তারপর কোনও অদৃশ্য হাতে শহরটা ঘেঁটে এলোমেলো । এ বছর শান্তিনিকেতন থেকে মাতুলালয় কীর্ণাহার যেতে ঠিক এই অনুভূতি হয়েছিল । কিন্তু কোথায় একটি মফস্বল শহর আর এখানে দেশের রাজধানী! শিক্ষা মন্ত্রণালয় এত সুযোগ দিয়েছেন ঘোরাঘুরির তা সত্ত্বেও এরকম ভাবছি জানতে পারলে কী মনে করবে ভেবে নিজেকেই বকুনি দিলাম । রাস্তার দুধারে তিলার্ধ স্থান নেই । কত ধরনের পসরা । শাকসবজি থেকে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি । জামাকাপড় ডাঁই করে বিক্রি হচ্ছে ফুটপাতের ওপর । তারই কোল ঘেঁসে সারি বাঁধা সব পেয়েছির দেশের মতো পণ্যদ্রব্যে ভরা দোকান । পিঠে শিশুকে কাপড়ে বেঁধে রঙিন গোন্ডো পরা মেয়েরা গুছি বিনুনিতে চুল বেঁধে বাজার করছে । অনেকের চুলের রং সোনালি ও ঢেউ খেলানো । কোঁকড়া আফ্রিকান চুল শুধু ছেলেদের ও বর্ষীয়সীদের । দেলফিন জানাল, মেয়েরা অনেকেই এখন রংপসন্দ পরচুলা পরে নেয় । ক্যামেরুনের মেয়েদের সোনালি চুল আর সোনার পাথরবাটি একই অর্থ বহন করে শেখাল আমাকে । কোঁকড়া চুল বাড়ে না, তাছাড়া আঁচড়ানোর নানা ঝামেলা । তাই পরচুলাও কাঁধ ছাড়িয়ে সটান নামছে । আমার তো দেখতে বেশ লাগল । দেলফিন ও আলফনসোর এসব তেমন পছন্দ নয় বুঝতে পারছিলাম । একটি দোকানে মাছ বিক্রি হচ্ছে, সাইনবোর্ডে লেখা অ্যান্টি ক্রাইসিস মাছ । তিনজনেই হেসে উঠলাম । দেলফিন জানাল, দেশের অবস্থা তেমন ভালো নয় । বেতন কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, মাছের কিলো ফরাসি সত্তর ফ্রাঁ, মাংসও ওই দামেই । সুখের কথা জমি খুব উর্বর । শাকসবজি ফলমূল ফলে সহজেই । গ্রামে তেমন অসুবিধা নেই । কিন্তু দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে উন্নত জীবনের আশায় । ফলে দারিদ্র আরও বাড়ছে । ধনীরা অসম্ভব ধনী । বাড়ি-গাড়ি কিছুরই অভাব নেই । শহরের পথে দেখেছিলাম অল্পবয়সী দু-তিনটি ছেলে দাঁতে নখে মারামারি করছে । লোকজন নিরপেক্ষ । শহরে ড্রাগ সমস্যা আছে, প্রায়ই ছিনতাই, ডাকাতি চলছে । একটা না শেষ করা বিশাল শূন্য বাড়ি দেখিয়ে দেলফিন বলেছিল, ‘প্রীতি, এর নাম মরণ প্রাসাদ । গভীর রাতে নিঃসঙ্গ পথচারীকে গ্যাংস্টাররা তুলে নিয়ে খালি বাড়ির কোনায় সবকিছু কেড়ে কখনও খুন করে ফেলে রেখে যায় । অথচ সবকিছু ঘটছে টগবগে শহরের মধ্যে । সাবধানে থাকতে হয় ।’

গাড়ি চলছে শহর কেটে। একটাই রাজপথ। আলফনসো টেপে বাজাচ্ছে অচেনা ভাষার গান। বাসা উপজাতির ভাষা-

'মু দো বিগ বাগা রে

মু ভুম লা জিবো আনা টগ দ লা না-

তোর কাঁচা বয়স চাখ রে বিয়ার বল স্বাদু কি বিস্বাদ-'

দুশো উপজাতি, ভাষা, আচার ব্যবহার, উৎসব, এক গ্রাম থেকে আরেক গাঁয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। বান্টু উপজাতির মধ্যেই ভাগাভাগি। দেলফিন বুলু, আলফনসো বেতি। কিন্তু রাজধানীতে বলা হয় বাসা ভাষা। সকলেই সে ভাষা বলতে ও বুঝতে পারে। ভাগ্যিস! দেলফিন যেন ইতিহাসের পাতা উল্টে কথা বলে চলেছে। ওর ফরাসি ভাষায় আফ্রিকান ছাপ। খুব ভালো লাগছিল শুনতে।

ক্যামেরুন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বিখ্যাত নৌসেনাপতি হানন কার্থেজ থেকে জাহাজ ভাসিয়ে আসেন এখানে। সমুদ্র থেকে দেখলেন উঁচু পাহাড়ের ওপরে আগুনের শিখা জ্বলছে, রাতের আকাশের অন্ধকার গিলে খাচ্ছে লাল রঙের আগুন, উগরে দিচ্ছে আগুনের স্রোত এত জোরে যে লাভা গড়িয়ে আসছে সমুদ্রের দিকে। কত দিন আগে মাউন্ট ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরির বর্ণনা তাঁর লেখায়। এই মুহূর্তে সেই আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। হাননের আঁকা ছবি নিজের চোখে দেখে এসেছি। সে কথায় পরে আসব। তিনি ওই পাহাড়ের নাম দিলেন 'ঈশ্বরের রথ'। কার্থেজের নাবিকেরা পাহাড়কে ঘিরে ইতিহাসের পাতায় দেশটিকে লিখে রাখল। বহুদিন পর ১৪৭২ সালে পর্তুগিজ নাবিকেরা এ দেশের উরি নদীর মোহানা আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখল জলে হাজার হাজার চিংড়ি মাছ। তারা নদীর নাম দিল Rio Dos Camaroes চিংড়ি-নদী। কামারোয়েস থেকে দেশটির নাম ক্যামেরুন। ৪,৭৫,০০০ কিলোমিটার চওড়া, অপটু হাতে আঁকা ত্রিভুজ আকৃতি পশ্চিম আফ্রিকায় গিনি উপকূলের কাছে ক্যামেরুন। এই দেশের দক্ষিণে, নিরক্ষীয় গিরি, গ্যাবন, কঙ্গো; দক্ষিণ পশ্চিমে অতলান্ত আটলান্টিক, পশ্চিমে নাইজিরিয়া, পুবে সেন্টার আফ্রিকা আর চাদ। উত্তরে, করিডরের মতো হাত বাড়িয়ে দেশটি ছুঁয়েছে মাছে ভরা 'চাদ' হ্রদ। আফ্রিকায় বিদেশিদের পায়ের ছাপ বারবার পড়েছে। ক্যামেরুনের ইতিহাস ব্যতিক্রম নয়। পর্তুগিজদের পর এল ওলন্দাজ, জার্মান। ১৯১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের পর ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দেশটাকে ভাগাভাগি করে উপনিবেশ গড়ে তুলল। পশ্চিমে ফরাসি আধিপত্য, পুবে ব্রিটিশরাজ। এত কথা লিখতে হল দেশটার চরিত্র বোঝার জন্য। দুই দেশই ক্যামেরুনে ছাপ ফেলে গেছে ভালো ভাবেই। ফরাসি দেশ নিজেদের মতো অঙ্গীভূত করে আর ইংরেজরা পরোক্ষ শাসনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় চেতনা

আফ্রিকায় যে নতুন হাওয়া আনল তা ছুঁয়ে গেল এ দেশের দুটি বিচ্ছিন্ন উপনিবেশকে। ১৯৬০ সালে ফরাসি আধিপত্যের অবসান ও আংশিক স্বাধীনতা, ১৯৭২ সালে পুরো দেশ ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন, প্রজাতান্ত্রিক সরকার। শুধু ভাষা থেকে গেল বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণের লোকেরা ইংরিজি বলে। পিজিয়ন ইংলিশ সাধারণ মানুষ তৈরি করেছে ফরাসি আর ইংরিজি শব্দ মিশিয়ে পারস্পরিক সমঝোতার জন্য। বাকি দেশে ফরাসি।

আমরা চলেছি নতুন তৈরি হওয়া মসজিদের দিকে। ইয়ায়ুন্দে শহর তৈরি নিয়ে কাহিনী শোনাল দেলফিন। অনেকদিন আগে সাভানার তৃণভূমি ছেড়ে এওন্ডো উপজাতিরা নাগদেবতার পিঠে চড়ে সানাগা নদী পার হয়ে বাসা বাঁধল এই সাত পাহাড়ের চূড়ায়। গড়ে উঠল আজকের রাজধানী। উঁচুতে উঠছি, নিচে ইট সিমেন্টের তৈরি বাড়ির জঙ্গল, সবুজের কোনও ছোপ দেখছি না। অথচ এই ওপরে বৃষ্টিধন্য গাছের শ্যামলিমা চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। লাল মাটির রাস্তা পেরিয়ে উঠছি ফিবি পাহাড়ের দিকে। ফ্ল্যামেঙ্কো গাছ লাল ফুলে ছেয়ে আছে, বুনো ঝোপে হলুদ মার্গারিটা ফুটে আলো করে রেখেছে যেন ধুয়ে দেবে অনেক নিচে পড়ে থাকা শহরের মালিন্য। দুধারে আমগাছ, ফলের ভারে নিচু। পাতা দেখা যাচ্ছে না। দেশ ছাড়ার পর এত ফল ভারানত আমগাছ চোখে পড়েনি। কলার কাঁদি, বিশাল পাকা পেঁপে গাছে গাছে। মনে হচ্ছে গাড়ি থামিয়ে কয়েকটা তুলে আনি। রাস্তার ধারে এমন ফসল, অথচ চুরি হয়ে যাচ্ছে না দেখে অবাক লাগল। মসজিদের কাছে পৌঁছলাম। ধপধপে সাদা ও নীলে প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে। মিনারের মাথা থেকে দুপুরের আজান ভেসে এল। ভেতরে শ্বেতপাথরের ছড়াছড়ি। মাদ্রাসা, প্রার্থনা ঘর, বিশাল চত্বরে তিনহাজার লোক বসতে পারে। একটি তরুণ মৌলবি আমাদের চারদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। নির্জন মসজিদে আমাদের উপস্থিতি তাঁর ভালোই লাগল মনে হচ্ছে। বাইরে খোলা চত্বর রোদে ভেসে যাচ্ছে। সামনে ফিবি পাহাড় সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা। নিচে ঢালু উপত্যকা। গরুর গলার ঘন্টা বাজছে। শব্দ প্রতিধ্বনিত মসজিদ মাঠ প্রান্তর উপত্যকা ঘিরে। ধীর গতিতে পাহাড়ে গাড়ি উঠছে। এই পাহাড়ের চূড়ার ওপরের মঠে মহামান্য পোপ দ্বিতীয় জন পল দুবার কয়েকটি দিন কাটিয়েছিলেন। দেলফিন প্রটেস্ট্যান্ট, আলফনসো ক্যাথলিক। দেশে প্রায় সমান সংখ্যক ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও মুসলমান। তাছাড়া বিভিন্ন উপজাতির আছে নিজেদের সর্বপ্রাণবাদমূলক ধর্মবিশ্বাস। সেও অসংখ্য। দেলফিন বলল, এতেও রক্ষে নেই। ইসলাম, খ্রিস্টধর্মেও নানা শাখা গজাচ্ছে। দেশের মানুষ দুঃখ, আর্তি দারিদ্রের হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়ে এরকম অনেক ফাঁদে পড়ছে।

ফিবি পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি। একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে আমরা তিনজন গল্প করছি। পাশেই গড়ানো ঢালু জমিতে তিনটি কমবয়সী মেয়ে বাদাম গাছ পুঁতে চলেছে নিচু

হয়ে । এখানে মেয়েরা খুব পরিশ্রমী । পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল । অনেকে ঝোপ থেকে পাতা তুলছে সাবধানে একটি একটি করে । তৈরি হবে ভেষজ ওষুধ । জড়িবুটিতে বিশ্বাস অগাধ । আলফনসোর কৈশোরে হাম হয়েছিল । বাড়িতে ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক, শেকড় বেঁটে খাওয়ানো, তারপর তাকে নোংরা ফেলার খালি টিনের ড্রামের ওপর একপায়ে নাচানো হয়েছিল । তার কথায় রোগ দুদিন পরেই উধাও । গা ঝরঝরে । ছেলেমেয়েদের অসুখে ডাক্তার না ওঝা কী ডাকবে জিজ্ঞেস করলাম । লজ্জিত হাসিতে জানাল, ডাক্তার । সবাই গুণিন বা ওঝা নয় । বুজরুকেরাও সংখ্যায় অনেক । নেমে আসছি, দেখি চেনা ফুল জবা, করবী, চাঁপা ফুটে আছে । নানা রঙের প্রজাপতির ওড়াউড়ি । লাল মাটি, হলুদ ফুল, সবুজ খেত প্রকৃতির বাহারি রূপ । পথে একটি অ্যান্টিক মুখোশের দোকান । মালিক শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো । ভেতরে দুই রানির কাঠের মূর্তি আমার চোখে ধরল । খোলা বুকে করোটির মালা, মুখে হাতির দাঁতে তৈরি দন্ত বিকশিত হাসি, মুখে লম্বা পাইপ, কটিবস্ত্রে কড়ি, পাখির পালক, মাকড়সার জাল সাজানো । দেলফিন শিউরে উঠে বলল, মেয়েদের যে এখানে ভালো চোখে দেখা হয় না এই নারীমূর্তি দুটি তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর । নিজের কথা জানাল । আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল ভুল মানুষকে । চার সন্তানের জননী হয়েও নিস্তার পায়নি । প্রতিদিন প্রহৃতা হয়েছে স্বামীর হাতে । বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে হয় প্রথমে নিজের গোষ্ঠী সংসদের কাছে, সেখানে সাত বছরের ওপরে সন্তানের ওপর মায়ের কোনও অধিকার নেই । উপার্জন না করা মায়ের অধিকার নেই কোনও সন্তানকেই কাছে রাখার । মদ্যপ স্বামীর অবহেলায় যখন চার বছরের ছেলে তৌকা জলে ডুবে মারা গেল দেলফিন সরকারি কোর্টে বাকি তিনজনকে ফিরে পাওয়ার আবেদন জানিয়ে কাছে এনে মানুষ করে তুলছে । নিজে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে এই ঝড়ঝাপটের মধ্যে । শিশু ও নারী অবহেলিত । তারা ডিম খেতে পাবে না, বিষাক্ত সাপ দামি খাবার এখানে । গোষ্ঠীপতি, স্বামী ও পুরোহিতকে দিয়ে অন্য পুরুষেরা তার অংশ পাবে, মেয়েরা বা শিশুরা কখনওই নয় ।

ফরাসি দেশের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ইয়নিক নোয়া ক্যামেরুনের ছেলে । মা ফরাসি । বাবার কাছেই তার টেনিস খেলার হাতেখড়ি । সেখানে গেলাম । বিশাল বাগানঘেরা সাজানো বাড়িতে তিনি সমাদরে বসালেন । ছেলেকে নিয়ে পিতা গর্বিত, একই সঙ্গে দুটি মেয়ের সম্বন্ধেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা । আইডিয়া পাল্টাচ্ছে ফিসফিসিয়ে দেলফিনকে বললাম ।

সন্ধেয় নেমন্তন্ন ছিল শিক্ষাসচিব মসিয় মুলাঁর বাড়ি । তাঁর এক ছাত্র অঙ্কে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন, তাঁরই সম্বর্ধনায় । প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন জুরি এসেছেন । বিশাল বাড়ির সামনে পুলিশ পাহারা । ঝকঝকে বাড়ি, অথচ সামনে লাল রঙের কাঁচা

রাস্তার গর্তে বৃষ্টির জল জমে আছে । পেরনো মুশকিল । অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল । এলাহি কারবার । খাওয়ার টেবিলে কত অজানা খাবার । সাপের কোনও তরকারি থাকলে মেয়ে হিসেবে আমার পাতে পড়বে না, এই ভেবে যা সান্ত্বনা । বিভিন্ন প্রদেশের আলাদা রান্নার স্টাইল । মাদাম মুলাঁ উত্তর পশ্চিমের মেয়ে । স্পেশ্যাল খাবার হল সবজি Kwem । মানিয়কের পাতা জলে সেদ্ধ করে বেঁটে মণ্ড তৈরি করেছেন, জানালেন খুব পুষ্টিকর, গায়ে জোর আনে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয় । তাঁর প্রদেশের শতকরা আশিজনের মূল খাদ্য । সঙ্গে কাঁচা কলা ভাজা, মাকাবো বা আলু টুকরো করে সেদ্ধ । ইয়ায়ুন্দের খাবারও ছিল । Ntomba nam, বাটা চিনাবাদাম দিয়ে মাছ ও মাংস মাখানো হয় তারপর কলাপাতায় মুড়ে রান্না । পাতুরি বলে ডাকব? দারুণ খেতে । টাটকা সিরিউল মাছ কালো সসে রান্না করা-চারা পোনার স্বাদ । Ndole (দোলে), মাংসের কিমা দেওয়া শাক । এল miondo । রান্না করতে ধৈর্য চাই । মানিয়কের (বনে দেখেছি তেঁতুল ছড়ার মতো ঝুলে থাকতে) খোসা ছাড়িয়ে তিন চারদিন হাঁড়ির জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে নরম করার জন্য, কষ দূর করার জন্য । তারপর বারবার জলে ধুয়ে হাতে চিপে জল বার করে মিহি করে পিষে সাদা ময়দার মতো মাখা আর গোল করে কেটে কচি কলাপাতায় মুড়ে রাখতে হয় । গরম বা ঠান্ডা যার যেমন পছন্দ কেটে খাও । ভাতও ছিল । শেষ পাতে মিষ্টি আম, কলা, আনারস । খাওয়ার মধ্যেই বারবার ধন্যবাদের হরির লুঠ, বাইবেল থেকে প্রার্থনা আবৃত্তি বহুক্ষণ চলল । রাত বারোটায় বন্ধু গি ও তার নৃতত্ত্ববিদ স্ত্রী আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছেন যখন, মনে হল সুনসান শহরে মরণের ফাঁদ বাড়িটার একটা ঘরে আলো জ্বলছে ।

পৃথিবীর ছোট মানুষদের দেখতে বেরিয়েছি । আলফনসো জানিয়েছিল পুরো একটা দিন হাতে পেলে সে দেলফিন সহ আমাকে রাজধানী থেকে অনেক দূরে গিনি উপকূল ও গ্যাবনের সীমারেখার কাছে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারে পিগমিদের দেখা পাওয়ার জন্য । আমরা আজ সেই পথে চলেছি । গাড়ি ভর্তি তেল নেওয়া হল । ওপর মহলে তেমন করে খবর দেওয়া হয়নি । যদি বাধা পড়ে! হাট থেকে কিনলাম কয়েক বস্তা নুন, গোটা তিরিশেক সাবান, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, লজেন্স, প্যাকিং বাক্স ভর্তি রুটি । না, বনে বাস করার রসদ নয় । ছোট্ট মানুষদের জন্য সামান্য উপহার । খোলা বাজারে শাকসবজি, ফল রঙের বাহারে ঝলমলে । ময়দার গোলা জিলিপির মতো ভাজা হচ্ছে । সঙ্গী দুজন মনের আনন্দে গরম এক এক প্যাকেট হুসহাস ওড়াল । এবার চলেছি দক্ষিণে সাংমেলিমা অঞ্চলের দিকে । জুম শহর পর্যন্ত রাস্তা ভালো । দুধারে ছোট ছোট গ্রাম সবুজে সবুজ । বৃষ্টি এল তোড়ে । নিও নদী পেরলাম । বৃষ্টি আটকাতে কলাপাতায় মাথা ঢেকে চলেছে স্কুলের পথে ছেলেমেয়েরা । রাস্তায় পচা শিম্পাজি জলে ভিজছে । ছোট্ট

ব্রিজের নিচে সরু নালায় ট্রাক পড়ে আছে । পোড়া মাছ বিক্রির জন্য বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা একজন । আলফনসোর গাঁ এবোলা পেরলাম । আগে ওকে এখানে বাস থেকে নেমে হাঁটতে হত ত্রিশ কিলোমিটার, বাড়ি পর্যন্ত । এখন বাড়ির সামনে বাস থামে । শুধু গাঁয়ে আসার সময় মেলে না । অঙ্গুলি নির্দেশে দূরে একটা ভাঙা চালার দোকান দেখিয়ে জানাল, ওখান থেকে বাবার হাত ধরে ওর পনেরো বছর বয়সে প্রথম জুতো কেনার কথা, সেই নতুন জুতোর গন্ধ এখান দিয়ে গেলেই ওর স্মৃতিতে ভেসে আসে । জুম পেরতেই ঝুপ করে লাল মাটির উঁচু নিচু কাঁচা রাস্তা, বৃষ্টি হয়ে গেছে । পিছল পথ খানাখন্দ পেরিয়ে দুধারে আফ্রিকার ঘন জঙ্গল পাশে রেখে গাড়ির তরঙ্গময় গতি । অনেকটা পথ পেরলাম । কাঠের গুদাম, টিনের চালা । পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে লরি ভর্তি সাপেলি, আবলুস আর লাল টুকটুকে দীর্ঘ গাছের কাঠের গুঁড়ি । কাঠ দেশের প্রধান বাণিজ্য পণ্য । বাদাম খেত, লিবি, আবুঙ্গা আরও কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে এখন গভীর জঙ্গলে ঢুকছি । দুধারে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মিটার লম্বা গাছ দাঁড়িয়ে । বাওয়াব গাছ দেখিয়ে দেলফিন জানাল, ‘দেশের পবিত্র বৃক্ষ । এখানে কেউ কোনও বিষয়ে দক্ষতা দেখালে বলা হয় উরে বাবা, একেবারে বাওয়াব গাছ যেন ।’ গাছেরা এ ওর উঁচু মাথা ছুঁয়ে দাঁড়ানো । আকাশ দেখতে পাচ্ছি না । জঙ্গলে এক আশ্চর্য গা ছমছম করা নৈঃশব্দ্য । ঘন সবুজে রঙিন ফুলের ফুটকি । আকাশ চুইয়ে কখনও সূর্যের আলোর ক্ষীণ রেখা । মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে । বন না গুহা! দম বন্ধ ভাব । ছ কিলোমিটার হাঁটলে গরিলার দেখা পাওয়া যাবে জানাল আলফনসো । কোনও সাধ নেই । এক কিলোমিটার দূরে চোখে পড়ল পিগমিদের ক্ষণবসতি পাতার ঝুপড়ি, যাতে কালকেই অন্য কোথাও আরও গভীর জঙ্গলে চলে যেতে পারে বাড়ির তোয়াক্কা না করে । এই বিশাল বনের মালিক যেন ছোট মানুষেরা । দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা । সরকার চেষ্টা করছেন তাদের বিচ্ছিন্নতা থেকে সরিয়ে এনে গাঁয়ের ধারে কাছে বাসা বেঁধে দিতে । সফল হওয়া কঠিন । কয়েকটি পর্ণকুটির এলোমেলো ছড়ানো । দলপতি একা বসে আছে । আলফনসোর প্রশ্নে জানাল, সবাই এখন বনে আহার্য আহরণে বেরিয়েছে । একটা বড় বাওয়াব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে শিস দিয়ে উঠল । বনের নিস্তব্ধতা চিরে উঁচু গাছের সারির ওপর দিয়ে ডাক ভেসে গেল । অল্প কিছুক্ষণ পরেই বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখছি দলের অন্যান্য সদস্যদের । কী সহজ চলাফেরা! বন থেকে শিকার করে ফিরছে । রোদে পোড়া ক্লান্ত মুখ । আমি কোনও উপহার এনেছি কিনা, টাকা দেব কিনা এসব কিছু না জেনেই মেয়েরা কোমরে গুঁজে নিল ফার্ন পাতার অলঙ্কার, ছেলেরা মাথা ঘিরে পরল বিনুনি করা ঘাসের শিষ । কাঠের গুঁড়ির ওপর চামড়া লাগিয়ে তৈরি ড্রাম । দ্রিমিদ্রিমি ঢাকের মতো আওয়াজের তালে ওরা নাচছে । আমরা সবাই ওই আনন্দ উৎসবে যোগ দিলাম । মেয়েরা গাইছে-

'মাম এ এ ও মা মা ইয়া ইয়া ও

মামা লে কো বাবা লেকো

লু তা লু তা ইয়া ও ও ও...

লু তা লু তা ইয়া ও ও ও...'

হাততালি দিয়ে একই সুরের গান আর সারি দিয়ে নাচ। হঠাৎ বৃষ্টি এল। আমরা পাতার কুটিরে এ-কোণে ও-কোণে মাথা বাঁচাতে দাঁড়াচ্ছি। বাড়ির ছাদে ফুটো, শালপাতার মতো দেখতে পাতা কাঠি দিয়ে ফুটিয়ে সারাবার চেষ্টা করছে। ওদের চালা ঘরে জ্বালা আগুন ঘিরে দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলছিলাম আর মনে হচ্ছিল নাগরিক সভ্যতা কত দূরে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আগুনের ধুনি থেকে ভ্যাপসা তাপ উঠে আসছে। হাতে হাতে ঘুরে যাচ্ছে আমাদের আনা উপহার সিগারেট। একটি মেয়ে তেকে ফল ভাঙছে, কানে গলায় কাঠের গয়না। তেকে থেকে তৈরি হবে ভেষজ তেল। মা ছেলেকে বুকের দুধ দিচ্ছে, দুজনের পা ভর্তি খোস পাঁচড়া। তেকে তেল মাখলে সারবে। বুতাঙ্গার হাঁটুতে বিরাট ক্ষত, বয়স্ক পুরুষ সবুজ পাতার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে তার ওপর বিশল্যকরণীর মতো। বুতাঙ্গাকে ভেবেছিলাম কিশোর। আসলে সে তিন সন্তানের পিতা, পূর্ণ যুবক। এরকম অনেক বিস্ময় জমা হল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত। সেদিন ওদের শিকারের ঝুড়িতে ছিল চাক ভাঙা সামান্য মধু ও একটি শীর্ণ মৃত সরীসৃপ। কুড়িটি পেট ভরাতে হবে। আমাদের উপহার রুটি ও অন্যান্য খাবার পেয়ে খুব খুশি। উচ্ছ্বাস নেই। আরও ভালো লাগল। দেশলাই তো ওদের কাছে পরম সম্পদ। তাই খুব যত্নে রাখল। যেখানেই যাক আগুন ওদের প্রিয় সঙ্গী। সারাদিন বনে কাটায় খাদ্যের খোঁজে। নাগরিক মানুষ এদের খুঁজতে আসে বনে। কেউ কেউ আসে রান্নার বাসন বা জামাকাপড় বিক্রি করতে। বিনিময় মুদ্রা ভেষজ ওষুধ যার খোঁজ জানে শুধু বনের খুদে মানুষেরা। তাছাড়া চাক ভাঙা মধু, শিকারের ফসল লোভনীয় খাবার-বাঁদর, শিম্পাজি, সজারু, অজগর সাপ ইত্যাদি। পিগমিরা নাগরিক পোশাকে আচ্ছাদিত কেন এখন বুঝতে পারলাম। জরাজীর্ণ জামাকাপড়, কিন্তু আবৃত। এদের দেখা পাওয়া খুব কঠিন। কখন কোথায় চলে যাবে নিজেরাই জানে না। তাই নিজের কপালকে নিজেই সাধুবাদ দিলাম। ফিরছি জঙ্গল ছেড়ে শহরের পথে। দেখি রাস্তায় শিকারের পসরা সাজিয়ে বসেছে কয়েকজন। বাঁদর, পাইথন, হরিণ, বিষাক্ত সাপ কী নেই! ছবি তুলতেই সাংঘাতিক চেঁচামেচি! এক রমণী তো এই মারে সেই মারে। দেলফিন আমার হাত ধরে গাড়ির দিকে ছুটল। পরে শুনলাম ছবি

তোলাতে ওদের ভীষণ আপত্তি। ছবির মাধ্যমে আত্মা চুরি করে ওকে মেরে ফেলে অন্য দেশে আমি তাকে ক্রীতদাস বানিয়ে কাজে লাগাতে পারি এই বিশ্বাস অনেকের।

দুদিন পর আমরা বড় শহর দুয়ালা গেলাম। উরি নদীর কোল ঘেঁসে বন্দর শহরে সবসময় কর্মচাঞ্চল্য। অনেকদিন আগে মধ্য আফ্রিকার বান্টুরা বসতি বাঁধে। এখন নানা জাতি উপজাতি, বিদেশি বণিক ভিড় জমিয়ে শহর গুলজার করে রেখেছে। আলফনসো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে হাটবাজার, মুখোশের পসরা, মাছের ভেড়ি। বোনাকুয়ামাং পাড়ায় আম্রকুঞ্জের কাছে দাঁড় করিয়ে ভুতুড়ে কাহিনী শোনাল। মৃত্যু প্রায় সব গল্পের প্রাণবিন্দু। কোনও এক সময় এক ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ী লোকজন জুটিয়ে গাছ কেটে প্রাসাদ তৈরি করবে ঠিক করেছিল এখানে। গাছেরা ডালপাতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করে তাদের। চারদিকে নিষেধের বেড়া দেওয়া। উরি নদীতে গিয়ে মিশছে তিরতিরে বোপি নদী। গরম বেশ। জলে পা ছোঁয়াতে যাব আলফনসো বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'সর্বনাশ! কোনও রহস্যময় কারণে কেউ জলে নামলেই ডুবে মরে এখানে।' শহর ছেড়ে বাঁদর-বনের পাশ দিয়ে চলেছি তোকোতো ঝরনার দিকে। সেখানে নীল রঙের 'পুরোহিত হ্রদে' ঝাঁকে ঝাঁকে মাছেরা খেলা করছে। কেউ ধরে না। কবে নাকি এয়োন্ডোর মেয়েরা দল বেঁধে মাছ ভর্তি হ্রদে আহ্লাদে ডুব দেয় কোঁচড় ভরে মাছ ধরবে বলে। শান্ত হ্রদের নিচে সলিল সমাধি তক্ষুনি। এখানেও পা ভেজানো যাবে না। আলফনসোর মতো ক্যামেরুনের অনেকেই এসব কাহিনী বিশ্বাস করে।

দক্ষিণ-পশ্চিমে বুয়া ও লিম্বে শহরের দিকে ক্যামেরুন পাহাড়ের আগ্নেয় বিস্ফোরণ দেখতে চলেছি। একদিকে অতলান্তিক সাগর সাদা ফেনার মুকুটে তীরে আছড়ে পড়ছে, অন্য দিকে পাহাড়চূড়ায় ক্র্যাটারে আগুন আর ধোঁয়া। হোটেল মাউন্টেন হিলে জায়গা পেলাম। জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছি আগুনের ধোঁয়া। রাতে গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম আগ্নেয়গিরির পায়ের কাছে। লাভার জ্বলন্ত স্রোত গড়িয়ে নেমে আসছে উঁচু থেকে। গাছে ডালে পাতায় আগুন ঝাঁপাচ্ছে আর আমরা ছ-সাত মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছি রাতের অন্ধকারে। আলো শুধু পাহাড়ের ক্র্যাটারে। দিনে আবার গেছি। লিবের আগ্নেয়গিরি আজ সকালে উন্মাদ। তরল কমলা রঙের লাভা গড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। পাথর জ্বলতে জ্বলতে কী ভীষণ আওয়াজ করে ছিটকে পড়ছে! ক্র্যাটারের হাঁ মুখে গনগন আগুন-জ্বলে যাচ্ছে তালের বন, রাবার খেত, গরিব গাঁ। আগুনের হলকায় মুখ তেতে উঠছে। বাতাসে পোড়া গন্ধ। বারবার তাড়া দিচ্ছে ফেরার জন্য। যে কোনও মুহূর্তে লাভা গ্রাস করে নিতে পারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে টুকু দূরত্ব। বাকুঙ্গিনি, পতোপতো গাঁ আগুনের চাবুকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লাভা স্রোত সমুদ্র পর্যন্ত গড়িয়ে আসার অশুভ সম্ভাবনা আছে। তাই গাঁয়ে ঘরে ওঝারা পুজোআর্চা করছে। অগ্নি পাহাড়ের দেবতা 'এফাসো মতো' ক্রুদ্ধ

হয়েছে নানা কারণে। টিকা গাঁয়ে গিয়ে দেখি ওঝারা পড়ছেন ঈশ্বরের রথকে শান্ত করার মন্ত্র। সামান্য দূরে অগ্নিরথের বহ্নিশিখা দপদপ করে জ্বলছে।

ভ্রমণ অক্টোবর, **১৯৯৯**

ডুয়ার্সের দুয়ার এখন খোলা

সমরেশ মজুমদার

জন্মেছিলাম উত্তর বাংলায়, বড় হয়েছি জলপাইগুড়ি শহরে । কলেজে পড়ার সময় যখন জেলাটাকে চষে ফেলেছি তখন কোথাও রাত কাটাবার কথা হলে খোঁজ নিতাম পরিচিত কেউ আছেন কিনা । না থাকলে পি ডাব্লু ডি বা ফরেস্ট বাংলোয় চলে যেতাম । সাঁইত্রিশ বছর আগে ওই সব বাংলোয় গেলে দেখা যেত ঘর খালি পড়ে আছে । ওপরে দুটো শোবার ঘর নিচে খাওয়া বসার জায়গা । ভাড়া ঘরপিছু পাঁচ টাকা । সর্বত্র যে এইসব বাংলো ছিল তা নয় কিন্তু উত্তর বাংলায়, শিলিগুড়িকে বাদ দিলে কোথাও রাত কাটাবার জন্য ভালো বা অল্প ভালো হোটেল ছিল না । দার্জিলিংকে আমরা উত্তর বাংলার মধ্যে ধরতাম না । কারণ তিনধারিয়াতে গেলেই যাঁদের দেখতে পেতাম তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও মিল খুঁজে পেতাম না ।

খোদ জলপাইগুড়ি শহরে তখন হোটেল বলতে ছিল দুটো, ওয়েসিস আর রুবি বোর্ডিং । ওয়েসিসকে হোটেল বলতে অস্বস্তি হত, রুবি বোর্ডিং ছিল মধ্য বা নিম্নবিত্তের একমাত্র থাকার জায়গা । পরে আরও কয়েকটি হোটেল হয়েছে কিন্তু তাদের শ্রীহীন চেহারা বড় বেদনাদায়ক । খোদ শহরের যখন এই অবস্থা তখন ধুপগুড়ি ময়নাগুড়ি গয়েরকাটার অবস্থা কী তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে ।

এর অন্যতম কারণ তখন জলপাইগুড়ি জেলা বা ডুয়ার্সে কোনও ট্যুরিস্ট হুট করে আসতেন না । আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থাকলে তাঁদের দেখা যেত । কলকাতার মানুষ শিলিগুড়ি হয়ে চলে যেতেন দার্জিলিং কালিম্পংয়ে । গ্যাংটকের আকর্ষণ বেড়েছে বছর কুড়ি আগে । শুধু প্রচারের অভাবে ডুয়ার্স এবং জলপাইগুড়ি ছিল অন্ধকারে ।

তখন জলপাইগুড়ি শহরের গায়ে তিস্তা নদী প্রবল বেগে বয়ে যেত । তার ওপর কোনও সেতু তৈরি হয়নি । প্রতিবছর বন্যার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতাম । বর্ষায় তিস্তার মাইলখানেক দূরত্ব পারাপার করতে হত নৌকায় চেপে । সমস্ত ডুয়ার্সের যাবতীয় বাস এসে দাঁড়াত দোমহনিতে, জলপাইগুড়ির উল্টোদিকে তিস্তার পাড়ে । প্রচুর মানুষ নানান কারণে নৌকায় চেপে শহরে এসে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সন্ধের মধ্যেই নদী পেরিয়ে আবার ওইসব বাসে উঠে পড়তেন । শহরে থাকার সমস্যাটা এড়িয়ে যেতেন তাঁরা

। শীত পড়তে বালির চর জেগে উঠত মাঝে মাঝে । সেখানে ছুটত পক্ষীরাজ ট্যাক্সি যার হর্নের প্রয়োজন হত না । সেই সময় আমরা ডুয়ার্স দেখতে যেতাম ।

দোমহনি থেকে প্রথমেই ময়নাগুড়িতে । এখানে রাস্তা দুটো দিকে গেছে । একটা লাটাগুড়ি হয়ে চালসা, দ্বিতীয়টা ধুপগুড়ি হয়ে গয়েরকাটা বীরপাড়া । ময়নাগুড়ি মূলত গঞ্জ এলাকা ছিল । নানা রকম ফসল বিক্রি হত । গয়েরকাটার সতীমাস্টার ময়নাগুড়িতে চলে এসে বাচ্চাদের নিয়ে নানান কাণ্ড করেছিলেন । সুকান্তর কবিতা থেকে ব্রতচারী, নাটক, কী না! আমরা চলে যেতাম লাটাগুড়ি । কোনও যানবাহন নেই, হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গরুমারা ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে যেতাম । কেউ তেমন যায় না তাই কোনও কড়াকড়ি বা আইন ছিল না । বাংলোটা কাঠের, পাশে কর্মচারীদের আস্তানা । কিন্তু জঙ্গল ছিল ঘন । হাঁটার সময় বুক ঢিপ ঢিপ করত । মানুষের অস্তিত্ব যেহেতু নেই বললেই চলে তাই হাজারও নাম না-জানা পাখির গলা শোনা যেত । দিনদুপুরে বাইসনের ঝাঁক দেখেছি নিচের তৃণভূমিতে । হাতির জন্য আটকে গিয়ে লাটাগুড়ি ফিরেছি সন্ধে পেরিয়ে, যখন শেষ বাস চলে গিয়েছে । ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই দেখে সরকারি অফিসের বারান্দায় রাত কাটিয়েছি মুড়ি খেয়ে । ভাতের হোটেল ছিল না ।

ময়নাগুড়ি থেকে অন্য রাস্তাটি ধরে কিছুদূর গেলেই ডানদিকের একটা রাস্তা ধরলে পৌঁছে যেতাম জল্পেশ মন্দিরে । ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আচমকা এই শিবের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো । অনেকে মনে করেন জলপাইগুড়ির নামকরণ এই জল্পেশ মন্দিরের জন্যই । শিবচতুর্দশীর সময় জল্পেশের ওই নির্জনে লক্ষ লোকের মেলা বসে । ওই মেলায় রাত কাটানোর বাসনা আমার পূর্ণ হয়নি । তিস্তায় নৌকা পারাপার বন্ধ হওয়ার আগেই ফিরে আসা বাধ্যতামূলক ছিল । পরে যখন স্বাধীনতা এল তখন মন থেকে ওই উত্তেজনা উধাও ।

ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে মিনিট কুড়ি বাসযাত্রায় ধুপগুড়ি পৌঁছনো । ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি ধুপগুড়িতে বিশাল হাট বসে । রাজবংশী অধ্যুষিত এই এলাকার যাবতীয় ফসল তো বটেই শীতকালে কমলালেবুর পাহাড় তৈরি হয় দোকানে দোকানে । তখন সেই ষাট সালে এক টাকায় আশিটা লেবু পাওয়া যেত । দরদস্তুর হত ওই আশির হিসাবে ।

ধুপগুড়ি ছাড়িয়ে মাইল চারেক গেলেই শুধু প্রকৃতি নয় মানুষও বদলে যেত এবং এখনও যায় । দুপাশের চাষের খেতের বদলে সবুজ চায়ের বাগান, তার শেডট্রি চোখের আরাম এনে দেবে । রাজবংশীদের বদলে মদেশিয়া ওঁরাও শ্রমিকদের এলাকা শুরু । ডুয়ার্সের চা-বাগানের প্রথম বাগান এই রাস্তায় হল গয়েরকাটা ।

গয়েরকাটায় ঢোকার আগেই জঙ্গল এবং চা-বাগানের মধ্যে বয়ে যাওয়া ডুডুয়া নদীর দুপাশের নিসর্গ আজও ভুলতে পারি না । গয়েরকাটার শরীর জড়িয়ে বয়ে যাওয়া আংরাভাসা যার শুরু চিমাগুড়ি থেকে শেষ ডুডুয়ার বুকে, তা আমার কাছে স্বপ্নের নদী । মাঝে মাঝে কোমর ছুঁলেও হাঁটুজলের ওই নদীকে দেখলেই আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে বলে মনে হত । মদেশিয়া মেয়েরা তাদের সায়ার ওপর যে কালো কাপড়টি জড়িয়ে রাখত তাকে বলত আংরা । নদী পার হওয়ার সময় সেই আংরার প্রান্ত জলের ওপর ভেসে থাকত বলেই বোধহয় নাম হয়েছিল আংরাভাসা ।

গয়েরকাটার দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে খুঁটিমারির জঙ্গল । তখন ছিল কাজ চলে যাওয়ার মতো একটা কাঠের বাংলো । লোকজন কালেভদ্রে যেত । আর একটু দূরে নাথুয়া । এই নাথুয়ার কাছে ডায়না নদী আর জলঢাকার মিলন হয়েছে, যেখানে দাঁড়ালে পৃথিবীতে চিরকাল থেকে যেতে ইচ্ছে করবে ।

গয়েরকাটা চৌমাথা থেকে একটা রাস্তা গেছে বানারহাট ছাড়িয়ে ভুটানের সামচির দিকে, অন্যটি বীরপাড়া হয়ে আলিপুরদুয়ার অথবা হাসিমারার দিকে । ওই রাস্তার একপাশে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সে সময় মোটেই প্রচারিত নয় । হাসিমারা হয়ে ফুন্টশোলিং যেত খুব কম মানুষ । হাসিমারা থেকে জয়ন্তীতে যাওয়া যেত । জয়ন্তীকে পশ্চিমবাংলার অন্যতম সুন্দর জায়গা বললে ভুল বলা হবে না । আগে আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সাদুয়ার হয়ে জয়ন্তীতে যাওয়ার একটা ট্রেন লাইন ছিল । এখন নেই । জয়ন্তী নদীর চেহারা যথেষ্ট বুনো । ওপাশে ডলোমাইটের পাহাড় । নির্জনতম সৌন্দর্য কাকে বলে তা এখানে এসে বোঝা যায় । এক সময় ইংরেজরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের ধরে বক্সার দুর্গে এনে রাখত । জয়ন্তীর কাছেই বিখ্যাত মহাকালের মন্দির । পাথর আর পাথর দিয়ে তৈরি রাস্তায় হাঁটলে শুধু পাহাড়ি নদীর গর্জন শোনা যাবে । ছয়-সাতবার নদী পেরিয়ে দুর্গম রাস্তায় হেঁটে শেষপর্যন্ত পৌঁছতাম মহাকালের মন্দিরে । অনেক উঁচুতে সেই গুহার অবস্থান । মাথার ওপরে মহাকালের জটার মতো পাক খাওয়া পাথর । পাশেই সিঁড়ি । সিঁড়ি দিয়ে উঠে গুহার মধ্যে ঢুকতে হয় মহাকাল দর্শনের জন্য ।

মহাকালের মন্দিরের কথা মনে আসতেই মনে এল মাকড়াপাড়ার কাকিবাড়ির কথা । ভুটান সীমান্তের গভীর অরণ্যের ভেতর এই মন্দিরটি । এখানে যেতে হয় রামঝোরা চা-বাগান হয়ে ।

জলপাইগুড়িতে চা-বাগানের পত্তন করেন ব্রুহাম নামক এক ইংরেজ । সেটা আঠারোশো চুয়াত্তর সাল । তার পঁয়ত্রিশ বছর আগে আসামে চা-বাগানের শুরু । জলপাইগুড়িতে দেরি হওয়ার কারণ এখানকার ডুয়ার্স তখন ছিল ভুটান রাজার অধীনে ।

অজস্র জঙ্গল আর নদীঘেরা ওই অঞ্চলে বর্ষাকালে যাওয়া অসম্ভব মনে হত । ইংরেজ পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন, 'জায়গাটা এত দরিদ্র যে ওটাকে জয় করার কোনও প্রয়োজন নেই । তাছাড়া জয় করলেও শাসন করা যাবে কিনা সন্দেহ ।' তবু আঠারোশো চৌষট্টি সালে ভুটানরাজকে হারিয়ে ইংরেজরা ডুয়ার্সের মালিকানা পায় । তার পাঁচ বছর পরে জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় । কিন্তু চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করার জন্য কৃষিজীবী রাজবংশীরা এগিয়ে এলেন না । ফলে আড়কাটির হাত ধরে ছোটনাগপুরের দরিদ্র মানুষেরা চলে এল ডুয়ার্সে ভাগ্যান্বেষণে । আজ তারাই সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ । ইংরেজরা অবশ্য তাদের খ্রিস্টান না করে চাকরি দেয়নি ।

তরুণ বয়সে জলপাইগুড়ির আনাচকানাচে ঘুরে বেড়ানো একটা নেশার মতো ছিল । থাকার জায়গা একটা পেলেই তো হয়ে গেল । সেই সময় ডুয়ার্সের স্থানীয় মানুষ রাজবংশীদের কিছু দেবদেবীর কথা জেনেছিলাম । যেটুকু মনে আছে তাতে দশজন লৌকিক দেবদেবীর নাম মনে পড়ছে । বিষ্টু ঠাকুর (বৈশাখ এবং ভাদ্রমাসে পুজো হয়), বিষহরি ঠাকুরানী, বর্ষা ঠাকুর (আগুনের দেবতা), বপন ঠাকুর (ঝড়জলের দেবতা), বসুমতী ঠাকুর (সন্তুষ্ট হলে দুর্ভিক্ষ হবে না), চণ্ডী ঠাকুর (কলেরা হবে না), মহাকল ঠাকুর (হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করেন), কালী ঠাকুরানী, গ্রামঠাকুর, ধরমঠাকুর । মুশকিল হল এই বিরাট জনগোষ্ঠী থাকত অনেক নম্রভাবে । তাদের সঙ্গে মদেশিয়ারা দূরের কথা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা বাঙালিদের সম্পর্ক আমাদের তরুণ বয়স পর্যন্ত তৈরি হয়নি । হ্যাঁ, তবে রায়কত বা প্রদ্যোত বর্মণের মতো সঙ্গীতে পণ্ডিত মানুষের কথা আলাদা অথবা উপেন্দ্র বর্মণের মতো মানুষের সংখ্যা খুব কম । এর পরিণতি যে কোনদিকে এগোল তা সত্তর সাল পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেনি ।

তিস্তা নদীর ওপর তৃতীয় সেতু তৈরি হয়ে গেল । প্রথমটি যদি তিস্তাবাজারে ধরা হয়, দ্বিতীয়টা সেবকে, তৃতীয়টি জলপাইগুড়ি শহরের পাশে । সেতু চালু হতেই সেই পক্ষীরাজ ট্যাক্সি যেমন উধাও তেমনই নৌকাগুলোও যে কোথায় চলে গেল!

গত মাসে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম । দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কলকাতায় রয়েছি । বছরে এক-আধবার মায়ের কাছে যাই, শহরের বাইরে যাওয়া যায় না । এবার ইচ্ছে হল ছেলেবেলার সেই জায়গাগুলো দেখে আসার ।

প্রথমে শহরটা । দেখা গেল রুবি বোর্ডিং আছে এবং তার চেহারা একটু আধুনিক হয়েছে । তবে তা মীর্জাপুর স্ট্রীটের হোটেলগুলোর মতো । ওয়েসিস উঠে গেছে । কদমতকার মোড়ের আশপাশে কয়েকটা হোটেল হলেও তার মান বেশ সাধারণ । অথচ জলপাইগুড়িতে অনেক লড়াইয়ের পরে হাইকোর্টের ডিভিশনাল বেঞ্চ বসছে । হৈ হৈ

ব্যাপার। কিন্তু কোনও মাঝারি মানের হোটেল নেই? বন্ধুরা বললেন, তিস্তাভবনের গেস্টহাউস বা সার্কিট হাউস ছাড়া রাজবাড়ির রাস্তায় একটা চমৎকার হোটেল হয়েছে। হোটেল না বলে পর্যটননিবাস বলাই ভালো। গিয়ে দেখলাম কথাটা সত্যি। এখনও শহরের হোটেলে দুশো টাকায় ঘর পাওয়া গেলেও এখানে সাত-আটশো থেকে বারোশো, ব্যবস্থাও টাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। এককালে ভাবতেই পারতাম না। তিস্তা সেতু পেরিয়ে কিছুটা যেতেই গাড়ি বাঁদিকের রাস্তা ধরল। শুনলাম লাটাগুড়িতে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়েছে ময়নাগুড়িকে এড়িয়ে। মনে পড়ল দোমহনি থেকে ট্রেন যেত। ড্রাইভার জানাল এখনও যায়। একটি কামরাকে টেনে নিয়ে যায় ইঞ্জিন, দিনে দুবার। স্টেশন মাস্টার বাকিটা সময় অন্য কাজ করেন। দোমহনি থেকে মালবাজার সেই ট্রেন যায় বনজঙ্গল পেরিয়ে। যাত্রীদের প্রয়োজন হলে ড্রাইভার দয়া করে ট্রেন থামিয়ে দেন। এরকম যাত্রা বেশ লোভনীয়।

রাস্তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো। আমরা লাটাগুড়িতে চলে এলাম। জানলাম হুটহাট জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। বনবিভাগের অনুমতিপত্র দরকার। এটি আগে ছিল না। মুড়ি খেয়ে এখানেই একদা রাত কাটিয়েছিলাম বারান্দায় শুয়ে, এখন দেখতে পাচ্ছি ট্যুরিস্টদের জন্য কয়েকটা প্রাইভেট হোটেল হয়েছে। অনুমতিপত্র নিয়ে গরুমারা ফরেস্টে ঢুকতে গিয়েই চেকপোস্টের মুখোমুখি। ছাড় মিলতে জঙ্গলে ঢুকলাম। কীরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগল। সেইসব পাখিদের অনেকের গলাই পেলাম না। গরুমারা বাংলোটি এখন যথেষ্ট সাজানো। সামনের তৃণভূমিও বেশ চোখ টানে। চমৎকার জায়গা। কিন্তু এখন বোধহয় বনজপ্রাণীদের দেখতে ধৈর্যের দরকার হবে। সময় বড় নিষ্ঠুর।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আরেকটু এগোতেই ডানদিকের রাস্তায় ঢুকল গাড়ি। জঙ্গুলে এলাকার পর গ্রাম। গ্রামের শেষে জঙ্গলের মুখেই বাঁদিকে সেই বাংলোটি। এর বয়স খুব বেশি নয়। আমাদের দেখার সময় তো অস্তিত্বই ছিল না। মূর্তি নদীর গায়ে এমন সুন্দর দোতলা এবং বিশাল বাংলো, পাশে হনিমুন কটেজের সারি দেখে সত্যি মুগ্ধ হলাম। বাংলোর পিছনে বাঁক নিয়ে তীব্র স্রোতের মূর্তি নদী বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছি। এত নরম অনুভূতি কোথাও হয়নি। বাংলোয় থাকার ভাড়াও যথেষ্ট বেশি। নিশ্চয়ই কারণ আছে। এ সি রুম পাওয়া যাচ্ছে, এ তো আমার কল্পনার বাইরে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে চলে আসতেই জানলাম আধা পাহাড়ের ওপরে সিনক্লেয়ার গোষ্ঠী রিসর্ট করেছে। গিয়ে দেখলাম অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। সামনের পৃথিবীটা এখানে পায়ের নিচে, রিসর্টের চার্জ বড় হোটেলের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তাই বলে ঘর খালি থাকে না।

শুনলাম এই বেল্টটায় এখন প্রায়ই শ্যুটিং হয়। তার দৌলতে স্থানীয় মানুষ জয়া বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী এবং অপর্ণা সেনকে দেখেছে। তাঁদের তোলা ছবিতে নিসর্গ দেখে বহু লোক চলে আসছেন এদিকে। ট্যুরিস্টদের সংখ্যা যত বাড়ছে তত ব্যবসার গন্ধ পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ভালো থাকা এবং খাওয়ার বদলে টাকা দিতে কেউ পিছপা নন। এই পরিবর্তনের হাওয়া এখন সারা ডুয়ার্সে। রাতটা কোথায় কাটাব তা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। ঘুরতে ঘুরতে নাথুয়ার রাস্তায় গিয়ে দেখলাম খুঁটিমারি জঙ্গলের সেই বাংলোটার চেহারাও বদলে গেছে। এক বুক বাগান নিয়ে আধুনিক আরামের ব্যবস্থা সেখানে। নাথুয়ায় পৌঁছে ডায়না আর জলঢাকার মিলনস্থলে গিয়ে দেখলাম আমাদের সেই অভিজ্ঞতার কোনও বদল হয়নি। না হোটেল না বাংলো। চোখের আড়ালে যেসব সৌন্দর্য এখনও ডুয়ার্সে পড়ে আছে তা চোখের সামনে আসা উচিত।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির জেলা সমাহর্তা সুব্রত গুপ্ত সচেষ্ট। যদি কাজ করতে চাওয়া ছেলের দল একত্রিত হয়ে নির্জনে মোটেল বানাতে আগ্রহী হয় তিনি তাদের সাহায্য করবেন। আমার বিশ্বাস ডুয়ার্সে মোটেল ব্যবসা খুব সফল হবে।

মহাভারতের আমলে ডুয়ার্স ছিল পাণ্ডববর্জিত। অর্জুন মণিপুরে গিয়েছিলেন কিন্তু এখানে আসেননি। ইংরেজ শাসনের আদিপর্বে ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং হিংস্র জন্তুর এলাকা। আর এখন শুধু চা-বাগান নয়, প্রকৃতি তার অঢেল সম্পদ নিয়ে যেন এতকাল পর্দানসীন ছিল, এবার পর্দা খসিয়ে বাইরে পা দিয়েছে দর্শকদের অপেক্ষায়।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

ইউরোপে দিন কয়েক

পূর্ণেন্দু পত্রী

অন্য সব লেখালেখির বেলায় আমার যে কলমটার পায়ে ঘোড়ার কদম, ভ্রমণকাহিনী লিখতে বললেই সে ব্যাটা হয়ে যায় ধোপার বাড়ির গাধা । যেন পিঠে চেপেছে এমনই গুরুভার যে পা আর নড়ে না ।

একেবারেই যে ভ্রমণকাহিনী লিখিনি তা নয় । কিন্তু লিখতে বসলেই দেখি, ভুবন উধাও । তার বদলে স্মৃতির কৌটোয় যা পড়ে আছে, সেটা ভবন । অর্থাৎ কিছু বাড়িঘর । মানে মিউজিয়াম আর গ্যালারি ।

৮৬-তে লন্ডন থেকে ফিরেই যা একটা মোটামুটি বড় লেখা । সেও শুধু লন্ডনকে নিয়েই । সেবারেই ফ্লোরেন্স, রোম আর ভেনিস । রোম তেমন পছন্দ হয়নি । কিন্তু ফ্লোরেন্স আর ভেনিসকে নিয়ে লেখবার জন্য মনের ডানায় ছটফটানি । তবু লেখা হয় না । লিখতে গেলে পড়তে হয় । না পড়লে চোখের দেখাটা হয়ে যায় কেবল রূপে ভোলা ।

রোমের সিসটাইম চ্যাপেলটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যখন, চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করেনি আপনার, কপালে সৌভাগ্যের এমন চন্দনটিপের ছোঁয়ায়? নিজেকে মনে হচ্ছিল না সেই আলিবাবার মতো, চিচিং ফাঁক বলার পরেই যার সামনে খুলে গিয়েছিল ধন-দৌলতের এক অবিশ্বাস্য সাম্রাজ্য! মুগ্ধ হয়ে, পরম পরিতৃপ্তির সুবাতাসে বুকের পাঁজরটাকে নৌকার পালের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, যেন একটা আস্ত স্বর্গ কেনা হয়ে গিয়ে এখন পকেটে রুমালের ভাঁজের ভেতর, এমনই এক অনুভবে পা-টলমল আপনি বেরিয়ে এলেন বাইরে । এরপর দিন যায় । দিন যায় আর আপনার ভেতরে টুপ-টাপ করে ফুটতে থাকে সন্ধের আকাশের নক্ষত্ররা । আসলে নক্ষত্র নয়, প্রশ্ন । জানবার ইচ্ছে । কবে তৈরি হয়েছিল এই সিসটাইন চ্যাপেল? কারা তৈরি করতে চেয়েছিল? মাইকেল এঞ্জেলো একে সাজানোর দায়িত্ব পেলেন কীভাবে? কতদিন লেগেছিল তাঁর এই বিশাল চিত্রমালাটি আঁকতে? কেমন করে এঁকেছিলেন? একাই, না সহযোগিতা ছিল অনেক সহকারীর? এমনই সব প্রশ্ন । যতক্ষণ না জানা হচ্ছে এর উত্তর, আপনার চেতনার ভেতরে আবছা হয়ে যাচ্ছে প্রথম দেখার অমন আলোকিত সৌভাগ্য, অমন আলোড়িত উচ্ছ্বাস ।

ফ্লোরেন্সে দেখার কত কী। ছোট্ট শহর। তবুও তার যেখানে পা ফেলবেন, ইতিহাস। যেদিকে তাকাবেন, শিল্প। যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন, পাশেই কোনও-না-কোনও লোভনীয় ভাস্কর্য। কিন্তু কী আছে ভেনিসে? জলের তৈরি রাজপথ। জলের অলিগলি, বিস্তর সেতু, তারচেয়েও বিস্তর গণ্ডোলা, সেন্ট মার্ক স্কোয়্যার, সেন্ট মার্ক গির্জা, রাজপ্রাসাদ, ঘড়িঘর, সেন্ট মার্ক ব্যাসিলিকা, শয়ে শয়ে ট্যুরিস্ট, আর সেন্ট মার্ক স্কোয়্যারের চত্বরে বুঝি বা লাখখানেক সাদা পায়রার ওড়াওড়ি-এই দেখলেই তো ফুরিয়ে গেল সব।

কিন্তু হায় রে, এ মনমোহিনীর খপ্পরে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। কিছু না পরেই এ যেন সালঙ্কারা। কিছু না সেজেই যেন ভুবনেশ্বরী। তাই আজ নয়, ইতিহাসের সেই কোন অতীতকাল থেকেই এই যাদুকরীর প্রেমে সবাই হাবুডুবু। দান্তে থেকে গ্যেটে, শিলার, শেক্সপীয়ার, শেলি, টার্নার মায় নেপোলিয়ান বা নেপলিয়ঁ পর্যন্ত মহাপুরুষেরা কাত।

ভেনিস নিয়ে লিখব লিখব করেও লিখে উঠতে পারলাম না আজও। পারলাম না যে ব্যামোটার জন্য, সেটা ওই আরও জানার ইচ্ছে। পৃথিবীর মোট কতজন বিখ্যাত কথাশিল্পী আর চিত্রশিল্পীকে সে নিজের মায়াবী-হাতছানিতে টেনে এনেছে বুকের কাছে, তার তত্ব-তল্লাস করতে গিয়ে থৈ পাই না আর। লেখা তাই শেষ হল না আজও।

সেই কবে ৮৯-তে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কৃষ্ণকলি মেয়েটি 'কথোপকথন'-এর বিমুগ্ধা পাঠিকারূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে, এখনও মনে আছে তার নাম। প্যাঁচ ঘোরালেই যেমন বেসিনের কলে জলের তোড়, সেভাবেই স্মৃতির কোনও একটা চ্যানেলের 'নব' টিপেই পেয়ে যেতে পারি তার সঙ্গে আলাপচারিতার চিত্রমালা। অথচ এই সেদিন, গত বছর অর্থাৎ ৯২-এর সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ থেকে আট পর্যন্ত যে মহিলার সঙ্গে আমি অথবা যে-মহিলা আমার সঙ্গে গায়ে গায়ে সর্বক্ষণই প্রায়, কিছুতেই নামটা মনে করতে পারছি না। মনে থেকে যাবে ভেবে নিয়ে লিখে রাখিনি।

যাকে সঙ্গে নিয়ে উঠছি-বসছি, হাঁটছি, সিনেমা কিংবা শহর দেখছি, আমি যে তার ভাষা বুঝিনে। সে ফরাসি ছাড়া জানে না অন্য ভাষা। ফরাসি ভাষার এক বর্ণ বোঝার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি নেই আমার মগজে। তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এই কারণে যে, মানুষ নামক এই ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিপদ মানুষটি ইচ্ছে করলেই হয়ে যেতে পারে চতুষ্পদ প্রাণীদের জাতভাই। তখন দেখা যায় মুখের উচ্চারিত ভাষা ছাড়াও সে কথা বলতে পারছে অন্যভাবে। তার কথা বলার জন্য রয়েছে দুহাতের দশটা আঙুল, দু-দুটো দপদপে চোখ, নাক-ঠোঁট-ভুরু ইত্যাদি নিয়ে একটা আস্ত মুখমণ্ডল। তদুপরি এমনই ছন্দমাখানো

একটা গোটা শরীর, যার কাছে পয়ার ত্রিপদী কিংবা মন্দাক্রান্তাও পেয়ে যেতে পারে লজ্জা ।

যার কথা বলছি অর্থাৎ কথা না-বোঝার কথা, আমি সেইভাবেই বুঝতাম তার ভাষা । সে আমার । ভাববেন না, শোনাচ্ছি আজগুবি কিছু । এমন ঘটনা ঘটে । চ্যাপলিন আর ককতো-র আলাপটা হয়েছিল ওইভাবেই । চ্যাপলিন জানেন না ফরাসি । ককতো জানেন না ইংরিজি ।

ব্যাপারটা গোড়া থেকেই শুরু করা যাক । ৯২-এর আগস্টে আচমকা ব্রাসেলস থেকে আমন্ত্রণপত্র । ওখানকার 'লিয়েজ' নামের একটা জায়গায় দুবছর অন্তর বসে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব । দিন পাঁচেকের অনুষ্ঠান । এবারে ৩ সেপ্টেম্বর । ৮-এ শেষ । আমন্ত্রণ সেখানে যোগ দেওয়ার । খেতে দেবে । থাকতে দেবে । কিন্তু গাড়িভাড়া দেবে না । গাড়ি মানে এক্ষেত্রে বিমান । সর্বনাশ, বিমানভাড়া মানে তো এক রাশ টাকা । টাকা ছাড়াও সমস্যা ছিল আরও । এদিকে প্যারিসের যে বন্ধুটি ব্রাসেলস কমিটির কাছে সুপারিশ করেছেন আমার নাম, তাঁর দিক থেকে নিয়মিত তাড়া । চিঠিতে এবং টেলিফোনে ।

শেষ পর্যন্ত অনেক সাত-পাঁচ ভেবে জানিয়ে দিই সম্মতি । পয়সা বাঁচাতে বেছে নিয়েছি বাংলাদেশ বিমান । কিন্তু বিপদ একটাই । তাদের প্লেন প্যারিসে পাড়ি দেয় সপ্তাহে একদিন । তাতে দেখা যাচ্ছে, আমি ব্রাসেলসের অনুষ্ঠানের প্রায় পাঁচ-ছদিন আগে পৌঁছে যাচ্ছি প্যারিসে । থাকব কোথায়! প্যারিসের বন্ধুটি ব্যবস্থা করে দিলেন তারও । জানালেন, দুর্দান্ত একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন আমার জন্য । ইচ্ছে করলে ওখানে বসে কবিতা তো লিখতে পারিই এমনকী এঁকে ফেলতে পারি ছবির পর ছবি ।

প্যারিসে গিয়ে দেখি সেটা একটা সাময়িক পান্থশালা । দৈনিক ভাড়া ৯৫ ফ্রাঁ । চারতলার ওপরে একখানা ঘর । কোনওমতে একটা বিছানা । আরেকটা নড়বড়ে এলেবেলে টেবিল । না ওয়ার্ডরোব, না আলনা, না লাগোয়া বাথরুম এমনকী না একটা জলের গেলাস । বাথরুম কোথায়? ঘরের বাইরের করিডরের বাঁ-ধারে । তিন প্যাঁচ চাবি ঘোরালে খোলে তবে দরজার লক । আবার উল্টো তিন প্যাঁচ ঘোরালে বন্ধ । চলো বাথরুমে । ওইখানেই হাতে তেলো পেতে খেয়ে নাও জল । ফোন করতে হবে একে-ওকে-তাকে । ফোন কোথায়? নিচে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে । আবার তিন প্যাঁচ ঘুরিয়ে লক বন্ধ । নামো লিফটে করে নিচে তরতরিয়ে । ফোন কর নগদ কড়ি ফেলে । ফোন না হয় হল । যাকে ফোন করছি, ধরা যাক সে বাড়িতে নেই । তাহলে কি হবে । মেসেজ না হয় দেওয়া রইল । কিন্তু আমাকে ফোন করলে পাব কী করে? পাব না । পেতে গেলে আমাকেই

আবার কিছুক্ষণ পরে ফোন করতে হবে তাকে। অর্থাৎ ওই ফোনের জন্যই তোমার নড়ন-চড়ন বন্ধ।

দ্বিতীয় দিন বেলা তিনটেয় এক দেবদূত এসে হাজির। নাম আমীরুল আরহাম। বাংলাদেশের ছেলে প্যারিসে থাকে। এখানেই তালিম নিয়েছে সিনেমার কলাকৌশলে। ছোট মাপের ছবি বানিয়েছে কয়েকটা। এখন পূর্ণ দৈর্ঘ্যে র ছবির ভাবনা ঘুরছে মাথায়। মুহূর্তে সে হয়ে গেল যেন কতকালের চেনা আপনজন। একটুখানি আলাপের পরই বললে, চলুন বেরোই। সাঁজালিজের দিকে ঘুরি। তারপর আপনাকে নিয়ে যাব একজন শিল্পীর বাড়িতে। কী নাম শিল্পীর? বললে সাহাবুদ্দিন। জানালাম, শিল্পীকে দেখিনি কখনও কিন্তু ওঁর কাজের সঙ্গে পরিচয়। খুব ফোর্সফুল, দুর্বার গতির মানুষ আঁকেন না? হ্যাঁ। আজ ওর বড় মেয়ের জন্মদিন। তাই? তাহলে তো ওকে দেওয়ার মতো কিছু নিতে হয় সঙ্গে। স্যুটকেশ খুলে বের করি, 'আমার ছেলেবেলা'। ছড়ার বই। নিজেরই লেখা। জন্মদিনের আসরে গিয়ে পেয়ে গেলাম এক আশ্চর্য দম্পতিকে। আনা আর সাহাবুদ্দিন। সাহাবুদ্দিন অতটা চিনতেন না আমাকে। আনার পড়া ছিল আমার লেখা। আর দেখা ছিল 'স্ত্রীর পত্র'। ফলে ওই এক রাতেই হয়ে গেলাম ঘরের লোক। যেহেতু পান-ভোজনের আসর চলেছিল অনেকটা রাত পর্যন্ত, তাই রাতটা ওখানেই কাটানো। আবার, সকাল হতেই, আমার জন্য নির্ধারিত নির্বাসন-কক্ষে ফিরে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি, ব্রেকফাস্টের খাবারে বসিয়ে আনা আর সাহাবুদ্দিন দুজনেরই অনুরোধ-যেখানে উঠেছেন, জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসুন এখানে। এলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু পুরো পাঁচদিনের পাওনা টাকাটা তো মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে আগে। অগত্যা ঠিক হয়, দু-তারিখ বিকেলে চলে আসব এখানে। পরদিন এখান থেকেই পাড়ি দেব ব্রাসেলসে।

৩ সেপ্টেম্বর। প্যারিস থেকে ট্রেনে ব্রাসেলস। ব্রাসেলস থেকে পুনরায় ট্রেন বদলিয়ে লিয়েজ। লিয়েজ-এর স্টেশনেই দেশ-বিদেশের অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির দুই মহিলা। একজন কুমারী। অন্যজন বিবাহিতা। কিঞ্চিৎ বয়স্কা। তবে রূপে-গুণে-গড়নে দুখ-জাগানিয়াও বলতে পারেন অথবা ঘুম-ভাঙানিয়া। স্টেশনে থেকে অতিথিদের জন্য বরাদ্দ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে গাড়ির খানিকটা ঘাটতি। তাই স্টেশনেই চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। তখনই চোখে চোখে আলাপ বয়স্কাটির সঙ্গে। পরদিন সকাল থেকেই তার প্রিয়-বান্ধবীতে রূপান্তর। কী করে ঘটল? ধৈর্য ধরুন, সেটাই তো বলছি।

নামে কীবা আসে যায়? শেক্সপীয়ার তো বলেই দিয়েছেন, যে নামেই ডাকা হোক না গোলাপকে, সুগন্ধ বিলোবে একই। তাই ধরে নেওয়া যাক, তার নাম ভিকতোরিয়া।

লিয়েজ-এর ‘প্যালেস দ্য কংগ্রেস’ নামের এক অতি আধুনিক স্থাপত্যের অভ্যন্তর ওই কবি উৎসবের জন্য নির্ধারিত স্থান । সেখানে ঢুকতেই এক বৃদ্ধা মহিলা নিজের থেকেই এগিয়ে এলেন আলাপ করতে । আমার চেহারা রং-ঢং দেখেই সম্ভবত বুঝে গেছেন, তৃতীয় বিশ্বের কালা আদমী । ইংরিজি জানেন বেশ পরিষ্কার । ফলে জমে উঠল আলাপ । কথায় কথায় বলে ফেলেছি যে, আমি একজন আর্টিস্টও । বৃদ্ধা চমকে উঠলেন উল্লাসে । অ্যাঁ, তুমি একজন আর্টিস্টও? এই বৃদ্ধা অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে রয়েছেন উৎসবের সঙ্গে । ইউনেস্কো ছাড়া আরও যেসব সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান সাহায্য করছে এই উৎসবকে, তার মধ্যে রয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল । ইনি ওই ইন্টারন্যাশনালের একজন প্রতিনিধি । প্রথম আলাপের মুহূর্তেই জানিয়েছিলেন, একটা ইন্টারভিউ নেবেন আমার । আর প্রথম আলাপের কথাটা রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন বেশ-জানাদের মধ্যে । সেই বেশ-জানাদের মধ্যে একজন ভিকতোরিয়া । সেও এখানকার উৎসব-কমিটির অভ্যর্থনা সমিতির একজন । ঘুরে ঘুরে পাঁচকান হতে হতে, কথাটা কানে পৌঁছল তারও । স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে জমাল আলাপ । অন্ধ যেভাবে অন্ধকার হাতড়ে ঠিকঠাক এগোয় গন্তব্যের দিকে, সেভাবেই এগোই তার না-বোঝা ভাষার সিঁড়ি ভেঙে, তার অকপট আন্তরিক বন্ধুত্ব ঘোষণার অন্দরমহলে । এই শুরু । পরদিন সকালেই সামনে মেলে ধরল ছোট্ট একটা খাতা । ইশারায় জানাল, ছবি এঁকে দিতে হবে । আঁকলাম ।

প্রথমটা হয়ে গেল খানিকটা মাতিস-মার্কা । সে তো মুগ্ধ । কিন্তু আমি নই, ভাবলাম এ আঁকা দেখলে কেউ কেউ হয়তো ভাববে আমরা আমাদের নিজস্বতার শিকড় হারিয়ে হয়ে গেছি ইওরোপীয় শিল্পের গাছপালাকে জড়ানো স্বর্ণলতা । মানে পরগাছা । তাই আরও একটা ছবি আঁকি । ভারতীয় দৃশ্য । গাছপালাময় । দ্বিতীয়টা পেয়ে লাফিয়ে উঠল সে । পরে ইংরিজি-জানা বৃদ্ধাদের মুখে শুনেছি, ওর নাকি ভীষণ বাগানের শখ । গাছপালার ওপর গভীর টান ।

ব্যস, ওই ছবিই হয়ে গেল আমাদের বন্ধুত্বের পুরোহিত । আর এর পরেই ভিকতোরিয়া স্বেচ্ছায় বেছে নিলে আমার প্রতিভার পয়লা নম্বর প্রচারকের দায়িত্ব । ডেকে ডেকে লোককে দেখিয়ে বেড়ায় নিজের খাতা । দূর থেকে দেখতে পাই তার খুশি-ছলকানো মুখ । কী যেন বলে চলেছে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে । মাঝে মাঝে একে-ওকে টেনে আনে আমার কাছে । ছবি এঁকে দিতে হবে ।

কংগ্রেস প্যালেস স্থাপত্যের দোতলায় একটা অংশ যেন জাহাজের ডেক । নিচে খালের জল, বোট, নৌকা । কনকনে হাওয়া থেকে থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আর শীত বেশ জাঁকালো । আমার মতো শীতকাতুরে তাই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না সেখানে । সামনেই

বসবার জন্য গদি পাতা । ভিকতোরিয়া চায়ের কাউন্টার থেকে চা এনে সামনে রাখে । আর ছবি আঁকার সাদা কাগজ । এঁকে যাই ।

যারা পায় তারা প্রশংসা ছোড়ে । ইংরিজিতে বললে বুঝি । ফরাসি বললে, না বুঝেও মুখে ফুটিয়ে রাখি সৌজন্যের হাসি । কিন্তু প্রশংসার সোনাদানার সবটা আমার কাছে পৌঁছয় না । অর্ধেকটা চলে যায় ভিকতোরিয়ার মুঠোয় । যেন আমার কৃতিত্বের সেও সমান অংশীদার । দুজনে মিলে পার্টনারশিপের ব্যবসা যেন । আমি যেন তারই এক মহার্ঘ প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কার, মুখমণ্ডলের চালচিত্রে সেভাবেই জ্বলছে নিভছে জ্বলছে যেন এক গর্বিত নিয়ন সাইন ।

অতঃপর বেশ একটা কেউকেটা মনে হতে থাকে নিজেকে । ভাষা না জানার ফলে নিজেকে গুটিয়ে শামুকের মতো খোলের মধ্যে পুরে রেখেছিলাম এ কদিন । এবার খোলের ভেতর থেকে মুখ বাড়াই । মুখ বাড়াবার ফলেই আলাপ হয়ে যায় মার্কের সঙ্গে । পুরো নাম, মার্ক ইমব্রেখটস । নিজে কবি । তদুপরি প্রকাশক । বের করে লিটল ম্যাগাজিন । আর ছোট ছোট সংকলন গল্প-কবিতার । চেহারা-চরিত্র, ভাব-ভঙ্গি এমনই যে ফরাসি বা বেলজিয়ামের বদলে বাংলাটা বলতে পারত যদি, হুবহু কলকাতার ছেলে । কলকাতার বইমেলায় মাঠের কোনও একটা প্রান্তে চিলতেখানেক স্টল নিয়ে গোছা গোছা হালকা, পাতলা, ছিপছিপে, রোগা ছনছনে, ঝকঝকে, লিটল ম্যাগাজিন, কিংবা এক ফর্মা-দুফর্মার কবিতা সংকলন বেচতে বসে যায় যারা, মার্ক যদি কোনওদিন তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াত, স্বচ্ছন্দে মানিয়ে যেত অন্যদের সঙ্গে । যৎসামান্য আলাপের পরই মার্ককে যখন বললাম, আমার সঙ্গে কিছু ছবি আছে । আমারই আঁকা আর সিল্ক স্ক্রিনে মনোকালারে ছাপা । তোমার স্টলে টাঙিয়ে রাখতে রাজি থাকলে নিয়ে আসব কাল । যদি বিক্রি হয় তুমি কেটে নেবে তোমার প্রাপ্য কমিশন । মার্ক এককথায় রাজি । পরদিন গুনে গুনে মাত্র তিনটে ছবি এনে তুলে দিই ওর হাতে । ও একটা টাঙিয়ে বাকি দুটো গুটিয়ে রাখে ওর নিজের বইপত্রের ভেতরে ।

ওর ছোট্ট স্টলটা সম্মেলনের ভোজনালয়ে ঢোকার মুখে ডানদিকে । লাঞ্চে ঢুকেছিলাম দল বেঁধে । বেরিয়েই শুনি একটা নয়, তিন-তিনটে ছবিই বিক্রি । বলে কী ছোকরা? সত্যি? সত্যি । এই নাও তোমার পাওনা । হায় আল্লা । যেখানে থাকতে দিয়েছে সেটা শহরের একটা প্রান্তে । দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসব আরও কয়েকটা ছবি, তার উপায় নেই । মনকে সান্ত্বনা দিই তখন, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট । বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যেটুকু দই, তাতেই তুষ্ট থাকা শ্রেয় । তখন কি আর জানি ছবি কিনেছেন কে বা কারা ।

ডিনারের আগে প্রভূত রঙিন পানীয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেকটা দিনই । এবং একেকদিন একেকটা বিশেষ রাজকীয় স্থাপত্যের অন্দরমহলে । সেদিন সেখানেই ভিকতোরিয়া আলাপ করিয়ে দিল যে বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে, দেখলেই বোঝা যায় বেশ দাপটের কেউ । দৈর্ঘ্যে -প্রস্থে প্রায় সমান সমান । অর্থাৎ পিপেসদৃশ । মাথার চুল মেহেদি-লাল । কিন্তু সাজে-সজ্জায় মার্জিত । আর চোখে-মুখে ব্যক্তিত্ব-পাণ্ডিত্য, মোটরগাড়ির হেডলাইটের মতো দপদপে । অনুগ্রহ করে নাম জিজ্ঞেস করবেন না । এঁরও নাম-ঠিকানা লেখা কাগজখানা খুঁজে পাচ্ছি না আর । মোটমাট জেনে রাখুন, তিনি ওখানকার মানে ব্রাসেলস-এর সংস্কৃতিজগতের পুপুল জয়কার-এর মতোই অনেকটা । তাঁর মুখে আমার ছবির প্রশংসা শুনে তো আমি থ । নগদ দাম দিয়ে একটি কিনেছেন তিনি । আলাপ জমে ওঠে বেশ । যেহেতু ইংরিজি জানেন । তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধ্যানধারণাটা খুবই সীমাবদ্ধ । টাগোর আর গানডি ছাড়া আর কারও নাম জানেন না । এমনকী সত্যজিৎ রায়েরও নয় ।

সুসময় ছপ্পর ফুঁড়ে আসে । দৈবক্রমে ওখানেই আলাপ এক জ্বলন্ত মোমবাতিসদৃশ যুবকের সঙ্গে । নাম, মিচেল ক্লিকে । কবি । বই বেরিয়েছে মাত্র একটা । নামটাকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় জ্বলন্ত মোমবাতির দুটো দিক । মানে দুদিকেই জ্বলছে মোমবাতিটা । কলকাতার কবিতা নিয়ে ভাসা-ভাসা কিছু কথাবার্তা হতে হতেই ঘন বন্ধুত্ব । এখানকার কবিতা-উৎসব শেষ হলে কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করতেই বলি, ব্রাসেলসে । তখুনি তার প্রস্তাব, তাহলে চলো আমার সঙ্গে ।

গাড়ির চালক তার কোনও এক বান্ধবীই হয়তো । ঠিকঠাক জানার উপায় নেই । ৮ তারিখে লাঞ্চের পরই উৎসব শেষ । ঘড়ির কাঁটায় সেটা শেষ হওয়ার অনেক আগেই তল্পিতল্পা নিয়ে চেপে বসি মিচেলের বান্ধবীর গাড়িতে ।

ব্রাসেলসে থাকার জায়গা ছিল । টেলিফোনে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল প্যারিসের আনা আর সাহাবুদ্দিন । মিচেল বলল, ঠিক আছে, সেখানেই যাবে । আগে তো আমার বাড়িতে ওঠো ।

গাড়ি ছুটল ব্রাসেলস-এর দিকে ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৩

রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বছর দশ-বারো আগে আমাকে যেতে হয়েছিল রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমায় । অযোধ্যা থেকে শুরু করে দুই পর্যায়ে আমি ধনুষ্কোটি পর্যন্ত গিয়েছিলাম ।

সাধারণ ভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার যে খুব ভালো লাগে তা নয় । ঘুরে বেড়াবার নেশা যাকে বলে, তেমন কোনও নেশা আমার নেই । তবে, বিভিন্ন কাজে আমাকে বহু জায়গাতেই যেতে হয়েছে এবং সেই যাওয়া যে খুব খারাপ লেগেছে এমনও নয় । বনবাসে বিসর্জিত হবার পর রামচন্দ্র যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন-চিহ্ন ধরে ধরে আবার সেই পথটিকে পুনরাবিষ্কার -এই কাজটির মধ্যে রোমাঞ্চ ছিল, কিছু অ্যাডভেঞ্চারও ছিল ।

মুশকিল হল, রামচন্দ্র বলে সত্যিই কেউ ছিলেন কি না, তিনি সত্যিই বনবাসে গিয়েছিলেন কি না, কোন পথে গিয়েছিলেন, এ সমস্ত নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । বাস্তবে কী ঘটেছিল তা তো আমার জানা নেই । তবে, এই পথ পরিক্রমায় বেরনোর আগে আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল ।

যাত্রা শুরু করেছিলাম অযোধ্যা থেকে । এখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে খারাপ লাগছে না কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অযোধ্যাবাস খুব সুখের হবে না । একেই তো শহরটা ভীষণ ঘিঞ্জি । তার ওপর সেদিন রামনবমীর জন্য অসম্ভব ভিড় । আমি এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলাম । হোটেল টোটেল ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থা অযোধ্যায় ছিল না কাজেই সাধুর আশ্রমটি খুব ভালো না হলেও চলে গিয়েছিল । অযোধ্যা থেকে শুরু করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম -অর্থাৎ এলাহাবাদে, তারপর চিত্রকূট, মধ্যপ্রদেশের খানিকটা অঞ্চল -আমার প্রথম পর্যায়ের পরিক্রমা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

আজকে পিছনে তাকিয়ে যখন ভাবি, মনে হয়, এই পরিক্রমণের মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ হয়েছিল । নিছক ভ্রমণ তো এটা নয়, জায়গা দেখা নয়, একটা উদ্দেশ্যমূলক অনুসন্ধান । এবং সেটা করতে গিয়ে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা কিছুর সঞ্চার হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই । আমি প্রথম আবিষ্কার করি, হিন্দিবলয়ের একটা বিশাল অংশ রামচন্দ্রকে যে এত জানে, কথায় কথায় রামচন্দ্রের এত উল্লেখ করে, এর পিছনে একজন কবির একটা মস্ত অবদান আছে । তিনি কবি হিসাবে কত বড় সেটা বড় কথা নয় । বড়

কথা হচ্ছে, তুলসীদাস একজন ভক্ত এবং কবি। রামচন্দ্রকে নয়, এই পরিভ্রমণে বেরিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম তুলসীদাসকে।

আমার আরেক মস্ত লাভ বিভিন্ন ধরনের মানুষের সান্নিধ্যলাভ। সাধারণ মানুষ সবাই। ছোট হোটেলওয়ালা, রিকশাওয়ালা, টাঙাওয়ালা, হোটেলের বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি, এরকম আরও বহু মানুষ, যাদের সঙ্গে আমাকে যেচে আলাপ করতে হয়েছিল আমার পরিক্রমা সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজনে। আমার জীবনে এই সফরটাতে আমি পেয়েছি যাকে বলা যায় সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ। আমার নিজের ভেতরে যে কতকগুলো অজ্ঞানতা ছিল, সেই অজ্ঞানতাও কেটেছে এই অভিজ্ঞতার ফলে।

গুহক রাজার রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। কথা হল এই শৃঙ্গবেরপুরটা কোথায়! এলাহাবাদে আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানতে পারলাম না। কিন্তু ইউ পি ট্যুরিজমের একটি মেয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত একটা সন্ধান দিল। এটা এলাহাবাদ থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরে। বলল, কছৈড়ি থেকে বাস ছাড়ে। সেখান থেকে লালগোপালপুরের বাসে চলে যান। শৃঙ্গবেরপুর পথেই পড়বে। বাসরাস্তা থেকে হাঁটাপথ। টাঙাও পাবেন।

টাঙা অবশ্য ছিল না। দীর্ঘপথ রোদের মধ্যে হেঁটে পৌঁছলাম শৃঙ্গবেরপুরে। এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে ওখানে পৌঁছে প্রায় শুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। উত্তরপ্রদেশের মানুষরা অতি সরল এবং অতিথিবৎসল। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ফল-টল পানীয় ইত্যাদি নিয়ে এল কয়েকটি ছেলে।

শৃঙ্গবেরপুরে নদী আছে-গঙ্গা, কিন্তু এই শৃঙ্গবেরপুরেই রামচন্দ্র এসেছিলেন কি না তা আমি জানি না। নদী তার খাত বদল করে সরে আসতে পারে। ঘাট আছে। মন্দির আছে, ভালোই বসতি আছে। সেখানে একটা খননকার্য চলছিল। কুষাণ আমলের বা ওই সময়কার বহু নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটা গুহক রাজার রাজধানী কি না সেটা তো বলার কোনও উপায় নেই। ওখানে রামচন্দ্রের খড়ম আছে, মন্দির তৈরি আছে। শৃঙ্গবেরপুর একটা তীর্থক্ষেত্রও হয়ে উঠেছে। ভালোই লাগবে, তবু একটা খটকা থেকেই যায় যে সেটাই আসল শৃঙ্গবেরপুর কি না।

অযোধ্যাও তাই। যে অযোধ্যাকে নিয়ে এত বিবাদ বিসম্বাদ সেই অযোধ্যাই যে আসল অযোধ্যা এ-কথা কে বলবে। একটা কিংবদন্তী আছে যে সম্রাট বিক্রমাদিত্য অযোধ্যাকে পুনরাবিষ্কার করেন। বিক্রমাদিত্য নাকি শিকারে গিয়েছিলেন, হঠাৎ দেখেন সরযূর ওপারে একজন কালো মানুষ কালো ঘোড়ায় চেপে নদীতে নামছে। নদীতে নেমে সে ডুবে গেল, এপারে যখন উঠল তখন সেও সাদা তার ঘোড়াও সাদা। তখন বিক্রমাদিত্য খুব অবাক

হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? সেই লোকটি উত্তর করল, আমি প্রয়াগরাজ । মানে, প্রয়াগের দেবতা । যত পাপীতাপী প্রয়াগের জলে স্নান করে, তাদের কলুষে আমি কালো হয়ে যাই । সেটা পরিষ্কার করার জন্যই আমি সরযূতে ডুব দিই । এরপর প্রয়াগরাজ বিক্রমাদিত্যকে বললেন, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, এটাই হচ্ছে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা । তুমি এই নগরীকে পুনরুদ্ধার করবে । কপিলা গাই বা ওরকমই স্বর্গের কোনও গাভী যেখানে যেখানে দাঁড়াবে এবং তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়বে বুঝবে সেখানেই প্রাচীন অযোধ্যার কোনও না কোনও চিহ্ন রয়েছে । মজা হল, বিক্রমাদিত্য নিজেই এমন একটা চরিত্র যে মিথলজিতে তাকে যেমন ভাবে খুশি ব্যবহার করা হয়েছে । সেই অর্থে রামচন্দ্রের বনবাসের পথটাও অনেকাংশে মিথ । আমি সেই মিথকেই, মায়ামারীচকেই অনুসরণ করে গেছি ।

তবে হ্যাঁ, চিত্রকূটে সেই পাহাড়টা তো আছে, যেখানে উনি বসবাস করতেন । চিত্রকূট থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বিশাল দণ্ডকারণ্য । সে-সব গাছ সাফ হয়ে গেছে, অরণ্য নির্মূল হতে হতে ওড়িশার এক কোণে সামান্য কিছু জায়গায় টিকে আছে । চিত্রকূট থেকে অবশ্য আর কিছু প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না, আসলে চিত্রকূটে তেমন কোনও বসতি ছিলও না ।

পঞ্চবটী, মানে নাসিকে সীতাগুম্ভা রয়েছে । সেখান থেকেই নাকি সীতাহরণ হয়েছিল । সেগুলো যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয় । তবে, নাসিকের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি রয়েছে, কারণ ওখানে কুম্ভমেলা হয় । কিন্তু জলের অভাব । শিপ্রা নদী একটা শুকনো নালার মতো বয়ে যাচ্ছে । একটা বেসিন করে রাখা আছে । লোকজন সেখানেই স্নান করে ।

নাসিকে আরও একটা জিনিস দেখেছিলাম ওরা বলে পাণ্ডব গুম্ভা । আসলে বৌদ্ধ শ্রমণদের গুহা । পাহাড়ের ওপরে প্রায় হাজার খানেক ফুট ওপরে । শ্রমণরা বেশ কষ্ট করেই থাকতেন সেখানে । জলের অভাব ছিল । বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পাথরের চৌবাচ্চা তৈরি করে রাখা হয়েছিল । বৌদ্ধরা চলে যাওয়ার পর এটাকে পাণ্ডবগুম্ভা নাম দিয়ে প্রচার করা হয় যে পাণ্ডবরা এখানে ছিলেন অজ্ঞাতবাসের সময় । এইরকম বহু মিথ আমরা অল্প অনুসন্ধান করেই বাতিল করে দিতে পারি । কিন্তু এটা বোঝা যায় যে ওই মিথগুলোর একটা প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর প্রবলভাবে রয়েছে ।

তুঙ্গভদ্রার তীরে যেখানে এখন তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হয়েছে, সেখানে ছিল বিজয়নগর বাহমনি রাজ্য । ও জায়গাটা এমনিতেই ভ্রমণকারীদের কাছে খুব প্রিয় । বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ওখানে আছে । দুর্লভ পাথর দিয়ে তৈরি নানারকম কনস্ট্রাকশন সেখানে রয়েছে । অন্য একটা পাথর দিয়ে টোকা দিলে কোনওটা থেকে

বাঁশির আওয়াজ হয়, কোনওটা থেকে মৃদঙ্গের আওয়াজ হয় । একটা আস্ত পাথর কেটে রথ তৈরি করা আছে । এখানেও মিথ আছে যে, সীতাহরণের সময় ওইখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল । ওখানকার লোকেরা পাথরের দুটো দাগ দেখায়-একটা সোনালি দাগ একটা রুপোলি দাগ । টানা চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত । সে দুটো দাগ অবশ্য সত্যিই আছে । জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করলে রাবণ সীতাকে রথ থেকে নামিয়ে একটা গুহায় আটকে রেখেছিল । সীতাকে টেনে আনার সময় গয়নার ঘষায় ওই সোনালি দাগটা পড়ে । আর রুপোলি দাগটা পড়ে তাঁর শাড়ির ঘষায় ।

এই জায়গাটাকে আমরা বলতে পারি কিষ্কিন্ধ্যা । সেখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল এবং এখান থেকেই রামচন্দ্র বানরসেনা সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্তু এরপর থেকে রামচন্দ্রের পথের কোনও দিকনির্দেশ পাওয়া দুরূহ । আর কোনও তীর্থক্ষেত্র পাওয়া যাবে না, যেখানে রামচন্দ্র বসবাস করেছিলেন বলে মিথ চালু আছে ।

ধনুষ্কোটি-এখনকার রামেশ্বরমের কাছে । এখান থেকেই রামচন্দ্র সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয় । এখানে রামচন্দ্রের বসবাসের কিছু নিদর্শন দেখানো হয় । ধনুষ্কোটি পর্যন্ত আগে ট্রেন যেত । আমরা সে অবধি যেতে পারিনি । কারণ ঝড়ে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । রামেশ্বরম পর্যন্ত গিয়েছিলাম ।

উত্তর ভারতে রামচন্দ্রের যে প্রভাব দক্ষিণ ভারতে তা কিন্তু নেই । এই পরিক্রমায় আমি বেরিয়েছিলাম সম্পূর্ণ একা । নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হত । খাওয়ার কষ্টও ছিল বেশ কিছু জায়গায় । তবুও এটা আমার কাছে বেশ মনোরম স্মৃতি হয়ে আছে ।

ভ্রমণ শারদীয় সংকলন, ১৯৯২

আসমু. ককেশাস

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

নিমন্ত্রণের ইতিকথা

ছেলেবেলায় ভূগোল বইয়ে পৃথিবীর কোথায় না কোথায় কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গার নাম দেখেছি, সেসব জায়গা কখনও দেখাই হয়নি, কীভাবে সেখানে যেতে হয় তাও জানি না । অথচ যুগ যুগ ধরে সেইসব অজ্ঞাত দেশ তাদের নিজস্ব ভূগোল-ইতিহাস নিয়ে বিরাজমান ।

ব্রাজিলের আমাজন থেকে ফিরে এসে, এবার চলেছি তেমনই একটা দেশে । নাম তার জর্জিয়া । অচেনা দেশ মাত্রই আমাকে টানে, তার ওপর জর্জিয়া অতি প্রাচীন দেশ আর জর্জিয়ানরা পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব-গোষ্ঠীগুলির একটি । বইয়ে পড়েছি, ককেশাসে, বিশেষ করে জর্জিয়ার অংশে প্যালিওলিথিক যুগের আদি মানবের চিহ্ন পাওয়া গেছে । পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগে জর্জিয়ায় কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আর রিওনি-কিউভিরিলা নদী-দুটির অববাহিকায় মানুষের বসতির কথাও শোনা যায় ।

দুয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক দাগ আমি নিজেই দেখেছি ।

জর্জিয়ার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ঘিরে ককেশাস পর্বতমালা । তিনদিকের চার দেশ থেকে ছোট্ট এই দেশটাকে ককেশাস তার পার্বত্যপ্রাচীর তুলে আলাদা করে রেখেছে । উত্তরে রাশিয়া, পুবে আজারবাইজান, দক্ষিণে আর্মেনিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে তুর্কি । বহু যুগের বহু জয়-পরাজয়, ভাঙা-জোড়া, ক্ষতি-বৃদ্ধির স্মৃতি বয়ে মিশ্র-অমিশ্র অন্তর্লীন সংস্কৃতি নিয়ে আমার ভালোবাসার এই দেশটি শেষবারের মতো তার স্বাধীনতা হারায় ১৯২১ সালে, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে ফিরেও পায় ১৯৯১-এ । এ পাওয়া চিরকালের মতো, নাকি ক্ষণকালীন, আমি জানি না । দেশটির বৈষয়িক সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য এখনকার এই স্বাধীনতাই ভালো, না তখনকার সেই সংযুক্তি, আমি জানি না ।

জর্জিয়ায় আমি দেখলাম মানুষের হাসিমুখ, আনন্দমুখ, দেখলাম তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মসুখ-এ হল নতুন স্বাধীনতার আনন্দ; আর দেখলাম দিন গুজরানোর কষ্ট, পথে

পথে, শহরে গ্রামে, লোকের বাড়িতে চাপা ব্যথা, অনিশ্চয়তার কালো মেঘ-এ হল স্বাধীনতার মূল্য ।

জর্জিয়ার তিনদিকে পাহাড় আর পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর । আসমুদ্রককেশাস এই প্রাচীন দেশ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও ছোট, মোটে ৬৯,৫০০ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষেরও কম, তার অধিকাংশই জর্জিয়ান, অল্পসংখ্যক আবখাজিয়ানসহ, আবখাজিয়ানরাও তো জর্জিয়ান । জর্জিয়ানদের ছোট্ট একটা গোষ্ঠী সীমান্তবাসী এই আবখাজিয়ানরা এখন আবখাজিয়ায় আলাদা স্বায়ত্তশাসন চালু করেছে । একালের 'রিপাবলিক অব জর্জিয়া' বলতে এই আবখাজিয়ান অটোনমাস রিপাবলিক আর আচারান অটোনমাস রিপাবলিক ধরেই । জর্জিয়ান ছাড়া জর্জিয়ায় আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানিয়ান, রাশিয়ান, গ্রিক, তুর্কি, কুর্দ, হিব্রু প্রভৃতি অন্যান্য দেশ ও ভাষার মানুষও দেখা যায় । তবে এরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়, যদিও এইসব জাতির লোকেরা বহু প্রাচীনকাল থেকে জর্জিয়ায় বাসা বেঁধেছে । ইহুদিরা এদেশে প্রথম বসতি করে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ।

এশিয়া আর ইউরোপ-এই দুটি মহাদেশের মাঝের দরজা জর্জিয়া । সেইজন্যই বোধহয় মেয়েদের ইউরোপীয় পোশাকের সঙ্গে অনেকের গায়েই আমাদের মতো শাল দেখলাম । পুরুষদের পোশাক আজকাল সব দেশেই প্রায় এক, মেয়েদের পোশাকে এখনও কিছুটা হয়তো সে দেশের চিরাচরিত ধারার পরিচয় পাওয়া যায় । শুধু পোশাক-পরিচ্ছদই না, জর্জিয়ার রাস্তায় বাজারে, লোকের বাড়িতে, সর্বত্রই না-পুরোপুরি ইউরোপ না-পুরোপুরি এশীয়, কিংবা যেন কিছুটা এশীয় কিছুটা ইউরোপীয় ভাব ও রীতি দেখেছি । পারিবারিক বন্ধনও একালের ইউরোপের মতো অতটা ঢিলেঢালা হয়ে যায়নি, কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেকটাই বরং আমাদের দেশের মতো তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকেই লেখাপড়া কি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে । ইউরোপের শহর-জীবনের মতো কিশোরী বা সদ্য তরুণীদের পারিবারিক স্নেহসম্পর্কহীন সম্পূর্ণ বেপরোয়া উদ্দাম জীবনযাপন এখানে দেখিনি । আরও একটা ভারতীয় ভাব আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে । তা হল জর্জিয়ার মানুষের আন্তরিক অতিথিপরায়ণতা । জর্জিয়া ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে আমার জন্য নির্ধারিত রাইটার্স ইউনিয়নের ঘরোয়া সভায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট লেখক সমালোচক তামাজ ৎসিভৎসিভাদজে এই বলে আমার সঙ্গে পানীয় 'টোস্ট' করেছিলেন, 'প্রাচীন সভ্যতা ও সুগভীর দর্শনের মহান দেশ ভারত থেকে আপনি এসেছেন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ছোট্ট দেশ জর্জিয়ায় । আপনি আমাদের অতিথি, আপনাকে আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে স্বাগত জানাই । আমরা বিশ্বাস করি অতিথি আসেন স্বর্গ থেকে ।'

কথা বলছিলেন জর্জিয়ান ভাষায়, সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি করে দিচ্ছেন আমার জর্জিয়ান বন্ধু মানানা দুমবাদজে ।

সেদিন ভেবেছিলাম, এ হয়তো সৌজন্য, নিছক আলঙ্কারিক ভাষণ ।

পরে জেনেছি জর্জিয়ার মানুষের এ হৃদয়ের ভাষা । এ তাঁদের সামাজিক রীতি । এ-ই তাঁদের স্বভাব । শুধু রাজধানী ৎবিলিসিতেই নয়, পূর্ব জর্জিয়া, পশ্চিম জর্জিয়া, দক্ষিণ জর্জিয়া-যখন যেখানেই গেছি, আপ্যায়নে আতিথ্যে মুগ্ধ হয়েছি, বাংলাদেশের ঢাকা নারায়ণগঞ্জের কথা আমার মনে পড়ে গেছে । আঠেরো দিনের জর্জিয়া ভ্রমণে ৎবিলিসি থেকে কখনও গেছি আখালসিখে, কখনও কাখেতিয়া, কখনও কুতাইসি, কখনও কৃষ্ণসাগরের তীরে, ফিরে আসার সময় সর্বত্র দেখেছি-আদর করে অনুনয় করে বলে, আজই যেও না ।

যদি বলি, আজ রাতে ৎবিলিসি না ফিরলেই নয়, তখনই তাঁরা আমার জর্জিয়ার বন্ধু, নিমন্ত্রণকর্ত্রী, সফরসঙ্গী ও দোভাষী মানানাকে ধরবে, তুমি ওর কালকের ৎবিলিসির প্রোগ্রাম একদিন পিছিয়ে দাও, আজকের দিনটা ও আমাদের মধ্যে থাকুক ।

মানানার পুরো নাম মানানা দুমবাদজে । জর্জিয়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক, ফুলব্রাইট স্কলার । বিখ্যাত জর্জিয়ান সাহিত্যিক নোদার দুমবাদজের কন্যা । নোদার দুমবাদজে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, শিশুদের মস্ত বড় একটা পার্কে তাঁর মূর্তি আছে, পার্কটার পরিকল্পনাও তাঁর । তাঁর মৃত্যুর পর জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে ও সরকারি অর্থে প্রয়াত দেশপ্রিয় লেখকের কল্পনা অনুযায়ী পার্কটি তৈরি হয় ।

নোদারের মেয়ে মানানার সঙ্গে আমার আলাপ জুরিখে, বিশ্ব সম্পাদক সম্মেলনে । এইসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাধারণত দুটি অধিবেশনের মাঝখানে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা থাকে । প্রত্যেক টেবিলে চার-পাঁচজনের চেয়ার । আমি যে টেবিলে বসেছিলাম সেই টেবিলের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খেতে খেতে পরিচয় হল । তাঁদের একজন জর্জিয়া থেকে এসেছেন, নাম মানানা দুমবাদজে ।

জর্জিয়া শুনেই আমি লাফিয়ে উঠি, আমি কতকাল ধরে ভাবছি জর্জিয়া আমাকে যেতেই হবে । মানানা কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে আমার বিজনেস কার্ড দেখে তাঁর কার্ড আমাকে দিয়ে বললেন, আপনি আমাকে জর্জিয়া ভ্রমণের ইচ্ছে জানিয়ে চিঠি লিখবেন, আমি গভর্নমেন্টকে সেটা ফরওয়ার্ড করে দেব, আমাদের সরকার আপনাকে জর্জিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ করবেন ।

পরের কদিন এতই ব্যস্ততার মধ্যে কাটল যে চলে আসার আগে মানানার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর দেখাই হল না ।

কলকাতায় ফিরে কর্মচক্রে বাঁধা পড়ে গেলাম, সব চাপা পড়ে গেল ।

গত বছর জুন মাসে রিও ডি জেনেরোয় জর্জিয়ার একজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হওয়া মাত্রই আমার জর্জিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা মনে পড়ে গেল, আমি তাঁকে একটু বিস্তারিত করে আমার মনের কথাটা বললাম ।

মহিলাটি চুপ করে সব শুনলেন । আমার কথা শেষ হতে বললেন, আপনি আমাকে জুরিখে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরে কথামতো চিঠি আপনি পাঠাননি ।

তক্ষুনি চিনতে পারলাম-আরে এ তো সেই মানানা দুমবাদজে!

আবার নতুন করে কথা হল এবার দেশে ফিরেই চিঠি লিখব, মানানা সে চিঠি তাঁর সরকারকে দেবেন, তাঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন ।

পরদিন লাঞ্চে আমাকে ডেকে নিল চিন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিরা । ফলে লাঞ্চের পরে দ্বিতীয় অধিবেশনে নোট লেখার ফাঁকে ফাঁকেই ঠিক হল সরকারি নিমন্ত্রণ ছাড়াও জর্জিয়ার সংবাদপত্রও আমাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে । গতবারেই নাকি এ নিয়ে কথা হয়েছে, ৎবিলিসির 'দিলিস গাজেতি' আমাকে জর্জিয়ায় তাদের দেশ দেখবার নিমন্ত্রণ জানাতে খুবই আগ্রহী ।

বিদেশে সরকারি নিমন্ত্রণে গেলে ঘোরাঘুরি অনেক সহজ হয়ে যায় । তাছাড়া অতিথির জন্য হয়তো বিশেষ কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা কোনও দুর্গম গন্তব্য বা এই ধরনের দুর্লভ কোনও আয়োজনও হতে পারে । আমি জর্জিয়া নিয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম ।

মানানাও আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, সরকার থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, দেশে ফিরেই চিঠিটা পাঠান, ফ্যাক্সে বা ই-মেলে । মানানার মুখটা গোলগাল, ভারি সুশ্রী, কিন্তু ওপরের সারির দাঁতগুলো দুয়েক জায়গায় ফাঁক-ফাঁক । বয়স কত? আমার মাথায় তখন অন্য সংশয় । বললাম, তোমাদের দেশে রিটায়ারমেন্টের বয়স কত?

'৫৮ ।'

'যদি কিছু মনে না করো, তোমার এখন কত বয়স?'

'৫৮ ।'

‘তাহলে তুমি দেশে ফিরে কবে আর সরকারের কাছে আমার চিঠি ফরওয়ার্ড করবে?’

‘কেন, অসুবিধা কোথায়?’

‘তুমি তো শিগগিরই রিটায়ার করে যাবে । তোমাদের তো ৫৮য় রিটায়ারমেন্ট ।’

মানানা গম্ভীর থমথমে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ডু আই লুক লাইক ফিফটি এইট?’

‘আপনিই তো বললেন!’

‘আমি বলেছি, আই ওয়াস বর্ন ইন ১৯৫৮ ।’

একেই সৌজন্যের সব সংজ্ঞা ভেঙে মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করেছি, তার ওপর ৪০-বছরের মহিলাকে ৫৮ বলেছি, কৃষ্ণসাগরের তীরে এসেও নির্ঘাৎ আমার তরী ডুবল!

কলকাতায় ফিরে চিঠি লিখে কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর পেলাম-

হ্যালো প্রিয় শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি । আপনি দেখছি খুবই আশ্চর্য, আগ্রহান্বিত, ব্যস্ত ও ফলপ্রসূ সময় কাটিয়েছেন ।

রিওতে যেমন কথা দিয়েছি, জর্জিয়ায় আপনাকে আনবই, যাতে আমার দেশের অনেকটাই আপনি দেখতে পান ও সেই দেখা ভ্রমণ-এ লিখতে পারেন ।

-মানানা দুমবাদজে

উপ-প্রধান সম্পাদক, দিলিস গাজেতি

দ্বিতীয় চিঠি প্রধান সম্পাদকের কাছ থেকে:

প্রিয় শ্রী চক্রবর্তী,

জর্জিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র ‘দিলিস গাজেতি’ আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জর্জিয়ায় অক্টোবরের ৭ থেকে ২৪ পর্যন্ত ভ্রমণের নিমন্ত্রণ করছেন । আমাদের দেশে নিমন্ত্রিত ভ্রমণ-লেখক হিসেবে আপনাকে পেতে চাইছি ।

আমাদের দেশ, দেশের মানুষ, আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করার আপনার যে আগ্রহ তা খুবই প্রশংসাযোগ্য । আমরা আশা করি আপনার জর্জিয়া ভ্রমণ

আমাদের দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতে আরও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাবে ।

'দিলিস গাজেতি' অক্টোবরের ৭ থেকে ২৪ পর্যন্ত জর্জিয়ায় আপনার থাকা খাওয়া ঘোরাঘুরি ও সারা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বহু বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকের সঙ্গে আপনার মিটিংয়ের ব্যবস্থা করবে' ।

-মানানা কারতোজিয়া

প্রধান সম্পাদক, দিলিস গাজেতি

ৎবিলিসি, জর্জিয়া

তৃতীয় চিঠি:

আপনার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা হবে । জর্জিয়ায় এখন যতদূর সম্ভব, ঠিক ততটাই চিত্তাকর্ষক হবে আপনার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ।

'দিলিস গাজেতি' আপনাকে আতিথ্য দানের জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে আছে । আমরা আপনার জর্জিয়া ভ্রমণ নিয়ে লিখব ও আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে । গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে । কিন্তু যেহেতু আপনি আসছেন অক্টোবরের গোড়ায়, প্রথমেই আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাই সমুদ্র-উপকূলবর্তী গ্রাম গ্রিগোলেতিতে । অক্টোবরে জর্জিয়ান ব্ল্যাক সি কোস্ট সোনালি আর উষ্ণ, কিন্তু অক্টোবরের গোড়াতেই শুধু এমন মনোরম থাকে । সেইজন্যই আমরা পশ্চিম জর্জিয়া থেকে ভ্রমণ শুরু করব, যাব গুরিয়াতেও, জর্জিয়ার এক অতি সুন্দর আর খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল এই গুরিয়া । দুঃখের কথা, আপনি ৎবিলিসি নগরোৎসব দেখতে পাবেন না, কেননা প্রতি বছর এই উৎসবের তারিখ পড়ে অক্টোবরের শেষ রবিবার, এবছর সেটা ২৯ তারিখ । অবশ্য ভাববার কিছু নেই, আমরা অন্য কয়েকটা জায়গায় যাব, ভালো ভালো প্রদর্শনী দেখব, গ্রামেও ঘুরব । ৎবিলিসি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব জার্নালিজম-এ আপনার জন্য সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে আপনাকে ভ্রমণ-সাংবাদিকতা, আপনার 'ভ্রমণ' পত্রিকা, আপনার নিজের কথা ও আজকের ভারত বিষয়ে বক্তৃতা বক্তৃতাকরতে হবে । জর্জিয়ার পর্যটন উন্নয়ন যাঁদের জন্য সম্ভব হচ্ছে তেমন কয়েকজন প্রথম সারির

ব্যক্তির সঙ্গেও আপনার মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করছি। জর্জিয়ার লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকসংস্কৃতিও আপনার ভ্রমণসূচিতে থাকছে।

আমি এখনও ভেবে যাচ্ছি আরও কী কী যোগ করা যায়। কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আপনার ভালো লাগবে। এসব চূড়ান্ত হওয়া মাত্র আমি আপনাকে ই-মেল করব।

অক্টোবরে এখানে কিছুটা গরম আবার হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডাও পড়ে যায়। হাল্কা পশমের পোশাক আর একটা চামড়ার জ্যাকেট হলেই চলবে। ভারি উলের পোশাক আনবেন না। একটা হাল্কা রেইনকোট অথবা ছাতা আনতে পারেন। আপনার ভারত ছাড়বার মুহূর্তে জর্জিয়ার আবহাওয়া ঠিক কীরকম হবে তাও তখন জানিয়ে দেব।

আপনার চিঠির আশায় রইলাম। আপনার আর কোনও প্রশ্ন থাকলে, কোনওরকম দ্বিধা বা সংকোচ করবেন না, আমাকে লিখুন। -মানানা দুমবাদজে

চতুর্থ চিঠি:

আশাকরি আমার ১২ সেপ্টেম্বরের ই-মেল পেয়েছেন, এই চিঠির নিচে আবার পাঠালাম। পেয়ে থাকলে উত্তর দিলেন না কেন? জর্জিয়ায় আসার ব্যাপারে এবং কবে আসছেন সে বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমার জানা খুব দরকার। কেননা এখানে আপনার ভিসার ব্যাপারে আমাকে লাগতে হবে।

ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসার ব্যাপারে আমি এখানে সব তথ্য ও নিয়মকানুন দেখে নিয়েছি। মনে হয় সামান্য জটিলতা রয়েছে, আশাকরি তার মীমাংসা করা যাবে।

আপনাকে শুধু আপনার বায়োডাটা, পাসপোর্ট নম্বর সহ এখনই ই-মেল বা ফ্যাক্স করতে হবে। তা নিয়ে আমি আমাদের বিদেশমন্ত্রকে যাব, তারাই আপনাকে জর্জিয়ায় প্রবেশের ভিসা সাপোর্ট দেবার ব্যবস্থা করবেন। ফলে আপনি ৎবিলিসি এয়ারপোর্টে হাতে হাতে ভিসা পেয়ে যাবেন। -মানানা দুমবাদজে

এর আগে কবে যেন একটা ই-মেলে মানানা জানালেন আমার ভ্রমণসূচি ক্রমশই আরও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে, এই কাজে তিনি নিজে ও দিলিস গাজেতির প্রধান সম্পাদক মানানা কারতোজিয়া নানা সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আমার বিমানের টিকিট পাঠাতে একটু দেরি হচ্ছে বলে দুমবাদজে খুবই দুঃখিত।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। প্যারিসের ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউজ পেপার্স ও সংবাদপত্র প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইফরা (IFRA) থেকে প্যারিসে যাবার নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। মাস কয়েক আগে প্রথম এই নিমন্ত্রণ পেয়ে সময়াভাবে যেতে পারব না জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর এই দ্বিতীয়বার একই নিমন্ত্রণ। লিখেছেন বেঙ্গট ব্রাউন, প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজ পেপার্স ও মারডক ম্যাকলেনান, প্রেসিডেন্ট, ইফরা।

মানানা দুমবাদজের টিকিট পাঠানোয় বিলম্বের কথা পড়ে আমি তাঁদের আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলাম, আমাকে WAN ও IFRAর একটা নিমন্ত্রণে ২৮ সেপ্টেম্বর প্যারিস যেতে হচ্ছে, সেখান থেকেই সোজা জর্জিয়ায় চলে যাব, ফলে কলকাতা-মস্কো-জর্জিয়া-মস্কো-কলকাতার টিকিট পাঠাবার দরকার নেই, ৫-৬ দিনের জন্য আমি প্যারিসের কাজ সেরে জর্জিয়া চলে যাব।

৫ অক্টোবর প্যারিসের 'সিতে ইউনিভারসিতে'র (ইউনিভার্সিটি সিটি) মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ-এর ডিরেক্টর আমার অগ্রজ বন্ধু ডক্টর বিকাশ সান্যালের কম্পিউটার থেকে আমার জর্জিয়া যাত্রার খবর দিয়ে ই-মেল পাঠালাম-

আমার এখানকার কাজ শেষ। এবার আপনাদের আশ্চর্য দেশ দেখবার অপেক্ষা। আমি ৮ অক্টোবর ভিয়েনা থেকে রওনা হয়ে ৎবিলিসি পৌঁছব জর্জিয়ান সময় সন্ধে ৬টা ২০ মিনিটে। ফ্লাইট নম্বর OS 682 (অথবা, হয়তো, A9 682)।

৬ অক্টোবর প্যারিসের ঠিকানায় জর্জিয়ার পঞ্চম চিঠি পেলাম:

আমরা আপনার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছি। মনে হয় জর্জিয়ায় আপনার দিনগুলো আনন্দের হবে। নানা অঞ্চলে আপনার বেড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, লেখক, সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনাকে তাঁদের জন্য কিছু বলতে হবে। টিভির পর্দায় আপনাকে জর্জিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে আপনি আমাদের ঘরোয়া অ্যাপার্টমেন্টে থাকবেন, হোটেলে থাকার চেয়ে সেটাই আপনার বেশি ভালো লাগবে।

আমি ও দিলিস গাজেতির কয়েকজন আপনাকে আনতে এয়ারপোর্টে যাব। জর্জিয়ায় আপনার আগমন নিয়ে পরদিনই, সোমবার, সকালের সংবাদপত্রে লেখা হবে।

এই বার আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম। এঁরা আমাকে ভুল করে কী ভেবে নিয়েছেন কে জানে!

২

ৎবিলিসির অতিথি

অক্টোবরের ৮ তারিখে আমার জর্জিয়ার রাজধানী ৎবিলিসিতে পৌঁছবার কথা, ফ্রান্সের শার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টের ১৫-২০ কিলোমিটারের মধ্যে গ্রিজি-অঁ-ফ্রাঁসে আমার দুদিন ধরে সেমিনার ও দু-বেলা ওয়ার্কশপ শেষ করে হাতে তখনও পাঁচ-ছদিন সময়, কী করি কী করি করতে করতে প্যারিসের গার দু নর স্টেশনে গিয়ে একটা ট্রেনে চড়ে চলে গেলাম লাঁও, সেখান থেকে সোয়াশেঁা। মধ্য যুগের এই দুটি দুর্গশহর অনেকটা যেন স্বপ্নে বা সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো। সোয়াশেঁা ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী।

যাইহোক ফ্রান্সের অতীতের রাজধানী থেকে বর্তমানের রাজধানীতে ফিরে প্যারিসের 'সিতে ইউনিভারসিতে'র ভারত ভবনে বাঙালিদের দুর্গাপুজোর ঢালাও নিমন্ত্রণে ধূপধুনো ঢাকঢোল যজ্ঞ আরতি দেখে, দুবেলা প্রসাদ ও ভোগ খেয়ে ৮ তারিখ সাতসকালে শার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠলাম। যাব ভিয়েনায়। ভিয়েনা থেকে ৎবিলিসির বিমান আকাশে উঠবে ভিয়েনার স্থানীয় সময় দুপুর বারোটায়।

ভিয়েনা এয়ারপোর্টে চেক-ইন ও সিকিউরিটি সেরে ৎবিলিসি যাবার গেটের সামনে লাউঞ্জে বসে প্রথমেই নজরে পড়ে অপেক্ষমাণ পুরুষ-মহিলা যাত্রীদের কালো চুল ও মুখের কিছুটা অন্যরকম বৈশিষ্ট্য। নৃতত্ত্বে আমূল আনাড়ি চোখেও আমার মনে হল, এদের মুখ যেন ইরানের আমে আর রাশিয়ার দুধে মেশানো। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে জীবনে প্রথম একসঙ্গে এতজন জর্জিয়ানকে দেখে খুবই ভাসাভাসা একটা ধারণা দেবার জন্য আমার এই অনধিকার চর্চা। আমি ছাড়া এখানে সবাই মনে হয় জর্জিয়ার লোক।

ৎবিলিসি এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমেই আমার বুক থেকে একটা আনন্দশ্বাস বেরিয়ে এল-আ, আমি এখন জর্জিয়ায়! স্থানীয় সময় তখন সন্ধে সাতটা।

পুলিশের কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখাতেই একটা ফরম পেলাম, পূরণ করে ফেরত দিতেই পুলিশ অফিসারটি তার ওপর সই করে ছাপ মেরে কাগজটা নিয়ে সামনেই আরেকটা কাউন্টারে যেতে বললেন। সেখানে ৪০ মার্কিন ডলার দিয়ে ভিসা পেয়ে গেলাম
।

ভিসা নিয়ে চলে আসছি, কাউন্টারের ভেতর থেকে একজন কর্মচারী বললেন, আপনার কাছে কি দশ ডলার আছে?

খুচরো দশ ডলার? না তো!

পাঁচ?

না। আমার কাছে ভিসা বাবদ খুচরো ওই চল্লিশ ডলারই ছিল।

ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না। ওয়েল কাম টু জর্জিয়া। উইশ ইউ এ নাইস স্টে ইন জর্জিয়া।

এরকম ভদ্র নম্র ঘুষ প্রার্থনা আগে কোথাও দেখিনি।

ব্যাগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ভাবছি মানানা তবে কি বাইরে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ দেখি সদলবলে হাজির। মানানার সঙ্গে একটি যুবক, একজন ফটোগ্রাফার ও এক যুবতী। যুবকের কোলে একটি শিশু।

মানানা ও অন্য মহিলাটি দুজনে মিলে ধরাধরি করে আমাকে একটি বাঁধানো পেইনটিং উপহার দিয়ে এয়ারপোর্টেই স্বাগত জানাল। মানানার সঙ্গের মেয়েটি ৎবিলিসির দৈনিক সংবাদপত্র, আমার নিমন্ত্রণকর্তা 'দিলিস গাজেতি'র রিপোর্টার, ফটোগ্রাফারও দিলিস গাজেতির, শিশু কোলে তরুণ মানানার ছেলে, শিশুটি তার নাতি! আরও একজন স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোক এসেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম ইনি হয়তো দিলিস গাজেতির ম্যানেজার বা ওই ধরনের কেউ, মানানা আর সকলের মতো এর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল-'দিলিস গাজেতি'র ড্রাইভার। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমার বাক্সটির টানা-ফিতেটি ধরে বাক্সটি টেনে নিয়ে চললেন।

মানানা একটা খবরের কাগজ খুলে আমার সামনে মেলে ধরল, জর্জিয়ান ভাষায় আধপাতা জোড়া একটা লেখার সঙ্গে আমার ছবি। সেইসঙ্গে আমার My White Horse ও ইংরিজি ভ্রমণ-এর মলাটের ছবি দেখে বুঝলাম লেখাটা আমার সম্পর্কে। ভাষা তো আর জানি না, দেখতে অনেকটা যেন ওড়িয়া বা তেলুগুর মতো। মানানা বলল, এটাই 'দিলিস গাজেতি'।

সন্ধে হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে রাস্তার দুধারে ঘরবাড়ি লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি, কেমন যেন আমাদের চন্দননগর বা বহরমপুর বা বাগবাজারের মতো পুরনো চেহারা, তফাৎ বলতে ক্বচিৎ-কখনও দুয়েকটি স্থাপত্যগর্বিত, শতাব্দীপ্রাচীন ও প্রাচীনতর অট্টালিকা। কোথাও কোনও জাঁকজমক চোখে পড়ল না। রাস্তায় বড় কোনও

আলোঝলমল দোকান বা উৎসবমুখর মানুষের জটলাও দেখলাম না। দিনটা রবিবার বলেই কি?

মানানার বাড়ি যেখানে সে এলাকাটা যেন আরও স্তিমিত। বড় রাস্তার কাছেই বাড়ি, মলিন, মেরামতিহীন বহুতল বাড়ির কয়েকটি ব্লক, ব্লকগুলির মাঝখানে বদ্বীপের মতো বড় খোলা জায়গাটাও তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। রাস্তার ধারেই বহুতলবাসীদের টুকটাক প্রয়োজন মেটাতে ছোট্ট খুপরির মতো একটা দোকান, দুয়েকটি কাঁচা সবজি, দুয়েকটি ফলটল পাওয়া যায়। একটু দূরে আরেকটি দোকানে চোখে পড়ল তিন-চার রকম মাছ চিজ ফল সব্জি রুটি ইত্যাদি নানা সামগ্রী। রাস্তার ওপারে অসমাপ্ত একটি বহুতল, আয়তন দেখে মনে হয় অনেক উচ্চাশা নিয়েই বাড়িটি তৈরি হচ্ছিল, কোনও কারণে শেষ রক্ষা হয়নি।

মানানা আমার চোখের কৌতূহল বুঝতে পেরে বলল, সরকারি উদ্যোগে বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল, অর্থাভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যাঁরা আগাম টাকা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বুক করেছিল, সরকার এখন তাদের বলছে, যে যার অংশ নিজেরাই তৈরি করে নাও।

মানানার বহুতলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে, চারধাপ সিঁড়ি ভেঙে লিফটে চড়ে পাঁচতলায় তাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে আনন্দে গা শিরশির করে উঠল-আমি একটা জর্জিয়ান সংসারে একেবারে অন্দরমহলে চলে এসেছি। প্রথমেই অভর্থনা করল একটি বিড়াল। তার বিলম্বিত লয়ের ম্যাঁও শুনে মানানা আমাকে বলল, বিড়ালে তোমার অসুবিধা হয় না তো?

একেবারেই নয়।

ছাতা জুতো জ্যাকেট রাখবার ছোট প্যাসেজ ছেড়ে মস্ত বড় বসবার-খাবার ঘরে খাবার টেবিলের সামনে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে মানানা বলল, এসো, বসে যাও। খেতে খেতে কথা হবে। আমাদের চিফ এডিটর মানানা কারতোজিয়া ও তাঁর স্বামীও তোমার সম্মানে ডিনারে আসবেন কথা ছিল। তোমার ডিলেইড ফ্লাইটের জন্য সেটা আর হল না।

জর্জিয়ান শ্যাম্পেন দিয়ে আমাকে স্বাগত জানানো হল। টেবিলে 'ভারতীয় অতিথি' ছাড়া আর আছেন মানানা, তার ছেলে, তার ছেলের ছেলে, 'দিলিস গাজেতি'র রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, 'দিলিস গাজেতি'র গাড়ির ড্রাইভার। এঁর পোশাকের রুচি ও পারিপাট্য তারিফ করার মতো। যখনই এরপর ৎবিলিসির বাইরে কোথাও গেছি এই ভদ্রলোকই আমাদের সারথী হয়েছেন।

পুরো টেবিল ভরা খাবার। সবই জর্জিয়ার নিজস্ব ব্যঞ্জন। আমি দুয়েকটি পদ পরখ করছিলাম। মানানা আমার দ্বিধান্বিত ধীরগতি ছুরি-কাঁটা সঞ্চালন দেখে পরপর কয়েকটা পাত্রে ছাগখণ্ড মেষখণ্ড গোখণ্ড ও অখণ্ড কুক্কুটের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে একটা পাত্র থেকে সরু ডাঁটা বা শেকড়সদৃশ এক গুচ্ছ গুল্মজাতীয় কিছু আমার প্লেটে ঢেলে দিলেন। এটা নাকি জর্জিয়ার আবহমান কালের একটা সর্বজনপ্রিয় আচার জাতীয় খাদ্য, আমারও নাকি ভালো লাগতে বাধ্য। ডিনারের সঙ্গে জর্জিয়ার জগদ্বিখ্যাত রেড ওয়াইন দিতে না পেরে তার আপসোসেরও শেষ নেই। গত কয়েকদিন তার অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততাতেই ঘরে রেড ওয়াইন এনে রাখতে ভুল হয়ে গেছে।

শেকড়জাতীয় আচার মুখে দিয়ে দেখি টকটক খেতে। যুগ যুগ ধরে জর্জিয়ানদের এত প্রিয়, জিনিসটা ঠিক কী? শুনলাম এর নাম জঞ্জলি, কচি আখের ডগা বা ওইরকমই কিছুর না-রাঁধা চচ্চড়ি, তবে সঙ্গে ভিনিগার ও আরও দুয়েকটা উপাদান মেশানো।

সাংবাদিক মেয়েটি চটপট খাওয়া শেষ করে আমাকে বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, আমি এসেছি আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে, কাল সকালের কাগজে বেরবে। আমি কি এখনই আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি? খেতে খেতেই আপনি উত্তর দেবেন।

মানানা আপত্তি করতে যাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটিকে বললাম, শুরু করুন।

মেয়েটি একটু কঠিন-কঠিন দর্শন-ঘেঁষা প্রশ্ন করছিলেন, আমি কথা বলছিলাম মানুষে-মানুষে সহজ, স্বাভাবিক ভাব-ভালোবাসার প্রতি আমার আজন্ম বিশ্বাস ও নিজের গভীর হৃদয়ানুভূতি থেকে। কিন্তু নানারকম সুখাদ্যের সুগন্ধে ব্যাকুল মানানার বিড়ালের ঘন ঘন ম্যাঁও-ম্যাঁও আর নতুন লোক পেয়ে মানানার দু-আড়াই বছরের নাতির নানা বক্তব্যে প্রশ্নকর্ত্রীর দর্শন ও উত্তরদাতার মানবপ্রেম বারবার বাধা পাচ্ছে দেখে আমাদের দুজনকেই পাশের ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করতে হল।

পরদিন সকালে মানানা সেই সাক্ষাৎকার পড়ে আমার তারিফ করায় বুঝলাম যে আমি কোনওক্রমে উতরে দিয়েছি, অন্তত খুব একটা সাপ-ব্যাঙ কিছু বলিনি।

মানানার বাবার নাম নোদার, ছেলের নামও নোদার। নাতির নামও নোদার কি না তা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। ছেলে নাতি দুজনেই মানানাকে নাম ধরে ডাকে। তার ফলে, জর্জিয়ান ভাষায় মা যে 'তেদা', ঠাকুমা-দিদিমা 'বেবো' সেকথা একজন জর্জিয়ান মা-দিদিমার সংসারে অতিথি হয়েও প্রথম দিন আমার জানার সুযোগ হল না। জর্জিয়ায়

বাবাকে বলে 'মামা' । আবার, মানানার বাবার এবং জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট শেভারনাদজের জন্মগ্রাম গুরিয়ায় 'বাবা'কে অবিকল আমাদের মতো 'বাবা'ই বলে ।

পরে এরকম আরও কিছু জর্জিয়ান শব্দ আমাকে শিখতে হয়েছিল, দুয়েক টুকরো জর্জিয়ান বাক্যও মুখস্থ করেছিলাম । তবে, ছোট্ট ও প্রাচীন এই দেশটি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বারবারই আমার মনে হয়েছে এদেশের ভাষাটা যদি কিছুটাও শিখে আসতে পারতাম!

আমার শোবার ঘরের দেওয়ালে দেখলাম পুরনো দিনের একটা বন্দুক । আমাকে কৌতূহলী দেখে নোদার সবিস্তারে যোদ্ধা জর্জিয়ানদের ঐতিহ্যের কথা শোনাল ।

নতুন দেশে প্রথম রাতটা আমার ঘুম আসতে চায় না, অথবা ঘুমোতে ইচ্ছে হয় না । অনেকক্ষণ ধরে বুক সেলফগুলোর বই দেখলাম, বেশিরভাগই জর্জিয়ান ভাষায়, কয়েকটা ইংরিজি বই নাড়াচাড়া করলাম, বন্ধ জানলার কাচের পাল্লা দিয়ে চোখে পড়ল সামনের বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেরই আলো নিভে গেছে, আমিও এক সময় শুয়ে শুয়ে দেশটার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়বার মুখে হঠাৎ মনে হল-নোদারের স্ত্রীকে আর মানানার স্বামীকে দেখলাম না তো! বাড়িতে শুধু মা ছেলে নাতি আর একটা বিড়াল!

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল ফেরিওলার ডাকে । মেয়েলি গলার অনভ্যস্ত, কাঁপা কাঁপা ডাক । কী ফিরি করছে, ভাষা জানি না বলে বুঝতে পারছি না, কিন্তু তার কণ্ঠের ক্লেশ স্পষ্টই কানে বাজছে ।

আমার ঘর থেকে বেরিয়ে, মাঝের খালি ঘরটি পেরিয়ে, বসবার-খাবার বড় ঘরটার ভেতর দিয়ে বাথরুমে যাবার সময় দেখলাম মানানারা আমার আগেই উঠে পড়েছে । বড় ঘরটার আরেকদিকে আরেকটা ঘর । নোদার আমাকে দেখেই বলল, কামারজোবা!

তখন সকাল আটটা । আমি আন্দাজে বুঝলাম এ হল গিয়ে ইংরিজি গুড মর্নিং, ফরাসি বোঁ জুর, জার্মান গুটেন টাগ, স্প্যানিশ বুয়েনস দিয়াস-এরই জর্জিয়ান সংস্করণ । তাই আমিও পর পর তিনজনকেই তিনবার 'কামারজোবা' বলে দিলাম ।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ব্রেকফাস্টের ডাক পড়ল । গত রাতের সেই মোটা মোটা জর্জিয়ান রুটি, জঞ্জলি, মাখন, চিজ, ডিম আর চা বা কফি ।

রান্নাঘরের ছোট্ট টেবিলে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমার আজকের কর্মসূচি শুনে নিলাম । মানানা আর পনেরো মিনিটে অফিসে রওনা হয়ে যাবে । নোদার তার ছেলেকে নিয়ে নিজের বাড়ি যাবে । সেখান থেকে বেলা এগারোটায়, তার একটা খুব পুরনো গাড়ি আছে, সেই গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে, বাড়ি দেখাবে । তারপর লাঞ্চের

সময় মানানার অফিসে নামিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলে যাবে, সেখানে সে বিচারকের কীরকম যেন সহকারী ।

সবাই বেরিয়ে গেলে আমি বড়ঘরের লাগোয়া আরেকটি ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম । ফিরিউলির ডাক শুনে নিচে তাকিয়ে দেখলাম মেঘলায় ঠান্ডায় মধ্যবয়সী একজন মহিলা কাপড়ের পুটলিতে বাঁধা কিছু একটা বিক্রি করার জন্য কাঁপা গলায় মৃদু হাঁক পাড়ছেন । ওপর থেকে মহিলার মুখ দেখেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা । রাস্তার জিনিস ফিরি করার অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, খুব সদ্য একাজে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছে । একটা দেশের রাজনৈতিক অদল-বদলে সে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম, বৃহৎ থেকে বৃহত্তম কত যে দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যায়, কত ভাঙন, কত ভেসে যাওয়া-জনপ্রতি সেই মর্মযন্ত্রণার হিসেব কেউ কোনওদিন করে না!

ককেশাস-কৃষ্ণসাগরে বাঁধা জর্জিয়া নামের এই দেশ দেখতে এসে আমি বোধহয় এই প্রথম টের পেলাম, পাহাড় নদী সমুদ্র দেশের সৌন্দর্যচ্ছবির ফ্রেম মাত্র, দেখবার আসল ছবি হল মানুষ ।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মেঘলা সকালের হতাশামাখা আলোয় মানানাদের সারিসারি আবাসনগুচ্ছ ভালো করে দেখলাম । আমার সামনের দিকের বড় রাস্তা থেকে এই হাউসিং কমপ্লেক্সে আসবার দুটি পথ । একটি আমার বাঁয়ে, অন্যটি ডাইনে । মাঝখানে চৌকো আকারের অপরিচ্ছন্ন অপরিকল্পিত খোলা জায়গার চারপাশে একেক দিকে একটানা বহুতল বাড়ি । সেই বহুতলের পাদমূলে ঘুরে ঘুরে জিনিস ফিরি করছে একদা-মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নারী ও পুরুষ ।

নোদার তার নড়বড়ে রাশিয়ান গাড়ি নিয়ে এগারোটাতেই এসে গেল । তার বাড়ি মানে তার পৈত্রিক বাড়ি, জর্জিয়ার একসময়ের অভিজাত আবাসিক এলাকায় পুরনো তেতলা বাড়ি ।

ছেলেটি প্রায় মিউজিয়াম দেখানোর মতো করে আমাকে তার মায়ামেদুর, স্মৃতিবিধুর পৈতৃক বাড়ি দেখাল । বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে নিয়ে গেল । পিতামহ-প্রপিতামহের বহু পুরনো আসবাবপত্র, পুরনো যুগের পেয়ালা-পিরিচ, পানপাত্র, ছবি মূর্তি সবই ভারি যত্ন সহকারে দেখাল । আলমারি খুলে সন্তর্পণে বের করে আনল নেপোলিয়নের রাশিয়ার যুদ্ধে পরাজয় উপলক্ষে রুশসম্রাটের কী একটা স্মারক চিত্রলিপি । প্রাচীন ও প্রায়-জীর্ণ বইপত্রের মধ্যে একটা বড় মাপের মোটা বাঁধানো বই দেখে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম । জর্জিয়ার জাতীয় কবি সোতা রুসতাভেলির মহাকাব্য 'The Knight in the Tiger's Skin' (বাঘের চামড়া ঢাকা নাইট) । ছেলেবেলায় ‘দ নাইট ইন দ প্যান্থার্স স্কিন’ নামে এ-

বইয়ের একটি ইংরিজি গদ্য-অনুবাদ আধাআধি পড়ে বিশেষ কিছু না বুঝেও গল্পটার মধ্যের বীরত্ব ও বেদনা আমাকে আলোড়িত করেছিল মনে আছে । বিশেষ করে এক অপরূপ নারীর ব্যাকুল অথচ বীর হৃদয় গ্রামবাংলার এক কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে খুব নাড়া দিয়েছিল । এই সেই বই! খোদ মহাকবির দেশে, প্রায় একশো বছর আগের ইংরিজি অনুবাদে সম্পূর্ণ মহাকাব্যটি! আমি নোদারের কাছ থেকে বইটি ধার নিলাম, কথা হল, জর্জিয়ায় যতদিন থাকব, বইটি আমার শয্যাসঙ্গী হবে ।

নোদার আমাকে বইটি সহ মানানার অফিসে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল । রাতে দেখা হবে নিশ্চয়ই? মা-ছেলে দুজনেই জানাল, আজ আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই । কেননা ছেলে মায়ের বাড়িতে থাকে না, থাকে বাপের বাড়িতে । আমি তো ধন্দে পড়ে গেলাম- ছেলের আবার মায়ের বাড়ি বাপের বাড়ি কী? তবে কি বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

নোদারের বাবা, মানানার প্রথম স্বামী বছর কুড়ি আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায় । নোদার তার মাকে খুবই ভালোবাসে, মায়ের বাড়িতে থাকতেও তার ভালো লাগে (বাড়িটা মায়ের বাবা প্রয়াত লেখক নোদার দুমবাদজে তাঁর বড় মেয়েকে দিয়েছেন) । কিন্তু বাবার ওই গত যুগের মহিমাচিহ্নিত বাড়িটা সে প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারবে না বলেই ওই বাড়িতে পড়ে আছে ।

প্রথম স্বামী, বলে কী? তাহলে দ্বিতীয় স্বামী কোথায়? এমনিতে এইসব সাংসারিক জটিলতা আমার বিশেষ নজরে পড়ে না । অনেক সময় কারও সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্বের পরও খেয়াল হয় না । দশ-বারো বছর ধরে যাঁকে কফি হাউসে দেখেছি, কখনও এক টেবিলে বসে আড্ডাও দিয়েছি, তিনিই যে সর্বজনপরিচিত স্বনামধন্য অমুক চন্দ্র তমুক তা আমি হঠাৎ জানতে পারি অনেক কাল পরে একদিন টিভিতে সেই মানুষটিকে ও তাঁর চলচ্ছবির নিচে লেখা তাঁর নামটি দেখে । আনন্দও পাই এই ভেবে যে-ও, ইনিই তাহলে ওই বিখ্যাত লোক! আমি তো এঁকে চিনি!

নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথাটা তুলতে হল, কেননা মায়ের বাড়ি বাপের বাড়ির রহস্য ভেদ হতে না হতে প্রথম স্বামী দ্বিতীয় স্বামীর প্রসঙ্গে কেমন ধন্দে পড়েছি তার একটা ধারণা করা যাবে ।

নোদার তার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে, মানানার অফিসের গাড়ি কোথায় কী একটা কাজে আটকে আছে, অতএব মানানার সঙ্গে ৎবিলিসির কিছুটা নিরিবিলি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চলেছি মধ্যাহ্নভোজ সারতে ।

হাতে সময় কম, লাঞ্চের পরই যাব ভাকে ডিস্ট্রিক্টে চাভচাভাদজে স্ট্রীটে নোদার দুমবাদজে মিউজিয়ামে। সেখানে থেকে যাবার কথা 'জিউরি' শিশু উদ্যানে।

হাঁটতে হাঁটতে স্বামী-সমস্যার সমাধান শোনা গেল। মানানার দ্বিতীয় স্বামী ভাদিক গেছেন রাশিয়ায়, সেদেশের মস্ত বড় পর্যটনমেলায়। ভাদিকের ধ্যানজ্ঞান বেলুনে চড়ে সিল্করুট অভিযান। সেকালের সিল্করুটকে ওদিকে জাপান আর এদিকে জর্জিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করে এই অভিযান হবে জাপান থেকে জর্জিয়া। মস্কোর পর্যটনমেলায় বেলুন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর জরুরি কাজ আছে।

মানানার উপসংহার-ভাদিককে তোমার খুবই ভালো লাগবে। ও হচ্ছে স্পোর্টসম্যান, সোভিয়েত আমলে খুব ভালো চাকরি করত, সাবমেরিনের কম্পিউটার প্রয়োগ বা চালনা বা ওইরকমই কিছু ওরই উদ্ভাবনা।

চটপট লাঞ্চ সারতে প্রেস হাউস কাফে উপযুক্ত জায়গা। কাচে ঢাকা বেশ কয়েক রকম পদ বা পুরো 'মিল' থেকে যেটা খুশি বেছে পয়সা দিয়ে কুপন কেটে টেবিলে এসে বসে পড়লেই হল। পছন্দের খাবার তক্ষুণি গরম করে দেবে। দামেও সস্তা।

মানানা অফিসে লাঞ্চ করে, ফলে শুধু আমার জন্য নেওয়া হল আস্ত একটা মাছ (জর্জিয়ান ভাষায় এই সুস্বাদু মাছটার নাম সিগা), পাপরিকা, রসুনকুচি দিয়ে এক প্লেট বেগুনভাজা, গত রাতের মতো জঞ্জলি, আর জর্জিয়ান মোটা গোলাকার রুটি। আশপাশের টেবিলে অন্যদের প্লেট দেখে মনে হল, একজনের পক্ষে একসঙ্গে এত রকম পদ একটু বেশিই। তা সত্বেও দাম মাত্র ৩ ডলার, জর্জিয়ান মুদ্রায় ৬ লারি।

প্রেস হাউস কাফে থেকে বেরিয়ে রুসতাভেলি অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, ছোট একটা রাস্তায় পড়লাম, রাস্তাটার নাম দেখলাম পেরোভস্কায়া স্ট্রিট, এটাকে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের মতো রেস্তোরাঁ সরণি বললেই ঠিক হয়, নানা দেশের রেস্তোরাঁ আছে এখানে। একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁও দেখলাম, তার চেয়ে বেশি নজর কাড়ল একটি ভারতীয় দোকান। দোকান না বলে মণ্ডপ বা প্রদর্শনীকক্ষ বললেই ঠিক হয়। এর মালিক জর্জিয়ার এক মহিলা শিল্পী। বয়েস ষাট বা সত্তর বা পচাঁত্তর হবে হয়তো, কানে গলায় হাতে মোটা মোটা রাজস্থানি গুজরাটি লাদাখি অলংকার। মহিলাটি মানানার বহুদিনের বন্ধু। আমাকে জর্জিয়ান ভাষায় মিঠে গলায় বললেন (মানানা ইংরিজি করে দিল), আমরা ভারতকে ভালোবাসি। ভারতীয়দের আমরা অনেকদিন আগেই মন সঁপে দিয়েছি।

এঁরা আমাদের দার্জিলিং চা খাওয়াতে চাইলেন। আজ সময়াভাব তাই বিনা চায়েই বেরিয়ে পড়লাম। পরে আরেকদিন এখানে এসে চমৎকার দার্জিলিং চা খেয়ে গেছি।

মানানা আমাকে নিয়ে গেল কোস্তাভা পার্কে। ৎবিলিসিতে আট আসনের ছোট ছোট একরকম বাস চলে, সোজা রাস্তায় যত দূরেই যান নামবার সময় চালককে আধ লারি ভাড়া দিতে হয়। এভাবেই আমরা পৌঁছে গেলাম কোস্তাভা পার্কে। সেখানে পাশাপাশি দুটি প্রাচীন গির্জা, এক উদ্ভট সহাবস্থান, ধর্মে চরম উদাসীনেরও চোখে পড়বে। একটা গির্জা রাশিয়ান, আরেকটা জর্জিয়ান। রাশিয়ান গির্জাটি একেবারে সাদামাটা, আগাপাস্তালা এমনভাবে চুনকাম করা যে চোখের পীড়া হয়, তার ঠিক পাশেই জর্জিয়ান গির্জাটির জরা ও জীর্ণতা, স্থানে স্থানে ইট বের করা প্রাচীনতা দেখে চোখ জুড়োয়। গির্জার ভেতরে ঢালাও সূক্ষ্ম দেওয়ালচিত্র কিন্তু ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তার আশ্চর্য রং রেখা রাশিয়ান চুনকাম ফুঁড়ে খুব সামান্যই ফুটে আছে।

কোস্তাভা পার্কে, জোড়া গির্জার পথে দেখলাম বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ ভিক্ষা চাইছে। ভিক্ষা চাইবার ধরনেই বোঝা যায় এরা ভিক্ষুক নয়, পেশাদারি ভিখিরি তো নয়ই, এ কাজে এরা এতটাই আনাড়ি যে ভিক্ষে না দিলে এদের কেউ কেউ প্রায় দাবি জানানোর মতো বলে, তুমি আমাকে একটা লারিও দিতে পারছ না কেন? তবু না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে বলে, তুমি এত কঞ্জুষ!

একটা বুড়ি হাত নেড়ে নেড়ে, আকাশে মুখ তুলে কথা বলছে দেখে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিক্ষে চাইছে না, আপনমনে কাউকে কিছু বলছে!

আমি মানানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কী বলছে, একটু অনুবাদ করে দেবে? মানানা মন দিয়ে শুনে ইংরিজিতে বলল, এই বৃদ্ধা কী বলছে শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। বৃদ্ধা বলছে-যে জর্জিয়া আমি রেখে গিয়েছিলাম, এ জর্জিয়া সে জর্জিয়া নয়। যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম, তুমি আর তেমনটি নেই, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না, জর্জিয়া। জানো, এর কথাগুলো অনেকটা গানের মতো শোনাচ্ছে। জর্জিয়ায় এরকম কোনও গান আছে বলে আমি শুনিনি।

চাকভাঙা ভদকা

বিখ্যাত বা কুখ্যাত রাশিয়ান ভদকার কথা সবাই শুনেছেন, রাশিয়ার সমাজজীবনে ভদকার সর্বনেশে বাড়াবাড়ি বা সরকারি কড়াকড়ি নিয়ে ভালো-মন্দ নানা কাহিনী-কিংবদন্তীও অনেক জানেন, সোভিয়েতভাঙা জর্জিয়াতেও ভদকাচ্ছন্ন পথচারী দুর্লভ নয়। তবে জর্জিয়ানদের নিজস্ব ও প্রাচীন পানীয় জর্জিয়ার ওয়াইন, স্বদেশের সুরা নিয়ে তাঁদের গর্বের শেষ নেই।

জর্জিয়ায় আমার অন্যতম নিমন্ত্রণকর্ত্রী মানানা দুমবাদজের মা নানুলি আমাকে তাঁর জন্মগ্রাম ‘গুরিয়া’র গর্ব ‘গুরিয়া ভদকা’ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন । নানুলির স্বামী প্রয়াত সাহিত্যিক নোদার দুমবাদজের জন্মও ওই গুরিয়ায় । অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ বিদেশমন্ত্রী, দুই জার্মানির মিলনে মধ্যস্থতা করেও যিনি বিখ্যাত, স্বাধীন জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট শেভারনাদজের জন্মও গুরিয়ায় । এ ভদকা শুধু সেই গুরিয়াতেই হয় । তৈরি হয় মৌচাক থেকে । বড় করে শ্বাস নিলে নাকি মৌচাকের ঘ্রাণও পাওয়া যায় ।

জিভের ডগায় তৃণশীর্ষে শিশিরবিন্দুপরিমাণ ভদকাস্পর্শ নিতে নিতে নানুলির জর্জিয়ানে, মানানার ইংরিজিতে এই যাদু-ভদকার মহিমা কানে যত শুনছি, প্রাণে তত বুঝছি না । কিন্তু মানানার মায়ের স্নিগ্ধ সস্নেহ স্বভাবটি বিনাভাষ্যে তাঁর ভারতীয় অতিথিকে মুগ্ধ করে । তাঁর ঘরোয়া আপ্যায়ন হয়ে ওঠে আমার প্রাণের আরাম । কথা বলতে বলতে একেকবার উঠে যাচ্ছেন আর ফিরে আসছেন ঘরে তৈরি কেক, পেস্ট্রি বা রান্না করা কোনও না কোনও ব্যঞ্জন হাতে নিয়ে ।

এই ফ্ল্যাটেরই একটি বেশ বড় হলঘরে নোদার দুমবাদজে মিউজিয়াম । বই, ফটো, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদিতে সাজানো একজন লেখকের জীবনকথা । আমার কাছে শুধুই তথ্য, কেবলই ছবি, আমার সঙ্গী দুজনের কাছে তার চেয়ে বেশি, জীবন্ত স্মৃতি ।

নোদার (১৯২৮-৮৪) জর্জিয়ার অতি জনপ্রিয় লেখক । তাঁর গল্প, উপন্যাস, ছোটদের ছড়া, কবিতা ঘরে ঘরে পড়া হয় । আরও শুনলাম, তাঁর সব উপন্যাস নিয়েই সিনেমা হয়েছে । ইনিই রাশিয়ার বাইরে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত একমাত্র লেখক ।

জর্জিয়ায় এখন কে কী লিখছেন, বড় কবি ও লেখক কারা আমরা কিছুই জানি না । ফলে পরদিন ৯ অক্টোবর রাইটার্স ইউনিয়নে যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল তাঁরা যে সকলেই বড় কবি লেখক সমালোচক, তাঁদের কেউ রাগী লেখক, কেউ তীক্ষ্ণ আধুনিক কবি, কেউ বিখ্যাত গল্পকার, কেউ গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক, কেউ ধূমায়িত আরখাজিয়ার যন্ত্রণাক্লিষ্ট কবি, মানানার দোভাষিত্বে এসব জেনে মন হায়-হায় করতে লাগল-এঁদের কোনও লেখা আমি পড়িনি! তবু, কোনওদিন এঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল শুধু সেই কথাটা মনে রাখবার জন্য আমি কয়েকজন লেখকের নাম লিখে রাখলাম-রেজো চেইসভিলি (Rezo Cheishvili), টামাস সিবৎসিভাদজে (Tamaz Tsivivadze), কেনো কালানদিয়া (Geno Kalandia), জাউর কালানদিয়া (Zaur Kalandia), মুরমান জগুবুরিয়া (Murman Zguburia), লেভান মালাজোনিয়া (Levan Malazonia) ।

এখানেই আলাপ হল ভারতীয় সাহিত্যের পণ্ডিত নিকো কেনচোশভিসের সঙ্গে। ভারতীয় অতিথিকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের প্রথানুগ অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর ভারতবিদ নিকো হঠাৎ হিন্দিতে স্বাগত জানিয়ে, হিন্দিতেই কুশলপ্রশ্ন করে আমাকে প্রায় চমকে দিয়েছিলেন। তিনি নাকি সকাল থেকে শুধু আমার জন্যই এখানে এসে বসে আছেন।

ভারতে লেখকদের বইয়ের বিক্রি, প্রকাশনাব্যবস্থা, লেখকদের সামাজিক সম্মান, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে জর্জিয়ান লেখকদের নানা প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিতে হল আমাকে। প্রবল বন্যার সময় কুঁড়ের চালে, গাছের ডালে আশ্রয় পাওয়া মানুষ যেমন ব্যাকুল হয়ে দূর নিরাপদ দেশের মানুষের ঘরবাড়ির ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়, সদ্য-পরিচিত এইসব কবি-লেখকদের প্রশ্নে আমি সেই আকুলতা অনুভব করলাম। দূর বিদেশে এসে বিষাদে আমার মন ভরে যায়।

এর পরেও অনেক বিখ্যাত কবি-লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে গত দু-তিন বছরে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোনীত কয়েকজন কবি ও লেখকও আছেন, এঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার খুব মনে হয়েছে যদি বাংলা-জর্জিয়ান দ্বিভাষিক পত্রিকা বার করে বাছাইকরা জর্জিয়ান গল্প-উপন্যাস অনুবাদের ব্যবস্থা করা যেত! এভাবে সবিনয়ে এঁদের সামান্য কিছু বাড়তি অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করা খুব কি অসম্ভব, বা অবাস্তব?

৩

তুর্কি সীমান্তে

পরদিন সকালে চললাম জর্জিয়া-তুর্কি সীমান্তে দক্ষিণ জর্জিয়ার প্রাচীন শহর আখালসিখে। আখালসিখে নামকরণ হয়েছে দ্বাদশ শতকে, নামটির অর্থ শুনলাম নতুন দুর্গ। এ শহর দেড় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে জায়গাটার নাম ছিল সোমসিয়া। কাছেই, আখালসিখে থেকে পনেরো-ষোল কিলোমিটারের মধ্যে রুশতাভি শহরে জর্জিয়ার মহাকবি সোতা রুসতাভেলির জন্ম।

আখালসিখেতে আমরা যে বাড়িতে উঠলাম, সেখান থেকে দক্ষিণে আর পনেরো কিলোমিটার গেলে জর্জিয়ার শেষ, তুর্কির শুরু। আখালসিখে নানা সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত হয়েছে। তুর্কিরা বারবার হানা দিয়েছে। ইতিহাস বা তার সত্য-মিথ্যা মেলাইনি, শুনলাম অতীতে তৈমুর লং, চেঙ্গিস খানের মতো প্রবলপ্রতাপ যুদ্ধবাজদের বিধ্বংসী আক্রমণে

দক্ষিণ জর্জিয়া কয়েকবার প্রায় গুঁড়িয়ে গেছে। আখালসিখেতে অর্ধেক জর্জিয়ান, অর্ধেক আর্মেনিয়ানদের বাস।

ৎবিলিসি থেকে দুপুর একটায় রওনা হয়ে আখালসিখে পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ। ৎবিলিসি থেকে এসেছি আমি আর মানানা আর সেই দিলিস গাজেতি বা ডেইলি গেজেটের সুবেশ ড্রাইভার। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এথেরির বাড়িতে। এথেরির বয়স ৬০, কিন্ডার গার্ডেনের শিক্ষিকা, তাঁর মেয়ে মায়িয়া পশুচিকিৎসক, তাছাড়া স্কুলে বায়োলজি পড়ান। সেখানে মাইনে দেয় না, যাতায়াতের খরচটুকুও দিতে পারে না, ফলে পশুচিকিৎসাই তার সামান্য আয়ের একমাত্র উপায়। মায়িয়া রাশিয়ার খিরোভ-র কৃষি ও পশুচিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ১৯৮২তে।

এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে, ফলে চট করে কিছু মুখে দিয়ে ছুটলাম আখালসিখে মিউজিয়াম দেখতে। প্রতিবেশী দুটি তরুণ তাদের গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তারাই আমাদের মিউজিয়ামে নিয়ে গেল।

সেখানে দক্ষিণ জর্জিয়ার সভ্যতার ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাস দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। আখালসিখের প্রাচীনতা এখানে যেন গায়ের ওপর নিশ্বাস ফেলে!

আজকের যা ভ্রমণসূচি তা মানতে গেলে সেটা আর দেশ দেখে বেড়ানো থাকে না, হয়ে যায় দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো। সেভাবেই আমি বহু প্রাচীন কালের একটা গ্রামে গিয়েও দু-দণ্ড বসবার সময় পেলাম না। প্রাচীনতা ছাড়াও এ গ্রামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আদ্যিকাল থেকেই গ্রামবাসীরা সবাই এক বংশের। সকলের পদবিই নেবাদজে। গ্রামটির নাম খ্রেলি বা হ্রেলি। আমি তো চার, নাকি পাঁচ পুরুষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে একসঙ্গে পেয়ে ফট করে ক্যামেরা টিপে দিলাম। আরেক পুরুষ গাছে আপেল পাড়ছিল, ডালপালা ফল-পাতার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে সেখানেই ক্যামেরা তাক করলাম। মানানার মাধ্যমে আমার ভারতীয় পরিচয় পেয়ে তাদের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল আপেল দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করার মধ্যে। আমাদের প্রত্যেককেই দুহাত ভরে সদ্য গাছপাড়া আপেল নিতে হল। আমাদের দলে আমি মানানা আর স্থানীয় দুজন তরুণ ছাড়াও ছিল মায়িয়া আর তিনা। তিনা মায়িয়ার মামাতো বোন, পিসির বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে।

গাড়িতে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে আপেল কামড়াতে কামড়াতে আমরা পৌঁছে গেলাম জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে ছড়ানো ছেটানো প্রাচীন সাফারা অর্থাৎ মনাস্ট্রি বা গুম্ভায়। পথে দেখা হল এক বুড়ো রাখালের সঙ্গে, গরুর পাল নিয়ে গ্রামে ফিরছে। কুঠার কাঁধে ঘরে ফিরছে কাঠুরে। কাঠ কাঁধে মেয়ে-পুরুষ। এরাও নিশ্চয়ই সকলেই 'নেদাবজে'।

খ্রেলি থেকে রাস্তাটা খানাখন্দে ভরা। এত দুলুনি আর ঝাঁকুনি যে মনে হয় যেন হাতির পিঠে চড়েছি। বছর ছয়েক আগে একবার নেপালে এক-শিংওলা গণ্ডারের খোঁজে হাতির পিঠে ভয়ানক ঝাঁকুনি খেতে খেতে বিশাল গাছের ডালে আচমকা মাথা ঠুকে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম, গাড়িতে সেই গল্পটা ও সেই সূত্রে হাতির সাংঘাতিক দুলকি চালের কথা শুনে আরোহীদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে দিল।

জর্জিয়ার মানুষ ধর্মানুরাগী। এঁরা অর্থডক্স খ্রিস্টান। নিজেদের ধর্মকে বড় ভালোবাসেন। এদেশে রাজা-রাজড়াও অনেক গির্জা মনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আখালসিখের ধর্মপ্রাণ জমিদার বেখাজাকেলি দশম শতকে এই সাফারা প্রতিষ্ঠা করেন। বেশ কয়েকটা পাহাড়ের বিস্তারে চূড়ার খাঁজে গুহায় ছড়ানো এই মনাস্ট্রি। গ্রামের চেয়ে পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে দেরিতে, এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে তখন সবে সন্ধ্যা নামছে, তার মধ্যেই দূর থেকে দেখলাম দুজন সুদর্শন গুম্ভশ্মশ্রুময় তরুণ সন্ন্যাসী গুহার দিকে ফিরছেন, সামনাসামনি এসে তাঁদের একজন আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অন্যজন কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের পথে ঘন জঙ্গলে ঘেরা গুহার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমার সামনের সন্ন্যাসীকে মানানা জর্জিয়ান ভাষায় আমার সম্পর্কে কিছু বলল, তার উত্তরে সন্ন্যাসীও কিছু বললেন, মানানা অনুবাদ করে দিল-সন্ন্যাসী বলছে আমার মতো মানুষকে তাঁদের দরকার। আমার দিকে তাকিয়ে চমৎকার হেসে আরও যা বললেন, তার অর্থ-ধর্ম আমার মতো লোককেই চায়।

মানানার উত্তর, এর তো নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সন্ন্যাসী ভারি সুন্দর হেসে বললেন, এ ধর্মহীন। এরকম লোককেই ব্যাপটাইজ করা উচিত। হবে নাকি?

শেষের প্রশ্নটি আমার উদ্দেশে। তার অর্থও তাঁর গভীর ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর নির্মল হাসিতে মানানার মধ্যস্থতা ছাড়াই আন্দাজ করে নিলাম।

জর্জিয়া-তুর্কির জনহীন সীমান্তে, মানুষের সমাজ-সংসার থেকে দূরে আদিম অরণ্য-পাহাড়-আবৃত এরকম একটা আশ্চর্য অচেনা সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রশ্নে মনে আমার চকিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল-সন্ন্যাসী হয়ে স্থায়ীভাবে এখানে থেকে গেলে কেমন হয়!

একটাই রক্ষা, মানুষের জীবনে এরকম অত্যুচ্চ অদ্ভুত কিছু ভাব বা তার আনন্দ-বিষাদ বুদ্বুদের মতো আসে, আবার চলেও যায়।

ৎবিলিসি থেকে সারথী সহ আমরা তিনজন এসেছি, আখালসিখেতে এসে দেখলাম আরও তিনজন আগেই এসেছে। একটি যুবকের নাম মিন্দিয়া। অন্য দুজন মেয়ে। পরে

বুঝলাম, আখালসিখেতে মানানারা নিজেদের অফিসের কাজে এসেছে, সেই সুযোগে আমাকে নিয়ে এসেছে আখালসিখে দেখাতে। মায়িয়ার মা এথেরির বাড়িতে সব ঘরেই দু-তিনজনের থাকার ব্যবস্থা, তার মধ্যেই আমাকে আলাদা একটা ঘর দিয়েছে। জর্জিয়া বছর দশেক আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলেছে। বিদ্যুৎ সংকট তার অন্যতম। আখালসিখেতে দিনেরবেলা বিদ্যুৎ দেওয়াই হয় না। সাধারণত সন্ধে ৮টায় আলো আসে।

আটটার আগেই বাড়ি ফিরে বন্ধ টিভির সামনে খাবার টেবিল ঘিরে সকলে মিলে আড্ডা দিচ্ছি, তিনা দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। বাথরুমের সামনে আরেকটা মোমবাতি। বাথরুমে ড্রামে বালতিতে গামলায় জল ধরা আছে, এমনকী ছোট বাথটবেও জল ধরে রেখেছে। সাবান দিয়ে হাত ধোবার সময় যতই কেন না-না করি, প্রতিবারই তিনা এসে মগে করে জল নিয়ে দুহাতের পাতায় ঢেলে দেবে। এর মধ্যেই তিনা আর মায়িয়া মিলে টেবিলে ডিনার দিয়ে গেছে। মায়িয়ার মা স্যুপ পাঠিয়ে রান্নাঘর থেকে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছেন। মিন্দিয়া বোধহয় এদের কিছুটা ঘনিষ্ঠ, সে উঠে গিয়ে অন্ধকারেই দুবোতল ওয়াইন নিয়ে এসে গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে দিল। তিনার যাতায়াত খুবই নিঃশব্দ, শুধু বার বার এঘর ওঘর রান্নাঘর করে অতিথিদের সব রকম প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

স্বাদে ও উপকরণে অবিকল তিব্বতি মোমোর মতো একটা জর্জিয়ান খাবার আছে, ভেতরে শুয়োরের মাংসের পুর দেওয়া, দেখতে বাংলার সুচারু সন্দেশের মতো গোলাকার ও নকশা কাটা। দোকানে বাজারে সর্বত্র পাওয়া যায়, বাড়িতে এনে শুধু জলে সেদ্ধ করে নিলেই হল। তিনা দুহাতে দু প্লেট এই জর্জিয়ান মোমো টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, কফি দেব, না চা?

মেয়েটির বাড়ি বোরজোনেতে, আখালসিখে আসবার সময় বোরজোনে পথে পড়েছিল, ওখানকার মিনারেল ওয়াটার খুবই বিখ্যাত। বোতলবন্দী সেই ঝরনার জলের নামও বোরজোনে, ফ্রান্সের এভিয়াঁর জলের নাম যেমন 'এভিয়াঁ'। 'বোরজোনে' 'এভিয়াঁ'র মতো জর্জিয়ার সেরা প্রাকৃতিক মিনারেল ওয়াটার, তবে এদের টেকনোলজির অভাবে ও রপ্তানির নিরুদ্যোগে 'বোরজোনে' 'এভিয়াঁর' মতো জগদ্বিখ্যাত নয় মোটেই।

তিনা বোরজোনে-এর মেয়ে বলেই বোধহয় বোরজোনে-জল নিয়ে তার এত উচ্ছ্বাস। এই জলের স্বাদ-গন্ধের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এর আরেকটা গুণ শোনাল-খুব বেশি মদ খেয়ে কারও হ্যাং ওভার হলে নাকি বোতল-বোতল বোরজোনে খাইয়ে তার হ্যাং ওভার কাটানো হয়।

আমি গ্লাসে বোরজোনে ঢেলে নিয়ে ঘুমের ওষুধ খেতে যাচ্ছি দেখে তিনা বলল, মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ওষুধ খাওয়া ঠিক নয় । ওষুধে অনেক রাসায়নিক জিনিস থাকে, সবই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে, খনিজ জলেও নানারকম রাসায়নিক থাকে । আমাদের ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের মুখে আমি এটা শুনেছি ।

তিনা আখালসিখের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ে, চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী, আর একবছর পরে আইনের স্নাতক হবে । বোরজোনেতে তার মা-বাবা আছে, তাদের বাড়ির ঠিক পিছনেই বোরজোনে ন্যাশনাল পার্ক, সেখানেই ঝরনা থেকে বোতলবন্দী করা হয় 'বোরজোনে' ।

বোরজোনে আর আখালসিখের মধ্যে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার । কিন্তু তিনার মতে দুটি জায়গার মধ্যে তফাত অনেক । প্রথমত, একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণের পার্থক্য । বোরজোনেতে ঠান্ডা বেশি, আখালসিখেতে অনেক কম । তিনা ইংরিজি উচ্চারণে 'টিনা', জর্জিয়ানে থিনা, তিনার মা ডাকেন থাতো । তার মায়ের নামও মানানা ।

আলো এল রাত প্রায় সাড়ে নটায় । টিভিতে জর্জিয়া-ইতালির বিশ্বকাপের ফুটবল খেলা চলছে । দুবছর আগে, ফ্রান্সের লোভালোয়ায় একটি ফরাসি পরিবারে টিভিতে ফ্রান্স-ব্রাজিলের ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল দেখেছিলাম । ফ্রান্স সেবছর ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে নেয় । ফুটবলের দেশ ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে । আমার গৃহকর্ত্রীর মতে, আমার উপস্থিতির জন্যই হয়তো ফ্রান্স জিতেছে । আখালসিখেতে আমার উপস্থিতিতেই ইতালি প্রথম গোল দিল । আমি শুতে চলে গেলাম । পরদিন সকালে উঠে শুনি জর্জিয়া ২-০ গোলে হেরেছে । একমাত্র সান্ত্বনা, দ্বিতীয় গোলটিও প্রথমটির মতো পেনাল্টি কিকে ।

একটু পরেই দুটি ছেলে এল, ২২-২৪ বছরের । একজন তিনার দাদা, আরেকজন নিজেই নিজের পরিচয় দিল-তিনার ব্রাদার-ইন-ল । শুনে তিনা বলল, ও একটা পাগল, ও আমার কাজিন ।

পরে জানলাম এতজন অতিথির থাকার ব্যবস্থা করতে কুমারী তিনার 'এই স্বঘোষিত দেওরটি' কাল নিজের ঘর ভারতীয় অতিথির জন্য ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল । আরও পরে মানানার কাছে শুনেছি অফিসের কাজে যখনই তাদের আখালসিখেতে আসতে হয় এই বাড়িতে ওঠে, পেয়িংগেস্ট হিসেবে । থাকা-খাওয়ার সব দায়িত্ব এথেরিদের ।

একটু পরে আমাকে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাবার দায়িত্ব মায়িয়া আর তিনার ঘাড়ে চাপিয়ে মানানা, মিন্দিয়া ও অন্য দুজন নিজেদের কাজে বেরিয়ে গেল । শুরু হল আমাদের পায়ে হেঁটে শহর পরিক্রমা । কথা হয়েছে দুপুরের খাওয়ার পর মানানারা এসে আমাকে

নিয়ে যাবে দূর পাহাড়ের ওপর দারুণ একটা জায়গায় (যাওয়া হয়নি তাই নামটাও লেখা হয়নি)।

আখালসিখের বাজারে আমাকে যে দেখে সেই এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে। কেউ খেতে দেয় ঘন মধু, কেউ দেয় আঙুরের থোকা, কেউ দিচ্ছে মুলো গাজর ওলকপি। আমি, বলতে কী, বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। সকলেই দেখছি মায়িয়া আর তিনার কাছে আমার ভারতীয় পরিচয় জেনে আমার সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। ভাষা তো বুঝছি না, কিন্তু হৃদয়ের ভাব আসলে রঙের মতো, পৃথিবীর সব দেশেই তা এক।

এত আন্তরিকতা, এমন আপ্যায়নের রহস্য ভেদ করল মায়িয়া। আসলে হয়েছে কী, অখণ্ড সোভিয়েতে যেমন খণ্ড জর্জিয়ায়ও তেমনই সবাই রাজকাপুরের অন্ধ ভক্ত। বহুকাল আগে রাজকাপুর জর্জিয়ায় এসেছিলেন, তাঁর অনেক সিনেমা এদের মুখস্থ, আমি সেই রাজকাপুরের দেশের লোক, বোধহয় স্বাধীন জর্জিয়ায় প্রথম ভারতীয় অতিথি, আমি তাদের আপনজন হব না তো কে হবে? বাজারের মধ্যে আমার জন্য তো তারা কিছুই করতে পারছে না।

তারা মুলোটা কলাটা কপিটা দিচ্ছে, দুহাতে কত আর নেওয়া যায়-তিনা-মায়িয়ার হাতে আর ধরছে না। মায়িয়া কোত্থেকে একটা প্লাস্টিকের বড় ব্যাগ জোগাড় করে ফেলল। এর পর যে-ই কিছু দিতে চাইছে, মায়িয়া ব্যাগটার মুখ ফাঁক করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরছে, দাতাও আশ মিটিয়ে তার দানসামগ্রী সরাসরি ব্যাগে ফেলে দিচ্ছে।

কী ধরনের খাবার আমার পছন্দ তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও গবেষণার পর ঠিক হল একটা কোনও কাফেতে শুকনো সামান্য কিছু খেতে পেলেই আমি খুশি হব। রাস্তার ধারে একটা কাফেতে বসে মায়িয়ার জর্জিয়ানে আর তিনার তাৎক্ষণিক ইংরিজি অনুবাদে প্রশ্ন হল-হাজাপুরি আমার পছন্দ কি না। জর্জিয়ার সর্বজনপ্রিয় এই হাজাপুরি নানা ধরনের হয়। আমিই চাররকম 'হাজাপুরি'র কথা জানি। তবে হাজাপুরির প্রধান উপকরণ মাখন আর চিজ। থান ইটের মতো আকার, মাখনে চুবচুব করে ভাজা একেকটা পরোটার ওপর পুরু চিজের আস্তরণ। তারপর আবার পরোটা, আবার চিজ। আবার পরোটা, আবার চিজ-সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। নৌকোর আকারে অন্য ধরনের হাজাপুরিও আছে। যাইহোক হাজাপুরিতে আমার ইতস্তত ভাব দেখে তিনা টেবিলের মেনু থেকে দুয়েকটি পদ ইংরিজি করে দিল। তার থেকে চিজ মাখন ছাড়া একটা শুকনো পরোটা জাতীয় খাবার বাছলাম। ইতিমধ্যে মায়িয়া তার বাজারের ব্যাগ নিয়ে উঠে গিয়েছিল। একটু পরে ফিরে এল, তার পিছনে একজন পরিচারিকা (ইনিই এই কাফের মালকিন), বাজারের সেই গাজর মুলো ওলকপি কেটে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। সব্জিগুলোর সজীব লাবণ্যে মুগ্ধ হই।

খেতে খেতে মায়িয়ার গল্প শুনি । কিছুটা মায়িয়ার মুখে, বেশিটাই তিনার মুখে ।

মায়িয়া যখন রাশিয়ায় পশুচিকিৎসার ছাত্রী, তখন একজন সিনিয়র রুশ ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে তার গভীর ভালোবাসা হয় । গোল্ড মেডেল পেয়ে ডাক্তারি পাশ করে ছেলেটির বড় ডাক্তার হবার ব্যস্ততায় বছরের পর বছর তাদের বিয়েটা কেবল পিছতেই থাকে । ওদিকে লেখাপড়া শেষ করে মায়িয়াকে জর্জিয়ায় তার বাড়িতে ফিরে আসতে হয় । সেখান থেকেই মায়িয়ার বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যখন শুভদিন স্থির হল, আখালসিখেতে তার বিয়ের পোশাকও তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক তখনই রাশিয়া জর্জিয়া দুটো আলাদা দেশ হয়ে গেল । মায়িয়াকে বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হল তার জন্মভূমি জর্জিয়ায় । ছেলেটিও কিছুতেই তার দেশ ছাড়বে না । তিনা যোগ করল, কাল ডিনারের আগে তুমি সেই ছেলেটির ছবি দেখেছ মনে আছে?

মনে পড়ল, মোমের আলোয় একটা অ্যালবামে মায়িয়া তার নিজের, সেই ডাক্তারের ও একসঙ্গে দুজনের অনেক ছবি দেখিয়েছিল ।

মায়িয়া-তিনা বাড়ি গিয়ে খাবে, শুধু আমাকে খাওয়াবার জন্য এখানে এসেছে ।

চিজ-মাখনহীন গরম পুরু পরোটাও এসে গেল । ভেতরে ছুরি চালাতেই প্লেটই বুঝি ভেসে যায়! গলানো মাখন নাকি? তিনা সান্ত্বনা দেয়, মাখনও নয়, চিজও না, পরোটার পেটে ভরা আছে গরুর চর্বি, চারদিক থেকে পরোটার দেওয়াল দিয়ে এটা আটকানো ছিল, ছুরি চালালে গলানো চর্বি তো জলের মতো বেরিয়ে আসবেই, খেয়ে দেখো, চমৎকার! এটা চমৎকার সে বিষয়ে সামান্যতম সংশয় প্রকাশ না করে শুধু জানালাম বাজারের লোকের ভালোবাসার উপহার তো আর নষ্ট করা যায় না, সেগুলো খেয়ে এটা আর খেতে পারব না । সুস্বাদু গাজর মুলো ওলকপি দিয়ে ভারি তৃপ্তি করেই মধ্যাহ্নভোজ সারা হল । মায়িয়া গেল মানানার খোঁজে । তিনা আমাকে নিয়ে শহরের রাস্তায় পার্কে ঘুরে বেড়াতে লাগল ।

রাস্তায় মাঝেমাঝেই চোখে পড়ছে তরুণীরা তিনাকে কখনও পষ্টাপষ্টি, কখনও আড়চোখে দেখছে । এভাবে তাকে দেখার কারণ কী? আমি তিনাকে কথাটা বলতেই তার চটজলদি উত্তর-ওরা আমাকে দেখছে না, মাই ডিয়ার, ওরা দেখছে তোমাকে!

নির্দিষ্ট জায়গাতেই মানানাদের সঙ্গে দেখা হল । রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, অতএব দূর পাহাড়ে যাওয়া হবে না । শুনলাম তার বদলে আমার জন্য আখালসিখেতেই একটা বড় রেস্তোরাঁয় ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে ।

মায়িয়া আর তিনার হেফাজত থেকে আমাকে ফেরত নিয়ে সবাই মিলে গাড়িতে উঠে পড়া হল । তিনা বাড়ি যাবার সময় বলল, আলো থাকতে থাকতে ফিরে এসো, তোমার

সঙ্গে আমার একটা ফটো তুলতে চাই।

তোমার কয়েকটা ছবি তো তুলেছি। এক মিনিট দাঁড়াও, আরেকটা তুলে দিচ্ছি।

তোমার সঙ্গে তুলতে চাই।

মিন্দিয়াকে বলছি, ও ছবি তোলে, এখনই তুলে দেবে।

বাড়ি গিয়ে পোশাক বদলাব, সেই পোশাকে ছবি তুলব।

এখানে অনেক সময় ডিনার দিনের আলো থাকতে থাকতেই হয়ে যায়। সেকথা ভেবে তিনাকে আমি অভয় দিলাম।

কাল যখন এখানে আসি, তখন কথা ছিল আজই ৎবিলিসি ফিরব, কাল বিকেলে ৎবিলিসি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতাদেবার কথা। আজ সকালে মানানা জানাল, আজ ফেরা সম্ভব হবে না, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে সোজা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে যাব।

ডিনারের পর যখন মায়িয়াদের বাড়ি পৌঁছলাম, তখন আলো একেবারে মুছে যায়নি। কিন্তু পথেই ঠিক হয়েছে আজই আমাদের ৎবিলিসি ফিরতে হবে। ফলে ঘরে ঢুকেই ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে আসছি, কোনও ঘরেই তিনাকে দেখলাম না। চলে আসার সময় বলে আসাও হল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি তিনা ভারি সুন্দর পোশাকে সেজে বাড়ির সামনে গোধূলির আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। মানানারা তাড়া দিল, খুবই দেরি হয়ে গেছে, পথও কম নয়।

হঠাৎ এথেরি এসে বললেন, তোমার আজ যাওয়া চলবে না, দুটো দিন থেকে যেতে হবে।

মানানা কাল ৎবিলিসিতে আমার কর্মসূচির কথা বলতে এথেরির উত্তর-তুমি গিয়ে সেটা দুদিন পিছিয়ে দাও।

তিনা এগিয়ে এসে হেসে বলল, তুমি থেকে যাও। তোমাকে আমি আখালসিখের ইতিহাস শোনাব।

আমারও ইচ্ছা, থেকে যাই, মানানার মত কী? মানানার সম্পূর্ণ অমত। আরও কে কে নাকি আজ মানানার মোবাইল ফোনে আমার সঙ্গে দেখা করবার সময় চেয়েছেন। মানানা তাঁদের সময় দিয়েছে। এখন আর তা বাদ দেওয়া যায় না!

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, মায়িয়া প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে কাগজে-মোড়া কী একটা দিয়ে বলল-এটা তোমাকে আমাদের উপহার । তারপর জর্জিয়ান ভাষায় রুসতাভেলির একটা বহুমূল্যবান রাজ-সংস্করণ দেখিয়ে বলল, এটা তুমি নিলে আমি আনন্দ পাব ।

বইটা জর্জিয়ান ভাষায় বলে নিলাম না । ৎবিলিসিতে ফিরে কাগজে মোড়া উপহার খুলে দেখি নকশা-কাটা ভারি রুপোর চামচ! মানানা বলল, জর্জিয়ানরা বিশিষ্ট অতিথিকে এরকম রুপোর চামচ উপহার দেয় । এ আমাদের বহু প্রাচীন রীতি!

৪

ইউক্রেনের নুন

বাড়ি ফিরে দেখা হল মানানার স্বামী ভাদিকের সঙ্গে । দরজা খুলেই মানানাকে শশব্যস্ত আলিঙ্গনে চুমু খেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে এক গালে চুমু দিল । জর্জিয়ায় ইউরোপের মতো দুগালের বদলে এক গালে চুমু দেওয়াই রীতি । আমিও ভাদিকের গাঢ় বলিরেখা আঁকা গালে অনভ্যস্ত চুমু দিলাম । ও আজই রাশিয়া থেকে ফিরেছে । ভাদিকের স্বপ্ন বেলুনে চড়ে সিল্ক রুট অভিযান । মস্কোর পর্যটন মেলায় গিয়েছিল বেলুনের কলকৌশল বুঝতে ।

ডিনার টেবিলে ম্যাপ খুলে ভাদিক আমাকে তার স্বপ্নে ওড়ার আকাশপথ দেখাতে ব্যগ্র হয়ে পড়ল । বছর পাঁচ-ছয় আগে মধ্য এশিয়ার সিল্ক রুট ধরে কষ্টসাধ্য অভিযানের সঙ্গী হয়েছিলেন চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ, তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা ও ছবি তখন 'ভ্রমণ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, পুরো অভিযান নিয়ে তাঁর পাঁচ ঘণ্টার তথ্যচিত্র 'ডিসকভারি' চ্যানেলে দেখানোও হয়েছিল । ফলে ভাদিকের সঙ্গে তার স্বপ্নের অভিযানে আমি সহজেই সামিল হয়ে গেলাম ।

সেটা একদিক থেকে ভালোই হল, কেননা ডিনার বলতে সেই প্রথম সন্ধ্যার ডিনারের ভুক্তাবশিষ্ট, যদিও পরিমাণে কম নয় । অতএব, আমার ভাগেই বলি আর ভাগ্যেই বলি সেদিনের সেই জঞ্জলি চিবনো ।

আমার দুর্দশা গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু এত রাতে, এত পথের ক্লান্তিতে তিনিই বা কী করবেন!

বোধহয় রাতের সেই ক্ষতি পূরণ করতেই পরদিন সকালে মানানা পেঁয়াজ-টোমাটো-চিজ দিয়ে স্টাফড ওমলেট বানিয়ে প্রথমদিনের জর্জিয়ান রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে

দিয়েছে। বলল, সে এই স্পেশ্যাল ওমলেট বানিয়েছে ইউক্রেন থেকে ভাদিকের আনা কালকের স্পেশাল নুন দিয়ে। খিদে ভালোই পেয়েছিল, ওমলেট এক টুকরো মুখে দিয়ে মনে হল ইউক্রেনের নুনে নোনা স্বাদটা যেন নেই-ই, মুখে শুধু মিহি বালি টের পাচ্ছি। খুবই বিশেষ ধরনের লবণ সন্দেহ নেই, হয়তো মানানার হাই ব্লাড প্রেসারের পক্ষে উপকারী, হয়তো খুবই দুর্লভ, জোর করেই তিন-চার টুকরো ওমলেট খেয়ে ফেললাম। নোনতা স্বাদ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এরকম আশ্চর্য লবণের কথা আগে কোথাও শুনিনি বা পড়িনি।

আমার মুখের চেহারা ঠিক কীরকম হয়েছিল জানি না, মানানার চোখ পড়তেই কাছে এসে কাঁটায় বিঁধে এক টুকরো ওমলেট মুখে দিয়ে এক লাফে সিঙ্কের কাছে গিয়ে থু থু করতে লাগল ও বার বার জল মুখে নিয়ে কুলকুচি করে মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলল, তুমি কি পাগল? এতক্ষণ এই বালিভরা ওমলেট খেয়ে যাচ্ছ?

তারপর চেঁচিয়ে ডেকে ভাদিককে এই মারে তো সেই মারে! ইউক্রেন থেকে শিশি ভরে বালি বয়ে এনেছ কেন?

ভাদিক গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে যা বলে গেল তার অর্থ-সে যখন কিয়েভ থেকে ট্রেনে উঠছে, তার দাদা স্টেশনে এসেছিল তাকে বিদায় জানাতে। দাদাই তাকে এই ইউক্রেনের নুন দিয়েছে। ভাদিক তো নুনই শুনেছে। বালি হতে যাবে কেন? তার দাদাই বা খামোখা কেন তাকে বালি দেবে? নুন ছাড়া এ আর অন্য কিছু হতেই পারে না।

মানানা শিশি উল্টে সবটা টেবিলে ঢেলে দেখাল-বিশুদ্ধ সাদা বালি!

মানানার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, ড্রাইভার নিচে গাড়িতে বসেই মোবাইলে জানিয়েছে সে যথাসময়ে এসে গেছে, ফলে আমার খাওয়া হল না বলে মানানা খুব দুঃখ করল ও ভাদিককে আদেশ ও নির্দেশ দিল, আমাকে সে যেন আজ ৎবিলিসি ঘুরিয়ে দেখায় ও ভালো কোনও রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করায়।

আমাকে বলে গেল, ভাদিকের দেশ ইউক্রেন হলে কী হবে, জর্জিয়া সম্পর্কে ওর জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া ও খুব ভালো গাইড।

ভাদিক সারা দুপুর আমাকে ভারি যত্নে ও আগ্রহে ৎবিলিসির নানা দ্রষ্টব্য দেখিয়ে বেড়াল। প্রথমেই তার সঙ্গে একটি প্রশস্ত দোকানে ঢুকে জর্জিয়ার বহুকালের প্রচলিত নিজস্ব মিষ্টি পানীয় এক গ্লাস খেয়ে আমার প্রাণ জুড়ল। আর চোখ জুড়ল দোকানের দেওয়াল ও সিলিংয়ের দুর্দান্ত রঙিন মোজাইক আর ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম পরিহিতা বিক্রয়মহিলার সুশ্রী হাসিমাখা মুখ দেখে।

দিদি মাদলোবা

মানানার স্বামীর পুরো নাম ভvাদিমির মালোভিচকো, ডাকনাম-রুশ উচ্চারণে ভাদিক, জর্জিয়ান জিভে ভাজিক । পেশাদার গাইডের মতো সে আমাকে নতুন-পুরনো ৎবিলিসি তন্নতন্ন করে ঘুরিয়ে দেখায় । এই শহরে সোভিয়েত আমলের ভালোমন্দ, সোভিয়েত ভাঙনের সুখ দুঃখ শোনায় ।

সবশেষে নিয়ে গেল বাজারে । এখানেও ভারত থেকে এসেছি শুনে মধু ও খাবার বিক্রেতারা একটার পর একটা শিশি থেকে মস্ত বড় ছুরির ডগায় মধু তুলে আমার হাতের চেটোয় মাখিয়ে দিচ্ছে চাখবার জন্য । নানারকম চিজ আর সসেজ মোটা রুটি দিয়ে মুড়ে নিজেরাও খাচ্ছে, ছুরি দিয়ে কেটে আমাকেও খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে । আখালসিখে-এর বাজারে অনেক দোকানির অনেক খাবারের অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছি । এখানে আমাকে শেষ পর্যন্ত রুটিতে মধু ঢেলে খেতেই হল । এরকম সুস্বাদু সুঘ্রাণ চাকসুদ্ধ মধু এর আগে আর কোথাও খাইনি । চাকও চিবিয়ে খাওয়ার কে জানত! এদের অবুঝ পীড়াপীড়িতে এত খেয়ে ফেললাম যে সেদিন মানানার নির্দেশমতো ভালো রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজের আর চেষ্টাই করা গেল না । যদিও মানানা এজন্য ভাজিকের পকেটে বেশকিছু ‘লারি’ গুঁজে দিয়েছিল ।

বাজার দেখে চলে আসার সময় সকলেরই এক কথা-ভারত থেকে কেউ আর আসে না, তুমি বারবার জর্জিয়ায় এসো । ইংরিজি করে দিল ভাজিক । জর্জিয়াকে ওরা বলে শাখার্ৎবেলো ।

মাদলোবা, দিদি মাদলোবা । নাখোয়ামদিস! (ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ । বিদায়!)

কথাটা মুখস্থ বললেও, বলি আসলে অন্তর থেকে ।

আমি দেখেছি যেসব দেশে চাষবাস আর পশুপালন প্রধান জীবিকা সেসব দেশের মানুষ বানিয়ে কথা বলতে পারে না, তাদের মনে যা, মুখেও তাই । এরকম মনের মানুষ আমি বড়ই ভালোবাসি ।

শাখার্ৎবেলোর সংকটে

এই পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোন তিনটি জিনিস আমি সর্বদা অক্ষত দেখতে চাইব? সবুজ অরণ্য, সুনীল আকাশ আর মানুষের সোনালি হৃদয় । ৎবিলিসি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রশ্নের এই নাকি ছিল আমার চটজলদি উত্তর ।

আমার সেদিনকার বক্তৃতাও বক্তৃতা-পরবর্তী প্রশ্নোত্তর জর্জিয়ান দৈনিক সাপ্তাহিক থেকে মানানা ইংরিজি করে দিয়েছিল, পড়ে আমি অবাক হয়েছিলাম বক্তব্যের গুরুত্বে না, দৈর্ঘ্যে।

অতক্ষণ ধরে অতরকম কথা কী করে বলতে পেরেছিলাম জানি না । হয়তো শ্রোতাদের ভিড় ও মুগ্ধতাই তার কারণ । বক্তৃতার শুরুতেই আমার মুখে ‘মেগো ব্রেবো, কামারজোবা!’ (বন্ধুগণ, জয় হোক!) শুনে হল-ভর্তি শ্রোতাদের আচমকা প্রবল হাততালিতে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছি । কাগজে সেদিনের বক্তৃতার লম্বা বিবরণ বেরিয়েছিল, একটা সাপ্তাহিকের সাক্ষাৎকারে এই মুখবন্ধও ছিল যে ‘ভারতীয় এই লেখক-সাংবাদিক-ভ্রামণিক আমাজনের তীর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তার কিছুদিন পরেই এসেছেন জর্জিয়ায়, এখন জর্জিয়ার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এ-দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ দেখে বেড়াচ্ছেন । এই মুহূর্তে মানানা দুমবাদজের দোভাষিত্বে আমরা ভারত ও জর্জিয়ার নানা প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি ।’

ঘণ্টাখানেকের বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের পালা । সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, কারগিল, পোখরান, প্রধানমন্ত্রী কেন বিয়ে করেননি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন । দুঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে একটা প্রশ্ন আমার মনে দাগ কেটেছিল-জর্জিয়ার প্রবল এই সংকটের দিনে কী করে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধরে রাখবে তরুণ সম্প্রদায়?

দেশে যেকথা মুখ ফুটে বলতে পারতাম না, বিদেশে ফট করে সেকথা বলে দিলাম-আপনাদের স্বপ্নশক্তি আর সংকল্পশক্তি দিয়ে । আমার কানে গেল, আমি আরও বললাম-পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যেখানে কোনও সমস্যা নেই, এমন কোন যুগ গেছে যেখানে কোনও সংকট ছিল না? শাখার্ৎবেলো নিয়ে আপনাদের স্বপ্ন আর তার ঐতিহ্যে আপনাদের অনুরাগ আঁকড়ে থাকুন, একদিন নিজেদের আবার ফিরে পাবেনই ।

টিভির খবরেও এটা দেখানো হল ।

অচিন দেশে বেড়াতে এসে এমন অপ্রাপ্য প্রচারে যত না সঙ্কোচ, তার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চ হয় । সমগ্র জর্জিয়াভ্রমণেই এরকম কাগজে টিভিতে সংবাদে-সাক্ষাৎকারে বার বার প্রদর্শিত হয়েছি । হয়তো আমাকে ভুল করে ভারতের বড় কোনও লেখক-টেখক ভেবেছে, অথবা হয়তো দেশটা ছোট বলে ছোট মাপের কাউকেও এরা ছোট মনে করে না, অতিথি মাত্রই তো এদেশে বরণীয়! তবে এসবের পিছনে মানানার কারসাজিও থাকতে পারে ।

রেজোর ঠাকুমার বাড়ি

ইউনিভার্সিটিতে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন নাট্যকার রেজো ক্লদিয়াশভিলি। এমন স্বভাবপরোপকারী ভালো মানুষ আজকাল চট করে দেখা যায় না। আমার সঙ্গে দুদিনেই তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রথমদিন মানানার মধ্যস্থতায়, পরে তার ইংরিজিনবিশ মেয়ের দোভাষিত্বে।

রেজো আমাকে একদিন ট্যাক্সিতে, একদিন বন্ধুর গাড়ি ধার করে ৎবিলিসি ঘোরাল। এবছর তিবিলিসোবা বা ৎবিলিসি উৎসবের দিন পড়েছে ২৯ অক্টোবর, অক্টোবরের শেষ রবিবারই প্রতিবার এই উৎসব হয়, আমি চলে যাব ২৭ অক্টোবর, ফলে শহরের মধ্যেই আলাদা একটা গ্রামের মতো জায়গায় রেজো আমাকে নিয়ে গেল, এখানেই ৎবিলিসি উৎসব হয়, এখানে জর্জিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা আলাদা বাড়ি ও প্রাঙ্গণ তৈরি করা রয়েছে। রেজো নিয়ে গেল তার ঠাকুমার তৈরি তাদের অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বাড়িতে। উঠোনে রাবণের রান্নাঘরের উপযুক্ত মাটির হাঁড়ি গামলা পড়ে থেকে থেকে মাটিতে আংশিক বসে গেছে। এসবই রেজোদের গ্রামের রীতি অনুযায়ী মদ তৈরির সরঞ্জাম। আঙুরের রস নিংড়োবার বহুদিনের পুরনো কাঠের পেষাই পাত্রও পড়ে আছে।

খোদ রাজধানীতে শহরের মধ্যে বা এক ধারে এতখানি জায়গা নিয়ে এমন বিস্তীর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ, সারা দেশেরই একটি ছোট্ট প্রতিরূপ এক জায়গায়-দেখে ভালো লাগল।

রেজো আমাকে নিয়ে জরাজীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে তার ঠাকুমার তৈরি জীর্ণ বাড়িতে ভ্যাপসা গন্ধওলা একটা ঘরে ঢুকে নিজের মনের কথা খুলে বলল। দুবছরের মধ্যে পুরো বাড়িটি সংস্কার করে সে এখানে একটা সাহিত্য সম্মেলন করবে। দেশের কবি লেখক নাট্যকারদের এক জায়গায় জড়ো করবে। আমাকে তো আসতে হবেই। তবে অন্তত দুসপ্তাহ থাকতে হবে।

এর মধ্যে একদিন এক ফাঁকে টিভির দুটি ছেলেমেয়ে ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে এসে আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে গেল। বোধহয় রেজোরই উদ্যোগে। রেজোও সেদিন আমার অনেকগুলো ছবি তুলল। ঘরের দেওয়ালে দু-তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনেকগুলো করে ছবি দিয়ে চমৎকার কোলাজ করেছে রেজো। মেয়ের তর্জমায় বুঝলাম, ও বলছে, আমার ছবিও নাকি দেওয়ালে ওইরকম কোলাজ করে রেখে দেবে। শুনে, কেন জানি না, আমার মোটেই ভালো লাগল না। রেজো ইংরিজি এক অক্ষরও বোঝে না, ফলে মেয়ের ভাষান্তরে ওকে একাজে নিরুৎসাহ করতে আমি আর উৎসাহ পেলাম না।

টিভির সাক্ষাৎকারে দোভাষীর কাজ করেছে মানানা, জর্জিয়াভ্রমণে সর্বদা সর্বত্র সভায়-সাক্ষাৎকারে, ভোজসভায়, আলাপ-আলোচনায় মানানার মতো বিখ্যাত লেখক ও বিশেষজ্ঞ সাংবাদিককে দোভাষী হিসেবে পাওয়া আমার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্যের কথা । তার দোভাষিত্ব ছাড়া জর্জিয়ার এত গভীরে আমি যেতে পারতাম না ।

টিভির ইন্টারভিউ শেষ করেই খুব জরুরি কী একটা কাজে মানানাকে চলে যেতে হয়েছে, রেজো আমাকে নিয়ে পুরনো ৎবিলিসির ইহুদি ও তুর্কিদের মিশ্র পাড়ায় নিয়ে গেল । সেখানে রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে একটা তুর্কি হামামে স্নানব্যবস্থা দেখলাম । রেজোকে হামামের পুরুষ-মহিলা কর্মীরা সবাই দেখলাম চেনে, আমি ভারতীয় শুনে রেজোকে জিজ্ঞাসা করল, আমি চান করতে চাই কিনা । রেজো আমার দিকে তাকাল, মহিলা ভাঙা ইংরিজিতে এবার আমাকেই প্রশ্নটা শোনালেন । প্রাচীন এই তুর্কি স্নানব্যবস্থা চেখে দেখার ইচ্ছে ছিল না তা নয়, কিন্তু অচেনা এই পরিবেশে স্নান করতে মন সায় দিল না ।

রেজো আমাকে নিয়ে কাছেই ছোট্ট একটা দোতলা বাড়িতে গেল । বহুকালের পুরনো বাড়ি । ভেতরটা অদ্ভুত ধরনের । ছোট্ট ঘরে, প্যাসেজের দেওয়ালে পুতুলনাচের পুতুল সাঁটা । মাথা বাঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি মাঝারি মাপের একটা ঘরে একদিকে পুরনো কয়েকটা টুলে ও মোড়ায় বসার ব্যবস্থা, সামনে একটু উঁচু খানিকটা মঞ্চের মতো, ওপরের দেওয়ালের ধার ঘেঁসে অনেকরকম অনেকগুলো লাইট । কয়েকজন লোক সেগুলো ঠিক করছে । সিড়িঙ্গে চেহারার একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে রেজো বিশুদ্ধ জর্জিয়ান ভাষায় কিছু বলল, সেই রোগা চেহারার ভদ্রলোকই সেটা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলেন-তিনি রেজোর বন্ধু, এই মিনি থিয়েটার হলের মালিক ও নাট্যপরিচালক, শুধু নতুন নিরীক্ষামূলক নাটকই তাঁরা এখানে মঞ্চস্থ করেন । সব সময়ে তো আর সেধরনের নাটক পাওয়া যায় না, বা করাও যায় না, সেইসব সময় এটা ভাড়া দেওয়া হয় টিভির শুটিংয়ের জন্য ।

সামনের শনিবার এখানে এঁদের নিজস্ব নাটক হবে । তারপর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে নতুন নাটক, রেজোর লেখা । আজ সন্ধেবেলা টিভির শুটিং । সেইজন্যই আলো-টালো ঠিক করা হচ্ছে । টিভি শুটিংয়ের পক্ষে হয়তো এই স্বল্পপরিসর ঠিকই আছে, কিন্তু এই এক চিলতে ঘরে নাট্যাভিনয় কীভাবে হয় ভেবে কূল-কিনারা পেলাম না । কুশীলবরাই বা কজন হবেন, শ্রোতার সংখ্যাই বা কত হতে পারে?

ভদ্রলোক থামতেই রেজো আমার সম্পর্কে একটানা কী বলে গেল, আমি শুধু সেই অদ্ভুত উচ্চারণে আমার নাম আর 'ইন্দোয়িথি' শব্দটা চিনতে পারলাম । 'ইন্দোয়িথি' মানে

ইন্ডিয়ান।

যাইহোক, পরিচয় শুনেই নাট্যপরিচালক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, জিজ্ঞেস করলেন-বিজয় তেন্ডুলকর কেমন আছেন? সুদূর জর্জিয়ায় ভারতের আধুনিক নাট্যকারের নামও পৌঁছে গেছে দেখে ভারি আনন্দ হল। দু-তিন বছর আগে তেন্ডুলকর সরস্বতী সম্মান পেয়েছিলেন সেকথা জানালাম।

রাজকাপুর বনাম রবীন্দ্রনাথ

সন্ধেবেলা রেজো আমাকে মানানার বাড়িতে পৌঁছে দিতে এলে দেখা গেল, মানানা তখনও ফেরেনি। সামনের ফ্ল্যাটে মানানার চাবি রাখা থাকে, রেজো জানত। ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুলে গেল, একটা ছোট ছেলে রেজোকে দেখে আমাদের ভেতরে আসতে বলল। আমি দ্বিধা করছি দেখে এক মহিলা, বোধহয় ছেলেটির মা, এসে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা সরু প্যাসেজ পেরিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগোচ্ছি, এক সুদর্শন প্রৌঢ় এসে আমাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। ছোট ছেলেটির মা ততক্ষণে দ্রুত হাতে টেবিল থেকে ছেলের বইখাতা নামিয়ে টেবিলটাকে পরিষ্কার করে ফেলেছেন।

জর্জিয়ার সর্বত্র দেখেছি রাজকাপুরের নামে মানুষের মুখে খুশি খেলে, মনে আলো জ্বলে। এই অপরিচিত সংসারে, অচেনা ভদ্রলোকের সামনে চুপচাপ। বসে থেকে কী বলি কী বলি করতে করতে আমি হঠাৎ বললাম, আপনি রাজকাপুরকে দেখেছেন?

ভদ্রলোক প্রায় ছিটকে উঠে কোথায় চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন দুহাতে সাত-আটখানা সুন্দর বাঁধানো বই নিয়ে। সব কটার প্রচ্ছদেই দেখলাম Tagore লেখা আছে। তাঁর শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় বিনা ভাষাতেই বুঝিয়ে দিলেন, ভারত বলতে তিনি কী বোঝেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমিও কৈফিয়তের সুরে বললাম, এখানে রাজকাপুরের তুমুল জনপ্রিয়তা দেখেই আমি ওঁর কথা তুলেছি, এমনিতে শিক্ষিত বাঙালিরা বাজারচলতি হিন্দি ছবির খুব একটা ভক্ত নয়। কথাবার্তা হচ্ছে ভদ্রলোকের কিশোরী কন্যার ধীর গতি ইংরিজি অনুবাদে।

মানানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রীতিমতো উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, ভাগ্যিস, আজ আমার ফিরতে দেরি হল। তুমি জানো ইনি কে? তারিয়েল চানতুরিয়া-অত্যন্ত শক্তিশালী কবি। বলতে পারো জর্জিয়ার শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিদের একজন

। সেদিন তুমি যাঁর একটা কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলে সেটা এঁরই লেখা । কতদিন ভেবেছি, তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব-

'তারিয়েল' শুনেই মনে পড়ে গেল, জর্জিয়ার জাতীয় কবি রুসতাভেলির মহাকাব্যের একটা প্রধান চরিত্রের নাম তারিয়েল! কবিতার নামটাও বেশ অসাধারণ-'একটা হতাশ চিন্তা' । A Dissapointed Thought, প্রায় ৫০ লাইনের কবিতা, তার প্রথম চার লাইন এইরকম, একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে যায়:

A poem needs a heart

A poem needs a liver

A poem needs a tear

And plenty of your blood.

আমাদের বাংলা কবিতা, এখনকার কবিদের কথা, খুব নতুন রকম কবিতা কী লেখা হচ্ছে, এইসব বিষয়ে তারিয়েলের তীক্ষ্ণ সব প্রশ্নের উত্তরে আমার সামান্য জ্ঞান বিশ্বাসমতো দু-চার কথা বলতে হল । সব শুনে তারিয়েল হঠাৎ বললেন, শ-পাঁচেক পংক্তি নতুন কবিতা পাঠাতে পারেন? আমি জর্জিয়ানে অনুবাদ করে দেখতাম । সেটাই হবে জর্জিয়ানে প্রথম বাংলা কবিতাবই ।

যিনি দরজা থেকে ভেতরে ডেকে এনেছিলেন সেই মহিলা কবির পুত্রবধূ । এঁকে আমি পরেও মাঝে মাঝে দেখেছি, রাতে ডিনারের পর আমাদের বাড়ি, মানে মানানাদের ড্রয়িং রুমে আসতেন সিগারেট খেতে ।

আমরা চা-টা খেয়ে উঠে পড়লাম । পরদিন জর্জিয়ার প্রাচীন রাজধানী থেতা (Mtskheta)-য় খুব বড় ধর্মীয় উৎসব-থেতোবা (Mtskhetoba), বাংলায় থেতা উৎসব । 'দিলিস গাজেতি' আমাকে এই উৎসব দেখাবে এবং আমার সম্মানে থেতাতেই ডিনারের আয়োজন করেছে । নৈশভোজসভা বসবে ডেইলি গেজেট-এর থেতাবাসী একজন কর্মীর বাড়িতে ।

সাদা নদী কালো নদী

ঠিক হল কাল সকাল আটটায় আমরা বেরব, কেননা নটার আগে পুলিশচৌকি পেরিয়ে না গেলে পরে আর উৎসবের জায়গা পর্যন্ত কোনও গাড়ি যেতে দেবে না । তখন অনেকটা

রাস্তা আমাদের হাঁটতে হবে। উৎসবে অস্বাভাবিক ভিড় হয়, একটু বেলা হলেই উৎসবমুখী রাস্তায় মানুষের ঢল নামে, তার আগেই সব গাড়ি রুখে দেওয়া হয়।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি চারদিক স্যাঁতসেঁতে, আকাশ-বাতাস কালো হয়ে আছে, তার মধ্যেই ঝিপঝিপে বৃষ্টি।

লেপ না সরিয়ে শুধু একটু মাথা তুলে একটুখানি জানলা ফাঁক করেছি, ঠান্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাটে মুখ-কপাল সব হিম হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা। এই অবস্থায় আমাদের থেতা উৎসবে যাওয়া হবে কি?

বাথরুমের পথে দেখা হল ভাজিকের সঙ্গে, জগিং সেরে এসে জুতোর জলকাদা সাফ করছে। ও জগিং করতে যায় পাহাড়ের নিচে মস্ত বড় ফাঁকা জায়গায়। আমাকেও রোজ ডেকে নিয়ে যায়, আজ যাব না সেকথা কালই জানিয়ে রেখেছি। তাছাড়া ভাজিকের মতে ওই পাহাড়টা ককেশাস, এমনকী লিটল ককেশাসও নয় শুনে মর্নিং ওয়াকে আমার উৎসাহেও কিছু ভাঁটা পড়েছে। মানানার দাবি ওটা ককেশাসেরই একটা শাখা, তবে 'রাশিয়ান, থুরি, উইক্রেনিয়ান হলেও জর্জিয়ার ভূগোল আমার চেয়ে ভাজিকই ভালো জানে।'

খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল মানানা গভীর ঘুমে। এমন বিশ্রী মেঘবৃষ্টির দিন, বেরবার সময় হয়ে গেছে, গৃহকর্ত্রী তখনও নিদ্রামগ্ন, ভাজিকও কী একটা রুশ প্রবাদ আউরে চোখ মটকে তার অর্থ করে দিল-এরকম আবহাওয়ায় দিন শুরু করতে হয় ভদকা দিয়ে, শেষও করতে হয় ভদকা দিয়ে, আর মাঝের সময়টাও ভাসিয়ে দিতে হয় ভদকায়। শুনে আমি একশো ভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে লেপের নিচে ফিরে গেলাম।

বোধহয় দশ মিনিটও হয়নি, কোন বিদেশে কাদের সঙ্গে কেমন একাত্ম হয়ে আছি ভাবতে ভাবতে সবে আরামে আমার দু-চোখ জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার নাম ধরে মানানার চিৎকারে লেপ ফেলে দৌড়ে যাই।

ভুরু কুঁচকে বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, এ কী! তুমি তৈরি হওনি?

ঘড়িতে দেখলাম ঠিক আটটা। মানানা বেরবার জন্য একেবারে তৈরি।

আমার জন্যই আমাদের বেরতে একটু দেরি হয়ে গেল। ভাজিক অবশ্য এল না, তার নাকি ভেরি মেনি ওয়ার্কস আছে। আমি একবার অনুরোধ করতে যাচ্ছিলাম, মানানা চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলল, রোজই ওর 'ভেরি মেনি' ওয়ার্কস থাকে তুমি জানো না? 'থেতোবা'র দিনেও। যেদিন সবার ছুটি, ওর কি কাজ না করলে চলে নাকি?

লিফট বন্ধ, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মানানা বলল, গত বছর মেতেছিল ৎবিলিসির পার্কে অ্যাকোরিয়াম করতে, এবার ক্ষেপেছে বেলুনে বিশ্বজয় না করে ছাড়বে না!

বেলুনে চড়ে সিল্ক রুট অভিযান-শুনতে পাগলামি মনে হলেও ভাজিকের কাছে মস্ত বড় ব্যাপার । এ তার জীবনের স্বপ্ন, সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান । এই অসাধ্য সাধনে সবরকম সহযোগিতা চেয়ে সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে তার আর্জি জানিয়েছে । প্রেসিডেন্টও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন । জর্জিয়ান ভাষায় টাইপ করা সেই দরখাস্তের ওপর প্রেসিডেন্টের সেই মন্তব্য ও স্বাক্ষর ভাজিক আমাকে দেখিয়েছে । মানানাকে দিয়ে ইংরিজিও করিয়ে দিয়েছে । এই অভিযান নিয়ে আমার সঙ্গে ভাজিকের জল্পনা-কল্পনার যেন শেষ নেই । আমাকেও কথা দিতে হয়েছে যে পুরো পথটা যদি নাও পারি, অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত আমাকে অভিযানে যেতেই হবে, এজন্য সে আমাকে এখন থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে ।

মানানার আশংকাই সত্যি হল । কিছুদূর যাবার পর পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকে দিল । এখানে নামলে অনেকটা হাঁটতে হবে, অতএব গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের রাস্তা ধরে অন্য একটা রাস্তায় পড়ে আমরা প্রথমে গেলাম ছুয়ারি বা জুয়ারি । জর্জিয়ার সবচেয়ে উঁচুতে এই প্রাচীন গির্জা, জায়গাটা বোধহয় ১২,০০০ ফুট উঁচু, আর তেমনই হাওয়ার দাপট, মনে হয় বড় বড় বরফের চাঁই সোজা হাড়ের ওপর কেউ ঘষে দিচ্ছে । তাড়াহুড়োয় ভারি গরমের জামাকাপড়ও বেশি কিছু চড়ানো হয়নি । আমার দাঁতে দাঁতে খটখটি শুনে মানানা অপ্রস্তুতের একশেষ, তার নিজের গায়ে বোধহয় সাইবেরিয়ার গরম পোশাক! ওপরে উঠছি তো উঠছিই, গাড়ি থেকে নেমেও আরও খানিকটা উঠে ষষ্ঠ শতাব্দীর গির্জার সামনে পৌঁছলাম ।

মস্ত উঁচু কাঠের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে শীতের কামড় থেকে শুধু রক্ষাই পেলাম না, অদ্ভুত আরামে উষ্ণতায় মোমের আলোয়-গন্ধে দেহ যেন ধন্য হল ।

মানানা, ডেইলি গেজেটের ফটোগ্রাফার, গাড়ির ড্রাইভার-সকলেই যখন উপস্থিত অসংখ্য জনের সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছে আমি তখন ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে সিলিংয়ে মেঝেয় রঙিন চিত্র দেখে বেড়াচ্ছি ।

বাইরে আসতেই আবার সেই শীতের ঝাপট । ঘুরতে ঘুরতে আরও উঁচু, রেলিং ঘেরা একটা জায়গায় পৌঁছলাম । নিচে চেয়ে দেখি দুদিক থেকে দুটি নদী এসে আরেকটা নদীর সঙ্গে মিলেছে । দুই নদীর নাম থেৎরি (সাদা) আরাগ্রি আর শাবি (কালো) আরাগ্রি, এরা এখানে এসে মিলেছে দকুবারি (তুর্কি ভাষায় 'কুরা') আরাগ্রিতে । আরাগ্রি মানে নদী । কুরা নদী তুর্কি থেকে এসে জর্জিয়া হয়ে আজারবাইজানে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে ।

মাস তিনেক আগে আমাজনে দেখেছি নিগ্রো (কালো) আর সোলিময়েস (হলদে) নদী মিশেছে আমাজন নদীতে, জর্জিয়ায় দেখলাম সাদা আর কালো নদী-থেৎরি আর শাবি।

থেতা উৎসব

জুয়ারি থেকে নেমে অনেকটা রাস্তা উজিয়ে ফিরে এলাম থেতার পথে। এবারও পুলিশ পথ আটকাল। এবারে পুলিশ আরও বেশি কড়া, কেননা এখান থেকেই রাস্তায় প্রচুর ভিড় দেখা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাব, না এখান থেকেই ফিরে যাব তাই নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে মানানার আলোচনা চলছে, হঠাৎ দীর্ঘনাসা দীর্ঘদেহী মুণ্ডিতমস্তক ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে গিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে কী বললেন, পুলিশ অফিসারটি ঝুঁকে জানলা দিয়ে মানানাকে দেখে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। কী ব্যাপার? নোদার দুমবাদজের মেয়ে মানানা দুমবাদজে সত্যিই এই গাড়িতে যাচ্ছেন কিনা পুলিশ অফিসার শুধু সেটুকু দেখে নিলেন। সাহিত্যের প্রতি সাধারণের এই অনুরাগ, সাহিত্যিকের প্রতি রাস্তাঘাটেও এই সম্মান জর্জিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দিল।

থেতায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে দেখি ক্যাথিড্রালের পথে মানুষের ঢল নেমেছে। ভিড়ে এগনো অসম্ভব, হাঁটাই দায়! তার ওপর প্রেসিডেন্ট এসেছেন, তাঁকেও দেখলাম ভিড়ে ধীরগতি। মানুষের মিছিল এগোচ্ছে শামুকের মতো, মাঝে মাঝে মনে হয় এই বুঝি ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যাবে। রাস্তার ধারে নানারকম ভিখিরি ও মোমবাতি বিক্রেতা, খাবারের পসরা নিয়ে বসেছে অনেকে। ভিড়ে আটকে পড়া মানুষের রাগ-বিরক্তিও কানে আসছে, মানানার তাৎক্ষণিক তর্জমায় সব কথাই বুঝতে পারছি।

পরদিনের 'দিলিস গাজেতি' কাগজে 'ইন্ডিয়ান উইসডম অ্যান্ড লাভ ফর জর্জিয়া' শিরোনামে আমার এই থেতা উৎসব দেখার খবরে লেখা হল-

জর্জিয়ান খ্রিস্টানদের এই থেতা উৎসবে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ক্যাথিড্রালের সামনে বিরাট ভিড়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী মন দিয়ে সেই ভিড়ের নানা কথা শুনছিলেন, ভিড়ের মধ্যে লোকেরা তাদের দুঃসহ দারিদ্র আর দুর্বহ জীবনযাপনের জন্য ক্ষোভ জানাচ্ছিল, মানানা দুমবাদজে প্রত্যেকটি শব্দ চক্রবর্তীকে ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর চক্রবর্তী বললেন, মানুষ সারা পৃথিবীতেই এক। সুখ-দুঃখের আসল কারণগুলোও একই।

অনুষ্ঠানের পর দিলিস গাজেতির কর্মীবৃন্দ আয়োজিত এক ঐতিহ্যপূর্ণ জর্জিয়ান নৈশভোজে চক্রবর্তীকে আপ্যায়ন করা হয়। ভোজসভার টেবিলে গৃহকর্তার পরিবারের

তিন পুরুষকে উপস্থিত দেখে তিনি খুব খুশি হলেন কেননা ভারতেও এরকমটা দেখা যায় । আধুনিক ভঙ্গুর সমাজে তিনি এটাকে সভ্যতার সবচেয়ে সুন্দর বিলাসিতা বলে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখের যে আজ আর আমরা এটা বুঝতে পারি না । সম্পর্কের বিস্তার ও গভীরতাকে তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব বলে মনে করেন ।

ডিনার যখন শেষ হল, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে এবং সকলেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, তখন এই ভারতীয় লেখক-পর্যটক এক গর্ভবতী মহিলাকে দেখে বলেন, আমার বিশ্বাস এই শিশুটি বড় দার্শনিক হবে এবং জর্জিয়ার সংকটে পথ দেখাবে । তাঁর এই বিশ্বাস ও কল্পনা আমাদের সকলেরই ভালো লাগল । চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটাই যে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ককে অন্তর থেকে মানেন ও মূল্য দেন । তিনি বলেন, সর্বত্র এই সম্পর্ককে সযত্নে লালন করা দরকার ।

খবরের কাগজে ছাপা না হলে, এসব তুচ্ছ কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ত না । অথচ সেদিনের ডিনারের অন্য অনেক মজার স্মৃতিও ভোলবার নয় ।

সবচেয়ে বেশি মনে আছে পাঁচ ঘণ্টার রাজকীয় ভোজনের আগে প্রায় দশ ঘণ্টার উপবাসের বেদনা ।

সকালে বেরবার আগে তাড়াহুড়োয় ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা যায়নি, রাস্তায় যেতে যেতে হয়তো খানিকটা অপরাধ বোধ থেকে মানানা মাঝে মাঝেই শোনাচ্ছে-থেতায় আজ তোমার সম্মানে ডিনার! জর্জিয়ার সর্বোচ্চ জায়গায় শীতে যখন শরীরের হাড়ে হাড়ে বাজছে স্পেনদেশীয় ফ্লামেঙ্কো নাচের দ্রুত তালের কাঠ-খটখটি বাজনা, দুপাটি দন্ত মাধ্যমে তা শোনাও যাচ্ছে, তখনও মানানা আমার দিকে সকরুণ চেয়ে থেকে জর্জিয়ার ঐতিহ্যপূর্ণ ডিনারের সংবাদ দিয়েছে ।

আমি ভেবেছিলাম অনেকে ভুল করে লাঞ্চ ডিনার গুলিয়ে ফেলে, এও নিশ্চয় তা-ই, তা না হলে সকালে ব্রেকফাস্ট হয়নি, দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা শোনা যাচ্ছে না, সোজা একেবারে ডিনার?

উৎসব শেষে যখন ডিনারস্থলে পৌঁছলাম, তখন দুপুর ৩টে । মুখ তেতো, খিদেয় পেটে যেন হোয়াইট ওয়াটার র্যাফটিং চলছে, হঠাৎ গেট দিয়ে ঢুকেই মাথার ওপরে থোকা থোকা কালো আঙুর ঝুলছে দেখে ভারি শান্তি বোধ হল । গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী দুজনেই এগিয়ে এসে একে একে মানানার সঙ্গে এক গালে চুম্বনবিনিময় করলেন, কর্ত্রী ঠাকরুন এসে ডান হাতে আমার পিঠ জড়িয়ে ধরে সাদরে ভেতরে নিয়ে চললেন । দোতলায় নিয়ে আমাদের যেখানে বসালেন, সেখানে নিচু টেবিলে প্রচুর বই ও কয়েকটা পেইন্টিংয়ের অ্যালবাম ।

বইয়ের মধ্যে যে কোনও জর্জিয়ান পরিবারে রুসতাভেলির 'ব্যাঘ্র চর্মাবৃত নাইট' থাকবেই, আর যদি একজন চিত্রশিল্পীও থাকেন, তিনি ফিরোসমানি।

অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ হৃদয়ে জর্জিয়ার এই জাতীয়-শিল্পীর ছবি দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে নানা বয়সের মহিলারা বড় বড় সব কাঠের পাত্রে, সেরামিক ও রুপোর পাত্রে গন্ধে আকুল করা সুখাদ্য আমার পাশের বড় একটা ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে মৃদু আশা, একটু দেরি হয়ে গেলেও এ নিশ্চয় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন! এই ডাক পড়ল বলে!

আরও দু-তিনটে বই নাড়াচাড়া করার পরেও যখন চোখের সামনে দিয়ে শুধু নানা আকারের কারুকার্যময় সুগন্ধ পাত্র হাতে পাত্রীদের ঘরের মধ্যে চলে যেতে দেখছি তখন আর সন্দেহ রইল না যে খাবারের এখনও ঢের দেরি, এ তো ডিনারই!

বিকেল পাঁচটায় গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এসে আমাদের মস্ত বড় খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিশাল টেবিলে পাত্র-পাত্রী খাবার পানীয়ের বৈচিত্র্যে প্রাচুর্যে সাজসজ্জায় এতক্ষণের খিদেও অতি তুচ্ছ মনে হল।

এইরকম আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় অতিথির উদ্দেশে পানীয় 'টোস্ট' করা একটা দেখবার মতো ব্যাপার বটে! আমার উদ্দেশে একটু পর পর একেক জনের দীর্ঘ বাগবিস্তারের সঙ্গে মস্ত বড় ওয়াইন গ্লাস হাতে দীর্ঘ 'টোস্ট'-এর ধকলে আমার তো ভিরমি খাবার জোগাড়!

টোস্ট করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ বিড়বিড় করে, কেউ স্পষ্ট গলায় আমার উদ্দেশে নানা সুবাক্য ব'লে, কখনও আমার প্রশস্তি ও কুশল-কামনা ক'রে, কখনও মহান ভারতীয় অতিথিকে নানা বিশেষণে ভূষিত ক'রে বা দুই দেশের মৈত্রী-প্রীতির বিকাশ ও স্থায়িত্ব চেয়ে এক চুমুকে লম্বা গ্লাসের সবটুকু মদ শেষ করে। মানানা তার আগেই প্রায় ঝড়ের গতিতে টোস্টের বাণী বা বক্তব্যের অংশ আমার জন্য ইংরিজি করে দেয়। উত্তরে আমাকেও কিছু বলতে হয়, মানানা জর্জিয়ানে তার অনুবাদ করে।

নতুন কোনও কথা মনে উদয় হওয়ায় কেউ কেউ আবার উঠে দাঁড়িয়ে নতুন বাক্যরাজি বলে এক চুমুকে পূর্ণ গেলাস শূন্য করে দেয়। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এরকম বার কতক গ্লাস শেষ করতে দেখে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায়। নিয়ম হচ্ছে, যার উদ্দেশে এতসব শুভেচ্ছাবাণী তাকেও একই সঙ্গে এক চুমুকে সুরাপাত্র খালি করে দিতে হয়। প্রথম প্রথম এঁরা আমার উদ্দেশে কে কী বলছেন, তার ইংরিজি অনুবাদে মন দিতে গিয়ে আমি গেলাসে পাল্টা চুমুক দিতে ভুলে যাই, মানানার খোঁচা খেয়ে খেয়াল হতে

আমি বুদ্ধি করে বড় গ্লাস রেখে ভোজনান্তের লিকিয়্যরের ছোট্ট গ্লাস হাতে নিয়ে টোস্টযুদ্ধে অবতীর্ণ হই ।

ভোজসভায় নিমন্ত্রিত বা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাপকরা সবাই সংবাদপত্রের কর্মী, ফলে যাঁর যখন কাজ শেষ হচ্ছে তিনি তখনই ভোজসভায় যোগ দিচ্ছেন এবং এসেই তাঁর প্রথম কর্তব্য আজকের 'মহান অতিথি'র সঙ্গে পানীয় টোস্ট করা । সেই বিরাট গ্লাস, সেই বাগবিস্তার, সেই এক চুমুকে পাত্র খালি করা ।

টেবিলে যেমন বড় বড় জাগ ভরা পানীয়, পাত্রের পর পাত্র ভরা তেমনই নানা ব্যঞ্জন । স্বাদ গন্ধ বর্ণ ছাড়াও শুধু বৈচিত্র্যে ও সংখ্যাধিক্যেই চোখে ধাঁধা লাগে । এই টেবিল ভরা আহার্য-পানীয় সাজাতে এক-দেড়ঘণ্টা সময় লেগেছিল, ভোজের সেটা ছিল মাত্রই শুরু । এরপর পুরনো পাত্র কতবার পূর্ণ হল, কত নতুন পাত্র, নতুন পদ যুক্ত হল, তার আর হিসেব নেই ।

৫

আলাজানি, মুকুজানি

জর্জিয়ায় দেখতে দেখতে দুসপ্তাহ কেটে গেল । আজ ২২ অক্টোবর । ৎবিলিসি থেকে বাসভর্তি জর্জিয়ার কবি লেখক নাট্যকারের সঙ্গে চলেছি কাকেথি অঞ্চলে, সেখানে তেলাভির ইকালথো-তে মহাকবি সোতা রুসতাভেলি উৎসব ।

কাকেথি পূর্ব জর্জিয়ায় । প্রাচীন কাল থেকে কাকেথি সুরা অঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত । পথে পড়ছে আলাজানি নদীর গায়ে আলাজানি উপত্যকা, ইওরি নদীর ইওরি উপত্যকা, পেরিয়ে যাচ্ছি একের পর এক আঙুরগ্রাম, মাইলের পর মাইল দ্রাক্ষাকুঞ্জবতী গ্রামগুলোর নামেও মধু । কোনও গ্রামের নাম শিনানদালি, কোনওটির নাম মুকুজানি, কোনওটির আবার গুর্জানি । এইসব গ্রামের দ্রাক্ষা থেকে এখানেই তৈরি হচ্ছে বিখ্যাত জর্জিয়ান ওয়াইন । গ্রামের নামেই সুরারও নাম আলাজানি, মুকুজানি, গুর্জানি ইত্যাদি ।

আমাদের দেশে বাল্মীকি উৎসব বা ব্যাসোৎসব বা কৃত্তিবাস উৎসবে আমরা অভ্যস্ত নই বলেই হয়তো রাজধানী থেকে দেড়-দুশো কিলোমিটার দূরে প্রায় হাজার বছর আগের একজন কবির বাল্যশিক্ষার গ্রামে কবি-লেখকদের জড়ো হওয়া দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত । তাছাড়া আশপাশের গ্রামের নানা বয়সের সাধারণ মানুষের ভিড় থেকেও

জর্জিয়ানদের সাহিত্য-অনুরাগের আঁচ পাচ্ছি । পাঁচিলের ওপর, গাছের মাথায় দুচারজন অত্যুৎসাহী শ্রোতা-দর্শক দেখা গেল, আমাদের দেশে এ শুধু এখন খেলার মাঠেই সম্ভব ।

এপর্যন্ত সব বেশ ভালোই চলছিল, আমিও যথাসম্ভব গাম্ভীর্য সহকারে দূর বিদেশের মহাকবি-উৎসব প্রত্যক্ষ করছি, হঠাৎ মাইকে জর্জিয়ান উচ্চারণে ইন্দোয়েথী অ্যাম্যারেনদ্র ইত্যাদি শুনে শংকিত হই । মানানা আমার কানে কানে শোনাল, তোমাকে কিছু বলতে বলা হচ্ছে, চলো-

একটা মাইকের সামনে আমাকে ও আরেকটির সামনে মানানাকে এগিয়ে যেতে হল ।

প্রথমেই আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল-আমি বাক্যহারা, আমি অভিভূত! কারণ? মহাকবির নিজের দেশে এসে তাঁকে এভাবে নমস্কার জানাবার সুযোগ পাব কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি । জর্জিয়ায় আমার আসা সার্থক হয়েছে, তাছাড়া আমিও বিশ্ববন্দিত দুই মহাকবির দেশ ভারত থেকে এসেছি-

বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! তখনও জানি না, বিড়ম্বনার এ সবে সন্ধে!

একটু পরই বিরাট হলঘরে একসঙ্গে দেড়-দুশো সাহিত্যিক আর স্থানীয় বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে সে এক মহা মধ্যাহ্নভোজ । স্কুলের ক্লাসঘরের মতো বসবার বেঞ্চ ও হাইবেঞ্চ পেতে ঢালাও আহার-পানীয়ের আয়োজন । একে একমাত্র ভারতীয় অতিথি, তায় তাঁদের মহাকাব্য থেকে দুচার লাইন বলতে পেরেছি, অতএব কাছাকাছি বেঞ্চগুলো থেকে আমার উদ্দেশে টোস্ট করা তো ছিলই, হল-এর দূর দূর প্রান্ত থেকেও অনেকে পানীয় ভরা গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়িয়ে টোস্ট করতে লাগল । একজন কবি তো বেঞ্চে ঝুঁকে একটা কাগজে কী সব লিখে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে জর্জিয়ান ভাষায় আমাকেই শোনাতে লাগলেন । মানানা বলে দিল, ইনি একজন কবি, তোমার জন্যই এই কবিতাটা লিখেছেন, তোমাকে দিতে চান ।

কবিতা শেষ করে 'মহাকাব্যের দুই দেশের কবিতার জয় হোক, কবিদের জয় হোক, কবিরাই সরকার গড়ুক' বলতে বলতে সেই কবি 'গাউমারজোস' বলে এক হুঙ্কার ছেড়ে একটি লম্বা চুমুকে হাতের দেড় লিটার গ্লাসটি নিঃশেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন । গাউমারজোস কথাটার আক্ষরিক অর্থ 'আমাদের জয় হোক' ।

এরকম আরও অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা উচ্চাশা ভালোবাসার যেন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে । এখানে লিকিয়্যর পানের ছোট্ট গ্লাস দেয়নি, বড় গ্লাস সামান্য খালি হওয়া মাত্রই কেউ না কেউ আবার পুরো করে দেয় । যতই নানা কৌশলে গলায় কম সুরা ঢালি, আলাজানি মুকুজানি গুর্জানি শিনানদালির দেশে ওই চালাকির দ্বারা খুব একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ।

ফলে আতিথ্যে আপ্যায়নে বশীভূত হয়ে আমিও একসময় গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে বলে উঠি-সাদারি সোয়াগান আসেথি লামাজি শাখার্তবেলো! এটা আসলে জর্জিয়ানদের প্রিয় গান । কথাগুলোর মানে, জর্জিয়ার মতো এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!

সবাই খুব চমকে উঠে প্রথমে খুব একচোট হাততালি দিলেন, পর মুহূর্তেই অনেকে মিলে লাইনটি গেয়ে উঠলেন । তারপরই আমার উদ্দেশে 'টোস্ট' অর্থাৎ দেড় লিটার গ্লাস একচুমুকে শেষ ।

আমি আবার বললাম, এবার ইংরিজিতে, এই সুন্দর শাখার্তবেলো সোতা রুসতাভেলির, এই মহাকবি সোতা রুসতাভেলি শাখার্তবেলোর । মানানার অনুবাদ শেষ হওয়া মাত্র আরেক প্রস্থ হাততালির মধ্যেই আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম-সাদারি সোয়াগান আসেথি সুইডোবা (Mshvidoba)! সুইডোবা মানে শান্তি । গানের মুখস্থ লাইনটিতে 'সুন্দর শাখার্তবেলো'র জায়গায় চটজলদি সুইডোবা বসিয়ে আমি যে একটা নতুন কথা শোনাব তা বোধহয় কেউ ভাবেনি, মানানাও দেখলাম আমার দিকে চেয়ে আছে! সদ্য স্বরচিত এই পদটির মানে-এমন শান্তি আর কোথায় আছে?

হাততালি, আলিঙ্গন, 'টোস্ট'-এর যেন আর বিরাম নেই । কে বলবে, এই দেশ, এই ভাষা, এই মানুষজন দুসপ্তাহ আগেও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শাসকনিক্ষেপকারী লেখক

লেখকদের কথায় দুজন লেখকের নাম না বললেই নয় । একজনের নাম ছাবুয়া আমুরেদজিবি; লম্বা ছিপছিপে চেহারা, লতায়-পাতায় জর্জিয়ার রাজবংশের অর্থাৎ নীলরক্তবান পুরুষ, বয়স নাকি আশি! জর্জিয়ায় এসেই একদিন আলাপ হয়েছিল, তারপর গতকাল রাইটার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় অনেক কথা হল । তাঁর নামের কার্ডটি দুভাঁজ করা, সই করে তারিখ বসিয়ে আমাকে দিলেন । এক দিকে জর্জিয়ান, আরেক দিকে ইংরিজি । নাম-ঠিকানা ছাড়াও ভেতর পিঠে বাঁদিকে লেখা আছে-

শাসকনিক্ষেপকারী

সর্বকালের সব মানুষের

সবচেয়ে চড়া সুরের গায়ক

ডানদিকের পাতায় লেখা-

গৃহহীন কুকুরদের পৃষ্ঠপোষক

১ লিটার (মদ্য) পানে সমর্থ

'রেড বুক'-এর বাসিন্দা

শুনলাম দু-তিন বছর আগে, জার্মান সাহিত্যিক গ্রুন্টের গ্রাস যে বছর নোবেল পুরস্কার পান, সেবছর গ্রুন্টের গ্রাসের সঙ্গে ছাবুয়াও মনোনীত পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন। গলায় ক্যান্সার, কয়েক বছর আগে অপারেশন করা হয়েছে, বেশ জোর দিয়ে কথা বললেও মনে হয় ফিসফিস করে বলছেন, এদিকে দিনে এখনও দিব্যি দশ-পনেরোটা সিগারেট খান। ষোল বছর আত্মগোপন করে ছিলেন। ছাবুয়া একবার কলকাতায় এসেছিলেন, ১৯৯০-এ। পার্ক সার্কাসের দিকে কোথাও কলকাতাবাসী রুশ শিল্পী বেরিখের বাড়িতে উঠেছিলেন। আমরা কেউ খবর পাইনি শুনে বললেন, ইচ্ছে ছিল কলকাতার লেখকদের সঙ্গে আড্ডা হবে, তা তেমন কাউকে কোনও খবর দেওয়া যায়নি।

আমি আর মানানা কথা বলে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে চলে আসছি, ছাবুয়া আমাদের এগিয়ে দিতে সঙ্গে আসছেন, হঠাৎ সিঁড়ির মুখে আমাকে থামিয়ে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আনা কালান্দাজে। মানানা জানাল, আনা কালান্দাজে জর্জিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ২০০০ সালে নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনয়ন তালিকায় এঁর নাম উঠেছিল।

বিদেশে আমার এই এক যন্ত্রণা। সে দেশের বড় কবি বা গদ্যলেখক কী লিখছেন, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে তিনি এই জীবন জগতের কথা কী লিখেছেন, তাঁর ভাষা না জানায়-আমি কিছুই জানতে পারি না।

ৎবিলিসি ফিরে ভাজিকের কাছে জর্জিয়ার ম্যাপ খুলে বসে কাকেথি অঞ্চলের দ্রাক্ষাকুঞ্জবতী গ্রামগুলোর বিষয়ে নানা গুণগান শুনছি, হঠাৎ সে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, পূর্ব জর্জিয়ায় এই কাকেথি অঞ্চলে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম-এর অনেক সুযোগ রয়েছে। আর উত্তর জর্জিয়ায় গুদায়ুরি তো স্কিয়িংয়ের স্বর্গ। গুদায়ুরিতে আমি নিজেই এপর্যন্ত দেড় হাজার ছেলেমেয়েকে স্কিয়িং শিখিয়েছি। বছরে দুবার যাই, জানুয়ারি আর মার্চে। দুসপ্তাহ ওদের সঙ্গে থাকি। স্কি শেখানো হয়, আবার একসঙ্গে থাকতে থাকতে নানান গল্পও হয়। ছোটদের সঙ্গে গল্প করে তুমি ওদের অনেক কিছু শেখাতে পারবে, নিজেও অনেক কিছু শিখতে পারবে।

ম্যাপ গোটাতে গোটাতে ভাজিকের প্রশ্ন-'ভারত আর জর্জিয়ার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দুসপ্তাহের জন্য পরস্পরের দেশ বেড়িয়ে যেতে পারে না? স্কি শিখবে, রোমাঞ্চ ভ্রমণ

করবে, দেশ দেখবে-এমনটা করা যায় না?

কুতাইসির কথা

ৎবিলিসির অনেক পশ্চিমে, কিছুটা উত্তরে কুতাইসি । ইমেরেথি রিজিয়নের রাজধানী কুতাইসির রান্নার খুব নামডাক । দুপুরের সামান্য ফলাহারের পর সন্ধ্যায় দুঘণ্টার ডিনারেই তা টের পাওয়া গেল । শুধু ঘরে তৈরি টাটকা চিজের কথাই বলি, চাররকম চিজের চাররকম স্বাদ তো হবেই, কিন্তু একটির স্বাদ মনে হয় এ পৃথিবীর নয় । কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না । আমি চিজভক্ত নই, তেমন ভোজনরসিকও নই, তা সত্ত্বেও কুতাইসির রন্ধনশিল্প আমার রসনায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে । আহার-পানীয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল কুতাইসির ইতিহাস, ভাস্কর্য, সাহিত্য ।

আমার নিমন্ত্রণ ছিল জর্জিয়ার রাইটার্স ইউনিয়নের কুতাইসি রিজিওন্যাল ডিপার্টমেন্টে । ৎবিলিসি থেকে দুপুরে সেখানে পৌঁছতেই স্বাগত জানালেন কুতাইসি আঞ্চলিক বিভাগের চেয়ারম্যান, জর্জিয়ার প্রখ্যাত ও পুরস্কৃত লেখক তেইমুরাজ লাঞ্চাভা । একটু পরেই কুতাইসির দৈনিক পত্রিকার দুটি মেয়ে এসে আমার সাক্ষাৎকার নিলেন ।

দুপুরে রাইটার্স ইউনিয়নে ফলাহারের পর আমাদের কুতাইসি দর্শনে নিয়ে গেলেন তেইমুরাজ লাঞ্চাভা । মোমের তৈরি মূর্তির মিউজিয়ামে দেখা হল স্তালিন হিটলার নেপোলিয়নের সঙ্গে । বাগরাথির গুম্ভা ও দুর্গ আর গেলাতির গুম্ভা ও অ্যাকাডেমি দেখলাম কুতাইসির ইতিহাস শুনতে শুনতে ।

সেদিন ডিনারের পর কুতাইসির একটা পারিবারিক হোটেলে উঠলাম, আমাদের তিনজনের জন্য তিনটে ঘর আগে থেকেই বুক করা ছিল ।

ছোট হোটেল, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে চালান । শোবার বিছানা, ঘুমের আগে পড়বার বই ও পত্র-পত্রিকা, পরদিন ব্রেকফাস্টে কর্তাগিন্নির দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করা, সব কিছুতেই গার্হস্থ্য স্বাদ । সবই খুব সুন্দর ঘরোয়া ও পরিপাটি, শুধু বাথরুম শোবার ঘরের বাইরে, এই যা ।

এখান থেকে যাব কৃষ্ণসাগরের তীরে গ্রিগোলোটিতে । পথে সাতাপ্লিয়ায় দেখব ডাইনোসরের পায়ের ছাপ আর যাব প্রাগৈতিহাসিক গুহায় ।

কুতাইসি থেকে কৃষ্ণসাগরে যাবার কথায় পরে আসছি । তার আগে ৎবিলিসিতে আমার দুদিনের সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতের কথা বলি ।

ককেশাসের বন্দী

আজ অনেক দিন পর চমৎকার রোদ উঠেছে, আকাশ ঝকঝকে নীল । মানানা সকাল থেকেই বাড়ি নেই, সে গেছে তার ছেলে নোদারের কাকার অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে । নোদারের এই কাকা খুব ডাকসাঁইটে মাফিয়া, বাসস্থান রাশিয়ায়, কর্মস্থান উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, রাশিয়া, বেলারুশ ইত্যাদি দেশ-দেশান্তরে ছড়ানো বিরাট এলাকা জুড়ে । ওইসব দেশের বাঘাবাঘা মাফিয়ারা তার চেলা । তারা তাদের নেতার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মরদেহ তার জন্মভূমি জর্জিয়ায় কবরস্থ করতে বিশেষ বিমানে ৎবিলিসিতে নিয়ে এসেছে । সরকার তাদের গ্রেপ্তার করবে না এবং মস্কো থেকে তাদের বিনা বাধায় বিমানে উঠতে দেবে এই শর্তে এই মাফিয়াবাহিনী নাকি রুশ নিরাপত্তা-বাহিনীকে মস্কো বিমানবন্দরে বহু সহস্র ডলার উপঢৌকন দিয়েছে । একইভাবে জর্জিয়ান পুলিশ-গোয়েন্দাদের ঝুলিতে তারা নাকি প্রচুর ডলার ঢেলেছে, চুক্তি হয়েছে ৎবিলিসিতে তাদের নিরাপদে নামতে ও নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেওয়া হবে ।

মানানা আমাদের বলে গেছে, ফিউনারেল পর্ব দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, ফিরে এসে আজ লাঞ্চের জন্য সে একটা বিশেষ পদ রাঁধবে ।

দুপুর দুটো বেজে গেল, মানানার দেখা নেই । বেশ কয়েকদিন বাজার-টাজারও কেউ করেনি, ফলে আধশিশি মধু আর এক বাটি সেই জঞ্জালি ছাড়া ফ্রিজেও কিছু পাওয়া গেল না ।

ভাজিক কোনও কিছুতে হতাশ হয় না । সে প্রায়ই বলে, হতাশ হলে কি এখন জর্জিয়ায় থাকা যায়!

একদিন শুধু বলে ফেলেছিল, সোভিয়েত ভেঙে যাবার পর গত দশ বছরে জর্জিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে, আগামী দশ বছরে সবাইকে চমকে দেবার মতো ভালো কিছু ঘটবার সম্ভাবনাও নেই । তাই ভাবি, আমার এই বেলুনে চড়ে সিল্ক রোড অভিযানের স্বপ্ন যদি সফল না হয় তাহলে এই বয়সে আমি আর কী নিয়ে বাঁচব!

যাই হোক, ভাজিক আমাকে তৈরি হতে বলে নিজেও চট করে একটা জ্যাকেট চড়িয়ে নিল । রাস্তায় দেখলাম এক মহিলা দু হাতে দু গোছা ঘরে তৈরি রুটি নিয়ে চলেছে । বড় বড়, গোল, মোটা রুটি, একেবারে খোলা অবস্থায় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে কিছুটা

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে । রুটিগুলোর ঠিক মাঝখানে বড় মাপের গোলাকার ছিদ্র । ভাজিককে জিজ্ঞেস করে জানলাম এই ছিদ্রযুক্ত রুটি আসলে গ্রিক রুটি । বাড়িতে তৈরি করে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে বিক্রি করতে ।

পথের ধারেও নানারকম খাবার জিনিস বিক্রি হচ্ছে । তার মধ্যে তেঁতুলের মতো দেখতে, কিন্তু এক-দেড় হাত লম্বা, ভেতরে গাঁটে গাঁটে বাদাম-অনেকেই দুয়েক ছড়া কিনে নিয়ে খেতে খেতে চলেছে ।

আমরা শেষমেশ এক জোড়া কলা কিনলাম । দাম আমাদের ২৫ টাকার মতো ।

ভাজিক আমাকে একটা ওয়াইন তৈরির দোকানে নিয়ে গেল । নিছক দোকান না বলে জর্জিয়ান ওয়াইনের কুটিরশিল্প বললেই বোধহয় ঠিক হয় । আমাদের সিকিম বা দার্জিলিংয়ের মতো রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নেমে একটা অপরিসর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে বুঝলাম এটা দোকানও বটে, দোকানের মালকিনের বাসগৃহও বটে । টেবিলে বেশ কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট কাচের গ্লাস, দেওয়াল ঘেঁসে অনেকগুলো পিপে, বড় বড় প্লাস্টিকের জার, ভেতরে রেড বা হোয়াইট ওয়াইন ।

নোদার একদিন আমাকে বলেছিল, এইসব ঘরে তৈরি ওয়াইন খুব সস্তা । এক লারিতে এক লিটার । এখানে শুনলাম দুই-তিন লারিতে খুব ভালো ওয়াইন পাওয়া যায় ।

ভাজিক আমাকে একটা ছোট গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজে একটা নিল । দোকানের মধ্যবয়সী মালকিন হাতায় করে একেকটা পিপে থেকে মদ তুলে আমাদের গ্লাসে ঢেলে দেয় আর ভাজিক ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিয়ে, কখনও জিভে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মদটির বর্ণগন্ধস্বাদ যাচাই করে ।

আমাকেও মতামত দিতে হয়, আমি রায় দিই শুধু শুঁকে । কেননা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা গ্লাসগুলোর কিনারে দুয়েকটি মাছি ও গ্লাসের নিচে দু-দশ ফোঁটা পানাবশিষ্ট মদ আমার চোখে পড়েছিল । যত বার মদ চাখতে দিল আমিও ততবার গ্লাস বদলালাম । সব গ্লাসের তলদেশেই পূর্বসূরির পানাবশেষ!

ভাজিক শেষ পর্যন্ত দু বোতল রেড ওয়াইন কিনল । বোতল বলতে দুটো 'বোরজোনে' মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল বের করে ভেতরের ঘর থেকে মদ ভরে আনল । উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে বেশ বড় ঘর । বড় বড় জার, পিপে, খাবার টেবিল, শোবার খাট নিয়ে খুবই অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন ঘর । একপাশে মোমের আলোয় একটি কিশোরী বই পড়ছে, বোধহয় মালকিনের মেয়ে ।

রাস্তা থেকে দুটো গ্রিক রুটি ও দুটো জর্জিয়ান রুটি (গ্রিক রুটির মতোই, মাঝখানের শূন্যটি শুধু নেই), চিজ, সসেজ কিনে আমরা ফিরে এসে লাঞ্চের তোড়জোড় করতে শুরু করলাম । মানানা তখনও আসেনি ।

চমৎকার দুটি ওয়াইন গ্লাস বের করে ভাজিক ওয়াইন ঢেলে দিল । গ্লাস ও বোতল দুটিই ফেনায় ভরা । গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে 'গাউমারজোস' বলে ছোট্ট চুমুক দিয়ে দেখি মধুর মতো মিষ্টি ।

কিন্তু গাঁজলা দেখে আমি আর দ্বিতীয় চুমুক দিচ্ছি না লক্ষ্য করে ভাজিক ঠিক এই ধরনের মদের কী একটা নাম বলল । এ মদ নাকি এখনও কিছুটা কাঁচা, এর আঁধারবাসের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি । এরকম গাঁজলাসুদ্ধ মদ ভাজিকের নাকি খুব পছন্দ ।

দু-তিন গ্লাসের পর থেকেই ভাজিক বেলুনে সিল্ক রোড পাড়ির বিশদ পরিকল্পনা আমাকে বোঝাতে লাগল । জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের সহযোগিতা চেয়ে তারা যে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছে এবং সেটা পড়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর লেটার হেডে মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি যে নোট দিয়েছেন -সবই জর্জিয়ান ভাষা থেকে আমার জন্য ইংরিজিতে অনুবাদ করে কলকাতায় অবশ্যই পাঠাবে, কিছুতেই ভুল হবে না, একথাও শোনাল । আর আমাকে তো এই বেলুন অভিযানে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসতেই হবে, অন্তত ওসাকা-ৎবিলিসির শেষ অর্ধেক পথ ভাজিকের সঙ্গে এক বেলুনে থাকতেই হবে, এবিষয়ে বরাবরের মতো আজও সে আমার কথা আদায় না করে ছাড়ল না ।

রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা বাংলায় মোটামুটি এইরকম:

প্রিয় প্রেসিডেন্ট,

একথা আজ সবাই জানে যে ঐতিহাসিক সিল্ক রোড পুনরায় চালু করার ব্যাপারে আপনি খুবই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন । আপনিই লিখেছেন যে, 'বুদ্ধের পথ, ইহুদীর পথ, ইসলামের পথ ও যীশুখ্রিস্টের পথের মিলন ঘটিয়েছে এই রাস্তা । মানুষের সহ্যগুণের মিলন ঘটেছে এই পথে ।'

বিখ্যাত সিল্ক রোড সম্বন্ধে বহু ধারণাই রয়েছে । আমরাও তারই মধ্যে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিয়েছি । আমাদের প্রাথমিক কার্যকরী দল 'সিল্ক এয়ার রোড' ২০০০ সালের গোড়া থেকেই 'এয়ার বেলুনে চড়ে সিল্ক রোড পাড়ি' প্রকল্পে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ।

এই অভিযানের লক্ষ্য যন্ত্রচালিত বেলুনে করে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের ওপর দিয়ে জাপান থেকে স্পেনে পাড়ি দেওয়া ।

গ্রেট সিল্ক রোড অভিযান জাপানের ওসাকা থেকে শুরু হয়ে কোরিয়া, চিন, মধ্য এশিয়ার দেশগুলি পার হয়ে, কাস্পিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে গিয়ে প্রবেশ করবে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় ।

তারপর অভিযাত্রীরা কৃষ্ণসাগর পার করে ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর দিয়ে গিয়ে স্পেনে পৌঁছবে । অভিযানের শেষে অংশগ্রহণকারীরা ৎবিলিসিতে মিলিত হবেন বিশিষ্ট অতিথি ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে । এখানে তাঁদের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা হবে । বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনে পরিণত হবে এই আলোচনা ।

আমাদের দলে রয়েছেন সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি জগতের বিশেষজ্ঞরা ।

আমরা এই অভিযানে আপনার সহযোগিতা কামনা করি এবং অনুরোধ করব অন্যান্য যে দেশগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের অভিযান চলবে সেই দেশগুলিও যাতে আমাদের সাহায্য করে সে বিষয়েও আপনি আমাদের সহায়তা করেন । আমরা নিশ্চিত যে আপনার জগৎজোড়া খ্যাতি ও যশ অভিযানের পথে পড়া দেশগুলির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে ও জাপান থেকে স্পেন অবধি বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাবরণ তৈরি করবে, যা আমাদের যাত্রাপথকে সুগম করার পাশাপাশি আমাদের অভিযানকেও আরও পরিচিতি এনে দেবে ।

আমাদের অভিযান নিয়ে একটি তথ্যচিত্র ও বাস্তবধর্মী ফিচার ফিল্ম করার ইচ্ছা রয়েছে । তাছাড়া একটি ফটো অ্যালবাম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে যেখানে আমাদের যাত্রাপথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবি থাকবে ।

অভিযানের খরচ সামলাতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার দান, বিজ্ঞাপন, বিদেশি সদস্য, স্পনসরশিপ এবং অন্যান্য দানের ওপর নির্ভর করা হবে ।

যে সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে আমাদের অভিযান চলবে তাঁদের কাছ থেকে ভিসা, বায়ুপথে চলার সুরক্ষা এবং দেশভিত্তিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য আশা করি ।

আমরা মনে করি যে অভিযানভিত্তিক ফিল্ম, ফটো অ্যালবাম, টিভি রিপোর্ট আমাদের লাভজনক অবস্থায় এনে দেবে ।

আমরা আপনার সবরকম সাহায্যের আশা রাখি ।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন জর্জিয়ান জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি জাজা আবজিয়ানিদজে, জর্জিয়ান মাউন্টেন অ্যামেচার ইউনিয়নের সহ সভাপতি ভ্লাদিমির মালো-ভিচকো ও আরও কয়েকজন।

ভাজিকের ভালো নাম ভ্লাদিমির মালোভিচকো।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বিদেশমন্ত্রী, পর্যটন দপ্তরের প্রধান, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান, সংস্কৃতিমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীকে নোট দিয়েছেন-

এটা একটা ইন্টারেস্টিং উদ্যোগ। অনুগ্রহ করে এঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। দয়া করে সব খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনা করবেন।

এঁদের সিল্ক রোডের ধারণাটি বেশ ব্যাপক। প্রস্তাবিত এই বেলুন অভিযান সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের জন্য জর্জিয়ার ইংরিজি দৈনিক The Georgia Times থেকে ৮ ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখের একটি প্রতিবেদন এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল:

হট এয়ার বেলুনে চেপে গ্রেট সিল্ক রোড পাড়ি

জর্জিয়ার রাষ্ট্রপতি এডওয়ার্ড শেভারনাদজের আক্ষরিক উচ্চারণ অনুযায়ী 'গ্রেট সিল্ক রোড বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিস্টের পথের মিলন ঘটিয়েছে। এই পথ বিশ্বের মানুষের মিলন পথ।'

মুখ্যত জর্জিয়ার প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ৎবিলিসির 'গ্রেট সিল্ক রোড অ্যারোনটস অ্যাসোসিয়েশন' একটি অভিযানের আয়োজন করেছে। এই অভিযানের নাম 'হট এয়ার বেলুনে চড়ে সিল্ক রোড পাড়ি'।

এই অভিযান সংক্রান্ত কাজকর্ম জানুয়ারি ২০০০ সাল থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং আগস্ট ২০০১ সালে অভিযান শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত চলবে। দুটি আড়াআড়ি ভ্রমণপথ নির্ধারিত হয়েছে-একটি শুরু হবে ওসাকা (জাপান) থেকে এবং অন্যটি একই সময়ে শুরু হবে লন্ডন (ইংল্যান্ড) থেকে। এই পথ দুটি যথাক্রমে এশিয়া ও ইউরোপের ওপর দিয়ে যাবে।

এশিয়া অংশে উড়ানপথটি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান হয়ে শেষ হবে জর্জিয়ায় রাজধানী ৎবিলিসিতে।

ইউরোপীয় অংশে উড়ানপথ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেন, রাশিয়া, আর্মেনিয়া হয়ে

ৎবিলিসিতেই শেষ হবে।

যেহেতু বেলুনের সঙ্গে সঙ্গে সড়কপথেও একটি গাড়ি একই পথ ধরে চলবে তাই এটি গ্রেট সিল্ক রোডের ওপর একটি মোটর-অভিযান হিসেবেও ধরা যেতে পারে।

সংবাদসংস্থা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে এই ঘটনাবহুল অভিযান দেখানো হবে। ফটো অ্যালবাম ও ফিল্ম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। বেলুনের গায়ে থাকবে বিজ্ঞাপন যা এই অভিযানের দরুন আধখানা বিশ্বের মানুষ দেখতে পাবেন। এই অভিযানটিকে অনেকেই আখ্যা দিয়েছেন-'একবিংশ শতাব্দীর সুপার প্রজেক্ট' হিসেবে। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেন সেই কথাটিই প্রমাণিত হতে চলেছে।

এশিয়া ও ইউরোপের সন্ধিস্থলে ককেশাস অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত জর্জিয়ায় ৎবিলিসিতে এসে মিলবে দুটি উড়ানপথ।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহান্তে পালিত 'তিবিলিসোবা' উৎসবের সময়েই এখানে বেলুন অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। ছুটির দিনগুলিতে অভিযাত্রীরা দিনে ও রাতে বেলুন প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

শহরের ব্যক্তিবর্গ যাঁরা এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের এবং অভিযাত্রীদের মেমোরিয়াল মেডেল, স্যুভেনির এবং ডিপ্লোমা প্রদান করা হবে।

এই অভিযানের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে এই পথের কিছু পরিমার্জন করে নিয়মিত ভ্রমণপথ হিসেবেও গড়ে তোলা যেতে পারে-এশিয়া অংশে ভারত ও ইরান যুক্ত হতে পারে, ইউরোপীয় অংশে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রিস যুক্ত হতে পারে, এমনকী উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলিও যুক্ত হতে পারে।

যাঁরা এই ২০০১ সালের অভিযানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা গ্রেট সিল্ক রোড অ্যারোনটস অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবেদন করতে পারেন।

সেদিন অভিযানের জল্পনায় মশগুল ভাজিক চিজ-সসেজে আমার অনিচ্ছা দেখে তার নিজের ভাগের কলাটি আমাকে গছিয়ে নিজে চিজ সসেজ রুটি দিয়ে লাঞ্চ সারল। দুটি কলা ও আধখানা গ্রিক রুটিতে আমার মধ্যাহ্নভোজনও, আমার মতে, কিছু কম হল না। যদিও ভাজিক তা মানতে রাজি নয়।

একে তো এরকম একটা সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে কোথাও যাওয়া হল না, তার ওপর লাঞ্চের ওই অবস্থা। ভাজিক বোধহয় আমার দুর্দশায় কিছুটা বিব্রত হয়েই বলল, তুমি

রাশিয়ায় যাবে? ককেশাস পেরিয়ে চেচনিয়া দিয়ে আমি তোমাকে বাই রোড রাশিয়ায় নিতে যেতে পারি। পথের সৌন্দর্যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে!

কালই যেভাবে গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারে বলল তাতে মনে হল সে হয়তো নিছক কথার কথা বলছে না।

সত্যি বলতে কী, ককেশাস পর্বতমালা পার হয়ে যেতে হবে, একথা শোনামাত্র অজানা সেই পথের টানে আমার মনে যেন আনন্দের জোয়ার খেলে গেল। ছেলেবেলায় রুদ্ধশ্বাসে পড়া তলস্তয়ের 'ককেশাসের বন্দী'র পাহাড়-প্রান্তর যেন চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পেলাম।

সমস্যা হল আমার রাশিয়া যাবার ভিসা নেই। ভাজিকের বিশ্বাস, সীমান্তে তাদের চেনাজানা অফিসার ধরে দু-তিনদিনের সাময়িক একটা ভিসার ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।

এভাবে যাওয়াটা একটু বেশি দুঃসাহসিক হয়ে যাবে কি না, তাছাড়া আমার পক্ষে অনিশ্চিত ভিসার ভরসায় বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করা আদৌ উচিত হবে কি না এইসব ভেবে মন ক্রমশই দমে যেতে লাগল। আরেকটা কথা মনে পড়ায় আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলাম।

ঠিক হয়েছিল, জর্জিয়ার রাইটার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় দেশের রাষ্ট্রপতি শেভারনাদজে আসবেন, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন ইউনিয়নের সভাপতি, সভার দিন রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে খবর এল, চেচনিয়ার দুজন গেরিলা যোদ্ধা রুশ সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে জর্জিয়ায় ঢুকে পড়েছে, রাশিয়ান সরকার এতে জর্জিয়ার ওপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ, ফলে পলাতক গেরিলা যোদ্ধা দুজনকে গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে এক্ষুনি ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের এই সংকটে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ব্যস্ততার জন্য তিনি আসতে পারলেন না।

ককেশাস পেরিয়েই সেই চেচনিয়া! সেখানে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলছে, খবরের কাগজে তার বহু বিবরণ পড়েছি। বেড়াবার নেশায় সেই দুর্যোগের মধ্যে গিয়ে পড়া কি ঠিক হবে?

মানানা এল সন্ধের মুখে। সঙ্গে নোদার। দুজনেরই মলিন, ক্লান্ত, উপোসচিহ্নিত মুখ। কী ব্যাপার? এত দেরিই বা হল কেন?

নোদারের কথা থেকে জানা গেল, জর্জিয়ান পুলিশ চুক্তিমতো ডলার পেয়েও মাফিয়া নেতার মরদেহ কবরস্থ করার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে নানাভাবে বাধা দিয়েছে, সারাদিন ধরেই নানান বিধিনিষেধ জারি করেছে, ফলে পুরো কাজ শেষ হতে এত বিলম্ব। সারাদিন খাওয়া হয়নি বলে নয়, নোদারের রাগ জর্জিয়ানদের আবহমানকালের রীতি অনুযায়ী

অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান করতে বাধা দেওয়ায় । ক্রোধ আর ক্ষোভ মিশিয়েই নোদার বলল, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন, আচার অনুষ্ঠান থাকে, তাতে বাধা দেওয়ার কোনও অধিকারই কারও থাকা উচিত নয় ।

নোদার আজ আর থামতে চায় না । ভাজিকের দেওয়া দুপুরের কেনা ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলল, আমার কাকা পাঁচ দেশের সরকারের কাছে মাফিয়া ডন হতে পারে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে কত দেশের কত লোক আজ কাঁদছে! তাঁর দলের লোকদের তো চোখে জল নিয়েই পুলিশের নতুন দর কষাকষি সামলাতে হল ।

বিদেশে বেড়াতে এসে সেদেশের এত দূর পরিচয় পাব ভাবিনি ।

নোদারের জাত্যাভিমান একটু বেশিই । প্রথম রাতেই আমার শোবার ঘরে দেওয়ালের ঢাল-তলোয়ার প্রসঙ্গে জর্জিয়ানদের বীরত্ব নিয়ে তার গর্ব আমার মনে আছে । জাতীয়তা নিয়ে এই গর্ব বা গৌরবের জন্যই হয়তো সে তার ৎবিলিসির প্রাচীন বনেদি এলাকায় তার পিতৃপুরুষের প্রায়-জীর্ণ বাড়ি ছেড়ে মায়ের নতুন বাড়িতে এসে থাকতে চায় না । তার মায়ের নতুন স্বামীও তো ইউক্রেনিয়ান!

ৎবিলিসিতে শিল্পসন্ধ্যা

পরদিন আমার জন্য একটা বড় চমক অপেক্ষা করে ছিল ।

শহরের এক ধারে, ভিড় কোলাহল ছাড়িয়ে মানানা আমাকে একটা বিশাল উদ্যানের রাজকীয় গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দারোয়ানকে কিছু বলবার আগেই দুজন যুবক ভেতর থেকে প্রায় দৌড়ে এসে দারোয়ানকে দরজা খুলে দিতে বলল । তারা মানানাকে ও আমাকে রীতিমতো অভ্যর্থনা করে উদ্যান-মধ্যবর্তী এক বিরাট অট্টালিকার ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিশাল সুসজ্জিত একটি বসবার ঘরে বসাল । একটু পরেই সে ঘরে এলেন এক দীর্ঘদেহী সুদর্শন বৃদ্ধ, জর্জিয়ার সমকালীন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মেরাব বের্দজেনিশভিলি । ৎবিলিসি শহরে পার্কে স্কোয়্যারে যত বিশিষ্ট ভাস্কর্য দেখা যায় তার অধিকাংশই এই শিল্পীর গড়া । সেদিক থেকে পুরো শহরটাই তাঁর নিজস্ব গ্যালারি । তাঁর সব সৃষ্টির স্থায়ী প্রদর্শনী অবশ্য তাঁর বাড়িতেই । একটি বিশাল কক্ষ ছাড়াও বাড়ির অন্যান্য জায়গায়ও মূর্তিগুলি সাজানো আছে । শুধু এই নয়, বাড়ির বাইরে খোলা আকাশের নিচে উদ্যানের নানা অংশে হঠাৎ হঠাৎ একেকটি মূর্তি । বিখ্যাত এই ভাস্কর, মানানার পিতৃবন্ধু, পার্কে মানানার বাবার মূর্তি এঁরই করা, ঘরে ঢুকেই মানানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাল চুম্বন করলেন । তারপর আমার সঙ্গেও আলিঙ্গন সেরে আমরা পাশাপাশি বসে মানানার দক্ষ দোভাষিত্বে নানা বিষয়ে

বাক্যালাপ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে এক যুবক এসে জর্জিয়ান ব্র্যান্ডি আর নানারকম ফলের একটা সুদৃশ্য ঝুড়ি দিয়ে গেছে।

আগে ঠিক ছিল আমরা বেলাবেলি আসব, মানানাও সেইমতো ভাস্করকে বলে রেখেছিল, কিন্তু আমার দোষেই আমাদের এখানে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। আমি আজ দকুবারি নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এই দকুবারি বা দকোয়ারি বা কুরা নদী জর্জিয়ানদের খুব প্রিয় নদী। আমি অনেক তরুণ ও তরুণীকে তাদের প্রিয় তিনটি জিনিসের নাম জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি-মহাকবি সোতা রুসতাভেলি, উনিশ শতকের চিত্রশিল্পী ফিরোসমানি আর এই দকুবারি।

দেরিতে আসায় তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে আসছে। সমস্যা হল, ফ্ল্যাশ দিয়ে ভাস্কর্যের ছবি তোলা সম্পূর্ণ অনুচিত। সেইজন্যই সংক্ষেপে আলোচনাপর্ব সেরে আমরা বাড়ির ভেতরে ও উদ্যানে ভাস্কর্যগুলি দেখতে লাগলাম। ভেতরের মূর্তিগুলির ছবি তোলবার সময় নিজের দোষে নিরুপায় হয়ে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করতেই হল, সেইসব আশ্চর্য মূর্তির অন্যায় ছায়াকে ছবিতে ডেকে আনছি জেনেও।

আমি কখনও এত বড় মাপের ভাস্করের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্ম এভাবে দেখিনি, মন উপভোগের আনন্দে টইটম্বুর, চলে আসবার সময় শিল্পীর সহৃদয় সৌজন্যও আমাকে পিছু টানতে লাগল।

নির্জন শহরপ্রান্ত ছেড়ে ৎবিলিসির পুরনো এলাকায় এলাম এক তরুণ ভাস্করের প্রদর্শনী দেখতে। ২৮ বছর বয়সী এই জর্জিয়ান ভাস্করের কাজে আমাদের বস্তারের ও বাঁকুড়ার ঢোকরা লোকশিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখে আমার ভারি ভালো লাগল। সজ্ঞান প্রভাব যদি নাও হয়, আমাদের ঢোকরা শিল্পের সঙ্গে তাঁর এই মিশ্রধাতুর ঢালাই কাজের খুবই মিল। আমার তো প্রিয় ভাস্কর ঢোকরা লোকশিল্পরীতির আধুনিক কবি বা কারিগর মীরা মুখোপাধ্যায়ের কাজগুলির কথা খুব মনে পড়ছিল। জর্জিয়ান এই ভাস্করের নাম ইরাক্লি সুলাদজে।

ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম পুরনো ৎবিলিসির ‘খুদে গ্যালারি’তে। সেখানে ছোট পরিসরে নতুন শিল্পীদের একত্র বা একক প্রদর্শনী হয়। আজ একটি তরুণী শিল্পীর প্রদর্শনী চলছে। আমরা ছবিও দেখলাম, নতুন প্রজন্মের জর্জিয়ান শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর চিত্র-ভাবনাও কিছুটা শুনলাম।

দুপুরে নদী, গোধূলিতে ভাস্কর্য। সন্ধ্যারাতে চিত্রপ্রদর্শনী দেখে আমরা চলে এলাম ৎবিলিসি সেন্ট্রাল ফিলারমোনিয়ায়। সেখানেও চার রাস্তার মোড়ে বের্দজেনিশভিলির বিশাল

ভাস্কর্য-ম্যুজে। ফিলারমোনিয়ার অলিন্দে দেখা হল ম্যানেজার সোক্রাট সালুকভাদজের সঙ্গে। শুনে অবাক হলাম, আমি প্রথম যেদিন এই ফিলারমোনিয়ায় জর্জিয়ান লোকনৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলাম, সেদিনের পর থেকে জর্জিয়ার ফার্মাকোলজির ইতিহাসের গবেষক এই ম্যানেজার মশাই ওষুধ আবিষ্কারে জর্জিয়ার কৃতিত্ব ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে তাঁর গবেষণার খেরোর খাতা নিয়ে রোজই এই রাস্তামুখী অলিন্দে আমার অপেক্ষায় পায়চারি করেন। তেত্রিশশো বছর আগে জর্জিয়ায় ওষধি লতাগুল্ম চাষের তথ্যপ্রমাণও নাকি তাঁর হাতের মুঠোয়।

সোক্রাট সালুকভাদজে তাঁর গবেষণার সারসংক্ষেপ (তাও ১৫-২০ পাতা) আমার হাতে তুলে দিয়ে আমার এক হাত তাঁর দুহাতে ধরে অনুরোধ জানালেন ওষুধের ইতিহাসে জর্জিয়ার গৌরবান্বিত প্রাচীনতার কথা আমি যেন 'ভ্রমণ' পত্রিকায় লিখি। মানানা বাংলা 'ভ্রমণ'-এর সঙ্গে একটা ইংরিজি 'ভ্রমণ'ও সোক্রাটকে আগেই দেখিয়েছিল।

সোক্রাটকে কথা না দিয়ে চলে আসা চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা হত। সোক্রাট আমার হাত আর ছাড়ে না। তাঁর দ্বিতীয় অনুরোধ-ভারতে ফিরে যাবার আগে আবার একদিন যেন ফিলারমোনিয়ায় জর্জিয়ান লোকনৃত্যগীত দেখে যাই। প্রত্যেক কথায় তাঁর প্রবল জাত্যানুরাগ-'এমন প্রাণোচ্ছল নাচ গান বাজনা তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না। রাশিয়ায় তো নয়ই। অবশ্য ভারতের লোকনৃত্যগীত আমি দেখিনি।'

জর্জিয়ান লোকনৃত্যগীত সত্যিই অপরূপ, এখনও আমার চোখ-কান-মনে লেগে আছে।

ভাজিক আজ আমাদের ডিনার খাওয়াবে, সে সকাল থেকেই তার বেলুনে সিল্ক রোড অভিযানের 'ভেরি মেনি ওয়ার্কস' নিয়ে বেরিয়েছে। কথা আছে, আমরা সেই রেস্তোরাঁ সরণিতে একটা নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় যাব, সেখানেই সে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে।

আমরা যখন পৌঁছলাম, ভাজিকের তখন কয়েক বোতল শেষ, বোধহয় হিসাব রাখতে টেবিলে খালি বোতল রেখে দিয়েছে। মানানা তাদের ভারতীয় অতিথিকে নিয়ে আসবে বলে রেস্তোরাঁর মালিক সবচেয়ে ভালো কোণটিতে একটি টেবিল পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছেন।

আমি আর মানানা পৌঁছনোমাত্র মালিক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে চেয়ার টেনে আমাকে ও মানানাকে বসালেন। মালিক ভদ্রলোক ভাজিকের বহুদিনের বন্ধু।

ভাজিকের একটা গুণ দেখেছি, যতই মদ্যপান করুক, সে কখনও বেহেড মাতাল হয় না।

বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত পানাহার, গল্প, দুই দেশ নিয়ে নানান আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে ভাজিক-মানানার দ্বৈতসংগীত শুরু হল। তাদের অনেক অনুরোধেও আমি তাদের সুরে সুর মেলাতে পারলাম না, কেননা আমার কানে সুরের প্রবল তৃষ্ণা থাকলেও গলায় শুধুই অসুর।

নিজের ঘরে ঢুকে যখন বই পড়বার চেষ্টা করছি তখনও ভাজিক-মানানার দ্বৈতসংগীত, যখন শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি তখনও তাদের সুরের আগুন বাড়িময় খেলে বেড়াচ্ছে।

৭

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

পশ্চিম জর্জিয়ায় ইমেরেথি রিজিয়নের রাজধানী কুতাইসি থেকে চলেছি কৃষ্ণসাগরের তীরে, গ্রিগোলেথিতে। পথে সাতাপ্লিয়ার জঙ্গলে জীবনে প্রথম ডাইনোসরের পায়ের ছাপ দেখলাম। যতই দেখি, বিস্ময় যেন আর শেষ হয় না। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বিরাটাকার এই প্রাণী কত লক্ষ বছর আগে ঠিক এইখানে, এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, জঙ্গলও তখন কী বিশাল আর কী গভীর ছিল ভেবে কূল-কিনারা পাই না। কেমন ছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী?

জঙ্গলের আরও ভেতরে লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন গুহা। অন্ধ্রপ্রদেশের বোরাগুহার মতো, তবে-তার চেয়ে অনেক বড়। টিমটিমে বৈদ্যুতিক আলোয়, বিরাট বিরাট অদ্ভুত সব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য, অনেক জায়গায় রীতিমতো জলের ধারার ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

ঘণ্টাখানেক পর গুহা থেকে উঠে এসে দেখি সামনেই একটা পুলিশের গাড়ি, গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন পুলিশ অফিসার। যেন আমাদেরই অপেক্ষায়। ভঙ্গি দেখে মনে হল গ্রেপ্তার করবে না কি?

আজ সাপ্তাহিক বন্ধের দিন গুহায় ঢোকা নিষেধ। প্রহরীর কাছে বাধা পেয়ে আমরা ফিরেই যাচ্ছিলাম, পথে দেখা হয়ে গেল গুহা রক্ষণাবেক্ষণ অফিসেরই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁরই হস্তক্ষেপে নিয়ম ভেঙে আমাদের গুহা দর্শনের অনুমতি দেওয়া হল, বিদ্যুৎ সংকট সত্ত্বেও গুহার আলোও জ্বালানো হল, সবই সাহিত্যিকের প্রতি জর্জিয়ানদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রকাশ, অত বড় লেখক নোদার দুমবাদজের মেয়ে স্বয়ং এসেছেন, সঙ্গে আবার ভারতীয় অতিথি, গুহা না দেখেই তাঁরা ফিরে যাবেন?

এপর্যন্ত ভালোই ছিল, কিন্তু নিষিদ্ধ গুহাপ্রবেশ হয়তো পুলিশের মনঃপূত নয়, যে-কোনও ভাবেই হোক তাঁরা খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছেন! যেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের পায়ের ছাপ ছুঁয়ে দেখা যায়, আদিম কালের গুহায় কোটি কোটি বছরের প্রাচীন প্রাকৃতিক ভাস্কর্য চাক্ষুষ করে এলাম, মনে এখনও তার রেশ কাটেনি, সেখানে হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব! মানানাও মনে হয় একটু দমে গেছে ।

পুলিশ অফিসার দুজন দ্রুত এগিয়ে এসে আমাকে সহাস্য স্বাগত জানালেন । আমাকে তাঁরা টিভিতে দেখেছেন, কে একজন জর্জিয়ান সাংবাদিক আমাকে তাঁদের দেশ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, মানানাই কি সেই জর্জিয়ান সাংবাদিক?

মানানা পুলিশের কথাগুলো ইংরিজি করতে করতেই হেসে বলল, 'তোমাকে দেখেই চিনেছে, আমিও তোমার সব টিভি প্রোগ্রামেই ছিলাম, আমাকে চিনতে পারল না ।'

'তার কারণ একটাই । রোজই টিভিতে অসংখ্য জর্জিয়ান মহিলাকে দেখা যায়, আর ভারতীয় বলতে শুধুই আমি । মনে তো থাকবেই ।'

যাইহোক, পুলিশের আগমনের কারণ জেনে আমি তো হতভম্ব, এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি এখানে এসেছি শুনেই চলে এসেছেন আমাকে দেখতে!

কৃষ্ণসাগরের তীরে

সাতাপ্লিয়া থেকে দুপুরে বেরিয়ে সন্ধেবেলা জনমানবহীন একটা রাস্তায় ড্রাইভার জানাল, গ্রিগোলেথির রাস্তা সে হারিয়ে ফেলেছে ।

এরপর কয়েক ঘণ্টা শুধু ভয়ে ভাবনায় দিশেহারা অবস্থা । একবার একটা রাস্তায় পঞ্চাশ-একশো কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তা না পেয়ে আবার ফিরে এসে অন্য রাস্তা ধরা, সেখানেও চেনা রাস্তার সন্ধান মেলে না, আবার অন্য রাস্তা । কাছাকাছি মানুষের ঘরবাড়িও নেই । তা সত্বেও মাঝেমাঝেই ড্রাইভার গাড়ির হর্ন বাজিয়ে, মুখের সামনে দুহাতের তালু দিয়ে ঘিরে গলার জোরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে যাচ্ছে । আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম । এসব জায়গায় আজকাল নাকি দেশের প্রবল অর্থসংকটের ফলে খুব ডাকাতিও হচ্ছে । মানানা বোধহয় উদ্বেগ আর সহ্য করতে পারছিল না, তার মোবাইল এখানে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দেখেও মাঝে মাঝেই সে নানারকম নম্বর ডায়াল করে যাচ্ছে ।

শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতে কৃষ্ণসাগরের তীরে পৌঁছে খুবই হতাশ হলাম । সাগরসৈকত ও তার ধারের রিসর্ট এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে । এখন অফ সিজন, তার ওপর এনার্জি ক্রাইসিস, জেনারেটর একেবারেই চালানো হয় না । মানানা আর ড্রাইভার অনেক চেষ্টায়

রিসর্টের অফিসের দুজন মহিলা কর্মচারীকে জাগিয়ে আধঘণ্টার জন্য জেনারেটর চালাবার ব্যবস্থা করল । গাছপালার মধ্যে তাঁবুর আকারে একটু দূরে দূরে পর পর বেশ কয়েকটা কাঠের ঘর । তারই একটা ঘর খুলে ড্রাইভার আমার স্যুটকেসটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল । মানানা আরেকটা ঘরে বাক্স রেখে এসে আমাকে পথকষ্টের জন্য সহানুভূতি ও রাতের জন্য ঘরে শুয়েই কৃষ্ণসাগরের সংগীত শোনার নিশ্চয়তা জানিয়ে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ।

শোবার জন্য তৈরি হতে হতেই জেনারেটরের মেয়াদ শেষ । অন্ধকারে কাঠের দেওয়াল থেকে মাথা বাঁচাতে শুধু হাত দিয়ে দিয়ে দেওয়ালের ত্রিভুজ সামলে কোনক্রমে শয্যাগ্রহণ করা গেল ।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে কোথাও কারও সাড়া শব্দ না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণসাগরের বালুকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াই । হাওয়ায় গায়ের শার্ট, কাঁধের ক্যামেরা উড়িয়ে নিয়ে যাবে মনে হল ।

প্রায় টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম সুপসা নদীর মোহনা দেখতে । এখানে আসবার পথেই গুরিয়ায় পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সুপসা নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বেশ অনেকটা সময়, তখনই শুনে এসেছি সুপসা গ্রিগোলেথিতে গিয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে ।

দেখে মন খারাপ হয়ে গেল । এই সেই আমাদের বাল্যের ভূগোলবই-বিখ্যাত কৃষ্ণসাগর, এই নাকি একটা নদীর মোহনা!

এখানেই দেখা হল মানানা আর তার ড্রাইভারের সঙ্গে । শুনলাম, আমি দেরি করে এসেছি বলে সমুদ্রের ভোরের সৌন্দর্য দেখা হল না । যদিও কৃষ্ণসাগরের সেরা সৈকতও নাকি এটা নয় । তবে আমরা এত কষ্ট করে এখানে এলাম কেন? মানানার অকপট উত্তর-এখানে আমার একটা নিজস্ব রিসর্ট আছে, সারি সারি কাঠের তাঁবুর মতো যেগুলো দেখলে, তারই একটা । চলো তোমাকে দেখাব ।

মানানা কাল রাতে সেখানেই ছিল । দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল । দেড়তলা কাঠের কুঁড়ে । মানানা বলল, এটা আমার নিজের কেনা না । বছর দুয়েক আগে বাবার ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে বাবার লেখার একজন ভক্ত, তিনিই এইসব কটেজের মালিক, আমাকে এইটা দান করেছেন । এমনিতে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত, সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটানোর সামর্থ কই?

গুরিয়ার আরাচা পাহাড়ের জঙ্গল আর নদী ছাড়াও সেখানকার সরল সুন্দর সাধারণ মানুষজন আমার মনকে বড্ড স্পর্শ করেছিল । ওই পাহাড়িয়া গ্রামের ছোটদের মুখগুলো

তো আমার মনে আঁকা হয়ে আছে। আহারে, আর কখনও ওদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না! সেখানে জঙ্গলের মধ্যে, দূর সমুদ্রের একলা দ্বীপের মতো একটা প্রাচীন গির্জারও যেন হৃদয় আছে। নির্জন জঙ্গলে এ যেন কাঠ-পাথরের তৈরি একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর।

গুরিয়ায় বহু প্রাচীন ও বিখ্যাত একটি স্কুলের এক ইংরিজি জানা অল্পবয়সী শিক্ষক আমাকে গুরিয়ার কথা শোনাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে ছিলেন ওই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক, গুরিয়ার ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে, কিন্তু ইংরিজিটা ভালো জানেন না বলে ইংরিজি জানা সহশিক্ষকের মাধ্যমে আমাকে গুরিয়ার পাঠ দিচ্ছিলেন। প্রাচীন গির্জাটি নাকি ষষ্ঠ শতাব্দীর। এটি গুরিয়ার বিখ্যাত সেমকস্মোদি চার্চ।

গুরিয়ার তোরণে বাবার কবিতার উদ্ধৃতি দেখে মানানা আমাকে তার ইংরিজি শোনাল, বাংলা করলে এইরকম হবে-"আমার ছোট্ট গুরিয়া দেবতাদের জন্মভূমি।"

আরেকটা তোরণে আনা কালান্দাজের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি খোদাই করা। আমাদের বাংলার গ্রামে শহরে এরকম করা যায় না?

কৃষ্ণসাগরের উড়ন্ত চুমু

বিদায় নেবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, মনের মধ্যে ততই যেন ব্যথা বাজে। কৃষ্ণসাগরের শ্রেষ্ঠ সৈকতভূমি বাতুমি দেখা হল না, তা নিয়ে আর আপসোস নেই। ককেশাস পর্বতমালার শ্বাসরোধী সৌন্দর্যের বাসভূমি গুদায়ুরিতে যাওয়া হল না, তা নিয়েও কোনও দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু, ছেড়ে যাবার দিন আসন্ন।

কৃষ্ণসাগর থেকে সেদিন সকালেই ফেরার পথে অদ্ভুত একখানা ব্রেকফাস্ট হল। রাস্তার ধারে পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে সাগরের মাছ ধরে এনে বিক্রি করছে মেয়েরা, আমাদের দেখেই হই হই করে এগিয়ে এল, সবাই মানানাকে চেনে। সঙ্গের এই পরদেশী অতিথিটি ভারতীয় জেনে এবার তাদের আনন্দ আর ধরে না। একটি মেয়ে বার কতক চেষ্টা করে আমার নামের উচ্চারণও রপ্ত করে ফেলল। ঠিক হল এখান থেকে মাছ কিনে রাস্তার উল্টোদিকের ছোট্ট খাওয়ার দোকান থেকে সেই মাছ ভাজিয়ে সেখানে বসেই সকালের জলখাবার সারা হবে। কয়েকটা মাছ মানানা বাছল, ওরাও কয়েকটা বেছে দিল। ছোট ছোট ট্রাউট, এক ধরনের পমফ্রেট বা ওই জাতীয় মাছ, আরও দুয়েকটা কী যেন। সেগুলো কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে ওরাই দোকানে পৌঁছে দিল।

দোকান চালায় দুই প্রৌঢ়া, ভারি যত্ন করে প্লেটে স্যালাদ, চিজ, সস, বেতের টুকরিতে জর্জিয়ার রুটি, পাউরুটি সাজিয়ে টেবিলে রেখে গেল। তারপর একে একে এল আস্ত

আস্ত ট্রাউট মাছ ভাজা, পমফ্রেট ভাজা, আরও দুয়েকটা কুচো মাছ । তিনজনের পক্ষে খুবই বেশি । যাইহোক, কফি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ হল ।

মানানা বাড়ির জন্যও আরও কিছু মাছ কিনে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, তার পিছনে আমি, পিছন থেকে হঠাৎ একটা মেয়ে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তার এক হাতে একটা মাছ, আরেক হাতে আমার উদ্দেশে তার চুমু উড়িয়ে দিল, মুখের হাসির মধ্যে মনের প্রীতি ছড়ানো ।

এপথেই এযাত্রায় খুব ভালো একজন বন্ধু পেয়েছিলাম, ভদ্রলোকের কার্ড হারিয়ে ফেলেছি, নামও লিখে রাখা হয়নি ভেবে এখন খারাপ লাগে ।

বোধহয় আধঘণ্টা পর পর মানানাকে ফোন করে জানতে চাইছেন আমরা এখন ঠিক কোন পর্যন্ত এসেছি, সেইমতো হিসাব করে ভদ্রলোক ঠিক সময়ে হাসুরিতে চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন যাতে সেখান থেকে ৎরোমি-তে সপ্তম শতাব্দীর একটা বিখ্যাত গির্জায় যেতে আমাদের রাস্তা খোঁজাখুঁজি করতে না হয় । ভদ্রলোক হাসুরির একটি সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক, আজ মধ্যাহ্নভোজে আমরা তাঁর অতিথি ।

চার রাস্তার মোড়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল মানানা । ভদ্রলোক আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সেই প্রাচীন গির্জা, একদা সমৃদ্ধ ৎরোমি ও হাসুরির নানা কথা শোনাতে শোনাতে গাড়ি চালাচ্ছেন । পিছনে মানানার গাড়ি ।

গির্জায় পৌঁছে দেখা গেল গির্জা বন্ধ । অনেকটা এলাকা নিয়ে বেশ বড় গির্জা । বন্ধ দরজার সামনে একটা পাগলী গান গাইছিল, আমাদের দেখে এগিয়ে এসে হাসিতে ভেঙে পড়ল । কিছুতেই তার হাসি আর থামে না । তার মধ্যেই সে কোনওক্রমে যা জানাল, সম্পাদকমশাইয়ের ইংরিজি অনুবাদে তার সারসংক্ষেপ এই যে, আজ অন্য কী একটা গ্রামের গির্জায় নেমন্তন্ন, সেখানে বাদ্যিবাজনা পান-ভোজনের ঢালাও আয়োজন, এখানকার সবাই তাই এই গির্জা বন্ধ করে সেখানে গেছে ।

গাড়ি ঘুরিয়ে শহরের একটা চমৎকার রেস্তোরাঁয় এলাম । ভেতরে ঢুকে আরও দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল । এঁরাও এই পত্রিকার সাংবাদিক । দলের মধ্যে মহিলা বলতে একা মানানা । মোট ছজনের জন্য বিরাট টেবিল সাজানো হয়েছে । ড্রাইভার সহ আমরা তিনজন, প্রধান সম্পাদক সদলে তিনজন ।

নানারকম ভোজ্য-পানীয় আসতে লাগল । দেখলাম কাউকে কিছু আদেশ করতে হচ্ছে না, একের পর এক সব আপনা থেকেই টেবিলে পরিবেশন করে যাচ্ছে । তার মানে

আগে থেকে সব ঠিক করা আছে।

গলায় গিটার ঝুলিয়ে একজন এসে গানও শোনাতে লাগল। একটু পরে প্রধান সম্পাদক গিটারটি চেয়ে নিয়ে নিজেই একটা গান ধরলেন, ভদ্রলোক অতি সুদর্শন, প্রথম আলাপেই তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা বোঝা যায়, কী খাচ্ছি, কী খাচ্ছি না সে বিষয়ে তাঁর সযত্ন নজর দেখেও আমি তো অবাক। তার ওপর তাঁর ভরাট সুরেলা গলার গান শুনে ভারি আনন্দ হল-ভ্রমণপথে এমন বন্ধুও তবে মেলে! এমন আকস্মিক!

এরপর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনায় গাল-গল্পে একেবারে জমে গেলাম। মধ্যাহ্নভোজন গড়িয়ে গেল নৈশভোজের দিকে। অথবা এটাও হয়তো আদপে নৈশভোজনেরই নিমন্ত্রণ! জর্জিয়ায় এর আগেও যেমন হয়েছে।

বন্ধু হঠাৎ বললেন, মানানা, অমরেন্দ্রর সঙ্গে আগে কেন আমার আলাপ করাওনি? আজ তোমরা যেতে পারবে না।

মানানা তাঁর অনেক দিনের বন্ধু।

এরপর মাতৃভাষায় মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে প্রায় দু-তিন মিনিট কথা বলে আমাকে বললেন, আমার স্ত্রী তোমার জন্য আমাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা সাজিয়ে রাখছেন-।

আজ রাতেই ৎবিলিসি পৌঁছতে হবে, কাল বিকেলে জর্জিয়া থেকে বিদায়, একথা আমি ও মানানা প্রায় একসঙ্গে জানাতে আমার বন্ধুর চটজলদি মীমাংসা-কাল আমি নিজে তোমাদের সোজা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। ৎবিলিসি এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটারের বেশি নয়।

আমার বইপত্র? জামাকাপড়?

মানানাদের বাড়ি হয়ে যাব, পনেরো মিনিটে সব গুছিয়ে নেবে। আজ রাতে, চলো, আমরা জর্জিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের স্বপ্নের কথা বলব। ইংরিজিতেও তিনি জর্জিয়ার বদলে 'শাখার্ৎবেলো' বললেন।

এর কী উত্তর? আমি তাঁর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলি, এত কষ্ট, এত দারিদ্রের মধ্যে কতদিন তোমাদের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে জানি না!

দারিদ্রের আলোচনা আজ করব না। এ দেশের দারিদ্রের চেয়েও বড় শত্রু কী জানো? আমাদের দুর্নীতি! প্রশাসনের সর্বত্র লাগামছাড়া দুর্নীতি। চলো, আজ আমরা ডেভিডের কথা বলব, কুইন ঠামারের গান গাইব, সোতা রুসতাভেলির কবিতা পড়ব। আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

কুইন ঠামারকে জর্জিয়ার মানুষ বলে কিং ঠামার। দ্বাদশ শতাব্দীর রানি ঠামারের শাসনে জর্জিয়া হয়ে উঠেছিল এক অতি সমৃদ্ধ দেশ। জর্জিয়ার মহাকবি সোতা রুসতাভেলিও ছিলেন এই সময়কার। মহাকবির সঙ্গে মহারানির গভীর বন্ধুত্বও এক গৌরবজনক ইতিহাস।

ৎবিলিসি পৌঁছলাম মধ্যরাতে।

ভাজিক জেগে ছিল, দরজা খুলে দিয়েই বলল, শুতে যাবার আগে তোমার এয়ার টিকিটটা আমাকে দিয়ে যেও, কাল সকালেই আমি তারিখ বদলিয়ে আনব। নভেম্বর তিন বা চার তারিখে গেলে চলবে না?

কী ব্যাপার? না দুদিন পরই ৎবিলিসি উৎসব-তিবিলিসোবা। তাছাড়া জর্জিয়া এসে গুদায়ুরি আর বাতুমি না দেখে ফিরে যাওয়া-সে শুধু মানানাই ভাবতে পারে!

মানানা তার বিড়ালের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, ভাজিকের খোঁচা বোধহয় শুনতে পায়নি, একবার মুখ তুলে শুধু বলল, কাল তোমার জন্য 'উখা' করব। উখা কী জানো? বিখ্যাত রাশিয়ান স্যুপ। এটা আসলে জেলেদের স্যুপ (ফিশারমেন'স স্যুপ)। ব্ল্যাক সির মাছ তো সেইজন্যই এনেছি।

গোছগাছ শেষ করে শুতে গিয়ে আর ঘুম আসে না। সকালে অনভ্যস্ত, অভিজাত নারীকণ্ঠে ফেরিওলার ডাক শুনে জেগে উঠে বুঝি একসময় নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জর্জিয়ায় আমার প্রথম রাতের ঘুমও ভেঙে ছিল এই ক্লান্ত বিষণ্ণ ক্লিষ্ট নারীকণ্ঠের জিনিস ফিরি করার ডাকে।

এ যেন এক করুণ বাঁশির সুর। সমস্ত জর্জিয়ার কষ্ট ও অভিমান এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। এদের শিল্পসাহিত্য, গর্ব-গৌরব, সাধ-আহ্লাদ, ঐতিহ্য অঙ্গীকার নিয়ে এরা আবার কবে রানি ঠামারের আমলের সুখ-সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছবে জানি না। বিদায় বেলায় ভেবে পাই না, এই ছোট্ট দেশটা আমার সমস্ত হৃদয়ের শিরা-উপশিরা ধরে এমন টান দিচ্ছে কেন।

ভ্রমণ মার্চ থেকে অক্টোবর, ২০০১

নিরলংকার . মণ

শঙ্খ ঘোষ

গয়নার ঝঞ্ঝাট

শুরুতেই অলক্ষণ! মায়েরা কেউ থাকলে নিশ্চয় বলতেন: হাতেপায়ে লক্ষ্মী একেবারে বাঁধা!

বেড়াবার সময়ে ভার বাড়াতে নেই, রেলবিজ্ঞাপনে একথা বারেবারেই বলে দেয় । তার সঙ্গে আরও যেটা বলা উচিত তা হল: আপাদমস্তক নির্ভূষণ হতে হয় বেড়াবার সময়ে ।

বেতলার জঙ্গলের সামনে দাঁড়ানো সায়ন্তন এক দলীয় বিলাপের কথা মনে পড়ে । বিলাপের কাছাকাছি পৌঁছে সেদিন শুনেছিলাম বিপর্যস্ত একটি দল তখনই হাজির হল নেতারহাট থেকে । অভিজ্ঞতা তাঁদের ভালো হয়নি নেতারহাটে, সূর্যাস্তের শোভা দেখবার বদলে তাঁদের না কি দেখতে হয়েছিল ডাকাত কয়েকটি যুবাকে, সর্বস্ব তাদের কাছে উপঢৌকন দিয়ে তবে সেদিন ফিরতে পেরেছিলেন তাঁরা । সেই সর্বস্বের মধ্যে ছিল মহিলাদের বিচিত্র সব অলংকার । গতস্যের শোচনা নিয়ে বিলাপপ্রলাপ চলছিল সেই সন্ধ্যায়, বেতলার জঙ্গলে ঢুকবার ঠিক মুখোমুখি পথটিতে ।

‘ওইজন্যেই তো সঙ্গে গয়না রাখতে নেই’ -মুরুব্বির ভঙ্গিতে তাঁদের বলেছিলাম সেদিন । কিন্তু জানতাম কি আর, বেড়াতে বেরোবার শুরুতেই আমরাও পড়ব গয়নারই এক ঝঞ্ঝাটে?

ভুটান রওনা হব জলপাইগুড়ি থেকে । জলপাইগুড়িতে আমার গৃহিণীর পিত্রালয়, কটা দিন সেখানে আদরেবিশ্রামে কাটাবেন তিনি, তারপর পাহাড় । পাহাড়ি ধকল সইতে হবে বলে তার আগে বিশ্রামের কিছু আধিক্যই হয়তো ঘটেছিল । সে-রকমই এক বিশ্রাম-অবসানে, বৈকালিক শয্যা থেকে গাত্রোত্থানের পর, ঘোষণা করলেন তিনি: তাঁর সাধের দুলটি কর্ণচ্যুত ।

এ-রকম মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, এ নিয়ে বিচলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন । কিন্তু পিত্রালয়ে দুলহীনতা? এই অসম্ভব ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য চতুর্দিকে শুরু হল ব্যাপক সন্ধানপর্ব । বালিশের খোল, খাটের তলা, বারান্দার কোণ কিংবা উঠোনের ঘাস-কোনও জায়গাই বাদ রইল না আর । সর্বত্র সবাই খুঁজছেন সেই দুল, সর্বক্ষণ; কখনও গোচরে,

কখনও-বা অগোচরে । কিন্তু 'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না'র আদর্শ অনুসরণে অত্যন্তভাবেই প্রচ্ছন্ন রইলেন সেই দুল ।

আর সেই অধীর বিয়োগব্যথা পিছনে রেখে, কোনও-এক সকালবেলায় আমরা উঠে বসলাম সুদৃশ্য এবং সুরম্য এক মিডিবাসে । তার শিরোদেশে লেখা আছে 'জয়গাঁও' ।

একটা দেশের শেষ বিন্দু আরেকটা দেশের শুরু, এ-রকম একটা সন্ধিজায়গায় পা রাখবার সুযোগ কি সহজে মেলে? দুদেশের সীমানারেখার মাঝখানে তো খানিকটা না-মানুষের জায়গা থাকে বলে শুনেছি । হয়তো কয়েক হাত দূরেই, তবুও হাত বাড়িয়েই তো বলতে হয় 'ওই-যে ওই অন্য একটা দেশ ।'

কিন্তু জয়গাঁও আর ফুন্টসোলিং, ভারতের শেষ আর ভুটানের শুরু, তেমন-কোনও 'ওই'-এর জায়গা ফেলে রাখেনি এরা । দুপা দুদেশে রেখে বলতে হবে সেখানে 'এই-যে এই অন্য একটা দেশ ।'

চোখ বেঁধে ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিলেও অবশ্য টের পাওয়া যাবে কোন পা কোন দেশে । এ-পায়ে কি জলকাদা লাগছে, ও-পায়ে তা নয়? এ-পা তাহলে ভারতে আর ভুটানে ওই পা । এদিকে কি ঘিনঘিনে লাগছে আর ওদিকে ছিমছাম? এদিকটাতে ভারত তবে, ওদিকে ভুটান । এইদিকে কি লোকের ভিড়, ওইদিকে নির্জন? এদিকটাতে ভারত তবে, ওইদিকে ভুটান । মাঝখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছে সুদৃশ্য এক চিত্রকরা তোরণ ।

ফুন্টসোলিংয়ের 'ব্লু ড্রাগন'-এ আস্তানা নেবার পর, মুহুর্মুহু এপারওপার করি । বাঃ, নিয়ম নেই না কি কোনও? হ্যাঁ, নিয়ম একটা আছে । ঢুকতে হবে বাঁদিক দিয়ে, বেরোবার পথ ডাইনে ।

আসল কথা, দুবারই বাঁয়ে । শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিলে ডানদিকই তো বাঁদিক । পড়োনি রবীন্দ্রনাথ? 'দেহটা যেমনই করে ঘোরাও যেখানে/বাম হাত বামে থাকে, ডান হাত ডানে'! অন্যমনস্কভাবে সেটা খেয়াল না করলে মৃদুভাষী ভুটানি পুলিশ আলগোছে বলবে শুধু: এদিক নয়, ওদিক ।

'বারে বারে এপারওপার করছেন কেন' একথা অবশ্য বলবে না কখনও তারা । বললে তো কতবারই বলত তারা আমাকে । কেননা, থেকে-থেকেই বলছিলাম আমি: 'চলো একটু ভারত ঘুরে আসি ।' আর তার ঠিক পরেই: 'চলো এবার ভুটান ।'

অবশ্য, ফুন্টসোলিং পর্যন্তই ওই আবদার, তার পরে আর নয় । তারপরে একটা পরিচয় চাই । আমি যে আমি, সেই পরিচয় ।

তা কি আর জানি না? সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে আছে পাসপোর্ট।

পাসপোর্টে কী হবে? এর জন্য চাই পারমিট।

পাসপোর্ট কি পারমিট নয়?

ঠিকই তো। হতেও পারে তা।

আরেকজন বলেন: না, না-ও হতে পারে।

এইরকম কিছু অনিশ্চয়ের বিতর্ক চলল হোটেলের কাউন্টারে। একজন শেষে বললেন: অন্তত কটা ছবি তো তুলিয়ে রাখুন। চারটে করে ছবি। পারমিটের জন্য লাগে। কাল কিন্তু পাবেন না কিছু আর, কাল মঙ্গলবার, সব দোকানই বন্ধ থাকবে কাল।

কাজেই আমরা ছবি তুলিয়ে নিই কটা, দরকার হবে থিম্পু যাবার পথে। তুলিয়ে নিই ছবি, আর ঘুরে বেড়াই সানুদেশের পথঘাট। পাহাড়ের আদলটা শুধু শুরু হয়েছে এখানে, একটুখানি ঘুরে দাঁড়ালেই সামনে প্রসারিত সমতল আর পিছনে ঘুরে-ঘুরে উঠে যাচ্ছে পথ। আমাদের হোটেলের ঠিক পিছনেই প্রশান্ত এক গুম্ভা, চারপাশে-ঘেরা বারান্দা ঘুরে-ঘুরে ঘণ্টাগুলিতে অবিরাম দোলা দিয়ে যাচ্ছেন কোনও-না-কোনও ধর্মভীরু, বা ঘুরিয়ে চলেছেন সারি সারি ধর্মচক্র। তার সামনে দিয়েই নেমে এসেছে দোকানপসারের পথ, একটু পিছনে ওপরদিকে উঠে এলেই নিঃসীম নিরিবিলি। একজন দুজন কোথাও শুধু বলে: 'ট্যাক্সি চাই? ট্যাক্সি?' কিন্তু এছাড়া আর কোনও শব্দপাত নেই, পাহাড়ের নিশ্বাসের মতো অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘিরে নেয় আমাদের। সেই অন্ধকার একসময়ে হয়ে উঠবে মেঘ। খানিক পরে ঝমঝমে পাহাড়ি বৃষ্টির মধ্যে তৈরি হবে চমৎকার এক ঘুমের আবেশ।

পরদিন, ঝকঝকে ভোরবেলায়, হোটেল-মালিক এসে বলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম কাল, দেখা হয়নি। কোনও সমস্যা নেই তো? পারমিট নিশ্চয় করা হয়নি এখনও?'

'পারমিট কি লাগবে? ওঁরা যে বলছিলেন পাসপোর্টেই হবে?'

'হতে পারে। তবু পারমিটটা করিয়ে রাখা ভালো। চা খেয়ে নিন। আমিই এসে নিয়ে যাব আপনাদের।'

সত্যি সত্যিই নিয়ে গেলেন তিনি, খানিকটা উঁচুতে ভারতীয় দূতাবাসের দপ্তরে। ফর্ম সই করে, এখানেওখানে টিক দিয়ে, দুদুটো করে ছবি লাগিয়ে, অধিকর্তার সই নিয়ে বেরিয়ে আসছি যখন, জিজ্ঞেস করি: 'এখানে কি আমাদের আসতেই হত? আন্তর্জাতিক এই পাসপোর্ট কি পরিচয় হত না?'

'না, হত না ।' বেশ অমায়িকভাবেই জানান অধিকর্তা ।

ভাগ্যিস তোলানো হয়েছিল ছবিগুলো । দুখানা নিলেন এঁরা, আরও দুখানা না কি লাগবে আরেকটা কাগজে, রওনা হবার পরে, অল্প খানিকটা দূরে । পারমিট যদি পাসপোর্ট হয়, ওকে বলা যাক ভিসা ।

ঘুরে ঘুরে চলেছে গাড়ি আর বিকেল হয়ে আসছে । অন্য অনেক পাহাড়ের তুলনায় এর আছে একটু শুকনো শুকনো ভাব, প্রথম কিছুদূর পর্যন্ত মনে হয় যেন উদ্ভিজ্জের সবুজও এখানে কম ।

বৃষ্টি নামে আবার । তত ঘন বৃষ্টি নয় যে সব একাকার করে দেবে বা মুছে দেবে সামনের সমস্ত ছবি । গাড়ির কাচের মধ্য দিয়ে জল, জলের মধ্য দিয়ে পাথর বা আকাশ । আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসে । এবার জলের ভেতর দিয়ে উঁচুতে-নিচুতে সারি সারি আলোর ক্ষীণ বিন্দু । বুঝিয়ে দিচ্ছে কোনও শহর আমরা ছেড়ে এলাম দূরে কিংবা সামনে আসছে নতুন কোনও শহর । তারই মধ্যে কখন এসে যায় থিম্পু, প্রায় যেন নিঃসাড়ে । ভুটান-সময়ের সাতটা বাজে তখন, আমার ঘড়িতে সাড়ে ছয় । পুরো সাত ঘণ্টাই লেগে গেল তবে!

কিন্তু এই না কি রাজধানীর বাসস্ট্যান্ড? অন্ধকার, জনহীনপ্রায় । যাত্রী যাঁরা ছিলেন, টুপটাপ টুকটাক নেমে চলে যান নিজের নিজের দিকে । আমরা কোথায় যাব? একটি দুটি ট্যাক্সিঅলা এসে দাঁড়ায় । কোনদিকে যেতে চাই আমরা? বৃষ্টিটা ভাগ্যিস থেমেছে । যে-কোনও একটি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলি: 'হোটেল' । 'কোন হোটেল?' 'যে-কোনও একটা ।'

ট্যাক্সিঅলা মুহূর্তে পাক দিয়ে ঘুরিয়ে নেয় গাড়ি । আলোকিত কিন্তু জনবিরল বড় রাস্তায় পৌঁছে একেকটা হোটেলের সামনে দাঁড়াতে থাকে, আর গাড়িতে বসেবসেই বহিরবয়ব দেখে কারণে-অকারণে আমরা নাকচ করতে থাকি সব, আবার শেষ পর্যন্ত তেমনি অকারণেই নির্বাচন করে নিই একটা । আর, ঘর সাব্যস্ত হবার আগেই, বেশ সবজান্তা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করি প্রথমেই: 'রুমহিটার আছে তো? রুমহিটার?'

কেননা কলকাতায় একজন আমাকে বলেছিলেন, রুমহিটার ছাড়া থাকবেন না থিম্পুতে, ঠান্ডা কিন্তু খুব ।

কাজেই, আলো আছে কি না জল আছে কি না ঠান্ডা আছে কি না এমনকী ঘর আছে কি না জানতে চাইবার আগেই বলে বসি আমি: 'রুমহিটার আছে? রুমহিটার?'

ঈষৎ সন্ত্রস্ত ছোটখাটো রিসেপশনিস্ট মেয়েটি জানায়: 'দিয়ে দেব একটা।'

বেশ, তাহলে তো কোনও সমস্যাই রইল না আর।

এই তাহলে থিম্পু?

ভোরের আলোয় একলা একবার বেরিয়ে পড়েছি পথে, হোটেল থেকে ডাইনে। এ দার্জিলিং গ্যাংটক বা সিমলার পথ নয়, হোটেলের সামনে প্রধান রাজপথটা এখানে সমান টানে চলে গেছে তার বাঁকহীন দীর্ঘতা নিয়ে। সে যে সমতল নয়, সে যে পাহাড়ি পথ, বোঝা যেন শক্তই সেটা।

কিন্তু কাল আমরা নেমেছিলাম কোথায়?

সেটার আবিষ্কার হল একটু পরে। গোটা শহর এক চক্কর দেখে নেব বলে দুজনে যখন বেরিয়েছি আবার, বাঁয়ের দিকে এবার, কয়েক পা হেঁটে একটা চত্বরের পিছনদিকে নেমে এসেছি যেই, দেখি-আরে, এই তো সেই স্ট্যান্ড! এইখানেই নেমেছিলাম কাল? আর এখান থেকেই অত পাকফেরতার পর পৌঁছলাম সামনেই আমাদের হোটেলে?

এ-রকম দুচারবার ঠকে যাওয়াটা অবশ্য বেড়াতে বেরোবার ভবিতব্য। তাই সেকথা আর না ভেবে আমরা ভাড়া করে ফেলি একটা গাড়ি, ঘুরে দেখা যাক রাজধানী। চোখে দেখে যতটা ছোটখাটো মনে হচ্ছে ততটাই কি ছোট এ শহর? ততটাই খেলনাবাড়ি?

পথ চলতে চলতে মনে হয়, এই তো একটা গুম্ভা। এত এত গুম্ভা চারদিকে? ভুল ভেঙে যায় একটু পরে। না, কোনওটাই তা নয়। একই ধাঁচে তৈরি সুঠাম বাড়িগুলির শীর্ষাংশে চিত্রবিচিত্র রংরূপ দেখে ও-রকম মনে হয় বটে, কিন্তু এ-বাড়িটা ব্যাঙ্ক। ও-বাড়িটা? পোস্ট অফিস। আর ওইটে? ওটা হল থানা। সুদৃশ্য বাড়ির সঙ্গে সুরম্য পোশাক, সুভদ্র ব্যবহারের সঙ্গে সুমিত বাচন, স্থির শান্ত চারদিক, আর তার সঙ্গে যেদিকে চাও থরে থরে সাজানো পিচ ফলের গাছ, বেগনি ফুলে ফুলে ভরে আছে ডালপালা। একে কি আর নিছক একটা শহর বলা চলে? এ হল সাজিয়ে রাখা এক খেলনাবাড়ি শহর।

মাঝখানে বয়ে গেছে শীর্ণ একটা জলধারা, এই তাদের নদী, থিম্পু চু। নদীটা অবশ্য চলছেই চলছেই পাহাড়পথের সঙ্গে সঙ্গে, খানিক দূরে গিয়ে মিশে যাবে পারো থেকে আসা আরেক ধারার সঙ্গে, তারপর একসঙ্গে নেমে যাবে নীচে, তখন তার নাম ওয়াং চু। থিম্পু চু-এর একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে গোটা শহরটার আদল একবার দেখে নিই উঁচু থেকে। ওই দূরে রাজবাড়ি, এই এদের জোং, তাশিছো জোং। জোং কথাটার মানে দুর্গ, কিন্তু এ-জায়গাটা আসলে শাসন-পরিচালনার কেন্দ্র। ওই যে ইন্ডিয়া হাউস, আর ওই হল সার্ক-

এর জন্য তৈরি করা বাড়ি। 'জানেন তো, সার্ক-এর প্রথম সম্মেলন হয় এইখানে, এই বাড়িতে? সেইজন্যই এত জাঁক। আর এই হচ্ছে ক্রিকেটমাঠ।'

'ক্রিকেট? এখানে ক্রিকেটখেলাও হয় না কি?'

'ক্রিকেট হয়, গল্ফ হয়। দেখাচ্ছি চলুন গল্ফ খেলবার জায়গাটা।'

কিন্তু ক্রিকেটের কথায় মনে পড়ে যায় আজ ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা। বেড়াতে এসেছি বলে খেলা দেখব না না কি? অতটা হয় না! কিন্তু দেখব-বা কেমন করে? আমাদের হোটেলে রুমহিটার আছে, টিভি তো নেই! ড্রাইভার-ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি: 'টিভি কোথায় দেখা যাবে বলো তো?'

'টিভি? টিভি কোথায় পাবেন? ভুটানে তো টিভি নেই।'

'নেই?'

'নাঃ। যদি লুকিয়ে-লুকিয়েও দেখে কেউ তো তার ফাইন হয়ে যাবে।'

টিভি নেই, ১পত্রিকা নেই, রেডিয়ো চলে সন্ধ্যায় মাত্র দুঘণ্টা, খবর জানে কেমন করে এরা? জানে এদের সাপ্তাহিক একটা ট্যাবলয়েড থেকে, 'কুয়েনজেল' তার নাম। যারা পড়তে জানে জোংখা (ভুটানি) বা নেপালি বা ইংরিজি, প্রত্যেক শনিবারের সকালবেলায় তারা ভিড় করে ঝুঁকে পড়ে তিন ভাষায় প্রকাশিত ওই কাগজের ওপর।

'আর সিনেমাহল? সিনেমাহল কটা?'

'একটাই মাত্র।'

'কোথায় সেটা? কতদূর?'

'বাঃ, সে তো আপনাদের হোটেলের ঠিক গায়ে গায়ে লাগানো। ঠিক সঙ্গেই।'

সিনেমাহল ওটা? তাই লোকজনের ওই ভিড় দেখেছিলাম কাল রাতে? হোটেলের নীচের তলাতেই দোকানপসারের বাহার দেখে ওটাকেও আমি ভেবেছিলাম একটা সুপারমার্কেট।

গাড়ি চালাতে চালাতে শেতেন দোরজি (এই হল আমাদের চালকের নাম) বলে: 'ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবেন?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরি? নিশ্চয়ই যাব।'

স্কুলকলেজের বিশেষ আধিক্য নেই এ-শহরে, পড়বার ব্যবস্থা আছে কেবল বারো ক্লাস পর্যন্ত, আরও কিছু পড়তে হলে যেতে হবে থিম্পুর বাইরে। সেই থিম্পুতে গোটা একটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি? দেখতেই হয় সেটা।

চোদ্দ বছর আগে তৈরি হয়েছে এই বাড়ি। কিন্তু ভেতরে ঢুকে ঘরগুলির প্রসারিত শূন্যতা দেখতে দেখতে ধন্দ লাগে মনে। ছিমছাম সাজানো কোনও তাকে দশখানা বই কোনওটায় বিশখানা, অনেকগুলি ফাঁকাও। বই রাখবার অন্য কোনও প্রচ্ছন্ন জায়গা কি আছে তবে? ন্যাশনাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিটা কই? সমাসীনা একমাত্র কর্মিণীটির সামনে গিয়ে বলি: 'মহাশয়া, একটা কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি? এ-লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা কত?'

'তিন হাজার।'

তিন হাজার! খেলনা শহরের খেলনা লাইব্রেরি। আর, তিন হাজার বলেই বই খুঁজে পাবার কোনও সমস্যা নেই। 'লিটারেচার'-চিহ্নিত কোণটিতে গিয়ে দেখি তাকের ওপর সাতাশখানা বইয়ের মধ্যে আগম আব ত্রিপিটকের ঠিক পাশেই গোর্কির 'On Literature'-সংকলন, হ্বিনটারনিৎসের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পাশেই 'Noh Drama'!

বই তিন হাজার হলেও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এখানে আছে দশ হাজার।

লাইব্রেরি অবশ্য দেখেছি এখানে আরও একটা, পাবলিক লাইব্রেরি। বড় রাস্তার পাশেই, পাড়ার পাঠাগারের মতো ছোট একটা বাড়ি, কিন্তু সেখানে বরং দশ হাজার বইয়ের জমায়েত। ব্যবহার হয় তো তার? বলা মুশকিল। সাতানব্বই সালের অক্টোবর মাস থেকে সপ্তাহে দু-তিনদিন ('depending upon the response') গল্প পড়ে শোনানো হবে ছোটদের, কিংবা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাদেরই পড়বার মতো বই, এই মর্মে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে দেওয়ালে। 'কেমন জমছে এই আসর?' ছমাস পরে মার্চের শেষে আমার এই প্রশ্নের উত্তরে জানি, তখনও শুরুই হতে পারেনি সে-অনুষ্ঠান, response-এর দশা হল এই।

কিন্তু স্কুলপোশাক পরে পিঠে বইয়ের ঝোলা চাপিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেই চলেছে হেঁটেই চলেছে আটদশবারো বছরের ছেলেমেয়েরা, এদিকে বা ওইদিকে, আসতেযেতে এ-ছবিটা হামেশাই চোখে পড়বে ভুটানে। পারোর পথে দেখেছিলাম যেমন, যাবারও পথে, আসবারও পথে।

শেতেন দোরজিকে বেশ ভালো লেগে যায়, ছাড়া হবে না একে। 'পারো যাব আমরা, নিয়ে যাবে তুমি?' শেতেন বলে: 'নিয়ে যাব, ফিরিয়েও আনব। থাকবেন না তো আর ওখানে? থাকবার দরকার কী! ছোটখাটো জায়গা।'

'এরও চেয়ে ছোট?'

'হ্যাঁ, এরও চেয়ে ছোট।'

'কিন্তু শুনেছি যে ওখানে একটা এয়ারপোর্ট আছে?'

'প্লেন নামে বটে, কিন্তু ওকে কি আর এয়ারপোর্ট বলে? একফালি রাস্তা মাত্র। দেখতেই পাবেন চোখে।'

ঘড়িধরা ঠিক সময়ে শেতেন এসে হাজির হয় সকালে। আমরা তখনও তৈরি হতে পারিনি পুরো। কিন্তু ওকে কি আর দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত? চটপট, চটপট! এটা-ওটা কাঁধে ফেলে ঝটিতি তৈরি হয়ে নিই। বেরিয়ে পড়ি আলোয়ভরা আমেজভরা শীতের পথে। থিম্পু চু-র সাঁকো পেরিয়ে, বড় বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে (হ্যাঁ, বড় স্ট্যান্ডও আছে একটা), বারো ক্লাসের ইস্কুল পেরিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি আমরা। সামনেই সিমটাখ। ধারাবিবরণ দিতে দিতে চলেছে শেতেন। বেশ আলাপী ছেলেটি। হঠাৎ প্রশ্ন করে: 'পারমিটটা তো পকেটেই রেখেছেন?'

'পারমিট?'

'হ্যাঁ, পারমিট। নেই সঙ্গে? পারমিট লাগবে না? কোন কোন শহরে ঢুকতে পারবেন সে তো বলা আছে কাগজটায়। কাগজ না দেখালে ঢুকতে দেবে কেন? কী হল? ফেলে এসেছেন?'

'মনে তো হচ্ছে হুটোপুটিতে ফেলেই এসেছি হোটেলে।'

পকেট হাতড়ে দেখি তবু দু-একবার। আর, মুখে মৃদু বিরক্তিচিহ্ন নিয়ে উল্টোদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দেয় শেতেন। এবার তার কথা নেই কোনও। দ্রুততম বেগে পৌঁছে দেয় হোটেলে। লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়ি টপকে উঠতে থাকি ঘরে, কেননা পার্কিং-এর নিয়ম নেই এ-হোটেলের সামনে। দরজা খুলি ঝটপট। দেরাজ খুলি। কিন্তু কই? কাগজপত্র যে এইখানে রেখেছিলাম, কোথায় গেল সেসব?

ভোরবেলাতেই বেরোতে হবে বলে সেসব যে কাল রাতে গুছিয়ে রেখেছিলাম কাঁধঝোলাতেই, সেকথাটা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। কাঁধেই সেটা ঝোলানো। তার মধ্যে হাত দিয়ে দেখি ঠিক-ঠিক জায়গাতেই রয়ে গেছে পারমিট, সমস্যা নেই কিছু।

লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরে আসি আবার।

'নিয়ে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

সেই মুহূর্তে কাউকে আর ফাঁস করি না কথাটা।

দু-চারবার বোকা বনে যাওয়াটা তো বেড়াতে বেরোবার ভবিতব্যই!

আবার সিমটাখ হয়ে নামসেলিং হয়ে ওয়াংসিসিনা হয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। শেতেনের গাম্ভীর্য এখনও অটুট। কেবল, দূরে একটা চৌরাস্তার মোড় আসছে জানিয়ে দিয়ে সে বলে একবার: পারমিটটা বার করুন।

থিম্পু চু পারো চু মিলে গেছে ওইখানে, মিলেমিশে নেমে গেছে ওয়াং চু। ত্রিবেণীসংগম বললেই চলে। এই মোড় থেকে পথ একদিকে নেমে গেছে ফুন্টসোলিং-এ, একটা উঠে গেছে হা-এর দিকে, আরেকটা পারোয়। 'হা পর্যন্ত পৌঁছলে তবে আমার গ্রাম', বলে শেতেন। 'কতদূর সেখান থেকে?' 'তিরিশ কিলোমিটার হাঁটলেই পৌঁছে যাই।' 'হাঁটতেই হবে অতটা? অন্য কোনও ব্যবস্থা নেই?' 'কোনওই ব্যবস্থা নেই আর।'

এই চৌরাস্তার সন্ধিমুখে চেকপোস্ট। পারমিট নিয়ে শেতেন নেমে যায় অফিসঘরের জানলায়। ঘুরেফিরে খানিক পরে ফিরে আসে, জানলায় কেউ নেই। 'নেই কেউ। চলুন যাই।' ডানদিকে বাঁক নিয়ে আমরা চলতে থাকি পারোর পথে। আলতো একবার জিজ্ঞেস করি শুধু: 'কাজে লাগল না পারমিটটা?'

নিরুত্তর শেতেন গাড়ি থামায় পথবর্তিনী এক ভুটিয়া যুবতীকে দেখে। জিজ্ঞেস করে: 'কতদূর?'

'পারো।'

আমাদের কিছুমাত্র পাত্তা না দিয়ে তাকে সে তুলে নেয় গাড়িতে। মেয়েটিও যত সহজভাবে উঠে আসে, মনে হয় নিশ্চয়ই ওর জানাশোনা কেউ।

একটি দুটি কথা বলছে তারা। ক্যাসেটে বেজেই চলেছে হিন্দি গান। সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে শেতেন মিহি স্বরে। বেশ সুরেলা তার গলা। জিজ্ঞেস করি: 'ভুটানি গান গাও না তোমরা? শোনো না?'

'গাই। শুনি। অল্প।'

‘ভুটানি সিনেমা? দেখানো হয় না কখনও?’

‘হয়। এখনই তো হচ্ছে একটা। তোমাদের ঠিক পাশের সিনেমাহলেই তো।’

‘ভুটানি ওটা? কেমন ছবি?’

‘ওই যেমন তোমাদের হয়, হিন্দিরই মতো। এ ওকে love করল। আর তার পর, ইন্ডিয়াকা মাফিক, ঢিশুমঢুশুম।’

আরে, এও-যে বলে ঢিশুমঢুশুম। এ কি একেবারে আন্তর্জাতিক শব্দ হয়ে গেল তবে?

আর ওই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লতা ফিরে এল শেতেনের।

‘সবসময়েই এত হিন্দি বলছ তোমরা, শেখো কী করে? সিনেমা দেখে?’

‘হাঁ, সিনেমা দেখে। আর তাছাড়া ইন্ডিয়ান মিলিটারির কাছে।’

‘মিলিটারির কাছে? পাও কোথায় তাদের?’

‘কেন? সবসময়েই তো এপথ দিয়ে যাওয়াআসা করছে তারা। দেখোনি গাড়িগুলি? এরই মধ্যে তো চলে গেল কটা। ফুন্টসোলিং থেকে হা পর্যন্ত কেবলই এরা যায়। দেখছ না পথগুলি কত মজবুত সেইজন্যে, কত পরিষ্কার? হা তো তিব্বতের বর্ডারের কাছে। সেখানে আছে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। তার হাবিলদার থেকে কর্নেল পর্যন্ত সবাই আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গে কথা বলে বলে শিখে নিয়েছি সব। তোমরা কলকাতার লোক? কলকাতায় হিন্দি বলে না লোকে?’

‘বলে। খুবই বলে।’

‘ঢিশুমঢুশুম দেখে?’

‘সে তো দেখেই। এখন বাংলা ছবিতেও সেটা দেখে।’

‘কিন্তু ইন্ডিয়া কালচার আমি ভালোবাসি না।’

‘কেন?’

‘ইন্ডিয়ায় ছেলেরা বিয়ে করবার সময়ে টাকা চায়। এ খুব খারাপ আছে। তোমাদের ওখানেও নেয়? এখনও?’

‘এখানে নেয় না? এখানে কীভাবে বিয়ে হয়?’

‘এখানে? কেউ কাউকে পছন্দ করল। বাপকে গিয়ে বলল সাদি করবে। বাপ রাজি হল তো ভালো, না হল তো ভেগে পড়ল দুজন। ব্যস, খতম। কেউ কিছু বলল না।’

‘বেশ ভালো।’

‘লেকিন, আভি একটু একটু ইন্ডিয়া কালচার ঢুকছে!’

‘ওই-যে দেখুন পারোর এয়ারপোর্ট। ফিরবার সময়ে ওর একেবারে পাশ দিয়েই ফিরব আমরা। আর এই নদী হল পারো চু। উঁচুতে ওই তাকান। দেখতে পাচ্ছেন একটা বিল্ডিং? ওটা ন্যাশনাল মিউজিয়াম।’

ন্যাশনাল লাইব্রেরির অভিজ্ঞতার পর ন্যাশনাল মিউজিয়াম কথাটা মস্ত কিছু হিল্লোল তোলে না মনে। কিন্তু পারোর দিকে পৌঁছতে পৌঁছতে মনে হচ্ছে এবার যেন আমরা নেমে আসছি একটু। অল্প আগে থেকে আবার মেঘ জমেছে আকাশে। পদ্মফুলের পাপড়ির মতো চারদিকে উঠে আছে পাহাড়, মাঝখানে যেন প্রায় সমতলভূমি, নিঃসঙ্গ নির্জন উপত্যকা। শান্ত একখানা গ্রামের মতো শুয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ রেখে। খুব ভুল হয়ে গেল। এক লহমা দেখেই মনে হচ্ছে এখানেই থাকা উচিত ছিল কদিন।

থামল একটু গাড়ি। নেমে গেল মেয়েটি। যাবার সময়ে অল্প কয়েকটা কথার বিনিময় তাদের। পরে আমি জিজ্ঞেস করি: ‘চেনা বুঝি তোমার?’

‘না-না-’

‘এইখানে ওর বাড়ি?’

‘না, এখানে এসেছে পড়তে।’

‘কী পড়ছে?’

‘বারো ক্লাসের পরীক্ষা দেবে। বলে কী, ভাড়া কত লাগবে। ভাড়া দেবে আমাকে! কী করে দেবে? কীভাবে এরা পড়াশোনা করে আমি তো জানি। আমার তো হলই না লেখাপড়া। আমি বললাম: বহিন, ভালো করে পরীক্ষাটায় পাশ করো। যদি পাশ করো, তাহলে জানবে সেটাই আমায় ভাড়া দেওয়া হল।’

বোকা হতে হল আরও একবার।

গাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পাশে। আড়াই ঘণ্টায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার গাড়িতে আসতে আসতে এই দুপুরটায় মনে হল গরমই লাগছে। গরম চাদর

তাই গাড়িতেই রেখে ঢুকছি এসে মিউজিয়ামে । শেতেন জানাচ্ছে, গাড়ি চলল নীচের দরজার দিকে, ছতলা বাড়ির নীচতলায়, সেখান দিয়েই বেরোতে হবে আমাদের ।

ঘরে ঢুকবার অল্প পরেই টের পাই আমার মূর্খতা । কাঁপন লাগছে হী হী । ঠান্ডায় জমাট হয়ে আছে আবদ্ধ সেই ঘরগুলি, হা, কোথায় আমার রুমহিটার, কোথায়-বা চাদর! প্রত্যেক তলাতে দুচোখ ভরে দেখবার মতো অঢেল সামগ্রী সাজানো থরে থরে, সময় নিয়ে দেখবার । সময়ের কোনও অকুলোনও নেই আমাদের । আঃ, কেবল চাদরটা যদি থাকত এই সময়ে!

এখানকার ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখছি ন্যাশনাল লাইব্রেরির মতো নয় একেবারেই । আট হাজার শ্লোকের স্বর্ণাক্ষর 'অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা' থেকে শুরু করে প্রাচীন পার্বত্য দেবতা আর বৌদ্ধ দেবদেবীদের ছোট বড় মূর্তিতে ভরে আছে ঘরগুলি । খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকে একেবারে হাল আমল পর্যন্ত ভুটানিদের পোশাক ভূষণ তৈজস এক-এক ঘরে সাজানো, এমনকী ডাকটিকিটেরও বিচিত্র বাহার । আর একেবারে শেষ পর্বে এক উপাসনাঘর ।

কিন্তু এক উপাসনাঘর থেকে অন্য উপাসনাঘরে এবার যেতে হবে আমাদের! বৌদ্ধদের দুই উপভাগের দুটো ভিন্ন গুম্ভা আছে পারোতে, কিচু আর তাকসাং । কোনওটারই অবশ্য ভেতরে গিয়ে দেখবার আর উপায় নেই এখন । কেন? রাজকীয় নিষেধ । ভেতরে গিয়ে ছবি তুলে নিয়ে বাইরে সবাই বাণিজ্য করছে, এই অপরাধে ঘরে ঢোকাই বারণ হয়ে গেছে বছর পাঁচেক হল । কিচুর শুধু প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম আমরা, দেখতে পেলাম শুধু তার বছরজোড়া ফলফলানো কমলালেবুর গাছ, খুদে খুদে ফল । এর নীচে না কি আছে জলাশয়, কিংবদন্তি বলে । কেউ কখনও দেখেনি অবশ্য ।

আর তাকসাং?

দশ কিলোমিটার দূরে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে দিয়ে, অতল গহ্বরের ওপারে সুদূর এক উচ্চতায় কোনও-একটা স্তূপের অস্পষ্ট আভাসের দিকে তর্জনী নাচিয়ে শেতেন বলে: 'ওই-যে দেখুন ।'

আরে! এ কী চালাকি না কি? এইভাবে দেখিয়ে দিলেই হল? যেতে হবে না কাছে?

'যাবেন? গেলে তো পায়ে হেঁটে যেতে হবে । গাড়ির পথ তো নেই ওখানে । সরু পথ বেয়ে উঠতে উঠতে সে অনেক ঘণ্টার পথ, যেতে যেতেই সন্ধে হয়ে যাবে ।'

'যায় না বুঝি কেউ?'

'কাউকে কাউকে তো যেতেই হয় । মানত করা থাকে তো অনেকের । আমাদের গাঁয়ের দুজন মেয়েকে প্রত্যেক বছর আসতে হয় এখানে পুজো দেবার জন্য । খুব তকলিফ ওদের । আর পুজো তো আমাদের করতেই হবে, হবে না? দিতেই হবে পুজো । পয়সা ভি খরচ হবে খুব । তা বিশ হাজার টাকা তো লেগেই যাবে । আপনাদের টাকা আর আমাদের টাকা তো সমান-সমান, তাই না?'

'পুজোর জন্য কুড়ি হাজার?'

'বাঃ, তা লাগবে না? লামারা আছে গুম্ভায় । লামারাও তো মজুরই একরকম? একশো টাকা করে তো দিতেই হবে তাদের । তাহলে কী হল? তিরিশ জন লামার জন্যই তো তিন হাজার হয়ে গেল । তার পর গাঁয়ের সবাইকে খাওয়ানো । খরচ আছে তার ।'

'গাঁ-সুদ্ধ খাওয়াতে হবে?'

'হবে না? মানতকরা পুজো, খাওয়াতে হবে না সবাইকে? ওটাই নিয়ম ।'

'এত টাকা পাও কী করে?'

'বছর জুড়ে যে যা জোটাই, রেখে দিতে হয় সেটা । বেশির ভাগটাই চলে যায় পুজোয় । বাঁচতে তো হবে । পুজো না করলে লোকে বাঁচবে কী করে?'

থিম্পুর দিকে যখন ফিরে আসছি আবার, বিকেল হয়ে গেছে, পেরিয়ে এসেছি সেই ত্রিবেণীসংগম, চলতে চলতে আবারও হঠাৎ থেমে যায় গাড়ি । কী হল? থামলে কেন? শেতেন চুপ । পিছনে তাকিয়ে দেখি পাহাড়িপথে নেমে আসছেন শিশুকোলে এক মহিলা, তাঁর এক পুরুষসঙ্গীর হাতে পুঁটুলি । সঙ্গীটি এসে গাড়ির পিছনে তুলে দিলেন পুঁটুলিটা, আর শিশুকোলে মহিলাটি উঠে বসলেন ড্রাইভারের পাশে । কোনও বাগবিনিময় নেই । গাড়ি আবার চলতে শুরু করে ।

ওই মহিলার কাছে পয়সা নিয়েছিল কি না শেতেন, সেটা আর জানা হয়নি আমাদের । কেননা হোটেলে আমাদের নামিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত তাঁর গন্তব্য এসে পৌঁছয়নি, নামবেন তিনি আরও একটু পরে । নেমে যাবার সময়ে এঁকে কী বলবে শেতেন? বলবে কি: বাচ্চাকে মানুষ করে তোলো ভালোভাবে, সেইটেই হবে আমায় ভাড়া দেওয়া?

ভুটান ছাড়বার সময় হল আমাদের । বিদায় নেবার সময়ে সকলেই জানতে চায় কেমন লাগল তাদের দেশ । উত্তরে, আমাদের উচ্ছ্বাসের কোনও অন্ত থাকে না ।

এ-রকম এক উচ্ছ্বাসের সময়ে পাশে ছিলেন প্রৌঢ় এক সুগম্ভীর শিখ । থিম্পুতেই কাজ করেন তিনি । আমাদের আবেগ শুনে তাঁর ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠে অল্প একটু

বাঁকা ঢেউ । বলেন: ‘সাতদিনের জন্য এলে ওইরকম লাগে ।’ তারপর, একটু থেমে: ‘থাকতেন যদি একমাস তো বুঝতাম । অসহ্য! বোরিং! কিচ্ছুই করবার নেই এখানে ।’

সন্তর্পণে সরে আসি আমরা ।

থিম্পু চু-কে ডাইনে রেখে নামছি আমরা ফুন্টসোলিংয়ের দিকে । চলতে চলতে দেখি থাকে থাকে আপেল গাছের জমি তৈরি হয়ে আছে, শুকনো ডালপালা মেলে গাছগুলি যেন কাত হয়ে আছে অনেকখানি, যেন প্রতীক্ষায় আছে তারা । কিছুদিন পরে যখন এত এত গাছ ভরে উঠবে ফলেপাতায়, কেমন তার ছবিটা হবে ভাবি ।

চৌরাস্তায় পৌঁছবার পর এবার কিন্তু বুঝি, চেকপোস্টটা একেবারেই খেলাখেলা নয় । ফুন্টসোলিংয়ে নামবার পথে যাত্রীদের খানাতল্লাশিটা বেশ বড় মাপেই ঘটে । বাসের ছাদে উঠে সুটকেস খুলে খুলে, বাসের ভেতরে ঢুকে ব্যাগ-হাতব্যাগ খুলে খুলে, বেশ জবরদস্ত পরীক্ষা করেন এঁরা, সবকিছুই । কী এত পরীক্ষা করেন? কী এমন পাচার করবে লোকে? নিরীহভাবে কথাটা জানতে চাইলে একজন কর্মী খানিকটা উপেক্ষা নিয়ে তাকান, বলেন না আর কিছু ।

ছেড়ে দেয় আবার বাস । ফুন্টসোলিংয়ে রাত কাটিয়ে কাল আবার জলপাইগুড়ি ।

বেড়ানো সাঙ্গ করে জলপাইগুড়ি থেকেই ফিরে আসব আবার । ট্রেন ধরতে হবে পাঁচটায় ।

জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে । রিকশা নিয়ে স্টেশনে গেলেই হল । নিরুদবেগ বিশ্রামে বসে আছি টেবিলের ধারে, আর অলস হাতে ওলটাচ্ছি টেবিলের-ওপর-পড়ে-থাকা মস্ত একখানা ‘মনুসংহিতা’, এ-বাড়ির প্রাচীন সংগ্রহের অন্যতম একটা বই, বন্যার পলিতে আগাগোড়া আটকে-আটকে-যাওয়া তার পাতা ।

জিনিসপত্র তো সব গোছানোই আছে? ‘আছে’-গৃহিণী বলেন -‘শুধু চটিগুলো মুড়ে নিতে হবে ।’

চটির একটু বিলাসিতাই তিনি করেছিলেন এবার । ঘরে কোনটা বাইরে কোনটা, সমতলে কোনটা পাহাড়ে কোনটা, মর্মের গভীরে এর কোনও ভেদাভেদ হয়তো ছিল, হিসেবটা যদিও ঠিক থাকেনি সবসময়ে ।

আমি ঝুঁকে আছি টেবিলে, পিছনে দাঁড়িয়ে তিনজোড়া চটির শেষ জোড়াটি উনি পেলব যত্নে মুড়ে নিচ্ছেন কাগজে, এমন সময়ে অস্ফুট এক শব্দ শুনি: আলিবাবা ।

আলিবাবা? হঠাৎ কেন আলিবাবা? পিছনে তাকিয়ে দেখি, স্থির মূর্তি । ‘স্ট্যাচু’ বললে ছোটবেলায় যতখানি স্থির হয়ে দাঁড়াতে হত, ঠিক ততটাই স্থির, চোখও পলকহীন ।

কাগজের শেষ পাকটা চটির ওপর পড়বার আগে স্থির হয়ে আছে হাত, স্ফারিত চোখের সামনে চটির তলদেশ। সেই স্থিরমূর্তির মুখ থেকে আরও একবার ফিসফিস শব্দ ভেসে এল: আলিবাবা।

ওঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু তা কি হঠাৎ এতটাই খারাপ হল যে মাথাতেও এল বিকার? 'মনুসংহিতা' গুটিয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি: 'কী বলছ?'

এবার, দুপা এগিয়ে এসে, চটির তলদেশ আমার মুখের সামনে উত্থাপন করে তিনি বলেন: 'এই-যে, আলিবাবার গল্প!'

তাকিয়ে দেখি, চটির তলায় ঝকঝক করছে তাঁর সেই হারিয়েযাওয়া দুল, যেন বিষ্ণুর বুকে কৌস্তুভের মতো গেঁথে আছে সুখে। আর এই হল সেই চটি, জলপাইগুড়ির ঘরের পর যা তিনি ব্যবহার করেছেন গোটা ভুটান জুড়ে, এই কয়েকটা দিন।

গালে হাত দিয়ে ভাবি, ফিরবার পথে পুন্ঝে পুন্ঝে চেকিং-এর সময়ে চটির তলা তো দেখতে চাননি অফিসাররা। উচিত ছিল না কি দেখা? আর, দেখতেন যদি? কাগজে কি সোনাপাচারের খবর উঠত তবে?

অবশ্য, জানি না এখনও, দুলটা ঠিক সোনারই ছিল কি না!

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

চেঙ্গিস খানের দেশে

প্রতাপকুমার রায়

সাতানব্বই-এর অক্টোবরে আমরা উলানবাটোর গিয়েছিলাম। মোঙ্গলিয়া। আমাদের টিকিট হয়েছিল থাই এয়ারওয়েজে ব্যাঙ্কক, সেখান থেকে কোরিয়ান এয়ারে সোল (Seul)। সোল থেকে কোরিয়ান এয়ারওয়েজের অন্য ছোট প্লেনে উলানবাটোর।

ব্যাঙ্ককে, সোলে মালপত্র ডেলিভারি নিয়ে আবার অন্য প্লেনে ওঠা বড় হয়রানির কাজ। তাছাড়া সোলে আমাদের প্লেন বদলাবার সময় ছিল খুব কম।

কলকাতা এয়ারপোর্টে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মোটঘাট কি সোজা বুক করা যাবে উলানবাটোর পর্যন্ত?

যিনি আমাদের চেক-ইন করছিলেন, এয়ারলাইন্সের কর্মী, চমকে উঠেছিলেন। বললেন, উলানবাটোর? সে কোথায়?

পরে বলেছিলেন, চোদ্দ বছর এই কাজ করছি মশাই, কেউ উলানবাটোর যাচ্ছে বলে কখনও শুনিনি।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা এই না-জানা শহরে যাচ্ছি কেন? অনেক শহর তাদের নামেই আমাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে যাবার ইচ্ছা ছিল ইরকুটস্ক, আলমাআটা, উরুমচি। দিল্লি থেকে কাজাখস্তানের আলমাআটার বিমান যেত একসময়। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম কাজাখস্তানে যাবার ভিসা পাওয়া যায় না। ওখান থেকে কেউ আপনাকে নিমন্ত্রণ না পাঠালে ভিসার দরখাস্ত নেওয়াই হবে না।

অতএব স্থির হল উলানবাটোর। ভ্রমণ সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে ইউরোপে উলানবাটোরের এক মহিলার পরিচয় হয়েছিল। অমরেন্দ্রর অনুরোধে তিনি একটা নিমন্ত্রণবার্তা পাঠিয়েছিলেন। শহরে হোটেলও ঠিক করে দিয়েছিলেন।

যাতায়াত কোন পথে সুবিধা হয়, এখান থেকে সব খবর পাওয়া যায় না। কলকাতা-ব্যাঙ্কক-সোল-উলানবাটোর ছাড়াও অন্য পথে, কলকাতা-ব্যাঙ্কক-বেজিং-উলানবাটোর, যাওয়াও সম্ভব ছিল। এখবরটা আমরা যাত্রার পূর্বে জানতাম না।

মোঙ্গলিয়া যাবার অন্য কারণও আছে। নৃতত্ত্ববিদেরা সারা পৃথিবীর মনুষ্যকুলকে কয়েক গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের অধিবাসী মোঙ্গলয়েড। এমনকি আমাদের পার্বত্য ভারতীয়দের মধ্যেও মোঙ্গলয়েড ছাপ পাওয়া যায়।

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম, মোঙ্গলীয়রা যাযাবর প্রকৃতির। কোথাও স্থায়ী আস্তানা করে না। তাঁবুতে বাস করে। পশুপালন তাদের প্রধান কাজ। ইচ্ছেমতো তাঁবু ও তাদের ঘোড়া-ভেড়া-ছাগল নিয়ে অন্য চারণক্ষেত্রে চলে যায়। ঘোড়াই তাদের একমাত্র বাহন। মোঙ্গলিয়েরা অত্যন্ত দক্ষ অশ্বারোহী।

মোঙ্গলিয়া ছোট দেশ নয়। আয়তনে ভারতবর্ষের অর্ধেক। অথচ জনসংখ্যা ছাব্বিশ লক্ষ মাত্র। তারমধ্যে ছ-লক্ষের বাস উলানবাটোর শহরে।

এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী থেকে দুই 'খান' একদা অর্ধেক পৃথিবী জয়ের পথে এগিয়েছিলেন। চেঙ্গিস খান ও তাঁর নাতি কুবলাই খান। খান মানে শাহানশাহ বা সম্রাট। পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এত বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে সাম্রাজ্যের আর কোনও উদাহরণ নেই।

আমরা উলানবাটোরে নামলাম, তখন ভরা দুপুর। আমাদের যাত্রার সময়টা যে ভুল ছিল সেকথা প্লেন থেকে নেমেই হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছিলাম। এতটা ঠান্ডা হবে অনুমান করিনি। তাপাঙ্ক চার বা পাঁচ ডিগ্রি। ওভারকোট চড়াবার সিকি মিনিট সময়েই জমে গিয়েছিলাম। উলানবাটোরেও এয়ারপোর্ট ও প্লেনের সংযোগের চলমান বাহু আছে। সম্ভবত নামার সময় ব্যবহার হয় না। আমাদের প্লেন থেকে হেঁটে এয়ারপোর্টে ঢুকতে হল।

কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনে সময় লাগল না। বাইরে বেরিয়ে আশা করে তাকিয়ে ছিলাম। হয়তো কেউ আসবে। আসবার কথা নয়। শ্রীমতী নারানজারগাল, অমরেন্দ্রর বন্ধু, আমাদের হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন। তারপরই তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছেন। হোটেলের নাম জানি। একটা ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারলে হোটেলের পথে রওনা হতে পারি।

এক তরুণী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ছোটখাটো মানুষটি, সঙ্গে সুদেহী, দীর্ঘ এক পুরুষ। মহিলা ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আমি মিঃ রায়, কিনা। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না। ছোট প্লেনে এসেছি সোল থেকে। বেশি যাত্রী ছিল না প্লেনে। সবই মোঙ্গলীয় চেহারা। আমাদের মতো কৃষ্ণকায় আর্য কোথাও নেই।

তরুণী আমাদের ইন্টারপ্রেটর, দোভাষী । তাকে পেয়ে খুব আশ্বস্ত হলাম । সঙ্গের পুরুষটি গাড়ির চালক । অবলীলায় আমাদের সুটকেশ দুটি তুলে নিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দিল । তরুণীর নাম ইয়াডমটসু । অমরেন্দ্রর বন্ধু শ্রীমতী নারানজারগাল লিখেছিলেন মোঙ্গলিয়াতে আমাদের ইন্টারপ্রেটর লাগবে । তিনিই মেয়েটিকে নিযুক্ত করেছিলেন । পারিশ্রমিক দৈনিক ত্রিশ ডলার । গাড়ি নারানজারগালের । আমরা যে কদিন থাকব, ব্যবহার করতে পারব ।

এইবার চারপাশ দেখবার অবকাশ হল । আমরা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে রয়েছি । বহু দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে তিনদিকে । তৃণলেশহীন, একটা গাছ নেই কোথাও, নিরলঙ্কার, চরাচরে অপার বৈরাগ্যের চেহারা । তার সঙ্গে প্রায় বেমানান পরমাশ্চর্য নীল আকাশ । সমস্ত রাস্তায়, আধঘণ্টার, বিশেষ বাড়িঘরও নেই, কয়েকটা অফিসবাড়ি, একটা ছোট কারখানা । বৃক্ষহীন প্রান্তরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পথ জনহীন । কদাচ, দুয়েকটা গাড়ি বিপরীতমুখী । সব জানলা বন্ধ, আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না । একটা নদী পেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি দেখা গেল । তারপর, আবার এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এসে নিঃসঙ্গ দুটি বারোতলা বাড়ি দেখতে পেলাম । এই দুই বাড়ি নিয়ে আমাদের হোটেল বায়ানগোল । হাওয়া দিচ্ছে শনশন, অতি শীতল হাওয়া ।

এই যে এখন শীতের প্রারম্ভে দিগন্তব্যাপী ধূসর রিক্ত ছবি, এমন চলবে মে মাস পর্যন্ত । তার আগেই জমিতে রং ধরতে শুরু করবে । কল্পনা করছিলাম, আদিগন্ত নির্বাধ সবুজ, যত দূর চোখ যায়, না জানি কী অপূর্ব রূপ হবে তখন । এই হল মোঙ্গলিয়া । বছরে নমাস শীত, তিনমাস গ্রীষ্ম । সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন । উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে, পুবে ও পশ্চিমে চিন ।

দোভাষী মেয়েটির কেন দরকার, প্রত্যহ ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে, ক্রমশ বুঝতে পারছি ।

বড় হোটেলের মধ্যে বায়ানগোল দ্বিতীয় । বিদেশীদের বেশ যাতায়াত আছে । এখানেও কেউ ইংরিজি বলে না । যারা হোটেলের অভ্যর্থনার কাউন্টারে, তারাও ভাঙা ইংরিজির বেশি বলতে পারে না । সব কথা, অন্তত আমাদের উচ্চারণে, বুঝতেও পারে না । বুঝতে পারলাম দোভাষী না পেলে এই তৃণহীন, বৃক্ষহীন দেশে বাক্যহীন থাকতে হত ।

আমাদের হোটেলটি ভালো । দুজনের জন্য দৈনিক একশো ডলার । শ্রেষ্ঠ হোটেলটি খুবই ভালো । দাম কিছু বেশি । এখানে সব ভালো জিনিসেই চেঙ্গিসের নাম । বড় হোটেলের নাম চেঙ্গিস হোটেল, শ্রেষ্ঠ ভদকার নাম চেঙ্গিস ভদকা । বৃহত্তম রাস্তার নাম চেঙ্গিস অ্যাভেনিউ । হোটেলের লাউঞ্জ ছোট । কিন্তু বাসকক্ষ প্রশস্ত । সুখের সব উপকরণ

মজুত। এমনকী, এখন যা সর্বত্র প্রচলিত, ঘরে একটি ইলেক্ট্রিক কেটলিও আছে। নিজের চা তৈরি করে নেবার জন্য।

হোটেলের ভোজনশালায় সেদিন দ্বিপ্রহরে লাঞ্চ করে দোভাষীকে ছেড়ে দিলাম। একটু বিশ্রামের দরকার। সে আমাকে একটা প্রোগ্রাম ধরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রীমতী নারানজারগাল আমাদের জন্য সাতদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম করে দিয়ে গিয়েছেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চা করতে গিয়ে আমার স্ত্রী আবিষ্কার করলেন দুধ, চিনি ও কফির ছোট ছোট প্যাকেট আছে, চা নেই। অনুমান করলাম চায়ের প্যাকেট রাখতে ভুলে গিয়েছে। নিচে রিসেপশনে টেলিফোন করে অনুযোগ বোঝাতে অনেক সময় লাগল। রিসেপশনের মেয়েটি সব কথার শেষে খালি বলে, নিচে আসুন, এখানে পাবেন।

নিচেই যেতে হল শেষপর্যন্ত। মেয়েটি বোঝাল এই হোটেলে চায়ের প্যাকেট দেওয়া হয় না। আমরা যদি চাই, তাহলে বাইরে প্রায় দুটো ফুটবল মাঠ পার হয়ে যে কয়েকটি দোকান দেখা যাচ্ছে সেখানে পেতে পারি। তখনও বেশ রোদ রয়েছে, যদিও হিমশীতল হাওয়া বইছে শনশন করে।

মস্ত বড় মাঠের মধ্যে পাঁচ-ছটি স্বতন্ত্র ছোট ছোট দোকান। কাঠের ঘর। কেবিন বা কিয়স্ক বলা যায়। হাড় জমানো হাওয়ার প্রকোপে দোকানদার ছোট্ট একটা ফোকরের ওপর কাচ নামিয়ে দিয়ে কেবিনের ভেতরে বসে। খদ্দের এলে কাচ তুলছে। বাইরের শোকেস দেখে অনুমান করতে হয় কীসের দোকান। আমরা একটা দোকানের মানুষটিকে আমাদের প্রয়োজনের কথা বললাম। সে নির্বিকার তাকিয়ে থাকল। অনেক চেষ্টা করলাম বোঝাবার, কিন্তু কিছুই হল না। দ্বিতীয় দোকানেও ব্যর্থ হলাম। তৃতীয় দোকানের বিক্রেতাও আমাদের হাঁকিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলাম ভেতরের শেলফে লিপটন ছাপ মারা প্যাকেট। টি ব্যাগ। এক বাক্স কিনে হোটেলে ফেরবার আগে জলও দু বোতল নেওয়া হল। এক বোতল জলের দাম পনেরোশো তুগরুক, অর্থাৎ প্রায় দু ডলার। ভেবে আশ্বস্ত হলাম এই ঠান্ডার দেশে বেশি জল খাবার প্রয়োজন হবে না।

মোঙ্গলিয়ার জল যে নির্ভয়ে পান করা যায় না, সোল থেকে প্লেনে আসবার সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম। প্লেনে প্রত্যেক আসনের সামনের পকেটে, এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল, এক বোতল মিনারেল ওয়াটার। জিজ্ঞাসা করতে এয়ারহোস্টেস বলেছিল, মোঙ্গলিয়ার জল না খাওয়াই ভালো।

আসলে মোঙ্গলিয়ায় জল খাবার রেওয়াজ নেই। অন্যতম পানীয় হল ভদকা। তাছাড়া বিয়ার এবং স্থানীয় সস্তার মদ্য এদের পিপাসা নিবারণের পানীয়। ঘোড়ার দুধ থেকে

চোলাই করা মদ কুমিস সাধারণ মানুয়ের প্রিয় পানীয় ।

আমরা আটদিন থাকব এদেশে । প্রথমদিনটা তো কেটেই গেল । দ্বিতীয়দিন থেকে আমাদের প্রোগ্রামের শুরু ।

নিজের ঘরের উষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে সন্ধ্যার পর আর কোথাও যেতে মন চাইল না । হোটেলের ভোজনশালাতেই ডিনার সম্পন্ন করা গেল । সেই বিনা মশলার ইউরোপীয় খাদ্য । স্বাদ চেনা, নামও চেনা । আশ্চর্য, হোটেলে কোনও মোঙ্গলিয়ান খাবার পরিবেশিত হয় না । ভোজনকক্ষের পরিচারক ইংরিজি বুঝতে পারে । কিছু বলতেও পারে । বলল, মোঙ্গলিয়ান পদ চাইলে নিচের বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে যেতে হবে । এই বিশাল রেস্টুরেন্ট সম্পূর্ণ গোলাকার ছাদের নিচে, হোটেলের দুই বাড়ির মাঝখানে । গোলাকার ভোজনশালা বলে নাম বায়ানগোল, তা কিন্তু নয় । বায়ান মানে ঐশ্বর্যময়ী, গোল মানে নদী । আমাদের হোটেলের ইংরিজি নাম হতে পারত রিচ রিভার ।

বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে পরে অনেকবারই গিয়েছি । সেখানেও মোঙ্গলদের নিজস্ব ভোজ্যের সংখ্যা নগণ্য । আসলে, সম্পূর্ণ মেনু কার্ডটিই ছোট । বেশি পদের আয়োজন নেই ।

যেহেতু আমি খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত, অমরেন্দ্রর বন্ধু তাই আমার জন্য যে প্রোগ্রাম করেছেন তাতে সংবাদপত্র অফিস পরিদর্শনের প্রাধান্য । ভদ্রমহিলা নিজেও পরোক্ষে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত । তাঁর একটি বড় ছাপাখানা আছে । সেখানে পাঁচ-ছটি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ছাপা হয় । সর্বপ্রথম তাই দেখতে গেলাম দ্বিতীয়দিন সকালে ।

মোঙ্গলীয়রা সাজসজ্জা ভালোবাসে । মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক গোলাপি রঙের ওপরও রং চড়ায় । মেয়েদের চুল দীর্ঘ এবং নিকষ কালো । এখন শীত পড়েছে, স্ত্রী-পুরুষ সবাই গাম বুটের মতো জুতো পরেছেন । এখানে চামড়া সহজলভ্য এবং সস্তা, তাই ভালো জুতো পরার বিলাসিতা এদের ছাড়তে হয় না ।

নটার সময় প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট । আটটা না বাজতেই দোভাষী পৌঁছে গেল । মেয়েটির চেহারা সাধারণ মোঙ্গলিয়ানদের সঙ্গে মেলে না । ছোট হালকা শরীর, কচিমুখ । আজ সকালে মাথায় প্লাস্টিকের ফুল । কালো ভারি পশমের জামার ওপর কালো ওভারকোট । আমরা তখনও ব্রেকফাস্টে । তাড়াতাড়ি নেমে এলাম । মেয়েটি অধীর পায়চারি করছে । বললাম, এখনও তো অনেক সময় আছে । ইয়াডমটসু বলল, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো, যদি দেরি হয়ে যায় ।

দোভাষীর নাম উচ্চারণ করা সহজ নয় বলে, সে নিজেই বলল, নামের প্রথম অংশটা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ ইয়া। পরে ইয়া নামেই তাকে ডাকা হত।

মেয়েটি ইংরিজি ভালো বলে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর, এক বছর ইংরিজির ক্লাস করেছে। সাধারণ পর্যটকের জন্য তার জ্ঞান যথেষ্ট। কিন্তু আমরা তো সাধারণ নয়। শ্রীমতী নারানজারগাল আমাদের এমন গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমরা গুরুগম্ভীর বাক্যালাপ না করলে তাঁর মান থাকবে না। বিভিন্ন কাগজের অফিসে যাব, সম্পাদকদের সঙ্গে মিটিং হবে, যথার্থ কথা না বলতে পারলে, কঠিন প্রশ্ন না করলে আমার নিজের সম্পাদকত্বই বা থাকবে কোথায়?

প্রথম প্রশ্ন করেই হোঁচট খেতে হল। এখানে সংবাদপত্র কি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন? ইংরিজি প্রশ্নে ফ্রি কথাটি যোগ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ ইয়া বলল, না না আদৌ ফ্রি নয়। সব কাগজের দাম লাগে।

ভুল শোধরাবার জন্য বললাম, সরকারি কোনও বাধানিষেধ নেই? উত্তর শুনলাম, না, যার যেমন ইচ্ছা দাম রাখতে পারে।

অকারণ আর বাক্য বাড়াইনি।

শ্রীমতী নারানজারগালের অফিস খুব বড় কিছু নয়। একটি অফসেট রোটারি আছে। ম্যাগাজিনগুলি মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। নারানজারগাল নিজেও একটি সাপ্তাহিকপত্র শুরু করেছেন, খুব বিক্রি হয় মনে হল না। অফিসের মানুষগুলি ভালো। হাসিমুখে চেয়ে থাকে, কথা হয় না। সমস্ত অফিসে মাত্র একজনই ইংরিজি বলতে পারে। একই বাড়িতে আরও কয়েকটি অফিস। তার মধ্যে একটি হল প্রেস ইনস্টিটিউট। ডিরেক্টর ইংরিজি ভালো বলেন। বিদেশে নানা সেমিনারে গিয়েছেন। পৃথিবীর খোঁজখবর রাখেন। তাঁর কাছে শুনলাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর মোঙ্গলিয়ার পুনর্জন্ম হয়েছে। দেশে বিশেষ কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। পশুপালন এবং কোনও কোনও অঞ্চলে চাষ-আবাদের ওপর নির্ভর করত মোঙ্গলিয়ার অর্থনীতি। ১৯৯০ সালে প্রথম সোভিয়েত আওতার বাইরে মোঙ্গলিয়া স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ঘোষিত হয়। একদলীয় রাজনীতির শেষও হয় তখন। এখন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে। বহুদলীয় প্রথম নির্বাচনে পুরাতন কমিউনিস্ট পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ৭৬ সদস্যের পার্লামেন্টে।

তখন কথাটা মনে হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ৭৬ সদস্যের মধ্যে মাত্র সাতজন মহিলা নিয়েই সন্তুষ্ট মোঙ্গলিয়ার মানুষ। পরে একজন মহিলা সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি দেশের শাসনব্যবস্থায় মহিলাদের স্থান নেই বলে আক্ষেপ

করেছিলেন। তিনিও শতকরা তেত্রিশ জন সংরক্ষণের কথা বলেননি। আশ্চর্য এই যে, মোঙ্গলিয়া প্রায় পূর্ণ সাক্ষর দেশ। কাগজপত্রে দেখেছি, মোঙ্গলিয়ার সাক্ষরতার হার শতকরা পঁচানব্বই। সংখ্যাটায় কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডেনমার্কের এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এদেশে গ্রামোন্নয়নের কাজ করছিলেন। তিনি বললেন, এদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পঁচানব্বই পারসেন্ট সাক্ষরতা অবাস্তব। আসলে পঁচাশি পারসেন্ট হবে। মেরে কেটে নব্বই।

সাক্ষরতায় যারা এত এগিয়ে সেদেশে খবরের কাগজের প্রসার নেই কেন? ডিরেক্টর বললেন, সেদিন পর্যন্ত সার্বভৌম মোঙ্গলিয়া গঠনের পরও কমিউনিস্ট প্রাধান্যে সংবাদপত্রের ওপর নানা বিধিনিষেধ ছিল। সবে দুবছর হল অকমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর খবরের কাগজ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে। এখন পঞ্চাশ-ষাটটি সাময়িকপত্রের নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। তার মধ্যে চারটি দৈনিক কাগজ।

এই সব দৈনিকপত্রের অফিসেই আমাকে যেতে হয়েছিল। সাপ্তাহিকেরও কয়েকটি অফিসে গিয়েছি। আমাদের তুলনায় এখানকার পত্রপত্রিকা অতি সাধারণ। বিক্রিও বিশেষ নেই। তার অবশ্য অন্য অন্তরায় আছে। প্রকাণ্ড দেশ, যানবাহন নেই পর্যাপ্ত, বাঁধানো রাস্তাও অল্প। তার ওপর, এক লাখের ওপর জনসংখ্যার শহর মাত্র চারটি। সেখান থেকে দুটি-চারটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। শহরের বাইরে কোনও কাগজের বিক্রি নেই বললেই চলে। উলানবাটোরের নিকটতম বড় শহর দুশো কিলোমিটার দূর।

সেদিন দ্বিপ্রহরের ভোজন হল নারানজারগালের অফিসের ক্যান্টিনে। মোট ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন কর্মীর জন্য ক্যান্টিন। আহারাদির ঘটা নেই। সবাই এক বাটি নুডল খাচ্ছেন। নুডলে ছোট মাংসখণ্ড এবং কিছু সবজি মেশানো। আমাদের জন্য বিশেষ খাবার, ফ্রায়েড রাইস এবং মাংসের কবাব। ফ্রায়েড রাইস চলনসই। বিনি মশলার ভোজ্যে যেমন স্বাদ হবে কাবাবের স্বাদ তেমনই। তবে ঝলসানোর সুগন্ধ ছিল। জলের বদলে আমাদের জন্য স্প্রাইট বা কোকাকোলা। ভোজনান্তে মস্ত বড় বাটিতে করে সুপের ধরনের কিছু এল। নাম শুনলাম সুখে ছ্যা। অর্থাৎ দুধের চা। ছ্যা শব্দটা জানা ছিল না বলে কাল চা কিনতে গিয়ে এত হেনস্থা। সুখে ছ্যা-ও আমাদের অন্যভাবে হেনস্থা করেছিল। চা-এ চিনির বদলে নুন দেওয়া। শুনেছিলাম তিব্বতীরাও নাকি নুন-যুক্ত চা পান করে। তারা আরও একটু বেশি, দুধের বদলে মাখন যুক্ত হয় চা-এ। দুপুরটা আমাদের ছুটি। সকালে কিছুক্ষণ উলানবাটোরের ম্যাপ দেখেছিলাম। খুব ছড়ানো শহর, জনসংখ্যার পক্ষে। বাস চলাচল করে ঘন ঘন। একদা-অশ্বারোহীদের কাউকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলাম না। এমনিতে অফিস অঞ্চল ছাড়া, সর্বত্র মানুষজন কম।

নারানজারগালের গাড়ি ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়ে আমাদের ভারি সুবিধা হয়েছিল। ক্যামেরার জন্য ব্যাটারি কোথায় পাওয়া যাবে দোভাষী বলতে পারলেন না। ড্রাইভার বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে একটা মস্ত দোকানে নিয়ে গেল। মূল্যবান ক্যামেরা, ভিডিওর যন্ত্রাদি, সাউন্ড সিস্টেম, কী নেই। দোকানটা যেন উলানবাটোরের সঙ্গে মেলে না। একেবারে সর্বাধুনিক। কেনাকাটাও হচ্ছে খুব। রাতে আমাদের অপেরা দেখবার প্রোগ্রাম। পাঁচটার সময় এসে ইয়া আমাদের নিয়ে গেল।

মনে করেছিলাম অনেক দূরে যেতে হবে। তা নয়। সুখবাটার স্কোয়্যারের পিছন দিকে। মিনিট দশেক লাগল। শো আরম্ভ হবে ছটায়। তাহলে এত তাড়াতাড়ি এলাম কেন? ইয়া বলল, যদি দেরি হয়ে যায়, তাই। তখনই অবশ্য অনেকে আসতে আরম্ভ করেছে। অপেরা বাড়িটার বাইরের বারান্দায় এক সার গ্রিক করিন্থিয়ান স্তম্ভ। তারপর চওড়া বারান্দা পার হয়ে প্রবেশদ্বার। এটি জাতীয় সম্পত্তি। অপেরা এবং ব্যালে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু অনুষ্ঠান থাকে। ভেতরটাও বেশ মনোজ্ঞ। ইউরোপিয়ান অপেরা হাউসের মতো লাল ভেলভেটে মোড়া নয়। পিছনের অংশ দোতলা। আমরা বিশিষ্ট আসন পেয়েছি, আমাদের জন্য বক্স। বক্সে আসীন হয়ে নিচে দর্শকদের আনাগোনা দেখছি। সবাই বেশ সাজগোজ করে এসেছেন। অনেকের আপাদমস্তক চামড়ার জামা। মেয়েদের সুগৌর বর্ণে লালের ছোঁয়া, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। সবার পায়েই গামবুট।

ইতিমধ্যে আমার শীত করতে আরম্ভ করেছে। বুঝতে পারলাম প্রেক্ষাগৃহে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। ওভারকোট বাইরে রেখে আসা ভুল হয়েছে। আমাদের বক্সের তিনটি খালি চেয়ারে এবারে দুজন অনুচর নিয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসন নিলেন। তাঁর গায়ে আজানুলম্বিত ওভারকোট। আমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। তিনি মনে করলেন কথা বলতে চাইছি। তিনিও অনেক কথা বললেন, যার বিন্দুবিসর্গ আমরা বুঝতে পারলাম না। আমাদের দোভাষী তাঁকে কী বলার পর তিনি কথোপকথনে নিরস্ত হলেন। ইতিমধ্যে অপেরা শুরু হবার আগে অর্কেস্ট্রা শুরু হয়েছে। এই দৃশ্যটা বড় সুন্দর। সুন্দর পোশাকে কন্সার্টের প্রত্যেকটি শিল্পী সুসজ্জিত। কন্ডাক্টারের হাত ও মাথা নাড়ার সঙ্গে বাজনা বাড়ছে, আবার কখনও কানে কানে কথা বলার মতো একান্ত হয়ে উঠছে।

অপেরার কাহিনী ইয়ার কাছে আগেই শুনে নিয়েছিলাম। প্রণয়ীযুগল যখন সুখের সপ্তম স্বর্গে, তখনই মঞ্চে আবির্ভাব অত্যাচারী শাসকের। লুণ্ঠিতা নায়িকার সন্ধানে প্রণয়ী অরণ্য, মরুপ্রান্তর পার হয়ে পাপিষ্ঠ শাসককে হত্যা করে প্রেমিকাকে উদ্ধার করলেন। যতক্ষণ

নৃত্যগীত চলছিল, শীতের প্রকোপ ভুলে ছিলাম । অনুষ্ঠান শেষ হতেই শীত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর । প্রেক্ষাগৃহ এত ঠান্ডা? অথচ অন্য কারও সামান্যতম কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না । আমার পাশের দীর্ঘ ওভারকোট পরা পদাধিকারী উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বিদায় নিলেন । আমি কাঁপতে লাগলাম । দরজার সামনে ভিড়, উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে, মানুষের চোখমুখে প্রশংসার আলো । ভিড় আর এগুতেই চায় না । আমি ওভারকোটের কাছে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুল । অবশেষে ওভারকোট পাওয়া গেল । যেন পরশমণি পেলাম । ওভারকোটের উত্তাপ প্রাণমন দিয়ে সেবন করতে করতে ভেতরের বারান্দা পার হয়ে বাইরের বারান্দায় পৌঁছলাম । সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল বাতাস যেন ধাক্কা দিয়ে তার উপস্থিতি আমার হাড়ে হাড়ে পৌঁছে দিল । তখনও জানি না আর কত কষ্ট বাকি আছে ।

ক্রমে ভিড় কমে এল । ইয়া আমাদের গাড়ি ও ড্রাইভার ডাকতে গেল । সামনে যে চার-ছটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেগুলি যাত্রী নিয়ে চলে গেল ।

ইয়া ফিরে এসে বলল, ড্রাইভারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, গাড়িও নেই । হয়তো কিছু খেতে গিয়েছে, অথবা ... । এতক্ষণে শেষ দর্শকও চলে গেল, অপেরা হাউসের মস্ত বড় বড় দরজা খুব শব্দ করে বন্ধ হয়ে জায়গাটা নিথর নিঝুম । তারমধ্যে আমি শীতে কাঁপছি । আমাদের মাথার ওপর আলো জ্বলছে, কিন্তু সামনেটা নিরেট অন্ধকার । এবারে সে আলোও নিভে গেল, দুটি ছোট আলো ছাড়া । ইয়া বলল, আরেকবার ড্রাইভারকে খুঁজে আসি । কোথায় যেতে পারে?

চলে যেতেই আমার শীতের কাঁপুনি আরও বাড়ল । অচেনা দেশে, জনহীন প্রান্তরের অন্ধকারে, বিশাল অট্টালিকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি নানা দুর্বিপাকের কল্পনা করতে লাগলাম ।

ইয়া আর আসে না । কতক্ষণ কেটে গিয়েছে কে জানে, ইয়া এসে বলল, ড্রাইভারকে পাওয়া গেল না ।

তাহলে উপায়? ইয়া বলল, একটু যদি হাঁটতে পারেন ওই দূরের রাস্তার আলোর দিকে কিছু উপায় হবে । আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি । হাঁটতে আরম্ভ করলাম অন্ধকারে । ক্রমে সামনে একটা বড় রাস্তা স্পষ্ট হল, সেখানে দুদিকের গাড়ি চলেছে । আমরা রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম । আমি দুচোখ জ্বেলে ট্যাক্সি খুঁজছি, ইয়া হঠাৎ একটা গাড়ি থামাল হাত তুলে । ড্রাইভারের সঙ্গে কী কথা বলে বলল, আসুন, উঠে পড়ুন । কার গাড়ি, কোথায় যাচ্ছি, এসব ভাবনা ছিল না তখন । কিছুক্ষণ পরেই আমাদের হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেলাম । ইয়া আমাকে আর কথা বলার অবসর না দিয়ে চলে গেল ।

পরদিন সকালে শুনলাম, উলানবাটোরে ট্যাক্সি সংখ্যায় কম বলে সব গাড়িই খালি থাকলে ট্যাক্সির কাজ করে। ভাড়াও বাঁধা, প্রতি কিলোমিটার ২০০ তুগরুক, অর্থাৎ ছ-সাত টাকা। পরে আমরাও রাস্তায় এমন চলন্ত গাড়ি থামিয়ে ব্যবহার করেছি।

রীতিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। কত সহজে কঠিন সমস্যার সমাধান হয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমাদের ড্রাইভারও এমনই কোনও সওয়ারি নিয়ে সে রাতে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ইয়াকে প্রশ্ন করে বিব্রত করতে ইচ্ছা হল না।

প্রত্যহ একটি দুটি খবরের কাগজের অফিস দেখে বেড়াচ্ছি। এদেশ এখনও সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নিতান্ত নাবালক। বিক্রি সামান্য হয়, তার মধ্যে মোঙ্গলিয়ান ভাষার সরকারি দৈনিকটির বিক্রি শুনলাম পঞ্চাশ হাজারের ওপর। বিপক্ষদলের একটি কাগজ আছে, সেটি সন্ধ্যায় সরকারি খবরের কাগজের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। বিলি হয় পরের দিন। নতুনত্বের মধ্যে মোঙ্গলিয়ান পার্লামেন্টের একটি খবরের কাগজ আছে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আগে নাকি পুলিশের একটা দৈনিক কাগজ ছিল।

শহরে সংবাদপত্রের বিতরণ হয় পোস্ট অফিস মারফত। চিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেও একদা এই ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক পালাবদল হবার পর, মোঙ্গলিয়ার ডাকব্যবস্থা এখন বেসরকারি পরিচালনাধীন। খবরের কাগজ বিক্রির স্টলও দেখেছি উলানবাটোরে, সংখ্যায় বেশি নয়।

মোঙ্গলিয়ার যে ছবি আমার মনে উৎকীর্ণ ছিল, তার সামান্যই দেখছি উলানবাটোরে। আধুনিক রীতির কিছু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দেখেছি, কিন্তু যে যাযাবর জাতি তাঁবুতে বাস করে, ঘোড়া যাদের প্রধান বাহন তাদের দেখছি না। ইয়া বলল, এখন শহরের মধ্যে তাঁবুতে বাস কমে গিয়েছে। বড় বাড়িতে ফ্ল্যাট পাবার পর অনেকেই তাঁবু ছেড়ে বাড়িতে উঠে এসেছে। আবার এমনও আছে, চার দেওয়ালের বন্দিত্ব অসহনীয় বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে কেউ কেউ তাঁবুতে ফিরে গেছেন। আর, অশ্বারোহী? তাদের দেখা যাবে শহরের বাইরে। তাও বেশি নয়।

শহরের এক প্রান্তে টেলিভিশন স্টুডিওতে যাবার পথে তাঁবু দেখলাম। অস্থায়ী বেড়া দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গায় কয়েকটি কাঠের ও টিনের বাড়ি, তারই মধ্যে দশ-পনেরোটি গোল সাদা তাঁবু। মাথাটা চূড়ার ধরনে, সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এই হল মোঙ্গলীয়দের স্বাভাবিক বাসস্থান। ক্রমশ আরও কিছু তাঁবু দেখলাম শহরের নানা অঞ্চলে। বোঝাই যায় তাঁবুর সংখ্যা কমে আসছে। মানুষ ক্রমশ সভ্যতার আশ্রয় অ্যাপার্টমেন্টে উঠে আসছে।

এখনও প্রয়োজনের অনুরূপ বাসস্থান নির্মিত হয়নি। তাই অনেককেই একটি দুটি ঘর নিয়ে থাকতে হয়। বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে, তাই শহরের অনেক স্থানেই নির্মাণকার্য দেখা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সব অঙ্গদেশে গিয়েছি, বড় বড় বাড়ি তৈরির কাজ দেখেছি। শাসকদল প্রাসাদোপম অট্টালিকা পছন্দ করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব দেশেই জাতীয় সৌধগুলি চমকপ্রদ। মোঙ্গলিয়াতেও তার পর্যাপ্ত নিদর্শন। আরও একটা বিশেষ নজর ছিল সেকালীন শাসকদের, দেশে সাক্ষরতার বিস্তার করা।

আসতে যেতে আমাদের পথে বিশাল একটা বাঁধানো চত্বর পড়ে। সুখবাটার স্কোয়্যার। সুখবাটার মোঙ্গলিয়ার জাতীয় হিরো। মোঙ্গলিয়ার পরিবর্তন আনার ভগীরথ। রাজতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে মোঙ্গলিয়াতে জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতা। সুখবাটারের উদ্যোগে ১৯২৪ সালে মোঙ্গলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্ত হয়। স্কোয়্যারের মাঝখানে অশ্বারোহী সুখবাটারের মূর্তি। স্কোয়্যারের একদিকে পার্লামেন্ট ভবন, আরেকদিকে অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার। দুটিই বিশাল এবং বিশিষ্ট সৌধ। সকালে বিকালে অনেক মানুষ এই স্কোয়্যারে বেড়াতে আসে। মস্কোর রেড স্কোয়্যার বা বেজিংয়ের তিয়েন আন মেন স্কোয়্যারের মতো বিরাট না হলেও সুখবাটার স্কোয়্যার গুরুত্বে কম নয়। এক রবিবার সকালে দেখলাম বিয়ের পর নবদম্পতি সুখবাটারের মূর্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ, চঞ্চল শিশুর দল স্থানটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল।

স্কোয়্যারের নানা স্থানে দলে দলে শিশুরা খেলা করছে, মা-বাবারা অলস ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বয়স্করা বেঞ্চে বসে বিদায়ী সূর্যের উষ্ণতায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, প্রত্যহ বিকেলেই এই দৃশ্য দেখতাম। সূর্যাস্তের পর প্রবলতর শীতে কী হত এখানে আমাদের দেখবার সাহস হয়নি।

উলানবাটোর ছড়ানো শহর বলে কোথাও ভিড় নেই। গাড়ি চলাচল হয় সমান গতিতে, যানজটে আটকে পড়িনি। ইয়ার সঙ্গে সরকারি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গিয়েছিলাম। উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখলাম না। সাধারণ জামাকাপড়, চামড়ার কম দামের জ্যাকেট, টপ বুট। হাতের কাজ প্রায় কিছুই নেই বললে চলে। দুটি মোঙ্গলীয় পোশাকে সজ্জিত ছোট পুতুল কেনা হল। মনে হচ্ছে দাম অনুচিত বেশি ছিল। আমাদের হোটেলের কাছে এবং অন্যত্র দুয়েকটি ছোট বুটিক জাতীয় দোকান ছিল। সেখানে প্রধানত মোঙ্গলীয় পুতুল, জলরঙে আঁকা মোঙ্গলিয়ার ল্যান্ডস্কেপ, মেয়েদের স্টোল। সবই বড় বেশি দাম। মনে হল বিদেশীদের কাছ থেকে যৎপরোনাস্তি ডলার সংগ্রহের চেষ্টা সর্বত্র।

বড় দোকান যে নেই তা নয় । একটি বড় সুপার মার্কেটে গিয়েছিলাম । বিদেশী চিজ মাখন জ্যাম সস ড্রেসিং ফ্রুটজুস কী নেই সেখানে? ডেনমার্কের হ্যাম, জার্মানির সসেজ, ইটালির সালামি, যা চাই । নানাবিধ সবজিও ছিল । এবং ফল । তারও কিছু কিছু বিদেশ থেকে আমদানি করা । বিদেশী পানীয় জল, যা সত্যিই মিনারেল ওয়াটার, তারও উচ্চমূল্যের বোতল । মাছ-মাংসের কাউন্টারগুলিও দেখবার মতো । টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, ক্রিম, শ্যাম্পু, ময়শ্চারাইজার সব বিদেশ থেকে আমদানি করা । দাম যথেষ্ট বেশি, অন্তত টাকার হিসাবে । সম্ভ্রান্ত বিদেশীদের তৃপ্তি ও পরম আরামে রাখবার ব্যবস্থা ।

বলা বাহুল্য, এ দোকান সাধারণ মোঙ্গলিয়ের জন্য নয় । তাদের প্রধান আহার গম এবং মাংস । ছাগ বা মেষ মাংসের দাম খুব কম, প্রতি কেজি ৮০০ তুগরুক । বিফের দাম বেশির দিকে, এখানে বিফের চল নেই তেমন । মুরগির দাম চড়া । দেশে হাঁস-মুরগি পালন উন্নত স্তরের নয়, তাই সরবরাহ কম ।

আমাদের ভোজনের অসুবিধা হচ্ছিল না । রকমারি পদ নেই সত্যি, কিন্তু সাধারণ খাবার হিসাবে খারাপ নয় । প্রাতরাশ তো পূর্ব এশিয়া বাদ দিয়ে সর্বত্র এক হয়ে গিয়েছে । ডিম, পাউরুটি, চা-কফি । অথবা তার রকমফের । পূর্ব এশিয়াতে নানা রূপে ভাত থাকে প্রাতরাশ টেবিলে ।

উলানবাটোরে আমাদের প্রধান দুটি ভোজনে, গ্রিলড ল্যাম বা চিকেন, ল্যাম স্টু, ল্যাম স্নিটশেল অথবা চিকেনের ওই পদগুলি । মিষ্টান্নে ক্যারামেল কাস্টার্ডের বাইরে যেতে পারিনি । হোটেলের ভোজনশালার খাদ্যতালিকা অতি সংক্ষিপ্ত বলে আমরা প্রায়ই বায়ানগোল রেস্টুরেন্টে যেতাম । হোটেলের দুই বাড়ির মাঝখানে বিশাল রেস্টুরেন্ট-শ'তিনেক আসন আছে । পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি অতিথি থাকত না । এক রাতে দেখি বেশ ভিড়, সামান্য কটি টেবিল খালি আছে । আমরা আসন নিয়ে আমাদের প্রয়োজন বললাম । সাধারণত ঠান্ডা পানীয় বা ফলের রস নেওয়া হত । কদাচিৎ ভদকা বা ওয়াইন । আট-দশ ডলারে দুজনের পূর্ণ ভোজন । প্রত্যাশা করিনি, হঠাৎ একজন আপাদমস্তক ভারতীয় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন । দক্ষিণী উচ্চারণে ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথা থেকে আসছি । আলাপ জমতে দেরি হল না । তাঁর এক সহকর্মীও ছিলেন । আমরা চারজন এক টেবিলে বসলাম । প্রথম ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতের । বিলেতের ইউনিলিভারের এজেন্টের কর্মচারী । সানলাইট সোপ থেকে ডাভ, ক্লোজআপ বিক্রি করেন । এখানে পরিবার নিয়ে আছেন, স্ত্রী এবং শিশু কন্যা । দুবছর হয়ে গিয়েছে । শীতকালে সত্যিই নির্বাসিত মনে হয় । অন্য সময় কষ্ট হয় না । বরফ পড়ে না উলানবাটোরে । কিন্তু ঠান্ডা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে যেতে পারে । গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কুড়ি

ডিগ্রির ওপরে ওঠে না । ভদ্রলোক আরও বললেন, শহরটা শান্ত, মানুষেরা নির্বিবাদী । এখানে রাতে পথ চলাচল নিরাপদ ।

তাঁর সঙ্গী হংকং থেকে কদিনের জন্য এসেছেন । তাঁদের হংকং অফিস থেকে চার-ছ মাস অন্তর কেউ না কেউ আসেন । সঙ্গে নিয়ে আসেন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য, মশলা ইত্যাদি, তাই খাওয়াদাওয়ার কোনও কষ্ট নেই । রাত্রি হয়েছিল, আমাদের এবার উঠতে হবে, পরশুদিন আমরা চলেও যাব, তাই আর দেখা হবে না । বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক বললেন, আপনারা আসাতে উলানবাটোরে ভারতীয়ের সংখ্যা বেড়ে এক ডজন হয়েছিল । তাঁর সহকর্মী ফিরে গেলে আবার নজন হয়ে যাবে, যার মধ্যে দূতাবাসের পাঁচজন ।

নতুন দেশে ভোজনের নতুনত্ব হচ্ছে না বলে আমরা ইয়াকে আমাদের কোনও মোঙ্গলীয় রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে বলি প্রায়ই । ইয়া হোটেলের সংযুক্ত রেস্টুরেন্টগুলি দেখিয়ে দেয় । মোঙ্গলীয় খাবার কোথায় পাব তার হদিশ পাই না ।

আমাদের হোটেলের সামনে যে চত্বর, সেখানে চার-ছটি কিয়স্কে দোকান, সেখানে একটি ছোট চালাতে খাবার বিক্রি হয় দেখেছি । দুপুরবেলা স্কুলের ছেলেমেয়েরা বোধহয় টিফিনের ছুটিতে সেখানে ভিড় করে । কাগজের বাক্সে নুডল জাতীয় কিছু কিনে খায় । সেই দোকানেও আমাদের প্রয়োজন বোঝাতে পারি না । স্কুলের একটি ছাত্র সামান্য ইংরিজি বোঝে, তাই দুবাক্স নুডল, মাংসখণ্ড সহযোগে নেওয়া গেল এবং দু বোতল বিয়ার পাশের দোকান থেকে । হোটেলের ঘরে বসে আপাত-মোঙ্গলীয় সেই খাবার খারাপ লাগল না । কিন্তু কোনও নতুনত্ব নেই । অন্য এক খাবারের দোকানে দেখলাম, পাউরুটির মাঝখানে মাংসখণ্ড দিয়ে বার্গার জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছিল । আর দেখলাম আমাদের মাছের ফ্রাইয়ের আকারে অথবা বলতে পারি চেপ্টা সিঙাড়ার আকারে কিছু বিক্রি হচ্ছে । এই পদটির নাম পরে দোভাষীর কাছে জেনেছি, খুরুস । খুরুস ময়দার খোলে কিমা ভরে ভাজা । ভালো লেগেছিল । এটি প্রকৃতই মোঙ্গলীয় পদ ।

ইংরিজি সাপ্তাহিক উলানবাটোর নিউজে একটা বিজ্ঞাপনে দেখি, মোঙ্গলীয়দের সনাতন তাঁবুর ছবি, তলায় লেখা ঘের রেস্টুরেন্ট । আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম । ইয়া কোনওদিনই আমাদের সঙ্গে খায় না । হোটেলের রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করে আমরা দুজনে এক দুপুরে সেখানে রওনা হলাম । রিসেপশনই বলে দিল, ঘের রেস্টুরেন্ট হাঁটা পথ, হোটেলের পিছনদিকে ।

দুপুরবেলা, আকাশে যেমন রৌদ্র, বাতাসে তেমনই ঠান্ডা । খুঁজে খুঁজে হয়রান, ঘের রেস্টুরেন্টে আর পৌঁছতে পারি না । কাকে জিজ্ঞাসা করব, এই অঞ্চলটায় বিশেষ মানুষজন নেই পথে, একদিকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি, সেখানে গিয়ে কাউকে ডেকে

জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় এক মধ্যবয়স্কা মহিলাকে আসতে দেখা গেল। ভাষায়, ইঙ্গিতে অনেক বোঝাতে হল। বারবার ঘের শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগলাম এবং ভোজনের মুদ্রা দেখাতে তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন। কথা না বলে আমাদের হাত ধরে তাঁর যাবার পথের বিপরীত দিকে অনেকখানি নিয়ে গেলেন। আমরা বুঝতে পারছি না তিনি আদৌ আমাদের অভিলাষ বুঝেছেন কিনা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের পিছনে একটি সাদা ক্যানভাসের ঘের দেখা গেল। আমাদের তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে মহিলা আবার ফিরে গেলেন। ঘেরের দরজায় সাবেকি পোশাকে এক তরুণী আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু সেদিন ওখানে ভোজন হল না। একটা বড় আমেরিকান দল সব আসন দখল করে লাঞ্চ খাচ্ছেন তখন।

দ্বিতীয় দিন আবার গিয়ে দেখি জনপ্রাণী নেই ভোজনকক্ষে অর্থাৎ ঘেরের মধ্যে। যথারীতি উষ্ণ অভ্যর্থনা হল। আমরা দুজন, একছত্র দম্পতি সমস্ত ঘের অধিকার করে বসলাম। পরিচারিকার সাজ বড় সুন্দর ছিল, সাবেকি মোঙ্গলীয় পোশাক। মেয়েটিও সুন্দরী। তারই পরামর্শে, অর্থাৎ অসম ভাষার দ্বৈরথে যতটুকু পরামর্শ করা সম্ভব, সিদ্ধান্ত হল আমরা হরহখ ভোজন করব। ভোজ্য আসতে বুঝতে পারলাম হরহখ মানে মেষমাংসের গ্রিল। ঝলসে নেওয়া মাটন বলা যায়। কিছু সবজি সহযোগে ভালো লেগেছিল। ঘেরের ভেতরটা চমকপ্রদ। সেখানে বসে সব কিছুই বুঝি ভালো লাগবে। বৃত্তাকার তাঁবুটির ব্যাস হবে কুড়ি ফুট বা সামান্য বেশি। সমস্ত মেঝে পুরু কার্পেটে মোড়া, দেওয়ালেও কার্পেট টাঙানো আর মাঝে মাঝে কোনও লোমশ প্রাণীর চামড়া। মাথার ওপরেও রঙের বাহার। ঘেরের মাঝখানে একটি ঢাকা লোহার বাক্সের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার নল ধোঁয়া নিষ্কাশনের জন্য তাঁবুর চূড়া দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের বাসের ঘেরও এই ধরনের, সাজসজ্জা থাকে না অবশ্য। কিন্তু এমনই ফেল্টের তৈরি, শীত নিবারণের জন্য। মাঝের আগুন জ্বালাবার বাক্সটি ঘেরকে উত্তপ্ত রাখে, ওখানেই রান্নাবাড়া হয়। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ঘের শুধুই ভোজনকক্ষের কাজ করছে। রান্না হচ্ছে বাইরে অন্যত্র। টেবিল-চেয়ারের বদলে কাঠের শয্যা, আর বিশেষ কোনও আসবাব থাকে না।

জায়গাটা ভালো লেগেছিল, সেই দ্বিপ্রহরে শুধুমাত্র আমাদের দখলে বলে আরও। দুপাত্র ভদকা আদেশ করলাম। বললাম, ছোট। পরিচারিকা বাইরে থেকে ফিরে এসে বলল, ছোট ভদকা নেই। তখনই আমার খটকা লাগা উচিত ছিল। ছোট ভদকা নেই মানে কী? অল্প পরিমাণ ভদকা যদি না থাকে বড় ভদকা কী করে দেবে। এসব কথা আমার কিছু মনে হল না। বললাম, বেশ তো বড় ভদকা দাও। মেয়েটি চেঙ্গিস খান ভদকার বড় নতুন বোতল খুলে আমাদের দুপাত্র ভদকা পরিবেশন করল। পরিবেশ

পছন্দের, ঘেরের উষ্ণতা সুখের, আমরা ধীরেসুস্থে ভদকা সেবন করে হরহখে মনোনিবেশ করলাম । মাংসখণ্ডগুলি সুপক্ক, সদ্য রন্ধনের সৌরভ-আয়োজন সামান্য হলেও সুন্দরী পরিচারিকার হাসিমুখ যুক্ত হয়ে দুপুর ভালোই কাটল । বিল চাইলাম ।

বিল হাতে নিয়ে একটু আশ্চর্য হলাম । মূল ভোজ্যের দাম সাত ডলার, তার ওপরে সালাদ ইত্যাদির সামান্য দু-এক ডলার, আর ভদকার দাম কুড়ি ডলার । দুই বড় পেগ ভদকার দাম কুড়ি ডলার! একটু সময় লাগল বুঝতে । কেন বলেছিল ছোট ভদকা নেই তাও স্পষ্ট হয়ে গেল । এখানে বোধহয় মদ্য পরিবেশনের রীতি নেই । অতিথি চেয়েছেন বলে তাঁর জন্য এক বোতল ভদকা দিতে হল । এবং ছোট বোতল ছিল না বলে বড় ।

বিল চুকিয়ে বড় বোতলসুদ্ধ চেঙ্গিস খান ভদকা নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলাম ।

শ্রীমতী নারানের ব্যবস্থায় এক মোঙ্গলীয় যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল । নাম ওডজারগাল । চল্লিশের নিচে বয়স । নানারকম ব্যবসা করেন । সফল মানুষ । কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক । সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন । এখন দেশে বেসরকারিকরণের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েছেন । অফিস দেখলেই তাঁর উন্নতি বোঝা যায় । আমেরিকান কায়দায় সাজানো অফিস । সব কাজে কম্পিউটার । এখন একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সি খোলার ইচ্ছা । তাই নারানের উদ্যোগে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন ।

দ্বিপ্রহরে একটি সুন্দর রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন । ইউরোপের যে কোনও অভিজাত ভোজনশালার সমকক্ষ । আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে মোঙ্গলিয়ান খাদ্য চেয়েছিলাম । বললাম, বেজিংয়ে একটা পদ খেয়েছিলাম, মোঙ্গলিয়ান হটপট । অত্যন্ত পাতলা করে কাটা ছাগ মাংসখণ্ড ক্ষণিক ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে নানাবিধ সস সহযোগে গ্রহণ করা হয় । ওডজারগাল এমন কোনও পদের নাম শুনেছেন বলে মনে হল না । বললেন, মোঙ্গলিয়ান পট আমাদের বিশিষ্ট স্যুপ । সেটা পরখ করে দেখতে পারেন । তিনিই আমাদের জন্য খাবার নির্বাচন করে দিলেন, লুলিয়া কাবাব । এখানেও মশলা প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু ছাগ মাংস কোনও প্রক্রিয়ায় অতি কোমল এবং পরম সুস্বাদ । মনে হয়েছিল সামান্য রসুনের স্পর্শ আছে ।

এসেছিলেন মার্সিডিজ গাড়ি চালিয়ে । আমাদের ফেরত নিয়ে এলেন তাঁর সহকারী আরেকটি মার্সিডিজে । অফিসের সামনে আরও একটি মার্সিডিজ দাঁড়িয়েছিল দেখেছি । ওডজারগালের সাফল্য ও সম্পদ বুঝতে দেরি হল না ।

অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে ওই মার্সিডিজ গাড়িগুলি এদেশে এসেছে । অত্যন্ত উচ্চমূল্যের গাড়ি । সাধারণের অগম্য । জামার্নির কোনও বন্দর থেকে জাহাজে করে গাড়িগুলি এসেছে চিনের বন্দর সাংহাইতে, তারপর সেখান থেকে দীর্ঘ দুর্গম স্থলপথে উলানবাটোর । মোঙ্গলিয়া স্থলভূমিতে ঘেরা ।

ওডজারগালের অতিপূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান কী করে এই দুস্তর দূরত্ব পার হয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজকের সহজ ভ্রমণের যুগেও কল্পনা করা কঠিন । ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চেঙ্গিস যাযাবর এক মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন । মোঙ্গলিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের অভিষিক্ত দলপতি চেঙ্গিস খান রাজ্য আহরণে বেরিয়েছিলেন । তখনও কামান গোলাবারুদের আবিষ্কার হয়নি । সত্যিকার মরু গিরি নদী কান্তার পার হয়ে, প্রতিকূল নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে চেঙ্গিস এবং তাঁর পরে তাঁর পৌত্র কুবলাই খান যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইয়েলো রিভার থেকে ইউরোপের কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সাম্রাজ্যের মতো বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না । অশ্ব ছাড়া বাহন ছিল না । অথচ কত দুস্তর দূরত্ব অবহেলায় পার হয়েছিলেন তাঁরা । চেঙ্গিস ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন । কঠোর প্রকৃতির মানুষ এই খানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, বলা যেতে পারে পৈশাচিক । যেখানে গিয়েছেন দৈব অভিশাপ মনে করেছে পরাভূত মানুষ । লুণ্ঠন ও হত্যালীলার এমন উদাহরণও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ।

কুবলাই বুঝে গিয়েছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে দেশ জয় করা যায়, কিন্তু রাজ্য শাসন করা যায় না । তিনি তাঁর নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন সেই স্থানে যেখানে আজকের বেজিং । সমগ্র চিন তখন তাঁর পদানত । কুবলাই খান চিনে নতুন রাজবংশের পত্তন করলেন, ইউয়ান রাজবংশ । কুবলাই খানের মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষদের স্থান হয়েছিল । বিশ্রুত ইটালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো কিছুকাল কুবলাইয়ের সভাসদ ছিলেন ।

কুবলাই খান চিনা বিদ্বানদের সহযোগিতায় প্রথম মোঙ্গলীয় লিপির প্রবর্তন করেছিলেন । সাতশো বছর পরে রাশিয়ান প্রভুরা মোঙ্গলীয় লিপির পরিবর্তে রাশিয়ান সেরেলিক লিপি প্রবর্তন করেন মোঙ্গলীয় ভাষা লেখবার জন্য । প্রকৃতিতে যতই নিষ্ঠুর হন, কুবলাইয়ের চরিত্রে মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বিচক্ষণতা ছিল ।

কুবলাইয়ের ইউয়ান রাজবংশ চিনের ওপর বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি । একশো বছর পরে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়ে চিন মোঙ্গলিয়া অধিকার করল । চিনের সে রাজত্ব চলল ২০০ বছর । ১৯১১ সালে মোঙ্গলিয়া স্বাধীন হল । কিন্তু সেও স্বল্পকালের জন্য । শেষ

খানকে সিংহাসনচ্যুত করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম গণতন্ত্র হল মোঙ্গলিয়া । তারপরের ইতিহাস আমাদের জানা ।

মোঙ্গলিয়ার শেষ খান বোগড খানের শীতকালীন প্রাসাদ ও মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম একদিন । শহরের উপকণ্ঠে এই মিউজিয়াম অন্যতম দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে । প্রাসাদের সবই এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের । মিউজিয়ামেরও প্রায় তাই । বিশেষ প্রাচীন কিছু প্রায় দেখাই যায় না মোঙ্গলিয়াতে । এক ডাইনোসর ছাড়া । ছ কোটি বছর পূর্বের এই অতিকায় প্রাণীগুলির একদা উপস্থিতি নিয়ে মোঙ্গলিয়ার গর্বের অন্ত নেই ।

কোথাও পড়েছি পৃথিবীর নানা স্থানে যত ডাইনোসরের অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে মোঙ্গলিয়া দ্বিতীয় । শুনলাম মোঙ্গলিয়ার দক্ষিণাংশ গোবি মরুভূমিতে তল্লাশ করলে এখনও কিছু অস্থি এবং ডিম পাওয়া আশ্চর্য নয় । জাতীয় সংগ্রহশালায়, প্রাপ্ত অস্থি দিয়ে ডাইনোসরের পুনর্গঠিত পূর্ণ কঙ্কাল দেখলে শিউরে উঠতে হয় । অনেকগুলি নানা মাপের প্রস্তরীভূত ডিমও আছে । এই মিউজিয়ামটিতে ডাইনোসরের কঙ্কাল ছাড়াও দেখবার মতো অনেক জিনিস ছিল ।

ফাইন আর্ট মিউজিয়াম আমাদের দেখা হল না । মোঙ্গলিয়ানদের জন্য সামান্য প্রবেশমূল্য, আর বহিরাগতদের জন্য পাঁচ ডলার বা তার বেশি ।

প্রত্যহ সকালে নটার মধ্যে বেরোতে হয় । ইয়া তার ঘণ্টা খানেক আগে পৌঁছে যায় । তাকে কিছুতে বোঝানো যাচ্ছে না যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবার জন্য অত আগে বেরোবার দরকার নেই ।

মাঝে একদিন কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না । দশটা নাগাদ বেরোবার কথা, গ্রামাঞ্চল দেখতে যাব । গ্রাম মানে তো দশ-পনেরোটা তাঁবুর জটলা । সেদিনও ইয়া সকাল আটটাতেই হাজির । ছুটির সকালে মন্থরে তৈরি হব, তার উপায় নেই । বেরিয়ে পড়তে হল । আমাদের গন্তব্য শহরের পুবদিকে টেরিলজ সংরক্ষিত বনাঞ্চল । ষাট কিলোমিটার দূরে । শহর ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা । মাঝে মাঝে পাহাড়, আর না হলে অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত তৃণহীন গৈরিক সমতল । কোনও পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ সবুজ পাইন গাছের ঘন অরণ্য । পাশের পাহাড়টা হয়তো সম্পূর্ণ রিক্ত । কদাচ দুয়েকটি ঘের অর্থাৎ বাসের তাঁবু দেখা যাচ্ছে । অব্যর্থ সাদা রঙের । কখনও এক দুজন মোঙ্গলীয় স্ত্রী-পুরুষ, সারা পথে দশটির বেশি অশ্বরোহী দেখিনি । ওই শুষ্ক প্রান্তরে দূর থেকে সাদা তুলোর মতো ভেড়ার পাল । শুষ্ক পৃথিবী থেকে তারা কী পুষ্টি সংগ্রহ করছে কে জানে । দু-চারটে ছোট পাহাড়ও পার হলাম, পথ উঁচু-নিচু, সর্বত্র সমতল নয় । চেকপোস্টে এক সৈন্য গেট খুলে আমাদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিল ।

এবারে কিছু বড় গাছ, পাইন, ফারও আছে । তৃণহীন পাথুরে পাহাড়গুলোর চেহারা বিচিত্র, যেন কোনও উন্মাদ ভাস্করের রচনা । আলাদা আলাদা বিশাল গ্র্যানাইটের খণ্ড ওপরে নিচে, পাশাপাশি সাজানো । এতক্ষণে দুটি বাস দেখলাম । পর্যটক দল নিয়ে এসেছে । বড় রাস্তা থেকে বাঁদিকে একটু নেমে বড় শুষ্ক মাঠের ওপর যেন এক অতিকায় কচ্ছপ, গ্র্যানাইটের । কারও তৈরি করা নয় । হাজার হাজার বছর ধরে ঝড়-বৃষ্টি বরফে পাহাড়টা এই বিচিত্র রূপ পেয়েছে । আমরা এগিয়ে চললাম । এখানে উন্মুক্ত প্রান্তর নেই, আমরা পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকা দিয়ে চলেছি, কোথাও সংকীর্ণ কোথাও প্রসারিত ।

টেরিলজ রিসর্টে মস্ত খোলা জায়গায় একটি ত্রিতল বাড়ি । হোটেল । যাঁরা বাড়িতে থাকতে চান না তাঁদের জন্য কম্পাউন্ডের মধ্যে পাশাপাশি ছটি ঘের । একটি ঘেরের ভেতরে গিয়েছিলাম । আমাদের দেখা ঘের রেস্টুরেন্টের মতো, সাজসজ্জা কিছু কম । চেয়ার-টেবিলের বদলে দুদিকে দুটি শোবার খাট । আরেকদিকে একটি লেখবার টেবিল । তাঁবু গরম রাখবার সেই সনাতন ব্যবস্থা । লোহার বাক্সে আগুন জ্বালানো রয়েছে । ধোঁয়া বেরোবার নল তাঁবুর চূড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেছে । ঘেরের পিছনে পাকা বাড়িতে শৌচাগার ।

জায়গাটা মনোরম । পাশে গভীর খাদ । তিনদিকে গাছে ঢাকা পাহাড় । মোঙ্গলিয়ার এই এক বৈচিত্র্য । তৃণশূন্য প্রান্তরের পাশে পাহাড়ের মাথায় আচমকা সবুজের সমারোহ । উলানবাটোরের কর্মচঞ্চলতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে পর্যটক এখানে আসেন কদিনের জন্য । ত্রিসীমানায় আর কোনও জনবসতির চিহ্ন নেই ।

উলানবাটোর শহরের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কোনও নিদর্শন নেই । শহরের বাইরের দিকে গন্ডন টেকচিলেন বৌদ্ধবিহার বিশেষ প্রাচীন নয় । শহরে সব পুরনো মন্দির, বিহার এই শতাব্দীর প্রথমভাগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । গন্ডন টেকচিলেন বিহার, তার পাশে আরও একটি এবং লামাদের শিক্ষালয়, এই সব নতুন হলেও স্থানটি সুন্দর । ১৯২১ সালের বিপ্লবের পর এই সৌধগুলি অবহেলায় ও অনাদরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । এখন আবার সংস্কার করে সৌধগুলি এবং সমগ্র চত্বর খুব দেখাশোনা করা হয় । দর্শনার্থীও অনেক আসে । হাওয়া যদি তাড়া না করে বিহার চত্বরে একটা সকাল বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায় । এখানে সাবেকি পোশাকে কিছু লামা ও ভক্তদের দেখেছি ।

উলানবাটোর ছাড়বার আগের দিন বেশি কোথাও যাবার ছিল না । আমরা ইয়াকে ছুটি দিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার গিয়েছিলাম । শহর থেকে বেরিয়েই একটা ছোট কারখানা, তারপর ইতস্তত ছড়ানো পাহাড় এবং জনহীন প্রান্তর । দশ-পনেরো মাইল যাবার পর ছোট শহর, জুমোড পড়ল ।

দশ-বিশটা দোকান, একটা বড় অফিস বাড়ি, কিছু বাসের তাঁবু, টিনের, কাঠের বাসস্থান এবং কয়েকটি মাথা উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউস । শহর ছেড়ে আবার একই নিসর্গ । মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালেও মাথায় পাইন, পপলার গাছের ছোট জঙ্গল । দুয়েকজন অশ্বারোহী, নিঃসঙ্গ ঘের মাঝেমাঝে, আর শুষ্ক চারণভূমিতে আহাররত মেষের দল । আমরা চলেছি মনজশির বিহার, প্রাচীন বুদ্ধমন্দিরে । আমাদের পথ খেন্তি গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে । একপাশে বোগড খান উল, পবিত্র বোগড খান শিখর । বোগড খান শুধু রাজা নয়, তিনি ধর্মীয় প্রধানও ছিলেন । এদেশের বৌদ্ধেরা লামাবাদী ।

জুমোড থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পাঁচ-ছ কিলোমিটার গেলে মনজশির মনাস্ট্রি এবং মিউজিয়াম । মনজশিরের অবস্থান বড় সুন্দর । তিনদিকে পাইন ফার বার্চ গাছের জঙ্গল । তাদের পিছনে গাছের মাথা ছাড়িয়ে নগ্ন গ্র্যানাইটের পাহাড় । আদি মনাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল ১৭৩৩ সালে । কালে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে । বর্তমান বাড়িটি মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছে । আদি মনাস্ট্রির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত দেখা যায় । মনাস্ট্রির সমসাময়িক ব্রোঞ্জের একটি বড় হাঁড়ি এখনও অক্ষত আছে । আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল, এখানে এক হাজার মানুষের জন্য রান্না করা যায় ।

উলানবাটোরে পৌঁছে মনে হয়েছিল এখানে আটদিন কী করে কাটাব । আশ্চর্য, সাতদিন রীতিমতো ব্যস্ততার সঙ্গে কেটে গিয়েছে । কাল আমাদের ফেরার দিন । বুঝতে পারছি মোঙ্গলিয়ার সামান্যই দেখা হল । সময় থাকলে এবং আরেকটু তৎপর হলে একদিন গোবি মরুভূমির প্রান্ত থেকে ঘুরে আসা যেত । এই দেশের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে গোবি মরুভূমি । সব দিন প্লেন যায় না উলানবাটোর থেকে । গাড়ি করে গেলে সারাদিন লেগে যেত । গোবির এক তৃতীয়াংশ বালির পাহাড় আর মরুভূমি । বাকি অংশে মাঝে মাঝে তৃণভূমি আর মরূদ্যান । উঁচু নিচু পাহাড়ও আছে গোবির অনেকখানি জুড়ে ।

সোল থেকে উত্তরে গোবি পার হয়ে উলানবাটোর পৌঁছেছিলাম । ফেরার পথ ভিন্ন । আমরা বেজিং হয়ে সোল যাব । মোঙ্গলিয়ার যে অংশ ইনার মোঙ্গলিয়া, তার ওপর দিয়ে বেজিং যেতে হবে ।

ইরকুটসক না যাওয়ার দুঃখ থেকে গেল । মোঙ্গলিয়ার উত্তর সীমান্ত জুড়ে বৈকাল হ্রদ । ইরকুটসক থেকে বৈকাল যেতে হয় । রাশিয়ান ভিসা করানো হয়নি, তাই ইরকুটসক যাওয়া সম্ভব ছিল না ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

মিজোরামের নীল পাহাড়ে

দীপঙ্কর ঘোষ

বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ে কীভাবে যাওয়া যায়, জানা নেই । তবে নীল পাহাড়, আমাদের দেশেই । দক্ষিণ মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ব্লু মাউন্টেন ন্যাশনাল পার্ক । মিজোরামের এই অঞ্চলটি চিমতুইপুই জেলার মধ্যে । লাই জাতির মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য চিমতুইপুইয়ের প্রশাসনের কাজ চালিত হয় লাই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে । মৃদুভাষী, সরল স্বভাবের মিজোদের রাজ্যে উগ্রপন্থার কোনও স্থান নেই । বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমানে সবচেয়ে শান্তির জায়গা মিজোরাম ।

জানুয়ারির মাঝামাঝি পৌঁছলাম গৌহাটি, এখান থেকে শিলচর যাব । বেসরকারি সংস্থা মিজোরাম ট্র্যাভেলসের রাত্রিকালীন বাস ভোর চারটেয় নামিয়ে দিল শিলচর । বাসস্ট্যান্ডে দেখি প্রচুর অটো আর রিকশা জমায়েত হয়েছে অন্ধকারের মধ্যেই । একটি অটো নিয়ে গেলাম বাসস্ট্যান্ড থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মিজোরাম হাউসে । ভোররাতে রাইফেল হাতে একজন গার্ড ছাড়া সেখানে আর কোনও জনমানুষ চোখে পড়ল না । সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আলো ফুটতে শুরু করলে খোঁজ করলাম একখানা ঘর পাওয়া যাবে কিনা । একজন বাঙালি কর্মচারীর সহায়তায় দুটি গেস্টহাউসের একটিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকার অনুমতি পেলাম । কারণ সেদিনই শিলচর থেকে মিজোরামে প্রবেশের জন্য ইনারলাইন পারমিট সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল ।

মিজোরাম হাউসের লিয়াজঁ অফিসারের সহায়তায় বেলা বারোটার মধ্যে পারমিট হাতে পেয়ে রাস্তার বিপরীতে মিজোরাম ট্র্যাভেলসের কাউন্টার থেকে সেদিন সন্ধ্যার আইজলগামী বাসের টিকিট কাটলাম । গেস্টহাউসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় চাপলাম আইজলগামী বাসে । সহযাত্রীদের অধিকাংশই মিজো ভাষায় কথা বলছেন । বাস চলতে শুরু করলে অন্ধকারে চুপচাপ বসে গান শুনতে লাগলাম । ঘণ্টাতিনেক পরে এক জায়গায় বাস থামলে সহকারী চালক সবাইকে খালি হাতে বাস থেকে নেমে যেতে বললেন । ঠান্ডার মধ্যে নিচে নেমে দেখি মিজোরামের দ্বারপ্রান্ত ভাইরেংতে-তে পৌঁছে গিয়েছি । ইতিমধ্যে মিজোরাম এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের জনাকয়েক লোক বাসে উঠে সবার মালপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন । মিজোরামে বিনা অনুমতিতে মদ নিয়ে প্রবেশ

করা বেআইনি। হঠাৎ দেখলাম ভেতর থেকে একজন অফিসার চালককে ডাকছেন। একটি স্যুটকেশ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তার মালিকের খোঁজ পড়েছে। মালিক এক ঘরফিরতি সেনাবাহিনীর জওয়ান। কৌতূহলী জনতার সামনে সেটি খোলা হলে দেখলাম ভেতরে তিনটি রামের বোতল। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সঙ্গে থাকায় সে যাত্রায় তিনি বেঁচে গেলেন। এক্সাইজ চেকপোস্ট পেরিয়ে আবার কিছুদূরে বাস থামল পারমিটের জন্য। প্রত্যেক অ-মিজো যাত্রীর পারমিটের তথ্যাদি জমা করে বাস আবার অন্ধকার চিরে রওনা দিল রাজধানীর দিকে। জানলার বাইরে অন্ধকার থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি সরু পাহাড়ি রাস্তায় কী অসামান্য দক্ষতায় চালক বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কোলাসিবে রাস্তার ধারে অর্ডার হোটেলে রাতের খাবার-ভাত, ডাল, সরষেশাক সেদ্ধ, শুয়োরের মাংস আর পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে তৈরি চাটনি দিয়ে খেয়ে নিয়েছিলাম।

বিলাসবহুল নরম বাসের সিটে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে, ঘুম ভাঙল লোকের চেঁচামেচিতে। বাইরে প্রচুর গাড়ির আলোর রোশনাই। দোকানের গ্লোসাইনে ঝলমল করছে আইজল। বাকি লেখা সবই রোমান হরফে, তবে পড়ে অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। মিজো-ভাষা রোমান হরফেই লেখা হয়। বাস থেমেছে শহরের মাঝে জারকতে। বর্তমানে শহরে বাস ঢুকতে না দেওয়ায় সমস্ত বেসরকারি দূরপাল্লার বাস আইজলের উপকণ্ঠে এসে থামে। সব ট্যাক্সি মারুতি কার বা ভ্যান। এক যুবক ড্রাইভার এগিয়ে এসে ইংরিজিতে গন্তব্যস্থল জেনে মালপত্র গাড়িতে তুলে নিয়ে আমাদের বসতে বলল গাড়িতে। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম চালৎলাংয়ের ট্যুরিস্ট লজে। ভোরে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। চৌকিদার ও একজন কর্মচারীকে ডেকে তুলে খাতা দেখে জানতে পারলাম আমাদের জন্য ঘর বুক করা আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে গিয়ে দেখি সেখানে মিটার নেই। যুবক বলল, যা খুশি দিন। প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের জন্য পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়ে এসে ঘরে ঢুকলাম। সুন্দর সাজানো ঘর আর পরিষ্কার স্নানঘর দেখে ভালো লাগল।

একটু ঘুমিয়ে স্নান করে প্রাতরাশ সেরে হাঁটা লাগালাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে পূর্বপরিচিত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ব্লু মাউন্টেন যাওয়ার ছাড়পত্র নিতে। অসম্ভব তৎপরতায় সেখানকার কর্মীরা সমস্ত ব্যবস্থা করে পারমিটের এক কপি আমার হাতে দিয়ে বললেন যে সেদিনই তাঁরা ওয়্যারলেস মারফৎ খবর পাঠাচ্ছেন, যাতে ব্লু মাউন্টেন আর পথে নাথিয়াল এবং সাঙ্গাউতে আমাদের জন্য বন দপ্তরের বাংলো সংরক্ষণ করা থাকে।

সেদিন অনেকটা সময় হাতে পেলাম আইজল শহরটা ঘুরে দেখার জন্য। শহরের মধ্যেই চিড়িয়াখানা কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন। আর দেখার কিছু গির্জা ও ধর্মীয় সৌধ।

এসব দেখে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় ফিরলাম ট্যুরিস্ট লজে । রিসেপশনিস্ট এবং তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কফির টেবিলে আড্ডা মারতে মারতে একসময় নৈশভোজের ডাক পড়ল ।

পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল এক ফরেস্ট অফিসারের ডাকে । ভদ্রলোক নিজের জিপসি নিয়ে পৌঁছে দিলেন বাসস্ট্যান্ডে । চেপে বসলাম নাথিয়াল বাজার বাসে । চালক কিশোর ভালো ইংরিজি জানে, জায়গার নাম করে করে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল । বাস থামল সেলিংয়ে, সকালের খাওয়ার জন্য । আবার ভাত, লাইপাতা বা সর্ষেশাক ও মাংসের ঝোল দিয়ে খাওয়া সেরে যাত্রা শুরু হল । বাসরাস্তার ধারে আগুন রঙের কমলালেবু ভর্তি গাছে ব্লু ম্যাগপাইয়ের রাজকীয় ভঙ্গিমায় উড়ে এসে বসা আর উপত্যকার ওপর ক্রেস্টেড সারপেন্ট ঈগলের ওড়া দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম চিনছিপ । স্থানীয় মেয়েরা পথের পাশে বসে নানারকমের ফল ও সবজি বিক্রি করছে । সেরছিপ থেকে দারুণ সুস্বাদু কলা আর কমলালেবু নিয়ে নিলাম ।

বেলা দেড়টায় পৌঁছলাম নাথিয়াল, বাসরাস্তা থেকে চারশো মিটার দূরে বনবাংলো । ঘরের দুদিকের জানলা দিয়ে তাকালে দুরকম রূপ । একদিকে প্রায় শহরতলি নাথিয়ালের জনবসতির শান্ত জীবন, বাচ্চারা অলসভাবে কাঠ কাটছে রাতে আগুন জ্বালাবে বলে; অন্যদিকে পাহাড়ের ঢালু গা নেমে গিয়ে অনেক নিচে উপত্যকায় মিশেছে । সেদিকে গাছের গায়ে ঝুলছে সাদা আর বেগুনি অর্কিড । সন্ধ্যায় দেখলাম সেখান থেকে উঠে আসছে দুজন মানুষ । একজনের হাতে ছোট মাছধরার জাল, সঙ্গে কয়েকটি পাহাড়ি নদীর মাছ -অন্যজনের কাঁধে ঝুড়িতে শুকনো কাঠের বোঝা, তার ওপর সত্যিই কিছু কচুজাতীয় শাকের আঁটি । জিজ্ঞাসা করে জানলাম সকালে গিয়েছিল নিচে তুইপুই নদীর ধারে ভুট্টার জন্য খেত তৈরি করতে, ফিরে এসেছে রাতের খাবারের জোগাড় করে । বৃদ্ধ চৌকিদার সুইয়া আগে সেনাবাহিনীতে ছিলেন, ভালো হিন্দি বলেন । ঘরে মালপত্র ঠিকঠাক করে রেখে রাতের আহারের ব্যবস্থা করে রেখে হোটেলে আমাকে নিয়ে গেলেন নাথিয়ালের রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করাতে । জানলাম একটি নদী পেরিয়ে মোট ৬৮ কিলোমিটার গাড়িতে চেপে যেতে হবে সাঙ্গাউ, ব্লু মাউন্টেন জাতীয় উদ্যানের রেঞ্জ অফিস । কোনও সাধারণ যানবাহন পাওয়া যায় না, দুয়েকটি চাল-গমবহনকারী ট্রাক ছাড়া ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল কাছেই বাড়িগুলিতে পোষা মোরগের ডাক শুনে-বেরিয়ে দেখি ঝলমলে রোদ । বকুল ফুলের মতো ফুল ফোটা বড় একগাছে পক্ষীকূল সমাগত প্রাতরাশের জন্য । নাথিয়ালের ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ ইন্সপেক্টর জুয়ালার সহায়তায় একটি ট্রাকে যাবার ব্যবস্থা হল । ট্রাক বলতে সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ওয়ান টনার । বেলা নটায়

চাল চিনির বস্তা নিয়ে ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার গতিতে ট্রাক চলতে আরম্ভ করল। কিছুদূর গিয়েই লুংলেইগামী হাইওয়ে ছেড়ে আমরা অন্যরাস্তা ধরলাম। একসময় পৌঁছলাম বহুশ্রুত কলোডাইন বা চিমতুইপুই নদীর পাড়ে। মারবোট বলে পরিচিত বড় এক গাদাবোটে গাড়িসুদ্ধু আমরা সবাই চেপে বসলাম। কাচের মতো জল, সরু পাহাড়ি খরস্রোতা নদী পেরোতে সময় লাগল দু-মিনিট। ছোট ছেলেমেয়েরা ভেলা নিয়ে মাছ ধরছে বা বালি পারাপার করছে।

ভয়ঙ্কর এবড়ো-খেবড়ো পথে পৌঁছলাম দারজো। সেখানে বেশ কয়েকটি বাড়ির সামনে দেখলাম প্রচুর বন্যজন্তুর খুলি আর পাখির পালক দিয়ে অলংকৃত করা রয়েছে। ট্রাক থামিয়ে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেগুলি বেশ কয়েকযুগ আগে বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষদের শিকার করা। পরের গ্রাম দক্ষিণ ভনলাইফাইয়ে উপত্যকাটি বেশ বড়। স্থানীয় লোক চাষের কাজে ব্যস্ত-অনেকটা গ্রামবাংলার ছবি। বৃদ্ধ চাষী ততোধিক বয়স্ক বলদ নিয়ে হালচাষ করছেন। ট্রাকড্রাইভার দেখাল দূরে দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে ব্লু মাউন্টেনের একাংশ। গ্রামে রাস্তার ধারের দোকানে চা খেয়ে রওনা হলাম।

সন্ধ্যার মুখে পৌঁছলাম সাঙ্গাউ। রেঞ্জ অফিসার জামা পথে অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাংলোয়। সামান্য মশলায় রান্না করে নানাপ্রকার খাবার নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সারাদিনের খিদে নিয়ে অনেকখানি খেয়ে যাত্রার ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে রসদপত্র কিনে নিয়ে পোর্টার ঠিক করে রওনা হলাম নয় কিলোমিটার দূরের ফারপাকে বনবাংলোর উদ্দেশে, খাড়া চড়াই রাস্তা। আড়াইঘণ্টা সময় লাগল। পাহাড়ের মাথায় ফারপাক, পাঁচ কিলোমিটার দূরে সবচেয়ে কাছের গ্রাম থালৎলাং। সেখান থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে কলোডাইন নদী, অন্য পারেই মায়ানমার। প্রচুর মিজো লোকের আত্মীয়স্বজন সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারের গ্রামগুলিতে থাকেন। সেদিন রান্না ও অন্যান্য কাজকর্মের তদারকিতে অনেক সময় কেটে গেল। কারণ ফারপাকে লোকজন থাকে না। কেউ এলে চৌকিদার আর গার্ডরা আসে গ্রাম থেকে। রাতে খেয়ে দেয়ে বাংলোর ঘরে ঘুমোতে গেলাম কলারড স্কোপস আউল আর নাইটজারের ডাকের প্রতিযোগিতা শুনতে শুনতে।

দেশের সবচেয়ে পূর্বে হওয়ায় এখানে খুব তাড়াতাড়ি সূর্যোদয় হয়। ঠিক ভোর চারটে পঞ্চাশে মায়ানমারের পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠল। ঘন নীল আকাশ যেখানে সবুজ অরণ্যে

মিশেছে সেখানে পাহাড়ের রং নীলাভ দেখায় । এই জন্যই বোধহয় নাম নীল পাহাড় । স্থানীয় ভাষায় ফাংপুই ।

লাল রডোডেনড্রনের ফুলের ভারে নুয়ে পড়া গাছের ওপর ফায়ার টেলড সানবার্ড আর ইউহিনার ঝাঁক কিচিরমিচির করছে । মাঝে মধ্যে পালাচ্ছে গ্রে সিবিয়ার তাড়া খেয়ে । বেলায় পাহাড়ের প্রান্তের কাছে গিয়ে কিছু গোরাল চোখে পড়ল । তিনঘণ্টা হেঁটে পৌঁছলাম উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ফাংপুই পিকে, ২,১৫৭ মিটার, মিজোরামের সর্বোচ্চ জায়গা । চারপাশের দৃশ্য দেখার জন্য ওয়াচটাওয়ার তৈরি করা হয়েছে । সঙ্গে টর্চ নিয়ে এসেছিলাম দেরিতে ফিরব বলে । সকালে মায়ানমারের পাহাড়ের মাথায় সূর্যোদয় দেখেছিলাম, বিকেলের শেষে দেখলাম বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে সূর্যকে অস্ত যেতে । ফেরার পথে সন্ধেয় জঙ্গলে যাওয়ার অন্য অনুভূতি । পায়ের শব্দে সচকিত বার্কিং ডিয়ারের চিৎকার করে পালানো আর মাথার ওপর গাছের ডালে ভীতসন্ত্রস্ত কালিজ ফেজ্যান্টের ডানা ঝটপটানি বেশ গা ছমছমে পরিবেশের সৃষ্টি করে । আমার কাজ ছিল ব্লাইথস ট্র্যাগোপান (স্থানীয় ভাষায় ভাঙা)-এর খোঁজ করা । তার দেখা পেয়ে চোখ সার্থক হয়েছে ।

দু-সপ্তাহ ব্লু মাউন্টেনে থেকে মনে হল আবার ফিরতে হবে এই জায়গায় । যেখানে সূর্যের আলো গাছের পাতার ফাঁক না পেয়ে মাটিতে পৌঁছতে পারে না, বনের পাখির ডাকে সকালে ঘুম ভাঙে, সতেজ হাওয়ায় শরীর মনও সবুজ থাকে ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

গৌহাটি থেকে সরাসরি বাসে আইজল যাওয়া যায় । সময় লাগে ১৮ ঘণ্টা । কলকাতা থেকে ইনারলাইন পারমিটের ব্যবস্থা করে নেওয়া সব থেকে ভালো । যোগাযোগের ঠিকানা:

Liason Officer

Mizoram House, 24 Ashutosh Chowdhury Avenue (Old Ballygunge Road)

Kolkata-700 019 % (033) 2475-6430/7034

আইজলে ভালো হোটেল রিৎজ, অহিংস, সাংছিয়া, ক্যাপিটাল গেস্টহাউস । এগুলির দ্বিশয্যাঘর ২৫০-৫০০ টাকা । বনবাংলো সংরক্ষণ আর ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশের জন্য অনুমতি সংগ্রহের ঠিকানা:

The Chief Wildlife Warden

Chief Conservator of Forests Office, Principal Tuikhuatlang, Aizawl

Mizoram-796 001 % (0389) 25371

যাওয়ার সব থেকে ভালো সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। তবে এরজন্য আগে থেকে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভ্রমণ আগস্ট, ১৯৯৮

সিন্ধুদুর্গ

বিশ্বদীপ দত্ত

কোঙ্কন রেলপথের সিন্ধুদুর্গ স্টেশনে যখন নামলাম তখন বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে মেঘ, তবু বিকেলের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। ঝকঝক করছে নতুন তৈরি স্টেশনঘরের সামনে নির্জন প্ল্যাটফর্ম। লাইনের ওপারে জঙ্গল। এপাশে দূরে পাহাড়ের রেখা। পিছনের কামরা থেকে দুজন যাত্রী নেমে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম ধরে। লোকালয়ের চিহ্ন নেই ধারেকাছে। শহরে যেতে হবে রাতে থাকার হোটেলের জন্য।

হাওয়ায় ভিজে ভিজে ভাব। আগে চা খেয়ে তারপর দেখা যাবে যানবাহন কী পাওয়া যায়। একপাশে রয়েছে স্ন্যাকস কাউন্টার। একা বসে বোধহয় বোর হচ্ছিলেন দোকানদার। দেখামাত্র তৎপর হয়ে উঠলেন। শহরের কথা বলাতে জানতে চাইলেন কোন শহরে যেতে চাই।

যেতে চাই সিন্ধুদুর্গতে। কিন্তু সেই নামে নাকি কোনও শহরই নেই। সিন্ধুদুর্গ তো একটা জেলা। সেখানে আমি এসে গেছি। সেই জেলার কোন শহরে যেতে চাই, আবার জিজ্ঞেস করলেন দোকানদার। আগন্তুকের পক্ষে বেশ কঠিন প্রশ্ন। কাছাকাছি কোনও দুর্গ আছে কি? সেটা কোন শহরে? এবার বুঝে গেছি, ভদ্রলোক বললেন। আপনাকে মালবণ যেতে হবে। বেশি নয়, এক-দেড় ঘণ্টার পথ। স্টেশনের সামনে বাস পাওয়া যাবে সন্ধে নাগাদ। আর লাইন ধরে শর্টকাটে একটু হেঁটে ব্রিজের কাছ থেকে বাঁদিকের রাস্তায় চলে গেলে বাস পাওয়া যাবে তার আগেই।

রেললাইনের পাশ দিয়ে টিলার কোল ঘেঁসে এগিয়েছে পিচরাস্তা। সামনের ব্রিজ পার হয়ে চলে গেছে বাঁদিকে। লাইন ধরে মিনিট তিনেক হেঁটে ওঠা গেল ব্রিজের কাছে। পিছনে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট দুর্গের মতো করে তৈরি স্টেশনের সাদা বাড়িটাকে। চারদিক সবুজে সবুজ। ছায়া ছায়া বিকেলে জায়গাটাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে মনে হল ভাগ্যিস নেমেছিলাম এখানে ট্রেন থেকে! ব্রিজ পার হয়ে আবার গাছপালার মধ্য দিয়ে বাঁক নিয়ে এগিয়েছে রাস্তা। দুপাশে ঘন সবুজে বেশ জঙ্গল জঙ্গল ভাব। একটা লোকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না পথে। ঠিক দিকে যাচ্ছি কিনা ভাবতে ভাবতে আরও প্রায় এক

কিলোমিটার হেঁটে মোড়ের কাছে এসে দেখা গেল দুজনকে । ট্রেন থেকে নেমে আমার আগেই এসে পাথরে বসে আছেন তাঁরা ।

বাস এল কণকবলী থেকে । বম্বে-গোয়া রেলপথে সিন্ধুদুর্গের আগের স্টেশন কণকবলী । সেই স্টেশনে নেমে গেলে ফাঁকা বাস ধরতে পারতাম টার্মিনাসেই । সিন্ধুদুর্গের পরের স্টেশন কুডাল থেকেও ছাড়ে মালবণ যাওয়ার বাস । তবে কোঙ্কন রেলপথে স্টেশন থেকে শহরের বাসস্ট্যান্ড সাধারণত কিছুটা দূরে, আর খুব বেশি ভিড়ও হয়নি বাসে । একটা সিট খালি হতেই ট্রেনের সঙ্গী দুজন বসতে দিলেন আমাকে । বাইরে থেকে এসেছি বলে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন অনেকেই, পরামর্শ দিচ্ছিলেন নানারকম । সুদূর কলকাতার লোক সিন্ধুদুর্গের নাম জেনে গেছে দেখে সবাই খুশি । বললেন, নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করা যেতে পারে কোঙ্কন উপকূলের যে কোনও জায়গায় । আর সিন্ধুদুর্গের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করবেই । নীল সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপের মধ্যে শিবাজি তৈরি করেছিলেন সেই দুর্গ । মালবণের জেটি থেকে যেতে হবে নৌকায় ।

মুম্বই থেকে ট্যুরিস্ট বাস আসে মালবণে, জানালেন একজন । বিকেলে ছেড়ে এসে পৌঁছয় ভোরবেলায় । আবার মালবণ থেকে বিকেলে রওনা হয়ে ভোরে ফিরে যায় মুম্বইতে । রিটার্ন টিকিটও নিয়ে আসা যায় মুম্বইয়ের এম টি ডি সি কাউন্টার থেকে । ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট বাস চালু করার পর ছুটির দিনগুলোতে আজকাল অনেক লোক আসে কেল্লায় বেড়াতে । কাছাকাছি তারকর্লি বিচে টেন্ট রিসর্টও হয়েছে পর্যটকদের থাকার জন্য ।

তারকর্লি মালবণ থেকে অটোরিকশায় পনেরো মিনিটের পথ । বাস থেকে নেমে চলে যেতে পারতাম সেখানে । কিন্তু সহযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তখন মালবণ শহরটাকেও ভালো লাগতে শুরু করেছে । সেদিন দুর্গাপুজোর রাত । শহরে উৎসব । একটা রাত শহরে থেকে, মালবণী খাজা খেয়ে, কেল্লা বেড়িয়ে, তারপর তারকর্লি সৈকতে যেতে অনুরোধ করলেন সবাই । তাদের কথা না শুনে যদি চলে যেতাম, তাহলে পরদিন ঘুরতে এসে মালবণী খাজার স্বাদ যদি বা নিতে পারতাম, দূরে থেকে মালবণ শহরের স্বাদটা হয়তো বুঝতেই পারতাম না ।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় কোঙ্কন উপকূলের নির্জন সমুদ্রসৈকত । এখনও বাইরের পর্যটকদের কাছে প্রায় অপরিচিত মহারাষ্ট্রের আশ্চর্য সুন্দর নানা সৈকতভূমি । তটরেখা ধরে ছড়িয়ে থাকা নানা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজির রাজত্বকালে তৈরি দুর্গগুলো খুঁজে বের করাও খুবই রোমাঞ্চকর । আর তেমনই আকর্ষণীয় কোঙ্কনী মানুষজন, তাঁদের গ্রাম আর পুরনো শহরগুলো । আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক সংস্কৃতি পৌঁছে গেছে সবজায়গাতেই । তবু তারমধ্যেও এখনও টিকে আছে কোঙ্কনের নানা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

। তাই তারকর্লি বিচ আর সমুদ্রের বুকে সিন্ধুদুর্গের মতোই আকৃষ্ট করে মালবণ শহরের পথঘাট-দোকানপাটও । ভারতের পুবতট থেকে পশ্চিমতটের শহরে পৌঁছে অনেক কিছুই মনে হয় বিচিত্র, অপরিচিত ।

দশেরার সন্ধ্যায় ঠাকুর বেরিয়েছে মালবণের রাস্তায় । হাতেটানা গাড়ি টানতে টানতে চলেছেন ভক্তরা । একবার দড়িতে হাত লাগানোর জন্য ভক্তদের হুড়োহুড়ি । গাড়ি ঘিরে ভিড় করে চলেছে জনস্রোত । কিছুটা দূর থেকে পাহারা দিয়ে ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে পুলিশের ওয়ারলেস জিপ । দোকান-বাজারের মধ্যে সরু গলিপথে সেই ভিড় পার হয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই । জনস্রোতের মাথা ছাড়িয়ে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে দেবীর প্রশান্ত মুখ । ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখি দেবীর আট হাত । সকালে চার হাতের মূর্তি দেখে এসেছি রত্নাগিরিতে । দুর্গার হাত কটা থাকে, জিজ্ঞেস করলাম একজনকে । এই ঠাকুরের আটটা আছে । দুটোও থাকতে পারে, জানালেন তিনি । 'ইচ্ছেমতো বানানো যেতে পারে, কোনও নিয়ম নেই!' 'নিয়ম তো নিশ্চয়ই আছে', ভদ্রলোক বললেন, 'তিনটে তো আর বানায় না কেউ । বিজোড় চলবে না । একপাশে দুটো আরেক পাশে একটা হলে নিশ্চয়ই ভালো দেখাবে না! দুর্গার হাত হবে সবসময়ই দুটো বা চারটে, কিংবা ছটা, আটটা । এমনকী বারোটাও বানায় কেউ কেউ' । 'দশটা হয় না?' 'না, দশটা হতে পারে না', একটু চিন্তা করে বললেন তিনি, 'দুপাশে পাঁচটা পাঁচটা হলে তো বিজোড়ই হয়ে যাবে' । এটা কোনও যুক্তিই নয় । ছ-হাতের দুর্গা হলেও একপাশে তিনটে হাত থাকছে । শুনে একটু বিরক্ত হলেন ভদ্রলোক । বললেন 'দশ হাতের দুর্গা তো হয় না কখনও' । দেবী তুলজা ভবানী বর দিয়েছিলেন শিবাজিকে । দুর্গার সেই রূপ ব্যাঘ্রবাহিনী, হাতে তলোয়ার, চতুর্ভুজা । কিন্তু দশভুজা দুর্গার কথা শুনেছে এমন ব্যক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেদিন রাতে । 'দশ হাত কখনওই হতে পারে না, কারণ শাস্ত্রেই নেই', জানিয়ে দিলেন একজন ।

হোটেলে ঘর নিয়ে স্নান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি খাবারের খোঁজে । সিন্ধুদুর্গ শোভা লজে সেদিন রান্নার ব্যবস্থা নেই । পুজোর জন্য ছুটিতে আছেন কর্মচারীরা । ম্যানেজার বললেন, প্রায় সব লজেই সেদিন রান্না বন্ধ । কাছেই ভালো খাবার পাওয়া যায় ময়ূর লজের রেস্টুরেন্টে । না হলে যেতে হবে বাজারের চৈতন্য হোটেলে । ময়ূর লজের নাম শুনেছিলাম বাসে । সহযাত্রীরা সেখানেই থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন । গিয়ে দেখি পুরনো বনেদী বাড়ির দোতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে লজ হয়েছে । ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন সম্ভ্রান্ত চেহারার সুদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক । দুঃখ জানিয়ে বললেন, তাঁর কর্মচারীরাও সেদিন ছুটিতে । পিছনের গলিতে আর যে দুটো খাবারের হোটেল আছে সেসবও সেদিন বন্ধ । যেতে হবে বাজারে । কথা বলে ভালো লাগছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে । ভালো লাগছিল বাড়িটাকেও । উঁচু ছাদের খোলামেলা ঘরে কাঠের কড়িবরগা নিয়ে

এইরকম পুরনো বাড়িগুলোতে এক ধরনের রহস্যময়তা থাকে। রাস্তার দিকের ঘরটাই পছন্দ হচ্ছিল। ভাড়া কিছু কমই হত এই লজে থাকলে। আর মানানসইও হত মালবণ শহরের মেজাজের সঙ্গে।

পরদিন দুপুরে খেতে আসব জানিয়ে বিদায় নিয়ে চললাম বাজারের দিকে। রাস্তায় তখন সেজেগুজে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন অনেক লোক। উচ্ছল মেয়েরা চলেছে দলবেঁধে। নানা সাজসজ্জার মধ্যে নজরে পড়ছে মেয়েদের মাথার পিছনে চুলে ঘাসের সাজ। দোকানে দোকানে ভিড় খুব। দুপাশে পর পর মালবণী খাজা আর কাজুবাদামের দোকান। সাইনবোর্ডগুলো পড়া যাচ্ছে কারণ মারাঠি ভাষার হরফ দেবনাগরী। হাঁটতে হাঁটতে পাওয়া গেল চৈতন্য হোটেলটাকে। নিরামিষ খাবার নয় তো, আশংকা ছিল মনে মনে। ম্যানেজার অভয় দিলেন, নাম চৈতন্য হলেও মাছ পাওয়া যাবে সেখানে। কী মাছ আছে? সুরু আর বাংলা, বললেন ম্যানেজার। এতদূর এসে বাংলা মাছ খাওয়ার মানে হয় না। সুরুই দিতে বললাম।

সুরু-মিল অর্ডার চলে গেল কিচেনে। পাশের টেবিলে বসেছিলেন শিশুকন্যা কোলে নিয়ে এক মারাঠি দম্পতি। দেখলাম আশ্চর্য দুটো থালা নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের জন্য। মিলের অর্ডার ছিল বোধহয়। বিশাল থালার একপাশে ভাঁজ করে দেওয়া হয়েছে ঘি মাখানো রুটি। তারপর গোল করে থালার ধার দিয়ে সাজানো রয়েছে ছোট ছোট একগাদা বাটিতে তরকারি, ভাজা, আচার, দই। আর থালার ঠিক মাঝখানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা করে বড়সড় কাটলেট। রুটি-তরকারির সঙ্গে কাটলেটের কম্বিনেশন আগে কখনও শুনিনি। ভাব দেখে মনে হল কাটলেটের সাইজ দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছেন মারাঠি দম্পতি। অবাক হওয়ার তখনও কিছু বাকি ছিল। কারণ একটু পরেই আমার জন্যও উপস্থিত একই রকমের একটা থালা।

মাঝখানের জিনিসটা কাটলেট নয়। বুঝতে পেরেছি ততক্ষণে। একটা বড় মাছকে আড়াআড়ি কেটে ভেজে দেওয়া হয়েছে এক ফালি। এভাবে কাটলে মাঝখানে যে ফুটো থাকে সেটাও বুজে গেছে পুরোপুরি। তার ওপরে ছড়ানো রয়েছে পোস্তদানার মতো কোনও কিছু। দেখাচ্ছে অবিকল কাটলেটের মতো। 'খেতে পারছেন না মনে হচ্ছে?' ম্যানেজার এগিয়ে এলেন, 'রুটি শেষ হলে ভাত দেওয়া হয়। আগেই দিতে বলব কি?' 'রুটিটা সমস্যা নয়। সবকিছুতে এত টক দিয়েছেন কেন?' 'টক নয়, আমসোল দেওয়া হয়েছে।' ম্যানেজার রান্নাঘর থেকে একটা শুকনো ফল এনে দেখালেন। এই আমসোল শুকিয়ে রেখে সারা বছর রান্নার সময় কারি বা আমবাটিতে দেওয়া হয়। আর এটা কী, লাল রঙের দই কেন? জানা গেল সেটা দই নয়, সোলকড়ি। নারকোলের রসের মধ্যে

দেওয়া হয়েছে কোকুম ফলের লাল রস। 'আর এ বাটিতে কী আছে?' ওটা মাছের কারি। নারকোল পেষা আর পাউডার মশলার জন্য ঘন দেখাচ্ছে। নিচে মাছ আছে। 'আর তার পাশে?' ওটাও মাছের মাথার কারি। নারকোলের কারিতে ঢাকা পড়ে গেছে। 'কী মুশকিল, মাছের-মিল অর্ডার দিয়েছি বলে সবটাই মাছ দিয়েছেন না কি?' প্রবল আপত্তি জানালেন ম্যানেজার। এই তো রয়েছে আমবাটি। অর্থাৎ ডাল। তারপাশে লোনচেবাটি। অর্থাৎ আচার। 'কাটলেটের ওপর কী ছড়ানো হয়েছে?' 'কাটলেট কোথায়, ওটা সুরমাই মাছ। ওপরে চালের গুঁড়ো দিয়ে ভাজা'। সুরমাই মাছের নাম তো জানি। তাকেই ডাক নামে সুরু বলা হচ্ছিল এতক্ষণ! 'আর বাংলা মাছটা কী?' বাংলা নয়, সেটা বাংরা মাছ। ম্যানেজার খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কোথা থেকে আসা হয়েছে জানতে চাইলেন। 'এসেছি কলকাতা থেকে। আপনি শিগগিরি একটা বাংরা মাছ নিয়ে আসুন। খেয়ে দেখব সেটাও।' চটপট এসে গেল আরেকটা প্লেট। চালের গুঁড়ো মাখা হৃষ্টপুষ্ট বাংরাভাজার মাথা আর লেজ বেরিয়ে আছে প্লেট ছাড়িয়ে।

অজস্র মাছ পাওয়া যায় কোঙ্কন উপকূলে। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখি সার বেঁধে জেলে নৌকা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের কিনারে। হোটেলটা যে সমুদ্রের কাছে সেটা জেনেই ঘর নিয়েছিলাম, কিন্তু রাতের অন্ধকারে বুঝতে পারিনি যে একেবারে ঘরের জানলার নিচ থেকেই শুরু হয়েছে বালির তট। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাঁধানো পাড়ের কাছে জল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি নারকোল গাছ। আর তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বন্দরে ছোট বড় নানা আকারের রংবেরঙের নৌকা। মাথায় পতাকা লাগিয়ে নৌকাগুলো এক এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে জলে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে হালকা ঢেউয়ে। আরও কিছুটা দূরে জলের বুকে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট দুটো দ্বীপ। তারই একটাতে রয়েছে সিন্ধুদুর্গ।

ভোরের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটাতে এমন স্নিগ্ধভাব যে দেখামাত্র মন ভালো হয়ে যায়। তখনই বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জেটিতে। সিন্ধুদুর্গে যাওয়ার জন্য তার আগেই অপেক্ষা করছিলেন দু-চারজন। মাঝি জানালেন আর কয়েকজন যাত্রী হলে নৌকা রওনা হবে কেল্লার দিকে।

সচরাচর যে রকম দুর্গ দেখা যায় সিন্ধুদুর্গকে তেমন দেখাচ্ছিল না দূর থেকে। সমতল দেখাচ্ছে পাথরের পাহাড়ের ওপরটা। কালো পাথরের একটা পাত্র যেন জলের মধ্যে রাখা হয়েছে উল্টো করে। পাড়ে দাঁড়িয়ে যতটা বড় মনে হচ্ছিল জায়গাটাকে, নৌকায় যেতে যেতে বুঝতে পারছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় দুর্গ অঞ্চল। মাঝি বললেন, গ্রামও রয়েছে দুর্গের ভেতরে। ঢেউ কম এদিকের সমুদ্রে। তবু ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়া রোমাঞ্চকর। বিশেষ করে দুর্গের জেটিতে পৌঁছনোর পর ঢেউয়ের দুলুনির মধ্যে নৌকা

থেকে পাড়ে উঠতে যাত্রীরা হিমশিম। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের তালে তালে শিশুদের চিৎকার পুরুষদের সাবধানবাণী মেয়েদের হাসাহাসি হইচইয়ের মধ্যে অনভ্যস্ত পর্যটকদের ধরে ধরে ওপরে তুললেন মাঝিরা। বলে গেলেন ঘণ্টাখানেক পরে এসে ফেরত নিয়ে যাবেন মালবণে। মাথাপিছু মাত্র কুড়ি টাকার যাতায়াত। একটা নৌকা ছেড়ে ফেরা যেতে পারে পরের নৌকাতেও।

জলের মাঝখানে এরকম একটা দুর্গ সত্যিই বিস্ময়কর। পাথর আর চুনের তৈরি দুর্গে ঢোকার মুখে আঁকা আছে শিবাজির হাত আর পায়ের ছাপ। ভেতরে রয়েছে শিবাজি মহারাজের মন্দির। ভেঙে পড়েছে কেল্লার এক অংশ। তবে কোনও কোনও জায়গায় এখনও লোকে বসবাস করে বংশপরম্পরায়। চারদিক লবণজলে ঘেরা হলেও দুর্গে রয়েছে মিষ্টি জলের কুয়ো। শিবমন্দির, রামমন্দির, দুর্গামন্দির রয়েছে কেল্লাতে। দিগন্তবিস্তৃত সাগরের সামনে কেল্লার নিচে রয়েছে ছোট্ট সৈকত, রানিচি বাগ। জেলেদের গ্রাম আছে সেদিকে সমুদ্রের ধারে।

কেল্লার ওপর থেকে দেখা যায় চারদিকের ঘন নীল আরব সাগর। দেখা যায় বহুদূর সমুদ্রে নৌ-চলাচল। সার্থক নাম হয়েছিল সিন্ধুদুর্গ। পিছনে মালবণ বন্দর। বোঝা যায় উপকূল রক্ষার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই দুর্গ। এর পাহারায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছিল মালবণ শহর। দুর্গের ওপরের অংশে না উঠলে দেখা যায় না মালবণের দিকটা। সমুদ্রেঘেরা দুর্গ অঞ্চল মনে হয় অন্য জগৎ। সময় যেখানে পিছিয়ে আছে বেশ কয়েক যুগ। সকালবেলার নরম রোদে পর্যটকদের অসুবিধে হয় না সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে, একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে। দুই শাখাওয়ালা এক নারকোল গাছের ছবি তোলেন প্রত্যেকেই। ঘুরে বেড়ান নির্জন সমুদ্রসৈকতে। খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে এসে সারাটা দিন এখানে কাটিয়ে বিকেলের দিকে মালবণ ফেরেন অনেকে। তবে মালবণের কাছাকাছি বেড়ানোর জায়গা আছে আরও কিছু। ৫ কিলোমিটার দূরে তারকর্লি বিচ ছাড়াও ৪ কিলোমিটার দূরে ওঝর আশ্রমে আছে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সমাধিক্ষেত্র। ১৮ কিলোমিটার দূরে ধামাপুর তালাব দেখতে যাওয়া যেতে পারে বাসে বা অটোরিকশা ভাড়া করে। রোজারিও চার্চ রয়েছে মালবণ শহরের মধ্যেই হাঁটা দূরত্বে। বাজার ছাড়িয়ে শহরের সেই দিকটা বেশ নিরিবিলি। সেদিক দিয়েও হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাওয়া যায় মালবণের সমুদ্রসৈকতে। অনেকগুলো গলিপথ চলে গেছে শহর থেকে সমুদ্রের দিকে। পথের পাশে গাছপালায় ছাওয়া কোঙ্কনি কুটিরে শহরের নিরালা গলিপথগুলোও খুবই আকর্ষণীয়। ঠিক শহর বলে মনে হয় না তখন মালবণকে। গ্রাম্য পরিবেশের আমেজ মিশে থাকে চারপাশে। যেতে যেতে হঠাৎ কোনও জায়গায় দেখা যায় নৌকা সারাইয়ের ব্যস্ততা। পাশেই বিশাল বজরা ঢাকা রয়েছে খড়ের ছইয়ে। বোঝা যায় আবার অন্যপথে

এসে পড়া গেছে সমুদ্রের ধারে। একটু এগোতেই বালির তটে এসে এবার দেখা যায় পরপর ছইয়ে ঢাকা বজরার সারি। সামনে রঙিন ছোট নৌকাগুলো যেন জিরিয়ে নিচ্ছে জলকেলির ফাঁকে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এপথে সেপথে ঘুরেই কেটে যায় সারাবেলা। জেলেদের গ্রামের দিকে গিয়ে পড়লে অনেক সময় অবাক হয় স্থানীয়রা। হয়তো কুটির থেকে বেরিয়ে আসে কোনও জেলের মেয়ে, 'কৌন পাইজে?' জিজ্ঞেস করে সুরেলা গলায়। মানে হয়তো, কাকে খুঁজছেন? নির্দিষ্ট কিছু যদি না খোঁজে কোনও ভবঘুরে পর্যটক, কোঙ্কনের সিন্ধুসৈকতে মনে হবে যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা পাওয়া গেছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

মুম্বই থেকে সিজনে মহারাষ্ট্র পর্যটনের লাক্সারি বাস যায় মালবণ। মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্ট থেকে ছাড়ে বিকেল চারটেয়। দাদারে প্রীতম হোটেলের কাছ থেকে ছাড়ে বিকেল পৌনে পাঁচটায়। ভাড়া ২৫০ টাকা। মালবণ থেকে মুম্বই ফেরার বাস ছাড়ে পিম পালপার থেকে। বিকেল তিনটেয়।

কোথায় থাকবেন

হোটেল সিন্ধুদুর্গশোভা (এম টি ডি সি অনুমোদিত)

মালবণ, সিন্ধুদুর্গ-৪১৬ ৬০৬ % (০২৩৬৫) ৫২২৬৪

মুম্বই % ৮৩৬৯১৫৫-৮২১৯৬২৬

ভাড়া: ডাবল বেডেড রুম ২৫০ টাকা, ফোর বেডেড রুম ৩০০ টাকা, থ্রি বেডেড রুম ৩৫০ টাকা।

ময়ূর লজ

ভাড়া: কমনবাথ থ্রি বেডেড রুম ১০৫ টাকা, ডর্মিটরি ৩৫ টাকা।

এছাড়াও হোটেল রয়েছে ওম শ্রদ্ধা লজ, স্বস্তিক প্যালেস, সাহেবা, অঞ্জলি, সেবাঙ্গল, ট্যুরিস্ট, বিনায়ক লজ।

তারকর্লি সমুদ্রসৈকতে

এম টি ডি সি টেন্ট রিসর্ট

ডিস্ট্রিক্ট: সিন্ধুদুর্গ, মহারাষ্ট্র % (০২৩৬৫)৫২৩৯০

ভাড়া: ডাবলবেডেড টেন্ট ১৭৫ টাকা, ফোর বেডেড টেন্ট ২৫০ টাকা, এক্সট্রা বেড ২৫ টাকা।

ভ্রমণ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

জিম করবেটের জঙ্গলে

মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

আচমকাই শব্দহীন হয়ে গেল জিপটা। নিঃশব্দ জঙ্গলে অন্যরকম শব্দের ঝঙ্কারে সচকিত হয় প্রকৃতি। ঝিঁঝির একটানা ডাক, পাখিদের সমস্বর হৈচৈ, মর্কটকুলের বেখাপ্পা হঠাৎ চিৎকার-সব ছাপিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হয় গাছের ডাল ভাঙার মটাস মটাস আওয়াজ। নিশ্বাস বন্ধ করে আমরা বসে থাকি, আগ্রহ আর আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে।

ধানগড়ি চেকপোস্ট পেরিয়ে কিছুক্ষণ হল প্রবেশ করেছি করবেট জাতীয় উদ্যানের অন্দরমহলে। জঙ্গলের বুক চিরে কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা। অরণ্য কোথাও গভীর, সতর্ক দৃষ্টি হেনেও কিছুই নজরে পড়ে না এমনই ঠাসবুনোট। আবার কোথাও শুদ্ধাচারী কতিপয় মহীরুহ অন্যের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণে ক্রমশ দীর্ঘ হবার চেষ্টায় মগ্ন। নতমুখী লতাগুল্ম যেন তাদের পা জড়িয়ে আছে। বেশ চলেছিলাম। কখনও মসৃণ গতিতে, কখনও শম্বুক লয়ে, কখনও বা লাফিয়ে লাফিয়ে। মাঝে মাঝে রাস্তার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। হঠাৎই ড্রাইভারের সশব্দ ব্রেক কষায় চমকে গেলাম।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এক দঙ্গল হাতি, কাচ্চাবাচ্চা সহ, নির্বিচারে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে এসে দাঁড়াল ঠিক রাস্তার পাশটিতে। আমাদের গাড়ি থেকে হাত কয়েক দূরে। গনগনে বৈশাখের তীব্র তাপে পিচরাস্তার দুধারের মাটি ফুটিফাটা, ধুলোর পুরু চাদর বিছানো। দলপতি হাতি শুঁড় দিয়ে সেই ধুলোকে বেশ করে উড়িয়ে দিয়ে তার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। তারপর গা দুলিয়ে দুলিয়ে সে কী ধুলো মাখার ধুম। পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সকলে। একজন একজন করে বেশ 'ধূলিধূসরিত নন্দদুলাল' সেজে পরের জনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে হেলতে দুলতে ঢুকে পড়ছে জঙ্গলের ভেতরে। সম্ভবত রামগঙ্গায় গিয়ে স্নানটা সেরে নেবে।

এদিকে আমরা ন যযৌ ন তস্থৌ, আরও গোটা দুই গাড়ি এসে পড়ায় সাহস কিঞ্চিৎ বেড়েছে। তাহলেও ঠিক নির্ভাবনায় আছি বলা যাবে না। গাড়িটাকে নিয়ে কার যে কখন ফুটবল খেলতে ইচ্ছে হবে কে জানে? ধুলোকেলি তো চলছেই, চলছে মিছিলও। সব থেকে ছোটটি চলার সময় মায়ের পেটের তলায় ঢুকে পড়ছে। মা-ও শুঁড়ে করে ধুলো

নিয়ে তার সন্তানকে স্নেহভরে মাখিয়ে দিচ্ছে। ভারি দৃষ্টিনন্দন সে দৃশ্য। পরে জেনেছিলাম এভাবে ধুলো ঘষে ঘষে হাতিরা তাদের শরীরের পোকা মারার চেষ্টা করে।

প্রায় মিনিট কুড়ি চলল এই শোভাযাত্রা। বাকি পথটুকু উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে ফুটতে হাওয়ায় ভর দিয়ে ২০ কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ধিকালায়।

ধিকালা বন-আবাসটি করবেট ন্যাশনাল পার্কের ঠিক মধ্যস্থলে। রামগঙ্গা জলাশয় পাশেই। ১৩১৮ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত করবেট অভয়ারণ্যটি। ধিকালা ছাড়া আরও কয়েকটি রাত্রিবাসের আস্তানা আছে-খিনানৌলি, সরাপদুলি, গৈরাল, বিজরানি, কান্দা ও সুলতানে। স্থানমাহাত্ম্যে ধিকালার কৌলীন্য অনেক বেশি তাই বুকিং পাওয়া একটু কঠিনই হয়। কলকাতা থেকে বুকিং আমরা পাইনি। লখনউ থেকে বুকিং করতে হয়েছিল। রামনগর থেকে বুকিং পাওয়া বরং বেশি সহজ।

করবেট ন্যাশনাল পার্কটি সংরক্ষিত হয় ১৯৩৬ সালে। গভর্নর ম্যালকম হ্যালির নামানুসারে তখন এর নাম ছিল হ্যালি'স ন্যাশনাল পার্ক। এটিই ভারতের প্রথম সংরক্ষিত বনভূমি। তারপর স্বাধীনতার পরে নাম পাল্টে রাখা হয় রামগঙ্গা অভয়ারণ্য। শেষমেষ প্রখ্যাত শিকারি জিম করবেটের নামানুসারে ১৯৫৭ সালে এর নতুন নাম হয় করবেট জাতীয় অরণ্য। ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্রপ্রকল্প শুরু হলে এই অরণ্যটিই প্রথম সেই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়।

শিবালিক হিমালয়ের তরাই বনাঞ্চল ঘিরেই মূলত করবেটের বিস্তৃতি। তাই এখানে মাঝে মাঝেই উঁকিঝুঁকি দেয় সারি সারি পাহাড়। উচ্চতা কোথাও হাজার মিটার আবার কোথাও মাত্রই ৩০০ মিটার। বনের সর্বোচ্চ পাহাড় উত্তর-পশ্চিমে কান্দা পাহাড়। বৃষ্টিপাত বেশ ভালো হয় বলে পার্ক সবসময়ই সবুজ। শাল, শিশু, শিমুল, কুল জাতীয় গাছই বেশি। বিশেষত এখানে 'মোটা শাল' বলে একধরনের শাল গাছ পাওয়া যায় যার গুঁড়িকে দশজন মিলেও ধরা যায় না। দৈত্যাকৃতি এই গাছটি উচ্চতায় প্রায় ৩৩ মিটার।

ধিকালার পর্যটক আবাসগুলি প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য মেনে কুঁড়েঘরের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। মেটে রঙা দেওয়াল, লাল টালি বা সবুজ ছাদ। কিন্তু ভেতরে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রায় সব সরঞ্জামই মজুত। টেলিভিশন বাদে। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে সেজন্য যারপরনাই কৃতজ্ঞ বোধ করেছি। লোডশেডিংয়ের প্রকোপ খুব। তাতে খুব একটা ক্ষতি হত না। কারণ জঙ্গলে দুপুরের প্রখর সূর্যালোকের সময়টুকু ছাড়া গরম বিশেষ গায়ে লাগে না। বরঞ্চ নিষ্প্রদীপ জঙ্গলে জ্যোৎস্নার হানাদারিতে রাত হয়ে উঠত মায়াবী। বন্যপ্রাণী দেখতে পান আর নাই পান চাঁদনি রাতে করবেট অরণ্য দর্শনের অপার্থিব অভিজ্ঞতা হবে বিরল সঞ্চয়।

পার্কিং লটে সারি সারি গাড়ি । হরেক রকমের । টাটা সাফারি আর কালিস । উত্তরপ্রদেশের সরকারি গাড়ির সংখ্যাধিক্য রীতিমতো চোখে পড়ার মতো । ফি শনি-রবিবার করবেটে ছুটি কাটাতে আসেন সপারিষদ কোনও না কোনও বড় কর্তা । তাই শনি-রবিতে বুকিং পাওয়া বেশ শক্ত । চেষ্টা করবেন সোম-মঙ্গল বারের বুকিং পেতে । এতে ভিড়টা কমও হবে ।

গাড়ি থেকে নামামাত্র পাশ দিয়ে এক দাঁতাল শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে এগিয়ে গেল । ভয়ে আবার লাফিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি ভ্রাম্যমাণ সিকিউরিটি জানাল, এটি এখানকার পোষা । বছর কয়েক আগে বাঘের থাবায় আহত শিশু মিহিরকে সারিয়ে তোলেন এখানকার কর্মচারীরা । সেই থেকে সে এখানেই রয়ে গেছে । শুনলাম তার দেখাদেখি এবং খাদ্যের সহজলভ্যতার কারণে আরও দু-চারটি বুনো শুয়োর নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে মানুষের বশ্যতা । গৃহপালিত কুকুরের মতো তাদেরকে পায়ে পায়ে ঘুরতে দেখে মজাই পাবেন । বিপত্তি বেধেছিল এক সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে মিহির ভেবে এব বন্য বরাহকে ক্যামেরা তাক করতে গিয়ে । পার্কিং লটের বাঁহাতে ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলেই এক ধাবা । কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের রেস্তোরাঁর দাম কিঞ্চিৎ বেশি বলে অনেকেই এখানে ভিড় করেন । খাবারের রকমফেরও এখানেই বেশি । সবই নিরামিষ । সম্প্রতি জঙ্গলে আমিষ আহার্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । যদিও ডিম পাওয়া যায় । সেখানে বরাহ এসেছিল সম্ভবত খাদ্যের সন্ধানে । আমরাও পিছু নিয়েছি । ছবিও তুলেছি বেশ কিছু । হঠাৎই পিছন থেকে সাবধানবাণী ‘আগে মৎ যাও, বরা হ্যায়’ । তড়িঘড়ি পালিয়ে বাঁচি । বন্য বরাহের রাগী মেজাজের কথা পুথিপত্তরে পড়েছি অনেক, সেরকম কিছু ঘটেনি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ ।

ধিকালার বন-আবাসগুলি মূলত দুধরনের-কেবিন কটেজ ও ডিলাক্স বেডরুম । এছাড়া লগ হাটও রয়েছে । এই ডর্মিটরিতে ২৪টি বেড আছে । বেডিং পাওয়া যায় না । তৈরি হয়েছে পাঁচতলা এক পর্যটক আবাস । রোজ সন্ধেয় ডাইনিং হল সংলগ্ন চারদিক খোলা অডিটোরিয়ামে অরণ্য ও তার বনচারী সভ্যদের তথ্যচিত্র দেখানো হয় । সংলগ্ন লাইব্রেরিতে বিভিন্ন অসাধারণ বইয়ের সংগ্রহ । অলস মধ্যাহ্নে জঙ্গল যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন এই লাইব্রেরি হতে পারে আপনার সময় কাটানোর সঙ্গী । অবশ্যই বন্ধ ও খোলার সময় আগেই দেখে নেবেন । এটি পরিবর্তিত হয় মাঝে মাঝে ।

করবেট অরণ্যে ঘোরবার জন্য ফরেস্টের কোনও গাড়ি নেই । আসলে রামনগর থেকে ধিকালা আসতে হলে ভাড়ার গাড়িই একমাত্র বাহন বলে প্রত্যেকের সঙ্গেই গাড়ি থাকে এবং জঙ্গলে তাই নিয়েই ঘোরা যায় । তবে গাইড নিতেই হবে সঙ্গে । এছাড়া হাতি ভাড়া

পাওয়া যায় জঙ্গলে ঘোরার জন্য । এর বুকিং পাওয়া খুবই দুষ্কর । সুতরাং পৌঁছেই প্রথম কর্তব্য রিশেপশন সেন্টারে হাতির জন্য নাম লেখানো । আমরা ধিকালায় তিন রাত বাস করেছিলাম । প্রচণ্ড ভিড় ছিল বলে তৃতীয়দিন সকালে হাতি পেয়েছিলাম । অবশ্য তখন হাতিসুমারি চলছিল বলে গোটা দুই পোষ্য হাতি সেই কাজে ব্যস্ত ছিল ।

ধিকালার সামনেটায় অনেকটা উন্মুক্ত চারণভূমি-শীতের শুরুতে ঘাস ছোট থাকে বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় । এপ্রিল-মে মাসে ঘাস প্রায় মানুষ-সমান উচ্চতায় পৌঁছে যায় । তখন ছোটখাটো হরিণ জাতীয় জন্তু ঢাকা পড়ে যায় ঘাসের আড়ালে । শুধু দলকে দল হাতির ঊর্ধ্বভাগ নজরে আসে । এইসময় অবশ্য বাঘেদের শিকার করতে খুব সুবিধে । ঘন ঘাসের জঙ্গলে সে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, তারপর শিকারের দিকে আচমকাই লাফিয়ে পড়ে । কপাল ভালো থাকলে এ হেন রোমহর্ষক দৃশ্যের সাক্ষী আপনিও হতে পারেন যেমনটি হয়েছেন ধিকালার প্রায় প্রতিটি কর্মচারী ও অসংখ্য পর্যটক । করবেটে বাঘের প্রাচুর্য রীতিমতো উল্লেখযোগ্য । গত বাঘসুমারিতে বাঘের সংখ্যা ছিল নব্বইটি । বর্তমানে তা প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি হবে এমনটি আশা করা হচ্ছে । যদি ওয়াচটাওয়ারে গিয়ে ধৈর্য ধরে কাটাতে পারেন কয়েক ঘণ্টা তবে সন্ধের দিকে বাঘেদের জল খেতে আসার সময়ে তাদের দেখা পেতে পারেন । আজকাল সন্ধের পর জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে দেয় না বিশেষ, তাই আগাম জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবেন ।

আমাদের কুঁড়েঘরটি ছিল একদম শেষে । তারপরই জঙ্গল শুরু । পাশ দিয়ে রামগঙ্গা চলছে নাচতে নাচতে পাথরে পাথরে নিক্কণ ধ্বনি তুলে । বনভূমিকে বাঁচাতে তৈরি হয়েছে রামগঙ্গা লেক বা জলাধার যাতে বর্ষার জল ধরে রাখা যায় । জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে অবশ্য জলাধারে মলমলি ঘাসের সবুজ আস্তরণ । চিতল হরিণ আর হাতিরা পেটপুরে অহোরাত্র খেয়েই চলেছে । হাতির দল ঘরে বসেই দেখতে পাবেন । যত্রতত্র হাতিদের এমন যথেচ্ছাচারে ঘুরে বেড়াতে দেখে মনে হয় গোটা করবেট অরণ্যটাই যেন ওদের ব্যক্তিগত চারণভূমি । তবে আমদান্ডা হয়ে বিজরানির দিক দিয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা অতটা সৌভাগ্যবান নাও হতে পারেন ।

সকাল বিকেলের জঙ্গল সফরটুকু বাদ দিয়ে ঘরের পিছনে চেয়ার পেতে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায় দু-চারদিন । অরণ্য তার রূপবৈচিত্র নিয়ে নিজেকে মেলে ধরবে । ভোর হতে না হতেই শুরু হবে পাখিদের কিচিরমিচির । তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে পড়বে তাদের দিন মজুরিতে । শ্রম বলতে সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরা আর ভরপেট্টা খাওয়া । সন্ধেয় আবার ঘরমুখো, কলতানে মুখরিত আকাশ । সারারাত পাশের ঝোপে গাল ফুলিয়ে ঝগড়া ছাতারে আর প্যারাকিটদের ।

রোজই দেখতাম একদল খ্যাঁকশিয়াল আমাদের ঘরের চারপাশে ঘুরঘুর করে । ঠিক বুঝতে পারতাম না । পাশের ঝোপেই কিছু পক্ষিশাবক থাকত । একদিন দেখি তারা কড়মড়িয়ে হাড় চিবোচ্ছে । সেই থেকে লাঠি হাতে পক্ষিশাবক পাহারা দেওয়াটা হল আমার নিত্যকর্ম । বাড়তি পাওনা হল পাখিদের ঘর-গেরস্থালি দেখা । সাদাকালো হর্নবিলগুলোকে দেখতাম বড় উঁচু কোনও গাছের মগডালে বাসা বেঁধেছে । এরা একটু নাক উঁচু গোছের । কারও সঙ্গে মেশে না । সোনালি কালো ঝুঁটির ওরিয়ল আর কুচকুচে কালো ফিঙের দোস্তি বোঝা যেত তাদের কাছাকাছি ঘুরতে দেখে । প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার রাতদিন ঝাঁপাঝাঁপি করে পোকা মারায় ব্যস্ত । রিং ডাভ আর স্পটেড ডাভ বা ঘুঘু প্রজাতি মাটির কাছাকাছি থাকতে বেশি পছন্দ করে । সবুজ বী-ইটারগুলোই সব থেকে মজার । এই অরণ্যে প্রায় ছশো প্রজাতির পাখি আছে । পরিযায়ী পক্ষিকুলের সংখ্যাও কম নয় ।

রামগঙ্গা জলাধারের কাছে গেলে আবার দেখা মেলে জলার পাখির । হুইসলিং টিল বা সরাল তো অগুনতি । লেজ উঁচিয়ে ল্যাপউইং এক্কা দোক্কা খেলেই চলেছে । ক্যামেরার ছোট ফ্রেমের সাধ্য কি তাকে ধরে? বৃথা দৌড়োদৌড়িই সার । বরং কোনও ঘাড় উঁচু প্রস্তরখণ্ডে মৌনী বাবা হয়ে বসে এদের লক্ষ করুন । রঙের বৈচিত্রে নেশা ধরে যাবে । সেলিম আলি সারাজীবন কেন যে এদের নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন তা খানিকটা অনুভূত হবে ।

চারটে বাজতে না বাজতেই করবেটে সাজ সাজ রব পড়ে যায় । একটার পর একটা গাড়ি করে পর্যটকের দল বেরিয়ে যাচ্ছে । প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০-৮০টা গাড়ি যায়, শনি-রবিবার সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায় ।

অথচ জঙ্গলের ব্যাপ্তি ও ঘনত্ব এত গভীর যে সফর চলাকালীন আপনার সঙ্গে বিশেষ কারও দেখাই হবে না । জঙ্গলের মধ্যে ঘোরার জন্য পাকা ও কাঁচা দুরকম রাস্তাই আছে । রামগঙ্গা সরোবরকে এক পাক দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম । উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা মাঠে অন্তত পাঁচশো হরিণের এক দল । ঘন বাদামির ওপর হলুদ বুটিদার চাদর জড়ানো তাদের গায়ে, কাজল টানা গভীর দুচোখে অসীম সরলতা । পুরুষের মাথায় অহংকারের ভারি মুকুট । থেকে থেকে দাঁড়িয়ে আছে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ-মাটিতে রাগী পায়ের আছড়ানি, শিঙে শিঙে ঠকাঠক শব্দ । পুরস্কার হিসেবে হয়তো বা পাওয়া যাবে কখনও তিলোত্তমা হরিণীর অনুগ্রহ যে এখন নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় । একদল কোনও ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে ঘাসের কার্পেটে শয্যা নিয়েছে, চর্বিত চর্বণ অবশ্য চলছেই ।

একপাল হাতি হেলতে দুলতে এগিয়ে এল । গাইড জানাল, আগে করবেটে হাতির সংখ্যা ছিল কম । কালাগড়ে বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে ওঠায় ও রামগঙ্গা জলাশয় তৈরি হবার ফলে অরণ্যে জলের প্রাচুর্য বেড়েছে । এরাও তাই অরণ্যের পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেছে । এরা সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায় তবে ধিকালার আশপাশেই এদের বেশি দেখা যায় । তার কারণ হাতিরা স্নান করতে ও জলকেলি করতে খুব ভালোবাসে । শুঁড়ে করে জল তুলে ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে ধারাস্নান করা এদের প্রিয় খেলা । আপনমনে ঘাস চিবোতে ব্যস্ত হাতির দলই খোঁচা খেলে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে । সুতরাং এদের খুব কাছাকাছি না যাওয়াই ভালো । সুদূর বরোদা থেকে আগত সঞ্জীব মেহেতো এদের আপাত নির্লিপ্ততাকে অনুধাবন করতে না পেরে ছবি তোলার জন্য একটু বেশিই কাছে চলে গিয়েছিলেন । ফলে দাঁতাল হাতির হঠাৎ তেড়ে আসায় হতচকিত হয়ে তিনি পালাতে গিয়ে পাশের গাছেই মেরে দিলেন এক ধাক্কা । ফলস্বরূপ তার নতুন গাড়িটির সম্মুখভাগ পুরো তুবড়ে ভেতরে চলে এল । কোনওরকমে ইঞ্জিনটাই যা চালু রাখা যাচ্ছে । বনবিভাগের কর্মীরা গিয়ে ভাঙা গাড়িসুদ্ধ আরোহীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন ।

তৃণভূমি ছেড়ে এবার বনভূমিতে প্রবেশ । এতক্ষণের উন্মুক্ত আকাশ হঠাৎ পাতার আড়ালে মুখ লুকোল । পাতার স্তর পেরিয়ে আলোর ক্ষীণ কয়েকটা রেখাই মাত্র ভেতরে প্রবেশ করতে পারে । আলোআঁধারিতে ঘেরা এই রহস্যময়তাই অরণ্যভ্রমণের আসল মজা । হয়তো চাক্ষুষ হবে না কিছুই কিন্তু আশা আর আশঙ্কায় দুলতে দুলতে উত্তেজনায় পিঠ টান করে বসতেই হবে আপনাকে । তার ওপর গাইডের কেরামতি তো আছেই । ধুলোমাটির ওপর কোনও পায়ের ছাপ দেখিয়ে বলবে ‘পাগমার্ক’ কিংবা কোনও দুলে ওঠা ঝোপ দেখিয়ে বলবে ‘শায়দ এহি থা’ আর আপনিও উৎকণ্ঠায় হৃৎপিণ্ড হাতে করে বসে থাকবেন ঠায় । দ্রুতলয়ে বয়ে যাবে দু-চার ঘণ্টা । গাছেদের মাথায় মাথায় কমলা রঙা রোদ্দুর ছড়িয়ে সূর্যদেব যখন পাড়ি দেন দিগন্তের ওপাড়ে, সফর শেষে যে যার ঘরে ফেরা । অন্ধকারে ঝিকিয়ে ওঠে হরিণের চোখ-ঠিক জোনাকির মতো ।

সকালের জঙ্গলের আবার অন্যরকম রূপ । কুয়াশা ঢাকা ভোরে নির্জন অরণ্য বড় বেশি চুপচাপ । পাতা খসার টুপটাপ আওয়াজও কানে আসে । সারা রাতের ঘোরাঘুরির পর নিশাচরেরা সবেমাত্র ক্লান্ত শরীরে বিশ্রামে বসেছে । উদ্বিগ্ন বিপন্নতার আরও একটি রাত কাটিয়ে তৃণভোজীর দল হয়তো বা এইমাত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিরোতে গেছে । পাখির দল শয্যা ত্যাগ করেনি । অরণ্যের সঙ্গে গভীর মেলামেশার এটাই তো উপযুক্ত সময় । খানিক পরে দূরের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ঝুপ করে বেরিয়ে আসেন তরুণ তপন । কচি সোনা রং গায়ে মেখে জঙ্গল তখন নিমেষে আনন্দ মুখর । পাখি, হরিণ, হাতি, সম্বর, বরাহ, ঢোল সবাই মিলে যেন একইসঙ্গে জেগে ওঠে । গোটাকয় ঢোল বা

বুনো কুকুরকে একদল হরিণের পিছু নিতে দেখে গাইড জানাল, আজ তাদের হরিণের মাংস দিয়ে প্রাতরাশ সারার ইচ্ছে। হরিণরা বাঘের চিন্তাতেই বড় বেশি ব্যস্ত থাকে বলে এই ঢোলদের শিকার করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। তারা হরিণের সঙ্গে সঙ্গে একটু তফাত রেখে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্যস্থির করে ফেলে। তারপর চারপাশ দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে। তাদের সাঁড়াশি আক্রমণে সহজেই বধ হয় হরিণ।

হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে জঙ্গল সফরের অভিজ্ঞতা আরেক ধরনের। অরণ্যকে সরাসরি এফোঁড় ওফোঁড় করে ঝোপঝাড় আছড়ে চলে বাঘের সন্ধান পর্ব। বাঘেদের আস্তানা অভিজ্ঞ মাহুতরা যত ভালো চেনে ততটা আর কেউ নয়। ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাঘটিও সহজেই ধরা পড়ে যায় তার চিরুনিতল্লাশিতে। হাতির পিঠে ভ্রমণকালে ডালের ঝাপটা থেকে হাতমুখ বাঁচাতে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত। হাতির সারাক্ষণ মুখ নাড়ার প্রবৃত্তি। যা পাচ্ছে সামনে তাই ভেঙে নিয়ে চলেছে। ঘাস বনে প্রচুর ভাং গাছ হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম হস্তিসুন্দরী পাশের ঝোপঝাড় সাবাড় করলেও ভাং গাছগুলোকে ছুঁয়েও দেখছে না।

বনরাস্তা ছেড়ে এবার সটান সেঁদিয়ে গেলাম গহনে। বন্য লতা আর বুনো ফুল দেখতে দেখতে হস্তিপৃষ্ঠে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে চলেছি। পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি। শুকনো পাতায় হাতির পায়ের আওয়াজই নির্জন বনভূমিতে বড় বেশি কানে বাজছে। আর একটু এগোতেই বাঁশ জাতীয় বৃক্ষের জমজমাট বসতি। বাতাসে কেমন একটা থমথমে ভাব। এগুলোই হচ্ছে বাঘের 'ঠেক'। তবে দর্শন পাওয়া যাবে কিনা বলা ভারি শক্ত।

এক দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াচটাওয়ারে গিয়ে বসেছি। হঠাৎই আকাশ জুড়ে কালো মেঘের তাণ্ডব। হুড়মুড়িয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ওয়াচটাওয়ারের ছাদ দিয়ে জল পড়ায় পুরো ভিজে গেছি। রীতিমতো শীতে কাঁপছি। এভাবেই চলল ঘণ্টা দুই। ফেরার সময় আরেক মুশকিল। কাঁচা মাটির রাস্তা ভেঙে তীব্র স্রোতে বইছে জলধারা। শেষমেশ জুতো হাতে করে কাদামাটি মেখে ঘরে ফিরলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামনগর। রামনগর সরাসরি পৌঁছনো যায় না। মোরাদাবাদ হয়ে যেতে হয়। মোরাদাবাদ থেকে রামনগর মাত্র আড়াই ঘণ্টা। কলকাতা থেকে অমৃতসর মেলে মোরাদাবাদ আসুন। সেখান থেকে জিপে কিংবা গাড়িতে কিংবা ট্রেনে রামনগর হয়ে

ধিকালা। মোরাদাবাদ থেকে রামনগর প্রায় দুশো কিলোমিটার। রামনগর থেকে ধানগড়ি গেট ৫০ কিলোমিটার রাস্তা। আমদান্ডা প্রবেশদ্বার দিয়ে করবেটে ঢুকলে দূরত্ব অনেকটা কম হবে।

নৈনিতাল কিংবা রানিখেত হয়েও করবেটে প্রবেশ করা যায়। অনেকেই কুমায়ুন সফরকালে করবেটকেও জুড়ে নেন। আগে থেকে বুকিং করা না থাকলে রামনগরে বনবিভাগের অফিস থেকে বুকিং করে নিতে পারেন। জঙ্গলের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা আছে। যদি রাত্রিবাস করতে না পারেন তাহলে আমদান্ডা প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে বিজরানি পর্যন্ত ঘুরতে পারেন। যদিও এটি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর ব্যবস্থা।

কোথায় থাকবেন

ফরেস্ট বাংলো আছে ধিকালা, খিনানৌলি, সরাপদুলি, গৈরাল, বিজরানি, কান্দা ও সুলতানে। এরমধ্যে ধিকালা ছাড়া অন্যগুলোতে রেস্তোরাঁ নেই। রেশন নিজেদের আনতে হবে তবে রেস্টহাউসের কেয়ারটেকার রান্না করে দেবে। ধিকালাতে কাবেরী রেস্তোরাঁতে সব ধরনেরই খাবার পাবেন-চাইনিজ, মোগলাই ইত্যাদি কিন্তু সবই নিরামিষ। করবেটে প্রাণী ভোজন নিষিদ্ধ। যদিও প্রাতরাশে ডিম পাওয়া যায়।

এছাড়া জঙ্গলের বাইরে বিলাসবহুল হোটেল আছে অনেক। করবেট রিভারসাইড রিসর্ট, ক্লারিজেস হাইড অ্যাওয়ে, টাইগার টপস করবেট লজ, কোয়ালিটি ইন জাঙ্গল রিসর্টগুলি এককথায় চমৎকার। কিন্তু অরণ্যে রাত্রিবাস না করতে পারলে আপনি করবেটের সৌন্দর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না। কলকাতা থেকে ধিকালার বুকিং পাবার একমাত্র রাস্তা হাতে সময় নিয়ে সংলগ্ন ঠিকানায় চিঠি লেখা। তারপর কনফার্মেশন পেলে টাকা পাঠাতে হয়। লখনউ কিংবা রামনগরে কনফার্মেশন ঝালাই করে নেবেন। অনেক সময় টাকা পাঠানোর পরেও কনফার্মেশন পাওয়া যায় না। পোস্ট অফিসের ওপর দোষ পড়ে। একবার বুকিং করে পরে যদি বুকিং বাতিল করেন তাহলে টাকা ফেরত পাবার সম্ভাবনা কম।

মনে রাখবেন

বনের মধ্যে ঘোরার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও গাড়ি নেই। তাই নিজস্ব বাহন সঙ্গে রাখতে হবে। সব থেকে ভালো উপায় হল কলকাতা থেকে ট্রেনে মোরাদাবাদ এসে গাড়ি ভাড়া করা। বিমানে এলে পন্তনগর থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরের রামনগর থেকে গাড়ি ভাড়া করুন। এখানে রেট বেশি বলে আপনি দিন হিসেবে ভাড়া নিতে পারেন।

রামনগর থেকে ভাড়া করলে ওরা করবেট যাতায়াতেই ১২০০-১৫০০ টাকা নেবে। বনের মধ্যে ঘোরার জন্য আলাদা খরচ। চেষ্টা করবেন আর্মাডা কিংবা জিপসি জাতীয় শক্তপোক্ত গাড়ি নিতে এবং সেটা যেন পেট্রোল কার হয়। বনের মধ্যে ডিজেল গাড়ি নিষিদ্ধ। পর্যাপ্ত তেল নিয়ে নেবেন। ভেতরে কোনও পেট্রোল পাম্প নেই।

প্রয়োজনীয় ঠিকানা:

ফিল্ড ডিরেক্টর, প্রজেক্ট টাইগার

করবেট ন্যাশনাল পার্ক, রামনগর, নৈনিতাল-২৪৪ ৭১৫, উত্তরাঞ্চল

%(০৫৯৪৭) ৫১৪৮৯/৫১৩৬২/৫১৩৭৬

ডি এফ ও, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, করবেট ন্যাশনাল পার্ক

রামনগর, নৈনিতাল-২৪৪ ৭১৫, উত্তরাঞ্চল

ভ্রমণ মার্চ, ২০০১

থর ম. ভূমিতে ট্রেকিং

শিবনাথ বসু

জয়সলমির থেকে ট্রেকিং শুরু হবে থর মরুভূমির অভ্যন্তরে। পুরোটাই হেঁটে যাব, উটও অবশ্য থাকবে-মালপত্র বওয়া আর পথ দেখানোর জন্য।

থর মরুভূমির সব মানুষই জাঠ। লোকসংখ্যা খুবই কম, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ছজন। গ্রেট গ্লোবাল ডেজার্ট বেল্টের মধ্যেই এই থর। আয়তন ২,১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনই ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী এই থর মরুভূমি।

নানারকম ভয় আর ভাবনা আমাদের ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসেও দিনে প্রচণ্ড গরম। আর রাতে তেমনই ঠান্ডা। সূর্যের তাপ ফেব্রুয়ারিতে মাঝে মধ্যে দেখায় ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত। রাতে শূন্য ডিগ্রির নিচে। তাপমাত্রার এত হেরফের শরীরে সহ্য হবে কিনা এই ভাবনা ভীষণভাবে ছিল। শেষে সানস্ট্রোক হবে না তো। মরুভূমির ভেতর একরকম সাপ আছে। ডেজার্ট স্নেক। হলুদ রঙের দেখতে। বালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে শুধু মুখটা বাড়িয়ে। খুব বিষাক্ত। আর শিকার পেলেই লাফিয়ে আক্রমণ করে। ওদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। আছে জলের সমস্যা। মরুভূমিতে যে জল সহজলভ্য হবে না সে কথা জানাই ছিল। আছে বালির ঝড়। একবার ভালোভাবে উঠলেই সর্বনাশ। উটকে ধরে জড়িয়ে বসে থাকা। আর যদি উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই ফেরা সম্ভব নয়। অচেনা অজানা মোহময়ী প্রকৃতি। পথে পার হতে হবে বিশাল বিশাল বালিয়াড়ি। স্যান্ড ডিউনস। আর এইসব বালিয়াড়িতে বরফের মতো ফাটল (Crevasse) আছে। একবার যদি চোরাবালিতে ঢুকে যাই তবে এ যাত্রা শেষ। আছে চোরাচালানকারীর দল। সীমান্ত লাগোয়া। আর আছে ডাকাত। কিন্তু এত ভাবলে তো চলবে না।

ট্রেনে দিল্লি এসে যোধপুর না গিয়ে গেলাম বিকানির। ওখান থেকে রাতের বাসে চেপে জয়সলমির। দূরত্ব ৩২৮ কিলোমিটার। জয়সলমির যখন এলাম তখন ভোর হচ্ছে। বিশাল হলুদ এক ভূখণ্ড। বালির ঢিপি পাহাড়। কাঁটাগাছের মরুঝোপ। থর মরুভূমির পুরনো মরূদ্যান নগরী জয়সলমির। ১৫৫৬ সালে ভাটিবংশের বংশধর রাজা রাওয়াল জয়সওয়াল এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ত্রিকূট বেলে পাহাড়ে পাথরের দুর্গ, প্রাসাদ।

বাড়িঘরদোর সবই হলুদ । বিদেশি ট্যুরিস্টদের ভীষণ পছন্দ এই মরুশহরকে । জয়সলমিরে প্রচুর হাভেলি আছে । আর এই হাভেলি দেখার মতো । বেনারসের মতো সব গলি । তারই মাঝে অকল্পনীয় কারুকার্য করা সব হাভেলি । পাঁচতলা অপূর্ব জাফরির কাজ করা পাটোয়া কি হাভেলি । সালিম সিংহ কি হাভেলি । নাথমলজি কি হাভেলি । ভেতরের দেওয়ালে সব মিনিয়েচারের ছবি ভর্তি । তার মাঝে মাঝে রাস্তার ফাঁক দিয়ে অতন্দ্রপ্রহরী কেল্লার দিকে নজর । ত্রিকূট বেলে পাহাড়ের ৭৬ মিটার উঁচুতে এই দুর্গ নির্মিত । দুর্গটি প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীরে ঘেরা । ভেতরে অসংখ্য মানুষের বাস আর দ্রষ্টব্য স্থান । আছে রাজস্থানিদের রংচঙে জামাকাপড়, শাড়ির দোকান । হস্তশিল্পের দোকান । মনিহারীর দোকান । ওপর থেকে শহরটা দেখতে বেশ মজাই লাগে । সবই হলুদ । আর ঘিঞ্জিও বটে ।

জয়সলমিরের কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে আমরা ট্রেকিং রুটের অনুমতিপত্র নিলাম । জয়সলমিরের মরুতে ট্রেকিং করতে গেলে অনুমতি নেওয়া এই কারণে প্রয়োজন যে, এটা সীমান্ত এলাকা । পাকিস্তানি বর্ডার খুব বেশি দূরে নয় । তাই সব মিলিয়ে মিলিটারি তৎপরতা এর আশপাশে প্রায়শই দেখা যায় । আর কালেক্টর সাহেব জানালেন, আপনারা সাবধানে চলাফেরা করবেন । আর উটওয়ালাদের কথা শুনবেন ।

পরদিন দুপুরের পর উটওয়ালারা এল । একজনের নাম আকবর আরেকজনের মহম্মদ । মালপত্র সব উটের পিঠে চড়ানো হল । উটরা নিজেরা ৮০ কেজি করে দানা নিয়েছে নিজেদের জন্য । মহম্মদ আর আকবর টেন্টে শোবে না । উটওয়ালারা নাকি কেউই টেন্টে শোয় না । উট নাকি খুব চুরি হয় । তাই উটকে পাহারা দিতে হয় । ঠান্ডার মধ্যে খোলা আকাশে শোবার সরঞ্জাম-তাই বেশ বেশি । ৫-৭ খানা করে লেপ আর কম্বল । টেন্ট আর কাঁচাবাজার তুলতেই পিঠ ভর্তি । বাসনপত্র আছে । অন্যান্য খাবারদাবারও রয়েছে । শেষে অতিকষ্টে সব তোলা হল । আমার নিজের ইচ্ছে ছিল মাঝেমধ্যে উটের পিঠে উঠব । তার কী হবে? একে তো দোতলার মতো উঁচু, তার ওপর মালপত্তর । যাইহোক, ওদের সঙ্গে আগে আলাপ হোক । কয়েকদিন চলি । পরে দেখা যাবে কী করা হবে ।

ডাকবাংলো আর সোনার কেল্লা পিছনে ফেলে কালো পিচঢালা রাস্তা দিয়ে প্রথমে আমাদের যাত্রা শুরু । কিছুক্ষণ হাঁটার পর রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়লাম একরাশ জমাট শক্ত বালির মধ্যে । আমরা যাব কুলধেরা । রাস্তা প্রায় ১৮ কিলোমিটার । কুলধেরা হল একটা পুরনো ধ্বংসাবশেষ নগরী । মৃণাল সেন তাঁর ‘জেনেসিস’ ছবির শ্যুটিং এখানে করেছিলেন । কুলধেরার একটু দূরেই মূলসাগর । অবশ্য তখন সেখানে জল নেই । আস্তে আস্তেই

আমরা চলেছি। পাহাড়ি রাস্তা। একপাশে একটু খাদও আছে। শক্ত পাথুরে জমি। সন্ধ্যা নামল। কিন্তু টর্চের প্রয়োজন হল না। চারপাশ যেন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আমাদের তিনটে উট। এরমধ্যেই ওদের নাম জেনে গেছি। কালা, ধলা আর মরু। দিকনির্ণয় করা বেশ মুশকিল। সেই অর্থে কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু উটওয়ালারা ঠিক চিনতে পারে। দিনের পর দিন রুক্ষ মরুভূমিতে পথ চিনে চলতে ওদের কোনও অসুবিধা হয় না। ওরা জানে কোথায় জল, কোথায় উটের খাবার, কোথায় থামতে হবে। এই উটওয়ালাদের এখানে বলা হয় রাইকা। রাজস্থানি লোকগীতিতে প্রায়শই রাইকাদের কথা শোনা যায়। মরুভূমিতে এদের দেবদূত হিসাবে মনে করা হয়। আমাদের রাইকা মহম্মদ আর আকবর। সবাই গল্প করতে করতে চলেছি। শুধু একবার ওরা বলল, তোমাদের হেঁটে চলার অভ্যাস নেই। তাই কত সময় লাগবে বুঝতে পারছি না। তোমরা উটের পিঠে না চড়ে হেঁটে যাচ্ছ কেন? আরও দুটি নিলে ভালো হত। তাহলে বেশ তাড়াতাড়ি চলা যেত। এ কেন-র উত্তর আমাদের জানা ছিল না। তাড়াতাড়িই বা চাই না কেন তাও জানি না বলতে ওদের কী হাসি। জায়গার নাম মনপিয়া। বেশ মিষ্টি নাম। এখন রাত ৯টা। আর ২ কিলোমিটার দূরে কুলধেরা। হঠাৎ মহম্মদ জানায়, এখানে জল আছে। কুলধেরা যাব না। ওখানে জল পাওয়া মুশকিল। যদিও আমরা জেনেছিলাম কুলধেরাতে একটা পরিবার থাকে। জলও আছে। কিন্তু কিছু বলার আগেই ওরা মালপত্র নামিয়ে ফেলল। অগত্যা। একবার মনে হয়, পথে কোনও গোলমাল নেই তো! ফাঁকা মাঠে টেন্ট। ফাটাফুটি জমি। সাপের ভয় আছে। তাই ভালো করে কার্বোলিক অ্যাসিড টেন্টের পাশে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটানো। রাতে বেশ ঠান্ডা। এমনিতে মরুভূমিতে সকাল বেশ দেরিতে হয়। ৭টার পর সূর্য উঠল। রেডি হয়ে বেরোতে বেরোতে ৯টা। রোদের তাপ এর মধ্যে বেশ গরম। এল কুলধেরা। একটা ফ্যামিলি ওই ধ্বংসাবশেষ নগরীর মধ্যে রয়েছে। জলও আছে। কেন রাতে ওরা এখানে এল না বুঝলাম না তখন। বেশ কিছুক্ষণ ওই খণ্ডহরের মধ্যে ঘুরে আবার পথ চলা। চারদিকে অন্তহীন বালির সমুদ্র। প্রাণের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। শুধু কিছু কাঁটাঝোপ। নিঃস্তব্ধ চারপাশে। কুলধেরা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বজরা কি ধানি। ধানি অর্থে খুব ছোট্ট গ্রাম। ওর ১ কিলোমিটার আগে এক গাছতলায় থামা হল। দুপুরের বিশ্রাম। রান্না করা। রোদের তাপ একটু কমলে পথ চলা শুরু আবার। যাব ৮ কিলোমিটার আরও। যাত্রা শেষ সততা গ্রামে। সততার কিছু আগে উটওয়ালাদের রাত্রিকালীন এক থামার জায়গায় আকবর থেমে গেল। এখানে জলও আছে। সুতরাং আজ এখানেই বিরতি। আর তাছাড়া গ্রামে রাতে গেলে কোথায় থাকব ঠিক নেই। উটও চুরি যেতে পারে। প্রতিদিনই এরকম হত। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। শেষে বুঝেছিলাম ওই গ্রামগুলো হিন্দু গ্রাম। ওরা মুসলমান। তাই যেতে চায়নি। এ এক

গেরো। কিন্তু কিছু করার নেই। তবে উট চুরির ঘটনা সত্য। আর এখন ফিরে এসে মনে হয়েছে একপক্ষে ভালোই হয়েছে। নিরালায় থাকা গেছে।

রাতে ভালোই ঠান্ডা ছিল। সকালে ২ কিলোমিটার হাঁটার পর এল সততা গ্রাম। ছোট্ট। ছবির মতো রংচঙে সাজানো গ্রাম। নানা রঙিন নকশা আঁকা ঘরদোরগুলোতে। মরুভূমির ভেতর এত সুন্দর বাড়ি দেখে রাস্তা ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়াই। দেখি একদল মেয়ে প্রজাপতির মতো নানা রঙের শাড়ি-জামাকাপড় পরে জল আনছিল। সারা মরুভূমিতে দেখেছি মেয়েদের এটাই একমাত্র কাজ। জল আনা। কতদূর থেকে যে জল আনতে হয় কী বলব। আর জল তোলার সময়ে গল্প করা। মেয়েগুলোকে সুন্দর দেখতে। কিন্তু হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে কলসি রেখে ভাগো বলে পালাল। মাথাতে কিছুই এল না। আমরা কি চোরডাকাত। পরে শুনেছিলাম ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে গ্রামে গিয়ে বসলাম। জল খেলাম। পরিস্থিতি একটু সহজ হল। একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, মরুতে আমরা জানি তো সাদা জামাকাড় পরতে হয়। তো তোমরা এত রঙিন জামাকাপড় পরো কেন। উত্তরে তিনি বললেন, হারিয়ে যাবার ভয় থাকে তো। তাই উজ্জ্বল জামাকাপড় মেয়েরা পরে। যাতে দূর থেকে বোঝা যায়। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, এখানে তো শুধু বালি হলদে। ফ্যাকাসে। চোখে হলুদের ঘোর লাগে। গ্রাম ছেড়ে তো কেউই বড় একটা বেরোয় না। দুয়েকজন ছাড়া। তাই রঙের অন্ধতায় সবাই ভোগে। এইসব লাল-নীল-সবুজ দেখে ওরা রং চেনে। জানে পৃথিবীটা শুধুই হলুদ নয়। সাত রঙে উজ্জ্বল। আর উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে আমরা রং পছন্দ করি। ঘরদোর থেকে নিজেদের সবাই সাজিয়ে রাখতে তাই ভালোবাসি। বিবর্ণ প্রকৃতিকে আমরা পোশাকের উজ্জ্বল রঙে সাজিয়ে তুলি। এমনকী আমাদের পাগড়িও উজ্জ্বল রঙের। এই যে পাগড়ি এর আবার বাঁধার রকমফের আছে কিন্তু। সাধারণ ৮ মিটার দৈর্ঘ্যের কাপড় হয় পাগড়ির। পাগড়ি বাঁধার স্টাইল দেখে বোঝা যায় লোকটি কোন জেলার। কী জাত। সমাজে তার অবস্থান। সব কিছু। বেশ মজার লাগছিল কথা বলতে। অনেক কিছু জানা গেল।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু। রোদ্দুরে সব যেন জ্বলে যাচ্ছে। ৬ কিলোমিটার পর এল জিরাজে কি ধানি বলে এক জায়গা। বিশ্রাম। খিচুড়ি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন। প্রচুর পেঁয়াজ খাওয়া। পেঁয়াজ খেলে শরীর ঠান্ডা করে। আর চিনি দিয়ে নুন জল। তবে জল খাওয়া উচিত সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে। একটু হেরফের করলে সানস্ট্রোক। বা মাথাঘোরা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া।

খাওয়া সেরে আবার হাঁটা। যাব খুরি। খুরিতে প্রচুর লোকসংস্কৃতির মানুষ আছে। স্যান্ড ডিউনস এলাকা। হিন্দি সিনেমার শ্যুটিং এখানে মাঝেমধ্যে হয়। তাই হোটেল আছে দুয়েকটা। বিদেশিরাও আসে। তবে অন্য পথে। গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। আমাদের পা বালিতে বসে যাচ্ছে। প্রচণ্ড দম লাগে। বেশ কষ্টের। পুরীর সমুদ্রতটে গরম দুপুর রোদ্দুরে একটু স্বর্গদ্বার থেকে চক্রতীর্থ শুকনো বালির মধ্যে হেঁটে দেখলেই আর আমার লিখে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না।

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধে হল। সন্ধের মুখে ওই বালিয়াড়িই হয়ে উঠল নন্দনকানন। আকাশের রং সূর্যাস্তের জন্য লাল ও বেগুনি, না সব মিলিয়ে অন্য কিছু, কিছুই বলতে পারব না। অপূর্ব। মরুভূমিতে সূর্যাস্তের কথা অনেক শুনেছি। এই প্রথম দেখলাম বালিয়াড়ির ওপর। ভাষা নেই তা প্রকাশের, নিরালা নিঃঝুম চারপাশ। শুধু উটের পায়ের পদধ্বনিতে ছন্দ।

খুরি ১২ কিলোমিটার। শেষপর্যন্ত খুরি এল না। অনেক রাত হয়ে গেছে। খুরির কিছু আগে এক জলের জায়গায় হল রাত্রিকালীন বিরতি। সকালে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই এল খুরি। বেশ গ্রামটা। কিছুক্ষণ গ্রাম দেখে আবার বেরিয়ে পড়া। আজ আমাদের পথ ১৬ কিলোমিটার। সুদাসরি। ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক। রোদ্দুরের মধ্যে ভারনা হয়ে সুদাসরি যখন এল তখন প্রায় সন্ধে। আজ ছিল বীভৎস গরম। লু-র চোটে শরীর বেশ কাহিল। কিন্তু সুদাসরি হল ন্যাশনাল পার্ক। তাই মাটির ট্যুরিস্ট ঘর আছে। আমরা জয়সলমির থেকে পার্কে প্রবেশের অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছি। তাই আজ আর টেন্টে নয়, বাংলোতে থাকব।

৩,০২৫ স্কোয়্যার কিলোমিটার এরিয়া নিয়ে এই ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক। এই ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে অন্য কোনও ন্যাশনাল পার্কের মিল নেই। মরুভূমির মধ্যে এর মেজাজটাই আলাদা। সকালবেলায় আমরা প্রথমেই দেখলাম সেই বিখ্যাত পাখি গ্রেট ইন্ডিয়ান বার্স্টাড। স্থানীয় নাম গোরানা। এখন এই পাখি প্রায় নিশ্চিহ্ন। কারণ জ্যান্ত এই পাখির দাম বিদেশে প্রচুর। চোরাগোপ্তা প্রায় সব বিক্রি হয়ে যায়। এখন WWF আর ভারত সরকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে যেটুকু রয়েছে তাকে বাঁচানোর। দূর থেকে অনেকটা ঈগলের মতো দেখতে। ভীষণ সুন্দর। উচ্চতা প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার। আর ওজন ১৪-১৫ কেজি।

গ্রেট ইন্ডিয়ান বার্স্টাড ছাড়া দেখলাম চিংকারা। একধরনের হরিণ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আর কিছু মিলল না। ডেজার্ট নেকড়ে, শিয়াল ও নানা প্রজাতির পাখি নাকি এখানে আছে।

যাই হোক, আজ আমরা যাব সামে। এখান থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার। বেশি বেলা করে আজ আমরা বেরিয়েছি। কারণ সকালে ন্যাশনাল পার্ক ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। তাই ঠিক হয়েছে আজ দুপুরে বিশ্রাম নয়। টানা হাঁটা। কারণ সাম স্যান্ড ডিউনসে আজ পৌঁছতেই হবে। কাল পূর্ণিমা। আর কাল সাম স্যান্ড ডিউনসে মরু উৎসব বা ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল। আজ পথে কাঁকড়াবিছা চোখে পড়ল। তবে ট্রেকিংয়ের সময় এসব কিছু লক্ষ থাকে না। শুধুই চলা।

গঙ্গা নামে এক গ্রাম পেরিয়ে বিকেলের মধ্যে এল সাম। মানে সামের স্যান্ড ডিউনস। দারুণ। মরুভূমির ভেতর এরকম মরুরূপ দেখেই তো সম্পূর্ণ হয় মরু ট্রেকিং। দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। বিশাল বিশাল বালির টিলা। সাম স্যান্ড ডিউনস এরিয়া প্রায় ৩ কিলোমিটার। সবাই বাচ্চাদের মতো ওই বালিতে ছোটাছুটি করলাম। কাল এখানেই মরু উৎসব শুরু হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে চারদিকে। অস্থায়ী থাকার জন্য ট্যুরিজম থেকে তাঁবু ফেলা হয়েছে। একটা হোটেলও আছে এখানে।

জয়সলমির থেকে সামের দূরত্ব মাত্র ৪২ কিলোমিটার টানা পথে। তাই একটা কথা এখানে বলি, জয়সলমির বেড়াতে গেলে কখনওই সাম বাদ দেওয়া উচিত নয়। অবশ্যই দ্রষ্টব্য। আমরা সরকারি তাঁবু ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূরে আমাদের তাঁবু ফেলি। সেখানে কোনও শোরগোল নেই। আজ সবাই খুশিতে ভরপুর। কারণ কাল আমাদের বিশ্রাম। সারাদিন সামে থাকা। আর সন্ধের পর উৎসব দেখা।

আজ সাম স্যান্ড ডিউনস-এ প্রচণ্ড ভিড়। আজ পূর্ণিমা। আজই মরু উৎসব। ১৯৭৯ সাল থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। সাধারণত শীতের সময়েই এই উৎসব হয়। জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে। দুদিন জয়সলমিরে আর শেষ সামের স্যান্ড ডিউনস-এর জ্যোৎস্না রাতে। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির আসরই মরু উৎসব নামে পরিচিত এখন। বারমের, পোখরান এইসব জায়গা থেকে নানা লোকসংস্কৃতির লোকজন আসে। এইসব অখ্যাত শিল্পীদের পেশাগত নৈপুণ্য না থাকলেও সারল্যের রঙে রসে মাধুর্যে তা মানুষকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। স্থানীয় মানুষরাও এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে ওঠে। আর বিদেশিদের খুব পছন্দ এই উৎসব। মূলত ওদের জন্যই এখন ট্যুরিজম থেকে হয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা। নাচ-গান, রাজপুতদের উত্থান-পতনের নানা আখ্যান আর সাজপোশাকের যেন হোলিখেলা। আছে নানাধরনের বাদ্যযন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেসব শুনতে হয়। নড়বাঁশি, আলগোছা এ হল জোড়া বাঁশি। আছে সারেঙ্গির মতো সিরিমণ্ডল, কায়ামাচা নানা কিছু। হয় নানাধরনের হস্তশিল্প প্রদর্শনী। ছাপা শাড়ি, কাঠের কাজ করা সামগ্রী, বারমেরের কার্পেটের কদর তো পৃথিবীব্যাপী। বিদেশিদের সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার,

উটের রেস, উটের পোলো খেলা। শেষে শুধুই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যা আজ সামে হবে। সারাদিন বেশ মজা হল। যেন হঠাৎই এক মেলাতে এসেছি। তবে সবচেয়ে ভালো লাগল মুক্ত আকাশে আতসবাজি। দেখার মতো। রাতে যখন ঘুমোতে গেলাম তখন অনেক রাত। আর তেমনই ঠান্ডা।

আজ সাম আবার সেই পুরনো সাম। সবাই দেখি রাতে চলে গেছে। দোকানপত্তর উঠে গেছে। একেবারে ফাঁকা। শুধু আছে বালিয়াড়ির মধ্যে অজস্র পায়ের ছাপ। বালিয়াড়ির বালির স্তরের নকশা কে যেন অদৃশ্য হাতে একদিনেই বদলে দিয়েছে।

একদিন বিশ্রাম হয়েছে। তাই আজ আমাদের প্রচুর হাঁটা। ২৪ কিলোমিটার দূরে ছত্রেল গ্রামে। ৫ কিলোমিটার বালিয়াড়ির পথ ধরে কানোই। ওখান থেকে আরও ৬ কিলোমিটার হাঁটার পর বিশ্রাম। খাওয়া, তারপর আবার পথ চলা। এবার শুরু হল পাথুরে এলাকা। রুক্ষ। শক্ত বালির সঙ্গে নুড়িপাথর। একটা মজা হল, সমস্ত নুড়িই যেন খোদাই করা ভাস্কর্য। পথে যেন পড়ে আছে ছোট ছোট পাথরের মূর্তি। ওদের মাড়িয়ে পথ। একটু নজর দিলেই মনে হচ্ছে তুলে নিই।

এদিকে অনেক রাত হয়ে গেল। ছত্রেল শেষপর্যন্ত এল না। জল নেই। তবুও থামতে হল। জেরিক্যানে যা জল আছে তাই দিয়েই রাতটা চালাতে হবে। রাত কাটিয়ে সকালে ছত্রেল এলাম। খুব বেশি আর বাকি ছিল না। ওখানেই চা-জলখাবার খাওয়া। লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু মানুষ এখানে থাকে। তারা এল আলাপ জমাতে। শোনাল প্রাচীন কিছু লোকগীতি। অচেনা পরিবেশ নিমেষে যেন চেনা হয়ে গেল।

ছত্রেল ছেড়ে চললাম লোদুর্ভার পথে। প্রায় ৭ কিলোমিটার। লোদুর্ভা হল একদা থরের রাজধানী। পথের ল্যান্ডস্কেপ দারুণ। টিপিক্যাল মরুপ্রান্তর। প্রচুর গুল্মজাতীয় গাছ। লোদুর্ভাতে একটা জৈন মন্দির আছে। ভেতরের কাজ অনুপম সৃষ্টিনৈপুণ্যে ভরা। ওখানেই দুপুরের খাওয়া। খাওয়া সেরে ওই দুপুরেই পথচলা আজ। ৪-৫ কিলোমিটার পরে এল রূপসী গ্রাম। পাহাড় আর হালকা সবুজের সমারোহ রূপসী। অপরূপ গ্রাম। প্রচুর ময়ূর আছে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুরে রূপসীর মায়া ছাড়াতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও চলা। কয়েক কিলোমিটার পরে এল রামকুণ্ড। এখানে একটা মন্দির আছে। আজকের মতো বিরতি। কিন্তু মন একটু খারাপ। আগামীকালই মরু ট্রেকিং শেষ।

খুব ভোরে আজ সবাই উঠি। বেশ গরম। কিন্তু আজ আমরা সবটুকু রাস্তা হাঁটব না। হেঁটে প্রতিদিনই চলেছি। উট আমাদের নিজেদের। উটের পিঠে খাবারদাবার সব কমে গেছে। তাই আজ পালা করে ক্যামেল সাফারি। উটের পিঠে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ক্যামেরা, রুকস্যাক সব নিয়েই উঠেছি। পরে উটের দড়ির কন্ট্রোল রপ্ত করে

ভীষণ মজাই লাগছিল। কখনও জোরে চলছে। কখনও আস্তে। কখনও সবাই চলে গেছে ও একটা কাঁটা গাছ খাচ্ছে। তাড়া দিলেও চলে না। ওদের চলার ছন্দে এলাম বড়াবাগ। হলুদের মধ্যে অনুপম সবুজ। নরম ধানখেত। কতদিন ভালো করে সবুজ দেখিনি। ধানখেত সংলগ্ন বড়াবাগ। শিল্পনৈপুণ্যে ভরপুর। জয়সলমিরে উট এজেন্সির মালিক বলেছিল, ট্রেকিংয়ের শেষে বড়াবাগ হল মিষ্টি শরবৎ। সত্যিই তাই। বড়াবাগ ট্যুরিস্ট স্পট। প্রচুর বিদেশি এসেছে। রামকুণ্ড থেকে বড়াবাগ ৭ কিলোমিটার। বড়াবাগ থেকে জয়সলমির আরও ৭ কিলোমিটার। বড়াবাগে পাথরের মূর্তি, নকশার কাজ দেখলাম। ওখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে এবার ফেরার পালা। সন্ধের রাঙা সোনালি সূর্যের আলোতে সোনার কেল্লার প্রবেশদ্বারে ফিরে এলাম। ট্রেকিং শেষ। স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রইল থর মরুভূমির বিশালতা, রঙিন সাজ-পোশাক, নাচ-গান।

দুয়েকটি তথ্য

সাধারণত শীতকালেই ডেজার্ট ট্রেকিং করা চলে। ছোট-বড় নানা ধরনের ট্রেকিং রুট আছে। জয়সলমিরের ট্যুরিস্ট লজ মুমল থেকে উট এজেন্সির খোঁজ পাওয়া যাবে। উটের ভাড়া ৭৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা প্রতিদিন। গ্রাম থাকলেও জরুরি প্রয়োজনের জন্য টেন্ট দরকার। বাসনপত্র, স্টোভ, জলের জন্য দুয়েকটি বড় জেরিক্যান নিতে হবে।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

মরোক্কো ভ্রমণ

হরপ্রসাদ মিত্র

মুখবন্ধ

'আল মাগ্রীব আল আকসা ।' ঘাবড়ে যাবেন না । নতুন কোনও ধর্ম বা তন্ত্রধ্বজী স্লোগানের আমদানি করছি না । বয়েৎটি নতুনও নয় । বরং বেশ পুরনো । বারোশো বছর আগে শহর বোগদাদের বিদ্বৎজনেরা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে হেঁড়ে মাথার খুলির ওপর টুপির মতো তেরচাভাবে বসানো দেশটির এই নামকরণ করেছিলেন । মানে হল 'দূর পশ্চিম' । ফার ইস্টের বদলে ফার ওয়েস্ট । শুধু দূরই নয়, দেশটা তখনকার সমতল পৃথিবীর একেবারে কিনারায় । এর পরেই পায়ের তলার শক্ত মাটি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েছে । তাই তো ৬৮৩ সালে কাইরুয়ানের (বহু প্রাচীন শহর, আধুনিক টিউনিসিয়ার মধ্যে) আরব শাসনকর্তা উকবা ইবন নাকি মরোক্কো জয় করে বলেছিলেন যে, পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত ইসলামের জয়পতাকা পুঁতে এলাম । এলাম-বললেন বটে, কিন্তু কাইরুয়ানে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি । পথে দেশজ বারবারদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর প্রাণ যায় । উকবার প্রাণদান কিন্তু নিষ্ফল হয়নি । আরব তথা ইসলামের জয়পতাকা মরোক্কোতে আজও সমান বিক্রমে উড়ছে । আরবরাই মরোক্কোতে প্রথম আগন্তুক নয় । ওদের বহু আগে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে ফোনেসিয়ান নাবিকরা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ কূল ধরে জিব্রাল্টার পেরিয়ে উত্তর ইউরোপ ইস্তক ইংল্যান্ড পর্যন্ত যাতায়াত করত । ওরা দেশটার নাম দিয়েছিল মরিটানিয়া । আরব অভিযান পর্যন্ত ওই নামটাই চালু ছিল । মরোক্কো নাম এই সেদিন হল, মরোক্কোর তখনকার রাজধানী মারাকেশের ফরাসি অপভ্রংশ হিসেবে । ফরাসিরা বললেন মারোক । ইংরেজরা সেই শুনে গাঁক গাঁক করে উঠলেন 'মরোক্কো' ।

ইতিহাস

একটা মজার জিনিস লক্ষ করলেন? দেশটার নাম সর্বদাই বিদেশীরা দিয়েছেন । দিশি নাম একটা হালে হয়েছে । আল মামলাখ আল মাখ্রিবিয়া । মানে উত্তর আফ্রিকার রাজত্ব । কিন্তু কলকাতার নব নামাঙ্কিত রাস্তার মতোই এই নামটা এখনও খাতাপত্রেই আছে । দেশের নামকরণ হচ্ছে বিদেশীদের হাতে-কেন, দেশে কি কোনও লোক ছিল না? ছিল বৈকী ।

আটলাস পাহাড়ের পরতে পরতে এবং সমুদ্দুরের কূল ধরে (বাকি দেশটা তো মরুভূমি) সেই আদ্দিকাল থেকে বারবারদের বাস । বারবার নামটাও রোমানরা দিয়েছিল, এদের জংলি ভূত বিবেচনা করে (ল্যাটিন বারবারিসমো) । আকৃতিতে বারবার-রা একেবারে সায়েব । ফর্সা রং, সুগঠিত নাক, চিবুক । কটা চুল, কটা চোখ, নীল চোখও বেশ দেখা যায় । পাহাড়ি ঝরনার পাথরবাঁধানো চৌবাচ্চাকূপ আলো করে বারবার-দুহিতা যখন কাঠের মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে কাপড় কাচেন তখন স্বভাবতই কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে যায় । প্রকৃতিতেও এরা ইউরোপীয়দের মতো স্বনির্ভর, পরিশ্রমী । এখনকার আরবদের (এবং আমাদের) মতো শ্রমবিমুখ, নিরুৎসাহী নয় । এত রূপ গুণ থাকা সত্ত্বেও বারবার-রা পৃথিবীর সভ্যতার বাজারে অধমর্ণ হয়ে রইল । ওরা নিজেদের কোনও ঐতিহ্য, শিল্প, কৃষ্টি তৈরি করতে পারল না । ওদের ভাষা একটা আছে বটে কিন্তু লেখবার অক্ষর হয়নি । ধর্ম বলতে গাছ, পাথর পূজা, পরে মারাবুটিজম । মারাবুট বলা হয় এক ধরনের সর্বত্যাগী সাধু-ফকিরকে, যাঁদের কেন্দ্র করে ইসলাম আসবার আগে মরোক্কোর ধর্মজীবন গড়ে উঠেছিল । ইসলামের পরে, মারাবুটরা তাদের চেলাচামুণ্ডা দলবল নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাদের আশ্রম সংগঠন আগের মতোই রয়ে গেল । এরা যে শুধু ধর্মগুরু ছিলেন তা নয়, প্রয়োজনে এঁরা সশস্ত্র সংগ্রামেও নামতেন । খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এঁদেরই একজন, আলমোরাভিদ বংশের অনাচার এবং ভ্রষ্টাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের পতন ঘটান এবং আলমোহাদ বংশীয় আবদ আল মুমিনকে সিংহাসনে বসান । চাণক্যের কথা মনে পড়ছে নাকি!

অক্ষরের অভাবে ওদের ধর্মশাস্ত্র গড়ে উঠতে পারেনি । তৈরি হয়নি শাস্ত্র পুরাণ, দর্শন । অথচ আধার হিসেবে এরা অতুলনীয় । হাজার-হাজার বছর ধরে আদিম জীবনযাপন করলেও পৃথিবীর অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মতো এদের বুদ্ধিবৃত্তি জমে পাথর হয়ে যায়নি । যখন যে সভ্যতার বীজ এদের মধ্যে এসে পড়েছে তার কয়েকটি অন্তত অঙ্কুরিত হয়েছে মহীরুহে । ফোনেসিয়ানরা এদের নিয়েই কার্থেজ তৈরি করেছিল, যে কার্থেজ একদা রোমের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে । অগাস্টাস সিজারের স্বহস্তে লালিত বারবার রাজকুমার দ্বিতীয় জুবা বিয়ে করলেন অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার মেয়ে ক্লিওপেট্রা সেলিনাকে, যাঁর পাণিগ্রহণের জন্য রোমের তাবৎ সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকরা লাইন দিয়েছিলেন । দ্বিতীয় জুবা রোমের মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে পঞ্চাশ বছর মরিটানিয়ায় রাজত্ব করেন । দুশো বছর পরে এঁদেরই এক যোদ্ধা সেন্টিমাস সেভিনাস রোমের সম্রাট মনোনীত হন । রোমের প্রতাপ কমে যাবার পর যখন খ্রিস্টানরা এদেশে গেড়ে বসল তখন এই মাটিতেই জন্মালেন চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে খ্রিস্টানদের সুবিখ্যাত চিন্তানায়ক সেন্ট অগাস্টিন ।

খ্রিস্টধর্ম কিন্ত এদেশে বেশিদিন টিকল না। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ইসলামের ষাঁড়াষাঁড়ি বাণে খ্রিস্টধর্ম ভেসে গেল। বারবার-রা একযোগে মুসলমান হল মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে। কাইরুয়ানের নতুন মুসলমান শাসনকর্তা মুসা ইবন নুসাইল, টানজিয়ারস থেকে স্পেন আক্রমণ করলেন। পত্তন হল আন্দালুসিয়া, গ্রানাডা, আলহামব্রার। সেই আক্রমণের নেতা ছিলেন এক পুরুষে মুসলমান বারবার-সন্তান তারিক ইবন জিয়াদ। মরোক্কোর ইতিহাসের পাতায় পাতায় বারবারদের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে এবং রক্তাক্ষরে লেখা আছে। অথচ বারবার-রা কোন জাতির কোন শাখা বা প্রশাখা, তারা কোথা থেকে উত্তর আফ্রিকায় এল অথবা তারা কি বরাবরই এদেশে ছিল, এদের ভাষাটা কোন শ্রেণীর ভেতরে পড়ে-এসব নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতরে মতদ্বৈধতার অন্ত নেই। এদের আসল পরিচয় এখনও কুয়াশায় ঢাকা।

বারবারদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম এই জন্য যে, এরাই হল মরোক্কোর আদি বাসিন্দা। বাকি সবাই ফোনেসিয়ান, গ্রিক, রোমান, ভ্যান্ডাল, বাইজানটাইন, আরব, ইহুদি, স্পেন আর পর্তুগালের লোক। সুদান এবং পশ্চিম আফ্রিকার কালো মানুষরা সব বাইরে থেকে এসেছে। এসেছে এবং থেকে গেছে। মরোক্কোর 'মহামানবের সাগরতীরে' বহু জাতি, বহু রক্ত মিশে তৈরি হয়েছে আধুনিক মরোক্কো। তবুও আজকের সাধারণ মুর প্রধানত বারবার এবং আরবের সংমিশ্রণ। নিজেরা পুরোপুরি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও এবং আরবদের সঙ্গে লেনদেন, বিয়ে-শাদি প্রায় বারোশো বছর ধরে চালু থাকলেও বারবাররা তাদের উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, বিশেষ করে তাদের খাস মোকাম আটলাস পাহাড় এবং তার দক্ষিণ অঞ্চলে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, কট্টর মুসলমান হলেও বারবার সুন্দরীরা বোরখায় তাদের মুখ ঢেকে রাখেন না। ভাগ্যিস! তা না-হলে আটলাস পাহাড়ের অর্ধেক আলো ফিউজ হয়ে যেত। বাকি অর্ধেক কী বলুন তো? পাহাড়ি ফুল। দুপাশের নীল জঙ্গলে যেন রঙিন তারা ফুটে আছে। মরোক্কোর জাতি মিশ্রণ প্রসঙ্গে একটা কথা চুপিচুপি বলে রাখি। সবাই সবাইয়ের সঙ্গে মেশে বটে, কেবল ইহুদিরা (অল্পই অবশিষ্ট আছে এখন) উন্নাসিকভাবে নিজেদের ফারাক রাখেন। আর কালো মানুষগুলোকে বাকি সবাই কিছুটা কৃপার চোখে দেখেন।

ভূগোল

ইতিহাসচর্চা যথেষ্ট হল। এখন একটু ভূগোল আলোচনা করা যাক। কর্মব্যস্ত পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ভ্রমণকাহিনীর ভেতরে আবার এত ইতিহাস-ভূগোল কেন? এ যে 'ধান ভানতে শিবের গীত'। আমি বলি, ধান ভানার মতো ক্লান্তিকর কাজকে মনোরম করার জন্যই শিবের গীত গাইতে হয়। যে দেশটা দেখতে যাব তার সম্বন্ধে একটু

জানাশোনা না থাকলে গিয়ে কী দেখব। আগেই বলেছি যে, আকৃতিতে মরোক্কো দেশটা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে তেরচা করে বসানো একটি সমান চতুর্ভুজ। উত্তর এবং পশ্চিম ভুজে যথাক্রমে ভূমধ্য এবং আটলান্টিক সমুদ্র, দক্ষিণে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের বেড়া (আটলাস পর্বতশ্রেণী)। তার পরের অংশটুকু সাহারা মরুভূমির গোড়ার দিক। পূর্বেও নিচু পাহাড়ের গাঁট, যার মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা-পথে যাতায়াত চলে। সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত কোনাকুনিভাবে চারটি শৈলশ্রেণী চলে গেছে। ভূমধ্যসাগরের কূল ঘেঁসে প্রথম শ্রেণী হল 'রিফ মাউন্টেন'। পশ্চিমঘাটের মতো অনুচ্চ পর্বতমালা, পশ্চিমঘাটের মতোই সমুদ্রোপকূল থেকে খাড়া উঠে গেছে। সর্বোচ্চশিখর জেবেল টিডিরিন ৮২৮৬ ফুট উঁচু। সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের গা কেটে বসানো রাস্তার নাম কর্নিস। সমুদ্দুরের ওপারে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েবাতে ওই এক নামই চলে। ভূ-প্রকৃতিও একইপ্রকার। রিফের পরে বিস্তৃত স্যুশ উপত্যকা। মরোক্কোর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ধান, গম, ভুট্টা থেকে কফি, কড়াইশুঁটি, গাজর, টমেটো, আঙুর, ডালিম, আপেল, লিচু এমনকী আমাদের কলা, মুলো, শশা, পেঁপে পর্যন্ত কিছুর অভাব নেই। আবার এরই মধ্যে পাহাড়ের একদিকে চাষবাস, অন্যদিকে বালিয়াড়ি। ঢেউখেলানো নয়, বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের মাথায় উঠে যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। সালভাডোর ডালির সুররিয়ালিস্টিক ছবির মতো। স্যুশ উপত্যকার পরেই শুরু হল আটলাস পাহাড়, তিন সারিতে। প্রথম সারি মিডল আটলাস অপেক্ষাকৃত নিচু। সর্বোচ্চ শিখর 'জেবেল সায়াচি' ১২৪৮৭ ফুট। মিডল আটলাস সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয়। তবে আরও বন্য। আরও অকৃত্রিম। সুইজারল্যান্ডের চেয়ে ঠান্ডাও কম। মিডল আটলাসের পিছনে সমস্ত দক্ষিণ দিকটা আড়াল করে হাই আটলাস। উচ্চতম শিখর জেবেল তুকবাল (১৩৮৩৫ ফুট), শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে। স্কি খেলার জন্য সারা পৃথিবীর লোক জড়ো হয়। গ্রীষ্মে উপেক্ষিতা। হাই আটলাস পেরোলেই হাওয়া বদলে গেল। শুরু হল অ্যান্টি-আটলাস পর্বতশ্রেণী। সাহারার অববাহিকা। তারপর ধু-ধু মরু।

আবহাওয়া

মরোক্কোভ্রমণে যাওয়ার বিশেষ কোনও সময়-অসময় নেই। মরুভূমির দেশ হলেও সমুদ্রের দক্ষিণে আটলাসের এপারে তাপমাত্রা জুলাই-আগস্ট মাসেও ৩৭০-৩৮০ সেন্টিগ্রেডের ওপরে ওঠে না। সমুদ্রের ধারে তাপমান বিশ-ত্রিশ ডিগ্রি কম তবে হাওয়া আর্দ্রতায় ভরপুর। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সব জায়গাতেই তাপমাত্রা ১৫০-১৬০ সেন্টিগ্রেডে

নেমে যায়। সাধে কী মরোক্কোর অন্যতম বিশিষ্ট গুণগ্রাহী চার্চিল বলেছিলেন যে, মরোক্কো হল ‘গরম সূর্যওয়ালা ঠান্ডা দেশ’। বৃষ্টি মরোক্কোতে খুব বেশি হয় না, তবে হলে একবার হয় জুন-জুলাই মাসে, আরেকবার ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেই কখনও-কখনও আটলান্টিক থেকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া চালু হয়, যাকে ফরাসিদের অনুকরণে এরাও বলে মিস্ট্রাল। মোটামুটি বলা যায়, মরোক্কোতে সব সময়ই প্রশস্ত সময়। তবে যাঁরা পাহাড়ে স্কি খেলতে না চান, তাঁদের পক্ষে এপ্রিল-মে আর ওদিকে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরই সবচেয়ে ভালো সময়। আমাদের হিমালয়ের মতো আটলাস হল মরোক্কোর প্রাণপুরুষ। একদিকে ঠেকিয়ে রাখে সুদান সাহারা থেকে আসা বুক পুড়িয়ে দেওয়া গরম হাওয়া। অন্যদিকে আটকে দেয় আটলান্টিক থেকে ওঠা জলকণাবাহী বাতাস যা মেঘ হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে ফুল, ফল, ফসল ফলায় মরোক্কোর মরুভূমির মতো জমিতে। সব মিলিয়ে বিচিত্র রঙের খেলা। নীল আকাশ, নীল-সবুজ সমুদ্র। গেরিমাটি রংয়ের বালি, কাঁকর, পাথরবিছানো বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষীণকায় নদীর ধারা আর তাকে ঘিরে সবুজ মরকত মণির মতো উজ্জ্বল জনপদগুলি। দূরে পাহাড় বনরাজি নীলা।

যাত্রাপথ

মরোক্কো তো মুজতবা আলি সাহেবের কাইরো নয় যে, সুয়েজ বন্দরে নেমে একটা রোঁদ দিয়ে আবার সেই জাহাজেই ওঠা যাবে পোর্সুই বা পোর্টসৈয়দ-এ। মরোক্কো যেতে হলে আলাদা করে কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। প্রথমেই ভারত থেকে লন্ডন। লন্ডন এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রধান শহরগুলির সঙ্গে মরোক্কোর বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। উড়ে তো যাওয়া যায়ই। লন্ডন থেকে মরোক্কোর বৃহত্তম শহর, বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যাসাব্লাঙ্কা আড়াই ঘণ্টার উড়ান। যেন মুম্বই-কলকাতা। এছাড়া প্যারিস থেকে সোজা ট্রেন আছে। ইরুণ হয়ে স্পেনের দক্ষিণকূলে সালজেসিয়াস পর্যন্ত। ৩৬ ঘণ্টার মতো লাগে। লন্ডন থেকে চল্লিশ ঘণ্টা। মোটর বা বাসেও যাওয়া যায়, অজস্র ট্যুরিস্ট বাস আছে। প্যারিস, বিয়ারিটজ, বুর্গোস, মাদ্রিদ, মালগা হয়ে সেই সালজেসিয়াস। সালজেসিয়াস জিব্রাল্টারের এপারে। খাঁড়িটুকু পেরোলেই (মোটর, বাস সব এক জায়গাতেই খাঁড়ি পেরোয়) ট্যানজিয়ারস। পৌঁছে গেলেন মরোক্কো। ট্যানজিয়ারস থেকে ট্রেন মোটর বা বাসে করে সারা মরোক্কো ঘোরা যায়। বড় বড় শহরের মধ্যে প্লেন চলাচল আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের সেতে বন্দর থেকে একটা জাহাজও টানজিয়ারস যায়। ৩৬ ঘণ্টা লাগে। সময় এবং স্বাস্থ্য অনুকূল থাকলে স্থলপথ ভ্রমণটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কেমন লোম্বার্ডি। গ্যাসকনের মধ্য

দিয়ে পিরেনীজ পাহাড় পেরিয়ে, দুদিকে বাস্কদের দেশ দেখতে দেখতে মাদ্রিদ। তারপর দৌড়! দৌড়! দুধারে লা মাঞ্চার দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর (দূরে জীর্ণ-শীর্ণ কোনও অশ্বারোহী ততোধিক জীর্ণ-শীর্ণ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে নাকি?)। একদমে এসে পৌঁছলেন আন্দালুশিয়া। মুরেরা নাম দিয়েছিল আল আন্দালুশ। করডোবা, সেভিল, মালগা, গ্রানাডা। ৮ম শতাব্দীর গোড়া থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আটশো বছর মুরেরা রাজত্ব করেছে এদেশে। আন্দালুশিয়ার নাড়ির পাকে পাকে জড়িয়ে আছে আরবসভ্যতার অবদান। তাই স্থলপথে গেলে মরোক্কোর ভোজের আগে আন্দালুশিয়াতেই তার কিছুটা স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যায়। একদা এসব রাস্তায় ঘুরেছি কিন্তু এবার সাহস হল না। ঠিক করলাম লন্ডন থেকে উড়ে যাব।

গন্তব্যস্থল

তারপরেই ঠিক করতে হয় যে, সীমিত সময়ের মধ্যে মরোক্কোর কোথায় যাব। আয়তনে ৪৫৮৭৩০ বর্গ কিলোমিটার (লোকসংখ্যা ২৪০ লক্ষের মতো)। ভারতের সাতভাগের এক ভাগ হলেও দেশটি ছোটখাটো নয়। তারমধ্যে মরু, পাহাড়, সমুদ্র সবই আছে। পাহাড় দেখতে হলে একদিকে যেতে হয়, সমুদ্র অন্যদিকে। 'মরোক্কোর কোথায়' যদি বা স্থির হল, তখন ভাবতে হবে 'মরোক্কোর কখন'। রিফ পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের ধার ঘেঁসে পুরাবৃত্ত। ফোনেসিয়ান, রোমান, গ্রিক, বাইজান্টাইনদের আনাগোনা। তার সঙ্গে আছে আধুনিককালের অবক্ষয় অশিক্ষা-দারিদ্র্য। ইউরোপের ঝাঁট দেওয়া জঞ্জাল আর পাপ যার চরম পরিণতি হল ট্যানজিয়ারস। রিফ আর আটলাসের মধ্যে ধরণী শস্যশ্যামলা। ইসলামীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। নবম শতাব্দীর গোড়া থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মরোক্কোর রাজধানী এই অঞ্চলেরই বিভিন্ন স্থানে ছিল। ফেজ, মেকনেস, মারাকেশ। আটলাসের দক্ষিণে স্বচ্ছন্দচারী বারবার উপজাতিদের বাস। যারা নিতান্ত সাময়িকভাবে ছাড়া কখনও উত্তরের আধিপত্য মেনে নেয়নি, বরং তারাই খেপে খেপে আটলাস পেরিয়ে এসে দখল করেছে মরোক্কোর সিংহাসন। মরোক্কোর এখনকার রাজা হাসান (২)-এর আলওয়াইত বংশও এসেছিল আটলাসের ওপার থেকে। এহেন মরোক্কোর কোথায় কী দেখতে যাব। আমি পুরাতত্ত্ববিদ নই, ইতিহাসবেত্তা নই। ভূপর্যটকও নই, রামনাথ বিশ্বাস বা মুজতবা আলি সাহেবের মতো। আমি চোখে যা পড়ে তাই দেখি। খবরের কাগজে যা দেখি তাই পড়ি। অতএব আমার যাওয়া উচিত মরোক্কোর সেই অংশে যেখানে 'এখন' 'তখন'-এর সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে পশ্চাৎপটের ওপর ফুটিয়ে তোলা ছবির মতো।

অভিজ্ঞজনেরা বললেন, চোখ বুজে বেরিয়ে পড়ো ইসলাম মরোক্কোর উদ্দেশে । ফেজ, মেকনেস, মারাকেশ । পারো তো এখনকার রাজধানী রাবাতেও একবার যেও । ওই ফেজ থেকে গাড়িতে ঘণ্টাচারেক লাগে । না হলেও ক্ষতি নেই । ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা যাবার দরকার নেই । মরোক্কোর বৃহত্তম শহর (লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ) হলেও ওটা নিতান্ত অর্বাচীন । এই তো সেদিন ১৯৩০ সাল থেকে ফরাসিদের হাতে ওর বাড়বাড়ন্ত । ট্যানজিয়ারসও না হয় পরের বারে যেও ।

পশ্চিমতট

অবশ্য আটলান্টিক তটভূমিতে কয়েকটি দ্রষ্টব্য জায়গা আছে । যেমন ট্যানজিয়ারসের অদূরে আসিলা । জুলাই-আগস্ট মাসে এখানের চারুশিল্প মেলায় সারা পৃথিবীর লোক ভেঙে পড়ে । তারপর সালে । এক হাজার বছরের পুরনো শহর বহু মসজিদ, মাদ্রাসাভূষিত । সালের পরে সাফি । পর্তুগিজদের আস্তানা ছিল এই সেদিন পর্যন্ত । সাফি ছাড়ালে ইসাউইরা । আগের নাম মোগাডোর । বহু প্রাচীন শহর । অক্লেশে ২০০০ বছরের কথা বলতে পারে । ইদানীংকালে মোগাডোরের প্রসিদ্ধি হল অরসন ওয়েলসকে নিয়ে । তাঁর যুগ প্রবর্তক ছবি ওথেলোর চিত্রগ্রহণ এখানে হয়েছিল দেড় বছর ধরে । এখনও মোগাডোরের কফি হাউসে বসে কোনও কোনও নগরবৃদ্ধ সেদিনের গল্প করেন ।

মোগাডোরের দক্ষিণে আগাডির । মরোক্কো বিজয়ী আরব সেনাপতি উকবা ইবন নাকি আগাডিরেই প্রথম কিংবদন্তীর নীল মানুষদের সম্মুখীন হন । এরা বারবারদের একটি শাখা । এদের পুরুষরা নীল পোশাক পরে । মুখ নীল ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে । কেউ কেউ নাকি গায়ে নীল রং মাখে । এরাই হল সাহারাখ্যাত টুয়ারেগ । নির্মম যোদ্ধা, নির্বাক এই নীল মানুষদের উকবা ইবন ঘাঁটাননি । পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন । আগাডিরের আশপাশে মানুষরা আজও আছে । তাদের প্রধান বৃত্তি হল ইউরোপ থেকে দলে দলে আসা সমুদ্রপ্রেমী ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জন । সত্যিকারের রাজা যেন অবস্থা বিপাকে যাত্রাদলে রাজা সেজেছে । আগাডির থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁসে শুরু হল সাহারা মরুভূমি । হাই আটলাসের পিছনে । তবে সমস্ত সাহারা একেবারে ধু-ধু মরুভূমি নয় । মাঝে মাঝে মরূদ্যান আছে । বাসে করে অ্যান্টি-আটলাস পেরিয়ে ড্রা নদীর উপত্যকা (নদীটি মরুপথেই ধারা হারিয়েছে । আটলান্টিকে পৌঁছয়নি ।) ধরে এগোলে মরোক্কোর দিকে শেষ শহর হল জাগোরা । রক্তের মতো লাল বিপণীশ্রেণী ঘিরে সবুজ খেজুর গাছের সমারোহ । জাগোরার প্রধান রাস্তা অ্যাভেনিউ মোহামেদ (৫) যে ধুলোমাখা গোল চত্বরে শেষ হয়েছে সেখানে রং ওঠা কাঠের ফলকে অস্পষ্ট ফরাসি অক্ষরে এখনও পড়া যায় । 'টিমবাক্টু,

উটের পিঠে ৫২ দিন’। বড় সাধ ছিল এসব জায়গায় কিছুটা ঘুরি। কিন্তু বন্ধুরা, শক্ত ঘাড় নাড়লেন। পাগল! তোমার বয়সের কেউ ওসব শ্মশানে-মশানে যায়!

মারাকেশ

অতএব একদা সায়ংকালে লন্ডন বিমানবন্দর থেকে স-গৃহিণী যাত্রা করলাম। লক্ষ্য মারাকেশ। বিমানপথে কোনও ঘটনা নেই। যদি কিছু ঘটে তবে সেটা দুর্ঘটনা। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল। সাড়ে তিনঘণ্টা পরে (আসলে সাড়ে চারঘণ্টা। মরোক্কোর ঘড়ি ইংল্যান্ডের থেকে একঘণ্টা এগিয়ে থাকে।) মারাকেশে অবতরণ। ছোট্ট এয়ারপোর্ট। আমাদের ভুবনেশ্বর বা বারাণসীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ইমিগ্রেশন কাস্টমস সবাই বন্ধুভাবাপন্ন। মধ্যপ্রাচ্য বা প্রতীচ্যের মতো ভারতীয় দেখলেই তারা মুখ বেঁকায় না বা বাক্স-প্যাঁটরার বিশেষ খানা-তল্লাসির বন্দোবস্ত করে না। এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই হাসিমুখে এগিয়ে এল আজিজ। হোটেল থেকে পাঠানো ট্যাক্সির চালক। রাস্তায় কিছুটা আলাপ হল আজিজের চোস্ত ফ্রেঞ্চ এবং গৃহিণীর ভাঙা ফ্রেঞ্চের মাধ্যমে। আজিজ বলল যে, ও ইংরিজিও জানে তবে বলার অভ্যাস নেই তো। এখানে মরোক্কোর ভাষাতত্ত্বের কথা একটু বলে রাখি। বারোশো বছর আরবি ভাষা স্বাধীন রাজত্ব চালিয়ে ১৯১২ সালে মরোক্কো ফ্রেঞ্চ প্রোটেক্টরেট (বাংলায় কি রক্ষিতা বলব?) হল। খোলনলচে, হুঁকো-গড়্গাড়া সব বদলে গেল। ফরাসি শাসকরা বললেন, ফরাসি ভাষা ছাড়া আধুনিক ন্যায়-নীতি, বিচার, প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই চলতে পারে না। অতএব আরবি ভাষাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফরাসির আসন করা হোক। তবে আরবিকে পুরোপুরি নির্বাসন দেবার দরকার নেই। দেশের ধর্মব্যবস্থা, মোল্লা, মসজিদ, ওইগুলোর চর্চা আরবিতেই চলতে পারে। মরোক্কোতে ফরাসি শাসন মাত্র চুয়াল্লিশ বছর টিকেছিল। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সুলতান মোহামেদ (৫) (এখনকার রাজার বাবা) রাবাতে বসে মরোক্কোর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেইসঙ্গে আরবি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হল। মোহামেদ অবশ্য ফরাসি ভাষাকে তাড়িয়ে দিলেন না। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ওটা রয়ে গেল। মরোক্কোর স্কুলে ছাত্ররা প্রথম পাঁচ বছর আরবি পড়ে, তারপর শেখে ফ্রেঞ্চ। শিক্ষিত মরোক্কোবাসী মাত্রেই দ্বিভাষিক। স্বাধীনতা পাবার পর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে মরোক্কোতে। শতকরা সত্তর জন সাক্ষর। ফরাসি আমলে যেখানে বড়জোর পাঁচ লক্ষ শিশু স্কুলে যেত এখন সেখানে স্কুলগামী ছাত্রের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। এই একই সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছে মাত্র দেড় গুণ। ১৬ কোটি থেকে ২৪ কোটি। শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম নিদর্শন হল ডটপেনের চাহিদা। শহরে-গ্রামে সব জায়গাতেই ছেলেবুড়ো সবাই বলবে-একটা বাইরো দেবে? এক

শহর থেকে আরেক শহরে যাবার সময় দেখবেন দলে দলে ছেলেরা ও মেয়েরা ব্যাগ ঝুলিয়ে, রোদ্দুরে মুখ রাঙা করে স্কুল যাচ্ছে বা স্কুল থেকে ফিরছে। মোটরে গেলে আপনাকে থামতে বলবে। কলকল করে উঠে আসবে গাড়িতে। কম তো নয়; কেউ কেউ তিন-চার মাইল হেঁটে স্কুলে যায়।

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা হয়ে গেল। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া। আজিজকে বলে রাখলাম যে, পরদিন সকালে আমাদের পুরনো শহর দেখাতে নিয়ে যাবে। মরোক্কোর প্রায় সব শহরই প্রাক ফরাসিক এবং নতুন ও পুরনো দুটি আলাদা অংশে ভাগ করা। মেদিনা বা পুরনো শহর চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মেদিনার সঙ্গে লাগোয়া থাকে একটি করে 'কসবা' দুর্গ বা সেনানিবাস। (আমাদের কলকাতার কসবাতেও একদা সেনানিবাস ছিল।) অন্য অংশটি হল 'ন্যুভেল ভিল বা নয়ানগর' যেটি ফরাসিরা তৈরি করেছিল। ভারতের প্রাক ব্রিটিশ শহরগুলোতেও এমনই দুটি অংশ থাকে। গৃহিণী সকালে উঠে বললেন যে, উনি বিছানায় বসেই চা খাবেন। দোষ দিই না। বাড়িতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওঁকেই উঠে উনুনে আগুন দিতে হয়। আমি নিচে নেমে হোটেলটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। চারদিকে মরোক্কোর দেশজ অলঙ্করণ, চারুশিল্পের ছাপ, ঐসলামিক আলেখ্যহীন নকশা মেঝেতে, দেওয়াল থেকে দেওয়াল পর্যন্ত পুরু কার্পেট। অবাক হয়ে দেখি, সেই সাতসকালে বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ মিলে বিরাটকায় কার্পেটগুলো উঠিয়ে, মেঝে লাঠির ডগায় লাগানো ভিজে নুটি দিয়ে মুছছে। পরে দেখেছিলাম যে, এই মেঝে মোছাটি দৈনন্দিনের কাজ। ইউরোপের কোনও হোটেলে এমন ব্যাপার দেখিনি। এরা বোধহয় ইউরোপীয়দের মতো ধুলো-ময়লা কার্পেটের তলায় চালান দিতে অভ্যস্ত নয়। হোটেলের বাইরে হোটেলের নিজস্ব কুড়ি একরব্যাপী বাগান। হোটেলের প্রয়োজনমতো ফুল, ফল, সবজি-আনাজ এখান থেকেই পাওয়া যায়। সবই ভালো। হতাশ হলাম খালি দূরে মেঘের মতো হাই আটলাসের ছায়ামূর্তি দেখে। উঁচুও তো এমন নয়, অথচ বলে কাক ওড়া রাস্তায় পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতো। হোটেল তত্ত্বাবিধায়করা বললেন, হাওয়ায় বড্ড ধুলো আর এখন তো বরফ সব গলে গেছে। শীতকালে এসো। তখন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হাওয়ার মধ্য দিয়ে দেখবে বরফের টুপি পরা হাই আটলাসের শিখরশ্রেণী সকালের রোদ্দুরে ঝলমল করছে।

ইতিহাসের মারাকেশ

প্রাতরাশ সারতে সারতে দেখি দোরগোড়ায় আজিজের হাসিমুখ উঁকি দিচ্ছে। ট্যাক্সি চড়বার আগে সুধী পাঠককে জানিয়ে রাখা ভালো যে, মারাকেশ কেন, মরোক্কোর কোনও শহরেই টুম্ব, মনুমেন্ট, ক্যাথিড্রাল প্যালেসের ছড়াছড়ি নেই। দেখতে দেখতে পায়ের দড়ি

ছিঁড়ে যায় না। মসজিদ, দরগা, পীরের থান কিছু আছে বটে কিন্তু প্রায়শই সেসব জায়গায় অ-মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব দেখবার যা কিছু একবেলায় সেরে নিয়ে বাকি বেলাটা হোটেলে গিয়ে গড়ানো যায় বা কাফেতে বসে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা' দেখা যায়। চারদিকে মুম্বই নির্মিত হিন্দি ফিল্মের ছড়াছড়ি। যার যেদিকে অভিরুচি ঢুকে পড়লেই হল। অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, হেমামালিনী, রেখা বলতে ওরাও অজ্ঞান। গাড়ি হোটেল-চৌহদ্দি ছেড়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল মারাকেশের বিখ্যাত পাঁচিল। প্রায় তিন মানুষ উঁচু গিরিমাটি রঙের দেওয়াল, মাথায় বল্লমের মতো খাঁজকাটা। সোজা বাঁদিক থেকে ডানদিকে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। পাঁচিলের মাঝে মাঝে বুরুজ, তাতে সারি সারি চোখের ফোকর, সেকালের তীরন্দাজ, বন্দুকবাজদের জন্য। চারদিকের মুক্তপ্রান্তর যেন থমকে দাঁড়িয়েছে পাঁচিলের সামনে। প্রায় হাজার বছর আগে মরোক্কোর তখনকার রাজবংশ আলমোরাভিডরা পাঁচিলটা খাড়া করেছিল। তখন পাঁচিলের পরিসীমা ছিল ১৬ কিলোমিটার। এক-এক বাহু চার কিলোমিটার লম্বা। তারমধ্যে মারাকেশের পুরনো শহর মেদিনা। এখন পাঁচিল বহু জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বহু জায়গায় বহুবার মেরামত হয়েছে। আলমোরাভিডদের সময়ে পাঁচিলে ২০টি গেট ছিল। বিখ্যাত, কুখ্যাত, অখ্যাত, নানা কাজের নানা জায়গায় যাওয়ার জন্য। পুরনো দিল্লির কথা স্মরণ করুন। এখন সে রাম, সে অযোধ্যা কিছুই নেই। শুধু পাল্লাহীন কতকগুলো গেট টিকে আছে। আমরা যে গেট দিয়ে শহরে ঢুকলাম তার নাম বাব-এল-জেদিদ। অখ্যাত গেটগুলোর অন্যতম। অচিরে গাড়ি এসে থামল সাদীয়ান সমাধিক্ষেত্রের দরজায়। ভিড় করে সাদা পোশাক (জেলেবায়া) পরা গাইডরা দাঁড়িয়ে আছে, যার যখন ডাক আসবে। আমাদের কাছে এল এক মধ্যবয়স্ক দোহারা মূর্তি, কাঁচা-পাকা দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ। সাদীয়ান সমাধি দেখার জন্য গাইডের খুব দরকার ছিল না, কিন্তু গাইডের (সামনের দুটো দাঁত ভাঙা) ফোকলা হাসির আবেদন এড়াতে পারলাম না। শুনলাম, সে নাকি ইংরিজি ভাষার হুনরী। কাজের বেলায় সে ইংরিজির চেয়ে ফ্রেঞ্চ বরং ভালো, ফ্রেঞ্চটা অন্তত বোঝবার চেষ্টা করতে হয় না।

সাদীয়ান সমাধিক্ষেত্রের সঙ্গে কাব্যের কোনও সম্পর্ক নেই। এ হল এক সাদী বংশের কথা যারা এখনকার আলওয়াইত রাজবংশের ঠিক আগে একশো বছর মরোক্কোতে রাজত্ব করেছে, ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। গিল্টির কাজ করা ক্যারারা মার্বেলের দেওয়াল, জালি, ঝরোকা। মাঝে মাঝে আকাশের রঙে রং মেলানো নীল টালির (মরোক্কোর বিশেষত্ব) আস্তর ক্যালিগ্রাফিক আরবি অক্ষরে লেখা কোরানের বয়েৎ। ওপরে সিডার কাঠের সিলিং। মৃদু-কোমল উদ্ভিদজাত রঙে চিত্র-বিচিত্র। স্যাফ্রন থেকে হলুদ।

হেনা থেকে লাল । পুদিনা থেকে সবুজ । আর বাগান, সে বাগান না দেখলে বোঝা যায় না । একমাত্র গ্রানাডার (স্পেন) আলহামব্রায় এমন বাগান দেখেছি । নিবিড় তরুলতার ফাঁক দিয়ে রৌদ্র-ছায়ার খেলা । নিচে কতরকম ফুলের কেয়ারি । তার চারপাশ ঘিরে সুঘ্রাণ লতাগুল্মের বেড়া । রোজমেরী, মিন্ট, এলাচ । চারদিকে ফোয়ারার জল বাতাসে উড়ে আসছে । জলকণাবাহী বাতাস সত্যিই সুরভি মন্থর । মাথা নত করে নতি জানালাম সাদী বংশীয় সর্বোত্তম নরপতি টিমবাক্টু বিজয়ী আহমদ আল মনসুরকে । তাঁর যোগ্য সমাধিস্থান বটে । মৌলে (মৌলে মানে হল নেতা) ইসমাইল কিন্তু তা ভাবেননি । আলওয়াইত বংশীয় এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুলতান (বিক্রমে আল মনসুরের সমকক্ষ বলা যেতে পারে ।) সাদীয়ান সমাধিক্ষেত্র দেখে হিংসায় ফেটে পড়ে, রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে টুম্বে ঢোকার পথ নিরেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন । এ হল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ঘটনা । ক্রমে লোকে এই সমাধিক্ষেত্রের কথাই ভুলে গেল । ১৯১৭ সালে ফরাসিরা এই নিরেট গাঁথনি কেটে সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথে কবরস্থানে ঢুকলেন । সুড়ঙ্গপথটি আজও সেইভাবেই রাখা আছে । পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ (বেশি মোটা না হলে) কোনওক্রমে আনাগোনা করতে পারে । সাদীয়ান টুম্বের পাশেই আহমদ আল মনসুর তাঁর সাধের এল বাদি-প্রাসাদ গড়েছিলেন । এল বাদি মানে অতুলনীয় । মৌলে ইসমাইল সে প্রাসাদও ধ্বংস করলেন । যা কিছু মূল্যবান জিনিস সোনা, রূপা, মার্বেল, নকশাকাটা সিডার কাঠের ছাদ নিয়ে গেলেন তাঁরা রাজধানী মেকনেসে । যা নিতে পারলেন না ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে গেলেন । এখন সেই ধ্বংসের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নেই । এল বাদি থেকে এল বাহিয়া (বাহিয়া মানে চোখ ঝলসানো) । এও এক প্রাসাদ, তবে মোটে একশো বছর আগে মরোক্কোর গ্র্যান্ড ডিজিয়ের সিমুসা এটা তৈরি করেছিলেন । প্রায় ষাট একর জমি নিয়ে এলাহি ব্যাপার । এখনও রাজবংশীয়রা মারাকেশে এলে এখানে থাকেন । সেসময় সাধারণ লোকে প্রাসাদে ঢুকতে পারে না । আমাদের ভাগ্য ভালো প্রাসাদ খালি ছিল । এমন কিছু আহামরি ব্যাপার নয় । এক জায়গায় এক বিরাট চবুতারা ঘিরে চব্বিশটি খুপরি খুপরি ঘর । গাইড বলল, ঘরগুলি উজিরের চব্বিশটি উপপত্নীর জন্য । পাশের মহলে শরিয়ৎ অনুমোদিত চারটি ধর্মপত্নীর জন্য অবশ্য বেশ বড় বড় ঘর । গাইড ঘুরে ঘুরে সব দেখাল । 'উজির কোথায় থাকতেন?' -এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর গাইড দিতে পারল না । এত বুদ্ধি না হলে কি কেউ গ্র্যান্ড ডিজিয়ের হয় । পত্নী এবং উপপত্নীদের ত্রিসীমানায় তিনি বাস করতেন বলে মনে হল না । এল বাহিয়ার লাগোয়া একটি ছোট প্রাসাদ দার-এল-সৈদ । এটা তৈরি করেছিলেন সি-মুসার কোনও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লোকে তাঁকে বলে আধপাগল । পাগল হলেও তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ছিল । ছোটর ওপরে প্রাসাদটি বেশ ছিমছাম সুদৃশ্য । এটি এখন মরোক্কান আর্টের মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার হয় । আরও অনেক ছোটখাটো দেখবার জিনিস ছিল ।

কিন্তু একবেলায় শরীর মন আর চোখ কত বা নিতে পারে। হোটেলে ফিরে আহার এবং বিশ্রাম।

জেমা-এল-ফন

বিকেলের রাউন্ডে আর আজিজকে ডাকিনি। হোটেল থেকে একটা ছোট ট্যাক্সি নিয়ে (আমাদের দুটি প্রাণীর জন্য বড় ট্যাক্সির বেশি ভাড়া গোনার কী দরকার) টুক করে চলে এলাম জেমা-এল-ফন। মরোক্কো আসবার আগে বিলাতের বন্ধুরা প্রচুর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন এখানকার ট্যাক্সিওয়ালা, পোর্টার, বয়, বেয়ারাদের সম্বন্ধে। এখন মনে হয় সে সতর্কতায় যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। ফেজ-এ একবার এক অসাধু গাইডের পাল্লায় পড়ে সামান্য কিছু অর্থক্ষয় ছাড়া আমাদের দশদিনের অভিজ্ঞতায় মরোক্কোতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আসলে মরোক্কোর সাধারণ মানুষেরা বেশ হাসিখুশি, আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ। ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে দুটো পয়সা পাবার প্রত্যাশা করতে পারে, কিন্তু চোটপাট, জোর-জবরদস্তি নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে কয়েক বছর আগে যখন মেক্সিকো গিয়েছিলাম তখনও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা এমনই ভয় দেখিয়েছিলেন। ফিরে এসে যেই বললাম যে, তাঁদের ভয় অমূলক, তাঁদের জবাব হল, অঃ তোমরা ভারতীয় বলেই (কালা আদমি আর মুখ ফুটে বললেন না) ওরা নিজমূর্তি ধরেনি। মনে মনে ভাবি ঠিকই তো। আমরা তো আর বছরের পর বছর ধরে ওদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াইনি যে আজ আমাদের দেখলেই ওরা জবাই করবার ছুরিতে শান দেবে। যাক, যে কথা বলছিলাম, জেমা-এল-ফন মারাকেশের প্রাণ, মরোক্কোর আত্মা। যদি একদিনের মধ্যে কেউ মরোক্কো দেখতে চায় তাকে সেই দিনটি কাটাতে বলব এই জেমা-এল-ফন-এ। অথচ কথাটার মানে হল বিনাশিতদের জমায়েত। একসময় মেদিনার ঠিক বাইরে এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে যুদ্ধে নিহত শত্রুদের ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শিত হত। কিন্তু সে অনেকদিন আগেকার কথা। আরেকটা পুরনো কথা মনে পড়ে। বহুকাল আগে দেখা হিচককের বিখ্যাত ছবি 'যে মানুষটি বড্ড বেশি জানত।' জেমস স্টুয়ার্ট ও ডোরিস ডে অভিনীত রুদ্ধশ্বাস ছবিটি। মনমাতানো গান 'কে সেরা, সেরা...'। ছবির অনেক দৃশ্য মরোক্কোতে তোলা। বিশেষ করে প্রথম শট-'জেমস স্টুয়ার্ট ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাপ খেলানো দেখছে। হঠাৎ কেন জানি ছুটতে শুরু করল।' -এই জেমা-এল-ফনেতেই তোলা হয়েছিল।

জেমা-এল-ফনকে কী বলব? মেলা, হাট, কার্নিভাল, ফিয়েস্তা, ফ্লি মার্কেট, না একাধারে সব? যদি চার-পাঁচটা হাটের মধ্যে কয়েকটা মেলা ঢুকিয়ে একটা তালগোল পাকানো যায়,

তার মাঝে থাকে সারি সারি খাবার স্টল, কোথাও বা বর্ণোজ্জ্বল পোশাক পরে কালো নাচিয়েরা ওত পেতে বসে আছে খদ্দেরের জন্য। কেউ বা সাপ খেলাচ্ছে (ঠিক আমাদের দেশের মতো, তবে ওরা তুবড়ি বাঁশিটা ব্যবহার করে না), ওরই মধ্যে চলছে পুতুল নাচ, লাগ ভেলকি ভানুমতীর খেলা, দড়াবাজি (অ্যাক্রোব্যাটিক্স) নানারকম কৌশলের খেলা-টিপ করে বালাটা ফেলতে পারলেই জিনিসটা তোমার, চাঁদমারি আর বন্দুকের খেলা তো আছেই। কী নেই! হ্যাঁ, ভিখারি নেই। একটাও ভিখারি দেখলাম না। দোকান-দোকান সার সার দোকান। মাটিতে শতরঞ্চি পেতে, বেঞ্চের ওপর বাক্স সাজিয়ে, ঢাকনাওয়ালা ঠেলাগাড়ির ডালা খুলে বিচিত্র পণ্যসম্ভার। নতুন এবং পুরনো। এমনকী রদ্দি, ফেলে দেওয়া জিনিসেরও স্থান আছে। এক জায়গায় ডাঁই করে রাখা পুরনো জুতো। শুনলাম ওগুলো নাকি সব এক পাটি জুতো। কেউ যদি জোড় মেলাবার জন্য কেনে। ওরই মধ্যে বয়স্কা অপিচ তযঙ্গি এক রমণী এসে স্ত্রীর হাতে একটি রুপোর চুড়ি পরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে। ওটা তোমায় দিলাম।' ভালো লাগার মূল্য আমাদেরও কিছু দিতে হল। বেশি নয়। চুড়িটাও তো সত্যিই রুপোর নয়। বেলা যত পড়ছে, ভিড় তত বাড়ছে। ট্যুরিস্টের ভিড় নয়। জেমা-এল-ফন হল মারাকেশের প্রাণস্পন্দন। ট্যুরিস্টরা তার অংশ নিতে পারে কিন্তু এ হল প্রধানত মরোক্কোর লোকদের জন্য।

ভিড়ের ভিতর যখন আর দৃষ্টি চলে না তখন বেরিয়ে এসে উঠে যান চারপাশের কোনও কাফের খোলা ছাদে। সেখানে বেঞ্চিতে বসে মিন্ট চা খান আর নিচে তাকিয়ে দেখুন জেমা-এল-ফনের বিশ্বরূপ। বিরাট জনসমষ্টি চিনাদের কাগজের সাপের মতো হেলছে দুলছে। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় মেলার বিভিন্ন অংশ থেকে ছিটকে পড়ছে বিভিন্ন রং। আলো কমে এল। পিছনে মসজিদ থেকে আজান ধ্বনি উঠছে, 'আল্লা-হো-আকবর, আশহাদো আল-লা এলাহা ইল্লাল্লাহ...' (আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই...।) নামবার সময় সিঁড়ির মুখ থেকে চোখে পড়বে ২৩২ ফুট উঁচু কুতুবিয়া মিনারের নিঃশব্দ অঙ্গুলি নির্দেশ খোদাতালার আশমানের দিকে যেখানে, তখন কোণ ভাঙা কাঁসার থালার মতো প্রায় পূর্ণিমার চাঁদের পাশে একটি ক্ষীণকায় তারা ঝিকমিক করছে। জেমা-এল-ফনের অনতিদূরে কুতুবিয়া মসজিদ এবং তার সুউচ্চ মিনার মারাকেশের অন্যতম স্থান নির্দেশক। আলমোরাভিডরা প্রায় একশো বছর আগে শুরু করলেও, এ মিনার খাড়া করেছিলেন আলমোহাদ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ইয়াকুব-এল-মানসুর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। আমাদের কুতুবমিনারের সমসাময়িক বলা যায়। প্রবাদ আছে যে, মিনারের ওপরে তিনটি সুবর্ণগোলক গড়া হয়েছিল ইয়াকুব

আল মানসুরের কোনও বেগমের সমস্ত গহনা গালিয়ে। বেগম পবিত্র রোজার সময় তিনটি আঙুর খেয়ে ফেলেছিলেন। তাই তাঁর প্রতি এই দণ্ডাদেশ হয়।

নিচে নেমে দেখবেন জেমা-এল-ফনে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। ওদিকে খোলা আগুনে বড় বড় লোহার পরাত পেতে তৈরি হচ্ছে নানারকমের কাবাব, বড় বড় দাগায় সেঁকা মাছ। হাঁড়ি হাঁড়ি কুসকুস। তার সঙ্গে মেখে খাওয়ার সুরুয়া টাজিন (একরকমের স্টু), বড় বড় ডেকচি করে ফুটছে মরোক্কোর সুপ হারিরা। পিটা ব্রেড মানে হাতগড়া রুটি তো আছেই। চওড়া টেবিলের একপাশে রান্না হচ্ছে। পরিবেশন হচ্ছে টেবিল থেকে। অন্য পাশে সারি সারি বেঞ্চি পেতে বসে ভোক্তারা। দূর থেকে দেখবেন, ঝলসানো মাংস, ফুটন্ত সুপ সুরুয়ার ভাপ ওপরের ঠান্ডা হাওয়ায় জমে গিয়ে খাবার স্টলের দিকে একটা বাষ্পের চাঁদোয়া তৈরি করছে। কয়লার ধোঁয়া নেই। রান্না বেশিরভাগই গ্যাসের উনুনে। কয়লা অল্প যা কিছু তা হল কাঠকয়লা। বড় সাধ হল ওই খাওয়ার আসরে বসে যাই কিন্তু সাহস হল না। অত ভিড়ভাড়াক্কার মধ্যেও কিন্তু বন্দেজ আছে। প্রত্যেক স্টলের নম্বর দেওয়া আছে। ফেরবার পথে যে স্টলে আমরা কিছু বাদাম ভাজা কিনলাম, তার কালো কোলো হাসিমুখ মালিক কাগজে সওদা মুড়তে মুড়তে (ওরা ঠোঙার ব্যবহার জানে না) বলল, ‘আবার এসো। এই তো আমার ২৮নং স্টল’।

নয়ানগর

পরের দিন বেশ বেলা করে নতুন শহর দেখতে যাব বলে বেরিয়েই শুভদৃষ্টি হল আহমেদ সাহেবের সঙ্গে। চোস্ত, সুট, বুট, টাইপরা সুদৃশ্য যুবক। বয়স গোটা পঁচিশ হবে। ফর্সা রং, কালো চুল, দাড়ি কামানো, ছাঁটা গোঁফের তলায় একমুখ হাসি। আদাব তসলিম দিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, ‘মারাকেশের বিখ্যাত স্যুক দেখতে যাবেন না, আর পুরনো শহর মেদিনার অলিগলি?’ আমাদের আগেই জানা ছিল যে, গোলকধাঁধার মতো স্যুক বা কাটরা দেখতে গেলে একজন গাইড নেওয়াই ভালো, না হলে হয়তো সারাদিন একই চত্বরে ঘুরতে হবে। তাছাড়া পুরীর পাণ্ডার মতো সঙ্গে একজন না থাকলে অসংখ্য পাণ্ডার উৎপাত এড়াতে পারা যাবে না। তবুও ইতস্তত করছি দেখে বললেন, ‘ভয় নেই, আমি সরকার অনুমোদিত গাইড। আমার রেটের বেশি এক পয়সাও নেব না। কোনও দোকানে কিছু কিনতে বলব না।’ আমরা বললাম, স্যুক দেখতে কাল যাব। আজ নতুন শহর দেখে আসি। হোটেলের ট্যাক্সির দাম বেশি, আমরা একটু পায়ে হেঁটেও চলতে চাই বলে দশ মিনিট হেঁটে এলাম ফাউন্টেনে যেখানে গোল চক্করে পাঁচটা বড় বড় রাস্তা এসে মিশেছে। মুম্বইয়ের ফ্লোরা ফাউন্টেনের মতো তবে ওরকম ঘিঞ্জি নয়। এইখান থেকেই নতুন শহর

শুরু বলা যায় । ফাউন্টেন এবং পুরনো মারাকেশের মধ্যের জায়গাটাও নতুন । এটা হল হোটেল আর অফিস এলাকা । সারি সারি বড় বড় হোটেল তাদের নিজস্ব বাগানের মধ্যে । ফাউন্টেনের চারদিকে গোল করে এবং তার ধারে-কাছে বিরাট বিরাট বাড়ি (পাঁচ-ছতলার বেশি নয় । স্থান সংক্ষেপ মারাকেশে এখনও হাইরাইজ শুরু করেনি) । সরকারি, বেসরকারি অফিস, বড় বড় দোকান । দুয়েকটা কাফিখানা । পরিষ্কার চওড়া চওড়া রাস্তা, গাছপাতা, ফুলে-ফলে নয়নাভিরাম । সরকারি নয়াদিল্লির কথা মনে করিয়ে দেয় । নয়াদিল্লির মতোই সকাল-বিকেল সাইকেলের ভিড় । অফিসযাত্রীরা । মাঝে-মাঝে মোটরাসীন অফিসারকুল । অন্যসময় রাস্তা সুনসান । কখনও ভোঁ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল । এছাড়া আছে আমাদের ফিটনের মতো ঘোড়ার গাড়ি । দেশি নাম কালেচে । গাড়ি এবং নাম দুই-ই ইউরোপ থেকে নেওয়া । এগুলো ট্যুরিস্ট ধরবার ফাঁদ । এদের ভাড়া ট্যাক্সির দু-তিনগুণ এবং সে ভাড়ার কোনও মা-বাপ নেই । তবুও শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনীরা যুগলে কখনও বাচ্চাকাচ্চাসমেত ক্লিপেটি ক্লপ করে হাওয়া খেতে যান ঘোড়ার গাড়ি চড়ে । ভাড়া বেশি বটে কিন্তু ডলার, পাউন্ড, মার্ক দিয়ে মাপ করলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই 'ড্যাঞ্চি' ।

ফাউন্টেন থেকে ট্যাক্সি ধরে চলে গেলাম নয়া শহরের যেটা কেন্দ্রস্থল, ব্যবসা-বাণিজ্যের আড্ডা, দোকান-পসার যেন আমাদের ধর্মতলা (বড়বাজার তো মেদিনার ভেতরে) সেই গেইলাতে । রাস্তার দুধারে ঝুপি অলিভ গাছ । কমলালেবুর গাছও আছে, কিন্তু সে ছোট ছোট লেবু খাবার নয় । জোঁদা টক । শহরের সর্বপ্রধান দুটি রাস্তা এভঃ মোহামেদ (৫) আর এভঃ ইয়াকুব এল মানসুর, যেখানে অসমকোণে মিশেছে সেখানে চারটি কোণা জুড়ে চারটি ফুটপাথে ছড়ানো কাফে । খোঁজ নিয়ে জানলাম, এসব কাফে স্রেফ আড্ডা মারবার জন্য । চা, কফি, বিয়ার, ওয়াইন, জিন, হুইস্কি সবই পাওয়া যাবে কেবল খাবার বেলায় ঢু-ঢু । পাশেই এক রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসে কাফেতে ছড়িয়ে বসলাম । এইখান থেকেই শহর দেখা যাক । প্রায় তৎক্ষণাৎ এক ছোকরা এসে আমার 'বুৎ বালিশ' করতে লেগে গেল । টকটকে ফর্সা রং, লাল চুল, পোশাক-পরিচ্ছদ পুরনো হলেও পরিপাটি । বয়স ১৬-১৮ হবে । সে বুরুশ ঘষে আর আড় চোখে আমার স্ত্রীর শাড়ি পরা মূর্তির দিকে তাকায় । তারপর আরবী ভাষায় গড়্গাড় করে কি বলে গেল । আমরা কিছুই বুঝলাম না কিন্তু কলকাতার লোকের মতোই মরোক্কোবাসীরা বিদেশীকে সাহায্য করতে সর্বদাই উন্মুখ । আমাদের পাশেই যে দুটি আরব ছোকরা বসে মিন্ট চা খাচ্ছিল তাদের একজন ভাঙা ফরাসিতে আমাদের বুঝিয়ে দিল যে বুৎ পালিশ ছেলেটি বলছে যে, ও ইন্ডিয়া ভীষণ পছন্দ করে, অনেক হিন্দি ছবি দেখে এবং আরেকটু বড় হলেই ও ইন্ডিয়াতে

গিয়ে ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করবে । কত খরচ পড়বে ইন্ডিয়ান কনের জন্য । আমার স্ত্রী তখন দোভাষীর মারফত তাকে জানালেন যে, ইন্ডিয়াতে বরপণ দিতে হয় কন্যাপণ নয় । ওর মুখটা বেশ হাঁ হয়ে গেল । একটা জিনিস লক্ষ করলাম, মরোক্কোতে আবালবৃদ্ধ (বনিতাদের কথা বলতে পারলাম না) দৃঢ় বিশ্বাস করে ইসলামাৎ পরতর নহি । ফিল্ম স্টার ধর্মেন্দ্র মুসলমান নয় শুনে আমাদের ছেলেটি বেশ মর্মাহত হল । সেকি? ওই যে অমুক ফিল্মে আকুলভাবে আকাশের দিকে হাত তুলে খোদাকে ডাকল ধর্মেন্দ্র । আমাদের মারাকেশ ভ্রমণের ফলে ধর্মেন্দ্রর অন্তত একটি ভক্ত বোধহয় কমে গেল । হিন্দি ফিল্ম সম্বন্ধে যে যাই বলুক তৃতীয় পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে যে, আমাদের সমমর্মী এই দেশগুলিতে অথবা ভারতের বাইরে ভারতীয় আবাসিকদের মধ্যে ভারতের সঙ্গে কৃষ্টিগত সংযোগ ও ভারতচেতনা বজায় রাখার ব্যাপারে এই ফিল্মগুলির দান অনস্বীকার্য । সেইদিনই সন্ধেবেলায় পুরনো শহরের এক মরোক্কান রেস্টুরেন্টে যখন খেতে গেলাম তখন মালিক স্বয়ং এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে ভুল উচ্চারণে (কিন্তু ঠিক সুরে) হিন্দি ফিল্মের গান শুনিয়ে দিলেন ।

মেদিনা এবং স্যুক

পরের দিন সকালে আমরা মিঃ আহমেদের হাতে আমাদের সঁপে দিলাম । মেদিনা এবং তার অন্তর্বর্তী স্যুক । নতুন শহর যেমন নতুন দিল্লির কথা মনে করিয়ে দেয় মেদিনা তেমনই পুরনো দিল্লি । গলিঘুঁজি কাশীতেও কিছু কম নেই, কিন্তু বোধহয় ইসলামীয় স্থাপত্যের জন্যই মেদিনা যেন আমাদের চাঁদনিচকের আশপাশ, দরিবা কালান, পরোটাওয়ালা গলি । এর ইতিহাস অক্লেশে এক হাজার বছর চলে যায় । তবে এখন যে শহর দেখছি, তা পুরনো দিল্লির মতোই চার-পাঁচশো বছরের । টেরা-বাঁকা সরু রাস্তা, তার দুদিকে ইটের নয়, গিরিমাটির দেওয়াল, মাঝে মাঝে লম্বা খুপরিমতো যেখানে বেনে তার বেনেতি মশলা সাজিয়েছে নিচু পাটাতনের ওপর আধভর্তি গানিব্যাগে । তারপাশেই একটা পেতল-কাঁসার দোকান । হরদম সায়েব ঠকানো অ্যানটিক তৈরি করছে । ছোট ছোট সিগারেটের খুপরি, সেখানে সিগারেট ছাড়াও নানারকম টুকিটাকি জিনিস পাওয়া যায় । পান-দোক্তার চল একেবারেই নেই । সেলুনে নাপিত চুল ছাঁটছে । কটা কার্পেটের দোকান । তারপরেই গাইড দাঁড়িয়ে গেল কারুকার্যমণ্ডিত বিরাট এক দরজার সামনে । বেন ইউসুফ মেদ্রেসা । ১৬শ শতাব্দীর বিখ্যাত ইসলামীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । এই সেদিনও চালু ছিল । ফরাসি আমলে (বোধহয় ছাত্রাভাবে) বন্ধ হয়ে এখন মিউজিয়ামে পরিণত । গলিঘুঁজি হলেও সব বেশ ছিমছাম সাফসুরৎ । কারণ রাস্তা জুড়ে কেউ সবজি বেচছে না । অথবা

‘চিরপরিচিত গদাইয়ের চায়ের দোকান’, ‘করিমের কাবাব স্টল’ নেই । খাবার স্টল প্রচুর আছে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট এলাকাও আছে । সারা শহর জুড়ে শালপাতা, খাদ্যের অবশেষ, হাত ধোয়া এবং সবজি ধোয়া জলের নোংরামি নেই । অথচ মেদিনার একতলাতেই শুধু দোকান । দুতলা-তিনতলাতে পুরুষানুক্রমে বহু লোক বাস করে । মেদিনা শেষ করে এবার বূহ্যের ভেতরে ব্যূহের মতো স্যুকে ঢুকলাম । স্যুকের চারদিকেও দেওয়াল ঘেরা তবে নগর-প্রাকারের মতো উত্তুঙ্গ নয় । দেওয়ালের মাঝে মাঝে গেট এবং সেসব গেটেরও নাম আছে স্যুকগুলির অবস্থান বোঝাবার জন্য । স্যুকগুলি আর কিছুই নয়, এক-এক পণ্যের দোকান সমষ্টিমাত্র । যেমন স্যুক আতরাইন মশলা গন্ধ দ্রব্যাদির স্যুক । স্যুক আরাটিন যেখানে চামড়া, কাঠ এবং বহু ধাতুনির্মিত জিনিস বিক্রি হয় । স্যুকেও বিজুতেরি গয়নার বাজার আরও কতরকমের স্যুক । স্যুক আরব সভ্যতার একটি বিকাশ । মধ্য এবং নিকট প্রাচ্যের সর্বত্র আছে । কারণ সভ্যতার বহু কারণের মতো ধর্মভিত্তিক । প্রত্যেক স্যুকের মাঝখানে তাদের নিজেদের মসজিদ থাকে যাতে করে প্রত্যেক দোকানি হাঁটাপথে নমাজ পড়তে যেতে পারে আজান শোনবার পর । মেদিনা এবং স্যুকে এত ভিড়-ভাড়াক্কা, দোকান-পসার, কেনাবেচা হলেও চেঁচামেচি নেই । এবিষয়ে মরোক্কোর লোকেরা আশ্চর্য শান্ত, মৃদুভাষী । বাইরে গাড়ির হর্ন পর্যন্ত শোনা যায় না । স্যুকের ভেতরে চলতে চলতে কানে আসবে দুটি আওয়াজ । এক ‘পলেক পলেক’ । পিঠে বিরাট বোঝা নিয়ে (মাথায় মোট নেওয়া ভারতের বাইরে কোথাও দেখিনি) মুটেরা সাবধান করছে তফাৎ যাও, তফাৎ যাও । অন্যটি হল, মাঝে মাঝে সরব দীর্ঘশ্বাসের মতো । আল্লা! ভগবানের দোহাই । অন্ধ কৃপা ভিক্ষা করছে । এর অদূরেই মরোক্কোর সন্ত সুফী সাধুদের পূজ্যতম সিদি বেল আব্বাসের দরগা । লোকে বলে দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু এখনও প্রতি রাতে কুতুবিয়ার আশপাশে ঘুরে বেড়ান যতক্ষণ না মারাকেশের সমস্ত অন্ধ খেতে পায় । গাইড আহমেদ সর্বদা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং যত্ন করে সব দেখিয়েছেন । তিনি মজুরি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন তার বিন্দুমাত্র অন্যথা করেননি । এমনকি ফেরবার সময় মাঝপথে ওকে ছেড়ে দিয়ে যখন আমরা মামুনিয়া হোটেল দেখতে গেলাম তখন তিনি নিজে হোটেলে ফিরে যাবার ভাড়াও চাননি । ভদ্রলোক আর কাকে বলে । আহমেদ এখনও অবিবাহিত । তবে পাড়ার কোনও মেয়ের সঙ্গে পূর্বরাগ চলছে । না, মরোক্কো মুসলিম হলেও পূর্বরাগে বাধা নেই । ভোরবেলায় জেমা-এল-ফন-এ বসে কফি খেতে খেতে আমি দেখলাম হাসিমুখ নারী-পুরুষ (স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে হল) হাত ধরাধরি করে চলে গেল ।

বাগান

মারাকেশে দুটি সরকারি বাগান আছে । মেনারা এবং আগুয়াডাল । আগুয়াডাল আসলে একটি বিরাট সমচতুর্ভুজ দিঘি, যার চারদিকে বাগান । শহরের জল সরবরাহ হয় এখান থেকে । দুটি বাগানই তৈরি করেছিলেন সবুজপ্রেমী জলবিলাসী বারবার সুলতানরা দ্বাদশ শতাব্দীতে । তখন হয়তো পুষ্প এবং বুলবুলিতে এদের ফিরদৌস বলা চলত । এখন হৃত গৌরব । আরেকটি পটে আঁকা বাগানবাড়ি আছে যার মালিক হলেন ইভস সেন্ট লরেন্ট (YVES ST LAURENT), প্যারিসের উচ্চ ফ্যাশনের গুরু এবং উদ্ভাবক । বাড়িটি তাঁর ব্যক্তিগত হলেও বাগান এবং বাগানের অভ্যন্তরে তাঁর নিজস্ব শিল্প সংগ্রহশালা সামান্য পয়সা নিয়ে দেখতে দেয় । বাগানটি দেখবার মতো ।

মামুনিয়া হোটেল

মারাকেশ এলে মামুনিয়া হোটেলের কথা বলতেই হয় । এটি একটি প্রতিষ্ঠান । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলির অন্যতম । ঐশ্বর্য, বিলাস এবং মূল্যে । মরোক্কোপ্রেমী চার্চিল এই হোটেলে বহুদিন ছিলেন । তাঁর ব্যবহৃত স্যুইটটি এখনও সাজিয়ে রাখা হয়েছে দ্রষ্টব্য হিসেবে । লোকমুখে এখানকার মরোক্কান খানার প্রচুর প্রশস্তি শুনছিলাম । তাই স্যুক থেকে ফেরবার পথে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা এখানে সারব ভেবেছিলাম, না হয় তারপর দুদিন ম্যাকডোনাল্ডে (তাও আছে) ক্ষুন্নিবৃত্তি করব । কিন্তু হোটেলে গিয়ে শুনলাম হোটেলের নতুন মালিকরা দুপুরবেলা মরোক্কান রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখেন । সেখানে কেবল নৈশাহার হতে পারে । অতএব কাফেটেরিয়ায় খেলাম । তারও উদ্যোগ আয়োজন লিনেন ক্রকারি, কাটলারি অনেক ভালো রেস্টুরেন্টকে লজ্জা দিতে পারে । উত্তম ফরাসি খাদ্য । চার্চিল স্যুইট দেখা হল না কিন্তু একতলার বহু কক্ষ, বারান্দা, অলিন্দ ঘুরে ঘুরে দেখলাম । একটি বিরাট ঢাকা বারান্দায় মনোমুগ্ধকর মুরালে মরোক্কোর নানা দৃশ্য আঁকা আছে । বলে রাখি যে, সারা মরোক্কোর ভেতর এই একটি জায়গা যেখানে হোটেল কর্মচারীদের কেউ কেউ (সবাই নয়) আমাদের কালো বরণের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল । হবে না । চার্চিল সাহেবের হোটেল তো । শোনা যায় যে, মামুনিয়ার গ্র্যান্ড ক্যাসিনো (অভিজাত জুয়াখেলার জায়গা) অর্থকৌলিন্যে এবং উত্তেজনায় মন্টি কার্লোর সঙ্গে তুলনীয় ।

উরিকা ভ্যালি

মারাকেশের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। আরেকটি দিন। এই দিনটি আমরা ট্যুরিস্ট বাসে করে বেড়াতে গেলাম উরিকা ভ্যালি, মারাকেশ থেকে কমবেশি পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে আটলাসের পাহাড়তলিতে স্নিগ্ধ শ্যামবনানী গভীর উপত্যকা। মাউন্ট তুকবাল পর্বতশ্রেণীর সমস্ত জল নামে এই উপত্যকা বেয়ে ঝরনা, নদী, প্রস্রবণ। চারদিকে কুলকুল জলের আওয়াজ। বিরাট বাস। বিরাট দল। আমরা দুটি ছাড়া সব সাহেব-মেম। মরোক্কোর ট্যুরিজম এখনও বেশিরভাগই ইউরোপীয়দের দখলে। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিয়াডদের ছড়াছড়ি। আমেরিকান অপেক্ষাকৃত কম। জাপানি চোখেই পড়ে না। আর আমাদের যে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা সর্দারজি পুরো দশদিনে মাত্র একটি চোখে পড়েছিল। মরোক্কোতে ভারতীয়দের সংখ্যা অত্যল্প। ফিল্ম যতই থাক ভারতীয় রেস্টুরেন্ট তো দেখিনি। বাস পিচের রাস্তা দিয়ে চলেছে। একহারা রাস্তা কিন্তু বেশ মসৃণ। খানাখন্দ নেই। যান চলাচলও এমন বেশি নয়। দুদিকে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, ছোট ছোট গ্রাম। কাফিখানা। মুদির দোকান। অন্তত একটা মসজিদ, তার লাগোয়া স্কুল। পাঠশালা বললেই হয়। খোয়াই ভেঙে পাহাড়ি নদী। মাটির রং লাল। বাস চলছে প্রায় তীরের মতো সোজা হাই আটলাস লক্ষ্য করে। চালকের পাশে বসে গাইড মাইক্রোফোনের সাহায্যে ক্রমাগত বস্তু এবং দৃশ্য পরিচিতি দিয়ে যাচ্ছেন শুদ্ধ ফরাসি ভাষায়। কথা ছিল ভাষণটি ইংরিজিতেও হবে। গাইড বার দুই চেষ্টাও করল। ফরাসির বদলে ইংরিজি। কিন্তু সে ইংরিজি আমাদের কাছে ফরাসির মতোই দুর্বোধ্য। পাহাড়ের শুরুতেই টনাইন এল। উরিকায় সোমবারের হাট ও অঞ্চলে বিখ্যাত। আমাদের ট্যুরটাও ওইজন্য সোমবার করা হয়। চারপাশের দশটা গাঁ থেকে মানুষজন আসে। আসে পসারীরা তাদের ডেরা ডাণ্ডা, তাঁবু, শতরঞ্চি নিয়ে। আনাজ, সবজি, মাছ, মাংস, ফল-পাকড়, চাল-ডাল, মশলা, কাপড়, বাসন, কাঁসা, কম্বল, খুরপি, শাবল, ছুরি, কাঁচি-সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় এই হাটে। তার সঙ্গে খবর নেওয়া, খবর দেওয়া, গল্পগুজব, এ গ্রামের লোকের সঙ্গে ও গ্রামের দেখা-সাক্ষাৎ সব এই মেলায়। সব পুরুষমানুষ, মেয়েরা হাটে আসে না। তারা নিজের নিজের গ্রামে ঘরকন্নায় ব্যস্ত। মেলার ডাঙা জমির একটু আগে নদীর ধারের নাবালে বিরাট পার্কিং লট। সেখানে অন্তত পাঁচশো গাধা খোঁটায় বাঁধা আছে। পাশেই ফুয়েল পাম্প। ঘাস-খড়ের দোকান। হাট দেখে আবার বাসে উঠলাম। এবার সত্যি পাহাড়। ঘুরে ঘুরে বাস উঠছে। কখনও দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। কখনও একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে নিচুতে সংকীর্ণ এক নদী। নদীর কাছে কয়েকটা ঘর। একচিলতে খেত। এক জায়গায় রাস্তা সর্পজিহ্ব। অন্য পথটি গেছে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে

উকাইমেদেন । জেবেলতুকবালের পায়ের গোড়ায় ছোট্ট শহরটি ৮৬০০ ফুট । স্কি খেলার জন্য বিখ্যাত । এখান থেকে স্কি লিফট করে ওঠা যায় জেবেল উকাইমেদেন । প্রায় ১১০০০ ফুটে পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম স্কি খেলার জায়গা । আমরা অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম না এবং অক্টোবর মাসে বরফও নেই, স্কি-ও নেই । এর কিছুটা পরই রাস্তা চওড়া হয়েছে আর আধখানা রাস্তা জুড়ে সাইনবোর্ড-LA KASBAH DE L'OURIKA RESTAURANT BAV. SALON DE THE.

শুনলাম এই হল উরিকা ভ্যালিতে আমাদের গন্তব্যস্থল । একসময়ে এটি দুর্গ ছিল । দ্বিপ্রাহরিক আহার এখানেই হবে । নেমে পড়লাম । আহারাদির গল্প অন্য জায়গায় করব । মরোক্কান খাওয়া । বুফে স্টাইলে । কেবল স্যুপ এবং সুরা পরিবেশিত হল । তারপর হোটেলে ফেরা । বাস সকলকে যে যার হোটেলে নামিয়ে দিল ।

সেইদিন মানে মারাকেশের সেই শেষ সন্ধ্যায় এদেশীয় একটি ক্যাবারে দেখতে গেলাম । এল-বাদিয়া নাম্নী নর্তকী প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আমাদের নানাবিধ নৃত্য দেখালেন । অপারদর্শী আমার পক্ষে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে বিদ্যুতের পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে দিলে হয়তো এইরকম দেখাত বা শোনাত । বাদিয়া অবশ্য ঘুঙুর ব্যবহার করেননি । তাঁর হাতে ছিল ক্যাসটানেট । ধাতু এবং কাঠের তৈরি একরকম মন্দিরা বলা যায় । পরে শুনেছিলাম যে, উনি হলেন মারাকেশের শ্রেষ্ঠ নর্তকী । বয়স নাকি পঁয়তাল্লিশ । এছাড়া বাজিকর, ম্যাজিক, সাপখেলানো । নানারকমের যৌথনৃত্য । আটলাসের ওপার থেকে নিয়ে আসা আওয়াস এবং গুয়েদ্রা । বাদ্যযন্ত্র বাঁশি (ফ্লুট), রুবাব, কাঠতরঙ্গ, হার্প, ভায়োলার মতো দেখতে একটা যন্ত্র কিন্তু হাঁটুর ওপরে রেখে বাজায়, আমাদের সবচেয়ে অবাক করল তলারদিকে সরু আর ওপরদিকে চওড়া খোলার ওপর চামড়া ঢাকা এক পটহ যেটার বাদ্যি ঠিক যেন আমাদের ডুগি তবলা । শুনলাম বাজনাটির নাম ডারবুকা । সঙ্গীতও ছিল । মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীত যেমন হয় । আমাদের খেয়ালের বিস্তারের মতো । সুরের ওঠানামা আছে, কিন্তু দুন-চৌদুন না থাকার দরুন আমাদের কানে একটু একঘেয়ে ঠেকে । পরের দিন সকালে ফেজ পুরনো মরোক্কোর প্রধান নগরী । মারাকেশ থেকে ওড়াপথে পঁয়ত্রিশ মিনিট । সবসুদ্ধ হোটেল থেকে হোটেলে আড়াই ঘণ্টা । এই সময়টা এয়ারপোর্ট বা এয়ার প্লেনে বসে না থেকে একটা আলোচনা করি মরোক্কোর আহারাদি, কেনাকাটা, রীতিনীতি বিষয়ে ।

আহারাদি

মরোক্কান খানার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মাংস, বিশেষ করে চিকেন ও ফলের সংযোগ। বিখ্যাত স্ট্রু-টজিন হল স্ট্রু করা মাংসের ওপরে প্রন, কমলা, এলমন্ডের আবরণ। স্ট্রু করা মাংস আর সবজি। স্যুপ বলতে হারিরা। ঘন ডালের সঙ্গে মাংসের টুকরো, পেঁয়াজ, টমাটো প্রভৃতি দিয়ে ফোটানো। এটা প্রধানত গরিবের খাবার, ফেজ-এল বালির রাস্তায়, প্রত্যুষে দলে দলে লোক সকালের জলপান সারে একবাটি হারিরা আরেকটা বান দিয়ে। এরপরেই বলতে হয় বিসটিল্লার কথা। নবাব বাদশার খাদ্য। আগে থেকে বলে রাখলে কোনও কোনও পাঁচতারা হোটেলে পেতে পারেন। নানাবিধ লতা-পাতা, শিকড়, মশলা সংযোগে গুমো আঁচে বহু ঘণ্টা ধরে পক্ক কপোত মাংস। অন্যদিকে তৈরি হয় পাতলা পাতলা খাস্তা পরোটা। সুপক্ক কপোত মাংসের সঙ্গে জাফরান, এলমন্ড, মধু ও শর্করা মিশিয়ে খাস্তা পরোটার ওপর পরতে পরতে বিছিয়ে দেওয়া। খেতে কেমন লাগে। কী করে বলব, খাইনি তো। এখানে মাংসের সঙ্গে মধু ও বাদামের সংযোগ লক্ষ করুন। বিসটিল্লা না খেলেও মরোক্কোর জাতীয় ডিস কুসকুস (ইউরোপীয়দের বিচারে) অনেক খেলাম। কুসকুস হয়তো আপনারাও খেয়েছেন। তবু বলে রাখি যে, মোটা দানার সেদ্ধ সুজি অল্প ভেজে, মাংস বা সবজির সুরুয়া দিয়ে মেখে খেতে হয়। বেশ লাগে। এছাড়া আছে নানারকমের কাবাব এবং কোফতা আমাদেরই মতো। ছোট ছোট সসেজ (শুয়োরের মাংস নয়) ভাজা খুব চলে। মরোক্কোর সুবিশাল সমুদ্রসৈকতে এবং পাহাড়ি ঝরনায় নানারকমের মাছ পাওয়া যায়। মাছ ওরা খায়, তবে ঝোলঝাল অম্বল বানাতে জানে না। আস্ত আস্ত মাছ বা বড় বড় দাগা সেঁকা, ভাজা, সেদ্ধ নানাভাবে খাওয়া হয়। মরোক্কোতে ফল, সবজি, চিংড়ি, সার্ডিন ফিডাচিজ (ছাগলের দুধ থেকে তৈরি) সব মিশিয়ে যা স্যালাড করে, তা পিঠা (মধ্যপ্রাচ্যের হাতে গড়া রুটি) দিয়ে খেলে এক বেলার খাওয়া হয়ে যায়। মিষ্টিমাষ্টার ব্যাপারে মরোক্কোর খুব প্রশংসা করতে পারছি না, যদিও দেশটা মধুর খনি ও চিনির রানি। ভারতবর্ষের অনেক আগে থেকে মরোক্কো চিনি বানাচ্ছে এবং ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপ মরোক্কোর চিনির প্রত্যাশায় বসে থাকত। এর কারণ বোধহয় মিষ্টিতে দুধের ব্যবহার মরোক্কানরা শেখেনি। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত সর্বত্রই গরু তথা দুধের ব্যবহার কম। উট, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা এই নিয়েই তাদের কারবার। মিষ্টি সবই ময়দা, চিনি, মধুর সমন্বয়। যেমন ব্রিউয়াত। ছোট ছোট সামোসার ভেতরে মধু আর বাদামের পুর। কিমা বা চালের পুর দিয়ে ব্রিউয়াতকেই আবার খাদ্যারম্ভে দেওয়া হয়। 'গ্রীয়ুশ' মধু মেশানো ময়দার ছড়ির মতো পেস্ট্রির গায়ে তিল ছড়ানো। আর আছে 'কাব এল গেজলা' বা গেজেলের শিং। গেজলের শিংয়ের

ডগার মতোই পাকানো পাকানো খাস্তা পেস্ট্রির মধ্যে মধু মেশানো বাদাম বাটা কমলালেবুর ফুলের গন্ধে সুবাসিত। শুনতে যতটা, খেতে কিন্তু ততটা নয়। খুব মিষ্টি কিছু চাইলে চিনি মেশানো বাদামের পুর ভরা খেজুর খেতে পারেন।

পানীয়

মরোক্কোর জাতীয় পানীয় হল মিন্ট টি বা পুদিনার চা। প্রায় সমান পরিমাণ সবুজ চা আর শুকনো পুদিনা পাতা একসঙ্গে ফুটিয়ে মিন্ট টি তৈরি হয়। চিনি অঢেল কিন্তু দুধ বারণ। ছোট ছোট পল কাটা কাচের গ্লাসে আধ ভর্তি করে এই চা খাওয়া হয়। আমরা বাঙালিরা দিনে আর ক'কাপ চা খাই। মরোক্কোবাসীরা ওর থেকে অনেকবেশি গ্লাস মিন্ট টি খায়। কফির চলও আছে, তবে ফরাসি কায়দায়। গাঢ় কালো কফি। চিনির ডেলাটা কফিতে না ফেলে দাঁতে কামড়ে রাখার নিয়ম। আমাদের দুধ-চিনি মেশানো কালো চা একবারে অপাংক্তেয়। বিদেশীরা যেসব জায়গায় আনাগোনা করে কেবল সেখানেই পাওয়া যায়। ইসলাম মদ্যপান নিষিদ্ধ করলেও উত্তর আফ্রিকার এই অংশে (মরোক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিস) আঙুরের চাষ বেশ হয়। সেই সুযোগ নিয়ে ফরাসি আমলে মদ্য প্রস্তুত চালু হয়। ফরাসিরা চলে যাওয়ার পরে উৎপাদন পরিমাণ কমে গেছে কিন্তু এখনও যা আছে তা দেশের পক্ষে যথেষ্ট। কিছু রপ্তানিও হয়। বড় বড় এমনকী মেজ-সেজ রেস্টুরেন্টেও এবং কফিখানাগুলোতে মরোক্কান ওয়াইন এবং বিয়ার পাওয়া যায়। হুইস্কি, জিন প্রভৃতি উগ্র পানীয়ের অত চল নেই তবে পাওয়া যায়। নানারকম অ-সুরাবাহী পানীয় যেমন কোকাকোলা, সোডা, লেমোনেড তো আছেই।

কেনাকাটা

মরোক্কো লেদারের কথা আমরা সবাই শুনেছি এবং আমি বলব যে, আমাদের ভারতীয়দের পক্ষে সবচেয়ে ভালো খরিদ হল চামড়ার জিনিস। কাপড়ের মতো নরম মরোক্কোর চামড়ার জিনিস নানারকম উদ্ভিদজাত রং-এ উজ্জ্বল। সঙ্গের গাইড বললেন, চামড়া এত উজ্জ্বল এবং নরম কেননা এটি কিয়োর করা হয় গোমূত্রে। কিন্তু এত গরু পায় কোথায়? তবে কি...? চামড়ার পরে সুতির জিনিস। মরোক্কোর লম্বা আঁশ তুলা ইজিপ্টের সঙ্গে টেক্কা দেয়। মরোক্কোর বিশেষ ধরনের নীল চিনামাটির কাজও খুব ভালো কিন্তু বিমানচারীদের পক্ষে বর্জনীয়। এছাড়া কার্পেট, তামা-পিতলের জিনিস, রুপোর গয়না প্রভৃতি নানা মনোরঞ্জনকারী জিনিস আছে বটে কিন্তু আমরা যারা দিল্লির জনপথ বা মুম্বইয়ের চোরাবাজারে ঘুরেছি তাদের কাছে এমন কিছু নয়। হ্যাঁ, কাশ্মীরে যেমন চাষারা পুরনো

সামোভার বেচে নতুন কেটলি কিনে নিয়ে যায় আর আমরা ওই সামোভার নিয়ে এসে বাড়ি সাজাই, মরোক্কোতেও তেমনই বারবার-রা তাদের কারুকাজ করা টি-পট বদলে নতুন ধরনের সওদা নিয়ে যাচ্ছে। ওইরকম একটা টি-পট আমরা কিনলাম। মরোক্কোতে জিনিস কিনতে হলে, তা সে স্যুকেই হোক বা শহরের দোকানেই হোক দরদাম করতে পেছপা হলে চলবে না। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও মরোক্কোতে দাম কষাকষি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার খেলা। দুপক্ষ সমান খেলোয়াড় হলে বেশ একটু মজার ব্যাপার হয়। একটা উদাহরণ দিই। শহরের এক দোকানে আমি একটি জেলেবায়া কিনতে চাইলাম। দোকানদার আমাকে আগে জেলেবায়াটি পরাল, মাথায় একটা ফ্রেজ ট্রপী দিল, তারপর আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে, এদিকটা টেনে ওদিকটা সমান করে একমুখ হেসে বলল, 'বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো। কে বলবে তুমি মরোক্কোর লোক নও।' দাম? দাম একটা দিচ্ছি। এইতো ৬৪০ দিরহাম (২৫৬০ টাকা) লেখা আছে। তবে তুমি আমার ভারতীয় বন্ধু, তোমার জন্য ৫৫০ দিরহাম। তার আগের সন্ধ্যায় গৃহিণী ওই একই জিনিসের একটি মহিলা সংস্করণ কিনেছেন ১০০ দিরহামে। আমি মুখের ভাব অবিকৃত রেখে বললাম-অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কাছে যে এদিকে মেরেকেটে ১০০ দিরহামের বেশি নেই। শেষপর্যন্ত ১২০ দিরহামে রফা হল। আমরা দুজনেই খুব খুশি। এই ঘটনাটা অবশ্য একটু অসাধারণ। সাধারণভাবে চাওয়া দামের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের মধ্যে কিনতে পারলে দুপক্ষেরই জিত হল। আবার অত্যাধুনিক এমন সব দোকানও আছে যেখানে একদাম। কোথাও বা চাইলে শতকরা দশ থেকে কুড়ি শতাংশ ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়।

রীতিনীতি

আগেই বলে রাখি মরোক্কোর রীতিনীতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিভিন্ন গাইড, হোটেল কর্মচারী, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছ থেকে পাওয়া। এগুলো সাধারণ লোকের বেলাতেই প্রযোজ্য। বিশ-ত্রিশ বছর আগেও যৌথ পরিবার ছিল মরোক্কোর নিয়ম। এখন নাগরিকজীবনের সংঘাতে বিশেষ করে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ছেলেরা বিয়ের পরে আলাদা বাসা করছে। কিন্তু যৌথ দায়িত্ব এখনও স্বীকৃত। আমার বাবা বা আমার ভাই না খেতে পেলে সে আমার লজ্জা। মরোক্কো দরিদ্র দেশ হলেও কেউ না খেয়ে থাকে এমন হয় না। এতদিন বাবা-মা দেখেশুনে বিয়ে দিত। এখন স্বনির্বাচিত পাত্র-পাত্রীও চলে। তবে দুপক্ষের বাবা-মার সম্মতি না থাকলে বিয়ে হওয়া মুশকিল। মরোক্কোর মুসলমানেরা

সুন্নী হলেও এদের সুর অনেক নরম। বিধর্মীকে স্বধর্মে আনা এদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু যদি কেউ মুসলমান হতে না চায় তবে তাকে দীনজন হিসেবে ত্যাগ করলেই চলে। বধ করবার দরকার নেই। এখানে আলমোহাদ বংশের কুলপ্রদীপ সুলতান ইয়াকুব আল মানসুরের একটা গল্প বলি। তখন পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ইবন রুশদ কাইরুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। গুজব রটল যে, ইবন রুশদ ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত কোনও বইতে গ্রিক দেবী ভেনাসের উল্লেখ করেছেন। ইসলামের এত বড় খেলাপ ফেজের মোল্লারা সহ্য করবেন কী করে। তাঁরা ফতোয়া দিলেন যে, ওই লেখকের সমস্ত পুস্তক মায় লেখককেও প্রকাশ্যে পোড়ানো হোক। কোতল কচ্ছলের অধিকার একমাত্র সুলতানের। তাঁর কাছে এত্তালা গেল। সুলতান ভেবেচিন্তে রায় দিলেন যে, খেলাপ নিশ্চয়ই হয়েছে এবং পুস্তক অচিরে ভস্মসাৎ করা হোক কিন্তু লেখককে পোড়াবার কী দরকার। ওকে বরং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হোক। আর পোড়ানো হোক ওই ধর্মপুস্তকখানি। বাকি যা বই ও লিখেছে গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে সেগুলো আর কী পাপ করল। শোনা যায় যে, কয়েক বছর পরে সুলতান ইবন রুশদকে অন্য একটা ভালো কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলেন। আইনকানুনও সব শরিয়তি মতে চলে না। বিবাহ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিম আইন চালু থাকলেও কেউ যদি সিভিল ল ব্যবহার করতে চায় তাতে আইনত বাধা নেই। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আধুনিক নিয়মে চলে। হাত-পা কাটাকাটির ব্যাপার নেই।

আমোদ-প্রমোদ

নতর্কীর নূপুর নিক্কণে আপত্তি না থাকলেও মুসলিম সমাজ আমোদ-প্রমোদকে খুব প্রশ্রয় দেয় না। তবুও মরোক্কানরা গোঁড়া মুসলিম নয় বলে এবং বারবারদের উপজাতীয় প্রভাবের ফলে মেয়ে-পুরুষের মিলিত লোকনৃত্য এবং সঙ্গীত চালু আছে। সিনেমার কথা আগেই বলেছি, কিন্তু সে শহর অঞ্চলে। যাদুবিদ্যা, সাপ খেলানো, জিমন্যাস্টিক্স প্রভৃতি সকল গ্রাম্য মেলাতেই দেখানো হয়। এর ওপর যদি বিদেশী ট্যুরিস্টরা ‘নাইট লাইফ’ চান তাহলে বড় বড় শহরে, কিছু ক্যাবারে ও নাইট ক্লাব আছে, তবে মরোক্কোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্য বাদ দিলে এগুলো খুব উঁচু দরের নয়।

ফেজ-এল-বালি

ঝরঝরে সকাল, ঝলমলে সকাল। আল্লা তায়লার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কুশল, সমস্ত মঙ্গল। হোটেলঘরের সংলগ্ন বারান্দায় পূর্বাস্য হয়ে বসে আছি। হিন্দুর তো সর্বদাই

পুবদিক । এখানে মুসলমানও পুবদিকে মক্কার দিকে চেয়ে নামাজ পড়ে । বসে বসে দেখছি প্রায় ২০০ ফুট নিচে ফেজ-এল-বালির ঘেঁসাঘেঁসি ছাদ । একটার সঙ্গে আরেকটা ঠেকে ঢেউখেলানো টালির এক সুবিশাল চত্বর । নিচে নেমে ওর ভেতরে ঢুকলে (যা গতকাল করেছিলাম) দেখা যায় যে দেওয়াল আর ছাদ ঘেঁসাঘেঁসি হলেও মেশামেশি নয় । ওদের মাঝখানে এক গাধাপ্রমাণ পথ আছে । বুঝলেন না তো! দুপাশের বস্তায় মালবোঝাই গাধা যদি দেওয়াল না ছুঁয়ে এগোতে পারে তাহলেই হল । উল্টোমুখি গাধাকে রাস্তা দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চৌক আছে গলির মোহনায় । গাধাই হল এ গলির একমাত্র গতি । ফেজ-এল-বালি তো ছোটখাটো ব্যাপার নয় । প্রায় তিন লক্ষ লোকের বাস । পুরো শহরের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ । তার ওপরে বহুবিধ হস্তশিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র । সোনা, রূপা থেকে শুরু করে পেতল, তামা, চামড়া, কাপড় ব্রোকেড, কার্পেট, জুতো কী নেই বারোশো বছরের এই পুরনো শহরে । এই জনজীবন এবং শিল্পোৎপাদনের জন্য যা কিছু কাঁচা বা পাকা মাল দরকার হয় তার পরিবহন ব্যবস্থা এই সেদিন পর্যন্ত গাধাদের পায়েই ছিল । অধুনা কিছু খচ্চর আমদানি হয়েছে । ফেজ-এল-বালির ভেতরেই ফেজের জগদ্বিখ্যাত স্যুক । আলাদা করে তার কথা বলছি না । মারাকেশের একটি বৃহত্তর সংস্করণ মনে করুন । মারাকেশের সঙ্গে তফাৎ এই যে, ফেজ-এল-বালির চারদিকেই অনুচ্চ পাহাড়ের বেড়া । যেন সমস্ত গোলকধাঁধাটা পাহাড়ের গা কেটে বসানো । তার ভেতরে গলির তস্য গলি । এমন গলির সংখ্যাও কম নয়, যেখানে একজন মানুষকে পাশ ফিরে চলতে হয় ।

মারাকেশ যদি মরোক্কোর হৃদয় হয়, ফেজ হল তার মন আর বুদ্ধি । ওই যে চত্বরের মাঝখানে পালিশ করা অনেকখানি সবুজ টাইলের ছাদ রোদ্দুরে চমকাচ্ছে, ওটাই হল সুবিশাল কাইরুইন মসজিদ । কাইরুইন থেকে ধর্মগত গোষ্ঠীযুদ্ধে উৎখাত এক ধনী বিধবা তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে ৮৬২ সালে এটি তৈরি করেছিলেন । মসজিদের ১৪টি দরজা । উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ২২০০০ লোক একসঙ্গে নমাজ পড়তে পারে । অ-মুসলমানের প্রবেশ নিষেধ । পাশেই কাইরুইন বিশ্ববিদ্যালয়, যে একদিন কাইরোর আল অজহরের সঙ্গে পাল্লা দিত । সারা পৃথিবী থেকে ছাত্র আসত কাইরুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য । পাঠ্যবিষয় ছিল দর্শনশাস্ত্র (জড়বিজ্ঞান তারই অন্তর্গত), ধর্মতত্ত্ব ইতিহাস সমেত, কোরানিক আইন, গণিত এবং দ্যুলোকবিদ্যা । ইবন রুশদের মতো দার্শনিক, ইবন খালদুনের মতো ঐতিহাসিক এখানে পড়িয়েছেন । ইবন বতুতা এখানে লেখাপড়া শেষ করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । কাইরুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা কিন্তু সোজা ছিল না । রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হত । আরেকটা নিয়ম ছিল যে, নিতান্ত মেধাবী না হলে কেবলমাত্র গরিব

ছাত্রদেরই আবাসিক ছাত্র হিসেবে নেওয়া হত। বলে রাখি যে, কাইরুইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্রদের ব্যয়ভার সরকার বহন করতেন। কিন্তু যারা খুব মেধাবী বা যথেষ্ট গরিব নয় তারা কী করবে! তারা নিজেদের থাকা-খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করে দৈনিক ছাত্র হিসেবে পড়ত। কিছু অর্থগ্রাহী আবাসিক মাদ্রাসাও ছিল যেমন আতরাইন মাদ্রাসা। কথাটা এসেছে আতর থেকে। আতর-বিক্রেতাদের অর্থে তৈরি। সুদৃশ্য সমচতুষ্কোণ গহনার বাক্সর মতো কাজ করা ইমারতটি আরবের চেয়েও পারস্যকে বেশি মনে করিয়ে দেয়। ভেতরে অমনিই মিহি কাজ। মাদ্রাসা এখন মিউজিয়াম। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে ফেজ-এল-বালির প্রতিষ্ঠাতা মৌলে ইদ্রিস ২-এর (এঁদের কথা স্থানান্তরে বলব) অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত সমাধিসৌধ গেটের বাইরে থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে হয়। বিধর্মীর প্রবেশ বারণ। ফেজ-এল-বালির আরেকটি দ্রষ্টব্য বিষয় হল, আগেকার দিনের ফুন্দুক বা দূরাগত বণিকদের আশ্রয়স্থল। বিরাট দু-তিনতলা বাড়িগুলোর মাঝখানটা ফাঁকা। ছাদের তলায় সেখানে থাকবে মাল এবং মালবাহী পশুরা। চারদিকে দেওয়াল ঘেঁসে দুতলা, তিনতলার ঘর বণিকদের জন্য। এখন ফুন্দুকগুলো মাল রাখার কাজেই ব্যবহার হয়। কয়েকটি সুদৃশ্য ফুন্দুককে সাজিয়েগুজিয়ে মরোক্কান রেস্টুরেন্ট করা হয়েছে। বেশিরভাগই ট্যুরিস্টদের জন্য।

ফেজ-এল-জদিদ

ফেজ-এল-বালি, আরব মরোক্কোর প্রাচীনতম রাজধানী। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই এখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। অবস্থা দেখে ১২৪৮ সালে মেরিনিড বংশীয় সুলতান আবু ইউসুফ এল-বালির বাইরে এক নতুন শহরের পত্তন করলেন ফেজ-এল-জদিদ। এই নতুন শহর এখন ৭০০ বছরের প্রৌঢ়া রমণী। বয়স হয়েছে তবে পুরনো ফেজের মতো চোখেমুখে বলিরেখা দেখা দেয়নি বা যেটুকু দেখা দিয়েছে সেটুকু ঢেকেঢুকে রাখবার প্রচেষ্টা এখনও আছে। গলিঘুঁজি প্রচুর আবার চওড়া রাস্তাও কিছু আছে যেখানে মোটর চলতে পারে। এরকম এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে চালক বেন শাকুন আমাদের বললেন, তোমরা ঘুরে ঘুরে দেখ, আমি গাড়িটা ওই হোথায় পার্ক করছি। একদিকে আশি হেক্টরব্যাপী রাজপ্রাসাদ। সে এক নগরের ভেতরে নগর। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। অন্যদিকে, মেললা বা ইহুদিদের এলাকা। ক্রিশ্চানদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে ইহুদিরা দফায় দফায় মরোক্কোর আরব নৃপতিদের কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং পেয়েছে। মরোক্কোর সব বড় বড় শহরেই তাই একটা করে মেললা গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্পী আজকের ইহুদিরা সে কথা মনে রাখেনি। নিজেদের ছাড়া কার কথাই বা ইহুদিরা ভাবে।

ইহুদি এলাকায় এখন আর বড় একটা ইহুদি নেই কিন্তু তাদের উপাসনা মন্দির বা সিনাগগ এখনও দাঁড়িয়ে আছে । মেললার বাড়ির স্থাপত্য পেটা লোহার অলঙ্কৃত বারান্দা, আন্দালুশিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় । ফেজের ইহুদিরা প্রধানত এখান থেকেই এসেছিল । মেললা কথাটার উৎপত্তি বড় ভয়ঙ্কর । তখনকার প্রথামতো সুলতান-শত্রুদের খণ্ডিত মস্তক লোহার শিকে বিঁধে প্রাসাদ প্রাচীরের ওপরে প্রদর্শিত হত । তার আগে মস্তকটিকে নুন মাখিয়ে তৈরি করতে হত যাতে তাড়াতাড়ি পচে না যায় । এই কাজটি করত ইহুদিরা । তাদের পাড়ায় বড় বড় নুনের গোলা থাকত এবং 'মেললা' এই আরবী কথাটার মানে হল নুন । এখন বুঝতে পারছেন তো যে, কেন ইহুদিদের এলাকাকে মেললা বলা হয় এবং কেনই বা মেললা রাজপ্রসাদের পাঁচিলের কাছাকাছি হত ।

আবার নয়ানগর

বিকেলবেলা এক চক্কর ঘুরে এলাম । অন্যান্য নতুন শহরের মতোই ছিমছাম খোলামেলা । দেখবার জিনিস বিশেষ কিছু নেই । একটি সরকারি দোকান আছে আমাদের কটেজ এম্পোরিয়ামের মতো । সেখানে মরোক্কোর বহুবিধ হস্তশিল্প উচিতমূল্যে পাওয়া যায় । এক দাম । দরাদরি নেই । ফিরবার সময় বেন শাকুন আমাদের শহরের অন্যদিক দিয়ে নিয়ে এল যেখানে রইস ব্যক্তিদের বাস । উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বিরাট বিরাট বাগানের মধ্যে বাড়ি । বাইরে থেকে বাগানের তরুশীর্ষ এবং পাঁচিলে ওঠানো বোগেনভেলিয়া ছাড়া আর কিছু দেখা না গেলেও মালিকের ঐশ্বর্যের পরিমাপ পাওয়া যায় ।

বেন শাকুন

ফেজের বাসিন্দাদের (ওরা বাকি মরোক্কো থেকে নিজেদের আলাদা করে ফাসি বলে) বেশ একটু ডাঁট আছে । অতীত গৌরবের জীর্ণাবশেষের মধ্যে যারা বাস করে তারা বোধহয় এইরকমই হয় । 'আমি কারোর থেকে কম নই' । আমাদের বন্ধু, প্রদর্শক এবং চালক বেন শাকুন, সেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ । অতিথির সুখ-সুবিধার দিকে সর্বদা নজর আছে । অথচ গায়ে লেপ্টে থাকা নেই । মেললা ভ্রমণের পরদিন আমরা সারাদিনের সফর করলাম । ফেজ থেকে ভলিউ ব্লিস । মৌলে ইদ্রিস হয়ে মেকনেস এবং প্রত্যাবর্তন । সবসুদ্ধ ১৫০ কিলোমিটারের মতো । দুপুরের খাওয়ার জন্য বেন শাকুন আমাদের নিয়ে গেলেন মেকনেসের অনতিদূরে নদীর ধারে (এখন জলহীন) এক সুরম্য বাগিচা খানা ঘরে । আমাদের সঙ্গে খেতে বলতে হেসে বললেন যে, ড্রাইভারদের জন্য অতি উত্তম আলাদা খানার বন্দোবস্ত আছে অনেক সস্তায় । আবার সফর সেরে যখন হোটেলে ফিরছি তখন

জানালেন যে, আমরা ওঁর বাড়ির প্রায় পাশ দিয়েই যাব। এক কাপ চা খেয়ে গেলে কেমন হয়। গেলাম। বাড়ি মানে ফ্ল্যাট। অনেকটা দিল্লির ডি ডি এ (দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-সরকারি সংস্থা) ফ্ল্যাটের মতো। দুটি শোবার ঘর। বসবার ঘরটি বেশ বড়। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই কিন্তু আতিথেয়তায় সেটুকু পুষিয়ে যায়। স্ত্রী তুরিয়ার সঙ্গে আলাপ হল। পাঁচ বছরের ছেলে শাফিক টিভি দেখতে ব্যস্ত। তবু এসে আমাদের অভিবাদন করল। বাপের সঙ্গে একটু হুটোপুটি খেলাও হল। মিন্ট চা এল আর ঘরে তৈরি বিস্কুট। চা খেতে খেতে শাকুনসাহেবকে বললাম, বেশ বাড়িটি করেছেন তো। উনি জবাব দিলেন, 'আমি আবার কবে বাড়ি করলাম। এ তো আমার শ্বশুরের বাড়ি। আমাদের থাকতে দিয়েছেন। মরোক্কোতে কি আমার মতো লোক বাড়ি করতে পারে। পাঁচ থেকে দশ বছরের উপার্জন জড়ো করলে তবে যদি একটা ফ্ল্যাট হয়। ভাড়া করলে মাইনের অর্ধেকের ওপর বাড়ি ভাড়াতেই যাবে।' নিজের দেশের কথা মনে পড়ল। কথায় কথায় জানলাম যে, বেন শাকুন ১৭ বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ফেজ থেকে প্যারিস যান। সেখানে বহু বছর কাটিয়ে (বোধহয় একটা বিয়েও করেছিলেন) এসে পড়েন ফ্রান্সের পশ্চিমঘেঁসা দক্ষিণ কূলে টুলুসে। ওর শ্বশুর আরবী হলেও টুলুসের অধিবাসী। মোটামুটি সম্পন্ন ব্যবসাদার। টুলুসেই ওঁর আলাপ তুরিয়ার সঙ্গে। তুরিয়ার বয়স মনে হল গোটা পঁচিশ। বেন শাকুন চল্লিশ ছাড়িয়েছেন। একটি ছেলেকে নিয়ে দুজনের সুখের সংসার। আরেকটি আসছে।

ভলিউ ব্লিস

এদিকের আকাশ থেকে ওদিকের আকাশছোঁয়া শস্যবহুল স্মশ উপত্যকা। তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝুপিঝুপি অলিভ গাছ। আঙুরের খেত। ফলের বাগান। মাঝে ম্যাঝে বালিয়াড়ি। নবম বালির পাহাড়। উত্তুঙ্গ নয় ঘোরানো এলানো। এ পাহাড় পুরুষ নয়। রমণী। এলোমেলো শাড়ি পরে রোদ্দুরে বুক দিয়ে শুয়ে আছে। গাড়ি থামল। বড় বড় ঝাঁকায় করে ডালিম বিক্রি হচ্ছে। চিনির মতো মিষ্টি। রসে টইটম্বুর দানাগুলি। বীজ নেই বললেই হয়। বেন শাকুন এক ঝাঁকা কিনলেন। আমরাও একটা করে পেলাম। রাস্তা থেকেই পাহাড় টপকে দেখা গেল উঁচু উঁচু থামের মতো ভলিউ ব্লিস। দুহাজার বছর আগে রোমান মরোক্কোর রাজধানী ছিল। কার্থেজ ধ্বংস হবার পর (খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬) এই সমস্ত অঞ্চলটাতে রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম একশো বছর রোমানরা স্থানীয় বারবার সর্দারদের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছিলেন। কিন্তু নানা ঝামেলার ফলে খ্রিস্টপূর্ব

২৫ সালে রোমানরা তাঁদের ‘আপনজন’ বারবার রাজকুমার জুবা ২-কে মরোক্কোর রাজা করে পাঠালেন। সে কথা আগে বলেছি। ভলিউ ব্লিস হল সেই জুবা ২-এর রাজধানী এবং প্রায় ২০০ বছর রোমানরা এই শহর থেকেই উত্তর আফ্রিকা শাসন করতেন। এখন আর কিছু নেই। শুধু এখানে-ওখানে ছড়ানো কতকগুলো ছাদহীন আয়োনিক কলাম। একটু উঁচুতে পাথর বাঁধানো ফোরামের মেঝে। একদিকে কিছুটা দেওয়াল। শহরে ঢোকবার মুখে বিরাট ট্রায়ম্ফাল আর্চ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সারা শহরে ছড়ানো পাথরের স্তূপ, ভাঙা বনেদ। ছাদহীন দেওয়াল, বড় বড় স্নানের ঘর এবং তাতে গরম ও ঠান্ডা জল আনবার আলাদা পয়ঃপ্রণালী। সবচেয়ে মজা লাগল রান্নাঘরে উনুনের বালিমাখা দেওয়ালে একটি ছোট কুলুঙ্গি। রাঁধুনি তার অলিভ তেলের ল্যাম্পটি ওইখানে রাখত। রইস ব্যক্তিদের বাড়ির মেঝেতে সেই দুহাজার বছরের পুরনো মোজাইকে কতরকম ছবি। পুরনো গ্রিসের সুরগুরু অর্ফিয়াস বীণায় ঝংকার তুলছেন আর তাঁকে চক্রাকারে ঘিরে বনের পশুরা সেই সুরলহরী শুনছে। জিয়াস পুত্র ব্যাকাস (ইনি আবার সুরার দেবতা) বাঘের রথে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। আলো এবং তারুণ্যের দেবী ডায়ানা স্নানকক্ষে অসম্বৃতা অবস্থায় একটিয়নের (রোমানদের ডায়ানা হল গ্রিকদের আর্টেমিস। গ্রিক পুরাণে বলে যে, দেবী আর্টেমিস যখন ঝরনার জলে স্নান করছিলেন তখন আধা-মানুষ আধা-দেবতা একটিয়ন সেই বনে শিকার করতে এসে তাঁকে দেখে ফেলে। দেবী রেগেমেগে একটিয়নকে মৃগে রূপান্তরিত করেন আর একটিয়নের পঞ্চাশটি শিকারী কুকুর তাকে খেয়ে ফেলে। আমাদের দেবীরা এতটা কাঁচাখেগো নন।) নজরে পড়ে গেছেন ইত্যাদি। কবেকার রঙিন সিরামিকের টুকরোগুলি এখনও অপেক্ষাকৃত অম্লান, কিন্তু এদের বরাবরের জন্য রক্ষা করতে হলে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। তবু ভলিউ ব্লিসের প্রধান পথ ডেকুমানুস ম্যাক্সিমাসের (দিল্লির রাজপথের মতোই তীরের মতো সোজা রাস্তা ট্রায়ম্ফাল আর্চ থেকে ফোরাম পর্যন্ত কমবেশি ৫০০ মিটার) ওপর দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ভাবা যায় সেদিনকার সেই সমারোহ, জাঁকজমকপূর্ণ শহর, যার লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারে পৌঁছেছিল। ইদানীংকালে ভলিউ ব্লিসের আরেকটা সুদিন এসেছিল যখন ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে মরোক্কোর প্রথম আরব সুলতান মৌলে ইদ্রিস (১) এখানে রাজধানী করেছিলেন। সে কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের জন্য। মৌলে ইদ্রিসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মৌলে ইদ্রিস (২) রাজধানী ফেজে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

মৌলে ইদ্রিস

ভলিউ ব্লিস থেকে মৌলে ইদ্রিস মোটে পাঁচ কিলোমিটার। ইতিমধ্যে স্যুশ উপত্যকা থেকে জরহুন পর্বতপুঞ্জ বেয়ে আমরা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। জরহুন যেখানে বুফক্রেন নদীর উপত্যকায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই পর্বতপ্রপাতের খাঁজে খাঁজে সার দিয়ে নেমে এসেছে চুনকাম করা সাদা বাড়িগুলো। পবিত্র মৌলে ইদ্রিস। শহরের মাঝখানে চমকানো সবুজ টাইলের নিচে মৌলে ইদ্রিসের সমাধি এবং মসজিদ। মহম্মদের বংশগত মৌলে ইদ্রিস বোগদাদের খালিফার সঙ্গে ধর্মগত মতানৈক্যের দরুন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত এই মরোক্কোতে চলে আসেন কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে। তাঁর মধুর মূর্তি, সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে, দেশজ বারবাররা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুসলমান হল এবং ক্রমে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। মৌলে ইদ্রিসের প্রভাব-প্রতিপত্তির খবর যখন বোগদাদে পৌঁছল তখন খলিফ একজন গুপ্তঘাতককে মরোক্কো পাঠালেন মৌলে ইদ্রিসের প্রাণ নেবার জন্য। ঘাতক ইদ্রিসের সভাসদ হিসাবে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করে বিষপ্রয়োগে তাঁকে বধ করল। এই খলিফটি আর কেউ নয়। আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং বিশ্ববিশ্রুত হারুন আল রশিদ। মৌলে ইদ্রিসের সমাধিস্থানে পৌঁছলাম ঠিক বেলা বারোটার সময়ে। বিরাট কারুকার্যমণ্ডিত দরজা পেরিয়ে একটা কাঠের পাটা ফেলা যার ওপারে অ-মুসলমানরা ঢুকতে পারে না। সেইখানে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলাম হাস্যমুখ প্রসন্ন প্রেমী মানুষটিকে, যিনি ভালোবাসার অস্ত্রে বন্য বারবারদের হৃদয় জয় করেছিলেন। মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে তখন আজান ঘোষণা হচ্ছে। দ্বিপ্রাহরিক নমাজের জন্য। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মৌলে ইদ্রিস বেশিদিন রাজত্ব ভোগ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে বারবার পত্নীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মাল। সময়ে তিনিই হলেন দ্বিতীয় সুলতান মৌলে ইদ্রিস। মসোলিয়ামের বাইরে আর পাঁচটা পুরনো ধর্মীয় শহর যেমন হয় মৌলে ইদ্রিসও তাই। তীর্থযাত্রীই প্রধান জীবিকা। মেকনেসের পথে বাইরের ট্যুরিস্টও কিছু আসে। গৃহিণী এখানে একটা কারুকার্য করা চশমার খাপ কিনলেন। একটা জিনিস লক্ষ করলাম। দরদাম এখানকার দোকানিও করে কিন্তু শহরের মতো উনোকে দুনো করে না।

মেকনেস

মেকনেস বলতে মনে পড়ে একজন লোককে। সুলতান মৌলে ইসমাইল যিনি একাদিক্রমে পঞ্চান্ন বছর (১৬৭২ থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। মারাকেশের সাদীয়ান সমাধি প্রসঙ্গে এঁর উল্লেখ করেছি। যেমন বিরাট চেহারা ছিল তাঁর, তেমনই বিরাট ছিল তার পরিকল্পনা। ভার্সাই ও ফরাসি হর্ম্যমালার গল্প শুনে তিনি তৈরি

করেছিলেন দার কেবিরা। বাগান, চন্দ্রাতপ জলধার জলপ্রবাহ সমন্বিত চব্বিশটি প্রাসাদের এক বেষ্টনী। সেসব এখন ধ্বংসস্তূপ কিন্তু তাঁর নিজ প্রাসাদ চত্বরে ঢোকার জন্য যে সুবিশাল গেট বাব-এল-মনসুর তা এখনও অক্ষত আছে। আর আছে মোটা মোটা চৌরস থাম আর খিলানের তিন মানুষ উঁচু ছাদের তলায় মৌলে ইসমাইলের ঘোড়াশালা। ১২০০০ ঘোড়া এখানে থাকত। কালো প্যান্টের ওপরে গুলবাঘা ছাপের জামা পরা যে দশাশই মূর্তিটি আমাদের ঘোড়াশালা দেখাল তাকে এমনি রাস্তায় দেখলে সসম্মানে সরে দাঁড়ানোই যুক্তিযুক্ত হবে কিন্তু আসলে বেশ বশংবদ লোক। ঘোড়াশালের মাঝে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি গভীর কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে। সে মেঝে থেকে একমুঠো কাঁকর নিয়ে কুয়োর ভেতরে ফেলল। টগবগ আওয়াজ হল, ঠিক যেন একদল ঘোড়া ঘোড়াশালে ঢুকল। সেই আমাদের বলল যে, ঘোড়াশালের শেষে ছাদের সঙ্গে লাগানো একটি বিরাট ট্যাঙ্ক (টালার ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বড়) আছে। তার জল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে ঘোড়াদের খাবার জন্য যেত। কুয়োগুলো জলটাকে বাতাসের সংস্পর্শে রাখার জন্য। ট্যাঙ্কটাও আমরা দেখলাম। স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনা থেকে তার জল আসে। চারদিকে ফুলের বাগান। এখন অনাদৃত। অথচ এক সময়ে সবার অলক্ষ্যে এই ফুলবাগানে বেড়াতে যাবার জন্য মৌলে ইসমাইল দেওয়ালঘেরা বৃক্ষলতাশোভিত একটি অলিন্দ তৈরি করেছিলেন যার দৈর্ঘ্য ছিল তিন কিলোমিটার। সে অলিন্দের কিছুটা এখনও আছে। মৌলে ইসমাইল বলেছিলেন, আর কী? এই অলিন্দটাকে মারাকেশ পর্যন্ত (৭০০ কিলোমিটার) বাড়িয়ে দেব যাতে অন্ধরাও বিনা ক্লেশে মারাকেশে যেতে পারে। অলিন্দটি তৈরি হয়নি বটে কিন্তু মৌলে ইদ্রিসের রাজত্বের শেষভাগে অন্ধ-আতুর-স্ত্রীলোক সবাই মরোক্কোর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় যাতায়াত করতে পারত। এমনই ছিল মৌলে ইসমাইলের দাপট। পূর্বে অটোমান তুর্কদের মওড়া নিলেন তিনি। ট্যানজিয়ারস থেকে তাড়ালেন ইংরেজদের। আসিলা থেকে হটালেন স্প্যানিয়ার্ডদের। আসমুদ্র আটলাসকে এক সার্বভৌম রাজত্বে পরিণত করেছিলেন তিনি। লোকে নিন্দাও প্রচুর করে। বলে, সুলতান নিষ্ঠুর যথেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁর পত্নী এবং উপপত্নীর সংখ্যা নাকি চার শতাধিক ছিল। সহস্রাধিক সন্তানের জনক ছিলেন। কিন্তু তার এসব ক্রিয়াকলাপের বিচার তখনকার রীতিনীতি মনন অনুযায়ী করতে হবে। তাঁর সমসাময়িক চতুর্দশ লুই মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। আর রমণী বিলাস তো রাজাদের ভূষণ ছিল। অন্যদিকে, মৌলে ইসমাইল নিজে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও ক্রিশ্চান যুদ্ধবন্দীদের পাদ্রী সন্দর্শনে বাধা দিতেন না। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তিনি। তাঁর ঘোড়াশালে যে শুধু ১২০০০

ঘোড়া ছিল, তা নয়। ১২০০০ পুস্তকসমন্বিত একটি পুস্তকশালাও তাঁর ছিল। মৌলে ইসমাইল সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর ছিদ্রান্বেষী কপটভাষী পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের বিবরণ পড়লে মনে হয় 'বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলে করে পরিহাস অট্টহাস্য রবে/তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস এই জানে সবে।'

বাব-এল-মনসুর দিয়ে ঢুকলেই পড়বে মেচুয়ার প্যারেড গ্রাইন্ড। এখানে সুলতান ইসমাইল তাঁর পার্শ্বরক্ষীদের পরিদর্শন করতেন। ১৪০০০০ সেনার এই বাহিনীতে। কেবলমাত্র আটলাস পারের কালো মানুষদের নেওয়া হত। সুলতান বোধহয় কাছের মানুষদের অতটা বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুদিকের দোকান এবং কাফিখানার চাপে স্কোয়্যারটি এখন বেশ ছোট হয়ে এসেছে। তবুও আমাদের এসপ্ল্যানেডের চারগুণ হবে এবং অনেক খোলামেলা। পার্কিং লট, ফুড স্টল, নানারকম শহুরে আয়োজন। মেচুয়ারের অন্য প্রান্তে সবুজ টালির ছাতওয়ালা কোনাচে বাড়িটা ছিল সুলতানের দেওয়ানি আম। সিংহাসনে বসে তিনি দেশ-বিদেশের লোককে দর্শন দিতেন বা স্বাগত জানাতেন। এর পরেই কতকগুলো ভূগর্ভস্থ কক্ষ আছে। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা একসময় বলতেন যে, এগুলো ছিল সুলতানের ঠান্ডি গারদ। ক্রিশ্চানদের জন্য। এখন বোঝা যাচ্ছে তা নয়। এগুলো সুলতানের শস্যাগার। প্রত্যেকটি ঘরের ছাদের কাছে বাইরের চত্বরের সঙ্গে এক লেভেলে হেলান ফোকর কাটা আছে যা দিয়ে শস্য ভরা হত। মেচুয়ারের আরেক পাশে সুলতান মৌলে ইসমাইলের সমাধি। এই একটি জায়গায় অ-মুসলমানরাও ঢুকতে পারে যদি তার পোশাক সহবত অনুযায়ী হয়। সে সহবতের বিচার করেন সমাধিদুয়ারে প্রহরীরা। এইজন্য মাঝে মাঝে দেখা যায়, হাফপ্যান্ট পরা মেমসাহেব বা গেঞ্জি পরা সাহেব একাকিনী বা একাকী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। দল ভেতরে গেছে কিন্তু প্রহরী তাদের আটকে দিয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভালো। দুজনেই ঢুকলাম। মার্বেল, প্লাস্টার, মোজাইক, টাইল সিডার কাঠের জমাটি আসর। প্রধান কবরটিতে আছেন মৌলে ইসমাইল স্বয়ং। তাঁর প্রধানা পত্নী এবং দুই ছেলে। দুই কোনায় রয়েছে দুইটি পিতামহ ঘড়ি, যে দুটি ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই মৌলে ইসমাইলকে উপহার দেন। ঘড়ি দুটি এখনও চলছে। বইতে পড়েছিলাম যে সমাধির বাইরের প্রাঙ্গণে একটি সূর্যঘড়ি আজও অভ্রান্ত সময় দেখিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটির খোঁজখবর পেলাম না।

মেদিনা এবং স্যুক

মৌলে ইসমাইলের ইম্পিরিয়াল সিটির বাইরে আছে মেকনেসের পুরনো শহর মেদিনা এবং তার অন্তর্গত স্যুক। ফরাসিদের তৈরি নয়ানগরও আছে। কিন্তু সময়াভাবে সেগুলো আর দেখা হল না। অবশ্য মারাকেশ এবং ফেজের পরে মেকনেসের মেদিনা বা নয়ানগরে

নতুন কিছু দেখবার আশা করিনি । ইতিহাস ছাড়াও মেকনেসের আরেকটা পরিচয় আছে । স্যুশ উপত্যকার কৃষি সম্পদ এই মেকনেস বাজার হয়েই আনাগোনা করে ।

ইবন আইসার দরগা

শহর থেকে বেরোতে সিদি মহম্মদ ইবন আইসা সাহেবের দরগা । পুরনো কবরখানার মধ্যে । পীর মারা যান ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তাঁর চেলাচামুণ্ডা বেড়েই চলেছে । সুফি শ্রেণীভুক্ত এই সাধক সম্প্রদায় ঐহিক সুখাকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণা করেন । আত্মনিপীড়নেই এঁদের আগ্রহ । খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই । এঁদের গুরু কণ্টক কঙ্করশয্যায় শুতেন । পোকামাকড় এমনকী সাপ-ব্যাঙ-বিছে ধরে ধরে খেতেন । গুরুর অনুকরণে এখনও এঁদের কেউ কেউ দরগার ফাটল থেকে কাঁকড়াবিছে ধরে খান । পীরের কৃপায় দরগাতে কখনও কাঁকড়াবিছের অভাব হয়নি । বেন শাকুন বললেন যে, আমরা দরগাটা দেখতে চাই কিনা । গৃহিণী ঘন ঘন ঘাড় নাড়লেন ।

মিডল আটলাস

ফেজের শেষদিনটি বেন শাকুনের গাড়ি চড়ে মিডল আটলাস বেড়াতে যাব ঠিক করা ছিল । গৃহিণীর শরীরটা সেদিন পাথর-পাথর অথচ বেন শাকুন সাহেবের দিনটাও নষ্ট করা যায় না । একাই রওনা দিলাম । বেন শাকুন আমার একাকীত্ব দেখে তাঁর এক ইংরিজি জানা বন্ধুকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন । 'ওকে কিছু দিতে হবে না । ওর আজ অফিস ছুটি । এমনি আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবে ।' বন্ধু বেন শাকুনের পাশে বসে বোতলের পর বোতল বিয়ার খেতে লাগলেন । ছুটির দিন । তবে আমিও তাঁর কাছে মরোক্কো সম্বন্ধে অনেক কথা জানলাম । বেন শাকুন যুবাকালে প্রচুর মদ্যপান করেছেন । এখন আর খান না । মিডল আটলাস দেখার ইচ্ছা আমার খুব ছিল, কিন্তু সময়টা অনুকূল ছিল না । লোকে এসব জায়গায় আসে এক গরমকালে, ঠান্ডা হবার জন্য অথবা শীতকালে স্কি খেলবার জন্য । অক্টোবর মাসে গ্রীষ্মতাড়িতরা নেমে গেছেন এবং স্কি-পীড়িতরা উঠে আসেননি । সর্বত্রই ভাঙা হাট । গৃহিণী না এসে ভালোই করেছেন । তবু যা দেখলাম তাই বলি, ফেজ, সেফরু, ইমমুজের, ইরফান, আজরু । পুরো চক্করটা ওই ১৫০ কিলোমিটারের মতো । সেফরু গ্রাম পাহাড়ে ওঠবার আগেই একটি জলপ্রপাত আছে । গাঁয়ের ঝরনাটি পাহাড়ের ধার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে । নিতান্ত আটপৌরে ব্যাপার, কিন্তু লক্ষ করতে হয় ঝরনার দুধারে প্রাকৃতিক গুহাগুলো । ঘর । ঘরের ভেতর ঘর । স্পেনে এইরকম গুহায় আমি জিপসিদের বসবাস করতে দেখেছি । গ্রিসে পার্থেননের তলায় এরকম গুহাবাস

আছে। সেফরুর গুহাগুলিতে কেউ থাকে না তবে পিকনিক করার চিহ্ন আছে। গরমকালে সেফরু জলপ্রপাত ঘিরে মেলা বসে। এখন জলপ্রপাতের ধারা যেখানে তোড়ে মোড় ঘুরছে, সেখানে একা একটি যুবক খরধার স্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তারপরেই ছোট একটি গ্রাম ভালিল। সকালবেলা গ্রামের লোকেরা যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। ওপর থেকে পাহাড় কেটে জল নিয়ে আসা হয়েছে, সেই জল রাস্তার দুধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। খাও। রান্না কর। কাপড় কাচ। বাগানে দাও যার যা খুশি। জল নারায়ণ। জলই জীবন। গাড়ি পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। দুদিকে জঙ্গল। অলিভ, অরেঞ্জ, আঙুরের বদলে সিডার চিনার নানারকম চওড়া পাতার জঙ্গুলে গাছ। আরও ওপরে পাইন, ফার, বারচ। গাড়ি ঘুরে ঘুরে উঠছে। উল্টোদিক থেকে একখানা গাড়ি নিশান উড়িয়ে বেরিয়ে গেল। ইরফানের রাজপ্রাসাদের গাড়ি। বেন শাকুন আর তার বন্ধু দুজনই মাথানিচু করল। এখনকার রাজা হাসান (২) এবং তাঁর বাবা মোহাম্মেদ (৫)-কে মরোক্কোবাসীরা সত্যিই শ্রদ্ধা করে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফরাসিরা বারবার সে শ্রদ্ধার আসন টলাতে চেয়েছে। পর্বতবাসী বারবারদের সমতলস্থ রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। কিন্তু সফলকাম হয়নি। হায়, সোনার অখণ্ড ভারত। এই তো সেদিন ১৯৫৫ সালে ফরাসিদের চক্রান্তে নির্বাসিত রাজা মোহাম্মদ (৫)-কে যখন ফরাসিরাই ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হল রাজ্যভার নেবার জন্য, তখন প্যারিসের হোটেলে বিদ্রোহী বারবার নেতা মারাকেশের পাশ থামি এল গ্রাই রাজার মাটিতে লোটান গাত্রাবরণ চুম্বন করে ক্ষমা চেয়েছিল। রাজা তাকে সসম্মানে উঠিয়ে বললেন, 'অতীতের কথা আমায় বোলো না। আসল কথা হল ভবিষ্যৎ। তুমি ভবিষ্যতে কি করবে তাই দিয়েই তোমার বিচার হবে।'

ইমমুজের পৌঁছে গেলাম, ৪৪৬৫ ফুট। শীতকালে প্রায়ই বরফ পড়ে তবে স্কি খেলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একদম দেশী শহর। লোকসংখ্যা ১৩২০০০। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া চলছে। দোকানিরা জিনিসপত্র বাইরে থেকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। কাফিখানার সামনের ফুটপাথ ফাঁকা। কাচের শার্সির পিছনে ঢাকা বারান্দায় বসে কয়েকজন ছাড়া ছাড়া লোক চা বা কফি খাচ্ছে। দ্রুতবেগে খসে পড়ছে গাছের পাতা। চারদিকে কেমন যেন একটা ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত ভাব। শীত আসছে। ইমমুজেরের পরে ইরফান। ৫৩১২ ফুট। সুলতান হাসান (২) এবং মরোক্কোর বহু ধনী-মানী লোকের গ্রীষ্মাবাস। সুইস শ্যালে। ফ্রেঞ্চ শ্যাতো। জার্মান ক্যাসলের ছড়াছড়ি। ঠিক যেন আরব্য রজনীর কোনও দৈত্য সুইস আল্পস থেকে একটা শহরকে তুলে এনে মরোক্কোর পাহাড়ে বসিয়ে দিয়েছে। তেমনই নির্মল, নির্ভেজাল, নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু খাই কোথায়। রাস্তার ওপর কোনও চৌক বা বাজার দেখলাম না। পাঁচতারা হোটেল মিশলিফেনের খানা কামরা আড়াইশো চেয়ার-টেবিল, ছুরি,

কাঁটা, প্লেট, ন্যাপকিন দিয়ে সুচারুরূপে সজ্জিত, কিন্তু একটা লোক নেই । বেন শাকুন নিয়ে গেলেন নিচের একটা রেস্টুরেন্টে, যেখানে ইরফানের বাসিন্দারাও খায় । সেখানে এই বেলা বারোটার সময় চেয়ারগুলো সব টেবিলের ওপর তোলা । মুশকিল । চলো পরের শহর আজরু সেখানে প্যানোরোমা হোটেল সারা বছর খোলা থাকে । ওখানে খেয়ে ফিরব । আজরুতে দেখার কিছু নেই । তবে জায়গাটি মনোরম বলে যাত্রীরা কয়েকদিনের জন্য থাকতে আসে । বেশ কয়েকটি অল্পমূল্যের হোটেল আছে । আর আছে উটজ শিল্পীদের পরিচালিত একটি শিল্পাগার, যেখানে বারবার নির্মিত নানারূপ কারুকৃতি কিনতে পাওয়া যায় । এছাড়া আজরু উত্তর মরোক্কো থেকে দক্ষিণে যাবার দুটি প্রধান রাস্তার মোহনায় । নিকটেই আজরু পর্বতশিখরের মাথায় মৌলে ইসমাইল একটি দুর্গ বানিয়েছিলেন । স্বার্থবাহ বণিকদের ওপর নজর রাখবার জন্য । ফেরবার পথে ইমমুজেরের আট কিলোমিটার দক্ষিণে ‘শ্যালে (CHALET) দ্যু লাক’ হোটেলে চা খেলাম । লাক অর্থে এখানকার বিস্তৃত অগভীর লেকটি যাঁকে সম্পূর্ণ ঘুরে এলে ষাট কিলোমিটার বেড় পড়ে । বাড়ি এসে শুনলাম, গৃহিণী সারাদিন সুইমিং পুলের ধারে বসে এবং শুয়ে বই পড়েছেন । এখন শরীর-মন দুই-ই প্রসন্ন । ভালো । তস্মিনতুষ্টে জগৎ তুষ্ট ।

মরোক্কোর পালা শেষ হচ্ছে । আর দুঘণ্টার মধ্যে ফেজ থেকে উড়ে যাব প্যারিস । আড়াই ঘণ্টার রাস্তা । হস্টেলের বারান্দায় বসে কদিনের কথা ভাবছি । নিচে ফেজ-এল-বালির দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা । কাইরুইন মসজিদের সবুজ টালির ছাদ রোদে চমকাচ্ছে । মারাকেশের জেমা-এল-ফন । কুতুবিয়া মিনারের নিঃশব্দ অঙ্গুলি সংকেত । আহমেদ আল মনসুরের সুরভিত মন্দির । ভলিউ ব্লিস । গ্রাম ছাড়া তালগাছের মতো আকাশমুখো থামগুলো । মৌলে ইদ্রিসের প্রসন্ন প্রশান্তি । মেকনেস । বাব-এল-মনসুর । আবেষ্টনী প্রাচীরের ভ্রূকুটি কুটিল ভঙ্গি । কিন্তু সবার ওপরে মানুষ সত্য । বেন শাকুন আর তাঁর সংসার । মারাকেশের গাইড আহমদ । বৃত্তির অভাবে সে বিয়ে করতে পারছে না । ‘আমি ইংরিজি-ফরাসি দুটো ভাষায় গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু একটা চাকরি জোগাড় করতে পারছি না । এই গাইডের কাজে কি চলে । আমার বাকদত্তাও কাজ করে । অফিসে স্বাগতভাষিণী । কিন্তু আমার একটা নিয়মিত উপার্জন না হলে... ।’ মরোক্কোতে খাবার-পরবার অভাব না থাকলেও বেকার সমস্যা কঠিন । শহরে শিক্ষিত বেকার শতকরা কুড়িজন । মনে পড়ছে সেই বুৎ পালিশ ছোকরাকে যে ভারতে গিয়ে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করবে । সেফরুতে সকল লোকচক্ষের আড়ালে ঝরনার জলের দিকে চেয়ে যে ছেলেটি বসেছিল । মারাকেশের সেই কালো কোলো ভেন্ডার । কাগজ মুড়ে বাদামভাজা দিতে দিতে বলেছিল, ‘এই তো আমার আটাশ নম্বর স্টল । আবার এসো’ । আর যাওয়া হয়নি । আজরুর সেই দীনতা নম্র

ওয়েটারটি যত্ন করে খাওয়াল আমাকে । সদা হাস্যমুখ আজিজ । মরোক্কোতে আমাদের প্রথম বন্ধু । সব মনে আছে । সব মনে থাকবে ।

ভ্রমণ অক্টোবর, **১৯৯৩**

ভাগীরথী, রূপনারায়ণ, নোবেল প্রাইজ

নবনীতা দেব সেন

দিদি গাদিয়াড়া যাবেন?

'আমরা ফিরব কবে?'

এ যেন অবিকল সেই প্রবাদপ্রতিম হাভাতেপনার উদাহরণ, 'বাঙাল, ভাত খাবি?'

না, 'আঁচাবো কোথায়?'

অনেকদিন ধরে মনটা পালাই পালাই করছে, আর দেহ বাধা দিচ্ছে। রক্তচাপ রক্তচক্ষু করে শয্যাবন্দী রেখেছিল পুরো পুজোর ছুটিটা। দুদিনের জন্য শুধু ছুটে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে-আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে। পুজোর ছুটি ফুরোতে চলল, হাতে কাজ জমে আছে অজস্র, বাড়িতে বিজয়ার ভিড়-যদিও খুব ভালো লাগছে। 'লোক, না লক্ষ্মী' মা বলতেন, 'যতদিন বাড়িতে লোকজন আসে, ততদিনই বাড়িতে লক্ষ্মী আছেন, জানবি।' কিন্তু পরিশ্রমও হচ্ছে তো? আমাদের বাড়িতে অতিথি এলে যে একলা আমিই আছি সবার সঙ্গে গপ্পোড় করে কথা বলবার জন্য। তারই ভেতর নিজের লেখাপড়ার কাজ করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু এগোচ্ছে শামুকের গতিতে। মননে, শরীরে এত শ্রান্তি, মগজে না ঢুকছে কিছু, বেরচ্ছেও না কিছুই। এমনই সময়ে ভ্রমণ-সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ঠিক যেন দেবদূত হয়ে নেমন্তন্ন দিলেন। ঠান্ডা গাড়িতে, ধুলো-ধোঁয়া বাঁচিয়ে সোজা নদীর হাওয়ায়। আমি তো এক লাফে রাজি! দল বলতে আমি, অমরেন্দ্র, টুকু আর আমার দিদিভাই, বুলবুলি। গাদিয়াড়ার রূপগুণের সুনাম শুনছি ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরেই। সেখানে নাকি ভাগীরথীর সঙ্গে রূপনারায়ণের জোড় বাঁধার খেলা চলছে। সেই খেলাতে ওদের সঙ্গী ধানখেতের শান্ত সবুজ, আর খোলা আকাশের স্বচ্ছ নীল, আর সাক্ষী নদীর হাওয়ার ঝিরঝিরে আদর। চোখের আরাম। মনের বিশ্রাম। আত্মার শান্তি।

জলের ধারে ঘর আমার চিরদিনের স্বপ্ন। নদী আমার প্রেম। একটা রাত্রি, দুটো দিন জলের ধারে নদীর কাছে মনপ্রাণ ছড়িয়ে শ্বাস নেব। অক্টোবরের ১৪ তারিখ সকালে যাব। ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় ফিরব। শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ, সবকিছু ধুয়ে মুছে দেবে ভাগীরথী আর রূপনারায়ণ।

ঠিক হয়েছে সকাল সাতটায় বেরবো, যাতে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাই । যতক্ষণ পারি থাকতে হবে তো নদীর ধারে? তাই সেই কোন ভোরে উঠে পড়েছি । রাত থাকতে স্নান সারা, পুঁটলি বাঁধা, ওষুধপত্র খেয়ে একদম রেডি!

সাহেবদের মতো সাতটায় গাড়ি এসে হাজির । গেটে ভৌ ভৌ করে কাতর গুডবাই জানাতে লাগল টুসুরানি আর রাকুন । আর তাদের সামলে হাত নাড়তে থাকে কানাই, ‘ভালো করে ঘুরে আসুন দিদি!’

‘কাল সন্ধেবেলাই ফিরব!’

নতুন হাওড়ার ব্রিজে বিদ্যাসাগরের নামে গড় করে তো আমরা হাওড়ায় প্রবেশ করলাম । টুকু সারথিকে মনে করিয়ে দিলেন, ‘রাজীব গান্ধীর মূর্তি পেরিয়ে, বাঁদিকে । মনে আছে তো? সেবারে যে গেলাম?’ কিন্তু রাজীব গান্ধীর স্ট্যাচু আর এল না । পথে একটি হোটেল পড়ল, কবে নাকি একবার ঝাড়গ্রামের যাত্রাপথের বর্ণনায় হোটেলটির উল্লেখ ছিল ‘ভ্রমণ’ পত্রিকায়, সেই থেকে অমরেন্দ্রর সেখানে স্ট্যান্ডিং চায়ের আমন্ত্রণ আছে । তা, আমার প্রাণে একটু চা-টার লোভ জাগলেও, অমরেন্দ্র, দেখা গেল, নির্লোভ সম্পাদক । কেরালা-ভ্রমণের এক উপাদেয় কাহিনী শোনাতে শোনাতে হোটেলের সামনেটা পার করে দিলেন । অমরেন্দ্রর মুখে ফ্রান্সের সূর্যমুখী, ল্যাভেন্ডার আর আঙুরখেতের গল্প শুনছি আর মনে মনে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাচ্ছি, আর চলছি তো চলছিই । রাজীব গান্ধীর সেই প্রতীক্ষিত মূর্তিটি কোথাও নেই!

এমন সময়ে আমরা এসে পড়লাম অপূর্ব এক কাশবনের আঁচলের আওতায় । টুকু উছলে উঠে বললেন ‘বাঃ!’ তারপরেই-‘বাড়িতে ফেরার সময়ে কিছু কাশফুল নিয়ে যাব!’ অমরেন্দ্র তক্ষুণি গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়ে, নেমে পড়লেন । না, পরে বুঝেছি ফুল তুলতে নয়, ফটো তুলতে । আস্তে আস্তে কাশফুলের বনে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।

আকাশটার রং টলটলে নীল । রচনা বইতে শরৎকালের যেমন বর্ণনা থাকে, অবিকল তেমনই । নীলের মধ্যে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে, ঘন কাশবনে হাওয়ার সাদা ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সবুজ মাঠ বৃষ্টি ধোয়া । অমরেন্দ্রর ছবি তোলা আর ফুরোয় না! গাড়িতে এসে তাঁর কেবল নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার বিস্ময়, ‘আকাশখানা দেখেছেন! কী অসাধারণ নীল!’

ইতিমধ্যে ড্রাইভার জানালেন রাজীব স্ট্যাচু লরির ধাক্কায় কাত । এদিকে গাদিয়াড়ার পথও আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি । অগত্যা অ্যাবাউট টার্ন করে ছুটলাম । এবার পশ্চাদপসারণ । বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রাম্য রাস্তা । কত বাজার, কত হাট, কত রেল লাইন,

কত বাসস্ট্যান্ড, কত বাঁশবাগান, কত সবুজ পানাপুকুর, কত সবুজ ধানখেত । বাতাসে শহরের ধোঁয়া নেই । মানুষ দরিদ্র, কিন্তু হতদরিদ্র মনে হচ্ছে না ।

একটা মোড়ে এসে আটকে যাই । এখানে বাঁয়ে ঘুরতে হবে-গাদিয়াড়ার পথে । চারটে ছেলে এসে কালীপুজোর চাঁদা চাইছে । অমরেন্দ্র তাদের বললেন, ‘তোমরা কি জানো, এটা বেআইনি? আমি যদি পুলিশকে বলে দিই?’ বললেন বটে কিন্তু দিয়েও দিলেন পাঁচ টাকা ।

গাদিয়াড়ার পথ আগলে দাবি-দাওয়া হল এমনই আরও তিনবার । বাচ্চারা ছোট হলে অবশ্য দুটাকাতেই খুশি । কোথাও পুজোর কোনও রকমের প্রস্তুতি অবশ্য দেখা গেল না । তবে হ্যাঁ, একটি মোড়ের সিনেমা হল দেখলাম, তাতে ছবি চলছে, ‘বাবা কেন চাকর?’ বোধহয় স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে? সেখানে বেশ ভিড় ।

রাস্তাটা এখানে দক্ষিণ ফ্রান্সের অ্যাভেনিউগুলিকে মনে পড়িয়ে দেবেই । ছায়াময় পথ । দুপাশে উঁচু গাছ গির্জার দেওয়ালের মতো খাড়া উঠে গেছে, আর করজোড়ের মতো মিলিত হয়েছে আকাশে । আমাদের মাথার ওপরে গাছের ছাদ । এ পথটুকু খুবই সুন্দর । তারপর হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরেই সামনে ম্যাজিক-বিশাল জলরাশি! তাকে ঘিরে দূরে দেখা যাচ্ছে শ্যামল রেখা । চোখ জুড়িয়ে যায় । নাড়িও যেন ধুকপুকুনি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে, এক নিশ্বাসে সেই রূপটি অন্তরে গ্রহণ করি । গাড়িতে ছোট্ট একটা শব্দ হল সেই সুখ-বিস্ময়ের শ্বাসটানার ।

দূরে দুরকম রং দেখা যাচ্ছে, বাঁয়ে বিশাল গেরুয়া, ডাইনেও তাই, মাঝখানে হঠাৎ কিছুটা ঝিরঝিরে ঘননীল স্রোত । সেটা কি মেঘের ছায়া? নাকি রূপনারায়ণের স্বাক্ষর? আকাশ তো ঝকঝকে নীল, সাদা মেঘের কি ওরকম ছায়া হবে? নিশ্চয় রূপনারায়ণ জানান দিচ্ছে । ঠান্ডা গাড়ি, বন্ধ গাড়ি, তাতে নদীর হাওয়া ঢোকে না । আমরা কাচ নামিয়ে ফেলি ।

বাঁয়ে সরকারি অতিথিশালা, রূপনারায়ণের নামে তার নাম । ভেতরে অনেকখানি সবুজ, একটি সুদৃশ্য কুটির আছে খড়ের ছাউনি দেওয়া, আহা, সেটি কি? সেটি কি? নাঃ, ওটা কোনও অফিস । আরেকটি সুদৃশ্য পুরনোদিনের দোতলা কোঠাবাড়ি রয়েছে, একটু ভাঙাচোরা, একটু মলিন, বিস্মৃতি বিলগ্ন । একেবারে নদীর ধারে । বারান্দায় ডেকচেয়ার । সেটি কি? সেটি কি? নাঃ সেটি কিছু নয় । পুরনো অতিথিশালা ।

তবে?

ভেতরে যান ।

ভেতরে প্রথমেই চোখে পড়ে বোটিং-এর তীরচিহ্ন । সেটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চকচকে পুকুর, সেখানে প্যাডল বোট চালিয়ে ফুর্তি করে যান কলকাতার লোকেরা । নদী ফেলে । নদীর বড় বড় নৌকা ফেলে । স্টিমার ভুটভুটি ফেলে । নদীর দিকে পিছন ফিরে । পুকুরের এক ধারে অনেক রংচংয়ে বোট উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তাদের ভালোবেসে ধুয়ে মুছে রাখেনি কেউ, একমাত্র আদর করে জড়িয়ে রেখেছে ঘন মাকড়সার জাল ।

দুটি এ সি ঘর । একটিতে এ সি কাজ করে না । নাকি গোড়া থেকেই । শুধু শব্দ করে । অমরেন্দ্র আমাদের অন্যটি দিলেন, যেখানে এ সি চলে ।

(হ্যাঁ, চলত । একটু পরেই বন্ধ হয়ে গেল । আর দুদিনে চলল না ।) আমরা দরজা-জানলা খুলে দিই, বারান্দায় নদী দেখতে দৌড়াই । ও মা! সামনে যে ঝাঁকড়া গাছের দু-সারি পর্দা! ফাঁকে ফাঁকে নদীর গেরুয়া । ফাঁকে ফাঁকে নৌকা বয়ে যায় । কিন্তু ও কী? এ কোন আকাশ? অমরেন্দ্রর সেই শরৎ সুনীলের শোভা গেল কোথায়? এ যে নীল অঞ্জনঘনপুঞ্জ শোভায় সম্বৃত অম্বর! এ সংবরণ তো বেশিক্ষণের নয় । এবারে বৃষ্টি নামবেই । আকাশের রং কালো । নদীতে তার গাঢ় ছায়া ।

লাঞ্চ অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে । ডাল, ইলিশ মাছ ভাজা, আলু-পটলের সব্জি, রুই মাছের ঝোল । আমরা খেতে যাব একঘণ্টা পরে । খেতে খেতেই আকাশ অসম্বৃত হয়ে পড়লেন!

খাবার পরে একটু বিশ্রাম করা নিয়ম । দিদিভাই আর আমি তো বারান্দায় বৃষ্টির ছাটে ভিজতে ভিজতে বিশ্রাম করতে লাগলাম । যেটুকু নদী পাওয়া যায়, ভেতরে ভরে নিই । একটু পরে টুকু, অমরেন্দ্র হাজির ।

'চলুন, বৃষ্টিটা থেমেছে । একটু ঘুরে আসি ।'

'এখুনি, এখুনি ।'

বৃষ্টি কিন্তু থামেনি । ধার করা ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা স্টিমার ঘাটে যাই ।

গেঁওখালি আর নূরপুর । এই দুটো জায়গায় যায় স্টিমার । দুটোই ওপারে । ত্রিকোণ যাত্রা সম্ভব-গাদিয়াড়া-নূরপুর-গেঁওখালি-গাদিয়াড়া । নতুবা যে কোনও ঘাট থেকে যে কোনও ঘাট । চারজনের গাদিয়াড়া থেকে নূরপুর যাবার টিকিট চোদ্দ না পনেরো টাকা । গেঁওখালির ভাড়া আরও কম । নূরপুরের ভুটভুটি ছাড়ছে তিনটেয় ।

ঘাট যেমন হয় ।

ভুটভুটির ছাদে দাঁড়ানো আইনত নিষিদ্ধ । ভুটভুটির পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে । ছাদে দাঁড়ালে বিশুদ্ধ নদীর হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া যায়, আকাশ, আলো আর নদীর সঙ্গে গল্প করা যায় । পেটের মধ্যে ঢুকলে আঁধার মনখারাপ, ভুটভুটির ভটর ভটর আর ডিজেলের বিষবাষ্পে নিশ্বাস নেওয়া । সেটাই আইনত নিতে বাধ্য যাত্রীসকল । ওপরে ছাদে কোনও রেলিং ঘেরা নেই । যাত্রীদের নিরাপত্তা নেই ।

বাচ্চারা বেঞ্চিতে হাঁটু গেড়ে জানলা দিয়ে নদী দেখছে । বসে পড়লে গর্তে ঢুকে যাবে । কিছুই দেখা যাবে না । দিদি, টুকু আর আমিও তাই করি । অমরেন্দ্র ক্যামেরা নিয়ে একটু দূরে দূরে ঘোরাঘুরি করছেন ওই খুপচির মধ্যে । উদ্দেশ্য জানলা দিয়ে নদীর ছবি তোলা । প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে । যাত্রী কম । হলদে প্লাস্টিকের পর্দাটা ফেলে দিলেন চালক । সোনায় সোহাগা । আমি তো জোর করে তুলে দিলাম, জল আসে আসুক, বিশুদ্ধ বাতাসটাও তো আসবে? এ যেন জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা নয়, বৃষ্টির সৈন্য । নূরপুর এসে গেল ১৫ মিনিটে । প্রচণ্ড বৃষ্টি, আর ঝোড়ো বাতাস । মানুষের ছাতা উড়ে যাচ্ছে । ভিজে কাপড় গায়ে লেপ্টে আছে । তারই মধ্যে উঠছেন দুকোলে দুই বাচ্চা নিয়ে মা । বালতি মাথায় দিয়ে স্বামী । সাইকেল নিয়ে মানুষ । বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পরিবার । নূরপুর থেকে ফিরলাম গাদিয়াড়া । এবারে অমরেন্দ্র আর আমি সিঁড়িতে । আমরা বড় ছাতাটা সিঁড়ির গর্তের মাথায় মেলে রেখেছি, বৃষ্টিতে ভিজছি না, কিন্তু টাটকা বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি ।

কোনওরকমে গাদিয়াড়াতে নেমে, ফেরার টিকিটের পয়সা দিয়ে গাড়িতে চড়ে পালিয়ে বাঁচি । কোথায় একটু ধাবায় বসে চা খাব, তা নয়!

চট করে অন্ধকার নেমেছে । এবং লোডশেডিং ঘোরতর । আমরা ঘরে মোমবাতি জ্বেলে, চা খেতে খেতে, অমরেন্দ্রর মুখে ছোটদের কবিতা শুনি । সন্ধে গাঢ় হয় । নরম মোমের আলোয় নরম শিশুদের ছড়া দিব্যি আবেশ তৈরি করেছে । হঠাৎ আলো ফেরে । পাখা চলে ।

'দেখি তো, টিভিটাও চলে কিনা?' টিভিটা চালিয়ে দিতে অস্পষ্ট একটা ছায়া ভেসে উঠল । অমিতা সেন । ইনসেটে তাঁর পুত্র অমর্ত*্য সেনের ছবি । আমি লাফিয়ে উঠি, 'দিদিভাই! এবার তাহলে পেয়ে গেলেন! অবশেষে!' কদিন ধরেই কাগজে নোবেলের খবর একটা একটা করে বেরোচ্ছে । দিদি, অমরেন্দ্র, টুকু,-আমরা সেই সন্ধ্যা যে কী করে কাটালাম, সেই দূর গ্রামে, রূপনারাণের কূলে! তারই মধ্যে ম্যাজিক, আজকালের টেলিফোন-'প্রতিক্রিয়া?'

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার । রাতে আমার ঘুম হয়নি । নদীর ধারে হাঁটতে গেলাম চারজনে । অমরেন্দ্র উধাও । গ্রামের সরু পথে, কলাবাগানের, ধানখেতের

মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি ।

আমরা মনোরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলি । সে আমাদের নদীতে নিয়ে যাবে । আমরা খগেনের সঙ্গেও কথা বলি । সে আমাদের সাইকেলভ্যানে করে গ্রামে নিয়ে যাবে । নদীর ধারের গাছগুলোর কেন যে জলে হাত ডোবাতে, আঙুল ছোঁয়াতে এত ইচ্ছে করে? নিচু হয়ে পড়েছে ।

তারপরে মনোরঞ্জনের কাঠের নৌকা । আসল তরণী বাওয়া । একঘণ্টা ধরে ভাগীরথী থেকে রূপনারায়ণ হয়ে ফের ভাগীরথীতে ফেরা । সূর্যোদয়, নদীর হাওয়া, নোবেল প্রাইজ । আজ সন্ধ্যায় নয়, আমাদের এখুনি ফিরতে হবে কলকাতায় । আজ তো কলকাতায় সাত-সমুদ্রের বাতাস লেগেছে ।

ফিরতে সময় লাগল অনেক কম । এসে দেখি কানাই আড়াইশো নাম লিখে রেখেছে । ফোনের অতিথির । বি বি সি, আজতক, দূরদর্শন, আকাশবাণী, আনন্দবাজার ইত্যাদি এবং অগণিত বন্ধুর নাম ।

আমাদের স্মৃতিতে ভাগীরথীর বুকে লেগে থাকবে স্টকহলমের বাতাস । গাদিয়াড়ার সেই মোমজ্বলা সন্ধ্যাটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা নতুন সূর্য ওঠা সকাল হয়ে রইল ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ১৯৯৯

গ. ব্য মাচুপিচু

প্রতাপকুমার রায়

পৃথিবীর প্রাচীন ও অবলুপ্ত সভ্যতার তালিকায় দক্ষিণ আমেরিকার ইঙ্কা সভ্যতার নাম পড়েছিলাম । গত নভেম্বরে সেই সভ্যতার অবশেষ দেখবার সুযোগ হল । প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দক্ষিণ আমেরিকার যে রাষ্ট্রের নাম পেরু, তার অনেকাংশ জুড়ে একদা ইঙ্কাদের সাম্রাজ্য ছিল । যদিও তাদের রাজত্বের কাল দীর্ঘ নয়-ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী মাত্র । তাদের স্থাপত্যের বহু নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায় পেরুর নানা স্থানে ।

ইঙ্কাদের রাজধানী ছিল কুজকো । আন্ডিস পর্বতমালার দুর্গম অভ্যন্তরে ৩,৬০০ মিটার (১১,২০০ ফুট) উচ্চতায় কুজকোর অবস্থান । কুজকো শহর আজও আছে । পেরুতে ভ্রমণার্থীদের দ্রষ্টব্যের তালিকায় কুজকোর মর্যাদার স্থান । এখান থেকেই যেতে হয় মাচুপিচু । ইঙ্কাদের তৈরি সৌধপ্রাসাদ মানুষের অবহেলা এবং কালের তাড়না সহ্য করে এখনও অনেকাংশে অবিকৃত আছে মাচুপিচুতে । আমরাও মাচুপিচু যাব ।

মাচুপিচু যাওয়া সহজ নয় । আমরা প্রথম পৌঁছলাম পেরুর রাজধানী লিমা । লিমা থেকে অতি প্রত্যূষে বিমানে কুজকো যাত্রা । ভ্রমণসংক্রান্ত বিবিধ নির্দেশিকায় পড়েছিলাম, লিমার মানুষেরাও বললেন, লিমার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুঘণ্টায় কুজকোর এগারো-বারো হাজার ফুটে উঠে শরীরে খুব অস্বস্তি হয় । আমাদের শরীর এই আকস্মিক পরিবর্তন সহজে সইতে পারে না । অধিক উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, তাই নিশ্বাসের কষ্ট হয়, প্রথম দিনটা শরীরকে সইয়ে নিতেই কেটে যায় ।

লিমা থেকে প্লেন সকাল ছটায় । এখন নভেম্বর মাস, দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রীষ্মের শুরু । বিষুবরেখার দক্ষিণে বলে এদেশের আবহাওয়া উত্তরমণ্ডলের, আমাদের বিপরীত । আন্ডিস পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে উড়তে থাকলাম । তৃণপত্রহীন গ্র্যানাইট পাহাড় নিষ্ঠুর রুক্ষ ভয়ঙ্কর মনে হয় । মাঝে মাঝে ছোট লেক, উঁচু পাহাড়ে বরফ জমে রয়েছে । ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রা । একটি সমতল জায়গায় নামলাম, কুজকো । আন্ডিসের ওপর বেশ বড় অধিত্যকা । আমরা খুব চিন্তিত হয়ে কুজকোতে পৌঁছলাম । থাকব তো মাত্র তিনদিন, তার একটা দিন যদি নিশ্চল থাকতে হয়, তাহলে এত দূরে আসা বৃথা যাবে না তো?

আমাদের কুজকো মাচুপিচু ভ্রমণের সব আয়োজন লিমার এক ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিয়ে করিয়েছিলাম । তাদের প্রতিনিধি কুজকো এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন । কতটা ইংরিজি বোঝেন ধরা গেল না, কারণ তিনি ইংরিজি আদৌ বলেন না । আমাদের বর্ণের জন্য তিনি অনেক যাত্রীর মধ্যে আমাদের অভ্রান্ত চিনে ফেললেন । সিনর কুমার? বলে হাত ধরে বাইরে একটা গাড়িতে আমাদের বসিয়ে দিলেন । আমার মধ্য নাম কী কারণে তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠল জানবার চেষ্টা করিনি । তাঁর নাম মারিয়া, স্প্যানিশ বলেন । পরে দেখেছি এই অঞ্চলের ভাষা কুয়েচুয়া অনর্গল বলেন । সুগৌর, দশাসই চেহারা । আদি অধিবাসী ইন্ডিয়ানদের রক্ত মিশেছে তাঁর পরিবারে । তিনি মূলত ইন্ডিয়ান, না স্প্যানিশ বুঝতে পারিনি । ভাষার অন্তরায় যে কত কঠিন হতে পারে মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম । তিনি এবং তাঁর ড্রাইভার আমাদের মোটঘাট নিয়ে এলেন ।

কুজকো ছোট শহর । তাপমাত্রা কোনও সময়েই হিমাঙ্ক ছোঁয় না । যে পথে পুরনো শহরে ঢুকলাম সেটি বেশ প্রশস্ত । দুপাশে ছোট ছোট বাড়ি । দোতলা বেশি নেই বললেই চলে । অল্প সময়ে হোটেলে পৌঁছলাম । কাউন্টারে আগমনের কার্ড সই করে ঘরের চাবি নেবার জন্য দাঁড়িয়েছি, মারিয়া আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন । কী বলেন কিছু বুঝি না । শুধু বুঝলাম, কোকা টি । মারিয়ার সঙ্গে হোটেলের ভোজনকক্ষে যেতে হল । প্লেনে প্রাতরাশ হয়ে গিয়েছে । আবার কেন? কাকে সে কথা বোঝাব?

একটু পরেই বড় বড় পেয়ালায় চা এল, দুধ-চিনি ছাড়া । চুমুক দিয়ে বুঝলাম, কোকো নয়, চা-ও নয় । স্বাদহীন আর কোনও পানীয় । পরিচারকের সাহায্যে জানা গেল কোকা টি, মানে চা-এর বদলে গরম জলে কোকেন পাতা । এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা, কলম্বাস যাদের নাম দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান, অনেকদিন আগেই জেনে গিয়েছিল, কোকেন অল্প মাত্রায় সেবন করলে এনার্জি বাড়ে, এই উচ্চতায় সুস্থ থাকা যায় । ইঙ্কারা কোকেন সেবন করতেন, এখনও তাদের বংশধরেরা কোকেন পাতা চর্বণ করে এবং তাদের অনেকেই কোকেনে আসক্ত হয়ে যায় । পেরুতে কোকেনের গাছ সহজেই বৃদ্ধি পায় । বস্তুত, পেরুর অন্যতম রপ্তানির বস্তু কোকেন ।

কোকা টির জন্য কিনা বলতে পারব না । তবে যে তিনদিন কুজকোতে ছিলাম, আমাদের আদৌ অস্বস্তি হয়নি । কুজকোতে নামার অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা কুজকোর দ্রষ্টব্য দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম । কোনও কষ্ট হল না ।

হোটেলটি ছোট হলেও বেশ ভালো । ডাইনিং হল আছে, তবে কাউকে লাঞ্চ-ডিনার করতে দেখিনি । সকালে প্রত্যহ ব্রেকফাস্ট রুমে মামুলি ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় । একজন এসে ডিম কেমন চাই জিজ্ঞাসা করে যেত । দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম, যে ছেলেটি

সন্ধ্যায় রিসেপশন কাউন্টারে বসেছিল, সকালে দেখি সে-ই ব্রেকফাস্ট রান্না করছে। টোস্ট এনে দিল যে মেয়েটি সে-ই কাল আমাদের মোটঘাট দোতলায় তুলেছিল। হোটেলে লিফট নেই। দোতলাই শেষ। আমাদের ঘরে কার্পেট থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত কাচের জানলা। ঝলমলে দিনে দেখলাম প্লাজা আরমাস-এর একাংশ, সাধারণ টালির ছাদ দেওয়া বাড়িঘর, তাদের পিছনে উঁচু পাহাড়। তারও পিছনে আর একসারি পাহাড়, তার এক পাশে বরফ পড়ে আছে। আমাদের ঘর থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে হয়।

আমাদের ট্যুর শুরু হবে বেলা আড়াইটেয়। মারিয়া বলে গিয়েছেন আমাদের নিতে গাড়ি আসবে, আমরা যেন তৈরি হয়ে লাউঞ্জে উপস্থিত থাকি।

হোটেলের সামনে উঁচুনিচু অসমান পাথর বাঁধানো রাস্তা বেশি চওড়া নয়। তার ওপর দিয়ে ট্যুর কোম্পানির বাস দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করছে। তিন চারটি এয়ারলাইন্সের প্লেন দিনে একাধিকবার যাত্রী নিয়ে আসে। তাদের জন্য বাসগুলি বিভিন্ন হোটেলে যাচ্ছে, আবার সেখান থেকে যাত্রী নিয়ে দ্রষ্টব্যস্থানে যাত্রা।

কুজকোতে অনেক হোটেল। আসলে, কুজকোর প্রধান ব্যবসা হল হোটেল আর ট্যুর। আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে পরপর চার পাঁচটা রেস্টুরেন্ট। বাইরে বোর্ডে খাদ্যবস্তু ও তার দাম লেখা আছে। কোনও স্থানীয় খাদ্যের অপরিচিত নাম দেখলাম না। অনেক ভেবে চিন্তে আমরা এক চিনা ভোজনশালায় ঢুকলাম। পৃথিবীর যেখানেই যাই, চিনা ভোজনশালা থাকবেই। সাধারণ ভোজন হল, অবশ্য অতৃপ্তির ছিল না। দাম সহনযোগ্য।

যথাসময়ে ট্যুরের কোচ এসেছিল। আমাদের দলে জনা পঁচিশ যাত্রী। সঙ্গের দোভাষী ইংরিজি এবং স্প্যানিশ বলে।

কুজকো ছোট এবং সেই জন্যই অন্তরঙ্গ শহর। মানুষগুলি ভালো, ইংরিজি বুঝতে বা বলতে অসুবিধা হয় বলে লজ্জা পায়। মনে হল ইংরিজিভাষী পর্যটকের সংখ্যাই বেশি। নানা দেশ থেকে পর্যটক আসে এখানে। নিশ্চয় সবকটি প্রধান ভাষার দোভাষীর আয়োজন আছে। ভারতবর্ষে যেমন যেখানেই বেড়াতে যান, দুচারজন বাঙালি পর্যটক থাকবেই, বিদেশে তেমনই কিছু জাপানি থাকবেই সব ট্যুরে। তারা ইংরিজি ভালো বলতে না পারলেও, বুঝতে পারে।

কুজকো শহর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বে সামান্য নয়। কুজকো প্রায় তিনশো বছর ইঙ্কা রাজাদের রাজধানী ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই ইন্ডিয়ান উপজাতি স্থানীয় অধিবাসীদের পরাভূত করে কুজকোতে বাস করতে শুরু করে। স্থানটি তাদের পছন্দ হয়েছিল। বিশাল মালভূমি, চাষবাসের ক্ষেত্র পর্যাপ্ত। দুশো বছর কুজকোতে বাস করবার পর, তাদের

রাজারা সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন । ক্রমশ তাঁদের অধিকার প্রসারিত করেছিলেন কয়েক প্রজন্ম ধরে । ১৫৩৩ সালে স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা কুজকো জয় করে । ইঙ্কাদের নির্মিত বিশিষ্ট প্রাসাদ, মন্দির সব নির্মমভাবে ধূলিসাৎ করে দেয় ।

এই কাহিনী বলছিল আমাদের যুবক গাইড । সে ইঙ্কা বংশোদ্ভূত । ইংরিজি ও স্প্যানিশ দুটোই অনর্গল বলতে পারে । বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পরীক্ষা পাস করে গাইড হয়েছে । ইঙ্কা সভ্যতা ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব তার কথায় ফুটে ওঠে । তার ইঙ্কা নাম বলেছিল আমাদের । উচ্চারণ সহজ নয় বলে সে নিজেই বলল, আমাকে আপনারা ডেভিড বলে ডাকবেন । স্প্যানিশদের ওপর তার ক্রোধ ও ঘৃণা আদৌ চেপে রাখবার চেষ্টা করে না । বলল, স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা যখন এসে পৌঁছল কুজকোতে, তার আগে তারা এত সুন্দর স্থাপত্য দেখেনি । এখানকার মতো এত সোনার ব্যবহারও তাদের অবাক করে দিয়েছিল । তারা দেশের স্বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষে লুট করল, তারপর ইঙ্কাদের স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শনগুলি ভাঙতে শুরু করে ।

তাই কুজকো শহরে আজ আর ইঙ্কাদের কোনও সৌধ, প্রাসাদ বা বাড়িঘর দেখতে পাওয়া যায় না । তবে স্প্যানিশদের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলা যায় ১৫৩৪ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্প কুজকোর তাবৎ বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল ।

আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, সেইখানে ইঙ্কাদের কোনও ইমারত ছিল । সেই বনেদের ওপর স্প্যানিশ গভর্নর কুমারীদের বাসস্থান তৈরি করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে । কনভেন্টো ডমিনিকান ডেল পেরু, কয়েক স্থানে এখনও পুরাতন দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন গাঁথনি করে বাড়ানো হয়েছে দেখতে পাওয়া যায় । আমাদের গাইড একটি কক্ষে আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখাল ঘরের দেওয়ালের নিম্নাংশ বড় বড় পাথরের, তার ওপর ছোট পাথরের নতুন নির্মাণ । বিশেষত্ব এই, গাইড বলল, ইঙ্কাদের নির্মাণকার্যে কোনও বালি-সিমেন্টের বা সুরকির মশলা দরকার হত না । নতুন নির্মাণে দুই পাথরের মাঝখান, পাশে মশলা দিতে হয়েছে ।

অতঃপর গাইড আমাদের ইঙ্কাদের স্থাপত্য কৌশল বোঝাতে লাগল । যে ধরনের মানুষের যে দলের সঙ্গে এসেছি আমরা, তারা সবাই সূক্ষ্ম বিষয়ে আগ্রহী নয় । তারা বেড়াতে বেরিয়েছে, ইতিহাস, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির পাঠ নিতে নয় । তারা ক্রমশই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল ।

গাইড আমাদের বোঝাল নিখুঁত মাপের মসৃণ করা পাথরের ওপর পাথর চাপাবার পূর্বে নিচের পাথরে সামান্য একটা খাঁজ থাকত, ওপরের পাথরে উঁচু করে রাখা একটা অংশ

নিখুঁতভাবে তারই ওপর বসত, তাই মশলার দরকার হত না । এটাই ইঙ্কা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ।

গাইড সহজে থামতে চায় না, স্বভাবতই পূর্বপুরুষের গুণকীর্তনে তার আনন্দ, কিন্তু দলের সবাই অধৈর্য হয়ে পড়ছে, এর পরের গন্তব্যে গেলে হয় না? গাইড বলে চলেছে, আরও আশ্চর্য কী জানেন, ইঙ্কাদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না, তবুও তারা কেমন অবিশ্বাস্য অব্যর্থভাবে তাদের নির্দেশ দূরের মানুষকে পাঠাতে পারত । সত্যই আশ্চর্য ঘটনা । পৃথিবীর সব সভ্যতায় অন্যতম সংযোগের বাহন ছিল লিপি । অথচ এই সেদিন, মাত্র সাড়ে চারশো বছর আগেও একটা বিশাল রাজত্ব চলেছিল লেখার অক্ষরমালা ছাড়া ।

আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, তাই হঠাৎ শুনলাম এক মহিলা অবান্তর প্রশ্ন করলেন, যদি লিপি ছিল না, তাহলে ইঙ্কারা বই পড়ত কী করে? আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠি লিখত কী করে ইঙ্কারা?

কনভেন্টোটি বেশ বড় । কক্ষের পর কক্ষ । দেখতে দেখতে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । কনভেন্টো থেকে বেরিয়ে মস্ত চত্বর । ইঙ্কারা নাম দিয়েছিল ক্যুরি কুয়েকা-সোনার উঠান । পাঁচ মন্দির ছিল এখানে । ইঙ্কাদের আরাধ্য সূর্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি পাঁচ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা । চত্বরে সোনার ফোয়ারা, চারপাশে কৃত্রিম কৃষিক্ষেত্র, সোনার তৈরি লামা-রা চরছে সেখানে । সঙ্গে মেষপালকের স্বর্ণমূর্তি । সে সবের কিছুই নেই এখন । গাইডের কথায় আক্ষেপ ঝরে পড়ল । স্প্যানিশ দস্যুরা কুজকোর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে ।

স্প্যানিশরা যেমন একদিকে কুজকোর ইঙ্কা সভ্যতার চিহ্ন নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিল, তেমনই পরম অনুরাগের সঙ্গে তৎকালীন স্প্যানিশ শৈলীর গির্জা ও সৌধাদি নির্মাণ করে শহরটাকে অলঙ্কৃত করেছিল । তার সুন্দরতম নিদর্শন কুজকোর ক্যাথিড্রাল । ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল । প্লাজা দ আরমাস-মস্ত বড় চত্বর, প্রায় ফুটবল মাঠের সমান, তারই একদিক জুড়ে ওই গির্জা । ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় স্থাপত্য ধারায় সমৃদ্ধ এই প্রকাণ্ড গির্জাটির ভক্তদের বসবার সার সার বেঞ্চির ওপর আমরা সবাই প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়লাম । সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত, এতক্ষণে বসবার সুযোগ পেয়ে আর কেউ উঠতে চায় না । গাইড সুউচ্চ গির্জার খিলানগুলির নির্মাণপদ্ধতি বোঝাতে লাগল । একধারে কাঠের অপরূপ মূর্তিগুলি দেখে আমরা চমৎকৃত । কে কত শুনছে, গাইডের খেয়ালও নেই । ক্যাথিড্রালের অবস্থান শহরের কেন্দ্রে । প্লাজার অপর তিনদিকে নানা দোকানপাট । কুজকো এবং পেরুর অন্যান্য স্থানে তৈরি বহু সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে । ক্যাথিড্রালের প্রশস্ত সিঁড়ির ধাপে ফেরিওয়ালারা তাদের জিনিসপত্র বিক্রির জন্য পর্যটকদের ব্যতিব্যস্ত করছে ।

পুঁতির মালা থেকে মূল্যবান কার্পেট, জামাকাপড়, মহামূল্যবান ভিকুনার তৈরি ক্ষুদ্র বহির্বাস। ভিকুনার পশমের তৈরি মেয়েদের কোট, কোটের কলার ইত্যাদির চাহিদা সারা ইউরোপ ও আমেরিকায়। অনেকটা ভেড়ার ধরনের এই প্রাণীটির বাস আন্ডিসের বারো-তেরো হাজার ফুট উচ্চতায়। অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে পাওয়া আরেকটি প্রাণী, আলপাকা। আরও নিচের স্তরে বাস করে লামা। ইংরিজি বানানটা বিচিত্র, Llama। আলপাকা আর লামা এক জাতের প্রাণী। লামার পশমের চেয়ে আলপাকার পশমের আদর বেশি। লামা যেন একটা ভেড়া উট হবার চেষ্টায় বেশি এগোতে পারেনি। তার গলা খানিক লম্বা হয়ে থেমে গিয়েছে। বলতে পারি বেমানান চেহারা। লামা এখন পর্বতাঞ্চলের গৃহপালিত পশু। এই অঞ্চলের একমাত্র ভারবাহী জন্তু। পাহাড়ে ঘোড়া, বলদ, গাধা নেই। কিন্তু লামার ভার বহনের ক্ষমতা খুব সীমিত। দশ-পনেরো কেজির বেশি বইতে পারে না। আমাদের গাইড বলেছিল, লামারা বড় চতুর প্রাণী, ভার বেশি হলেই বসে পড়বে। ভার না কমালে তাকে কিছুতেই নড়ানো যায় না। লামার মাংসও এখানের মানুষের খাদ্য। আমরা ল্যাম বলে যা খেয়েছি পেরুতে, হয়তো সবই লামার মাংস।

আমাদের হোটেল থেকে যাতায়াতের পথে, ইন্ডিয়ান বর্ণময় পোশাক পরে মেয়েরা ছোটবড় পসরা নিয়ে পর্যটকের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করত। সামান্য ইংরিজি বলত, ভেরি বিগ, হাউ মাচ, অলরাইট টুমরো, বাই ফ্রম মি ওনলি ইত্যাদি। বাচ্চা মেয়েদের মা বা অভিভাবককে ফুটপাতের একধারে স্টক নিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। তার পাশে একটা দুটো লামা লম্বা ঘাড় উঁচিয়ে কেমন বোকা বোকা চোখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবে। লামাই এই পর্বতাঞ্চলের একমাত্র প্রাণী। যে উচ্চতায় ভিকুনা বা আলপাকা থাকে সেখানে মানুষের বাস নেই।

আরমাস-এর মতো বড় নয়, শহরে আরও দুটি সুন্দর স্কোয়্যার বা প্লাজা দেখলাম। দুটিকে ঘিরেই দোকানপাট, ভোজনশালা। কুজকোর শেষ প্রান্তে নাতিউচ্চ পাহাড়ের ওপর সাকসেওয়ামান, একদা ইঙ্কাদের দুর্গ ছিল, শহরের প্রহরীও। এখন ইতস্তত কয়েকটি বিশাল পাথর পড়ে আছে। দুর্গপ্রাকারের একাংশ, সামান্যই, দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে একের ওপর আরেক পাথর বসানো ইঙ্কা স্থাপত্যের চিহ্ন দেখা যায়। পাথরগুলি বিশাল। কুড়ি টন ওজনের পাথরখণ্ড অনেক। কী করে এই পাথরগুলি পাহাড়ের মাথায় আনা হয়েছিল, কত দূরত্ব থেকে, তার কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অবশ্য আশ্চর্য হন না। দূর থেকে বড় পাথর এনে ওপরে তোলার চূড়ান্ত নিদর্শন তো মিশরের পিরামিড। কাইরোর সন্নিকট, গিজা পিরামিড গোষ্ঠীর সর্ববৃহতের নাম খুফু পিরামিড। সেখানেও দু-দশ টনের পাথর অনেক দূর থেকে আনা হয়েছিল। আর, সে পিরামিডের উচ্চতা ১৪০ মিটার, কুজকোর দুর্গপ্রাকারের কয়েক গুণ। তাছাড়া, পিরামিডের নির্মাণকাল

খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর। অর্থাৎ কুজকোর চার হাজার বছর পূর্বে পিরামিড নির্মিত হয়েছিল।

আন্ডিস পর্বতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং তার ইতিহাস সমানভাবে পর্যটককে মোহিত করে। ইঙ্কাদের কীর্তিমান রাজাদের মধ্যে পাচাকুটি ইঙ্কা উল্লেখযোগ্য। আসলে তাঁর নাম থেকেই সমস্ত উপজাতির নাম হয়ে গিয়েছে ইঙ্কা।

কুজকো শহরের নানাস্থানে ইঙ্কাদের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। তিন-চারদিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কুজকোর অন্তরঙ্গতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। যে রাস্তায় আমাদের হোটেল, সেই রাস্তার ওপর একটি ভোজনশালায় আমরা দুরাত্রি ভোজন করেছিলাম। পরিচারকের একজন ইংরিজি বলতে পারে, তাই কোনও অসুবিধা হয়নি। সারাদিন মাচুপিচুতে কাটিয়ে হোটেলে ফিরে সে রাতে আমার স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে ডিনারের জন্য বেরতে চাইলেন না। আমি পরিচিত ভোজনশালাটিতে খাবার আনতে গেলাম। হোটেলের ঘরে বসে নিশ্চিন্তে ভোজন করা যাবে। আহার্য আদেশ করে বসতে যাচ্ছি, পরিচারক বলল, খাবার নিয়ে যাবার জন্য আপনাকে বসতে হবে না, আপনারা তো পাশের হোটেলে আছেন, আমরা খাবার পাঠিয়ে দেব। আপনার ঘরের নাম্বার কত?

নিচে দুটি পিসকো সাওয়ারের আদেশ দিয়ে ঘরে বসতে না বসতেই খাবার পৌঁছে গেল। পরিপাটি সাজিয়ে এনেছে, ছুরি কাঁটা যন্ত্রাদি তো বটেই, সঙ্গে নুন মরিচের দুটি সুদৃশ্য কৌটো। যে খাবার এনেছিল, সে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল, এই ক্রুয়েট সেটটা যেন ফেরত দিই। হোটেলকে পরদিন সকালে বেরবার আগে বলেছিলাম, কিন্তু ফেরত দিয়েছিল কিনা খোঁজ নেওয়া হয়নি।

ইন্ডিয়ান বাজার, অর্থাৎ স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের বাজার দেখতে গিয়েছিলাম পুকাপুকারা। কুজকো থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। আমাদের যে কোনও বড় গ্রামের হাটের মতো। ইন্ডিয়ান ক্রেতা ও বিক্রেতারা তাদের নিজস্ব পোশাকে রঙের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। তরিতরকারি, মাছ-মাংস, ফল, জামাকাপড়, বাক্স, বিছানা, হাতের কাজ, প্রয়োজনের সবকিছুই পসরা সাজিয়ে বিক্রেতারা বসেছিল। এক জায়গায় দেখলাম মাছভাজা বিক্রি হচ্ছে। ভুট্টা-সিদ্ধ বিক্রি করার স্টল একাধিক। সামলাতে পারলাম না, দুটো সদ্য-সিদ্ধ করা, তখনও গরম সুবৃহৎ দানার ভুট্টা মুখে দিয়ে আমরা চমৎকৃত। অত্যন্ত সুস্বাদ। পরে শুনেছি, ভুট্টা আসলে আন্ডিসের ফসল। পেরুতে ষাট সত্তর প্রজাতির ভুট্টা পাওয়া যায়। কৃষি বিজ্ঞানের এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লিমাতে। তিনি বললেন, ভুট্টার আদি জন্মস্থান মেক্সিকো, পেরু নয়। খাদ্য জগতে পেরুর অবদান আলু। পেরুতে ষাট-সত্তর রকমের আলুর চাষ হয়। তাতেও বুঝি এদেশের মানুষের মন ওঠে না। বাজারে

কুচকুচে কালো রঙের শুকনো আলু বিক্রি হচ্ছে। শুনলাম অতি সুস্বাদু। পেরু থেকে আলু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। পুকাপুকারার ইন্ডিয়ান বাজারে ঘুরে বেড়াতেই আনন্দ। দিনটা নির্মল ছিল, গরম নেই, চারপাশে মানুষের বর্ণময় সমারোহ, তার মাঝে আমরা, পর্যটকেরা মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো। জোর কেনাবেচা চলছিল। দেখলাম দরদাম করা যায়। পূর্ব এশীয় দেশের মতো নয়। পশমের তৈরি একটা ঝোলা, দাম চেয়েছিল কুড়ি পেসো, ষোলোতে সওদা হল। কিছু মাটির এবং পোর্সিলিনের হাতের কাজ কেনা হল। কেনা গেল না লামা এবং আলপাকার লোমের তৈরি পোশাক। ভালো কার্পেট বিক্রি হচ্ছিল, নকশাগুলি যেন ভিন্ন জগতের, কাশ্মীরি নামদার ধরনে মোটা হাতের কাজের ছোট রাগ-ও দেখলাম। দাম কিছু বেশিই।

সেদিনটা আমাদের পরিশ্রমের দিন ছিল। আমরা নেমে এসেছি দু-তিন হাজার ফুট নিচে উরুবাম্বা নদীর উপত্যকায়। নদীর দুপাশে উর্বর জমিতে চাষ হয়েছে। পাশের পাহাড়েও ধাপ কেটে চাষ দেখা যায়। ছোট গ্রাম, দু-চারটে নিঃসঙ্গ বাড়ি, মসৃণ রাস্তা দিয়ে আমাদের কোচ চলেছে।

পাড় ছুঁই-ছুঁই উরুবাম্বা নদীকে বাঁপাশে রেখে আমরা চলেছি। এক জায়গায় থেমে মধ্যাহ্নভোজন হল। স্থানটি পর্যটকদের জন্যই তৈরি হয়েছে, পরের পর কোচ এসে থামছে, আর দলে দলে যাত্রী নেমে বাথরুম এবং ভোজনস্থলের দিকে দৌড়চ্ছে। আমাদের কুপন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুপনের বিনিময়ে বুফে লাঞ্চের জন্য প্লেট পাওয়া গেল। বহু পদ ছিল, নির্বাচন কঠিনই হয়েছিল। আমরা প্রথমেই ভুট্টা-সিদ্ধ নিয়েছিলাম। আর সব চেনা পদ, পেরুভিয়ান কিছু নেই বলেই মনে হয়েছে।

নানা দেশের নানা বর্ণের পর্যটক, নানা অশ্রুত ভাষায় কথা শুনছি, যেন একটা উদ্যানের মধ্যে আন্তর্জাতিক কোনও মেলা বসেছে। বেশিক্ষণ নয় আবার কোচে উঠে পড়তে হল। এখনও আর তিনটি দ্রষ্টব্যস্থানে যাব।

আন্ডিস পাহাড়ের ওপর উরুবাম্বা নদী যেন প্রকৃতির অলঙ্কার। আমরা কখনও নদীর পাশ দিয়ে চলেছি, কখনও নদী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা যাব চিনচেরো, সেখানেও কিছু ইঙ্কা নিদর্শনের অবশেষ পড়ে আছে, কোথাও শুধুই ইতস্তত ছড়ানো ইঙ্কা আমলের ছোটবড় পাথর। চিনচেরোর গির্জাটি দর্শনীয়। স্থানীয় কারিগর দিয়ে পর্তুগিজ শৈলীর এই গির্জাটি তৈরি করানো হয়েছিল। তাই সর্বত্র দুই শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। ইঙ্কাদের আঁকা কিছু ছবি, কাঠের কাজ এবং অলঙ্করণে গির্জাটি সমৃদ্ধ।

ওলানতেটাম্বোতে যখন পৌঁছলাম আমরা, তখন আমাদের সামর্থ্যের শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছি। পাহাড়ের গায়ে পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া ধাপ-কাটা। শ-দেড়েক ধাপ ওপরে উঠে

আবার ইঙ্কাদের কোনও কীর্তির ধ্বংসাবশেষ । অনেক কোচ এসেছে, অনেক পর্যটক পাহাড়ে উঠছেনও, কিন্তু আমার মতো পরিশ্রান্ত অনেকে নিচে একটু ছায়ার সন্ধানে ঘুরছেন । শেষ বিকেলের গুমোট গরম ছিল, আমাদের কষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছিল । দুটি ছোট দলে তিন-চারজন করে কুয়েচুয়া স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা স্থির হয়ে বসেছিল এক পাশে । তাদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী কয়েকটি লামা । এরা যেন মডেল, এদের পরনে বর্ণাঢ্য ইন্ডিয়ান পোশাক । ছবি তুললে পয়সা আশা করে, না দিলেও কিছু বলছে না, লামাগুলির মতোই স্থির চোখে নিশ্চল মানুষগুলি বসে আছে । পর্যটকের সুবিধার জন্য এমন আয়োজন আরও কয়েক জায়গায় দেখেছি । যেমন দেখেছি ফেরিওয়ালা স্থানীয় হাতের কাজ বিক্রির চেষ্টা করছে ।

কুজকোর আশপাশে প্রত্ন-সম্পদের ছড়াছড়ি । পথে পাহাড়ের ছবি ঘনঘন বদলাতে থাকে, কোথাও থাকে থাকে পাহাড়ের শস্যক্ষেত্র উরুবাম্বা নদী পর্যন্ত নেমে এসেছে, কোথাও তৃণগুল্মহীন নির্দয় পাথর ভ্রূকুটির মতো দাঁড়িয়ে আছে । উরুবাম্বা উপত্যকাটি নিসর্গে বড় মনোরম । এই অঞ্চলকে বলা হয় সেকরেড ভ্যালি অব দি ইঙ্কাস । ইঙ্কাদের পবিত্র উপত্যকা ।

প্রত্নতাত্ত্বিক সমারোহের মধ্যমণি হল মাচুপিচু । আন্ডিস পর্বতের মধ্য দিয়ে ট্রেন নিচে নামতে থাকে । ভোরবেলা কুজকোর সান পেড্রো স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল । দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের মতো । নেমে এলাম ঘুরে, গড়াড়িয়ে, ভাবনা হয় উঠতে পারবে তো এই ট্রেন । কুজকো শহরের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ছোট ট্রেন, বসতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, কখনও পাশ কাটিয়ে পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করবে প্রায় চার ঘণ্টায় । পথে স্টেশনও পড়ল কয়েকটি । যেখানে যথারীতি স্থানীয় হাতের কাজ নিয়ে আশপাশের গ্রামের মানুষ । ট্রেনে স্প্রিং-এর কমতি ছিল । খুব ঝাঁকানি দিয়ে চলে । দাঁড়ালেই পড়ে যাবার ভয় । তিন শ্রেণী । আমরা মধ্যবর্তী শ্রেণীতে উঠেছি । আসন সংরক্ষিত । ট্রেনে ব্রেকফাস্ট পরিবেশন হল । মাচুপিচুর ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে গাড়ির ভেতর । ইন্ডিয়ান গানের ক্যাসেটও ছিল । প্রত্যেক কামরায় টেলিভিশন স্ক্রিনে মাচুপিচুর ভিডিও দেখতে দেখতে চলেছি । আমরা উরুবাম্বা উপত্যকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, কখনও নদীর অত্যন্ত কাছাকাছি, কখনও দূরে সরে যাচ্ছি, প্রকৃতির চেহারাও ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে । এক জায়গায় নদী হঠাৎ বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত চলেছে, ফেনায় স্থানটা ভরে রয়েছে, পাহাড়ি র্যাপিডস-এর মতো ।

দু-আড়াই হাজার ফুট নেমে উপত্যকা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । দুপাশে খাড়া পাহাড় ঘন সবুজ । ট্রেনের দৌড় এই পর্যন্ত । পুন্টেস রুইনাস স্টেশন । একটু এধারে সারি সারি কোচ দাঁড়িয়ে আছে । আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কোচে উঠে পড়লাম । উরুবাম্বা

এখানে ক্ষীণকায় । পোল পার হয়ে নদীর অপর পার থেকে আবার চড়াই আরম্ভ হল । হাজার ফুট ওপরে উঠব । আধঘণ্টার যাত্রা । ওপরে আরও অনেক কোচ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে । আমাদের পরে আরও আসছে । পাহাড়ের ওপরে একটা মালভূমির মতো জায়গায় এসেছি, মাচুপিচু ।

এখন মাচুপিচু ন্যাশনাল পার্ক । সংরক্ষিত স্থান । ভারতীয় একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল । সে বলল, পার্কের গেট ওই সামনে । প্রবেশের আগে আপনার ব্রিফকেস, খাবারের ঝুলি, মায় জলের বোতল সব জমা রেখে যেতে হবে । মেয়েটি অস্ট্রেলিয়ায় থাকে । ওই দেশি ছেলেকে বিয়ে করেছে । উপদেশ দিল, একটু জিরিয়ে নিয়ে জল খেয়ে যান । ভেতরে তৃষ্ণায় এবং গরমে কষ্ট পাবেন । অক্ষরে অক্ষরে ফলল তার কথা । দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথার ওপর । স্থানে স্থানে কোনও বড় গাছ নেই, ছায়া বিরল । তবু দু-দশজন নিয়ম অগ্রাহ্য করে বিদেশি জলের বোতল নিয়ে ঢুকেছিলেন । আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকলাম ।

পাঁচ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে মাচুপিচু মালভূমি । ১৯১১ সাল পর্যন্ত কেউ এই স্থানটির অস্তিত্ব জানত না । ওই বছর আমেরিকার প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক হিরাম বিংহাম মাচুপিচু আবিষ্কার করেন । তারপর থেকে সারা পৃথিবীর পর্যটক ইঙ্কা সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের রূপ দেখতে মাচুপিচু আসেন ।

ফটক পার হয়ে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা উঁচুনিচু একটা সরু পথ ধরে আমরা এগোতে লাগলাম । হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে মাচুপিচুর সিংহাবলোকন হল । সেকালের ইঙ্কাদের বাড়িঘর, মন্দির ইত্যাদি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায় ।

আমাদের দলে কুড়িজন পর্যটক । নানা দেশের মানুষ সে দলে । ভারতীয় বলতে আমরা দুজন । পেরুর ভ্রমণে আমরা অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় মেয়েটি ছাড়া বম্বের এক গুজরাটি ভদ্রলোককে দেখেছিলাম । তাঁর মেয়ে আমেরিকাতে থাকে । তাকে সঙ্গে নিয়ে কুজকো এসেছিলেন । তারপর অন্য দলে চলে গেছেন ।

আমাদের গাইড যুবকটিও কুয়েচুয়া ইন্ডিয়ান । ইঙ্কাদের সম্বন্ধে বলতে তারও অদম্য উৎসাহ । বড় কাগজের ওপর ছবি এঁকে আমাদের বোঝাল ইঙ্কা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় । ইঙ্কাদের কোনও কক্ষের জানলা চৌকো বা রেকটাঙ্গেল (আয়তক্ষেত্র) নয় । সব ট্র্যাপিজয়েড, যেখানে জানলাগুলির ধার সমান্তরাল নয় । এই নকশায় ভার বহনের ক্ষমতা বাড়ে, ভারসাম্য ঠিক থাকে । জানলাগুলির অবস্থানও যে সূর্যের গতিপথের হিসেব করে এবং এসব যে ইঙ্কাদের জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতির জন্য হয়েছে, তাও শুনলাম । প্রথমেই আমরা গিয়েছিলাম সূর্য মন্দির । ইঙ্কাদের দেবতা সূর্য । সত্যিই ইঙ্কারা

জ্যোতির্বিদ্যায় কত উন্নত ছিল আমার জানা নেই, তবে তারা বছর শুরু করত মকর সংক্রান্তির দিন, ২২ বা ২৩ ডিসেম্বর থেকে, যেদিন সব থেকে ছোট দিন, তারপর দিন দীর্ঘ হতে শুরু করে । ৩৬৫ দিনের বছর ছিল তাদের এবং বারোটি মাস । অনুমান করতে বাধা নেই যে ইঙ্কাদের অন্য কোনও সভ্যতার সঙ্গে যোগ অথবা পরিচয় ছিল না, এই প্রমাণিত ধারণাগুলিতে তারা নিজেরাই পৌঁছেছিল ।

একটি গোল বাড়িতে গেলাম । বাড়ি বলতে একটি বড় কক্ষ । এখানে সেই এক ধরনের কাজ । বিশাল আকারের পাথর দু ফুট থেকে চার ফুট চওড়া, উঁচু দু-তিন ফুট, গভীরতা এক-দেড় ফুট । পরের পর সাজিয়ে গাঁথা । ছাদ কোথাও নেই, পাতার বা রিডের ছাদ হত । দ্বিতল করবারও নিদর্শন দেখলাম । অজস্র সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছিল । বড় একটা খোলা জায়গায় বিভিন্ন স্তরে নির্মাণকার্য হয়েছিল ।

গাইড বলল, সম্ভবত এটা ইঙ্কাদের মন্দির শহর ছিল । অন্তত দুশো পরিবারের আবাসের ইঙ্গিত রয়েছে । বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের বাসস্থান । রাজারানির বাসকক্ষও দেখলাম ।

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও সময়ে এই শহরের পত্তন হয়েছিল । অনেকের মতে, সম্রাট ইঙ্কা পাচাকুটি মাচুপিচুর স্থাপন করেছিলেন । পাচাকুটি মারা গিয়েছিলেন ১৪৭১ সালে, তার মানে মাচুপিচুর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মধ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে । চারদিকে পাহাড়ঘেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে । স্প্যানিশরা ষোড়শ শতাব্দীতে কুজকো এবং আশপাশের জনপদ দখল করেও মাচুপিচুর সন্ধান পায়নি । তাই জায়গাটা অক্ষত আছে । অধিবাসীরা স্প্যানিশ আক্রমণের আশঙ্কায় অথবা অন্য কোনও কারণে মাচুপিচু পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় । সাড়ে তিনশো বছর পরে হিরাম বিংহাম মাচুপিচু আবিষ্কার করেন, একথা আগেই বলেছি । তাঁর আগে কেউ মাচুপিচুর খবরই জানত না ।

খবর না জানার প্রধান কারণ, ইঙ্কাদের লিখিত ভাষা না থাকার জন্য কোনও রেকর্ড রাখা সম্ভব হয়নি । আমার মনে প্রশ্ন হচ্ছিল ইঙ্কারা তো দূরত্ব জয় করতে কার্পণ্য করেনি, মধ্য চিলি থেকে ইকুয়েডর পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল । ইঙ্কার রাজারা তথ্য ইতিহাস ইত্যাদি ধরে রাখবার জন্য এবং দূরে কোনও খবর পাঠাবার জন্য স্মৃতিধর মানুষ নিয়োগ করতেন । তাঁরাই ইঙ্কাদের ঐতিহ্যের কথা জানতেন । অর্থাৎ কমিউনিকেশন সিস্টেমটা তাঁরা চালাতেন । স্প্যানিশরা ইঙ্কা রাজত্ব ধ্বংস করলেও, তাঁদের জন্যই আজ আমরা ইঙ্কাদের সভ্যতার কিছু বর্ণনা পাই । স্প্যানিশ আক্রমণের সময় যে স্মৃতিধরেরা জীবিত ছিলেন এবং মুখে মুখে যে কাহিনী ও কথার প্রচার ছিল, সমসাময়িক স্প্যানিশ

লেখক, ঐতিহাসিক তার বর্ণনা লিখে গিয়েছেন । ইঙ্কাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সূত্র তাঁরা । তাই আমরা জানতে পেরেছি ইঙ্কারা চাকার ব্যবহার জানত না । খনি থেকে সোনা রুপো নিষ্কাশনের পদ্ধতি ইঙ্কাদের আয়ত্তে ছিল । ধাতুর নানা বিচিত্র অলঙ্কার উদ্ধার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা । রাজ্য শাসনের জন্য ইঙ্কারা কুজকো থেকে মধ্য ইকুয়েডর পর্যন্ত চব্বিশ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করেছিল দুর্গম আন্ডিস পর্বতমালার ওপর দিয়ে, প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার । আরও একটা উপকূলবর্তী রাস্তা তারা তৈরি করেছিল আন্ডিসের পাদদেশে, সেটিও সমান দীর্ঘ, মধ্য চিলি থেকে ইকুয়েডরের শেষ পর্যন্ত । অথচ তারা লোহার ব্যবহার জানত না । ব্রোঞ্জ, তামা, পাথরের খনিত্র তার সাক্ষ্য দেয় । ইঙ্কাদের কোনও ভারবাহী বা দ্রুতগতি পালিত প্রাণী ছিল না । তবুও মাত্র একশো বছরের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল, রাজ্য শাসনও করেছিল দক্ষতার সঙ্গে । কোনও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটেনি । সাম্রাজ্যের মানুষের সংখ্যা সওয়া কোটি, তারা অন্তত কুড়িটি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে ।

গাইড বলেছিল, ইঙ্কারা হিসাবপত্র রাখার একটা উপায় প্রবর্তন করেছিল । তার নাম কিউপু । একটা ছোট লাঠিতে বাঁধা বিভিন্ন রঙের সুতো ঝোলানো থাকে, তাতে গেরো বেঁধে বেঁধে জটিল পদ্ধতিতে নির্ভুল হিসাব রাখা যেত । যা কিছু পাওয়া গিয়েছে তার পাঠোদ্ধার সহজ নয় । কিউপুতে নাকি কিছু তথ্যও রাখা যেত, কিন্তু পাঠোদ্ধার ইঙ্কা শ্রুতিধর ছাড়া করা সম্ভব হয়নি ।

ঘোরা যেত আরও অনেক । বহু পর্যটক ইঙ্কা ট্রেল ধরে তিন-চারদিনের যাত্রা করেন পায়ে হেঁটে । যে অঞ্চল দিয়ে গিয়ে ইঙ্কা ট্রেল ধরতে হয়, তাকে বলা হয় সেকরেড ভ্যালি, পুণ্যভূমি ।

রৌদ্র প্রখর ছিল, জলপানের উপায় নেই । সূর্য মধ্যগগনে বলে কোনও দেওয়ালের আড়ালেও ছায়া নেই । আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । গাইড আমাদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাচ্ছে, তার ক্লান্তি নেই । উঠতে নামতেও হচ্ছে ।

একটি বৃত্তাকার কক্ষে গেলাম । নিয়ে গেল তিন জানলা-বিশিষ্ট আরেকটি কক্ষে । অন্য এক কক্ষের ভেতর দিয়ে একটু নিচে নামলে অন্ধকার একটি প্রকোষ্ঠ । এখানে সূর্য দেবতার পূজায় প্রাণী বলি দেওয়া হত । নরবলিও দেওয়া হত বলে ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন । ইঙ্কারা প্রথম দুশো-আড়াইশো বছর কুজকো এবং তার কাছাকাছি জায়গায় পুরনো অধিবাসীদের পর্যুদস্ত করে রাজত্ব করেছে । পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি রাজা হলেন পাচাকুটি ইঙ্কা, সমর্থ উচ্চাভিলাষী পুরুষ, তিনি মন দিলেন সাম্রাজ্য বিস্তারে । পাচাকুটির মৃত্যু হয় ১৪৭১ সালে । তারপরও সাম্রাজ্য বিস্তার চলেছিল ।

স্প্যানিশরা এসে যখন ইঙ্কা রাজধানী অধিকার করল, তখন সাম্রাজ্যের বিস্তার উত্তর ইকুয়েডর থেকে সম্পূর্ণ পেরু পার হয়ে মধ্য চিলি পর্যন্ত । দুহাজার কিলোমিটারের অধিক । ইঙ্কাদের সমাজব্যবস্থা, রাজ্য শাসনের ধারা সবই গড়ে উঠেছিল লিখিত ভাষা ছাড়া । কেমন করে নির্দেশ পাঠানো হত এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, শ্রুতিধর দূত কতখানি নির্ভরযোগ্য ছিল, আজও তার গবেষণা হচ্ছে ।

স্পেনের রাজা পঞ্চম কার্লোসের অনুগ্রহে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন পিজারো তিনটি জাহাজে একশো আশি জন সৈন্য ও সাতাশটি ঘোড়া নিয়ে পেরুর উপকূলে পৌঁছলেন । সময়টা ইঙ্কা রাজা আতাউয়ালপার ভালো যাচ্ছিল না তখন । দেশে ইতস্তত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে । কুজকো থেকে তিনি কায়ামার্কাতে নেমে এলেন । সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা । তাঁর ভাই উয়াসকারকে যোগ্য শাস্তি দেবার জন্য এগোচ্ছেন, এমন সময় খবর পেলেন, কোনও বিদেশি দল পেরুর উপকূলে নেমেছে । রাজার কিছু সৈন্য খবর নিতে গিয়ে স্তম্ভিত । যারা এসেছে তারা নিশ্চয় ভগবানের কাছের মানুষ । চুল সোনালি, সুগৌর বর্ণ, নীলাভ চোখ । এমন সুন্দর মানুষ তারা কখনও দেখেনি, আগন্তুক রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় রাজসৈন্যেরা দেবদূতদের অভ্যর্থনা করে সানন্দে রাজার কাছে নিয়ে চলল ।

পিজারোর সৈন্যেরা রাজার কাছে পৌঁছে রাজার দুহাজার দেহরক্ষীকে নৃশংসভাবে হত্যা করল । সেই সৈনিকদের বন্দুক গুলি কামান নেই, তারা সহজেই পরাজিত হয়ে প্রাণ দিল । ঐতিহাসিকেরা বলেন, কায়ামার্কায় রাজার পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র সৈনিক সে খবর পেল না । পিজারো রাজা আতাউয়ালপাকে সহজেই বন্দি করলেন । তারপর মুক্তিপণ চাইলেন যে কক্ষে রাজা বন্দি, সেই কক্ষ ভরে সোনা । আতাউয়ালপা সরল বিশ্বাসে পিজারোকে ঘর ভরে সোনা দিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পিজারো অকস্মাৎ যখের ধন পাবার পর আতাউয়ালপাকে হত্যা করেছিলেন ।

কুজকোয় যখন সে খবর পৌঁছল, সিংহাসনে বসলেন মাঙ্কো ইঙ্কা । ধনরত্নের সন্ধানে পিজারো দিগবিদিকে তাঁর সৈন্যদের পাঠাচ্ছেন । এক দল সৈন্য কুজকো আসছে খবর পেয়ে মাঙ্কো ইঙ্কা ১৫৩৫ সালে কুজকো পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন । স্প্যানিশরা কুজকোও দখল করল বিনা যুদ্ধে । মাঙ্কো ইঙ্কা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেলেন । তার পরের অধ্যায় আমাদের জানা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস । মাচুপিচুর খবর পায়নি স্প্যানিশরা । মাচুপিচু তাই আজও অক্ষত ।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে দেখি একটি বড় পাথরের ছায়ায় এক জাপানি ভদ্রলোক বসে । কাছে আসতেই তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল । আমরা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য

হয়েছিলাম। আমরা এমন দলছাড়া জাপানি পর্যটক দেখিনি। দেখেছি জাপানিরা ছোট বড় দলে একসঙ্গে ঘোরে। কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ করে না, হয়তো তাদের ইংরিজি বলার আড়ষ্টতার জন্য। আমরাও পাথরের ছায়ার আশ্রয় নিলাম। জাপানি ভদ্রলোক ভালো ইংরিজি বলেন। কাজেই আলাপের অসুবিধা ছিল না। তিনি ওসাকার এক বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। প্রত্যেক ছুটিতে তিনি অন্তত দিন পনেরোর জন্য কুজকো আসেন এবং সেখান থেকে মাচুপিচু তিন-চারদিন। আমরা আজই ফিরে যাচ্ছি শুনে হতাশ গলায় বললেন, আমি কয়েক বছর ধরে মাচুপিচুতে আসছি, দেখার শেষ নেই। কাল সকালে আমাদের সামনের ওই পাহাড়ে উঠব, প্রতিবছরই উঠি। পাহাড়ের নাম হুয়েনাপিচু, গভীর সবুজ বৃক্ষলতায় মোড়া, দুপুরের রৌদ্রে মরকতের মতো জ্বলছে। ভদ্রলোক বললেন, তাছাড়া রাতে যদি পার্কের কাছে পেরু হোটেলে না থাকলেন, সকালের প্রথম রোদ মাচুপিচুর ওপর পড়তে না দেখলেন, তাহলে কি মাচুপিচু দেখা হল?

মাচুপিচুর মায়াবদ্ধ মানুষটির কাছে বিদায় নিয়ে আমরা পার্কের বাইরে ভোজনস্থলে যাব। এলাহি আয়োজন। আমাদের কুপন দেওয়া ছিল, তার বিনিময়ে খাবার পাওয়া গেল। বহু পদের আয়োজন, সিদ্ধ ভুট্টাও অব্যর্থ ছিল। পরিপাটি ভোজন হল। এবার ফেরা। প্রথমে কোচ, তারপর পুন্টেস রুইনাস স্টেশন। স্টেশনের কাছে আমাদের দেশের মতো ছোট ছোট অস্থায়ী স্টল। টুকিটাকি জিনিস থেকে, উচ্চমূল্য কার্পেট, ভিকুনার জামা, লামার পশমে বোনা সোয়েটার।

আমাদের ট্রেন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রেনের স্বল্প আলোয় ইঙ্কা সভ্যতার অসাধারণ উন্নতির কথা ভাবতে ভাবতে সাড়ে নটা নাগাদ কুজকো পৌঁছলাম।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৯

কই যাইত্যাছি জানি না

শঙ্খ ঘোষ

কই যাইত্যাছি জানি না

চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল ২২৫এ নম্বরের একটা বাস । তাকিয়ে দেখি তার পিছনে গোটা গোটা হরফে লেখা আছে: 'সুন্দর মুখের চেয়ে ভদ্র ব্যবহার অনেক বেশি আকর্ষণীয়' ।

এ তো প্রায় বাণীর মতো! উপরন্তু, বাস-ট্রাকের পিছনে যে রকম হেলফেলায় অক্ষরবিন্যাস দেখা যায় তেমন নয় একেবারেই । এর ছাঁদের মধ্যেও বেশ একটা চারুতা । বাসের গায়ে এমন কথাও লেখা হয় তাহলে? সচরাচর তো এসব জায়গায় ইংরিজিতে বা হিন্দিতে পাবার কথা 'ব্লো হর্ন' 'টা-টা' 'ডু নট কিস মি' কিংবা 'বুরি নজরওয়ালে তেরি মুঁহ কালা' । না, শুধু এইটুকুই নয়, কদিন আগে আরও একটা দেখেছিলাম 'ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট' ।

সম্প্রতি বাংলাদেশে গিয়ে ট্রাকের বা অটোরিকশার পিছনে ওই ধরণের নানারকম লেখন দেখছিলাম, দেখতে দেখতে ভিন্ন একটা সুখের বোধ হচ্ছিল, কেননা তার সবটাই ছিল বাংলা । 'ব্লো হর্ন' নয়, সেখানে থাকে 'ভেঁপু বাজান' বা 'ভেঁপু দিন' । সেখানে পাওয়া যায় এইসব বাচন বা নির্দেশ: '১০১ হাত দূরে থাকেন' 'এবার তবে চলি' 'মা-বাবার দোয়া' কিংবা একেবারে ঢাকাই রসবোধ থেকে উঠে আসা: 'জন্ম থেকে জ্বলছি' । তবে, এসব ছাপিয়ে সবচেয়ে যেটা আমাদের মনে গেঁথে রইল এবার, তা হল আচমকা পেয়ে যাওয়া এই চমৎকার এক ঘোষণা: 'যাইত্যাছি যাইত্যাছি, কই যাইত্যাছি জানি না' ।

ঘোষণাটার মধ্যে ঠিক কী যে আছে, ভাবতে থাকি । কোনও স্পর্ধা, না কি উপেক্ষা? অ্যাডভেঞ্চার, না ঔদাস্য? রকেট-বাসের সামনের আসনে বসে আমরা চলেছি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার, আমাদের দিকে ওই বাণীনিক্ষেপ করতে করতে সামনে সামনে চলেছে একটা ট্রাক, আর ব্যক্তিগত স্তর থেকে প্রায় যেন রাষ্ট্রনৈতিক কিংবা দার্শনিক নিরুদ্দেশের দিকে চকিতে চকিতে ইশারা পাঠাচ্ছে কথাগুলি, বলে চলেছে: যাইত্যাছি যাইত্যাছি, কই যাইত্যাছি জানি না ।

কে বলতে পারে, গোটা বাংলাদেশরই এটা মর্মকথা কি না।

রামু কলেজের অধ্যক্ষ অবশ্য জানেন কোথায় তিনি যেতে চান। কক্সবাজারে পৌঁছবার ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যেই সমুদ্রকে পিছনে ফেলে উল্টোমুখে চলে এসেছি আবার, তার ঠিক আগের বসতি রামু শহরের দিকে। আমাদের নিয়ে চলেছেন নতুন পাওয়া বন্ধু জাফর আহমদ হানাফি।

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক এই হানাফি। নিজের নামটাকে সব সময়েই লেখেন জাফার আহমাদ, কেননা জাফর বা আহমদ লিখলে শব্দগুলি তার যথার্থ আরবি রূপ পায় না বলে তাঁর ঘোর বিশ্বাস। সজ্জন, সুপারিবারিক, অতিথিবৎসল এই মানুষটি কথা বলেন নিরন্তর, আকর্ষক সেসব কথার মধ্যে ওতপ্রোত জড়ানো থাকে ইতিহাস-ভূগোল-ভাষাতত্ত্ব। তাঁর একেবার নিজস্ব চর্চার বিষয় হল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতীয় বৃত্তান্ত। অচিরেই আমাদের সমস্ত দায়িত্ব হাতে তুলে নেন তিনি, আর কক্সবাজারে পৌঁছবার দেড়ঘণ্টার মধ্যেই নিয়ে চলেন রামুর দিকে, পুরনো এক বৌদ্ধমন্দির দেখাবার জন্য।

‘কিন্তু তার আগে’-বলেন হানাফি-‘চলেন এই কলেজটা একবার ঘুরে যাই।’ কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম ফিরে যাবার ঝকঝকে পিচের মসৃণ চওড়া রাস্তাটা থেকে হঠাৎ একটু ডাইনে বেঁকে যায় গাড়িটা, তিনদিকে ছড়ানো প্রান্তরের মধ্যে গাছগাছালি ঘেরা লম্বাটে একখানা দালানের সামনে দাঁড়ায় এসে, গাড়ি থেকে নামতে নামতে জানতে পাই এ হল বছর তিনেক আগে শুরু করা রামু কলেজ। এ কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা না বললে কক্সবাজারে বেড়ানোটা সম্পূর্ণ হতে পারে না: এই হচ্ছে হানাফির অভিমত।

অধ্যক্ষের নাম মোশতাক আহমদ। ইংরিজির এই অধ্যাপক তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে জীবিকাজগতের বাইরে ছিলেন কিছুদিন, কেননা কর্তৃমহলের কোনও কোনও আচরণকে খুবই নীতিভ্রষ্ট মনে হচ্ছিল তাঁর। রামু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এখানকার নিযুক্ত অধ্যাপকেরা কেউ কেউ তাঁর প্রাক্তন ছাত্র, সানুনয়ে তাঁরা তাঁদের শিক্ষককে ধরে এনেছেন কলেজের দায়িত্ব নেবার জন্য, আর নতুন কিছু গড়ে তোলবার সম্ভাবনায় অনেক স্বপ্ন নিয়ে তিনিও চলে এসেছেন খুশি মনেই।

খুব বেশি ছাত্রছাত্রীর দরকার নেই তাঁর, মোশতাক ভাবেন। শৃঙ্খলা দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বিদ্যাচর্চার আনন্দ দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চান এই কলেজ। অসম্ভব কি তা? অসম্ভব কেন মনে হবে তাঁর, অনেক ঝুঁকি নিয়ে যিনি একদিন চলে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেনা হয়ে? ‘চারপাশের অবস্থা ভালো না। কোন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে দেশে, এরা সব ভুলে গেছে তা। কিন্তু এর মধ্য থেকেই ভালো কিছু

গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ তো নিতেই হবে আমাদের, কী বলেন?' ঠিক, সেই গড়ে তোলার আবেগে মোশতাক ভাবেন যে শিক্ষার চাই পরিবেশের সঙ্গে যোগ। ছেলেমেয়েদের চাই প্রকৃতির সঙ্গে লগ্নতা। 'আমি তো ভেবেছি বাইরের ওই গাছগুলি আরেকটু বড় হলে তার চারপাশে গোল করে বাঁধিয়ে নেব বেদি, ক্লাস হবে সেইখানে, শান্তিনিকেতনের মতো। এখনই অবশ্য মাঝে মাঝে ক্লাস নিই বাইরে। রবীন্দ্রনাথই ঠিক ঠিক জানতেন কীভাবে শেখাতে হয় লেখাপড়া।' বলতে থাকেন মোশতাক: 'সরকারের কাছে আমরা কতটুকুই আর দাবি করি বলেন। আমরা তো চাই মোটামুটি একটা সুখী সচ্ছল দেশ? তার তো পূর্বশর্তই হল শিক্ষা। শিক্ষা না থাকলে হবে কিছু? তা সেদিকেই এদের নজর নাই। যে কোনও মূল্যে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ ফিরাতে হবে স্কুল-কলেজে, আর সেইজন্য সংস্কৃতিচর্চায় উৎসাহ দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। ভাবেন তো, যে গান ভালোবাসে, যে কবিতা ভালোবাসে, ভালোবাসে ফুল পাখি নদী-সে কি কখনও সন্ত্রাসী হতে পারে? সেই ভালোবাসাটাই তো তৈরি করে দিতে হবে ছেলেমেয়েদের মনে?'

চা খেয়ে উঠে আসছি যখন, বিশাল হাতের থাবায় আমার হাতটা ধরে নেন মোশতাক, বলেন: 'আপনাদের যেন শুভেচ্ছা পাই এই কাজে।'

শুধুমাত্র শুভেচ্ছায় কী হবে? 'চতুরঙ্গ'র জ্যাঠামশাইয়ের মতো বলতে ইচ্ছে করে যে শুভেচ্ছাতে আমার 'সিকি পয়সার বিশ্বাস' নেই। কিন্তু এই কলেজের ভবিষ্যৎ কী হয়, তা নিয়ে একটা আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিশ্চয় বহুকালই জেগে থাকবে আমাদের মনে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ঘোর দুপুরবেলায় আমরা এসে পৌঁছে গেছি রামু নামের ছোট্ট শহরে। আসবার সময় পথের নানা বাঁকে ঘুরেফিরে বারে বারেই একটা নদীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের, কেননা সেই নদীও বাঁক নিতে নিতে ঘুরে চলেছে কেবলই। 'আর সেইজন্য'-হানাফি বলেন-'এর নাম বাঁকখালি'।

নামের সঙ্গে তার তাৎপর্যকে মিলিয়ে নেবার অভ্যাস অবশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি গড়িয়ে গেছে ও অঞ্চলে। রামুর যে মন্দিরের দিকে আমরা চলেছি, সেখানে ছোট একটা জলাশয় ঘিরে পাঁচ-পাঁচটা বটগাছ। তাহলে কি পঞ্চবটীই হল না? আর, এর মাইল কয়েক দূরে, টেকনাফের দিকে যেতে, একটা জনপদের নাম হল মরিচ্যা। এ তো নিশ্চয় মারীচ শব্দেরই স্থানীয় রূপ? তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে এ হল সেই জায়গা যেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দিন কাটাতেন বনবাসে। এই সেই পঞ্চবটী। আর সোনার হরিণকে তাড়া করতে করতে মরিচ্যার কাছে গিয়েই রাম তাকে মেরেছিলেন নিশ্চয়, সেইজন্যই তার ওইরকম নাম।

এসব কল্পকথা শুনে হনুমানের বিষয়ে সম্ভ্রম আরও বেড়ে যায় নিশ্চয় অনেক দূর? ভাবুন একবার ব্যাপারটা, কন্যাকুমারিকা থেকে নয়, একেবার এই কক্সবাজার বা টেকনাফ থেকেই হয়তো তাকে লাফ দিতে হয়েছিল লঙ্কায়!

এমন সব গল্পের প্রচলন থেকেই মন্দির, না কি মন্দির থেকেই এমন সব গল্পের প্রচলন, তা অবশ্য জানি না। রামুর বৌদ্ধমন্দিরের প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো আছে একটা রামমন্দির, আর তার মধ্যে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের যৌথ বিগ্রহ। কেবল সে বিগ্রহের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে আমরা আরাকান সীমান্তের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি, কেননা সেই রাম বা সীতা বা লক্ষ্মণের মুখের আদলে চিহ্নিত হয়ে আছে বেশ একটা বর্মি-বর্মি ভাব।

'আরাকান' শব্দটায় পৌঁছে মনে পড়ে যে রামু শহরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল 'রাজর্ষি' উপন্যাসে। রাজ্য থেকে নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্য যখন চট্টগ্রামে এসে পৌঁছন, সে অঞ্চল তখন ছিল আরাকানের অধীন। পার্বত্য অঞ্চল থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন গোবিন্দমাণিক্য, রামু তখনও দশ ক্রোশ দূরে, এক গরিবঘরে আশ্রয় নিলেন তিনি। পুজোর দিনেও সে ঘরের ছোট ছেলেটির কোনও আবদার মেটাতে পারে না তার বাবা, অগোচরে সে কথা জেনে গোবিন্দ্যমাণিক্য চলেছেন ছেলেটির জন্য একখানা রাঙা শাল কিনতে। কিন্তু চলেছেন কোথায়? 'রামু শহরের অভিমুখে'। এই সেই রামু, গোবিন্দমাণিক্য যেখান থেকে না কি রাঙা শাল কিনে এনেছিলেন একদিন, আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আছি আজ।

ওই গরিবঘর থেকে গোবিন্দমাণিক্য পরে চলে গিয়েছিলেন রামুরও দক্ষিণে রাজাকুলের কাছে মগদের এক দুর্গে। এই দুর্গেই তিনি নির্বাসিত সুজা আর তাঁর মেয়েদের আতিথ্য দেন, এখানেই গড়ে ওঠে দুই নির্বাসিতের সখ্য। দুজনকেই নির্বাসন দিয়েছেন তাঁর ভাইয়েরা। গোবিন্দমাণিক্যের দুর্ভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে সুজা বলেছিলেন: 'আর সকলেই অতি সহজে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।'

এটা তবে নির্বাসিতদেরই জায়গা! রামও যে এইখানে চলে আসবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

রামুরও চেয়ে সেই দক্ষিণে যাব আমরা কাল। গোবিন্দমাণিক্যের রাঙা শালের গল্পকথা আর নির্বাসিত রামচন্দ্রের কল্পকথার ভূমিতে দাঁড়িয়ে আজ আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি দুই দিকে দুই টিলা, একটিতে রামমন্দির আর অন্যটিতে বুদ্ধ।

টিলার ওপর উঠে একটা আশ্রম, রামকোট বনাশ্রম এর নাম। সেই আশ্রমে আছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা, আছে বুদ্ধমন্দির। রামকোট অথবা রামকূট থেকে রামু নামটা পৌঁছে

গেছে তবে। না কি উল্টোটাই? রামুও কি মূল নাম ছিল? এর সঙ্গে বুদ্ধেরই বা কী যোগ? রামের সঙ্গে বুদ্ধের?

সে যোগের একটা আভাস হয়তো পাওয়া যায় স্নিগ্ধ বুদ্ধমূর্তিটির সামনে এসে দাঁড়ালে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দাবিমতো এই মূর্তি প্রায় দুহাজার বছরের পুরনো। তৈরি হয়েছিল না কি অশোকের সময়ে, আর তৈরি হয়েছিল বুদ্ধের এক পঞ্জরাস্থির ওপর। সে অস্থির প্রতিশব্দ রাংফু।

তাহলে কি সেই রাংফু থেকে রামু? আর সেই রামু থেকে রামকোট বা রামকূট? আর এইভাবে রাম নাম পাওয়া গেল বলে বিপরীত টিলায় এক বৌদ্ধস্তূপের পাশেই গড়ে তোলা হল রামমন্দির? সে মন্দিরটা যে কত পুরনো, তার অবশ্য নিশ্চিত কোনও হদিশ দিতে পারেন না তার সেবায়েত।

বেশ বড় রকমেরই একটা বৌদ্ধ সমাবেশ যে ছিল রামুর এই অঞ্চলে, তার নিত্যনতুন নজির আজও পাওয়া যায় এই টিলাগুলির এধারে ওধারে। হানাফি, আর এ অঞ্চলের দেখাশোনা করেন যে বড়ুয়া, এঁরা দুজনেই দেখাতে থাকেন নতুন নতুন খুঁড়ে তোলা দেড়-দু ইঞ্চির অনেক বুদ্ধমূর্তি, ব্রোঞ্জের তৈরি, মাটি থেকে তুলে নিয়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে খেলা করে তা নিয়ে। আরও অনেক বড় কীর্তিও হয়তো এখানে আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে আজও, এরকমই ভাবছেন এঁরা।

কিন্তু খুবই বিস্ময়ের কথা, প্রাচীনতার চিহ্ন মাখানো গায়ে গায়ে লাগা এই দুই টিলার মাঝখানে, বুদ্ধ আর রামের মাঝখানে, দাঁড়িয়ে আছে অত্যাধুনিক এক স্থাপত্য। খুবই শোভন সেই স্থাপত্য। কিন্তু এইখানে, এই পরিবেশের মধ্যে, একে মনে হয় যেন প্রক্ষিপ্ত। গর্ব করে বলেন বড়ুয়া: 'বাড়িটা দেখুন, ভেতরের ব্যবস্থা একটু ভালো করে দেখুন।' ভালো করে দেখি আমরা সবাই। চোখজুড়ানো সুব্যবস্থার কোনও অন্ত নেই, কিন্তু স্থান-নির্বাচনের অসংগতি ছাড়াও আরও একটা জটিলতার কথা মনে হয় এখানে এসে দাঁড়ালে।

ইতালীয় সরকারের টাকায় ফরাসি স্থপতির নির্দেশনায় তৈরি হয়ে উঠেছে এই বাড়ি, ছাত্রনিবাস। কাদের জন্য? ভব্যসমাজের ছোঁয়া না-লাগা অনগ্রসর আদিবাসীদের অনাথ ছেলেমেয়ের জন্য। সেই ছেলেমেয়েরা এখানে থেকে বড় হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, ভব্যতা শিখছে। একইসঙ্গে চর্চা চলছে স্বাবলম্বনের, সংস্কৃতির। নির্দেশ পাওয়া মাত্র খোলা জায়গায় অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে পারে এরা, অপরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলে সভ্য কানুনমতো ত্বরিতে নমস্কার জানাতে পারে এরা। কিন্তু এদের চারদিকে সর্বময় স্বাচ্ছন্দ্যের যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখা গেল, যে আধুনিকতার আবহাওয়া, তার মধ্যে বেড়ে উঠে এরা

কি আর সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারবে কোনওদিন? তাদের নিজেদের সমাজ থেকেও যেমন একটা বিচ্ছেদ এদের পক্ষে অনিবার্য, অন্য সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়াও তেমন সহজ হবে না হয়তো। কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তখন এরা, সযত্নলালিত এই অনাথেরা, যার মধ্যে রাখাইনও আছে অনেক?

রামু থেকে ফিরে আসবার পথে এই প্রশ্নটাকে মন থেকে তাড়াতে পারি না আমরা। মনে হয়, ওরা যে কেবল বুদ্ধ আর রামের দুই ভিন্ন মূর্তির মাঝখানে পড়ে আছে তা নয়, পড়ে আছে ভিন্ন দুই সমাজেরও মাঝখানে। শেষপর্যন্ত কোনখানে গিয়ে যে পৌঁছবে এরা, কারও কাছেই খুব স্পষ্ট নয় সেটা।

সুজার অবশ্য রাজাকুলেও থাকা হয়নি বেশিদিন। ঔরঙ্গজেবের রোষ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁকে আরাকানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গোবিন্দ্যমাণিক্য। দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে সরতে সরতে দেখা দেবে নাফ নদী, তার ওপারের পর্বতমালায় আরাকান। দুই দেশের সীমান্ত চিহ্নিত হয়ে আছে ওই নদীতে। তার এপারের উচ্চভূমি বা টেক, সেইখানে আজকের বাংলাদেশ শেষ। আজ আমরা চলেছি সেই টেকনাফের দিকে।

কক্সবাজারের দীর্ঘ সৈকতের ঠিক সমান্তরাল নতুন একটা সড়ক তৈরি হচ্ছে একেবারে টেকনাফ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য। হয়তো আর দুয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেই পথ, সমুদ্রজলের পাশ দিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যাবে অতটা দূর। সে খুব মনোরম পথ হবে নিশ্চয়, কিন্তু মনে হয় না যে এখনকার পথটাও রম্যতার দিক থেকে তেমন কিছু কম। কক্সবাজার থেকে আরও একবার রওনা হওয়া গেল রামুর দিকে, কিন্তু রামু পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ডানদিকে বেরিয়ে গেছে টেকনাফে যাবার এখনকার পথ, মরিচ্যারই ওপর দিয়ে চলে যাবে সেটা। হানাফির কাছে অগ্রিম শুনে নিয়েছি মাইলের পর মাইল দুধারে গর্জনগাছের সারি, কখনওবা চাষ-আবাদের খেত, লবণ খেত কখনওবা, আর তারপর নাফ নদীর কূল ধরে ধরে সমুদ্র পর্যন্ত বয়ে যাওয়া সেই পথ। এই বিচিত্রতাও কি সুন্দর নয় যথেষ্ট?

হানাফি বলেন: 'মুশকিল কী জানেন, এই রাস্তাটায় এখন ডাকাতের বড় হাঙ্গামা। এই তো ঈদের আগের দিনই হয়ে গেল বিরাট ডাকাতি, একটা গাড়ি থেকে যথাসর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিল।'

'এখন তো দিনেরবেলা'-তাঁকে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বলি।

'আরে দিনের বেলাতেই তো। রাতের দিকে তো এদিকে আসেই না কেউ ভয়ে!'

হানাফি গাড়ি চালাচ্ছেন, সঙ্গে আছেন তাঁর চাকমা স্ত্রী হেলেন আর তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলে। ছেলেটি সমস্ত পথ তার ভিডিও খেলনা নিয়ে ব্যস্ত, আর আমাদের অবিবাহিত সঙ্গীবন্ধু টুলু কেন বিয়ে করছেন না এই নিয়ে মশকরা করছেন হেলেন, আর আমাদের সবসময়েই কোনও না কোনও গল্পে মশগুল রাখছেন হানাফি। ডাকাতের গল্প কি সেইরকমই কোনও গল্প, পরিবেশটাকে সরস রাখবার আয়োজন কেবল?

কিন্তু না, হানাফির চোখের সঞ্চালন দেখে সেটা ঠিক মনে হচ্ছে না আর। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি: 'ওটা কী গাড়ি গেল হেলেন, ওই যে ওভারটেক করল? দেখলে কিছু?'

'আরে না না, ও তো ছোট একটা গাড়ি।'

ছোট গাড়ি বড় গাড়িতে কী প্রভেদ? জানা গেল তখন, ডাকাতদের ডাকাতি করবার করণকৌশল। একলা কোনও গাড়ি দেখলে একটা মাইক্রোবাস নিয়ে ধাওয়া করে তারা, টপকে যায় গাড়িটাকে, তারপর একেবারে নিঃসঙ্গ জায়গায় গাড়ি ঘুরিয়ে মুখোমুখি পথ আটকে দাঁড়ায়, আর তারপর রাহাজানি।

ঠিক সেই লোকালয়হীন দুর্বৃত্ত অঞ্চল দিয়ে চলছি এখন আমরা, সেই গর্জনগাছের সারি, সুমসৃণ পথ। এখন কি তবে ডাকাতদের কথা ভাবব আমরা? না, এই যে প্রায় শেষ হয়ে এল ভয়চিহ্নিত পথটা। সামনেই ছোট একটা বসতি আসছে মনে হয়। আর রাস্তার পাশে বসে বিক্রি করছে ওটা কী? বড়ই, বড়ই। কুল। কাজেই থামাতে হল গাড়ি। অম্লরসে দেখা গেল সবারই খুব আসক্তি।

গাড়ি থামল, আর আমাদের পাশ দিয়ে চকিতে বেরিয়ে গিয়ে একটা মাইক্রোবাস মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল ঠিক মুখোমুখি। এভাবে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় কেন ওরা? কুল কিনবার জন্য? কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গেই আবার পাশ কাটিয়ে গাড়িটা ফিরে গেল পিছনে, যে পথে সে এসেছিল। মিলিয়ে গেল দূরে।

কী হল ব্যাপারখানা? ডাকাতদের কি আমাদের ঠিক পছন্দ হল না? না কি আরও বড় কোনও দল আনতে ফিরে গেল ডেরায়? সে যাই হোক, কুল খেতে খেতে আমরা চলতে থাকি আবার।

নদী-সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি বলে বোঝা যায় এখন। এখন সারি সারি লবণখেত। আমাদের কারও কারও কাছে বেশ নতুন অভিজ্ঞতা এটা। ফসল ফলানোর জমিতে অফলা ঋতুতে মাটি নিকিয়ে তৈরি হয় জমি, জমানো হয় জল, দিনের পর দিন

সূর্যতাপে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় সেটা, তৈরি হয়ে যায় নুন। সে রকম নুন তৈরির নানা পর্যায় দেখতে দেখতে পৌঁছই আমরা উদবাস্তু অঞ্চলে।

হানাফি বললেন: 'ঠিক এইজন্যই বলছিলাম যে পথটা এখন খারাপ হয়ে গেছে। নদীর ওপার থেকে তাড়া খেয়ে দলে দলে মানুষ এসে বসতি করেছে এখানে, কোনও সুব্যবস্থাও নেই, নষ্ট এখন জায়গাটা। অবশ্য এবার একটা মীমাংসা হয়ে আসছে, ফিরেও যাচ্ছে ওরা আস্তে আস্তে। দুয়েকদিনের মধ্যেই আছে দুদেশের সীমান্তের ফ্ল্যাগমিটিং, রফা হয়ে গেছে, মিটে যাবে সব।'

নাফ নদীর ধার দিয়ে চলেছি আমরা। টলটলে নীল জলের ঠিক মাঝখান দিয়ে দেখা যায় যেন শাদা একটা টান। হতে পারে চোখের ভুল, কিন্তু ওইটেকেই না কি ধরে নেওয়া হয় দুদেশের সীমানারেখা। নদীর মাঝখানে, সবুজ একটা হরতনের মতো, একখণ্ড জমি পড়ে আছে শান্ত। তাকে ঠিক সামনে রেখে দাঁড়াই আমরা, ওই সবুজ হরতন, তার ওপারে সবুজ পাহাড়ের সারি। কাছেই একটা নদীপারের রেস্টহাউসে আমরা বসব এরপর।

কিন্তু সর্বনাশ, ওসব কী? রেস্টহাউসের দিকে সারি সারি ওসব নিশেন উড়ছে কেন? অল্প একটু তদন্ত করে হানাফি এসে জানালেন: 'যাঃ আজই তো দেখছি ফ্ল্যাগমিটিং। দুই দেশের সরকারি লোকেরা এসে গেছে এইখানে। এ অঞ্চলটা আজ সুরক্ষিত হয়ে আছে তাই। আমাদের আর ঢুকবার কোনও উপায় নেই ওখানে।'

শুনে মনে পড়ে গাড়ি থামানো গাড়িটার কথা, তার মানুষগুলির মুখ। তারা কি তবে ডাকাত ছিল না, ছিল পুলিশের লোক? সরকারি আয়োজন বলে নজর রাখছিল সবদিকে? আচ্ছা, গাড়িটা আমাদেরই কি তবে ভেবেছিল ডাকাত অথবা সন্ত্রাসী?

বেশ কয়েকটা দ্বীপ আছে কক্সবাজারের কাছাকাছি। সময় তত নেই বলে আমরা যাব শুধু ছ-মাইল দূরের মহেশখালিতে। সকালবেলায় হিলটপ সার্কিট হাউস থেকে অনেকটা দূর দেখে নিয়েছিলাম একসঙ্গে, শহর আর সমুদ্র। মহেশখালির প্রান্তরেখা দেখা যায় সেই চুড়ো থেকে। ঘাট থেকে স্পিডবোট নিয়ে নিলে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগবে মিনিট কুড়ি।

দ্বীপ শুনলে এখনও একটা মায়াময় ধারণা তৈরি হয় মনে। মনে হয় যেন সেখানে আছে কেবল গাছের সারি আর পশুপাখির দল, আর তার সজল ভূমির মাঝখানে ঘুরে বেড়ায় হয়তো ক্বচিৎ কজন মানুষ, সরল, শুশ্রূষাময়। সেটা যে একেবারে অলীক কল্পনা তা বুঝে নেওয়া শক্ত নয়, তবু একটু ধাক্কাই লাগে মহেশখালিতে প্রথম পা রেখে।

সামুদ্রিক হাওয়ায় কুড়ি মিনিট শরীর-মন ভিজিয়ে নেবার পর, আকাশজলের সুনীলিমায় চোখদুটোকে একেবারে মাখামাখি করে নেবার পর, স্পিডবোট ছেড়ে ডাঙায় উঠতেই সেই একইরকম শহুরে হুল্লোড় আর বাণিজ্যিকতায় যখন জাপটে ধরে আমাদের, কোন রিকশা আমাদের তুলে নেবে তা নিয়ে যখন পান্ডাসুলভ ছিনিমিনি চলতে থাকে প্রায়, হঠাৎ যেন অবসাদ ঘিরে ধরে তখন । প্রায় দেড়শো বর্গমাইল আয়তন যে দ্বীপের, জনসংখ্যা যেখানে প্রায় সওয়া দুলক্ষ, সেখানে এটা অপ্রত্যাশিত হওয়া উচিত নয় । তবুও, পাঁজর বার করা পথে ইটের খোঁচায় খোঁচায় অটোরিকশার চাকা লাফাতে থাকে যখন, মনে হতে থাকে ফিরে যাই আবার জলের দিকে । কিন্তু না, আমাদের দেখতে হবে পাহাড়ের ওপর আদিনাথের মন্দির ।

ছোটই পাহাড়, মাত্র তিনশো ফুট উঁচু, তার ওপর সরু পথে আরওই ছোট এক মন্দির । লোকে বলে পাহাড়ের নাম মৈনাক, রামায়ণে পড়া সেই মৈনাক । চারশো বছরের পুরনো মন্দিরের অপরিসর দুই ঘরের একটাতে শাদা পাথরের অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি, আর অন্যটাতে শিবলিঙ্গ ।

সূচনায় এ ছিল না কি নাথসম্প্রদায়ের কেন্দ্র, তাই আদিনাথ । পরে হিন্দু দেবদেবীর কল্পনা দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে একে । মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তার নামেই কি তবে মহেশখালির নাম? মহেশ থেকে মহেশখালি? নাকি মাছ থেকে? আমাদের ঠিক দুশো বছর আগে এ দ্বীপ জরিপ করতে এসেছিলেন যে সাহেব, ফ্রান্সিস বুকানন, তাঁর মনে হয়েছিল পাশের প্রণালীতে অনেক মাছ মেলে বলে এর নাম ছিল মাছখালি!

শ্রীহীন ওই মন্দির খুব টানে না আমাদের, আমরা সরে যাই তার পিছনদিকের নির্জনতায় । অল্প একটু ঢালু হয়ে পাহাড়ের ওপরেই একটা পুকুর হয়ে আছে সেখানে, পুকুরের সিঁড়িতে বসে আপনমনে গান গাইছে বিস্রস্তবাস এক যুবা, বেশ সুরেলা তার গলা । পুকুরটা ভরে আছে বেগুনি রঙের শাপলা ফুলে । মন্দিরপথের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে ধূলিধূসর যে দুটি কিশোর আমাদের সঙ্গ ধরেছিল আর কাতর অনুনয়ে বেচতে চাইছিল ফুল, তাদের সংগ্রহের উৎস তাহলে বোঝা গেল এবার ।

মন্দিরের পিছনের দাওয়ায় এসে দাঁড়াই আমরা, ছেলেদুটি ঠেস দিয়ে থাকে ফুলপাতাহীন এক গাছের কঙ্কালে । এখান থেকে মহেশখালির যে অংশটুকু দেখা যায় তার মধ্যে এখনও জেগে আছে কল্পনার দ্বীপ, নিঃসঙ্গ জমি অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রকে ছুঁয়ে আছে ওখানে । সেদিকে তাকিয়ে নাছোড় ছেলেদুটির সঙ্গে গল্প শুরু করি আমরা ।

সারাদিনই কি ফুল বেচো তোমরা?

না।

কী করো তবে? পড়াশোনা করো?

ইস্কুলে যাই।

কোন ক্লাস?

ফোর।

আজ যাওনি ইস্কুলে?

আজ ছুটি।

বাবা আছেন? বাবা কী করেন?

চাষ।

সবাই এখানে চাষ করে?

আমরা সবাই করি, বাঙালিরা সবাই করে না।

বাঙালিরা করে না? তোমরা বাঙালি না? নাম কী তোমার?

সুমন।

সুমন কী?

সুমন দে।

তাহলে তো বাঙালিই তোমরা।

না, আমরা হিন্দু।

বাঙালি তবে কারা?

ওরা, যারা রোজা রাখে, যারা নামাজ পড়ে।

তা কেন হবে, শুধু ওরাই কেন হবে, তোমরাও তো। তুমি তো বাংলাই বলছ। তাহলে তুমিও তো বাঙালি, তাই না?

কিন্তু ছেলেদুটি অবোধভাবে তাকিয়ে থাকে। আমাদের কথার কোনও মানেই খুঁজে পায় না তারা।

আর আমাদের মনে হয়, ইতিহাসের বৃত্ত তাহলে পূর্ণ হয়ে এল এবার। এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই একদিন বলা হত, শুনতে হত 'ওরা বাঙালি না, ওরা মুসলমান', আর আজ এই ছেলেদুটি বলছে 'আমরা বাঙালি না, আমরা হিন্দু'। কোথায় আমরা চলেছি, এখনও জানি না ঠিক। ট্রাকের পিছনদিকের সেই লেখনটা আরও একবার ভেসে উঠল চোখে।

মহেশখালি থেকে ফিরে আসবার স্পিডবোট ধরি আমরা।

ভ্রমণ মে, ১৯৯৭

পারাংলা অভিযান

সুনীলকুমার সরদার

এবছর জুন মাসের এক সন্ধ্যায় চড়ে বসলাম কালকা যাওয়ার ট্রেনে । আমাদের অভিযানের লক্ষ্য স্পিতি উপত্যকার পারাংলা অতিক্রম করে লাদাখের স্বপ্নের হ্রদ সো মোরিরি । এই অভিযানের উদ্যোগ ও আয়োজন শুরু হয় প্রায় আট-নয় মাস আগে । উদ্যোক্তা হিমালয়ান গিল্ড । মোট অভিযাত্রী নয়জন । সাতজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা । জুন মাসে কোনও ট্রেকার এর আগে এ পথে অভিযান করেননি । উপরন্তু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুইজন মহিলা । যাঁরা এত উচ্চতায় (১৮,৩০০ ফুট) কখনও ওঠেননি ।

আমাদের ট্রেন সিমলা পৌঁছতেই ছুটে গেলাম বাসের টিকিটের জন্য । ম্যালের বাঁ-ধারে হিমাচল পর্যটনের অফিসের পাশেই টিকিট কাউন্টার । এখান থেকেই কিন্নর ও স্পিতি যাওয়ার বাসগুলির টিকিট পাওয়া যায় ।

পরদিন ভোরে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই চড়ে বসলাম রেকং পিও-র বাসে । সিমলা থেকে দূরত্ব প্রায় ২৬১ কিলোমিটার । বাসভাড়া ১২৫ টাকা । নারকান্ডা, রামপুর, ওয়াংটু, টাপরি, করছাম হয়ে রেকং পিও পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল । শহরের বাসস্ট্যান্ডের আশপাশেই রয়েছে কয়েকটি সাধারণ মানের হোটেল । সেখানেই দুই রাত্রির বিশ্রাম ।

ভোরবেলা কিন্নর-কিন্নরী দেখার আশায় বেরিয়ে পড়লাম স্বর্গের খুব কাছের শহর কল্পার পথে । এখান থেকে কল্পার দূরত্ব মাত্র ১৩ কিলোমিটার । জিপসি, মারুতি, জিপে মাথাপিছু ভাড়া ১০ টাকা ।

শোনা যায়, যে সমস্ত অপ্সরারা দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় নাচের আসর মাতিয়ে রাখতেন, তাঁরা ছিলেন এই কিন্নর দেশেরই বাসিন্দা । তাই স্থানীয় লোকেরা এখনও নিজেদের দেবতার প্রতিবেশী বলেই মনে করেন ।

ছোট্ট পাহাড়ি শহর কল্পা । একদা এই কল্পাই ছিল কিন্নরের জেলা সদর । এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোলার নয় । সবুজ খেত ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে । আর শতদ্রু নদীর অপর পারেই রয়েছে সাদা বরফে ঢাকা কিন্নর কৈলাস । হঠাৎই চোখে পড়ল একটা

সবুজ আপেল বাগানের মাঝে নানা রংবেরঙের কাগজ ও কাপড় দিয়ে সাজানো এক দোতলা বাড়ি। দূর থেকে ভেসে আসছে হালকা মাদলের আওয়াজ।

সময় নষ্ট না করে ক্যামেরা নিয়ে পৌঁছে গেলাম ওই বাড়ির দোরগোড়ায়। সামনেই সাজানো রয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা আখরোট কাঠের সোফা, খাট, আলমারি ও টেবিল। এর সঙ্গে রয়েছে পেতলের বড় বড় ডেকচি, হাঁড়ি ও রান্নার নানা সরঞ্জাম। আবার পাশেই রয়েছে কয়েকটা কুড়ুল ও কাস্তে। পরে জেনেছিলাম এগুলি মেয়ের বাড়ির যৌতুক। সামনের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন আজ তাঁর বোনের বিয়ে। কিন্নরী বিয়ের অনুষ্ঠান দেখা এবং ছবি তোলার লোভ সামলাতে না পেরে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব বলে এগিয়েছি। তার আগেই ভদ্রলোক তাঁর বোনকে ডেকে আনলেন দরজার সামনে এবং উভয়ে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে এলাম অন্দরমহলের দোতলার একটা বড় ঘরে। সেখানে প্রায় ১৫-২০ জন কিন্নরী একে অপরের হাত ধরে একটা গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছে। আমরাও যোগ দিলাম সেই আনন্দনৃত্যে।

বাড়ির লাগোয়া বাগানে শামিয়ানার তলায় চলছে রান্নার আয়োজন। কোথাও বড় বড় ডেকচিতে বসেছে ভেড়ার মাংস, কোথাও ভাজা হচ্ছে পনির, আবার কোথাও বা কিন্নর-রমণীরা রুটি তৈরিতে ব্যস্ত। সেখানে যাওয়া মাত্রই এক কিন্নরী একটা বড় কেটলি নিয়ে হাজির, আমাদের মাখন চা খাওয়াবে।

বাড়ির স্বল্প দূরে একটা সুন্দর গোলাকার মাঠের মধ্যে আবার নাচ শুরু হয়। প্রথমে কনে ও কন্যাযাত্রীরা ও পরে বর ও বরযাত্রীরা এসে যোগ দেয় ওই দলে। শুরু হয় নাচের প্রতিযোগিতা। মিহি বাঁশির সুর। কিন্নরীদের সুমিষ্ট সুর আর মাদলের তালে তালে নাচ সমস্ত আকাশ-বাতাসকে মুখর করে তোলে। নাচের গতি ক্রমশ উদ্দাম হতে লাগল।

এর মধ্যেই ভোজনের নিমন্ত্রণ পেলাম। আমরা না খেলে বিয়েবাড়ির অমঙ্গল। স্ত্রী এবং পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক ঘরে খাবার আয়োজন করা হয়েছে। কুশাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দুই হাস্যময়ী কিন্নরী এগিয়ে এলেন। একজনের হাতে তোয়ালে, সাবান ও পিতলের জলের জগ, অপরজনের হাতে একটা সূক্ষ্ম কারুকার্য করা সোনালি রঙের পাত্র। অতি যত্নসহকারে প্রত্যেক অতিথির হাত ধুইয়ে দিলেন। এই ভোজনের প্রধান খাবার হল রুটি, ভাত আর ভেড়ার মাংসের ঝোল। পুরুষদের জন্য আলাদা একটা উপকরণ আছে, নাম ছাং। এটি একপ্রকার দেশি মদ। ভোজনের শেষে অনুষ্ঠানে পৌঁছে দেখি তখন আশীর্বাদ ও যৌতুক প্রদানের পর্ব চলছে। বরের ডানপাশে বসে রয়েছেন মা-বাবা ও ভাই

এবং বাঁপাশে বসে আছেন কনে ও কনের বোন । বাড়ির লাগোয়া বিশাল জায়গাটা যেন অপ্সরাদের ভিড়ে ঠাসা ।

বেলা প্রায় শেষ, ফেরার পালা । বিদায় জানাতে এগিয়ে এলেন কনের এক আত্মীয় । ভদ্রলোককে বিদায় জানিয়ে একটা ফাঁকা বাসে চড়ে রেকং পিও-র মূল বাসস্ট্যান্ডে ফিরে এলাম কাজা যাওয়ার বাসের আগাম টিকিট কাটব বলে । কিন্তু টিকিটদাতা জানালেন, সিমলা থেকে রাতে ছেড়ে এখানে ভোররাতে পৌঁছনোর পর খালি সিট অনুযায়ী টিকিট দেওয়া হয় লাইনের মাধ্যমে । তিনি আমাদের পরদিন ভোর পাঁচটা-ছটা নাগাদ ওখানে লাইন দেওয়ার উপদেশ দিলেন ।

পরদিন টিকিট সংগ্রহ করে কাজার ভিড়-বাসে পাড়ি দিলাম । শতদ্রু নদীকে ডানধারে রেখে হিন্দুস্থান টিবেট হাইওয়ে ধরে গাড়ি রুক্ষ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল । পুহ (২,৮৩৭ মিটার) ছাড়িয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম শতদ্রু ও স্পিতি নদীর সঙ্গমস্থল খাব-এ । এখান থেকে একটা পায়ে-হাঁটা পথ ভারত-তিব্বত সীমান্তে শিপকি-লার দিকে চলে গেছে । কাংথাং-এ (৩,৮০০ মিটার) দুপুরের আহার সেরে ফেলি । গাড়ি আবার চলতে থাকে । সামদো থেকে মূল হাইওয়ে চলল কৌরিক সীমান্তে আর স্পিতি নদীকে অনুসরণ করে গাড়ি কাজার পথ ধরল । এখানে ডানদিক থেকে পারে-চু নদী এসে মিশেছে স্পিতি নদীর সঙ্গে । পথে পড়ে টাবো ও ডানকার নামে দুটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ভা । ১৫৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সন্ধে নাগাদ এসে পৌঁছলাম কাজায় (৩,৬০০ মিটার) । আশ্রয় নিলাম বাসস্ট্যান্ডের গায়েই এক হোটেলে ।

কাজা স্পিতির সদর শহর । রুক্ষ পাহাড়ের মধ্যে বিশাল সবুজ খেত । চোখ জুড়িয়ে যায় । কাজায় বেশ কয়েকটা ভালো হোটেল আছে, বাজারটাও বড় । মনোহারী দোকানগুলো দেখার মতো, আধুনিক উপকরণের প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায় । পরদিন সকালে ইনারলাইন পারমিটের জন্য সাব ডিভিশনাল ম্যানেজারের অফিসে হাজির হলাম । ছবি সহ প্রত্যেকের আবেদন তৈরিই ছিল । আর ছিল পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট এবং আই এম এফ-এর চিঠি । কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখান থেকে আমাদের পাঠানো হল স্থানীয় থানায় । পারমিট পেতে প্রায় চারটে বেজে গেল ।

পরদিন ভোরে মালপত্র নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি, কোনও বাসের চিহ্ন নেই । কাজা থেকে কিব্বের একদিন অন্তর বাস যায়, ওইদিন বাস যাওয়ার কথা । অগত্যা দুটি জিপ নিয়ে কিব্বের রওনা দিলাম । দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার, ভাড়া ৮০০ টাকা । কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম স্পিতি নদীর ওপর একটা ব্রিজ । ট্যাক্সিচালক জানাল, ওই পথ লোসার (৪,০৭৯ মিটার), কুনজুমলা (৪,৫৫১ মিটার), গ্রাম্ভু হয়ে চলে গেছে মানালি । এই রাস্তা

দিয়ে কেলংও যাওয়া যায় । ৭ কিলোমিটার দূরে রয়েছে স্পিতি উপত্যকার বিখ্যাত গুম্ভা কি (৪,১১৬ মিটার) । কিব্বেরের রাস্তা ছেড়ে ডানধারে প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার ওপরে এর অবস্থিতি । ওপরে পৌঁছে দেখলাম নতুন একটা পূজাগৃহ তৈরি হচ্ছে । একটা বড় লম্বা করিডোরের মধ্য দিয়ে হাজির হলাম মন্দির প্রাঙ্গণে । বাঁ-ধারে তখন 'ওঁ মণিপদ্মে হুম', ধ্বনির সঙ্গে ধর্মচক্র ঘুরে চলেছে । এখানে এক অভিজ্ঞ লামা জানান, এই গুম্ভা প্রায় সাতশো বছরের পুরনো । গুরু পদ্মসম্ভবের এক শিষ্য এই গুম্ভার প্রতিষ্ঠাতা । এখন গুম্ভার প্রধান লামা মারা গেছেন নতুন প্রধান লামা হিসাবে পাঁচ-ছয় বছরের একটি শিশুর সন্ধান চলছে । গুম্ভার ছাদ থেকে স্পিতি উপত্যকাকে অপরূপ লাগে । চারধারে অজস্র রুক্ষ পাহাড় । তাদের অধিকাংশই ঢেকে রয়েছে সাদা বরফে । বিশাল রুক্ষতার মাঝে ছোট ছোট সবুজের ছোঁয়া । বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ এসে পৌঁছই কিব্বেতে (১৪,৪৬০ ফুট) । বাসরাস্তার ওপর ভারত তথা এশিয়ার সর্বোচ্চ গ্রাম ।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়ি এসে পৌঁছল বাসরাস্তার শেষপ্রান্তে । সামনেই একটা ধ্বংসপ্রায় চোর্তেন, তারই মাঝে ছোট একটা হলুদ বোর্ডে কালো কালি দিয়ে লেখা কিব্বের, উচ্চতা ১৪,৪৬০ ফুট । আমরা পৌঁছলাম বাসরাস্তার ওপর অবস্থিত ভারতের তথা এশিয়ার সর্বোচ্চ গ্রামে । এখান থেকে পুরো গ্রামটা লক্ষ করা যায় । একটা অর্ধগোলাকৃতি রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে দুই-তিনতলাবিশিষ্ট অনেকগুলি ঘরবাড়ি । তার পিছনেই প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি । গ্রামের ঠিক অপরপারেই রয়েছে একটা বড় সবুজ খেত । ঘন নীল আকাশের নিচে এই সবুজের ছোঁয়া কিব্বেরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে । বর্তমানে এখানে বিদেশিদের আনাগোনার ফলে তিনটি হোটেল গড়ে উঠেছে । বাসস্ট্যান্ডের সামনেই হিলটপ আর গ্রামের মাঝে রয়েছে পারাংলা গেস্টহাউস ও হোটেল রেইনবো । শেষেরটিকেই আমাদের কদিনের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিই । ঘরভাড়া ১০০ টাকা ।

পরদিন বেরিয়ে পড়লাম গ্রামটা ঘুরে দেখব বলে । পাশেই কিব্বের সরকারি হাই স্কুল । শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি । সেকেন্ডারি স্কুল ।

হাজির হলাম কিব্বেরের স্কুল প্রাঙ্গণে । তখন ছাত্রছাত্রীরা সবে প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু করেছে । সুর শুনে অবাক । তারা গেয়ে চলেছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে.........' । পরিচয় হয় স্কুলের শিক্ষক মদনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে । ইনি সমতলের লোক । চাকরির খাতিরে এখানে এসেছেন । তাঁর কাছেই জানা গেল, স্কুলের মোট ছাত্রের সংখ্যা ৩১ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২২ । তিনি জানালেন যে শীতে সমস্ত গ্রামটা যখন বরফে ঢেকে থাকে, তখনও স্কুল খোলা থাকে, তবে ক্লাসঘরকে গরম রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।

এখানে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি । গ্রামের উত্তরের প্রায় শেষপ্রান্তে উঁচু পাহাড়ের ঢালে রয়েছে আরেকটি প্রাথমিক স্কুল ।

হোটেলেই পরিচয় হয় তেনজিং সেরিংয়ের সঙ্গে । পেশীবহুল চেহারা, চোখে কালো চশমা, মাথায় খয়েরি রঙের টুপি । সে একজন ঘোড়া ব্যবসায়ী এবং প্রায় বারো বছর ধরে সে ঘোড়া নিয়ে পারাংলা, রূপসু উপত্যকায় যাচ্ছে । তাই পারাংলার পথ তার মুখস্থ । তার পেশীবহুল চেহারা এবং সুন্দর হিন্দি বলার ভঙ্গিমা আমাদের মুগ্ধ করে এবং তখনই ঠিক করে ফেলি তেনজিং রাজি হলে আমরা তাকেই আমাদের গাইড হিসাবে সঙ্গে নেব । মনের কথাটা তাকে জানাতে সে রাজি হল বটে, তবে পারাংলা গিরিবর্ত্ম পার করে সে আবার ফিরে আসবে, বাকি পথটা আমাদের গাইড হিসাবে কাজ করবে তারই খুব পরিচিত দুইজন মিউলম্যান ।

পরদিন সকালে তেনজিংকে সঙ্গে নিয়ে চিচেম গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম । গ্রামটা পশ্চিমপ্রান্তে । পথ চলার ফাঁকে তেনজিংয়ের সঙ্গে নানা আলোচনা চলল । বুঝতে পারলাম সে শুধু একজন ধনী ব্যবসায়ী নয়, শিক্ষিতও বটে । তার কাছে জানতে পারি স্পিতিবাসীরা ধর্মে বৌদ্ধ । তবে তাদের মধ্যে জাত-পাতের পার্থক্য আছে । তাই এক জাতের সঙ্গে ভিন্ন জাতের বিবাহ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না । এছাড়া তাদের সমাজব্যবস্থায় একমাত্র বড়ছেলেই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় । তাই ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা আলাদা হয়ে যান । কেবল মেজছেলে তার সঙ্গে থাকতে পারে । ছোটছেলেকে গুম্ভায় গিয়ে লামা হতে হয় । পড়াশোনা ও খাওয়ানোর দায়দায়িত্ব গুম্ভার । পুত্রহীন অবস্থায় যদি বড়ছেলে মারা যায় তখন মেজছেলেই ওই সম্পত্তির মালিক হয় । আবার বাবা-মা-র মৃত্যু হলে সেই সম্পত্তি পায় বড় ছেলে । এই প্রথার নাম খাং চেন । পারিলুম্বি নালা পেরিয়ে একটা বিশাল চড়াই ভেঙে সবুজ খেতের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছলাম চিচেম গ্রামে । কিব্বেরের সম-উচ্চতায় অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম । এখানের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন, তিনটি স্কুল আছে ।

এই গ্রামের শেষপ্রান্তে তেনজিংয়ের বন্ধু লবসাং গিয়ালজেনের বাড়ি । সেও একজন ঘোড়া ব্যবসায়ী এবং প্রতিবছর রূপসুতে ঘোড়া বিক্রি করতে যায় । বর্তমানে সে খুবই দুঃখের মধ্যে আছে, কারণ তার দুই স্ত্রীর একজন মারা গেছে এবং অন্যজন তাকে ত্যাগ করেছে । তেনজিং আমাদের সেখানে নিয়ে গেল । তেনজিং জানাল যে, ওখান থেকে দুমলা গ্রাম হয়ে কিব্বের ফিরব । জানতে হবে, কোনও চাংপার দল রূপসু থেকে ভেড়ার পাল নিয়ে পারাংলা পেরিয়ে এখানে এসেছে কিনা, যদি এসে থাকে, তবে জানব আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন । কারণ, কয়েকশো ভেড়া একসঙ্গে চলার ফলে বরফের ওপর একটা পথ

তৈরি হয়, ফলে ট্রেকারদের কাছে ওই পথটা হয় অনেক সহজ ও মসৃণ। দুমলায় কোনও চাংপা বা ভেড়ার দল চোখে পড়ল না। কয়েকজন মহিলা খেতের কাজে ব্যস্ত। কয়েকদিনের মধ্যে চাংপারা এখানে এসেছে বলে তাদের জানা নেই। একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম কিব্বেরে। সন্ধ্যায় তেনজিংয়ের বাড়িতে তিব্বতি নুন-চা খেলাম। ইয়াকের দুধের মাখন ও নুন দিয়ে তৈরি এই চা-কে ছ্যাজা বলে। ঠিক হল পাঁচটা গাধা (ভাড়া ১০০ টাকা প্রতিদিন) ও দুজন মিউলম্যান (পারিশ্রমিক ২২৫ টাকা প্রতিদিন) আমাদের মাল বয়ে নিয়ে যাবে, আর তেনজিং পারাংলা অবধি গাইডের কাজ করবে।

পরদিন ভোরবেলা শুরু হয় আমাদের মূল ট্রেকিং। প্রথমদিন মালপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে বের হতে প্রায় সাড়ে সাতটা হয়ে গেল। কিব্বের গ্রামের সবুজ খেত পেরিয়ে একটানা উতরাই পথে নেমে এলাম পারিলুম্বি নালায়। নুড়ি পাথরের দেওয়াল আর কাঠের পাটাতন বিছানো একটা নড়বড়ে ব্রিজ পেরিয়ে সোজা চড়াই পথে উঠতে লাগলাম। বেশ কিছুটা চলার পর আবার উতরাই। সামনেই সবুজ খেত। জায়গাটার নাম দুমল, স্থানীয় ভাষায় একে বলে দুগরি অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন আবাস। বিশাল খেতের আশপাশে তিন-চারটে বাড়ি। তেনজিং জানায়, রূপসুতে যাওয়ার আগের রাতে তারা এখানে নাচ-গানের আসর বসায়। কিছুক্ষণের বিশ্রাম ও দুপুরের আহার সেরে আবার হাঁটা শুরু করি। থালডক অবধি সমস্তটাই প্রায় চড়াই। একে প্রথমদিন, তার ওপর এই প্রচণ্ড চড়াই। মহিলা অভিযাত্রী দুজন বেশ কাহিল হয়ে পড়েন। ফলে থালডক পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে যায়। থালডক একটা পাহাড়ি ঢালের মাঝে স্বল্প পরিসর সমতলভূমি। এর বেশিরভাগটাই ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপে ভরা।

দ্বিতীয়দিন খুব ভোরে আমরা থালডক (১৫,০০০ ফুট) থেকে পোরোচেনের (১৭,০০০ ফুট) উদ্দেশে রওনা হই। কিছুটা চলার পর দুটো পাহাড়ের খাঁজে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে পথটা ভীষণ খাড়াইভাবে নেমে গেছে পারিলুম্বি নালা পর্যন্ত। তবে পথের চিহ্নমাত্র নেই, কারণ এখনও লোকের যাতায়াত শুরু হয়নি। একটা সরু ঝরনার ধারাকে কখনও বাঁয়ে, কখনও বা ডাইনে রেখে খুব সাবধানে নিচে নামতে লাগলাম। নামা আর নামা-প্রায় ১,০০০ ফুট নেমে এলাম। পথটা পারিলুম্বি নালার বাঁ-তীর ধরে উত্তরে সোজা এগিয়ে গেছে। কিছুটা যাওয়ার পর একটা সেতু। কিন্তু তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। যে-কোনও সময় ওই খরস্রোতা নদীতে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। ওই সেতুই তখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ফলে ভয়ে ভয়ে একে একে সেতুর বাঁ-ধার ধরে নদীর অপর পারে এলাম। এখান থেকে শুরু হল ছোট ছোট স্লেটপাথর আর ঝুরো মাটির প্রাণান্তকর রাস্তা। মাঝে মাঝে রাস্তা এতই সরু যে একটা পায়ের পাতা রাখার জায়গা নেই। তার ওপর ঝুরো মাটি। পা হড়কালেই সোজা নদীতে। এই কঠিন পথ পেরিয়ে

যখন আমরা যুগথার তলায় এসে পৌঁছলাম তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে । অগত্যা যুগথার নিচেই তাঁবু পাতা হল ।

পরদিন সকালে তখনও অন্ধকার কাটেনি, ইন্দ্রদার চেঁচামেচিতে ঘুম থেকে উঠে দেখি তেনজিংয়ের তাঁবুটা জলে ভেসে গেছে, ভেতরের মালপত্রগুলো ধরাধরি করে বার করা হচ্ছে । অবাক কাণ্ড । পাহাড়ের গা দিয়ে এভাবে যে জল আসতে পারে, তা আমরা আগের দিন ভাবতেই পারিনি । ভালোই হল । তাড়াতাড়ি মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম । পুরো পথটাই চড়াই এবং রূপসু যাওয়ার পথে এটাই দীর্ঘতম চড়াই । ১৪,৩০০ থেকে উঠতে হবে ১৮,৩০০ ফুট পর্যন্ত একটানা । বড় বড় বোল্ডার আর ছোট ছোট স্লেটপাথরের পথ পেরিয়ে প্রায় ঘণ্টা দু-আড়াই পরে এসে পৌঁছই যুগথায় (১৫,০০০ ফুট) । এখান থেকে পথটা ডাইনে বেঁকে ধীরে ধীরে পোরোচেনের দিকে উঠে গেছে । ঝুরো মাটি আর পাথরের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম । পথ বন্ধ । বিশাল গ্লেসিয়ার আমাদের পথ আটকে । তেনজিংও অবাক হয়ে জানাল, আগে কখনও ওই জায়গায় এত বরফ দেখেনি । ফলে আইস-এক্স দিয়ে বরফ কেটে রাস্তা করা হল । এইভাবে কয়েকটা ছোট-বড় গ্লেসিয়ার ডিঙিয়ে, একটা বিশাল চড়াই পেরিয়ে পোরোচেনের মাঠে উঠে এলাম । সূর্যের পড়ন্ত আলোর আভায় চারদিকের সোনালি পাহাড়গুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । এই পোরোচেনেই (১৭,০০০ ফুট) আমরা তৃতীয় ক্যাম্প করি ।

পরদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ অল্প আলো-আঁধারির মধ্যে যাত্রা শুরু করলাম । অবশ্য স্বপন তার স্ত্রী ও ইন্দ্রদার স্ত্রীকে নিয়ে আগেই রওনা দিয়েছে । মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটার পরই আমরা বরফের রাজ্যে ঢুকে পড়লাম । তখনও রৌদ্রের আলো এসে পৌঁছায়নি । ফলে প্রচণ্ড ঠান্ডা, তীব্র হাওয়া আর বরফের ফাটল এড়িয়ে পথ চলতে চলতে আমরা প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলাম । মন্থর গতিতে চলতে চলতে যখন আমরা পারাংলা গিরিবর্ত্মের গোড়া থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে, তখন সূর্যের প্রখর তাপ অনেক বেড়ে গেছে । ফলে বরফও ভেতরে ভেতরে গলতে শুরু করেছে । তেনজিং ও দুই মিউলম্যান পাঁচটা গাধা নিয়ে আগে আগে চলল, আমরা তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম ।

সামান্য চলার পরই দেখা গেল গাধারা আর এগোতে নারাজ । যখন চলতে বাধ্য করা হল, তখন দেখা গেল গাধাগুলোর বুক অবধি বরফে ঢুকে যাচ্ছে । তেনজিং জানাল, এই অবস্থায় মাল নিয়ে গাধা ওপরে উঠতে পারবে না । সুতরাং গাধার পিঠ থেকে মাল নামিয়ে হালকা করা হল । কিন্তু তাও গাধার পা বরফে গেঁথে যেতে লাগল । বুঝতে পারলাম কাল সকালের আগে এই গাধাদের ওপরে তোলা যাবে না । কিন্তু ওই জায়গাতে আমাদের থাকাও সম্ভব নয়, কারণ প্রথমত, জায়গাটা এতই ঢালু যে তাঁবু খাটানো সম্ভব নয়,

দ্বিতীয়ত, চারধারে বরফ । তেনজিংকে দুটি তাঁবু আর কিছু শুকনো খাবার পারাংলায় পৌঁছে দিতে বললাম এবং আমরা বরফ এড়িয়ে ঝুরঝুরে পাথরের পথ পেরিয়ে উঠে এলাম পারাংলার মাথায় । চারধারে বরাফাচ্ছাদিত বিশাল বিশাল পাহাড়, তারা যেন আকাশকে স্পর্শ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঘন নীল আকাশ, তারই মাঝে তুলোর মতো ভেসে চলেছে সাদা সাদা মেঘ, একদিকে রূপসু আর অপর দিকে বড়া শিগরি অঞ্চলের অসংখ্য পর্বতমালা । পাশেই একটা চোর্তেন । তার মাথায় ছোট ছোট কয়েকটা কাপড়ের পতাকা উড়ছে । সবই সাদা রঙের । মনে হয় গত বছরের স্পিতি ও পিন উপত্যকার লোকজনের সঙ্গে রূপসু ও চাংথাং উপত্যকার লোকজনদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক লেনদেনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই গিরিবর্ত্মকে কেন্দ্র করেই । গ্রেট হিমালয়ান বিভাজিকার ওপর তাই পারাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । ১৮,৩০০ ফুট উঁচু পারাংলার মাথায় রাত কাটাব বলে স্থির করি । কারণ আমাদের গাইড, পোর্টার, মালপত্র সবই নিচে রয়ে গেছে । তাছাড়া শেষবেলায় পারাংলার এই বিশাল তুষারক্ষেত্র পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক । বেলা বেড়ে চলেছে । আলো থাকতে থাকতেই তাঁবু খাটানো দরকার । চারধার ছোট-বড় উঁচু-নিচু পাথরে ভর্তি । কোথাও এক টুকরো সমতল জায়গা চোখে পড়ল না । অগত্যা আমরা চোর্তেনের উত্তরপ্রান্তে পাহাড়ের ঢালে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর তাঁবু টাঙাতে শুরু করলাম । কিন্তু তীব্র হাওয়ায় তাঁবু খাটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল । ইন্দ্রদা একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী । তাঁর উপদেশমতো কয়েকজন অভিযাত্রীকে তাঁবুর ভেতর ঢোকানো হল আর আমরা কয়েকজন বাইরে থেকে তাঁবুর পোলের দড়িগুলোকে বড় বড় পাথরে বেঁধে কোনওরকমে তাঁবুকে দাঁড় করালাম । এবার প্রয়োজন হল জলের । কিছুক্ষণ আগে ইন্দ্রদা গিরিবর্ত্মের পশ্চিমপ্রান্তে একটা সরু জলের ধারা দেখে এসেছেন । ছুটলাম সেখানে । কিন্তু সেই জল তখন বরফের রূপ নিয়েছে । বরফ গলিয়েও জল করা যায় । কিন্তু স্টোভ তো নিচে রয়ে গেছে । হঠাৎ দেখি ইন্দ্রদা একটা খুবই ছোট গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে হাজির । তিনি জানালেন, হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য এটা তাঁর রুকস্যাকেই রাখা ছিল । ওই গ্যাস জ্বালিয়েই বরফ গলিয়ে পেলাম জল, তৈরি হল চিকেন স্যুপ । তাঁবুর বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা, সূর্য অস্তগামী । কানাংমো পাহাড়ের চূড়ায় পড়েছে সূর্যাস্তের রক্তিমচ্ছটা । সামনের বিশাল তুষারক্ষেত্রটার শুভ্রতা রাঙা আভা ঢেকে ফেলেছে ।

রাতে একটা সমস্যা দেখা দিল । একটা চারজনের তাঁবুতে সাতজন ঢুকে পড়েছে । বাকি দুজনের জায়গা ভেতরে কিছুতেই হচ্ছে না । ইন্দ্রদা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাইরেই রাত কাটাবার প্রস্তাব দেন । এতে আমরা অনেকেই বেঁকে বসি । কিন্তু তাঁর অসীম সাহস আর দুর্জয় মানসিকতার কাছে আমরা হার মানি । অর্ধেক উঁচু-নিচু পাথর আর অর্ধেক বরফের

ওপর ম্যাট্রেস পেতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়েন প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তীব্র হাওয়ার মধ্যেই ফাঁকা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে দেন। সকালবেলা উঠে দেখি ইন্দ্রদারা তখনও ঘুমিয়ে রয়েছেন আর তাঁদের স্লিপিং ব্যাগ দুটো ঢেকে রয়েছে সাদা হালকা বরফে। মালপত্র গুছিয়ে আমরা তেনজিংয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। খুব ভোরে গাধাদের নিয়ে তার এখানে পৌঁছনোর কথা। কিছুক্ষণ পর দেখি তারা তিনজনে গাধাদের নিয়ে উঠে আসছে। কিন্তু গাধার পিঠে কোনও মাল নেই। ব্যাপার কী? তেনজিং জানাল, প্রচুর বরফের মধ্যে গাধারা মাল নিয়ে চড়াইয়ে উঠতে পারছে না। তাই মালপত্র সব নিচেই ফেলে এসেছে। পরে ফেরি করে ওগুলো ওপরে তুলবে। আর ওখানে আমাদের থাকা সম্ভব নয়। ফলে তার সঙ্গে কথা হয়, আমরা আজ পারাংলা অতিক্রম করে নিচে নেমে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করব। আর তেনজিংরা আগামীকাল ভোরে গাধা ও মালপত্র নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছবে।

বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই পিছনের স্পিতি উপত্যকা অদৃশ্য হয়ে গেল। চারধারে শুধু বরফ আর বরফ। কোথাও বরফের শক্ত আস্তরণ, আবার কোথাও বরফ এতই নরম যে হাঁটু পর্যন্ত পা ঢুকে যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল, চাপা পড়ে গেল চারধারের অনুপম সৌন্দর্য, শুরু হল তুষারপাত, ঠান্ডাও বেড়ে গেল কিন্তু হাঁটার গতি বাড়াবার উপায় নেই। কারণ পথে রয়েছে বেশ কিছু বরফের ফাটল। অবশেষে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চার কিলোমিটার লম্বা এই হিমবাহকে পেরিয়ে আমরা পারে চু নদীর উৎসমুখে নেমে এলাম। এখানেই আমাদের পঞ্চম রাত্রিবাস।

পরদিন সকালে তেনজিং গাধাদের নিয়ে হাজির। সঙ্গে মালপত্র। এখান থেকে সে আমাদের বিদায় জানিয়ে ফিরে চলল কিব্বের গ্রামের উদ্দেশে। এখন থেকে একজন মিউলম্যান, ছোট তেনজিং আমাদের গাইড হিসাবে পথ দেখাবে।

পারে চু নদী পেরিয়ে তার বাঁ-তীর ধরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। কিছুটা চলার পর পারে চু উপত্যকার বিস্তৃতি বাড়তে লাগল। এই নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছই খারসা কোংমায়। অল্প নরম ঘাসে ঢাকা একটা বড় মাঠ। এখান থেকেই আবার নদী পার হতে হল। নদী এখানে অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। তুষারশীতল জলের দশ-বারোটা ধারা পেরিয়ে আমরা উঠে এলাম নদীর অপর পাড়ে। এখান থেকে পারে চু উপত্যকা ডান ধারে বাঁক নিয়েছে। সমস্ত পথটাই প্রায় সমতল। চারধারের রুক্ষ পাহাড়ের বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছই দাটাং ইয়োংমাতে। উচ্চতা ১৬,৫০০ ফুট।

পরদিন জুনিপারে ছাওয়া একটা বিশাল মাঠ পেরিয়ে পারে চু নদীর মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি। এখান থেকে নদীর বাঁদিক দিয়ে তাকলিংলা যাওয়ার পথ আছে। নদীর ডান তীর ধরে চলতে চলতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। দেখি অসংখ্য মাটি ও দানাপাথরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাইড জানাল, জায়গাটার নাম খটপা ভৌজে। এর মানে পোকায় খাওয়া জায়গা। নদী থেকে কিছুটা ওপরে পাহাড়ের ঢালে একটা সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। ফালোং পড়াং ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে কিছুটা আগে। ওখানেই রাতটা কাটাব ঠিক করি।

আজকের লক্ষ্য নরবো সুমদো। পথটা নদীবক্ষ ধরেই এগিয়ে গেছে। কিন্তু নদীতে প্রচুর জল। ফলে ডান তীরের পাহাড়ি ঢালের সরু বিপজ্জনক পথটাই বেছে নিতে হয়। কয়েকটা ছোট ছোট চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নদীবক্ষের জলকাদা ভেঙে আমরা এসে পৌঁছলাম নরবো সুমদোর অপর পারে। এখান থেকে নরবো-সুমদো পর্যন্ত পারে চু নদী প্রায় দেড় কিলোমিটার চওড়া এবং অসংখ্য ধারায় বিভক্ত। এর মধ্যে মূলধারা চারটি। প্রথমে গাইড ও তার সঙ্গী গাধাদের নিয়ে জলে নেমে পড়ল। দূর থেকেই দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড জলের গতি। একেক সময় জল গাধাদের বুক অবধি উঠে পড়ছে। ভয় হচ্ছে, এই বুঝি ভেসে যাবে। ছোট তেনজিংরা ফিরে এল ওপারে গাধাদের রেখে। এবার আমাদের পালা। আমাদের চার অভিযাত্রী এখনও এসে পৌঁছয়নি। অগত্যা আমরা পাঁচজনই তেনজিংদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে জলে নেমে পড়লাম। তুষারশীতল জলে পা দুটো সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল। দুটি স্রোত পার হয়ে, তৃতীয় স্রোতের মাঝে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এখানে নদী ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। যতই এগোই জল ততই বাড়তে থাকে। এক সময় সেই জল প্রায় কোমরে পৌঁছে গেল। আর সেই সঙ্গে জলের প্রবল গতি। এক পা এগোচ্ছি তো দুপা পিছোচ্ছি। একেক সময় মনে হচ্ছে পারে চুর ধারার সঙ্গেই হারিয়ে যাব। এইভাবে আরও দুটো কঠিন স্রোতের ধারা পেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলাম নদীর অপর পারে। অপর চার সঙ্গীও তেনজিংয়ের সাহায্যে নদীর এপারে এসে পৌঁছল। কিছুক্ষণের বিশ্রাম। উঠে এলাম নরবো সুমদোর উঁচু সমতলভূমিতে। একটা পাথরের দেওয়াল দেওয়া ভাঙা ঘর। তেনজিং জানাল, নরবো সুমদো নদী প্রাচীন কালে লাদাখ এবং স্পিতি রাজ্যের সীমানা ছিল। তাই লাদাখরাজ সেনজে নামগিয়াল দক্ষিণের শেষপ্রান্তে এই প্রহরী চৌকি নির্মাণ করেন। নরবো সুমদোয় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এখানে কঠিন পাথর আর রুক্ষতার ছোঁয়া নেই। আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা এক বিরাট প্রান্তর, একটা বিশাল জলাভূমি।

কিছুটা চলার পর নন্দিতা বৌদির কথায় আজকের মতো চলার ইতি ঘোষণা করতে হল। সামনেই চাংপাদের কয়েকটা তাঁবু। তেনজিংকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম চাংপাদের আড্ডায়। কয়েকজন চাংপা তখন ভেড়ার লোম কাটতে ব্যস্ত। হাতে তাদের কাঁচির মতো

একটা অস্ত্র । ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে ওই অস্ত্র দিয়ে তারা একেকটা ভেড়ার লোমের ওপরের আস্তরণ কেটে ফেলছে । দেখলে মনে হয়, ভেড়ার গা থেকে একটা পশমের কোট খোলা হচ্ছে । তেনজিং জানাল, এগুলো পশমিনা । খুব দামি । চাংপারা লোমগুলো বস্তায় পুরে পাঠিয়ে দেয় করজোক গ্রামে । সেখান থেকে যায় শ্রীনগরে । আবার কখনও কখনও ভেড়ার দল নিয়ে এরা কিব্বের বা কাজায় যায় । সেখানে লোম বিক্রি করে পরিবর্তে নানা উপকরণ সঙ্গে নিয়ে আসে । তাঁবুতে ফিরে ক্যামেরা গোছগাছ করছি হঠাৎ দেখি এক চাংপা মহিলা, সঙ্গে দুই ছোট ছোট মেয়েকে নিয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে । রমণীর হাতে একটা বড় লাদাখি কেটলি, দুজনের হাতে দুটো থালা । মহিলার কথা বুঝতে না পেরে আমরা তেনজিংয়ের শরণাপন্ন হলাম । তেনজিং জানাল, এই মাঠে চাংপাদের কাছে আজ আমরা অতিথি । তাই ওরা এসেছে আমাদের চা খাওয়াতে । সঙ্গে এনেছে একথালা পনির, যবের ছাতু ও এক বোতল দুধের ঘোল । তাদের সহজ সরল ব্যবহার এবং অকৃত্রিম আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম ।

পরদিন চাংপাদের বিদায় জানিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যখন এগিয়ে চলেছি, পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা খরগোশ আমাদের দেখে গর্তে ঢুকে পড়ল । বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সবুজ জলাভূমি ছেড়ে এসে পৌঁছই এক বিশাল রুক্ষ প্রান্তরে । এখান থেকেই রূপসুর মূল উপত্যকা শুরু । জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই রূপসু কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল । কারণ ১৯৯৫ সালের আগে ওখানে সাধারণ ভ্রমণার্থী বা ট্রেকারের প্রবেশের অধিকার ছিল না । প্রবেশের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অনুমতি লাগত । ফলে রূপসুর অনিন্দ্যসুন্দর রূপের কথা এখনও অনেকের অজানা । এই উপত্যকায় প্রবেশের বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় পথ আছে, উত্তরে তাংলাংলা হয়ে লে উপত্যকা ও মাহে উপত্যকার নাম সাংলা, পূর্বে লেনাক লা, পশ্চিমে লাচুংলা ও লানিয়ের লা এবং দক্ষিণে পারাংলা ও তাকলিংলা । আমরা পারাংলার পথেই এখানে এসে পৌঁছেছি । ফিরসে ফু নদীর অসংখ্য ধারাকে পার হয়ে সবুজ ঘাসের জলাভূমির ওপর দ্রুত এগিয়ে চললাম একটা অজানা আকর্ষণে । কয়েক পা হাঁটার পরই মাথা তুলে দেখি আস্তে আস্তে সো মোরিরির নীলরেখাটা ঘন ও মোটা হতে লাগল । অবশেষে এসে পৌঁছলাম গল্পে শোনা, স্বপ্নে দেখা সো মোরিরির তীরে । সরোবর নয়নাভিরাম দৃশ্য । রুক্ষ পাহাড়ে ঘেরা বিশাল সরোবরকে সাগর বলেই ভ্রম হয় । নীল আকাশ । তার মাঝে ছোট ছোট মেঘের আনাগোনা । নিচে সো মোরিরির বিশাল জলরাশির তুঁতে রং সূর্যের আলোয় এবং মেঘের ছায়ায় কখনও হালকা কখনও গাঢ় হচ্ছে । বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরের নরম সবুজ ঘাসের ওপর । দূরে মনের আনন্দে

ভেসে চলেছে সারি সারি হাঁসের দল। হঠাৎই অচেনা লোকজন দেখে যাযাবর পাখির দল সরোবরের তীর থেকে পাড়ি দিল অনেক দূরে।

আস্তে আস্তে সূর্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলে পড়ল। আর জলের অপার্থিব রং-পরিবর্তন। সত্যি এ যেন এক স্বপ্নের দৃশ্য। এখান থেকে ঘণ্টাদেড়েক হেঁটে সরোবরের একটা বাঁকে আমরা সেদিনের জন্য তাঁবু খাটাই। এখান থেকে সূর্যাস্তের যে রূপ দেখেছি, তা প্রকাশের কোনও ভাষা নেই।

রূপসুর প্রধান আকর্ষণ এই সো মোরিরি। ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই সরোবর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫ থেকে ১২ কিলোমিটার চওড়া। এই লেকের চারধারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা পর্বত। পূর্বে থালদা কুরমি (২১,৮৭০ ফুট), পশ্চিমে মাতা (২০,৮০০ ফুট) ও একটি অনামা শৃঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে রূপসু আইসক্যাম্প। হিমালয়ের কোলে অতি উচ্চতায় অবস্থিত লেকগুলির মধ্যে সো মোরিরি ভারতের সর্বোচ্চ হ্রদ। এই উপত্যকার তাপমাত্রার পরিসংখ্যান বড় বিচিত্র। শীতে সমস্ত জায়গাই ঢেকে যায় কঠিন বরফে। তখন তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের অনেক নিচে। গ্রীষ্মে, মাত্র তিন-চার মাস এই মরুপ্রকৃতির তাপমাত্রা দিনেরবেলায় ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার রাতে কমতে করতে কখনও নেমে যায় শূন্যের নিচে।

পরদিন সো মোরিরির রূপ আবার ভিন্ন। ভোরের সূর্যোদয়ের হালকা আলো এসে পড়েছে সরোবরের জলে। জলের স্বচ্ছতা এত বেশি যে, জলের গভীরে থাকা নুড়িগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সরোবরের পশ্চিম তীর ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি সরোবরের রং পাল্টে গেছে। হালকা তুঁতে রঙের জলরাশি নীল রঙে রূপান্তরিত হয়েছে। সূর্যের প্রখরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নীল গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগল। সরোবরের অপর পারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাম না-জানা অসংখ্য পর্বতশ্রেণী। তারই মাথায় ঘন নীল আকাশের বুকে তুলোর মতো ভেসে চলেছে অজস্র সাদা মেঘের রাশি। দূরে একধারে গিয়া অপর ধারে মাতা শৃঙ্গ। পথে পড়ে পাথরের ওপর পাথর চড়ানো কিছু উঁচু ঢিবি। প্রত্যেকটা পাথরের গায়ে লেখা রয়েছে বুদ্ধের নানা বাণী। এগুলোও একধরনের চোর্তেন। দুপুর দুটো-আড়াইটে নাগাদ কোরজোক গ্রামে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত গ্রামটা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। সমস্ত ঘরবাড়ি বন্ধ, কোনও লোকজনের দেখা নেই। হঠাৎ এক লামাকে দেখে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কী। তিনি জানান, নিয়মায় উৎসব চলছে। স্বয়ং দলাই লামা সেখানে এসেছেন। তাই গ্রামের লোকেরা তাঁর বাণী শুনতে সেখানে গেছে। ফিরবে কয়েকদিন পরে। কোরজোকে পৌঁছে স্কুলবাড়ি ও তার সংলগ্ন লনে

আমরা আশ্রয় নিই। সো মোরিরির কোলে অবস্থিত এই কোরজোক গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম। এটি চাংপাদের শীতকালীন আবাস। গ্রাম থেকে বার্লি ও যবের একটা বিশাল সবুজ খেত নেমে গেছে সরোবর অবধি। পাহাড়ের ঢালে একটু উঁচুতে একটা গুম্ভা। তার আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো একতলা-দোতলা বাড়ি। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সরোবরের কোল ঘেঁসে আরও একটা নতুন গুম্ভা তৈরি হচ্ছে। সরোবরের একেবারে তীরে একটা সরকারি বিশ্রামাগারও তৈরি হয়েছে। আমরা জানতাম, চাল-ডাল ও কিছু কাঁচা তরিতরকারি এই গ্রামে পাওয়া যায়। তবে দামটা একটু বেশি। আমাদের আনা রসদ চাল-ডাল-আটা শেষ। কারণ তেনজিং আমাদের না জানিয়েই পাসের মাথায় থাকাকালীন চাল-ডাল গাধাদের খাইয়েছে। দোকানগুলোও বন্ধ। ফলে আমরা খুবই অসহায় হয়ে পড়লাম। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন প্যারা মিলিটারি ফোর্সের প্রধান নামগিয়াল। স্কুলবাড়ির পাশেই তাঁর অস্থায়ী তাঁবু। রাতে তিনি আমাদের একটা ভালোই ভূরিভোজের ব্যবস্থা করলেন। পরদিনও তিনি আমাদের প্রাতঃভোজনের ব্যবস্থা করেন। চালের খোঁজে গুম্ভার আশপাশে ঘোরাঘুরি করছি, এমন সময় পরিচয় হয় কোরজোকের স্কুলের এক শিক্ষকের সঙ্গে। তিনিই কয়েকজনের ঘর থেকে চাল সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন।

৪ ও ৫ জুলাই হেমিস উৎসব। ৪ জুলাইয়ের অর্ধেক দিন প্রায় কেটে গেছে। বাকি আছে কালকের দিনটা। আজ লে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু তখনও কোনও গাড়ির চিহ্ন নেই। আশা প্রায় যখন ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ একটা ট্রাক এসে হাজির। ট্রাক মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সঙ্গের মালপত্র নামিয়েই সে আজই আবার ফিরে যাবে লে। তাকে অনুরোধ করতে সে আমাদের পৌঁছে দেবার আশ্বাস দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাকে চড়ে রওনা দিই লে-র পথে। রাত ১১টার সময় লে পৌঁছে আশ্রয় নিই ওল্ড লে রোডের ওপর একটা সুন্দর হোটেলে।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

পুশকিন, মলদভা আর কচি পাতার বাঁশিতে মোৎসার্ট

প্রীতি সান্যাল

এবার কোথায় বেরোচ্ছেন? মলদভা। কোথায়? আরে আমিই কি জানতাম যাওয়ার আগে! পূর্ব ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ। সোভিয়েত ব্লক ভেঙে যাওয়ায় অধুনা স্বাধীন। এক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছে। জাতীয় কমিশন ও ইউনেস্কো হাত মিলিয়ে একটি কর্মচক্রের আয়োজন করেছে উচ্চ শিক্ষা ও টেকনোলজি একসঙ্গে মিলিয়ে কাজ করে ব্যূহ ভেদের কোনও পথ খুঁজে পেতে পারে কি না। সে দায়িত্ব পড়েছে ইউনেস্কোতে কর্মরত আমার স্বামী শ্রীযুক্ত সান্যালের ওপর। আমি সঙ্গ নিলাম যথারীতি।

বেরোবার আগের দিন ইউনেস্কোর এক বন্ধু বললেন, 'কিশিনো-আরে ও তো ধুরধুরে গ্রাম। ওখানে তুমি একা একা কী করবে?' সঙ্গী বলছেন, আর কিছু না হোক কয়েকদিনের বিশ্রাম তো হবেই। কিছুই দেখার না থাকলে বই পড়ে কাটানো যাবে ভেবে বেশ কিছু বই নিয়ে চলেছি এয়ার ফ্রান্স বিমানে বুদাপেস্ট। সেখানে বিমান বদল করে রাজধানী কিশিনো যেতে লাগবে তিন ঘণ্টা। বুদাপেস্টে বসে আছি অপেক্ষায়। সংযোগ বিমানটি পাব কিনা আসবার পথে এই নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছিল। এখন অনন্ত অপেক্ষা। ইতালি থেকে উড়োজাহাজ এলে তবে যাওয়া যাবে মলদভা। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। পাশের কিশোর স্প্যানিশ ছেলেটি তার মোবাইল ফোনে একবার মা কখনও বালিকা বন্ধুর সঙ্গে বকবক করে চলেছে। অধৈর্য অপেক্ষা। শুধু একটি শিশুর কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে সময় কাটানো। সিঁড়ি দিয়ে তার অহরহ ওঠানামা, বেবি চেয়ার ঠেলে কতবার পার হয়ে যাচ্ছে প্রতীক্ষালয়ের সীমারেখা, যেন পৃথিবীটা ওইটুকু জায়গায় থেমে আছে আর সে ছুটছে হাতের মুঠোয় তাকে ধরবে বলে। অনেকটা সময় কাটল ওকে দেখে।

অবশেষে ছোট্ট নীল রঙের মলদভিয়ান বিমান। তিরিশজন বসতে পারে। বুদাপেস্টের বিমানবন্দরের পেল্লাই উড়োজাহাজের মাঝখানে দাঁড়ানো খুদে বিমানটিতে উঠলাম। প্রপেলারের গর্জন কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কাটা স্লাভ মুখের বিমানসুন্দরী নিরাপত্তা নিয়ে যা যা করতে বলছেন-ভয় হচ্ছে পৌঁছব তো! দিগন্তে সূর্য ডুবছে। ট্রেতে রকমারি ওয়াইন, আপেলরস, স্যান্ডউইচ। নিচে অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর আলোর বিন্দুরেখা, স্বল্প

আলোর ঝলকানি, এয়ারপোর্ট । খুব সাধারণ, তবে পরিচ্ছন্ন । প্লেন থেকে জাঁদরেল চেহারার দুজন সিকিউরিটি অফিসার এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে নিয়ে এল গাড়ি করে । চিন্তা করছিলাম দেশটায় নিরাপত্তার অভাব নেই তো! অপেক্ষা করে ছিলেন দুজন সজ্জন মানুষ । শ্রীযুক্ত চিয়োবানা ও রুসনা । দুজনেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার । ন্যাশনাল কমিশনে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি । ওঁদের বলিষ্ঠ হাতের করমর্দন ও সহজ ব্যবহার আমাদের খানিকটা আশ্বস্ত করল ।

কনস্তানতিন রুসনার মার্সিডিজ গাড়ি চলেছে শহর কেটে । রাস্তা বেশ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন । দুধারে সাজানো বাড়িগুলি বনেদি আভিজাত্যে দাঁড়ানো, মলিন ছাপ পড়েছে সংস্কারের অভাবে । পথের দুধারে পপলারের সারি । সুন্দর সবুজ পার্কের কাছে নতুন ঝকঝকে বহুতলার উঁচু হোটেল । আমাদের ঘর দশতলায় । ভাড়া ১৭০ ডলার । দেশে নতুন ইকনমির ঢেউ । ডলার প্রভুর দাপট । এরকম ভাড়ায় তিন তারা হোটেলে থাকা যায় । ঘর বেশ ছোট । চান করার সময় প্রায়ই গরম জল আসে না । শাওয়ারের নিচে যেতে হলে উঁচু একটা কাটা দেওয়ালের ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়-প্রতি মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা । তবে সকালে খাবারের টেবিলে গেলে মন ভালো হয়ে যায় । গ্রাম থেকে আনা টাটকা স্যালাড, পনির, চাইলেই ডিমের হরেকরকম রান্না আর ফলের বাহার । এখানকার জমি খুব উর্বর । সার ব্যবহার করে না বললেই চলে । ফলে খাবারের স্বাদই আলাদা ।

সকাল দশটায় এল আদ্রিয়ানা । কুড়ি বছরের তরুণী, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা নিয়ে কাজ করছে । খুব ভালো ইংরিজি বলে । ও আমাকে সাহচর্য দেবে এ কদিন । একটু পরে আরেক সুন্দরী হাজির । লিলিয়ান, গভীর নীল চোখের মেয়েটি ইউনেস্কোর হয়ে এখন কাজ করছে । পড়াশোনা ফরাসি সাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক কাজ । কবিতার মুক্ত আঙ্গিক ওর বিষয় । দুই সঙ্গিনীর সঙ্গে দুই ভাষায় কথা বলতে বলতে চললাম হোটেলের সামনে সন্ত স্তেফান পার্কের দিকে । জাতীয় কমিশন থেকে গাড়ি দিয়েছে । অতএব শহর চষে ঘুরে বেড়ানো যাবে । এই পার্কটি শহরের কেন্দ্রবিন্দু বললে অত্যুক্তি হবে না । সবুজের সমারোহ । রোদ চড়া । বেশ গরম । পপলারের সারির নিচে বনপথের দুধারে এদেশের লেখক, কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতকার, নৃত্যশিল্পীদের আবক্ষ শ্বেতপাথরের মূর্তি সমীহ জাগায় । দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে, এই প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তাঁরা কি দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলবেন কপালে? ভাসিল আলেকসান্দ্রেই, মির্চা ইলিয়াদ, মিহাই এমিনেস্কু, ইওজেন ইউনেস্কো, গায়িকা মারিয়া বিয়েসু, ব্যালে নৃত্যশিল্পী মারিয়া সিবুতারি- আরও অনেক ইতিহাস পরিচিত মুখ । পার্ক কেটে রাস্তা এসে পৌঁছেছে সন্ত স্তেফানের মূর্তির কাছে । উঁচু মিনারের ওপর দাঁড়ানো শ্বেতশ্মশ্রু ঋষি লক্ষ রাখছেন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে । তাঁর নামেই চওড়া রাস্তা চলে গেছে প্যারিসের আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ভের

মিনি সংস্করণের দিকে । সন্ত স্তেফান খুব জনপ্রিয়, জানাল দুজন সঙ্গিনী । বিয়ের ঠিক আগে দম্পতিরা আসে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এখানে-রেখে যায় মিনারের নিচে ফুলের গোছা । তোমরা রাখবে নাকি বিয়ে করলে? কলকণ্ঠে বলে উঠল, 'নিশ্চয় অবশ্যই' । খুব চওড়া রাস্তা ধরে হাঁটছি আর ওদের মুখে শুনছি দেশটির জটিল ইতিহাস । নাম বদলই কতবার । আজকের মলদভা বা মলদভিয়া ১৯৪০ পর্যন্ত বেসারাবিয়া নামে পরিচিত ছিল । দক্ষিণে ব্ল্যাক সি থেকে উত্তরে রুমানিয়ার প্রাক্তন প্রদেশ বুকোভিনা, পশ্চিমে সিরেট নদী আর পুবে নেস্টার নদী অবধি দেশটি ছড়ানো ছিল । পনেরো শতকে তৈরি এই দেশে বারবার বিদেশি শক্তি হানা দিয়েছে । ষোড়শ শতকে তুর্কি শাসন । ১৮১২ থেকে ১৮৫৬ রাশিয়ান প্রভুদের হাতে দেশ । নতুন নাম বেসারাবিয়া । ১৮৭৮ সাল থেকে রুশি সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব । কিছু সময়ের জন্য চলে যায় রুমানিয়ার হাতে । পরে নতুন গড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার হৃত রাজ্য দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগল । দেশে রক্ত ঝরেছে অনেকবার, বিদেশি আক্রমণে, গৃহযুদ্ধে । ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ছিল সোভিয়েতের প্রত্যন্ত প্রদেশ । ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট সরকার পাল্টে গেলে স্বাধীন মলদভা প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠল । দেশটার সংস্কৃতি, রুচি, সঙ্গীত, শিল্প, ভাষা এমনকী জীবনধারাতেও ইতিহাসের এইসব পরিবর্তনের ছাপ থেকে গেছে । রাগে-অনুরাগে, ভালোবাসা-ঘৃণায়, পছন্দে-অপছন্দে দেশটির চরিত্রে ছাপ রাখছে কখনও রুমানিয়া কখনও রাশিয়া বা তুর্কি দেশও ।

পার্কের ভেতর দিয়ে ফিরছি । ফোয়ারা থেকে ওঠা জলের ধারায় সূর্যের আলো রামধনু রং এঁকে দিচ্ছে । ফোয়ারা ঘিরে মানুষের ভিড় । রাশিয়ার কবি পুশকিনের দ্বিশতবার্ষিক জন্মদিন । পার্কের নাম পুশকিন পার্ক । অনেকের হাতে ফুলের তোড়া । কেউ আবার পার্ক থেকেই তুলেছে জুঁইয়ের লতা । রোদ চড়া । পুশকিন উৎসবে আমার সঙ্গিনীদের তেমন উৎসাহ দেখছি না । রাশিয়ানদের ওপর রাগ বেশ । ওই দেশ মলদভার সংস্কৃতি, ভাষা, লোকগাথা মুছে দিতে চেয়েছিল । লিলিয়ান স্কুলে অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছে রুশি অভিধান । দেশের সরকারি ভাষা এখন রুমানিয়ান । এই পুশকিন উৎসব ওদের কথায় রাশিয়ানরা টাকা দিয়ে করাচ্ছে । রংবাহারি পোশাকে যারা নাচছে তাদের ছবি তুলতে যাব, আদ্রিয়ানা আঙুল ছুঁয়ে বলল ফিসফিস করে, 'ও মেয়েটি রাশিয়ান পোশাকে সেজেছে, সে ছবি তুলে কী হবে!' মলদভার কস্টিউমে সাজা মেয়েটির ছবি জেদ করে তোলাল । একটি কিশোরী মেয়ে পরিচ্ছন্ন গলায় উঁচু তারে পুশকিনের কবিতা আবৃত্তি করছে । পার্ক পেরিয়ে তার সুরেলা গলা বাতাসে ভেসে গেল । ঊনবিংশ শতকে রাশিয়ান জার প্রথম আলেকজান্ডার স্বাধীনচেতা কবিকে নির্বাসন দিলেন দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশ মলদভায় । ১৮২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি কিশিনো এলেন । ক্ষোভ করে লিখেছিলেন, 'তিনটি

দীর্ঘ বছর কাটবে এই সংস্কৃতিশূন্য দেশে যা মরুভূমির মতো আমার কাছে ।' Eugene onegin বইয়ে লিখেছেন-

শহরের কঠিন মুঠি ছাড়িয়ে

তীক্ষ্ম বাস্তব পেরিয়ে

দূর দেশ মলদভা এক দুঃখী দেশ

তাঁবুর মতো বাড়িতে বেদুইনের মতো থাকা

বন্য ভালোবাসা ভুলিয়েছে ঈশ্বরের ভাষা

গেয়ে উঠতে হবে তরাইয়ের গান ।

মস্কোর বিলাস আড়ম্বর ছেড়ে এসে পুরনো মলিন শহরে থাকতে তাঁর যে খুব খারাপ লাগত তা লেখায় ফুটে উঠেছে । নানা দেশ থেকে আসা মানুষেরা শহরবাসী । গ্রিক লাল ফেজের সঙ্গে মিশত তুর্কের বাহারি পাগড়ি, মলদভার ভেড়ার চামড়ার লম্বা টুপি । রুশি সরকারি কর্মচারী, গ্রিক বুলগেরিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, সার্বিয়ান, আর্মেনিয়ান, তুর্ক, জার্মান, ফরাসি, আলবেনিয়ান, ইতালিয়ান-আশ্চর্য ক্যালিওডোস্কোপের ছবিও পাওয়া যায় একই সঙ্গে লেখায় । প্রেমে পড়েছিলেন কিশিনোর ভেনাস-কুমারী পুলহেরিতার । তাকে নিয়ে কবিতার বই লিখলেন 'কুমারী ঘুঘুর মতো চোখের কন্যা আমার প্রিয় সখি' মলদভার জমিদার কন্যা সুন্দরী মারিয়া মারিওলার সঙ্গেও গভীর প্রেম । জিপসি কাব্যগ্রন্থে মারিয়ার কথা এসেছে-'বারবার ফিসফিস করে বলি সেই নাম মারিওলা মারিয়া মারিয়া' ।

সাহিত্যের ছাত্রী লিলিয়ান পার্কের উৎসবমুখর বনপথে চলতে চলতে এ সব কাহিনী যখন শোনাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল দেশটিতে রাশিয়া কত গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ছাপ ফেলে গেছে । এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তা মেনে নিতে পারছে না ঠিকই কিন্তু সত্য এড়িয়ে যাবে কী করে!

ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছিলাম দেশটা তত ভালো নেই । অর্থাভাব বেশ । বড়লোক আর গরিব, মাঝখানের মধ্যবিত্তরা কোথায় গেল? আদ্রিয়ানার কথায়, ওই প্রায় অদৃশ্য শ্রেণী হলাম আমরা-মধ্যবিত্তরা যাঁরা অধ্যাপনা করে বেতন পান মাসে নয় ডলার । কালোবাজার চলছে জোর কদমে । দ্রুত টাকা রোজগারের এক অশুভ খেলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছুটতে পারছেন না । আদ্রিয়ানার সঙ্গে পরদিন সকালে শহর ঘুরতে বেরোলাম পায়ে হেঁটে । গাড়ি নিইনি, শহরটা এত ছোট যে পায়ে হেঁটে ঘোরা যায় । চল বইয়ের দোকানে । রুমানিয়ান ভাষার বইয়ে ভর্তি । রাস্তায় পুরনো বইয়ের পসরা । অবাক লাগে

অভাব আছে অথচ পরিচ্ছন্ন চারদিক। রাস্তাঘাটে একটা কুটো পড়ে নেই। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেউ ঝাড়ু দিয়ে গেছে। মানুষজনেরা দামি জামাকাপড় পরেনি কিন্তু সকলেরই মোটামুটি ভদ্র পোশাক। দু-তিনজন বৃদ্ধা টুলে বসে ভিক্ষা চাইছেন নিঃশব্দ হাত বাড়ানো প্রার্থনার ভঙ্গি। পথচারীই বেশি। আছে কলকাতার মতো ভিড়ে ছয়লাপ বাস। ছাত্রছাত্রীদের বাসের টিকিট ফ্রি। শিক্ষাদপ্তর থেকে কার্ড দেয়। তাই দিয়ে যেখানে খুশি যাও। আদ্রিয়ানা বলল, চল আমাদের সবসেরা মিষ্টির দোকান দেখাই। আসলে এক পেল্লাই চকোলেটের দোকান। ওকে বললাম, যা পছন্দ তাই কেনো। ছয় লেতে মাঝারি সাইজের চকোলেট কিনে বলল, বড্ড দাম! খুশিতে মুখটি যদিও চকচক করছে। পুরনো বাজারের পথে হাঁটছি, মেয়েটি একটু একটু করে চকোলেটে কামড় দিচ্ছে কী তৃপ্তির সঙ্গে এখনও মনে পড়ে। মা স্কুলে পড়ায়। বেতন মাসিক নয় ডলার। ভাইয়ের সঙ্গে দুশো লে ভাড়া ভাগ করে এক বাড়িতে থাকে। ভাই বিয়ে করছে শীঘ্র ধনী বাড়িওয়ালা মেয়ের সঙ্গে। আদ্রিয়ানা কি করবে তাই নিয়ে আকণ্ঠ দুশ্চিন্তা। মাঝে মধ্যে ইংরিজি কোচিং দেয়, দুঘণ্টায় এক ডলার উপার্জন। বাবা হাতের কাজে পটু। নানা ধরনের কাজ করেন। মাংস খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। সব্জি, ফল, রুটিতেই থাকা। গাঁয়ে ঘরে পশু জবাই হলে বাবা গ্রাম থেকে কম দামে কিনে আনে। বাজারের সামনে দিয়ে হাঁটছি। সিমেন্টের চত্বরে খোলা হাট বসেছে। সব পেয়েছির দেশ যেন। কী নেই। দুধারে বাঁধানো বেদিতে শাক সব্জি ফল, জামাকাপড়, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি মনে হচ্ছে পুরনো জিনিস, চিলেকোঠা খালি করে আনা। পাশেই ওজনযন্ত্র মাটিতে রেখে এক বৃদ্ধ এক লের বিনিময়ে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের ওজন দেখে দিচ্ছেন।

পরদিন সকালে কনস্তাতিন এলেন গাড়ি নিয়ে আমাদের দলনা দেখাবেন। সঙ্গে চিয়োবানা মহাশয়, লিলিয়ান আছেন। অন্য আরেকটি গাড়িতে তাঁদের কয়েকজন বন্ধু। ১৮২১ সালে পুশকিন আসেন কিশিনো থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূর দলনায়। এই গ্রামে কবির নির্বাসন ভবন দেখতে চলেছি। সুন্দর রাস্তা-দুধারে খেতে সবুজ ফসল, ফলে ভরা গাছ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পিকনিকের খাবারদাবার রাস্তা থেকেই কেনা হল। শহর ছাড়তেই পথের দুধারে লাল টুকটুকে টম্যাটো, চেরি, তরমুজের পসরা। আমরা টিলার মাথায় উঠছি। ঘন বন ঘিরে আছে আমাদের। এরা বলে কদ্রি। কদ্রি শুধু বনভূমি নয়-তার থেকে বেশি কিছু। টিলার ওপরে ঘন জঙ্গল, নিচে উপত্যকায় ওক গাছের সারি, মোটা গুঁড়ি ঘিরে বনফুলের স্তবক, আঁকাবাঁকা পথ ডাক দিয়ে যায় আরও গহনে ডুব দেওয়ার। 'কত কাহিনী ও ইতিহাস এই কদ্রির বুকে লুকানো। উর্বর জমির ফসল; আঙুর খেত, পুরনো গ্রাম আর মানুষের অতুলনীয় আতিথেয়তার জন্য বারবার এই বনে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়'... চিয়োবানা গভীর ভালোবাসার গলায় বলছিলেন তাঁর ইচ্ছের কথা।

শেষ শয্যা যেন হয় এই বনে লুকানো তাঁর ছোট্ট গাঁ ক্রুশেনিতে । একটি পুরনো বাড়ির মরচে ধরা গেটের সামনে গাড়ি থামল । আমাদের অপেক্ষায় ছিল ভেতরের মানুষজন । সুন্দর বাড়ি, ওপরে বারান্দায় ওকের রেলিংয়ে খোদাই কাজ! পুশকিনের অতিথি ভবনটি কিনে নিয়েছেন কনস্তাতিন রুসনারের বন্ধু সার্জ । সে আর তার বৌ চমৎকার ফরাসি বলে, চোদ্দ বছরের কন্যা ডায়ানা কথা বলছিল ঝরঝরে ইংরিজিতে । টেবিল পাতা হল বাগানে । চটপটে হাতে ওরা সাজাল নানা ধরনের পনির, বিশাল বিশাল রুটি, টম্যাটো, টম্যাটোর মতো বড় বড় মুলো, সাদা মাছের মণ্ড আর হরিণের শুকনো মাংস । ঠান্ডা জলের জালায় ডোবানো রুসনার বাগানের আঙুর পিষে নিজে হাতে তৈরি সাদা ওয়াইন আর লাল ক্যাভারনের বোতল খুলে চিজ রুটি মুড়ে হাতে নিয়ে বনভোজনের সূচনা । এরপর আমরা পুশকিনের বাড়ি দেখতে চললাম । ঘাসে পা ডুবে যাচ্ছে । টিলার ওপর উঠছি । পথে শিমুল তুলোর মতো সাদা পেঁজা ফুলের আঁশ পড়ে আছে । পাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই । রুসনা খুব নিচু গলায় কথা বলে চলেছেন । উচ্চশিক্ষিত মানুষটি সুরকার, বাজান ক্ল্যারিয়নেটে ধ্রুপদী সুর । একটি রেকর্ড বেরিয়েছে, উপহার দিয়েছেন আমাদের । খুব টগবগে মানুষ । ছেলেমেয়ে দুজনেই দেশের নামকরা বেহালাবাদক । একটি নাতনি নয়নের তারা-মার্গারিতা । বৌ ছিলেন লোকনৃত্য শিল্পী । শরীর ভালো নেই তাই আসতে পারলেন না । কোমরে ব্যথা সারাবার জন্য বোলতার কামড় চিকিৎসা করছেন, তার ফলে সাংঘাতিক অ্যালার্জি । এই চিকিৎসার কথা প্রথম কানে এল তাই অবাক বিস্ময়ে পদ্ধতি জানতে চাইলাম । কোমরের বিভিন্ন খাঁজে তিন-চারটি বোলতা বসিয়ে দেওয়া হয় । ওদের হুল ফোটানোতে ব্যথা সারে । এরা অনেক টোটকা চিকিৎসায় বিশ্বাস করে । রুসনার বাবার কোমরে বীটরস ইঞ্জেকশন দিয়ে পিঠের ব্যথা সারানো হয়েছিল শুনলাম । গল্প করতে করতে কবির বাড়ি পৌঁছে গেছি । সামনে দাঁড়ানো ম্যানর হাউস । বারান্দায় এক জিপসি দম্পতি আলু সেদ্ধ করে গোলমরিচ ছড়িয়ে খাচ্ছেন । বারান্দা ভোজন । বাড়িটি এখন মিউজিয়াম । ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ । দেওয়ালে কোঁকড়া চুলে কবির তেল রং ছবি, একটি পুরনো দিনের আসবাব-অর্থাভাবে মিউজিয়াম অবহেলিত । তাই বলে এত দুরবস্থা! বাগানে জুঁই ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে । কবির মূর্তিটি কালো পাথরে তৈরি । পায়ের কাছে কয়েক গোছা ফুল । ছবি তোলা হল । রুসনা গাছের কচি সবুজ পাতা তুলে ঠোঁটে ছুঁইয়ে বাজাচ্ছেন আশ্চর্য সুর, পুশকিনের কবিতা সুরে, মোৎসার্ট, ভিভালদির চার ঋতু, এমনকী জন লেননের গান-পাতা থেকে এমন সুরের মূর্চ্ছনা ভাবাই যায় না । সুর ওপরে উঠছে কখনও নিচু তারপর এক হারমনিতে মিশে আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে । ফিরে আসছি বনভোজনের মাঠে । সবকিছু ততক্ষণে প্রস্তুত । শূলপক্ক মাংস, পিঁয়াজকলি, ছাগদুগ্ধের পনির, দূরে কাঠের আগুনে আরও মাংস পুড়ছে । কাঁচা সব্জির কী টাটকা স্বাদ । সার্জের পয়সাকড়ি আছে মনে হল । ছিল ডাক্তার । স্বপ্ন

ছিল গড়ে তুলবে নিজের হাসপাতাল। স্বাধীন, মুক্ত ও সুখী হবার স্বপ্ন এখন। পুশকিনের অতিথি ভবন কিনেছে জমানো টাকা দিয়ে, একটি বেশ দামি গেস্টহাউস করতে চায় বিদেশি অতিথিদের জন্য। চটজলদি টাকা করার রেসে দৌড় লাগিয়েছে। আদ্রিয়ানার কাছে শুনেছি মাংসের দাম খুব। চার-পাঁচ ডলার কিলো। সবাই খেতে পারে না। এখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। সার্জ আর আইওয়ানার একমাত্র মেয়ে ডায়ানা পনেরো বছরের কিশোরী ছিপছপে শরীর, নাভি খোলা জামা। প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমল করছে। হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল, 'আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান'-আমি প্রশ্ন করলাম, কী ধরনের? ইংরিজি ঝালাবে। বই পড়? এই বয়সে পড়েছে শেক্সপিয়র! জ্যাক লন্ডন খুব প্রিয়, হেমিংওয়ের ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি পড়ে কেঁদেছিল। আমি হাভানার রেস্তোরাঁয় ওল্ড ম্যান প্রেগরিওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথা বললাম। গল্প গল্প। ছুটে ওপরের ঘর থেকে কবিতা নিয়ে এসে পড়ল, নিজের লেখা গান গাইল মৃদু গুঞ্জনে, সে গান ভবিষ্যতের মানুষকে নিয়ে। সাফল্য নয়, প্রেম নয়, দুঃখ নয় মানুষকে নিয়ে ওর কবিতা ও গান। আমি বাগানের সীমান্তে একটি নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চিতে বসে দূরের বন, নিচে আঙুর খেতের ফসল অলস চোখে দেখছি এমন সময় দূরে লাল টুকটুকে চেরির গোছা দুহাত ভরে ডায়ানা এগিয়ে আসছে দেখলাম। পাশে চুপ করে বসল। আমরা টকাটক চেরি খাচ্ছি আর কে কত দূর বিচি ছুড়ে ফেলতে পারি তার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছি। খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচল করে ছুড়ে দিচ্ছে অনেক দূরে। আমরা এবার চলেছি ছোট্ট ঝরনার কাছে। নাম জেমফিরা। গাঁয়ের নাম ভারজারেস্তি। পুশকিনের সময় সেখানে ছিল জিপসি বসতি। ওদের নাচগানে কবি আকৃষ্ট হন, ভালোবাসলেন দলপতি বুলিবাসির মেয়ে জেমফিরাকে। লম্বা চুলের দু বেণী, রঙিন ঘাগরা পরা সুন্দরী পাইপ টানছেন-ছবি দেখে এসেছি পুশকিন মিউজিয়ামে। পুশকিন একমাস জিপসিদের তাঁবুতে ছিলেন জেমফিরার সঙ্গে। গভীর বনে ঝরনার ধারে তাঁদের অভিসারের কথা সকলের মুখে মুখে। ঘাসের ওপর অলস বিশ্রামে বনবালিকার সঙ্গে প্রেম কাহিনীর মতো। হঠাৎ একদিন সুন্দরী উধাও এক তরুণ জিপসি সঙ্গীর হাত ধরে, ফেরার কোনও চিহ্ন না রেখে। আর তার দেখা পাননি কবি। নির্বাসন শেষে ওদেসায় বসে লেখা জিপসি কাব্যগ্রন্থে জেমফিরার কথা আর্তির মতো ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঝরনার জলে হাত ডোবালাম। স্ফটিকের মতো জল কী ঠান্ডা। প্রেমিক প্রেমিকা এই জল পান করতেন নাকি। ভালোবাসার উত্তাপে সবই সম্ভব হয় তো। জেমফিরা ঝরনা, নুড়ির ওপর দিয়ে জিপসি গানের কলির মতো গুনগুন বয়ে যাচ্ছে, দুধারে কদ্রির জঙ্গল ঘন রহস্যে ঘোর। হঠাৎ মেঘ করে এল পুশকিনের নির্বাসন জগতে। 'এমন নির্বাসনে যেতে অনেকেরই লোভ হবে'-রোমান্টিক গলায় চিয়োবানা বলে উঠলেন। দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টি, ফেরার পালা। আবার গাড়ি। ঘন কালো মেঘ সবুজ উপত্যকার ওপর ঝুলে আছে। পপলার গাছেরা দমকা হাওয়ায় পাতায় ঝালর তুলে যেন বলছে, বিদায় বিদায়। গরুর

গলার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। দুজন জোয়ান প্রায় গোটা তিরিশেক গরু তাড়িয়ে বাড়ি ফিরছে। রুসনা বললেন, সোভিয়েত আমলে তো সবই সমবায় পদ্ধতিতে চলত এখন গাঁয়ে-ঘরে সকলেরই একটা দুটো গাই গরু আছে। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় কে কোনদিন গোকুল নিয়ে মাঠে যাবে। খাওয়া পরার তো অসুবিধা নেই। এখানকার কালো মাটি এত উর্বর যে প্রবাদ আছে শুকনো চেস্টনাটের ডাল পুঁতে দিলে তিনদিনের মধ্যে কচি পাতার শোভায় গাছ দেখা দেবে। সবই আছে। রাসায়নিক সার না ব্যবহার করা যব, ভুট্টার অকৃপণ ফসল, দুধ, ছানা, ডিম, ফল-অভাব হচ্ছে টাকার। শিক্ষকেরা, সরকারি কর্মচারীরা ঠিকমতো মাসমাইনে পাচ্ছেন না। সোভিয়েত ব্লক ভেঙে যাওয়ার পর যে পরিস্থিতি তার সঙ্গে তাল দিতে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের মতো মলদভাতে এ রকম নানা সমস্যা। শুনেছি নিজের কাজ ছাড়াও জীবনধারণের জন্য প্রায় সকলকেই তিন-চারটি কাজ করতে হয়। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম, এরা নিজেদের রুমানিয়ান মনে করে। রাশিয়ানদের পছন্দ করে না। সোভিয়েতের মুঠি থেকে বেরিয়ে দেশটা রুমানিয়ার দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু রুমানিয়া কতটা দিতে পারবে তা নিয়েও সন্দিগ্ধ। তরুণেরা একটু গোলমালে পড়েছে। একটা ছকে বাঁধা জীবন হঠাৎ উধাও। বুড়োরা বলছেন, আগের আমলটাই ভালো ছিল। এ প্রজন্ম অন্য পথের সন্ধানে ব্রতী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। ইংরিজি শেখার জন্য সকলেই তৎপর। ফরাসিও।

এক জার্মান বন্ধুর কাছ থেকে রুসনা চোদ্দ বছর আগে বেশ কম দামে মার্সিডিজ গাড়িটি কিনেছিলেন। এখন যা তেল খায় তা ওর এক মাসের মাইনে। নিজে হাতে বাড়ি তৈরি করেছেন কিশোনোর যত পুরনো বাড়ি ভাঙা পাথর বসিয়ে। ১৯০০ সালের মার্সেইয়ের লাল টালির ছাদ। বাড়িতে ঢোকা হয়নি টাকার অভাবে। ভাড়া দিয়েছেন আমেরিকানদের। নিচতলায় পড়ে আছে তার স্বপ্নের পঞ্চাশ বর্গমিটার ঘর, যেখানে একদিন মিলিত হবে সাহিত্যিক, সুরশিল্পী, কবি-এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, ওদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার মানেই তো দেশকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আজ সকালে কমিশন থেকে লারিসা সাক্ষাৎকার ঠিক করেছে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে, তারা কেউ কবি, লেখক, সাংবাদিক। মারি মাগদালেনা কবি ও লেখিকা। কবিতা পড়লেন। কবিতা লেখার সময় স্কেচ করেন আবার। সাংবাদিকদের ভারতবর্ষ নিয়ে নানা প্রশ্ন। আবার প্রাতরাশ। গাড়ি অপেক্ষায় ছিল। আমি, শ্রীযুক্ত রুসনা আর তাঁর যোগ্য সেক্রেটারি লারিসা যাব বার্দার গাঁয়ের একটি স্কুলে। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় সেখানে একটি ফরাসি স্কুল তৈরি হয়েছে তা দেখা, ইওজিন ইউনেস্কোর জন্মভূমি দেখা আর সবার ওপর একটি গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। পথ থেকে উঠলেন ফরাসি ভাষার অধ্যাপিকা তামারা। সবুজের বন্যা দুধারে। আজও রোদে ঝকমকে দিন। কোথাও গির্জার চূড়া,

হ্রদের নীল পেরিয়ে শস্য ভরা উপত্যকা, আঙুর খেত পেরিয়ে অনেকটা পথ এলাম। স্কুলের সামনে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে। একটি যুদ্ধের স্মৃতিমিনার, মাঝখানে দৃপ্ত পুরুষ, একপাশে রমণী ও অন্য দিকে কিশোর পুত্র। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। একসঙ্গে সকলে বলে উঠল 'বঁজুর, সুপ্রভাত'। একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা, সামনে রোগা একটি মহিলার বসে থাকার ভঙ্গিটি করুণ কোমল অথচ দৃপ্ত। কথা বলতে গেলে সামনের দাঁতে একটু সোনা ঝিলিক দিচ্ছে। হেলেনের দুই কিশোরী ছাত্রী কী সুন্দর উচ্চারণে ফরাসি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল। তারপর ওদের নাচগান। হেলেনের মাতৃসমা দৃষ্টি ওদের দিকে। এরপর গেলাম তাদের বসার ঘরে। টেবিলে সাজানো ঘরে তৈরি খাবার, সোনালি ভদকা, সাদা ওয়াইন। গোল হয়ে বসেছি। ভারতীয় ছবি নিয়ে কথা শুরু। অচ্ছুতকন্যা দেখে সেজকিন চোখের জল ফেলেছে জানাল। রাজকাপুর এখনও হৃদয় দখল করে আছে এদের। 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি' গান আমরা একসঙ্গে গাইলাম। এরপর মুড়মুড়কি গানের সুর ওদের গলায় অবাক করে দিয়েছিল। ইউনেস্কোর কবিতা এক শিক্ষক গানে গেয়ে উঠলেন। অপেরা গায়কের মতো গলা। এক শিক্ষয়িত্রী গাইলেন ফরাসি গায়িকা এডিথ পিয়াফের বিখ্যাত গান, 'যখন জড়াও বাহুর আলিঙ্গনে'। 'বার্সি সেতুর ওপরে'। আমি শোনালাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'-কবির কাজের সঙ্গে এঁরা পরিচিত।

এখানকার মানুষেরা সংবেদনশীল, সাহিত্যপ্রেমী। ওদের ছবিতে দেখা ভারতীয় রমণী ও আমাকে এক করে নিয়ে হেলেন কী সুন্দর বলেন, ছোটবেলায় দেখা আবেগধর্মী ভারতীয় ছবির কথা। পারিবারিক সুখ-দুঃখ, কলহ, সংঘাত নিয়ে ছবি মেলোড্রামাটিক ছিল ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব মাসখানেক ধরে ওর মধ্যে থেকে যেত। 'তোমাকে আমি দেখেছি বোধহয় অন্য এক জীবনে। তোমার জন্য রইল প্রার্থনা ও ভালোবাসা। মনে রেখো, কোনও সন্ধ্যায় আকাশে তাকিয়ে দূর দেশ মলদভার গাঁয়ে কেউ একজন তোমার কথা ভাবছে'। গাড়ি পর্যন্ত দলটি এগিয়ে এল। বিদায় পর্ব। জানলায় টোকা। আবার হেলেন, সামনের সোনার দাঁতটি ঝলসে উঠল। চোখের নীল নিষ্প্রভ মণিতে একটু আলো। হাত মুঠি করে বিদায় জানাচ্ছে হেলেনের সঙ্গে পুরো গ্রামটাই।

পরদিন সকালে রাজধানী থেকে বেশ দূরের বুতুসেনি গাঁয়ে যাব। সেখানে দেখব বিখ্যাত ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় মঠের প্রত্নতাত্ত্বিক স্তূপ-Orheiul Vechi. দনা তাতিয়ানা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব। লাল টুকটুকে মুখ, চোখে কাজল আকর্ণ বিস্তৃত। এত রং মাখা মুখ বেশি দেখিনি এখানে। গাড়িতে বিশ বছরের দোভাষিণী রগিদা আর বুখারেস্টের মহিলা আনা কিয়োরতকা। সের্গেই বলিষ্ঠ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে। আপেল অর্চার্ড, আঙুর

লতা, যবের খেত পেরিয়ে কদ্রির দিকে চলেছি। মলদভার অনেকটা অংশই বনে ঢাকা। সচরাচর গাছ কাটতে চায় না এরা। সের্গেই বলে, 'কুঠারের ঘা যেন বুকের পাঁজরে আঘাত'। তবু কাটা হয় ওক, বার্চ যার চাহিদা দেশের বাইরে। আমরা বুতুসেনি গাঁয়ে ঢুকছি। রাউত ও নিসত্রু নদীর মাঝখানে এ উপত্যকা পাথরের গায়ে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়ানো। প্যালিওলিথিক, এনেওলিথিক (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক) ভগ্নস্তূপের খনন কাজ চলছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংস চিহ্ন নিয়ে প্রত্নতাত্বিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন, আমরা দেখতে চলেছি মধ্যযুগের বুতুসেনি ও বসি খ্রিস্টীয় মঠগুলি। গাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছি দূরে উঁচু টিলা দেওয়ালের মতো দাঁড়ানো, তার গায়ে মৌচাকের মতো বৃত্তাকার ছেঁদা। আরও উঁচুতে পুরনো গির্জার গম্বুজ। ছবি তুলব বলে গাড়ি থেকে নেমে এগোব, সের্গেইয়ের কঠিন মুঠির চাপে থেমে গেলাম। একটি কুচকুচে কালো সাপ পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে সরসর করে তৃণভূমির দিকে চলে গেল। গাড়ি এবার ক্লান্ত মুখের যিশুর মূর্তি ফটকের গায়ে দাঁড়ানো এক চাষীর বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গৃহস্বামিনী সাদা লাল কাজ করা অ্যাপ্রন কোমরে জড়িয়ে আমাদের আপ্যায়ন জানালেন। ভেতরে ঢুকেই কুয়ো। ফলের বাগান, ফুলের বাগান আবার একটু দূরে খেতে চাষবাস হচ্ছে। বাইরে টেবিলে ফুলতোলা জল তুলে পা ধুইয়ে দিল একটি কিশোরী। ওদের রীতি নাকি! আমরা বাড়ির আরেকটি রমণীকে গাইড নিয়ে বেরলাম। জীববিদ্যার অধ্যাপিকা ছিলেন। কোথায় কাজ মিলবে এখন? তাই বাড়ির দেখাশোনা ও ট্যুরিস্টদের গাইড হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তিন ছেলেমেয়ের মার সুঠাম শরীর দ্রুত উঠে যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের দিকে। আমরা সন্তর্পণে তাঁকে অনুসরণ করছি। ওপরে প্রাচীন মঠ পাথরের গুহার ভেতরে, তারও ওপরে ক্যাথিড্রাল। পথে ছোট্ট কবরখানা ফুলে ভরে আছে। কাঠের ফলকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর করুণ মুখ। একটি কচি বাছুর এই গরমে খুঁটিতে বাঁধা। করুণ হাম্বা রব, জল তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়। ওপরে গুহার মুখে লোহার দরজায় তালাচাবি দেওয়া। দূরে নিচ থেকে উঠে আসছে হাতে চাবির গোছা নিয়ে সত্তর বছরের মহিলা। তার ফোলা পায়ের পাতায় ক্লান্তি তবু আমাদের থেকে অনেক দ্রুত চলা দেখে অবাক মানি। দরজা খুলে দিলেন। পাথরের সুড়ঙ্গ। ভেতরে আরামদায়ক ঠান্ডা। এই পথ সোজা চলে গেছে মা মেরির পূজার বেদীর দিকে। ছোট মন্দির ঘিরে গড়ে উঠেছিল যাজকদের মঠ। পাথরের কোণে কোণে ঘরের আড়াল, পাথরের বিছানা। দূর থেকে দেওয়ালে যে মৌচাকের মতো গর্ত দেখেছিলাম তা হল গবাক্ষ। বাইরে পাথরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের দেওয়াল ঘিরে বয়ে যাচ্ছে রাউত নদী। দুয়েকজন চাষী মাঠে লাঙল চষছে। জিপসি মেয়েরা নিচু হয়ে ফসল পুঁতছে। মনে হচ্ছিল বর্তমান সময় পেরিয়ে মধ্যযুগে চলে গেছি। ভেড়ার চামড়ার টুপিতে মাথা ঢেকে আলখাল্লা পরা যাজকেরা মন্ত্রপাঠ করতে করতে যেন চক্রাকারে ঘুরে চলেছে মঠের সুড়ঙ্গ পথে।

গ্রামে ফিরে আসছি । বাড়িগুলো সব পাথরে তৈরি । বাড়িতেই ঢেলেছে যত ভালোবাসা । দেওয়ালে রঙিন সেরামিকের কাজ-নীল, সবুজ, হলুদ, লাল, ফুল লতাপাতা, খ্রিস্টের মুখ, চাঁদ, সূর্য খোদাইয়ে । প্রতিটি বাড়ির গায়ে রঙের আলপনা । দরজা খুলে যাচ্ছে । উৎসুক গ্রামীণ মুখের অভিবাদন, সমাদরের হাত নাড়া-কুয়োর ধারে গল্পগুজব করছে কয়েকজন । একটি কিশোরী জল নিতে এসেছে । সামনেই ওর বাগান ঘেরা বাড়িতে কী রঙের বাহার । বাবা ঘোড়া টানা গাড়িতে খেত থেকে কাটা শস্যের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য । কিশোরী স্কুলে যায়, কচি হাতে খেতে-বাড়িতে বাবা মাকে সাহায্য করে ।

আমরা ফিরে এলাম চাষী বাড়িতে । ততক্ষণে খাবারদাবার সাজানো হয়ে গেছে । বাগানের শশা, টম্যাটো, সদ্য তৈরি রুটির গোছা, পিঁয়াজকলি সসেজ কত রকমের! ঘরে তৈরি মাংসের পুর দেওয়া পরটা-প্লাচিনতা, সারমালে-ভাত আর মাংস দিয়ে বাঁধাকপির পাতা সাজিয়ে রান্না, মামালিগা-কর্নফ্লাওয়ার পরিজ আর সোনালি রঙের বাড়িতে তৈরি ওয়াইন । খাবারের স্বাদ জিভে লেগে আছে । কড়া কফি, চড়া রোদ, আলসেমিতে ঢুলে পড়ব, দেখি লোকসংগীতের একটি দল বাহারি জামাকাপড়ে সেজে কুয়োতলা দিয়ে এগিয়ে আসছে । দনা তাতিয়ানা ব্যবস্থা করেছেন । লাইয়াতুরের দল । অনেকটা আমাদের দেশের বাউলের মতো । হাতে কোবজাটি যেন একতারা । হাত ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না-কান্নার মতো বাজল সুর আর গান-‘মানোলে মানোলে, মাইমেপ মানোলে-’ লাইয়াতুর গাইল সেই নয়জন শিল্পীর কাহিনী যাঁরা রাজা নেগ্রুর আদেশে এক রমণীয় পাথরের মন্দির গড়ে তুলেছিলেন । কোন অভিশাপে রাতে মাটিতে গুঁড়িয়ে ভাঙল ধুলো হয়ে । দিনের পর দিন একই ঘটনা । রাজমিস্ত্রি মানোলে স্বপ্নে দৈবাদেশ পেলেন, খুব ভোরে প্রথম যার দেখা তাঁরা পাবেন তাকে পাথরে পুঁতে উৎসর্গ করলে মন্দিরের ভিত শক্ত হবে । পরদিন মানোলার সুন্দরী বৌ আন আসছে, দূরে পথে দেখা যাচ্ছে তাকে, যেন এক কৌতুকের খেলা এমনভাবে মানোলে মারলেন তাকে । শুরু হওয়া দেওয়ালের গায়ে একটি পাথরের ইট, দুটি ইট, দেওয়াল উঠে দাড়াঁল ।

‘সুন্দরী আন কোথায়?

অদৃশ্য তার কোমল পায়ের পাতা

সোনা রঙের উরু

ইটের নিচে পড়ে রইল ফেনার মতো শরীর...’

তৈরি হল নারীদেহ বলিদানের ওপরে নদীর ধারে আশ্চর্য এক মন্দির। এর থেকে সুন্দর প্রাসাদ আর যাতে কেউ না গড়তে পারে রাজা ওই নয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে। শিল্পীরা উড়ে পালাবার ডানা তৈরি করতে চাইলেন কিন্তু মরণই এল মুক্তি হয়ে। মলদভার গাঁয়ে আজও এই গান শোনা যায়, যেন ওই নয়জন স্থাপত্য শিল্পীর আত্মা ঘুরে বেড়ায় অন্য শিল্পীদের গানে।

লাইয়াতুরেরা খেতে বসেছে। রনদুনিয়া পাখিরা রুটির টুকরোর জন্য উড়ে উড়ে আসছে। চড়ুইয়ের মতো দেখতে। খুব দূরে কদ্রির বন থেকে শিস দিয়ে উঠল রোদিগো তোয়ারে-নাইটিঙ্গেল। রগিদা বলে উঠল, জানো আমার ঠাকুমা আমাকে আদর করে ডাকে রদিগা তোয়ারে। বিশ বছরের ভবিষ্যৎ চিন্তাক্লিষ্ট মুখটি এখন এই খোলা হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদ্দুরে সোনার মতো ঝকমক করছে।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

আমাদের ছোট নদী : পার্বতী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিয়াস খুব বড় নদী । হিমাচল প্রদেশের রোটাং পাস থেকে এর উৎপত্তি । ইচ্ছে করলে সে পর্যন্ত গিয়েও দেখে আসা যায় । পাহাড়ি খাত ধরে ঝরনার মতো নেমে এসেছে অনেকখানি । মানালি, কুলু, মাণ্ডি শহরগুলোর ধারে ধারে ঝরনার বদলে নদী নদী ভাব, তাও শীতকালে জলের বদলে পাথরই দেখা যায় বেশি ।

বিয়াস নামটির তাৎপর্য এখন অনেকটা বদলে গেছে । এখন অনেকের ধারণা, মহাভারতের স্রষ্টা ব্যাসদেবের নাম থেকেই এই নদীর নাম । পৌরাণিক কাহিনীটি অবশ্য অন্য । সেকালের মুনি-ঋষিদের নানা রকমের তেজ এবং নারীঘটিত কীর্তির কথা আছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, গভীর এবং নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বশিষ্ঠ । সেই নিরীহ ঋষিরও একশোটি পুত্রকে হত্যা করে কল্মাষপাদ রাক্ষস । নিদারুণ শোকে বশিষ্ঠ ঋষি প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প নিয়েছিলেন । হঠাৎ লাফ দিলেন উঁচু পাহাড় থেকে, কিন্তু তাতেও তাঁর পুণ্য শরীর অক্ষত রয়ে গেল । তবু সংকল্প থেকে বিরত হলেন না বশিষ্ঠ, শক্ত দড়িতে নিজের হাত-পা বেঁধে ঝাঁপ দিলেন তাঁর আশ্রমের সামনের নদীতে । কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতি এই মহাত্মার মৃত্যু চান না, তাই নদীর স্রোতে আপনা আপনি তাঁর বন্ধন খুলে গেল । বশিষ্ঠ আবার উদ্বুদ্ধ হলেন বেঁচে থাকার মন্ত্রে । এই নদী তাঁকে শাপ মুক্ত করেছে বলে, তিনি এর নাম দিলেন বিপাশা । সেই বিপাশা এখন বিয়াস । অবশ্য ব্যাসদেবের সঙ্গেও এই নদীর সংস্রব আছে, এর তীরেই নাকি ছিল ব্যাসদেবের আশ্রম । রোটাং পাসে যেখানে এই নদীর উৎস, সেই জায়গাটির নাম বিয়াসকুণ্ড ।

কুলু-মানালির সৌন্দর্য বিখ্যাত এবং সেই খ্যাতির টানেও সারা বছরই বড় ভিড় । এমনকী শীতকালেও পর্যটকদের স্রোত অব্যাহত । যারা কুড়ি বছর আগে মানালি গেছে, তারা এখন ওই জায়গায় গেলে চিনতেই পারবে না । যেমন স্বাতী পারেনি । আগেরবার এসে কোথায় ছিল, সে জায়গাটা খুঁজেই পায় না, আমাদের কাছে যা বর্ণনা দিয়েছিল, তা মেলে না কিছুই । ফাঁকা জায়গা একটুও নেই, হোটেলে-হোটেলে ধুল পরিমাণ । কী সব বড় বড় হোটেল, দেখলে তাক লেগে যায় । কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি এবং নিরাপত্তার অভাবের জন্য এখন ভ্রমণকারীরা দল বেঁধে আসে কুলু-মানালিতে । মধুর অভাবে গুড় যেমন । তা মধুর চেয়েও নতুন ওঠা ঝোলা গুড় কম সুস্বাদু নয় । কাশ্মীরের মতো বড় বড়

হ্রদ এখানে নেই, অত উচ্চ গিরিচূড়াও নেই, কিন্তু কুলু-মানালিতে যেন হিমালয়ের বুকের ওপর বসে থাকার মতো অনুভূতি হয় । কাশ্মীরের সঙ্গে এ জায়গার তুলনা টানা ঠিক নয়, দুটি জায়গা দুরকম, নিজস্ব ভাবে আকর্ষণীয় ।

আমরা ঠিক করেছিলাম নিরিবিলিতে একটা ছোট্ট জায়গায় থাকব । যে জায়গার নাম ট্যুরিস্ট ম্যাপে নেই, যেখানে কন্ডাক্টেড ট্যুর যায় না, যেটা তীর্থস্থান নয় । মাণ্ডির ডিভিশনাল কমিশনার সুদৃপ্ত রায় আমার বন্ধু ভাস্করের ভাগ্নে, সে-ই সুপারিশ করল, আপনারা কসোল-এ যান ।

প্রথমে বুঝতে পারিনি । কসৌলি তো বিখ্যাত জায়গা । ধরমপুর থেকে যেতে হয় । সেখানে পাবলিক স্কুল আছে, হাসপাতাল আছে, হিমালয় প্রেমিকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য একটি স্থান । সেখানে তো ভিড় লেগে থাকবেই । তাছাড়া, কসৌলি এখান থেকে অনেক দূরে ।

সুদৃপ্ত হেসে বুঝিয়ে দিল, কসৌলি নয়, কসোল, এর নাম বিশেষ কেউ জানে না, আমাদের রুচি বুঝেই সে বলেছে, সেখানে একটিমাত্র হোটেল ও কিছু গেস্টহাউস আছে । কোনওরকম উত্তেজনা নেই, আওয়াজ নেই । সুদৃপ্তর ব্যবস্থাপনায় পরদিন সকালেই আমরা রওনা দিলাম সেদিকে ।

মাণ্ডি থেকে কুলু-মানালির দিকে একটিই মাত্র পথ । বিপাশা নদীর পাশে পাশে । কখনও নদীর এপারে, কখনও ওপারে । মাঝে মাঝে যেমন ছোট ছোট উপনদী-শাখা নদী আছে, সেইরকম ছোট ছোট রাস্তাও বেরিয়ে গেছে এদিকে-ওদিকে । কুলু পৌঁছনোর আগেই আমরা সেরকম একটা পথে বেঁকে গেলাম ডানদিকে ।

মাঝে মাঝে রাস্তাটি বেশ সরু, রোমাঞ্চকর বলা যেতে পারে, হঠাৎ দুদিক থেকে দুটি গাড়ি এসে পড়লে বুক দুরু দুরু করে । এইসব রাস্তায় বাস উল্টে পড়ার দৃশ্য একবার না একবার চোখে পড়বেই ।

এই রাস্তার পাশে পাশেও একটি নদী । নাম জানা গেল, পার্বতী । বেশ সরল, সুন্দর নাম । চওড়া বেশি নয়, তাই জলের তোড় টের পাওয়া যায় ।

কসোল-এ পৌঁছবার আগে রাস্তায় যেসব মানুষজন দেখা গেল, তাদের মধ্যে বিদেশিই বেশি । পরে শুনেছিলাম, যে-কোনও কারণেই হোক, ইতালিয়ানদের কাছে এই ক্ষুদ্রস্থানটি বেশ জনপ্রিয় ।

হোটেলটিতে পৌঁছে আমরা আশ্বস্ত হলাম ।

পুরো হোটেলটিতে আমরা ছাড়া আর লোকই নেই বলতে গেলে। এটা হোটেলের মালিকের পক্ষে দুঃখের বিষয় হলেও আমাদের বেশ ভালো লাগল। একটু পরেই জানা গেল, এত যে সাহেব-মেম আসে, তারা সাধারণত হোটেলে ওঠে না, তারা দু-তিন মাসের জন্য গ্রামের মধ্যে বাড়ি ভাড়া নেয়, নিজেরা রান্না করে খায়। সেই জন্যই অনেক সুন্দর সুন্দর কটেজ তৈরি হয়েছে এ অঞ্চলে।

আমরা মোট চারজন, কিন্তু আমাদের তিনটি ঘর লাগে। স্বামী-স্ত্রীর একটি, পয়সা বাঁচানো গেলেও ভাস্কর ও অসীম কিছুতেই এক ঘরে শুতে রাজি নয়। অসীমের ধারণা, ভাস্করের খুব জোরে নাক ডাকে, তাই এক ঘরে থাকলে সে রাতে ঘুমোতে পারবে না। ভাস্করের জোরে নাক ডাকে ঠিকই, যেমন আমারও রীতিমতো নাসিকা গর্জন হয়, সেটা স্বাতীর সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু অসীমের নিজেরও যে নাক ডাকে, তা সে জানে না। বিয়ে তো করল না, না-হলে তার স্ত্রীই জানিয়ে দিত।

পাশাপাশি তিনটি ঘর পাওয়া গেল সহজেই। ডাকলেই বেয়ারারা ছুটে আসে, অন্য কোনও কাজ নেই তো! হোটেলটার চারদিকে যেন ঘিরে আছে পাহাড়, কয়েকটি চূড়া বরফমণ্ডিত। পাহাড়গুলির গায়ে নিবিড় জঙ্গল। আর হোটেলের পিছন দিকে, অদূরে পার্বতী নদী।

নদীর ধারে ধারে আপেল-বাগান। এই অঞ্চলের আপেল বিখ্যাত। আপেল আর পর্যটন, এই দুটি কারণে এখানকার মানুষদের দারিদ্র্য বেশ কম।

সন্ধেবেলা আড্ডা হয় ভাস্করের ঘরে। ফেব্রুয়ারি মাস, দিনেরবেলাতেই বেশ শীত, সূর্যাস্তের পর বাইরে বেরতেই ভয় করে। ভাস্কর আর অসীম তিন যুগ ধরে আছে লন্ডন ও প্যারিসে, কিন্তু ঘরের মধ্যে বসেও ভাস্করের বেশি শীত করে। গায়ে জড়িয়েছে চাদর, পায়ের কাছে জ্বলন্ত হিটার। সেই তুলনায় অসীমের শীতবোধ কম।

যখন আমরা একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই, ভাস্কর অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়ে আসে। প্রচুর কাজু বাদাম, নানা রকম বিস্কুট, চানাচুর, এমনকি জোয়ান-এলাচ মেশানো মশলা পর্যন্ত। নানাবিধ উত্তম পানীয় তো থাকবেই, এবং অবশ্যই অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট ডজন ডজন। জীবনের আর সবক্ষেত্রে ভাস্করের স্বভাব এলোমেলো ও ভুলোমনা, শুধু ভ্রমণের ব্যাপারেই তার পরিকল্পনা নিখুঁত।

প্রথমে চা দিয়ে শুরু হয়, তারপর কড়া পানীয়, আড্ডার ঝোঁকে রাত গভীর হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে একমাত্র স্বাতীই আগে দুবার কুলু-মানালি ঘুরে গেছে, অনেকদিন আগে অবশ্য, সেই জন্য এবারে এদিকে আসার ব্যাপারে তার প্রাথমিক আপত্তি ছিল। কিন্তু

কসোল তার পছন্দ হয়ে গেল। এখানকার নিস্তব্ধতা, আবার পাহাড়ের গম্ভীর উপস্থিতি। দুটি মিলিয়ে বিচিত্র অনুভূতি হয়।

ভাস্কর ঘুম-কাতুরে, জাগে অনেক দেরিতে। স্বাতী উঠে পড়লেও তার বাইরে বেরবার জন্য প্রস্তুত হতে সময় লাগে। অসীমের স্বভাবে কৌতূহলবৃত্তি প্রবল, যে-কোনও নতুন জায়গায় গিয়ে সে চতুর্দিক ঘুরে দেখে নিতে চায়। তাছাড়া তার ফটোগ্রাফির ঝোঁক, ক্যামেরার ব্যাগ তার কাঁধে ঝোলানো থাকে সব সময়, তাতে তিন-চার রকম ক্যামেরা, পাঁচ-ছরকম লেন্স। সকাল সকাল অসীম বেরিয়ে পড়তেই আমি হলাম তার সঙ্গী।

আপেল বাগানের একেকজন মালিকের সীমানা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, তাই প্রথমে নদীর ধারে পৌঁছবার রাস্তাটা খুঁজে পাইনা। হোটেলের সামনের রাস্তাটা চলে গেছে মণিকরণের দিকে। সেটা ধরে খানিকটা এগোতেই একটা সরু পথ চোখে পড়ল নদীর দিকে। পথ মানে বড় বড় পাথর ফেলা, যেতে হয় ডিঙিয়ে। আমাদের বাংলা-বিহারে যে-কোনও লোকালয়ের নদীর ধারে সকালবেলা না যাওয়াই ভালো, গেলে অনেক পুরুষের বসে থাকা উন্মুক্ত পশ্চাৎ দৃশ্য দেখতে হয়। এখানে কেউ নদীকে সেভাবে ব্যবহার করে না। তাছাড়া এই শীতে বরফ-গলা নদীর জল ছোঁবে কে?

উঁচুর দিক থেকে নেমে আসছে পার্বতী নদী, ধাপে ধাপে, তাই তার স্রোতে মৃদু কুলুকুলু ধ্বনি আছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভাঙা ডালপালা। নামের জন্যই নদীটিকে মনে হয় সুন্দরী রমণী, সে যেন আপনমনে গান গাইতে গাইতে চলেছে।

জলের মধ্যে একটি আধো-ডোবা পাথরে একটি ফড়িং একেকবার বসছে আর উড়ে যাচ্ছে। ঠিক মুহূর্তে ফড়িংটিকে ধরবার জন্য ক্যামেরা তাক করে আছে অসীম, মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। ভালো ছবি তুলতে ধৈর্য লাগে। আন্তর্জাতিক দুয়েকটি প্রতিযোগিতাতেও অসীম তার ছবি পাঠায়। ফড়িং-মাকড়সা-গুবড়ে পোকা, এইসবের ছবিই নাকি বেশি পুরস্কারযোগ্য। আমার অত ধৈর্য নেই। আমি ফড়িংকে ছেড়ে দেখতে থাকি নদীর ওপারের বনরাজি। মনে হয়, হঠাৎ যেন ওর মধ্য থেকে হরিণ বেরিয়ে আসবে। আমি সুন্দরবনে গিয়ে কখনও বাঘ দেখিনি, কিন্তু ভোরবেলা লঞ্চের ছাদ থেকে দেখেছি জঙ্গলের প্রান্তে এক পাল হরিণ।

জঙ্গলের ওপাশে পাহাড়ের চূড়া, প্রথম সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে বরফ। স্বর্ণকিরীট একেই বলা যায়। অসীমকে বললাম, এই পাহাড়ের ছবি তুলবে না? দ্যাখো, দ্যাখো-

মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ায় বিরক্তভাবে ভুরু কুঁচকে বলল, ওতে নতুনত্ব কী আছে?

পাহাড়ের তুলনায় একটি ফড়িং-এর ওড়াউড়িতে কী এমন নতুনত্ব থাকতে পারে, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বুঝলে তো আমিও ফটোগ্রাফার হতাম।

একটু পরে অসীম বললে, চলো, নদীটার ধার দিয়ে দিয়ে খানিকটা এগোই।

বেশি দূর যাওয়া গেল না অবশ্য। নদীর কিনারে কোনও রাস্তাই নেই, অনবরত পাথর ডিঙোতে হয়, কোথাও ডিঙোনোও যায় না। পার্বতী নিরিবিলিতে থাকতে চায়।

দুপুরবেলা আমরা এগোলাম পাকা রাস্তা ধরে, গাড়ি নিয়ে। কিছু দূরেই মণিকরণ, একটি তীর্থক্ষেত্র। হিন্দু এবং শিখ, দুই ধর্মেরই তীর্থ বলে সারা বছরই এখানে জনসমাগম লেগে থাকে।

মণিকরণের কাছাকাছি এসে পার্বতী নদীর এমন একটা রূপ চোখে পড়ে, যার তুলনা পাওয়া ভার। নদীর জল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে!

এদিককার কোনও পাহাড়ের হিমবাহ থেকেই এই নদীর উৎপত্তি। বরফ-গলা জল নিশ্চিত ঠান্ডা হবার কথা। কিন্তু এই অঞ্চলে যত্রতত্র উষ্ণপ্রস্রবণ। নদীর ধার ঘেঁসেও কোথাও কোথাও মাটি ফুঁড়ে উষ্ণপ্রস্রবণ বেরিয়ে আসছে, সে জল এমনই গরম যে নদীকেও তপ্ত করে তুলেছে।

একদিকে গাড়ি রেখে, একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে মণিকরণে যেতে হয়। সেতুর নিচে দেখি, এক জায়গায় পার্বতী নদী টগবগ করে ফুটছে। এরকম দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি।

গুরু নানক নাকি মণিকরণে এসেছিলেন, তাই শিখদের কাছে এই স্থানটি খুব পবিত্র। একটা প্রকাণ্ড ধর্মশালা রয়েছে। আর সব উষ্ণপ্রস্রবণকেই হিন্দুরা তীর্থস্থান মনে করে। একটি বড় রামমন্দির আছে, আরও অনেক মন্দির। কয়েক জায়গায় প্রকৃতির গরম জলে স্নান করার ব্যবস্থা।

অনেক শ্বেতাঙ্গ সেখানে দিব্যি কালো মানুষদের সঙ্গে স্নান করছে। কয়েকটি হোটেলেও ওইরকম স্নানের ব্যবস্থা আছে, হোটেলের বাথরুমে উষ্ণপ্রস্রবণের জল।

তীর্থস্থান মানেই প্রচুর টুকিটাকি জিনিসপত্রের দোকান, আর রেস্টুরেন্ট। এক জায়গায় দেখি, বাংলায় লেখা, 'বউদির দোকান'। সেখানে নিশ্চিত ভাত-মাছের ঝোল পাওয়া যায়। আমি প্রবাসে গিয়ে বাঙালি খাওয়া একেবারে পছন্দ করি না। নিত্যি তিরিশ দিন বাড়িতে যা খাচ্ছি, প্রবাসে বেড়াতে গিয়েও তা খাব কেন? প্যারিসে আমাদের এক বাঙালি বন্ধুর স্ত্রী ফরাসিনী। তাঁদের বাড়িতে গেলেই বন্ধুর স্ত্রী আমাদের ভাত-ডাল-তরকারি খাওয়াবার জন্য

ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অপটু হাতের রান্নায় ডাল-তরকারির চেয়ে ফরাসি খাদ্যদ্রব্য পেলে যে আমরা অনেক বেশি প্রীত হতাম, তা তাঁকে বোঝানো যায় না।

মণিকরণ একটি উপত্যকার মধ্যে। চতুর্দিকের দৃশ্য ভারি মনোরম। ভাস্কর বলল, আগে এই জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল, এখন এত বাড়ি-ঘর উঠে ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, আমি এখানে এত বাড়ি বানানো নিষিদ্ধ করে দিতাম!

অসীম বলল, ওটাই তো এ দেশের দোষ। কেউ কিছু চিন্তা করে না, সুন্দর জায়গাকে সুন্দর রাখতে জানে না।

অসীম ও ভাস্কর দুজনেই বিদেশে থাকে, ওদের পাসপোর্টও ভারতীয় নয়, কিন্তু অসীম এ দেশের নিন্দে শুরু করলেই ভাস্কর তার বিপক্ষে চলে যায়। স্বাতীও তখন ভাস্করের সঙ্গে যোগ দিয়ে অসীমকে বকাবকি শুরু করে। আমি অধিকাংশ সময়েই নিরপেক্ষ শ্রোতা।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর স্বাতী বলল, এখানে একদিন থেকে গেলে হয় না?

তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজন পুরুষ একমত হয়ে জানালাম যে, না, তা হতেই পারে না। ভিড়ের জায়গায় থাকব না ঠিক করেই এসেছি, এর চেয়ে কসোল অনেক ভালো।

আমি মন্দির-মসজিদ-গির্জা বাইরে থেকেই দেখা পছন্দ করি। স্বাতী ভেতরেও যেতে চায়। এখানকার মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য-স্থাপত্যের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তাই কাছে গিয়েও দেখার মতো কিছু নয়। কিন্তু স্বাতী দুয়েকটি মন্দিরের ভেতরে যাবেই ঠিক করেছে। ভাস্কর শিভালরি দেখিয়ে সঙ্গ দেয় স্বাতীকে।

অসীম ছবি তোলার জন্য বিষয় খুঁজতে চলে যায় এদিক ওদিক। আমি বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করি একটি চায়ের দোকানের বেঞ্চে।

চা অত্যন্ত বিস্বাদ, দুধে ফোটানো, বেশি চিনি। কম চিনির ব্যাপারটা এরা বোঝেই না। আজকাল ট্রেনের চাওয়ালারাও আগে থেকে মিষ্টি মিশিয়ে রাখে, তাতে বাইরে চা খাওয়ার আনন্দটাই চলে গেছে! মাটির ভাঁড়ও নেই, সেই সোঁদা গন্ধ মেশানো চায়ের জন্য মন কেমন করে।

সিগারেট টানতে টানতে উল্টোদিকের বাড়ির দেওয়ালে একটা বড় পোস্টার চোখে পড়ল। মাঝখানে একটি যুবকের ছবি, তার তলায় লেখা, দশ হাজার ডলার পুরস্কার।

উঠে গিয়ে ইংরিজিতে লেখা পোস্টারটি ভালো করে পড়লাম।

খুব মর্মস্পর্শী ব্যাপার। কানাডার এক মহিলা সেই পোস্টারটি লাগিয়ে গেছেন। ছবিটি তাঁর একমাত্র ছেলের, সে নিরুদ্দেশ। দুমাস আগে সেই ছেলেটি এই মণিকরণ থেকে তার মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিল, তারপর থেকে আর তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা নিজে এখানে এসেছিলেন খোঁজ করার জন্য। এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে পোস্টার লাগিয়ে গেছেন অনেক জায়গায়।

ফিরে এসে দোকানদারটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির বিষয়ে কিছু জানেন নাকি?

দোকানদারটি বললেন, ওই বিদেশি যুবকটিকে তিনি চিনতেন। মণিকরণে থেকেছে অনেকদিন। এই দোকানে চা খেতেও আসত। একদিন সে পার্বতী নদীর উৎস সন্ধান করতে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একা চলে গিয়েছিল পাহাড়ে। আর ফিরে আসেনি। পাহাড়ের পর পাহাড়, কোথায় সে হারিয়ে গেছে, কী করে আর জানা যাবে!

আমি পার্বতী নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

যুবকটি কি শেষ পর্যন্ত পার্বতীর উৎসমুখে পৌঁছতে পেরেছিল? কত দূর থেকে এসেছিল সে, একা একা কেন গেল ওই দুর্গম পাহাড়ে।

সে বোধহয় এই নদীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। নদী তাকে বুকে টেনে নিয়েছে?

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৯

.দবলোকের পথে পথে

অশোক চক্রবর্তী

বেসক্যাম্প রাহুং পর্যন্ত পর্যটন বিভাগের বাসে যাওয়ার কথা । কিন্তু বেসক্যাম্পের পৌনে ১ কিলোমিটার আগেই রাস্তায় ধস । নেমে পড়তে হল । বনবাসের আগে সীতার অবস্থা অনুভব করতে পারছি । আমাদের এই বনবাসযাত্রা অরুণাচলের পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রায় অজ্ঞাত পথে ।

যে যার রুকস্যাক পিঠে তুলে নিলাম । বিদায় নিতে হবে দলের অন্যদের কাছ থেকে । প্রায় ৫০ কিলোমিটার চড়াই-উতরাই নিজের পায়ে চরে খাওয়ার জন্য । চরে খাওয়াই বটে । ছয় ট্রেকারের সঙ্গে পাঁচদিন চার রাতের রেশন নিয়ে পাঁচ পোর্টার আর পথ জানা আপাতানি যুবক মিচি তাজো । 'ভ্রমণ'-এর এই অভিযাত্রী দলে আছে সর্বকনিষ্ঠা মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা শূন্য, ট্রেকিং-অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার মধুপর্ণা দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি, সবচেয়ে বয়স্ক । অভিজ্ঞতা? 'ভ্রমণ'-এর জন্য 'হিলারির পথে' ট্রেকিং কাহিনীর অনুবাদ করেছিলাম মাত্র । গতবছরও বিষ্ণুপুরের ছোট পাথরের চাঙর বাইতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে ক্ষান্তি দিয়েছিলাম । বরাবর ট্রেকিং রসে বঞ্চিত । এযাত্রায় না হলে বুঝতাম না লোকে কোন সাধে খামোকা শামুকের মতো বোঝা বয়ে পাহাড়ে চড়তে যায় । কেন দিনের পর দিন অমূল্য সময় খরচ করে । জানতাম না, পাহাড়ের যে আকর্ষণে আমরা ট্রেনে-প্লেনে-বাসে-ট্রেকারে বারবার ছুটে যাই, ছুটি কাটানোর ট্যুরিস্ট স্পট খুঁজে বেড়াই, তা পাহাড়লোকের বিস্ময়ের আভাসমাত্র । ট্রেকাররা ছোটে তার গহন গভীরের টানে । অভিযান ও আবিষ্কারের রোমাঞ্চে ভরা সে এক অন্য অনুভূতি ।

ট্রেকিং শেষে বাসে করে ফেরার সময়েও সেই গতি আমার শরীরমন জুড়ে । পাশে পাহাড় দেখলেই মনে মেটাল ডিটেক্টরের সাড়া-পায়ে সুড়সুড়ি-কোথায় আছে পথের চিহ্ন, যে পথ গেছে নগরসভ্যতার থেকে বহুদূরে বুনো ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের মতো ফুটে থাকা কোনও পাহাড়ি গ্রামে । জীবনযাপনের অপরিসীম লড়াইয়ের মধ্যে আতিথেয়তায় ভরা সেই জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্য এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ৮-১০ কিলোমিটার বা আরও দূর-দূরান্তের পথে একেকটি দেবলোক দর্শন । শুধুমাত্র পথের কষ্ট সহ্য করেই সে পুরস্কার পাওয়া সম্ভব । পথের কষ্টও তো পথই ভোলায় তার রোমাঞ্চ ও ঐশ্বর্যে । তাছাড়া পাহাড়ে চড়া

তো নিজের ক্ষমতার পাহাড়েই চড়া-তাকে তিল-তিল অনুভূতিতে আবিষ্কার করা । সেও এক নেশা ।

ফেরার বাসযাত্রায় বিভোর ছিলাম পায়ে পায়ে পথভাঙার দিনগুলির স্মৃতিতে । সেই পথকে বিদায় জানাতে পারিনি । বরং পাহাড়ে-পাহাড়ে আমন্ত্রণ । পুনরাগমনায় চ । আবার আসব । আসতেই হবে ।

প্রথম দিন

রাহুংয়ের ধসটুকু পেরিয়ে বেসক্যাম্প পর্যন্ত মিনিট পনেরোর সমতল রাস্তা । তারপর রান্না খাওয়া সেরে মূল ট্রেকিং শুরু । এবার নেমে যেতে হবে বাঁদিকের নালার মতো পথে । ওটাকে এতক্ষণ মনে হয়েছিল স্থানীয়দের প্রাতঃকৃত্যের অলিগলি । এই পথেই একশো মিটারের মতো নেমে আবার উঠতে হবে সামনের পাহাড়ে, ডানদিকে । এ একটা কাজ বটে । পরেও দেখেছি, যখনই কোনও পাহাড়ে উঠতে হবে, তার আগে আছে অনেকটা নেমে সেই পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছনো । পা থেকে মাথায়, আকাশে-পাতালে, এপাশে-ওপাশে, এপিঠে-ওপিঠে ঘুরিয়ে পাহাড়ের এ এক খেলা বটে ।

পথনালায় মলমূত্র নেই, তবে কাদা জোঁক জংলায় হুঁশিয়ার থাকতে হয় সর্বক্ষণ । পিছলে যাওয়ার ভয়ে পা রাখছিলাম পথের দুধারের ঝোপজঙ্গলে । পা ফাঁক করা কাঠের পুতুলের মতো থপথপ করে । তাতে জংলার থেকে জোঁকে ধরার ভয় বেশি, বিশেষত এই বৃষ্টির পর । আর কিছুদিন পরে অবশ্য জোঁক শীতঘুমের জন্য মাটির নিচে অদৃশ্য হবে । এই জোঁক-জংলা-কাদাকে জয় করাও আমাদের ক্রমশ শিখে নিতে হয়েছে । শুনেছি, এক জায়গায় প্রথমজনের পদক্ষেপে জোঁকের ভয় তেমন থাকে না, দ্বিতীয়জন একই জায়গায় পা রাখলে জোঁক তৎপর হয়, তৃতীয়জনকেই নাগালে পায় । ফলে তৃতীয়জনকে বিশেষ সাবধান হতে হয় । চোখ খোলা রেখে বা গা-হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে বা আগের জনের পায়ের ছাপ এড়িয়ে । আগাগোড়া উইন্ডচিটার জাতীয় পোশাকে ঠিকমতো মোড়া থাকলে জোঁক সহজে শরীরের ছোঁয়া পায় না, তবে এরকম পোশাকে শিলেমূলে মোড়া থাকাও বেশ কষ্টকর-খুব শীতেও ট্রেকিংয়ের সময় দরদর করে ঘাম হয় । পাহাড়ের চোরাগোপ্তা ঠান্ডার কথা জানা ছিল, কিন্তু ট্রেকিংয়ে ক্রমাগত ঘেমে আমরাও ক্রমশ পাহাড়িদের মতোই বেপরোয়া ও সহনশীল । তবে কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি, হাঁটার সময় উইন্ডচিটারের চেন খুলে ফেলতে যেমন বাধ্য হচ্ছি, তেমনই হাঁটা বন্ধ হওয়ামাত্র চেনও বন্ধ । তাতে ঘাম গায়ে বসে না, বাইরের ঠান্ডাও লাগে না । এই ব্যাপারটায় প্রথমদিকে অবশ্য আমার একটু মুশকিল হয়েছিল । বেসক্যাম্পে পৌঁছনোর আগে বমডিলায় এক সেনা-অফিসার পরামর্শ

দিয়েছিলেন, এরকম পাহাড়ি উচ্চতার দেশে বছরের এই সময়ে খাঁটি উলের মোটা সোয়েটারেও শানাবে না, লাগবে চামড়া বা ফারের গরম পোশাক বা কোট। তাছাড়া গ্লাভস, উলের মোজা, মাফলার, টুপি। ড্রয়ার তো চাই-ই। ঠান্ডা জল একদম নয়-স্নান, পান এমনকী দাড়ি কামাতেও গরমজল অপরিহার্য। না হলে, আমরা সমতলের লোক- নির্ঘাত নিউমোনিয়া! আমাদের দলপতি, ট্রেকিং পর্বের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন 'ভ্রমণ'- সম্পাদক নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন। অতএব, উইন্ডপ্রুফ কাম ওয়াটারপ্রুফের নিচে চাপাতে হল গেঞ্জি, ড্রয়ার, জামা, হাল্কা সোয়েটার, তার ওপর ভারি সোয়েটার, প্যান্ট, টুপি। উইন্ডচিটারের নানা উপকার অবশ্যই পেয়েছি পুরো ট্রেকিং পর্বে, তার নিচে শুধু অন্তর্বাস পরেই চলেছি আরামে, রাতে ঘুমিয়েছি ওই পোশাকেই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে, কিন্তু প্রথমদিনের কয়েকপ্রস্থ পোশাকে ঘেমেনেয়ে একাকার। সারাটা পথ সেই সেনা-অফিসারের মুণ্ডপাত না করে পারিনি। একে বৃষ্টি-কাদার চড়াই, চোখের ঘামের ফলে ঝাপসা চশমা খুলে রাখতে হয়েছে, জুতোর মধ্য কাদাজল আর ঘাম, ভেতরের জামাকাপড়ও জবজবে। তায় সন্ধে ঘনিয়ে এল। দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকার। পা আর চলতে চায় না। কিছুটা হাঁটার পর বিশ্রামের প্রয়োজন ক্রমশ বেশি করে টের পাচ্ছি। যেদিক থেকে আসছি সেদিকে ফিরে দু-পা ফাঁক করে দুই হাঁটুতে হাতের চেটো রেখে মাটির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির বিশ্রাম। তাতে মসৃণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে শরীরে অক্সিজেনের জোগান বাড়ে, আরাম লাগে। আবার নতুন করে চলা যায়। সেই নতুন করে চলার ক্ষমতাও ক্রমশ কমতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ থেমে থাকলে কেউ সহজে জানতে পারবে না দলভ্রষ্টের কথা। থাকতে হবে অনিশ্চয়তার মধ্যে। সে অভিজ্ঞতা বিকেলের দিকে হয়েছিল-প্রথম পৌনে একঘণ্টার মতো উতরাই-চড়াইয়ে হাঁটার পর। তার আগে দলের সবাই রাহুংয়ের পাহাড়ি নদী দিগিন-এর সাসপেনশন ব্রিজ পেরিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম (ব্রিজের রেলিং দিয়ে জলের স্রোতের দিকে কিছুক্ষণ তাকালে মাথা ঘুরে যায়)। পোর্টাররা আগে এসেছিল, আগেই রওনা দিল। আমিও এবার তাদের পথ ধরলাম। মিনিট কুড়ি এগিয়েই পথ দুমুখো। বুঝতে পারলাম না কোথায় যাব। শেষপর্যন্ত চড়াইয়েই যেতে হবে বলে আমিও ধরলাম ওপরের পথ। কিন্তু হাঁটছি তো হাঁটছি, আগে-পিছে কারও সাড়া নেই। তবে কি ভুল পথে এসেছি? আমি হারিয়ে গেলাম? আরও ওপরে ওঠার ভরসা পাই না। নিচের অতটা পথ নেমে যাওয়াও সামর্থ্যের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নেওয়া। কিন্তু নেমেও যদি দেখি কেউ নেই, অন্য পথে হতো অনেকদূর কোথাও এগিয়ে গেছে-তাহলে? একে-একে দলের সবার নাম ধরে ডাকলাম মুখের দুপাশে হাত দিয়ে, এদিকে ফিরে, ওদিকে ফিরে। কোথাও কোনও সাড়া নেই। বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে এক অসহায়তা। কেউ কি টের পাবে, আমি যে দলে নেই? ট্রেকিংয়ে কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে তো পড়েই-যার যেমন চলার সার্মথ্য বা গতি। বারবার পিছনের লোকেদের খোঁজ নিতে হলেও চলে না-

পেরে ওঠা কঠিন। কে কাকে দেখবে? প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝি মানুষকেও নিষ্ঠুর করে তোলে। অসহায়কে তাই লড়াই করতে হয় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে। হয় পথ থাকে, না হয় থাকে না। পরে বুঝেছি, সমুদ্র যেমন কোনও কিছুকে নেয় না, সবই ফিরিয়ে দেয়, পাহাড়েও তেমনই পথ সহজে হারায় না, শেষপর্যন্ত এক জায়গাতেই পৌঁছে যায়-দিকজ্ঞান যদি ঠিক থাকে।

ঝুঁকি নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসেছিলাম। একসময় নিচের জঙ্গলের আড়ালে মানুষের কথাবার্তা। তারা যে আমাদেরই লোকজন সে বিষয়েও প্রায় নিশ্চিত। কারণ পথ দেখে মনে হয় না এখানে এরকম সময়ে লোকজন যাতায়াত করে। একটু পরেই উঠে এল দলের পিছিয়ে পড়া লোকেরা। তারা আমার হাঁক একটু-আধটু শুনেছিল, তবে তার মর্ম বুঝতে পারেনি। ভেবেছে পাহাড়ের অন্য কারও আওয়াজ। হায়! পরে পরীক্ষা করে দেখেছি, চিৎকার করে জানান দিলে আগের বা পিছনের দল কখনও তা ঠিকমতো শুনতে পায়, পাল্টা আওয়াজ দেয়, কখনও আবার আদৌ আওয়াজ দেয় না, ঠিক শুনতে না পেয়ে। যদিও দূরত্ব মোটামুটি এক বা কমই। আসলে পাহাড়ে তো ঘুরে-বেয়ে ওঠা। তাই দলের লোকেদের প্রতি আর আওয়াজের গতি একমুখি বা অভিমুখি হলে তবেই শোনা যায়, ভিন্নমুখি হলে তা নাও হতে পারে। যতই চেঁচাই। এরপর আর দলছাড়া হইনি। ক্রমশ মন্থর হয়ে আসা পায়ে বৃষ্টি-কাদা-অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চলার কঠিন পরীক্ষা। তিনঘণ্টার মধ্যেই শরীরটা বোঝা হয়ে উঠল। সামনের যে যখন যেখানে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ায়, সে সুযোগে নিজেও না দাঁড়িয়ে পারছি না। প্রতি পদক্ষেপে মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই। পাষাণের মতো শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নেওয়া। পিছিয়েও পড়েছিলাম। আমাদের লাইটহাউস বরুণ। সামনে-পিছনে টর্চের আলো দুলিয়ে পথ-বিপথ জানান দিচ্ছিল। অন্ধকার হলেও এটা তো ঠিকই যে কখনও-কখনও পা একটু বেশি পাশের দিকে পড়লেই আর দেখতে হবে না। পরিণাম কেউ বলতে পারে না। আমাকে পিছন দিক থেকেও গার্ড দিয়ে চলল সঙ্গী অভিযাত্রী। পাহাড়ি ছেলে হলেও ওর এটাই প্রথম ট্রেকিং। আমাকে আগলাচ্ছিল বটে, যদিও আমার পা ফসকালে ওরও একই অবস্থা হবে।

সন্ধে ৭টা নাগাদ প্রায় সওয়া ৪ কিলোমিটার পেরিয়ে কিছুটা সমতল পথ। ভুট্টার খেত বা এইরকম কিছুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। বৃষ্টিতে-অন্ধকারে ওসব খেয়াল করার মতো বোধশক্তি তখন এমনিতেই ছিল না। শরীর-মন নির্বিকার। হাত-পা যেন অন্যের। ধৈর্য ভাঙছে। মনে হল, পোর্টাররা আর যারা এগিয়ে গেছে যাক, আমরা গা এলাই, এখানেই রাত কাটাই, যা হয় হোক। সঙ্গের মেয়েদের কথা ভেবে তবু চলতে হল। মাতালের পায়ে। ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ দূরে আলো। তাহলে এসে গেছি? কিন্তু টর্চের আলো হাতে

দেবদূতটির দেখা পেলাম আরও মিনিট-দশেক নবোদ্যমে চলার পর। সে থেম্বাং গ্রামের এক কিশোর। আমাদের আগের লোকেদের মুখে খবর পেয়ে গ্রামের মানুষগুলিই ব্যস্ত হয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এইসব পথে এরা হরিণ। ৫-৭ কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া এদের কাছে নিশ্বাস নেওয়ার মতোই স্বাভাবিক। আমরা কাদা, ঘোড়ার মল ও জঙ্গলের বিছুটির মধ্যে আরও আধ ঘণ্টার মতো নাস্তানাবুদ হয়ে গ্রামের মানুষদের মধ্যে পৌঁছলাম যেন এক উৎসবের রাতে। রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে। আমাদের দেখতে ও আলো ধরতেই যেন তারা হঠাৎ রাতে জেগে উঠেছে। বাচ্চা, মেয়ে, বয়স্ক-সব বয়সের মানুষ। অনেকেরই হাতে কাঠের আগুনের মশাল। ইনস্পেকশন বাংলোয় পৌঁছলাম রাত সাড়ে আটটায়। মোট ৭ কিলোমিটার পথ সাড়ে চার ঘণ্টায়। আগের দল অবশ্য ঘণ্টাখানেক আগেই পৌঁছে রান্নাবাটি শুরু করে দিয়েছে। ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে লেপের তলায় পা গরম করলাম। আজকের পথ বড় কষ্টের। বড় রুক্ষ। বৃষ্টির জল ছাড়া কোনও জলরেখা দেখলাম না।

দ্বিতীয় দিন

ভেবেছিলাম রাতে পায়ে আর পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হবে। সকালে দেখি শরীর বেশ ঝরঝরে। একঘুমে সব মেরামত। ঠিক করেছিলাম, ট্রেকিং আর জীবনে নয়। কিন্তু এখন হার মানতে রাজি নই। সাড়ে আটটায় আবার রওনা, হাল্কা জলখাবার খেয়ে। কালকের ভিজে গেঞ্জি-মোজা-জামা পরেই। সোয়েটার ইত্যাদির বোঝা পিঠের রুকস্যাকে। ইতিমধ্যে দলে কিছু শৃঙ্খলা তৈরি করে নেওয়া হল। যারা আগে থাকবে তারা চলার পথে রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে দেখলে চিহ্ন রেখে যাবে। আর, পথ জানা লোক থাকবে পিছনের দলের সঙ্গে। আজ উত্তরে ৯ কিলোমিটার রাস্তা। সেমনাক যাব। ইনস্পেকশন বাংলোর বাঁয়ে পঁচিশ-ত্রিশ গজ নেমে বাঁয়েই সোজা হাঁটা। এই পথেই কাল এসেছিলাম পিছন থেকে। থেম্বাংয়ের মানুষজনের পরিচয় রয়ে গেল রাতের সেই আলো-অন্ধকারেই যা কিছু।

পথ অনেকটা সমতল। কোথাও অল্প চড়াই-উতরাই। পৌনে একঘণ্টার মতো চলার পর শুরু হল জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেফিরে কাদার বিড়ম্বনা। আগের দিনের বর্ষার ফলে। কোথাও অবস্থা এতই সঙ্গিন যে ঝরনার ধসে একহাঁটু কাদার মধ্যে পাথর ফেলে চলতে হচ্ছে। হাত ধরাধরি করে পেরোতে হয়েছে ভাঙা রাস্তার খাদ। এমনিতেই আজকের প্রায় অর্ধেক পথে কাদাটা একটু বেশি নরম ও গভীর। এরই মধ্যে একসময় দ্বিতীয় দলের থেকে একটু এগিয়ে গেছি। হঠাৎ সামনে বেড়া। আর কোনও পথ নেই। পথ একমাত্র ওই বেড়ার গেটের ওপরে দেখা যাচ্ছে। অগত্যা ঢুকে গেলাম গেট খুলেই। বন্ধ করবে

পিছনের শেষ দলের লোকেরা। এই পথেই গেছে আগের দলের লোকের পায়ের ছাপ। নিশ্চিন্ত। আরও প্রায় আধঘণ্টা চলার পর জলকাদার বুনো ভাব কাটল। রাস্তাও অনেক সমতল। সামনে পাংমা গ্রাম। কাছাকাছি আরও দুটো গ্রাম-গুন্ধু, সামনাং। তিন গ্রামের মাঝামাঝি চোখজুড়নো সমতল সবুজ প্রান্তর। অরণ্যের ঘেরাটোপ থেকে কিছুক্ষণ খোলা আকাশের নিচে। মন ভরে যায়। বসে দুদণ্ড বিশ্রাম নিতেই হয়। বসলাম। চারপাশে শাকসবজি-ভুট্টার খেত। সামনে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে নিচের জমিতে আদিবাসীদের কয়েকটা কুঁড়ে। বাঁশ-কাঠ-বেড়ার ছাউনি। একটির চালে উঠে একজন কী বিছোচ্ছিল আর কাকে কী বলছিল। এখান থেকে শোনা যায়। পাহাড়ি অ্যাকসেন্টে ভরা সে বাক্যালাপ আমাদের কানে বকাঝকার মতো। দাজু (দাদা) বলে হেঁকে সেমনাকের পথ জানতে চাইলে সে আমাদের দিকে তাকাল, কিন্তু উত্তর দিল না। বোধহয় হিন্দি বোঝে না। বোধহয় সে 'দাজু' নয়, দিদি।

বাঁদিকের খেতের মধ্য দিয়ে গাঁয়ে ফিরছিলেন এক বৃদ্ধ, সঙ্গে তরুণী কন্যা নাকি ভার্যাই। বৃদ্ধের বয়স সত্তরের ওপর। চাষআবাদ করেন। জানালেন, আমাদের আগের দলের লোকদের তিনি দেখেছেন। সামনেই আমাদের রাস্তা। উতরাইয়ের পথ। তবে একটু বাঁপাশের রাস্তায় ঘুরে গেলে কষ্ট কম হবে, নাহলে আবার কষ্টের চড়াই। রওনা দিলাম। উতরাইয়ের শেষে ঝরনার ছোট সাঁকো পেরিয়ে আবার চড়াই। হঠাৎ দূরে পিছনের দলের লোকেদের সাড়া পেলাম ঝোপের আড়াল থেকে। জবাবে পথের জানান দিলাম।

অল্প কিছুটা চড়াই ভেঙে আবার সমতল। আরও এগিয়ে একটা কাঠ-বাঁশের ছাউনি দেওয়া মাচা। এরকম জায়গায় একটু বসে জিরনোর লোভ সামলানো যায় না। জোঁকের উপদ্রব আজকের জঙ্গলের পথে ও এই মাচাতেও কম নয়। জামাকাপড় ঝেড়েঝুড়ে নিলাম। আবার রওনা। পথে আবার উতরাই, ঝরনা, চার ঝরনার সঙ্গম, ছোট সাঁকো। সারা পথে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ের কাছাকাছি রয়েছে দুয়েকটি করে 'মানি'-বৌদ্ধদের একরকম ধর্মীয় স্তম্ভ। ছোট পাঁচিলের মতো। পোর্টাররা তার ওপাশ দিয়ে ঘুরে যায়, গাঁথনির খাঁজে খাঁজে জমা গুল্ম উপড়ে ফেলে। এটি এখানকার একটি পথকল্যাণ আচার। আমাদের দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শেষ হল এরকম পাশাপাশি তিনটি ও আরেকটু এগিয়ে আরও কয়েকটি মানির কাছে। মোট ৯ কিলোমিটার পেরোতে আজ আমার সময় লাগল প্রায় চারঘণ্টা। আজও প্রথম দল পৌঁছেছে একঘণ্টা আগে।

গাঁওবুড়ার সম্মতিতে থাকার ব্যবস্থা হল পাশের গুম্ভায়, রান্নার জন্য এক গ্রামবাসীর হেঁসেল একটু নিচে। গুম্ভায় রান্না খাওয়া নিষেধ। রাতে খাওয়া-থাকার এই ব্যবস্থায়

অসুবিধা হতে পারে ভেবে পঁচিশ-ত্রিশ মিটার ওপরে সেমনাক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাইকে ধরা হল। স্কুলে পুজোর ছুটি, অতএব থাকার জায়গা দিতে তাঁর আপত্তি নেই, বরং অতিথিসঙ্গ পেতে তিনি আগ্রহীই। রান্নার জন্যও তাঁর হেঁসেলই ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুলই তাঁর ঘরবাড়ি। সেমনাকে ভোটার সংখ্যা ৫২। ভোটের সময় বাবুরা এসে দানখয়রাতি করেন। এই প্রাইমারি স্কুলের একই ঘরে চার ক্লাস। কাছাকাছি একটি সেকেন্ডারি স্কুল আছে ৭৫ সাল থেকে, সে স্কুলের কেউ আজ পর্যন্ত সেকেন্ডারি পাশ করেনি। এসব স্কুলে মাস্টারমশাইদের নিয়োগ হয় সারা দেশ থেকে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। প্রায় নির্বাসিত জীবন। কাটাতে হয় অনেকটা আদিবাসীদের মতোই। অত্যাবশ্যকের বাইরে কিছু জোটানো বিলাসিতার স্বপ্নমাত্র। কিছু কিনতে হলে হাঁটতে হবে পনেরো-বিশ কিলোমিটার রাস্তা। মুনা ক্যাম্পের বাজারে। চাল-ডাল-আটাও কিনে আনতে হয় সেখান থেকে, মাসে একবার বা দুবার। সওদা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দোকানিই পাঠিয়ে দেয়। ঘোড়া ভাড়া অন্তত একশো টাকা। এখানকার আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা-মকাই। ভাতও খায়। শস্য, আটা এমনকী স্থানীয় বিয়ার 'ছাং' বা 'রকসি' ওই মকাই থেকেই। মেয়েরা মকাই আনে দূরের জঙ্গলে গিয়ে। তাদের ফেরার পথে পিঠের টোকরায় তাজা মকাইয়ের ছড়ায় কাঁচা সোনার রং ভারি লোভনীয় দেখায়। টোকরা পিঠে ফুটফুটে মেয়েদের সারিই এক নিসর্গ দৃশ্য। এখানকার জীবনযাত্রায় এই পাহাড়-কন্যাদের দেখলে বোঝা যায় অর্জুন বা অন্যান্য রাজাবাদশারা কেন এখানে-ওখানে গেলে দুয়েকটা বিয়ে করে বসতেন।

গ্রামের মানুষের সবই নিজেদের ব্যবহারের জন্য। অরুণাচলের সব গ্রামেই। মকাই, সবজি, ডিম, মুরগি-যেখানে যা পাওয়া যায় কেউ বিক্রি করতে রাজি নয়। ঘরের অতিথিকে অবশ্য এরা আপ্যায়ন করে অকৃপণভাবে। কিন্তু পয়সার বিনিময়ে বা ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদম নয়। তবে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ কেউ কেউ বিক্রি করে। এখানকার মানুষদের প্রধান স্টোর সম্ভবত ওই কাঠই। রোদজলের মধ্যে থাকে-থাকে উঁচু করে সাজানো। সেমনাকে আমাদের রান্নার জন্য কাঠ কিনতে সাহায্য করেছিল ১৭-১৮ বছরের একটি ছেলে শামসিং। ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের প্রজেক্টে কাজ করে, মাইনে ৬৬০ টাকা। অরুণাচলের পোর্টারদেরও সরকার ওই মাইনে দেন। ট্রেকার-পর্যটকদের প্রয়োজনে এইসব পোর্টার বরাদ্দ করেন ডেপুটি কমিশনার। ভাড়ার মূল্য পোর্টারপ্রতি দিনে একশো টাকা। শামসিং পরে লাগাম পর্যন্ত আমাদের পথপ্রদর্শক হয়েছিল।

সেমনাকে কুয়াশা জমতে থাকল বেলা চারটে থেকেই। পাঁচটার মধ্যে নিচের গুম্ভা, তার নিচে গ্রাম, সামনের পাহাড়ের সারি-সব অদৃশ্য। কুয়াশা পরে আবার কমছে। আমাদের দলের অনেকেই সন্ধে পর্যন্ত নিচের গ্রামে কাটিয়েছে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন,

আমরা চাইলে গাঁওবুড়া আদিবাসী নাচের ব্যবস্থা করে দেবেন । তারজন্য অবশ্য পয়সা খরচ হতে পারে । এরকম জায়গায় এই সন্ধ্যায় আদিবাসী নাচ ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগে । শেষপর্যন্ত অবশ্য গাঁওবুড়ার কাছে অনুরোধটা জানানো হয়নি ।

তৃতীয় দিন

সকালে রোদ । এতদিনে এই প্রথম । ভিজে জামাকাপড় শুকিয়ে নেবার জন্য মেলে দিলাম । কিন্তু সময় কই? কাল বিকেলেও শুকোতে দিয়েছিলাম । তাতে যত না শুকিয়েছে তার চেয়ে বেশি ভিজেছে কুয়াশায় । জুতোজোড়া রাতে উনুনের পাশে দিয়েছিলাম । এই সুযোগগুলো কুড়িয়ে নেওয়া দরকার ।

রওনা হলাম আটটায় । আধঘণ্টার মতো উতরাই ভেঙে আবার চড়াই । বাঁপাশের পাহাড়ের কোলে-কোলে এগিয়ে বাঁদিকে চলে গেলাম ওই পাহাড় ও সামনের সংযোগপথে । জোঁকের কামড় আমরা প্রায় সকলেই খেয়েছি সেমনাকে আসার পথে । এবার তাই জুতো-মোজায় আচ্ছা করে সবাই নুন মেখে নিলাম, নুনগোলা জলে জুতো ধুয়ে । উইন্ডচিটারের পা তো মোজার মধ্যে ঢোকানো ছিলই, গেঞ্জিও ভালো করে প্যান্টের মধ্যে গুঁজে জামার চেন টেনে দিলাম । জোঁক ঢোকার পথ গলা পর্যন্তই বন্ধ । সেমনাকে আমায় জোঁকে ধরেছিল পুরো প্যান্ট-জামা বেয়ে গেঞ্জির গলা দিয়ে ঢুকে । সরু জোঁক নাভির কাছে কামড়ে লেগে ছিল । নধরকান্তি বীভৎস দৃশ্য । ছাড়িয়ে দেওয়ার পরেও টপটপ করে রক্ত পড়ে বহুক্ষণ । এই জোঁকের রাজ্যেও এখানকার মেয়েরা জঙ্গলে যায় হাওয়াই বা সস্তা চপ্পল পরে বা খালি পায়েই । ছেলেদের পায়ে সাধারণত গামবুট জাতীয় জুতো থাকে । মেয়েদের জন্য যত্নআত্তি এখানেও কম । পুরুষদের রোজগার সাধারণত দিনমজুরির কাজে ।

আজকের পথ সবচেয়ে বেশি খাড়াই হবে বলে শুনেছিলাম । ১০ কিলোমিটার পথ, উঠতে হবে আরও দুহাজার ফুট উঁচুতে, মোট ৮,৯০০ ফুট উচ্চতায় । উত্তরদিকে । সবাই একসঙ্গেই রওনা দিয়েছিলাম, ক্রমশ দল কয়েক টুকরো হয়ে গেল গতির বেশি-কমে । আমি হয়ে পড়লাম একা দ্বিতীয় দল । পিছনের লোকদের জন্য রেখে যাচ্ছি পায়ের ছাপ, যদিও বেশিরভাগ পথই শুকনো । পা পিছলনোর ভয় কম, তবে জোঁকের ভয় আছে । তাছাড়া খাড়াই পথে উঠতে কষ্ট ও সময় বেশি লাগলেও ওঠা যায় কম সতর্ক হয়ে । পাহাড়ের এই এক মজা । খুব খাড়াই পথেও ওঠার সময়ে প্রতি পদক্ষেপকে সে বুক পেতে আগলাবে, কিন্তু নামার পথে একটু অসাবধান হলেই পদস্খলনের ভয় ।

আজ প্রথম দেড়ঘণ্টায় একদম থামিনি বলা যায় । কিন্তু ফুসফুস ক্রমশ হাপর হয়ে উঠছে । ফেটে না যায় । গলা শুকিয়ে কাঠ । সঙ্গে ঠান্ডা সরবৎ আছে, কিন্তু এত গলদঘর্ম অবস্থায় খেতে সাহস হল না । লজেন্স-চিউইংগাম ছিল, মুখে পুরে দিলাম । লজেন্সের মোড়ক অবশ্য পকেটেই রেখে দিলাম, কারণ পর্যটনপথে এসব ফেলা উচিত নয় । প্রকৃতির বুকে দূষণ এড়ানোর জন্য । প্লাস্টিক, রাংতা ইত্যাদি যেহেতু আগুন ছাড়া আর কিছুতেই নষ্ট হয় না, এসব পুড়িয়ে ফেলাই শ্রেয় ।

ইতিমধ্যে স্লো বাট স্টেডির একটা কৌশল আমি ছকে নিয়েছি । ক্লান্তির শাসনে আর বিশ্রাম নয়, এখন বিশ্রাম নেব নিজের পরিকল্পনার মতো । খাড়াই পথে গড়ে ৮৫-৯০ ফুট চলার পর আধমিনিট বিশ্রাম অর্থাৎ উল্টোমুখে হাঁটুতে ঝুঁকে শ্বাসপ্রশ্বাস । তারপর আবার হাঁটা । সমতল পেলে সেটুকু পথও বিশ্রামের মতো কাজে লাগানো যায়, পিঠ সোজা করে আরামসে হেঁটে । সময়ের ঝুঁটিও তো এভাবেই ধরা যায় পরিকল্পনা করে । পথ তো সময়েরই একটা রূপ ।

আজ ঘুরপ্যাঁচ একটু বেশি । কয়েক জায়গায় লুপওয়ের মতো । একজায়গায় অর্ধগুহা । আশপাশে এমন দুয়েকটা পথও বেরিয়ে গেছে আগের দিনগুলিতেও দেখেছি, যাতে শুধু ঘোড়ার খুরের ছাপ । স্থানীয়দের কাছে জেনেছি, ঘোড়ারা ওই পথে চরতে যায় । মানুষের গন্তব্যে ওপথে যাওয়া যাবে না, চলাও কষ্টকর ও বিপজ্জনক । পথে একটা মিথুন । ঝোপের মধ্যে । লাজুক জীব, দাঁড়িয়েছিল একটু আড়ালে । একটা কুকুরও হঠাৎ কোথা থেকে এল, আমায় দেখে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল । আর, এক জায়গায় দেখেছিলাম একপাল হিং-দাড়িওলা ছাগল । হাতে লাঠি নিলাম, তারা পালিয়ে বাঁচল ।

প্রায় আড়াইঘণ্টা চলার পর একটু ফাঁকা মাঠের মতো । তারপর বিশেষ পথচিহ্ন দেখা যায় না । এখানে বসতে হল । কারণ রুকস্যাকের পিঠের বেল্ট ছিঁড়ে গেছে । সঙ্গে দড়ি নেই, সুঁচসুতো নেই, এই বোঝা এবার কী করে বইব? অনেক চেষ্টাচরিত্রে সমস্যার সামাল দেওয়া গেল, বেল্টকে ঢাকনার নিচে দিয়ে গলিয়ে । তারপর সামনে উঁচুতে পথ ঠাউরে হাঁটা দিলাম ঝোপের মধ্যে । অর্থাৎ ঝোপে-ঝোপে চড়াই অব্যাহত । ঘুরেফিরে উঠছি আর ফেলে আসা ফাঁকা জায়গাটায় চোখ রাখছি । পিছনের দলের কেউ যদি ওখানে আমার মতো ধাঁধায় পড়ে । একসময় দূর থেকে রূপজ্যোতিকে দেখে হাত নাড়লাম ।

আরও ঘণ্টাখানেক পাকদণ্ডীর পর মানুষের অস্তিত্ব টের পেলাম । কোথা থেকে একটা নিয়মিত আঘাতের আওয়াজ আসছে । আলাদা করে শব্দ অনুসরণ করতে হল না, পথই নিয়ে গেল সেদিকে । পঁচিশ-ত্রিশ ফুট ওপরে একজন কাঠ কাটছে । এরকম ধরাশায়ী মড়া গাছ এযাত্রায় বেশ কয়েক জায়গায় দেখেছি । সন্দেহ হল, বিষ দিয়ে মারা হয়েছে ।

গোড়ার দিকে খানিকটা ছাল চৌকো করে তুলে নিয়ে সেখানেই ঢালা হয়েছিল মারণবস্তু। এই কাঠুরে অবশ্য জ্বালানির কাঠ কাটছিল। জিজ্ঞাসা করলাম লাগাম কোথায়, কতদূর। ও যা বলল, বুঝলাম এসে গেছি। লাগামের আস্তানায় পৌঁছলাম আধঘণ্টার মধ্যেই। মোট চারঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার। পর্বতারোহী ওনিয়ম, সেমনাকের শামসিং আর দুই পোর্টার মিলে প্রথম দল পৌঁছেছে একঘণ্টা আগে। এটি সেমনাকের মতোই পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম, তবে লম্বায় অনেক বড়। আমরা উঠলাম একেবারে শেষপ্রান্তে। এখান থেকে ডানদিকে মুখ করে হাঁক পাড়লে দূরের অন্য পাহাড় থেকে মৃদু প্রতিধ্বনি ফিরে আসি।

আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা। মুখে বয়সের আঁকিবুঁকি, কিন্তু ঋজু শরীর, চলাফেরায় সমান ক্ষিপ্রতা। আদিবাসী-আভিজাত্যের ছাপ আছে। শীতবস্ত্র কোমরে বেল্ট দিয়ে বাঁধা, নিচে মেখলা। অলঙ্কারও দর্শনীয়। সুপুরির মতো মোটা রঙিন পুতির মালা মাথার দুপাশ থেকে নেমে এসেছে কোমরের বেল্ট পর্যন্ত। মাথায় তা আটকানো ছোট পুতির মালায়, গলায়ও ওরকম ছোট পুতির কয়েকছড়া মালা। পায়ে গামবুটের মতো জুতো। ফটো তুলতে দিতে চান না, তুললে বকশিস চান সলজ্জ ঠাট্টার ভঙ্গিতে। হিন্দি বলতে পারেন না। সিগারেট দেখে চাইলেন, পরে ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত উনুনে ধরিয়ে সুখটান। ট্রেকিংয়ের শুরু থেকেই দেখছি, এই উনুন ব্যাপারটা অনেকটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। রুম হিটারের মতো জ্বলে চলেছে, ঘর ধোঁয়ায় ভরা, তারই মধ্যে সংসারযাত্রা। শহরজীবনে হলে দুদিনেই ফুসফুসের রোগ অবধারিত। রাহুংয়ে দেখেছি, সেমনাকে দেখেছি, পরে ছান্দেরেও-অতিথি-আগন্তুকের জন্যও উনুন অবারিত। সেখানেই আমরা রান্নাবাটি সারছি, ব্যবহার করছি তাঁদের রান্নার তৈজসপত্র, পুরো দলের লোক সেই ঘরের মধ্যে বসছি, খাওয়া-দাওয়া সারছি, গৃহকর্ত্রী হয়তো সেই ধোঁয়ার মধ্যেই নির্বিকারচিত্তে বসে বা শুয়ে দিনাতিপাত করছেন। খাটপালঙ্ক বা কোনও আসবাব নেই। কাঠ-বাঁশের তৈরি আস্তানায় নিরুপকরণ জীবনযাত্রার সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এত দারিদ্রের মধ্যেও এইসব উপকারের বিনিময়ে এঁরা কোনও মূল্য দাবি করেন না। এঁরা বিশ্বাসী, পরিশ্রমী, প্রাণোচ্ছল, সাহায্যে তৎপর ও অকপট। এই দেবদুর্লভ গুণের সরল মানুষগুলিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য হাজারও ট্রেকিংয়ের কষ্টও সার্থক। এঁদের মুখে হাসির আলোও কি কোনওদিন ভুলব। পৃথিবীর মধ্যেই এ এক গ্রহান্তর। জামাকাপড়, জুতো, টিনের কৌটো-এসব কিছু-কিছু জিনিস ব্যবহার করলেও সভ্য জগতের থেকে এঁরা বহু যোজন দূরে। হ্যাঁ, এঁদের ছেলেপুলেরাও লেখাপড়া শিখছে, এই গ্রামেও স্কুল চালু হয়েছে পাঁচবছর হল, কিন্তু পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ওই স্কুলেই যা কিছু। বৃদ্ধার এক ছেলে চুন্ডু, আর আছে একটা ঘোড়া। ছেলে মিতভাষী, পড়াশোনা করেনি। গুম্ভার দেখভাল করে, সকালে সন্ধ্যায় আলো-জল-বাতি দিয়ে আরাধনা। এখানকার লাগোয়া গুম্ভায়, আরও কয়েকটি গ্রামের গুম্ভায় এই কাজ।

বদলে রেশন পায় গাঁওবুড়াদের থেকে । এখানকার গাঁওবুড়িকে বলে সে লাগোয়া গুম্ভায় আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে । গুম্ভার দায়িত্বে আছে বলে চুন্ডু বিয়ে করেনি, করতে পারবেও না । বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, যদিও প্যান্ট-শার্ট-জুতো পরে । গুম্ভায় রাত্রিবাস অবশ্য সুখের হয়নি, তার ব্যবস্থাপত্র হতেও সারাটা দিন কেটেছে বাইরে, বৃদ্ধার উঠোনে ।

পরদিন সকালে এযাত্রার প্রথম ন্যাচারাল টয়লেট । জোঁকে-কাদায় ভরা জঙ্গলের মধ্যে । জোঁকই এখানকার ছারপোকা-বিছে-পাখির ইয়ে । এতসব আতঙ্ক ও অস্বস্তির মধ্যেও প্রকৃতির ডাক বড় ডাক ।

লাগামে লালরঙের মাশরুম খেলাম তরকারি করে । দলের লোকেরাই জঙ্গল থেকে তুলে এনেছে । অনেকটা আচারের স্বাদ ।

চতুর্থ দিন

এবার উত্তর-পশ্চিমে ছান্দের যাত্রা । রওনা দিলাম সকাল আটটায় । প্রথম একশো মিটার চড়াই, তারপর দশ কিলোমিটার প্রায় আগাগোড়া সমতল রাস্তা । কিছুটা চওড়াও । উঠে মনে পড়ল আগের দিনের রাত্রিবাসের সমস্যা ও তার জন্য অহেতুক সারাটা দিন নষ্ট হওয়ার কথা । অথচ এই প্রশস্ত রাস্তার পাশে চমৎকার তাঁবু খাটানো যেত, চোখের সামনেই ঝরনা, ফলে সকালের কাজকর্ম থেকে শুরু করে আরও বহু সমস্যারও সহজ সমাধান হত । এই জায়গা থেকে খাড়া ওপরে উঠলে অজেয় গোরিচেন শৃঙ্গের বেসক্যাম্প দূর থেকে দেখে আসা যায় । সময়াভাবে সেপথে যাওয়া হল না । আমরা ছান্দের যাওয়ার সিধে রাস্তা ধরলাম । এরাস্তায় গাড়িও যেতে পারে, যদিও গাড়ি চলার কোনও চিহ্ন কোথাও দেখলাম না । মাঝেমধ্যেই দেখেছি রাস্তার সংস্কার চলছে, মোটরেবল করার জন্য । প্রথমদিকে মিনিটদুয়েক পরপরই ঝরনা । আর দেখবার মতো মাঝেমধ্যে রকমারি কাটা পাহাড়ের বিশাল ভঙ্গিমা ও রং । এভাবে পাহাড় কেটেই রাস্তা বানানো হয়েছে । এক জায়গায় মস্ত গাছ আমূল উপড়ে পড়ে আছে পথের বাধা হয়ে । রাস্তার বিদ্যুতের তার জড়িয়ে ছিঁড়ে গেছে । দুয়েক জায়গায় ছোটখাটো ধসও দেখা গেল-ওপর থেকে বহু নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে । দু জায়গায় রাস্তা মেরামতি ও নর্দমা পরিষ্কারের কাজ চলছে । পুরুষ-মহিলা মজুররা মিলে । এই সমতল রাস্তায় চলার কষ্ট কম, কিন্তু পথ দীর্ঘ । ছোট্ট মাঠের মতো এক জায়গায় পৌঁছে পথ খুঁজে নিতে হল ডাইনে দশ-পনেরো ফুট নেমে । ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি চমরি গাইয়ের মুলুকে । কয়েক পাল চমরি চরতে দেখা গেছে এখানে-ওখানে । দেখেছি ভেড়া চরানোও । আড়াই ঘণ্টা মতো পার হয়ে এসে বিরল দৃশ্য । বরফে ঢাকা

কাংটো শৃঙ্গ । ডানদিকের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে । আমাদের সামনে নিচে ছোট গ্রাম । চমরি চরছে রাস্তার পাশেই । ওই রাস্তার দিনমজুররা ছাড়া এরপর আর জনমনুষ্যের দেখা মেলেনি । সর্পিল নিশ্চিত পথে আবার আমি একা । ঘণ্টাখানেক পর সামনে বাঁপাশের রাস্তা থেকে কারা হেঁকে ইশারা করছে । সেখানে যাওয়ার নির্দেশ । একটু পরে চিনতে পারি, ওরা আমাদেরই পোর্টাররা । আমার থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েও ওরা আগে পৌঁছে গেছে অন্য শর্টকাট রাস্তায় । আমিও সামনের পথটুকু শর্টকাট করলাম বাঁদিকে সামান্য চড়াইয়ের জমির মধ্য দিয়ে । এটিই ছান্দের । থুংরি মালভূমির লাগোয়া একটি গ্রাম । উচ্চতায় 'পৃথিবীর ছাদ' পামির মালভূমির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হলেও এটিও হাজারদশেক ফুট উঁচুতে পাহাড়ের একটি ছাদ । অতএব অবাধ কুলকুল হাওয়া, ঠান্ডা । সামনে অনেক নিচে সরু রুপোলি রেখার লাগোয়া একফালি সবুজ । পরদিন ওখানে পৌঁছতে আমার সময় লেগেছিল পাক্কা সাড়ে পাঁচঘণ্টা । ওটিই আমাদের ট্রেকিংয়ের সমাপ্তিস্থল-সাংতি ।

ছান্দেরে রাস্তার বাঁদিকে মিনিট-দশেক এগোলেই গাঁওবুড়ার বাড়ি । কাঠ-পাথর বাঁধানো পাকা দোতলা । হেঁসেল আলাদা । বেশ অবস্থাপন্ন । ছেলের মোটর সাইকেল আছে । সে শহরে কাঠের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা করে । এ অঞ্চলে আগে টেলিফোনের ডোমেস্টিক লাইন ছিল, কেটে নেওয়া হয়েছে চিনা আক্রমণের সময় থেকে ।

একটা লোভ হয়েছিল আজকের পথের শুরু থেকেই । চমরির দুধ খাব । গাঁওবুড়ার সুন্দরী পুত্রবধূর কাছে জানতে চাইলাম আশপাশে কেউ দুধ বেচে কিনা । বলল, কেউ বেচে না । বাড়তি দুধ দিয়ে মাখন, চিজ তৈরি করে । চমরির চামড়ার আধারে জমিয়ে । আমার মনোবাসনা জানতে পেরে ঘর থেকে এককাপ দুধ এনে দিল । অপূর্ব স্বাদ । ঘরেপাতা দই একটু নষ্ট হলে যেমন লাগে, গন্ধ অনেকটা সেইরকম । চিজও খেয়েছি । কিনতে পেলে কিছুটা নিয়ে যেতাম । এখানে একটা মুরগিও কেউ বিক্রি করে না । ঘরে ঘরে চেষ্টা করেও একটা কিনতে পাইনি আমরা । আসলে এসব জায়গায় মানুষের ভরণপোষণ তো এই পশুপাখি শাকসবজি ও অন্যান্য ফসলের ওপর নির্ভর করেই । স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রা । কিছু কিনতে হলে ছুটতে হবে সেই মুন্না ক্যাম্পে ।

কথা ছিল, এখান থেকে তিন হাজার ফুট নিচে নাম-সু গ্রামের পথ ধরব খাওয়াদাওয়ার পর । রান্নাবান্নার আয়োজনও তাই শুরু হয়েছে গাঁওবুড়ার হেঁসেলেই । কিন্তু প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের ছাদের ওপর বিকেল ও রাত কাটানোর মায়া ত্যাগ করা অসম্ভব । কলকাতায় আজ ষষ্ঠীর দুর্গাপুজো । নাম-সু যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হল । এখানে একটাই বড় সমস্যা, খাবার জল আনতে হয় প্রায় আধ কিলোমিটার দূর থেকে । তা, জলবাহক হতেও আমরা রাজি, যত দূরই হোক । থাকার ব্যবস্থা করে দিল গাঁওবুড়ার

ছেলে, এখানকার স্কুলবাড়িতে । সামনে বেড়াঘেরা বিরাট মাঠ-চমরি-ছাগল-মুরগির চারণভূমি । এমন স্থান-কাল-পরিবেশ, অতএব সন্ধেয় মজলিস বসতে বাধ্য । পাহাড়ের ছাদে বাংলা, হিন্দি, নেপালি, অসমিয়া ও মণিপুরী গানে, আবৃত্তিতে এক বিরল সমারোহ । সঙ্গে স্থানীয় ছাং, দুরমের-একটিতে চমরির মাখন ও মশলা মেশানো, অন্যটিতে অন্য মশলা ।

এখানে গ্যাসলাইটার সহজে জ্বলে না, বাতাসে অক্সিজেন কম বলে । বিকেল আড়াইটে-তিনটে থেকে কুয়াশা জমছিল । নিশ্বাসে মেঘ বুকে নিচ্ছি । হু হু হাওয়ায় এই প্রথম উদ্যোগ করে গরম পোশাক পরতে হল । স্কুলের চত্বরে তখনও কয়েকটি চমরি, ঘোড়া আর পাহাড়ি কুকুর । আমাদের শহরে মানুষের কাছে মহার্ঘ এইসব স্ট্রিট ডগ । স্কুলবাড়ি দখল হওয়ায় এরা আজ বাস্তুহারা । রাত আড়াইটেয় উঠেও চমরিগুলোকে ফোঁস ফোঁস করতে দেখেছি, একটা কুকুর ঠান্ডায় চিৎকার করছিল ।

ভোরে আবার প্রাকৃতিক প্রাতঃকৃত্য । তারপর চা-পর্ব সেরে হঠাৎ স্কুলবাড়ির পিছনে আকাশজুড়ে গোরিচেন-কাংটোর হীরের মুকুট । আরও পরিষ্কার ও পুরোপুরি দেখার জন্য ক্যামেরা নিয়ে উঁচু জমির দিকে ছুটতেই হল । বাঁয়ে কাংটো, ডাইনে গোরিচেন হাত ধরাধরি করে । দুচোখ ভরে দেখা গেল অনেকক্ষণ । তারপর মেঘের স্বর্গজয় । আমাদের সামনের মাঠে ভেড়ার পাল । পথের পাশে গ্রামবাসী চমরির দুধ দোয়াচ্ছে । কামধেনুর ফল্গুধারা । দুধের স্বাদ মেটানোর অধিক সে দৃশ্য ।

পঞ্চম দিন

এবার স্বর্গ থেকে অবতরণ । সত্যিই তাই । স্বপ্নের ছান্দের ছেড়ে চলে আসতে মনের কষ্টকে ছাপিয়ে গেছে পথের কষ্ট । পথ যতটা সুখের মনে হয়েছিল, আদৌ তা নয় । নেমে যাওয়ার একটু পরেই ছান্দেরও চোখের আড়ালে । সবই যেন মায়া । সাধনমার্গ বুঝি এরকমই হয় ।

রওনা দিয়েছিলাম সকাল সাড়ে আটটায় । গন্তব্য তো ঘুরেফিরে চোখেই দেখা যাচ্ছে-নিচে ছোট্ট সবুজের দ্বীপ । এখান থেকে মনে হয় কোনও পার্ক বা ছোট চাষির একফালি ধানখেত । তার মাপ যে কত বড়, পাশের রুপোলি রেখাটা যে একটা প্রমাণসই নদী তা ক্রমশ উদ্ভাসিত হল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার উতরাইয়ের পথে । কখনও জঙ্গলের আড়ালে, কখনও ঘুরপথে তার লুকোচুরি মরীচিকার মতো । মরীচিকাই বটে । চেনা-অচেনা গাছের এই অরণ্য, সবুজ প্রান্তর ও পাহাড়ের রাজ্যেও ক্লান্তি জাগছিল । দুটো কারণে । এক, প্রায় শুকনো ঢালু পথে চোরা কাদার প্রবঞ্চক স্তর-খাঁজ খুঁজে-খুঁজে এগোতে হয় অবিশ্বাসী

পায়ে, না হলে পদস্খলন অবধারিত । দুই, সঙ্গীরা অনেকটা এগিয়ে-পিছিয়ে পড়ায় দুবার পথভুলে সময় ও শক্তিক্ষয় হয়েছে যথেষ্ট-একবার ভুট্টাখেত-সবজিখেত পেরিয়ে বাঁদিকের বদলে ডানদিকে পনেরো মিনিট নেমে গিয়ে, পরেরবার খালিবোক গ্রাম ছাড়িয়ে আরেকটা ছোট গ্রামের এপথ-ওপথ-সেপথে ঘোরাঘুরি করে । অতিবৃদ্ধ এক গ্রামবাসীকে পথ জিজ্ঞাসা করে লাভ হল না-হয় তিনি হিন্দি বোঝেন না, নয়তো কানে কম শোনেন ।

সব মিলিয়ে আজ পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার পথই যাকে বলে সবসে খতরনাক সবচেয়ে ডিস্টার্বিং মনে হল । অবশ্য এখানে-ওখানে ডাইনে-বাঁয়ে পথের সামান্য আভাস পেলেই হুটহাট শর্টকাটে নেমে গেছি । অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সে এক অন্য ফুর্তি । আজকের পথের হাল্কা ঝরনাগুলোর মতো । এদেরও লক্ষ্য কি সাংতি নদী? এই ধারণায় কখনও ঝরনা ধরেও কিছুটা বেয়ে গেছি । আজও পথে একটা গেট পড়েছে আড়াই-তিনঘণ্টা হাঁটার পর । খুলে ঢুকতে এবার আর দ্বিধা করিনি । এত করেও সময় নষ্ট হল সম্ভবত পথভ্রম সন্দেহে দুবার থেমে পড়ার জন্যই । এগোলে অন্তত হতাশা ও মানসিক ক্লান্তি জাগত না । এখানেই আমি ঝরনার কাছে হেরে গেছি ।

এক সময় মরীচিকা মরূদ্যান হল । ঘন জঙ্গল থেকে খাড়া পঞ্চাশ মিটারের মতো নিচে । নগরসভ্যতার লোকালয় । মিনিট পাঁচেক ভুট্টাখেতের ধার দিয়ে এগোলেই নদীর সেতু । পেরিয়ে, ওপারের রাস্তায় আমাদের জন্য বাস অপেক্ষা করছে । পিছনের লোকেদের আসতে বেশ দেরি হবে বুঝে মনের বাকি স্বাদ মেটালাম-ডুব দিলাম সাংতির টলটলে জলে । উইন্ডচিটার আর জুতোর কাদা-ময়লা নিমেষে ধুয়ে গেল । যা কখনও ধোবার নয় তা হল পেরিয়ে আসা পাঁচটা দিন । সাধ আরেকটু বাকি ছিল । তাঁবুতে রাত কাটানো ও ক্যাম্পফায়ার । তাঁবু এতদিন কোথাও খাটানো হয়নি, লোভনীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও । ট্রেকিং শেষে আজ ঘাটতিটুকু মেটালাম দিরাংয়ে পৌঁছে । ট্যুরিস্ট লজের লনে তাঁবুতে রাত্রিবাস করে ।

ভ্রমণ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

না-ভ্রমণের বৃত্তান্ত

আশাপূর্ণা দেবী

ভ্রমণ সম্পর্কে নিজস্ব কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলতে বসব, এমন কথা ভাবিনি কখনও ।

ভাবলেই হল?

বলতে বসার পুঁজিপাটার দরকার নেই? মাল-মশলা? ভ্রমণ শব্দটার সত্যিকার মানেই কী জানলাম কখনও?

বেড়াতে যাওয়ার মানে কিছুটা বুঝি, হাওয়া বদলাতে যাওয়ারও । কিন্তু ভ্রমণ? মনের মধ্যে সেই কোন ছেলেবেলা থেকে যে একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল, সে ধারণার ধারে-কাছেই তো গেলাম না কখনও । যেতে পেলাম কই?

আমার সেই শৈশবকালের চেতনায় ছিল ভ্রমণ মানে একটি দুঃসাহসিক অভিযান-যে অভিযানের পদে-পদে বিপদ, মোড়ে-মোড়ে বাঁকে-বাঁকে অজানা কোনও ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হতে হবার আতঙ্ক । দূর-দুর্গম-দুস্তর সব জায়গাই তার লক্ষ্য । সেই অভিযানের সঙ্গের সাথী হচ্ছে-অভ্যস্ত অশন-বসন-শয়ন-ভোজন আর পরিবেশের শতেক যোজন দূরত্ব । এমনকী মেনে নিতে হবে কখনও বা অর্ধাহার, অনাহারও । ভ্রমণ সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে এই ছিল আমার ধারণা । আর সেই ধারণাটিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ভবিষ্যতের একটি রোমাঞ্চময় স্বপ্ন । স্বপ্নটির উৎস হচ্ছে-ছেলেবেলায় পিতামহীর কাছে বসে তাঁর ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চময় বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনা ।

জেনেছিলাম আমার জন্মের আগেই নাকি ঠাকুমা পায়ে হেঁটে চারধাম করে এসেছেন । তার তখনও আরও কত সব পরম ধামে ঘোরাঘুরি চলছে ।

সারা ভারতে ধামের অভাব নেই । সর্বত্রই তীর্থস্থান! সর্বত্রই পুণ্য সঞ্চয়ের পথ খোলা পড়ে আছে । যেতে হবে না সেখানে? গেছেন । অবশ্য সবই পায়ে হেঁটে । তাছাড়া উপায় কী? তখন তো আর ভারতভূমির ভূমিতে রেললাইন এসে আসন পাতেনি । যাদের পক্ষে প্রচলিত সব যানবাহনের সহায় নেওয়া সম্ভব নয়, তাদের তো ওই চরণযুগলই সম্বল । আর্থিক সামর্থ নেই বলে সামর্থিককে কাজে লাগাবে না? সেটা তো নিজের এক্তিয়ারে ।

পরে যখন রেললাইন খুলল, তখন তো এক কবি মনের আনন্দে বলে উঠেছিলেন, 'এসো কে বেড়াতে যাবে-শীঘ্র করো সাজ! ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।' বেচারী সে জন। রেলগাড়িকে 'পুষ্পক রথের' সম্মান দান। তবে দেখা যাচ্ছে কবি ডাক দিয়েছেন, বেড়াতে যাবার। ভ্রমণের নয়। তার মানেই হচ্ছে-রেলগাড়ি চড়ে বেড়াতে যাওয়াই হয়, ভ্রমণ হয় না।

ঠাকুমা নাকি রেললাইন খোলার পরও অনেকদিন পর্যন্তই তাকে গ্রাহ্য করেননি। বলতেন-পা থাকতে পরপিত্যেসী হতে যাব কেন? ঠাকুমার ভ্রমণ বৃত্তান্তর শ্রোতা যে কেবলমাত্র একা এই অতি মুগ্ধ বিহ্বল আমিই ছিলাম তা নয়। ছিল আরও অনেকে। বৃহৎ বিরাট পরিবার তো। অতএব অন্য স্তর থেকে এ প্রশ্নও উঠত-আচ্ছা ঠাকুমা, শুধু-শুধু এত কষ্ট করা কেন? কাছে কাছেও তো কত ঠাকুর, মন্দির আছে। সেও তো বলো 'মহাতীর্থ'। উত্তরে-সহাস্য জ্ঞানদান। আরে বাবা, শুধু মন্দিরই তো নয়, ওই 'পথ'ই হচ্ছে আসল তীর্থ। পথের টানেই ছোটা। তো একাকী কী এই আমি? চিরকাল ধরে লক্ষ-কোটি লোক ওই মরণ-বাঁচন পথে ছুটে যাচ্ছে না? এখন ওর মর্ম বুঝবি না। বড় হলে বুঝবি।

শুনতাম আর মনে হত-কবে বড় হব।

কিন্তু আমার এই পথপ্রেমিক পিতামহীর পুত্ররত্নরা? তাঁরা কি আর বড় হননি? তাঁরা সেদিন ওর মর্ম বুঝতে বসেননি। পঞ্চপুত্রের একটিও না। তাঁরা মাতৃভক্তিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য হলেও মাতৃ-মানসিকতার ধারকাছ দিয়েও যেতেন না। তাঁদের মানসিকতা হচ্ছে-নেহাৎ মতিভ্রম না হলে, কারও ভ্রমণে মনে হয় না। ভ্রমণ মানেই তো ইচ্ছে করে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। যেচে ঝঞ্ঝাট-ঝক্কি ঘাড়ে নেওয়া। কে জানে-মাতৃদেবীর সারাজীবনের অদম্য কর্মকাণ্ডের ফলেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল কিনা।

তা সে যাই হোক, পারিবারিক এই ভ্রমণে অনীহার ফলেই বাল্য-কৈশোরে একটু বেড়াতে যাওয়ারও সুযোগ ঘটেনি।

মূল শেকড় তো এই এপার বাংলায়। কাজেই বছরে বছরে গোয়ালন্দগামী স্টিমারে চেপে বসে পদ্মা পাড়ি দেওয়ার আবেগময় অভিজ্ঞতার স্মৃতিটুকুর সম্বলও নেই। থাকলে হয়তো সেই পুঁজি ভাঙিয়েও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলতে বসা যেত। সেও অবশ্যই অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদবাহী ছিল।

অতিবাল্যে একবার বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে রাঁচি যাওয়া হয়েছিল। ট্রেন থেকে নেমেই পুশপুশ গাড়ি ঈষৎ খোলা দরজার মধ্য দিয়ে সোনার মুকুট পরা মোরাবাদী

পাহাড়ের যে অপূর্ব সৌন্দর্যটি চোখে পড়ে চমক লেগেছিল, সে চমক এখনও মনে পড়ে। সোনার মতো ঝকঝকে পেতলে গড়া সেই বৃহৎ 'ওঁ' অক্ষরটিকে সত্যিই পাহাড়ের মাথায় সোনার মুকুটের মতো লেগেছিল।

পরবর্তীকালে তো আরও বার দুই-তিন রাঁচি যাওয়া হয়েছিল, সেই দৃশ্যটিও না দেখা হয়েছে তা নয়। তবু সেই প্রথম চমকটিকে মুছে ফেলতে পারেনি। শৈশব-বাল্যের স্মৃতি যেন পাথরে খোদাই হয়ে থাকে। তাই সেই সুদূরকালে শোনা কথাটি-ওরে, পথই হচ্ছে তীর্থ। সেটাই তীর্থভ্রমণ!

এযুগে অবশ্য ভ্রমণ শব্দটির দারুণ রমরমা। অবশ্যই যাবতীয় গাড়ি-টাড়ি চড়েই এবং যতটা পারা যায় আরামদায়ক। দিকে-দিকে সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ পর্যটন দপ্তর এবং ভ্রমণ সংস্থারা অবিরতই ঘরকুনোদের ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়বার ডাক দিয়ে হাতছানি দিয়ে চলেছে। বড় মায়াবী সেই হাতছানি। আজকাল তো এই ভ্রমণের ডাক একটি শিল্পের পর্যায়ে উঠেছে। অতি সূক্ষ্ম শিল্প। মনের যে তারটিতে ঝঙ্কার তুলে দিতে পারলেই ঘরকুনোকে ঘরছাড়া করে ফেলা যায়, সেই তারটিতে ঠিকমতো ঝঙ্কার তুলতে পারার যাবতীয় কৌশলই এই শিল্পের সাফল্যের উপকরণ। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই, ক্রমশ সেটা নেশা ধরায়। অতএব ক্রমশই এইসব দপ্তরের প্রসার আর নিরুদ্যম জনেদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার।

আমাদের সমাজজীবনে আজ ভ্রমণ শব্দটি যেন একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। সমাজজীবনের বেশ অনেকখানি জায়গা দখল করে চলেছে। এর অনেকটাই হয়তো ওই শিল্প কৌশলের দৌলতে। তবে সেকালেও যে এ কৌশলটি ছিল না, তা নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ঘরকুনো নিরুদ্যম জনেদের কাছে-বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি এগিয়ে দিতে যত সব দূর-দুর্গম-দুস্তর-দুরারোহ জায়গার অনির্বচনীয় বিউটি স্পটে এক-একখানি মহাতীর্থ বানিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা। সহস্র ক্লেশ স্বীকার করেও ছুটতে হবে সেখানে। পৌঁছতে পারলেই তো অক্ষয় স্বর্গ। কাজেই মরণপণ করেও তীর্থযাত্রা। সে যাত্রা মহাযাত্রায় পরিণত হল কিনা বাড়ির লোকের হয়তো জানবারও উপায় থাকত না। সেই অক্ষয় স্বর্গের লোভনীয় হাতছানি থেকেই ধরে যায় পথের নেশা। সুদূরের নেশা।

আমাদের কালে গেরস্থালি ঘরে হাওড়া স্টেশন পার হলেই বলা হত পশ্চিমে যাওয়া। তা সে গন্তব্যস্থল পুব-দক্ষিণ-উত্তর-পশ্চিম যেদিকেই হোক। আহা! এখনকার এই জটিল জটাজাল ঘেরা পশ্চিমের সঙ্গে, সেই অবোধ পশ্চিমের কী আকাশ-পাতাল তফাত। তা তখন হাওড়ার ওপারেই পশ্চিম। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পরমতীর্থ সাঁওতাল পরগনা। যেখানে

গেরস্থ লোকে হরদমই যেত। হয়তো বা ড্যাম চীপ-এর টানে, অথবা কখনও পরিবারের কারও কখনও স্বাস্থ্যোদ্ধারের দরকার হত-ডাক্তারবাবুরা যখন নির্দেশ দিতেন হাওয়া বদল দরকার। তখন।

তা হাওয়া বদল শব্দটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবহ। যে বদল শরীরের থেকেও বোধহয় মনের। নিত্যদিনের একঘেয়ে চক্রে আবর্তিত জীবনটা থেকে অন্তত গোটা কয়েক দিনও রেহাই মিললেই যেন নতুন হয়ে ওঠা যায়। ফেলে যাওয়া বিরক্তিকর পরিবেশটাতেই আবার আনুরক্তি আসে। কয়েকদিনের অনুপস্থিতির ধুলো ঝেড়ে, সংসারটাকে আবার সাফ-সুতর করে নিতে উৎসাহ আসে। হাওয়া বদল ব্যাপারটি বেশ। তাই বলে তো তাকে ভ্রমণের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

হাওয়া বদলই। তবে হাওয়ার মতো হালকা অবশ্যই নয়। যে অভিযানের সঙ্গী কেবলমাত্র বাক্স, বিছানা, জামা, জুতো, ছাতা, ছড়ি, টুপি, মোজা এবং আর কিছুই নয়। তার সঙ্গীর তালিকায় থাকে হাঁড়ি-কড়া, হাতা খুন্তি, চাকি-বেলুন, চিমটে, চাটু, বঁটি-কাটারি, শিল-নোড়া, হামানদিস্তে, আটা চালার চালুনি চাল ধোয়ার ধুচুনি, ধামা-কুলো, মায় উনুনে বাতাস দেবার তালপাতার পাখাখানা পর্যন্ত। তাকে তো আর বাতাসের তুল্য বলা যায় না।

কর্তারা অবশ্য গোড়া থেকে টাইট দেন মাল-মোট বাড়ানো চলবে না। কটা দিন যাহোক করে চালিয়ে নিতে হবে। কিন্তু গিন্নীরা কি তা শুনবেন?-তারা জানেন না ওই ড্যাম চীপ জায়গায় গিয়ে পড়লে কর্তারা এন্তার বাজার করবেন, আর রান্নাঘরে নিত্য নব মেনুর বায়না করবেন?

জল-হাওয়ার গুণে খিদে তো এমনিই বেড়ে চলে, তার ওপর আবার সেটা আরও বাড়াতে দু-দশ মাইল হাঁটা হয়। কাজেই ফিরে এসে ভালোমন্দ কিছু খেতে সাধ হবে না? মহিলাদের অবশ্য বেড়ানোর সময় জোটে না। নেহাৎ যেখানে যেসব অবশ্য দ্রষ্টব্য আছে, এবং স্থানীয় দেব মন্দির-টন্দির (সে আর ভারতে কোথাও নেই!) এবং বাজার ঘোরবার জন্য একটি চুক্তি হিসেবে গাড়ি ভাড়া করে সব সেরে নেওয়া।

তা মহিলাদের কাছে সেও পরম প্রাপ্তি। নিজস্ব জায়গায় দোকান-পাট বাজার-হাট-এর মুখ দেখতে পান কখনও তাঁরা। বাইরে এনে ওইটুকু ছাড়পত্র। অভিজ্ঞতা এইরকমই প্রায়। কিন্তু পরে?

মনের মধ্যে সেই কোন কাল থেকে স্বপ্নটি ছিল আসা প্রতীক্ষায়। তাদের বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা যে করা হয়নি, তা নয়। সাধ্যমতোই হয়েছে।

অতঃপর বয়েস এসে বসিয়ে দিয়ে জব্দ করে রেখেছে। যতক্ষণ না তেমন জব্দ করেছে-বঙ্গ, বিহার, উৎকল, পাঞ্জাব, মারাঠা, রাজপুতানা কোনও-না-কোনওখানে ঢুঁ মেরে আসা হয়েছে। দ্রষ্টব্যবহুল জায়গাগুলিতেই প্রধানত। তবে দ্রষ্টব্যরা আর কোনদিক থেকে হাতছানি না দিচ্ছেই? উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারত, পূর্ব, পশ্চিম, কে নয়।

বড়ই মায়াবী ওই হাতছানি। আসমুদ্রহিমাচল তার ওই মায়াবী ডাক। সেই ডাকের আকর্ষণে অন্তত এক-আধবার উঁকি মারতে যাওয়ার বাসনায় যাওয়ার তালিকায় সংযোজিত হয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অজন্তা-ইলোরা থেকে অমরনাথের পথে কাশী-বৃন্দাবন দু-চারবার সারা হয়ে যায়। বারবার হরিদ্বারের দ্বারে পৌঁছে, আবার সেই দরজা দিয়েই কেদার-বদ্রী।

এইভাবেই কতবারই ঘোরাফেরা-পুরী থেকে পণ্ডিচেরী, বাউলের দেশ থেকে বালুচরী শাড়ির দেশে।

কিন্তু এর কিছুই কী সেই স্বপ্নের ভ্রমণ? অনেক আগে থেকে হোটেল বুক করে রেখে এবং ট্রেনের টিকিট কেটে রেখে সম্ভাব্য যতকিছু অসুবিধের ফাঁকফোকর বুজিয়ে রাখার চেষ্টায় অতিষ্ঠ হয়ে যে ঘোরাঘুরি তাতে কী মন ভরে?

দেশের মানুষ। তাদের দেখবার সুযোগ এ ভ্রমণে কোথায়? অথচ সেটাই তো আসল দেখবার জানবার।

তবু ওরই মধ্যে পথে-পথে কিছু সঞ্চয় জমা পড়েছে ঝুলিতে। সে ঝুলি হাতড়ালে হাতে উঠে আসে এক-এক কুচি সোনা। সেই কতদিন যেন আগে পহেলগাঁওয়ের এক ডাকবাংলোয়, ভেতরে খিল ছিটকিনিহীন একখানা ঘরে হয়েছে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। খিল-ছিটকিনিরা নিজেরাই ছিটকে হারিয়ে গেছে। না অন্য কিছু? যা সারারাত হাড় হিমকরা ভয়, ওখানকার হাড় মজ্জা হিমকরা শীতকেও তুচ্ছ করে কম্বলের আবরণ থেকে চোখ বার করে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে ওই অনর্গল কপাটটা ঠেলে আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে আসছে একটা কালো কম্বলে মোড়া জমাট অন্ধকার। যার হাতটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চাদরে-কম্বলের মোড়কে মোড়া সেই হাতখানা কী হাত মাত্র না মৃত্যুর থাবা?

ডাকবাংলোর রাত পাহারাদের দৈত্যাকৃতি বিশাল চেহারাখানা বুকের মধ্যে পাথর হয়ে বসে আছে।

ঘড়ির কাঁটার টিকটিক-এর মতো হৃদযন্ত্রের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে ধকধক শব্দ। কতক্ষণ? কে জানে। অতঃপর এল সেই সময়। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। মৃত্যুর

মতোই নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে এল সেই জমাট অন্ধকার দৈত্যদেহ । আস্তে এগিয়ে এল একখানা কম্বলমোড়া হাত । আরও এগিয়ে-হাত চলে আসে । না গলা পর্যন্ত আসে না সে হাত । কারণ হাতে চায়ের সরঞ্জামে সাজানো ট্রে । বয়ে এনেছে বেড টী । একি পরম প্রাপ্তি ।

আবার সেই একদিন? পুষ্কর তীর্থে ঘাটের চাতালে বসে স্বামী তাঁর পরলোকগত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডোৎসর্গ করতে বসেছেন । সোচ্চার মন্ত্রপাঠ চলছে । যেখানে নিজের কোনও ভূমিকা না দেখতে পেয়ে ফালতুর মতো এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে কী ভেবে ঘাটের সিঁড়িতে নেমে গেছি একটু পুণ্যসলিল মাথায় ছিটোতে । ব্যস । সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকালের জমে থাকা ঘন কালো কোমল পানার আকর্ষণে সোজা হ্রদের নিচে ।

তলিয়ে যাবার মহা মুহূর্তে, নিশ্চিত মৃত্যুর প্রত্যয়ে যখন ভাবছি-পতি পরিবারের পরলোকগত সদস্যদের তালিকায় একটি নতুন সংযোজন হল, ঠিক তখনই এক অজানা অচেনা তাগড়াই চেহারার পাণ্ডাঠাকুরের বজ্রমুষ্ঠির আকর্ষণে জলের তলা থেকে ঘাটের চাতালে । উদ্ধারকারী সেই প্রায় তলিয়ে যাওয়া জনকে টেনে তুলে ঠুকে বসিয়ে দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বোধকরি আমার চোদ্দ পুরুষকেও উদ্ধার করে একবার আমার দিকে জ্বলন্ত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুমদাম করে চলে গেলেন । কিন্তু রেখে তো গেলেন কিছু সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়েই ।

আবার সেই একদিন । ঘনটানাটি নেহাৎই তুচ্ছ । ঘটনার নায়কও তাই ।

তবু সঞ্চয়টুকু তুচ্ছ নয় । নায়ক হচ্ছে বাংলা কথনে রীতিমতো রপ্ত এক উড়িষ্যানন্দন রাঁধুনি ঠাকুরমাত্র । বয়সে তরুণ হলেও-বোধহয় দক্ষতার গুণে সে তখন দার্জিলিঙের ‘লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের অর্থোডক্স ডিপার্টমেন্টের’ হেড রাঁধুনি । তার অবিরত আমাদের কাছে অনুযোগ-অহেতুক আমরা এ ডিপার্টমেন্টে কেন? বাঙালি হয়েও কেন ভেজিটেরিয়ান? সেই আক্ষেপেই বোধহয় সে আমাদের দুজনের জন্য সর্বদা স্পেশ্যাল কেয়ার নিত । বেশ বোঝা যেত আমাদের থালায় রান্নাঘরের নিয়মমাফিক মেনুর বাইরেও তার নিজস্ব প্রেরণার কিছু অবদান থাকে । যার মধ্যে অহেতুক ভালোবাসার অলক্ষ্যস্পর্শ । এটাই তো পরম প্রাপ্তি । কিন্তু ফেরার দিন?

জমার ঘরে তো জমল অনেক । সেদিন ঠিক সময়ে বাগডোগরায় পৌঁছবার তাড়ায় সাতসকালে ভাত চেয়ে লজ্জিতভাবে খেতে এসে দেখে অবাক । পাতে যথারীতি নিত্যকার মতোই পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো । দই থেকে লেবুটি পর্যন্ত । এই ত্রুটিহীন কুশলতার মধ্যে ঠাকুর বারবার আক্ষেপ জানাচ্ছে-আজ আমাদের একটা নতুন পদ খাওয়াবার জন্য-সে

অনেক চেষ্টায় যে দ্রব্যটি জোগাড় করে রেখেছিল । তাড়াহুড়োয় সেটি এখনও ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি ।

আমাদের বারংবার সান্ত্বনাবাক্যেও তার ক্ষোভ ঘোচে না । তারপর? যখন দেখা গেল যাওয়ার প্রায় শেষভাগে সে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একথাবা অতি উত্তপ্ত মোচার ঘণ্ট নিয়ে এসে দুজনের পাতে ভাগ করে দিয়ে, একখানা পাটকরা খবরের কাগজ নেড়ে নেড়ে বাতাস করতে শুরু করল । তখন চোখের জলকে চোখের মধ্যে আটকে রাখা সত্যিই শক্ত হয়েছিল ।

পথে পথে এমন কত প্রাপ্তির স্মৃতি জমা হয়ে আছে, যা আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান । কিন্তু অন্যের কাছে পরিবেশনযোগ্য কিনা এই দ্বিধায় পরিবেশন করতে এগোইনি । তাছাড়া এ যুগে ভ্রমণ মানে পৃথিবীর মানচিত্রে ঘুমিয়ে থাকা সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে হানা-দেওয়া । চিরকালের কুমারী মাটিতে নির্ভীক পদপাত । দুই হাতে দুই কালের মন্দিরার মতো দুই মুঠোয় উত্তর-দক্ষিণ দুই মেরুকে বাগিয়ে ধরে অবলোকন এবং হয়তো সেখান থেকে সম্পাদকদের দপ্তরে নিত্য দিনলিপি প্রেরণ । হয়তো বা উঁকি মেরে আসা মহাসমুদ্রের গভীরে । আঁচল উড়িয়ে আসা মহাকাশের অলিন্দে । এহেন যুগে কিনা রেলগাড়ি বাসগাড়ি চেপে কেবলমাত্র স্বদেশের চিরচেনা সব জায়গায় গিয়ে পড়ে ভাবতে সাধ-এইটাই বুঝি ভ্রমণ ।

দূর! এ আবার একটা বলবার মতো? তাও আবার কাল-তারিখ পেশ করার বালাই নেই । সবই স্মৃতিনির্ভর ।

এযুগের পাঠকরা বড় হুঁশিয়ার । সেই স্মৃতির শৈথিল্যে কোথাও একটু ভুলভাল ঘটলেই ধরে ফেলে, আর ছুটে আসে ভুল ধরতে । অতএব এই না-ভ্রমণের বৃত্তান্তটিই সম্পাদকমশাইয়ের দপ্তরে পেশ করে ইতি টানা ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৩

এভারেস্টের পাদদেশে যাত্রা

কমলা মুখোপাধ্যায়

১৯৭৫ সালে কাঠমান্ডু থেকে পায়ে হেঁটে রাজদর্শন অর্থাৎ এভারেস্ট দর্শনে গিয়েছিলাম। তখনই শেরপা অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তাদের সম্বন্ধে জেনেছিলাম অনেক কিছু। মহিমান্বিত এভারেস্ট শৃঙ্গকে খুব কাছ থেকে দেখা যায় ১৯,০০০ ফুট উঁচু 'কালাপাথর' থেকে। কাঠমান্ডু থেকে সেখানে পৌঁছতে লাগে প্রায় পনেরো-ষোল দিন, অবশ্যই পায়ে হেঁটে।

কাঠমান্ডু থেকে লামাসাঙ্গু পর্যন্ত বাসে গিয়ে আমাদের হাঁটা শুরু হয়। ফেরার পথে অবশ্য আমরা লুকলা বিমানক্ষেত্রে এসে আকাশপথে ফিরব কাঠমান্ডু। আমাদের পথে দেখা হল ক্যালিফোর্নিয়ার ২৫ জনের এক দলের সঙ্গে। তাঁরা জাপানে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে ফিরছেন। দেশে ফেরার আগে হিমালয়ের কিছু অংশ দেখে যাচ্ছেন। একসঙ্গে বেশ কিছুদিন পথচলা ও থাকার ফলে হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল। ওই দলের সঙ্গে ভালো ম্যাপ থাকায় আমরা বহু অপরিচিত শৃঙ্গ চিনেছিলাম।

আমরা লামাসাঙ্গু থেকে দক্ষিণের পথ ধরে উত্তরে যাব। খাদ্যসামগ্রী ও মাল বহনের জন্য একজন তামাং ও একজন লিম্বুকে নেওয়া হল। বেশি উচ্চতায় যাবার মতো জামাকাপড় ও জুতো এদের নেই, নামচেবাজারে গিয়ে এদের তাই ছেড়ে দিতে হবে। রোজগারের আশায় এরা মাল বইছে। লামাসাঙ্গু থেকে যাবার পথে ভগ্ন মণি দেওয়াল, ডাগোবা, চোর্তেন দেখা গেল। হয়তো একসময় গ্রামগুলিতে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল, এখন হিন্দু নেপালিদের বাস সেখানে। চারদিকে ধাপ চাষের খেত। ধান, ভুট্টা, সরষে, আলু, স্কোয়্যাশ চাষ হচ্ছে। গোর্খা সৈন্যদল থেকে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা এসব জমির মালিক। তামাং, রাই, লিম্বু, মগরা এরা দরিদ্র ভাগচাষী মাত্র। প্রথমদিন শিলডুঙ্গায় থাকা, দ্বিতীয়দিনে চর্ণাবতী পার হয়ে সেরেবংশী গ্রামে পৌঁছই। বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। ইট বা পাথরের বাড়ি, চায়ের দোকান ও মন্দির আছে। এক বাড়ির দোতলায় আশ্রয় পেলাম, যদিও সাত-আটজন থাকার তুলনায় ঘরটি ছোট। সারারাত নিচের ঘরে জুয়াখেলা চলায় ভালো ঘুম হল না। পরদিন তাম্রকোশী নদীর ধারে বুন্তীগ্রামে রাত কাটল। গৃহস্বামী ও তাঁর পুত্র আদরযত্ন করে রাখলেন আমাদের। তাঁদের কাছে জানতে পারলাম যে প্রতিবছর

কয়েক হাজার বিদেশি পর্যটক আসেন; তাই গ্রামবাসীরা অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

এরপর দশ হাজার ফুটের একটি চড়াই ও চিসাপানি গিরিপথ পার হয়ে ইয়ারসা গ্রামে এলাম। বেশ ঠান্ডা। এতদিন খাদ্যে স্কোয়্যাশ পাওয়া গেছে এবার সে পালা বন্ধ। আলু ও রাই শাকসেদ্ধ-সাহেবদের মতো স্টু খেতে হবে। এরপর বর্ধিষ্ণু গ্রাম থোসে ও দেওরালি গিরিপথপার হয়ে ভাড়ারে গ্রামে রাতের আশ্রয় মিলল এক গোশালায়। গ্রামটিতে পনির কেন্দ্র আছে। বাসিন্দাদের অনেকেরই গরু-মোষ আছে। আমাদের গৃহকর্তাও বেশ সম্পন্ন, আহারাদির ব্যবস্থাও বেশ ভালো হয়েছিল। কিন্তু সন্ধের মুখে গরুর পাল তাদের চিরাচরিত আশ্রয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতেই মুশকিল হল। অনেক রাত হয়ে গেল তাদের বিতাড়ন পর্ব সারতে।

আকাশ মেঘমুক্ত থাকবে এবং হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গগুলিকে ভালোভাবে দেখতে পাব সেই আশাতেই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে এই অক্টোবর মাসের শেষে এখানে আসা। পরদিন সকালে রৌলিং হিমলের গৌরীশঙ্কর (২৩,৪০০ ফুট) ও মনলুংসা (২৩,৬৫০ ফুট) শৃঙ্গগুলির দর্শন মিলল। এই শেষোক্ত শৃঙ্গে যাবার সময় এক গিরিপথের (১৯,০০০ ফুট) পশ্চিমে বিখ্যাত পর্বতারোহী এরিক শিপটন ১৯৫১ সালে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। তিনি এভারেস্টে ওঠার পথের সন্ধানে ওই পথে এসেছিলেন এবং তাঁর ধারণা হয়েছিল যে নেপালের দিক থেকে সাউথ কল দিয়ে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠা সম্ভব হবে, ততদিন পর্যন্ত তিব্বতের দিক থেকে নর্থ কল দিয়ে ওঠার চেষ্টাই হয়েছে। ইয়েতি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। চিন এবছরও ইয়েতির সন্ধানে একদল অভিযাত্রী পাঠাচ্ছে। তিব্বতী ও শেরপা মহলে ইয়েতির অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

‘থোসে’ থেকে বৌদ্ধ শেরপা বসতি শুরু হল। শেরপাদের বাস সোলো কুম্ভ অঞ্চলে। দক্ষিণ ভাগ সোলু-থোসে থেকেই শুরু মনে হয়। এদিককার গ্রামে প্রবেশপথে দেখা যায় স্তূপ বা চোর্তেন, মন্দিরের ওপর ত্রিশূল-তিব্বতীতে যাকে বলা হয় খাতাম।

শেরপা বসতিগুলিতে মহিলারাই প্রধানত গৃহে থেকে গৃহকর্ম, হোটেল ব্যবসা, খেতখামারে কাজ করে। পুরুষরা বাইরে ঘোরে নানা কাজের সন্ধানে। স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামানো নেই, কারণ জীবনযাত্রা এতই কঠিন যে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ৯ দিনের দিন খারি খোলা নদীর ধারে ফসলে ভরা সমৃদ্ধ গ্রাম জুবিং পার হতে হল। এরপর লামজুর গিরিপথ (১২,১২০ ফুট) পার হবার সময় নিদারুণ দৃশ্য দেখলাম। ভূ-আলোড়ন ও ভূমিকম্পের ফলে প্রস্তর মাটি ওপরে উঠে এসেছে, এক মহা ধ্বংসের ছবি। যেন রূপকথার কোনও দৈত্য এসে বেগুনি রঙের পাথরগুলিকে বিশাল

প্রান্তর জুড়ে উল্টোপাল্টা করে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেলা ৯টায় পথের ওপর 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' লেখা দেখে বুঝলাম যে উচ্চতা শেষ হল। দম নিলাম, তারপর নামা শুরু। দুপুরে চতুর্দিকে অপরূপ দৃশ্য-শীতের শুরুতে পাতা ঝরে যাবার আগে রডোডেনড্রন গাছগুলির পাতার রং লাল হতে শুরু করেছে। আমেরিকা বা বিলেতের 'ফল' বা শেষ শরতের মতো নয়নাভিরাম দৃশ্যপট।

বিকেলের মধ্যেই 'জুনবেশী' গ্রামে পৌঁছলাম। বোঝা গেল বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান-অফিস, বাড়ি ও মঠ রয়েছে। ধর্মে নিংমাপা সম্প্রদায়ের বা মহাযানী তান্ত্রিকমতাবলম্বী-যাঁদের গুরু হলেন 'পদ্মসম্ভব'। বেশ বড় একটি বৌদ্ধমঠ, দুজন বিদেশি রয়েছেন অতিথিশালায়। আমরা রইলাম কিরপা শেরপা নামে এক সম্পন্ন চাষীর ঘরে। বিকেলে পৌঁছে গেছি, অনেক সময় রয়েছে হাতে। ওই সুযোগে সুনীতি পাঠকের দেওয়া প্রশ্নাবলী নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে অনেক আলোচনার সময় পাওয়া গেল। কিরপা শেরপা শিলিগুড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন তাই হিন্দি ভালোই জানেন। জানতে পারলাম শেরপারা তিব্বতী ঘেঁসা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করলেও নেপালি ভাষা জানে ও বোঝে। আরও জানা গেল যে এরা তিব্বতের দক্ষিণ রং বুক গিরিপথের নিকটের কোনও স্থান থেকে বহু শতাব্দী আগে এসেছেন, ধর্মে আচারে-ব্যবহারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। তিব্বতের মতো বহুপতি প্রথার চল প্রায় নেই। লামা ধর্ম প্রচলিত। কিরপার ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্কুলে পড়ে। নিজেরা চাষবাস করে, দোকান চালায়, কাঠের বিস্তৃত ঘরগুলিতে অতিথিদের আশ্রয় দেয় ফলে কিছু রোজগারও হয়।

এরপর সবই শেরপাদের গ্রাম। জুনবেশীর পর তাকসিন্ধু, চৌরিখড়ক। জুবিংঘাট পার হয়ে কয়েকবার নদী এপার ওপার করে জোড়সেল গ্রামে রাত্রিবাস করলাম। পথে এক স্থানে স্টিভেনসন স্ক্রিন দেখে প্রশ্ন করে জানলাম যে জরিপের কাজে একটি দল এসেছিলেন তাঁরাই এটি ব্যবহার করতেন। একটি পাহাড়ের ওপর বৌদ্ধমঠ, সেখানে এক তিব্বতী লামা থাকতেন। এসব গ্রামেই অতিথিশালা বা হোটেল আছে, শেরপানি গৃহকর্ত্রী তদারকি করেন। হলের মতো বড় ঘরে পর পর খাটিয়া পাতা, রাতে গৃহকর্ত্রী নিজে খাবার এনে দিলেন। কিন্তু সারারাত নাচ, গান, পান, ভোজন, হৈ হল্লা শুরু হল-ঘুম হল না। নেপালে ভ্রমণকালে দেখেছি প্রায় সব বাড়িতেই মদ-চোলাইয়ের ব্যবস্থা আছে, অতিথি আপ্যায়ন হয় তাই দিয়েই। সঙ্গে শুকনো মাংস রামেরও বেশ চল আছে। শীতের দেশে এছাড়া গরম থাকার উপায় কী?

জোড়সেলের পর চড়াই। এখান থেকেই উঠতে হবে নামচেবাজারে। নামচেবাজারে কুলি বদল হল। শেরপা দুই ভাইকে নেওয়া হল-একজন তাদের মধ্যে কিশোর। তারা

নিজেদের গরম কাপড় ও খাদ্যবস্তু বইবার জন্য ১৪ বছরের বোনকে সঙ্গে নিল, সে-ই তাদের রান্নাবান্না করবে । এখানে বহু ভালো হোটেল আছে, বড় জনবসতি । এটি একটি ট্র্যানসিট পয়েন্ট-কম্বল, পোশাক ইত্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় । থেংবোচে যাবার পথে সুন্দরী আমাডাবলাম শৃঙ্গ মহিমান্বিত রানির মতো আসীন দেখলাম । ১৯২০ সালে খুমজুং গ্রামের গুলু লামা থেংবোচের গুম্ভাটি তৈরি করেন । দুই-তিন বার পুড়ে গেলেও নতুন করে আবার তৈরি করা হয়েছে । নামচে অর্থাৎ ব্যবসার কেন্দ্র (শেরপা ভাষায় 'লাউঝে') থেকে থেংবোচে (এই উচ্চারণ এভারেস্ট নামে বিখ্যাত গ্রন্থটিতে হিলারির দ্বারা গৃহীত হয়েছে) যাবার পথে বেশ কয়েকটি পর্বত শৃঙ্গ দেখা যায় । থেংবোচের উন্মুক্ত ময়দানে বসে দ্বিপ্রহরে সেইসব শৃঙ্গ দেখি, কুলিরা নাম বলে দেয় । সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল আমাডাবলাম শৃঙ্গের মনোমুগ্ধকর রূপ । তাছাড়া তামাশেরকু, কানটেগা, তাওচে-যেখানে হিলারির কয়েকজন সঙ্গী উঠতে গিয়ে ব্যর্থ হন । দূরে এভারেস্টকে কত ছোট দেখাচ্ছে । থেংবোচেতে অতিথিশালা ভগ্ন । অতএব আরও ওপরে যেতে হবে ।

প্যাংবোচেতে সবচেয়ে প্রাচীন গুম্ভা রয়েছে । রংবুক গুম্ভার লামা সাঙ্গে দোরজে কয়েকশো বছর আগে এসে ওই মঠটি স্থাপন করেন । স্থাপয়িতা সাঙ্গে দোরজেকে মনে করা হয় পদ্মসম্ভবের অবতার । স্থানীয় লোকজনের বিশ্বাস যে পদ্মসম্ভব যখন অলৌকিক শক্তিবলে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়ে আসছিলেন তখন এখানে পথে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেন । তাঁর পদচিহ্ন এখানকার পর্বতে ও মঠে রেখে গেছেন । ওই মঠে একটি ইয়েতির মাথার খুলি রক্ষিত আছে । সাঙ্গে দোরজে ওই চিত্রকরা খুলিটিকে নিজের বশে এনে নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ দেখাতেন তালবেতালের মতো । একটি শুকনো কুয়ো দেখলাম । এখান থেকে নাকি তিনি জল তুলতেন । চতুর্দিকে যে অর্ধচন্দ্রকার বৃক্ষরাজি আছে তা তার মুণ্ডন করা কেশ থেকে জাত বলে বিশ্বাস করে সকলে । মঠের মধ্যে একটি বন্ধ বাক্সে তাঁর চোখ, জিভ ও হৃদপিণ্ড রক্ষিত আছে যা তার শরীর, বাক্য ও মনের প্রতীক । পদ্মসম্ভবের পদচিহ্ন যেখানে পড়েছিল সেখানেই বিখ্যাত থেংবোচে গুম্ভাটি তৈরি হয়েছে-এই কাহিনীই সমধিক পরিচিত । থেংবোচের মঠাধ্যক্ষ কখনও কখনও তিনদিনের দূরত্বে তাকসিন্ধুতে গিয়ে পাহাড়ের ওপর ধ্যান করতেন, শিষ্যরাও সঙ্গে যেতেন । তাকসিন্ধুতে পাহাড়ের ওপর সুন্দর একটি মঠ বা গুম্ভা বানিয়ে দিয়েছে ভক্ত গ্রামবাসীরা । এই কুম্ভ এলাকায় দক্ষিণে সোলু এলাকাতেও শেরপারা থাকে । সেখানে পাপলুনে 'জিয়ং' গুম্ভাও বিখ্যাত । গুম্ভাটি সাঙ্গে দোরজে তৈরি করিয়েছিলেন ।

এখন আমরা নিচের সোলু এলাকা থেকে খুম্বু এলাকায় প্রবেশ করব । নামচেবাজার থেংবোচের মাঝে মহালঙ্গুর হিমাল । কিন্তু পথে একটিও হনুমান বা বাঁদর দেখিনি । আমাদের সঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্কের এক অভিযাত্রী দলের দেখা হয় । এঁরা আসছেন ওখালডুঙ্গা

বা দক্ষিণ থেকে । স্থানটি গুরুত্ব বহন করে, সরকারি দপ্তর আছে । সোলো কুম্ভ অঞ্চল নেপালের শাসনে থাকলেও এদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুবই গণতান্ত্রিক । খাজনা ইত্যাদি যা নেপাল সরকারকে দিতে হয় এ অঞ্চল থেকে তা ওখালডুঙ্গার কাছারিতে জমা নেওয়া হয় । অন্যান্য পারিবারিক, সম্পত্তি বিষয়ক বা চাষবাস সম্পর্কিত মামলা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত লোকজনই নিষ্পত্তি করেন ।

থেংবোচের পর উচ্চতা শুরু হল । তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়ে ধরবার কিছু নেই, পাহাড়ি পথও নেই । ট্রিলাইন শেষ হলে কেবল ঘাস ও ইতস্তত ছড়ানো প্রস্তরখণ্ড । তবে আমাদের লিডার মাঝে মাঝেই থেমে কফির ব্যবস্থা করাতে ক্লান্তি দূর হচ্ছিল । কোনওমতে সন্ধের অন্ধকারে প্রবল শীতের মধ্যে ফেরিচে পৌঁছলাম ও রান্নাঘরে আশ্রয় নিলাম । সঙ্গীরা যে যেখানে পারলেন শুলেন । আমরা দুজন কুলিসহ রান্না শেষ হবার পর সেই ঘরের মেঝেতেই শুলাম । বেশ আরাম হল । আধুনিককালে সেখান বেশ কয়েকটি হোটেল হয়েছে বলে শুনেছি, আমাদের যাত্রার সময় তা ছিল না ।

সেদিনই সকালে ফেরিচে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে এক আমেরিকান ডাক্তারের তত্বাবধানে । খুব শীতের সময় ছাড়া ডাক্তাররা পালা করে থাকবেন এক বছর । সেদিন ওই কেন্দ্র খোলাতে ফেরিচেতে বেশ ভিড় ছিল । এখানে ইয়াক প্রজননের জন্য পাথর ঘেরা কয়েকটি ঘর আছে, স্থানীয় অনেককেই দেখলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরে শুয়ে আছে এই অক্টোবরের শেষে । দেখে তো আমরা তাজ্জব বনে গেলাম । জানা গেল, বরফ পড়া শুরু হলে ইয়াক সহ চালকগণ নিচে নেমে যায় । আসার পথে ওই ধরনের কাঠের বাড়ি দেখেছি কয়েকটা ।

ওপরের দিকে পথচলা বেশ কষ্টসাধ্য । হিমবাহের গ্রাবরেখার চতুর্দিকে আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে । দুধকোশী নদীর পাশ দিয়ে সেই পাথরের মধ্য দিয়েই যেতে হচ্ছে, পাথরের ওপর পাথর রেখে যে স্তূপ তা দেখেই পথের হদিশ করতে হচ্ছে । দুধকোশী নদীর জল ঝকঝকে রোদে উজ্জ্বল । চুনাপাথরের আধারে ও মিশ্রণে রয়েছে তাই যেমন রং নামও তেমন । যত ওপরে যাওয়া হচ্ছে খাদ্যের অভাব বাড়ছে । ফেরিচেতে এক দুপুরে এক প্লেট আলুসেদ্ধ খেয়েই থাকতে হল তবে পেট ভরে ছিল । পথে আমাদের নিজস্ব খাবার মুসুর ডালসিদ্ধর জল, কফি ও বিস্কুট খাওয়া হত ।

প্যাংবোচের গুম্ভা ও ইয়েতির মাথার খুলি দেখে স্থানীয় সম্পন্ন এক গৃহস্থর বাড়ির দোতলায় ছিলাম । জল অনেক নিচ থেকে বয়ে আনতে হয় তাই সীমিত পরিমাণ জল আমাদের দেওয়া হল । একটি ছিদ্র করা লোহার পাত্রে আলু ঘষে নির্যাস বার করে তা দিয়ে মোটা রুটি (অনেকটা আমাদের চিতুই পিঠের মতো) তৈরি হল, আলুর ঝোল দিয়ে

খেলাম। এত ভারি রুটি যে কোনওমতে এক-চতুর্থাংশ খাওয়া গেল। পেট ভরল খুব। আমাদের সঙ্গে সয়াবিনের পিণ্ড ছিল তা গৃহস্থকে দেওয়া হল। থেংবোচে ও প্যাংবোচের মাঝে দেবুজেতে ভিক্ষুণীদের এক মঠ আছে।

পরদিন সন্ধের আগেই লোবুজ পৌঁছলাম, একটিমাত্র দোকানঘর। সেখানেই থাকতে হবে। কেউ টিনের বাক্সর ওপর শুল, আমি গ্রাউন্ড শীট বিছিয়ে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম। স্থির হল পরদিন খুম্বু হিমবাহর একাংশ পেরিয়ে গোরকশেপ গিয়ে বিকেলের মধ্যেই লোবুজে ফেরা হবে কারণ সেখানে থাকার জায়গা নেই, আর আমাদের সঙ্গে তাঁবুও নেই। গোরকশেপ থেকেই কালাপাত্থর যেতে হয়, এভারেস্ট বেসক্যাম্প তার কাছেই। কিন্তু ওই স্থান থেকে এভারেস্ট গোষ্ঠীকে দেখা যায় না। বিকেলের শেষে ওপর থেকে তিনজন বিদেশি অভিযাত্রী নেমে এলেন। একজন জার্মান ভূতত্ত্ববিদ, একজন ব্রিটিশ ভূ-বিদ্যার অধ্যাপক, একজন সুইডেনের। লোবুজের ওই ছোট ঘরে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তাঁদের সঙ্গে সলিড ফুয়েল ও ডিমের গুঁড়ো ছিল। সেই সঙ্গে তাঁরা কফি খেলেন। আমাদের খাওয়া পূর্ববৎ-মুসুরির ডালের স্যুপ, দুয়েকটা আলুসেদ্ধ ও কফি।

রাতে খুবই অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে শুতে হল, ভালো ঘুম হল না। নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ। এয়ার ম্যাট্রেস ও স্লিপিং ব্যাগ থাকা সত্ত্বেও প্রবল শীত অনুভব করছিলাম। কিন্তু সব দুঃখেরই অবসান আছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাঁর সভাসদ নিয়ে রাজমহিমায় আসীন-তাঁকে দর্শন করলাম পড়ন্ত সূর্যের আলোয়, রাতে চন্দ্রালোকে তারপর উজ্জ্বল তারার আলোয় আর খুব ভোরে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে বরফাবৃত রূপ। ভোরে উদীয়মান সূর্যের ছটায় তাঁর মহিমান্বিত রূপ দেখে সব কষ্ট গ্লানি দূর হয়ে গেল। আমাদের দীর্ঘ পথ চলা সার্থক হল।

এবার ফেরার পালা। লুকলাতে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিমান ধরতে হবে। মেঘে ঢাকা আকাশ থাকলে ওই ছোট এয়ারস্টপে বিমান নামতে উঠতে পারে না। বেলা বারোটার পর বিমান চলে না-যাত্রীদের ভিড় থাকে, থাকার জায়গা নেই লুকলায়। সেই সব চিন্তা করে থেংবোচের কাছে সেয়ামবোচে গ্রামের বিমানঘাঁটিতে যাওয়া ঠিক হল। সেখানে এক শেরপানির হোটেলে আশ্রয় পাওয়া গেল, খাদ্যও মিলল কিন্তু প্লেনের টিকিট মিলল না। কোনওমতে রাত কাটিয়ে খুব সকালেই পাকদণ্ডী বেয়ে নামচেবাজার নামার পথে প্রবাদপুরুষ এডমন্ড হিলারির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-পিছনে এক শেরপা সর্দার। দিনটা আমাদের পক্ষে শুভদিন ছিল বলতে হবে। নামচেতে এক পশুচিকিৎসালয় তৈরি হয়েছে, সেদিন তার উদ্বোধন। তিনি চলেছেন সেখানে। অল্প কিছুদিন আগেই লুকলা থেকে কাঠমাণ্ডু যাবার সময় বিমান দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও কন্যাকে হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু

কর্তব্যে অটল । একটু হয়তো বিষণ্ণ । নমস্কার ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল তারপর যে যার পথে চলা ।

লুকলায় এসে বিমানে জায়গা পাওয়া গেল পালাক্রমে । উনিশ দিনের হাঁটাপথ আধঘণ্টায় পাড়ি দিয়ে কাঠমাণ্ডু পৌঁছনো গেল ।

এবার এখানকার অধিবাসী শেরপা বা পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক । কয়েক শতাব্দী আগে তিব্বতের টিংরি জেলা থেকে নাংপা পাস দিয়ে শেরপাদের পূর্বপুরুষরা এই পূর্বাঞ্চলে আসেন । অন্যত্রও এখন কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে খুম্বু অঞ্চলের বাসিন্দা । খুম্বু নামটি এসেছে কুণ্ডে গ্রামের পিছনে যে উঁচু পর্বত খুম্বিলা (১৯,০০০ ফুট) মনে হয় একটা অখণ্ড গ্র্যানাইট শিলা । সেটাই এদের দেবতা-যাঁর উদ্দেশে নিয়মিত পশু বলি দেওয়া হয় ও সারাদেশের মানুষ অর্থাৎ শেরপারা এঁকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন । এদের সঙ্গে তিব্বতের খাম্বা বা খাম্পা গোষ্ঠীর লোকেরাও আসেন । এদের এখন তিব্বতী নেপালি গোষ্ঠী বলা হয় । শিশুকাল থেকেই এরা বারো-তেরো হাজার ফুটে বাস করার ফলে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী । এখানে স্ত্রী, পুরুষ, বালক সকলকেই পরিশ্রম করতে হয় । যক্ষ্মা রোগের হারও ছিল বেশি । এখন কিছু কমেছে । পাহাড়ের ঢালে গ্রীষ্মের সময় যব, গম, শাক এবং বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে আলুর চাষ প্রতি জমিতেই হচ্ছে বলে বসতির সংখ্যা বাড়ছে । হাইমেন ড্রফের মতে, আলু এদের জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে । যেটা আরেক বৌদ্ধ পাহাড়ি অঞ্চল সিদকে করা যায়নি সহজে । তবে চাষের সময় তো অল্পকাল, কাজেই এদের অন্য বৃত্তি হচ্ছে পশুপালন ও সঙ্কর প্রজনন । ঝব্বু হল ইয়াক-গরুর মিশ্রণ । এটি এদের পক্ষে লাভজনক, দুধ, মাখন, মাংস সবই পাওয়া যায় । ইয়াকের লেজ, লোম ইত্যাদির চাহিদা সর্বত্র । জন্তুগুলিও ভালো দামে বিক্রি হয় । মাল বহনের জন্য ইয়াকের তুলনা নেই, অনেক উচ্চতায় ভারী মাল অক্লেশে বহন করতে পারে । তাছাড়া তিব্বতের ভেড়ার লোম, পশমিনা-বোরাক্স সোনার সাদা সীমার বদলে খাদ্যদ্রব্য, পশমের দ্রব্যাদির ব্যবসাতে উভয়পক্ষেরই লাভ হত, সেটা বেশ কিছুদিন বন্ধ, দলাই লামার আসার পর থেকে । বর্তমানে তো উচ্চ পর্বতারোহণে এমন সঙ্গী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা-তাতেও এরা বেশ উপার্জন করে এবং বাইরের জগতের সঙ্গেও পরিচিত হয় । উচ্চস্থানের শেরপাদেরই বেশি চাহিদা । সামাজিক ব্যবস্থাও উন্নত । জমি, চারণক্ষেত্র সব বিষয়ে পঞ্চায়েতের নির্দেশ আছে, গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাবও বেশ । গ্রামবাসীরাই পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন করে । নেপাল সরকারকে এরাই চুক্তিমতো কর বা খাজনা নির্দিষ্ট সময়ে ওখালডুঙ্গাতে জমা করে দেয় । গ্রামীণ ব্যবস্থা, জমি বা পারিবারিক বিষয় পঞ্চায়েতেই ঠিক করে, বিচারও করে । সাধারণত ছেলেরা বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতে, অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে বাবা-

মায়ের সঙ্গে থাকে ও তাদের দেখাশোনা করে। ছেলেরা আলাদা সংসার পাতার সময় পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ পায়। মেয়েরা বিয়ে করে তাদের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যায়-আবার ঘরজামাই প্রথাও আছে। বহুপতি প্রথার চল নেই বললেই চলে। বহুপত্নী প্রথাও নেই। প্রাক-বিবাহ যুগে অবাধ মেলামেশার সুযোগ যথেষ্ট, বিবাহ নিজেরাই ঠিক করে বা পিতামাতার ওপর ছেড়ে দেয়। তবে বিবাহের খরচ খুব বেশি বলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হতে দেরি হয়, তবে ইতিমধ্যে এরা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। ব্যভিচারের কঠিন শাস্তি হয়-পঞ্চায়েতই এসব বিচার করে। এখন কয়েক স্থানে শেরপা ক্লাব তৈরি হয়েছে-এরা বিমান-ঘাঁটি পনির কেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদি দেখাশোনা করে, পর্বতারোহণের মজুরি প্রভৃতি ঠিক করে। সচ্ছল ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা-এদের ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ টাকা দিয়ে অনেক অপরাধের মার্জনা হয়, তবে সকলেই বৌদ্ধ বা মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মভীরু। ধর্ম এদের দৈনন্দিন জীবনকে বেশ নিয়ন্ত্রিত করে। লামারা বিবাহ করতে পারেন। একদিন এদের সঙ্গে মেশার ফলে বেশ ভালো লেগেছিল। শেরপাদের নাম এখন জগদ্বিখ্যাত। নেপালের পর্বতারোহণের তাগিদে এরা উচ্চ অঞ্চলের বাসিন্দা বলে এদের চাহিদাও খুব। এরা বিশ্বাসীও বটে।

ভ্রমণ জুলাই, ২০০২

নীল নদে পাঁচদিন

হর. সাদ মিত্র

সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ কায়রো এয়ারপোর্টে সগৃহিণী অবতরণ করলাম । আমরা গিয়েছিলাম ইউরোপ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষ থেকেও কায়রো যাওয়ার কিছুমাত্র অসুবিধা নেই । এমনকী ইউরোপ-আমেরিকা যাবার পথে একই খরচে কায়রো বেড়িয়ে যাওয়া যায় । তবে দূরপাল্লার বিমানে চাপলে চলবে না । এরা একছুটে দিল্লি থেকে লন্ডন যায় । মাঝে কোথাও থামে না । আমাদের বেছে নিতে হবে আরেকটু ছাপোষা লাইন-যার অনেকগুলো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়ানো আছে । ভারতবর্ষ থেকে কায়রো হয়ে ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দিতে হলে খোঁজ করুন রয়্যাল জর্ডন বা গালফ এয়ারের । এরা আই এ টি এ-র সভ্য । দক্ষতায় দড় এবং শিষ্টতায় কারোর চেয়ে কম যায় না । অধিকন্তুর মধ্যে এরা আপনাকে কোনও-না-কোনও জায়গায় মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত বিনাশুল্ক-সামগ্রী কেনার সুযোগ দেবে ।

মিশরের ভেতরে বেড়াতে হলে একজন দেশীয় ভ্রমণ তত্বাবধায়কের শরণ নেওয়া উচিত । তা না হলে কে কাটবে ট্রেন বা প্লেনের টিকিট । কে বা অগ্রিম বুক করবে নীল নদের জাহাজ । আমাদের এইরকম একটি সংস্থার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা ছিল । এয়ারপোর্টে ঢুকতেই চোখে পড়ল যে রেলিংয়ের ওপারে তাঁদের তরফ থেকে মাহ্‌মুদ সাহেব প্ল্যাকার্ড হাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন । ছিপছিপে একহারা হাস্যমুখ যুবক । রং ময়লার দিকেই বলতে হবে । তাঁর মাধ্যমে এয়ারপোর্টের করণীয়গুলি সুশৃঙ্খলে এবং অবিলম্বে সমাপ্ত হল । রেলিংয়ের বাইরে এসে প্রথম প্রশ্ন করলাম, হোটেলে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে । একনজরে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কতক্ষণ লাগবে তা বলা বেশ মুশকিল, তবে হ্যাঁ, সঙ্গে তাঁবুটাবু এনেছেন তো । আকাশ থেকে পড়লাম । সে কি! আমরা তো হোটেলে থাকব । কিন্তু তার আগে তো হোটেলে পৌঁছতে হবে । আর কায়রোর রাস্তায় এমন ট্র্যাফিকের ভিড় যে কখনও-কখনও গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারে দু-চারদিন থেকে যেতে হয় । বলার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে অভয় দিলেন-না না অত খারাপ নয়, মাঝে-মাঝে যে দু-চারঘণ্টা হয় না তা নয়, তবে এখন সন্ধ্যা গভীর হয়ে এল, আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাব । একটা জিনিস মিশরে বরাবর লক্ষ করলাম । ওরা বেশ কৌতুকপ্রিয় । কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা, রসিকতা, মজার গল্প । নীল নদের ধারেই আমাদের হোটেল তেরো কি সতেরোতলা মনে পড়ছে না । একটু

মনোক্ষুণ্ণ হলাম নদীর দিকের ঘর পেলাম না বলে (পরে বদলে দিয়েছিল) । তা আর কী করা যাবে । হোটেলেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে গেলাম । সারাদিন পথের ক্লান্তি । হলই বা এরোপ্লেনে ।

এ-কাহিনী কায়রো ভ্রমণের নয় । তবু যখন এসে পড়েছি তখন শহরটার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিই । প্রথম কায়রোতে আসি ১৯৫০ সালে । তারপর ১৯৭০ সাল । তখন নীল নদের এপার থেকে বাপ্পাদিত্যের গল্পে পড়া ত্রিকূট পাহাড়ের তিনটি চূড়ার মতো গির্জার তিন পিরামিডের শীর্ষভাগ দেখা যেত । এখন আর যায় না । সারি সারি হাইরাইজের আড়ালে পিরামিড এমন ঢাকা পড়ে গেছে যে এক মাইলের মধ্যে পৌঁছেও জিজ্ঞেস করতে হয় পিরামিডের রাস্তা কোনদিকে । পিরামিডে পৌঁছে আরেকটি আশাভঙ্গ হল । তখন বালি-গুল্মভরা রুক্ষ জনহীন প্রান্তরে বহুদূর ছড়ানো এবড়োখেবড়ো পাথরের চাঙড়ের মাঝখানে দেখেছিলাম পাশাপাশি দুটি পিরামিডের (তৃতীয় পিরামিডটি আকারেও ছোট এবং একটু দূরে) ভ্রূক্ষেপহীন মহিমা-যেন তারা এ-পৃথিবীর নয় । আর এখন, স্ফিংসের চারদিকে বেড়া থাকলেও পিরামিড দুটি ঘিরে রথ বা দোলের মেলা বসে গেছে । লোকে লোকারণ্য, পিরামিড মার্কা গেঞ্জি, ধাতু পাথর আলাবাস্তারের তৈরি ক্ষুদি ক্ষুদি পিরামিড, কাঠের ওপরে আঁকা ছবি । টুটেনখামেনের মুখোশ, ভেঁপু, বাঁশি । ছেলেভুলানো বেহালা সব পাওয়া যায় । খুপরি খুপরি স্টল আর ফেরিওয়ালা । পায়ে হেঁটে, সাইকেল চড়ে, গাধা মায় উট সওয়ারিতে চারদিক থেকে সবাই ছেঁকে ধরছে । কিছু একটা কেনো । একমাত্র আশ্বাস এই যে, এর মধ্যে চা, শরবত, কাবুলি, ঘুগনি বা ফল-ফুলুরির প্রবেশ নেই । খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থাগুলো বেশ দূরে একটা সারিতে আবদ্ধ । ফলে পিরামিডের চারপাশে কোলাহল, ঠেলাঠেলি যথেষ্ট হলেও আবর্জনা নেই । পরে মনে হয়েছিল যে আশাভঙ্গের কারণ, আমার পরিণত বয়স । এখানকার বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী মায় প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারাও পিরামিডের নবজন্ম মেনে নিয়ে আনন্দে হুটোপুটি করছে ।

মেমফিস সাকারা

নীল নদের ওপারে গেলে খালি পিরামিড দেখে ফিরে আসবেন না । মেমফিস এবং সাকারাও দেখে আসবেন । হলই বা মাইল কুড়ি দূর । মেমফিস হল ফারাওয়ের প্রথম রাজধানী । প্রায় পাঁচ হাজার বছর এর বয়স । এখন সেখানে স্মৃতিমাত্র আছে । চোখে দেখবার বিশেষ কিছু নেই । দুহাজার বছর পরে তৈরি রামেসিমের এক বিরাট প্রস্তরমূর্তি ছাড়া । সাকারা হল মেমফিসের সমাধিক্ষেত্র । আর সমাধিক্ষেত্র বলেই বোধহয় সাকারা মেমফিসের তুলনায় অনেক বেশি অটুট আছে । পিরামিডের ভেতরে মৃতদেহ মমি । কীভাবে কোথায় রাখত তা দেখতে গেলে সাকারায় কয়েক বছর আগে খুঁড়ে বার করা

মেঘেমঘেটের কবর দেখতে যাওয়াই ভালো । দর্শকদের ভূগর্ভপ্রকোষ্ঠে নামা এবং চলাফেরার বন্দোবস্ত এখানে গিজ্জার পিরামিডের তুলনায় অনেক ভালো । আর এখানেই দেখবেন ইমহোটেপের ছকে তৈরি (খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০) স্টেপস পিরামিড যাকে তখনকার লোকেরা স্বর্গের সিঁড়ি বলত । স্বর্গের সিঁড়ি হোক আর না-হোক স্টেপস পিরামিডই হল পৃথিবীর প্রথম মহাস্থাপত্য এবং পরের সমস্ত পিরামিডের পূর্বপুরুষ । ইমহোটেপ ছিলেন একাধারে প্রধানমন্ত্রী, স্থপতি, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক । অ্যারিস্টটলের সঙ্গে তুলনীয় । নীল নদের বন্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত এখনও প্রামাণ্য বলে ধরা হয় । দেড় হাজার বছর পরে দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে, ইমহোটেপ দেবতার আসন পান ।

কায়রোতে অ্যান্টিকুইটি মিউজিয়াম অবশ্য দেখবেন । প্রাচীন ইজিপ্ট বিষয়ে এর চেয়ে ভালো সংগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও নেই এবং দেখতে গেলে কেবল দোতলায় টুটেনখামেনের ঐশ্বর্য দেখেই পালাবেন না । একতলায় ঘরের পর ঘরে সেই আদিকাল থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন মূর্তি, বস্তু, স্থাপত্যের নিদর্শন সময়ানুসারে সাজানো আছে । মনে হবে যেন সে যুগের একটা ফিল্ম দেখছেন । সব আছে, খালি বাসিন্দারা নিপাত্তা । কায়রো ছাড়ার আগে খান-এল-খলিলিতে কেনাকাটার জন্য নিশ্চয় যাবেন । ওখান থেকে দুপা এগোলেই আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয় । পৃথিবীর প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা আজ এগারোশো বছর ধরে বিদ্যা বিতরণ করে চলেছে । ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যাকেন্দ্র । ইসলাম ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয় । আগে থেকে বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে বিদ্যালয় সীমানার ভেতরে ঢুকতে পারবেন না । প্রহরী বাধা দেবে । অল্প আয়তনে এই সুবিশাল বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ছাত্রদের যা ভিড়, তাতে দর্শকদের মুক্তভাবে ঢুকতে দিলে আর রক্ষা থাকত না । তবু রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বিদ্যালয়ের বহুতল অট্টালিকা দেখতে পাবেন আর দেখবেন বই-খাতা হাতে দলবাঁধা ছাত্রদের ভিড় । ঠিক যেমন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু হস্টেলের জটলা ।

নীল নদ

এবার নীল নদ । আরবি নাম নহর আন-নিল । পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী । ৬৬৫০ কিলোমিটার । প্রধান নদীটি বেরিয়েছে মধ্য আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে । নাম শ্বেত নীল । প্রধান শাখাটি বেরিয়েছে ইথিওপিয়ার পাহাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচু লেক টানা থেকে । এর সংজ্ঞা হল নীল নীল । আয়তনে ইনি শ্বেত ভগ্নীর চেয়ে ছোট হলেও জলভারে এবং প্রবাহে গরিষ্ঠ । নীল নদের যে বাৎসরিক বন্যা-ইজিপ্টের জীয়নকাঠি, মরণকাঠি, তার জলভাগের বেশিটা জোগান ইনি । মাটি অবশ্য শ্বেত ভগ্নীটির দান । নীল নদের জল-মাটি

নিয়েই মিশর দেশ। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক ভৌগোলিক হোরাডোটাস তাই বলেছিলেন, মিশর তো একটা দেশ নয়। মিশর একটি নদী।

মোটামুটি সমতলের কাদা ধোয়া জল বয়ে প্রধান নদীটির জল কাদাগোলা সাদা। নীল ভগ্নীটি নেমে আসছেন পাহাড় ভেঙে। ধাতু সম্পদে গরীয়ান পাথর গুঁড়িয়ে। তার জলের রং নীল কৃষ্ণ। দুই ভগ্নীর মিলন হচ্ছে সুদানের রাজধানী খারটুমে। এখান থেকে দুই বোন হাত ধরাধরি করে এক খাতে বয়ে চলেছে আরও ৩৩০০ কিলোমিটার ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। খারটুম থেকে আনুমানিক আশি কিলোমিটার দূরে নীলের অন্যতম প্রধান শাখা-নদী আটবারার মোহনা। ব্যস, তারপর আর কোনও নদী, উপনদী, ধারা, প্রস্রবণ নেই। বৃষ্টিপাত যৎসামান্য। ঊষর বন্ধুর মরুপ্রান্তরের মাঝখান দিয়ে একটি জলস্রোত, একটি প্রাণস্রোত বয়ে চলেছে যার দুপাশে সবুজের ছোপ, তৃণভূমি, চাষ-আবাদ, গ্রাম জনপদ। আবার এই সবুজের বেড়া পার হলেই দুপারে ধু-ধু মরুভূমি বালির পাহাড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে তৃষ্ণার জল নেই, ক্ষুধার খাদ্য নেই, সূর্যের তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নেই। খারটুম থেকে উত্তর সুদানের দুহাজার কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে নীল মিশর প্রবেশ করলেন ওয়াদি হালফাতে-যেখানে আসোয়ান হাই ড্যাম হবার আগে নীলের পঞ্চম ক্যাটারাক্টটি ছিল। এখন এই ক্যাটারাক্ট লেক নাসেরের গভীরে মিলিয়ে গেছে। এখান থেকে মাত্র পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে আবু সিম্বেলের জগদ্বিখ্যাত মন্দির। কিন্তু সেকথায় পরে ফিরে আসব।

নীল নদের ক্যাটারাক্টগুলির কথা না বললে নীলের পুরো পরিচয় হয় না। সংক্ষেপে বলি। ক্যাটারাক্ট ইংরিজি শব্দ। মানে হল, যেখানে জলপ্রবাহ পাথর কেটে উঁচু থেকে নিচে নেমে আসছে। নৌকো, জাহাজ বা কোনওপ্রকার জলযান এই বাধা অতিক্রম করতে পারে না। খারটুম থেকে আসোয়ানের ২০০০ কিলোমিটারের মধ্যে এরকম ছটি ক্যাটারাক্ট আছে। ষষ্ঠ এবং শেষটি হল আসোয়ানে। ক্যাটারাক্টের দুস্তর বাধার জন্যই সেই ফারাওদের আমল থেকে নেপোলিয়নের বাহিনী পর্যন্ত কেউ নদীপথে আসোয়ানের দক্ষিণে যেতে পারেনি। এ অগম্য বাধা প্রথমে দূর করেন ১৯ শতকের গোড়ায় অটোমান খেদিভ (নামে খেদিভ হলেও আসলে তিনি তখন মিশরের তখত তাউস দখল করেছেন) মহম্মদ আলির ছেলে ইব্রাহিম। অপরিমিত লোকবল নিয়ে তিনি তাঁর নৌকোগুলি ক্যাটারাক্টের পাশ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নাব্য অংশে নিয়ে আসেন। একই কারণে নীল নদের উৎস সন্ধানে এত দেরি হল। ভেবে দেখুন, পৃথিবীর ইতিহাসে সুখ্যাত এই নদীটির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় মোটে এই বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে। তার কুড়ি বছর আগে মানুষ উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু পৌঁছে গেছে।

জলভ্রমণ

নীল নদে প্রমোদভ্রমণের দৌড়ও ওই আসোয়ান পর্যন্ত । সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্ট নিয়ে দুই শতাধিক জাহাজ কায়রো থেকে আসোয়ান আনাগোনা করে । এইসব জাহাজের মালিক বিভিন্ন কোম্পানি হলেও এদের বুকিং হয় কায়রোতে এবং ইউরোপ-আমেরিকার বড়-বড় শহরে, ট্র্যাভেল এজেন্টদের হাতে । ভালো ট্র্যাভেল এজেন্টের মাধ্যমে বুক করলে সেই এজেন্টরাই আপনাকে কায়রো এয়ারপোর্টে নিতে আসবে, কায়রোতে হোটেল ঠিক করে দেবে, আবার কায়রো ছাড়ার পর বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে আবার কায়রোতে এনে প্লেনে তুলে দেবে । সমস্ত ব্যাপারটা ছকে ফেলা । নিতান্ত কপাল খারাপ না হলে ঝামেলায় পড়বার সম্ভাবনা নেই ।

জাহাজগুলি আকারে এবং গঠনে একরকম হলেও, আয়তনে এবং বিশেষ করে আরামে-বিলাসে যথেষ্ট তফাত আছে । অগভীর জলে চলবে বলে সব জাহাজই চ্যাপটা চওড়া খোলের । তার ওপরে দুই-তিন-চারতলা ডেকের সারি । মাত্র কুড়িজন যাত্রী নেয় এমন জাহাজও আছে আবার ১৫০ জন যাত্রী বইতে পারে এমন জাহাজও চলছে । চার বা পাঁচতারার জাহাজগুলো সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত । ছোট জাহাজ বলে ক্রীড়াক্ষেত্র, মল্লভূমি, সিনেমা ইত্যাদি নেই কিন্তু একাধিক খাবার জায়গা, বার, লাউঞ্জ এবং ছোট একটা সুইমিং পুল আছে । অবশ্য সময় কাটাবার জন্য এসব জাহাজে এর বেশি কিছু দরকার হয় না । দুধারে নীল তটভূমির দৃশ্য তো আছেই । দুই বা তিনতারার জাহাজও আছে । সেখানে হয়তো শীতাতপনিয়ন্ত্রণ নেই । কেবিনগুলোও অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু তেমন কিছু ঘেঁসাঘেঁসি হয় না । আর দামেও অনেক সস্তা ।

কায়রো থেকে আসোয়ান যাতায়াতের মেয়াদ চোদ্দদিন । ওটাকে বাড়িয়ে তিন সপ্তাহও করা যায় । যাদের হাতে অঢেল সময়, অনেক পয়সা, তারা সমস্ত সফরটাই জাহাজে করতে পারে । কিন্তু সাধারণ লোক অতটা বাড়াবাড়ি করতে চায় না । তাদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সফর হল-কায়রো থেকে আসোয়ান (৮৯০ কিলোমিটার) উড়ে যাওয়া এবং সেইদিনই এবং সাধারণত সেই এক প্লেনেই আসোয়ান থেকে আবু সিম্বেল (২৮০ কিলোমিটার) পর্যন্ত যাওয়া । ঘণ্টা দুই আবু সিম্বেলে কাটিয়ে আবার আসোয়ানে ফিরে এসে ওইখানে জাহাজে চড়া । তারপর চার বা পাঁচ রাত জাহাজে কাটানো এবং দুদিকে নানা নবীন ও প্রাচীন দৃশ্য দেখতে দেখতে আসোয়ান থেকে লাকসোর (২২৫ কিলোমিটার) পাড়ি দেওয়া । লাকসোর হল মিশরিয় পুরাতত্ত্বের মুকুটমণি । যেখানে সবকিছু দেখে, লাকসোর থেকে বায়ুপথে কায়রো (৬৬৬ কিলোমিটার) । ইউরোপের যাত্রীরা অনেক সময় লাকসোর থেকেই কায়রোয় না গিয়ে সোজা দেশে ফেরেন । আরেকটা পথ হল কায়রো

থেকে এরোপ্লেনে প্রথমে লাকসোর। সেখান থেকে জাহাজে আসোয়ান। আসোয়ান থেকে একছুটে (প্লেনে বা বাসে) আবু সিম্বেল যাওয়া যায়। তারপর আসোয়ান থেকে ব্যোমমার্গে কায়রো বা লাকসোর। আমরা প্রথমে আসোয়ান দেখলাম।

আবু সিম্বেল

ভোর সাড়ে ছটায় ইজিপ্ট এয়ারের বিমান কায়রো ছেড়ে আসোয়ান হয়ে আবু সিম্বেল পৌঁছল সকাল নটা নাগাদ। ছোট্ট এয়ারপোর্টের বাইরে বাস তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা দল বেঁধে উঠতেই ছেড়ে দিল। দশ মিনিট পরে যেখানে নামলাম, সেখানে বালি-পাথর-কাঁকর ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নদীর দিকে একটা টিলার মতো উঠে গেছে। দুদিকে সারি বাঁধা স্যুভেনিরের দোকান, কোল্ড ড্রিঙ্কসের স্টলের মাঝখান দিয়ে গিয়ে একটা রেলিংঘেরা জায়গায় টিকিট নেওয়া হল। তারপর টিলাটাকে বেড় দিয়ে নদীর দিকে নামতে শুরু করলাম। অক্টোবর মাসের শেষ। তেমন গরম না-হলেও রোদ্দুরের তেজ আছে। কাঁকুরে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে ভাবছিলাম গল্পের মতো, কাহিনীর মতো সেই আবু সিম্বেলের মন্দির। তারপর একটা মোড় ঘুরতেই একসঙ্গে চোখে পড়ল দুশো ফুট উঁচু খাড়া পাহাড় আর সেই পাহাড় খোদাই করা চারটি সুবিশাল মূর্তি। তিনটি অক্ষত। কেবল বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় মূর্তিটির বুকের থেকে মাথা পর্যন্ত ভেঙে নিচে পড়ে আছে। এই মূর্তি চারটির কথা অনেক শুনেছি, অনেক ছবি দেখেছি, তবু মন এই বিশালত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মনে হল যেন পাঁজরার ওপরে একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল। গুরগুর করে উঠল বুকের ভেতর। মুহূর্তের জন্য চারপাশের জনস্রোত, কোলাহল সব মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তা। ওই মূর্তি চারটি আর আমি। চটকা ভেঙে দেখলাম দল একটু এগিয়ে গেছে। আবু সিম্বেলে আবার কখনও যাব কিনা জানি না কিন্তু গেলেও এ-অনুভূতি আর হবে না। প্রথম সমুদ্র দেখার মতো, প্রথম হিমালয় দেখার মতো, এ-সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

চারটি মূর্তিই দ্বিতীয় রামেসিসের। ফারাও কুলের বিখ্যাততম নরপতি। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০৪ সাল থেকে ১২৩৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি। বহু যুদ্ধ জয় করেছেন, বহু নগর-গ্রাম-জনপদ তৈরি করেছেন। আর সারা মিশর জুড়ে সর্বত্র বসিয়েছেন নিজের বিরাট বিরাট মূর্তি, প্রতিকৃতি-তাঁর রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ছবি। পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো আত্মম্ভরী লোক আর দেখা যায় না। সে যাই হোক, মূর্তিগুলি কিন্তু অপূর্ব। হাঁটুর ওপর হাত রেখে উপবিষ্ট মূর্তি। সৌম্য শান্ত মুখ। সে মুখে ভয়, রাগ, দ্বেষ, উদ্বেগ কোনও মানবিক ভাবের ছাপ নেই। সে মুখ যেন

দেবতার মুখ। সে চোখের দৃষ্টি নীল নদের ওপারে কোনও দূর ভবিষ্যতের দিকে ন্যস্ত। মূর্তিগুলির চারদিকে পায়ের গোড়ায় ছড়ানো-ছিটানো আরও অনেকগুলি মূর্তি। তার মধ্যে রামেসিসের মা রানি টি এবং তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা রানি নেফেরটারির মূর্তি চোখে পড়ে। একটু খুঁজে দেখলে আরও চোখে পড়বে মূর্তিগুলির গায়ে পাথর কেটে নানারকমের আঁকি-জুকি গ্রাফিটি। তিন হাজার বছর ধরে দর্শকদের অমর হবার প্রচেষ্টা। একটি মূর্তির পায়ের কাছে ২১০০ বছর আগেকার গ্রিক ভাষায় লেখা আছে 'আমরা এটা লিখলাম। আমোয়াবিচোসের ছেলে আর্চন এবং উডামাসের ছেলে পেলোকাস।'

দুই জোড়া মূর্তির মাঝখান দিয়ে মন্দিরে ঢোকবার চারকোনা দরজাটি আকারে ছোটই বলতে হবে। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে সেখানে উঠতে হয়। সিঁড়িগুলি আবার পিছনদিকে সামান্য হেলানো। মানে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে উঠতে হয়। রামেসিসের অনুজ্ঞাতেই সিঁড়িগুলি এইভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে সবাইকে তাঁর মূর্তির সামনে মাথা নিচু করতে হয়। মন্দিরের বাইরে দক্ষিণের দেওয়ালে ইজিপসিয়ান আলেখ্যলিপিতে রামেসিসের সঙ্গে হিটাইটদের সন্ধিপত্রটি খোদাই করা আছে। দুই যুযুৎসু শক্তির মধ্যে এধরনের শান্তিকামী সন্ধিপত্র পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এবং রামেসিসই এই সন্ধির রচয়িতা।

একটা আস্ত পাহাড় খোদা মন্দিরটির দরজা থেকে দেবস্থল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় দুশো ফুট। তার মধ্যে প্রথম কক্ষটি যাকে পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন বিশাল হিপোস্টাল হল (সারি সারি থামের ওপর সিলিং), সেটিই প্রায় ১৫০ ফুট। থামগুলির ওপরেও রামেসিসের মুখ বসানো আছে ওসিরিসের পোশাকে, ইনি মৃতের দেবতা। হিপোস্টাইলের পরে আরেকটি হল। আনুমানিক ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৫ ফুট প্রস্থ। এই হলটি পেরিয়ে ছোট একটি কামরা যেখানে বেদীর ওপর দেবতাদের আসন। সমস্ত হলগুলিতেই দেওয়াল, থাম, সিলিং সর্বত্র বিচিত্র খোদাই করা এবং কোনও-কোনও জায়গায় তুলি দিয়ে আঁকা রঙিন চিত্রসমষ্টি। সুড়ঙ্গের মতো হলের দুধারে বত্রিশশো বছর আগে আঁকা ছবিগুলি মৃদু অন্ধকারে জ্বলছে। সবই রামেসিসের বিভিন্ন কীর্তি-কাহিনী। কোথাও বা রামেসিসের সঙ্গে দেবতাদের সাক্ষাৎকার। সব ছবিতেই রামেসিস হলেন প্রধান ব্যক্তি। এমনকী দেবতাদের সামনে তাঁর সেই ঋজু দৃপ্তমূর্তি। কোনওপ্রকার নতি স্বীকার রামেসিসের ধাতে ছিল না, তা সে দেবতা, মানুষ যাই হোক না কেন। হিপোস্টাইল হলের দুপাশে বহু ছোট-ছোট কামরা। কোনওটা রামেসিসের বসবার ঘর, কোনওটা তাঁর বিশ্রামকক্ষ। একটি কামরায় সারি সারি তাক। এটা ছিল রামেসিসের লাইব্রেরি।

দুটি হল পরপর পেরিয়ে এবার মন্দিরের গর্ভগৃহ। গ্র্যানাইটের তৈরি বেদীর ওপর চারটি দেবতার উপবিষ্ট মূর্তি। সামনে আরেকটি বেদীর ওপর পূজার উৎসর্গ দ্রব্যাদি

রাখবার ব্যবস্থা। চার দেবতার একজন হলেন টা-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং মেমফিসের আরাধ্য দেবতা। অন্য দুজন হলেন রা-হারাখটি এবং আমন-রা। দুজনেই সূর্যের বিভিন্ন রূপ, তবে প্রথমজন হলেন হেলিওপোলিসের প্রধান দেবতা এবং দ্বিতীয়জন রামেসিসের রাজধানী থিবসের হর্তাকর্তা। চতুর্থটি কে বলুন তো? রামেসিস স্বয়ং। আর তিনি যে এই তিন দেবতার একীভূত রূপ তার অকাট্য সৌরনির্দেশ রেখে গেছেন মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীতে। অক্টোবর মাসে যেদিন রামেসিসের জন্মদিন বলে ধরা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যেদিন তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল এই দুটি দিন, সকালের সূর্যের প্রথম আলো মন্দিরের দুশো ফুট অন্ধকার ভেদ করে রামেসিসের মূর্তিকে আলোকিত করে-অন্য দেবতাদের গায়ে সে আলো পৌঁছয় না। সাবাশ রামেসিস -সঙ্গে সঙ্গে সাবাশি দিচ্ছি এ যুগের সেই বিশ্বকর্মাদের যাঁরা মোটে এই তিরিশ বছর আগে পাহাড়সমেত সমস্ত মন্দিরটাকে নদীর ধার থেকে তুলে এনে নব্বই ফুট ওপরে এখনকার জায়গায় বসিয়েছিলেন। চার লক্ষ টন পাথর এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করলেন তাঁরা, যে মন্দিরের অভ্যন্তরীণ কারুকার্য বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটল না, এমনকী সূর্যের আলো এখনও একই সময়ে, একই রাস্তা দিয়ে একই জায়গায় পৌঁছয়। মন্দির দেখে বেরোবার সময় পাশের একটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। তখন দেখা যায় মন্দিরের ছাদের ওপরে সারি সারি কংক্রিটের থাম, খিলানের ওপরে আরেকটা ছাদ আছে। দুই ছাদের মাঝখানে নানারকম ছবি আর মডেল দিয়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে মন্দিরটি নব্বই ফুট নিচ থেকে ছোট-ছোট খণ্ডে কেটে ওপরে আবার জোড়া দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ছাদের ওপরে নিচেকার পাথর ফেলে সেই পাহাড়টির প্রতিকৃতি করা হয়েছে -যে পাহাড় খুঁড়ে রামেসিস তাঁর মন্দির বসিয়েছিলেন। এত কাণ্ড করা হল কেন? না-হলে, রামেসিসের অতুল কীর্তি, পৃথিবীর অন্যতম সম্পদ আসোয়ান উচ্চ বাঁধের জলে তলিয়ে যেত।

আবু সিম্বেল নামের সঙ্গে কিন্তু রামেসিসের কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। আরবি ভাষায় আবু মানে বাবা আর জায়গাটির নাম সিম্বেল। বোধহয় রামেসিসের বিরাট মূর্তি দেখে এখনকার বাসিন্দারা আবু সিম্বেল নাম দিয়েছিল। রামেসিসের মন্দির ছাড়াও এখানে আরও কিছু পুরাকীর্তি আছে, তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য -নেফারটারির মন্দির। এখানে দেবতা হলেন হাথোর -আদ্যাশক্তি, মাতৃদেবতা। এই মন্দিরটিও একটা আস্ত পাহাড় খুঁড়ে তৈরি, তবে রামেসিসের মন্দিরের চেয়ে অনেক ছোট।

আসোয়ান

আবু সিম্বেল থেকে বেরিয়ে আবার এরোপ্লেন। চল্লিশ মিনিট পরে আসোয়ান। বাসে করে নীল নদের খেয়াঘাট। সেখানে পুরো দল দুদিকে বেঞ্চিওয়ালা বৃহৎকায় চ্যাটাল খোলা

মোটর লঞ্চে চড়ে বসলাম । ভটভট করে লঞ্চ এগিয়ে চলল । একদিকে ঝুঁকে নীলের জলে হাত ঠেকালাম । গা শিউরে উঠল । ইতিহাসের সেই নীল নদ-ফারাও, ইহুদিরা, মোজেস, ডেরিয়াস, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার -একটা পুরো ইতিহাস মার্চ করে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল । লঞ্চের সারেং তখন আমাদের হাত তুলে দেখাচ্ছে উঁচু টিলার ওপর পোস্ট অফিস লালরঙা সুদৃশ্য বাড়িগুলি । অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত পুলম্যান ক্যাটারাক্ট হোটেল । আগাথা ক্রিস্টির ভক্ত পাঠকরা জানবেন তাঁর উপন্যাস Death on the Nile-এর চিত্ররূপের জন্য এই হোটেলটি ব্যবহার হয়েছিল । এখান থেকে কোনাকুনি দক্ষিণে পাড়ি দিলে নিউ আইসিস হোটেল, যার প্রায় সামনেই ভাসছে আমাদের নীল নদের জাহাজ SUN BOAT III. প্রথম দর্শনেই প্রেম হল । সাদা আর নীলে মিশিয়ে চওড়া ফাঁদলের নাতিবৃহৎ জাহাজটিই সান বোট । সী গালের মতো অবলীলাক্রমে ঢেউয়ের ওপর ভাসছে । তার সাবানধোয়া মসৃণ গায়ে দুপুরের রোদ হাসছে । সে যেন আকাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটুকরো মেঘ ।

রেলিংঘেরা কার্পেট বিছানো পাটাতন বেয়ে জাহাজে উঠতেই সহাস্য সম্ভাষণ জানালেন জাহাজের প্রধান ব্যবস্থাপক হুসেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মোহামেদ, প্রধান স্টুয়ার্ড । জাহাজ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা জেনে এবং এক গ্লাস উত্তম শরবত-ওই দেশেরই সোরেল ফুলের পাপড়ির নির্যাস, কালচে লাল রঙের সুশীতল পানীয়-পান করে, যে যার ঘরের চাবি নিয়ে জাহাজের ভেতরে চলে গেলাম । সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরটি । সংলগ্ন শাওয়ার এবং টয়লেট । জানলার পর্দা সরাতেই চোখে পড়ল ৫০ গজ দূরে নদীতট । সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ চান করছে, কেউ বা পোষা মোষের গা রগড়ে কাদা ধুয়ে দিচ্ছে-এক-আধটা ডিঙি-নৌকোর আনাগোনা-বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্য দেখা গেল না, কেননা দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে এবং খিদেও বেশ পেয়েছে । খানা দেশি এবং বিলাতি মিলানো । এখানে বলে রাখি ইজিপ্টের খাওয়া-দাওয়া মধ্যপ্রাচ্য-ঘেঁসা । ফেলাফেল, বাবা গাপুষ, কাবাব, কোফতা ইত্যাদি, তবে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় এরা মশলা একটু বেশি ব্যবহার করে । ফলে খাবার অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হয় । তবে, আমাদের ভারতীয়দের মতো মশলার কৌশল এরা কেউ জানে না । ইজিপসিয়ানদের নিজস্ব ডিশ বলতে ফুলমুতামমাস, একরকমের বিন, টম্যাটো মশলা দিয়ে সেদ্ধ করা হয় । কখনওবা তার মাথায় একটা ভাজা ডিম দেওয়া হল । বাটি করে এমনি বা পাউরুটি বা হাতেগড়া রুটি (পিঠা ব্রেড) দিয়ে খাওয়া হয় । খেতে মন্দ নয় । আরেকটা হল মুলুখিয়া । একরকমের শাক কুটে চিকেন বা খরগোসের মাংসের ব্রথের সঙ্গে ফোটানো হয় । ইজিপসিয়ানরা ভাতও খায় এবং রোজ বেল খালতা হল কিসমিস, বাদাম, মাংস, মেটে মেশানো একরকম ভাতভাজা ।

পায়রা এদের অন্যতম সুখাদ্য । খোলা আগুনে রোস্ট করে ঈষৎ ধোঁয়া গন্ধ পায়রা খুব চলে । পানীয়ের মধ্যে চা, কফি, কোকাকোলা, লিমকা তো আছেই, ইজিপসিয়ান গৃহজাত মদ্যাদিও খারাপ নয় । দাম গেরস্তপোষা । বিলাতির দাম কিন্তু আকাশছেঁোয়া ।

ফেলুকা

জাহাজের খানা কামরায় ভূরিভোজন সেরে সবে ভাবছি যে এবার কেবিনে গিয়ে একটু গড়ানো যাক । সেই কখন ভোর চারটেয় উঠেছি, এমন সময় দরজার বাইরে পা দিতেই কপাৎ করে ধরলেন ইব্রাহিম-আমাদের সঙ্গী ট্যুর গাইড, ফর্সা ছিপছিপে চেহারার হাস্যমুখ যুবকটি, অনতিত্রিংশ বর্ষীয়-কোথায় চললে! ফেলুকা চড়তে যাবে না? একটু আমতা আমতা করি-ফেলুকা মানে, ইয়ে .... । ইব্রাহিম কোনও ওজর আপত্তি শুনবেন না । আসোয়ানে এসে ফেলুকা চড়বে না-সে কি কথা? এখন বিকেল হয়ে এল । উজানে তিনটে পাল তুলে দেব । পাখির মতো উড়ে চলবে ফেলুকা । সেই ফুরফুরে হাওয়ায় বসে দেখবে না এলিফ্যান্টাইন আইল্যান্ডের ভাঙাচোরা মন্দির, কিচেনারের বাগান-দ্বীপ, উঁচু টিলার ওপরে তোমাদের আগা খাঁর স্মৃতিমন্দির-যেখান থেকে নীল নদ পেরিয়ে, সবুজের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারের মরুভূমির বালিয়াড়ি দেখা যায় । এ-অনুরোধ এড়ানো যায় না । বিশ্রামের কথা ভুলে ফেলুকায় গিয়ে বসলাম । ফেলুকা হল নীল নদের নৌকো । আমাদের যেমন বজরা । চিনেদের সাম্পান । সামনের দিকে ছুঁচলো উঁচু গলুই । চ্যাপ্টা চওড়া মধ্যভাগ, পিছনদিকে আবার সরু হয়ে পাটাতন দিয়ে আটকানো । হাল এবং হালির জায়গা সেইখানে জলের কাছাকাছি । বিরাট তিনকোনা হাল, ফেলুকার পিছনের পাটাতনের সঙ্গে আটকানো এবং হালি হাল নাড়াচাড়া করছে দুপায়ের চাপে । হালির হাতে রয়েছে পালের দড়ি, যা দিয়ে পালের মোড় ফিরিয়ে হাওয়ার বেগ ধরা যাবে । ফেলুকা নানা মাপের হয় । বিশ-ত্রিশ জন লোকের জন্য এক ডেকের ফেলুকা আছে । আবার শতাধিক যাত্রী নিতে পারে এমন ফেলুকাও আছে যাদের শেষের আধখানা জুড়ে, এক বা দুই কামরা এবং সেই কামরার ঢালা ছাদে যাত্রীদের আরামে বসে হাওয়া খাওয়ার বন্দোবস্ত । স্পিড বোট, মোটর লঞ্চ থেকে জাহাজ পর্যন্ত নানারকমের নৌযান এখন নীলের বুকে চলাফেরা করে, কিন্তু সেই অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত-আমাদের গরুর গাড়ির মতো কী যাত্রী, কী মাল বহনে ফেলুকার স্থান কেউ নিতে পারেনি ।

এলিফ্যান্টাইন দ্বীপ আগা খাঁ

ইব্রাহিমের কথা না শুনলে ঠকতে হত । পাশাপাশি তিনটি সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি পাল তুলে ফেলুকা আসোয়ানের দক্ষিণে উজানে পাড়ি দিল । ডানদিকে হাতির রিলিফ ছবির মতো এলিফ্যান্টাইন আইল্যান্ড । আফসোস এই যে, ওখানে নামা হল না । বিভিন্ন পর্যটকের বৃত্তান্তে এই দ্বীপের নম্রমুখী পীবর বক্ষ ন্যুবিয়ান সুন্দরীদের ভূয়সী প্রশংসার কথা পড়া ছিল । এলিফ্যান্টাইন পেরিয়ে যেখানে গিয়ে পড়লাম সেখানে নদী বেশ সরু হয়ে এসেছে, দুদিকে গ্র্যানাইটের বেড়া । ইব্রাহিম বললেন যে, এই হচ্ছে নীলের প্রথম ক্যাটারাক্ট যার প্রচণ্ড স্রোত ঠেলে নৌকো এগোতে পারত না । এখন অবশ্য সব জল আসোয়ান হাই ড্যামে আটকে আছে । সে জলধারাও নেই, সে স্রোতও নেই । পুরনো নদীর পাথুরে খাতে ড্যামের যে উদ্বৃত্ত জলটুকু বয়ে চলেছে, তাতে সন্তর্পণে ফেলুকা চলতে পারে-স্টিমলঞ্চ, নদীপোত আসে না । তাদের দৌড় সাত কিলোমিটার উত্তরে আসোয়ান বন্দর পর্যন্ত, সেখানে পাথুরে জমির পরে জল আবার অপেক্ষাকৃত গভীর । এবার ফেলুকার মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল । পশ্চিম কূলে অনুচ্চ পাহাড় । পাহাড়ের মাথায় সুবিশাল মন্দির । আগা খাঁর মসোলিয়াম । তার থেকে কিছুটা নেমে এসে পাহাড়ের গায়ে একটি সুদৃশ্য বাংলো । আসোয়ান আগা খাঁর অতি প্রিয় জায়গা ছিল । এই বাংলোটি তিনি শখ করে তৈরি করেছিলেন । আসোয়ানে জনবিরল জায়গায় কিছু অবসরযাপনের জন্য । এখনও আগা খাঁর পঁচাশি বছর বয়স্ক বিধবা এই বাংলোয় শীতকালের দুমাস কাটান । মনে মনে দেখলাম । শীতের কোনও সন্ধ্যায়, কুয়াশা ভেদ করে নিঃসঙ্গ বাংলোর বারান্দায় বসে বৃদ্ধা দেখছেন-ওই যেখানে আগা খাঁর স্মৃতিমন্দিরে আলো জ্বলছে ।

ফেলুকা যেখানে কূলে ভিড়ল, সেখানে ছোট একটি গঞ্জ । আমি সেখানে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম । গৃহিণী বাকি দলের সঙ্গে মসোলিয়াম দেখতে গেলেন । ছোট্ট পাহাড় । ১০-১৫ মিনিটের চড়াই, তবুও আমি সাহস করলাম না । ওঁদের ফিরে আসতে চল্লিশ মিনিটের মতো লাগল । তার মধ্যে গঞ্জের দোকানদার ফিরিওয়ালাদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল । মাদ্রাজের রেল পোর্টারদের মতো ইংরিজি অনেকেই জানে, আর বিদেশির সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য ভাষারই বা কী প্রয়োজন । হাবেভাবে বেশ কাজ চলে যায়, বিশেষ করে বিদেশিরা যদি মিশুক ব্যক্তি হয় । মিশরিরা যথেষ্ট মিশুক এবং আমি ভারতীয় শুনে ওদের ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল । দোকানপত্তর খুবই সাধারণ-মুদির দোকান, চায়ের স্টল, জামাকাপড়, জুতো, কফিখানা ইত্যাদি । খদ্দের যে খুব আছে তা নয় কিন্তু তা নিয়ে দোকানদারদেরও বিশেষ চিন্তিত দেখলাম না । ওরা নিজেদের মধ্যেই হৈ-হল্লা আড্ডা দিয়ে সিনেমার গান বাজিয়ে যথেষ্ট আমোদে আছে । মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর সতরঞ্চি বা জাজিম পেতে ছোট-ছোট গ্রুপে এক ফরসিতে তামাক খাচ্ছে । নল এ-হাত

থেকে ও-হাতে ঘুরছে। সামনে বাঘবন্দির মতো কী একটা খেলার ছক পাতা। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কয়েকবার সমবেত সভ্যরা আমার দিকে নলটি তুলে ধরলেন। সাহস হল না। ইজিপ্টজ্ঞ মুজতবা আলি সাহেব লিখেছিলেন যে, ইজিপসিয়ানরা তামাকের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে বালাখানা করতে শেখেনি।

দল ফিরে আসার সময় হতে আমি ফেলুকার ঘাটে গিয়ে ফিরিওয়ালা পরিবৃত হয়ে দাঁড়ালাম। সবাই নানারকমের তৈরি জামা ফতুয়া পাজামা বেচছে। ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে বেশ একটা হাসিঠাট্টার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে এবং আমি কিছু কিনব না জেনেও ওদের আমুদেপনায় কোনও ভাঁটা নামেনি। ওদেরই একজন হঠাৎ এসে বলল, ওই দেখ তোমাদের দল এসে গেছে। বল তো তোমার বৌ কোনটি? একটা মজা করব। তারপর যেই উনি ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন ফিরিওয়ালা তার ঠ্যাঙা বাড়ির মতো ডাণ্ডা, যার মাথায় এড়ো কাঠের সারিতে ওর সওদা সাজানো আছে, উঁচু করে সাঁ-সাঁ করে ওঁর দিকে তেড়ে গেছে। আমার স্ত্রী আঁৎকে উঠলেন আর ফিরিওয়ালার হো হো করে হাসি।

মিশরিদের হাসতে বা হাসাতে খুব উদ্যোগ-আয়োজনের দরকার হয় না। ফেলুকাতে উঠে স্ত্রী বললেন, আহা তুমি যদি মসোলিয়াম দেখতে আসতে-মসোলিয়ামের জন্য নয়, আগা খাঁর মসোলিয়ামের তুল্য সুগম্ভীর স্থাপত্য আরও অনেক জায়গায় দেখা যাবে এবং এটা কোনও সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাসাদও নয়, কিন্তু ওপারে পশ্চিমদিকের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সত্যি নীল নদের সবুজ বেড়া পেরিয়ে ওপারের মরুভূমি দেখতে পেলাম। সেখানে বালিয়াড়ির ওপর লম্বা ছায়া ফেলে একক আরোহী নিয়ে একটা উট চলে গেল। এরকম দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখেছি।

কিচেনারের দ্বীপ

হস্তি দ্বীপের পশ্চিমকূল ধরে যেতে যেতে উল্টোদিকে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি কিছু গুহামন্দির দেখা যায়। এগুলো হল রামেসিসেরও আগে ইজিপসিয়ান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাধি। ডানদিকে দ্বীপের একেবারে শেষে কতকগুলো আধুনিক ঘরবাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কী? ইব্রাহিম বললেন, এ-কোনও পুরাতত্ত্ব নয়। তোমাদের ওবেরয় কোম্পানির রিসর্ট হোটেল। সারা পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিরা ওখানে অবসর বিনোদন করতে আসেন। দামও তেমনই। পরের স্টপ হল কিচেনারের দ্বীপ। হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত লর্ড কিচেনার যিনি মিশরেও বহু কাণ্ডকারখানা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে আসোয়ান থেকে সুদানের খারটুম অবধি, বারোশো মাইল ভয়ঙ্কর মরুভূমি ভেদ করে রেললাইন বসিয়েছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন মিশরের সৈন্যদলকে

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে খারটুমে পাঠানো। সুদানের ধর্মনেতা মাজদির কবল থেকে সুদানকে আবার মিশরের হাতে ফিরিয়ে আনার জন্য। অবশ্য মিশরের হাতে ফিরিয়ে আনাটা নামেমাত্র। কারণ তখন মিশরের খেদিভ মোহামেদ আলি অটোমান-কুল ত্যাগ করে ব্রিটিশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। আসোয়ান কিচেনারের প্রিয় জায়গা বলে মোহামেদ আলি এই দ্বীপটি কিচেনারকে উপহার দেন। কিচেনার এই দ্বীপে বহুদিন ছিলেন এবং সমস্ত দ্বীপ জুড়ে মনোরম একটি উদ্যান তৈরি করেছিলেন। সে উদ্যান এখনও আছে এবং কী তার শোভা। ঘন সন্নিবদ্ধ বনস্পতি, লতায়, পাতায়, কুঞ্জে-কুসুমে পাখির কাকলিতে, ঝরনা, ফোয়ারা, অগভীর নালি বেয়ে জলের কুলুকুলু শব্দে মনে হয় যেন নন্দনকাননে এসে পড়েছি। আর মনে হয় কিচেনারের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিক ও কট্টর যুদ্ধ ব্যবসায়ী কী করে, কী স্নেহে, কত ভালোবাসায় বাগানটি গড়েছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, কিচেনার আজীবন এই বাগানটির তত্ত্বাবধান করেছিলেন। কখনও সাক্ষাতে কিন্তু প্রধানত পত্রযোগে। পৃথিবীর যেখানেই তিনি থাকুন এই বাগানের রিপোর্ট নিয়মিত তাঁর কাছে যেত এবং সেই রিপোর্ট পেলে গুরুতর রাজকার্য সরিয়ে রেখে আগে তিনি দেখতেন গাছেরা কেমন আছে। কোন লতায় ফুল ফুটল। প্রতি ঋতুর পাখি সময়ে দেখা দিল কিনা।

কিচেনারের দ্বীপ থেকে ফেলুকায় উঠতে সন্ধ্যার ঘোর লেগে গেল। টুপ করে হাওয়াও পড়ে গেল। মাঝি পাল নামিয়ে নিল। তখন সেই নিস্তরঙ্গ স্থির জলের ওপর দিয়ে নিথর বাতাসে ফেলুকা এগিয়ে চলল কেবল দুটি দাঁড়ির বাহুবল ভরসা করে। ওঃ কী তাদের পরিশ্রম। আধঘণ্টার রাস্তা সওয়া এক ঘণ্টায় কাবার করে আমরা যখন কূলে ভিড়লাম তখন দাঁড়ি দুটিকে দেখে মনে হল ওরা যেন কাপড়জামা সুদ্ধ নদীতে ডুব দিয়ে এসেছে। ফেলুকা থেকে নেমে জাহাজে যাবার পথে নিউ সাইসিস হোটেলে ঢুকলাম। ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙাতে হবে। কাউন্টারে হাস্যমুখ মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। মাথার কোঁকড়ানো চুল বাদ দিলে বেশ ভারতীয় ভারতীয় চেহারা। আমার পাসপোর্ট দেখে বলল, ও তুমি ইন্ডিয়ান। আমিও ইন্ডিয়ান। আমার নাম বালকৃষ্ণ মেনন। কেরালার লোক আমি। একটু হতভম্ব হলেও ভাবলাম হবেও বা। কেরালাতে কোঁকড়ানো চুলও কিছু দেখা যায়। বললাম, তাই নাকি, কতদিন আছেন এখানে? আমি তো বরাবর এখানেই আছি আমার মা ইন্ডিয়া থেকে এসেছিলেন। এইরকম সাত-পাঁচ গল্প করে হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন, কেমন ঠকিয়েছি তোমায়। আমি ইজিপ্টেরই লোক। তবে কি জানো আমাদের কোম্পানিতে ভারতীয় এক ড্রাইভার ছিল তার নাম বালকৃষ্ণ মেনন। কেরালার লোক। তার কাছে তোমাদের দেশের গল্প শুনেছি। চেক ভাঙিয়ে যখন জাহাজে ফিরলাম তখন সমস্ত আলো জ্বালিয়ে নদীর

কালো জলে তার ছায়া ফেলে জাহাজ ইন্দ্রপুরীর মতো সেজে আছে। খানাকামরার বাইরে বিরাট বোর্ডে লেখা Black+White night. সবাইকে সাদা-কালো মিশানো পোশাক পরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সানবোট আটলান্টিকচারী কুইন এলিজাবেথ নয়। চল্লিশজন যাত্রী আর জনা কুড়ি নাবিক নিয়ে এর কারবার। লম্বায় আনুমানিক দুশো ফুট, চওড়ায় ৩০ ফুটের মতো আর জলের তলায় অনধিক তিন ফুট-এই হল এর চৌহদ্দি। এইটুকুর মধ্যেও যাত্রীদের আমোদ দেবার জন্য প্রতি সন্ধ্যাবেলাতেই কিছু-না-কিছু বন্দোবস্ত থাকত। যাত্রীরা নৈশভোজনের আগে, ব্যবস্থামতো পোশাক পরে খানাকামরার সংলগ্ন লাউঞ্জে জমা হতেন। সেখানে জাহাজ কোম্পানির খরচে এক-আধ পাত্র সুরা। টুকটাক কিছু খাওয়া, সারাদিন কী হল তার আলোচনা মানে গজালি হত। টেপরেকর্ডে নাচের বাজনা বাজত। ওরই মধ্যে উদ্যোগী-উদ্যোগিনীরা একটু নেচে নিতেন। একদিন হল জেলেবায়া নাইট। অনেকে শার্ট-প্যান্টের ওপর মধ্যপ্রাচ্যের আলখাল্লার মতো পোশাক, জেলেবায়া চড়িয়ে এলেন। আরেকদিন ফ্যান্সি ড্রেস হল। সাহেবরা বিশেষ করে মেমেরা কত বিচিত্র ধরনের পোশাক পরে এলেন। সব নিয়ে এনেছিলেন। আমার স্ত্রী একটি শাড়ি পরেই কেল্লা ফতে করলেন। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাড়ি দেখতে। সবচেয়ে জাঁকের অনুষ্ঠানটি হল শেষ সন্ধ্যায়। Chief dinner খাওয়ার এলাহি কাণ্ড। বুফে ডিনার। টেবিলের ওপর থরে থরে খাদ্যসামগ্রী, আর পিছনের দিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চ প্রধান। প্রধান ব্যবস্থাপক হুসেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ। নাবিক প্রধান বা ক্যাপ্টেন ইসমাইল। প্রধান সুপকার সুলেমান এবং প্রধান স্টুয়ার্ড মোহামেদ। ইসমাইল ছাড়া বাকি চারজন উত্তর ইজিপ্টের লোক, ফর্সা সেমিটিক-হামিটিক মেশানো চেহারা। কেবল ইসমাইল হলেন কালা আদমি ন্যুবিয়ান। প্রধানদের সঙ্গে আলাপের সময় কিছু হাসি-ঠাট্টাও হল। সুলেমানকে দেখিয়ে হুসেন বললেন, জানো, আজ ওকে ছুটি দিয়েছি। যাতে করে একদিন অন্তত তোমরা খাবার মুখে দিতে পারো। ইসমাইলকে দেখিয়ে বললেন, আরে ও তো প্রশান্ত মহাসাগরেও জাহাজ চালাতে পারত। খালি কম্পাস দেখতে জানে না কি না। পরে শুনেছিলাম যে নীল নদের ওপর যে দুশো কলের জাহাজ চলে তার প্রত্যেকটি ক্যাপ্টেনই ন্যুবিয়ান মানে দক্ষিণ ইজিপ্টের লোক। নীলের খাড়ি, চর, পাথুরে ডাঙা স্যান্ড বার সব ওদের নখদর্পণে থাকে। রাডার দেখতে হয় না।

খানাকামরায় আমরা জনা বত্রিশ লোকের মোটামুটি তিন ভাগ। বড় ভাগটি হল আমেরিকার সাহেবদের। এই ভাগে দুজন ভারতীয়ও আছেন। স্বামী-স্ত্রী। প্যাটেল এবং সত্যিই ওঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় মোটেল চালান। মাঝবয়সী গেরস্ত চেহারার লোক। ওঁদের কথাও বেশ সাদাসিধে-খালি যখন ওঁরা ওঁদের সম্পদ-বাড়ি-গাড়ির কথা না বলেন। কত

টাকা, কত বাড়ি, কতগুলো মোটেলের মালিক ওঁরা-এসব কথাও এমন সরলভাবে বলতেন যে গা নিশপিশ করে উঠত না, বরং মায়া হত । এঁরা আমেরিকানদের সঙ্গেই বসতেন এবং পুরুষটি অন্তত আমেরিকানদের হৈচৈতে পুরো যোগ দিতেন । ছোট দলটি ইংল্যান্ডের সাহেব-মেমদের নিয়ে । এঁদের টেবিলের কথাবার্তার আওয়াজ টেবিলের বাইরে শোনা যেত না । কেবল মাঝে মাঝে এঁরা আমেরিকান কোলাহলের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে চাইতেন । তৃতীয় দলটি হল এই আমরা ঝড়তি-পড়তি । আমরা ঠিক দল করে বসতাম না । এখানে টেবিলগুলো আমাদের দখলে ছিল । আমরা, আরেকটি ভারতীয় দম্পতি, বাঙালি, সঙ্গে দুটি বাচ্চা । চার আর ছয় । ভদ্রলোক ডাক্তার, সৌদি আরবের কোনও হাসপাতালে আছেন, এখন ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন । কোরিয়ার একটি ছেলে একক-এমনই সব । খানাকামরায় আলাদা বসলেও কদিনে সকলের সঙ্গেই বেশ মেলামেশি হয়েছিল ।

আসোয়ান হাই ড্যাম

পরদিন সকালে গাইড ইব্রাহিম দলকে তাড়িয়ে বার করলেন আসোয়ানের দ্রষ্টব্য দেখার জন্য । প্রথমে আসোয়ান হাই ড্যাম । হাই ড্যাম থেকে মাইল চারেক উত্তরে সমস্ত নদীজুড়ে একটা লো ড্যামও আছে, যেটা তৈরি হয় ১৯০২ সালে । সেচকার্যের জন্য । হাই ড্যামটি তৈরি হয় ১৯৬৪ সালে রাশিয়ানদের সহযোগে । দুমাইল লম্বা ড্যামের ওপর প্রশস্ত রাজপথ । তার মাঝখান থেকে দেখলে একদিকে ৩৬৪ ফিটের খাড়াই যার তলা দিয়ে অবরুদ্ধ নদীর জল তিরতির করে বয়ে চলেছে । অন্যদিকে তিনশো মাইল লম্বা লেক নাসের ইজিপ্ট অতিক্রম করে অন্তত একশো মাইল সুদানের মধ্যে চলে গেছে । লেকের প্রসার এক থেকে দেড় মাইল । পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ এটি । লেক নাসেরের জলে মাছের চাষ হয় । লেক নাসেরের জল চারদিকের কৃষিকর্ম চতুর্গুণ বাড়িয়েছে । বাঁধের জলের তোড়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা ব্যবহার করে, চারদিকে শিল্প প্রগতি হয়েছে । এতসব সত্বেও একটা কিন্তু আছে । নীল নদের যে বন্যা মিশরের পক্ষে ভগবানের দান ছিল তার তোড় কমে গেছে । নীল নদ ধোয়া পলিমাটি যা দশ হাজার বছর ধরে মিশরের জমিকে উর্বরা রাখছিল, তার বেশ কিছু অংশ হাই ড্যামের বেড়া পেরিয়ে নিচে নামছে না । ফলে উত্তর ইজিপ্টে কৃষিকর্মের বেশ ক্ষতি হয়েছে । যে মিশর রোমানদের শস্যভাণ্ডার বলে পরিগণিত হত সেই মিশর এখন বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে । ইকোলজির তো কথাই নেই । মিশরের নীল নদ থেকে কুমির জলহস্তি সব লুপ্ত হয়েছে । তারা এখন ডেরা বেঁধেছে আসোয়ানের দক্ষিণে, ন্যুবিয়ায় ।

হাই ড্যাম থেকে বাসে করে দেখতে গেলাম গ্র্যানাইট পাথরের খনি । যে খনি ফারাওদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাবৎ ইজিপ্টের গ্র্যানাইট পাথরের জোগান দিয়েছে । এই খনির প্রধান দ্রষ্টব্য হল একটি অসমাপ্ত ওবেলিসক (চতুষ্কোণ স্তম্ভ যা ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে) । সেকালের নতুন রাজত্বের জাঁদরেল রানি হাটসেপসুট (খ্রিস্টপূর্ব ১৬ শতক) ওবেলিসকটি তৈরি করাচ্ছিলেন তাঁর কোনও স্মৃতিমন্দিরে বসাবার জন্য । একটা আস্ত পাহাড়ের গা কেটে ওবেলিসকটি প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে । পিছন এবং চারপাশ থেকে খাঁজকাটা পাহাড় থেকে আলাদা করা হয়েছে খাম্বা । কেবল নিচের দিকের জোড়টি বাকি এবং সেখানেও পাশাপাশি ফোকর করে কাঠ গোঁজবার বন্দোবস্ত সমাপ্ত । এমন সময় ২০ বছর দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করে রানি হাটসেপসুট মারা গেলেন । ফারাও হয়ে বসলেন তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা তৃতীয় থুতমোস । তিনি সিংহাসনে বসেই বললেন, হাটসেপসুট একটা অতি বজ্জাৎ নষ্ট মেয়েমানুষ । ওর সমস্ত স্মৃতি মিশরের ইতিহাস থেকে মুছে দাও । স্মৃতি অবশ্য মুছে দেওয়া যায়নি কিন্তু হাটসেপসুটের সাধের ওবেলিসক আর শেষ হল না । ইব্রাহিম বললেন, ভালোই হয়েছিল । অসমাপ্ত বলেই তো আজকে আমরা এই খাম্বাটি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম কী করে প্রাচীন মিশরিরা এই বিরাট বিরাট গ্র্যানাইটের খাম্বাগুলি পাহাড়ের গা থেকে কেটে গড়িয়ে নিচে নদীতে নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে ফেলুকা করে দেশ-দেশান্তরে পাঠাত । হাটসেপসুটের এই যে খাম্বাটি-এর দৈর্ঘ্য ১২৫ ফুট । ওজন ১১৭০ টন । তলার ফোকরগুলিতে শক্ত করে বালসা কাঠ গুঁজে দেওয়া হত । তারপর ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে কাঠগুলি ভেজানো হত । ভেজা কাঠ ফুলে উঠে চির ধরত গ্র্যানাইটের খাঁজে এবং এক সময়ে সমস্ত খাম্বাটি (পিছন এবং দুপাশ আগেই কাটা হয়েছিল) আলগা হয়ে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ত । এইজন্যই ওবেলিসক যে কোনও পাহাড় কেটে করা যেত না । খুঁজে পেতে বার করতে হত এমন খালি জায়গা যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে ওবেলিসক কেটে নিচে গড়িয়ে দেওয়া যাবে । রানির নামের উচ্চারণ নিয়ে সাহেব-মেমদের অনেকে ফাঁপরে পড়ছেন দেখে ইব্রাহিম বললেন, হাটসেপসুট বলার সময় মনে করো হট চিকেন স্যুপ । ভদ্রলোক রসিক বটে ।

ফিলের মন্দির

হাই ড্যাম থেকে নেমে কিছুটা বাসে, কিছুটা মোটরবোটে দেখতে গেলাম ফিলের মন্দির । নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপের ওপর । বহুকাল এই মন্দিরটি প্রায় সম্পূর্ণ জলমগ্ন ছিল । এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটিকে তুলে উচ্চভূমিতে বসানো হয় । মিশরের হিসাবে এ মন্দিরটি নিতান্ত বালক । মাত্র খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মিশরের শেষ ফারাওরা এটি শুরু

করেছিলেন এবং বৃহত্তম মন্দিরটি তাঁদের তৈরি । মৃত্যুজগতের দেবতা ওসিরিসের স্ত্রী আইসিস এবং তাঁদের ছেলে হোরাস (বাল সূর্য) এখানকার আরাধ্য দেবতা । ফারাও বংশ অচিরে লুপ্ত হল আলাকজান্ডারের হাতে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২)-রাজা হয়ে বসলেন গ্রিকরা । তাঁরা কিন্তু ইজিপ্টের ধর্মবিশ্বাসে কোনও আঘাত করেননি বরং আলেকজান্ডার পুরোহিতদের কাছ থেকে বিধান নিয়ে নিজেকে আমন মানে সূর্যের পুত্র হিসাবে চালু করেছিলেন । গ্রিকরা এই মন্দিরের বহু সংস্কার করেন । বহু গ্রিক ভাস্কর্য, কলোনাড দেখা যায় । গ্রিকেরা এখানে স্থপতিদের মিশরিয় দেবতা ইমহোটেপের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । গ্রিকদের পরে রোমানরা মিশর দখল করেন । তাঁরা এই মন্দিরের নানাবিধ উৎকর্ষ করেন । মন্দির প্রাঙ্গণ বহু বিস্তৃত করেন এবং এর মধ্যে অগস্টাস সিজারের একটি মন্দির বানিয়ে দেন । আর্চ বিখ্যাত রোম সম্রাট হার্ডিয়ানও এখানে একটি আর্চ বসিয়েছিলেন । ১৪টি পিলারের ওপরে রোম সম্রাট ট্রাজানের বিশ্রামস্থলটি দেখার মতো । ফিলের মন্দির এখনও বেশ অভগ্ন অবস্থায় আছে । দেওয়ালে আঁকিজুকি নানা ছবি-তবে এখানে যুদ্ধ জয়ের বা বন্দিদের শোভাযাত্রা খুব বেশি নেই । এ মন্দির ফারাওদের ক্ষয়িষ্ণু দিনের । বেশিরভাগই বিভিন্ন দেবতার সামনে ফারাওদের নতিস্বীকার । এখানে আর সেই পুরনো মিশরের উজ্জ্বল সোনালি সবুজ পটুয়া ছবি নেই । বোধহয় সে রংকার-রাও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখন ।

আসোয়ান

ফিলের মন্দির থেকে ফিরে এসে জাহাজে দুপুরের খাওয়া । তারপর কেবিনে গিয়ে কিছুটা ইজিপ্ট তত্ব পড়তে পড়তে একটা নিপাট ঘুম । বিকেলবেলা যাত্রীরা যে যার নিজের মতো আসোয়ান শহর দেখতে বেরোল । কেউ বা ফিলের মন্দিরে সন-এ-লুমিয়ের দেখতে গেল । আমরা শহর দেখাই সাব্যস্ত করলাম । আসোয়ান, এডফু, এসনা, মায় লাকসোর-সবই এক ছাঁচে গড়া । ডেহরি-অন-সোন থেকে গাজিয়াবাদ পর্যন্ত পূর্ব রেলের ধারে বিহার ইউ পি-র শহরগুলোকে মনে করিয়ে দেয় । অমনি ছিরিছাঁদহীন ন্যাড়া-ন্যাড়া দোতলা-তিনতলা বাড়িগুলো । চারদিকে ধুলো কাঁকর বসানো রাস্তা । শ্রীহীন বিপণিশ্রেণী । সাইকেলভ্যানের ওপর স্টল । কেবল নীল নদের ধারটা যা একটু ছিমছাম । কয়েকটা গাছপালা । কিনারায় শুকনো খাতে সাজানো আলো ঝলমল শামিয়ানার তলায় সারি সারি রেস্তোরাঁ । কোনওটি রামেসিস কাফে, কোনওটি প্রাইড অব নাইল-সবই ট্যুরিস্টভোলানো কৌশল । সাইকেল-রিকশা প্রচুর, বেশ কিছু ফিটন গাড়িও আছে সন্ধেবেলা নীল নদের হাওয়া খাওয়ার জন্য ।

আমরা পায়দলে ঘুরে বেড়ালাম । ডাঁই করে টি-শার্ট বেচছে এক ছোকরা । সে বলল, তার বাড়ি অস্ট্রেলিয়া । জিজ্ঞাসা করি, তাহলে ভালো ইংরিজি বলতে শিখলে না কেন? অস্ট্রেলিয়ার লোকেরাও ইংরিজি বলে নাকি, হো হো করে হেসে উঠল ছোকরা । আরেকজন বললে, সে হল দুশোতম রামেসিস । ঠাট্টায় গল্পে সন্ধ্যার আলো জ্বালিয়ে ফিটন চেপে জাহাজঘাটায় ফিরলাম । ফিটনওয়ালা ঠকায়নি । একটা জিনিস এরকম বহু জায়গায় লক্ষ করেছি । সাহেব-মেমদের নাজেহাল করলেও কালা আদমিদের ওরা দুখ-দরদ করে, ঠকায় না ।

সকালে উঠে দেখলাম জাহাজ চলতে শুরু করেছে । আজ সারাদিনই এবং সন্ধ্যার প্রথম প্রহর পর্যন্ত জাহাজ চলবে । আসোয়ান থেকে লাকসোর মোট ২২৫ কিলোমিটারের বেশিরভাগই-প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার এসনা পর্যন্ত আজকেই চলে যাব । এসনায় রাত্রিবাস । পরদিন সকালে এসনার লেক পেরিয়ে আরও ৫০ কিলোমিটার গেলে লাকসোর যার পুরনো নাম ছিল থিবস । প্রাচীন মিশরের গর্বোদ্ধত রাজধানী । ওসব পুরনো কথা এখন থাক । এখন দুচোখ ভরে দেখি নীল নদের কূলে কেমন বয়ে চলেছে সাধারণ মিশরির জীবনযাত্রা । আসোয়ানের পরে নীল নদের অববাহিকা সাত থেকে পনেরো মাইল চওড়া, তারপরেই মরুভূমি-বালি, পাহাড় । নদীগর্ভ থেকে মরুভূমি অত চোখে পড়ে না । খালি মাঝে মাঝে কোনও বাঁকের মুখে হয়তো একটা পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়ায় । তাছাড়া নদীর দুদিকেই শ্যামল তৃণভূমি, গম, তুলো, আখের খেত-মাঝে মাঝে একটা করে গ্রাম । কাছের কূলে দেখতে পাচ্ছি গ্রামের লোকেরা তাদের নানা কাজে ব্যস্ত । কোথাও মোষটা পানিচাক্কির চারধারে ঘুরে ঘুরে জল তুলছে, কোথাও চাষা নিজে অবিকল আমাদের ডোঙাকলের মতো একটা জিনিস দিয়ে নিচু জমির জল ওপরে তুলছে । বাড়ি-ঘরদোর সব নিচু-নিচু ইটের তৈরি । খাপরার চাল-মুদির দোকানে ক্রেতার ভিড় জাহাজ থেকেই দেখতে পাওয়া গেল । দুটো মেয়ে নদীর উঁচু পাড় ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জাহাজটাকে ঘুরে দেখছে । জাহাজ আস্তে হয়ে গেল । সামনে নদীর বিরাট বাঁক পশ্চিমদিকে আর সেই বাঁকের মুখে একটি পাহাড়, টিলা বললেই চলে । টিলার ওপর নানারকমের প্রাচীন বাড়িঘর দেখা গেল । কম অম্বো । রেললাইন হবার আগে আসোয়ান হয়ে ন্যুবিয়া-সাবিসিনিয়া যাবার পথে এখানে ক্যারাভানের মস্ত বড় আড্ডা ছিল । এখন ছোট ভাঙা গ্রাম একটি আর পাহাড়ের ওপরে ওই পুরাকীর্তি । সেও বেশ ভাঙাচোরা । এখানে দেবতা বাজমুখো হারোরিস (হোরাস মানে বাল সূর্য ক্রমে ক্ষমতা লাভ করে হারোরিস হন-এঁকে প্রভাত সূর্য বলা চলে) এবং কুমিররূপী দেবতা সোবেক (এঁকে সাক্ষাৎ ফারাওয়ের ভাবমূর্তি বলা হত, কেননা কুমির অসীম শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর জানোয়ার) । মজার কথা এই যে, কোনও দেবতা যাতে না চটেন (এঁরা হয়তো মিশরের কাঁচাখেগো

দেবতা ছিলেন), তার জন্য এঁদের মন্দিরকে সমান দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদিকে হারোরিস আর অন্যদিকে সোবেক। আমার মতে ফারাওদের তুষ্টিসাধনের জন্যই পুরোহিতরা কুমির দেবতাকে প্রভাত সূর্যের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। এখানে ছোট একটি কামরায় কয়েকটি মমি করা দেহ রাখা আছে।

কম অম্বো দেখে এসে জাহাজর সর্বোচ্চ খোলা ডেকে ছড়িয়ে বসলাম। একেকটি টেবিল ঘিরে কয়েকটি করে চেয়ার। মাথায় রোদ্দুর আড়াল করার জন্য বিরাট পাখামেলানো ছাতা। মোলায়েম করে হাওয়া দিচ্ছে। টেবিলে সাজানো চা-কফি নরম এবং গরম পানীয়, যে যা খায়। কাছের কূলে শরবনের মতো ঘন জঙ্গল। ইব্রাহিম বললেন, এসব আখের খেত। পূর্বদিকের পাড় ধরে হুস হুস করে একটা ট্রেন চলে গেল। নদীর ধারে কেমন নিরালা স্টেশনটি। এ-ট্রেন শুরু হয়েছে কায়রোতে, আসোয়ান হয়ে ১২০০ মাইল দূরে সুদানের রাজধানী খারটুমে যাত্রা শেষ করবে। মন মোর ট্রেনের সঙ্গী ছুটে চলে যায় কত দূর-দূরান্তে যেখানে নীল নদের দুই প্রধান শাখা এসে মিশেছে। সেই দ্বীপের মতো গেজিরা। মাঝখানে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ ডিংকাদের দেশ। যেখানে এখনও জলহস্তী কন্দমূল খুঁজে বেড়ায়। নদীর চড়ায় খেজুর গাছের মতো কুমির রোদ পোহায়। ডেক চেয়ারে বসে চোখে পড়ে একঝাঁক পাখি। দুপুরের রোদ রিমঝিম করে। হঠাৎ চোখে পড়ে কোনও পরিত্যক্ত মন্দিরের দ্বারপালটি মরুর কিনারায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আজ কত হাজার বছর হল।

এডফু

আজ দুপুরের খাওয়ার পর ঘুমোনো হল না। কেননা ততক্ষণে জাহাজ এডফুতে লেগেছে। জাহাজ থেকে নেমে দশ মিনিট ফিটন চেপে এডফুর মন্দির দেখতে গেলাম। সরু গলি, দুদিকে সারি সারি দোকান-বেশিরভাগই র্যাজড়া, খেলো জিনিস। হংকং তাইওয়ানে তৈরি প্লাস্টিকের সস্তা মাল। তার সঙ্গে কিছু ইজিপসিয়ান নকশা আঁকা কাপড়, জামা, পর্দার কাপড়, টেবিল ক্লথ (এগুলি উত্তম) আর স্যুভেনির-টুটেনখামেনের মুখোশ থেকে গির্জার পিরামিড পর্যন্ত যা চাও। গলির শেষে নাতিপ্রশস্ত অঙ্গন। আর তারপরে অন্তত কুড়ি ফুট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এডফুর মন্দিরের মুখোমুখি দাঁড়ানো গেল। সমস্ত মন্দিরটাই বালি চাপা পড়েছিল। এখন খুঁড়ে বার করা হচ্ছে। এডফুর এই মন্দিরও অপেক্ষাকৃত নবীন। এটি শুরু করেছিলেন মিশরের গ্রিক রাজা দ্বিতীয় টলেমি খ্রিস্টপূর্ব ২৩৭ সালে। তারপরে ২০০ বছর ধরে মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। টলেমির আগে এবং প্রায় একই জায়গায় দুনম্বর রামেসিস একটি মন্দির বসিয়েছিলেন, যার কিছু অংশ এখনও এডফু গ্রামের তলায় চাপা

আছে। মন্দিরের বর্ণনা দিয়ে কাহিনী আর বাড়াব না তবে এডফুর মন্দিরের মতো অভগ্ন অক্ষত অবস্থায় খুব কম মন্দিরই বেঁচে আছে। থাম, খাম্বা, দেওয়াল তো আছেই। এমনকী ছাদ পর্যন্ত অটুট আছে এডফুর মন্দিরে। দেবতা হোরাস এবং মানুষের শরীরে বাজপাখির মাথা বসানো নয়। এখানে দেবতা পুরোপুরি বাজপাখির রূপে প্রকট। টলেমিরা গ্রিক হলেও মিশরের শিক্ষা-দীক্ষা ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। দেওয়ালে নানারকম নকশা। তার মধ্যে হোরাস হিপোপটেমাস বধ করেছেন-চিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের পিছনে উঁচু পাড়ের ওপর এখনকার এডফু গ্রাম। হোরাসের মন্দিরে দাঁড়িয়ে দেখেছি ওপরে বাচ্চারা ছুটে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মুখ ভেংচে পালাল। সরু সরু কাঠের বারান্দা জুড়ে কাপড় শুকোচ্ছে। এক বুড়ো ফরসিতে তামাক টানছে। দল বেঁধে সব ফিটন চেপে জাহাজে ফিরলাম। কারও কারও হাতে দক্ষ শিল্পীর গড়া নবনির্মিত পুরাকীর্তি।

এসনার লকগেট

বিকেলের আলোয় জাহাজ ছাড়ল। এবার এসনা। সেখানে রাত্রিবাস করতে হবে কারণ পরদিন সকালের আগে এসনার লকগেট খুলবে না। শ্রীনগরে যাঁরা শিকারায় চড়ে ডাল লেক থেকে পুরনো শহর ঘুরেছেন খাল দিয়ে, তাঁদের কাছে এসনার লকগেট কিছু নতুন নয়। কিন্তু যাঁরা এ-সুযোগ পাননি তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি যে এই লক আসলে দুখানা জাহাজ ধরে এমন একটি চৌবাচ্চা, যার দুদিকে দুটি গেট আছে। প্রথম গেট খুলে জাহাজ দুটি চৌবাচ্চায় ঢোকে। দুটি জাহাজ পুরোপুরি লেকের মধ্যে এসে গেলে দ্বিতীয় গেটটি খুলে চৌবাচ্চার জল বার করে দেওয়া হয়। চৌবাচ্চার জলের লেভেল নামতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও নেমে সামনের নদীর সঙ্গে সমতলে দাঁড়ায় এবং উন্মুক্ত লকগেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় গেটটি বন্ধ করে প্রথম গেটটি খোলা হয় চৌবাচ্চার জলের লেভেল আবার পিছনের নদীর সমপর্যায়ে আনা হয়। নদীজলের উচ্চতার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ এসনার বাঁধ। যার একপ্রান্তে লকগেট দুটি লাগানো হয়েছে। বাঁধের ওপর দিয়ে রাশি রাশি গাড়ি, মোটর, ট্রাক যাতায়াত করে (আসোয়ানের পরে এই প্রথম স্থলপথে নদী পার হবার উপায়), কিন্তু লকগেট খোলা থাকলে রাস্তার সেই অংশটিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। হাওড়ার পুরনো ভাসা পোলের মতো। কাজেই লকগেট যখন তখন খোলা যায় না, নির্দিষ্ট সময়েই লকগেট খোলা এবং আসোয়ান লাকসোরের জাহাজকে এসনার অনুশাসন মেনে চলতে হয়।

এসনার মন্দির

রাতে খেয়েদেয়ে ডেকের ওপর থেকে দেখলাম বাঁদিকের বাঁকের ওপর এসনার আলোকে ম্লান করে এসনার বাঁধের ওপর সার দিয়ে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সে আলোর ওপারে অন্ধকার আকাশ নদীতে নেমে এসেছে। সেখানে মিটমিট করছে কয়েকটি তারা। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসনার মন্দির দেখতে গেলাম। এ মন্দিরও নবীন, খ্রিস্টজন্মের মাত্র ২০০ বছর আগে গ্রিকদের তৈরি। তবে পুরাতত্বের নিদর্শন আছে যে, খ্রিস্টজন্মের ১৫০০ বছর আগে অমিতপরাক্রম ফারাও তৃতীয় থুতমোস এই জায়গাতেই একটি মন্দির বসিয়েছিলেন। যে মন্দিরের এখন আর কিছু নেই। মন্দিরটি বেশ ভালো অবস্থায় আছে। এখানে দেবতা হলেন ভেড়ামুখো খুনউম। ইনি হলেন প্রজননের দেবতা এবং সেই সূত্রে নীল নদের বিশেষ করে ক্যাটারাক্টগুলির দেবতা ইনি। নীলই তো মিশরের ধাত্রী জননী এবং ক্যাটারাক্টগুলি পার হয়ে, তাবৎ নীলের জলস্রোত মিশরের মাটিকে উর্বরা করে রাখে। এসনা দর্শন একটু তাড়াহুড়ো করে হল, কেননা লক খোলার সময় হয়ে গেছে। এসনার লক পেরিয়ে আবার পঞ্চাশ কিলোমিটার খোলা নীল নদ। মাঝখানে একটা চর জেগে উঠে নদী দুভাগ হয়ে গেছে। যেন দুটি নদীর মোহনা। লাকসোরের যত কাছে যাচ্ছি নদীতে জাহাজের সংখ্যা তত বাড়ছে। দুই জাহাজে পাল্লা চলছে। এ-জাহাজ থেকে ও-জাহাজে নিশানের সংকেত করা হচ্ছে-যাত্রীরা পরস্পরকে হাত তুলে অভিনন্দন করছে। এই করতে করতে দুদিকে বসতি ঘন হয়ে এল। খেত-খামার আর বিশেষ নেই-বাড়ি-ঘর, রাস্তায় বাস-মোটর চলছে। শহরের ভিড় ডানদিকেই বেশি, সারি সারি বাড়ি হোটেল এবং তাদের পিছনে সুবিশাল প্রাচীন মন্দিরের সিংহাবস্থান। ইব্রাহিম বললেন, ওই হল ইতিহাসের থিবস। প্রাচীন মিশরের গর্বোজ্জ্বল রাজধানী। রূপকথার নগর। খ্রিস্টজন্মের পনেরোশো বছর আগে নীল নদের দুধারে পনেরো স্কোয়্যার কিলোমিটার জায়গা নিয়ে মহানগরী থিবস গড়ে উঠেছিল। নদীর দুধারে বিচিত্র ছবি-কারুকার্যমণ্ডিত প্রাসাদের সারি, বাগান ফোয়ারা। পথে নাগরিক, কর্মী, দেশদেশান্তরের স্বার্থবাহী বণিকের ভিড়। হঠাৎ রব উঠল-সরে দাঁড়াও, সব সরে দাঁড়াও। পিছন ফিরে চোখ মাটিতে নিবদ্ধ কর। আমন রার পুত্র প্রত্যক্ষ দেবতা আমেনহোটেপ। সূর্যমন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছেন। রুপোর খোলা পাল্কিতে সোনার সিংহাসনে বসা তাঁর যুগ্মমুকুটভূষিত মুখের দিকে যেন কারও দৃষ্টি না পড়ে। দেবতার দ্যুতিতে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখছ নাকি? ইব্রাহিমের কথায় চটকা ভাঙল। খাওয়াদাওয়ার পর জাহাজের রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পুরনো শহরের দিকে চেয়েছিলাম। দল বেঁধে লাকসোর আর কার্নাক শহর দেখতে নামলাম। নীল নদের ওপর

শহর যেমন হয় । এবড়োখেবড়ো ছিরিছাঁদহীন চেহারা । পলেস্তারা খসা ইট বার করা দোতলা, তিনতলা বাড়ি, তারও উচ্চতায় সমতা নেই । একতলায় দোকান, দোকান আর দোকান । ওপরে অফিস বা লোকের ডেরা । কেবল ট্যুরিস্টদের মুখ চেয়ে নদীর ধারের রাস্তাটি মসৃণ বাঁধানো । তার একপাশে সারি দিয়ে হোটেল, সরকারি অফিস, মিউজিয়াম এবং এগুলো মোটামুটি সুদৃশ্য । বাস এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল । কিছু দূর গিয়ে ডানদিকে পাঁচিলের আড়ালে চোখ পড়ল কার্নাকের মন্দির দেওয়াল । ইব্রাহিম বললেন, এখানে আমরা পরে আসব । আগে কার্নাকের মন্দির দেখে আসি । সেইটাই তো আসল ।

কার্নাকের মন্দির

থিবসের প্রাসাদ-বাগান-ফোয়ারার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নেই । সব অনেক হাত মাটির তলায় চলে গেছে এবং সেই মাটির ওপরেই গড়ে উঠেছে আধুনিক লাকসোর আর কার্নাক । যে মন্দিরগুলি আমরা দেখতে যাচ্ছি সেগুলোও মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে এই সেদিন । বাস আরও সামান্য কিছু এগোল । মাঠের মাঝখানে দেখলাম বিরাট এক তোরণদ্বার । বেশ ভালো অবস্থায় আছে । ইব্রাহিম বললেন, কার্নাক মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে এই তোরণটি বসিয়েছিলেন গ্রিক আমলের তিন নম্বর টলেমি । তোরণের সামনে দুদিকে সারি বাঁধা ভেড়ামুখো স্ফিংসের মাঝখানে পাথরবাঁধানো রাস্তার কিছুটা এখনও দেখা যায় । বাকি পাঁচিল এবং তার আনুষঙ্গিক নানা সংযুক্তি, এমনকী খনসু মানে চন্দ্রের দেবতার মন্দিরটি-সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে । বাস ততক্ষণে কার্নাকের ভাঙা পশ্চিম পাঁচিলের পাশ দিয়ে এসে মন্দিরের প্রধান তোরণের সামনে থেমেছে । সুবিশাল মন্দির চত্বর (মিশরের বৃহত্তম) থিবসের আরাধ্য দেবতা আমন রা-র উদ্দেশে তৈরি হয়েছিল । আসলে এটা একটা মন্দির নয় । আমন রার মূল মন্দির ঘিরে আদ্যিকালের সেসোসট্রিস থেকে সেদিনের টলেমি পর্যন্ত এই মন্দিরের ভেতরে এবং বাইরে যার যেমন ইচ্ছা তোরণ, রাস্তা, মন্দির, বিশ্রামাগার বাঁধানো উঠান ওবেলিসক বসিয়ে গেছেন এবং সব যে খুব প্ল্যানমাফিক বসানো হয়েছে তা নয় । দ্বিতীয় রামেসিস তো চারটি ৭৮ ফুট উঁচু থামের মাথায়, ছাদ বসালেন, যাতে প্রধান মন্দিরে আলো-হাওয়া ঢুকতে পারে । থিবসে বৃষ্টির বালাই ছিল না । মন্দিরের প্রধান অংশগুলি মোটামুটি এক লাইনে পশ্চিম থেকে পুবে এবং প্রতি অংশের আলাদা তোরণদ্বার । পুরো মন্দিরে এরকম দশটি তোরণ আছে ।

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায় । উঁচু-নিচুতে বুকে হাঁফ ধরে তবুও তোরণ পেরিয়ে দেখতে হয় । দিল্লির দেওয়ানি আমের মতো বিরাট প্রাঙ্গণ যেখানে নিশ্চয় সাধারণ

লোকেরা পূজায় ভিড় জমাতো। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে রামেসিসের হিপোস্টাইল হল। ১৩৪টি পিলারের ওপর (কিছু কিছু পিলার এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ছাদ কোথাও নেই) এই হলটির আয়তন পঞ্চাশ হাজার স্কোয়্যার ফুট। পৃথিবীতে এত বড় হল আর নেই। এছাড়াও নানা দেব-দেবীর মন্দির, রানি হাটসেপসুটের শ্রদ্ধার্ঘ্য ৯৭ ফুট উঁচু ওবেলিসক আগাগোড়া রক্তাভ গ্র্যানাইটের তৈরি। ছাদ বড় একটা কোথাও না থাকলেও দেওয়াল প্রচুর আছে এবং তার ওপর উৎকীর্ণ ছবিগুলি ইজিপ্টের ২০০০ বছরের চলন্ত ইতিহাস। ফারাওদের যুদ্ধযাত্রা, শিকার খেলা, দেবতাদের সঙ্গে মেলামেশা, অরাতি দমন প্রভৃতি নানারকম ছবি তো আছেই। এক জায়গায় বেশ কিছু জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা আছে। দিগ্বিজয়ী ফারাও তৃতীয় থুতমোস প্রজাকুলের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে বিচিত্র আকৃতির জন্তু-জানোয়ার ধরে এনেছিলেন। এগুলো তাদের ছবি। একটু খুঁটিয়ে দেখলে হাতি, ভাল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি ইজিপ্টে অলভ্য বেশ কটি জন্তু চেনা যায়। আর আছে লম্বা মুখওয়ালা কুমিরের মতো একটি জানোয়ার, অনেকটা যেন আমাদের ভাগীরথীর মকর। মন্দিরের পিছনদিকে পবিত্র পুষ্করিণী, যাতে এখনও জল টলমল করছে, দেবকার্যের সমস্ত জল এখান থেকেই সরবরাহ হত। পুষ্করিণীর ধার থেকে একটি বাঁধানো রাস্তা উত্তর দেওয়ালের অন্য একটি তোরণ পর্যন্ত গেছে। তোরণ পেরোলেই বিখ্যাত অ্যাভেনিউ অব দ্য স্ফিংস, দুমাইল লম্বা এই রাস্তাটির দুধারে সিংহমুখো স্ফিংসের সারি, যার মাথায় রাতে আলো জ্বলে। রাস্তাটি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে আধ ঘণ্টার মধ্যে লাকসোরের মন্দিরে পৌঁছনো যায়। আমাদের হাতে অত সময় (এবং পায়ে অত সামর্থ) ছিল না। আমরা ফিরে এসে বাসে চড়ে লাকসোরের মন্দিরে এলাম।

লাকসোরের মন্দির

কার্নাকের সুবিশাল মন্দির সমষ্টির এত কাছে আরেকটি মন্দির কেন বসানো হল এ-প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগতে পারে। বিশেষ করে দেবতা যখন সেই একই আমন রা। অধিকন্তুর মধ্যে এখানে আমন রা-র সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মাট এবং ছেলে খনসুও আছেন। কার্নাকে মাট এবং খনসুর আলাদা আলাদা মন্দির। আমার মনে হয়, ফারাও তৃতীয় আমন হোটেপ কার্নাকের সর্বজনীন মন্দির ছাড়াও নিজের জন্য একটি ব্যক্তি মন্দির চেয়েছিলেন। এবং মন্দির একবার শুরু হলে অন্য ফারাওরা বা কম যাবেন কেন? বিশেষ করে দ্বিতীয় রামেসিস। রামেসিস মন্দিরের বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। দুটি ওবেলিসক বসিয়েছিলেন। তার একটি এখনও আছে। অন্যটি ১৯৩১ সালে আধুনিক ইজিপ্টের তদানীন্তন শাসনকর্তা মুহম্মদ আলি ফ্রান্সের রাজাকে উপহার দেন। এটি এখন প্যারিসের প্লাস দ-লা কোঁকর্দে শোভা পাচ্ছে। উত্তর গ্রিস থেকে আগত সামান্য সৈনিক এই মুহম্মদ

আলি ৫০ বছর ধরে দোর্দণ্ডপ্রতাপে মিশর রাজত্ব করে গেছেন । তিনটি প্রধান শক্তির- ইংরেজ, ফরাসি এবং তুর্কির সঙ্গে সমানে মোকাবিলা করেছেন । এর বিরুদ্ধে ওকে লড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর রাজনীতির মূলকথা । এ বিষয়ে তিনি ক্লাইভ, হেস্টিংস, ডালহৌসির নাক কাটতে পারেন । কেবল মাঝে মাঝে পুরাকীর্তিপাগল ইংরেজ আর ফরাসিদের পুরনো ইজিপ্টের দপ্তর থেকে কিছু থাম দেওয়াল তোরণ ইনাম দিতেন । এগুলি এখন লন্ডন এবং প্যারিসের নানা স্থানে ছড়ানো আছে ।

কার্নাকের পরে আবার লাকসোরের মন্দিরের বিশদ বিবরণ দেবার দরকার নেই । এখানে পরিচয় হল সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো নীল নদের মাপকাঠি (Nilometer)-র সঙ্গে । কার্নাকের মন্দির চত্বরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম একটা কুয়োর মতো, যার চারপাশ ঘুরে সরু সিঁড়ি নেমে গেছে । কিন্তু সিঁড়িটা কুয়োর বাইরে কেন? জল তোলার জন্যই হোক আর পরিষ্কার করার জন্যই হোক সিঁড়ি তো কুয়োর ভেতরে হবে । ইব্রাহিম বুঝিয়ে দিলেন যে জিনিসটা আদপে কুয়োই নয় । ওটি হল সেই পুরাকালের Nilometer. নদীর সঙ্গে কুয়োর সংযোগ থাকার দরুন কুয়োর জলের লেভেল থেকেই নদীর (বন্যার সময়ে) জলের লেভেল মাপা যেত । নদীর জল কখন কীভাবে বাড়ছে (বা বাড়ছে না) তার ওপরেই নির্ভর করত (এবং এখনও করে) সে বছর চাষবাস কেমন হবে । অনেকটা আমাদের বর্ষার মতো । কেবল একটা বিষয়ে নীল নদের চাষীরা আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান ছিল । চাষের খাজনাও এই বন্যার জলের সঙ্গে বাঁধা ছিল । জল যদি ১২ ফুটের কম বা ২২ ফুটের বেশি হত তাহলে খাজনা পুরোপুরি মকুব তো বটেই, ফারাওয়ের শস্যভাণ্ডার থেকে জনসাধারণ বিনামূল্যে খাবার পেত । এই Nilometer-এর পাশে আরেকটি জিনিস ইব্রাহিম দেখালেন যার বিষয় কেবল বইতেই পড়া ছিল । কেমন করে মাটির নিচের সুড়ঙ্গপথে কৌশলী পুরোহিতরা সবার অলক্ষে দেবতার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং দেবতার মুখ দিয়ে তাঁদের নিজেদের অনুজ্ঞা প্রকাশ করতেন । মন্দির নির্মাতা আমেনহোটেপের বিধবা মা যখন আমেনহোটেপের জন্ম দিলেন তখন এই পুরোহিতরাই বলেছিলেন যে আমেনহোটেপের বাবা হলেন সাক্ষাৎ আমন রা । লাকসোরের মন্দিরে এই বিষয়ে কিছু দেওয়ালে ছবি আছে । মন্দির থেকে যখন বেরোলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা । শহরের আলো জ্বলছে । আবার লোকের মুখও বিনা আলোয় দেখা যাচ্ছে । বাসকে বললাম, এইতো পাশেই জাহাজঘাটা । আমরা একটু শহরের ভেতর দিয়ে ঘুরেটুরে যাই । ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল হয়তো সেইজন্যই পথ ভুলে আঘাটায় নেমে পড়লাম । জাহাজ তখনও দুশো গজ দূরে । জলের ধার দিয়ে কাঁচা রাস্তা । সেখান দিয়েই না হয় যেতাম কিন্তু ঠিক তার পাশে বসেই একদল ষণ্ডামার্কা লোক ফরসি ঘিরে তামাক খাচ্ছে । এদিকে ঘাট জনশূন্য । আমরা দুই বিদেশি । কেমন যেন ভয়

ভয় করতে লাগল। আবার এই খাড়া পাড় বেয়ে অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওপারের রাস্তায় উঠে যাব। আর সেও তো ওই দলটার পাশ দিয়ে। আমাদের দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে দল থেকে একটা লোক উঠে এল। মুহূর্তের জন্য বুকটা ধক করে উঠল। তারপরেই দেখি লোকটা আমাদের জাহাজেরই একজন খালাসি। দড়িদড়া টানে। আজ রাতে জাহাজ লাকসোরেই থাকবে। সারাদিন জাহাজি খাটুনির পর ওরা একটু আরাম করে তামাক খাচ্ছে।

ভ্যালি অব দ্য কিংস

বৃহস্পতিবারের সকাল। বারবেলা হলে ওই ভুতুড়ে জায়গাটিতে যাওয়ার কথায় মন খুঁতখুঁত করতে পারত কিন্তু এমন সকালে প্রসন্ন সূর্যালোকে আকাশ নীলের সমুদ্র, হাওয়া অনুকূল। নদীর জলে মিঠে আওয়াজ। সেই নদী আড়পার হয়ে পশ্চিমকূলে Valley of the Kings-এ পৌঁছলাম। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ রাজবংশের (১৫৬০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রায় সব ফারাওই এখানে সমাহিত হয়েছিলেন। Valley of the Kings-এর ধারে, দক্ষিণদিকে Valley of the Queens এবং এই দুটি ভ্যালির পিছনের পাহাড়শ্রেণীতে পাত্র, মিত্র সমানদের সমাধি। মিশরিয় প্রেততত্ত্বের মূল কথা হল এই যে, দেহটিকে রক্ষা করতে হবে। কারণ কল্পান্তরে বিদেহী আত্মা ফিরে এসে নিজ দেহে প্রবেশ করবে। মৃত পুনরুজ্জীবিত হবে এবং কল্পকাল স্বর্গবাস করবে। এইজন্যই প্রথম মিশরিয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল এবং এক হাজার বছর পরে ফারাওরা দেখল যে যত সুদৃঢ়ভাবেই পিরামিড তৈরি হোক না কেন সমাধিতস্করদের হাত থেকে মৃতদেহ এবং তার আনুষঙ্গিক সোনাদানা ধনরত্নাদি বাঁচানো যায় না। থিবসের ফারাওরা তাই নতুন এক কৌশল অবলম্বন করলেন। নদের ওপারে যে অর্ধবৃত্তাকার পাহাড়শ্রেণী, সেই পাহাড়ে তাঁরা সুড়ঙ্গ কেটে ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃতদেহ রাখবার বন্দোবস্ত করলেন। এই হল Valley of the Kings. যেখানে এখনও পর্যন্ত চৌষট্টিটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং খননকার্য এখনও চলছে। কিন্তু এত করেও সমাধিতস্করদের নিবৃত্ত করা যায়নি। চৌষট্টিটি সমাধির মধ্যে একমাত্র টুটেনখামেনের সমাধি ছাড়া প্রতিটি কন্দরে চোরেরা ঢুকে সব নিয়ে গেছে। এরা আধুনিক চোর নয়। সমাধি মন্দির তৈরি করার দু-তিনশো বছরের মধ্যেই সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে। মিশরিয় পুরনো পাপিরাসে পড়া যায় যে, খ্রিস্টজন্মের ১১০০ বছর আগে পূর্ব থিবসের মেয়র অভিযোগ আনলেন যে পশ্চিম থিবসের মেয়রের আনুকূল্যে Valley of Kings-এ অবাধে চৌর্যবৃত্তি চলছে। এই ডামাডোলের মাঝখানে ফারাও টুটেনখামেনের সমাধিগহ্বর কী করে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অক্ষত ছিল, সেটা সত্যিই

এক প্রহেলিকা। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে ১৯২২ সালের সমাধি আবিষ্কারক তস্কর ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক। তিনি টুটেনখামেনের সমাধিতে যে ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন তার সবটাই কায়রোর অ্যান্টিকুইটি মিউজিয়ামের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় তলা জুড়ে সাজানো আছে।

ইব্রাহিম কয়েকটি সমাধির ভেতরে নিয়ে গেলেন। বেশ ওঠানামা করতে হয়। তবে পাহাড় খোঁড়া এইসব সমাধির মধ্যে পিরামিডের তুলনায় জায়গা অনেক বেশি এবং দেওয়ালের কারুকার্য, বিশেষ করে রঙিন ছবিগুলি চিত্তাকর্ষক। এখানের ছবি কিন্তু যুদ্ধযাত্রা, অরাতিদমন, শত্রুনিধন এসব বিষয়ে নয়। দেবতার সামনে প্রার্থনা, ফারাওয়ের শবানুগমন, শোভাযাত্রা এইসব বিষয়েরই প্রাধান্য। আর আছে পুরো দেওয়াল-ছাদ জুড়ে মিশরের আলেখ্যলিপিতে বিভিন্ন মন্ত্রের পাঠ, যা মৃতের প্রয়োজন হবে পরজগতের আশ্রয় পাওয়ার জন্য। মৃতের যাত্রাপথে যেসব বাধা আসতে পারে, তার ছবি-যেমন কোথাও বিরাট বিরাট সাপেরা ফুঁসছে, কোথাও দৈত্যকুল পথ আটকেছে, কোথাও বা কুমিরমুখো দেবী আম্মাট আত্মাটিকে খেয়ে নেবেন বলে থাবা পেতে বসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদের প্রতিষেধক মন্ত্র, প্রাচীন শিল্পীর রঙিন তুলিতে ছবির মতো আঁকা হয়েছে। আর আছে অভিসম্পাতবাণী। মৃতের বিশ্রামে যারা ব্যাঘাত ঘটাবে সেইসব চোর-ডাকাত-লুটেরাদের জন্য ওসিরিসের ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ব্যবস্থা। চোরেরা অবশ্য এসব অভিশাপের পরোয়া না করে সমাধি খুঁড়ে দুহাতে লুটেছে সমাধি কন্দরের ধনসম্পদ। ফলে তাদের কী হয়েছে, ইতিহাস যে সম্বন্ধে কিছু বলে না, কেবল শেষ যাঁরা ১৯২২ সালে টুটেনখামেনের সমাধি ভেঙে জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের হোতা লর্ড বার্নার্ডান এক বছরের মধ্যে দুর্ঘটনায় মারা যান। খননকার্য যাঁরা চালিয়েছিলেন তাঁদেরও বেশ কয়েকজন বহু দুর্দশায় ভুগেছিলেন। মিশরের সমাধিতত্ত্ববিদরা তখন ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন যে এরকম যে হবে সে তো আমরা আগেই বলেছিলাম। কত করে বারণ করেছিলাম ওদের...।

ডেইর-আল-বাহরি

আমাদের ধারণা যে ইজিপ্ট, ইজিপ্টোলজি, ইজিপ্টোলজিস্ট প্রভৃতি নিয়ে মাতামাতি শুরু হয় এই মোটে দুশো বছর আগে, যখন নেপোলিয়ান ইজিপ্ট অভিযান করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু পুরাতাত্ত্বিক গিয়েছিলেন যার অগ্রণী হলেন বুসার্ড নামে এক ফরাসি ভদ্রলোক। বুসার্ড আবিষ্কার করেন বিশ্ববিখ্যাত রোজেটা স্টোন। কালচে লাল রঙের এই প্রস্তর ফলকে তিনরকমের আলেখ্যলিপি ডেমোটিক (আলেখ্যলিপি টানা হাতে লেখা) এবং গ্রিক হরফে একই অনুজ্ঞা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ বছর

পরে এই লিপি থেকেই মিশরের প্রাচীন আলেখ্যলিপির রহস্য ভেদ হয় এবং পৃথিবীর পণ্ডিতমহলে ইজিপ্ট নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ হল আধুনিককালের কথা। কিন্তু তার অনেক আগে নতুন রাজত্বের (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০) ইজিপসিয়ানরা মধ্য এবং প্রাচীন রাজত্বের (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩০০০) পাথর দেওয়াল থাম মন্দির নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এরই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখলাম ডেইর-আল-বাহরিতে, ভ্যালি অব দ্য কিংস-এর পূর্বে মাইল পাঁচেক দূরে রানি হাটসেপসুটের মরটুয়ারি মন্দির দেখতে গিয়ে। মরটুয়ারি মন্দির হল যেখানে সমাধির আগে মৃতদেহ রেখে দেওয়া হল।

ডেইর-আল-বাহরিতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তিন থাকে সাজানো আছে। সবগুলিই একসময়ে বালিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। খোঁড়া শুরু হবার পরে প্রথম থাকে বেরোল সপ্তম শতকের এক মনাস্ট্রির ধ্বংসাবশেষ। আরও খুঁড়তে খুঁড়তে বেরোল হাটসেপসুটের মন্দির। সে এক পেল্লায় ব্যাপার। কাশীর ঘাটের চেয়েও চওড়া এবং বিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান মন্দির চত্বরে যেখানে সারি সারি থামের মাথায় ছাদ এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে (বোধহয় বালিচাপা ছিল বলে)। সারি সারি এক মাপের থামের ওপর বসানো ছাদ (কলোনাড) মিশরের চেয়ে গ্রিক ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে (পার্থেননের বয়স মোটে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) হাটসেপসুট এই ধরনের হল কলোনাডের ধারণা করলেন কী করে? মন্দিরের জায়গাটি খুঁজে বের করতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে। থিবান পাহাড়শ্রেণী এখানে অন্তরীপের মতো নদীর ধারে চলে এসেছে। যেখানে সেই খাড়া পাহাড়ের ঠিক তলায় পাহাড়ের মতোই বিরাট মন্দিরগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে হয়। ডেইর-আল-বাহরির মন্দির মিশরের অন্যতম প্রধান বিস্ময় এবং ইজিপ্টের ট্যুরিস্ট বইতে প্রায়ই এই মন্দিরের ছবি দেখতে যায়। মন্দির স্থাপন করবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে গিয়েই রানি হাটসেপসুট সেই পুরাকালেও মিশরের প্রত্নতত্ত্বের সম্মুখীন হন। তাঁর মন্দিরের পাঁচিল আরও পাঁচশো বছর আগে তৈরি রানি নেফরুর মন্দিরের রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। এখনও দেখা যায় সেই সরু গলিটির, যেটি হাটসেপসুটের অনুজ্ঞায় রাখা হয়েছিল যাতে রানি নেফরুর মন্দিরের পথ খোলা থাকে। এই গলিপথের ওপর তখনকার দিনের গ্রাফিটিতে অনেক নাম লেখা আছে। নেফরু এবং প্রথম মেন্টুহোটেপের তৈরি মন্দিরগুলি মাটির ওপর বিশেষ কিছু আর নেই। হল ডেইল-আল-বাহরির তৃতীয় স্তর। হাটসেপসুটের মরটুয়ারি মন্দিরের সঙ্গেই সংলগ্ন আছে তাঁর তৈরি মহাদেবী হাথোরের মন্দির। এই মন্দিরটি সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল বলে দেখা হল না।

এবার ঘরে ফেরার পালা। প্রথমে জাহাজে এসে মালপত্র নিতে হবে। তারপর লাকসোর এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে কায়রো। কায়রোতে এক রাত কাটিয়ে ঘরের ছেলে

ঘরে ফিরব বাহরিন ও দিল্লি হয়ে। ইতিমধ্যে রোদ চড়েছে। বালি কিছু তেতেছে। এলোমেলো হাওয়া, সকালের তুলনায় গরম। সেই রোদে তাতা হাওয়ার ভেতর দিয়ে নদীতে এসে শরীর জুড়োল। নদী পার হবার সময় অপসৃয়মাণ থিবান পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মনে হল, ওরা যেন মঙ্গল গ্রহের কেনও লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে ওদের কোনও যোগ নেই।

লাকসোর থেকে কায়রো। একঘণ্টার উড়ান। এরোপ্লেনও নদীপথ বেয়েই চলেছে। ত্রিশ হাজার ফুট থেকে সমস্ত নীল নদের উপত্যকা একসঙ্গে চোখে পড়েছে। সেই ঠিক যেন একটা নকশাকাটা শাড়ির পাড়, গুটানো ফিতের মতো কেউ সমানে সামনে মেলে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে কালো নদীর জল, তার দুপাশে সবুজ তৃণভূমি, শস্যক্ষেত্র। সবুজের পরেই দুধারে বালি, বালিয়াড়ি, ধু-ধু মরুভূমি। একই দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখে ঘুম নেমে আসে। মোহ জন্মায় হঠাৎ মনে হয় যেন কোথাও যাচ্ছি না আকাশে একটা স্থির বিন্দু হয়ে আছি। কিন্তু যে ভ্রম মুহূর্তমাত্র। মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল অচিরে প্লেন কায়রো এয়ারপোর্টে নামবে। আমাদের পুরনো বন্ধু মাহমুদ আবার আমাদের নিতে এলেন এবং রাত্রিবাসের জন্য হোটেলে পৌঁছে দিলেন। পরদিন গালফ এয়ারপ্লেন তিনিই ধরিয়ে দিলেন ঘরে ফেরার জন্য। বিদায় ইজিপ্ট। সারাজীবন এই কদিনের কথা ভুলব না।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

বারাণসীর ঘাটের কথা

মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশীতে এলে প্রথমেই মনকে আপ্লুত করে মানুষের মিছিল। সারা ভারতবর্ষ এসে যেন মিলেছে কাশীর ঘাটে। প্রতিটি ঘাটেই বসেছে মানুষের মহোৎসব। কোথাও চলছে কুস্তির কসরত, কোথাও নির্ভেজাল আড্ডা, কোথাও চলছে পুজোপাট, কোথাও ক্রিকেট চর্চা, আবার কোথাও দেহাতী বউটি তোলা উনুনে ভেজে চলেছে পুরি কচুরি। হাজার হাজার নৌকা-কোনওটা বাঁধা আছে ঘাটের কাছে, কোনওটা যাত্রী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ তো গেল ভোরের কথা। সন্ধেয় যখন দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গামাঈর আরতি হয় তখন তার আরেক চেহারা। এই উৎসবের যে কী আকর্ষণ তা একবার যে কাশী এসেছে সেই বুঝেছে। তাই তো ইতিহাসের চাইতেও পুরনো শহরটাতে লোক ফিরে ফিরে আসে।

হাওড়া থেকে অমৃতসর মেল, দুন এক্সপ্রেস, হিমগিরি, জম্মু-তাওয়াই, পূর্বা বা অমৃতসর এক্সপ্রেসের যে-কোনও একটায় চেপে কমবেশি ১৫ ঘণ্টা পরেই বারাণসী। স্টেশন থেকে বেরিয়েই অটো নিয়ে সটান চলে আসুন দশাশ্বমেধে। আজকাল একমুখি ট্রাফিকের ফলে কিছু বিধিনিষেধ পড়েছে। তাই সেটা একটু খোঁজখবর নিয়ে নেবেন। সেরকম বুঝলে রিকশা করে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে চলে আসাই ভালো। গোধুলিয়ার কাছেও থাকতে পারেন। আজকাল অনেক নতুন নতুন হোটেল হয়েছে। ঝাঁ চকচকে এয়ার কন্ডিশনড রেস্তোরাঁ সহ। কিন্তু বারাণসীর প্রাণস্পন্দন পেতে হলে থাকতে হবে গঙ্গার ঘাটের কাছে। এখান থেকে বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও সহজ হবে।

এ তল্লাটে প্রচুর হোটেল ও ধর্মশালা রয়েছে। সবই সাধারণ মানের। থাকার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা দশাশ্বমেধ বোর্ডিং হাউস। বহু পুরনো এই বোর্ডিং হাউসটিই একসময় ছিল কাশীতে থাকার একমাত্র ভালো জায়গা। এখন অবশ্য সেই রমরমা নেই। তবে স্থান নির্বাচনের দিক দিয়ে এর তুলনা হয় না। দু কদম এগোলে গঙ্গা আর দু কদম পিছোলে বিশ্বনাথের মন্দির-এত সুন্দর থাকবার জায়গা আর হয় নাকি? টানা বারান্দায় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে পুরো কাশী দর্শন হয়ে যাবে। দিবারাত্র স্রোতের মতো পিল পিল করে মানুষ চলেছে কখনও গঙ্গা অভিমুখে আবার কখনও গঙ্গাস্নান অন্তে বিশ্বনাথ দর্শনে। সামনের

চায়ের দোকানটি খোলা থাকে সারারাত । আর কী আশ্চর্য! সারারাত ধরে লোকে চা জলখাবার খায় । এই বড় বড় সিঙ্গারা, কচুরি, আর চাট ।

মালপত্র রেখে থিতু হয়ে প্রথমেই চলুন বিশ্বনাথ দর্শনে । সাইকেলরিকশা, চলমান মানুষ আর উদাসীন ষাঁড়ের পাশ কাটাতে কাটাতেই বিশ্বনাথের গলি । ঘুরপাক খেতে খেতে দুধারের দোকানপাট দেখতে দেখতে শুধুই এগিয়ে চলা । দোকানের বৈচিত্র্য তো রীতিমতো চমকপ্রদ -এই রাবড়ি মেঠাই-যেখানে সারাক্ষণ বিশাল এক কড়াইতে দুধ জ্বাল দিচ্ছে একজন । ভেতর দিকে অষ্টপ্রহরই তৈরি হচ্ছে পেঁড়া আর রাবড়ি । রঙিন সব মিষ্টি- সবুজ বরফি, কমলা পেঁড়া-অক্লেশে গলাধঃকরণ করে ফেলছে নির্বিকার ভক্ত দল । পাশেই চুড়ি, টিপের পসরা, তার পরই শাড়ি, ওদিকে আবার ধাতুমূর্তি, পাথরের বাসন ইত্যাদি । এদিকে মশলার পাহাড় । বেনারসী মশলার কদর তো বিশ্ব জোড়া । খেলনা, পুতুল, নৌকা সবই আছে । চলতে চলতে লক্ষ রাখুন অন্নপূর্ণা মন্দির পেরিয়ে গেল না তো! গলির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে গেলেও ভয় নেই । ঘুরে ফিরে সেই একই দিকে এসে পড়বেন ।

বিশ্বনাথের মন্দির আসবার একটু আগে থেকেই শুরু হবে ফুল বেলপাতার প্রসাদী দোকান । তার একটাতে জুতো জোড়া গচ্ছিত রেখে অন্দরে প্রবেশ করুন । দর্শনাদি সেরে নিন নিজের মনোমতো করে । পাণ্ডার প্রকোপ আজকাল নেইই । তবে ভিড়ের সময়ে দর্শনের সময় সংক্ষেপ হয়ে যায় । প্রতিদিন রাত নটার সময় ভারি সুন্দর আরতি হয়, অবশ্যই দেখবেন । এই সময় বিশ্বনাথকে রাজবেশ পরানো হয়, রুপোর সিংহাসনে রুপোর ছত্রীতে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয় । ৩-৪ জন পুরোহিতের সম্মিলিত বৈদিক মন্ত্রপাঠের আওয়াজে পুরো পরিবেশটাই তখন বদলে যায় । সর্বক্ষণের কলরোল মুখরিত চত্বরে তখন নৈঃশব্দ । আরতির সমাপনে রাজবেশ পরিহিত দেবাদিদেব রুপোর খাটে শয়নে যান । আবার ভোর না হতেই শুরু হয়ে যায় তাঁর আরাধনা ।

দ্বিপ্রাহরিক আহার সারতে পারেন বোর্ডিং হাউসেই । ছিমছাম বাঙালি আহার । শুক্তো থেকে চাটনি পর্যন্ত পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো । এখানে না থাকলেও অনেকে এখানে খেতে আসেন, এমনই বিখ্যাত এখানকার স্পেশ্যাল ভোজ । মাত্র ৩৫ টাকায় দুরকমের মাছ, তরকারি, ডাল, চাটনি, দই কলকাতা শহরেও আজকাল দুর্মূল্য । বড়ই যত্ন করে হাউসের কর্মচারীরা পরিবেশন করেন ।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম সেরে সিধে গঙ্গার ঘাটে চলে আসুন । রোদের তাপ কমে যেতেই দলে দলে লোক নৌকা করে বেরিয়ে পড়েছে হাওয়া খেতে । দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর রঙিন ছাতার তলায় লাখো মানুষ । এই ছাতাগুলো বেনারসের বিশেষত্ব । আপনিও

নৌকাবিহার করতে পারেন । ঘাটে তো নৌকা বাঁধাই আছে অষ্টপ্রহর । উঠে পড়লেই হল ।

গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাটের বিরাট বিরাট ইমারতগুলোকে দারুণ সুন্দর লাগে দেখতে । মৃদুমন্দ হাওয়ার দোলায় নৌকা থেকে থেকে দুলে ওঠে । অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় অবশ্য ধাক্কাটা জোরেই লাগে । মাঝির লাগাতার ধারাবিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হয় অনেক না জানা তথ্য । গঙ্গার এক পাড় ঘেঁসে যতদূর দৃষ্টি যায় বাঁধানো ঘাটের সারি । মোট ঘাটের সংখ্যা নাকি ৪৫০ । তবে বাঁদিকে অসি ঘাট থেকে ডাইনে বরুণা ঘাট পর্যন্ত যে গোটা তিরিশেক ঘাট আছে কৌলীন্যে ও বংশমর্যাদায় তারাই অগ্রগণ্য ।

দশাশ্বমেধ থেকে যাত্রা শুরু করে সামনেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট । দশাশ্বমেধ ঘাটই সব থেকে প্রাচীন । এই ঘাটে স্নান করলে নাকি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয় । তাই এই পড়ন্ত বিকেলেও স্নানার্থীর অভাব নেই । রীতিমতো তৈলমর্দন করে স্নানকর্ম চলছে । রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাটে একটি ঝুলন্ত অলিন্দ আছে । ফুরফুরে হাওয়া খাবার দিব্যি জায়গা । বারাণসীর প্রতিটি ঘাটই কোনও না কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির নামে । ঘাটের ওপর তাদেরই তৈরি বাড়ি । প্রতিটির নকশা আলাদা, প্রতিটিতেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ । মুন্সীঘাট যদি হয় ছিমছাম তো সিন্ধিয়া ঘাটে রাজকীয় বৈভবের পরিচয় । আজকাল অনেক ঘাটেই তৈরি হয়েছে বিলাসবহুল হোটেল-বিত্তবান ও বিদেশিদের ভিড়ই তাতে বেশি । দ্বারভাঙা ঘাটের ওপর যে প্রাসাদোপম বাড়িটিতে এতকাল ঢুকে পড়া যেত স্বচ্ছন্দে আজ সেখানে চলছে পাঁচতারা হোটেল বানানোর কাজ ।

মণিকর্ণিকা ঘাটে রয়েছে মহাশ্মশান । কখনও নেভে না চিতার আগুন । মাঝি শোনায় শিব পার্বতী একদিন ঘুরছিলেন এখানে । অসাবধানে পার্বতীর কানের মণি পড়ে যায় । বহু সন্ধানেও তা পাওয়া যায় না । ব্যথিতা পার্বতীকে শিব সান্ত্বনা দেন এই বলে যে তার মণি পড়েছে বলেই এই স্থান অতি পবিত্র হয়ে থাকবে এবং এখানে মৃতদেহ দাহ করা হলে তাঁরা সশরীরে স্বর্গধামে যাবে । সেই থেকে ঘাটের নাম মণিকর্ণিকা । এখানে শিবপার্বতীর মন্দিরও রয়েছে । নৌকা বোঝাই করে কাঠ আসে । সেই কাঠ সাজিয়ে তাতেই দাহ করা হয় মৃতদেহ । আগুন জ্বলতেই থাকে ।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটে পঞ্চ নদীর জল এসে মিশেছে । গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দুর্গা, তৃণা । কীভাবে সেটা অবশ্য তর্কের বিষয় । তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে । লম্বা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলেই প্রশস্ত চাতাল । কার্তিক মাসে এখানেই বসে আকাশ প্রদীপের মেলা । লম্বা বাঁশের ডগায় ঝুড়ির মধ্যে ঝুলতে থাকা আলোগুলো এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের অবতারণা করে ।

সিন্ধিয়া ঘাটের একটু পরেই এক অদ্ভুত মন্দির নজরে পড়ে । ছাদটি একদিকে হেলে পড়ে জল ছুঁই ছুঁই করে । দুরন্ত বাচ্চাদের ডাইভ মারার আদর্শ জায়গা । এক ব্রাহ্মণ সন্তান তার মায়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে গড়েছিলেন এই মন্দিরটি । মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে তিনি জলে তর্পণ করে তার মায়ের উদ্দেশে বলেন ‘মা, তোমার ঋণ শোধ করলাম’ । বলামাত্র মন্দির একদিকে হেলে পড়ে, দৈববাণী হয় ‘মাতৃঋণ শোধ করা যায় না’ ।

সন্ধে হতে না হতেই সব ভিড় আবার দশাশ্বমেধ ঘাট অভিমুখে । প্রতিটি নৌকা থেকেই প্রদীপ ভাসানো হয় । জলের ওপর প্রদীপ শিখাগুলি নাচতে নাচতে হারিয়ে যায় অন্ধকারে ।

দশাশ্বমেধ ঘাটের সাজানো মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে । মাইকে বাজে গঙ্গা আরতির গান । পূজারী মহারাজ পেতলের বিশাল পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে গঙ্গামায়ের উদ্দেশে আরতি করেন । অনেকটা হরিদ্বারের গঙ্গা আরতির অনুকরণে । কানে ভেসে আসে সুরেলা স্তোত্রপাঠ আর গুরুগম্ভীর শঙ্খধ্বনি । পরিবেশের নিরিখেই অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে চিরস্মরণীয় ।

নৌকাবিহারে ক্ষান্তি দিয়ে উঠে এলাম ঘাটে । আলো ঝলমলে শীতলা মায়ের মন্দিরে জোরকদমে আরতি চলছে । গঙ্গা আরতি শেষ হলে তবেই এখানে আরতি শুরু হয় । বর্ষাকালে শীতলা মায়ের বড়ই করুণ দশা হয় । মন্দির তখন জলে আধডোবা । ভক্ত সমাগমে অবশ্য ঘাটতি পড়ে না তখনও ।

প্রয়াগ ঘাট থেকে একটু ওপরে বেনারসী ঘাটের বড় দোকানটাতে অবশ্যই ঢুকবেন । আলু টিকিয়ার স্বাদ যেন এখনও মুখে লেগে আছে । বেনারসের পানমশলার মতো চাটও বিখ্যাত । বিশেষত দহি ফুচকা ও টিকিয়া চানা । তবে আগে দশাশ্বমেধের দুপাশে যেভাবে লাইন দিয়ে ফুচকার দোকান বসত তার সংখ্যা এখন অনেক কম ।

বেনারসের বাঙালিটোলার গলি ছিল সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় জায়গা । কেদারঘাটের ঠিক পিছন দিয়ে খানিক এগোলেই সেই বিখ্যাত গলিতে ঢুকে পড়া যায় । গলির দুপাশে পুরনো দিনের একহারা বাড়ি, কোনওরকম জানলা দরজার চিহ্ন দেখি না, শুধুমাত্র ঘুলঘুলির ফোকর টুকু ছাড়া । রাস্তা এত সরু যে দুজন মানুষ পাশাপাশি চলতে গেলেই ঠোকাঠুকি লেগে যায় । তার ওপর গলি তো ঘুরপাক খেয়েই যাচ্ছে । বাঙালিটোলার মুখটায় আছে মধুর দোকান । এখানকার রাবড়ি আর পেঁড়ার স্বাদই আলাদা ।

নৈশাহার সেরে দু-চার পাক চক্কর মেরে নিন রাস্তায় । এ শহর দিব্যি জেগে থাকে রাতভর । ভয়ের কোনও কারণ নেই । চুরি-ডাকাতি বিশেষ হয় না । বেরতে না চাইলে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসুন । রাত বারোটাতেও সামনের চা-নাস্তার দোকানে ভিড় উপচে

পড়ে । এরা সব দোকানি । হিসেবপত্র সেরে বাড়ি যাবার পথে চা-কচৌরি খেয়ে নেয় । ১টার দিকে আসে কুলি, ঠেলাওলার দল । চা-কচৌরির নৈশাহার সেরে তারা রাস্তাতেই গামছা মাথায় শুয়ে পড়ে । রাত দুটো থেকে শুরু হয় সাধু মহারাজদের গঙ্গাস্নান । নিস্তব্ধ রাস্তায় খড়মের খটাখট আওয়াজ তুলে তাঁরা স্নানে যান । কপালে ফোঁটাতিলক কেটে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে চা জল খেয়ে এবার তাঁরা যান বিশ্বনাথ দর্শনে । তারপর বয়স্কা মহিলারা যান পুঁটলি বগলে । এঁদের অবশ্য ফিরতে খানিক সময় লাগে । রাত তিনটে-সাড়ে তিনটের পর থেকে জনসমাগম ক্রমশ বাড়তে থাকে । চায়ের দোকানের শিফটও পরিবর্তন হয় ।

বারাণসীর ভোরটা অসাধারণ । সূর্য ওঠার অনেক আগে থেকেই ঘাটে ঘাটে লোক পুজোপাঠ, স্নানাদি সারতে থাকে । তারপর যখন প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে গঙ্গার স্থির জলে, নরম আলোয় ভরে যায় চারধার, মাইকে বাজে সূর্যমন্ত্র, দলে দলে মানুষ 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং...' বলে সূর্যদেবকে করজোড়ে নমস্কার জানান, তখন সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য । সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এসে ভিড় করে বেনারসের ঘাটে ।

অহল্যাবাঈ ঘাটের চাতালে বসে রোজ সকালে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি মহাদেবকে আহ্বান জানান । নাগপুর স্টেটের মুন্সীঘাট পেরলেই ব্রিজ রামা প্যালেসের বিশাল হোর্ডিং । আদিতে এটি ছিল দ্বারভাঙার রাজবাড়ি । অনেক ঐতিহাসিক বাড়িঘর ভেঙে পড়লেও এই রাজবাড়িটির নির্মাণশৈলী এখনও নজরকাড়া । নতুন করে সংস্কারের কাজ করায় প্রাসাদটি ঝকঝক করছে ।

চৌষটঘাটের নবদুর্গা মন্দির দর্শন সেরে দিগপতিয়া ঘাটে আসুন । এখানে সীতারামদাস ওঙ্কারদাস স্বামীর আশ্রম আছে । পাশেই ধোবি ঘাটে দমাদম কাপড়ে আছাড় দিচ্ছে ধোবিরা । প্রচুর মহিলা ধোবিও দেখবেন ।

পেশোওয়াদের তৈরি রাজঘাটের পরের ঘাটটির কাহিনী বড় মজার । এই ঘাটটির নাম নারদ ঘাট । স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এখানে স্নান করলে তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ অবশ্যম্ভাবী । ভয়ে কোনও স্বামী-স্ত্রী জোড়ে নামে না । মানসরোবর ঘাটে প্রদীপকুমারের বাড়ি পেরিয়ে আসুন কামেশ্বর শিবমন্দিরে । রানি রাসমণির ঘাট দেখে চলে আসুন কেদারঘাটে । কেদারেশ্বর শিবমন্দিরের চাতালে কমণ্ডলু হাতে কৌপীন পরা সাধু দেখবেন অনেক । হরিশচন্দ্র ঘাটেও জ্বলে চিতার আগুন । তবে স্থানমাহাত্ম্যে ওপরে বলে মণিকর্ণিকা ঘাটেই দাহকার্য সম্পন্ন হয় বেশি । হরিশচন্দ্র ঘাটে ভিড় কম হয় । একদিকে চলমান জীবনের অবিরাম ধারা, অন্যদিকে নশ্বর জীবনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান-জীবনের নিত্যঅনিত্যকে পাশাপাশি পাওয়া-এটাই বোধহয় বারাণসীর চরম উপলব্ধি ।

একদিন অটো নিয়ে চলুন ব্যাসকাশী বা রামনগর, গঙ্গার পাড়েই বিশাল রাজবাড়ি । কাশীর রাজাদের বসবাস ছিল এখানেই । আপাতত খুব সুন্দর একটি যাদুঘর তৈরি হয়েছে রাজবাড়ির একাংশে । যানবাহন থেকে শুরু করে অস্ত্রশস্ত্র, মূল্যবান আসবাবপত্র, অলংকার, জামাকাপড়-রীতিমতো তাক লাগানো সংগ্রহ । হাতির দাঁতের একটা মাদুর আছে দেখবার মতো ।

অটো করে কিংবা গাড়ি করে দেখে নিন বারাণসীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য । সঙ্গে উপরি হিসাবে সারনাথ । বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার এখানেই হয়েছিল । সেই স্মৃতিতে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন রাজা মহারাজরা এখানে বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন ।

সঙ্কটমোচন মন্দির দেখুন সাবধানে, কারণ হনুমানের উপদ্রব । তুলসীমানস মন্দিরে তুলসীদাস বিরচিত রামচরিতের গল্পকাহিনী বিভিন্নরকম চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, জনার্দন মন্দির-বারাণসীতে মন্দিরের ছড়াছড়ি । সব থেকে ভালো লাগে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি চত্বরে বিড়লাদের মন্দির । পরিচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ মন্দির, নিমেষেই এনে দেয় শান্তির প্রলেপ ।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অন্দরমহলও রীতিমতো চিত্তাকর্ষক । একদা মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ।

একদিন বেরিয়ে পড়ুন বেনারসী দেখতে । কিন্তু ভুলেও পা দেবেন না বিশ্বনাথের গলিতে । এখানে সবাই গলাকাটা দাম চাইবে । আপনি বরং পিছন দিকে চকবাজার এলাকায় আসুন । এড়িয়ে চলুন রিকশাওলা, ঠেলাওলার সুন্দর শাড়ি দেখানোর আহ্বান । এদের বাঁধা দোকান আছে যেখান থেকে এরা কমিশন পায় ।

বারাণসীতে কোনও সিল্ক তৈরি হয় না । আসাম, ব্যাঙ্গালোর থেকে সিল্ক আমদানি করে তার ওপরে কাজ করা হয় । মদনপুরা আর মুবারকপুর বা মুবারকগঞ্জ এই দুজায়গাতেই শাড়ি তৈরি হয় । মদনপুরার শাড়ির মান অনেক ভালো, রং পাকা, কাজ সুন্দর, মোবারকপুরের শাড়ির মান তত ভালো নয়, কাজ কিংবা রঙের তফাৎ প্রথম নজরে আসে না । বেনারসীর হাটে মুবারকগঞ্জই বিকোয় বেশি । এতে মালিকের লাভ বেশি । খোদ কলকাতাতেই নাকি বেশিরভাগ দোকানেই মুবারকি শাড়ি বিক্রি হয় । রিকশা নিয়ে একদিন মদনপুরায় চলে আসুন । একটার পর একটা শাড়ির দোকান, যে কোনওটায় ঢুকে নয়ন সার্থক করতে পারেন । হাজার কয়েক শাড়ির দোকানের মধ্যে একটি দোকান তার সাইনবোর্ডের কারণেই নজরে পড়েছিল । বাংলায় লেখা মেট্রো স্টোরস । বেনারসে একমাত্র বাঙালি শাড়ির দোকান । বাঙালি দেখে বাঙালি দোকানদার উৎসাহের সঙ্গে শাড়ি

দেখিয়েছিল । তারা সাতপুরুষ বেনারসে থাকেন । অথচ বাংলা ভোলেননি । বাড়িতে অন্নপূর্ণা, দুর্গার পুজো হয় । দোকানের পিছনের গলিতেই তাদের কারখানা । সরু, নোংরা গলি দিয়ে ঢুকলাম স্যাঁতসেঁতে ভিজে একটা ঘরে । টিমটিমে আলোয় তাঁতে বসে শাড়িতে জরির ফুল ফুটিয়ে তুলছে এক কিশোর । খানদানি ব্যবসা । বেনারসী তাঁতের সিংহভাগ তাঁতিই মুসলিম । সব পরিবারের কিশোরই স্কুল ছুটির পরে তাঁতে বসে কাজ শেখে । জানে ভবিষ্যতে এটাই হবে তার জীবিকা । গোল গোল করে পিচবোর্ডের ওপর সব নকশার গ্রাফ আঁকা । কী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা শাড়িতে বসায় এরা না দেখলে বিশ্বাস হয় না । একটা দামি শাড়ি করতে প্রায় ২৫-৩০ দিন সময় লাগে । প্রত্যেকের চোখেই পুরু মোটা চশমা । কম আলোয় চোখ লাগিয়ে কাজ করার কুফল বোঝা গেল ।

বেনারসের আরেকটি বিখ্যাত দ্রব্য হল এখানকার জর্দা মশলা । দশাশ্বমেধ বোর্ডিং হাউস ছাড়িয়ে একটু এগোলেই অনিলের বিখ্যাত জর্দা । মশলার গন্ধে নেশা ধরায় । কৌটোয় কৌটোয় রকমারি এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদি হাজারো জিনিস । সবই মুখরোচক, দরদাম না করেই কিনে ফেলুন । ঠকবেন না ।

আর বেনারসের পুজোও খুবই বিখ্যাত । অনেক বাঙালিই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন । পুজো এলে তা বোঝা যায় । এই সময় কটাদিন বাঙালি উৎসবে মেতে ওঠে । গঙ্গার ঘাটে বসে নৌকা করে ঠাকুর ভাসানোর দৃশ্য আজও চোখে লেগে আছে ।

এই প্রাচীন শহরের জনাকর্ষণী ক্ষমতা এতই বেশি যে বেনারসে সব সময়ই ভরা সিজন । তবে হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যাও অনেক বলে অসুবিধে হয় না । ৩-৪ দিন গঙ্গার ঘাটে দুবেলা ঘুরে বেড়িয়ে, বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন করে, রাবড়ি, মালাই, চাট খেয়ে কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পাওয়া যায় না । হাতে কদিন বেশি সময় থাকলে অনেকে ঘুরে নেন চুনার, এলাহাবাদ । এছাড়াও যাওয়া যেতে পারে ১০০ কিলোমিটার দূরে রাজদেউরিতে । চন্দ্রপ্রভা নদীর ওপরে এক বিশাল বাঁধ তৈরি হয়েছে চন্দ্রপ্রভা ড্যাম । ভারি চমৎকার পরিবেশ । এছাড়া দেওদারি জলপ্রপাতটি এ পথের অন্যতম আকর্ষণ । ১২৫ কিলোমিটার দূরের উইনডাম ড্যামটিও চমৎকার । মীর্জাপুর জেলার এই অঞ্চলটি দ্রুত একটি পিকনিক স্পটে পরিণত হয়েছে এখানকার সৌন্দর্যের জন্য । ঘুরে নেওয়া যায় কাছের সিরসি । মারুতিভ্যান ভাড়া করে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়া । ১০০০-১২০০ টাকা পড়বে । সঙ্গে নিয়ে নিন প্যাকড লাঞ্চ ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

বালফাক্রমের পাহাড়-জঙ্গলে

সুমিত মুখোপাধ্যায়

শিলংয়ে বদলি হয়ে এসে পর্যন্ত বারবার শুনেছি বালফাক্রামকে নিয়ে নানা উপাখ্যান, লোককথা আর অতুলনীয়প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য । এখন একটা বিশাল ঢেউ খেলানো মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি । দম বন্ধ করে দেখছিলাম । প্রায় দু-হাজার ফুটের খাড়া দেওয়াল সোজা নেমে গেছে মহাদেও নদীর খাতে । লক্ষ করলে দেখা যায় দূরে একপাল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে । বাঁদিকটায় গাঢ় সবুজের ক্যানভাসে সাদা ফিতের মতো একটা জলপ্রপাত ফেনা ছিটিয়ে পেঁজা মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । ওপারের খাড়া পাহাড় ক্রমশ উঠে গেছে কৈলাস বা চুৎমাং শিখরের দিকে ।

১৯৮৭ সালে এই বালফাক্রাম জঙ্গলকে জাতীয় উদ্যানের আখ্যা দেওয়ার পরও প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটকদের তেমন টানতে পারেনি । প্রথমত প্রচারের অভাব তাছাড়া মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের দক্ষিণপ্রান্তে বাংলাদেশের গা ঘেঁসা এই জায়গাটার দুর্গমতা । অবশ্য জাপানের এক টি ভি সংস্থা এই মহাদেও নদীর খাড়া গভীর গিরিখাতকে নাম দিয়ে গেছে দি মিনি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন । এখানকার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, গাছপালা আর বন্যপ্রাণীর অতুলনীয় বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ । আর আদিবাসী অধ্যুষিত এই জঙ্গলের গাছ-পাথর-নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন লোকগাথা ।

শিলং থেকে নেমে সারারাত বাস চলেছে আসামের কালি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এ টি রোড ধরে । সমতল রাস্তা ছেড়ে পশ্চিমমুখী বাসটা আবার বাঁদিকের পাহাড়ি রাস্তায় মোড় নেবার পর পুবদিকটা চাপা লাল হয়েছিল । গৌহাটি থেকে ছেড়ে আসা অনেকগুলো নাইট সার্ভিস বাসও প্রায় একসঙ্গেই এসে পৌঁছে গেল পশ্চিম গারো পাহাড়ের ছোট্ট শহর তুরায় । এখনও তেমন গোছানো জেল্লা নেই । সবেমাত্র কয়েকটা চার-পাঁচতলা বাড়ি । দু-তিনটে হোটেল, একটা সদ্য বানানো সুপারমার্কেট, একপাশে বাসস্ট্যান্ড, পোস্ট অফিস আর হাসপাতাল । সেই অনেক দূরে পাহাড় শেষে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে বাংলাদেশ । উল্টোদিকে খাড়া উঁচু নকরেক পাহাড়চুড়োয় দুয়েক টুকরো সাদা মেঘ তখন কালচে সবুজ জঙ্গলে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ।

একটু খাটো কিন্তু মজবুত চেহারার এই গারো আদিবাসীরা কোনও এক অজানা কালে তিব্বত থেকে আসাম পেরিয়ে এসে বেছে নিয়েছিল এই মালভূমির আবাস । মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মহিলারা এখনও ধরে রেখেছে এদের নিজস্ব সাজ । তাঁতে বোনা উজ্জ্বল রঙের একটা লুঙ্গির ওপরে একটা ব্লাউজের মতো জামা । আর সময় বিশেষে একটা সুন্দর ওড়না বা চাদর ।

সিমসাংয়ের কোলে বাঘমারা

দু-তিন দিনের মতো খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে পরদিন ভোর ছটার বাঘমারা যাবার সরকারি বাসটায় আমরাই একমাত্র পর্যটক দল । গারো পাহাড়ের শীতঘুম ভেঙেছে সবে । মার্চ মাসের মাঝামাঝি, ঝিরঝিরে হাওয়ায় এখন লাট্টু-পাইনের কোঁড় উড়ে আসে । গারোরা অনেকেই বাংলা বলতে পারে । এমনকী মিশ্র সংসার পাতানোও নতুন কিছু নয় । গারোদের গ্রাম মেঘালয়ের পাহাড় ছাড়িয়ে উত্তরে আসাম আর দক্ষিণে বাংলাদেশের মধ্যেও বিস্তৃত ছিল ।

দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো একটা ঢালু রাস্তায় হুড়মুড় করে নেমে চলেছে বাসটা । পাঁচমিশালি গাছের জঙ্গল আর মাঝে মাঝে ঝকঝকে বাঁশের বাড়ির কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম প্রায় সমতলে । ঘণ্টাতিনেক পর বারেংগাপাড়ায় কিছুক্ষণ জলখাবারের বিরতি । এদিকটায় অল্প সংখ্যায় রাভা ও কোচ আদিবাসীও চোখে পড়ে । তবে মহিলাদের পোশাকের রকমফের দিয়ে তফাত বুঝে নিতে হবে । তারপর বাসটা সোজা বাংলাদেশ সীমানার ধার দিয়ে পুবদিকে বাঁক নিল । রাস্তার ডান পাশে ছোট ছোট সিমেন্টের পিরামিডের সারি । এপারে ভারত ওপারে বাংলাদেশ । মাঝখানের অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা ভেঙে হাল চালায় চাষীরা । মাঝেমাঝে বি এস এফ পোস্ট । ওদের কাজটা বড় কঠিন । একটা হাঁড়ি থেকে আতপ আর সেদ্ধ চালের ভাত আলাদা করার মতো । সবচেয়ে মুশকিল কাজ দলছুট গরুদের পাসপোর্ট চেক করা ।

আবার পাহাড়ি রাস্তা । এবারে বেশ সুন্দর জঙ্গল আর ছোট ছোট নদী । বাসটা একদম নদীর ধার ঘেঁসে বাঘমারা বাজারে এসে দাঁড়াল । আগাম পাঠানো টেলিগ্রাম নিরুদ্দেশ হলেও এস ডি এম সাহেবের সহৃদয়তায় ঘর মিলল এখানকার একমাত্র পর্যটকনিবাস সার্কিট হাউসে । এই রাস্তায় এ বাংলোয় এক রাত না কাটালে যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । রেশন পাওয়া যাবে বাঘমারা বাজারে । সবচেয়ে জরুরি হল বালফাক্রাম জাতীয় উদ্যানের ছাড়পত্র নিতে হবে বাঘমারার ডি এফ ও (ওয়াইল্ড লাইফ) অফিস থেকে ।

সার্কিট হাউসের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দেখি সিমসাং নদীর দৃশ্য । একটু পরেই বাংলাদেশে পৌঁছে নদীর নাম হয়ে যায় সোমেশ্বরী । গারো পাহাড়ের জল এখান দিয়ে ময়মনসিংহে যায় ।

মহাদেও গ্রামে একরাত

পরদিন সার্কিট হাউসের নিচে নতুন ব্রিজটার মুখে বাসের প্রতীক্ষা শেষ হল, বেলা তখন একটা । তুরা থেকে আসছে মহেশখোলার বাস । মাঝপথে সিট পাবার আশা কম । বাজারে গিয়ে বসার জন্য টিকিট কাটাও যায় । নদী পেরিয়ে বাসটা আবার পাহাড়ে উঠল । তখন ডানদিকের জানলায় চোখ জুড়নো বাংলাদেশের দৃশ্য । কদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে । চুনাপাথরের ঢালে তাই রাস্তা যেন লাঙলচষা । দম ফেলতে বাস দাঁড়াল রংরা গ্রামে নদীর ধারে, প্রায় ঘণ্টাদেড়েক চলার পর । চায়ের দোকানে আলাপ হল মহম্মদ আনসারির সঙ্গে । গত ত্রিশ বছর এখানে আছেন, তখন বাস রাস্তা ছিল না । ওঁর জঙ্গলের নেশা থেকে পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভিন্ন চিড়িয়াখানা আর সার্কাসে জীবজন্তু বিক্রি করা । এখন একটা কবিরাজি গাছগাছড়ার দোকান দিয়েছেন রংরায় ।

আবার চলা শুরু । জঙ্গল আরও আদিম হয়েছে । বাসের গতি আরও মন্থর । দিনের আলোও কমে এসেছে । দুপাশের ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে দলবদ্ধ উল্লুকের মাতামাতি শোনা যায় । কানাই নদীর ছোট্ট কাঠের ব্রিজটা পেরোতে পেরোতে অন্ধকার হয়ে এল । একটু পরে বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল বিশাল এক বাঁশ জঙ্গলের ধারে । বাঁদিকে একটা বোর্ড-বালফাক্রামে স্বাগত । সঙ্গে সাবধান বাণী বৈদ্যুতিক তারের বেড়ার জন্য । মহাদেও গ্রাম এখান থেকে আরও দু কিলোমিটার । ফরেস্ট গেট দিয়ে ঢালু রাস্তার ধার দিয়ে কিছুটা হাঁটতেই রেঞ্জারের অফিস । পারমিট দেখে চৌকিদার ছোট একটা বাংলো খুলে দিল । বৈদ্যুতিক বেড়া দেওয়া নিরাপদ আশ্রয় । তবে বাংলোতে জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই । চৌকিদারের তৎপরতায় মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই কয়েক বালতি জল ও গরম ভাত পাওয়া গেল । রেঞ্জারবাবু পরদিন ভোরবেলায় আমাদের জঙ্গল অভিযানের সব ব্যবস্থা পাকা করলেন । একজন বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড থাকবেন সঙ্গে । প্রধানত হাতিদের গুণ্ডামিতে এখানে সবাই তটস্থ । কাছাকাছি একটা বড় হাতির দল ঘোরাঘুরি করছে । জঙ্গলে বোধহয় জলের অভাব হয়েছে ওদের । ভাগ্য ভালো, খ্যাপা হাতিটা এখন এদিকটায় নেই ।

প্রায় দুশো কুড়ি বর্গকিলোমিটার জুড়ে থাকা এই জাতীয় উদ্যানের বিচিত্র এবং অসংখ্য বাসিন্দাদের সবার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি । প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় দুশো

চল্লিশ ধরনের গাছপালা চেনা গিয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলোই দুষ্প্রাপ্য এবং ওষধিগুণসম্পন্ন । দক্ষিণের সমতল থেকে খাড়া উঠে যাওয়া পাঁচিলের ওপর এই মালভূমির মাথাটা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আঠেরোশো ফুট উঁচুতে । প্রায় সমতল মালভূমির মাথায় ঘাস আর গুল্মই বেশি । আর গভীর গিরিখাতগুলোর মধ্যে দুর্ভেদ্য রেন ফরেস্ট । পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলের (মৌসিনরাম মাত্র শখানেক কিলোমিটার পুবে) অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে ছ-সাত প্রজাতির ক্যাট ফ্যামিলির সদস্যরা । ডোরাকাটা বাঘ থেকে ক্লাউডেড লেপার্ড পর্যন্ত । এছাড়া লালপান্ডা সমেত প্রায় চল্লিশ জাতের স্তন্যপায়ীর দেখা পাওয়া যায় । আরও আছে দশ-বারো রকমের সরীসৃপ এবং প্রায় ৯০ ধরনের পাখি ।

রাতে বাংলোর বাগানে দাঁড়িয়ে টের পেলাম সামনে মহাদেও গ্রামে ঝুম খেতের আগুন আর জ্বলন্ত বাঁশের কটকাট আওয়াজ ।

ভোর হল । তখনও বেশ ঠান্ডা । ক্যামেরা, সারাদিনের খাবার ও জলের বোতল নিয়ে দোনলা বন্দুকধারী বীরেন্দ্র সাংমার সঙ্গে চললাম জঙ্গলে । কুয়াশার মধ্যেও পথের ওপর দেখা যায় বন্যপ্রাণীর সারিবদ্ধ পায়ের ছাপ । হাতি, বাঘ, জংলী কুকুর, ভালুক, হরিণের পায়ের ছাপ নজরে পড়ল । একটা বুনো শুয়োরও একপাশ দিয়ে হেঁটে গেছে । বীরেন্দ্র এমনভাবে বোঝাচ্ছিল যেন ও সবাইকেই চেনে । এ জায়গাটা এদের রোজকার যাতায়াতের পথ । আবার ঠিক সন্ধ্যার মুখে এ পথ দিয়েই ওরা ফিরে যাবে যে যার আস্তানায় । একজোড়া বনমোরগ আর একদল উল্লুক আমাদের এই প্রাতঃকালীন অনুপ্রবেশ লক্ষ করছিল । ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর গার্ড দেখাল হাতিরা কীভাবে এই শুখা মরসুমে পাইপলাইন ভেঙে নিজেদের জলের ব্যবস্থা করে নিয়েছে । সমস্ত অঞ্চলটায় তাই মানুষের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ । আরও ঘণ্টাখানেক পরে বেশ চড়াই উতরাই আরম্ভ হল । এখানে জঙ্গল বেশ গভীর । একসারি চুনাপাথরের গুহার চারপাশটা কীরকম অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে । এখানটা সাপেদের পাড়া । শেষ চড়াইটুকু ভাঙতে ভাঙতে সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপর । একটা সুন্দর সোনালি হনুমান একলাফে রাস্তা পেরোল । এবার একটা গুহা বেশ বড়, দরকার হলে ওখানে রাত কাটানো যায়, বাইসন আর হাতিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আস্তানাও বটে ।

বেলা প্রায় বারোটা । এগারো কিলোমিটার হেঁটে এখন প্রায় মালভূমির মাথায় । অনেকটা সমান জায়গা । এখানেই হেলিপ্যাড বানানো হয়েছিল এই জাতীয় উদ্যানের উদ্বোধনের সময় । হাতিরা চারপাশের বেড়া ভেঙে ফেলেছে অনেকদিন । হেলিপ্যাডের উত্তরপ্রান্তে হঠাৎ মাঠটা শেষ । নিচে প্রায় দুহাজার ফুটের ক্যানিয়ন বা গিরিখাত । বীরেন্দ্র একটা পতঙ্গভোজী কলসপত্র গাছ এনে দেখাল । লম্বাটে সবুজ কলসের মধ্যে কিছুটা

জলের মতো পদার্থ । কয়েকটা ছোট পোকার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে তাতেই । এখানকার গ্রামবাসীরা ওই জলটুকু ওষুধ হিসাবে খায় ।

আরও তিন-চার কিলোমিটার হাঁটলে চুৎমাং শিখরের কাছে মহাদেও নদীর উৎস । এখানকার কোনও একটা গুহায় রাত কাটিয়ে পরদিন আরও ২০ কিলোমিটার হাঁটলে বালফাক্রামের অন্যপ্রান্তে পৌঁছনো যাবে । সেখানে সিজুগ্রামে আছে গারো পাহাড়ের অন্যতম বড় একটি গুহা । তবে ওই পথে উপযুক্ত পাথেয় এবং পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকা জরুরি ।

খোলা জায়গাটার চারদিকে নানান বিচিত্র চেহারার পাথর ছড়িয়ে আছে । কত অজানা ঘাসফুল দিয়ে সাজানো এই প্রাকৃতিক সংগ্রহশালা । পাশের ক্যানিয়নের ভেতর থেকে শনশনে হাওয়া উঠে আসছে থেকে থেকে । বীরেন্দ্র সাংমা তখন একটা বড় পাথরের সামনে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে । পাশে বন্দুকটা শোয়ানো । আমার কাছে এসে গভীর বিশ্বাস আর ভক্তি নিয়ে বলল, এই সেই হাওয়া -যার নাম বালফাক্রাম ।

এই অদ্ভুত নামটা এসেছে দুটি গারো শব্দ থেকে । বালোরা বা হাওয়া যেখানে অহরহ বয়ে যায় বা ফাক্রাম । স্থানীয় বিশ্বাস এই হাওয়ার উৎপত্তি অসংখ্য আত্মার শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে । গারোদের প্রাচীন লোককথা অনুযায়ী সমস্ত গারো মানুষকেই মৃত্যুর পর এই বালফাক্রামে অশরীরী হয়ে কাটাতে হয় কিছুদিন । তাই এই জায়গাটা হল আসলে থেমাং আসেং অর্থাৎ আত্মার আবাসস্থল । বিধির বিধান শোনার জন্য আত্মারা অপেক্ষা করে মিট্টে আদালতের আশপাশে । প্রত্যেক আত্মাকেই এখানে আসবার সময় একটা করে স্বাস্থ্যবান গরু নিয়ে আসতে হয় বিচারকদের দক্ষিণা হিসেবে । সেইসব গরু বাঁধা থাকে সামনের ওই বোলডাক গাছটার গোড়ায় ।

অশরীরীদের এই ট্রানজিট ক্যাম্পে ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই । আছে দু-দুটো বাজার । যাবতীয় মুদিখানার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় থেমাং আন্তেতে । আর একপাশে মাংসের বাজার মাচরু নি নিকেল । দিশি সুরা তৈরি হয় একটা বিরাট চ্যাপ্টা পাথরের পাত্রে । ভাটিখানার মালিকের নাম গিটিং । তার একটা ছোট চায়ের দোকান আছে । এমনকী প্রেতাত্মাদের মধ্যাহ্নভোজের জন্যও একটা বিশাল পাথরের টেবিল রাখা আছে । আজও গারো চাষীদের কাছে থেবিট থেবা বা প্রেতাত্মার শস্যভাণ্ডার নামক একটা বিশাল পাথর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । এই পাথরটার কোনদিক থেকে দানা খসে পড়ছে সেটা দেখে তারা বুঝে যায় সেই বছরে কোনদিকের গ্রামগুলোতে ভালো ফসল হবে । এছাড়া অবিবাহিত এবং বিবাহিত আত্মাদের থাকার জন্য আলাদা পান্থশালা আছে । আছে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও । অবিশ্বাস্য মনে

হলেও এ সবকিছুই নানারকম পাথর, গাছপালা ইত্যাদির চেহারায় গারোদের প্রাচীন লোকগাথার মধ্যে রয়ে গেছে আজও ।

কয়েকজন বিশিষ্ট আত্মা এই বালফাক্রামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য চিরকালের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রয়ে গেছেন । এঁদের মধ্যে সুপরিচিত এবং ত্রিকালদর্শী বীর যোদ্ধা দিক্কির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে নেওয়া হয় । দিক্কি মশাই তাঁর বৃদ্ধ মামা মাচরু এবং ছোট ভাই বান্দিকে নিয়ে বেশ রসেবশেই দিন কাটান । গারো পাহাড়ের সর্বকালের সেরা দুই সুন্দরী সোরে এবং গিটিং দুই ভাইয়ের দুই উপপত্নী । এদের রূপে-রসে-লাস্যে সারা বালফাক্রাম মেতে থাকে ।

গার্ড সাংমা বেশ রসিয়ে গল্প করে এইসব অলৌকিক দ্রষ্টব্য দেখিয়ে দিচ্ছিল একে একে । নিজে খ্রিস্টান হলেও এই প্রাচীন লোক সংস্কৃতিতে তার বিশ্বাস বেশ গভীর । এই মার্চ-এপ্রিল মাসে শ্রীমান দিক্কির দেখা পাওয়া যায় পুরো বালফাক্রাম পাহাড়ে, সে এখন অপূর্ব সুন্দর এক ফুল হয়ে ফুটে আছে । পালকের তৈরি ঝাড়নের মতো একটা ডাঁটাসমেত ফুল সোজা মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে শয়ে শয়ে । প্রায় দেড়ফুট লম্বা ফুলগুলোর নিচের পাপড়ি নীলচে-লাল বর্ণ নিয়েছে ।

চুনাপাথরের স্তর দিয়ে গড়া এই মালভূমির পাথরগুলি আবহাওয়াজনিত কারণে নানা বিচিত্র আকার নিয়েছে । সহস্র বছরের লোকশ্রুতি আর বিশ্বাস প্রকৃতির এই বহুমূল্য শিল্পকলাকে আজও নষ্ট হতে দেয়নি ।

সবসমেত প্রায় ১৬ কিলোমিটার হাঁটার পর ছোট্ট পুষ্করিণী চিদিমাকের স্বচ্ছ কালো জলে প্রকৃতির প্রহরী সেইসব মহান আত্মাদের অভিনন্দন জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম অন্য এক অনুভূতি নিয়ে ।

কীভাবে যাবেন

গুয়াহাটি অথবা শিলং থেকে বাসে তুরা । সরকারি ও বেসরকারি নানা শ্রেণীর বাসে অগ্রিম বুকিং পাওয়া যায় । শুধুমাত্র গুয়াহাটি থেকে দিনেরবেলায়ও বাস চলে । জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

Chief Conservator of Forests

Meghalaya Forest Department, PO-Tura, Dist: West Garo Hills

এবং

DFO (Wild Life), Balpakram , PO-Baghmara, Dist -South Garo Hills, Meghalaya

প্রবেশমূল্য ২০ টাকা, স্থির ক্যামেরা ২৫ টাকা ।

বাঘমারার সার্কিট হাউসে থাকতে চাইলে যোগাযোগ করুন:

Deputy Commissioner, Baghmara, Dist: South Garo Hills, Meghalaya.

ভাড়া ৪০ টাকা প্রতিশয্যা ।

বেড়াবার সেরা সময় বর্ষাকাল বাদ দিয়ে নভেম্বর থেকে মার্চ ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

গৌরীগঙ্গার উৎসব মিলাম হিমবাহ

পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয়ের গভীরে তিব্বত সীমানার প্রায় গা ছুঁয়ে হরদৌল ও ত্রিশূলী শৃঙ্গের কোলের মধ্যে ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মিলাম তুষারস্রোত । এর গহ্বর থেকে জন্ম নিয়েছে দুর্বার গৌরীগঙ্গা । অপ্রতিরোধ্য গতির তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বড় বড় পাথর ও বরফের চাঙরগুলোকে । গৌরীগঙ্গার উৎসমুখে গ্লেসিয়ারের বিস্তৃতি ৩৯ মিটার । তুষারশুভ্র গ্লেসিয়ারের দেহের ওপর হিমানী সম্প্রপাতের ফলে মাটির ধূসর আস্তরণ । অজস্র ফাটলের ফাঁক দিয়ে গৌরীগঙ্গা মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয় । গ্লেসিয়ারের পিছনে শ্বেতশুভ্র ত্রিশূলী ও হরদৌল । মেঘের আস্তরণ সরে যেতেই সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকে সাদা ধবধবে এই তুষারশৃঙ্গদ্বয় ।

গ্রামের নাম থেকেই হিমবাহের নামকরণ হয়েছে মিলাম । বহু আগে গ্রাম পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল । এখন প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার সরে এসেছে । ভারত-তিব্বত বাণিজ্যিক সম্পর্কের যুগে মিলাম গ্রাম, মার্তোলি, পাঁচুগ্রাম, বুরফু জাঁকজমকপূর্ণ জনপদ ছিল । মিলামের সমৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি । কাঠখোদাই করা গৃহসম্পদ, বিরাট বিরাট দরজা-জানলায় নানা ধাতুর কারুকার্য লুণ্ঠনকারীদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখনও রাজবাড়ি, স্কুলঘর, বিচারালয়, কয়েদখানার প্রাচীরগুলো দাঁড়িয়ে আছে । ১৯৬২ সালের আগে পর্যন্ত প্রাণচঞ্চল ছিল এই হিমবাহের ধারেকাছের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো । মানস কৈলাস যাত্রীদের আনাগোনা ছিল এই পথেই । যেদিন তিব্বত চিনের অন্তর্গত হল, বন্ধ হল সীমান্ত পথ, তখনই এদের ঐতিহ্য ও কৌলীন্য হারিয়ে গেল । সেই প্রাণস্পন্দন আজ নেই বললেই চলে ।

পিথোরাগড় থেকে সর্পিল সংকীর্ণ ফিতে পথ ধরে বাস চলছে । দেবদারু, পাইনের অরণ্য ভেদ করে ওগল, আসফোট, দিদিহাট হয়ে থলে এলাম । পথের বাঁকে, পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের বুকে ভেসে ওঠে শ্বেতশুভ্র নন্দাদেবী, ত্রিশূল, নন্দাকোট, চৌখাম্বার গগনচুম্বী শৈলশৃঙ্গগুলি । তেজাম পেরিয়ে বাস থামে ৬,৫০০ ফুট উঁচু গিরগাঁওয়ে । এরপর একটানা চড়াই পথ শুরু হয় । সেই দমবন্ধ করা চড়াই পথের শীর্ষে কালামুনিপট (৯,৫০০

ফুট) । পাহাড়ের চূড়ায় নাগাবাবার ঘণ্টামন্দিরের সামনে বাস থামে । এরপর ক্রমশই উতরাই পথে ১৫৪ কিলোমিটার দূরে মুন্সিয়ারি (৭,২০০ ফুট) । পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যায় ।

প্রথম দিন

৮ জুন আমাদের ট্রেকিং শুরু হল । আজ একটানা ১৪ কিলোমিটার উতরাই । আজকের গন্তব্য লিলাম গ্রাম (৫,১২০ ফুট) ।

মুন্সিয়ারির বাজার, দোকান পার হয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে টানা ৫ কিলোমিটার হাঁটাপথে (উতরাই) সরলাপানি বাস স্টপেজ । মাটিও পাথরের তৈরি বাসরাস্তাটা বেশ কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে । এই পথেই পিথোরাগড় ভায়া মটকোট বাস যাতায়াত করে । মুন্সিয়ারি বাসস্ট্যান্ড থেকে সকালে ৫টা ৩০ মিনিটে বাস ছাড়ে । বাসের সুযোগ নিতে পারলে ৫ কিলোমিটার হাঁটাপথ যাওয়া ও ফেরার সময় দুবারই কমানো সম্ভব । ফেরার সময় সরলাপানিতে বাস পৌঁছয় দুপুর ২টো নাগাদ ।

সরলাপানি থেকে ঢালু পায়ে চলা রাস্তা গ্রামের বাড়িঘরের মধ্য দিয়ে নেমে গেছে । আড়াই কিলোমিটার দূরে সুরিনগড় গ্রাম । পথে পাহাড়ি গ্রাম্যবধূর দেখা মেলে । শিশুরা খেলা ছেড়ে ছুটে আসে । নমস্তে বলেই হাত প্রসারিত করে লজেন্স ও টফির আশায় । নিচে জঙ্গলের আড়ালে পাহাড় স্পর্শ করে বয়ে চলেছে গৌরীগঙ্গা । কাঠের সেতু পার হতেই এক অতি রমণীয় ঝরনা । ডানহাতে বাঁশের তৈরি বিশ্রামগৃহে একটু চা খেয়ে প্রায় সমান্তরাল পথে ২ কিলোমিটার হাঁটলে জিমিঘাট । সামান্য চড়াই ভেঙে ৩ কিলোমিটার এগোলেই লিলাম গ্রাম (১,৮১০ মিটার) । রাস্তার গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা ২৫০ মিটার চড়াই পথে পাহাড়ের ওপর পি ডাব্লু ডি-র বিশ্রামগৃহ । নিচে রাস্তার ওপরেও থাকার জায়গা আছে । সূর্য ততক্ষণে পশ্চিম আকাশে সবেমাত্র ঝুঁকেছে । চা-জলখাবার খেয়ে বাকি সময়টুকু সবুজ প্রাকৃতিক অরণ্যের মধ্যে ঝরে পড়া রডোডেনড্রনের মোটা সবুজ পাতা, নাম না-জানা অসংখ্য পাখির কলতান, নিচে পাহাড় জঙ্গল কাঁপিয়ে গৌরীগঙ্গার দাপাদাপি উপভোগ করেই চলে গেল । রাতের আহার আশ্রয়গৃহের মালিকের দোকানেই সমাধা করলাম । চড়াই ভেঙে ওপরে পি ডাব্লু ডি-র বাংলোর পরিবেশ আরও মনোরম । প্রশস্ত লনে টেন্ট পাতার সুব্যবস্থা আছে । বাংলোর দুটো ঘর খুবই ভালো, চৌকি আছে দুটোতেই ।

দ্বিতীয় দিন

আজকের পথ চড়াই । গন্তব্য ১৩ কিলোমিটার দূরের বুগডিয়ার (৮,৬০০ ফুট) । রডোডেনড্রনের লাল, নদীর আওয়াজ আর সবুজের মধ্য দিয়ে ৩ কিলোমিটার পথ

এগোলেই রূপসীঘাট । পাথর দিয়ে বেদি করে পাহাড়ি পথে ক্লান্তি কাটানোর আয়োজন করা আছে । ডানদিকে উঁচু পাহাড়টার মাথা টপকে দুগ্ধফেনিল জলস্রোত পিলতীফলস ঝাঁপ দিয়েছে গৌরীগঙ্গার উদ্দেশে । জলকণা মিশ্রিত আর্দ্র বাতাস । এই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনে হল জ্যোৎস্নার প্লাবনে এই রূপসীঘাট কী অপরূপ রূপসী হয়ে ওঠে ।

প্রথম দিনের পথের পারিপার্শ্বিকতা আজ বদলে গিয়েছে । গ্রাম আজ আর নেই, তবে মাঝে মাঝে গ্রামবাসীর চলমান সংসার পাহাড়ের পথে চলেছে ৩-৪ মাসের জন্য অস্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে । তাদের প্রফুল্ল সম্ভাষণ-নমস্তের বিনিময়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে সাড়ে চার কিলোমিটার পার হয়ে পৌঁছে যাই রডগাড়ি । বাঁশ, পাথর ও টিনের ছাউনি দেওয়া প্রাসাদের বেতের মাচায় বসামাত্রই প্রাসাদের মালিক গরম চা পরিবেশন করেন । এখানে আহার ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে । রালাম হিমবাহ থেকে উদ্ভূত রালাম নদী এখানে গৌরীগঙ্গায় মিশেছে ।

এরপর গৌরীগঙ্গার ধার ধরে কষ্টদায়ক জনবিরল চড়াই পথ ৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে হাঁপাতে হাঁপাতে বুগডিয়ার (২,৪৫০ মিটার) পৌঁছে গেলাম । বুগডিয়ার নামের অর্থ 'বাঘের গুহা' । দুই কামরার পি ডাব্লু ডি-র বিশ্রামগৃহ, ভারত-তিব্বত সীমান্তবাহিনীর ২-৩টি ছাউনি ছাড়া রাস্তার ওপরে পাথর বাঁধানো প্রশস্ত পরিসরে দুটো দোকানঘর নিয়ে বাঘের গুহার বর্তমান অবস্থান । ডানদিক দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গৌরীগঙ্গার দাপাদাপি, বাঁদিক দিয়ে পোটিংনালার ঢল নেমে এসে মিলিত হয়েছে বাংলোর ঠিক পিছনে নিবিড় জঙ্গলে । ১৯৮৯ সালের ৭ জানুয়ারি এক ভয়াবহ তুষার সম্প্রপাতে সামনের উঁচু পাহাড়ের বেশ কিছু অংশ ভেঙে পড়ে । ১৩ জন জওয়ান চাপা পড়েন । ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় বড় পাথরের চাঙরগুলো ও নির্মিত স্মৃতিফলকগুলো পরিবেশটাকে বেশ মর্মস্পর্শী করে রেখেছে ।

তৃতীয় দিন

আজ ১৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে রিলকোট হয়ে মার্তোলি গ্রাম যাব । মার্তোলি গ্রামের উচ্চতা ৩,২৬০ মিটার ।

বাঘের গুহায় নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে পোটিং নালার কাঠের পুল পেরিয়ে তিন কিলোমিটার চড়াই পার হতেই ১,০০০ ফুট খাড়া মসৃণ পাহাড়ের গা ঘেঁসে গৌরীগঙ্গার প্রশস্ত তটে সমতল সবুজ তৃণক্ষেত্র নাহারদেবী । এক সময় ওই খাড়া পাহাড়টার গা ঘেঁসে গৌরীগঙ্গা নেমে আসত । তখন পাহাড়ের গায়ে খিলান কেটে কাঠের পাটাতন লাগিয়ে মাচা করে বেশ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই পথ অতিক্রম করতে হত । আজ গৌরীগঙ্গা সরে

গেছে অনেকটা। নতুন রাস্তাটা পাহাড়ের গা ঘেঁসে এগিয়ে গেছে নদীর বক্ররেখার সঙ্গে তাল রেখে। ছোট একটা ঘরে নাহারদেবীর মন্দির স্থাপিত হয়েছে। অজস্র বিভিন্ন রঙের টুকরো টুকরো কাপড় ঝুলিয়েছে মানুষ। তাদের কামনা বাসনার প্রতীক।

পাহাড়ের গা বেয়ে উদ্বৃত্ত তুষার সম্প্রসারিত হয়ে নদীর গহ্বর পর্যন্ত নেমে এসেছে। হেঁটে সেগুলি পার হয়ে তিন কিলোমিটার এগোলেই পৌঁছে গেলাম চিরকানি ঝরনা। বনবীথি ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে থাকে। তীব্র রুক্ষ বাতাসের দাপট বাড়তে থাকে। দুই কিলোমিটার পার হতেই চলে এলাম মাপাং (১০,১৩০ ফুট)। মাধ্যাহ্নের আহার এখানেই করে নেওয়া ভালো। ব্যবস্থা অন্যান্য জায়গার তুলনায় সুবিধাজনক, খাবারের বৈচিত্র্যও সম্ভব। সময় নষ্ট না করে গায়ের ঘাম শুকিয়ে রওনা দিলে ৪ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিয়ে ১২,২০০ ফুট উঁচুতে মুক্তাঙ্গন, রিলকোট। পাহাড়ের কোলে হেলান দিয়ে ছোট একখণ্ড মালভূমি। ভারত-তিব্বত সীমান্তবাহিনীর স্থায়ী ছাউনি, কয়েকটা পরিত্যক্ত ভাঙা পাথরের বাড়ি, একটা স্থায়ী চা ও খাবারের দোকান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ডানদিকে ৫-৭ ফুট নিচে গৌরীগঙ্গার নদীগর্ভ। বিপরীত দিক দিয়ে বয়ে আসা তীব্র বাতাসে ও মালভূমির ঢাল কম হওয়ায় এখানে নদীর গতি বেশ কিছুটা স্তিমিত। তরুলতাহীন নগ্ন রুক্ষ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে দুই কিলোমিটার টানা কষ্টদায়ক চড়াই। বাতাস এখানে তীব্রতর, পিঠের বোঝা নামিয়ে সবুজ ঘাসে গা এলিয়ে দিতে বাধ্য হলাম রিলকোট ধার-এ।

এক কিলোমিটার পথ এগোলেই রাস্তার ওপর সাইনবোর্ড, Martoli Village–3 K.M. মিলাম যাবার দুটো পথের একটা মার্তোলি গ্রাম হয়ে বুরফু পৌঁছয়। অপরটি বাইপাস ধরে বুরফু পৌঁছয়। বুরফু থেকে মিলাম ১৪ কিলোমিটার। নন্দাদেবী অভিযাত্রীদের মার্তোলির পথেই বেসক্যাম্পে যেতে হয়। সামান্য চড়াই পার হতেই বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণক্ষেত্র ও পাহাড়ি ফুলের সমারোহ। চারদিক দিয়ে অজস্র উচ্ছলধারা নেমে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে চাঙ্গা করে তুলল আমাদের ক্লান্ত দেহকে। মার্তোলি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যায়। ৩ জুন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সম্মিলিত যে অভিযাত্রী দলটি নন্দাদেবীর শীর্ষে বিজয়কেতন উড়িয়েছে, তারা মুন্সিয়ারিতে আজই ফিরে গেছে। তাদেরই সাহায্যকারী দলের একটা অংশ তখনও মার্তোলিতে থেকে গিয়েছিল। তাই স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি প্রাণচঞ্চল লাগল মার্তোলিকে। পরিত্যক্ত পাথরের বাড়িগুলোর মেরামতি হয়েছে। রাতে চাঁদের আলোয় খুব সুন্দর লাগছিল মার্তোলিকে। এদের থেকেই জানলাম, পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে নন্দাদেবীর পাথর বাঁধানো মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে সূর্যোদয় দেখা যাবে।

চতুর্থ দিন

সূর্যদেবকে নন্দাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে ভোরের আলো ফোটবার আগেই চড়াই ভেঙে ওপরে উঠলাম । দিনের প্রথম আলোয় বেশ কয়েকটা অচেনা অখ্যাত গিরিশৃঙ্গ উদ্ভাসিত হল । হঠাৎ মেঘ ছেয়ে ফেলল সমস্ত আকাশ, মেঘের আস্তরণের মধ্য দিয়ে অর্ধস্ফুট চিত্ররেখার মতো নন্দাদেবীকে দেখলাম । মনের সাধ অপূর্ণ রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল শেষ গন্তব্য, মিলামের উদ্দেশে । মার্তোলি গ্রাম থেকে বুরফু হয়ে মিলাম গ্রাম ১৪ কিলোমিটার পথ ।

পাহাড়ের গা বেয়ে অপ্রচলিত, গ্রামবাসীর পদচিহ্নের রেখা ধরে ১,৫০০ ফুট নিচে মার্তোলি গঙ্গার মুখে নেমে এলাম । গৌরীগঙ্গার সঙ্গে মার্তোলিগঙ্গা এখানে মিলিত হয়েছে । কাঠের সেতু পেরিয়ে বাইপাসের রাস্তা ধরে ৩ কিলোমিটার অল্প চড়াই । তারপর দড়ির ঝোলাসেতুর সাহায্যে, এই প্রথম গৌরীগঙ্গাকে অতিক্রম করে, নদীকে বাঁদিকে রেখে বুরফু গ্রামের সীমান্তে পৌঁছলাম । নদীর পাড় ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে মিলামের পথ । অপর পথটি বুরফু গ্রামে প্রবেশ করেছে । বুরফু গ্রামের ঠিক পিছনেই বুরফু হিমবাহ, বেলা ১০টার সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে ।

এই বুরফু গ্রাম হয়ে, ডানদিকে পথ চলে গেছে রালাম হিমবাহের দিকে । ব্রিজগঙ্গাটপ ডিঙিয়ে যেতে হয় । ফেরবার পথে রালাম হয়ে যাবার বাসনা অপূর্ণ থেকে গেল । সীমান্তবাহিনীর জওয়ান ও বুরফুর গ্রামবাসীরা জানালেন, ব্রিজগঙ্গাটপ (১৬,৫০০ ফুট) তখনও ৮-১০ ফুট বরফে আবৃত । কোনও পোস্টম্যান ও ভেড়াচালক দল ওই পথে তখনও আসেনি । সেপ্টেম্বরের শেষে ও অক্টোবরের প্রথমদিকে ছাড়া ওই পথে যাওয়া বিপদসঙ্কুল । বুরফু গ্রামে এক অস্থায়ী আবাসিকের আঙিনায় বিশ্রাম নিয়ে আমরা রুটি, আচার, চানার তরকারি খেয়ে যাত্রা শুরু করলাম মিলামের দিকে ।

গৌরীগঙ্গাকে বাঁদিকে রেখে চড়াই পথে সাড়ে তিন কিলোমিটার গেলেই বিলজু গ্রাম । ছোট গ্রাম, অস্থায়ী আবাসিকরা তাদের পরিত্যক্ত বাড়িতে তখনও এসে পৌঁছয়নি । রুক্ষ পথ এগিয়ে চলে । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া টুপি, মাফলার উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে বার বার । পথে মাটি আর পাথরের ঝুড়ো । সামনে ছুঁচলো, শীর্ণ পাহাড়শীর্ষ । বীভৎসভাবে ধসে যাওয়া খাদের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন ধরে ৩ কিলোমিটার বিপদজনক চড়াই পথ হঠাৎ নেমে চলে নিচে গোয়াংখ্যানালার অববাহিকায় । খরস্রোতা গোয়াংখ্যা গৌরীগঙ্গায় মিশেছে । নালার ওপর কাঠের তক্তা ফেলে স্বল্পপরিসর সেতুটি । সেতু পেরিয়ে আবার প্রাণান্তকর পাথুরে ঝুড়ো মাটির চড়াই । হঠাৎই দৃশ্যপথে

ভেসে উঠল শহিদস্মারক স্তম্ভগুলি । একটা ধাপ আরও উঠতেই রাজনীতির বলি, প্রকৃতির ধ্বংসলীলার শিকার মিলাম গ্রামের ভগ্নাবশেষ এবং এরই প্রহরায় নিযুক্ত সীমান্তবাহিনীর ক্যাম্প আর ডাকবাংলো । এক কিলোমিটার প্রায় সমতল পথ পেরিয়ে বন্ধ ডাকবাংলোর বারান্দার মেঝেতে গা এলিয়ে দিলাম । এখানে অস্বস্তিকর প্রবল হওয়াটাকে আড়াল করে বসা যায় ।

বাংলোর চৌকিদার মধ্যাহ্নের অবকাশে আহারাদি সারতে মিলাম গ্রামে তাঁর নিজের বাড়িতে গিয়েছিল । পোর্টার মারফত খবর পেয়ে, এসে বাংলোর ঘর খুলে দিলেন । বাংলোর দুটো স্যুট, প্রতিটি অংশে ২টি করে ঘর, সংলগ্ন বাথরুম । বড় ঘরদুটিতে মোটা সতরঞ্চি পাতা । ছোট ঘর দুটোর প্রতিটিতে ২টি করে চৌকি আছে । বাইরে দুটো পৃথক রান্নাঘর । অল্প বাসনকোসনও আছে । জ্বালানি হিসাবে কাঠ অথবা কেরোসিন (যদি নিজেরা নিচ থেকে সঙ্গে এনে থাকেন) ব্যবহৃত হয় । সীমান্তবাহিনীর ব্যারাকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে । তার সুযোগ বাংলোর অধিবাসীরাও সীমিতভাবে পেয়ে থাকেন । গ্রামের রেশন ও দোকান থেকে চাল, চিনি, আলু, পেঁয়াজ কিনে নিতে পারেন ।

গোয়াংখ্যানালার ধার থেকে যে মালভূমিটা দেখা যায় তার বিস্তৃতি লম্বায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার ও চওড়ায় আধ কিলোমিটার হবে । মালভূমির ডান সীমান্ত দিয়ে রাস্তা এগিয়ে গেছে, রাস্তার ডানপাশে মালভূমির প্রায় শুরুতেই পাহাড়ের গা ঘেঁসে বাংলো । বাংলোর চারপাশ পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা । পাকা দেওয়াল, টিনের ছাউনি, নুড়ি বিছানো চত্বর । গৌরীগঙ্গা মালভূমির বাঁ সীমান্ত দিয়ে পাহাড় প্রাচীরের কোল বেয়ে নেমে এসেছে । চা খেয়ে বাইরে এলাম । বাতাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এখন বিকেল ৫টা ।

বাংলোর সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভারত-তিব্বত সীমান্তবাহিনীর দপ্তর ও ছাউনি । সৌরশক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা ও জেনারেটর আছে । ওয়ারলেস টাওয়ার, অফিসঘর ও ব্যারাকের ডানদিক দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে তিব্বত সীমান্তের পথ উঠে গেছে । বাঁদিকের সীমানা দিয়ে নদীর খাদের পাশ দিয়ে পথ মিলাম গ্রাম হয়ে হিমবাহে চলে গিয়েছে । পরদিন মিলাম যাওয়ার অনুমতি আদায়ের জন্য ব্যারাকের অফিসে গিয়ে ৫ জন সঙ্গীসহ গ্রুপলিডারের নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিলাম । মুন্সিয়ারির অনুমতিপত্রটা দেখিয়ে তাদের সম্মতি পাওয়া গেল । পরদিন হিমবাহ দেখে ফিরে অফিসে সই করে যেতে হবে । আমরা গ্রামের রাস্তায় চৌকিদারের বাড়িতে গেলাম ।

নিজেদের প্রয়োজনে যে সব ওষুধ আমরা সঙ্গে এনেছিলাম সেগুলি পাহাড়ি পথে মহৎ উদ্দেশে কাজে লাগছে । আমাদের সহযাত্রীরা প্রতিদিনই আশ্রয়স্থলে পৌঁছনোর পর বেশ কিছু গ্রামের লোকজনদের অসুখের ওষুধ ঠিক করে । চৌকিদার তাঁর নাতির চিকিৎসার

জন্য আমাদের আরেকদিন মিলামে থাকতে বললেন। তাঁর সেই নিরুপায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরতা আমাদের প্রত্যেকের মনে প্রশান্তি এনে দিল। তাছাড়া পরদিন সারা দুপুর বৃষ্টি হওয়ায় আরও একটা রাত মিলামে থাকতে বাধ্যই হলাম।

পঞ্চম দিন

ভোরবেলা মিলাম হিমবাহের উদ্দেশে রওনা হয়ে ব্যারাক পর্যন্ত আসতেই ঘন মেঘ চলে এল। স্থায়িত্ব স্বল্পক্ষণের। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই পথ হারিয়ে গেল পাহাড়ের ভগ্নস্তূপে ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর-নুড়ির মধ্যে। এ যেন ঝুরো পাহাড় ও ভগ্নস্তূপের সমুদ্র। পোর্টারকে অনুসরণ করে অবিন্যস্ত পদে এগিয়ে চললাম। ত্রিশূলী ও হরদৌলের চুড়োদ্বয় মেঘের আড়ালে অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠেছিল মাঝে মাঝে। যে হিমস্রোত ওই পাহাড়ের গা থেকে ১৯ কিলোমিটার প্রসারিত, তাকে দূর থেকে ভগ্নস্তূপের সমুদ্র মনে হচ্ছিল। এই দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গৌরীগঙ্গার উৎসমুখে এসে হাজির হলাম। মুহূর্তের জন্য চরম ও পরম পাওয়ার তৃপ্তিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। গৌরীগঙ্গার স্রোতে বাহিত গোলাকৃতি মসৃণ পাথরটি তুলে এনে শিব প্রতিষ্ঠা করে ধূপ জ্বেলে কাজু, কিসমিস ও খেজুর প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

পোর্টার সঙ্গী আমাদের নিয়ে বাংলোয় ফিরল। খাবার তৈরি ছিল। আহার সমাধা হতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়ে থাকল কালো মেঘে। সারারাত বৃষ্টি হল। এরপর সেই রাতটা বুরফুতে কাটিয়ে ফেরার পালা। একই পথে হেঁটে ১৮ জুন পৌঁছে গেলাম মুন্সিয়ারি। ফেরার পথে দেখে নিলাম বনকাটিয়া হিমবাহ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতে হলে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয়। মিলামের পর্যটকদের অনুমতি দেন মুন্সিয়ারির সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। দুকপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও পরিচিতিপত্র প্রয়োজন। মুন্সিয়ারিতে একটা দিন থেকে পদযাত্রীদের পোর্টার ও রেশন গোছগাছ করার ফাঁকে অনুমতিপত্র আদায় করে নিতে হবে।

লখনউ থেকে নৈনি এক্সপ্রেস রাত ৯টা ১৫ মিনিটে ছাড়ে। পিলভিট পৌঁছয় রাত ৩টে ৩০ মিনিটে। টনকপুরের বগি এখানে রেখে যায়। সকাল ৬টায় রওনা হয়ে ৮টা ৩০ মিনিটে টনকপুরে পৌঁছয়।

পিলভিট স্টেশন চত্বর থেকেই পিথোরাগড়ের প্রথম বাসটি ছাড়ে সকাল ৫টায় (নিয়মিত ডাক নিয়ে যায়) । টনকপুর, লোহাঘাট হয়ে যায় । টনকপুর স্টেশন থেকে বাসের গুমটি প্রায় ১ কিলোমিটার । বেশ কয়েকটা দূরের বাস টনকপুর হয়ে সকালের দিকে পিথোরাগড় যায় (৯টা ৩০ মিনিট ও ১১টা ৩০ মিনিট) । ভাড়া ৫৬ টাকা । পিলভিট থেকে টনকপুর ৬০ কিলোমিটার, টনকপুর থেকে লোহাঘাট ৯১ কিলোমিটার, টনকপুর থেকে পিথোরাগড় ১৫১ কিলোমিটার ।

পাহাড়ি পথে ৮-৯ ঘণ্টা সময় লেগে যায় পিথোরাগড় পৌঁছতে । এইসব বাসগুলি লোয়ার পিথোরাগড়ের বাসস্ট্যান্ডে থামে । আপার ও লোয়ার উভয় বাসস্ট্যান্ডেই রাত্রিবাসের উপযুক্ত হোটেল ও খাবারের দোকান আছে । আলমোড়া জেলা থেকে পৃথক হয়ে পিথোরাগড় এখন বেশ সমৃদ্ধ জেলাশহর । মুন্সিয়ারির প্রথম বাসটি লোয়ার পিথোরাগড় থেকে সকাল ৫টায় ছেড়ে আপার পিথোরাগড় বাসস্ট্যান্ডে ২০-২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে সব্জি, চিঠি ও যাত্রী তুলে মটকোট হয়ে মুন্সিয়ারি বাজারের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছয় বিকেল ৪টেয় । দ্বিতীয় বা শেষ বাসটি আপার পিথোরাগড় স্ট্যান্ড থেকেই ছাড়ে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে । ভাড়া ৫৮ টাকা ।

হাওড়া থেকে কাঠগোদাম এক্সপ্রেসে এলে আলমোড়া হয়ে যেতে পারেন । আলমোড়া থেকে মুন্সিয়ারির বাস সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে ছাড়ে । বাগেশ্বর, চৌকরি, থল হয়ে মুন্সিয়ারি পৌঁছয় সন্ধে ৬টায় ।

ডাকবাংলোর সামনে যাত্রী নামিয়ে বাস চলে যায় নিচের বাসস্ট্যান্ডে । বাংলোর দৈনিক ভাড়া ৩৬ টাকা । দিদিহাট থেকে অগ্রিম বুকিং নিতে হয় । পাহাড়ের ঢালে দুটো স্তরে বাংলোর অবস্থিতি । ওপরের ধাপে ভি আই পি স্যুট ও নিচের ধাপে পর্যটকদের থাকার স্যুট দুটো । একটা বড় হলঘর আছে, প্রয়োজনে এটিও ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় । বাংলোর সামনে মরসুমি ফুলের সুসজ্জিত লনে পা রাখলেই চোখের সামনে পঞ্চচুল্লির পাঁচটা চুড়ো ।

পথ নেমে গেছে নিচের মুন্সিয়ারির আধা-শহর আধা-গ্রাম্য জনপদে । এখানে স্কুল, বাজার, দোকান, পোস্ট অফিস, এস ডি এম-এর অফিস, ব্যাঙ্ক, ধর্মশালা ও হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্থানীয় লোকেদের বসবাস । মিলাম যাবার হাঁটাপথের সরঞ্জাম মেলে এখানে । পোর্টার, গাইড, ঘোড়া, রেশনদ্রব্যের জোগান এখানেই । পোর্টারের খরচ ৬০-৮০ টাকা আহারাদি সহ । গাইড হবার যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া কষ্টসাধ্য । এছাড়া এই পথে গাইডের প্রয়োজন মোটেই নেই, পোর্টারই সব চেনে ও জানে ।

ভ্রমণ মার্চ, ১৯৯৬

ম. ভূমির দিনরাত্রি

পবিত্র সরকার

রাজস্থান হল হিন্দিতে যাকে বলে রেগিস্তান বা মরুভূমির দেশ-এই রকম একটা ধারণা নিয়েই রাজস্থানের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলাম । আগ্রা থেকে বাসে ফতেপুর সিক্রি দেখতে যাব, সেখান থেকে ভরতপুরে আমাদের নেবার জন্য জিপ আসবে । আর ফতেপুর সিক্রি থেকে দু-পা এগোলেই তো রাজস্থান, অর্থাৎ কিনা রেগিস্তান, অর্থাৎ কিনা মরুভূমির দেশ ।

কিন্তু কোথায় সে মরুভূমি! রাস্তার দুপাশে দিব্যি গাছপালা, জলাজমি, খেতে প্রচুর চাষবাস হচ্ছে । ভরতপুরে গিয়ে পক্ষীনিবাসেও সেই জলাজমি আর অজস্র গাছ, সম্ভবত বাবলাজাতীয় গাছের সংখ্যাই বেশি । এগোতে এগোতে জয়পুর উদয়পুর চিতোর বাড়মের হলদিঘাটি-কত কী দেখা হয়ে গেল, কিন্তু মরুভূমির সন্ধান আর পেলাম না । বাড়মের যেতে বালিয়াড়ি পড়ল একটি দুটি, কিন্তু মরুভূমি কই? পাহাড় দেখলাম, আজমেরের দিকে মার্বল পাথরের কারখানা থেকে সাদা পাথরের গুঁড়োর স্তূপ দেখলাম, বাসের মধ্যে মেয়েদের হাতের প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা রুপো আর প্লাস্টিকের বালার সারি দেখলাম, এমনকী একটি 'ভূতে-পাওয়া' বউ-ও দেখে ফেললাম । তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, কারণ তাকে নাকি 'দেওতা'-য় পেয়েছে । সে বিষণ্নমুখে বাসের জানলায় মাথা রেখে বসে ছিল । কালিপড়া চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, আর আমাদের হঠাৎ হঠাৎ চমকে দিয়ে মাঝে মাঝে 'হো-রে হো-রে' করে দমকে দমকে চিৎকার করে উঠছিল, প্রায় চল্লিশ সেকেন্ডের একটানা চিৎকার । তারপরে আবার সব শান্ত । মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমরা । তার ভেতরে যেন একটা মস্ত ভাঙচুর হয়ে গেছে, সে আর পুরোপুরি মানুষ নেই ।

যাই হোক, এ দৃশ্য দেখতে তো আমরা রাজস্থানে আসিনি, এসেছি মরুভূমি দেখতে, ভূভারতে একমাত্র মরুভূমি এখন এখানেই সঞ্চিত আছে, আর কোথাও তাকে পাওয়া যাবে না । তবে এমন নয় যে, আমরা একেবারে আলাভোলা বাবাজি হয়ে রাজস্থান দেখতে গেছি । বাংলা ইংরিজিতে রাজস্থান ভ্রমণের যা কিছু পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় বাড়িতে তার রীতিমতো চর্চা হয়েছে, তারপরে রাজস্থান ট্যুরিজমের রঙিন ছবিওয়ালা কাগজপত্রও বেশ কিছু জোগাড় হয়েছে, কাজেই আমরা জানতাম যে, 'সোনার কেল্লা'র শহর জয়সলমিরে গেলে তবেই মরুভূমিতে যাবার একটা রাস্তা পাওয়া যাবে । হ্যাঁ, জয়সলমিরে যাঁরা যাবেন

তাঁদের আরও একটা কথা বলে রাখি । তাঁরা যেন কেল্লায় গিয়ে ভুল করেও শৌখিন হিন্দির জ্ঞান দেখানোর জন্য 'সোনে কা কিলা' বা ওই ধরনের কিছু বলবেন না । পরিষ্কার বাংলায় 'সোনার কেল্লা' বলবেন, সম্ভব হলে দন্ত্য-সটা ইংরিজি 'এস'-এর মতো করে বলবেন । অর্থাৎ বলতেই পারেন, 'ক্যা ইয়ে সোনার কেল্লা হ্যায়?' কিংবা 'ইয়ে সোনার কেল্লা-মে অব কৌন রহতে হ্যায়?' আমাদের গাইড আমাদের পইপই করে বলে দিয়েছিল যে, জয়সলমিরের অনেকটা আকাশ দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা ওই সোনালি পাথরের দুর্গের নাম এখন সোনার কেল্লাই হয়ে গেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবির কৃপায়, সোনে কা কিলা বললে ব্যাকরণ ভুল হবে । ফলে সে আমাদের বিশেষ করে দেখাল কোনখানটায় মুকুল থাকত-যেটার নাম এখন 'মুকুলবাড়ি'-ই হয়ে গেছে, কোনখান দিয়ে দৌড় দিয়েছিল, কোন সুড়ঙ্গে সে ঢুকে পড়েছিল । এখানে গাইড খুব মনোবেদনার সঙ্গে জানাল যে, সুড়ঙ্গে সবাই বাড়ির আবর্জনা ফেলতে শুরু করায় সরকার এখন তার মুখটা 'সিল' করে দিয়েছে, ফলে সে আর আমাদের তার ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারছে না । আমরা মনে মনে ভাবলাম, রক্ষে করো বাবা, সুড়ঙ্গে ঢুকতে হলেই হয়েছিল আর কী । কিন্তু সে প্রচুর দোকান-পাট মন্দির ইত্যাদি, গরু-বাছুর-ছাগল ভর্তি অলিগলি এইসব দেখাল । সে সব দেখে আমরা খুশি হয়ে ফিরে এলেও মরুভূমি আমাদের অবিরত হাতছানি দিতে লাগল ।

সত্যি বলতে কি, বাড়মের থেকে আমরা জয়সলমিরে এসেছি-তাতেও পথে মরুভূমির বিশেষ চিহ্ন নেই । হ্যাঁ, কাছেপিঠে পাহাড়ও খুব একটা পেলাম না-সমতল মাটি । কিন্তু সর্বত্রই নানা ধরনের বাবলা গাছের ঝাড়, রাজস্থানের অনেকটা অংশই এখন সবুজ । জলসেচ-ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছে এখানে, তাই মরুভূমিও পিছু হটেছে । এত গাছপালা দেখব বলে আশা করিনি । গরম আছে, কিন্তু খুব দুঃসহ নয় । সেটা অক্টোবরের গোড়ার দিকে, জয়সলমির তো আমাদের কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও উপহার দিল । বোঝো ঠ্যালা, এসেছি মরুভূমির দেশ দেখব বলে, সেখানে কিনা বৃষ্টি! মরুভূমির মানসম্মান আর কিছু রইল না ।

যাই হোক, ইশা মহম্মদ বলে একজন জিপের ড্রাইভার আমাদের দখল করল । সে বিকেলবেলায় নিয়ে যাবে আমাদের সাম নামের সেই জায়গায়, যেটাকে আমেরিকার ওয়েস্টার্ন ছবির ভাষায় আউটপোস্ট-ই বলা চলে । সেখানেই এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বালুকার বিশাল বিশাল ঢেউ, তথাকথিত সাম স্যান্ড ডিউনস । অথবা মানুষের জগৎ গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বালুকা সমুদ্রের ধারে । সেখানেই উঁচু টিলার ওপরে আছে রাজস্থান ট্যুরিজমের কটেজ-একটি গোল বাড়ির মধ্যে তিনটি ঘর । চারপাশে আর কোনও আস্তানা নেই । সেখানে আমরা একটা রাত থাকব, তারপর পরদিন ফিরে আসব । টিলার নিচে যে পথটা জয়সলমির থেকে এসে মরুভূমির পাশ দিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে, তার পাশে চুড়োর

মতো চালায় ঢাকা গোল বেশ কিছু ঝুপড়ি ধরনের দোকান আছে বটে, কিন্তু সে সব দোকান সপরিবারে রাত কাটানোর মতো নয় । শুধু বিকেলবেলায় ট্যুরিস্টরা আসার সময় সেগুলো জেগে জ্যান্ত হয়ে ওঠে, খুব চা তেলেভাজা ইত্যাদি বিক্রি হয় । আবার যেই ট্যুরিস্টরা চলে যায় সেগুলো সার সার গোরস্থানের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ।

কিন্তু আমি আগ বাড়িয়ে এসব কথা বলে ফেলছি কেন, এখনও তো সাম-এ পৌঁছই-নি আমরা । ইশা মহম্মদের সঙ্গে দরদাম ঠিক হল-সে সামে নিয়ে যাবে, রাতে থাকবে সেখানে, পরদিন সকাল দশটা নাগাদ রওনা দিয়ে, আমাদের কোথাও খাইয়ে নিয়ে, একেবারে মালপত্রসুদ্ধ বাস টার্মিনাসে পৌঁছে দেবে । নিজের গাড়ির মতোই প্রায় সুবিধা দিচ্ছে । খাওয়াটা কোনও সমস্যা নয় । রাজবাড়ির কাছে যে বাজারটা আছে তাতে সার সার খাবার দোকান, প্রত্যেকটার মাথার ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে যে সেখানে বঙ্গালী খানা, এমনকী আলুপোস্তও পাওয়া যাবে । প্রত্যেকটাতেই লেখা আছে বাংলায় । একে 'সোনার কেল্লা', তার ওপরে 'আলুপোস্ত'-কোন বাঙালির না মাথা ঘুরে যাবে । এসব দোকানে মাছ-মাংসের ব্যবস্থা নেই-এই যা অসুবিধা । কিন্তু এমন অনেক বাঙালি আছেন যাঁরা আলুপোস্ত পেলে মাছ-মাংসের তোয়াক্কা করেন না, আলুপোস্ত দিয়েই এক-দু থালা ভাত উড়িয়ে দেন । এজন্য কী কন্যাকুমারিকা, কী মাউন্ট আবু-সর্বত্রই বাংলায় 'আলুপোস্ত' লিখে বাঙালিদের পাগল করে দেবার চেষ্টা হয় ।

ইশা মহম্মদ আমাদের বলল যে সে আটশো টাকা নিচ্ছে বটে, কিন্তু সরকারি ব্যবস্থার চেয়ে এ অনেক সস্তা, আর দ্বিতীয়ত, সে আরও দু-চারটে স্পট, যেমন অমর সাগর, লোধুর্বা আর 'ডেজার্ট ভিলেজ' দেখিয়ে নিয়ে যাবে-কোনও সরকারি ট্যুরে সেটি পাওয়া যাবে না । তার কথা যাচাই করবার সুযোগ আমাদের নেই, আর তার ওপর তার কথায় সত্যি একটা আন্তরিক সৌজন্যের সুর ছিল । ফলে আমরা বললাম, ঠিক আছে, তুমিই আমাদের ভবপারের কাণ্ডারি, তুমি কাল চলে এস । ইশা বলল, ঠিক দুটোর সময় আপনারা তৈরি থাকবেন ।

কয়েকশো কিলোমিটার বাবলা গাছের রাজত্ব দেখে এসে আর মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে মরুভূমি দেখব, এ যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না । যাই হোক, দুটোর সময় যাত্রা শুরু হল । পথে বিশাল বিশাল রাজকীয় এবং অত্যাধুনিক হোটেলের বাইরের দৃশ্য দর্শন করে ঢেউখেলানো মাঠের রাস্তা দিয়ে আমাদের জিপ প্রথমে অমর সাগরে এসে পৌঁছল ।

বেড়ানোর বইয়ে বলে 'লেক', আমরা দেখলাম বড়সড় একটি দিঘির মতো । পাশে একটি মন্দির, বাইরে থেকে সে মন্দিরের মাহাত্ম্য কিছু চোখে পড়ল না । আমি নাস্তিক

মানুষ, স্থাপত্য ভাস্কর্য ইত্যাদি আকর্ষণ না থাকলে মন্দিরে সাধারণত পা দিই না, কাজেই কয়েকটি গ্রাম্যবালক এসে মন্দির দর্শনের আমন্ত্রণ জানালেও সে আমন্ত্রণ তত বিচলিত করল না। ওই দিঘিটি বেশ ভালো লাগল অবশ্য, অনেকটা জায়গা জুড়ে টলটলে জল। চারপাশে জনবসতি হয়ে যাওয়ায় তার সীমানার সৌন্দর্য খানিকটা নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এদিকটা খোলা। একজন লোক গোটা তিনেক উট আর ঘোড়া নিয়ে এসে সেই লেকে জল খাওয়াচ্ছে, তাদের বোধহয় শরীরও ধুয়ে দিচ্ছে একটু-সেই দৃশ্যটা দেখে মন্দ লাগল না। ঘোড়াদের দেখেই বুঝলাম এরা কলকাতার ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া নয়, রীতিমতো দশাসই জোয়ান একেকজন, গায়ে জল পড়ার আরামে তারা মাথা ঝাঁকিয়ে নাক দিয়ে নানারকম সুখের শব্দ করছে। উট চড়ে জয়সলমির থেকে সাম চলেছে সাহেব দম্পতি। উঁচু-নিচু মাঠে ম্লান ঘাসের আস্তরণ, কিন্তু এখানে ওখানে, মাঠের মধ্যে মাঝখানে মাঝখানে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো, ফণিমনসা ধরনের গাছের ঝাড় গজিয়েছে, সেগুলো দেখতে অদ্ভুত লাগল। এ আগুন অবশ্য সবুজ আগুন, যেন একেকটা কুণ্ডে একাধিক সবুজ শিখা জ্বেলে জেগে উঠেছে।

আবার মাঠের ভেতর দিয়ে রাস্তা। বিস্ময়ের কথা এই, ওই পথ দিয়ে জলের পাইপও চলেছে পাশাপাশি। কোথাও কোথাও প্রচুর জল জমে আছে, খেতেও জল জমে আছে। মরুভূমি দেখতে এসে এইসব হতাশাজনক দৃশ্য দেখব আশা করিনি। যেতে যেতে আবার দূরে চোখে পড়ল বিশাল জলরাশি ছড়িয়ে আছে দূরে। তা দেখেও মনটা বেশ দমে গেল। মরুভূমির দেশে এসব কী কাণ্ড! যাই হোক, এঁকেবেঁকে পৌঁছে গেলাম প্রাচীন রাজধানী লোদুর্বাতে। সেখানে টিলার ওপরে একটি জৈন মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত উঠলাম, কিন্তু ভেতরে ঢুকলাম না। তবে এর সন্ন্যাসীদের আস্তানা এবং প্রাঙ্গণটি বেশ বড়, আর এঁদের জলসত্রের ঠান্ডা জল খেয়ে বেশ শান্তি হল।

সেখান থেকে নেমে এবার সাম-এর পথ ধরব। ইশা মহম্মদ বলল, ওই পথেই পড়বে 'ডেজার্ট ভিলেজ'। ইশা ইংরিজিতেই নামটা বলল। সেটা আসলে কী জিজ্ঞেস করায় সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসেছি, পৃথিবীর কোনও খবরই রাখি না। আমার মেয়েরাও হাসতে লাগল। তারপর বুঝলাম এই গ্রামটা তৈরি হয়েছিল কল্পনা লাজমির 'রুদালি' ছবির জন্য। তাতে ডিম্পল কাপাডিয়া, রাজবব্বর, রাখী-এইসব সাঙ্ঘাতিক লোকেরা ছিলেন। পুরো গ্রামটাই এখন রয়ে গেছে, তাতে লোকজনও এসে গেছে। ফিল্ম-টিল্ম চুকে গেছে, ডিম্পলরা সব যে-যার ঘরে ফিরে গেছে, এখন পড়ে আছে উটের গাড়ি উঁচিয়ে রাখা, দেওয়ালে মই লাগানো পথের দুধারে সারি সারি মাটির ঘর, আর বালুময় পথ, আর জিপ দেখে দৌড়ে আসার মতো নানা বয়সের

প্রচুর ছেলেমেয়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমাদের জিপ গোঁত্তা খেয়ে সেই গ্রামে ঢুকে পড়ল। একটা গোড়া-বাঁধানো তেঁতুল গাছের তলায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

ও মা, দেখতে দেখতে একটি বালক-বালিকার দল জুটে গেল আমাদের জিপ ঘিরে। আমরা নামতে-না-নামতেই তাদের সানুনয় ডাকাডাকি, চল আমাদের ঘর দেখবে। আমাদের ঘর-গেরস্থালি দেখবে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর সব দেখবে, বারান্দায় বাচ্চাদের বুড়োদের দড়ির দোলনা দেখবে, সব দেখিয়ে দেব। দশটা টাকা দেবে শুধু। আমরা যখন তাদের ঘরকন্না দেখার আমন্ত্রণ অস্বীকার করলাম তখন তারা বলল, তাহলে আমাদের দুটো টাকা দাও-যেন এর মধ্যেই তারা আমাদের যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছে। আমরা এবার একটু নিষ্ঠুর হয়ে বললাম, না টাকা দেব না। তখন তারা মেয়েদের বলল, তোমাদের কাছে টফি নেই, ক্যাডবেরি নেই? আচ্ছা তোমাদের কপালের টিপ এক সেট দাও না আমাদের। ফটো তোলো না আমাদের। সবই মেয়েরা অস্বীকার করায় তারা খুব ক্ষুণ্ণ হল এবং চেঁচামেচির পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিল।

আমার গ্রামটাকে দেখে প্রথম থেকেই বেশ একটু খটকা লেগেছিল। রাজস্থানের কোনও গ্রামে এত চওড়া রাস্তা থাকে না, দুপাশে ঘরবাড়ি এমন সাজানো থাকে না। পুরনো দিনের হলিউডে ওয়েস্টার্ন ছবিতে যেরকম সীমান্ত শহর তৈরি করা হত-দুপাশে দোকান, বাড়ি, কোথাও একটা বার আর হোটেল, তার পাশে পুলিশের থানা-খানিকটা সেইরকম করে একটা আস্ত গ্রাম বানিয়ে তোলা হয়েছে, ফিল্মের ক্যামেরায় কী ভালো আসবে, কোন অ্যাঙ্গল থেকে তাকে ধরা যাবে, পুরোটা যাতে একটা ছবি-ছবি দেখায়-এসব লক্ষ করে। যদিও শুনলাম গ্রামের ভেতরকার অংশটা আগেই ছিল, তবু মনে হল, ফলে এই গ্রামটা হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে, মাটির ভেতরে তার শেকড় তৈরি করেনি। এখানকার মানুষগুলোও যেন ফিল্মের দরকারেই এসে বসেছিল, এখন ফিল্মের ব্যাপারটা চলে যাওয়ায় তাদের আর কিছু করবার নেই। বাচ্চাদের ওই ভিক্ষে করার ছবিটা আমাদের ভালো লাগেনি। আমার মনে পড়ছিল রমাপদ চৌধুরির সেই গল্প 'ভারতবর্ষ'। যাতে আমেরিকান মিলিটারিরা দু-আনার জিনিস দশ টাকায় কিনে একটা পুরো গ্রামকে ভিখারির গ্রামে পরিণত করেছিল। বেশ মন খারাপ করে আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম।

শিগগিরই জিপ সাম-এর মূল রাস্তায় এসে পড়ল। এখানে ছোটখাটো পাহাড় পড়ছে, পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। চাষবাসও হচ্ছে, আবার বাঁদিকে হঠাৎ ভেসে উঠল রুপোলি জলের বিল। আমার মনে পড়ে গেল প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমেরিকার ইউটা রাজ্যে দেখা সেই বিশাল সল্ট লেকের কথা, যার নামে হয়েছে সল্ট লেক সিটি। ইউটাও

খানিকটা মরুভূমি অঞ্চল, তাতে বালুর সঙ্গে সোরা মিশে থাকে, রাস্তার ওপরে সেই সাদা বালু বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, আর বাঁদিকে ভেসে থাকে সল্ট লেকের সেই মৃত জলরাশি, যেখানে কেউ ডুবতে পারে না, চেষ্টা করলেও না । এও কি সেই রুপোলি সোরা মেশানো মৃত হ্রদ, নাকি এ মরীচিকা? এইরকম ভাবতে ভাবতে আমরা পেরিয়ে গেলাম ।

একটু পর থেকেই দেখা গেল, দারুণ সাজগোজ করা সব উট নিয়ে, তার নাকে বাঁধা দড়ি টেনে চলেছে বিশাল রাজস্থানি পাগড়ি-বাঁধা সব মানুষ । তাদের মুখে বেশ গালপাট্টাওয়ালা দাড়ি, কানে আংটির মতো বীরবৌলি, লম্বা হাতা জামার ওপরে জরির নকশা কাটা জ্যাকেট, আর পায়ে চমৎকার অলংকৃত নাগরা জুতো । বৃদ্ধদের প্রায় সকলেরই মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ-যেন মনে হয় এরা সবাই সেই রানাদের আমলের লোক, সেই ইতিহাসের পৃথিবী থেকে এসে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে । ‘এত উট নিয়ে কোথায় চলেছে গো?’ ইশা মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা । ইশা বলল, সব চলেছে ওই সামে । ওখানে বিকেলে একটু পরে ট্যুরিস্টদের মেলা শুরু হয়ে যাবে, তখন সবাই উটে চড়ে ওই মরু-বালিয়াড়ি বা স্যান্ড ডিউনস-এ বেড়াতে যাবে । উট যে মরুভূমির জাহাজ সে তো বাবুসাব জানেনই । আমরা বলি উট হল মরুভূমির জিপগাড়ি । কীভাবে হেলতে-দুলতে জাবর কাটতে কাটতে উঁচু নিচু বালির পাহাড়ে উঠবে সে আপনারা নিজেদের চোখেই দেখবেন একটু পরে ।

‘আচ্ছা, এই উট ভাড়া দেওয়াই কি এদের জীবিকা? কত পায় এরা মাসে? যে সময় ট্যুরিস্ট থাকে না সে সময় কী হয়?’-ইশাকে পরপর প্রশ্ন করলাম ।

ইশা হেসে বলল, ‘না সাব, এদের সক্কলের খেতি-জমি আছে । এরা সকলে বেশ ভালো অবস্থার লোক । খেতি-জমির রোজগার খারাপ নয়, তার ওপর আছে এই উট । উট তো সাহাব সবসময় কাজ করে । উট খেতে লাঙল টানে, শহরে ফসল নিয়ে যাবার গাড়ি টানে, আবার ট্যুরিস্টদের পিঠে চড়ায় । যার দু-তিনটি উট আছে তারা তো ‘রাজা’ । আর তাছাড়া, ইশা একটু মৃদু হেসে বলল, এদিকে বেশ একটু এসমাগলিংও হয় সাব । সেটাও এদের একটা বেওসা ।’

এইসব কথা চলছিল, এমন সময় বিশাল সারেঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ধবধবে ধুতি-জামা, পায়ে নাগরা আর মাথায় লাল পাগড়ি-পরা একটি লোক ইশারা করায় ইশা জিপ থামাল । আমি জিপের সামনে ইশার পাশের সিটে বসেছিলাম, সে এসে কষ্টেসৃষ্টে আমার পাশে বসল । ভাবলাম আমাদের সঙ্গে সাম পর্যন্ত যাবার জন্যই বুঝি উঠেছে, সেখানে গিয়ে পর্যটকদের গানবাজনা শুনিয়ে কিছু রোজগার করবে । আমরা ভুল ভেবেছি দেখলাম । জুত করে বসতে না বসতেই, ওই অসুবিধার মধ্যেই, সে সারেঙ্গি বাজিয়ে কাঁপা-কাঁপা

গলায় মিহি সুরে রাজস্থানি লোকসংগীত ধরল । তার গলা যে খুব মধুর, তা নয় । তবে সারেঙ্গির বাজনার সঙ্গে তার গান, চারপাশে উটের মিছিল, আর মরুভূমির ক্রমশ কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া বিশাল উজ্জ্বল আকাশ-সব মিলিয়ে একটা কাণ্ড তৈরি হল বটে । ফলে সামে আমাদের জিপ থেকে যখন সে নেমে গেল তখন তাকে শিল্পীর সম্মান-দক্ষিণা দিতে আমাদের কোনও আপত্তি হল না ।

কটেজে খুব জলদি করে সুটকেস টুটকেস রেখে আমরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম । কটেজের সহায়ক রাজিন্দার গোটাচারেক গার্ডেন চেয়ার এনে পেতে দিল । আমরা আরাম করে বসে দক্ষিণে তাকিয়েই দেখি, আরে বাঃ । এই তো সেই মরুর সমুদ্র । ঠিক পুরীর সমুদ্রের মতোই বিশাল বিশাল ঢেউ উঠেছে, শুধু এগুলো বালির ঢেউ, আর এগুলো উঠে নেমে এগিয়ে এসে কোথাও আছড়ে পড়ছে না । স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে, যেন কোনও অদৃশ্য ক্যানিউট রাজা লাঠি তুলে তাদের বলেছে, 'ব্যস, এই পর্যন্ত! আরেকটু এগোলেই শাস্তি পাবে!' বালিয়াড়ির ঢেউ চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত, জানি না দিগন্তের ওপারে কী আছে । সেই শান্ত অথচ উত্তাল সমুদ্রের ওপর রোদ ঝিলমিল করছে, আবার পুবদিকের ঢালগুলোতে জমে আছে ছায়া, সেই ছায়া আর আলোর নানা ভাঁজ ভঙ্গিমা দেখেই সারাদিন কাটানো যায় । আমরা, আর কটেজের অন্য দুটি ঘরের আরও দুই পরিবার এইভাবে চেয়ার পেতে বসেছি । একটি মারাঠি এবং একটি বাঙালি পরিবার । দুটিই তিনজনের পরিবার-প্রথমটিতে আছে একটি বছর দুয়েকের শিশু, আর দ্বিতীয়টিতে আছে বছর সতেরো-আঠারোর একটি কিশোরী কন্যা ।

আমাদের কটেজটি একটি টিলায় তা আগেই বলেছি । টিলার নিচে উত্তর দিক থেকে এসে গাড়ির রাস্তা আমাদের টিলাকে ঘিরে আবার পশ্চিমে সোজা চলে গেছে । তারই ধারে, এপারে বেশ কিছু ঝুপড়ি-ঘর, যেখানে পানমশলা থেকে শুরু করে ফুজি ফিল্ম পর্যন্ত বিক্রি হয় । সেই ঘরগুলোর পিছনে খানিকটা খোলা জায়গা, যা শেষ হয়েছে আমাদের টিলার গোড়ায় এসে । সেখানে দেখি এবার জমে গেছে একটা পুষ্কর মেলা । প্রায় শ-খানেকের মতো উট এসে সার সার বসে গেছে, আরও উট আসছে, দুয়েকটি ছুটকো হয়ে বসে বসে কাঁটাগাছ চিবোচ্ছে-কিন্তু উটেরা যেন প্রতীক্ষা করছে সেজেগুজে, এবার তাদের গুণপনার পরীক্ষা হবে । কী হয়, কী হয় গোছের ভাব একটা-সারা সাম উৎকণ্ঠ হয়ে আছে, জীবনানন্দের উটের গ্রীবার কথা মনে করে উদগ্রীবও বলা যায় ।

যা ঘটবার সেটা ঘটল । হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এসে পড়ল ছ-সাতটা ঢাউস দেখতে ট্যুরিস্ট বাস, তাদের গর্ভ থেকে পিলপিল করে নেমে এল অসংখ্য ট্যুরিস্ট । আর কী আশ্চর্য, তাঁরা প্রায় সবাই বাঙালি । তাঁরা দ্রুত দৌড়ে এলেন উটগুলোর কাছে ।

আমাদের টিলাতে এসে চড়লেন একটি দল। নানা বয়সের ছেলেমেয়ে, স্কুলের কিশোর-কিশোরী থেকে তরুণী বউ, জিনস ও টি-শার্ট পরা তাঁদের স্বামী ও দেওরেরা, বৃদ্ধ বাবা-মা। তাঁদের সঙ্গে এসে পৌঁছল ওই সারেঙ্গি, এমনকী হারমোনিয়াম ঝোলানো গায়কের দল। গায়কটি আমাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় বসতেই যাত্রীদের দল তাকে ঘিরে দাঁড়াল, আর 'রুদালি' 'রুদালি' বলে চিৎকার করতে লাগল। গায়ক বেচারা যে 'রুদালি'র গান জানে না, 'রুদালি' দেখেই-নি সে, সেটা অনেকের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হল। তারা হয়তো জানেই না যে, 'রুদালি'তে ভূপেন হাজারিকা সব রাজপুতানার সুর ব্যবহার করেননি, আসামের সুরও ছিল। এ গায়ক বেচারা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বা গুরুর কাছ থেকে যেসব গান শুনে বা শিখে এসেছে তার সঙ্গে 'রুদালি'র কোনও সম্পর্ক নেই। সে রাজস্থানের লোকসঙ্গীত ধরল একটি। তখন সেই ছন্দময় গানটির সঙ্গে তালে তালে হাততালি দিয়ে নাচবার জন্য তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটা বেশ উৎসাহ জেগে উঠল, জিনস, ফ্রক, শালোয়ার কামিজ, শাড়ি, হাউস-কোট-সব হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল-সে একটা দেখার মতো দৃশ্য হল বটে। বিশেষ করে নাইট-গাউন শোভিতা বাঙালি বউরা এখন নানা জায়গায় দেখা দেন, তাতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাড়ে। ওটা যে ঘরে পরে থাকার পোশাক, সেই পুরনো কুসংস্কারে কেউ আটকে থাকতে চান না, ফলে রেস্তোরাঁয়, বাজারে, পথে-ঘাটে-সর্বত্রই বেশ কিছু নাইট-গাউন দেখা যায়। ছেলেরাও ঘুমের জামা-পাজামা পরে পথে বেরোয়। অন্যরা একটু ভুরু কোঁচকায়, তাতে কী এসে যায়। আমাদের প্রতিবেশী মারাঠি দম্পতিই এটা নিয়ে একটু মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন আমাদের কাছে। আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাঙালিরা এত জোরে জোরে কথা বলে কেন বলুন তো!

যাই হোক, এর মধ্যে উটের কলোনিতে কোলাহল পড়ে গেছে। সেই ট্যুরিস্টরা সার বেঁধে উটে চড়ার জন্য দৌড়ে এসেছে, আমাদের ট্যুরিস্টরাও দুটো গান শোনার পর সেদিকে ধেয়ে গেল। উটগুলো পিছনটা উঁচু আর সামনেটা নিচু করে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসছে, আর দুজন দুজন করে উঠে যাচ্ছে উটে। স্ত্রী পিছনে স্বামীর কোমর ধরে, ভাই-বোন, বন্ধুর দল এইভাবে হৈ হৈ করতে করতে উঠে যাচ্ছে। কেউ অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে, কেউ পড়তে পড়তে হাউমাউ করতে করতে কোনওরকমে, তাদের মুখ পাংশু, মনে হয় চূড়ান্ত পেটব্যথা চেপে বসে আছে তারা, আবার অন্যরা বেশ বীরত্বপূর্ণ উজ্জ্বল উৎসুক মুখে উঠে যাচ্ছে। উটগুলো এই নানাবিধ সওয়ার নিয়ে যখন দাঁড়াচ্ছে তখন আরেক প্রস্থ নার্ভাস হৈচৈ-'এই, পড়ে যাব পড়ে যাব' চিৎকার। তারপর সার সার উট বালিয়াড়ির রাস্তা ধরে একেবারে ক্যারাভ্যানের মতো, আবার প্রচুর লোক হেঁটেই চলেছে, সেই মরুভূমি-খণ্ড দেখতে দেখতে জনসমুদ্রের চেহারা নিল।

বলা বাহুল্য, রোমে এলে রোমানদের রীতি মানতে হয়, তাই আমরাও উটে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম । এখানে উটওয়ালাদের ইউনিয়ন মতো কিছু একটা আছে বলে মনে হল । সকলের খেপ-এর নম্বর নির্দিষ্ট, কার উট আগে যাবে, কারটা পরে, ক-বার করে উট ভাড়া দেওয়া যাবে, সবই নির্দিষ্ট । তবে তারই মধ্যে ঝগড়াও হচ্ছে দেখলাম । দুয়েকটি উট একটু দূরে পশ্চিমদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘাস ও কাঁটাগাছ খাচ্ছে, একজন বা বসেই আছে-তাদের দেখলাম এই তুমুল প্রতিযোগিতা, হুল্লোড় ও মানুষের প্রাণপণ মরুদর্শন সম্বন্ধে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই ।

আমরা উটে চড়ে বেশ খানিকটা গেলাম, তাদের বাঁধা রুটে । একটিতে আমি, আরেকটিতে দুই মেয়ে । সে এক মজার অভিযান । ঝড়ের নদীতে নৌকোর মতো ক্ষণে ক্ষণে উঠছি নামছি, চোখের সামনে দিগন্তও উঠছে নামছে, উল্টোদিক থেকে উট এমনভাবে আসছে যে, এই মনে হচ্ছে গায়ে গায়ে লেগে একটা কলিশন হয়ে গেল, তারপরেই খুব দক্ষতায় উটের মালিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে । প্রচুর চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোল, হাসি, ডাকাডাকি, পড়ন্ত আলোয় ঝিলিক ঝিলিক ছবির ফ্ল্যাশ-সে এক বিশাল উৎসবের মতো ।

মনে হল, যেন খুব অবিশ্বাস্যভাবে এক সময় সেই উৎসব থেমে গেল । সন্ধে নামল মরুভূমিতে, সব উট তার সওয়ারি নিয়ে ফিরে এল, অন্ধকারে পায়ে-হাঁটা মরুযাত্রীরাও ফিরল, বিচ্ছিন্ন ঝুপড়িগুলোতে ম্লান বাল্ব জ্বলতে লাগল । কিছুক্ষণ বাসগুলো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল, জনতা দলে দলে ভাগ হয়ে হৈ হৈ চালাল । মরুভূমি দেখা শেষ, মস্ত একটা কাজ করা হয়ে গেছে উটের পিঠে চড়ে-সেটা উদযাপন করা চলল কিছুক্ষণ । তারপর সমস্ত বাস তাদের ট্যুরিস্ট-অভিবাসী নিয়ে একে একে স্টার্ট করে হেডলাইটের দুই বল্লম উঁচিয়ে চলে যেতে লাগল । কোনও একটি ঝুপড়িতে একদল অতি-উৎসাহী খানিকক্ষণ ‘উই শ্যাল ওভার কাম’ ইত্যাদি গেয়ে খানিকক্ষণ শোরগোল জাগিয়ে রাখল । তারপর পশ্চিমে কোথায় একটা হোটেলের পার্টি হচ্ছিল মরুভূমিতে, তার সাজানো আলো আর হৈ-হল্লা, মাইক-নিনাদিত গান-বাজনা চলল খানিকক্ষণ । তারপর নেমে এল এক আশ্চর্য স্তব্ধতা ।

আমরা ফিরে এসে ওই গার্ডেন চেয়ারেই বসেছিলাম আবার । সেখানেই পশ্চিমের ধোঁয়া-ধোঁয়া আকাশে সূর্য ডুবতে দেখলাম । চারপাশের কলরোল থামল, নৈঃশব্দ্য নেমে আসার পর অন্ধকার, আর ওই অন্ধকারে ওপরের দিকে যেই চোখ তুলেছি, দেখি লক্ষ লক্ষ তারা খুব উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে আমাদের দেখছে । এত তারা জীবনে দেখেছি বলে মনে হয় না । সন্ধে নামার পরেই সেই আশ্চর্য ঘটনাও ঘটেছে, ফোঁটা ফোঁটা একটু বৃষ্টিও হয়ে

গেছে। মরুভূমিতে বৃষ্টি-এ দেখার কপাল কজনের হয় জানি না। কিন্তু তাতেই আকাশ একদম ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল, আর নীলিমার অতল অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশ থেকে ভেসে উঠল ঝাঁকে ঝাঁকে তারার দঙ্গল।

এই শান্তিটুকুর জন্যই প্রতীক্ষা ছিল আমাদের। মরুভূমির ঊর্মিল বিস্তার আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা আভা জেগে আছে। এইবার রাত এবং মরুভূমির মুখোমুখি বসে রইলাম আমরা।

পরদিন ভোরে উঠে দেখি একটি নিঃসঙ্গ কুকুর মরুভূমির ওপার থেকে দুলকি চালে মৃদু দৌড়ে এদিকে আসছে। অনেকক্ষণ ধরে বালুর ঢেউয়ের পিঠ ধরে তার এগিয়ে আসা দেখলাম। এই ছবিটি দেখেই, উটের অসংখ্য পদচিহ্ন ধরে রাখা, সেই অনেক কষ্টে প্রকৃতির জাদুঘরে বাঁচিয়ে রাখা, চিত্রিত মরুখণ্ডের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

ঢাকা : একুশ বছর পর

অন্নদাশঙ্কর রায়

হঠাৎ একদিন কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব জাহাঙ্গীর সাদত সাহেব টেলিফোনে জানালেন বিজয় উৎসবের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার আমাকে বিশেষ অতিথি রূপে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করছেন । আমি কি ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা যেতে ও সেখানে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতে রাজি? যাত্রা হবে আকাশপথে ।

এই আমন্ত্রণটির জন্য আমি একুশ বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছি । আমার পণ ছিল আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্মৃতিসৌধ হবে, তারপরে আমি যাব । একুশ বছরেও যা হল না তা কি আদৌ কখনও হবে? এদিকে আমার বয়স বাড়তে বাড়তে বিরানব্বই পার । এ বয়সে কি বিমানযাত্রার ঝুঁকি নেওয়া যায়?

আমি সময় চেয়ে নিই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য । ভেবে দেখি আমার পণ রক্ষা হল কি না । ইতিমধ্যে খবরের কাগজে প্রস্তাব করেছিলাম যে মুজিবরের স্মরণে যেন একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয় । তার নাম হবে 'মুজিব মিনার' । শোনা গেল সেরকম কিছু হবে । তবে মুজিবের নামে আপাতত সম্ভব নয় । এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ।

ডাক্তার মত দিলেন । কিন্তু আমার পুত্রকন্যা নারাজ । তাদের আশঙ্কা ঢাকায় আমাকে নিয়ে যে টানাহ্যাঁচড়া হবে, আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ভালো নয় । আমার ভাই সুব্রত তা শুনে আমাকে অভয় দেয় । সে আমার সঙ্গে যাবে, ও আমাকে সাবধানে রাখবে । মাত্র পঁচিশ মিনিটের বিমানযাত্রা । ঢাকাই তো নিকটতম বিমানবন্দর । ঝুঁকি কিসের, মনের জোরটাই আসল ।

সুব্রত রায় ভারত সরকারের পাবলিক সেক্টরের Bridge and Roof-এর Managing Director । তাকে নানা দেশে ঘুরতে হয় । চট্টগ্রামের একটা কোম্পানি থেকে ঠিক সেই সময় তার আমন্ত্রণ ছিল, সেটা সে আমার খাতিরেই মুলতুবি রাখে । স্টেট গেস্ট হলে একইকালে প্রাইভেট গেস্ট হওয়া যায় না ।

অন্যান্য বার আমার সঙ্গে যেতেন আমার স্ত্রী লীলা রায় । এবার তিনি নেই । কে আমাকে ঠিক সময়ে ঠিক ওষুধটি খাওয়াবে । আমার চোখে ঠিক ড্রপটি দেবে । এইসব

কথা ভেবে আমি আমার বারো বছরের নিত্যসেবক অর্ধেন্দু মাইতিকে সঙ্গে নেওয়া স্থির করি ।

এছাড়া আমার একজন সেক্রেটারির দরকার ছিল । ঢাকায় আমার বহু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব । তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য গৌতম রায়কে সঙ্গে নিতে চাই । বাংলাদেশ সরকার আমার অনুরোধে আমাদের সবাইকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন । তখন আমার আর পিছু হটবার জো থাকে না ।

কিন্তু তা সত্বেও ছেলেমেয়েরা বলে সঙ্গে একজন ডাক্তার নিয়ে যেতে । ডাক্তার বন্ধু ব্যস্ত মানুষ । তিনি যেতে রাজি হন না । কিন্তু একগাদা ওষুধের নাম লিখে দেন । সর্দি, কাশি, জ্বরজারি, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, রক্তের চাপ সব রকম সম্ভবপর আধি-ব্যাধির জন্য একপ্রকার চলন্ত ডাক্তারখানা বহন করতে হল মাত্র চারদিনের সফরে । ফলে ছেলেমেয়েরা শান্ত ।

তবে আমার ভয় ছিল বিমানকে নয় । বিমানবন্দরের সিঁড়িকে । সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গেলে বুকে ব্যথা হতে পারে । সুখের বিষয় দমদমের নবনির্মিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিঁড়ির বদলে হয়েছে এসক্যালেটর । প্রায় সত্তর বছর আগে লন্ডনে প্রথম এসক্যালেটরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঠানামা করেছিলাম । ছড়াও লিখেছিলুম তা নিয়ে । ভয়ের বদলে এল ফুর্তি । সেই যে আমি ফুর্তি করে এসক্যালেটর দিয়ে ওপরে উঠলুম তারপর থেকে ফুর্তি করে বিমানে উড়লুম, ফুর্তি করে চারদিন চার রাত কাটিয়ে দিয়ে ফুর্তি করে ফিরে এলুম । ডাক্তারখানা কোনও কাজে লাগল না । তবে নিত্য নিয়মিত ওষুধ আগেকার মতো খেতুম বা চোখে লাগাতুম বৈকি ।

কিন্তু বিজয় উৎসবের দিন ঠাসা প্রোগ্রাম ছিল তাই আমি দাড়ি কামানো বা স্নান করবার সুযোগ পাইনি । সেকথা পরে ।

চোদ্দই ডিসেম্বর ছিল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস । আত্মসমর্পণের দুদিন আগে পাকিস্তানি হানাদারদের বাঙালি তাঁবেদাররা ঢাকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে । এঁদের মধ্যে আমার চেনা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র মোফেজজল হায়দার চৌধুরী ছিলেন । শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে যে মূল অনুষ্ঠানটি হয় সেখানে যোগ দিতে হলে একদিন আগে ঢাকায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল । কিন্তু সরকার তার ব্যবস্থা না করায় সেই অনুষ্ঠানটির পরেই অবশ্য পৌঁছই ।

বলতে ভুলে গেছি যে এবারকার ঢাকা যাত্রা বাংলাদেশ বিমানে । ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে নয় । খুব ভালো লাগছিল বিমানে বাংলাভাষার ব্যবহার । বিমানটি

যত ছোট হোক না কেন বাঙালি পাইলট ও বিমানবালা তো আমার আপনজন । একটা আত্মীয়তার ভাব অনুভব করি ।

দুপুরবেলায় যাত্রা । ওঁরা লাঞ্চ না দিয়ে একটা প্যাকেট দেন । তাতে কেক-পেস্ট্রির সঙ্গে ছিল এক টিন কোকাকোলা । সে কী! দেশটা কি মার্কিন মুলুক? সেই প্রথম, পরে বার বার মার্কিন প্রভাব লক্ষ করেছি । আমাদের হোটেলটাই তো মার্কিন শেরাটন হোটেলমালার অন্যতম হোটেল । এই আগে ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল । বলা বাহুল্য, ফাইভ স্টার । দশতলায় আমাদের আস্তানা ।

জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে শেরাটন হোটেল পর্যন্ত রাস্তা দেখলে মনে হয় প্যারিসের বুলভার্দে । তেমনই প্রশস্ত, তেমন মসৃণ । রাস্তা দিয়ে প্রাণপণ বেগে ছুটেছে অসংখ্য রিকশা, অগুনতি অটো, অগুনতি মোটরগাড়ি । অটোর ঢাকনায় বিচিত্র বাহার । রিকশারও হরেকরকম সাজ । কলকাতার সঙ্গে মিল বলতে একটাই-ট্র্যাফিক জ্যাম । আশ্চর্যের বিষয় ট্যাক্সি একটাও চোখে পড়ে না । এখানে কলকাতার জিৎ ।

রাস্তার দুধারেই অজস্র বিপণি । আগে তো আমি বাংলা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষার সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন লক্ষ করিনি । এবার দেখছি ইংরিজিও আসরে নেমেছে । আন্তর্জাতিক কারবারের ভাষা ইংরিজি । বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কারবারে অনেক দূর এগিয়েছে । পাশ্চাত্য পোশাক তৈরি করে পাশ্চাত্য দেশে চালান দেয় । আমেরিকাতেও তার খদ্দের রয়েছে । আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এখন সাহিত্য ছেড়ে পোশাক তৈরি করে পাশ্চাত্য দেশে চালান করছেন । শুনছি তাতেই আজকাল সহজে শ্রীবৃদ্ধি হয় ।

আরও অনেকরকম ব্যবসা আছে, তাতেও প্রচুর মুনাফা । দিকে দিকে বহুতল অট্টালিকা । কোনও কোনওটা কলকাতার বহুতল অট্টালিকার চেয়েও উচ্চতর । এসব তো একুশ বছর আগে দেখিনি । এসব রাস্তাও তখন ছিল না । কিংবা থাকলেও এত বেশি নয় । ঢাকার এটা একটা নতুন সংযোজন । বলা যেতে পারে নয়া ঢাকা । এখানে বড়লোকের বসতি । বড়লোকরাও নয়া বড়লোক । কলকাতায় এমন বড়লোক নিশ্চয়ই আছেন । কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বড়লোক নন । ঢাকা এখন যেন City of Palaces, হ্যাঁ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ।

আমার ঢাকা ভ্রমণ এবার নয়া ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ । পুরনো বড়জোর রমনা রেসকোর্স । যার নাম এখন সোহরাবর্দী উদ্যান । খালি মাঠ নয় । বড় বড় গাছপালায় ভরা উপবন ।

বিজয় উৎসবের দিন মূল অনুষ্ঠান হয়েছিল দূরে সাভারে । যেখানে যেতে হলে আমাকে রাত চারটের সময় উঠতে হত । সুব্রত উঠেছিল । তাই ও সাভার ঘুরে এল । আমার ঘুম

ভাঙে দেরিতে । তাই আমার সেখানে যাওয়া হয়নি । পরে ঢাকায় কুচকাওয়াজেও আমি যাইনি । মধ্যাহ্নে সোহরাবর্দী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা স্তম্ভের ভিত্তি পাত করেন । সেসময় আমি তাঁর ভাষণ শুনি । এক বিরাট নেতা তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি করে । জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক ।' একজন বক্তা চমৎকার বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে উল্লেখ করেন আমার কবিতার পংক্তি-

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান ।'

সভাস্থল থেকে যেতে হয় বিদেশমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজে । 'পদ্মা' অতিথিশালায় । সেখান থেকে যেতে হয় বঙ্গভবনে, রাষ্ট্রপতির দেওয়া সংবর্ধনায় যোগ দিতে । সেখান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলাপ হয় । এরপর যাই প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে । সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় । বেগম তাজউদ্দিনের সঙ্গেও ।

তার আগের দিনও একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল । তাঁকে আমার ছড়াসমগ্র দিই । তাতে ছিল তাঁর বাবার সম্বন্ধে ছড়া, অন্য একটিতে ছিল খালেদা ও হাসিনা উভয়ের উল্লেখ ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে মিলিত হই আমরা ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার অতিথিগণ । প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় সহায়তা বা সমর্থন করেন । একজন মার্কিন সাংবাদিক তখনকার রাজনীতির একটি গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করেন । তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল পাকিস্তানি সেনার অত্যাচারের বিবরণ শোনান । সোহরাবর্দী সাহেবের পুত্র রাশেদ এখন ব্রিটিশ নাগরিক । তিনিও এসেছিলেন বিদেশি অতিথি হয়ে । মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রচার করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে । একই পরিবারে দুই মত । দুই মেরু ।

ইতিমধ্যে বিদেশি অতিথি হিসাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় রায়, ভবানী সেনগুপ্ত, মুচকুন্দ দুবে ও পি এন ধার ভারত থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । আমরা চারজন সমেত মোট চব্বিশ জন । মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির প্রকৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয়নি । শেখ হাসিনার বারবার আবেদন ছিল প্রকৃত ইতিহাস লিখতে । আমিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই আবেদন করলুম ।

এই পঁচিশ বছরে বাংলাদেশ সরকারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল সাভারের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ। সেটি না দেখে আমি ফিরতে পারছিলাম না। শেষ দিন সুব্রতর বন্ধু হাসান সাহেবের সৌজন্যে সাভার ঘুরে আসি। যেদিন সরকারি প্রোগ্রাম ছিল না।

সাভার থেকে ফিরেই কলকাতার জন্য সন্ধ্যার প্লেন ধরি। আলো ঝলমল ঢাকা। অন্ধকার গ্রামবাংলা। মনে পড়ছিল, 'পরো দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে', কিন্তু এটা কি পশ্চিমবাংলার বেলায়ও সত্য নয়! ভালো কথা, বিজয় উৎসবের রাতে ঢাকার সর্বাঙ্গ ছিল অপূর্ব আলোকোজ্জ্বল। যতদূর দৃষ্টি যায়।

ভ্রমণ করে খালি হাতে কি কেউ ফেরে? যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম দশ হাজার টাকার ডলার। তা দিয়ে দুই বৌমা, দুই মেয়ে ও এক নাতনির জন্য ঢাকার শাড়ি কিনে আমার ভার অর্ধেন্দুর ওপর দিয়েছিলুম। সে তো ঢাকার কিছু জানে না। তাই সাহায্য নিয়েছিল দাউদ হায়দারের ভাই মাকিদ হায়দারের। ওদের দুজনের পছন্দ এত ভালো হয়েছিল যে শাড়ি পেয়ে সবাই খুশি। শাড়ির চেয়েও মনোহর নকশি কাঁথা। কোথায় পাব, কী করে টাকায় কুলোবে এসব ভেবে পাচ্ছিলুম না। না চাইতেই, না জানাতেই উপহার পেলুম হাসান সাহেবের কাছ থেকে। অনেক দিনের একটা সাধ পূর্ণ হল।

ঢাকার ভাষায় খাওয়াকে বলে খাওন। যাওয়াকে বলে যাওন। খাওনের জন্য যাওন। বিশেষ করে পদ্মার ইলিশের ও কই মাছের। বন্ধুজন নিমন্ত্রণ করে সেসব খাওয়ালেন। সরকারি ভোজেও সুব্যবস্থা ছিল। একটা পার্টিতে দই যা দিয়েছিল তা যেন অমৃত। আরেক জায়গায় পিঠেপুলিও খেয়েছি। এক মেয়েকে বললাম বাখরখানি এনে দিতে পার? সে এনে দিল একরাশ বাখরখানি। সুব্রত কখনও বাখরখানি খায়নি, জানতও না সেটা কী। অর্ধেন্দুর তো স্বপ্নই ছিল পদ্মার ইলিশ।

ওষুধপত্র আমার কোনও কাজে লাগেনি। ডাক্তারখানা বয়ে নিয়ে যাওয়াই সার। তবে একদিন দাড়ি কাটতে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। তখন হোটেলে খবর দিতেই তুলো, ডেটল ইত্যাদি নিয়ে আসে আমার স্যুইটের ভারপ্রাপ্ত তরুণী। 'কী নাম?' 'স্টেলা।' সালওয়ার কামিজ পরা। কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করি, 'স্টেলা? স্টেলা কী'? 'স্টেলা বিশ্বাস। আমরা খিস্ট্রান'। কিন্তু সৈকত চৌধুরী নামক লেখকটি যে কী তা সাহস করে শুধাইনি। একটু কৌশলে প্রশ্ন করি, 'তোমার বাড়ি তো চাঁদপুরে'। উত্তর পাই 'জি'। জানলুম যা জানার কৌতূহল ছিল।

ভ্রমণ মার্চ, ১৯৯৭

ফোকসোমদো হ্রদ

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আমাদের যাত্রা এক আশ্চর্য হ্রদের উদ্দেশে । নাম তার ফোকসোমদো । শুনেছি, নীলকান্ত মণির মতো তার রং । নেপালের পশ্চিমপ্রান্তে এককোণে পড়ে থাকা দুর্গম দোলপো উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ফোকসোমদো হ্রদ । এই দোলপো উপত্যকার উত্তরে তিব্বত তথা চিন, পূর্বে কালীগণ্ডকী অঞ্চল, দক্ষিণে ধৌলাগিরি গিরিশিরা ও পশ্চিমে কাঞ্জিরোবা হিমল । দোলপোর মোট ১,৩০০ বর্গমাইল পরিব্যাপ্তির মধ্যে শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটিতেই সবাই যেতে পারেন । বাকি অঞ্চলগুলোতে যাবার জন্য বিস্তর সরকারি বাধা-নিষেধ আছে ।

নেপালগঞ্জের রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমাদের সব পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে গেল । সকাল দশটায় কাউন্টার খুলবে ও জুমলাগামী ১৮ সিটের ছোট প্লেনের টিকিট দেওয়া হবে । কাউন্টারের সামনে তখন নিদেনপক্ষে শ-দুয়েক লোকের জটলা । কেউ চালের ব্যবসায়ী, কেউ গবাদি পশুর ব্যাপারী, কেউবা শুধু এক বস্তা নুন নিয়ে যাবার জন্য জুমলা থেকে নেপালগঞ্জ এসেছে, কাজ সেরে আবার ফিরে যাবে জুমলায় । নেপালগঞ্জ ও জুমলার সংযোগরক্ষাকারী মাধ্যম বলতে শুধু এই টুইন অটার বিমানগুলো । এই পরিস্থিতিতে টিকিট পাওয়ার কোনও আশা নেই দেখে বুকিং অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম । তিনি বললেন, ঘণ্টাখানেক পরে আসুন । দুরু দুরু বক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা এবং অতঃপর বিমানের আসন লাভ ।

দুপুর ঠিক বারোটা পঁচিশ মিনিটে আমাদের প্লেন নেপালগঞ্জের মাটি ছেড়ে আকাশে ডানা মেলল । মাত্র ৩৫ মিনিটের উড়ান । যাত্রীরা সবাই দেহাতি জুমলাবাসী । সঙ্গের মালপত্রের ওজনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় (২৫ কিলোগ্রাম জনপ্রতি) সবাই সমস্ত গরম জামাকাপড় গায়ে পরে নিয়েছে । সময়টা অক্টোবর মাসের প্রথমদিক । প্লেনের ছোট জানলা দিয়ে বাইরের কৃষ্ণনীল আকাশে মেঘের আনাগোনা । ঠিক ১টায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন জুমলার (২,৩৪০ মিটার) মাটি স্পর্শ করে । এত কম সময়ের মধ্যে চারপাশের পরিবেশ অদ্ভুত পাল্টে যাওয়াতে বেশ হতচকিত হয়ে যাই । চারপাশে বড় বড় সবুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি ছোট মাঠই এয়ারপোর্ট । অদূরে ছোট ছোট কাঁচা ঘরবাড়ি ।

তারই একপাশ দিয়ে স্রোতস্বিনী তিলা নদী বয়ে চলেছে। দুপাশে হরেকরকম সবজির খেত-খামারি। তবে ধানেরই প্রাধান্য বেশি। প্লেনেই জুমলার একটি অল্পবয়স্ক ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ও আমাদের ওর চেনা একজনের বাড়িতে একটি ঘরের বন্দোবস্ত করে দেয় এবং সন্ধ্যায় একজন মালবাহককে সঙ্গে করে নিয়ে আসার কথা দিয়ে চলে যায়। ঘরে মালপত্র রেখে জুমলার বাজার দেখতে বেরোই। বেশকিছু দোকানপাট, প্রাথমিক স্কুল ও কিছু সরকারি অফিস নজরে পড়ে কিন্তু সবকিছুতেই দারিদ্রের ছাপ। লোকজনের জীবনধারণের মান বেশ নিচু হওয়া সত্ত্বেও মানসিক স্বাস্থ্য বেশ অটুট। সবারই মুখে হাসি লেগে আছে। সারাদিন মাঠে মাঠে ঘাম ঝরিয়ে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে মৌতাতে ডুবে যায় গোটা গ্রাম। পশ্চিমে পাত্রাসী গিরিশিরার কোন অজানা তুষারশৃঙ্গের ওপর গোধূলির আলো এক রক্তিম আলপনা এঁকে দেয়। অন্ধকার নেমে এলে টর্চ নিয়ে বাজারে যাই পদযাত্রার কদিনের রসদ কেনবার জন্য।

১১ অক্টোবর, ১৯৯৮। বেরোতে বেরোতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তিলা নদীর ধার দিয়ে পথ। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর প্রথম গ্রাম দেপলগাঁও। গোটাচারেক মাটির ঘর নিয়েই গ্রাম। বাড়িগুলোর রং অর্ধেক গেরুয়া ও অর্ধেক সাদা, দেখেই বোঝা যায় এরা সব ছেত্রী সম্প্রদায়ের মানুষ। আমাদের গাইড দত্তবাহাদুরের বাড়ি এই গ্রামেই। ও এক ফাঁকে ওর ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসে। তিলা নদীর অপর পারে মাঝে মধ্যেই ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ে। গোটা জুমলা উপত্যকাটি বিখ্যাত রেড রাইসের জন্য। তবে তার দাম অত্যন্ত বেশি। দত্তবাহাদুরের কাছ থেকে জানা গেল বিশেষভাবে উৎপন্ন এই চাল বিদেশে রপ্তানি হয় আর নেপালের রাজপরিবারের রসুইখানায় চালান হয়। অর্থাৎ এই চাল সাধারণের জন্য নয়। আজ আকাশ একদম মেঘশূন্য। নদীর জলেও একটা নীলচে আভা লেগেছে। দুপুরের রোদ্দুরের তাত বেশ গায়ে লাগছে। নদীর ধারে একটি গাছের শীতল ছায়ায় বসে সঙ্গে আনা শুকনো খাবার দিয়ে আহার সারা হয়। মিনিট পনেরো বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। সন্ধে নাগাদ গজরানকোটে প্রথম রাত্রিবাস। চারপাশে ধানখেত থাকায় একটি বাড়ির ছাদে তাঁবু ফেলা হয়। এ অঞ্চলের বাড়ির ছাদগুলি সব কাঠ আর মাটি দিয়ে তৈরি হওয়াতে তাঁবু খাটাতে কোনও অসুবিধে হয় না। প্রথমদিনের হাঁটার দরুন গায়ে-হাতে বেশ ব্যথা। নিচের বাড়ির দিদির হাতে তৈরি রুটি ও আধসেদ্ধ আলুর তরকারি দিয়ে নৈশাহার সেরে সোজা স্লিপিং ব্যাগে।

পরদিন খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ি। মিনিট পনেরো হাঁটতেই গ্রাম শেষ। গ্রামেরই এক বাড়ির উঠোনের গাছ থেকে আপেল পাওয়া গেল ১ টাকা করে। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় এই জুমলা উপত্যকার আপেল। তিলা নদীর তীর ধরে সবুজ গালচে বিছোনো পথ। পথ ক্রমশ সরু হয়ে উঠেছে একটি ছোট পাসের মাথায়। জানতে পারলাম এর

নাম পাতিয়াতা পাস (২৮৩০ মিটার) । ছোট ছোট পাথর দিয়ে সাজানো পাসের মাথা থেকে সামনের দিকে তাকিয়ে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল । সবুজ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে অনেকটা আলপনার মতো বাপিলা খোলা তার অজস্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে । মন্ত্রমুগ্ধের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এলাম নিচে । প্রকৃতির কোলে এই মনোরম উদ্যানের নাম গোথিচর (২,৭৬০ মিটার) । একটি সরকারি ভেড়া প্রজননকেন্দ্র আছে এখানে । তারই অফিস ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের থাকার দুয়েকটি ঘরবাড়ি । আজ মধ্যাহ্নের বিরতি এখানেই । একটি মনোমত জায়গা বেছে নিয়ে দত্তবাহাদুর স্টোভ জ্বালায় । আমরাও সটান শুয়ে পড়ি সবুজ গালিচার ওপর । পশ্চিমদিকের পাহাড়ের ওপর দিয়ে চাঁদ তখনও দৃশ্যমান । ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়ে আবার পথে । এবার বেশ ঘন জঙ্গল । ঘণ্টাখানেক পর জঙ্গল বেশ হালকা হয়ে আসে । একটি কাঠের পুল পেরিয়ে তিলা নদীর ডানতীরে চলে আসি আমরা । প্রথম চেকপোস্টের নাম মণিসাঙ্গু । কর্তব্যরত প্রহরী আমাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিতে বলে । তিলা নদীর এখানে নাম চুরতা খোলা । পথ চলতে চলতে অজস্র পাখির ডাক । সন্ধে নাগাদ পৌঁছই চোত্রা (৩,০১০ মিটার) । এই চোত্রা গ্রামের লোকজন প্রধানত পূর্ব তিব্বতের খাম অঞ্চল থেকে আসা খাম্পা সম্প্রদায়ের অধিবাসী । বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় এদের সকলের বাড়ির সামনে চোর্তেন ও প্রার্থনা পতাকা । নৃতত্ত্ববিদেরা অবশ্য এদের মাতওয়ালি ছেত্রী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন যাদের বংশানুক্রমিক উৎস ছিল ভারতের কুমায়ুন হিমালয়ে । আজ আমাদের দ্বিতীয় রাত্রিবাস এখানে । একটি বাড়ির উঠোনে তাঁবু ফেলা হয় । আশপাশের ঘর থেকে দুয়েকজন গল্প করতে আসে ।

পরদিন প্রায় কাকভোরে বেরিয়ে পড়ি । আজ আমাদের অতিক্রম করতে হবে মৌরিয়া লগনা, লগনা মানে গিরিবর্ত্ম । উচ্চতা ৩,৮২০ মিটার । ঘণ্টাদুয়েক মৃদু চড়াইয়ের পর একটি গিরিশিরা দিয়ে ঘেরা জায়গায় চলে আসি । চতুর্দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে জঙ্গল । ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ থেকে পাইন, দেবদারু ও ভুজ গাছও রয়েছে । নানারকম পর্ণমোচী গাছগাছালির ভেতর দিয়ে হেঁটে পৌঁছই মৌরিয়া গিরিবর্ত্মের ঠিক নিচে । ঝকঝকে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে আমাদের গন্তব্য পাসটিকে দেখতে পাই । পথে এক জায়গায় দুপুরের আহারপর্ব সেরে নিয়েই আবার পথে নামি । চড়াইয়ের প্রকৃতি ক্রমশ তীব্র হতে থাকে । বেশ খানিকটা উঠে এলে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূরে ধৌলাগিরি গিরিশ্রেণীর পাহাড়গুলো একটু স্পষ্ট হয় । ঘণ্টাদুই একটানা ওঠার পর উঠে আসি মৌরিয়া গিরিবর্ত্মের মাথায় । এর অবস্থান ঠিক কর্নালি ও ভেরি নদীর জল বিভাজিকা গিরিশিরার ওপর । পাসের ওপর দাঁড়িয়ে উত্তরে গুতুম্বা (৫,৬০৮ মিটার) ও মাতাতুম্বা (৫,৭৬৭ মিটার) শৃঙ্গদ্বয়ের দৃশ্য আমাদের চড়াই অতিক্রমের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয় । পাসের মাথায়

রাখা পাথরের স্তূপের ওপর লজেন্স রেখে প্রার্থনা সেরে নিই। আজ মন খুশিতে ভরপুর, কেননা আমরা আজ প্রবেশ করব আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দোলপো উপত্যকায়। পাহাড়ের ঢাল ধরে একটানা নেমে চলা ও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়া। পশ্চিমে ভালু হিমলের ওপর সূর্যের শেষ কিরণ এক করুণ সুর সৃষ্টি করে। এরইমধ্যে একটি প্রশস্ত ঢাল পেয়ে তার ওপর রাত্রিবাসের আয়োজন করা হয়। তাঁবু ফেলার পর খেয়াল করি আশপাশের জঙ্গলে কতকগুলি ভেড়াওয়ালাদের ঝুপড়ি রয়েছে। আমাদের দেখে তাদেরই ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসে। ওরা এর আগে কোনওদিন তাঁবু দেখেনি। তাঁবুর ফ্ল্যাপের ভেতর উঁকি দিয়ে আমাদের অস্থায়ী সংসারের খবর নিতে চায়। এরই মধ্যে একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে গিয়ে বাটিতে করে কী যেন নিয়ে এসে আমাদের দেয়। তাকিয়ে দেখি একবাটি সদ্য প্রস্তুত ছানা। আমাদের আনন্দ দেখে ওরাও খুব খুশি। ওদের গোটাকতক ছবি তুলে দিই। হৈ-চৈ করতে করতে ওরা চলে যায়। আমরা মোটামুটি ৩,৫০০ মিটার উচ্চতায় আছি তাই রাতে বেজায় ঠান্ডা। পরদিন সকালে উঠে দেখি তাঁবুর আউটারে বরফকুচির আস্তরণ। শরীর ক্লান্ত থাকায় একটু দেরিতে বেরনো হয়। উতরাই পথ বলে বেশ জোরেই পা চালাই। পাসের এদিককার পাহাড়গুলো রুক্ষ। তারই মধ্যে ছোট ছোট রংবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। দুপুর নাগাদ দেখি কয়েকজন বয়স্ক লোক উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছেন। বুঝলাম আমরা চৌরিকোট গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি। খুব সুন্দর গ্রাম এই চৌরিকোট। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে ছবির মতো সুন্দর ঘরবাড়ি। লোকজন সবাই কৃষিনির্ভর। তাই দুপুরে গ্রাম একদম সুনসান। চৌরিকোট গ্রামের শেষপ্রান্তে একটি সুন্দর পাহাড়ি বাঁক আছে। বাঁকটা পেরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অপূর্ব দৃশ্য। পুব আকাশের নীল প্রেক্ষাপটে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে কাগমারা শৃঙ্গ (৬,৭০৫ মিটার)। পথ এখানে প্রায় সমতল। চতুর্দিকের সবুজ, নীল রঙের মধ্যে গা ডুবিয়ে আমরা পথ চলতে থাকি। আকাশে আজ অলক মেঘের আনাগোনা। রিমি ও মাঝগাঁও নামের দুটি গ্রাম পেরিয়ে যাই। বহুদূরে নিচে ভেরি নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ নজরে আসে। ওরই তীরে আছে কাইগাঁও গ্রাম। কাইগাঁও পৌঁছতে প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। আজ আর তাঁবুতে থাকার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে রাতের আশ্রয় নিই। এই কাইগাঁও থেকে দুভাবে ফোকসোমদো তাল যাওয়া যায়। একটি রাস্তা ভেরি নদীকে ডানদিকে রেখে সোজা চলে গেছে হরিকোট, তৈজাম হয়ে কাগমারা লা (৫,১১৫ মিটার) অতিক্রম করে ফোকসোমদো তালের দিকে। এই পথটিতে যেতে সরকারি বিধি-নিষেধ আছে। অন্যপথটি ভেরি নদীকে বাঁদিকে রেখে সোজা উঠে এসেছে আরও একটি গিরিবর্ত্মের মাথায় এবং বালাংরা নামের গিরিবর্ত্মটি সবার জন্য উন্মুক্ত। পরদিন প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক চড়াই ভেঙে উঠে আসি বালাংরা গিরিবর্ত্মের (৩,৭৬০ মিটার) মাথায়। চড়াই পথে পড়ে প্রচুর রডোড্রেনডন গাছের জঙ্গল। এপ্রিল-মে মাসে এই

জঙ্গলের রূপ কল্পনা করে শিহরিত হলাম । অথচ এখন সমগ্র বনাঞ্চল তৈরি হয়ে আছে আগামী শীতের তুষারের প্রতীক্ষায় । পাসের মাথায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার নামতে শুরু করি । প্রায় সত্তর ডিগ্রি ঢালের উতরাই পথ এঁকেবেঁকে নেমে গেছে ঘোড়াখোর গ্রামের দিকে । হাঁটুর প্রায় দফারফা করে যখন ঘোড়াখোর পৌঁছই তখন শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত । একটি চায়ের দোকানে চায়ের কথা বলে দোকানেরই ছাদে তাঁবু টাঙিয়ে ফেলি ।

পরদিন আমাদের থুলো ভেরি উপত্যকায় প্রবেশ করার কথা । স্থানীয় ভাষায় থুলো মানে বড় । ভেরি নদীর কলেবর এখানে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই বোধহয় তার এই বিশেষণ । নদীকে বাঁয়ে রেখে ঘন সিলভার পাইনের বনের মধ্য দিয়ে চড়াই-উতরাই পথ । উল্টোদিক থেকে একপাল ইয়াক নিয়ে কয়েকজনকে আসতে দেখি । আমাদের দেখে ইয়াকগুলি দাঁড়িয়ে পড়ে । আজ আকাশের মুখ ভার । একে মেঘলা আবহাওয়া তদুপরি ঝোড়ো হাওয়া । কতদূর যেতে পারব কে জানে । তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দুপুর নাগাদ টিবরিকোট গ্রাম । গ্রামে ঢোকার মুখে আবার পুলিশ চেকপোস্ট । যথারীতি নাম-ঠিকানা লিখে দিতে হয় । টিবরিকোটে দোলপো জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা আসে এখানকার সদা জাগ্রত ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর মন্দিরে পুজো দেবার জন্য । নদীর অপর পারে পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে ধান গাছের সারির ওপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাওয়া দেখতে ভারি ভালো লাগে । ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর কালাগৌরা (২,০৫০ মিটার) । চারদিক কালো হয়ে এসেছে । বৃষ্টির ফোঁটার আয়তনও একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে । উপায়ান্তর না দেখে একটি বাড়ি কাম হোটেলে রাতের আশ্রয় নিই ।

পরদিন দু-ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে যাই দোলপো জেলার সদর দুনাই (২,০৯০ মিটার) । গ্রামে ঢোকার মুখে একটি সুন্দর গেট আমাদের অভ্যর্থনা জানায় । বেশ বড় জায়গা এই দুনাই । স্কুল, অফিস, থানা এমনকী একটা ওয়্যারলেস স্টেশনও দেখলাম । গ্রামের ঠিক মাঝখানে নেপালের প্রাক্তন রাজা মহেন্দ্রর একটি প্রস্তরমূর্তি । তার চারপাশের পাথর বাঁধানো চাতালে খেলে বেড়াচ্ছে দোলপোর শিশুরা । বেশভূষায় হতদরিদ্র কিন্তু উচ্ছলতায় ভরপুর । এখান থেকে আমাদের রেশন নতুন করে নিতে হবে পরবর্তী পর্যায়ের পদযাত্রার জন্য । সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আবার যখন পথে নামি তখন বেলা প্রায় বারোটা ।

আমরা দুনাই এসেছি থুলো ভেরিকে বাঁদিকে রেখে । এবারে নদীকে অতিক্রম করে আমাদের ধরতে হবে অপর পাড়ের সরু পায়ে চলা পথটি, যেটি ক্রমাগত উত্তরদিকে চলে গেছে একটি গিরিখাদের মধ্য দিয়ে । এই গিরিখাদ দিয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে নেমে এসেছে ফোকসোমদো খোলা এবং দুনাইয়ের অদূরে ভেরি নদীতে এসে মিশেছে । মিলিটারি

ক্যাম্পকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলি । কিছুদূর এগোতেই আবার একটি চেকপোস্ট । চেকপোস্ট পেরিয়েই একটি ছোট ব্রিজের ওপর দিয়ে ফোকসোমদো খোলাকে পেরিয়ে গেলাম । যতই এগোচ্ছি জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে চড়াইয়ের ঢাল । কতদূর এগনো সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না । টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । সেইসঙ্গে হাড়কাঁপানো বাতাস । বেলা তিনটে নাগাদ জঙ্গলের মধ্যে একটি গবাদি পশু রাখার চালা দেখতে পেয়ে তার নিচে খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম । আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন গোটা আকাশটা জঙ্গলের ওপর ভেঙে পড়ল । চালার নিচে ততক্ষণে আমাদের তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছে । পাহাড়ের একপাশে পাথরের একটু আড়াল পেয়ে দত্তবাহাদুর চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে । ঠান্ডা বাতাসের দাপটে শরীর হিম হয়ে যাবার জোগাড় । এক মগ গরম চা গলাধঃকরণ করে একটু ধাতস্থ হলাম । তারপর চলল প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা । দুদিন দুরাত আমরা তাঁবুবন্দী হয়ে রইলাম । নানা আশঙ্কা নিয়ে তৃতীয়দিনের ভোরে তাঁবু থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি আকাশে আবার নীলচে আভা লেগেছে । সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু গুটিয়ে আবার পথে । দুদিনের প্রবল বর্ষণে পথের অবস্থা শোচনীয় । খানিকক্ষণ বাদেই শুরু হল আখরোট গাছের জঙ্গল । অজস্র আখরোট ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে । দুপুর নাগাদ পৌঁছই ছেপকা (২,৬৫০ মিটার) । জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র দোতলা ঘর । বেলা তিনটে নাগাদ জঙ্গল একটু যেন হালকা হয়ে আসে । ফোকসোমদো খোলার এখন ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি । তার গর্জন বহু ওপর থেকে শুনতে পাই । পথ ক্রমশ নেমে আসে নদীর ধারে । দূরে রিয়াজি গ্রামের (২,৯৫০ মিটার) চালাগুলো দেখা যায় । আজকের চলার ওখানেই ইতি ।

১৮ অক্টোবর, ১৯৯৮ । আমার হিমালয় পদযাত্রার দিনগুলির মধ্যে এমন সুন্দর সকাল বোধহয় আর আসেনি । তাঁবুর ফ্ল্যাপ খুলতেই এক চিলতে সোনালি রোদ্দুর আমাদের উষ্ণতায় ভরিয়ে দেয় । চারদিক অসম্ভব ঝকঝকে । সদ্য ধুয়ে যাওয়া গাছের সবুজ পাতাগুলি থেকে আকাশের নীল রং যেন চুঁইয়ে পড়ছে । তাড়াতাড়ি পথে নেমে পড়ি । গত দুদিন গর্জের মধ্য দিয়ে হাঁটার পর উপত্যকাটি আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে । গাছের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে । বড় বড় মহীরুহের পরিবর্তে ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় গাছে লাল, হলুদ নানারকম ফুল থোকায় থোকায় ফুটে রয়েছে । ঘণ্টাদুই চলার পর পৌঁছে যাই পালাম (৩,২৩০ মিটার) । এখানেই স্য-ফোকসোমদো ন্যাশনাল পার্কের চেকপোস্ট । শেষবারের মতো নাম-ঠিকানা লেখা । পালাম থেকে বেরিয়েই ঝুরো পাথর বেয়ে তীব্র চড়াই । উঠে এলাম একটি ছোট গিরিশিরার মাথায় । সেই প্রথম দেখা । দূরে দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা কাঞ্জিরোবা শৃঙ্গ (৬,৮৮৩ মিটার) ও তার নিচে একটি নীল রঙের ধাতব শীট । বহু নিচে দেখা যাচ্ছে সুলিগাড জলপ্রপাতের জল আছড়ে পড়ছে ৩৩০ মিটার নিচে । জোরে হাঁটলে এখনও এক ঘণ্টার পথ । বেশ খানিকক্ষণ পর রিংমো গ্রামের প্রবেশদ্বারের

চোর্তেনটি দেখা যায় । একটি সুন্দর কাঠের পুল পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করি । লোকজন কেউ কোথাও নেই ।

অবশেষে পৌঁছলাম সেই অপরূপের দেশে । কোনও কথা বলতে পারছি না । সৌন্দর্য সম্বন্ধে সব পূর্ব ধারণা ভেঙে চুরমার । অপার্থিব সৌন্দর্যের আধার হয়ে ফোকসোমদো তাল আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় ।

ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টে যাচ্ছে । কখনও নীলচে সবুজ, কখনও ঘন নীল, কখনও বা ময়ূরপঙ্খী । চরাচর অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ । সন্তর্পণে নেমে আসি সরোবরের তীরে । বাতাসে তীব্রতা, হ্রদের জলের কিনারায় ছোট ছোট ঢেউ । তার ওপর সূর্যকিরণ পড়ে ঝিকমিক করছে । লেকের পাশেই তাঁবু ফেলা হয় । ধীরে ধীরে দিনের আলো কমে আসে । তাঁবুতে ফিরে যেতে মন চায় না ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,০০০ মিটার উচ্চতায় দৈর্ঘে, ৪.৮ কিলোমিটার ও প্রস্থে মোটামুটি ১.৮ কিলোমিটার নিয়ে এই ফোকসোমদো তাল । পরদিন সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আবার হতবাক হবার পালা । সূর্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোকসোমদোর জলে নীল রঙের বন্যা । তালের পূর্ব পার ধরে সরু হাঁটাপথে এগিয়ে গিয়ে বহু প্রাচীন বন-পো সম্প্রদায়ের গুম্ভাটি দেখে আসি । আবার ফিরে আসা হ্রদের তীরে, এবারে পশ্চিম তীর বরাবর । সারাদিন ধরে হ্রদকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেও আশ মেটে না ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে ট্রেনে লখনউ ও ওখান থেকে বাসে বা জিপে রূপাইডিয়া । সীমানা পেরলেই নেপালের শহর নেপালগঞ্জ । ওখান থেকে ছোট প্লেনে চেপে জুমলা । ভাড়া ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫০ টাকা । ফেরার সময় ফোকসোমদো তাল থেকে দুদিনে দুনাই ফিরে অদূরে জুফল এয়ারপোর্ট থেকে ছোট প্লেনে নেপালগঞ্জ ফিরতে হয় । ভাড়া একইরকম ।

দরকারি টুকিটাকি: নেপাল বিদেশি রাষ্ট্র বলে সচিত্র পরিচয়পত্র সর্বদা সঙ্গে রাখতে হবে । চাল, ডাল সবই জুমলা ও দুনাইয়ে পাওয়া যাবে । সঙ্গে স্টোভ, তাঁবু নেওয়া একান্ত প্রয়োজন । প্রয়োজনে কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে রাখলে ভালো ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৯

ইন্টারলাকেন থেকে ইয়ুংফ্রাউ

মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সম্মিলিত হর্ষধ্বনি, তারপর সব চুপচাপ। শুধু হাজারখানেক মানুষের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। জাপানি যে দলগুলো এতক্ষণ কিচিরমিচির করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল তারাও বাকহীন হয়ে পড়েছে। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই বরফ, কোথাও তুষার-ধবল শৃঙ্গের আকারে, কোথাও তা বরফের নদী হয়ে বয়ে চলেছে, কোথাও মাখন-মসৃণ বরফের প্রান্তর, কোথাও ঢেউ খেলানো সমুদ্র। ঘাড় ঘুরিয়ে যেদিকেই তাকান না কেন শুধু বরফ রাশি রাশি, পুরো দিগন্তব্যাপী এই সাম্রাজ্য বিস্তার দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হওয়ারই কথা!

আমরা এসেছি ইয়ুংফ্রাউ। আল্পসের অন্যতম বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ। সেন্ট্রাল সুইজারল্যান্ড বা বার্নিস ওবারল্যান্ড রিজিয়নে রয়েছে তিন বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ আইগার, মঞ্চ ও ইয়ুংফ্রাউ। এই ত্রিমূর্তি তাদের সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে যুগ যুগ ধরে পর্বতারোহী ও প্রকৃতিপ্রেমিকদের আকর্ষণ করে চলেছে। এতটাই প্রবল তার আকর্ষণ-শক্তি যে ৩৪৫৪ মিটার উচ্চতাকে তুচ্ছ করে এখানে তৈরি হয়েছে ইউরোপের সর্বোচ্চ রেলস্টেশনটি, পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় সামলানোর জন্য। এই যাত্রাপথও অতীব সুন্দর, তবে তা পরের কথা। এখন শুধু দেখার পালা-সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার পালা।

ঝকঝকে নীল আকাশ! এত পরিষ্কার ঘন নীল রং দেখিনি কোনওদিন। আর শুভ্রতার এই ঝলক! রোদ্দুর পড়ে যেন আগুন জ্বলছে! বিস্ময়ের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এবার মুহুর্মুহু শাটার টিপে চলেছি সবাই। বিশেষণেও প্রকাশ করা যাবে না এর রূপকথা। এ যে বর্ণনারও অতীত। তবু সাহস করে কলম ধরেছি যাতে ভ্রমণ-এর পাঠক-পাঠিকাদের মানসভ্রমণের রসদ জোগাতে পারি।

গতকাল এসে পৌঁছেছি ইন্টারলাকেন। তারও বহু আগে সফর শুরু। কলকাতা থেকে মুম্বই হয়ে লন্ডন ঘুরে জুরিখ, জুরিখ থেকে বার্ন। বার্ন থেকে ট্রেন পাল্টিয়ে ইন্টারলাকেন পৌঁছেছি ৪টে নাগাদ।

জুরিখ থেকে ট্রেন ধরেছি সকাল ১০টা নাগাদ। সারা রাস্তায় প্রকৃতির নজরকাড়া রূপ দেখতে দেখতে ইন্টারলাকেনে এসে মোহিত হয়ে গেছি। ইন্টারলাকেন নামের তাৎপর্যই

হল দুটো লেকের মধ্যবর্তী অংশ। এর এক পাশে টুনার সি আরেক দিকে ব্রায়েনজার সি, সি মানে এখানে হ্রদ। মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটা খাল বয়ে চলেছে যা সংযোগ স্থাপন করেছে দুপাশে। আর ইন্টারলাকেনের ছোট্ট শান্ত জনপদটি গড়ে উঠেছে এই সংযোগস্থাপনকারী খালটির দুপাশে। ইন্টারলাকেন ওয়েস্ট আর ইন্টারলাকেন ইস্ট (সুইস ভাষায় অস্ট)-এর দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার। হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে ভারি মজা লাগে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে ইন্টারলাকেন থেকেই দেখা যায় আইগার, মঞ্চ আর ইয়ুংফ্রাউ। ইন্টারলাকেন থেকে অনেকগুলো মাউন্টেন রেঞ্জে যাওয়া যায়। প্রত্যেকটিই ছবির মতো সুন্দর তাই ইউরোপের প্রতিটি বড় শহর থেকে এখানে রেলপথে আসা যায়।

ইন্টারলাকেন পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই টুনার সি আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। লেকের পাল তোলা নৌকাগুলো তর তর করে এগিয়ে চলেছে। ধবধবে সাদা রাজহংসীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে লেকের পাড়ে। সন্ধে হব-হব। এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা। দূরে বহু দূরে লেকের কিনার ঘেঁসে সবজে-নীল পাহাড়েরা দাঁড়িয়ে।

ট্রেন চলেছে লেকের একেবারে পাশ দিয়ে। লেককে অনেকটা বেড় দিয়ে তবে স্টেশন। আমরা তাই প্রাণভরে উপভোগ করছি এই রেলভ্রমণ। এবারে একপাশে সবুজ মখমল ঘাসের উপত্যকা। তাতে ইতস্তত তৃণভোজনরত গাভীর দল। গলায় তাদের বিশাল কাঠের ঘণ্টা, নড়াচড়াতে আওয়াজ উঠছে ঠুন, ঠুন, ঠুন। পরে জেনেছি, এই ঘণ্টার আওয়াজেই মেষপালকরা তাদের দলছুটকে খুঁজে পায় সহজেই।

ট্রেনের জানলাগুলো পুরো কাচের। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। ভাবলাম কাচের মধ্যে দিয়ে কেন, প্রকৃতির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হোক সরাসরি। ভাবামাত্র কাচ নামানো, ঠান্ডা হাওয়া অকল্পনীয় সূঁচ ফুটিয়ে দিল শরীরে।

স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে কুয়াশা নেমে এল। পাহাড়ি জায়গার এটাই মজা, এই রোদ তো এই বৃষ্টি, এই ঝকঝকে নীল আকাশ তো এই কুয়াশার আঁধার। যাই হোক কাঁপতে কাঁপতে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছি। সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট চাপালাম তড়িঘড়ি। তারপর স্যুটকেশ টানতে টানতে এগোচ্ছি দুপাশে নজরদারি করতে করতে।

মালপত্র বেশিরভাগই জুরিখ স্টেশনের লকারে রেখে এসেছি। হালকা ছোট্ট দুটো ক্যারিব্যাগ আরেকটা চাকাওয়ালা স্যুটকেশ সঙ্গে। তাই নিশ্চিন্তে হাঁটছি আর পছন্দসই হোটেল দেখে বেড়াচ্ছি। শুধুমাত্র রাত কাটানোর জন্য ৬০-৭০ পাউন্ড খরচ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমরা খুঁজছি ৫০ পাউন্ডের নিচের দিকে।

ঝাঁ চকচকে রাস্তা, অসম্ভব সাজানো গোছানো বিশাল বিশাল কাচের দেওয়ালওলা দোকানপাট, মাঝে মাঝেই সুন্দর সুন্দর পার্ক, দেখতে দেখতে চলছি বলে ক্লান্তি লাগছে না একটুও।

একটা মোড় ঘুরতেই দেখি হোটেল ইনফরমেশনের বোর্ড লাগানো রয়েছে। একটা বড় বোর্ডে সেই এলাকার সমস্ত হোটেলগুলোর নাম ও তাদের সুযোগ-সুবিধা বোঝানো থাকে, পাশে একটা কোড নাম্বার। একটা ছোট স্ক্রিনে সেই নাম্বারটা টাইপ করলে বর্তমান অবস্থান থেকে সেই হোটেলের দূরত্ব ও রোড ম্যাপ পাওয়া যায়। চাইলে কোড নাম্বার দিয়ে সংলগ্ন ফোন থেকে সরাসরি হোটেলের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যায়।

আমরা একটা হোটেল পছন্দ করে সরাসরি ফোনে কথা বলে জেনে নিলাম বুকিং পাব কি না। তারপর নির্দেশমতো চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে পুরো ইন্টারলাকেন পেরিয়ে ইস্ট সাইডে গিয়ে রেললাইন পেরিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে, তবে পৌঁছলাম গন্তব্যে।

তারপর ইন্টারকম বাজিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। আসছি বলে মেমসায়েব আর আসেই না। এলেন অবশ্য বেশ দেরিতে। পরে দেখলাম জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ-অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট বানানো থেকে হোটেল পরিষ্কার করা সবই তিনি একাই সামলান, তার ফলে মাঝে মাঝে দেরি হয়। কিন্তু তাঁর মধুর হাসি সহ ক্ষমাপ্রার্থনায় আমরা কিছুই মনে করতাম না। এত কাজ একা করতে দেখে বরং শ্রদ্ধাই হত।

ছোট্ট হোটেল। তাই দামে সস্তা। মাত্র ৭০ সুইস ফ্রাঁ ব্রেকফাস্ট সহ। ব্রেকফাস্ট বলতে দু-পিস ব্রেড আর ধূমায়িত এক মগ কফি। ঘরটা ছোট হলেও ভালো। রুম হিটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা পয়সা বাঁচানোর জন্য সর্বত্র কমন টয়লেট নিতাম কিন্তু তা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল যে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি কোথাও।

একা মেমসায়েব সামলান বলে এই হোটেলে কয়েকটা মজার ব্যবস্থা আছে। একটা ম্যাগনেটিক চাবি তার একদিক দরজায় লাগালে বন্ধ হয়ে যায় আর উল্টোদিক লাগালে খোলে। সামনের প্যাসেজওয়ের আলো, যখন কেউ দরজার কাছাকাছি আসে তখন জ্বলে নিজে থেকেই আবার দূরে চলে গেলেই বন্ধ হয়ে যায়।

শুনলাম ইন্টারলাকেন ইয়ুংফ্রাউ রিজিয়নের ক্যাপিটাল শহর। উচ্চতা মাত্র ৫৬৭ মিটার। অবশ্য এটাকে উপত্যকা বলাই ভালো। দিবালোকে নাকি এর সবুজ উপত্যকায় হেঁটে বেড়াতে ভারি ভালো লাগে। গ্রীষ্মে তো বটেই সারা শীতকাল জুড়ে এখানে বসে আরামের আসর। আর শীতকাল তো ইউরোপের ধনীদের আগমনের সময়। তারা স্কি করে, বরফে লুটোপুটি করে, শপিং করে, ক্যাসিনোয় হুল্লোড় করে সময় কাটায়। এখানে তাই এত

নামী কোম্পানির ডিপার্টমেন্ট স্টোর। রাস্তাঘাট তাই এত চকচকে সবসময়। এ শহর নিজেকে সবসময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে যাতে দেখলেই মনে ধরে যায়।

আল্পাইন রেঞ্জের বেস বলে এখানে জনসমাগম প্রচুর হয়। হোটেলের সংখ্যাও প্রায় ৩০০। বড়, ছোট, মাঝারি সবরকম মানের হোটেল রয়েছে। হাজারও রকমের রেস্টুরেন্টও রয়েছে-চাইনিজ, সুইস, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, থাই। তবে ভারতীয় কোনও রেস্টুরেন্ট চোখে পড়েনি।

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পৌঁছে গেছি। বেঞ্চিতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে পাশের স্ট্যান্ড থেকে পয়সা ফেলে সংগৃহীত কোক খাচ্ছি। খানিক পরে এক চিনে রেস্তোরাঁয় নৈশাহার সেরে গভীর রাতে হোটেলে ফিরলাম।

সকালে উঠতে কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল। গরম জলে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য ইয়ুংফ্রাউ-ইউরোপের সর্বোচ্চ রেলস্টেশনটি এখানেই।

ইন্টারলাকেন অস্ট স্টেশন থেকেই ট্রেন ধরতে হবে। এটা আমাদের হোটেল থেকে মাত্র ৫ মিনিটের পথ। ৯টার মধ্যেই তাই স্টেশনে পৌঁছলাম। তখনও কুয়াশার ঘেরাটোপ থেকে শহর জেগে ওঠেনি পুরোপুরি। এক-আধটা দোকান খুলেছে তাতে ঝাঁটপাট, ধূপ-ধুনো দেওয়া হচ্ছে। স্যান্ডউইচ শপের কাউন্টার তো পুরোই খালি। সবে পাউরুটির গাড়ি এসে দাঁড়াল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার চলছে জোরকদমে। একটা অদ্ভুত-দর্শন গাড়ি, তলায় রাবার প্যাড লাগানো, তার সামনের বিশাল হাঁ-তে সে নিমেষে টেনে নিচ্ছে সব কাগজপত্র, নোংরা যার সংখ্যা নেহাতই কম কারণ রাস্তায় কাগজ ফেলে না প্রায় কেউই, আর রাবার প্যাড দিয়ে রাস্তাগুলো মোছা হয়ে যাচ্ছে। ময়লা ফেলার গাড়িতে বোঝাই করা হচ্ছে রাস্তার সমস্ত ডাস্টবিনের গার্বেজ। কালো প্লাস্টিকের বিশাল বস্তা সরিয়ে নতুন প্যাকেট লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এসব দেখতে দেখতেই ট্রেন এসে গেল।

এবারে আমরা যাব ছোট লাইনের মাউন্টেন ট্রেনে।

লাল রঙের ছোট ট্রেন। মাত্র ৪-৫টা কামরা তাতে। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কী সুন্দর গদি আঁটা লাল, নীল, সবুজ ছাপা চেয়ার। স্মোকিং, নন স্মোকিং জোন আলাদা করা যাতে কারও কোনও অসুবিধে না হয়। পুরো ট্রেনটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

ট্রেন চলেছে তীব্র গতিতে। মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে প্রেক্ষাপট। এই সবুজ উপত্যকা তো এই একমুঠো বসতবাটী। পাহাড় ঢালে চরে বেড়াচ্ছে এক পাল গরু-ভেড়া। এত সবুজ চারণভূমি আছে বলেই না সুইস চকোলেটের এত খ্যাতি। দূরের জঙ্গল এখনও জাগেনি। শীতের প্রারম্ভে এদিকে সব পাতা প্রথমে লাল হয়, তারপর হলুদ হয়ে বিবর্ণ হতে হতে

ঝরে পড়ে। প্রায় সব গাছেই লেগেছে লালের ছোঁয়া। কোনও কোনও গাছ তো সম্পূর্ণ লাল হয়ে গেছে। এত অন্যরকম এ দৃশ্য যে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

হুইল্ডার্স হুইল পেরনোর পর থেকেই ক্রমশ পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠছে ট্রেন। লাশ্চিন নদী নাচতে নাচতে, সঙ্গে চলেছে। কত ঝরনা চারদিক দিয়ে এসে মিশেছে এর গতিপথে। মোট ৭২টি ঝরনা, লিফলেটে দেখেছি। তবে এতগুলো আমরা দেখতে পাইনি। অনেকগুলোয় জল ছিল না।

একটা বাঁক পেরতেই সামনে নগাধিরাজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কুয়াশার আঁধারের বুক চিরে একফালি আলোর রেখা পড়েছে তার বুকে। দীপ্যমান তপস্বীর মতো আপন দীপ্তিতে ভুবন ভরিয়ে দিয়েছে সে। খানিকক্ষণ নয়নসুখ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে সে আবার হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে। এবারের বৃক্ষরাজি চিরহরিৎ শ্রেণীর, ফার ও বার্চ জাতীয় বৃক্ষই বেশি। এরপর বেশ খানিকটা সময় ধরে চলল বন, গাছ, বাড়ি ও তুষারশৃঙ্গের এই লুকোচুরি খেলা। লাউটরব্রুনেনের পর থেকে অবশ্য সে আর বঞ্চিত করেনি আমাদের। আমরাও চোখের আড়াল হতে দিইনি তাকে।

ইয়ুংফ্রাউ, ছবির মতো সুন্দর এই দেশটির ততোধিক সুন্দর, এক জায়গা। তাই এ পথে চলে অনেকগুলো ট্রেন-গ্রীষ্মে চলে প্যানোরামিক এক্সপ্রেস। জুরিখ থেকে কুর-এ ট্রেন পাল্টিয়ে এ পথে আরেকটি ট্রেনও চলে, সম্ভবত গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস তার নাম। তবে অফ সিজনে সেরকম কোনও ট্রেন না চললেও আমাদের মতো একই রুটে ট্রেন পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে যাওয়া যায়।

আধঘণ্টা পর পর ট্রেন। ইচ্ছে হলে কোনও স্টেশনে দুদণ্ড জিরিয়ে নিয়ে চলা যায়, সেই টিকিটেই। আমরা লাউটরব্রুনেনে নেমে দু-কাপ কফি নিয়ে বেঞ্চিতে বসে আল্পসের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সবুজ উপত্যকা সিধে গিয়ে আল্পসের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। আর মহারাজ সটান বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে। তার উন্নত শির সোজা গিয়ে ঠেকেছে আকাশের পিঠে।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি পুরো ইন্টারলাকেন শহরটাই মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। কী দুর্ভেদ্য তার আবরণ, এক চিলতেও ফাঁক নেই কোথাও। শুধু ঘন কালো মেঘের রাজত্ব।

এখানে ট্রেন পাল্টিয়ে পরের গন্তব্য ক্লাইন সেইডেগ যেতে হবে। প্রত্যেক ট্রেনের রং আলাদা, যাতে চিনতে অসুবিধে না হয়।

এবারে রাস্তা ক্রমশ সরু ও বন্ধুর হয়ে আসছে । যদিও ট্রেনে বসে তা বোঝা যাচ্ছে না । কোনও কোনও জায়গায় রাস্তা এত সরু যে তলায় লোহার লম্বা লম্বা রড লাগিয়ে তার ওপর ঠেকনা দিতে হয়েছে । কোথাও ধসের ক্রমাগত প্রকোপ থেকে বাঁচতে ট্রেন লাইনের ওপর ছাদ তৈরি হয়েছে পাথর ও গাছপালা দিয়ে । কোথাও লোহার দড়ি দিয়ে রাস্তাকে বাঁধা হয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে, যাতে কোনও পতন না ঘটে ।

একপাশে আল্পাইন রেঞ্জের বরফ ঢাকা পাহাড় আর একদিকে ঘন সবুজ আল্পাইন উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে ট্রেন চলছে ।

ক্লাইনেশেইডেগ থেকে পরবর্তী যাত্রা টানেল এর মধ্য দিয়ে । এই শেষ পর্বের ১২ কিলোমিটারের মধ্যে সাত কিলোমিটার প্রায় টানেল । প্রায় ৪০ মিনিট ধরে এই টানেল পার হতে হয় । মাঝে দুজায়গায় ট্রেন থামিয়ে টানেলের এক পাশের দেওয়ালে কাচ লাগিয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে ।

আমরা চলেছি আইগার ও মঞ্চ-এর পেটের মধ্য দিয়ে । টানেলের জানলায় তাকালে তাই দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে বরফ আর বরফ । যদিও এমনিতে টানেলের ভেতরে আলোর ব্যবস্থা রয়েছে ।

ট্রেন এসে থামল ইয়ুংফ্রাউ হয়ক, উচ্চতা ৩৪৫৪ মিটার । ইউরোপে এর থেকে উঁচুতে কোথাও রেললাইন নেই । এটা সুইসদের খুবই গর্বের বিষয় । স্টেশনের পাশে একটি ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে রেললাইন স্থাপনের আদিকথা ।

এক সুইস শিল্পপতির নেশা ছিল আল্পসের শিখরে শিখরে ঘুরে বেড়ানোর । অ্যাডল্ফ গায়ের জেলার, সেই শিল্পপতি ১৮৯৩ সালে আইগার, মঞ্চ ও ইয়ুংফ্রাউয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করেন রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে সেই সব লোকদের আল্পস এর মহান সৌন্দর্য দেখার সুযোগ দেবেন যারা ট্রেকিং করতে পেরে ওঠে না ।

কাজ শুরু হল ১৮৯৬-এ । কারণ ৩ বৎসর ধরে প্রচুর গবেষণা করা হয়েছিল কীভাবে একটা পুরো বরফের পাহাড় ফুঁড়ে রেললাইন পাতা যায় যাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না সেই পাহাড়ের শারীরিক বা চারিত্রিক গঠনে । প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ ১৬ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯০২ সালে এই রেলপথ চালু হয় । খরচ হয় ১৫ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ । এখনও এই রেলপথ রক্ষা করতে খরচ হয় কয়েক মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ । পানীয় জল বহন করতে হয় ক্লাইন সেইডেগ থেকে ।

এবারে বিশাল এক লিফটে চেপে বসলাম । এর ধারণক্ষমতা ১ ঘণ্টায় ১২০০ জন । ১০৮ মিটার পথ অনায়াসে অতিক্রম করে ২৫ সেকেন্ডে । ঘটনার অস্বাভাবিকতার আঁচ

একটা তখন থেকেই পাচ্ছিলাম । এখন সাঁ সাঁ করে ওপরে এসে এই স্ফিংক্স অবজারভেটরির লোহার ঘেরাটোপের মাঝে দাঁড়িয়ে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি ।

এখানে মাইলের পর মাইলব্যাপী তুষারশৃঙ্গ আর তুষারতরঙ্গের শুভ্র অভিঘাতে মনের সব কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল । এই শুচিশুভ্র সৌন্দর্য নিমেষে ভুলিয়ে দিল মনের যত সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা । আমরা বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্মের এই যে এক দল লোক এখানে জড়ো হয়েছি তারা হঠাৎ ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে একে অপরকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেললাম । বৃহতের এটাই লক্ষণ যে ক্ষুদ্রকেও তার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করতে সাহায্য করে ।

প্রাথমিক আবেগের উচ্ছ্বাস সামলিয়ে এবার অবজারভেটরি থেকে নেমে এলাম নিচের বরফে । মাইলের পর মাইল গ্লেসিয়ার ঘুমিয়ে রয়েছে, কখন যে ঘুম ভেঙে চলতে শুরু করে দেবে তার ঠিক নেই । বরফে মার্কিং করা রয়েছে, তার মধ্যে ঘোরাফেরা করাই ভালো । তার বাইরে ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই । কোথায় তলায় গভীর খাদ রয়েছে কে জানে ।

কনকনে হাওয়া কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে । সোয়েটার, জ্যাকেটের পুরু আস্তরণ ভেদ করে হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে । তাতে বিন্দুমাত্র না দমে বরফে ছোটাছুটি শুরু করে দিলাম । গ্লাভস খুলে এক মুঠো বরফ তুলে নিলাম হাতে, হাত যেন জমে গেল । তবু তার স্পর্শসুখ থেকে বঞ্চিত করতে চাইলাম না নিজেকে ।

মিনিট কুড়ি পরে কান-মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হতে ছুটে চলে এলাম ভেতরে । অবজারভেটরির নিচের তলাগুলোতে রয়েছে ৫টি রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির শপ, পোস্ট অফিস, কনফারেন্স রুম যাতে অডিওভিস্যুয়াল শো'র ব্যবস্থা করা যায় ।

রেস্তোরাঁয় হাজারও জিনিস সাজানো কিন্তু নামগুলো সব জার্মান ভাষায় লেখা । না পারছি বুঝতে, কাউন্টারের লোকেরাও বোঝাতে পারছে না । দুজনেই তিতিবিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে এক কাপ করে চা ও একটা করে কেক দিয়ে লাঞ্চ সারলাম । কাতারে কাতারে জাপানি ট্যুরিস্ট দেখছি । স্যুভেনির শপে উপচে পড়া ভিড় । অসম্ভব দাম! এত উঁচুতে সব কিছু কত কষ্ট করেই না আনতে হয় সুতরাং সহজবোধ্য কারণেই দাম বেশি! আমার রেস্তোর জোর কম তাই সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি কেনাকাটার পাট । পোস্ট অফিস থেকে শুধু কনসেশনে একটা চিঠি পোস্ট করেছিলাম দেশে ।

কাচের জানলার পাশে বসে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে জমে থাকা শরীরে সাড় ফিরে পাচ্ছি বেশ। একমাত্র আমরাই চা-পায়ী বাকিরা মৌজ করে চুমুক দিচ্ছেন লাল, সাদা তরল পানীয়তে। প্রায় ৬০-৭০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এক দল ঢুকল গাইড সহ। একেকজন তো বার্ধ্যকের শেষ সীমায় বলেই মনে হল। এখানে তো শারীরিক কোনও পরিশ্রম নেই, শুধু অর্থ থাকলেই হল। এমনকী প্রতিবন্ধীদের জন্যেও ট্রেনে লিফটে ওঠার ব্যবস্থা আছে, তাই তারাও দুচোখ ভরে দেখতে পায় বহির্জগতকে। হিমালয়কে দেখতে হয় দূর থেকে। তার বিরাটত্ব মনে ভক্তির উদ্রেক করে, আল্পস তুলনায় অনেক নিকট। ইউরোপীয়দের কাছে তো পাশের বাড়ি বেড়াতে যাবার মতোই ব্যাপার। রাতের ট্রেনে সকালে ইন্টারলাকেন এসে সারাদিন আল্পস ভ্রমণ করে আবার রাতের ট্রেনেই ফেরা যায়। উপরন্তু হিমালয়ের সাত-আট হাজার ফুটের নিচে বরফই জমে না। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল বলে ভারতে সূর্যের তাপ প্রখর। উত্তর গোলার্ধে হওয়ায় ইউরোপে সূর্যের তাপ কম। শীতে তো শহরেও বরফ পড়ে। তাই খুব কম উচ্চতা, মাত্র তিন হাজার ফুট উঠলেই বরফ দেখা যায়।

শুনলাম এখানে বরফ কেটে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্য গুহা। দিকনির্দেশ জেনে নিয়ে ঢুকে তো পড়লাম। হালকা নীল রঙা আলোয় গুহার ভেতরটা মায়াবী হয়ে আছে। দুপাশে রেলিং চলে গেছে। প্রথমটা বুঝিনি, কিন্তু পা পিছলে পড়ো-পড়ো হতে বোধগম্য হল রেলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা। জমাট বরফে পা পিছলে যাচ্ছে বার বার, বহু কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। সামনে পিছনে ধপাস ধপাস আওয়াজ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি উৎসাহীদের পদস্খলন ঘটছে। ভয়ে আর হাত ছেড়ে দিয়ে ছবি তোলার সাহসই পাই না।

বরফ গুহার ভেতরে বরফ কেটে কেটে কি সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি বানানো হয়েছে- ডানা মেলা পাখি, মাছ, নানারকমের জন্তু জানোয়ার। এত বিচিত্র ও বিভিন্ন বিস্ময়কর বস্তু দেখতে দেখতে শেষে বিস্মিত হওয়াই ভুলে গেলাম। সবই মনে হচ্ছে সম্ভব, অসম্ভব বলে কোনও কিছুই নেই এদের অভিধানে।

আবারও বেরিয়ে এলাম বাইরে। সূর্য তখন মধ্যগগনে। বরফে আলো ঠিকরে ঝলসে যাচ্ছে চোখ। সানগ্লাস চোখ থেকে খোলাই যাচ্ছে না। তবু চশমার আড়াল সরিয়ে সাদার ঔজ্জ্বল্য পরখ করলাম, চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দুয়েকটা পাহাড় দেখছি যার কালো মসৃণ গ্র্যানাইট গাত্রে বরফ দানা বাঁধেনি। সাদার পূর্ণতায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে তাদেরই জন্য। এক গুচ্ছ মেঘ জমে আছে ইয়ুংফ্রাউয়ের ঠিক নিচটাতে, লম্বা গ্লেসিয়ারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না কাউকেই। আল্পসের বিখ্যাত অ্যালেশ্চ গ্লেসিয়ার দেখতে পাওয়া যায় এখানেই।

এবার ফেরার পালা । দুচোখ ভরে শেষ বারের মতো দেখে নেমে এলাম নিচের স্টেশনে । অবশ্য আল্পস দূর থেকে পুরো ফিরতি পথটাই সঙ্গ দিয়ে গেছে আমাদের ।

ফেরা সেই একই পথে । পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদী, পাহাড়, জঙ্গলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে । গ্রীষ্মে উপত্যকায় ফুলের হাট বসে যায়, শীতে দুচারটে নাম না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে ইতিউতি ।

ইন্টারলাকেন পৌঁছে দেখি শহর এখনও ঢাকা পড়ে আছে কুয়াশায় । ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে । স্টেশনে বসে ঠিক করলাম এবার আর আল্পস বা সুইজারল্যান্ড নয়, এখান থেকেই কানেক্টিং ট্রেন ধরে চলে যাব ভেনিস । রিসেপশনিস্ট সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের খবরাখবর দিয়ে দিলেন । রাত ১১টায় ট্রেন ধরে বার্ন তারপর সেখান থেকে মিলান হয়ে ভেনিস যেতে হবে ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

কালিন্দী গিরিবর্ত্ম

রথীন চক্রবর্তী

জুন মাসের ২২ তারিখ কলকাতা ছেড়ে ২৪ তারিখ বিকেলে উত্তরকাশীতে উপস্থিত হলাম । বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের গাইড রাজু, কুক ভরত এবং ওদের আরও দুজন সঙ্গীর সাহায্যে সব মালপত্র নিয়ে হোটেলে আশ্রয় নিলাম । পরদিন সকালে উত্তরকাশী বাজার থেকে বাকি খাবার, আনাজ এবং কেরোসিন তেল সংগ্রহ করার জন্য দুজন চলে গেল । আমরা প্রথমে গেলাম এজেন্সি অফিসে এবং তারপর জেলাশাসকের সদর দপ্তরে । এখন নিয়ম হয়েছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ আর গাইড এবং মালবাহক সংগ্রহ করতে পারবে না । চার-পাঁচটি এজেন্সি আছে, তাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে । আমরা গাইড এবং কুকের ব্যাপারে অনমনীয় ছিলাম, ওরা জোরাজুরি করলেও শেষ পর্যন্ত ওদের মাধ্যমে শুধুমাত্র মালবাহক নেবার জন্য আমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য হল । ঠিক হল, কজন লাগবে সেটা পরে ঠিক হবে, আপাতত বেশি মালবাহকের নামে ইনারলাইন পারমিট বানিয়ে নিতে হবে আজই । সেইমতো ছবি তুলে নির্দিষ্ট ফর্ম ভর্তি করে নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে উপস্থিত হলাম । আমাদের সব কাগজপত্র যথাযোগ্যভাবে প্রমাণপত্র সহ ক্যুরিয়ার মারফৎ আগেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ।

কদিন ধরেই এদিকে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে, রাস্তায় কয়েকটি ধস পেরিয়ে আমাদের বাস পরদিন সকালে গঙ্গোত্রীতে এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট সময়ের দুঘণ্টা পর । আমাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে এসে দুপুরে খাওয়ার পর সব মালপত্র তালিকা করে প্যাক করে নিলাম ।

আমাদের পায়ে হাঁটা পথের শুরু হল পরদিন সকাল আটটায় । ভাগীরথীকে ডানদিকে রেখে হেঁটে চলেছি । সহজ পথ, সামান্য চড়াই, হালকা মেজাজে সবাই হাঁটছি । পথে এখন কয়েকটা অস্থায়ী চায়ের দোকান হয়েছে । মাঝে মাঝে এরকম কোনও দোকানে বসে বিশ্রাম নিই, চা খাই, আবার চলা শুরু করি । দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম ভুজবাসা । গঙ্গোত্রীতে সুদর্শন পর্বতকে দেখে যাত্রা শুরু করেছিলাম, দক্ষিণ-পূর্বদিকে হাঁটার দরুন অনেক আগেই সুদর্শন আমাদের দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেছে । এখন আমাদের সামনে

মেঘের আড়ালে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয়ের ইঙ্গিত। প্রথম দিনের পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। পরদিনের প্রস্তুতির কাজ সেরে সবাই তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় দিন বোল্ডারের ওপর দিয়ে একঘণ্টা হেঁটে গোমুখে এসে উপস্থিত হলাম। বর্ষার প্রভাবে ভাগীরথীর জলধারা এখন বেশ স্ফীত। গোমুখে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার পিছিয়ে এলাম। বাঁদিকের পথ ধরে আমাদের ওঠা শুরু হল গঙ্গোত্রী হিমবাহের ডান পাশের গ্রাবরেখা ধরে। আমাদের বাঁদিকে ঝুরো পাথরের দেওয়াল, ধস নামা নিত্যকার ব্যাপার। আমরা অবশ্য কোনও অঘটন ছাড়াই ওই অংশটুকু পার হয়ে এলাম। গ্র্যানাইট পাথরের বিশাল সব বোল্ডার, একটার পর একটা লাফিয়ে আমাদের উঠে চলা। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর রক্তবরণ হিমবাহের সাক্ষাৎ পেলাম। বাঁদিকে রক্তবরণ এবং ডানদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের মধ্যবর্তী গ্রাবরেখা ধরে আমরা উঠে চলেছি। রক্তবরণের শরীরের রং লাল, গঙ্গোত্রীর শ্বেতগাত্রের প্রায় বিপরীত। এর মধ্যে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে। একে বোল্ডার ঠেলে ওঠা, তার মধ্যে বৃষ্টি, সকলেই কিছুটা বিধ্বস্ত। হাঁটতে হাঁটতে বেলা বারোটা নাগাদ চতুরঙ্গী হিমবাহের দেখা পেলাম, বাঁদিক থেকে নেমে এসে মিশে গিয়েছে গঙ্গোত্রীর সঙ্গে। রক্তবরণ ছোট হিমবাহ, কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়নি, আলাদা স্নাউট তৈরি করেছে। চতুরঙ্গীর দৈর্ঘ্য ১৮ কিলোমিটার, গঙ্গোত্রীর থেকে খুব একটা কম নয়, কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে মিলে গেছে। তিন-তিনটে হিমবাহের তে-মাথার এই বিপজ্জনক জায়গা পেরিয়ে এলাম। চড়াই শুরু হল। ক্রমাগত ওঠা আর ওঠা। সব চড়াই একসময় শেষ হয়। দুটোর সময় নন্দনবনে এসে হাজির হলাম। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েই চলেছে, সঙ্গে শনশনে হাওয়া। সব সদস্য এবং মালবাহকদের আসতে বেশ দেরি হল। তাঁবুর ভেতর ঢুকে ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেল সবাই। রাতের দিকে আর বৃষ্টি নয়, ক্রমাগত বরফ পড়তে থাকল। মাঝে মাঝেই উঠে ঝাড়াঝাড়ি করে তাঁবুকে বরফের ভারমুক্ত করতে হয়েছে। আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য পরদিনটাও আমরা নন্দনবনে থাকতে বাধ্য হলাম। বেলা বারোটা নাগাদ বরফ পড়া থামল বটে, কিন্তু মেঘ সরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তবু যাই হোক বাইরে এসে একটু ঘোরাঘুরি করার সুযোগ পেলাম।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের এপারে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয়ের নিচে আমাদের অবস্থান, কিন্তু ভাগীরথী আমাদের দৃষ্টির বাইরে। হিমবাহের অন্য পারে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের নিচে তপোবন। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় আমরা শিবলিঙ্গকে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ এই নন্দনবন থেকেই শিবলিঙ্গকে (৬৫৪৫ মিটার) সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখা যায়। তপোবন থেকে একটা সরু পথরেখা বাঁদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধার বরাবর গিয়ে একটা বাঁকের মুখে হারিয়ে গেছে। ওই বাঁক থেকেই একটা হিমবাহ এসে মিশেছে গঙ্গোত্রীর সঙ্গে। ওটি কীর্তি হিমবাহ,

কেদারডোম অথবা দক্ষিণ গাত্র বরাবর শিবলিঙ্গ শীর্ষে অভিযান করতে হলে ওই পথেই যেতে হয় । মেঘের আড়ালে কেদারডোম এবং আরও বাঁদিকে করচাকুণ্ড পর্বতের আংশিক অস্তিত্ব চোখে পড়ছিল । কিন্তু মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম গঙ্গোত্রী হিমবাহের বিস্তারকে ।

আকাশের অবস্থা পরদিনও একইরকম, যদিও বরফ আর পড়েনি । আজ আর অপেক্ষা নয়, পথে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মনস্থ করে বেরিয়ে পড়লাম । প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল নন্দনবন ছাড়িয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহের প্রান্তে এসে পৌঁছতে । আমাদের ডানদিকে ভাগীরথীর অ্যাবালেশন ভ্যালি । একসময় নাকি ভাগীরথী থেকে এক হিমবাহ নেমে এসে এখান দিয়ে চতুরঙ্গীর সমান্তরালভাবে গিয়ে মিশে যেত গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে । এখন সেই হিমবাহ আর নেই, আছে পায়ের নিচে নরম ঘাস আর পাথরের কোণে রংবেরঙের ফুল, দিগন্ত জোড়া বরফের রাজত্বে এদের অস্তিত্ব বেশ আশ্চর্যজনক । কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, চতুরঙ্গী হিমবাহের বামপার্শ্বীয় গ্রাবরেখার কঠিন ও সংকীর্ণ পথ ধরে চলা শুরু হল । চতুরঙ্গীর বুকে ছোট ছোট কয়েকটি জলাশয়, গ্লেসিয়াল ট্যার্ন । চকচকে নীল রঙের জলের ওপর ধবধবে সাদা বরফের গুঁড়ো । বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এসে উপস্থিত হলাম ডানদিক থেকে আসা বাসুকী হিমবাহের সঙ্গে চতুরঙ্গীর সংযোগস্থলে । এখান দিয়ে বাসুকী হিমবাহ অতিক্রম করে অপর প্রান্তে যাবার কথা ভাবাই যায় না । আমরা ডানদিকের দেওয়াল বরাবর আড়াআড়িভাবে অনেকটা পথ হেঁটে এলাম । ছোট ছোট আলগা পাথর আর প্রায় ষাট ডিগ্রির ঢাল, খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে । একসময় বাসুকী হিমবাহের মাঝামাঝি একটা অপেক্ষাকৃত সহজ জায়গায় এসে হিমবাহটা অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হলাম । জমাট বাঁধা শক্ত বরফ, স্টেপ কাটতে গিয়ে আমার দেশী আইস-অ্যাক্সের ডগা ভোঁতা হয়ে গেল । হাঁ করে থাকা বরফফাটলগুলিকে বঞ্চিত করে আমরা এক সময় বাসুকী হিমবাহ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হলাম একটা ঝুরো পাথরের খাড়া দেওয়ালের সামনে । রোপ ফিক্স করে একে একে সবাই উঠে এলাম ওই দেওয়ালের মাথায় । আড়াআড়িভাবে আরও কিছুটা উঠে এসে দূরে নিচে দেখতে পেলাম বাসুকীতালকে । কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বাসুকীতালে (৪৮৯৮ মিটার) ।

হিমালয়ে অসংখ্য সুন্দর সরোবর বা তাল আছে, বাসুকীতাল তাদের তুলনায় ছোট, কিন্তু পরিবেশ-গুণে অনন্য । এখানে একদিকে একটা ঢালের গায়ে ছোট একটা গহ্বরে একটা মূর্তি আছে । ভরতের অনুরোধে সবাই সেখানে হাজির হলাম । ভরত পুজো দিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল আকাশ পুরোপুরি মেঘশূন্য । তিনদিন বিরক্তিকর আবহাওয়ার পর এখন ঝলমলে রোদ পেয়ে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম । বাইরে সব জিনিস শুকোতে

দিয়ে আমরা সবাই ঘাসের ওপর বসে গেলাম । আমাদের দক্ষিণ দিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাসুকী শৃঙ্গ (৬৫২৮ মিটার), সরোবরে ভাগীরথীর প্রতিফলন ।

পরদিন মিনিট পনেরো হেঁটে আবার উঠে এলাম চতুরঙ্গীর তীরে । আকাশ সামান্যতমও মলিন নয়, আমাদের চারপাশে শুধু বরফ মোড়া শৃঙ্গ । দক্ষিণে বাসুকী (৬৫২৮ মিটার), পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে মন্দা (৬৫২৭ মিটার) ও রাধানাথ (৬৬১৭ মিটার), পুবদিকে চতুরঙ্গী (৬৫১৩ মিটার) এবং চন্দ্রপর্বত (৬৭২৮ মিটার) চোখ ধাঁধিয়ে যায় । হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দুঘণ্টা পর চতুরঙ্গী হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হওয়া সুন্দর হিমবাহের সাক্ষাৎ পেলাম । কালকের মতোই বাঁদিকে বেঁকে হিমবাহের বামপ্রান্তের দেওয়াল আড়াআড়ি অতিক্রম করে এসে সুন্দরের বুকে নেমে এলাম । ম্যাপে সুন্দর এবং সুরালয় হিমবাহের স্পষ্ট বিভাজন আছে, কিন্তু এখানে এলে বোঝা যায় এই দুই হিমবাহের দূরতম প্রান্তদেশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে । খুব সাবধানে সুন্দর হিমবাহ অতিক্রম করতে থাকলাম, এক সময় এক জায়গায় এসে সতোপন্থ শীর্ষের (৭০৭৫ মিটার) দেখা পেলাম ।

আবার চলা শুরু করলাম । বিস্তীর্ণ এই হিমবাহের ঢেউ একটার পর একটা পার হয়ে, বরফফাটলগুলিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে এক আলগা পাথরের দেওয়ালের সামনে এসে উপস্থিত হলাম । শ্লথ পদক্ষেপ, কিন্তু চড়াই বেশিক্ষণের নয় । শীর্ষে উঠে দূরে নিচে দেখতে পেলাম সুরালয়কে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ক্যাম্পে (৫১০০ মিটার) । সুরালয় কথার অর্থ দেবতাদের আলয় । চারদিকে ঢাল, মাঝে নিচে কিছুটা সমতলক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান । একদিকে ঢালের মাথায় একটা বড় পাথর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তাই এ জায়গার অন্য নাম খাড়া পাথর । এখান থেকে উত্তরদিকে রাধানাথ পর্বত দেখা যাচ্ছে । ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের একটি দল সতোপন্থ আরোহণে ব্যর্থ হয়ে এই অনামা শৃঙ্গটি আরোহণ করেন এবং রাধানাথ শিকদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শৃঙ্গের নাম রাখেন রাধানাথ । পুবদিকে দেখা যাচ্ছে খালিপেট হিমবাহ-এই নামকরণের একটি কাহিনী আছে । ১৯৩৫ সালে মেজর গর্ডন অস্মস্টোন যখন এই হিমবাহ জরিপ করছিলেন, তখন একদিন কুলিরা ভুলবশত নিচ থেকে খাবার না নিয়ে ওপরে চলে আসে । মেজর সেদিন কাজ বন্ধ রেখে কুলিদের নিচে নেমে যেতে বলেন । কিন্তু কুলিরা রাজি হয় না, সারাদিন না খেয়েই এই দুর্গম হিমবাহে তারা জরিপের কাজ সম্পন্ন করে, তাই এর নাম খালিপেট হিমবাহ । আমাদের অনেকে, বিশেষত মালবাহকেরা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, অনেকেই রাতে কিছু খেল না ।

পরদিন সকালে মালবাহকদের দেখি নেতিয়ে পড়ে আছে । বেরতে বেশ বেলা হয়ে গেল । প্রতিদিন পথ চলার সময় মনে হচ্ছে আগের দিনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল । আজ আমাদের সুরালয় হিমবাহ অতিক্রম করতে হবে । ব্যাপ্তি ও গভীরতায় এর সঙ্গে বাসুকী ও সুন্দর হিমবাহের কোনও তুলনাই হয় না । যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বোল্ডারের বিশৃঙ্খলা আর মুখ হাঁ করে থাকা বরফ-প্রান্তর । একটা সুন্দর জলাশয় সহ সতোপন্থ শৃঙ্গ, চতুরঙ্গী ও অ্যাভালাঞ্চ শীর্ষ এবং সবার ওপর চন্দ্র পর্বত আমাদের পথ চলায় নিয়ত উৎসাহ দিচ্ছে । তবে এটাও ঠিক, এই প্রতিরোধের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে কেমন যেন একটা গোঁ চেপে যায় । খাড়া দেওয়াল বেয়ে কখনও নিচে নেমে যাওয়া, কখনও সংকীর্ণ বরফশিরার ওপর দিয়ে ব্যালেন্সের পরীক্ষা দেওয়া, কখনও দিগন্তবিস্তৃত বরফ-প্রান্তরের বরফফাটলগুলি সাবধানে অতিক্রম করা, কখনও চড়াই ভেঙে আকাশকে স্পর্শ করা, এভাবে সারাদিন হেঁটেও আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারলাম না, দু-কিলোমিটার আগে চন্দ্র পর্বতের গা ঘেঁসে একটা জায়গায় (৫৩০০ মিটার) থামতে হল । তাঁবু খাটানোর কোনও জায়গা নেই । শুধু পাথর আর পাথর । সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সবাই মিলে পাথরগুলি এদিক ওদিক সরিয়ে জায়গাটা যতটা সম্ভব সমান করে নিয়ে তাঁবু খাটালাম । চারদিক সাদা । দূরে শ্বেতা হিমবাহ দেখা যাচ্ছে । ক্লান্তিতে ও ঠান্ডায় সবাই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম ।

পরদিন আমরাও চলা শুরু করলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল । গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ আর হালকা হাওয়া, শীতের যাবতীয় পোশাক থাকা সত্বেও হাড়ে কাঁপন ধরে যাচ্ছে । হোয়াইট আউটে কিছু দেখা যাচ্ছে না । প্রথম একঘণ্টার পথ অন্যদিনের মতোই, তারপর চতুরঙ্গীর বুকে নেমে এসে একটা বড় খাদ পার হতে হল । এখানেই চতুরঙ্গীর সঙ্গে আমাদের এতদিনের সম্পর্কের ইতি, এখানেই মিশেছে তিন-তিনটে হিমবাহ, চতুরঙ্গী, শ্বেতা এবং কালিন্দী । চতুরঙ্গী ছেড়ে আমরা শ্বেতা এবং কালিন্দী হিমবাহের মধ্যবর্তী গ্রাবরেখা ধরে প্রায় দুঘণ্টা হাঁটলাম, তারপর নেমে এলাম কালিন্দী হিমবাহের বুকে । আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে, দু-ফুট দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না, বিশাল বিশাল বরফের ঢেউ আর অসংখ্য ক্রিভাস অতিক্রম করে চলেছি । মাঝে মাঝেই কেউ কেউ বরফের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কোমর পর্যন্ত । নিজেকে টেনে নিয়ে চললাম কোনওমতে । বেলা তিনটের সময় ওই বিপজ্জনক আবহাওয়ার মধ্যে একেকটা বরফের মূর্তি হয়ে যখন কালিন্দীর পাদদেশে (৫৬০০ মিটার) এসে উপস্থিত হলাম, তখন আমাদের দেহ-মনে সামান্যতম শক্তিও অবশিষ্ট নেই । বরফের প্রান্তরে কোনওমতে তাঁবু টাঙিয়ে সবাই ঢুকে গেলাম । এইসব উচ্চতায় সন্ধ্যা বলে কিছু থাকে না, থাকে দিন এবং রাত । সূর্য অস্তাচলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর রাত নেমে এল । ঠিক করলাম যদি শেষ রাতের দিকে আবহাওয়া ঠিক হয়ে যায়, তাহলে অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়ব । জানি

সদ্য পড়া বরফে বিপদ অনেক । ক্রিভাসগুলি ঢেকে যাবে, বরফে শরীর ডুবে যাবে, সবচেয়ে বড় কথা অ্যাভালাঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বিশেষত এখানে, যেখানে এমন একটা শৃঙ্গের পাশেই আমাদের অবস্থান, এমন একটা শৃঙ্গের গা ঘেঁসে আমাদের যেতে হবে যার নামই হল অ্যাভালাঞ্চ । হোয়াইট আউটের জন্য যদিও আমরা কালিন্দী, অ্যাভালাঞ্চ বা অন্য কোনও শৃঙ্গকেই এখনও দেখতে পাইনি, কিন্তু জানি সে আশপাশেই আছে । যদি কালকেও আবহাওয়া খারাপ থাকে, তবে অপেক্ষা করে দেখব । তাতেও বিপদ হতে পারে । কিন্তু পরশু আবহাওয়া ভালো হলে এগোব, না হয় ফিরে যাব । ছটার মধ্যেই কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম । কিন্তু ঘুমতে পারলাম না সারারাত, উচ্চতাজনিত কোনও কারণে নয়, চাপা উদ্বেগে ।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বরফ পড়া থামল । চারটের সময় শীতের যাবতীয় পোশাক পড়ে তাঁবুর বাইরে এলাম, গেইটারের ফাঁক দিয়ে বরফ ঢুকে যাচ্ছে । যদিও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না, তবু হালকা হাওয়া দিচ্ছে, মনে হচ্ছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে । টেম্পারেচার মাইনাস সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস । তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে সবাইকে জাগাতে থাকলাম । প্রথমে বেরিয়ে এল বিজয় । ঠান্ডায় শরীর জমে যাচ্ছে, সবসময় জুতোর ভেতরে পায়ের আঙ্গুলগুলি কুঁচকিয়ে এবং ছেড়ে দিয়ে সচল রাখার চেষ্টা করছি । আধো অন্ধকারে অল্প দূরে যেন একটা বরফের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে । হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ, যেন কানের পাশে বজ্রপাত হল, জীবনে এত বীভৎস আওয়াজ শুনিনি । অ্যাভালাঞ্চ হয়েছে বুঝতে পারছি, তার শিকার হইনি এটাও বুঝতে পারছি, কিন্তু ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেলাম আমি । রাজু, ভরত দৌড়ে এসে ওই বরফের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করতে থাকল ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল সব অনিশ্চয়তা । মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলাম, চারদিকে একেবারে কাছে একটার পর একটা শৃঙ্গ, সর্বত্র শুধু শুভ্রতা । একেবারে কাছে পুবদিকে কালিন্দী এবং অ্যাভালাঞ্চ শৃঙ্গ পাশাপাশি । মাঝে যে বরফের ঢালটা উঠে গিয়েছে, ওই পথে আমাদের যেতে হবে । যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সাড়ে ছটা নাগাদ হাঁটা শুরু করলাম । প্রায় এক ঘণ্টা উঠে এলাম । এতদূর পর্যন্ত ঢাল বিশাল কিছু নয় । চারদিকে শুধু বরফের কারুকার্য । আর মাত্র দুশো মিটার দূরে একটা আইসফল, ওটা আমাদের অতিক্রম করতে হবে, এই পথের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ এইটি । হঠাৎ একটা দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ, আর অ্যাভালাঞ্চ শৃঙ্গ থেকে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা কয়েক লক্ষ টন বরফের বন্যা । আর মাত্র আধঘণ্টা আগে রওনা হলে আমরা বরফের তলায় চলে যেতাম । যেমন হয়েছিল ১৯৮০ সালে পুনের একটি দলের দুই সদস্য বিজয় মহাজন এবং অরুন্ধতি যোশীর । এখন আমাদের যেখানে অবস্থান

তার থেকে সামান্য ওপরে কালিন্দী শৃঙ্গের গায়ে একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় তাঁবুর মধ্যে ওরা ঘুমোচ্ছিল, পরদিন কালিন্দী আরোহণের আশায় । কিন্তু রাতে অ্যাভালাঞ্চ শৃঙ্গ থেকে আসা এরকমই একটা বিশাল অ্যাভালাঞ্চের একেবারে প্রান্তিক ঝাপটায় ওদের তাঁবু ডুবে গিয়েছিল কয়েক ফুট বরফের নিচে । কয়েকজন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও ওরা দুজন পারেনি । ওখানেই সহযাত্রীরা সযত্নে ওদের শুইয়ে রেখেছে । উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, এই শৃঙ্গকে নাকি কখনও থেমে থাকতে দেখা যায় না ।

আধঘণ্টার মধ্যে আইসফল জোনের কাছে এসে একবার অ্যাভালাঞ্চ শীর্ষের দিকে তাকালাম । যত দ্রুত সম্ভব এই অংশটুকু আমাদের অতিক্রম করতে হবে । কিন্তু ভাবা যতটা সহজ, করা ততটাই কঠিন । নিচের দিকে কম উচ্চতায় একেকটা বোল্ডার পার হওয়াই বেশ কষ্টকর, আর এই ঊনিশ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায়, যেখানে শরীর সামান্য নড়াচড়া করলেই বুক ভরে শ্বাস নিতে হয়, সেখানে এত বড় বড় বরফের বোল্ডার পার হয়ে ওপরের দিকে ওঠা সত্যিই প্রাণান্তকর ব্যাপার । এমনকী আমাদের মালবাহকেরা নির্দ্বিধায় বেশ কিছু মাল ফেলে দিচ্ছে, কোনও প্রলোভনেও আমাদের কথা শুনছে না । তবু যখন একটা স্টোভ আর একটা স্লিপিং ব্যাগ পর্যন্ত ওরা ফেলে দিল তখন বাধ্য হয়ে রাগারাগি করলাম । নিজেই ওই দুটো দুহাতে নিয়ে উঠতে থাকলাম । দুঘন্টারও বেশি সময় লাগল আইসফলটা অতিক্রম করতে । এখন আমরা অন্তত অ্যাভালাঞ্চের বিপদমুক্ত, কিন্তু পিছিয়ে পড়া দলের জন্য অপেক্ষা করার জায়গা নেই, আমাদের এখনও উঠে যেতেই হবে । মাঝে মাঝেই নরম বরফে একেবারে কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে । উঠতে উঠতে একসময় কালিন্দীর গায়ে মোটামুটি একটা জায়গা পেলাম যেখানে পিঠের স্যাক নামিয়ে রেখে একটু বসে পিছিয়ে পড়া দলের জন্য অপেক্ষা করা যায় । কিন্তু ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে এই রোদেও শরীর কাঁপতে থাকে । সবাই এল ঠিক দুঘণ্টা পর, একেবারে নিঃশেষিত অবস্থায় । ইতিমধ্যে আবহাওয়াও খারাপ হয়ে গেছে, এতক্ষণ যে ভালো ছিল সেটাই আশ্চর্যের । তবু ওদের বিশ্রামের জন্য কিছু সময় দিতেই হল । তারপর আবার ওঠা, এবার সবার শেষে আমি । মাত্র আধঘণ্টা উঠেই দেখি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই আঙুলে ‘ভি’ চিহ্ন করে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে । ‘ভি’ মানে ভিক্ট্রি ! একটু উঠে ওদের সঙ্গে মিলিত হলাম । নারকোল ফাটিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে পুজো দেওয়া হল । আনন্দে কাঁদতে থাকল কয়েকজন । আমরা দাঁড়িয়ে আছি ছোট্ট এক চিলতে জায়গায় যেখানে ১৯৩১ সালের ২০ জুলাই প্রথম পা রেখেছিলেন জে বার্নি । তারপর একে একে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ, এরিক শিপটন, এইচ ডব্লু টিলম্যান, মার্কো পালিস, আন্দ্রে রঁস, জে বি অডেন ইত্যাদি সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ পর্বতারোহীরা । ভারতীয়দের মধ্যে এখানে প্রথম এসেছিলেন স্বামী প্রবোধানন্দ ১৯৪৫ সালে, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৩ সালে ।

আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেছে, সময় নষ্ট করার উপায় নেই । ওই খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেই চলতে শুরু করলাম । বরফের ঢাল আর শেষ হয় না । নামতে নামতে দিনের শেষে একটা প্রায় আটশো ফুটের বাট্রেস পেলাম, খাড়া নেমে এলাম তার পাদদেশে, তারপরেও একটা প্রায় পঁচাশি ডিগ্রির খাড়া বরফের দেওয়াল, পাঁচশো ফুটের মতো র্যাপলিং করে নেমে এলাম এক বিস্তীর্ণ এবং বিপজ্জনক বরফ-প্রান্তরে । তাড়াতাড়ি তাঁবু টাঙিয়ে প্রায় কিছু না খেয়েই সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে আশ্রয় নিলাম ।

কালিন্দীর এদিকের পথে প্রতিবন্ধকতা অন্য প্রান্তের সমান । ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে কালিন্দীর এই দিকের পথ খুবই সংবেদনশীল অঞ্চল, ছবি তোলা আইনবিরুদ্ধ । পরদিন তিনটে দড়িতে নিজেদের বেঁধে নিয়ে সারাদিন বরফ-প্রান্তরের ওপর হাঁটতে হাঁটতে শেষে নেমে এলাম অরোয়াতাল । তার পরদিন একটার পর একটা খরস্রোতা নদী বা ঝোরা পার হয়ে বড় বড় পাথরের সুদীর্ঘ শিরা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে নদীর ধারে একটা জায়গায় রাত কাটালাম । তারও পরের দিন আমাদের গন্তব্য বদ্রীনাথ । কতদিন পর আমাদের পায়ের নিচে নরম, সবুজ ঘাসের কার্পেট, অসংখ্য ফুল । ঘণ্টা তিনেক পর খাসতলি I.T.B.P ক্যাম্পের এক কিলোমিটার দূরে একটা সুন্দর কুণ্ডের দেখা পেলাম, উত্তর দিক থেকে সরস্বতী নদী এসে মিশেছে আমাদের গত দিনের সঙ্গী অরোয়া নদীর সঙ্গে । কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সবাই চলতে শুরু করলাম ।

ভ্রমণ এপ্রিল, ১৯৯৯

একযাত্রায় ভোরামদেরও আর কানহা

হীরক নন্দী

বিলাসপুর থেকে ১১৪ কিলোমিটার আর রায়পুর থেকে ১১৭ কিলোমিটার, অর্থাৎ প্রায় একই দূরত্বে ছোট্ট জনপদ কাওয়ার্ধা । কাওয়ার্ধা হয়ে পোণ্ডি (স্থানীয় উচ্চারণে পোঁড়ি) যেতে বিলাসপুরের পথে ২ কিলোমিটার পিছিয়ে বাঁয়ে গেছে ভোরামদেও-এর রাস্তা । ১৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পরিষ্কার সুন্দর পথ । সমতল পেরিয়ে একসময়ে শুকনো পাহাড় । টিলার গায়ে যদৃচ্ছ উড়ে বেড়াচ্ছে বসন্তের মরা পাতা । আপাত প্রাণহীন রুগ্ন শালের জঙ্গল বিছিয়ে আছে তার নিজস্ব সৌন্দর্য । হালফিলের মোটাদাগের স্থাপত্যে তৈরি একটা তোরণের মধ্য দিয়ে রাস্তা ঢুকে গেছে মন্দিরে । ডানহাতে সুন্দর বিশাল দিঘি; এই খটখটে ঊষর পরিবেশে চমক লাগে হঠাৎ । দিঘির এককোনায় প্রাচীন মন্দির । চোখ ধাঁধানো কিছু নয়, তবু নজর কাড়ে ঠিকই ।

মন্দিরের আসল গুরুত্ব তার প্রত্নতত্বে । আর্কিওলজি ও মিউজিয়ামস দপ্তরের অধিকর্তার তরফ থেকে মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে সামনের চত্বরে । ভোরামদেওয়ের মূল মন্দির তৈরি হয় খ্রিস্ট্রীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, নাগ বংশী রাজাদের শাসনকালে । যদিও মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা শিব, মন্দিরের নামটা আসে আদিবাসী লোকদেবতা ভোরাম-এর নামানুসারে । পুরো মন্দিরটাই পাথরের তৈরি । যত ছোটই হোক, মন্দিরের গঠনশৈলী বিস্ময়কর । প্রথমে সমাবেশ কক্ষ যার তিনদিকে কারুকার্য করা প্রবেশদ্বার; তারপর আরও একটা অপেক্ষাকৃত ছোট কুঠরি পেরিয়ে পবিত্র গর্ভগৃহ । এর ওপরে মন্দিরের দর্শনীয় কাঠামো যা সাতটা নির্দিষ্ট আনুভূমিক আর একইসঙ্গে উলম্ব স্তরের সমষ্টি । প্রধানত কাম, সঙ্গীত, নৃত্য আর যুদ্ধরত মূর্তিতে অলঙ্কৃত । বাইরের অলংকরণ ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারের প্রতিরূপ । মন্দিরের অভ্যন্তরে দৈবী চেতনার প্রকাশ, যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সংযোগ । মূল মন্দিরের গায়ে গা ঘেঁসে বহু পুরনো ইটের মন্দির, খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিকাশ পাওয়া ছত্তিশগড়ি স্থাপত্যের আদলে তৈরি । ওই একই চত্বরে পাকাপোক্ত ছাউনির তলায় আরও নানান দেবদেবীর মূর্তি । এগুলো চৌরা গ্রাম থেকে তুলে আনা প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন । হরগৌরী, সতী ইত্যাদি পাথরের মূর্তি । সবই খ্রিস্ট্রীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সংগ্রহ । স্থূল, বলিষ্ঠ প্রত্যঙ্গের আদল একাদশ শতাব্দীর ওই একই শিল্পধারার সাক্ষ্য বহন করে ।

মূল মন্দিরের অলঙ্গকণে কামের প্রাধান্য খাজুরাহোর কথা মনে পড়িয়ে দেয় । এই কারণেই ভোরামদেও ছত্তিশগড়ের খাজুরাহো নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে ।

ভোরামদেও মন্দিরে পৌঁছনোর সামান্য আগে বাঁহাতে মাণ্ডোয়া মহল । মন্দিরের অবস্থা যথেষ্ট করুণ । সামনের মণ্ডপ প্রায় ভেঙে পড়েছে । ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে ফণী (নাগ) বংশের ২৪তম ও শেষ শাসক রামচন্দ্রের আমলে গড়া । পাথরের গায়ে একই ধরনের শিল্প, কামের প্রাধান্য । এখানে যেন একটু খাপছাড়া, দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়, সম্ভবত হাতের কাজের স্থূলতার জন্য । যে নৈপুণ্যে মূল মন্দির গড়ে তোলা, এখানে তার ছিটেফোঁটা নেই । সামনের সাইনবোর্ডে ওই একই কথা লেখা । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের অবনতির পরিষ্কার ইঙ্গিত । দুটো স্থাপত্য কাছাকাছি থাকায় সেটা আরও শিক্ষণীয় ।

বিলাসপুর কি রায়পুর হয়ে কোনও পর্যটক যদি কানহার দিকে যান, ভোরামদেও ছুঁয়ে যাওয়াটা খুবই সম্ভব । ভোরামদেও থেকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে, পোণ্ডি আর চিল্পির মাঝামাঝি স্টেট হাইওয়ে ২৬-এ গিয়ে মেশে । কাওয়ার্ধার দিকের রাস্তাটা সে তুলনায় ভালো । সামান্য ঘুরপথ হলেও অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পটভূমিতে ভোরামদেওয়ের মন্দির আর চোখ জুড়োনো দিঘি সাধারণ পর্যটকের মনেও কিছটা ছাপ ফেলবে । যাঁরা প্রত্নতত্বে আগ্রহী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র-এ তাঁদেরই তীর্থস্থান ।

কানহা

আগের রাতে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পরদিন সন্ধ্যার মুখে মুক্কি পৌঁছলাম । একটু ঘুরপথে ভোরামদেও হয়ে না এলে তিনটে-সাড়ে তিনটের মধ্যে মুক্কি ঢুকে যেতাম । সন্ধের অন্ধকারে এম পি ট্যুরিজম-এর বিরাট সাফারি লজের ভেতরটুকু ছাড়া কিছু নজরে পড়েনি । বাড়িটার স্থাপত্য একটু অন্য ধরনের, বেশ মনে ধরে । ভোরের আলোয় পিছনের নদীটা নজরে পড়ল । পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে বেশ এলিয়ে বইছে । অবসর সময়টা নদীর ধারেও ভালোই কাটে । সামনেই স্টেট হাইওয়ে । রাতের বেলায় বেশ কিছু হরিণ ছিটকে আসে । মুক্কিতে সাফারি লজ ছাড়া আরও প্রাইভেট লজ আছে দু-তিনটে । ফরেস্ট রেস্টহাউসও আছে, সামান্য জঙ্গলে ঢুকে । চেকপোস্ট পেরোলেই একটানা জঙ্গল । ভোরবেলা লাইন লাগে গাড়ির । কে আগে দরজা ঠেলে ঢুকবে, তার প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা ।

এখন মার্চ মাসের শুরু । সাত পুরু পাতা পড়েছে জঙ্গলের মাটিতে । একটু হাওয়া দিলেই যেন হুড়োহুড়ি পড়ে অরণ্যভূমিতে । কানহার জঙ্গলের চরিত্রে আছে পাতাঝরা । চিরহরিৎ লালিত্যের অভাব । আসন্ন গ্রীষ্মের সূর্য জ্বালিয়ে খাচ্ছে সারাদিন । তার অত্যাচারের চিহ্ন সর্বত্র । শুখা অরণ্যে ফাঁকে ফাঁকে একটা দুটো ওয়াটার হোল । যেন

সানস্ক্রিন লোশন পড়েছে মাটিতে । দুনিয়ার পাখি তার আশপাশে । কদিন বাদে পশুরাও জড়ো হবে এরই আশপাশে । এখনও টুকরো টুকরো জল আছে জঙ্গলে । আদিগন্ত ঘাসবনে, বাষ্প জমে এখনও । কানহার এই ঘাসবনের তুলনা হয় না । অতটা জমি, যেন ঢেউয়ের মতো অনবরত দোল খেয়ে চলেছে । মাঝে মধ্যে শালবন, তলায় পাতার স্তূপ । দেখে মনে হয় যেন মেপে মেপে লাগানো । যেখানে পাহাড়ি পথ, সেখানে বাঁশের ভাগ বেশি । কিছু কিছু ঝাড়ে ফুল ফুটেছে প্রচুর । এবারে প্রকৃতই ঝাড়ে-বংশে মরবে । পাহাড়ের বনভূমি কিছুটা মিশ্র ধাঁচের, তাই অপেক্ষাকৃত সবুজ । এখানে জন্তু দেখার সম্ভাবনা কম । সমতলে হলুদ বেশি, তবু অক্লান্ত চোখ সেই হলুদই খোঁজে । গাঢ়তর হলুদ, যেন অনেকটাই স্বতন্ত্র তার জীবনীর প্রাবল্যে ।

কানহা বলতেই বাঘ । হাজারটা পর্যটক চরকির মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে । দেশি-বিদেশি, কিশোর-বৃদ্ধ সবাই এখানে এক । এক মহিলাকে দেখলাম তাঁর বছর দেড়েকের শিশুকে বুকে করে এই একই খেলায় মেতেছেন । এই একটা জন্তু আমাদের জাগিয়ে রেখেছে । ভারতীয় বাঘ যেমন বাঘের একটা উপপ্রজাতি, যাকে সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, কানহার বারাশিঙ্গা তেমনই একটা উপপ্রজাতি (Cervus duvauceli (brandevi) যাকে সারা পৃথিবীর মধ্যে শুধু কানহাতেই পাওয়া যায় । অথচ এই বারাশিঙ্গাকে লোকে পাত্তাই দেয় না । একটা সামান্য হরিণ, তার শিঙে দুটো ডালপালা বেশি-বড়জোর ওইটুকুই । এই একটা কারণেই বাঘ মানে 'বাঘের বাচ্চা' ।

বিস্তর ছুটে আমরা বাঘ দেখলাম । সেই বিখ্যাত 'টাইগার শো' । সংরক্ষণবাদীদের আপত্তিতে কিছুদিন বন্ধ থেকে কানহা, বান্ধবগড়ে আবার চালু হয়েছে । সকালে হাতিতে চেপে বনবিভাগের লোকেরা জঙ্গলে বেরোয় কানহা, কিসলি আর মুক্কি এই তিনটে জায়গা থেকে । বাঘ দেখা গেলে ওয়্যারলেসে খবর ছোটে । পর্যটকেরা হাউমাউ করে গাড়িতে উঠে যেখানে দেখা মিলেছে সেখানে ছোটেন । যে দল আগে নাম লেখাবে, তাদের সুযোগ আগে । ধরা যাক দশটা গাড়ি কানহায় দাঁড়িয়ে আছে নাম লিখিয়ে, এমন সময় কিসলিতে বাঘ দেখা গেল । তখন যে গাড়ির রেসটা হয়, সেটাকে গ্রাঁ প্রী বলে না চালাতে পারার সঙ্গত কারণ নেই । যাইহোক বাঘ দেখা গেলে একটা হাতি দাঁড়িয়ে থাকে বাঘের পাশে, আরেকটা হাতি পর্যটকদের নিয়ে গিয়ে আগের হাতিটাকে মুক্তি দেয় । বাঘ কখনও শুয়ে থাকে, কখনও গড়াগড়ি দেয়, কখনও সইতে না পেরে দাঁত খিঁচোয় ইত্যাদি । যত খিঁচোয়, ততই শাটার পড়ে বেশি । এই বিচিত্র বাঘবন্দী খেলা চলতেই থাকে যতক্ষণ না বাঘের স্থানত্যাগ করার ইচ্ছে এবং সুযোগ ঘটে; অথবা কানহায় অবস্থানকারী যাবতীয় পর্যটকের ক্যামেরার সমস্ত ফিল্ম খতম হয় । কিসলিতে বাঘিনী দেখলাম এই অভিনব খেলায় নাম লিখিয়ে । ফিল্ম শেষ হয়নি কারণ বাঘিনী অন্ধকার ঝোপে শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল । এতই

অন্ধকার যে লোকে সাধারণত হলুদের মধ্যে কালো ডোরা দেখে, আমি দেখলাম কালোর মধ্যে হলুদ ।

কানহার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার একটা অসামান্য সংযোজন । এত ভালো এই ধরনের সেন্টার কোনও জঙ্গলে দেখিনি । এটা কানহায় বলতে কানহা জায়গাটাতেই । মুক্কি থেকে ‘কানহা জাতীয় উদ্যান’-এ ঢুকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গিয়ে ‘কানহা’ আর সেখান থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার কিসলি । কিসলি থেকে আরও ৩ কিলোমিটার খাটিয়া, যেটা জাতীয় উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম এবং অন্যতম প্রবেশদ্বার । কানহায় পর্যটকদের ঘুরে বেড়াতে হয় কতগুলো নির্দিষ্ট রাস্তায়, এই খাটিয়া-কিসলি-কানহা-মুক্কির আশপাশকে কেন্দ্র করে । গাড়ি থেকে নামা ভীষণভাবে বারণ, হাতি থেকে তো বটেই । গাড়ি থেকে প্রায় সবকিছুই দেখা যায়, এমনকী বাঘও । এইভাবে বাঘ দেখাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, ওই বাঘবন্দীর আপাত-কৃত্রিমতা এখানে প্রভাব ফেলে না । আমরা অনেক কিছুই দেখেছি গাড়ি থেকে; বারাশিঙ্গা, চিতল, বুনো শুয়োর, শেয়াল এইসব ।

কানহায় তৃণভোজী প্রাণীদের অনেক প্রজাতি । যেগুলো দেখেছি সেগুলো ছাড়াও গাউর যথেষ্ট সহজলভ্য । বার্কিং ডিয়ার বা কুটরা সংখ্যায় ভালোই, যেহেতু দল গড়ে থাকে না তাই দেখা অপেক্ষাকৃত শক্ত । কৃষ্ণসার আর নীলগাই আছে, সংখ্যায় অতি নগণ্য । চৌশিঙ্গাও দেখা যায় মাঝেমধ্যে । মাংসাশীদের মধ্যে বাঘ আছে একশোর কাছাকাছি; এছাড়া চিতাবাঘ, বনকুকুর বা ঢোল ইত্যাদি । জঙ্গলের ঝাড়ুদার আছে কিছু, যেমন শেয়াল আর হায়না । বুনোশুয়োর পর্যাপ্ত; শ্লথ ভাল্লুকও বিরল নয় । ছোটখাটো স্তন্যপায়ী যেমন বেজি, ভাম, প্যাঙ্গোলিন, বনবেড়াল-এরাও ভালোই আছে । হনুমানের কথা আলাদা করে লিখছি না, তাদের আধিক্য জঙ্গলেও যেমন শহরেও তেমনই ।

কানহা পাখিদেরও স্বর্গরাজ্য । খুব বেশি দেখেছি ময়ূর, দাঁড়কাক, র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো, হাঁড়িচাচা বা ইন্ডিয়ান ট্রি পাই আর নীলকণ্ঠ । জলাশয়গুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখেছি ছোট সরাল, কটন টিল, পিনটেল, ড্যাবচিক আর ছোটবড় একগাদা বক । পাখিদের তালিকা দীর্ঘতর করে লাভ নেই; প্রথমত অনেকক্ষণ চলবে, দ্বিতীয়ত যে যাচ্ছে সে প্রতিবারেই কিছু না কিছু রকমফের দেখবে । তবে এত বেশি ময়ূর জঙ্গলে খুব একটা দেখিনি । একটা অসামান্য দৃশ্য দেখেছি একদিন । আমাদের গাড়ি বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল । রাস্তার ঠিক মাঝখানে একদম সোজাসুজি একটা ময়ূর, তার পূর্ণপেখম যেন চালচিত্রের মতো আড়াআড়ি মেলে ধরা । পেখম খোলা ময়ূর এপাশে ওপাশে হামেশাই দেখি । এ যেন একটা বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের পাঁচিল তুলে সরাসরি আমাদের

গাতিরোধ করল। ক্ষণিকের দৃশ্য, তবু ওই পলকের দেখায় জাতীয় পাখি যেন এই যাত্রায় অতিক্রম করে গেল আমাদের জাতীয় চতুষ্পদকে।

কানহায় কোনও বড় ধরনের সমস্যা নেই। জাতীয় উদ্যানের অসাধারণ ম্যানেজমেন্ট, পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধে, তাঁদের ওপর বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ, এ সবই যেন সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কানহা শুধু দর্শনীয়ই নয়, কানহা শিক্ষণীয়-নিসর্গ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসেন এরকম প্রতিটি ভারতীয় পর্যটকের কাছে।

ভ্রমণ এপ্রিল, ১৯৯৭

মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রা

কাজল দত্ত

পঞ্চকেদারের মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কেদার অর্থাৎ যথাক্রমে মদমহেশ্বর এবং রুদ্রনাথ । দুর্গম এই পাঁচ শৈবতীর্থে যেহেতু শীতকালে ভারি তুষারপাত হয় তাই মহাদেবের এই পঞ্চ রূপের শীতকালীন আবাস অপেক্ষাকৃত নিচের বিভিন্ন মন্দিরে । সাধারণভাবে দীপাবলি থেকে অক্ষয় তৃতীয়া শীতের এই ছমাস কেদারনাথ এবং মদমহেশ্বর পূজিত হন উখিমঠে । পাঁচটি কেদার প্রতি বছরে অক্ষয় তৃতীয়ার পরে তিথি অনুযায়ী পূর্বঘোষিত বিভিন্ন দিনে ডোলিতে চেপে গ্রীষ্মকালীন আবাসে পৌঁছে যান । ডোলির বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা জীবনের এক পরমপ্রাপ্তি । পঞ্জিকা মতে, অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন পরে দুটি তিথি অনুযায়ী দিন ধার্য থাকে শিব প্রতিষ্ঠার । এর মধ্যে প্রথমটিতে কেদারনাথ এবং দ্বিতীয়টিতে মদমহেশ্বর খোলে । এই বছরে মদমহেশ্বরের আরোহণপর্বের ডোলিযাত্রা উখিমঠ থেকে শুরু হয় ২২ মে । মদমহেশ্বর মন্দিরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় ২৪ মে । সরকারিভাবে ওইদিন থেকেই মন্দির সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় । তার আগে এই বছর কেদারনাথের মন্দির খুলে যায় ১৭ মে ।

২০ মে হৃষীকেশ থেকে সকাল আটটায় রুদ্রপ্রয়াগগামী বাসে চেপে শিবপুরী, বিয়াসি, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছে যাই ঘণ্টাছয়েকে । সবুজহীন আঁকাবাঁকা পাহাড়িপথে বাস চলতে থাকে । দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদী মিলিত হয়ে গঙ্গার সৃষ্টি করেছে । দেবপ্রয়াগের পর রাস্তা অলকানন্দার ধার ধরে এগিয়েছে । রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী এসে আছড়ে পড়ছে অলকানন্দার বুকে । আধুনিক রুদ্রপ্রয়াগে একটা রাত কাটিয়ে, পরদিন সাতসকালে ভাড়া করা জিপে উখিমঠের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি । উদ্দেশ্য মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রায় অংশগ্রহণ করা ।

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার ব্রিজ পার হয়ে মন্দাকিনীর ধার ধরে রাস্তা । মস্ত বড় একটা টানেল পার হয়ে চওড়া মসৃণ রাস্তা সোজা চলে গেছে গৌরীকুণ্ডের দিকে । সেখান থেকে কেদারনাথের যাত্রা শুরু হয় । আমাদের গন্তব্য ভিন্ন । আমরা একে একে অগস্ত্যমুনি, সিয়ালসোর পেরিয়ে গুপ্তকাশীর কিছুটা আগে কুণ্ড থেকে মূল রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের সুদীর্ঘ

মহীরুহের ছায়াঘেরা পাকারাস্তা ধরে আরও পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে সটান পৌঁছে যাই উখিমঠের ভারত সেবাশ্রম সংঘের অতিথি আবাসগৃহের দোরগোড়ায় । অগ্রিম সংরক্ষণ কলকাতা থেকেই করা ছিল । জগন্নাথ মহারাজের আন্তরিকতায় বরাদ্দ হল বেশ বড়সড় একটা আরামদায়ক ঘর । বর্তমানে উখিমঠে থাকার জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের অতিথিশালার দ্বিতীয় কোনও বিকল্প পাওয়া যাবে না । ঝকঝকে সাততলা সুবিশাল অতিথিশালাটি এককথায় অনবদ্য । অন্তত শদুয়েক লোক থাকতে পারে । প্রবেশপথ ছয়তলা দিয়ে, মন্দির চারতলায় । ক্যান্টিন তিনতলায় । ঘরের সামনের টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি বহু নিচে সরু ফিতের মতো পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী বয়ে চলেছে । ঠিক তার গা ঘেঁসে পুল পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডের দিকে রাস্তা চলে গেছে । উখিমঠে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো । সংঘের স্কুলে প্রচুর স্থানীয় ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে । এছাড়াও নিষ্পাপ, হতদরিদ্র গাড়োয়ালি মানুষগুলোকে সাধ্যমতো সাহায্য করছেন ওঁরা । সন্ধ্যায় সংঘের মন্দিরে গেলাম আরতি দেখতে । কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাকের বাজনায় মহারাজ নিজে আরতি করে ভজন গান করলেন । মনটা ভরে উঠল ।

মন্দাকিনীর দুদিকে পর্বতশিরে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে দুটি জনপদ । উখিমঠ এবং গুপ্তকাশী । হাজার চারেক ফুট উচ্চতায় উখিমঠের পৌরাণিক নাম শোনিতপুর । ক্রমে শোনিতপুরের নাম বদলে হয় ঊষামঠ । কালক্রমে উচ্চারণভেদে ঊষামঠ হয় উখিমঠ । শোনিতপুরের মঠে অর্থাৎ শিবমন্দিরেই বর্তমানে শীতকালে কেদারনাথ এবং মদমহেশ্বরের পুজো হয় । বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির সমিতির প্রধান কার্যালয়ও এই উখিমঠের মূল মন্দিরে । সুবিশাল চত্বরে পাথরের তৈরি মন্দিরটি অতি সুন্দর । মূল মন্দিরে শিবলিঙ্গ রয়েছে । এছাড়াও ঊষা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর অধিষ্ঠান এখানে । পরদিন মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রা শুরু হবে তাই সাজো সাজো রব । কেদারনাথ আগেই চলে গেছেন । মদমহেশ্বরের যাত্রী শুনে আনন্দিত পূজারী তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ জানালেন ডোলিযাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য । আমরাও সানন্দে রাজি ।

আগেরদিনই উখিমঠ বাজারের জিপস্ট্যান্ডে একটা জিপ ঠিক করে রাখা ছিল । সকালবেলায় সময়মতো সেও হাজির । দিন ছয়েকের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাকি মালপত্র সংঘের ক্লোকরুমে রেখে পরম নিশ্চিন্তে রওনা দিলাম । প্রথমেই গেলাম উখিমঠের মন্দিরে । দেখি দেবতার পাল্কিবাহকেরা সুসজ্জিত হয়ে দেবতাকে ডোলিতে ওঠানোর কাজে ব্যস্ত । মাঙ্গলিক পূজার্চনার শেষে দেবতার ডোলিযাত্রা শুরু হয় । ঢাকঢোল, কাঁসরঘণ্টা, শিঙা-সানাই বাজিয়ে ভগবান মদমহেশ্বর যাত্রা শুরু করলেন গ্রীষ্মাবাসের দিকে । ফুলের মালা ও চন্দনে ডোলি সুসজ্জিত করা হল । ডোলি যাবে একটু ঘুর পথে সব গ্রাম ঘুরে রাওলেক্ষ

হয়ে রাঁসি । প্রথমদিনের গন্তব্যস্থল । ডোলিযাত্রার সূচনা হতেই আমরা জিপে চেপে বসলাম । জিপ ছুটল মনসুনা হয়ে যোগাসুর দিকে । উখিমঠ বাজার পার হয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাকারাস্তা । মনসুনা ছোট্ট একটা পাহাড়ি জনপদ । দোকানপাট, হাটবাজার, বিদ্যুৎ সবই আছে । মনসুনার পরে কাঁচারাস্তায় আরও পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে জিপ থামল একেবারে মদমহেশ্বর গঙ্গার ধারে । এরপরে আপাতত যান চলাচলের উপযোগী কোনও রাস্তা নেই । সামনেই মদমহেশ্বর গঙ্গা প্রবল গর্জনে বয়ে চলেছে । নদীর ওপারে বাঁদিকে বহু উঁচুতে রাওলেঙ্খ । নদী পার হয়ে সামনের ডানদিকে সবুজ পাহাড়ের মধ্য দিয়েই পথ গিয়েছে মদমহেশ্বরের দিকে । যোগাসু থেকে যাতায়াতে ন্যূনতম চারদিন আর সর্বাধিক ছয়দিন লাগে । কঠিন চড়াইপথে পথচলার ক্ষমতার ওপরে যাত্রার দিনসংখ্যা নির্ভর করে । পথে পড়বে উনিয়ানা, রাঁসি, আখতোলি, গোণ্ডার, বানতোলি, খাড়ারা, নানু, মাখামা প্রভৃতি গ্রাম । ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে প্রবল বর্ষণ এবং ভূকম্পনে যোগাসু এবং রাওলেঙ্খ গ্রামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় । মধ্যরাতের প্রবল ভূকম্পনে একটা আস্ত পাহাড় ভেঙে পড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মদমহেশ্বর গঙ্গা বেশ কয়েকদিনের জন্য । সৃষ্টি হয় সুবিশাল এক হ্রদের । পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যায় অজস্র ঘরবাড়ি, চাষের খেত, গবাদি পশু এবং অর্ধশতাধিক মানুষ । এখন অবশ্য সেই হ্রদের কোনও অস্তিত্ব নেই । নদী তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে আবার । এখন মদমহেশ্বর গঙ্গার ওপরে মস্ত বড় লোহার ব্রিজ তৈরি হচ্ছে । বিপরীত দিকে জিপ চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি হচ্ছে রাঁসি পর্যন্ত । আর কয়েক বছরের মধ্যেই যোগাসুর ব্রিজ পার হয়ে জিপ চলে যাবে রাঁসি পর্যন্ত । ওপাশে গুপ্তকাশী থেকে কালীমঠ হয়ে রাওলেঙ্খে পথ এসেছে । তবে দূরত্ব বেশি পড়ে বলে যোগাসুই প্রথম পছন্দ । জিপ থেকে নেমেই দেখা হয়ে গেল রাওলেঙ্খের রাজিন্দর সিংয়ের সঙ্গে । দৈনিক দেড়শো টাকার চুক্তিতে সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ । এই পথে ঘোড়া-খচ্চর কিছুই পাওয়া যায় না । বিশেষত মে-জুন মাসে । যদিও বা কারও কাছে ঘোড়া থাকে এই সময়ে সেসব চলে গেছে গৌরীকুণ্ডে ।

মদমহেশ্বর গঙ্গার ওপরে কাঠের গুঁড়ি ফেলা পায়ে চলা দুটি সাঁকো পার হয়ে বিস্তৃত পাথুরে অঞ্চল । পাকদণ্ডীপথে রাস্তা ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে । ডানদিকে চৌখাম্বা দৃশ্যমান । ঘণ্টাখানেকের কঠিন চড়াই ভেঙে রাওলেঙ্খ-রাঁসি মূলসড়কে উঠে আসি । ঘন গাছগাছালিতে ঘেরা পথ । ওপর থেকে বহু নিচে তাকিয়ে দেখি মদমহেশ্বরের সুসজ্জিত রঙিন ডোলি যোগাসুর ব্রিজ পার হচ্ছে । ডোলির জন্য দাঁড়িয়ে পড়ি । এক সময়ে শিঙা ফুকিয়ে, কাঁসর-ঢোল বাজিয়ে, রুপোর ধর্মদণ্ডে লাল-হলুদ পতাকা লাগিয়ে ডোলি এসে পড়ল । সামনে ধ্বজাধারীর দল, দ্বিতীয় সারিতে ভগবানের ডোলি, পিছনে ঘোড়সওয়ার লাল ধুতি গেরুয়া জোব্বা পরিহিত প্রধান পূজারী । পূজারী কর্নাটকের ব্রাহ্মণ । নাম

শ্রীরাজশেখরলিং । সবার পিছনে অগণিত ভক্ত, স্থানীয় পুণ্যকামী মানুষ, পুলিশ, সাংবাদিক, মোটবাহক । সব মিলিয়ে হৈহৈ ব্যাপার । দ্রিমি দ্রিমি বাজনায় আমরাও পা মেলালাম । আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠলাম । হেলে দুলে ডোলি এগিয়ে চলে । মূল বিগ্রহ সোনালি রঙের পাল্কিতে লাল-হলুদ সিল্কের কাপড়ে ঢাকা । পাল্কির মাথায় রুপোর ছাতা । ছাতার ওপরে রুপোর ছোট পতাকা । একটি বেতের ডোলিতে বাঘছালে রাখা পুজোর উপকরণ ।

পথ চলেছি আশি বছরের যুবক ত্রিলোক সিংজির সঙ্গে । গোণ্ডারের লোক । সুঠাম চেহারার একদা মেষপালক আমুদে ত্রিলোকজির জীবনে একটাই গর্ব যে উনি কোনওদিন 'নোকরি' করেননি । তাঁর এক ছেলে বর্তমানে ভেড়বখরির দেখাশোনা করে এবং আরেকজন রাকেশ মদমহেশ্বরে চটির হোটেল চালায় । ত্রিলোকজি খালি পায়ে হাঁটছেন । অফুরন্ত দম । মহারাষ্ট্রের এক প্রৌঢ় দম্পতি চলেছেন ডোলিযাত্রায় । ওঁরা একযোগে পঞ্চকেদার পরিক্রমায় বেরিয়েছেন । জিজ্ঞাসা করি, কেদারনাথ ছাড়াও যে আরও চারটে কেদার আছে সে খোঁজ পেলেন কোথা থেকে? আমার ভুল ভাঙিয়ে বেশ অবাক করে দিয়েই বললেন যে ওঁরা শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন, কিন্তু ওঁর লেখা কোনও বই পড়েননি । তবে ভারতবর্ষে বাঙালিদের পরে একমাত্র মহারাষ্ট্রের লোকেরাই বেশিমাত্রায় পঞ্চকেদার যাত্রা করেন বলেও জানালেন । উত্তরাঞ্চলের গৌচরের দুই ছাত্র চলেছে ডোলিযাত্রায় । তারা জানাল যে পাহাড়ের লোক হলেও এই পথে প্রথম আসছে তারা । হঠাৎই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রায় যোগ দেবে বলে । দেরাদুনের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ফৌজি অফিসার উধম সিং নেগি একাই খালি পায়ে পথ চলছেন একেবারে ফৌজি মেজাজে । উনি জানালেন, তাঁর বহুদিনের সাধ পূরণ হতে চলেছে । ডোলি পৌঁছল উনিয়ানা গ্রামে । গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বরণ করে নিল দেবতাকে । দেবতাও প্রত্যেকের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দর্শন দিলেন । উনিয়ানার বেশ কিছু লোক যোগ দিলেন মদমহেশ্বরের ডোলির শোভাযাত্রায় । এই ফাঁকে আমরাও তাড়াতাড়ি চা-পান পর্ব চুকিয়ে নিলাম । রাঁসি পর্যন্ত রাস্তা হালকা চড়াই । প্রথমদিনের ট্রেক, তাই গতি বৃদ্ধি করতে অসুবিধা হচ্ছে । ডোলির সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন ।

আজ ২২ মে । ডোলি যাবে রাঁসিগ্রাম পর্যন্ত । ওখানে রাকেশ্বরীমাতার মন্দিরে ভগবান নিশিযাপন করবেন । আমরা দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম । একটা ধসপ্রবণ এলাকা সাবধানে পার হয়ে এগোতে থাকি চড়াইপথে । ডোলি তখন কিছুটা পিছনে । ডানদিকে অনেকটা নিচ দিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খরস্রোতে মদমহেশ্বর গঙ্গা বয়ে চলেছে । গাছপালা কেটে রাস্তায় পাথর ফেলে জিপ চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি হচ্ছে । ঠিকাদারের লোক জানাল, আর বছর দুয়েকের মধ্যেই রাঁসিগ্রাম পর্যন্ত জিপ চলে যাবে । তখন সর্বসাধারণের জন্য মদমহেশ্বর অনেকটাই সুগম হয়ে উঠবে । রাঁসিতে প্রবেশের

প্রথমেই বাঁদিকে মহেশ সিং বিস্ট-এর চৌখাম্বা হোটেল এবং লজ । মালপত্র কোনওমতে নামিয়ে রেখে ক্যামেরা নিয়ে দৌড় দিলাম মূল গ্রামে । আজ যেহেতু ভগবান এখানেই থাকবেন তাই সমগ্র গ্রামে উৎসবের মেজাজ । শান্ত নিরিবিলি কৃষিনির্ভর রাঁসিগ্রাম যথেষ্টই বর্ধিষ্ণু । পাহাড়ি সৌন্দর্যের মাঝে সুপ্রাচীন রাকেশ্বরী দেবীর মন্দিরের ভাবগম্ভীর পরিবেশে অগণিত স্থানীয় মানুষের ভিড় । যথাসময়ে ভগবানের ডোলির শিঙার ধ্বনি । গৃহবধূরা সেজেগুজে নতুন শাড়ি পরে যে যার দরজায় কুলোয় যব ও ধান নিয়ে এসে দাঁড়ায় । দুর্গম পাহাড়ের অন্তঃপুরে সত্যিই এঁরা যেন ভগবানের আশীর্বাদে বেঁচে আছে । মহাসমারোহে মদমহেশ্বরের ডোলি এসে দাঁড়ায় গৃহস্থের দুয়ারে । গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি চলমান ডোলি হেলেদুলে নুয়ে পড়ছে মানুষ ভগবানের দিকে । দুহাত ভরে ধানের অঞ্জলিতে মদমহেশ্বরকে ভরিয়ে দিচ্ছে গৃহবধূরা । কোনও লোক মাথা নত করছে না, ভগবানই যেন মাথা পেতে মানুষের আশীর্বাদ নিচ্ছে । ভগবানের এহেন জনমুখী কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাই । সমগ্র গ্রামটি পরিক্রমা করে সকলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রতিটি গৃহস্থের অঞ্জলি গ্রহণ করে মদমহেশ্বরের ডোলি রাকেশ্বরী মন্দিরে প্রবেশ করে । হেলেদুলে একাধিকবার মন্দির পরিক্রমান্তে ডোলিবাহকরা ভগবানকে মাটিতে নামিয়ে রাখে । শুরু হয় পূজাপাঠ-হোমযজ্ঞ । এ যেন দীপাবলি! গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে থালায় করে ধান, ফুল, তেল-হলুদ, সিঁদুর, চাল এবং ঘিয়ের প্রদীপ এসেছে । মন্দিরের চত্বরে অগণিত অর্ঘে ঝিকমিক করে জ্বলছে প্রদীপ । পূজারী রাজশেখরলিং ঘণ্টা বাজিয়ে শুরু করলেন আরতি । ধূপের সুগন্ধে এবং ঘণ্টাধ্বনিতে চারদিক ভরে উঠল । মন্দির চত্বরে তখন তিলধারণের জায়গা নেই । ছোট ছেলেমেয়েরা রঙিন নতুন পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পুজো দেখছে । মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রা উপলক্ষে তাদের কদিন স্কুল ছুটি । রাকেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পূজারী জনার্দন ভট্ট বর্তমানে প্রয়াত । তাঁর পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ ভট্ট এখন একটি দোকান এবং হোটেল চালায় ।

চৌখাম্বা লজের দোতলায় একটি ঘরে আশ্রয় মিলল । খাওয়াদাওয়া ওখানেই । সন্ধেবেলায় ত্রিলোকজি এলেন খবর নিতে । খুললেন গল্পের ঝোলা । খাঁটি পাহাড়ি মানুষটি খুব সহজেই আমাদের আপন করে নিলেন । পেশাগত কারণে উপরি মদমহেশ্বর অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পথই ওঁর নখদর্পণে । সন্ধে নামতেই ঠান্ডা বাড়তে থাকল এবং সেই সঙ্গে একরাশ মেঘ রাঁসিগ্রামকে (৬,৮৮০ ফুট) আচ্ছন্ন করল । হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতে ত্রিলোকজি শোনালেন বহুকাল আগে পানপাতিয়া হিমবাহ অঞ্চলে এক বাঙালি অভিযাত্রীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কাহিনী এবং আরেকবার নিজের ভেড়ার পাল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাতভর একটি চিতাবাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করার গল্প । উপস্থিত গ্রামবাসী সকলেই ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানিয়ে বললেন, যুবা বয়সে মনসুনার ওপরে ত্রিলোকজিই

ছিলেন সবচেয়ে বড় কুস্তিগীর । এখন বার্ধক্যজনিত কারণে রাতে চোখে একটু কম দেখেন । পরদিন ডোলি যাবে সাত কিলোমিটার দূরে গোণ্ডার গ্রাম পর্যন্ত । সেখানে ভগবান রাত্রিবাস করবেন ক্ষেত্রপালের মন্দিরে । পরদিন আমরা যাব নানু পর্যন্ত । রাঁসি থেকে নানুর দূরত্ব তেরো কিলোমিটার ।

২৩ মে ২০০২, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে ঢাকঢোল বাজিয়ে, শিঙা ফুঁকিয়ে আবার শুরু হল মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রা । রাঁসিগ্রামকে পিছনে ফেলে উতরাই পথে দ্রুত নামতে থাকি । আখতোলি গ্রামের সবুজ খামারের মধ্য দিয়ে মসৃণ পথ । সামনেই ওপরে সোজা দেখা যায় বরফাবৃত পাণ্ডুসেরা এবং নন্দীকুণ্ড । শুরু হয় ঘন জঙ্গল । আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি । ডোলিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিই । কারণ কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে পাখির ডাক চাপা পড়ে যাচ্ছে । পঞ্চকেদারের একমাত্র কেদারনাথ বাদ দিয়ে বাকি চারটি কেদারের মন্দির কেদারনাথ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির মধ্যে । উখিমঠ থেকে যোশিমঠ পর্যন্ত উচ্চ হিমালয়ের প্রায় এক হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে এর বিস্তৃতি । চিরহরিৎ এই অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হায়না ছাড়াও প্রচুর বারশিঙ্গা এবং কস্তুরীমৃগ রয়েছে । মদমহেশ্বরের রাস্তায় মাঝে মাঝে বনবিভাগের চেকপোস্ট আছে । বনকর্মীরা রাতে পাহারা দেয় । কারণ কস্তুরীমৃগের জন্য ওই অঞ্চলে অবাধ চোরাশিকার চলে । এই জঙ্গলের আরেক সম্পদ ভেষজ উদ্ভিদ এবং বিরল প্রজাতির পাখি । চোরাশিকারীদের কাছে এর মূল্যও কম নয় । ১৯৭২ সালে এই জঙ্গল অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় ।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঝরাপাতায় ঢাকা সঙ্কীর্ণ উতরাই পথে নিচে নামতে থাকি । গাছের ফাঁক দিয়ে বহু নিচে মদমহেশ্বর গঙ্গার সফেন জলরাশি চোখে পড়ছে । স্যাঁতসেঁতে ঘন জঙ্গলের ছায়াঘেরা মোড়ে ভিমসি ঝরনার ওপরে কাঠের পুলে এসে পড়ি । কয়েকশো ফুট ওপর থেকে বাঁদিকে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে বহু নিচে শ্যাওলা সবুজ কুণ্ডে । অপরূপ সেই দৃশ্য । এগিয়ে চলার পথে জঙ্গল হয়ে ওঠে গভীর থেকে গভীরতর । একটানা ঝিঁঝির ডাকের মাঝে হঠাৎ দেখি একটা স্কারলেট মিনিভেট পাখি । উজ্জ্বল লাল ও কালো রঙে বাহারই তার আলাদা । পথ চলতে চলতে হিমালয়ান ডিপার, লংটেল, ছোট ছোট ফ্লাইক্যাচার প্রভৃতি অজস্র পাখি চোখে পড়ে । নিঃঝুম অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলার অনুভূতি অন্যরকম । যেহেতু এই পথে লোকজন খুবই কম আসে তাই নেই কোনও হট্টগোল । বেশ আরামে হেঁটে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাই গোণ্ডারে (৬,০০০ ফুট) । মদমহেশ্বর গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁসে গোণ্ডার এক প্রাচীন, শান্ত এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম । গ্রামে ঢোকার মুখেই বাঁদিকে রমেশ পাঁওয়ারের কৈলাস ট্যুরিস্ট লজ । প্রাতরাশের পর্ব চুকিয়ে ক্ষেত্রপালের মন্দিরে যাই । মন্দিরটি কাঠের তৈরি দোতলা বাড়িতে । ভগবান মদমহেশ্বরকে ডোলি থেকে নামিয়ে পুজোপাঠ চলছে । প্রধান পূজারী হাতে প্রসাদ তুলে

দিলেন। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। বেগতিক দেখে লটবহর উঠিয়ে হাঁটা শুরু করি। অল্প সময়েই এসে পড়ি বানতোলিতে (৬,১০০ ফুট) মার্কণ্ডেয় গঙ্গার ওপরের ব্রিজে। চৌখাম্বা গিরিশৃঙ্গমালা ও তার আশপাশের শৃঙ্গের হিমবাহগলা জলে পুষ্ট উপরি গান্ধারপোঙ্গী বা মার্কণ্ডেয় গঙ্গা উপত্যকায় অবস্থিত সুজল সরোবর থেকেই মার্কণ্ডেয় গঙ্গার উৎপত্তি। মার্কণ্ডেয় গঙ্গা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উপরি মদমহেশ্বর অঞ্চলের পাণ্ডুসেরা, নন্দীকুণ্ড, কাচনি অঞ্চল থেকে বরফগলা জলে সৃষ্ট মদমহেশ্বর গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে এই বানতোলিতে। মার্কণ্ডেয় গঙ্গা এবং মদমহেশ্বর গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত বানতোলি গ্রামটি সুন্দর। এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। এক সময়ে প্রখ্যাত পর্বতপ্রেমী, লেখক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বানতোলির রূপ এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করেন এখানে। অকৃতদার উমাপ্রসাদ এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান তাঁর পরমবন্ধু তুলা সিংকে। তুলা সিং বর্তমানে মৃত। তুলা সিংয়ের উত্তরসূরি বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। বাড়িটি বর্তমানে জীর্ণ, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত। যাইহোক বানতোলির পরেই শুরু হল মদমহেশ্বরের প্রকৃত চড়াই পথ। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে ওপরে উঠে চলা। পাইন, বাঁশ, দেবদারু, রডোডেনড্রনের ঘন জঙ্গল। গাছের গুঁড়িতে ঘন শ্যাওলার প্রলেপ। পাথরের গায়ে অজস্র ফার্ন ও অর্কিডের সমারোহ। গাইড রাজিন্দার সিং মালপত্র নিয়ে অনেকটাই আগে ফতে সিংয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাড়ারা খালের দিকে এগিয়েছে। ফতে সিং গোণ্ডারে রমেশ পাঁওয়ারের দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কিনে নিয়ে ওপরে উঠছে। খাড়ারায় সে আজ তার চটির হোটেল খুলবে। একদা মদমহেশ্বর গঙ্গা উপত্যকার শ্রেষ্ঠ ছাত্র বর্তমানে সংসার ছেড়ে বিবাগী ফতে সিং এখন কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। ফলে তার দোকানে চা খেয়ে, ঘরে বসে আরাম করলেও সহজে তার চটির হোটেলে কেউ রাত কাটাতে চায় না। খাড়ারায় উঠেই ডানদিকে বেশ সাজানো-গোছানো তার চটির হোটেল। ফতে সিং নিজের হাতে চা বানিয়ে এনে আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মানুষটি বেশ ভালো। খাড়ারায় কয়েক ঘর বসতি এবং একটি বনবাংলো আছে। খাড়ারার দুর্দান্ত ল্যান্ডস্কেপ উপভোগ করতে করতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম নানুর (৮,০০০ ফুট) উদ্দেশে। প্রবল বৃষ্টির মাঝে শুরু হল দুর্দান্ত চড়াইপথে আরোহণ। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরে নানুতে এসে পৌঁছলাম পড়ন্ত বিকেলে। নানুতে চটির হোটেলে স্থান বাড়ন্ত। কারণ দুটি দল ওখানে দুদিন ধরে অপেক্ষা করছে। নিয়ম অনুযায়ী মদমহেশ্বর মন্দিরে ডোলিতে ভগবান না পৌঁছলে জনসাধারণকে নানুর পরে আর এগোতে দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে ওখানে যথেষ্টই কড়া। ত্রিলোক সিংজির বোনের বাড়ি নানুতে। তাঁরই বদান্যতায় এবং গাইড রাজিন্দারের ব্যবস্থাপনায় 'বহিনজি' তাঁর সুসজ্জিত শোবার ঘরটি

আমাদের ছেড়ে দিয়ে শিশুপুত্র-কন্যা সহ হাসিমুখে চলে গেলেন রান্নাঘরে । বহিনজির ছোট কন্যা গোণ্ডারের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ফুটফুটে গঙ্গা ব্যস্ত হয়ে পড়ল অতিথি আপ্যায়নে । সন্ধে নাগাদ বৃষ্টি থামল । দিনভর পথচলার ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর । মনে উৎসাহ জোগাতে ত্রিলোকজি আবার খুললেন তাঁর গল্পের ঝুলি । জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বসাধারণকে কেন ডোলি পৌঁছনোর আগের দিন পর্যন্ত মদমহেশ্বরে যেতে দেওয়া হয় না? উত্তরে জানালেন, মদমহেশ্বরের নাকি অনেক সম্পত্তি এবং গুপ্তধন আছে । সেই গুপ্তধনের সন্ধান জানে নাকি গোণ্ডার গ্রামের মাত্র দুজন লোক । তারা ছাড়া নাকি আর কেউ তার হদিশ জানে না এবং জানতেও দেওয়া হয় না । তাই গোণ্ডারের ওই দুজন নাকি প্রতিবছরে দুয়েকদিন আগে মন্দিরে পৌঁছে সবকিছু বাইরে বার করে ভগবানের তরফে হিসাবনিকাশ করে । তারপরে আবার যথাস্থানে রেখে দেয় । দেবাদিদেব মদমহেশ্বর নাকি তাদেরই মাধ্যমে সবকিছু হিসাব বুঝে নিয়ে তবেই মন্দিরে পদার্পণ করেন । ত্রিলোকজি আরও বলেন যে একবার সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে মন্দিরের গুপ্তকক্ষে যে সব সোনা-মণিমাণিক্য রয়েছে তার অডিট হবে । কিন্তু দেখা যায়, যে সরকারি কর্মচারীই আসুন না কেন রাত পোহালেই পালিয়ে যায় । সবশেষে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে প্রতি রাতে নাকি রাগী মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে আসেন । এই ঘটনার পরে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে আর হিসাব করার চেষ্টা করা হয়নি ।

২৪ মে ২০০২ সাল । হিমালয়ের অন্তঃপুরে একটা সুন্দর সকাল । চারদিকে রোদ ঝলমল করছে । স্বচ্ছ আবহাওয়ায় বহুদূরে গুপ্তকাশী স্পষ্ট দৃশ্যমান । মদমহেশ্বরের মন্দির আজ খুলবে । সাতসকালেই ডোলি রওনা হয়েছে গোণ্ডার থেকে । আমরা ডোলিতে যোগ দেব মাঝপথে । নানুর বেশিরভাগ মানুষই আজ মদমহেশ্বরের ডোলির সঙ্গে যাবে । ছোট্ট গঙ্গাও তার দিদি আরতির সঙ্গে ডোলিযাত্রায় যাবে । আমার ছোট্ট পুত্র সুমনকে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে । নানুর লোকজন সবকটি পুণ্যার্থী দলকে বিদায় জানাতে ভিড় করেছে । ত্রিলোক সিংজি একটি দুধেল গাভী ও তার বাছুরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন মদমহেশ্বরের উদ্দেশে । ওঁর দায়িত্ব পড়েছে মন্দিরের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে যে দুধ লাগে তার জন্য গাভী পৌঁছে দেওয়ার । ভারি আমুদে বৃদ্ধ মানুষটি খুব সহজেই আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে ওপরে উঠতে থাকলেন । তখন আমরা প্রায় মাখামাগ্রামের কাছে, আবার সেই ঢাকঢোলের দ্রিমি দ্রিমি শব্দ । মাখামাতে যোগ দিই ডোলিতে । 'জয় মদমহেশ্বর' বলে জয়ধ্বনি দিয়ে পা মেলাই মদমহেশ্বরের ডোলিযাত্রায় । গহন অরণ্যপথে কঠিন চড়াই ভেঙে এক সময়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিস্তৃত সমতল, সবুজ বুগিয়ালের মধ্যে মদমহেশ্বরের মন্দির এবং সংলগ্ন দোকানপাট । ডানদিকে তুষারাবৃত কাচনিখাল, পানপাতিয়া হিমবাহ অঞ্চল । দক্ষিণ-পূর্বে বিসুরিটপ, বামদিকে বুড়ামদমহেশ্বরের সবুজ

পাহাড়ি ঢাল । পাথরের তৈরি সুপ্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য কেদারনাথের মতোই । তবে একান্তভাবেই শান্ত ও নির্জন । ডোলি এসে মন্দির থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে পড়ল । অপেক্ষা, প্রথা অনুযায়ী মন্দির থেকে শাঁখ বাজিয়ে আবাহন সংকেত পাঠানো হবে । অবশেষে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল এবং ভগবান মদমহেশ্বর হেলেদুলে মন্দির প্রদক্ষিণ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন । উপস্থিত পুণ্যার্থীরা মদমহেশ্বরের জয়ধ্বনি দিয়ে পাহাড়ের অন্তঃপুর আলোড়িত করল । পলকেই দোকানপাট খুলে গেল, শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা । পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করার মতো । মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবতাকে আসনে বসিয়ে শুরু হল পূজার্চনা ।

আমরা স্থান করে নিলাম মন্দির-সমিতির অতিথিশালায় । কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ি । ব্যবস্থা মন্দ নয় । বিছানাপত্র আছে । অতিরিক্ত লেপ-কম্বল চাহিদা অনুযায়ী মেলে । তবে তার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হয় । ত্রিলোক সিংজি পুজোপাঠ সেরে আমাদের কুশল জেনে ফিরে গেলেন নানুর উদ্দেশে । ধীরে ধীরে স্থানীয়রা সকলেই নিচে চলে গেল । ভিড় কাটতে আমরা বেরিয়ে পড়ি মন্দির চত্বরে । মন্দিরের সামনে দুটি ঝরনাধারা নালা কেটে নিয়ে আসা হয়েছে । এটিই এখানকার একমাত্র পানীয় ও ব্যবহারের উপযোগী জল । মদমহেশ্বর মন্দিরের পিছনদিকে উত্তর-পূর্ব কোণে দুটি ছোট মন্দির এবং একটি কুণ্ড আছে । একটি পার্বতীর এবং অপরটি হরপার্বতীর । কালো কষ্টিপাথরের তৈরি হরপার্বতী মূর্তিটি চতুর্ভুজ শিবের । শিব প্রধান হাত দুটিতে একটি বীণা ধরে আছেন । অপর দুটির ডানহাতে ত্রিশূল এবং বামকর দেবী পার্বতীর অঙ্গে । উৎকুটিকাসনে বদ্ধ শিবের ডান পা । দক্ষিণা মূর্তি শিবের বামকোলে পার্বতী । হরপার্বতী উভয়েরই জটামুকুট । পার্বতীর বাঁহাতে দর্পণ এবং ডানহাত শিবের কণ্ঠলগ্ন । দেবীর অঙ্গে অলঙ্কার এবং মহাদেবের সর্পভূষণ । শিবের পায়ের কাছে বৃষ এবং পার্বতীর বাহন সিংহ । দক্ষিণ কোণে গণেশমূর্তি এবং বামকোণে কার্ত্তিকেয়র মূর্তি । সুবিশাল বাঁধানো চত্বরের কেন্দ্রবিন্দুতে মূল মন্দিরটি । অবশেষে প্রবেশ করি মন্দিরে । গর্ভগৃহ কেদারনাথের মতো অবারিত নয় । গর্ভগৃহের বাইরে থেকে পুজো দিতে হয় । মূল বিগ্রহটি অষ্টধাতুর তৈরি পঞ্চমুখী শিবের । চোখ দুটি অসম্ভব উজ্জ্বল । মস্তকে রৌপ্যমুকুট । ফুল ও চন্দনে নিপুণভাবে সজ্জিত । মদমহেশ্বরের মন্দির এগারো হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত ।

পরদিন খুব ভোরে যাত্রা শুরু করি বুড়ামদমহেশ্বরের পথে । মন্দিরের পাশ দিয়ে ঘন সবুজ পাহাড়ের ঢালে দেড় কিলোমিটারের চড়াইপথ । ছোট ছোট হলুদ ফুল ফুটে আছে চারদিকে । প্রায় বারো হাজার ফুট উচ্চতায় এক বিস্তীর্ণ সবুজ বুগিয়ালের মধ্যে পাথর দিয়ে সাজানো ছোট মন্দিরে মদমহেশ্বরের মূল শিবলিঙ্গটির অধিষ্ঠান । সামনেই ভৈঁষকুণ্ড । এই সময়ে কোনও জল নেই কুণ্ডে । অনিন্দ্যসুন্দর এই বুড়ামদমহেশ্বরে দাঁড়িয়ে খুবই

সামনে থেকে দেখা গেল সুবিশাল চৌখাম্বা পর্বতশৃঙ্গমালা । তার বাঁদিকে মান্দানি এবং ইয়াংবুককলের সাদা একটা ফালি । একেবারে ডানদিকে কাচনি অঞ্চল । বর্ষার পরে ভৈঁষকুণ্ডে জল থাকলে চৌখাম্বার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় । তখন তার সৌন্দর্যই আলাদা । সঙ্গে আনা ধূপ আর বুনো ফুল দিয়ে বুড়ামদমহেশ্বরের পুজোপাঠ সমাপ্ত হয় । বুড়ামদমহেশ্বরের শিবলিঙ্গটিই আসলে প্রকৃত মদমহেশ্বরের শিবলিঙ্গ । শিবলিঙ্গটি ভাঙা এবং একদিকে হেলানো । কথিত, তিব্বতের রাজার গাভী নাকি এখানে চরতে আসত । একবার দেখা গেল যে সবচেয়ে ভালো গাভীটির দুধ থাকে না । রাজা চললেন সরেজমিনে দেখতে । গিয়ে দেখলেন গাভীটি মদমহেশ্বরের শিবলিঙ্গের মাথায় অঝোরে দুগ্ধ বর্ষিত করছে । তিব্বতরাজ রাগের চোটে লাঠি দিয়ে সাধারণ পাথর মনে করে সজোরে আঘাত করেন । শিবলিঙ্গটি ফেটে গিয়ে একদিকে হেলে পড়ে । স্বপ্নাদিষ্ট হন তিব্বতরাজ এবং মহাদেব মদমহেশ্বরের নির্দেশেই অপেক্ষাকৃত নিচে আজকের এই মন্দির নির্মাণ করে দেন প্রায় হাজার বছর আগে । তিব্বতরাজের সেই দুগ্ধবতী গাভীর পায়ের খুরের চিহ্ন আজও দৃশ্যমান মন্দিরের পিছনের পাথরে, হরপার্বতী মূর্তিটির সামনে । বুড়ামদমহেশ্বর দর্শন করে নেমে আসি নিচে । আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হতে থাকে । ত্রিলোকজির ছেলে রাকেশের দোকান থেকে পুজোর ডালি কিনে মদমহেশ্বরের পুজোপাঠ সেরে যখন বেলা দশটা নাগাদ যাত্রা শুরু করি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে । তুমুল বৃষ্টির মাঝে পিচ্ছিল উতরাই পথে দিনভর হেঁটে বিকেল নাগাদ গোণ্ডারে নেমে আসি । রমেশ পাঁওয়ারের কৈলাস ট্যুরিস্ট লজের দোতলায় একটা আরামদায়ক ঘরে ঠাঁই মেলে । সারারাত চলে প্রবল বর্ষণের তাণ্ডব । পরদিন নেমে আসি রাঁসিতে । আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হয় । সূর্যাস্তে চৌখাম্বা লজের দোতলার বারান্দায় বসে দেখি আগুনরঙা নন্দীকুণ্ড এবং পাণ্ডুসেরা । ক্রমে নেমে আসে রাত । নিচে মহেশ বিস্টের দোকানে রেডিওতে মিহিসুরে গাড়োয়ালি সঙ্গীত বাজছে । এক বর্ণও বুঝি না তার, কিন্তু সুরের মাদকতা মনকে আচ্ছন্ন করে ।

২৭ মে, বর্ষণসিক্ত রোদ ঝলমলে সকাল । দ্রুত পায়ে নেমে আসি যোগাসুতে । ঝকঝকে নীল আকাশে চৌখাম্বা তখন নিজেকে জাহির করছে । সেই চেনা পথে মনসুনা হয়ে উখিমঠে পৌঁছে যাই ভারত সেবাশ্রম সংঘে । নীল আকাশের বুকে কেদারনাথ, কেদারডোম, কীর্তিস্তম্ভ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । সংঘের অতিথিশালার সেই টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি আলুলায়িত কুন্তলের মতো থাক থাক নেমে যাওয়া উখিমঠের সবুজ শ্যামলিমার দিকে ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০২

.কেনিয়ায় পাঁচ অরণ্য

প্রতাপকুমার রায়

স্বাভাবিক আদিম পরিবেশে বন্যপ্রাণী দেখতে কেনিয়া গিয়েছিলাম এবছর মে মাসে । কেনিয়াতে চৌত্রিশটি অভয়ারণ্য । তাদের নানা নাম, ন্যাশনাল পার্ক, ন্যাশনাল রিজার্ভ, ন্যাশনাল স্যাঙ্কচুয়ারি । সাধারণ মানুষ সবগুলিকে বলে গেম পার্ক । গেম পার্কগুলির প্রধান তোরণ নাইরোবি, কেনিয়ার রাজধানী । এক প্রসন্ন সকালে নাইরোবির জোমো কেনিয়াটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে যাঁরা বাড়িতে নিয়ে গেলেন, তাঁরা দীর্ঘকাল নাইরোবির অধিবাসী । প্রায় একশো বছর আগে তিন-চারটি বাঙালি পরিবার আফ্রিকার রেললাইন পাতবার কাজে কেনিয়া এসেছিলেন । তাঁদের উত্তরপুরুষের অনেকে কেনিয়াতে থেকে গিয়েছেন । প্রধানত নাইরোবিতে । মিত্র পরিবার তাঁদের অন্যতম । আমরা দুদিন এখানে ছিলাম । তারপর ছ-দিনের সাফারিতে পাঁচটি গেমপার্ক বা অভয়ারণ্য ঘুরলাম ।

কেনিয়ার বড় ব্যবসা পর্যটন । নাইরোবি শহরে দেখেছি এক-পা গেলেই ট্র্যাভেল এজেন্সি । আমরা আমাদের সাফারি কলকাতার ট্র্যাভেল এজেন্সিকে দিয়ে বুক করিয়েছিলাম । ছশো ত্রিশ ডলার মাথাপিছু । বস্তুত, ভালো ট্র্যাভেল এজেন্সি কদিনের সাফারিকে সার্থক ও মনে রাখবার মতো করে দেয় । প্রকৃতির অগোছালো সম্ভার এবং মানুষের সুপরিকল্পিত বিলাসের আয়োজন কত আনন্দময় হয়, আমাদের সাফারির দ্বিতীয় দিনেই অনুভব করেছিলাম । যোগাযোগ এমন, মাউন্ট কেনিয়া সাফারি ক্লাবে প্রবেশের প্রথম ফটকের পাশেই সেদিন দাঁড়িয়েছিল একটি উটপাখি । আমাদের অভ্যর্থনার জন্য নয় সেটা বুঝিয়ে দিল তার তাচ্ছিল্যের দ্বারা । কিছুমাত্র বিব্রত হল না । সদ্য বুঝি আহার করেছিল, একটা টেনিস বলের মতো তার ঠোঁট থেকে ক্রমশ দীর্ঘ গলা বেয়ে নামতে থাকল । ক্লাব বা লজগুলি আসলে হোটেল । সভ্যেরা কিছু বাড়তি সুখ-সুবিধা পায় । বলে রাখা ভালো ক্লাব, হোটেল আর লজগুলি সাধারণত অভয়ারণ্যের মধ্যেই অবস্থিত । তাই বন্য মুক্ত অস্ট্রিচটি নির্ভয়ে আমাদের ফটকের কাছে এসে গিয়েছিল । আসলে আমরাই অনধিকার প্রবেশ করেছি তার বিচরণ ক্ষেত্রে । আরও একটা কথা বলে রাখি । অভয়ারণ্য মানেই জঙ্গল নয় । মাসাইমারা তো বিস্তীর্ণ তৃণভূমি । মারা-কে বলতে পারি ঘাসের জঙ্গল ।

অস্ট্রিচকে ডাইনে রেখে আমরা মাউন্ট কেনিয়া সাফারি ক্লাবের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলাম । ঢেউখেলানো মাঠ দু-একশো একরে ছড়ানো । বর্ষার শুরুতে এখন সবুজে সবুজ । মাউন্ট কেনিয়া সাফারি ক্লাব বিভিন্ন অভয়ারণ্যে নানা ধরনের বাসস্থানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তার লাউঞ্জের কোমল আরামদায়ক সোফায় প্রায় নিমজ্জিত হয়ে কেনিয়ান কফি এবং উগ্রতর কোনও পানীয় হাতে নিয়ে সামনের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম । লাউঞ্জের ছাদ থেকে আভূমি কাচের জানালা, ঢেউখেলানো গাঢ় সবুজের অবারিত লন, দূরে দূরে কিছু গাছপালা, দুটি বৃহদাকার সারস অলস গতিতে ইতস্তত চলেছে, আরেকটি স্থিরচিত্রের মতো নিস্পন্দ । একপাশে দূরে সুইমিংপুলের জলের নীল ছোপ, রঙিন প্রজাপতির মতো বহু বর্ণে সংবৃত কিছু মানুষ, অনেকখানি বাঁদিকে ছোট লেক, ডানদিকে গাছের আড়ালে একসারি কটেজ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে । দৃষ্টি আরও প্রসারিত করলে শেষপর্যন্ত পৌঁছচ্ছে মাউন্ট কেনিয়াতে, আফ্রিকার দ্বিতীয় উচ্চতম শিখর, সমবাহু ত্রিভুজের মতো । এতক্ষণ মেঘে ঢাকা ছিল, হঠাৎ চূড়ার হালকা বরফ চিকমিক করে উঠল । শান্তি ও প্রমোদের এমন অগাধ অপার আয়োজন আর দেখিনি । বাসকক্ষগুলি সুসজ্জিত এবং আরামদায়ক, তেমনই সুন্দর বিশাল ভোজনকক্ষ । হবার কথাই । এই ক্লাবের সদস্যরা তো সামান্য মানুষ নন । আমেরিকার রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসন, আগা খান, বব হোপ, এমনকী টেলিভিশনের ডেভিড ফ্রস্ট ইত্যাদি এই ক্লাবের সদস্য । আমরা তাঁদের সৌজন্যে একদিনের অতিথি । যে দোতলা বড় লম্বা বাড়িতে আমরা ছিলাম সেটা ঢালের ওপর তৈরি করা । ঘরের সামনে টানা বারান্দা ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে । শেষ ঘরটা প্রায় বিশ ফুট নিচে ।

আহারাদির আয়োজনও তেমনই রাজকীয় ছিল । সন্ধ্যা সমাগমে স্যুট পরা বিধি । স্যুট পরিহিত না হলে ভোজনকক্ষে প্রবেশ বারণ । জঙ্গলে বেড়াতে এসে স্যুট পরতে হবে শুনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি হয়েছিল । বন্যপ্রাণী দেখতে অভয়ারণ্যে এইসব অবান্তর কেতা কার ভালো লাগবে । কিন্তু সন্ধ্যার আগেই আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে এল । ছ-টার সময় ঘরে ঘরে ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল পরিচারিকারা ঘটা করে । শয্যায় গরম জলের ব্যাগ । খাবার ঘরে ঢুকে মনে হল অনধিকার প্রবেশ করেছি । মৃদু আলো জ্বলছে ইতস্তত । মহার্ঘ সাজসজ্জার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার অল্প আলোয় । সুসজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ মৃদুকণ্ঠে কথা বলছেন, ভোজনকক্ষে একপ্রান্তে ওয়ালটজ বাজাচ্ছেন পাঁচজন শিল্পী । খাদ্যাদিও রমণীয় ছিল । ছ-পদের এমন ডিনার এখন শুধু বইতেই পড়া যায় । স্যুট পরার বিরক্তি কখন চলে গিয়েছিল, প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন ।

যাত্রার দ্বিতীয় দিনে আমরা মাউন্ট কেনিয়া সাফারি ক্লাবে ছিলাম । প্রথমদিন সকালবেলা রওনা হয়ে আমরা প্রথম থেমেছিলাম নিয়েরি নামের একটি ছোট শহরে ।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল তাঁর শেষ জীবনের ক-বছর এই শহরে কাটিয়েছিলেন । এখন বাড়িটি পর্যটকের দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে । আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জন আমাদের আধঘণ্টা সময় দিয়ে একটা বড় দোকানের সামনে নামিয়ে দিল । দোকান বলতে একটা বিশাল চালাঘর । কাঠের আর পাথরের ছোট-বড় কাজে ভর্তি । মনে হল কয়েক হাজার মূর্তি আছে । দাম জিজ্ঞাসা করে প্রায় নির্বাপিত হয়ে গেলাম । কিন্তু দোকানদার বেরোতে দিতে চায় না । নিজেই দাম কমায়, জেদ করতে থাকে আমরা একটা কিছু দাম বলি । কী বলব? দাম যা বলছে তাতে ওই চালাঘরের দোকানে মোট হিসাবে বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকার সামগ্রী আছে । একটু পরেই আমরা খেলাটা বুঝে গেলাম । দোকানি শুরু করে পাহাড়ের চূড়া থেকে, আর আমরা শুরু করি একেবারে পাদদেশে । আমাদের দরদস্তুরে ব্যুৎপত্তি দেখে আমাদের সঙ্গী দুটি আইরিশ মেয়ে চমৎকৃত । যদিও এখানে কিছু কেনা হল না । ব্যাডেন পাওয়ালের বাড়িও যাওয়া হল না । আমরা আবার প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা দিয়ে তীব্রগতিতে রওনা হলাম । বড় রাস্তা অর্থাৎ হাইওয়েগুলি খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করা হয় । কোথাও গতির অন্তরায় হয় না । দুপাশে সবুজ ঢেউখেলানো প্রান্তর, কদাচিৎ কিছু বসতি । দূরে ছোট-বড় পাহাড়ের সারি ।

দ্বিপ্রহরের অল্পপরেই আমরা যেখানে পৌঁছলাম সে অঞ্চলের নাম অ্যাবারডেয়ার । বড় রাস্তা থেকে কাঁচা উঁচু-নিচু জনহীন পথ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাবার পর অ্যাবারডেয়ার কান্ট্রি ক্লাব দেখা গেল । কয়েকটি সুদৃশ্য ছোট-বড় বাড়ির সমষ্টি । এখানেই আমাদের দ্বিপ্রহরের ভোজন হবে । ক্লাবের চৌহদ্দির মধ্যে ঢোকবার আগে বাঁদিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, সেইদিকে নির্দেশ করে সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে টু গেম পার্ক । ড্রাইভার জন বলল, আমাদের ভারি মোটঘাট সব এখানে জমা থাকবে । লাঞ্চের পর, শুধুমাত্র ছোট হাতব্যাগ নিয়ে আমরা অন্য একটা গাড়িতে করে দ্য আর্ক-এ যাব । সেখানেই রাত্রিবাস ।

আমাদের আর কিন্তু শোনার ধৈর্য ছিল না । সাইনবোর্ডের নির্দেশিত পথ ধরে আমরা গেম পার্কের দিকে দৌড়লাম । প্রথমেই একদল বেবুনের সঙ্গে দেখা হল । এই বানর-প্রজাতি বেবুনদের মুখটা লম্বাটে হয় । তারা একদল খেলা করছিল মাঠে । আমাদের দেখে দ্রুত চলে গেল । অনেকখানি হেঁটেও আর কোনও প্রাণী দেখতে পেলাম না । লাঞ্চের সময়ও হয়ে আসছে, আমরা কান্ট্রি ক্লাবে ফিরে চললাম । দেখি আমাদের গাড়ির মতো আরও কয়েকটি গাড়ি পর্যটক নিয়ে এসে গিয়েছে । এই মধ্যবর্তী স্থানে সবারই মধ্যাহ্নভোজন হবে । ভোজনও পরম রমণীয় ছিল । বুফে অর্থাৎ সব খাবার, সম্ভবত পঞ্চাশটি পদ, টেবিলে সাজানো । খাবার নিয়ে ছুরি-কাঁটা সাজানো সুন্দর টেবিলে গিয়ে বসা যায় । আমরা একটা বারান্দায় গিয়ে বসলাম । পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই ।

বিয়ার অথবা ওয়াইন কিনে খেতে হচ্ছে । তার কত দাম জানি না, আমি একবোতল মিনারেল ওয়াটার চাইলাম । বড় আনন্দদায়ক ভোজন হল, সম্পূর্ণ ইউরোপীয়-দুয়েকটি সবজির পদ দেখে মনে হয়েছিল ভারতীয় ধারার । জলের বিল আসতে বিব্রত হয়েছিলাম । আমার সঙ্গে কেনিয়ান শিলিং, প্রায় শ-দেড়েক ছিল-ভারতীয় টাকার হিসাবে একশো টাকা । ভেবেছিলাম সুবিধা মতো ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে নেব । এক বোতল জলের বিল এল দেড়শো শিলিং । আমার কাছে দু-চার শিলিং কম আছে, তার ওপর বকশিশ । দ্বিধা করেও সঙ্গী আইরিশ মেয়েদের কাছ থেকে কিছু শিলিং নিতে হয়েছিল ।

হঠাৎ পর্যটকদের চাঞ্চল্য দেখে আমরাও উঠে পড়লাম । সবাই বাগানে নেমে দৌড়চ্ছেন । দূরে একটা ময়ূর দেখে সকলের আনন্দ আর ধরে না । শেষপর্যন্ত কিন্তু সবাইকে দমে যেতে হল । ক্লাবের পোষা ময়ূর ।

এবারে কয়েক গাড়ির যাত্রী মিলিয়ে আমরা একটি বড় বাসে করে যাব । আফ্রিকার অশেষ প্রান্তরের মধ্যে ভালো রাস্তা দিয়ে ঘণ্টাখানেক যাবার পর আমাদের বাস কাঁচা রাস্তায় উঠল এবং ক্রমশ দুপাশে গাছপালার জটলা বাড়তে থাকল । আমরা অ্যাবারডেয়ার পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছি । বন্যপ্রাণী দেখবার জন্য অধীরতায় অস্পষ্ট অর্থাৎ জন্তু-সদৃশ কোনও কিছু দেখলেই সবাই লাফিয়ে উঠছিল । যাত্রীরা জানলায় মুখ রেখে বসে আছেন । সামনের দিকের আসন থেকে উৎসাহব্যঞ্জক আওয়াজ শুনে আমরা সেদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম । নিরাশ হতে হল, রাস্তার ধারে একটা গাছের গুঁড়িমাত্র । অমনি আরেকবার উত্তেজনায় সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখলাম একপাল বেবুন । জঙ্গলের মধ্যে একটা ক্লিয়ারিং-এ বাস থামল । বাসের গাইড জানাল, আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে, এরপর আর বাস যায় না । এখান থেকে আর্কে পৌঁছতে হবে পায়ে হেঁটে । যাবার পথটা বিচিত্র, সরু পুলের মতো, কোথাও গাছের মাথার ওপর দিয়ে, কোথাও গভীর খাদ পার হয়ে আমরা কাঠের তৈরি মস্ত একটা চারতলা বাড়ির দোতলায় গিয়ে পৌঁছলাম । বাড়িটা বজরার আকার । তিনদিকের জঙ্গল প্রায় ঘিরে রেখেছে । একদিকে খানিকটা খোলা জমি, পাশে একটা জলা, তারপর জঙ্গল আবার ঝাঁপিয়ে এসেছে । খোলা জমির একস্থানে নুন ফেলে দেওয়া হয় । বন্যপ্রাণী নুনের স্বাদ নেবার জন্য এবং জল পানের জন্য এখানে আসে ।

কেনিয়াতে দ্য আর্কের মতো আরও দুটি হোটেল আছে, যাদের বলা হয় ট্রি হোটেল । এই পর্যায়ের প্রথম হোটেল ট্রি-টপস পৃথিবী-বিখ্যাত । ১৯৫২ সালে যখন সত্যিই ছিল ট্রি হোটেল অর্থাৎ গাছের ওপরে হোটেল, তখন বর্তমান ব্রিটিশ রানি এলিজাবেথ যে রাতে এই হোটেলে বাস করেছিলেন সেই রাতে তাঁর বাবা ষষ্ঠ জর্জ মারা যান । সন্ধ্যার রাজকুমারী সকালে রানি হয়ে ট্রি-টপস থেকে নেমেছিলেন । তখনকার সেই ট্রি-টপস আর

নেই, দুকামরার ট্রি-টপস। এখন সেখানে ৫২ কামরার হোটেল। খুঁটির ওপর তৈরি এই হোটেলটিতে থাকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমাদের ট্যুর প্রোগ্রামে ছিল দ্য আর্ক। এই ট্রি হোটেলগুলির বিশেষত্ব হল তাদের অবস্থান, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। হোটেলে প্রবেশ করে হোটেলেই বাস করতে হয়। বেরিয়ে অথবা নেমে কোথাও যাবার উপায় নেই। বলা যায় হোটেলের আকারে এক ওয়াচটাওয়ার। তবে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। দ্য আর্কের বাসকক্ষগুলি ছোট। কিন্তু সঙ্গে ঝকঝকে বাথরুম। লাউঞ্জ ইত্যাদি বেশ বড়। তেমনই বড় ভোজনকক্ষ ও পানশালা। সুসজ্জিত। সর্বত্র মস্ত মস্ত কাচের জানলা। এছাড়া তিনটি অবজারভেশন পোস্ট। দুটি বন্ধ কাচের জানলার এপারে, আরেকটি খোলা ডেকে বা ছাদে। আমরা বন্যপ্রাণী দেখবার জন্য চঞ্চল। নির্দিষ্ট ঘর চিনে নিয়েই অবজারভেশন পোস্টে ছুটলাম। সল্ট লিকে তখন গুটি ছয় হাতি এবং দশ-বারোটি বন্যমহিষ। পর্যটকরা উত্তেজিত। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক চলছে, ভিডিওর চাকা ঘোরার শিরশির। কথা বলা বারণ, বারবার বলে দেওয়া হয়েছে। যথাসম্ভব কম কথা বলবেন, আস্তে বলবেন, ফ্লাশ জ্বালাবেন না ক্যামেরার-জন্তুরা বিরক্ত হবে, ত্যক্ত হবে। ট্রি-হাউস হোটেলগুলিতে ছোট ছেলেমেয়েদের আনা বারণ।

আরেকটু দূরে ঘাসের আবছা আড়ালে দুটি ওয়ার্টহগ। হাতিরা প্রায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে, মহিষেরা মাটি চাটছে। ক্রমে বেলা পড়ে আসতে ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল-সামনেটা পরিষ্কার দিনের মতো উজ্জ্বল। কিছুক্ষণ পরে চারটি হাতি ফিরে বাঁদিকের জঙ্গলে চলে গেল। মহিষ দুটি জলার ধার দিয়ে ডানদিকে হাঁটতে লাগল। ওয়ার্টহগ দুটি ঘাসের আড়ালে বসে থাকল। আমাদের চা-পানের ডাক এসেছিল ইতিমধ্যে। চায়ের আসর থেকেও কাচের জানলা দিয়ে একপাশের জঙ্গল দেখা যায়। আবার দুটি হাতি মন্থর পায়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ থেমে গেল। আমরাও চুপচাপ বসে দেখছি, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই। বলে দেওয়া হয়েছিল যাঁরা সারা রাত অবজারভেশন পোস্টে বসে থাকতে না চান, তাঁরা নিজের ঘরের উষ্ণশয্যায় থাকবেন। উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটলেই প্রত্যেক ঘরে সাংকেতিক ঘন্টি বাজাবার ব্যবস্থা আছে। একটা ঘণ্টা বাজলে হাতি, দুবার বাজলে গণ্ডার ইত্যাদি।

রাতের প্রথম অংশ জাগরণেই কাটল। খাবার ঘর থেকেও একদিক দেখা যায়। কখনও গাছপালা নড়ে উঠল, হয়তো ছায়া ছায়া কিছু দেখা গেল, আমরা তৎক্ষণাৎ টেবিল ছেড়ে জানলার ধারে। শোবার আগে অনেকক্ষণ নানাদিক থেকে জন্তুদের দেখলাম। আফ্রিকায় বলে 'বিগ ফাইভ'-হাতি, সিংহ, বন্যমহিষ, গণ্ডার ও লেপার্ড (চিতাবাঘ)। লেপার্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয়। আমরা গণ্ডার দেখতে পাইনি আর্কে। মনে দুঃখ থেকে গিয়েছিল, তখন তো জানি না আর্ক উপক্রমণিকা মাত্র।

রাতে মাঝে মাঝে উঠে অবজারভেশন পোস্টে আসছি । শুধু আমরা নয়, আরও অনেকে । বন্যপ্রাণীদের ধৈর্য দেখে অবাক হচ্ছিলাম । একটা হাতির লেজ ধরে ছোট্ট বাচ্চা হাতি এল । সল্ট লিকের কাছে দুজন দাঁড়িয়ে থাকল, প্রায় ঘণ্টাখানেক । কোনও কিছু ঘটছে না, কী ভাবছে বোঝার উপায় নেই । ছটা-আটটা মহিষ চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে । তবে একটা বিষয় লক্ষ করলাম । মহিষকে হাতিও সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখে । কেউ কারও কাছাকাছি যায় না-সবাই যদিও অল্প একটু স্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে । একসময় বাচ্চা হাতি আবার তার মায়ের লেজ ধরে জঙ্গলে ফিরে গেল । কেন এসেছিল, কেন চলে গেল, কে জানে । ডানদিকের জঙ্গল থেকে একজোড়া হরিণ এসেছিল, তারা হাতি ও মহিষের থেকে একটু দূরে দূরে থাকল । একটি পাশে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল । অনেকক্ষণ পরে অন্য হরিণটি আবার ধীরে সুস্থে জঙ্গলে ফিরে গেল । তার সঙ্গীকে আর দেখলাম না । একটা বড় খরগোশ হাঁটু মুড়ে বসে যেন ধ্যান করছিল, দুটো হাতি আসতে দেখে, একটু পাশে সরে গিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হল ।

রাত গভীর হতে জঙ্গল কিন্তু নীরব হল না । ঝিঁঝি এবং নানা কীটপতঙ্গ অবিরাম তীব্র আবহ সৃষ্টি করল । মাঝে মাঝে রাতচর অন্যান্য পাখির আওয়াজ, ব্যাঙের ডাকও কদাচিৎ । জলা থেকে দুটো হাঁস উঠে এল, এবার হাতির মস্ত কান নাড়ার শব্দ । আর কোনও শব্দ নেই । আসন্ন কোনও অঘটনের জন্য যেন সারা প্রকৃতি স্থির হয়ে আছে । প্রখর আলো যেন সেই সম্ভাবনাকে আরও প্রবল করে তুলেছে ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । কোনও ঘণ্টা শুনতে পাইনি । শোনার দরকারও ছিল না । আমাদের আর্কের রাত পূর্ণ হয়েছে । ব্রেকফাস্টের পর রওনা হয়েছিলাম কেনিয়া সাফারি ক্লাবের উদ্দেশে । পথে অ্যাবারডেয়ার কান্ট্রি ক্লাবে আমরা বাস ছেড়ে আবার জনের গাড়িতে উঠলাম ।

মাউন্ট কেনিয়া সাফারি ক্লাব থেকে তৃতীয়দিন প্রাতরাশের পর রওনা হলাম নাকুরু লেক । পথে, অ্যাবারডেয়ার পাহাড়ের অন্য পাশে টমসনস ফলস । টমসন জলপ্রপাত । ৭৩ মিটার উঁচু থেকে একটা মাঝারি ধারা নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় । প্রপাতের শীর্ষে এবং নিচের জলাধার পর্যন্ত যাবার রাস্তা আছে । দুদিকে বড় গাছের জটলা । গাড়ি থেকে নেমেই দেখি একটা কিকুয়ু নাচের দল বসে আছে । দল বলতে দুজন । কথাকলি নর্তকের মতো নানা রং লাগানো মুখে । পরিধানও চিত্র-বিচিত্র । হাতে বর্শা । পাশে ইংরিজিতে নোটিস লাগানো, ছবি তুললে এক ডলার দিতে হবে, ভিডিও ফিল্ম তুললে দশ ।

নাকুরু বুঝি কেনিয়ার তৃতীয় প্রধান শহর। বর্তমান রাষ্ট্রপতির বাড়ি এই শহরে। জন বারবার সখেদে বলতে লাগল, এখন তো কালেনজিন উপজাতির পোয়াবারো, রাষ্ট্রপতি ময় ওই উপজাতির মানুষ। সব উন্নয়ন তাই এখন নাকুরু শহরে, নাকুরু জেলায়। বলল, মাসাইরাও খানিকটা সুযোগ নিচ্ছে, মন্ত্রিসভায় তাদের মন্ত্রী টিমামার প্রভাব খুব বেশি। অন্যদের জন্য শুধুই অবহেলা।

ইতিমধ্যে আমরা নাকুরু লেকের ধারে চলে এসেছি। অন্যপাড়ে গোলাপি রঙের বর্ডার লেকের সমস্ত বিস্তার জুড়ে। ওই বর্ডার আসলে ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি। বৃহদাকার এই পাখিগুলির এই লেকে বাস ও প্রজননক্ষেত্র। পৃথিবীর অন্য কোথাও একসঙ্গে এত ফ্ল্যামিঙ্গো দেখা যায় না। জন বলল, পনেরো-বিশ লক্ষ পাখি থাকে এখানে। এখন লেকের জল কমে যাওয়ার জন্য কিছু পাখি চলে গিয়েছে। জল তটরেখা থেকে অনেক দূরে। সূর্য অতি প্রখর। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা আধ কিলোমিটার হাঁটলাম। খোলা চোখেও পাখিগুলিকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছে তখন। বাইনোকুলার লাগিয়ে তো পরিষ্কার। বেশিরভাগই জলে। কিছু আকাশে ইতস্তত উড়ছে। হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে একটা পাখি জল থেকে আকাশে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও ত্রিশ-চল্লিশটা পাখি জল থেকে উঠে পড়ল। তারা একটা সরলরেখার ফর্মেশন করে গোলাপি একটা দীর্ঘ বর্শার মতো আকাশে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ। আবার কোনও অদৃশ্য সংকেতে প্রথম পাখিটি জলে নেমে পড়ল, অন্যেরাও পরের পর নামতে থাকল। হঠাৎ দেখি একটা পাখি অল্পজলে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। পনেরো-ষোলটা পাখিও তার পিছন পিছন বাহিনীর সৈন্যের মতো মার্চ করে চলেছে। মনে মনে আমরা লেফট রাইট শুনতে পাচ্ছি। হলট-দলটা থমকে দাঁড়াল। সামনের পাখি ঘুরে আবার উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করল, বাহিনী তখনও তার পিছনে। চড়া রোদ এবং ভূমি বৃক্ষহীন না হলে আরও অনেকক্ষণ দেখতে পারতাম। লাঞ্চ অপেক্ষা করছে, সুতরাং আমরা পৌঁছলাম লেকের ধারে ছোট পাহাড়ের ওপর হোটেলে-লায়ন হিল সারোভা লজ। খাবার ঘরটা নাইরোবির কার্নিভোর রেস্টুরেন্টের মতো, কাঠের মোটা কাজ। তবে এখানে ইতিহাসের ও মাটির আরও কাছাকাছি। নিচে লেক দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের বিশাল গাছে নানা পাখির কলরব এবং একটু আলো কম।

পানীয় জল এখানেও কিনতে হল। বুফে লাঞ্চ। ইউরোপীয় ভোজ্যের কয়েক পদ। গুজরাটি ডাল রুটি কড়হি আর উপরি হল কেনিয়ান ভোজ্যের চারটি পদ। আমি কেনিয়ান ভোজ্যে মন দিলাম। খুব মন দেবার মতো নয় যদিও। কেনিয়ানদের অঞ্চল ভেদের কথা বাদ দিলে প্রধান খাদ্য ভুট্টা ও কাঁচকলা। সিদ্ধ ও পিষ্ট ভুট্টার দানা বড় বরফির আকারে কেটে রাখা আছে, তার নাম উগালি। স্বাদে নিতান্তই নিরেশ। উগালির সঙ্গে খাবার জন্য

একটা কাঁচকলার ব্যঞ্জন, মাটোকে। ব্যঞ্জন না বলে কাঁচকলা সিদ্ধ বলা যায়-মশলাপত্র অতি সামান্য। আর মটনের যে পদটি ছিল, সেটিতে স্পষ্ট ভারতীয় প্রভাব। নারকোল মেশানো। এরা তেল ঘি পরিহার করে। লঙ্কাও অপছন্দ। কখনও সামান্য মেশানো হয়, বলে পিলপিলি। নাইরোবিতে একদিন নির্ভয়কুমার কেনিয়ান খাবার আনিয়েছিল, ইরিও। আলু, ভুট্টার দানা, সিমের বিচি ইত্যাদি সেদ্ধ করে মাখা আলুভাতের মতো। কিঞ্চিৎ সরষের তেল এবং কাঁচা লঙ্কা যোগ করলে ভালোই লাগত। কাঁচা পিঁয়াজ সংযুক্ত হলে তো কথাই নেই।

লাঞ্চের পর বিশ্রাম নেই। চারজনে গাড়িতে উঠে নাকুরু রিজার্ভে চললাম। জন বলেছিল এখানে চিতাবাঘ দেখা যাবে। আমরা সমানে বড় গাছের নিচের ডালে নজর রাখছিলাম। চিতাবাঘ অর্থাৎ লেপার্ড নাকি এই সময়টাতে অর্থাৎ দুপুরে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের স্থান গাছের ডালে। আগের দিনের শিকারও তুলে রাখে। আমাদের দুর্ভাগ্য কোনও গাছের ডালে নিদ্রিত চিতাবাঘের দেখা মিলল না। ইংরিজি চিতা এবং লেপার্ড দুই প্রজাতিকেই আমরা চিতা বলি। পরে আমরা চিতা দেখেছি, কিন্তু লাজুক, শঠ লেপার্ড বা চিতা বাঘের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল না। সন্ধ্যার মুখে এবং ভোরবেলায়, কোনও সময়ই নয়।

নাকুরু রিজার্ভে গণ্ডার দেখেছি কয়েকটি। গাড়ির রাস্তার পাশাপাশি ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে আমাদের সঙ্গে একদিকে চলেছে। আমরা গাড়ির গতি কমিয়ে একটা জোড়ার পাশে পাশে চলতে থাকলাম, চলন্ত ট্যাঙ্কের মতো এবং তেমনই ধীর গতিতে। জোড়া খড়্গের এই গণ্ডার আফ্রিকার বিশেষত্ব। এগুলো ছিল কালো গণ্ডার। সাদা গণ্ডার দেখতে গেলে অন্যত্র যেতে হত। আপাত-নিরীহ প্রাণীগুলি আমাদের প্রতি নির্বিকার। নিজের সামর্থ্যে ভরসা থাকলে এমনই হয়। আরেকটা দল দেখেছিলাম তৃণভোজে ব্যস্ত। আমাদের একপাশে দূরে নাকুরু লেক। মধ্যে হালকা জঙ্গল। অন্যপাশে তৃণভূমি-বড় দু-আড়াই ফুটের ঘাস, তারপর পাহাড় বড় গাছে ভরা। জিরাফও এখানে দেখলাম। বিচিত্র দর্শন প্রাণী তার অস্বাভাবিক লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছের মাথার কাঁটাপাতা খাচ্ছে। কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। হরিণ অজস্র, নানা প্রজাতির-ছোট বড়। অনেক নামও শুনলাম, গ্যাজেল, হল্যান্ড, ইমপালা, অরিস, বুশবাক, ওয়াটার বাক। কাছাকাছি গেলে তারা শূন্যে অপরূপ লাফ দিয়ে মুহূর্তে চলে যায়। তারপর সতর্ক কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আমাদের বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার যেতে হবে নাইভাশা লেকের ধারে, যেখানে আমাদের রাত্রিবাস। বৃহৎ পাঁচের তিনটি দেখেছি, চিতা ও সিংহ এখনও বাকি।

নাইভাশা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল । নাইভাশা কান্ট্রি ক্লাব নাইভাশা লেকের ধারে । যদিও পাঁচ প্রধানের কেউ নয়, হিপো, জলহস্তী তখনও দেখিনি । শুনেছি নাইভাশা লেকে অনেক জলহস্তীর বাস । এখানে ঠান্ডা একটু বেশি । হোটেলের বিশাল কম্পাউন্ডে ছোট ছোট এক বা দুকামরার কটেজ । আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই । এখানে প্রথম মশারি দেখলাম । শুনেছিলাম ম্যালেরিয়ার ভয় খুব বেশি । ট্যাবলেটে না শানাতেও পারে । মস্ত মাঠের ভেতর টালিপাতা সরু পথ মাঝে মাঝে, ওপরে ঢাকা দেওয়া নিচু আলোর রাস্তাটা একটা আলোকিত ফিতের মতো দেখাচ্ছে । মস্ত মস্ত গাছ । আমাদের কটেজ থেকে ভোজনকক্ষ ও পানশালা অনেক দূরে । যেতে যেমন ভালো লাগছিল তেমনই একটু ভয়ও করছিল । লাউঞ্জে গিয়ে নানা নোটিস পড়ছিলাম । লেখা আছে রাতে ভোজনকক্ষ থেকে ঘরে যাবার সময় আমাদের প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন । গাটা শিরশির করে উঠল । ভোজন এখানেও পরিপূর্ণ তুষ্টির হল । নিরামিষ একটা অঞ্চল রয়েছে, সেখান লুচি, আলুর তরকারি, ডাল, ভাজা, পাঁপড় ইত্যাদি দেখলাম । সব জায়গাতেই স্যালাড খুব পছন্দের । আহারের পর লাউঞ্জে বসে কফি পান হল, সামনে আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে, টিভিতে কী একটা ছবি হচ্ছিল । ঘরে ফেরবার সময় এক প্রহরী আমাদের সঙ্গে গেল ।

শুনলাম সকালে অনেক জলহস্তী আমাদের হোটেলের হাতার কাছাকাছি চলে আসে । জলহস্তীরা এলে ঘণ্টি বাজিয়ে ডেকে দেবার ব্যবস্থাও আছে । আমরা অনুরোধ লিখিয়ে ঘরে ফিরে এলাম । ভোরে কোনও ঘণ্টি বাজল না । সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেকের ধারে গিয়ে জলহস্তী দেখার জন্য উঠে পড়লাম । টালি-বাঁধানো সরু রাস্তা শেষ হবার পর বড় বড় গাছের তলা দিয়ে লেকের ধারে চলেছি । কোথাও জনপ্রাণী নেই, অনেকখানি যেতে হল । নিস্তব্ধ,জনহীন, একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল । একটা ছোট জেটি, মোটরলঞ্চ বাঁধা আছে সেখানে । পর্যটকদের লেকে ঘুরিয়ে একটা ছোট দ্বীপেও নিয়ে যায় । ত্রিসীমানায় কোনও জলহস্তী নেই । হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, হোটেলের এক কর্মচারীকে দেখা গেল । বলল, হিপো দেখতে পেলেন না? চারটে হিপো সকালেই এখানে এসেছিল । চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে লেকের মাঝখানে নির্দেশ করে বলল, ওই যে, ওই ওখানে দুটো হিপো । বহুদূরে জলে কালো একটা ছায়ার মতো । হিপো কোনটা বুঝতে পারলাম না । একটা খেদ থেকে গেল ।

পরদিন প্রাতরাশের পর মাসাইমারা যাত্রা । এইদিন সকালটা সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল । তৃণগুল্মের বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে আবার গাছপালার জগতে ফিরে এলাম । হঠাৎ ছবির মতো স্থির একজোড়া জিরাফ । নানা স্থানে, আমাদের গোচারণভূমিতে যেমন একশো-দুশো জেব্রা । হরিণ যত্রতত্র ।

আমরা যাব রিফটভ্যালির মধ্য দিয়ে। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন, এটা হল প্রথম ঢালাইয়ের পর স্থপতির সংশোধনের কাজ। লম্বালম্বি প্রায় দুহাজার মাইল, কোথাও পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত চওড়া, পৃথিবীর একাংশ দুহাজার ফুট নিচে নেমে গিয়েছে, যেন দুই স্পষ্ট থাক বা স্তরে ভাগ করা। নিচের উপত্যকাকে বলা হয় রিফটভ্যালি। প্রচুর চাষবাস উপত্যকায়। খেতে কাজ করছে মানুষ। মাইলের পর মাইল কফি চাষ। আরেকটু নিচে অনুরূপ চা-বাগান।

ক্রমে আমরা নিচের উপত্যকা থেকে ওপরে উঠতে লাগলাম। গাছপালা কমে এল। রুক্ষ, নিষ্ফলা, বিশাল সব প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা মাসাইমারার দিকে চলেছি। পাহাড়ের সারি দূরে সরে গিয়েছে। রাস্তা ভালো নয়। দীর্ঘ ঘাসে ভরা দিগন্ত-ছোঁওয়া সমতল। দু-দশটা অ্যাকেশিয়া, কদাচিৎ একটা বড় গাছ, আর কোনও উদ্ভিদ নেই। জেব্রা, ওয়াইলডবীস্ট, হরিণ, ওয়ার্টহগ দেখা যেতে লাগল। আর ছোট-বড় নানা পাখি, সেক্রেটারি বার্ড, বুজার্ড, লম্বালেজ উইডোবার্ড, প্লোভার, স্টার্লিং।

১৮০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে মাসাইমারা সংরক্ষিত অঞ্চল। কয়েকটি মাসাই গ্রাম পার হয়ে এলাম। গ্রাম অর্থে কুড়ি-ত্রিশটি ছেঁচাবেড়ার কুটির বৃত্তাকারে গায়ে গায়ে লাগানো। মাসাইদের দৈর্ঘ্য দেখবার মতো, ছ-ফুট বা তারও বেশি। চড়া লাল রঙের একটা চাদর সর্বক্ষণ গায়ে থাকে। হাতে একটা ছোট লাঠি, তার মাথাটা গদার আকারে ঈষৎ স্ফীত। মাসাই উপজাতি পশুপালনে দক্ষ, এটাই তাদের জীবিকা। কিন্তু কৃষিকাজ জানে না। প্রাগৈতিহাসিক পরম্পরা থেকে তারা এখনও চাষবাস করতে চায় না। আদিম রীতির পরিবর্তন হয়নি বলা চলে তাদের সমাজে। এখনও পালিত পশুর রক্তক্ষরণ করে পান করে। গ্রামের মানুষের পাকশালায় দেখেছি রক্ত রাখা হয়েছে, রন্ধনে ব্যবহার হবে।

অসম সাহসী মাসাইরা যেখানে বাস করে সেটা সিংহের অঞ্চল। আমাদের ড্রাইভার জন বলল, সিংহেরা মাসাইদের ভয় করে। অস্ত্রশস্ত্রকে নয়। মাসাই এবং সিংহ অনাদিকাল থেকে পাশাপাশি বাস করছে, তারা পরস্পরকে বংশানুক্রমে জানে, সমীহ করে।

মাসাইমারাতে আমরা উঠলাম কিকোরক লজে। লজটি দেখে মন প্রসন্ন হল। দূরে দূরে ছড়ানো কটেজ এবং ভিলা। লাঞ্চ প্রস্তুত ছিল। লাঞ্চের পরই আমরা বন্যপ্রাণী দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত মারার যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো যাবে। সূর্যাস্তের পর মারা অঞ্চলে যানবাহন বা লোক চলাচল নিষিদ্ধ। মাসাইমারার মতো এত বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আর কোথাও নেই। শুধু মাসাইমারাতে গেলেই আফ্রিকার সব বন্যপ্রাণী দেখা যায়। এখানে আমরা হাতির যূথ দেখলাম কয়েকটি। আফ্রিকার হাতিদের মাথা ভারতীয়

হাতিদের অনুপাতে ছোট হয় । যদিও এখানের হাতি আকারে বড় । আমরা বিশ-পঁচিশ গজ দূরে গাড়িতে । হাতিরা বিশেষ গ্রাহ্য করল না । সিংহও তেমনই । যতবার দেখেছি সিংহের দল বিশ্রামে মগ্ন । পর্যটকদের দিকে একবার চোখ মেলেই আবার নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে । মারা জুড়ে অনেক পর্যটকের গাড়ি এসে গেছে । সব গাড়িতে বেতারের বন্দোবস্ত আছে । কোথায় কোন প্রাণী আছে পরস্পর কথা হচ্ছে । রাস্তা ছেড়ে মারার ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে । দু-আড়াই ফুট ঘাসের আড়ালে কোথায় জন্তু আছে ড্রাইভারেরা সহজেই খুঁজে বার করছে ।

হঠাৎ সামনে চারটি সিংহ । আমরা একটু ঘুরে তাদের কাছাকাছি চলে এলাম । ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের মধ্যে । একটি সিংহ এবং তিনটি সিংহী । সবাই বিশ্রামের ভঙ্গিতে । সিংহীরা হঠাৎ দেখলাম স্থির হয়ে একদিকে তাকিয়ে, তারপর গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকল । দূরে দেখতে পেলাম দুটি হরিণ ভয়হীন ঘাস খাচ্ছে । তিনজনের দল ছেড়ে এক সিংহী বাঁদিকে চলে গেল, অন্যজন ডানদিকে । সবটাই হচ্ছে নীরবে এবং সন্তর্পণে । জন বলল, সিংহ এভাবেই শিকার করে । ওরা দৌড়তে পারে না হরিণের মতো । হরিণ একবার জানতে পারলে মুহূর্তে পালিয়ে যাবে, তাই সিংহেরা তাকে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করছে । আমরা আসন্ন একটা হত্যালীলা দেখবার সম্ভাবনায় টানটান হয়ে আছি । স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে । একটি হরিণ বোধহয় সিংহের গন্ধ পেয়েছিল । মাথা উঁচু করে স্থির হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বিদ্যুতের মতো দৌড়তে লাগল । তার সঙ্গীও মুহূর্তে তার সঙ্গে যোগ দিল । হরিণের দৌড়ের মতো এমন মনোরম দৃশ্য আর দেখিনি । মনে হয় ক্ষণিক মাটি ছুঁয়ে আবার হাওয়াতে তীরের গতি পেয়েছে । সিংহীর দল অনেকক্ষণ নিজেরা নিজের জায়গায় বসে থাকল । তারপর আবার সিংহের কাছে ফিরে এল । সিংহ সমস্তক্ষণ নিশ্চিন্তে আলস্য উপভোগ করছিল ।

চিতাবাঘ দেখবার জন্য অনেক ঘোরা হল । সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, তাই লজে ফিরে এলাম ।

লজে ফিরে মনে পড়ল হিপো তো দেখা হয়নি । মারার যেখানে আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছিলাম সেখানে কোনও জলা জায়গা ছিল না । হিপো থাকবেই বা কোথায় । খবর পেলাম কিকোরক লজের চৌহদ্দির বাইরে একটা জলা, সেখানে একটি হিপো আছে । তাকে দেখতেই পরদিন সকালে হোটেলের বিশাল মাঠ পেরিয়ে সুইমিংপুল পার হয়ে একটা কাঠের সরু উড়াল পুল দিয়ে জলার ওপর পৌঁছে গেলাম । সত্যিই একটা হিপো । সে তখন সর্বাঙ্গ নিমজ্জিত রেখে শুধু নাক-কান আর চোখ দুটি জলের ওপরে তুলে রেখেছিল । প্রায় চিড়িয়াখানায় হিপো দেখার মতো । পরিবেশ যদিও আলাদা । জায়গাটায়

বড়-বড় গাছ, চারদিকে মানুষের বসতির চিহ্ন নেই । যাই হোক তবু তো হিপো দর্শন হল ।

পরের দিন সকালে আমাদের আক্ষেপের কথা শুনে জন বলল, হিপো দেখতে মারা নদীর পারে যেতে হবে । আমরা তো তৈরি । তৎক্ষণাৎ আবার বড় রাস্তা, ছোট কাঁচা রাস্তা, ঘাসে ভর্তি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা দক্ষিণে মারা নদীর উদ্দেশে রওনা হলাম । মারা নদী তানজানিয়া সীমান্তে । আরেকটু গেলেই সেরেনগেটি গেম পার্ক, তানজানিয়ার । সে স্থান নাকি আরও বিশাল । বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য । আমাদের আগে আগে একটা জিপ চলেছে । জিপটা আসলে একটা চিত্রবিচিত্র বেলুনকে অনুসরণ করছে । বেলুন তখনও বেশি ওপরে ওঠেনি । পাঁচ-ছ জন যাত্রীকে দেখা যাচ্ছে । ধনী মানুষেরা বেলুনে চড়ে উভয় অর্থে সিংহাবলোকন করেন । বেলুন যেখানে নামবে জিপ সেখান থেকে যাত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে । খরচ শুনলাম মাথাপিছু তিনশো ডলার । জন অবশ্য আমাদের আশ্বস্ত করল, জিপে করে ব্রেকফাস্ট চলেছে যাত্রীদের । অবতরণ করামাত্রই উত্তম ব্রেকফাস্ট এবং শ্যাম্পেন দিয়ে তাঁদের সৎকার করা হবে ।

মারা নদীর ধারে কিছু বড় গাছপালা এবং দীর্ঘ ঘাস । একটা বাঁকের মুখে নদীর জলে দশ-বারোটি হিপো । ছোট-বড় নানা মাপের হিপো মিলিয়ে একটা বড় পরিবার । হয়তো উপনিবেশ বলা ঠিক হবে । নদীর ধার দিয়ে একটু পশ্চিমে যেতেই আরেক দল হিপোর জটলা । কেউ সারা শরীর জলে ডুবিয়ে শুয়ে আছে । দুজন নদীর মাঝে একটা পাথরে উঠে বসেছে । অনেকগুলি অগভীর জলে দাঁড়িয়ে আছে । দুটি শিশু মায়ের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে । পাথরের ওপর থেকে একটা হিপো তার দু-আড়াই টনের বিশাল শরীর নিয়ে কেমন অনায়াসে জলে নেমে গেল । সকালের রোদে হিপোগুলির গোলাপি মসৃণ চামড়া চকচক করছে । মস্ত শরীর, অবিশ্বাস্য ছোট ছোট পা, প্রশস্ত মাথায় বিরাট চোয়াল । হিপোর ছোট-বড় কাঠের ও পাথরের মূর্তি সব কিউরিওর দোকানেই বিক্রি হয় । সম্পূর্ণ বাস্তব অনুসরণ না করে গ্রামীণ শিল্পীদের কল্পনায় হিপোর চোয়াল আরও প্রকাণ্ড এবং পা চারটি অতি ক্ষুদ্রাকার । কাঠ ও পাথরের বিবিধ জন্তুর, পুতুলের মধ্যে হিপোর মূর্তিটাই আমাকে বেশি আকর্ষণ করছিল । যেন আদর করবার মতো প্রাণী । গায়ে হাত দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল । রাতে তীরে উঠে ঘাসপাতা এবং জলে মৎস্যাদি যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে হিপোর ভোজন । তার থেকেই এত বড় শরীর ।

বিকেলে দুটি চিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল । আফ্রিকার গাইড ও ড্রাইভারদের অসাধারণ ক্ষমতা । দু-আড়াই ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীগুলিকে দেখতে পারে । দুনিয়ার সর্বোচ্চগতির প্রাণী চিতা । ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে দৌড়তে পারে । মানুষের

মতো নতজানু ভঙ্গিতে চিতা দুটি বসেছিল দিগন্তে দৃষ্টি মেলে । আমাদের দেখে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করল না । হয়তো এক মাইল দূরে সম্ভাব্য শিকারকে দেখছিল একাগ্র হয়ে । আমার মনে হয়েছে চিতার চোখের নিচে দীর্ঘ কালো রেখাটি যেন অশ্রুর দাগ । চিতার অশ্রুপাতের কোনও কারণ নেই । প্রাণীটি অতি হিংস্র । তখন অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘ হয়ে এসেছে । একটা চিতা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আমরা সচকিত হয়েছিলাম । জন বলল, ওরা ছায়া খুঁজছে । সত্যিই তাই, একটা গাড়ির ছায়ায় এসে দুজন আবার উবু হয়ে বসে দিগন্তে চোখ মেলে দিল ।

মাসাইমারার শেষ সন্ধ্যায় কিকোরক লজে মাসাই নৃত্যের আয়োজন হল । একদল অতি-দীর্ঘদেহী মাসাই খাটো রক্তাম্বরে ছোট ড্রাম বাজিয়ে কিছুক্ষণ নাচ দেখাল । মেয়েরাও খাটো পোশাকে, তার ওপর চুল অত্যন্ত ছোট করে ছাঁটা, প্রায় মুণ্ডিত । নতুন অবশ্যই, খুব ভালো লেগেছিল বলতে পারব না ।

দুদিন সকাল বিকেল মারায় প্রচুর ঘোরা হল । বন্যপ্রাণীও দেখেছি প্রচুর । এবার ফেরার দিন । মারাতে প্রাতরাশ, নাইরোবিতে মধ্যাহ্নভোজন । পথে রিফটভ্যালির একাংশ দিয়ে উঁচুতে উঠে মাসাইমারা ও রিফটভ্যালির অনেকটা দেখা যায় । মনে হয়েছিল এখানে দিগন্ত কত বেশি দূরে চলে যায় ।

যাঁদের সময় অল্প, তাঁরা দুদিন বা তিনদিনের সাফারি নিতে পারেন । মোট হিসাবে মাথাপিছু প্রতিদিন ১৩০ থেকে ১৫০ ডলার পড়ে । তবে যাতায়াত, শয়নভোজন সব খরচ এর মধ্যে । তাঁবু নিয়েও থাকা যায় কোনও কোনও অঞ্চলে, খরচ অল্পই কম পড়ে, তাঁবুর ভাড়া দৈনিক পাঁচ ডলারের কম, আহারাদির এবং যাতায়াতের খরচ নিজের । তার ওপর গাইডের খরচ আছে । দল ভারি হলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে থাকা খুব আনন্দের, খরচের সাশ্রয়ও হয় । রাতে একটু ভয়ভয় করে, তবে গা-ছমছম আনন্দের কি তুলনা হয় । অনেক লজেও তাঁবুতে বাসের আয়োজন আছে । তার জন্য অবশ্য দাম কম হয় না । কারণ অন্য সব সুখের আয়োজন থাকে, শুধু নতুন অভিজ্ঞতা হয় ।

সময় যদি থাকে মাত্র একদিন, তাহলে নাইরোবি শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে, নাইরোবি ন্যাশনাল পার্ক । ভেতরে গাড়ি করে ঘোরা যায়, সর্বত্র গাড়ি থেকে নামা বারণ, অসংখ্য বন্যপ্রাণী দেখা যাবে । সামান্য একশো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সমাবেশ দেখে আশ্চর্য হতে হয় । পার্কের দক্ষিণ সীমান্তে বাগাথি-আথি নদীতে হিপো ও কুমিরের দেখা মিলবে ।

দশ কিলোমিটারের ব্যবধানে একদিকে বিংশ শতাব্দীর শহর নাইরোবি, আর অন্যদিকে আদিম বন্য পরিবেশে প্রাণীজগৎ-না দেখলে বিশ্বাস হয় না । এত সহজে এত অল্পে বিংশ

শতাব্দীকে দূরে ফেলে আসা যায়?

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

কোনাডা থেকে রেভুপাল ভরম

রতনলাল বিশ্বাস

পূর্বঘাট পাহাড় ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে অনেকটাই দূরে । তাই বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চলে পাহাড় ও সাগরের মিলন হয়েছে খুবই কম অংশে । বিশাখাপত্তনমের কাছাকাছি অঞ্চলে পূর্বঘাটের পাহাড় থেকে কয়েকটা শিরা এসে মিশেছে সাগরে । সেখানেই সাগরের জল আছড়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে । আর মাঝে মাঝেই তৈরি হয়েছে সুন্দর অর্ধচন্দ্রাকার সৈকত । পর্বতপ্রেমী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পদযাত্রীরা এই অঞ্চলে পদযাত্রা করে খুবই আনন্দ পান ।

২৭ জানুয়ারি, ২০০০ ভোররাতে করমণ্ডল এক্সপ্রেস থেকে নেমে পড়লাম বিশাখাপত্তনম । স্টেশন চত্বর থেকেই ট্যাক্সি চেপে ৬০ কিলোমিটার উত্তরের কোনাডা পৌঁছলাম যখন, তখন সবে সকাল । প্রাথমিক প্রস্তুতি কলকাতা থেকেই নেওয়া ছিল । সৈকত পদযাত্রায় গাইড বা পোর্টার সংগ্রহের পাট নেই । সাগরই পথ দেখাবে । সামান্য প্রয়োজনীয় মালপত্র থাকবে নিজেদের পিঠে । হালকা পোশাক পরে সাগর পাড়ে নেমে পড়লাম । কোনাডা গ্রাম থেকে সৈকত খানিকটা দূরে, একটা খাড়ি পেরতে হবে । ভাঁটার সময় জলের গভীরতা তেমন নয় । শুরুতেই খালি পায়ে জলে নেমে পড়লাম । শুরু হল এই পর্বের পথ চলা । গোটা খাড়ি পেরতে হবে । গোটা খাড়ি জুড়ে লোকজনেরা চিংড়ির পোনা ধরায় ব্যস্ত । জল, বেলাভূমি, আবার জল । এভাবেই প্রশস্ত খাড়িটি পেরিয়ে উঠে এলাম এক বালির ঢিবির ওপরে । এটিকে টপকে নেমে এলাম সৈকতে । উত্তাল সাগর, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু পাথর আর ডানদিকে ধু-ধু বালিয়াড়ি-এই হল চলার সঙ্গী । আঞ্চলিক লোকজনের চলাফেরা কদাচিৎ । মাঝে মাঝে হাঁটতে হয় পাথরের ওপর দিয়ে । কাছেপিঠে পাহাড় নেই । অথচ পাথর আছে । বালিয়াড়িতে এক ছোট্ট জেলেবসতি দেখতে পেয়ে উঠে এলাম পানীয় জলের আশায় । গ্রামের নাম কানচেরি । ধু-ধু বালিয়াড়ি, মাঝে কাছাকাছি তেমন বড় বসতি গড়ে ওঠেনি । আবার চলা । ডানদিকে শুরু হল পোড়ামাটি রঙের পাথুরে দেওয়াল । নির্জনতার মাঝে এ জায়গাটি একটু অন্যরকম । বাঁদিকে উত্তাল সাগর, পায়ের চলায় মাঝে মাঝে সমতল পাথুরে চাতাল, আর ডানদিকে ধারাবাহিক পোড়ামাটি রঙের দেওয়াল । এমনই সুন্দর প্রকৃতির মাঝে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়িয়ে এল । চাই পানীয় জল । কাছেপিঠে গ্রাম নেই । বছর ষোল আগে যখন এই অঞ্চলে ট্রেক

করছিলাম, তখন এখানে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা পেয়েছিলাম। দীপঙ্কর এগিয়ে গেল সেই ঝরনার খোঁজে। হ্যাঁ, জল পাওয়া গেল। লাল পাহাড় ধুইয়ে জল নামছে। জলের পাশে পাথুরে কোটরে একটা ছোট্ট বট গাছ জন্মেছে। জায়গাটি দারুণ। এমন এক নির্জনতার মাঝে আমাদের দুপুরের বিরতি। অনেকটা ভেতরে আছে তুরাও গ্রাম। দুপুরের সাগরের রূপ অনন্য। নীল ও পান্না সবুজের এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছে।

বিরতির পর আবার চলা। নেমে এলাম সৈকতে। সেখানে বালি মেশানো পাথুরে অঞ্চল। সোনালি বালির মাঝে কোথাও আবার বালির রং কালো। ডানদিকে কাছাকাছি পাহাড় নেই। কিন্তু মাঝে মাঝেই হাঁটতে হচ্ছে পাথুরে সৈকতের ওপর দিয়ে। ঢেউ আছড়ে পড়ে পায়ের কাছে। জল ছিটকে তৈরি হয় ফোয়ারা। এমনই সুন্দর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বেলাভূমিতে। প্রশস্ত সৈকত জুড়ে বেলাভূমি ধরে হাঁটতে হাঁটতে দিন শেষ হতেই গ্রামের সন্ধান করি। উঠে এলাম আনারা গ্রামের মাঝে। গ্রামবাসীরা থাকতে দিল স্কুলবাড়িতে।

ভোর হতেই নেমে এলাম প্রশস্ত সৈকতে। বেলাভূমি ধরে জেলেনিরা ঝুড়ি মাথায় দ্রুত চলেছে দলে দলে। ওরা মাছ নিয়ে চলেছে ভিমুনিপত্তনম। যেন প্রথমে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। একটা খাড়ির পাশে পৌঁছে একটানা চলার ছন্দপতন ঘটল। খেয়ার ব্যবস্থা আছে। ওপারেই ভিমুনিপত্তনম। ডাচ অধ্যুষিত অতীতের এই পোতাশ্রয়টি এখনও কিছু স্মৃতি বহন করছে। সাগরপাড়ের স্মৃতিফলকগুলি বলে দেয় ভিমুনিপত্তনমের গোড়াপত্তন হয়েছিল বহু বছর আগেই। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এ জায়গাটি খুবই মনোরম। চারদিকে গাড়ির ছোটাছুটি এড়িয়ে আমরা আবার পাথুরে চাতালের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। পাথরগুলি দেখে মনে হয় যেন কোনও গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। পাথরের গায়ে জন্মেছে হলুদ ও সবুজ রঙের শ্যাওলা। সেইসব পাথরের ওপর সাবধানে পা রেখে এগিয়ে চলি। ডানদিকে খানিকটা দূরে ধারাবাহিক উঁচু পাথর। সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ভিমুনিপত্তনম থেকে বিশাখাপত্তনম যাবার গাড়িপথ। শুরু হল অর্ধচন্দ্রাকার সৈকত। বেলাভূমি জুড়ে, লোকজনের জটলা। নেংটি পরা কালো মানুষেরা টানা জাল টেনে তুলছে ডাঙায়। মাছ উঠেছে সামান্য। বরঞ্চ জালে ধরা পড়েছে বেশ কয়েকটা জেলিফিস। ডানদিকে বালিয়াড়ি, মাঝে দু-চারটে জেলে ঝুপড়ি আর রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু তালগাছ। সেই অর্ধচন্দ্রাকার সৈকতের শেষ প্রান্তে উপারা গ্রামে পৌঁছে হল আমাদের দুপুরের বিরতি। অর্থাৎ রান্না ও খাওয়ার পর্ব। সেদিন দুপুরে জুটল গলদা চিংড়ি। ভরদুপুরে সাগরের রং তীব্র নীলাভ। সৈকত থেকে খানিকটা ভেতরে নোঙর করেছে নানা রঙের জেলে নৌকো। সবই মোটরচালিত। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকোগুলি দুলছে আর এদিক ওদিকে সরে যাচ্ছে অনবরত। আবার চলা। ধারাবাহিক বালুবেলার মাঝে কখনও

হাঁটতে হয় পাথুরে চাতালের ওপর দিয়ে । অনবরত ঢেউ আছড়ে পড়ে সেইসব পাথরের ওপরে । নোনাজলে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে তৈরি হয়েছে নানা কারুকার্য । কোথাও তৈরি হয়েছে পোড়ামাটি রঙের এক সুন্দর বলয় । ডানদিকে পর পর রয়েছে উঁচু পাহাড় । সেই সুন্দর সৈকতে চলতে চলতে বেলা পড়ে এল । সাদা রঙের পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে প্রশস্ত সৈকতে । সূর্যাস্তের সোনালি আলোর ছোঁয়া তার ওপরে । সামনে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা সাজানো গোছানো ঘর দেখে সহজেই বোঝা যায় ওগুলি হল ঋষিকোণ্ডার পর্যটন কটেজ । আমরা ঢুকে পড়লাম তুফান বিল্ডিংয়ে । পদযাত্রীদের থাকার জন্য সুন্দর আশ্রয়স্থল ।

সৈকত জুড়ে ভোরের আলোর ছোঁয়া লাগতেই নেমে পড়লাম সৈকতে । শুরু হল তৃতীয়দিনের হাঁটা । পাথুরে এলাকা পেরিয়ে সোনালি সৈকত । ডানদিকে পাহাড়ের ঢালে আছে গাড়িপথ । ওপথে অনবরত গাড়ি চলাচল করছে । সাগরনগর হয়ে খানিকটা এগিয়ে কৈলাসগিরি পাহাড় । পাহাড়ের মাথায় পর্যটকদের বেড়ানোর জন্য আছে অনেক উপকরণ । বিশাখাপত্তনম শহর আর বেশি দূরে নয় । শহরের দূষিত বায়ু গ্রাস করেছে শহরের আকাশ, বাতাস আর সাগরকে । সৈকত ক্রমশ নোংরা হয়ে উঠল । শহরের সেই নোংরা সৈকত ধরে হাঁটতে ভালো লাগে না । শহর শুরু হতেই উঠে এলাম বাস রাস্তায় । অটোয় চেপে রামকৃষ্ণ বিচ হয়ে চলে এলাম ভাইজ্যাগ শিপইয়ার্ড ক্যানেলের জেটিতে । পারাপারের জন্য ছোট লঞ্চ আছে । এই ক্যানেলের সাহায্যে শিপইয়ার্ডের সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ । ক্যানেলটি পেরিয়ে চড়াই পথ । একটানা সেই চড়াই পথটা শেষ হল ডলফিন নোজে । বিশাখাপত্তনমের বাতিঘর এখানেই । এখান থেকে দক্ষিণদিকে দেখা যায় বিশাখাপত্তনম শহর ও জাহাজ কারখানা । সেই বাতিঘরকে বাঁদিকে রেখে নামার পথ উত্তরদিকে । পাকা সড়ক ছেড়ে একসময় পায়ে চলা এবড়োখেবড়ো পথে নামতে থাকি । সামনে দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর । সাগরপাড়ে সারি সারি তাল গাছ । দক্ষিণদিকে স্পষ্ট হল ইয়ারডো গ্রাম । গ্রাম ছাড়িয়ে সাগর ছুঁয়ে রয়েছে একের পর এক পাহাড় । ওই পাহাড় পেরিয়েই আমাদের আগামীদিনের পথ । নেমে এলাম গ্রামের মাঝে । আগে দেখা এই গ্রামটি পালটে গেছে । রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে । বিদ্যুৎ যোগাযোগ হয়েছে ঘরে ঘরে । আর সেইসঙ্গে ঢুকে পড়েছে টেলিভিশন । গ্রামের মধ্য দিয়ে নেমে এলাম সুন্দর সৈকতে । প্রশস্ত বালুবেলায় ভিজে বালির ওপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা । পথ চলার কষ্ট এখানেই কম । একটানা সেই সুন্দর সৈকত শেষ হতেই সামনে দাঁড়িয়ে এক উঁচু পাহাড় । পাহাড়টি পা ডুবিয়েছে সাগরের জলে । সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়েছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে । জল ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । পাহাড়টি টপকাতে হবে । একটা পায়ে চলা পথও রয়েছে । ডানদিকে পাহাড়ের কোলে নারকোল গাছের ছায়ায় গড়ে উঠেছে একটা রিসর্ট । নির্জনতার মাঝে এ

জায়গাটি ভারি সুন্দর । এবড়োখেবড়ো পাথর মাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলাম পাহাড়ের ওপরে । ঝোপঝাড়ে ঢাকা সেই পাহাড়ের ওপরে উঠে মূল পথ ছেড়ে বাঁদিক ঘেঁসে চলতে থাকি । এক অস্পষ্ট পথ ধরে নেমে এলাম পাহাড়ে ঘেরা এক ছোট্ট সৈকতে । ওখান থেকে বেরনোর জন্য দীপঙ্কর পাহাড়ের মাঝে একটা চিমনি ফাটলের সন্ধান পেয়ে গেল । তারই মধ্য দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে বেরিয়ে এলাম । হঠাৎই সেই পাহাড় পেরিয়ে চলে এলাম অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমিতে । বেলা পড়ে আসতেই ঢুকে পড়লাম দিব্বাপালেম গ্রামে । গ্রামের ছেলেরা নিমেষের মধ্যে স্কুলঘর পরিষ্কার করে থাকার ব্যবস্থা করে দিল । বিশাখাপত্তনম থেকে এখানে বাসেও আসা যায় । গ্রামটি বেশ বড় । দোকানপাট আছে । ভোর হতেই গ্রাম লাগোয়া সৈকতে হৈ চৈ লেগেই থাকে । মাছ ধরে নৌকো পারে ফিরতেই মাছ কেনার জন্য ভিড় জমায় ব্যবসায়ীরা । সেই জটলা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম এক ছোট্ট খাড়ির ধারে । এক হাঁটু জল ভেঙে উঠে এলাম এক প্রশস্ত সৈকতে । কিন্তু সেই সুন্দর সৈকত ধরে বেশিদূর এগনো গেল না । সামনে খাড়া পাহাড় । পাহাড়টিকে বাঁদিকে রেখেও গঙ্গাভরম পৌঁছনোর জন্য পায়ে চলা পথ আছে । আমাদের চেষ্টা জলের ধারে ধারে পাথরের মধ্য দিয়েই এই বিপদসঙ্কুল জায়গাটি পার হতে হবে । পাথরের ঢালে জলের ঝাপটা এড়িয়ে পেরিয়ে গেলাম সেই পাথুরে এলাকা । নেমে এলাম এক অর্ধচন্দ্রাকার সৈকতে । সুন্দর সৈকত ঘেঁসে সাগরের টলটলে জলে অল্প অল্প ঢেউ উঠেছে । সামনে একটা টিলা পাহাড়ের ওপরে রয়েছে মন্দির । সাগর পাড়ে রয়েছে বিশাখাপত্তনম স্টিল ফ্যাক্টরির সাজানো গোছানো বিশ্রামগৃহ । বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম পাহাড়ের ওপরে মন্দির চত্বরে । উত্তরদিকে দূরে দেখা যায় ডলফিন নোজ পাহাড় আর গঙ্গাভরম থেকে সেই পাহাড় পর্যন্ত রয়েছে এক বিশাল অর্ধচন্দ্রাকার সৈকত । চোখ রাখি দক্ষিণদিকে । সামনের পাহাড়টি জলের ধারে ধারে পেরনো যাবে না । আরও দূরে রয়েছে একের পর এক অস্পষ্ট পাহাড় । গঙ্গাভরম থেকে জলের ধারে ধারে নয় । পাহাড়টিতে বাঁদিকে রেখে ঢুকে পড়লাম এক সংরক্ষিত বনের মাঝে । সাগর পাড়ের এই ছোট্ট বনাঞ্চলটি ভালো লাগল । পায়ে চলা পথে বেরিয়ে এলাম সৈকতে । সোনালি সৈকত, বালিয়াড়ি ও পর পর দুটো পাহাড় পেরিয়ে লোকজনের জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম । জেলেরা বালির ওপর বসে জাল সারাচ্ছে । কেউবা বুনছে নতুন জাল । ওপরেই আপিগোন্ডা গ্রাম । ওখানেই হল দুপুরের বিরতি ।

আপিগোন্ডা থেকে কয়েক পা এগিয়ে একটা খাড়ি পেরিয়ে সামনে এক ছোট্ট পাহাড় । তারপর একটানা সোনালি সৈকত । ডানদিকে বালিয়াড়ির মাঝে গ্রাম নজরে পড়ে না । তবে মাঝে মধ্যে কাজুবাগান দেখা যায় । সামনে কংক্রিটের থামের ওপর একটা মোটা পাইপ লাইন রয়েছে । সাগরের অনেকটা ভেতর থেকে জল এই পাইপের সাহায্যে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে নার্সারিতে । যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চিংড়ির ডিম থেকে চিংড়ি পোনা ফোটানো হচ্ছে । এই ধরনের প্রকল্পের ফলে সাগরতটে চিংড়িপোনা ধরার প্রবণতা অনেকটাই কমেছে । বেলা পড়ে আসতেই ঢুকে পড়লাম এক জেলে বসতিতে । গ্রামের নাম টিভি পার্লেম । খুবই দরিদ্র গ্রাম । রাতে আশ্রয় স্কুলের বারান্দায় ।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম । তালপাতার কুঁড়ে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝাউগাছের পিছন থেকে সূর্য উঠল । সৈকতে জেলেদের ব্যস্ততা ছাড়িয়ে চলে যাই অনেক দূরে নির্জনে । সামনে এক খাড়া পাহাড় । এটিকে এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব । কিন্তু শান্তি, দীপঙ্কর ও ধনঞ্জয় চলল সেই খাড়া পাহাড়ে উঠতে । পিছনে শুভময়ের ক্যামেরা । কিছুক্ষণ রক ক্লাইম্বিং কসরতের পর আবার হাঁটা । ভোরের সোনা রোদ্দুরে সৈকতকে আরও বেশি সুন্দর লাগে । ডানদিকে বালিয়াড়ির মাঝে ঝাউবনের দেখা পেলেও গ্রাম নজরে পড়ল না । দূরে বহু লোকজনের জটলা থেকে সহজেই বোঝা গেল ওখানে বড় গ্রাম আছে । ওখানেই রয়েছে জনবহুল পুডিমাডাকা । বাঁদিকে সৈকত বাঁক নিয়েছে । আর সেই বাঁকের মুখে বালির ওপরে সারি সারি নৌকো । তারপর সারিবদ্ধ নারকোল গাছের ছায়ায় জেলেদের ঝুপড়ি । দুপুরের রান্না-খাওয়ার জন্য এমনই একটা খালি ঝুপড়িতে ঢুকে পড়লাম । আমাদের ঘিরে বহু লোকজন বালিতে বসে পড়েছে । দেখছে আমাদের কর্মকাণ্ড । দুপুরের রোদ কমতেই নেমে এলাম সৈকতে । চার টুকরো লম্বা কাঠ জুড়ে তৈরি ভেলা নৌকো ফিরছে গভীর সমুদ্র থেকে । নৌকোয় লাগানো আছে কেরোসিন তেলচালিত মোটর আর রয়েছে নানারঙের পাল । তাই গভীর সমুদ্র থেকে খুবই দ্রুত মাছ নিয়ে চলে আসছে পাড়ে । মাছ নামানো, নৌকোকে ওপরে তোলা, মাছ বাছাবাছি, নিলাম ডাকা, সব মিলিয়ে চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা । পুডিমাডাকার ব্যস্ততা ছাড়িয়ে উঠে এলাম একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে । ওপরে রয়েছে এক ছোট্ট মন্দির । এখানেই মোহাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি । বিশাল সমুদ্রে নীল জলরাশির বুক চিরে লাল রঙের পালতোলা নৌকো ফিরছে দলে দলে । পালের রং নীল, হলুদ, সাদা, বেগুনি, আবার কোনওটায় নানারঙের নকশা কাটা । এ দৃশ্য দারুণ লাগে । যেন দেখার আর ছবি তোলার শেষ নেই । তারপর পা বাড়ালাম দক্ষিণদিকে । সেখানে শুধুই নির্জনতা । পায়ের কাছে ঢেউ ভাঙার শব্দ আর পাখিদের আনাগোনাই চলার সঙ্গী । সেই নির্জনতার মাঝে একটা খাড়ির পাশে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লাম । ভাঁটার সময় । তাই জল কম ছিল । এক হাঁটু জল ভেঙে আবার হাঁটা । চলতে চলতে বেলা পড়ে এল, ডানদিকে মাঝে মাঝেই নজর রাখি । কোথাও কোনও গ্রাম নেই । আছে এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি । সামনে সাগরের জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় পাহাড় । এক সময় বালির ওপরে লোকজনের পায়ের ছাপ দেখে ডানদিকে ঢুকে পড়লাম । গ্রাম আছে, তবে অনেকটা ভেতরে । এক মেঠো পথ ধরে পৌঁছে গেলাম লোভাপালেম গ্রামে । চলে

এলাম তুফান হাউসে । সবুজে ঢাকা এক উঁচু পাহাড়ের কোলে গ্রামটি খুবই সুন্দর । সর্বত্রই গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সব সমস্যাই মিটে যায় অনায়াসেই ।

পরদিন সাগরপাড়ে সেই উঁচু পাহাড়টির পায়ের কাছে পৌঁছে গেলাম । সরাসরি পাহাড়টি টপকে যাব, না জলের ধারে ধারে এগিয়ে যাব এই নিয়েই ভাবছিলাম । এমন সময় দুটি আঞ্চলিক ছেলের দেখা পেলাম । ওরা জানাল, জলের ধারে ধারে যাওয়া যায় । কিন্তু পথ সহজ হবে না । অতএব আমাদের ওটাই পছন্দ । কখনও পাহাড়ের গায়ে গায়ে, আবার কখনও পাথর টপকে এগিয়ে চলি । জল আছড়ে পড়ে বাদামি রঙের খাড়া পাহাড়ের গায়ে । তখনই এগনো কঠিন হয় । কোনওরকমে পা রাখার মতো জায়গা খুঁজে খুঁজে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি । পাথরের গায়ে ভারি অদ্ভুত কারুকার্য । পা হড়কালেই পড়তে হবে জলে আর তারপর ঢেউ তুলে আছাড় মারবে পাথরের গায়ে । তবুও অ্যাডভেঞ্চারের নেশা সেই পথেই আমাদের নিয়ে চলে । এক সময় সেই পথের শেষ হয় । শুরু হল সোনালি সৈকত । চলার গতিও যায় বেড়ে । কিন্তু সেই চলা বেশিক্ষণ নয় । সাগরপাড়ে একটা রুক্ষ খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে । এ পাহাড়ের ধারে ধারে জল ছুঁয়ে এগনো সম্ভব হল না । অগত্যা এটিকে টপকানোর পথ খুঁজি । পথ খুঁজে হয়রান হয়ে বসে পড়লাম এরই পদতলে । আঞ্চলিক লোকজনের জন্য অপেক্ষা করি । অনেকক্ষণ পর একটি মেয়ের দেখা পেলাম । তার সামনে বেরোতেই সে তো ভয়ে কাঠ । অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে আকার ইঙ্গিতে জানা গেল ওঠার রাস্তাটি কোথায় । কাছেই ছিল ওঠার পথটি । কিন্তু নিচ থেকে বোঝার উপায় নেই । সেই দেওয়াল ধরে চার হাত পায়ে উঠে এলাম পাহাড়টির ওপরে । ওপর থেকে সাগরের অন্যরূপ । দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত । দিগন্তবিস্তৃত শান্ত জলরাশি । এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখার আনন্দই আলাদা । পাহাড়টির দক্ষিণ ঢালের নামার পথটি এবড়োখেবড়ো পাথরের মধ্য দিয়ে । সরাসরি নেমে এলাম বালুবেলায় । ডানদিকে বাঁক নিতেই দূরে নজরে পড়ল মেয়েদের জটলা । ওখানে কুয়ো রয়েছে । পাশেই পাহাড়ের ঢালে রয়েছে একটা গুহা । দুপুরের বিরতির জন্য এ এক আদর্শ জায়গা । জায়গাটির নাম রেভাটারা ।

সামনে এক ছোট্ট নদী মিশেছে সাগরে । খেয়া নৌকোর ব্যবস্থা আছে । তাই পারাপারের কোনও সমস্যাই নেই । এছাড়াও বাঁশের বোনা বড় আকারের ঝুড়ির পিছনে পলিথিন চাদর মুড়ে তৈরি হয়েছে এক গোলাকার ভাসমান ঝুড়ি । এই ঝুড়িতে চেপে একজন একজন করে পার হবার ব্যবস্থা আছে । দক্ষিণদিকে একটানা সুন্দর সৈকত । দূরে এক অস্পষ্ট পাহাড়কে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলা । সাগরবক্ষের এই পাহাড়টি ক্রমে স্পষ্ট হয় । মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এর সামান্যই যোগ আছে । কাছেই রেভুপালভরম গ্রাম । সাগরপাড়ে পুজোপাঠ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম । নারকেল ফাটানো হল, বলি দেওয়া হল

একটি মোরগকে। মাথাটি ছুঁড়ে দেওয়া হল সাগরের জলে। বাকিটা প্রসাদ। রক্ত মাখানো হল নতুন সুতোয়। এই সুতো দিয়ে একটা নতুন জাল বোনা শুরু হবে, তাই এই পুজোপাঠের ব্যবস্থা। সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের মাঝে। এ জায়গাটি অপূর্ব। পূজারী খুবই সদাশয় ব্যক্তি। এপথে সকল পদযাত্রী এখানেই রাত কাটায়। এই মন্দিরের মাঝে, দক্ষিণদিকে সাগরের জল ছুঁয়ে আর কোনও পাহাড় দেখা যায় না। ঝাউবনের পিছনে সূর্য মুখ লুকিয়েছে। সাগরের জল আর সিক্ত বেলাভূমির রং তখন রক্তিম লাল।

এখান থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্যও অপূর্ব। এক ঝলসানো আলোর মাঝে পালতোলা নৌকোর হারিয়ে যাওয়া দেখতে দারুণ লাগে। এখানেই শেষ হল এই পর্বের ছয়দিনে সৈকত পদযাত্রা। রেভুপালম থেকে বাসে ফিরে এলাম বিশাখাপত্তনম।

ভ্রমণ ডিসেম্বর, ২০০২

চাঁদের দেশ লাদাখ

কমলেশ কামিলা

রোটাং পাসে বরফের ছিটেফোঁটা নেই । যারা মানালি থেকে রোটাংয়ে বরফ দেখতে গেছে তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে আরও এগিয়ে চলেছে কিছুটা দূরে পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা বরফের সন্ধানে । আমাদের গন্তব্য চাঁদের দেশ লাদাখ । মানালি দিয়ে প্রবেশ ও শ্রীনগর দিয়ে প্রস্থানের পরিকল্পনা ।

সকালের ঝকঝকে আলোয় ভেড়ার পাল চলেছে রাস্তার ওপর দিয়ে । পিছনে বরফের একটি শৃঙ্গ অসাধারণ লাগছে । ভেড়ার পালকে পাশ কাটিয়ে নামতে থাকি । তলা দিয়ে রুপোলি ফিতের মতো বয়ে চলেছে চন্দ্রা নদী । পৌঁছে যাই গ্রামফুতে । এখান থেকে পূর্বদিকে চন্দ্রা নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে কুনজুম পাস হয়ে কাজা যাওয়ার রাস্তা । লাদাখের সঙ্গে ভৌগোলিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে লাহুল ও স্পিতির অনেক মিল রয়েছে । তাই এই অঞ্চল হিমাচলের লাদাখ নামে খ্যাত । চন্দ্রার তীর ধরে চলেছি । টান্ডিতে পৌঁছে দেখি চন্দ্রায় এসে মিশেছে ভাগা নদী । তারপর চন্দ্রভাগা নাম নিয়ে পশ্চিমে বয়ে চলেছে । আমরা চলেছি উত্তর-পূর্বে । চন্দ্রভাগার তীর ধরে চলেছে উদেপুর যাওয়ার পথ ।

ঘরবাড়ি খেতখামার গ্রামজীবন ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম লাহুলের সদর শহর কেলং । এখানে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে আবার চলার শুরু । জেসপা ছেড়ে পৌঁছে গেলাম দারচা । হোটেলে রাত্রিবাস । এরপর মানালি-লে পথে অস্থায়ী তাঁবুতে রাত কাটাতে হয় সারচু অথবা পাং-এ । আর এপথের শেষ গ্রাম রঙ্গিত । তারপর আর মানুষের বসতি নেই লে-র সাতচল্লিশ কিলোমিটার আগে উপসি ছাড়া । রঙ্গিতের পর থেকেই শুরু হল রুক্ষ পাহাড়, পথঘাট । কিন্তু তারই মধ্যে স্ফটিক স্বচ্ছ টলটলে জলে পাহাড়, নীলাকাশের প্রতিচ্ছবি-সুরজতালে । কিন্তু সে দৃশ্য উপভোগ করার মতো সময় নেই আমাদের । পেরোতে হবে এপথের দ্বিতীয় গিরিবর্ত্ম বারালাচালা । উচ্চতা ১৬,০২২ ফুট । অল্পক্ষণের মধ্যে পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে এলাম । নীল আকাশের নিচে চারদিকে সারি সারি বরফ ঢাকা চূড়াগুলোর মাথা ছুঁয়ে চলেছি । কিন্তু এই উচ্চতায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না, শ্বাসকষ্ট হয় । শুরু হল নামার পালা । সারচু পেরিয়ে চলি পাংয়ের দিকে । যদি হিমাচল পর্যটনের বাসে যান তাহলে মানালি-লে ৪৭২ কিলোমিটার লম্বা এই হাইওয়েতে রাত্রিবাস করতে হয় সারচুতে । ছোটগাড়ির ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে পাংয়ে রাত্রিবাস করা সম্ভব । তাই আমরা এগিয়ে চলেছি

। আমাদের পূর্বদিকে রূপসু উপত্যকা ও পশ্চিমে জাঁসকার উপত্যকা । গ্রেট হিমালয় গিরিশিরা, বারালাচা পেরিয়ে এসে পড়েছি ট্রান্স-হিমালয়ে । সারচু পেরিয়ে আমাদের গাড়ি যেখানে থামল, সেই জায়গাটির নাম ব্রান্ডিনালা । অস্থায়ী ক্যাম্প হোটেল । বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা বেশি । একটি লাদাখি তরুণী দৌড়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তাদের তাঁবুতে রাত্রিবাসের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল । অবশেষে তার কাছ থেকে চা-পান করে তবেই নিস্তার পাওয়া গেল । প্রতিবছর জুনের শুরুতে বরফ গলে পথ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাদাখিরা তাঁবুর হোটেল মেলে বসে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত । তারপর গ্রামে ফিরে যায় । এই সময়ে গদ্দিরাও ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে ওপর থেকে নেমে গ্রামে ফেরে । এটাই তাদের সারাবছরে আয়ের একমাত্র রাস্তা । যত দূর চোখ যায় অনুর্বর শুষ্ক-রুক্ষ পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ।

কিছুটা পথ চলার পর হাজির হলাম গাটালুপের কাছে । খাড়া চড়াইপথ সতর্কতার সঙ্গে পার করে আমাদের লাদাখি ড্রাইভার জানাল, আমরা পৌঁছে গেছি আইবেক্সের চারণভূমিতে । ভাগ্য সহায় হলে দেখা মিলবেই । সমতলে ছোট ছোট ঢিপির ওপরে ঘাসের চাপড়া সাজানো । হিমবাহিত ড্রামলিনে গঠিত । ভারতের আর কোথাও এই ভূমিরূপ দেখা যায় না । হঠাৎ আমাদের গাড়ি থেমে গেল । দেখি দুটি বাচ্চা সহ দুটি পূর্ণবয়স্ক আইবেক্স আমাদের দিকে সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে খাওয়া ছেড়ে । হালকা খয়েরি ও ছাই রঙা শরীর । মাথার শিং দুটি সবচেয়ে নজরকাড়া । গাড়ির শব্দ হতেই তারা দূরে সরে গেল । আমরা এগিয়ে চলি লাচুলুং গিরিবর্ত্মের দিকে । উচ্চতা ১৫,৩০২ ফুট । ধীরে ধীরে উঠে এলাম লাচুলুং গিরিবর্ত্মের মাথায় । এখান থেকে জাঁসকার ও লাদাখ গিরিশিরা ও ট্রান্স হিমালয়কে বোঝা যায় । লালচে, খয়েরি, হলদে, কালচে, সবুজ শেডের পাহাড়ের মাথায় শুভ্র তুষার মুকুটে পড়ন্ত বিকেলের আলো লালচে হয়ে উঠেছে । সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে ধীরে ধীরে নেমে আসি । অবশেষে দেখলাম কাংলাপাল শৃঙ্গকে । তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো । আজও অজেয় এই শৃঙ্গ । অবশেষে রাতের গন্তব্য পাংয়ে পৌঁছই । ইতিমধ্যে ঠান্ডা বাতাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে । শরীরে উচ্চতাজনিত আলস্য ও শিথিলতা দেখা দিয়েছে ।

পরদিন সকালে মাখন ও লবণ মেশানো চা-পান করে চাঙা হয়ে উঠি । এই চা গুরগুর নামে পরিচিত । প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ি । প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বুগিয়ালের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে । দুপাশে দেড়-দু কিলোমিটার দূরে সরে গেছে পাহাড় । এখান থেকে পূর্বে পথ গিয়েছে রূপসু উপত্যকার মানালি-লে হাইওয়ের রোকচেন থেকে সো-বার সরোবর হয়ে সোম । এই অপূর্ব প্রান্তরের নাম জাগচুদং । এখানে প্রথম দেখা মিলল গর্ত থেকে বেরিয়ে দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়া মারমটদের । এদের আঞ্চলিক নাম টাব । এক গদ্দি

পরিবারের কিছু সদস্য ছুটে এল আমাদের থেকে পানীয় জল নেওয়ার জন্য । আমরা এগিয়ে চলি । তারা হাত নেড়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানায় । সমতল ছেড়ে উঠতে থাকি দ্বিতীয় উচ্চতম মোটরমার্গ তাংলাংলা গিরিবর্ত্মে । মানালি-লে পথের সর্বোচ্চ এই গিরিবর্ত্ম লাদাখ গিরিশিরার ওপর অবস্থিত । উচ্চতা ১৭,৩৯২ ফুট । তাংলাংলার মাথায় গাড়ি থেকে নেমে পড়ি । অক্সিজেনের স্বল্পতায় সামান্য শ্বাসকষ্ট হয় । দূরে সিন্ধু উপত্যকা আর কারাকোরাম শৃঙ্গশ্রেণীর অসাধারণ রূপ দেখা যায় । এখানে তাংলাং বাবার মন্দিরে ড্রাইভার প্রণামী দিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ল । নেমে এলাম সিন্ধু নদের ধারে । পথে পড়ল রঙ্গিতের পর প্রথম গ্রাম গিয়াও মিরু । উপসিতে সিন্ধু নদ পেরিয়ে চলি লে-র পথে । দূরত্ব ৪৭ কিলোমিটার । বাঁদিক দিয়ে বয়ে চলেছে মহাসিন্ধু । সিন্ধু নদের ধার ধরে দক্ষিণ-পূর্বে আরেক পথ চলেছে রূপসু উপত্যকায় । আমরা চলেছি জাঁসকার ও লাদাখ দুই গিরিশিরার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে । লে পৌঁছে যাই দুপুর একটায় । ১১,৪৮৩ ফুট উচ্চতায় লাদাখের প্রাণকেন্দ্র । বহুদূর থেকে নজর কেড়ে নেয় পাহাড়ের ওপর লে প্রাসাদ । শহর ছেড়ে লে-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ১-এর ৪ কিলোমিটার দূরে এয়ারপোর্টের কাছে মুনল্যান্ড ট্যুরিস্ট হাটে উঠি । অল্পক্ষণের মধ্যে হাটের কেয়ারটেকারের সঙ্গে আমাদের ভাব জমে ওঠে । বিকেলে ওঁর বাড়িতে গেলাম । ১ কিলোমিটার পথ অলিগলি বাগানের মধ্য দিয়ে । ওংচুকের কিশোরী কন্যা আমাদের নিয়ে গেল বাগানে । গাছের ডালে চড়ে আপেল, খুবানি পেড়ে দিল । গাছ ভর্তি টকটকে লাল আপেল বাগান আলো করে আছে । কাশ্মীরি আপেলের থেকে ছোট কিন্তু মিষ্টি । বাগান থেকে গেলাম বৈঠকখানায় । এটাই ওঁদের রান্নাঘর । শীতে ঘর গরম রাখার জন্য এই ব্যবস্থা সব লাদাখি বাড়িতেই । মেঝে জুড়ে সুদৃশ্য পুরু কার্পেট । ছোট ফোল্ডিং কাঠের টেবিলে ড্রাগন ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির সুদৃশ্য নকশা । নাম চোগতে সে । জাপানিদের মতো লাদাখিদেরও চা-পানের একটা রীতি আছে । মোমো ও চা দেওয়া হল আমাদের । সেই মাখন দেওয়া গুরগুর চা ।

পরদিন লে-র ডিসি অফিস থেকে লাদাখের সীমান্তবর্তী দ্রষ্টব্যগুলো দেখার জন্য ইনারলাইন পারমিট জোগাড় করে বেরিয়ে পড়ি হেমিসের উদ্দেশে । লে-মানালির পথে সিন্ধু নদ পেরিয়ে ডানদিকে এক পাহাড়চূড়ায় হেমিস । দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার । লাদাখের সর্ববৃহৎ এবং ধনাঢ্য এই গুম্ফাটি রাজা সেনগে নামগিয়াল ১৬৩০ সালে নির্মাণ করান । গুম্ফাটি দুভাগে বিভক্ত । একাংশে জনসমাগমের জন্য বিশাল হল, অন্য অংশটিতে বৌদ্ধমন্দির । আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি বিশাল দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে । দুপাশ জুড়ে লামারা তখন বসেছে প্রার্থনায় । আমাদের ইশারা করে বসতে বলা হল । প্রার্থনা শেষে আমাদের সেই গুম্ফার অন্দর ও ছাদ ঘুরিয়ে দেখালেন এক লামা । ফেরার পথে গেলাম লাদাখের সবচেয়ে কারুকার্যময় থিকসে গুম্ফায় । লে থেকে দূরত্ব ২০ কিলোমিটার ।

পাহাড়ের মাথায় দূর থেকে দেখতে দারুণ সুন্দর লাগে । গুম্ভার দুটি তল জুড়ে রয়েছে বিশাল পদ্মাসনে বসা বুদ্ধমূর্তি । মুকুটে নানা দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে । এছাড়া এখানে অন্যান্য মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি কালীমন্দিরও রয়েছে । ফেরার পথে শ্যে প্রাসাদের গুম্ভার ২৫ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্তিটিও দেখে নিই ৫ কিলোমিটার পথ এসে ।

পরদিন সকালে পাড়ি দিই নুব্রা উপত্যকায় । বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটরমার্গ খারদুং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার রোমাঞ্চই আলাদা । যত ওপরে উঠতে থাকি লে শহরকে তত অপূর্ব দেখায় । সকালের আলোয় ক্রমশ অবগুণ্ঠন খুলে দেখা দেয় জাঁসকার পর্বতশ্রেণী । বাঁদিকে একটি রাস্তা চলে গেছে ১২,৫০০ ফুট উচ্চতায় লে-র সর্বোচ্চ গ্রাম গংলাসে । এখানেই রয়েছে লে শহরের পানীয় জল সরবরাহের রিজার্ভার; পাহাড় কেটে গেটের মতো জায়গায় লেখা আছে গেটওয়ে অব নুব্রা । লে থেকে টানা ৪৫ কিলোমিটার পথ এসে গাড়ি থামল খারদুংলার ওপর । গাড়ি থেকে নামতেই হিমশীতল বাতাসের দাপটে কাঁপুনি ধরে গেল । বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বেশ টের পেলাম । একটি ফলকে চোখ আটকে যায়, ইংরিজিতে লেখা, আপনি এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন । এই পরিবেশে এটাই যেন বাস্তব মনে হয় । পাশের একটি নীল রঙের থামে ও ডানদিকে একটা হলুদ ফলকে লেখা: প্রজেক্ট হিমাঙ্ক; হাইয়েস্ট মোটরেবল রোড অব দি ওয়ার্ল্ড, হাইট ১৮,৩৮০ ফুট । আবহাওয়া ভালো থাকায় দক্ষিণে জাঁসকার পর্বতশ্রেণী ও উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য শৃঙ্গ দেখার সৌভাগ্য হল । এবার পাকদণ্ডী বেয়ে কয়েক হাজার ফুট নেমে এসে দেখা হল সাইয়ক নদীর সঙ্গে । পান্না রঙের নদীর জল বয়ে চলেছে বিক্ষিপ্তভাবে চড়া সৃষ্টি করে । কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এলাম সাইয়কের তীরে । দুদিকে পাহাড় ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে । সাইয়ক নদী উপত্যকা ধরে চলেছি । এখান দিয়েই ছিল প্রাচীন রেশমপথ । তখন এই রাস্তাকে বলা হত খোটান রোড । আর লে-কে বলা হত গেটওয়ে অব সেন্ট্রাল এশিয়া । এ পথেই বণিকরা কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে চিনের সিংকিয়াংয়ের মধ্য দিয়ে কাশগার ইয়ারখন্দ মধ্য এশিয়া যেত মাসের পর মাস ধরে উট, ঘোড়া, গাধা, ইয়াকের পিঠে মাল চাপিয়ে ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর পৌঁছলাম নুব্রা উপত্যকার বৃহত্তম জনপদ ও মহকুমা শহর দেসকিটে । লে থেকে নিচু । ৮,৫০০ ফুট উচ্চতায় বাজার, দোকান, স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক সবই রয়েছে । আবহাওয়া ভালো থাকায় প্রথমেই গেলাম দেসকিট মনাস্ট্রিতে । এই মনাস্ট্রির বারান্দা থেকে নুব্রা নদীর ওপারে সাসের কাংড়ি পর্বতমালা ছাড়াও দেখা গেল মাসের ব্রুম (২৫,৬৬০ ফুট), গোল্ডেন থ্রোন (২৩,৯৯০ ফুট), গ্রাসের ব্রুম-১-২-৩, ব্রড পিক এবং আরও অনেক বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গের মধ্যমণি হয়ে থাকা বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কে-২ বা গডউইন অস্টিন । মনাস্ট্রি দেখে হুন্ডারের পথে রওনা দিলাম । আড়াই

কিলোমিটার পথ পেরোতেই বালিয়াড়ি শুরু হল। তারই প্রান্তভাগে হেঁটে চলেছে দু-কুঁজের ব্যাক্ট্রীয় উট। অবশেষে পৌঁছে গেলাম হুন্ডার ট্যুরিস্ট বাংলোতে। চারটি উট এসেছে সেই মরু সফরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে একটি কুঁজে হেলান দিয়ে অন্য কুঁজটি ধরে বসলাম।

সকাল দশটায় উট সফরের গায়ে ব্যথা কমাতে চললাম উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করতে। প্যানমিকের এই উষ্ণপ্রস্রবণ যেন শীতলমরুর মধ্যে প্রকৃতির এক বিস্ময়। এ পথটি চলে গেছে কারাকোরাম গিরিবর্ত্ম হয়ে মধ্য এশিয়া। কিন্তু এপথ আজ বন্ধ। তাই প্যানমিক ছাড়িয়ে আর যাওয়া গেল না। হুন্ডারে ফিরে বিকেলে হুন্ডার গ্রাম দেখতে গেলাম।

পরদিন সকালে দেসকিটের ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম দেখে লে ফিরে এলাম। বিকেলে লে প্রাসাদ, শঙ্কর গুম্ভা, শান্তিস্তূপ দেখে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

সকালে ঘুম ভাঙল গাড়ির হর্নে। রাতে সব গোছানোই ছিল। ভোর চারটেয় বেরিয়ে পড়লাম প্যাংগং সরোবরের পথে। তখনও লে শহর জাগেনি। আমরা কারু থেকে বাঁদিকের পথে রওনা দিলাম। এপথে দেখা পেলাম পাটকেল রঙের খরগোশ, মারমটের দল ছাড়াও অসংখ্য পাখির। চেকপোস্ট পেরিয়ে আমরা ক্রমশ পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। এক সময় পৌঁছে গেলাম লাদাখের তৃতীয় উচ্চ গিরিবর্ত্ম চাংলা। উচ্চতা ১৭,৩৫০ ফুট। এখানে রয়েছে একটি শিবমন্দির। চাংলা বাবা নামে তিনি জনপ্রিয়। চাংলা থেকে ক্রমশ উতরাই পথে এসে পড়ি কয়েক হাজার ফুট নিচে। চলে আসি অপূর্ব এক সরোবরের তীরে। সেই সরোবর আলথাক সরোবর নামেই খ্যাত। এখানে প্রাতরাশ সেরে আবার চলা শুরু হল। দুরবুক নালা ছাড়িয়ে পৌঁছলাম তাংসে। সুন্দর গ্রাম। আরও ১৫ কিলোমিটার দূরে মুগলিব গ্রাম। গ্রামের সবাই যাযাবর চাংপা উপজাতির মানুষ। পশুচারণ তাদের একমাত্র জীবিকা। খানিকক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাই লুকুং চেকপোস্টে। পারমিট দেখিয়ে কিছুদূর চলার পর দেখা গেল ওপর থেকে প্যাংগং সরোবর। অবশেষে পৌঁছে যাই ১৪,৪৫০ ফুট উচ্চতায় এশিয়ার বৃহত্তম নোনতা জলের সরোবরে। প্যাংগং ও চ্যাংচেনমো পর্বতশ্রেণীর মাঝে এর অবস্থান। ১৩৫ কিলোমিটার লম্বা এই সরোবরের মাত্র ৪৫ কিলোমিটার রয়েছে ভারতে, বাকিটা রয়েছে তিব্বতে। এই বিশাল সরোবরের তীরে পৌঁছে নির্বাক। তীর ছুঁয়ে পান্না সবুজ জল, মধ্যে ময়ূরকণ্ঠী নীল, পাহাড় ঘেঁসা অংশে লালচে থেকে বাদামি বা খয়েরি। তারই সঙ্গে আকাশের মেঘের প্রতিফলনে রুপোলি প্রলেপ ঢেউয়ের খাঁজে। সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনে সরোবরে চলেছে রঙের খেলা। এগিয়ে চলি তীর বরাবর আরও পুবে। একেবারে জলের ধারে কোথাও জলের কিনারে পাখির দল। জলে ভেসে বেড়াচ্ছে পিনটেল, ব্রাহ্মণী হাঁস। কখনও উড়ে এসে বসছে

জলে সিগাল। ছবি তুলে আশ মেটে না। সকাল সাড়ে নটা থেকে পুরো দুপুরটা কাটিয়ে বিকেল তিনটেয় লে ফেরার পথে রওনা দিই। সাড়ে আটায় পৌঁছই লে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য দক্ষিণ-পূর্বাংশের সোমোরিরি সরোবর। বেরিয়ে পড়ি সকাল ছটায়। গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা ও সিন্ধু উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশে রূপসু উপত্যকায় এই সরোবরের অবস্থান। দুপথেই সোমোরিরি যাওয়া যায়। আমরা স্থির করলাম তাংলাংলা দিয়ে প্রবেশ করে সো-বার, সোমোরিরি দেখে প্রস্থান করব পুগা, চুমাথাং হয়ে সিন্ধু নদের ধার দিয়ে। সেইমতো তাংলাংলার পথে ১৫৪ কিলোমিটার এসে পৌঁছই সো-বার সরোবরের তীরে। এখানে পাশাপাশি দুটি সরোবর রয়েছে। বাঁয়ে সো-বার, ডাইনে তাগসাবুক-সো। দুটি সরোবরের মধ্যে রয়েছে একটি সংযোগকারী সরু নদী। যা পেরিয়ে যেতে হবে সোমোরিরি।

অতীতে দুটি সরোবর এক ছিল। সরোবরের তীরে সাদা নুনের মোটা স্তর জমে রয়েছে। জানা গেল, জলে এপসাম জাতীয় নুন ছাড়াও বোরাক্স রয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এই নুন সংগ্রহ করে। আগে এই নুন লাদাখ ও তিব্বত যেত। নদী পেরিয়ে এসে পড়ি বিশাল এক রুক্ষ সমতলভূমিতে। পাহাড় সরে গেছে দূরে। কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের গাড়ি থামল। দেখি চারটি তিব্বতি বন্য গাধা চরে বেড়াচ্ছে। কমলা বাদামি রঙের মসৃণ লোমে ঢাকা ঘোড়ার মতো বিশাল চোহারা। লাদাখে কিয়াং নামে বেশি পরিচিত। আমরা যত এগোই কিয়াং ততই দূরে সরে যায়। এখানে রাস্তা বলে কিছুই নেই। গাড়ির চাকার দাগ দেখে জনমানব শূন্য এপথে আমরা চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর যাযাবর চাংপা দলের সঙ্গে দেখা হল। তারা জলের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এল। আমাদের থেকে পানীয় জল নিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কিছুক্ষণের মধ্যে পোলোগোংকালা হয়ে সুমদো গ্রামে পৌঁছলাম। এখান থেকে কোরজোক ১৩ কিলোমিটার। কিছুক্ষণ চলার পর দেখা মেলে থাজাংকুরু-সো বা সরোবরের। আকারে ছোট, সৌন্দর্যে অতুলনীয়। ঘননীল জলে পরিপূর্ণ। অল্পক্ষণের মধ্যে সোমোরিরির তীর ধরে পৌঁছে যাই কোরজোক গ্রামে। গোধূলির আলোয় সিঁদুরে রাঙা মেঘের নিচে সোমোরিরি সরোবর হয়ে উঠেছে অনন্য। আজ পূর্ণিমা। পূর্বাকাশে বিশাল চাঁদ উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার আলোয় ভেসে গেল বিশ্ব চরাচর। সরোবরের জলে চাঁদের আলোয় অসংখ্য ঢেউয়ের মাথায় রৌপ্য মুদ্রার মতো ঝিলিক খেলে যায়।

পরদিন সকালে সরোবরের পুবদিকে লামসের কাংরি ও চামসের কাংরি শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্য দিয়ে আসা সূর্যালোকে সরোবরের জল ধূসর রং থেকে ক্রমশ গোলাপি, গোলাপি থেকে লাল, তারপর সোনালি হয়ে ওঠে, তারপর রং বদলে নীল থেকে গাঢ়তর নীলে রূপান্তরের

ম্যাজিক দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়! কোরজোক গ্রামের বাসিন্দারা তিব্বতি যাযাবর চাংপা উপজাতির । এই কোরজোক গ্রামে রয়েছে একটি গুম্ভা । ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে কোরজোক চু বা নদীর ধার দিয়ে সকালে আমরা রওনা দিলাম কোরজোক প্রান্তরে । এখানে চাংপাদের অস্থায়ী তাঁবুর বসতি রয়েছে । ইয়াকের চামড়া দিয়ে তৈরি তাঁবুতেই এদের ঘরসংসার । ভেড়া, অ্যাঙ্গোরা, ইয়াক, কুকুর, ঘোড়া, গাধা নিয়ে এক চারণক্ষেত্র থেকে অন্য চারণক্ষেত্র ঘুরে বেড়ায় । তুষার চিতা, নেকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালন করে চাংপাদের পোষা কুকুরগুলো ।

পরদিন সকালে লে অভিমুখে রওনা দিই চুমাথাংয়ের পথে সিন্ধু নদের ধার দিয়ে প্রায় সমতল পথে । আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সিন্ধু নদের তীরে আর্যগ্রাম-দা, হানু । লে শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ১-এ ধরে ৯৭ কিলোমিটার চলার পর খালসে থেকে উত্তর-পশ্চিম পথে সিন্ধু নদ ধরে এগিয়ে চলি আরও ৬২ কিলোমিটার । বিমা গ্রামে আমাদের গাড়ি থামল । কিন্তু আমরা থাকব আর্যদের গ্রামের মধ্যেই । তাই আমরা আরও ৪ কিলোমিটার পথ গিয়ে দাগ্রামে দ্রোকপা যুবক সোনমের বাড়ির গেস্টহাউসে উঠলাম । গাড়ি থেকে খেতখামার-বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথে দ্রোকপা মহিলাদের দেখা গেল খেতের কাজে ব্যস্ত । আয়ত চোখ, উন্নত নাক, পুরু রক্তবর্ণ ঠোঁট, চোয়াল ও চিবুকের সুন্দর গড়ন, সুশ্রী মুখমণ্ডল । ফর্সা, দীর্ঘাকৃতি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী । ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় সবুজের ছায়ায় ঘেরা সিন্ধু নদের কোলে আর্যদের ঘর-সংসার । এদের ধমনীতে বইছে খাঁটি আর্য রক্ত । সোনম আমাদের তার গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গেল । সিন্ধু নদের ধারে গ্রামের একপ্রান্ত জুড়ে রয়েছে এদের খেতখামার, ফলের বাগান । আপেল, ন্যাসপাতি, আখরোট, আঙুর, খুবানি আর আলু, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর ইত্যাদি সবজিখেতের মধ্যে সর্বত্র নানান ফুলের বাগান । আসলে দ্রোকপারা ফুল খুব ভালোবাসে । মহিলারা সর্বদাই সুন্দর অলঙ্কার ও ফুল দিয়ে সাজানো টুপি ব্যবহার করে । তবে গ্রামের কেউ মারা গেলে মাথা থেকে ফুলের টুপি নামিয়ে রাখে ।

দ্রোকপাদের পারিবারিক উৎসবের মধ্যে বিয়ে হয় বেশ জাঁকজমক করে । পাত্রের কোনও বন্ধু ছাং নিয়ে পাত্রীর বাড়ি যায় । সেই ছাং নিয়ে আলোচনায় বসে পাত্রীর বাড়ির লোকজন । সকলের মতামত সন্তোষজনক হলে তবেই সকলে মিলে সেই ছাং পান করবে । অর্থাৎ তারা এই বিয়েতে রাজি । আর সম্মত না হলে ছাং ফিরিয়ে দেয় । এই বিয়ে তাদের নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । দ্রোকপাদের সবচেয়ে বড় উৎসব ‘বনো-না’ । আগস্ট মাসের শেষের দিকে হয় । পাঁচদিন ধরে চলে । এছাড়া ‘না’ এবং লোসার উৎসব হয় যথাক্রমে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সুরু উপত্যকা । পরদিন সকালে দা থেকে বেরিয়ে খালসে ফিরে লে-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে কারগিলের পথে রওনা দিলাম । কিছুক্ষণ চলার পর পাকদণ্ডী পথে উঠে আসি ফাতুলা । তারপর নামার পথে পৌঁছে যাই চাঁদের দেশে । পাহাড়ের মাঝে এমন হলুদ খোয়াইয়ের দৃশ্য বিশ্বের আর কোথাও মেলে না । পাশের বোর্ডে লেখা 'দি গ্র্যান্ড ভিউ অব মুনল্যান্ড ।' একটু চলার পর পৌঁছে গেলাম লাদাখের প্রাচীন জনপদ ও গুম্ভা, লামায়ুরুতে । পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো সুন্দর গুম্ভা । ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ দর্শন করে আবার শুরু হয় পথচলা । নামিকা-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এসে পৌঁছই কারগিলের ৪৫ কিলোমিটার আগে জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত মুলবেক চাম্বায় । আফগানিস্থানের বামিয়ানের সেই বিখ্যাত বৌদ্ধমূর্তিটি ধ্বংস হওয়ার পর মুলবেকের পাহাড়ের দেওয়ালে খোদিত কুষাণযুগের ৯ মিটার সুবিশাল চতুর্ভুজ মৈত্রেয় বুদ্ধ আজ সর্বোচ্চ বৌদ্ধমূর্তি । অবশেষে সুরু উপত্যকায় পৌঁছলাম বিকেলবেলায় । মধ্যযুগের বিখ্যাত শহর কারগিল সুরু উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র । মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে কারগিল একটি অন্যতম স্থান দখল করে আছে । তখন কারগিলের বালতি বাজারে রেশমপথের মাধ্যমে চিন, তিব্বত, ভারত ও মধ্য এশিয়ার নানান দেশের পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় চলত । ১৯৭৪ সাল থেকে বাণিজ্যকেন্দ্রের পরিবর্তে কারগিল হয়ে ওঠে শ্রীনগর, লে ও জাঁসকার উপত্যকার সংযোগকারী পর্যটনকেন্দ্র ।

জাঁসকারের পাদুম যাওয়ার পথে সুরু উপত্যকার প্রায় সব দ্রষ্টব্যস্থান দেখা হয়ে যায় । তাই পরদিন ভোরবেলায় রওনা দিই । পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুরু নদী । পানিখারে পৌঁছে সকালের আলোয় সুরু উপত্যকার অন্যতম আকর্ষণ দুই বিখ্যাত যমজ শৃঙ্গ নুন ও কুন দেখে বিস্মিত হই । নুন বরফের চাদরে মোড়া আর কুনের গায়ে কোনও বরফ নেই । যদিও দুজনেরই উচ্চতা প্রায় সমান । এই পানিখার জনপদের ওপর বেশ কয়েকটি ট্রেকিং রুট রয়েছে । ডানদিকে একটা বড় হিমবাহ পড়ল, নাম পেনসিলুঙ্গুলা । এখান থেকে সুরু নদীর উৎপত্তি । আরও এগিয়ে চলার পর পাহাড়িপথ ছেড়ে প্রায় সমতলে নেমে আসতেই নজর পড়ল একটি পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো রংদুম গুম্ভা । গুম্ভা দর্শন করে কিছুটা চলার পর শুরু হল চড়াই । উঠে আসি পেন্সি গিরিবর্ত্মে । একটি পাথরের ফলক চোখ পড়ল, পেন্সিলা, ১৪,৪৩০ ফুট, হায়েস্ট পয়েন্ট অব কারগিল-পাদম রোড । এরপর নামার পালা । পৌঁছলাম জাঁসকারের অনন্য সুন্দর দ্রুং-দ্রাং হিমবাহ । সিকলমুন পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে এক বিশাল বরফের নদী নেমে এসেছে । কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হল না । হিমালয়কে উত্তরদিক থেকে দেখার সুযোগ হল এপথে । সম্মুখে কুথাল ও চাপড়া পর্বতশৃঙ্গ । তার পিছনে ব্রহ্মা শৃঙ্গ, উচ্চতা ২০,১০১ ফুট এবং ব্রহ্মার স্ত্রী, উচ্চতা

২১,১২১ ফুট। অবশেষে সন্ধেয় পৌঁছলাম পাদম। কারগিল থেকে ২৪২ কিলোমিটার ভাঙা পথঘাট পেরিয়ে এসে ক্লান্তিতে শরীর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে পূর্ণিসেতু পেরিয়ে পাদম-দরচা ট্রেকরুটে ৭ কিলোমিটার দূরে ফুগতাল গুম্ভা দেখতে গেলাম। পাহাড়ের গুহার অভ্যন্তর খুবই সুন্দর। তারপর ঝুংকুল ও কারসা গুম্ভা দেখে রওনা দিলাম কারগিলের পথে, রাত ১০টায়। কিন্তু কারগিল থেকে রাত ২টোয় আবার আমাদের গাড়ি ছাড়তে হল, সকালের মধ্যেই জোজিলা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে যেতে হবে। সেনাবাহিনীর কনভয় শুরু হয় তারপর। সকাল ৫টায় ঘুম ভেঙে দেখি জোজিলার ওপর পৌঁছে গেছি। বাঁদিকে দুটি পাহাড়চূড়ার মধ্যে অমরগঙ্গার ধার দিয়ে অমরনাথ যাওয়ার পথ দেখা গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে শোনমার্গ পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে শ্রীনগর মাত্র ৮৩ কিলোমিটার। শোনমার্গে প্রাতরাশ সেরে ফের চলতে শুরু করি। অবশেষে কারগিল থেকে ২৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শ্রীনগর পৌঁছই সকাল ৯টায়, ডাল লেকের হাউসবোটে। পরদিন শ্রীনগর থেকে জম্মু হয়ে কলকাতা ফিরি।

ভ্রমণ জুন, ২০০২

বোকের তোভ, ইজরায়েল

নবনীতা দেব সেন

পুরিম উৎসব

আমি এঘর থেকেই গান-বাজনা শুনতে পাচ্ছি, হাসিখুশি গলার স্বরগুলো অন্ধকারে ভেসে আসছে, রাতের ঠান্ডা বাতাসকে উষ্ণ করে তুলছে । ওরা সবাই পুরিম পার্টি করছে । পুরিম উৎসব ইজরায়েলে খুব জরুরি, বসন্ত উৎসবের মতো । আজ ১৫ মার্চ ১৯৯৫, এই সময়টা বসন্ত উৎসবের ঋতু সারা বিশ্বজুড়ে-আমার দেশেও এখন হোলি হ্যায় । পুরিম উৎসবকে এরা কার্নিভ্যালের রূপ দিতে চেষ্টা করে । করলে কী হবে, ইজরায়েল তো ব্রাজিল নয় । এখানকার মানুষ অতিরিক্ত সিরিয়াস প্রকৃতির । অমন হালকা পলকা ফাজলামি এদের ধাতে নেই । নাচতে ভালোবাসে এরা (হাভা না গিলা, হাভা না গিলা)-নাচতে ভালোবাসলেও এরা ঠিক ছন্দের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে পারে না, এলিয়ে দিতে পারে না । ইজরায়েলীরা স্বভাবতই অধিজ্য জাতি, বড্ড টেনস মানুষ এরা । পুরিম পার্টির জন্য যতই আজগুবি সাজপোশাক করুক, মাথায় শিং পরুক, আর রং মেখে সং সাজুক, এদের পুরিম উৎসবের নাচগানের মধ্যে কোথাও ব্রাজিলের গা ছেড়ে দেওয়া আহ্লাদ নেই, বাঁধন ছাড়া উন্মাদনা নেই । লাতিন আমেরিকার আমুদেপনা, অমন ফুর্তিবাজি জুডাইয়াতে আশাই করা যায় না । জাতটা নিজেদের চিরকাল পরিস্থিতির শিকার হিসাবে দেখে এসেছে । গোটা জাতটা যুগযুগান্তের যন্ত্রণার স্মৃতিকে জড়িয়ে ধরে, আঁকড়ে রেখে, নিজেদের বংশ-পরিচয় গড়ে নিয়েছে । প্রাকপুরাণিক স্তর থেকেই এই জাতি দুঃখ-যন্ত্রণা-ব্যথা-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে স্থিতি খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছে । কাফকা একবার মিলেনাকে চিঠি লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘মিলেনা, তুমি জানো না, ইহুদিরা কিছুই ছেড়ে দিতে পারে না, হাতের কাছে যা কিছু পায় আঁকড়ে ধরতে চায়, সেটা হয়তো একটা পাউরুটির টুকরোও হতে পারে ।’ ইহুদিরা কখনও ভুলে যায় না যে তারা বঞ্চিত হয়েছে, বিতাড়িত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে । তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও তীব্রভাবে রয়েছে এই মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ।

পুরিম উৎসবের দিনটি কীসের স্মরণে? ওইদিনে ঈশ্বর ইহুদিদের বলেছিলেন, চরম দুর্দিনেও তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না, ঈশ্বর সদা সর্বদা তাদের রক্ষা করবেন।

পুরিম উৎসব কীসের স্মারক? পুরিম ইহুদি-বিরোধী দুষ্টু মানুষদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি ইহুদিদের বিজয় উৎসব।

উলপান আকিভা

দোলপূর্ণিমার পূর্ণশশী আর মাত্র দু-রাত দূরে। আমি বসে রয়েছি। ত্রয়োদশীর চাঁদ মাথার ওপরে নিয়ে, নেতানিয়া গ্রামে, ইজরায়েলের মাটিতে। ভূমধ্য সমুদ্রের ঢেউ আছড়াচ্ছে ঠিক পাঁচিলটার ওপারেই। এখানে সবচেয়ে বড় পাওয়া বোধহয় এই, যে এরা কেউ আমাকে চেনে না। আমিও তাদের জানি না। সবই নতুন করে শুরু হবার অপেক্ষায়।

প্রথমত, এসেছি জেরুসালেমে ‘মিশকেনট শা আনানিম’-এর আয়োজিত আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে। সে এক অপার আনন্দময় দশটি দিন। সেখান থেকে এসেছি ‘উলপান আকিভা’-তে, হিব্রুভাষা ও সংস্কৃতি শিখতে। বড়দের হিব্রু শিক্ষার স্কুলগুলিকে বলে উলপান। একটা ফেলোশিপ পেয়েছি এক টার্মের জন্য। তার বেশি থাকতেও পারব না এযাত্রায়, দেশে কাজ আছে।

প্রথম পাঠ শেষ। কিছু কিছু হিব্রু শিখেছি। অক্ষরগুলি, কিছু শব্দ, কিছু ধাতুরূপ। কিছু কিছু শব্দ আমি এর মধ্যে লিখতে পড়তে বলতে পারছি। এরা আশ্চর্য আমার তৎপরতা দেখে। আমি বুঝতে পারছি না এতে এত আশ্চর্য হবার কী আছে। সারা জীবন ধরে একাধিক ভাষা শিখতে চেষ্টা করেছি বলেই হয়তো একটা কাজ চালানোর কায়দা রপ্ত করতে পেরে যাই। অন্য অন্য যাঁরা আমার সঙ্গে পড়েন, তাঁরা দুই জাতের। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রুশ উদ্বাস্তু। তাঁরা শিক্ষার আলো দেখেননি-তাঁরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান বিদেশি ভাষা শিখতে। আর কিছু শখের বাস্তুছাড়া-নব-বসতি পাততে এসেছেন মার্কিন দেশ থেকে স্বামী-স্ত্রী মিলে-রিটায়ার করার পরে। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিদের দেশে রেখে। বয়স্ক হলেও তাঁরা অনেক বেশি মনোযোগী, দ্রুত শিখছেন। একটি জাপানি ছাত্র, দুটি আরব ছাত্র, একজন সুইস ডিপ্লোম্যাট, এক সুইস বৃদ্ধা-এই আরব ছাত্ররা এই প্রথম এসেছে। এদের নিয়ে শ্রীমতী শুলামিথ কার্টজ নেলসন, এই উলপানের প্রাণলক্ষ্মী, ছিয়াশি বছর বয়স্কা প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা, যারপরনাই গর্বিত। ১৯৪৮-এ ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই শুলামিথ এখানে এসেছেন সুইজারল্যান্ড থেকে। আরব-ইহুদি মৈত্রী তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার শিক্ষায়িত্রী তরুণী নাটাশা নিজে একজন রুশ উদ্বাস্তু, নীল চোখ, সোনালি চুল, যাদের ইজরায়েলে বলে আশকেমাজি, আর আমাদের গানের শিক্ষক আপারেম ইয়েমেনের ইহুদি-কালো চুল, বাদামী চামড়া, সাফারডিক ইহুদি যাদের বলা হয় । ইজরায়েলে বর্ণবৈষম্য নেই বলা যায় না, রীতিমতোই আছে । আশকেমাজিরাই শক্তিমান । উন্নতি হয় তাদেরই-নীল চোখ সোনালি চুলেদের । বাদামী চামড়ার ইহুদিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুচ্চারিত হিসেব আছে । এখানে ইহিওগিয়াম ইহুদিরাও আছে । কালো রং, আর অত্যন্ত শ্রীমন্ত তাদের রূপ । তাদের পোশাক-আশাকও আলাদা, তাদের সাংস্কৃতিক জগৎও ভিন্ন । তাদেরও ইজরায়েল ঠিক দুহাত মেলে গ্রহণ করেনি । যেমন করেনি ভারতীয় ইহুদিদেরও । 'বেন ইজরায়েল' জাতি যখন পশ্চিম ভারতের উপকূল থেকে ইজরায়েলে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের ইহুদি বলে স্বীকারই করা হয়নি অনেক বছর । ইজরায়েল নতুন দেশ বটে, কিন্তু পুরনো সংস্কৃতি, আর সনাতন ধর্ম নিয়ে চলে যারা, তারা অচেনাদের সন্দেহ করে, নতুনদের চট করে ঠাঁই করে দিতে চায় না । ইজরায়েলও চায়নি ।

আমাকে এরা ফেলোশিপ দিয়েছে, যাতে হিব্রু ভাষা শিখে আমি হিব্রু কবিতা পড়তে পারি । আমি হিব্রু কবিতা পড়লে ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রকের কী লাভ হবে কে জানে? আমি ইজরায়েলের সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে উৎসুক । আমার আগ্রহের কারণ বাইবেল থেকে শুরু করে আউশাভৎস পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস । এই সেই পবিত্র ভূমি, সেই দুধ আর মধুর দেশ, যার জন্য এত অশ্রুজল, এত রক্তপাত, এত সহস্র বৎসর যাবৎ চলে আসছে । এই সেই জাতি যারা নাকি ঈশ্বরের স্বনির্বাচিত জাতি । যাদের ঈশ্বর প্রচণ্ড জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যথা, বঞ্চনা অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন, কেবল নিজের কাছাকাছি রাখবেন বলে, কোলের মাঝখানটিতে টেনে নেবেন বলে । তাই এত স্থিতিহীন, বেদনাতাড়িত জীবনেও তারাই শত শত বছর ধরে পশ্চিম পৃথিবীর মস্তিষ্কটাকে নিজেদের মুঠোয় রেখেছে । বুদ্ধিজীবী মহলটা প্রায় ইহুদিদেরই নিজস্ব এলাকা ।

দুধ মধুর দেশ

নিশি রাত, ভরা চাঁদ । বাতাসে নুনের গন্ধ । নোনা হাওয়ার সঙ্গে জলের সঙ্গে বেলাভূমির অনাদ্যন্ত প্রণয়লীলার মৃদুগম্ভীর শব্দ । একটু চেষ্টা করলেই এই গ্রিন বিচ হোটেলের পাঁচিলের ওপাশে সবুজ, নীল, কালো স্তরে স্তরে রং পাল্টানো সমুদ্রে সাদা ফেনার বুটিদার অনন্ত ডুরে শাড়ির লুটিয়ে পড়ে থাকা দেখা যায় । হিব্রুর মতো প্রাচীন ভাষা শেখার পক্ষে আদর্শ ঠাঁই, যেখানে জল আর আকাশ এত কাছাকাছি, 'মাইম' আর 'শামাইম' । মরুময় ভূমির দেশ । চরাচরব্যাপী বালুকার দেশ, উটের, আর তৃষ্ণার, আর বেদুইনের আর ইহুদির, প্যালেস্টিনিয়ান আর ইজরায়েলি-দুই যুধ্যমান ভাইয়ের দেশ । এবং কিছু ধর্মমুগ্ধ

খ্রিস্টানের। এখানে তুমি কী করছ নবনীতা? কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে? গঙ্গা-যমুনার পলিমাটি দিয়ে তৈরি মেয়ে তুমি। তোমার 'পবিত্র ভূমি' সেখানে। তুমি এখানে কেন? এ তো তোমার শিকড় সন্ধানের যাত্রা নয়?

তা নয়, কিন্তু এ আমার স্বপ্ন-সন্ধানের যাত্রা তো বটে। যিশুর দেশে আসা! যেখানে পথে-ঘাটে কিংবদন্তীরা সত্য হয়ে আছে। গ্যালিলিও, সাগর, মাউন্ট কারমেল, বেথলেহেম, জেরুসালেম, জর্ডন নদী, নাজারেথ-এইসব নাম যেখানে ভূগোলের মানচিত্রে জীবন্ত হয়ে পার্থিব মানুষে ভরে আছে। সেখানে হাটবাজার বসছে, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, সিনেমা হলে ছবি চলছে। পুজোপাঠ হচ্ছে সিনাগগে, গির্জেতে, অফিসে যাচ্ছে মানুষ, হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটছে শোঁ শোঁ। প্রাত্যহিক ব্যস্ততায় বাস্তব হয়ে উঠেছে প্রাক-ইতিহাস। ম্যাপে দাগ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে প্রত্যেকটা প্রবাদপ্রতিম শহর, গ্রাম, নদী, পাহাড়, হ্রদ। বাইবেলের মানুষদের নামে রাস্তাঘাট যেখানে-কিংবদন্তী যে দেশে জীবন্ত। এক্সটিক? হ্যাঁ, আমার পক্ষে তাই। অতি-দুর্লভ, অতি-অভিনব অভিজ্ঞতা। যেন অন্য কারও স্বপ্নের মধ্যে পদচারণা করছি। যেন অন্য কারও স্বপ্নে ভাগ বসাচ্ছি। ইজরায়েলের রাষ্ট্রনায়ক হেরৎসেল বলেছিলেন-'বাসনা যদি গভীর হয়, তাহলে কিংবদন্তী আর কিংবদন্তী থাকে না।' বাসনা গভীর ছিল, তাই স্বপ্নের দেশ ইজরায়েল জন্ম নিয়েছিল ১৯৪৮-এ। স্বপ্ন সত্য হয়েছিল ইহুদি মানুষের। পুরনো একটি ভাষাকে আধুনিক মানুষেরা প্রত্যহের ভাষা করে তুলেছে সেই স্বপ্ন।

সংস্কৃত ভাষার ঝকঝকে বিজ্ঞানসম্মত পটভূমি থেকে এসে কিন্তু যাই বলো হিব্রু ভাষাটাকে যেন অসংস্কৃত, অবৈজ্ঞানিক, আদিম বলে মনে হয়। যে ভাষা ব্যাকরণ নয়, ব্যবহার নির্ভর। ভাষাটা মুখে মুখে জানা থাকলে, তবেই হিব্রুর লিখিত ভাষায় অধিকার সহজ হয়, অর্থবোধ সহজ হয়। হিব্রু শেখার পক্ষে কল্পনা এবং পূর্ব পরিচয়-দুটোই জরুরি। ইংরিজির মতো অবৈজ্ঞানিক ভাষাকেও হিব্রুর চেয়ে পরিশীলিত মনে হয়। ইংরিজির তো কোনও মাথামুণ্ডু নেই, P-U-T পুট, B-U-T বাট, SO, SEW, SOW সবই সো, DRAFT/ DRAUGHT দুটোই ড্রাফট-যথেষ্ট গোলমেলে বানান। আমাদের ণত্ব-ষত্ব তার চেয়ে ভালো। তার একটা নিয়ম আছে, প্রণালী আছে। তবু ইংরিজিতে পাঁচটা ভাওয়েল আছে, অন্তত কিছু স্বরবর্ণ তো আছে! হিব্রুতে নেই। স্বরবর্ণগুলো সব কল্পনা করে নিতে হবে। একই বর্ণ, অবস্থাবিশেষে স্বরবর্ণও হতে পারে। ব্যঞ্জনবর্ণও হতে পারে। বিভিন্ন অবস্থানে তার বিভিন্ন ব্যবহার। কিন্তু শব্দরূপ, ধাতুরূপ বেশ স্পষ্ট। প্রণালীবদ্ধ। যে আরবের সঙ্গে ইহুদির এত অবন্ধুতা, সেই আরবি ভাষাতেও শুনেছি স্বরবর্ণ নিয়ে এই একই সমস্যা আছে।

সমুদ্র, সমুদ্র

অনেককাল পরে আমি আবার হস্টেলে আছি । ছোট ঘর, অ্যাটাচড বাথ । জানলা নেই । সেজন্যই বোধহয় কেমন একটা জেলখানা-জেলখানা ভাব । সরু খাট । একটি চেয়ার । দেওয়াল আলমারি । আশ্রমের যেমন কঠোর জীবনযাত্রা হওয়া উচিত । একটা পড়ার টেবিল পর্যন্ত নেই, গালচেবিহীন, ঠান্ডা পাথরের মেঝেটা রাতে বরফ হয়ে থাকে । বাইরে বাগানে টেবিল চেয়ার আছে । সেখান বসে পড়াশোনা করতে পারি । রঙিন ফুলে ঘেরা, সুগন্ধে ভারী বাতাসে, দিনের বেলায় পড়াশোনা করতে দিব্যি ভালোই লাগে । কিন্তু সূয্যি ডুবে গেলে, গাঁয়ের মানুষের মতো লেখাপড়া বন্ধ । পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়ালে সমুদ্র দেখা যায় । সূর্য ডুবলে সমুদ্রও ডুবে যায় । কিন্তু সমুদ্র একমুহূর্তও আমাদের ভুলে থাকে না, পরিত্যাগ করে না আমাকে-শ্রবণে তার নিত্য অধিষ্ঠান ।

সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা ইজরায়েলে পা দিয়েই । তেল আভিভের উপকণ্ঠে ছোট্ট শহর হের্ৎসলিয়া পিটুয়াক । তার সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে একটা এবড়ো-খেবড়ো বাড়ি । অবিকল মৌচাকের মতো বাড়িটা । মৌচাকের মতো একটা একটা করে যেন তার কোটরগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে । শরীরে যেমন করে কোষ বৃদ্ধি পায় । আশ্চর্য স্থাপত্য এই বাড়িটার । সমুদ্রতীরের সরকারি পাহাড় আর বালিতে জবরদখল করে একটু একটু করে একটা বাসস্থান গড়ে নিয়েছে পাগল যুবকটি, গুহা, কিংবা বাসা, কেল্লা কিংবা প্রাসাদ বলা যায় তাকে । তার মধ্যে নানারকমের পাখপাখালি, জন্তু-জানোয়ার নিয়ে সে মানুষটি থাকে । তার একটি মানুষী সঙ্গিনীও আছে । ভোরবেলা ছটার সময় সে কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছে পাথরে । একটা দরজা-খোলা খাঁচাতে অনেক পাখির কলকাকলি । এখানে সেখানে নানা রকমের কুকুর, ছানাপোনা নিয়ে বেড়ালগিন্নি । প্রাসাদ? না মন্দির? গুহা? না বাসা? কেল্লা? না লাইটহাউস? না মৌচাক? হনলুলুর বিচের কোনও ফ্যান্সি রেস্তোরাঁও হতে পারত । সরকার তাকে তুলে দেননি । যত রাজ্যের ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে এনে, রাজ্যের অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা যত্ন করে তুলে এনে এই সুন্দর বাসস্থলটি গড়েছে পাগল শিল্পী ছেলেটি । প্রধানত ব্যবহার করেছে প্রকৃতিকেই । দুটি একটি দোর-জানলা শুধু মানুষী সভ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে । যা দিয়ে মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয় । একজনের থেকে আরেকজনকে আলাদা করে, নিজের নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে, সেই জিনিস হল দোর-জানলা । ওদের কি ইলেক্ট্রিসিটি আছে? ওদের দরজায় কি খিল আছে? ছিটকিনি? তালাচাবি? ওই বাড়িতে শঙ্খ ঝিনুকের ছড়াছড়ি । ইংরিজিতে গেঁড়ি ও গুগলি, শঙ্খ, ঝিনুক সবকিছুরই একটা নাম: শেলস, খোলস । নামটা ভালো নয় । আমরা কি সুন্দর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা নামে ডেকে আপনার

জন করে নিই! ওই সমুদ্রতীর থেকে আমি সুন্দর সুন্দর ঝিনুক আর শঙ্খ কুড়িয়ে এনেছি । আমার ঘরটাকে সাজিয়েছি । একটি সাদা রঙের কচুরিপানার ফুলগাছও আছে আমার ঘরে । লীলাখের দেওয়া । সাদা রঙের হায়াসিনথ-কেমন সোনার পাথরবাটির মতো! হায়াসিনথ তো একটা রঙের নাম । কচুরিপানা ফুলের রং । সুদূর ইজরায়েলে এসে টবের মধ্যে কচুরিপানাকে পোষ-মানা ফুলগাছ হিসাবে দেখতে পেলাম । এভাবে ওকে কখনও দেখব ভাবিনি । সুশ্রী টবের মধ্যে, দুটি সুন্দর পাতার মাঝখানে একটি শুভ্র কলিকা হয়ে কোনওদিন আমার ঘর আলো করে থাকবে কচুরিপানা, কে ভেবেছিল? মৃদু সুগন্ধও আছে । সাদা ফুলের যেমন থাকা উচিত । সাদা ফুলের নাম হায়াসিনথ ।

বোকের তোভ, ইজরায়েল

ইজরায়েলি প্রাতরাশের টেবিল কাঁচা সব্জিতে, ফলেতে ঝলমল করে । এ এক নতুন রকমের অভিজ্ঞতা । ব্রেকফাস্টে স্যালাড খায় এরা । অন্য কোথাও এটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না ।

নানারকমের চিজ, দশ-বারো ধরনের শাকসব্জি, বিনস বরবটির স্যালাড, তিন-চার রকমের ফলের রস, দুধ, কফি, চা । কালো রুটি, ব্রাউন রুটি । ইজরায়েলের রুটিটা খুব ভালো । ডিমসেদ্ধ থাকে । কোলড কাটসও কিছু থাকে মাংসের, হ্যাম জাতীয় । কিন্তু এরা প্রধানত শাকাহারী, যা দেখছি । ডিনারেও স্যালাড খাওয়ারই চল বেশি । প্রধান খাওয়াটা হচ্ছে মধ্যাহ্নভোজন । ওটাই বড় করে খাওয়া হয় । সেদিন হের্ৎসলিয়া পিটুয়াক-এর সমুদ্রতীরে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রাতরাশ করেছিলাম । সেই ছোট রেস্তোরাঁতেও প্রাতরাশের বিপুল সম্ভার দেখে আমি তো অবাক! বাইরে বসে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি জলের কিনারা বেয়ে ভিজে বালির ওপরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে একটি মানুষ । তার পিছনে পিছনে ছুটে যাচ্ছে দুটি সাদা ঘোড়া । ওদের পিঠে কোনও সওয়ারি নেই । যেন স্বপ্নের মতো মনে হল । যতদূর দৃষ্টি গেল ঘোড়াগুলি ছুটছে । সমুদ্রতীরে জল ঘেঁসে শেষপর্যন্ত বিন্দু হয়ে আকাশে মিশে গেল । দৃশ্যটা আমাকে অনেক কিছু মনে পড়িয়ে ছিল । ‘রাইডার্স টু দ্য সী’-সিঞ্জের নাটক মনে পড়ল । শিল্পী চিরিকোর ছবি মনে পড়ল । আর মনে পড়ল ১৯৭৯-এ দেখা দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরে কামার্গের বুনো সাদা ঘোড়ার দল । জল ছিটিয়ে তাদের আধা-সমুদ্রে আধা-বালিতে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য । ঠিক স্বপ্নের মতো । কে ছিল ওই ঘোড়সওয়ার? দূরে সমুদ্রের মাঝখানে একটিমাত্র জাহাজ স্থির হয়ে । নোঙর করা জাহাজ, সে শুধুই ভাসছিল, দুলছিল, ভেসে যাচ্ছিল না কোথাও । ইজরায়েলে পা দিয়ে আমার প্রথম সূর্যোদয় এই হের্ৎসলিয়া পিটুয়াক-এর সমুদ্রতীরেই । ভোর চারটেয়

প্লেন নেমেছে। লীলাখ প্রথমেই নিয়ে এসেছিল সমুদ্রে। ইজরায়েলে সূর্যোদয় দেখাতে। গুড মর্নিং ইজরায়েল! বোকের তোভ, ইজরায়েল! এই সবে যাত্রা শুরু!

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

বিষ্ণুপুর মুকুটমণিপুর

হরপ্রসাদ মিত্র

আটটা নাগাদ যখন বালি ব্রিজ পেরোলাম, কুয়াশার আড়ালে সূর্য তখনও ম্রিয়মাণ । বেলুড়ের মন্দির দেখা গেল না । নিচে গঙ্গার জলে নৌকা সন্ধানী বকের মতো ইতস্তত ঘুরছে । নদীর প্রায় মাঝখানে এক দল ছোট স্টিম বা মোটর লঞ্চ । উড়ন্ত মিলিটারি জেটের মতো সংগঠন করে এগোচ্ছে ঠিক যেন একটা তীরের ফলা । ওরা বেড়া জাল পাতছে বা ওঠাচ্ছে । ব্রিজের ওপরে রাস্তা ফাঁকা, হাওয়া মোলায়েম । ব্রিজ থেকে নেমেই গাড়ি যেন গাড্ডায় পড়ল এবং সে গাড্ডা পূর্বগামিনী ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল সেই আরামবাগ পর্যন্ত । প্রায় আশি কিলোমিটার রাস্তা । সে কী রাস্তার অবস্থা! মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনও হিংস্র দানব আকাশ ফাটানো আক্রোশে লোহার নখ দিয়ে রাস্তার বুক-পেট চিরে নাড়িভুঁড়িগুলো ছড়িয়ে রেখে চলে গেছে । তার ভারি পায়ের গর্তে কাদা জল জমে রয়েছে । সেই রাস্তায় থ্যাঁতলাতে থ্যাঁতলাতে, হোঁচট খেতে খেতে এগোতে লাগলাম আর দেখলাম আমাদের দেশের মানুষ কী পরিমাণ সর্বসহ । আমরা তো তবু গদি মোড়া স্প্রিং লাগানো কোচে বসে আছি আর এরা যাচ্ছে ট্রেকারে বেঞ্চি পেতে, টেম্পোতে গাদাগাদি করে, লজঝড় বাসের মাথায় মালপত্র নিয়ে বাবু হয়ে বসে, ধুলায়, রোদে, ঝাঁকানিতে বিপর্যস্ত হয়ে । তবু কোনও প্রশ্ন নেই, প্রতিবাদ নেই । সরকার যে চলবার জন্য রাস্তা আর চড়বার জন্য গাড়ি দিয়েছে তাতেই এরা তুষ্ট ।

মৃগোলা, কামারকুণ্ডু, ঝুপিঝুপি গ্রাম ফুঁড়ে রাস্তা চলেছে । দুদিকে খড়ের চাল, খোলার চাল-কখনওবা একটা আস্ত পাকা বাড়ি, দোকান বাজার, রূপা টি হাউস, রাধাকৃষ্ণ বস্ত্রালয়, ভাইপোর তেলেভাজার দোকান-এই সব পেরিয়ে গাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ল দুদিকে আকাশ ছোঁয়া মাঠের মধ্যে । আলু, আলু আর আলু । আলুর খেত । মাঠের ওপরে আলু শাকের সবুজ বাহার, আসল সম্পদ মাটির নিচে । মাঝে মাঝে নাবাল জমিতে ধানের চাষও আছে । কাদা জলে দাঁড়িয়ে, কোমর ভাঁজ করে স্ত্রী পুরুষ মিলে ধান রোয়ার কাজ করছে । ছোট ছোট ডোবার ধারে বক বসে আছে । খুদে ছেলেমেয়েগুলো ছাঁকনি জাল দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে । কেউ বা ডোবার কাদা ঘেঁটে গেঁড়ি, গুগলি তুলে পাশে ভাসানো হাঁড়িতে রাখছে । একটু নুন হলুদ লঙ্কা আর এক পলা তেল দিলে চমৎকার ঝাল হবে । হঠাৎ এই

একান্ত গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে বিরাট এক সৌধ। পাথরে গড়া দুর্গের মতো বোবা, অন্ধ। দরজা-জানলাহীন দেওয়াল খাড়াই ত্রিশ চল্লিশ ফুট উঠে গেছে। হিমঘর। পৃথিবী জোড়া আলু খেতের মাঝখানে অতি বেমানান হলেও, প্রয়োজনীয় আলু সংরক্ষণের জায়গা। হিমঘর ছাড়া চারদিকের অন্যান্য দৃশ্য যতই মনোহারী হোক না কেন, রাস্তা আগের মতোই কদর্য, অপরিসর। ট্রাফিক যথেষ্ট এবং যখনই দুই বিপরীতমুখী গাড়ি মুখোমুখি হয় দুজনকেই প্রায় রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে অপরকে জায়গা দিতে হয়। রাস্তার সাইনবোর্ড দেখছি। সিয়াখালা। হাওড়া-সিয়াখালা একটা লাইট রেলওয়ে ছিল কি? হরিপাল। শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া। বাসদেওপুর, তারকেশ্বর। থামবার উপায় নেই। যে শম্বুকগতিতে এগোচ্ছি তাতে সন্ধ্যার আগে মুকুটমণিপুর পৌঁছতে পারব না। বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলা। চাঁপাডাঙা, হরিণখোলা-কেমন মজার নামগুলি। এর পরে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপরে টোল ব্রিজ। নদীতে জলের চেয়ে বালি বেশি। পাশে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে-নদী থেকে বালি অনুমতি বিনা তুলিবেন না। ব্রিজের ক্ষতি হতে পারে।

ইতিমধ্যে চলন্ত গাড়িতেই আমাদের সকালের জলখাবার পর্ব শেষ হয়েছে। পৌঁছে গেলাম মায়াপুর (সে মায়াপুর নয়)। এরপর ও অঞ্চলের বিখ্যাত শহর আরামবাগ। আরামবাগ হ্যাচারির খাতিরে আরামবাগের নাম সবাই জানেন। আমি কিন্তু আরামবাগের প্রশস্তি শুনেছিলাম অন্য ব্যাপারে। প্রথমত, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাড়ি। আর দ্বিতীয়ত, ওখানকার মিষ্টান্ন। দ্বিতীয়টির ওপরে আমার লোভ ছিল। চলতি বাস থেকে বাজারের যে কটি মিষ্টান্ন বিক্রেতার সাইনবোর্ডে চোখে পড়ল তাদের প্রত্যেকটিতেই ফলাও করে লেখা আছে যে তাঁরা হলেন কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। আরামবাগ (৯৬ কিলোমিটার) যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। বিষ্ণুপুর আরও দুঘণ্টা। সেখান থেকে মুকুটমণিপুর দুই থেকে আড়াইঘণ্টা। অতএব, আরামবাগে নামা হল না।

আরামবাগের পরেই বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদী দ্বারকেশ্বরের ওপর ব্রিজ। এ নদীতে জল বালি দুইই আছে। কোথাও দল বেঁধে লোক স্নান করছে। ধোপা কাপড় কেচে বালির ওপর মেলে দিয়েছে।

তবুও এ সে দ্বারকেশ্বর নয়, যার কূলে কূলে একদা তরঙ্গ বইত। বহু পালতোলা দাঁড় বাওয়া মহাজনি নৌকা সমুদ্রকূলে তাম্রলিপ্ত থেকে রূপনারায়ণ বেয়ে দ্বারকেশ্বরের মধ্য দিয়ে চলে যেত মল্লভূমে, বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে। এই নদীপথেই এদেশে এসেছিলেন জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। সে হল খ্রিস্টজন্মেরও পাঁচশো বছর আগেকার কথা। সহায় সম্বলহীন সাধুকে তখনকার আরণ্যক আদিবাসীরা ভালো চোখে দেখেনি। ঢিল ছুড়ে মেরেছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সাধু তাঁর নিজের চরিত্রমাধুর্যে সমস্ত বিদ্বেষ জয়

করে অহিংস জৈনধর্মের যে ভিত্তি এখানে স্থাপন করেছিলেন তা পরবর্তী পনেরোশো বছর ধরে অটুট ছিল। এর নিদর্শন এখনও ছড়ানো আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দিরে, দের্বাচনায়। দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে সামান্য দূরে আমরা হুগলি জেলা ছেড়ে বাঁকুড়ায় ঢুকলাম। বাঁকুড়ার প্রথম বড় গ্রাম কোতুলপুর। কোতুল কথাটা কি কোতল থেকে এসেছিল? তা আসুক আর না আসুক, কোতুলপুর মুসলমান প্রধান গ্রাম, যেটা বাঁকুড়া জেলায় সচরাচর দেখা যায় না। তার পরের গ্রাম রায়বাঘিনী পেরোলেই জয়পুরের জঙ্গল শুরু হল। ছোট্ট জঙ্গল ১০-১২ কিলোমিটার হবে। শালগাছই বেশি। এখন শীতের শেষে গেরুয়া মাটিতে, হালকা খয়েরি পাতায় জঙ্গল সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরেছে। শুকনো শালপাতা পুরু হয়ে পড়ে আছে জমি জুড়ে। শালপাতার বোঝা নিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, মোটর ট্রাক। মানুষের মাথাতেও শালপাতার বোঝা। জঙ্গলে কোনও জন্তু চোখে পড়ল না। অবশ্য দুপুর রোদে, ঊর্ধ্বশ্বাস বাস, মোটর, ট্রাকের আনাগোনায় রাস্তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোনও জন্তু থাকার কথাও নয়।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দেখতে দেখতে কোচ বিষ্ণুপুর বাইপাসের মোহানায় থামল। বাঁদিকে শহরে ঢোকবার রাস্তার ধারে লাল পাথরের ফলক-মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আমরা ডানদিক ঘেঁসে বেরিয়ে গেলাম বাঁকুড়ার দিকে কিন্তু তার আগে আমাদের চালক এবং তাঁর সহকর্মী এখানের চালাঘর ভোজনশালায় তাঁদের দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করলেন। আরও আধঘণ্টা গেল। তখন প্রায় দুটো। মুকুটমণিপুর এখনও আশি কিলোমিটার। তবে রাস্তা আগের চেয়ে অনেক ভালো, প্রশস্ত এবং ট্র্যাফিক কম। দুদিকের দৃশ্য ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে। খানা, ডোবা, আলু ও ধানের খেত-এসবের জায়গা নিয়েছে রাঢ়ের আকাশ জোড়া মাঠ। গেরুয়া রঙের কাঁকুরে পাথুরে মাটি-ঢেউ খেলানো উঁচু নিচু খোয়া-যার বুক চিরে চলে গেছে শীর্ণ জলধারা। আর মাঝে মাঝে এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে বড় বড় গাছে ঘেরা উঁচু পাড়ওলা বিরাট দিঘিগুলি। এইরকম এক ডাকাতে কালীদিঘির পাড়েই কি ইন্দিরার কপাল ভেঙেছিল? ওঁদা গ্রাম পার হয়ে আরও ১৫ কিলোমিটার পরে বড় রাস্তার মোড়। সোজা সামনে বাঁকুড়া। আমরা বাঁদিকে ঘুরলাম খাতরা হয়ে মুকুটমণিপুর যাব বলে। এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার। কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বেলাবেলি পৌঁছে যাব।

তালগাছ, তালগাছ আর তালগাছ। ঝাঁকে ঝাঁকে তালগাছ। আর তাদের কি সুপুষ্ট কৃষ্ণচিক্কণ চেহারা। তমাল গাছ দেখিনি কিন্তু আকাশ থেকে এ ভূমি যে তালীবনরাজিনিলা দেখাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরে শুনেছিলাম এই সব তালগাছ এদেশের সম্পদ। এদের সম্পত্তি। এখানকার লোক তালের বাগান করে। যত্ন করে। দেখাশোনা করে। শহর খাতড়া পেরোল। কিন্তু কোথায় সেই মুকুটমণিপুর-কংসাবতী-কুমারী নদীর সঙ্গম।

১১ কিলোমিটার লম্বা, ৩৮ মিটার উঁচু বাঁধ, যার ওপরে পশ্চিমে আকাশ ছোঁয়া জল চাঁদের আলোয় চিকমিক করবে। সেদিন আবার বুদ্ধপূর্ণিমা। তার বদলে আমরা দেখছি নিচু খোয়াপাহাড়ের বেড়া, গাড়ি তার একদিক দিয়ে চলছে। আসলে বাঁধ এবং জল রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে। মাঝখানে কয়েকটা ঢিপি ঢিপি পাহাড়। ফলে রাস্তা থেকে বাঁধের সমগ্রতা চোখে পড়ে না। বাঁদিকে পড়ে রইল মুকুটমণিপুরের সামান্য লোকালয়, দোকান বাজার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট লজটিও এখানে। আমরা লকগেটের ওপরের রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পেলাম দ্বাররক্ষকের কাছে। আমাদের কোচ ওই রাস্তায় নিয়ে যেতে হলে সরকারি অনুমতি লাগবে। তখন বেলা সাড়ে চারটে। ক্যানাল অফিস তখনও খোলা ছিল, অনুমতি পাওয়াও গেল, কিন্তু অফিস টাইমের বাইরে পৌঁছলে ঝামেলা একটু বেশি হতে পারে। মোটর, জিপ বা এইরকম কোনও হালকা গাড়ির অনুমতি লাগবে না কিন্তু মোটর কোচ বা বাসে যাঁরা যাবেন এবং পিয়ারলেসের নিশ্চিন্তাবাসে যাঁরা থাকবেন তাঁরা এই অনুমতির জন্য অগ্রিম বন্দোবস্ত করে নেবেন। পিয়ারলেসের কলকাতা অফিসই সে বন্দোবস্ত করে দেবেন। অন্য কোথাও থাকলে এ অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

লকগেট থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে কংসাবতী জলাশয়ের একটা ধার জুড়ে বেশ কয়েক একর জমি নিয়ে পিয়ারলেসের নিশ্চিন্তাবাস। চারটে করে ঘরের তিনটি ইউনিট তিন জায়গায়। বেশ প্রমাণ সাইজের ঘর, বাথরুম সমেত। এছাড়াও একটি দোতলা ডর্মিটরি আছে। মস্ত লনে ফুল গাছের কেয়ারি। সবুজ ঘাসের আস্তরণে আঁকা লাল সুরকির রাস্তা। সামনে পশ্চিমদিকে জলের ওপারে প্রথমে কিছুদূর বাঁধের পাঁচিল। তারপর সমস্ত উত্তর পশ্চিম দিক জুড়ে দূরের পাহাড় পর্যন্ত বাঁধের জল টলমল করছে। জঙ্গল, পাহাড় জল দিয়ে ঘেরা পিয়ারলেসের আবাসটি মনোরম। বিলাস বাহুল্য নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, আরামপ্রদ। ঘরে ঘরে গরম জলের ব্যবস্থা আছে। খাদ্যতালিকা সীমাবদ্ধ। পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। লুচি, আলু চচ্চড়ির বন্দোবস্ত আছে। বাঙালি তথা ভারতীয়দের খাবার অসুবিধা হবে না। মশা আছে, আবাসে মশারির বন্দোবস্ত আছে। গুডনাইটও জ্বালাতে পারেন। লোডশেডিং হলেও ভয় নেই। আবাসের নিজস্ব জেনারেটর আছে। দু-তিন দিন যদি কেউ নিরুদ্বেগ আলস্যে বাঁধের জল দেখে কাটাতে চান, মুকুটমণিপুর আদর্শ জায়গা। লেখক বা লেখার বোঝা মাথায় নিয়ে আরও কদিন থাকতে পারেন। তবে লেখার সব সরঞ্জাম মায় অভিধান কোষগ্রন্থ সব সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে কিছু পাবেন না।

সময় থাকলে মুকুটমণিপুরের অদূরে অম্বিকানগরে অম্বিকা দেবী দর্শন করে আসতে পারেন। বিরাট পাথরের চত্বরের ওপর আধুনিক যে দালান মন্দিরে দেবী এখন পূজিত

হচ্ছেন সেটি যে হালে তৈরি, তা দেখেই বোঝা যায় । পুরনো মন্দিরটি এর ঠিক পিছনে । একাদশ শতকে তৈরি-কেউ কেউ বলেন, আরও আগেকার । মাত্র পনেরো ফুট উঁচু ভগ্নশিখর ছোট মন্দির । পাথরে তৈরি প্রাক-মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন । মন্দিরের গর্ভগৃহে অম্বিকা দেবীর ভৈরব বলে যে মূর্তিটি পুজো পাচ্ছেন তিনি খুব সম্ভব আদিতে কোনও জৈন তীর্থঙ্কর রূপে প্রকট হয়েছিলেন । মন্দিরের বাইরে দুটি দ্বারপাল, একটি মা ষষ্টি অন্যটি গণেশ । তাতে কোনও ক্ষোভ নেই । যুগে যুগে মানুষ পালটায়, মানুষের দেবতাও পালটায় কিন্তু ভক্তের ভক্তি অচলা থাকে । খোদ অম্বিকা দেবীর মূর্তিটি আগাগোড়া লাল কাপড়ে মোড়া । উজ্জ্বল দুটি চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না । দেবী দর্শন সেরে এসে মুকুটমণিপুর বাজারে একটু ঘুরলাম । বাঁধের রাস্তার দুধারে সারি সারি স্টল । টুকিটাকি সেই সব জিনিস যা ট্যুরিস্টরা বেড়াতে এসে আগ্রহ করে কেনে এবং বাড়ি ফিরে গিয়ে সেগুলো নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না । শুশুনিয়া পাহাড়ের সাদা পাথরের জিনিস (শ্বেত পাথর নয়) যদি কিছু পান তো কিনতে পারেন । মুকুটমণিপুরের আরেকটি বিলাস বাঁধের জলে নৌকাবিহার । এমনই এক ঘণ্টা-দুঘণ্টা বেড়ানো ছাড়াও কেউ কেউ মাঝখানের কোনও দ্বীপে ডিয়ার পার্কে যায় । যেতে আসতে তিন চার ঘণ্টা লাগে । কেউ বা কংসাবতী ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থানে পাহাড় জঙ্গল দেখতে যায় । আমরা সন্ধেবেলা ঘণ্টাখানেক বাঁধের জলে বেড়িয়ে, নিয়ম রক্ষা করলাম । বেশ লাগল ।

মুকুটমণিপুরের পালা শেষ হল । এবার বিষ্ণুপুর । পথে ওঁদা গ্রাম থেকে রেললাইনের ওপারে এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে প্রায় চার কিলোমিটার গিয়ে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি দেখে এলাম । দশ বা এগারো শতকে নির্মিত । মন্দিরটির নির্মাতা কে তা জানা যায় না, তবে আনুষঙ্গিক অলংকরণ থেকে মনে হয় যে পার্শ্বনাথের মন্দির হিসাবেই এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । পরে এসব অঞ্চলে জৈন ধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, মন্দিরটি হিন্দু তীর্থে পরিণত হয় এবং স্বয়ং পার্শ্বনাথ শিব হিসাবে পুজো পেতে থাকেন । ভগ্নশিখর পঞ্চরথ মন্দিরটির এখনকার উচ্চতা কুড়ি মিটারের মতো । শিখরসমেত হয়তো পঁচিশ মিটার ছিল । পুরোপুরি ওড়িয়া শৈলীতে তৈরি রেখদেউল, কিন্তু পাথরের নয় । বাংলার একান্ত নিজস্ব জিনিস, পোড়ামাটিই এর উপাদান । মন্দিরের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে অবাক হতে হয় সেই স্থপতিদের কথা ভেবে যারা ভঙ্গুর পোড়ামাটির ইট একের পর এক সাজিয়ে এই সুউচ্চ মন্দির গড়ে তুলেছিলেন । কোন কুমোরের পোনে এসব ইট পোড়ানো হয়েছিল যা এই এক হাজার বছরেও নোনা লেগে নষ্ট হয়নি! পলেস্তারার বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই কিন্তু ইট বার করা দেওয়ালগুলি এখনও অটুট । আর তার সঙ্গে সাঁটা আছে আধো রিলিফের ছবি আঁকা অনবদ্য পোড়ামাটির

টালিগুলি । নানা রকম জ্যামিতিক নকসা, ফুল লতা পাতার মধ্যে নৃত্যরত মূর্তি । এসব দাঁড়িয়ে দেখতে হয় ।

সিদ্ধেশ্বরের মন্দির দেখে বিষ্ণুপুর পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হল । পুরনো ঘিঞ্জি শহরের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে বাজার ঘুরে যখন বাসস্ট্যান্ডের কাছে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছলাম তখন একটা বেজে গেছে । ওইখানেই খাওয়াদাওয়া করে, যথাসম্ভব সত্বর আমরা দল বেঁধে দুটি সাইকেল রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিষ্ণুপুর মন্দির পরিক্রমায় । প্রথমে ছিন্নমস্তার মন্দির । মাত্র ১৯৭৩ সালে তৈরি মন্দিরটির এমন কোনও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব নেই । আরাধ্য দেবীই হলেন প্রধান বৈশিষ্ট্য । ছিন্নমস্তার মন্দির সচরাচর দেখা যায় না । শহর বাজার অঞ্চলে তো নয়ই । দেবীর মূর্তি পুরাণোক্ত মতেই লাল পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর ছিন্নমস্তক মুখে বা মুণ্ডহীন শরীরের ভঙ্গিতে কোথাও সেই খর্পরধারিণী লোলজিহ্বা রক্তপিপাসা ফুটে ওঠেনি । প্রণাম করে উঠে মনে হল কোমলাঙ্গী দেবী যেন সর্বমঙ্গলা । আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন । এই হল বাঙালির দেবতা । তিনি ঈশ্বর নন, পরম ব্রহ্ম নন অবাংমনসগোচর নন, আবার রক্তচক্ষু, রাজদণ্ডধারী শাসকও নন-তিনি গোপাল হয়ে ঘরে অঙ্গনে খেলে বেড়াচ্ছেন, কন্যারূপে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ি আসছেন-করালবদনী কালীর চোখে তাই করুণা । ত্রিকালেশ্বর শিব তাই দুটি অন্নের প্রত্যাশী । বাঙালির দেবতা, বড় ঘরের জিনিস, বড় কাছের জিনিস এবং এই ভাবনাচিন্তা বাঙালির স্থাপত্যকেও প্রবাবিত করেছে । সে কথায় পরে আসব ।

ছিন্নমস্তার পরে রাসমঞ্চ । আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর মল্লরাজ বংশের প্রখ্যাততম রাজা বীর হাম্বির এটি তৈরি করান । রাসমঞ্চটি সত্যিই মঞ্চ, মন্দির নয় । মল্লরাজাদের আমলে রাস পূর্ণিমার দিন বিষ্ণুপুরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে এখানে এনে আলোয়, ফুলে, বিভূতিতে সাজানো হত জনসাধারণের দর্শনের জন্য ।প্রায় দেড় মিটার উঁচু এবং পঁচিশ মিটার সমচতুর্ভুজ বিশাল পাথরের বেদীর ওপর বসানো মঞ্চটি সারি সারি ইটের থাম এবং খিলান দিয়ে ঘেরা । মাথার ওপর স্টেপ পিরামিড আকৃতির ছাদ ধাপে ধাপে উঠে গেছে আরও দশ মিটার । আশ্চর্য এই ইমারতটি । এর তুলনা দুই বঙ্গের কোথাও নেই । ভাবতে অবাক লাগে যে যুগপৎ ওড়িয়া এবং বঙ্গ স্থাপত্যের সংস্কার বঞ্চিত সৌধটি বিষ্ণুপুরের মতো প্রত্যন্ত প্রদেশে কারা তৈরি করেছিল । রাসমঞ্চ থেকে বেরিয়ে রিকশাবাহিনী গড় অভিমুখে চলল । ফোর্ট উইলিয়ামের মতো উঁচু মাটির বাঁধ আর পরিখা দিয়ে ঘেরা গড়ের চৌহদ্দি এখনও বেশ বোঝা যায়-ছোট, বড় দুটো পাথরের গেটও পেরতে হয় । গেটদুটি বিশেষ করে বড় গেটটি, পুরনো দিল্লির গেটগুলির কথা মনে করিয়ে দেয় । গড়ের ভেতরের জমি বেশ ফাঁকা । রাজপ্রাসাদ অট্টালিকাগুলি ভেঙে পড়েছে । অক্ষত আছে কেবল দুটি দেবস্থল-শ্যাম রায়ের মন্দির আর জোড় বাংলো ।

আগেই বলেছি যে বাঙালির দেবতা ঘরের লোক। তার জন্য অভ্রভেদী মন্দির মহিমার দরকার নেই। বাঙালির নিজস্ব মন্দির তাই গ্রাম বাংলার খড়ের চালের অনুকৃতিতে গড়ে উঠেছিল। ওই রকমই একচালা, দুচালা, চারচালা, আটচালা কুটিরের মতো দেবতার আবাসগৃহ। ওই রকমই চালাগুলি কোণ থেকে কোণ পর্যন্ত বাঁকানো-দুই বা চার চালের মাঝখানে আড়ার বাঁধুনি। তফাৎ শুধু এই যে কুটিরের খড়ের চালাকে মন্দিরে পাকা গাঁথুনি করা হয়েছে। একচালা বা দুচালা মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য। বেশিরভাগই চারচালা বা আটচালা, সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি যেমন হয়ে থাকে। আটচালা আর কিছুই নয়। চারচালার চারটি চালের শেষের দিকে দেওয়াল তুলে আরও চারটি চাল বসান। এ পদ্ধতিতে মন্দিরের উচ্চতা কিছুটা বাড়ানো যায়। তারও ওপরে দেবালয়ের চারচালা বা আটচালার মধ্যিখানে একটি করে গম্বুজ বসানো হয় যাতে মন্দিরের উচ্চতা আরেক মাথা বাড়ে। গম্বুজের ওপরে ওড়ে দেবতার নিশান-ধ্বজবজ্রাংকুশ। কলকাতার কালীঘাট মন্দির এইরকমই আটচালা। চারচালার বড় মন্দিরে অনেক সময় চার কোনায় চারটে ছোট গম্বুজ দেওয়া হয়। যাদের বলে পঞ্চরত্ন মন্দির। একটি চূড়া থাকলে একরত্ন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি দেখবার মতো। সাধারণত মাঝখানের দটি থাম এবং শেষের দুটি থামাংশ নিয়ে তিনটি খিলান, খিলানের তলায় হ্রস্ব থামগুলি লক্ষ করবেন। নিচে দুফুট পরিধির থামগুলি ক্রমশ সরু হয়ে মাঝখানে ১৫-১৮ ইঞ্চি আবার বেড়ে বেড়ে ওপরে দুফুট। ডম্বরু আকৃতি এমন থাম অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এও কি বাংলা স্থাপত্য শৈলীর বৈশিষ্ট্য?

শ্যাম রায়। ১৬৪৩ সালে বীর হাম্বিরের প্রপৌত্র, দ্বিতীয় রঘুনাথ রাধাকৃষ্ণের প্রীতার্থে মন্দিরটি স্থাপন করেন। চারচালা পঞ্চরত্ন মন্দিরটি কি স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যে শুধু বিষ্ণুপুর কেন সারা বাংলার গৌরব। মন্দিরের মূল রত্নটি গোল নয়, আটকোনা। আর মন্দিরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ ফুট। ওসারে সমস্ত অন্ত ও বহিঃপ্রাচীর জুড়ে পোড়ামাটির যে রিলিফ চিত্রগুলি আছে, দেহ ভঙ্গি এবং ভাবের ব্যঞ্জনায় তারা খাজুরাহোর প্রাচীর চিত্রের সঙ্গে সমান তুলনীয়। খাজুরাহোর মতো স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ মিলনের লীলারঙ্গ এখানে নেই কিন্তু আছে রাসনৃত্যপরা রাধা সখীদের ছবিগুলি। তাদের আকুল নয়ন শ্রীকৃষ্ণের মুখ চন্দ্রিমায় নিবদ্ধ, সেই শ্যাম অঙ্গ স্পর্শ করার জন্য তাদের আকুতি দর্শকের মনকে নাড়া দেয়। রাসনৃত্য ছাড়াও আরও কত রকমের ছবি, পুরাণ কাহিনী-ফুলকারির লতাপাতা কাটা-মহাভারতের যুদ্ধ দৃশ্য। হস্তীর বৃংহিতে, অশ্বের হ্রেষায় জায়গাটা মুখর হয়ে উঠেছে। দৃপ্ত অশ্বপদতলে দলিত শত্রুর কাতর মুখচ্ছবি-ঠিক যেন ম্যাজিক ল্যান্টার্নের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজানো রয়েছে। মনে পড়ল অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। এইসব দৃশ্যের আলোকচিত্র তুলে অ্যালবাম করা যায় না।

ভারতের আরও অনেক পুরাকীর্তির সম্বন্ধে যেন কফি টেবিল বই হয়েছে, বিষ্ণুপুর তাদের থেকে কোনও অংশে কম নয়, কেবল প্রচার আবশ্যক । শ্যাম রায়ের মন্দির যাঁরা দেখতে যাবেন তাঁদের জন্যে একটা সতর্কবাণী । মন্দিরের ভেতরে আলোর বন্দোবস্ত নেই । কাজেই নিজেরা আলো না নিয়ে গেলে অন্তঃপ্রাচীরের ছবিগুলি দেখতে পাবেন না ।

শ্যাম রায়ের পাশেই আর দুটি মন্দির জোড় বাংলো এবং রাধাশ্যাম । স্থাপত্য রীতিতে জোড় বাংলো অন্য সব মন্দির থেকে আলাদা । দুটি দোচলা মন্দিরকে পাশাপাশি রেখে, চালাদুটির মাঝখানে ইংরিজি ভি আকারে একটি ব্রিজ করা হয়েছে । মন্দিরের একটি চারকোনা চারচালা শিখর বসানো হয়েছে এই ব্রিজের ওপরে । এই মন্দিরও মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের কীর্তি । এখানেও সমস্ত দেওয়াল জুড়ে অনবদ্য পোড়ামাটির অলংকরণ । জোড় বাংলোর অনতিদূরে রাধাশ্যাম মন্দিরটিও দেখবেন । মল্লবংশের শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ বানিয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক বছর পরে । চারচালার এক রত্ন মন্দির । পোড়ামাটির নয় । মাকড়া পাথরে (Laterite) তৈরি । মাকড়া হালকা বাজে পাথর । পালিশ নেয় না । তবু এই পাথর কুঁদে কত রকম চিত্র-বিচিত্র কাজ করে তার ওপরে পঙ্খের আস্তরণ দেওয়া হয়েছিল । এখন সে আস্তরণ বহু জায়গায় উঠে গিয়ে পান খাওয়া দাঁতের মতো লালচে কালো পাথর বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু ওপরে ঝোলানো কার্নিশের তলায় যেখানে পঙ্খলেপ এখনও অক্ষত আছে । সেখানে পড়ন্ত সূর্যের আলো আয়নার মতো ঝকমক করছে । ভাবতে ভালো লাগে যে আড়াইশো বছর আগে পঙ্খের পলেস্তারা ঢাকা মন্দিরটি প্রভাত সূর্যের আলোয় কেমন জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলন্ত । মন্দিরনগর বিষ্ণুপুরে মন্দির দেখে শেষ করা যায় না-তবু রাধাশ্যাম মন্দিরের কাছেই পাঁচিল ঘেরা লালজি মন্দিরটি দেখে যাবেন । আর দেখবেন একেবারে অন্য পাড়ায় মদনমোহন মন্দির । মল্লরাজ দুর্জন সিংহ (নাম যাই হোক তিনি লোক ভালো ছিলেন) ১৯৬৪ সালে চারচালা একরত্ন পোড়ামাটির মন্দিরটি তৈরি করান । এর গায়ে ও সামনের পাঁচিল জুড়ে চৌখুপি কাটা টালির মধ্যে নানা অলংকরণ লক্ষ করবেন । সময় থাকলে বিষ্ণুপুর থেকে ৬-৭ কিলোমিটার দূরে ধরাপাটের পরিত্যক্ত মন্দিরটি দেখে আসবেন । পঙ্খের পলেস্তারা ঢাকা মাকড়া পাথরের রেখদেউল । আমাদের এটি দেখা হয়নি ।

মন্দির পরিক্রমা শেষ করে এবার লালবাঁধের ধারে গিয়ে দাঁড়ান, এখানেও বেশ কয়েকটি মন্দির আছে । কিন্তু মন্দির আর নয় । তার চেয়ে বাঁধের নিস্তরঙ্গ জলে অতীতের ছবি দেখুন । মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ এবং মুসলমানি লালবাইয়ের প্রেমকাহিনী । নর্তকীর নূপুর নিক্কণে, কুহুতানে, অলসে হেলায় কাটানো বিলাসের মনোরম সন্ধ্যাগুলি এবং তার ভয়ংকর পরিণাম । প্রজার ধর্মরক্ষার জন্য পাটরানি শিরোমণি দেবীর প্ররোচনায়, আততায়ীর হস্তে নিহত রঘুনাথ । স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিলেন শিরোমণি । ক্রোধান্ধ

প্রজারা উন্মত্ত বৃষদলের মতো লালবাইয়ের প্রাসাদ ভেঙে তছনছ করল আর লালবাইকে জীবন্ত সমাধি দিল ওই লালবাঁধের জলে । বিষ্ণুপুরে আরও অনেকগুলি বাঁধ আছে । সব ঘুরে ঘুরে দেখবার দরকার নেই । খরাপীড়িত রাঢ়ভূমে প্রজার এবং জমির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিচু বাঁধে বর্ষার জল ধরে মল্লরাজারা এই জলাশয়গুলি বসিয়েছিলেন ।

ইতিবৃত্ত বলে মল্লরাজারা সেই হর্ষবিজেতা শশাঙ্কর আমল থেকে ব্রিটিশ অভ্যুদয় পর্যন্ত প্রায় আঠেরোশো বছর একনাগাড়ে রাজত্ব করেছিলেন । এত বছরের হিসাবে আমাদের কাজ নেই । কিন্তু মোটামুটি ষষ্ঠদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মল্লরাজ্যের এই দুশো বছরের স্বর্ণযুগে, বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ছাপ রেখে গেছে তার কিঞ্চিৎ স্পর্শ নিয়ে আসবেন । রাস্তায় যেতে রিকশাওয়ালা আপনাকে দলমাদল কামান দেখাবে । এই সুবৃহৎ কামানটি বিষ্ণুপুরের অস্ত্রশালাতেই তৈরি হয়েছিল এবং তার জন্য লোহাও বাইরের থেকে আনতে হয়নি । বিষ্ণুপুরেই ছিল সেই কর্মীরা যারা মাকড়া পাথর গলিয়ে লোহা বার করত । বিষ্ণুপুরের কাঁসারিরাও সমান বিখ্যাত । আর বস্ত্রশিল্প । বালুচরী শাড়ির কথা সবাই জানেন । স্থাপত্য, প্রাচীর চিত্রের কথা আগেই বলেছি । এ ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছেন যামিনী রায় বা রামকিংকর বেজের মতো । শিল্পী । সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিষ্ণুপুর পিছিয়ে পড়েনি । বড়ু চণ্ডীদাস, শূন্য পুরাণের রামাই পণ্ডিত এই অঞ্চলের লোক । আমাদের বয়সে যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো গুরুমশায়ের পাঠশালে শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ করেছেন-মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর । শুভঙ্কর বিষ্ণুপুর রাজের কর্মচারী ছিলেন । বিষ্ণুপুরে উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচলন করেছিলেন মল্লরাজ বীর হাম্বির । তানসেনের ঘরানার ধ্রুপদী বাহাদুর খানকে তিনি দিল্লি থেকে বিষ্ণুপুরে টেনে এনেছিলেন । তারপর ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরেই গড়ে উঠল বিষ্ণুপুর ঘরানা । যদুভট্ট, অনন্ত চক্রবর্তী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান গোস্বামী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত নায়কদের শোভাযাত্রা । ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের অলঙ্কার বর্জিত শুদ্ধ গায়কী ঢংয়ের স্বীকৃতি আছে । সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্রও বিষ্ণুপুরের লোক ।

এইবার একটি তাস খেলা দিয়ে বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গ শেষ করব । দশাবতার তাস । কেউ বলে এ খেলা মল্লরাজ বীর হাম্বির চালু করেছিলেন আকবরের রাজা উজির তাস খেলার অনুকরণে । কেউ বলে এ খেলা বাংলার নিজস্ব জিনিস-পাল রাজাদের আমল থেকে চলে আসছে । আমাদের এত ঝামেলার মধ্যে যাবার দরকার নেই । কিন্তু যাঁরা তাসাড়ু তাঁদের হয়তো এই বিষ্ণুপুরি তাসের কথা ভালো লাগবে । তাস দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রতি শ্রেণীতে বারোটি করে তাস থাকে । প্রতি শ্রেণীর নায়ক একজন করে অবতার । মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি । নায়কের পরে উপনায়ক এবং তাঁরাও ওই একই অবতার, তবে অলংকরণে নায়ক এবং উপনায়কে তফাৎ থাকে । অভিজ্ঞ চোখ এক নজরেই বুঝতে

পারে নায়ক এবং কে উপনায়ক । আমাদের তাসে সায়েব আর গোলাম যেমন । নায়ক এবং উপনায়কের পরে বাকি দশটি তাসে তাদের শ্রেণীর প্রতীক এবং প্রতীকের সংখ্যা আঁকা থাকে । যেমন এক্কায় প্রতীক চিহ্ন একটি, দোক্কায় দুটি ইত্যাদি । একশো কুড়িটি তাস খেলেন পাঁচজনে । কেউ কারুর খেঁড়ি নয় । প্রত্যেকে নিজের হাতের চব্বিশটি তাস খেলে জেতেন বা হারেন । খেলা কীভাবে হয় তা বোঝানোর জায়গা এখানে নেই এবং খেলা শিখে লাভও নেই । যাঁরা এ খেলা খেলতেন তাঁদের প্রায় সবাই ভবের খেলা সাঙ্গ করে গেছেন । তবে খেলতে পারুন বা না পারুন বিষ্ণুপুর গেলে মদনমোহন মন্দিরের কাছে ফৌজদারদের পাড়ায় তাসগুলি দেখতে যাবেন । দেখবার জিনিস । তেঁতুল বিচি পিষে তার সঙ্গে চকখড়ির মিহি গুঁড়ো মিশিয়ে কাই মতো করা হয় । সেই কাই পরিষ্কার সাদা কাপড়ের ওপর মাখিয়ে এবং রোদে শুকিয়ে তৈরি হয় তাসের কাগজ । তারপর কাগজগুলি আন্দাজ সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাসের পরিধিতে গোল করে কাটা হয় । এই গোল তাসের ওপর শুরু হয় ছবি আঁকার কাজ-অবতারদের বহুরঙা মূর্তি, অলংকরণ, প্রতীক চিহ্ন । এক প্যাকেট তাস বা অন্তত দশটি নায়ক বা উপনায়ক তাস যদি আনতে পারেন, ফ্রেমে বাঁধিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারবেন । এক্কার ছবিগুলোও মনোজ্ঞ ।

বিষ্ণুপুর থেকে ফেরার সময় আমরা জয়রামবাটি, কামারপুকুর, তারকেশ্বর দেখে এলাম কিন্তু সে অন্য গল্প । আরামবাগে দুপুরের খাওয়ার সময় ধরে প্রায় দশ ঘণ্টা লাগল । একটা কথা, জয়রামবাটি এবং কামারপুকুর দুজায়গাতেই সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে । কাজেই বিষ্ণুপুর থেকে সকাল সকাল-সাতটার আগে বেরোলে ভালো হয় ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

বিষ্ণুপুর-১৫০ কিলোমিটার । টানা মোটরে গেলে চার-সাড়ে চার ঘণ্টা, বাসে ছয় ঘণ্টা । অনেক বাস আছে । ট্রেনে ২০০ কিলোমিটার । সবচেয়ে ভালো ট্রেন পুরুলিয়া এক্সপ্রেস । হাওড়া থেকে ছাড়ে বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে, পৌঁছয় সন্ধ্যা ৮টা ৩০ মিনিটে । বিষ্ণুপুর থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে, পৌঁছয় দুপুর ১২টা ০৫ মিনিটে । এই ট্রেনে এ সি চেয়ারকার আছে । ভাড়া একপিঠের ১৯৭ টাকা । সেকেন্ড ক্লাসে ৭৪ টাকা ।

মুকুটমণিপুর-২৩৫ কিলোমিটার । কলকাতা থেকে সোজা রকেট বাসে যাওয়া যায় । দশ ঘণ্টার রাস্তা । এছাড়া বিষ্ণুপুর (৮২ কিলোমিটার) বা দুর্গাপুর (৯২ কিলোমিটার) থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায় ।

কোথায় থাকবেন

বিষ্ণুপুর-ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ট্যুরিস্ট লজ সব চেয়ে ভালো জায়গা, তবে এটাও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় । ডবলরুমের ভাড়া পড়ে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা । এ সি ডবলরুমের ভাড়া ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা । ভাড়া প্রতি রাত্রি দুজনের জন্য । খাওয়া আলাদা । ট্যুরিস্ট লজে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে । ট্যুরিস্ট লজ ছাড়া অন্য হোটেলও আছে । ওখানে গিয়ে খুঁজে নিতে পারেন ।

মুকুটমণিপুর-রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট লজ আছে । ভাড়া ডবলরুম ৫০ টাকা প্রতি রাত । খাওয়া আলাদা । পিয়ারলেসের সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রিসর্ট আছে । ডবলরুমে ভাড়া প্রতি রাত ৩৫০ টাকা থেকে ৩৭৫ টাকা । খাওয়া আলাদা । এছাড়া আছে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব আবাস কংসাবতী ভবন । বড় সুন্দর জায়গায় এই ভবনটি অবস্থিত ।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

ডোকরিয়ানি বামক

অনিন্দ্য মজুমদার

গোমুখ থেকে যাত্রা শুরু করে দেবপ্রয়াগে গঙ্গা নাম গ্রহণ করার আগে ও পরে অসংখ্য ছোটবড় নদী মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে । তাদের মধ্যে জাটগঙ্গা, ভীলাঙ্গনা, অলকানন্দার মতো বিখ্যাত উপনদী যেমন আছে, তেমনই বহু ছোট ছোট নদী-নালা ভাগীরথীকে পুষ্ট করেছে । এদের বেশিরভাগই আমাদের কাছে অপরিচিত । ভাগীরথীর এমনই এক অখ্যাত সঙ্গিনী হল দিন গাড । পূর্বের ডোকরিয়ানি বামক থেকে সৃষ্ট হয়ে তার স্বল্পজীবন শেষ হয়েছে বুকির কাছে । আমাদের এবারের ট্রেকিং এই দিন গাড উপত্যকায় ।

প্রতিবারের মতো দুন এক্সপ্রেস দেরি করে হরিদ্বারে ঢুকল । বেলা বারোটার বাস ধরে তেহরি পৌঁছলাম সন্ধেবেলায় । পরদিন নতুন বাসে উত্তরকাশী । ৩১ মে ২০০০, দুজন পূর্বপরিচিত নেপালি বন্ধুকে সঙ্গী করে গঙ্গোত্রীগামী বাসে চেপে পৌঁছলাম বুকিতে । ছোট জায়গা বুকি । বাসস্ট্যান্ডের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী । ভাগীরথী-দিন গাড সঙ্গমটি খানিকটা উত্তরে, আমাদের রাস্তায় পড়ে না । ভাগীরথী পার হওয়ার জন্য স্টিলের সাসপেন্স ব্রিজ । বাসস্টপটি নদীর ডানতীরে হলেও, মূল গ্রামটি নদীর বামপারে, নদীবক্ষ থেকে বেশ খানিকটা ওপরে, গাছের ছায়া মাখা পথ । সোনালি শস্য খেত ঘিরে রেখেছে গ্রামটিকে । আমাদের পথ অবশ্য গ্রামে না ঢুকে, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে । আরও চড়াই । ওপর থেকে কার্পেটের মতো লাগে খেতগুলিকে । বুনো গোলাপ আর রডোডেনড্রনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একটা স্পার পার হই । আমরা এখন ঢুকে পড়েছি দিন গাড উপত্যকায় । নদী অবশ্য পথ থেকে বহু নিচ দিয়ে বইছে । জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা । হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয় । তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিই পাথরের আড়াল । তারই মধ্যে নরেন্দ্র এক পাত্র জল নিয়ে আসে । তারপর সেই বৃষ্টি ভেজা জঙ্গলে বসল চায়ের আসর । বৃষ্টি কমলে আবার চলা । পৌঁছে যাই টেল (২৫০০ মিটার) বা তেল । জঙ্গলে ঘেরা এই সবুজ ময়দানটা এক লহমায় ভালো লেগে যায় । একদিকে নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিংয়ের চার-পাঁচটা তাঁবু, অন্য পাশে ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান জিওলজির তাঁবু । প্রথম সংস্থাটি ‘নিম’ ও দ্বিতীয়টি ‘ওয়াদিয়া’ নামেই স্থানীয়দের কাছে

বেশি পরিচিত। এখানে আলাপ হল এক গদ্দির সঙ্গে, নাম জ্ঞান সিং। আদতে হিমাচলের লোক, তবে বহু বছর ভেড়া চরাচ্ছেন গাড়োয়ালে।

পরদিন প্রথমে উতরাই পথ। নামতে নামতে কানে আসে নদীর গর্জন। অবশেষে দেখা পেলাম দিন গাডের, এযাত্রায় প্রথম বারের জন্য। আবার চড়াই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি। ছোট ছোট কয়েকটা নালা পার হতে হয়। এই দিন গাড উপত্যকার জঙ্গল বেশ গভীর। বন্যজন্তু থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনকী এখানকার একটি অনুচ্চ শৃঙ্গের (৪১৫২ মিটার) নাম রাখাউ টপ, 'রাখাউ' মানে ভাল্লুক। তবে পাথর বিছানো, চওড়া পথ ধরে চলেছি বলেই বোধহয় তেমন ভয়ডর লাগছে না। এমনকী যখন ওই জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প লাগালাম, তখনও না। টেল থেকে সাধারণত সবাই একদিনে যান ক্রোলিতে, পরদিন অল্প হেঁটে ডোকরিয়ানি বামক। আমরা মোটামুটি অর্ধেক অর্ধেক করে দুদিনের পথ ভাগ করে নিই। অর্থাৎ কাল ক্রোলিতে না থেকে সিধে ডোকরিয়ানি বামক।

এই দিন গাড উপত্যকা পর্বতপদযাত্রীদের কাছে খুব সুপরিচিত নয় বটে, কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষজনের নিয়মিত আনাগোনা আছে। যেমন উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং। এঁরা যুবক-যুবতীদের পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন ডোকরিয়ানি বামক ও তার পার্শ্ববর্তী দ্রৌপদী কি ডান্ডা শৃঙ্গে। আবার ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সাল থেকে ডোকরিয়ানি বামকে হিমবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছেন। টেল, ক্রোলি এবং হিমবাহের কাছে তাদের ক্যাম্প রয়েছে। এই দুই সংস্থা ছাড়াও দিন গাডের অন্যতম অতিথি গুর্জররা। গদ্দিদের মতো আধা যাযাবর গোষ্ঠী এরাও। তবে আদি নিবাস কাশ্মীর, আর ভেড়ার বদলে এদের সঙ্গে থাকে মোষ। দিন গাড উপত্যকার ক্রোলি, খেরতাল, দেওকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে এদের ছোটবড় আড্ডা আছে। সেখান থেকে এরা দুধ, ক্ষীর ইত্যাদি বিক্রি করেন উত্তরকাশীতে। এমনই কয়েকজন গুর্জরের সঙ্গে দেখা হল। খেরতাল থেকে সকালবেলা বেরিয়ে, বুকিতে ক্ষীর বেচে আবার ফিরছেন খেরতালে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রায় আড়াই-তিনদিনের পথ পেরতে তাদের লাগে একদিন। চলার পথে বিশ্রাম নেন আমাদের ক্যাম্পে, নিঃসংকোচে চা চেয়ে খান। কোনওরকম শহুরে ভনিতা নেই।

পরদিন শুরুতেই একটা নালা পার হতে হয়। তারপর চড়াই পথ। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা, দিন গাড আবার অনেক নিচে রয়ে যায়। ফেলে আসা নালার পর আর কোনও জলধারা পাই না ক্রোলির কাছাকাছি পর্যন্ত। এপথের সবচেয়ে কঠিন চড়াই এইটি, গতকাল দিনশেষে এই চড়াই ভাঙতে হলে কষ্ট হত খুব। চড়াই শেষে ক্রোলি (৩৪০০ মিটার)। ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউটের ক্যাম্প আছে এখানে, আছে গুর্জরদের কিছু ঘর আর

নদীর অপরপাড়ে নিমের ক্যাম্প । ক্রোলি থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দ্রৌপদী কি ডান্ডা, জাওনলি প্রভৃতি তুষারশৃঙ্গের দেখা পাওয়া যায় বলে শুনি, কিন্তু আমরা দেখলাম মেঘে ঢাকা চারদিক । ওয়াদিয়ার এক কর্মীর সঙ্গে তেজবাহাদুরের পরিচয় ছিল । সেই সূত্রে তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানান তাঁদের তাঁবুতে । কিন্তু আজ আমাদের আরও এগিয়ে যাবার মতলব । পাহাড়, বুগিয়াল আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দিন গাড-সব মিলিয়ে ক্রোলি জায়গাটি খুবই মনোরম । নদীর পাড়ে নেমে আসি । ব্রিজ পেরিয়ে ডানতীরে । আমাদের দক্ষিণে বইছে দিন গাড, উত্তরে তার উপনদী হুরা গাড, হুরা গাডের উত্তরে আছে মেচা ধার গিরিশিরা । এই মেচা ধারের ওপর থেকেই ১৯৮০ সালে নিমের তৎকালীন প্রিন্সিপাল কর্নেল বলবন্ত সাঁধু দিন গাড উপত্যকাকে দেখে পছন্দ করেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে । পৌঁছই নিমের বেসক্যাম্পে । আরেকটু এগিয়ে ওয়াদিয়ার বেসক্যাম্প (৩৭৬০ মিটার) । আজ আমরা এদের অতিথি । চারদিকে সবুজ ময়দান, সামান্য দূরে বয়ে যাচ্ছে দিন গাড, আর তার ওধারেই দ্রৌপদী কি ডান্ডা-২ (৫৬৭০ মিটার), দ্রৌপদী কি ডান্ডা-১ (৫৭১৬ মিটার) । পূর্বদিকে আমাদের লক্ষ্য ডোকরিয়ানি বামক । তার পিছনের দুটি অনামা ছ হাজারি শৃঙ্গ জাওনলিকে ঢেকে রেখেছে । মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে তুষারশৃঙ্গগুলি । এর মধ্যে সন্ধে নামে, সোনালি হয়ে ওঠে চারপাশের শৃঙ্গগুলি । নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা এই সুন্দরীদের দিকে, আর মনে মনে ভাবি এত সহজ, সুন্দর রাস্তা কেন বাঙালি পর্বতপ্রেমীদের এখনও নজরে পড়েনি ।

পরদিন কখনও মেঘ, কখনও রৌদ্র । তারই মধ্যে চলেছি ডোকরিয়ানি বামক দেখতে । সবুজ ময়দানে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল । আমাদের পথ তৃণভূমি ছেড়ে পাথরের মধ্যে হারিয়ে যায় । ডোকরিয়ানি হিমবাহের মোরেন অঞ্চল । ছোটবড় বোল্ডার, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দিন গাড । অবশেষে পৌঁছই হিমবাহের স্নাউটের সামনে (৩৮৩০ মিটার) । কালচে বরফের গহ্বরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে জল-যেন গোমুখের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ । পিছনে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয়ের বদলে অনামা ছ হাজারিদ্বয় (৬০৩৪ মিটার, ৬০০২ মিটার) । দক্ষিণে শিবলিঙ্গের বদলে দ্রৌপদী কি ডান্ডা-২ । ভাগীরথী যেমন হু হু করে বেরিয়ে আসে, তেমনটি নয় দিন গাড । শান্ত তার চলন, এমনকী স্নাউটের সামনে ছোট্ট একটি জলাশয় সৃষ্ট হয়েছে ।

ডোকরিয়ানি বামক প্রায় ৫ কিলোমিটার লম্বা, কিন্তু প্রতি বছর গড়ে ১৭.৪৮ মিটার পিছচ্ছে বলে জানা যায় । সামগ্রিকভাবে হিমালয়ের সর্বত্রই হিমবাহ ছোট হয়ে আসছে, তবে দিন গাডের এই গতি বিপজ্জনকভাবে বেশি । আশা করি প্রকৃতির এই অনুপম সৃষ্টি উপভোগ করতে পারবেন ভবিষ্যতের প্রজন্মও ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

তাওয়াং .থকে তাসি-চু জং

কমলা মুখোপাধ্যায়

বহুদিনের মনের বাসনা সুদূর পূর্বাঞ্চল তাওয়াং দেখবার, সে ইচ্ছা পূরণ হল। গত বছর ১৯৭১-এ যখন অরুণাচলের বমডিলা শহরে যাই তখন বর্ষায় রাস্তা ছিল খারাপ। যাবার সুবিধা হয়নি তাই এবছরে দিনক্ষণ মাস আবহাওয়া বিচার করে রওনা হলাম। মার্চের শেষে বর্ষা তেমন নামেনি এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তাওয়াং গুম্ভার বিষয় অনেকখানি জেনেছি তাতে আরও কৌতূহল বেড়েছে। বমডিলাতে মেঘ ও কুয়াশা থাকলেও দিনগুলি ছিল শুকনো ও ঠান্ডা। বমডিলা (৮১৫০) থেকে যখন তাওয়াং গেলাম সেখানকার আবহাওয়াতে যেন নতুন শক্তি পেলাম। দিনেরবেলায় শীত প্রায় নেই। ১০,০০০ ফুট জায়গাটিতেও পরিষ্কার রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া। তত হাওয়া নেই, তবে রাতে বেশি শীত, আগুন না জ্বালালে ঘুমানো মুস্কিল-আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা সমস্ত ডাকবাংলো ও সরকারি বাড়িগুলিতেই আছে এই যা সুবিধা।

অরুণাচল শাসনের অধীনে একটি পরিবহন অফিস আছে তেজপুরে। তাদেরই একটি গাড়িতে চড়ে মার্চের শেষে বমডিলা রওনা হলাম। ৬০ মাইল মতো পার্বত্য সর্পিল পথে উঠতে হয়। ৩০০ ফুট থেকে একদিনেই ৮১৫০ ফুট যেতে হবে। গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগে রওনা দিতেই বেলা ২টো বেজে গেল। সুতরাং রাত ১০টায় নিঝুম বমডিলাতে পৌঁছলাম খোলা লরিতে, তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। শীতে সবাই জমে যাচ্ছি। একজন সঙ্গী সরকারি কর্মচারীর মেসের একটি ঘরে কোনওমতে রাত কাটানো গেল। তার পরদিন অবশ্য সার্কিট হাউসে আরামে থাকা গেল। এর আগেরবার যখন এসেছি তখন-রূপা, কলকটাং খোয়া, দিরংজঙ্গ প্রভৃতি গ্রামে তাদের উৎসব দেখে এসেছি তাই কিছুটা পরিচিত ছিল। এখানকার অধিবাসী মোন-পা (Monpa) যারা ঠিক তিব্বতি নয়। এরা ভোট জাতি গোষ্ঠীর লোক যারা তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে থেকে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করত-প্রথমে নাকি ধর্মে কালী বা শক্তি উপাসক ছিল, বর্তমানে সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও দালাই লামার গেলু-পা বা পীতটুপি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক দিক থেকে এ অঞ্চলের গুরুত্ব অসাধারণ কারণ তিব্বত থেকে ভারতে আসতে অন্যান্য পথের তুলনায় তাওয়াং-বুমলা গিরিপথই সব চাইতে সহজ। তাই ১৯১৪ সালের সিমলা চুক্তিতে তিব্বতি প্রতিনিধি লোরচেন শার্ত্র (Lorchen Shatro)

ইংরেজদের অনুরোধে এই অঞ্চলটি তাঁদের দেন। তা সত্বেও এ অঞ্চল ভারতের নিয়মিত শাসনে এসেছে **১৯৫১** সাল থেকে। অরুণাচলের প্রথম জেলা কামেং, এর উত্তর দিকে ভুটান-তিব্বত-ভারত, এই তিন দেশের মিলন স্থানে তাওয়াং অঞ্চল বমডিলা থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। সর্বদা বরফাবৃত সে-লা গিরিপথ (১৪০০০) অতিক্রম করে তাওয়াং যেতে হয়। অবশ্য এখন সামরিক বাহিনীর অবস্থানের ফলে রাস্তা বরফমুক্ত কারণ সর্বদাই রাস্তাকে পরিষ্কার করার লোকজন আছে।

১৯১৪ সালের আগে এ অঞ্চল ছিল তিব্বতের রাজধানী লাসার অধীনে। এদের শাসক তান্ত্রিক ও ধর্মীয় গুরু দালাই লামা, কারণ প্রায় ৩৬০ বছর পূর্বে মোন-পাদের লামাধর্মে দীক্ষিত করেন তিব্বতের শেরে লামা বা মিরিক লামা। তাঁর সমাধি বর্তমানে মঠের ভেতরেই আছে এখনও। তিনি এখানকার খুব সম্মানিত ও পূজনীয় ব্যক্তি। মোন-পাদের ভাষার অক্ষর তিব্বতি হলেও উচ্চারণে বেশ তফাত আছে। এদের পূজা বা ধ্যানের মন্ত্র অবশ্য পালিতে। মোন-পারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক হলেও তিব্বতিদের মতো ভারী মজবুত গঠন নয় দেহের, পায়ের রং ঠিক পীতাভও নয়-রক্তিমাভ বলা চলে, অনেকখানি হালকা দেহের গঠন, গাল বা চোয়াল উঁচু ভারীও নয়। ছিপছিপে গঠন, চোখগুলি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল-খুব লম্বাও নয় হ্রস্বও নয়। একজন মোন-পা যুবক বর্তমানে ওই অঞ্চলের সরকারি কর্মচারী, রিং চিং নাম। বোধহয় cultural officer বা ওই ধরনের কিছু পদে আছেন, আমাদের সব বিষয়ে খুব সাহায্য করেছেন ও তাঁদের দেশ সম্পর্কে যাতে ওয়াকিবহাল হই তারও চেষ্টা করেছেন। তাওয়াংয়ের মঠের নিচে তিব্বতি শরণার্থীদের অনেক বস্তি আছে। সেখানেই এই দুই গোষ্ঠীকে একসঙ্গে দেখলে তফাতটা বোঝা যায়।

১৯১৪ সালের আগে তাওয়াং অঞ্চলটি ৭ জন রাজা দ্বারা শাসিত হত। তার মধ্যে একজন প্রধান রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন লাসার অধীনে, কর বা রাজস্ব যা কিছু দেয় এঁর মারফতেই এ অঞ্চল থেকে যেত। লাসা থেকে কুরিয়াপাড়া ডুয়ার্স দিয়ে তেজপুর আসতে এটাই সব চাইতে সোজা ও হ্রস্বতম রাস্তা ছিল। আসামের ওদলগিরির উত্তরে এ অঞ্চল এসে মিশেছে। দালাই লামার দুজন প্রতিনিধি বা Zongpen-রাই প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চল শাসন করতেন। তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্বে kyakya গিরিপথ থেকে সমতলভূমি পর্যন্ত স্থানটিকে বলা হল Monyul (মনিয়ুল) বা নিচু ভূমি। প্রধান শহর ছিল মেন তাওয়াং। মোন-পা মানে সমতল বা নিচু ভূমির অধিবাসী। সে-লা গিরিপথ পার হলেই দেখা গেল উন্মুক্ত উপত্যকায় তাওয়াং গুম্ভাটি ছবির ফ্রেমে আঁটা পরবলয়াকৃতি পাহাড়ের চূড়ার ওপর। তাওয়াং-চু-নদীটি মঠের নীচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে-আরও নিচে আছে দিরংচু, পাশেই দিরং গ্রাম-ভালো চাষবাস হয়-বেশ সমৃদ্ধ গ্রামগুলি। তবে সে-লার উত্তরে তাওয়াং অঞ্চলে কৃষিরও উৎপাদন বেশি। পাহাড়ের ঢালে চাষ হচ্ছে-গ্রামগুলিতে লোকও বেশ

আছে, তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। মাঝে মাঝেই তিব্বতি শরণার্থীদের শিবির। তারাও পরিশ্রমী। নর-নারী নির্বিশেষ কাঠের কাজ, বাড়ি রং করা-সুন্দরভাবে সকাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে, কেউ বসে নেই। এরা বরাবরই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। সকাল থেকে যতক্ষণ আলো থাকবে ততক্ষণ খুব কর্মতৎপরতা সর্বত্র।

তাওয়াং এলাকায় কোনও সমতল জমি নেই। সমস্ত বাড়ি, অফিস বা বাসস্ট্যান্ড সবই একেকটি উচ্চভূমির ওপর অবস্থিত। আমাদের ডাকবাংলো থেকে ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি যেতে খানিকটা নেমে আবার উঠতে হত, যদিও দুটি স্থানই মুখোমুখি। একদিন সকালে ৩ মাইল দূরে তাওয়াং মঠটি যাবার জন্য সকাল ৯টায় রওনা হলাম। সঙ্গে সেরিং দোরজে বলে একজন দো-ভাষী, হিন্দি জানে-তাছাড়া সে নিজেও কিছুদিন লামা ছিল। পথে পড়ে শো গ্রাম, সেখানেই তার বাস। বর্তমানে তার স্ত্রী-পুত্র আছে। চুনা গিরিপথ দিয়ে তিব্বতের নানাস্থান থেকে ঘোড়া যখন এ অঞ্চলে আসত উর্বর উপত্যকায় প্রচুর ঘাস পেত। তাতে ঘোড়াদের চলাফেরা সুবিধা ছিল তাই তিব্বতি ব্যবসায়ীরা এ পথেই বেশি চলাচল করত। তিনদিনে বুমলা দিয়ে এখান থেকে তিব্বতে পৌঁছনো যায়।

তাওয়াং কথাটি অনেকের মতে এসেছে (রত) র্ত ও দাবং (ওয়াং) শব্দ দুটি থেকে। কথাটির মানে হল হয়গ্রীবের আশীর্বাদ। তিব্বতি ভাষার অধ্যাপক শ্রী সুনীতিকুমার পাঠকের মতে বা বর্ষীয়ানরা তাঁকে যা বলেছেন তা হল এক মস্ত বড় তিব্বতি যোগী ওই পাহাড়ের চূড়ায় বসে হয়গ্রীবের (ঘোড়া মুখ দেবতা তিব্বতি তামাদিন) সাধনা করেছিলেন। সেই থেকে এই নাম। পুরো তিব্বতি কথাটি হল র্ত-মগ্রিন গ্যি দবং।

মঠে ঢোকার মুখেই একটি গন্ধ পুস্পের গাছ, গন্ধ শুঁকে ও পাতা দেখে Magnolia grandiflora-র জাত ভাই বলে মনে হল। আসার পথে জাং গিরিপথ ছাড়িয়ে পাহাড়ের কোলে অনেক সাদা ফুলের গাছ দেখেছি-ভিক্ষুদের মতে, একজন মহাপুরুষের গলার মালার ফুল যেখানে যেখানে পড়েছিল সেখানেই ওই ফুলগাছ। তবে সেগুলি আসলে রডোডেনড্রন ফুলের সগোত্র। একজন অরুণাচল নিবাসী অফিসার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকেও দেখলাম এ মত পোষণ করতে। কী জানি অত লাল ফুলগুলি কী করে এই উচ্চতায় সাদা হয়ে গেল! যাহোক আমাদের চক্ষুকে তারা খুবই আরাম দিচ্ছিল ওই বরফের রাজ্যে।

তাওয়াং গুম্ভা (আসল কথাটি নাকি গোন-পা বা বিজন স্থান-মঠগুলি লোকালয়ের বাইরে অবস্থিত হওয়ায় এই নাম) তিনতলা। কাঠ ও পাথরে তৈরি ও টিনে ছাওয়া। শিল্পকলা, ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার অনুরূপ। মন্দিরটি দক্ষিণ মুখো-সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। সামনে গো-ঘং বা গো-পুরমের মতো গেট। সকালে ভিক্ষুরা কাজে বেরিয়েছেন-কাঠ

জোগাড় করতে, খেতের তদারক করতে । প্রধান লামা ভাবী লামাকে নিয়ে গ্রামে গ্রামবাসীদের বাড়িতে গেছেন দেখাশোনা করতে কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক মশায় সবাই ছিলেন । গেট বন্ধ ছিল । চাবি এলে দেখলাম কী বিশাল অদ্ভুত আকৃতির চাবি-একটা ছোটখাট যন্ত্র বিশেষ-দরজাটিও অবশ্য তেমনই বৃহৎ ও মজবুত । সামনে দেওয়ালের গায় বিখ্যাত লামা ও বৌদ্ধ গুরুদের মূর্তি অঙ্কিত করা-অনেকের সামনে পুথি-খোলা রয়েছে । তাছাড়া ড্রাগন ও অন্যান্য জাতকের গল্পের চিত্র । মন্দির প্রদক্ষিণ করে প্রবেশ করতে হয় । মঠের বিপরীত দিকে সংসদ ভবন । বাঁদিকে সাধারণ রান্নাঘর-ডানদিকে দোতলায় গ্রন্থাগার-যেখানে রেশমের কাপড়ে মোড়া কানজুর (বুদ্ধের বাণী) তানজুর (বুদ্ধের উপদেশের ব্যাখ্যা) গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে । এরমধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা অংশটি সোনালি জলে লেখা যাকে গেটাম্পো বলে । তিব্বতি গ্রন্থগুলি কাঠের ব্লকে ছেপে করা হয় । আশপাশে উঁচু পাহাড়ের গায় ভিক্ষুদের বাসস্থান । কয়েকটিতে প্রবীণ ভিক্ষুরা দুয়েকজন শিষ্য নিয়েও থাকেন । উৎসব বা বিশেষ দিন ছাড়া ভিক্ষুদের নিজেদের আহার্য তৈরি করে নিতে হয় । মঠ থেকে কিছু দূরে মঠের শস্যাগার বা ডো-থ্যাং । গো-ঘং পেরিয়েই সামনে মণিচক্র-'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' দেওয়ালের সামনে-তাছাড়া বহু স্থানে ওই মন্ত্রযুক্ত দণ্ড বা মণিঘাং পাথর ঝরনার জলের সঙ্গে ঘোরে-তাহলেই একেবারে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয় । ঢুকেই সামনের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবদেবীর মূর্তি বস্ত্র দিয়ে আবৃত । প্রদীপের সাহায্যে বস্ত্র সরিয়ে নিলে দেখি সামনেই বিশাল কালীমূর্তি তাছাড়া অন্যান্য বোধিসত্ব মূর্তি । মন্দিরের উত্তরের দেওয়ালের মাঝখানে বড় ধরনের সুবর্ণময় অবলোকিতেশ্বরের সাত মুখওয়ালা মূর্তি । পাশে দেবী তারার বিগ্রহ । একদিকে মঞ্জুশ্রী অন্যপাশে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি । একপাশে বুদ্ধদেব দুপাশে সারিপুত্ত ও মৌদগ্যাল্যায়নকে নিয়ে বসে আছেন । কুলুঙ্গি ও দেওয়ালে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি । ধ্যানী বুদ্ধদেবের ৫টি মূর্তি, তাছাড়া শ্রীমতী দেবীর রুদ্রমূর্তি । মন্দিরের বেশ ভেতরের কক্ষে বিশালকায় বুদ্ধমূর্তি প্রকাণ্ড ঘর জুড়ে আসীন । ঈষৎ পীতাভ মূর্তি, সোনালি রঙের আভাস, মুখে অর্ধনিমীলিত শান্ত চোখ-দোতলা সমান উঁচু মূর্তি তার উল্টোদিকে দশজন দেবীমূর্তি আসীনা । অবলোকিতেশ্বর বা মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্তির পাশে দুর্গামূর্তি আসীনা । অবশ্য তিব্বতের বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার এত প্রভাব যে হিন্দুদের বহু দেবদেবী এদের ধর্মে স্থান পেয়েছেন । তাছাড়া ভারতীয় বৌদ্ধ পদ্মসম্ভবও এখানে গুরু রিমপোচে বলে পূজা পান-তিনি অষ্টম শতাব্দীর যে সময়ে এখানে আসেন তখনই বহু তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ও দেবদেবী বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল, কাজেই তিব্বতের লামা বৌদ্ধধর্মে তার প্রভাব পড়বে-তা তো খুবই সম্ভব ।

দোতলায় না উঠলে পুরো বুদ্ধমূর্তিটি দেখা যায় না । মঠের বেশ অভ্যন্তরে বিপুল আয়তনের বুদ্ধমূর্তির মাথায় ও গলায় শুভ্র স্কার্ফ-সম্মানের ও আরতির প্রতীক-ভক্তরা

বাইরে থেকে ছুড়ে দেন। প্রশান্ত মুখচ্ছবি, অর্ধনিমীলিত নয়ন দেখলে আপনিই শ্রদ্ধাতে মাথা নত হয়। নেওয়ারি শিল্পীদের অনবদ্য শিল্পকলার সাক্ষ্য চতুর্দিকে। ওই বিশাল ঘরজোড়া বুদ্ধমূর্তি তৈরি করার সময় বহু পবিত্র পুথি ও হাতে লেখা ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্র মূর্তির ভেতরে পুরে দেওয়া হয়েছে, ওই দেশের রীতি অনুসারে। দোতলার সামনের ঘরে, গুরু রিম-পো-ছে বা পদ্মসম্ভবের মূর্তি, ইনি ঞিংম-মা-পা (nying ma pa) বা লালটুপি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন-এখানে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপেরই প্রভাব বেশি। গেলু-পা সম্প্রদায়ের মধ্যে ওইসব ক্রিয়াকলাপের প্রভাব কম। পাশের ঘরে বিখ্যাত গুরু শোং-কা-পার মূর্তি-ইনিই গেলু-পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে আসার পর। একটি ঘরে দুজনের মূর্তির মধ্যে সুখাবতী স্বর্গের চিত্র অঙ্কিত। আলমারিগুলিতে হাজার পিতলের বুদ্ধমূর্তি রয়েছে-এগুলি চিনা আক্রমণের পরে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। ভিক্ষু সকলেই প্রায় অঙ্কন ও চিত্রণ কার্যে পারদর্শী-শাস্ত্র পাঠের সঙ্গে এগুলিও তাঁদের শিখতে হয়। তাছাড়া কয়েকজনের বিশেষ পারদর্শিতাও থাকে। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রচলিত, এঁরা জন্মান্তরবাদে বিশেষ বিশ্বাসী।

ভেতরের ঘরে যেখানে মঠাধ্যক্ষ বা ঘেন-পো থাকেন-সেটি নির্জন ও কোলাহল মুক্ত। ভেতরে কুলুঙ্গিতে সোনালি অবলোকিতেশ্বরের কয়েকটি মূর্তি আছে, জিজ্ঞেস করাতে মুদ্রার ব্যাখ্যাও করলেন আমাদের চা পানের সময়। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা রাজা স্রনসেংগাম-পোর চিনা রানি ওয়েং চেং কর্তৃক আনীত মৈত্রেয় মূর্তির প্রতিলিপি দেখালেন। তাছাড়া দেওয়ালে মাথার ওপরে বৌদ্ধ দেব দেবীর ও ৭০-৭২ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের মূর্তি অঙ্কিত-খুব নিপুণ কাজ। তিব্বতি ভক্ত কবি মিলা-রে পারও চিত্র আছে। এটি ছবি দেখে এখানকার নেওয়ারি শিল্পী করেছেন।

মঠে প্রবেশ করার সময় দেখেছি-সূর্যকিরণে মঠের চূড়া দীপ্যমান-বাঁদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সোনার জলে কাজ করা ধর্মধ্বজা-নিচে তাওয়াং-চু বয়ে যাচ্ছে ও ঘন বন-পিছনে পাহাড়ের সারি-কয়েক মাইলের মধ্যে দুটি মেয়েদের গুম্ভা-তাদের বলা হয় আনী গুম্ভা-৩৩ জন করে ভিক্ষুণী থাকেন। সুন্দর শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ-কলকাতার ভিড়ের পর খুবই ভালো লাগে এ স্থান। বিশেষ করে সকালে বিকেলে যখন ৩০০ ভিক্ষু ঘণ্টা হাতে বজ্র নিয়ে বিভিন্ন মুদ্রায় দেবতার আহ্বান ও প্রার্থনা বন্দনা করতেন তখন যে কী এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হত! এখানকার খোল করতাল, ডম্বরু কোনটিই হালকা ধরনের নয়-সবই গুরু গম্ভীর-কাজেই তার আওয়াজও গুরু গম্ভীর ও অনেকক্ষণ তার প্রতিধ্বনি থাকে। মোন-পা লামারা গাঢ় লাল ও ধূসর লাল রংয়ের পশমের পোশাক পরেন-গৃহীরা বাদামী লাল রংয়ের পোশাক, মাথায় কালো টুপি পরেন। সারি সারি ভিক্ষুরা বসেছেন-প্রার্থনার সামনে মাখন গলানো ঘিয়ের প্রদীপ ঘণ্টা বজ্র ও জলপাত্র দূর্বাজাতীয়

ঘাসের গুচ্ছ, হাতে জপের মালা, মাঝে মাঝে ছোট রেকাবে যব মিশ্রিত আতপ চাল আছে, আমাদের দেশের খইয়ের মতো ছিটিয়ে দেওয়া হয় । মোন-পা পরিবারের সকলকেই কিছুদিন লামা হয়ে থাকতে হয়-তবে যেসব পরিবারে তিনজন ছেলে সেখানে এক জনকে ভিক্ষু হতে হয় ।

সব মিলিয়ে তাওয়াং গুম্ভাটিকে, তার পরিবেশ ও সরল পরিশ্রমী লোকদের খুব ভালো লেগেছিল । দালাই লামা ১৯৫৭ সালে এ পথ দিয়েই তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতে এসেছিলেন-তিনি এদের ধর্মগুরু-সুতরাং তিনি কোথায় ছিলেন, কী করতেন, সকলে তাঁকে কীভাবে দর্শন করতে এল এসব গল্প শুনলাম অনেকবার । কয়েকজন ভিক্ষুর ইচ্ছা তিব্বতি, পালি ও সংস্কৃত ভাষা শেখাবার জন্য স্কুল খোলেন । বহু বই তিব্বতি হরফে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়ে আছে, বা মূল সংস্কৃতে লেখা বই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার ভালো অনুবাদ তিব্বতি ভাষায় আছে । সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৪শো শতাব্দী অবধি তিব্বতে বহু ভারতীয় ভিক্ষু ও পণ্ডিত গেছেন । ১৩০৮ সালের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যাবার পর মহাযান বৌদ্ধধর্মকে অনেকখানি যাদুবিদ্যা, ভূত উপাসনা প্রভৃতির থেকে মুক্ত করে ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়-পরবর্তীকালে গেলুকা সম্প্রদায়ের এইভাবেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে । তিব্বত থেকেও বহু ভিক্ষু, নালন্দা বিক্রমশীলা প্রভৃতি সংঘারামগুলিতে আসতেন । তারপরে অবশ্য তিব্বতে তাদের মধ্যে থেকেই বহু ভক্ত ও পণ্ডিত জন্মান-লামা তারানাথের নাম তো বেশ বিখ্যাত-৭০০-৮০০ বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করার পরে এবং যে সময়ে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছে ও ধর্মাচার্যদের এদেশে শিক্ষা দিতে আসার ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় বৌদ্ধধর্ম কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে তিব্বত ও আশপাশের দেশগুলিতে এমনকী মঙ্গোলিয়াতে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে । এইসব বই আবার অনূদিত হলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও অনেক জানা যায় ।

এখন ধর্মের কথা যাক, আমার এক বিশেষ বন্ধু, তিনি এ অঞ্চলের পথঘাট, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বললেই হয়, ভালো তিব্বতি জানেন, পায়ে হেঁটে তাওয়াংয়ের আশপাশে সরকারি কাজে বহুবার ঘুরেছেন । তিনি একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন । তাঁরা ১৯৫৫-৫৬ সালে শীতকালে তাওয়াং থেকে পূর্বদিকে রওনা দিয়েছিলেন পথঘাট দেখতে । সময়টা ছিল শীতকাল । কাজেই প্রচণ্ড শীত, পথে কস্তুরীমৃগের দুর্গম নিবাস ও চতুর্দিক বরফে ঢাকা! তাওয়াংয়ের পূর্বে গভীর ছোনা-চুর উপত্যকা । সেখানে আছে দুটি উষ্ণপ্রস্রবণ-তার একটাতে ডিম হাফ বয়েল করে খেয়েছিলেন । আরও পূর্বদিকে ছোনা-চুর একটা উপনদী নিউক-চা ধরে ধরে চলতে চলতে ক্রমশ ওপরে উঠে-পাতলা বাঁশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলেন-এই উপত্যকার নাম নিউক-চা-রং বা

'ছোট বাঁশের উপত্যকা' । দুদিন ক্রমাগত চড়ার পর এক উঁচু সমতলে পৌঁছে হল আশ্চর্য অভিজ্ঞতা-কোথাও বুনো ভেড়ার পাল কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল, জংলী মুরগির পাশাপাশি জল খাওয়া, হঠাৎ হঠাৎ পাখির দল ভয় না করে গায়ে মাথায় বসতে লাগল-তার মধ্যেই আবার সবজির সন্ধান চলল । পরে অবশ্য রসুনের মতো একরকম শাক প্রচুর সংগ্রহ করলেন । পঞ্চমদিনে ওই সুন্দর উপত্যকা ধরে চলতে চলতে উপত্যকার শেষ হল । সামনে কঠিন গিরিপথ, নাম গোংকর-লা (২২০০০ ফুট) । সেদিন সন্ধেবেলা সেই বিশাল উচ্চতার নিচে তাঁবু ফেলে রাতে থাকলেন-রাতে খুব বেশি বরফপাত হল । সকালে তাড়াতাড়ি উঠে রওনা হলেন । তাঁর সঙ্গী ও কুলিরা ছিলেন অবশ্য সব তিব্বতি ও মোন পা । প্রায় মাইল খানেক যাবার পর বরফের ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখলেন, তখন তো গলদঘর্ম অবস্থায় আর বেশি কিছু দেখেননি-তাই অনুমান করলেন ওঁর আগে কেউ এই পথে ওপরে গিয়েছে! কে যে সেই যাত্রী তা ভাববার বা চিন্তা করার অবকাশও ছিল না-শুধু বোঝা গিয়েছিল যে খুব ভোরে সেই পদযাত্রী গেছে । হয়তো সঙ্গী পাবেন ভেবে ভালো লাগছিল । পায়ের দাগ ধরেই চলেছেন-পিছনে তিব্বতি সঙ্গীর ডাক শুনলেন-ওপথে নয়-অন্যদিকে যেতে হবে-পিছন ফিরে দেখলেন পোর্টাররা সম্পূর্ণ অন্য পথের দিকে দাঁড়িয়ে অনেকটা দূরে । তিনি বলেন-অসম্ভব কথা-এই তো পায়ের ছাপ গিয়েছে, এটাই পথ? সঙ্গী দৌড়ে এসে পায়ের দাগটা পরীক্ষা করে মাটিতে থুতু ফেলল-বলল-তুষার মানব । মোন-পা পোর্টাররাও তাই বলল 'তুষার মানব' । তখন তিনি ভালো করে দেখলেন-সত্যি ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা পাগুলো হাঁসের মতো উল্টানো-ফেরার পথে মেপে দেখলেন একটা পদচিহ্ন থেকে অন্যটার দূরত্ব প্রায় ৫ ফুটের মতো । সেদিন তাঁরা বেলা তিনটেয় গোংকর-লার চূড়ায় পৌঁছেছিলেন । হায়, এখন পথঘাট হয়ে গেছে আর কি ইয়েতিরা এ ধারে আসবে!

ইনি জাং দিয়ে ৬ দিনের হাঁটাপথে অন্য একটি পর্বতশ্রেণীর নিচে সুন্দর হ্রদ দেখার গল্পও করেছিলেন । এঁর সব গল্পগুলি শুনি ও রোজই দেখি খচ্চরে, ঘোড়াতে চড়ে কর্মচারী ও লোকেরা দূর দূর থেকে আসছে । কেউ পুব থেকে কেউ উত্তর বা পশ্চিম থেকে । তাওয়াং থেকে ৪০ মাইল পশ্চিমে পড়ে তাসিজং-বর্তমানে ভুটানের অন্তর্গত । এখানকার লোকেরা হাঁটাপথে সকলেই সেখানে গেছে-তাছাড়া একটি পার্বত্য পথে ভুটানের সঙ্গে জিনিসপত্রের আদানপ্রদান হয়-অন্য রাজ্য হলেও বিশেষ বাধানিষেধ নেই যাতায়াতের । তিনটি পাহাড়ি পথ আছে পূঃ ভুটানের তাসিজংয়ে যাবার-কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বোধহয় স্ত্রীলোক দেখেই আমাকে নানারকম ভয়ের কথা বলতে লাগল-পথ ভাঙা, গ্রাম নেই, বরফে রাস্তা আবৃত । তবে আমাদের কাছে সব চাইতে বড় বাধা অনুমতি । ভুটান সরকারের কাছে আগেই অনুমতিপত্র আনিয়েছিলাম । তাঁরা জানিয়েছিলেন-যে দশ দিনের জন্য তাসিজংয়ে যেতে পারি-তবে তাওয়াং থেকে যাওয়ার পথ ভালো নয়-বরফ পড়ে পথঘাট

ভেঙে গেছে সুতরাং রঙিয়া থেকে বাসে ভুটান সরকারের সীমান্ত দরঙ্গা বাজার-দরঙ্গা নদীর ওপাশে সমদ্রুক জগপেন-(ভুটান অঞ্চল)-দিয়ে যেন তাসীজঙ্গে যাই । যাবার তারিখ পার হয়ে গেছে-তবু দরঙ্গা বাজারে ও সমদ্রুক জগপেনে গিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম । তাওয়াং গুম্ভা গেছি; তাই সে সব অনুমতিপত্রাদি দেখে যাবার ছাড়পত্র মিলল-ডাকবাংলোতে বাসস্থানও মিলল ।

সমদ্রুক জগপেন থেকে মাঠের ওপরের রাস্তা দিয়ে দরঙ্গা বাজারে (ভারতীয় এলাকায়) স্বচ্ছন্দে যাওয়া চলে । এখানে ডাকবাংলোতে থাকার আগেই চেকপোস্টের পুলিশ যথাসম্ভব সার্চ করল । Transport officer ছিলেন নেপালি মিঃ সুব্বা-তাঁর আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে কী হত তা বলা মুশকিল । তাসিজং বা তাসিগাঁও ১৭২ কিলোমিটার উত্তরে ও পূর্বে তিব্বত সীমান্তের বেশ কাছে । ভুটানে পথঘাট তৈরি হয়েছে, আমাদের পি ডাব্লু ডি-র বহুলোক ও নতুন কর্মীরাও ওখানে কাজ করছেন । ভেতর দিয়ে যাবার কোনও রাস্তা নেই-পাহাড়ি দুর্গম । রাস্তাগুলি যা হচ্ছে তা সবই দক্ষিণ ভারত সীমান্ত থেকে ভুটানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি পর্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ উত্তর হয়ে গেছে । আমরা গিয়েছি পূর্ব ভুটানে-যেখানে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ব্যাপারে পশ্চিম ভুটান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে । স্থানীয় লোকদের মতে তাদের দেশ জনবহুল হলেও দুয়ো রানির ব্যবহার পাচ্ছে, যা কিছু উন্নতি হচ্ছে পশ্চিম ভুটানে-যেখানে রাজধানী পারো, থিম্পু, ফুঙং, সিলং প্রভৃতি অবস্থিত । যা কিছু বাড়ি, ঘর, শিল্প ইত্যাদি নাকি সেখানেই-পূর্বাঞ্চল উপেক্ষিত । যাক আমরা আদার ব্যাপারি জাহাজের খবরে কাজ কি-তাই চুপচাপ সব শুনে যাই ।

মানস বা ডাংমে চু পাশে রেখে তাসিগাঁও যেতে হয় । মিঃ সুব্বা ডাকবিভাগের লাল জিপটির সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা করেছিলেন, না হলে তখন যানবাহন পাওয়া মুশকিল ছিল । মানস নদী ভারতের কামেং সীমান্তের উচ্চ পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা কুলং চুর সঙ্গে মিশেছে । এরই একটি উপনদী তাজম চুর পথ বেয়ে তিব্বত থেকে পূর্ব ভুটানে আসার প্রাচীন যাতায়াতের পথ ছিল । তাসিজংয়ের কাছে মানস ১৬০ ফুট চওড়া, সমুদ্র সমতল থেকে ২০০০ ফুট উঁচুতে প্রস্তর খণ্ডকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড শব্দ করে চলেছে । পথে লরিতে করে বহু লোক যাচ্ছে-কারণ জিজ্ঞেস করলে শুনি-সমস্ত দোকানদারের প্রতিনিধি নির্বাচন হচ্ছে-সকলকে ভোট দিতেই হবে, না হলে শাস্তি । সেজন্য সরকারি কর্মচারীরা সকলেই ব্যস্ত । সমদ্রুক জগপেন পার হয়ে জিপ উত্তরাভিমুখে চলল-প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্ট দেও-থাং (দেবস্থান) । এখানেই ভালোরকম করে খোঁজখবর তল্লাসি হয় । ভারতীয় সৈন্যদলকেও দেখলাম মাঝে মাঝে । দেওথাংয়ে প্রবেশ করার পথে অবশ্য গেটে ভুটানি বা দ্রুককে ভাষায় (যার অক্ষর তিব্বতি) বড় করে লেখা আছে 'জেনথর লেকসো' মানে welcome-কিন্তু সে কাদের জন্য, তাই Check post-এ বসে বসে ভাবি । তিব্বতি

ভাষার সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল থাকলেও আশপাশের শব্দ ও idioms-এ ভাষায় বেশি আছে। দেশটা এদের নিজের ভাষাতে বলে 'Drukpa', তাই ড্রুককে (Druk-ke) এদের সরকারি ভাষা। তবে পূর্ব ও পশ্চিম ভুটানে উচ্চারণেও শব্দের অর্থে বেশ তফাত আছে। ভুটানিরা কারগুই-পা গোষ্ঠীর কারমা-পা ড্রুকপা ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধীন। এদের বলা হয় লালটুপি সম্প্রদায়। এদের ধর্মে যাদুবিদ্যা ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রভাব বেশি-বন ধর্মের অনেক ক্রিয়াকর্ম এদের ধর্মে আছে। এই ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মমত পরে শোংকা-পা প্রভৃতি ধর্মাচার্যের হাতে অনেকখানি সংস্কৃত (Reformed) হয়ে গেলু-পা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে-অধুনা যার ধর্মগুরু দালাই লামা। সেজন্য ভুটান ও তাওয়াংয়ের তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকলেও তফাতও আছে তাই রেষারেষিও আছে। আসলে তিব্বত থেকেই ভুটানে বৌদ্ধধর্ম গেছে-(কারমা-পা) কারমা-পা সম্প্রদায়ের লামা ধর্ম। কিন্তু পরবর্তীকালে তিব্বতের ধর্ম সংস্কার-এরা মেনে নেয়নি। পুরনো গোষ্ঠীতেই আছে।

তিব্বত-ভুটানে, মানুষের জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় প্রভাবে ও অনুষ্ঠানের দ্বারা। পথটি খুব সুন্দর-দিনটিও ছিল পরিষ্কার। পথের দু ধারে কমলালেবুর গাছ, ভুটানের ক্ষুদ্রাকৃতি কমলাগুলির মিষ্টত্বের খ্যাতি আছে। নেপালি ও ভুটানিদের সহজেই তফাত করা যায় কারণ সরকারি আদেশে ঢোলা হাতওয়ালা ভুটানি পোশাক-ছাত্র, কৃষক, সরকারি কর্মচারী সকলেই পরতে বাধ্য। তবে খাবার জিনিস খুব পাওয়া গেল না-চা ছাড়া। ভাত ও শুয়োরের মাংস অবশ্য পাওয়া যায়-আর যেটা সবচেয়ে সস্তা-সেটা হল মদ। ভুটান সরকার পরিচালিত Distillery আছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। জেসুইট ব্রাদারদের পরিচালিত ৫০০ ছাত্রছাত্রীর আবাসিক পাবলিক স্কুলটি আছে-ইয়াং ফুলাতে (৯০০০ ফুট)। এখানকার নেপালি বাঙালি শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ সহজেই আলাপ জমে উঠল। এখনও পত্রালাপ চলে। তবে Public Schoolটি স্থাপিত হয়েছে থিম্পুতে রাজধানীর কাছে, কিছুদিন আগে।

১৭২ কিলোমিটারের পথ-ওরং, মোরং, নরফাং জোনথাগ্রাম পুল সিলিঙ্গার, রিজের-বু, খাটিংলে, পেরিহান, ওয়ামরাং, কাংলুং, ইয়নফুলা পার হয়ে বিকেল তিনটেয় তাসিগাঁও বা জংয়ে পৌঁছলাম। ৯০০০ ফুট উঠে বেশ শীত করছিল-কিন্তু তাসিগাঁও মাত্র ৩০০০ ফুট, কাজেই বেশ গরম লাগতে লাগল, ফলে রাত দশটায় স্নান। পথে এক মুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে একজন ভদ্রলোক ইশারা করলেন গাড়ি থামাতে এবং জিপের মালপত্রের পিছনে বসলেন। খানিক পরে আমাদের বাংলা কথাবার্তা শুনে-তিনিও যে বাঙালি এবং খাস বালিগঞ্জীয়-ভদ্রলোক তা বলতে লাগলেন। সহজেই আলাপ জমে উঠল। তিনি গিয়েছিলেন ভেতরে পি ডাব্লু ডি কাজের তদারকে। আমাদের জিপটি না পেলে আরও

তাঁকে কতক্ষণ বা কতদিন বসে থাকতে হত কে জানে! বালিগঞ্জের ছেলে এই গহন অরণ্যে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করতে বললেন, ভালো আছি কাজের মধ্যে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে গলা ছেড়ে গান গাই-এ কথা কলকাতা থাকতে ভাবতেও পারিনি-। তাছাড়া বেকার জীবনের জ্বালা তো নেই । বালিগঞ্জে থাকতে এধরনের জীবনের কথা ভাবতেও পারিনি । এরকমই কর্মী উৎসাহী ছেলেদের দেখেছি পি ডাব্লু ডি-র দপ্তরে তাসিগাঁওতে-আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের ছেলেরা-বিদেশে, যেখানে ভাষাটা একটা প্রধান বাধা মানুষকে বুঝতে সেখানে এদের পেয়ে যে কত আনন্দ হল তা বলাই বাহুল্য । এদের কাজের সময়ও অদ্ভুত । রাতে খাবার পর জিপ নিয়ে সীমান্তে ছুটল রাস্তা তৈরির তদারক করতে । আমরাও কখনও সঙ্গী হয়েছি তাদের । একজনের স্ত্রী-পুত্র পরিবার এখানেই থাকেন-কাজেই খাওয়াদাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হল না । ওদের পি ডাব্লু ডি বিভাগ থেকে রসদ আনাবার, ন্দ্রাiপ্তপ্প আনাবার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে । তাতেই খাবার কিছু সুবিধা হয়েছে ।

সরকারি অফিস, ডাকঘর, হোটেল, বাজার বাস রাস্তার পাশেই, নিচে । মাঝে তাজম-চু বলে ছোট নদীটি । ছোট ধারাটির পাশ দিয়ে রাস্তা গিয়ে সেই রাস্তা শেষ হয়েছে । তাসিজং বা তাসি গুম্ভার নামানুসারেই স্থানটির নাম তাসিগাঁও । তাসি কথাটির মানে ‘পবিত্র’, সিকিমে ভুটানে এই কথাটির ছড়াছড়ি । প্রাচীন গুম্ভাটি পুড়ে গেছে-সেটি ছিল ২০০ বছরের পুরনো । সেই জায়গায় একটি নতুন গুম্ভা প্রায় ৪০-৫০ বছর আগে তৈরি হয়েছে । একটি Spur-এর ওপর অবস্থিত তে-তলা বাড়িটির সামনে প্রশস্ত অঙ্গন । এখানকার জংগুলি আসলে দুর্গ, কেন্দ্রস্থলে পূজাস্থান বা মঠ, বাইরের দিকে শাসনকার্যের অফিস । এখানেও তাই, শাস্তি বিচার, সরকারি কাজকর্ম সব এখানেই হয় । গুম্ভার একটি আলাদা দরজা ও সমস্ত জংয়ের একটি প্রধান দরজায়, সন্ধে ৫টার পর লামাদের সান্ধ্য উপাসনার সময়ে বাইরের ভারি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়-প্রহরী চাবি নিয়ে ভেতরেই থাকে । ৫টার পর কারও ঢোকবার বা বের হবার হুকুম নেই । অতবড় গুম্ভাটি দেখতে আমাদের বেশ সময় লেগেছিল । তাই ৫টা বেজে গেলেও লামারা যখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য তৈরি হচ্ছেন-তখন একজন লামা মশাল নিয়ে ও দুটি শিক্ষার্থী বালক লামাকে নিয়ে, একতলা দোতলা সব দেখাতে লাগলেন । দোভাষী নেই-দুয়েকটা কথা বলে সব বুঝতে হচ্ছে । দীপঙ্কর-‘অতীশ-অ’-এসব তো বুঝলাম । অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি এখানে বড় একটা নেই । তবে ১৬৫০ সালে ভুটানের রাজা ও কার-স্তইপা গোষ্ঠীর প্রবর্তক শিপটুন-থুচেনের বড় প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে-তাওয়াংয়েও দরজার সামনেও এঁর মূর্তি আছে । এই মঠের দেওয়ালগুলি ৫ ফুট পুরু ও ৩০ ফুট উঁচু । এর শাসককে বলা হয় জঙ্গদা-তিনি নির্বাচন উপলক্ষে তখন বাইরে ছিলেন । তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা

আমাদের ভাষা, হিন্দি, ইংরিজি কিছুই বোঝেন না । তাঁর অনুমতি নিয়েই গুম্ভায় ঢুকেছিলাম-সমস্ত দেখতে দেখতে ক্রমশ কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে । বুদ্ধমূর্তির পাশে অমিতাভ বুদ্ধমূর্তি, অন্য পাশে কারমা-পা যিনি এখানকার প্রচলিত ড্রুক-পা সম্প্রদায়ের মূল গোষ্ঠী কারমা-পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । মারণ উচাটন, শনি বা খারাপ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানারূপ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, অপ্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আহ্বান, মণ্ডল ও চক্রের সাহায্যে নানাবিধ প্রক্রিয়া ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন এই ধর্মমতে বেশি দেখা যায় । মন্ত্রের শক্তিতে এদের অন্যদের মতোই খুব বিশ্বাস । ঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারলে সোনম (পুণ্য) অর্জন হয় ও মুক্তি হয় এই বিশ্বাসেই জপমালা বা ওঁ মণিপদ্মে হুঁ বাণীটি সর্বত্র পাহাড়ের গায়ে কাঠের গায়ে খোদিত ও উচ্চারিত হচ্ছে । এখানে দশটি তারা মূর্তির চিত্র অঙ্কিত, তাছাড়া কোনও শিল্পী এখানকার মঠের চিত্রও করেছেন । উপাসনাগৃহে বুদ্ধমূর্তি (মৈত্রেয়) আসীন তবে তাওয়াংয়ের মতো অত বিপুলায়তন নয় । ভালো করে কথা বুঝতে না পারার বা যে জন্যই হোক সমস্ত দেখাশোনার পর গেটে এলে দেখি ৬টা বেজে গেছে, গেটে বৃহদাকার তালা ঝুলছে । রক্ষী প্রহরী কিছুতেই খুলবে না-নিয়ম নেই । বাইরের রক্ষী যে আমাদের অনুমতি দিয়েছিল-সে তো দারুণ রাগারাগি শুরু করল । বলছে ওখানেই রাতে আটকে থাকতে হবে । আগেই শুনেছিলাম জেলখানা মাটির নিচে, দারুণ চিন্তা হল-বিশেষ করে আমাদের পি ডাব্লু ডি বিভাগের যে ছেলেটি প্রদর্শক হিসাবে এসেছিল তার জন্য । অন্য রাজ্যে এসেছি, এদের নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচিত নই, ভাষাও বোঝে না আমাদের । ভেতরের রক্ষীকে অনেক অনুরোধ ও মিনতি করার জন্য এবং বোধহয় জঙ্গের ভেতরে মেয়েদের থাকার নিয়ম নেই সেজন্যও বটে, ৭টার পর দরজা খোলা হল-বাইরের রক্ষী কর্মচারী তো আমাদের তখনই পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায় আরকি! অবশেষে অনেক বকাবকির পরে, অনুনয় বিনয়ের পর ঠিক হল পরদিন তার কাছে গিয়ে পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা করা হলে তবে সে সিদ্ধান্ত নেবে । জঙ্গদা থাকলে অবশ্য এতটা হত না । পরদিন সকালে স্থানীয় বাঙালি পি ডাব্লু ডি-র একজন সিনিয়র কর্মচারী আমাদের সঙ্গে এসে বিষয়টা বুঝিয়ে বলাতে রক্ষা পাওয়া গেল-এমনকী আরও ২ দিন বেশি থাকবার অনুমতি পাওয়াও গেল । ভাষা সমস্যা বেশ-তাছাড়া ভুটানের স্কুলগুলিতে ভুটানি ও ইংরিজি ছাড়া অন্য ভাষা পড়ানোও হয় না ।

তাওয়াং থেকে এটি ৪০ মাইল দঃ পশ্চিমে অবস্থিত পুরনো ব্যবসা-বাণিজ্যের পথটি ছাড়াও অন্য দুটি পথে যাতায়াত করা যায়, তবে সেগুলি সবই পাকদণ্ডী ও খারাপ রাস্তা । একেকটি অঞ্চলে জঙ্গ বা দুর্গ ঘিরেই শহর বা গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে । পুরনো বন ধর্মের অলৌকিক শক্তি ও দেবদেবীর প্রভাব বেশ অনেকখানি এদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে-ঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারলে ঐশী শক্তির অধিকারী হওয়া যায়-কারমা-পা গোষ্ঠীর

মতে। তাই এখানে বর্তমানে বাইরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক আইন সংস্কার খুব ধীরে ধীরে করতে হচ্ছে-কারণ অল্প কিছুদিন আগেও ভুটানে বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। জিগমি দোরজের হত্যার কারণও খানিকটা এই যে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, দেশটাকে উন্নতির পথে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এখানকার প্রধান কর্মচারীরা বেশিরভাগ ভুটানি বা নেপালি। জুম চাষের চাইতেও পাহাড়ি ঢালের ওপর চাষের পরিমাণ (Terraced cultivation) বেশি হয়। বর্তমান সরকার দেশটার সার্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন-দুর্গম পাহাড়ি পথে রাস্তা হচ্ছে, স্কুল, হাসপাতাল খুলেছেন-তবুও সকলে মন খুলে কথা বলতে ভরসা পায় না-বেশ সময় লাগবে এদের আধুনিক কালকে গ্রহণ করতে। রাস্তা তৈরি করার হ্niব্ধ-এর নাম 'দস্তক'-তার একজন কর্তার সঙ্গে কথা হল-ভুটানি ভাষা জানেন-একটা বই পড়াতে আসবেন কলকাতায় জানালেন। তিনি এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্পর্কে বেশ জানেন। পরবর্তীকালের অতীশ দীপঙ্করের প্রভাবে শোংকা-পা যে গেলু-কা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে মহাযানী ধর্মকে আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি থেকে অনেকখানি মুক্ত করে ধ্যান ও প্রার্থনার দিকে জোর দিয়ে সংস্কৃত (reformed) করেছিলেন-সে মত এখানে গ্রহণ করা হয়নি। সেইজন্যই হয়তো তাওয়াংয়ে লামা ভিক্ষুদের সংযত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহার ও কথাবার্তা এত ভালো লেগেছিল এদের তুলনায়।

কিন্তু হিমালয়ের যত সৌন্দর্য কি শুধু উপত্যকায়? কুলাকাংরি চমলহরি শৃঙ্গ, উত্তরের উচ্চ উপত্যকাগুলি, ঘন অরণ্যবেষ্টিত মধ্য হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী, মহান হিমালয়ের বরফাবৃত চূড়াগুলি আড়াআড়ি (transversal) নদী উপত্যকাগুলি কী অপূর্ব সুন্দর! হিমালয় তার অকৃত্রিম রূপে এখানে দৃশ্যমান। নদীগুলির নামই বা কত বিচিত্র,-মানস, তোর্সা, রায়ডাক, সঙ্কোশ। বড়পেটা থেকে মানস নদীর পারে ভুটানি অঞ্চলটিও কী সুন্দর! কাছেই বন্যজন্তুর অভয়ারণ্য। ভুটান সিকিমকে রোনালডসে বলেছেন-বজ্রের দেশ।

আমাদের সরকারি ডাকবিভাগের জিপেই ফিরতে হল। নেপালি ড্রাইভারটি খুব আমুদে। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, গান গাইছে, ভারতে ছিল, নেপালিরা হিন্দি ভাষা বেশ বোঝে তাই হিন্দি সিনেমার গান খুব রপ্ত করেছে। আমাদেরও কথা বলাবে, গান গাওয়াবে-নাহলে ওর ঘুম এলে এই সর্পিল দুর্গম পথে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে! কিছুদিন আগেই একটি জিপ এইভাবে খাদে পড়ে গিয়েছিল-দুয়েকজন মারাও গিয়েছিল। উঁচু থেকে নিচু শ্রেণীর সকলেরই বহু সংস্কার আছে-রাস্তার সামনে কোনও জন্তু পার হলে অলক্ষণ, অবশ্য সে যদি শুধু দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে নয়। জিগমি দোরজের মৃত্যুর আগে নাকি তাঁর বাগানে তিন রাতেই চিতাবাঘ ঢুকে ডেকেছিল-সেটা ওদের মতে অশুভ লক্ষণ, তার পরেই তিনি নিহত হন।

যাক, চেনা শোনার পালা শুরু হয়েছে । সেখানকার বাঙালি কর্মচারী ও অন্যান্য শিক্ষকরা-আবার ওদের মধ্যে গিয়ে দেশটাকে ভালো করে জানবার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ দিয়ে রাখলেন-যেন পশ্চিম ভুটানে, রাজার অভিষেকের সময় যাই ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

মেক্সিকো শহরের একটি দিন

প্রীতি সান্যাল

'তোমাদের কি পায়ের তলায় চাকা বাঁধাই থাকে? এই তো ফিরলে গ্রীষ্মের গ্রেনাডা থেকে । ক্যারাবিয়ান সাগরের নোনা জল গা থেকে শুকোয়নি বললেই চলে । এক সপ্তাহের মধ্যে স্যুটকেসে শীতের পোশাক গুছিয়ে চললে মেক্সিকো! এই অক্টোবরের ঠান্ডায়!' বার্কলে থেকে সস্নেহে মেয়ে বকে উঠল ফোনে । ২০০০ সালে বড়ই ঘোরা হয়েছে এটাও ঠিক । দেশ বেড়ানো ঘোরের মতো, যাঁরা বেড়ান তাঁরা জানেন । আমার ভ্রমণ পঞ্জিকা নির্ধারিত হয় স্বামীর কর্মস্থল ইউনেস্কোর প্রোগ্রামের সঙ্গে । ১৮ অক্টোবর পারি শহরের বৃষ্টি, স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা, গোমড়া আকাশ ছেড়ে এক সপ্তাহের জন্য উধাও হওয়া মেক্সিকো । শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরে এয়ার ফ্রান্স লাউঞ্জে ঢুকতেই দেখি কাঁচাপাকা দাড়িতে টেলিভিশনে, খবরের কাগজে দেখা চেনা মুখ, কফি আনন, ইজরায়েল থেকে ফিরছেন, প্যারিস হয়ে যাচ্ছেন নিউইয়র্ক । তাই এত সিকিউরিটির কড়াকড়ি । আমাদের চোখে পরিচয়ের দৃষ্টি ফুটে উঠতেই হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন । কফি টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসে গল্প করছেন সঙ্গীদের সঙ্গে দ্বাদশ শতকের একটি ব্রোঞ্জের দেবীমূর্তি নিয়ে । বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষায় কাটল । এখন উড়ছি মেক্সিকোর পথে । 'ওলা' অর্থাৎ হ্যালো সম্বোধনে চমকে তাকালাম । পাশে জানলার কাছে বসা মিষ্টি চেহারার মহিলা আলাপ করলেন । আমার স্প্যানিশ একেবারেই কাজ চালানো গোছের । তবু পরস্পরকে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না । পেশায় ডাক্তার । চার বোন আর মেয়েকে নিয়ে ইউরোপ ঘুরে ফিরছে নিজের শহর মেক্সিকো । প্যারিসের কথায় ঝলমলে মুখ । তার প্রিয় শহর । আর মেক্সিকো! আমার প্রশ্ন । হেসে বলল, 'এক আশ্চর্য শহর । বিশাল, দম বন্ধ, খেপা, রঙিন, হিংস্র, দুঃখী, ঝকমকে, বিপজ্জনক অথচ কী যে মনকে টানে । জানো তো এই শহরকে তুলনা করা হয় কলকাতা, কায়রো, রিও দি জেনেরোর সঙ্গে । আমার তো মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনও শহর এত বৈপরীত্য, আকর্ষণ, অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য, হতাশা, বাড়তে থাকা জনসংখ্যা, পরিদূষণ, ঐশ্বর্য, সংস্কৃতি সমেত এমন ভালোবাসাতে পারে মানুষকে । (আমার কলকাতার কথা তক্ষুনি মনে পড়ল) সমুদ্র থেকে দু হাজার কুড়ি ফুট ওপরে সাত হাজার আটশো কিলোমিটারের গড়ানো উপত্যকায় পাহাড়ে ঘেরা আমার শহরের জনসংখ্যা মনে হয় ত্রিশ

মিলিয়নেরও বেশি । আর তা বেড়েই চলেছে । আর পলিউশন! প্লেন থেকে নামার সময় দেখতে পাবে পশমের চাদরের মতো ঝুলে আছে ধুলো আর ধোঁয়া । যেন ছুরি দিয়ে কেটে এক চাক তুলে নেওয়া যায় । নিশ্বাসে প্রশ্বাসে টের পাবে পরিদূষণের ভয়ানক চেহারা । মেক্সিকো শহরে হাঁটতে চলতে তোমাকে ঘিরে থাকবে ধোঁয়া ধুলো মাখা ভারি বাতাস ।' আমার চিন্তিত মুখ দেখে হেসে বলল, 'আগে ভাগে এ সব বলে নিচ্ছি, তাই বলে মনে করো না আমি আমার শহরকে ভালোবাসি না । আসলে মেক্সিকো মেক্সিকোই । মানুষজন, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ছবি ভাস্কর্য, কবিতা সাহিত্য সব কিছু নিয়েই মেক্সিকো আমূল মেক্সিকান । প্রাচীন, জটিল, দুর্বোধ্য এই শহরকে এত অল্প সময়ে কি চিনবে? তবে চেষ্টা করো মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করতে । পঞ্চাশেরও বেশি ইন্ডিয়ান জাতির সঙ্গে মিশেছে স্প্যানিশ সভ্যতা যাকে ডাকতে পারি মেক্সিকানিসম নামে । দুর্বিষহতা নিয়ে জীবন কখনও উৎসবের ছটায় রঙিন, ফিয়েস্তার আনন্দে ফেটে পড়ে আবার তক্ষুনি লুকিয়ে ফেলতে পারে নিজেকে অন্ধকার বিষাদে ।' এত ভালো লাগছিল ওর কথা শুনতে যে নাম জিজ্ঞেস করার ফুরসৎ পাইনি । নাম গুয়াদালুপে । বললাম, 'তোমার নামে ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি দ্বীপ আছে ।' বলল, 'তাই বুঝি! আসলে ইনি হলেন দেবী, মেক্সিকো শহরের রক্ষাকর্ত্রী ।' বেশ গল্পগাছা করে ঘুমিয়ে বারো ঘণ্টা সময় কেটে গেল । নামছি । দেখি ফ্ল্যানেলের মতো পুরু আস্তরণ ঢেকে রেখেছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহরের মুখ । এ দেশের বিখ্যাত লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেসের লেখা জনপ্রিয় বইটির নাম মনে এল Where the Air is Clear– এখন আর বলা যাবে না নিশ্চয় । গুয়াদালুপের গালে চুমু দিয়ে বিদায় নিলাম 'আদিয়োস আমিগা'-বিদায় বন্ধু-ভাগ্যিস তোমার পাশে আমার বসার জায়গা ছিল । অল্প সময়ে কত কিছু জানালে । শহরে ব্যাগ নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে, হোটেলে কলের জল না খেতে, আর প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারগুলি ভালো করে দেখে নিতে অনুরোধ করল 'শহরের দেবী' নামে মেয়েটি । এখন রাত আটটা । গাড়ির ভিড়, দেওয়ালের গায়ে রাঙানো গ্রাফিতি শহরের বহুতল বাড়ির চূড়া দেখতে দেখতে শহরের কেন্দ্রে হোটেলে এসে পৌঁছলাম ।

সকালে ট্যুর নিলাম হোটেল থেকে সারাদিনের জন্য । সালভাতর আমাদের গাইড । বয়সের ভারে নুয়ে আছেন । কিন্তু শহরের নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে, জানাল গাড়িচালক দিয়েগো । তবে তাড়াতাড়ি কথা বলার জন্য, না বাঁধানো দাঁতের জন্য প্রায়ই কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল গাইডের । কান সজাগ রেখে শুনতে হচ্ছে । যেহেতু সময় কম এবং এই বিশাল দেশ ও শহর তাই আমরা দু-তিনটি জায়গা বেছে নিয়েছি ভালো করে দেখার জন্য । সারা

দেশে নব্বই মিলিয়ন লোক আর ওই একই সংখ্যার দ্রষ্টব্য স্থান । আর আছে তার সঙ্গে চার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস । আমাদের দেশের মতোই এ দেশটা দেশ কাল সময় পেরিয়ে এক বহতা জীবনের ছবি । সারা দেশে ছড়ানো পুরনো সভ্যতার প্রাচীন ভগ্নস্তূপ-ওলমেক টলটেক্স মায়া আজটেক আজও ফেলে আসা সভ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে অতি আধুনিক বাড়িঘরের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে । আমরা দুজন ছাড়া আরও দুজন আরোহী । লেনা অসলোর তরুণী, হান জুরিখের ছেলে, জাজ পিয়ানো সঙ্গীতের সঙ্গে পারকাসন বাজায় । এখন মেক্সিকোতে প্রোগ্রাম করতে এসেছে । সঙ্গী হিসাবে দুজনেই মনোমতো ।

প্রথমেই এলাম শহরের কেন্দ্রে, বাড়ি আর বাড়ির সমুদ্র পেরিয়ে জোকালো, বিশাল প্লাজাটি শহরের প্রাণভোমরা । পাসেও দ্য লা রিফরমা ধরে হাঁটছি । সঙ্গে বয়সের ভারে কমজোরি পায়ে কথা বলতে বলতে হাঁটছেন সালভাতর । 'এ রাস্তাকে আদর করে ডাকা হয় মেক্সিকান সঁজেলিজে । কবি অক্টাভিও পাজ এ রাজপথটির নাম রেখেছেন-মেক্সিকো শহরের সিমেন্টের সেইন নদী, প্যারিসের অতি চেনা সেইন নদীর নামে । এখানে আগে দুধারে সাজানো ছিল প্যারিসিয়ান স্টাইলের বিশাল বিশাল প্রাসাদ, ফরাসি ফ্যাশন বুটিক, রেস্তোরাঁ । সালভাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে দিন কি আর আছে? অত সুন্দর বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে চক্ষুশূল স্কাইস্ক্র্যাপার ।' আমার হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল । ফরাসি স্থপতি শার্ল কর্দলিয়রের তৈরি কলম্বাস মনুমেন্ট, তার একটু দূরে শেষ আজটেক সম্রাট বীর Cuauhtémoc-এর স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো অহংকারী মুখ শহরের সবথেকে ব্যস্ত ও কোলাহল মুখরিত রাস্তাগুলি একেবারে যেখানে মিশেছে ঠিক সেই বিন্দুতে । তার পরেই স্বাধীনতার দেবী সোনালি রঙের El Angel– ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে পাখা মেলেছেন যেন স্মৃতি মিনার থেকে উড়ে যেতে চান অন্য কোথাও । ডানহাতে ধরা লরেল পাতার গোল মালা । সুন্দরী এই রমণীকে ডাকা হয় পুংলিঙ্গে, এল এঞ্জেল নামে । লেনা, অসলোর মেয়ে আমাদের সঙ্গিনী বলে উঠল, 'দেখেছ এদেশের মাচো চরিত্রের অহংকার! দেবীমূর্তিও রেহাই পায়নি তার হাত থেকে ।' সালভাতর নিচু হয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে বলেই বোধহয় কথাটি কানে নিল না । আমরা এখন চলেছি Tlatelolco; মাটির নিচে কয়েকটি স্তরের ভূমি আর কয়েক শতকের সময় এই সব ব্যবধান ছাড়িয়ে তিনটি সভ্যতা একসঙ্গে এসে মিশেছে এক বিন্দুতে । এক দিকে পিরামিডের চূড়া আজটেক সভ্যতার পরিচয় বহন করছে, এসপ্ল্যানেডের মাঝখানে সপ্তদশ শতকের সেইন্ট জেমস গির্জা ঔপনিবেশিক সভ্যতা আর উঁচু তলার আধুনিক বাড়িটি বিদেশি মন্ত্রণালয় আজকের সময়কে ধরে রেখেছে ।

Tlatelolco-তে হাঁটছি, গাইড দেখাচ্ছে পুরনো দেওয়াল, মন্দিরের বেদী, সিঁড়ি আর Tzompantli– পাথরে খোদাই করোটির মঞ্চ, ঠিক ঔপনিবেশিক গির্জার পাশটিতে ।

যেন ওই ঈশ্বর ঢেকে দেবে অতীতের ধ্বংস তাণ্ডবের ছবি । সালভাতরের গায়ে আছে অনেকটা আজটেক রক্ত । কথা বলছিল বেশ উঁচু গলায়, 'অনেক রক্ত ঝরেছে এখানে । বিজয়ী স্প্যানিশ নেতারা চেয়েছিল এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে । আর না হয় মাটির নিচে কবর দিতে । স্তরে স্তরে এখনও সেই শিল্পভূমির পরিচয় ছড়িয়ে আছে । জলের দেবতা, আগুনের দেবতা, উর্বরতার দেবী-শয়তানের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বাঁধা । কাজেই এ সব অশুভ ধারণাগুলো তাড়িয়ে ধর্মান্তকরণ সম্পূর্ণ করতে হবে এই ধারণায় তারা কত যে দেবদেবীর মূর্তি, শিল্প কাজ, অলঙ্কৃত বেদী হয় ভেঙেছে না হয় পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলেছে । এভাবে শুধু দলে দলে দেশবাসীদের নিধন করেই ক্ষান্ত হয়নি, একটা পুরো উন্নত শিল্প সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল । শুধু প্রাচীন আজটেক নয় অনেক পরে যখন স্প্যানিশ ও মেক্সিকান দুজাতি মিলে একটা মিশ্রিত জনসংখ্যা mestizos গড়ে উঠেছে ১৬৯২ সালে, তারা ক্রেয়ল আর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল বিদেশি শ্বেত প্রভুদের কেড়ে নেওয়া তাদের দৈনন্দিন খাবার পবিত্র ভুট্টার আটা বাঁচাতে । বিদ্রোহী জনতা রুখে দাঁড়িয়েছিল । তখন এই প্লাজাতেই রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল এ দেশের মানুষের প্রাণের বলিদানে । এ স্কোয়্যার রক্তের রঙে লাল । ১৯৬৮ সালে অলিম্পিক খেলা হওয়ার আগে এখানে ছাত্ররা জড়ো হয় প্রতিবাদী শ্লোগানে । প্রতিবাদ তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে । অলিম্পিক খেলার জন্য কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন স্টেডিয়াম, ভিলেজ, দেশের সাধারণ মানুষের তখন কঠিন অবস্থা, দারিদ্র্যের সঙ্গে রোজের সংগ্রাম, জীবন কঠিন চাপে দুর্বিষহ । ছাত্রসমাজ রুখে দাঁড়াল । সুবিচার আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তাদের । অলিম্পিক খেলা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে । সরকারের এই চেহারা বাইরের জগতের কাছে তুলে ধরতে হবে এই বাজির লড়াই ছাত্রদের । অলিম্পিক শুরু হওয়ার ঠিক ষোল দিন আগে প্লাজাতে সমবেত প্রতিবাদী জনতা জিগির তুলেছে 'ভাই সব এক হও'-সরকারের আরক্ষ পুলিশের গুলির ছররা ছুটে এল, এ যেন এক মৃত্যু ফাঁদ, ছাত্ররা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না, জানেই না কোন দিকে গেলে রেহাই পাওয়া যাবে বুলেটের হাত থেকে । ১৬৯২ সালের মতো আবার রক্তের বন্যা বইল এই প্লাজাতেই । 'এক অভিশাপ ঘিরে আছে এই প্লাজাকে ঘিরে তা আমরা বিশ্বাস করি', বলে উঠল সময়ের ভারে নুয়ে পড়া অনেক অভিজ্ঞতা অতিক্রম করা বুড়ো গাইড । '১৯৮৫ সালে যে ভূমিকম্প হয় তা এই প্লাজার অনেক ক্ষতি করে । এ অতি পবিত্র আর রহস্যময় স্থান যেখানে ক্রুদ্ধ দেবতারা মাঝে মাঝেই নরবলির উপচার চান । প্রাচীন যুগে উচ্চারিত হয়েছে কতবার পবিত্র বলিমন্ত্র, প্রতিশোধী যজ্ঞের লেলিহান শিখা জ্বলেছে, সূর্য উপাসকেরা ভালোবাসত এমন ব্রত পুজোর আচার অনুষ্ঠিত হয়েছে বারবার এখানেই । ধর্মীয় উৎসব, জীবন মৃত্যুর উৎসব, ওদের নাচ গান স্তোত্র পাঠ, মাটির নিচ থেকে আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, আগুনের ফুলকির মতো

অতীত উঁকি দিয়ে যায় এই ত্রিসংস্কৃতি ঘেরা প্লাজায় ।’ একটু এগিয়ে গিয়ে সবুজ পার্কের গায়ে একটি ছোট্ট কাফেতে ঢুকলাম । আমরা নিলাম টাটকা ফলের রস, সালভাতর কোয়েসাদিল্লা-চিজে মোড়া তরতিলা রুটি আর অগুয়া দ্য জামাইকা-জবা ফুলের রসে তৈরি এক গ্লাস কড়া পানীয় নিয়ে চুপচাপ খেতে খেতে অন্যমনস্ক বসে রইল । এরপর আমাদের অনুরোধে নিয়ে গেলে প্রত্নতত্ব মিউজিয়ামের কাছে অ্যাভেনিউ দ্য মহাত্মা গান্ধী নামের রাস্তায় । ডান্ডি অভিযানের দাঁড়ানো মূর্তিটি কাজ করা রেলিঙে ঘেরা । পিছনে সবুজ গাছের ছায়া পড়েছে তাঁর শরীরে । প্লাজার ক্ষুব্ধ ইতিহাস থেকে একেবারে অন্যরকম । গর্ব বোধ হচ্ছিল এই বিদেশে তাঁকে এমন সম্মানিত করে রাখা হয়েছে দেখে । সালভাতর জানাল, এখানে গান্ধীজিকে একজন সন্ত বলে মনে করা হয় । রাস্তাটি চওড়া ও বেশ দূর পর্যন্ত চলে গেছে ।

এখন শহর কেটে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে Teotihuacàn পিরামিড শহর লক্ষ্য করে গাড়ি ছুটছে । চোখের সামনে দেখছি পথ আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে । সামনে পাহাড় গাছপালায় সবুজ । পথের দুধারে গাছের সারি, লাল টুকটুকে চেরী ফলের মতো ফল ঝুলছে । পিরুল গাছ । আরবল দেল পেরু । পেরু থেকে এসেছিল কবে কে জানে । বাতাসে ঝিরঝির করে মাথা দোলাচ্ছে সবুজ ডালপাতা, পাখির মেলা, এ ফল ওদের খাবার । রোদ চড়া । আমরা পিরামিডের কাছে এসে গেছি । থামলাম ক্যাকটাসের মতো দেখতে উঁচু গাছের সারির কাছে । Pulque পানীয় তৈরি হয় এই Maguey গাছের রস থেকে । সালভাতর গাছের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, পাশের কিউরিও শপের থেকে ছোট ছোট গ্লাসে দিয়ে গেল । ফেনিল দুধ সাদা সামান্য টক স্বাদের এই পানীয় আমার মোটেও ভালো লাগল না । পুরুষ সঙ্গীরা ভালোই সদ্ব্যবহার করলেন । ‘আগুয়া মিল-হনি ওয়াটার’, সালভাতর এক চুমুকে তৃতীয় গ্লাস শেষ করে বলে উঠল । প্রতিটি গাছ থেকে দু লিটার পানীয় তৈরি হয় । এ দেশের শঁপাইন নাকি । প্রচুর ভিটামিন আছে, পান করলে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, একপাটি নকল দাঁতে হেসে উঠল বৃদ্ধ । গাছ মরে গেলে তার থেকে তৈরি হয় সুতো । বোনা হয় কার্পেট, পঞ্চো-আগের দিনে কচি পাতা থেকে তৈরি হত কাগজ, মণ্ড থেকে সাবান । শুকনো কাঠি থেকে ছুঁচও ।

এরপর গাড়ি ঘুরিয়ে পিরামিডের দিকে যাত্রা । দিয়েগোর হাতে স্টিয়ারিং । সালভাতরের হাতে ছোট বোতলে কয়েকটি পোকা কিলবিল করছে । ম্যাগুয়ে গাছের পোকা নাকি এদেশে ডেলিকেসি । কী করে খাবে? প্রশ্ন করতে বলল, আরে টাকো শেলের ওপর ছড়িয়ে উনুনে সামান্য রোস্ট করে নেওয়া । টাকো এদের ডোঙার মতো রুটি । এ পোকার দাম মহার্ঘ্য । কত রকম খাদ্য যে পৃথিবীতে আছে! গাড়ি ছুটছে । পৌঁছলাম পিরামিডের কাছে । যা দূর থেকে পাথরের ঢিবির মতো লাগছিল দেখি প্রান্তর জুড়ে

পাথরের বিশাল গম্বুজের মতো প্রাসাদ, ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে । রাস্তার দুধারে প্রাচীন যুগের প্রাচীরের ভগ্ন টুকরো পড়ে আছে । সালভাতর কথা বলতে বলতে আমাদের নিয়ে চলেছে পুরনো অলিন্দের মধ্য দিয়ে ভাঙা মন্দিরের অভ্যন্তরে । সেখানে দেওয়ালের গায়ে প্রায় মুছে যাওয়া লাল রঙের নদীর স্রোত সর্পিল গতিতে আঁকা, মাঝে মাঝে আবছা নীল । প্রাঙ্গণ ঘিরে স্তম্ভ, তার গায়ে কী সূক্ষ্ম কাজ! দীর্ঘ চঞ্চু পাখি, মুখোশ, পুজোর বাসন ঘট গাছের ডাল নানা আজব জীবজন্তু খোদাই করা । সূর্যদেবের মুখ সূর্যমন্দিরে । Teotihuàcan শব্দের মানে এমন স্থান যেখানে মানুষ হয়ে ওঠে দেবতা । প্রায় চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই প্রাচীন আশ্চর্য শহর তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব একশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে । এক বিশাল সভ্যতার জন্ম । হাজার বছর ধরে তার প্রভাব পুরো মধ্য আমেরিকার শিল্প সংস্কৃতিতে পড়েছে । তিয়োতিহুআকান শহরকে ঘিরে ওঠা এই সভ্যতার নাগরিক সংখ্যা ছিল দশ লক্ষের ওপর । প্রাচীন দিনের অন্যতম বিশাল নগর । সাজানো সুকল্পিত শহর গড়ে উঠেছিল প্রায় দুহাজার শিল্প সম্ভারের সৃষ্টিকাজে । চাষীরা থাকত কাঠের বাড়িতে শহরের উপকণ্ঠে, বনে । নাগরিকেরা পাথরের শিল্প সুষমা সমৃদ্ধ গৃহের আবাসিক ছিল, ছিল মাটির নিচে বয়ে যাওয়া জল পরিসরণের নালি যার ধ্বংসাবশেষ দেখে এখনও অবাক হয়ে যায় আজকের মানুষ সেই যুগের আধুনিকতার পরিচয়ে । অবাক হয়েছি দেওয়ালে আঁকা ছবির শিল্প সুষমায়, পাথরের মূর্তির অভিব্যক্তিতে আর এক সময়ের সৃষ্টি সমৃদ্ধ সভ্যতার ভেঙে পড়া নির্জন সৌন্দর্যে । তিয়োতিহুআকানদের পরিচয় আজ কোনও একটি অলঙ্কৃত স্তম্ভে, প্রাচীর চিত্রে, পিরামিডের গায়ে লেখায় ফোটা । খুব বেশি তথ্য এদের সম্বন্ধে পাওয়া যায়নি । এখানে যারা বাস করত কী নাম ছিল তাদের, নগরের নামই বা কী ছিল জানা যায়নি । তিয়োতিহুআকান নামটিও তো সাতশো বছর পরের সভ্যতার মানুষ আজটেকদের দেওয়া । এই পবিত্র রহস্যময় ভগ্নস্তূপে তারা আসত তীর্থযাত্রায় । সূর্য ও চন্দ্র পিরামিডের নামও আজটেকদের দেওয়া । Quetzalcoatl মন্দিরের ডানা মেলা দেবতা নাগ ও পাখির সমন্বয়ে গড়া সবুজ মূর্তি প্রাচীনকালে এ দেশের ধর্ম বিশ্বাসকে জানাতে চায়, এক দ্বৈত জগতের প্রতীক, স্বর্গ মর্ত, বাতাস জল, জন্ম মৃত্যু, আলো অন্ধকার-এক সুতোয় বাঁধা এ বিশ্বাসে । মন্দিরের সিঁড়িগুলির ধাপে ধাপে ব্যাদিত মুখ সর্পদেবতাদের মূর্তি । মুখের দুপাশে কী ভয়ঙ্কর দাঁত । গা শিউরে ওঠে । আরেক মন্দিরে জলের সিংহাসনে বসা মাতৃদেবীর মতো মূর্তিকে ঘিরে উঠেছে পাথরের লতাপাতা, তাঁর মাথার মুকুটে স্বর্গের পাখির রাজকীয় পালক । গুহা, ঝরনা, দৈববাণী গৃহ, উর্বর মাতৃভূমি, 'রিভিয়া করিম্বোসার' লতা যা খেলে দেখতে পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ, এ সবই মধ্য আমেরিকার প্রথমতম শহরের মূল মন্ত্র ছিল । মন্দির থেকে বেরোতেই দেখি দূরে উঁচুতে পিরামিডেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । অনেক নিচে রোদে ধোয়া প্রাঙ্গণ থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছে । করুণ অচেনা সুর আমাদের ছুঁয়ে গেল ।

পুরনো দিনের পোশাকে সাজা আজটেক বংশধরেরা নানা পণ্য দ্রব্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'আনদালে সিনিওরা, আনদালে', এই যে ম্যাডাম আসুন, অন্তত একটু তাকান, না হয় নাই কিনলেন, দেখতে দোষ কী!' এ সব কথায় চিঁড়ে তো ভেজেই। একটি পাথরের মূর্তি কিনলাম। ছিদ্রে ফুঁ দিতে আশ্চর্য সুর বেজে উঠল। আরও কিছু কেনাকাটা হল, চন্দ্র সূর্য দেবতার মূর্তি, ফসলের দেবী আরও টুকটাক। চত্বর ধরে হেঁটে চলেছি, দেখছি চাঁদের পিরামিড, সূর্যের পিরামিড, জাগুয়ার প্রাসাদ, প্রজাপতি প্রাসাদ ডানামেলা শঙ্খ দেবতার মন্দির। চত্বরের পাশের রাস্তাটির নাম কালজাদা দ্য লস মুয়েরতস, মৃত্যুপথ; দুধারে নরবলির পাথর সাজানো। ভেতরে সুড়ঙ্গে কবরের সারি। এ জায়গাটির নাম সিউদাদেলা প্লাজা। চাঁদের পিরামিডের ওপরে ওঠা হল। কী উঁচু ধাপ। সেখান থেকে দেখলাম এক স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ, বহু যত্নে গড়া এক নগর শিল্পের টুকরো ছড়ানো ইতিহাস। এ সভ্যতার পতনের বহু শতক পরেও তীর্থযাত্রায় এসেছে আজটেক রাজপরিবার যারা বিশ্বাস করত এখানেই দেবদেবীকুল প্রাণ বিসর্জন দেন আজটেকদের বাসভূমি 'পঞ্চম জগতে' সূর্যদেবতার পরিক্রমণ সূচনায়। এখন ইউনেস্কোর উত্তরাধিকার তালিকায় ভুক্ত এই শিল্প সম্ভার। কাজ চলছে এক প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষার। পুরো শহরে একটা রহস্য জড়ানো। কারা বাস করত এখানে? কী ছিল তাদের রোজের জীবন! কোন দেবতার পায়ে রাখত পুজোর উপচার! সাতশো খ্রিস্টাব্দের পর আর কেন জীবনের কোনও চিহ্ন থাকল না! কোথায় গেল এমন সৃষ্টিশীল মানুষেরা! প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে বলেছেন, এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে শহর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনুমান করা হয় এ আগুনের হোতা বাইরে থেকে আসা বিজয়ী বাহিনী। কারণ যাই হোক না কেন এ নগর আর কোনওদিন ধ্বংসের অগ্নিস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি, এক বিশাল সভ্যতার ছাপ রয়ে গেল শুধু স্বপ্নময় ভগ্নস্তূপে।

একদল ছেলেমেয়ে এসেছে শিক্ষকদের সঙ্গে। আমার কপালের টিপ ওদের কৌতূহল জাগাল। একটি মেয়ের মুখ আমাদের দেশের গাঁয়ের কিশোরী মেয়ের মতো। ওর কপালে পরালাম লাল টুকটুকে টিপ। আমরা এগোলাম মিউজিয়ামের দিকে। সেখানে রাখা প্রত্নতাত্ত্বিক রত্নভাণ্ডার। বিভিন্ন সময়ে পাল্টেছে জীবনধারা, শিল্পকলা। কখনও মাথার মুকুটে, কখনও ভয় জাগানো মুখোশে, অলঙ্কৃত জাগুয়ার, কুমির, বানর, সাপ, চিতার রত্নখচিত মূর্তিতে, অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে মন চলে যায় শতাব্দীর বেড়া পেরিয়ে অনেক দূরে। একটি কাচের প্ল্যাটফর্মের নিচে সাজানো আজকের স্থপতিদের হাতে গড়া পুরনো দিনের সেই অবিশ্বাস্য সুন্দর নগরভূমি মিনিয়েচার সংস্করণে। কী করে এই নদীমাতৃক, মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতা উধাও হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি। এলাম এক বিচিত্র বাগানে যেখানে এখনও দাঁড়ানো প্রাচীন ঝাউ, তাল গাছ, নাম না-জানা মহীরুহের

সারি, ফুটে আছে নাম না-জানা কত ফুল। বেরিয়ে দুধারে দেওয়ালের পাথরের ভগ্নস্তূপের মাঝখান দিয়ে চলেছি। সালভাতর আমাদের যাত্রা শেষে অপেক্ষা করতে বলেছিল এক নম্বর গেটের সাদা বাড়ির সামনে। ওখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছি একটি খোলা আকাশের নিচে বিপণি সংস্থায়। ধুলো উড়ছে, দুধারে হকারেরা বিক্রি করছে পাথরের গয়না, মুখোশ, মূর্তি, খুদে পিরামিড, এক বৃদ্ধা ন্যুব্জ হয়ে হাতের ঝুড়ির পসরা নিয়ে এগিয়ে আসছে, বলিরেখায় কুঞ্চিত মুখ, মনে হল পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরুন। একজোড়া পাথরের দুল কিনলাম। দেখি স্বল্প পসরার মাঝখানে রেখেছে নিজের খাওয়ার জন্য একটি কলা। গাইডরা ঘোরাঘুরি করছে পিরামিড সফরসূচি নেব কিনা, অতদূর দেশ ইন্ডিয়া থেকে এসেছ? এ সব শুনতে শুনতে গেট পেরোতে যাব হঠাৎ টুলে বসা ছেলেটি বলে উঠল 'টিকিট, টিকিট কোথায়?' আরে কিসের টিকিট! আমরা তো রাস্তা খুঁজতে ভেতরে ঢুকেছি। বাইরে কিছু লেখা ছিল না তো! ছেলেটি নাছোড়বান্দা। চড়া রোদে আমাদেরও মেজাজ খারাপ। দেব না কিছুতেই টিকিট বলে হনহন করে এগিয়ে গেলাম। দুধারে সেই প্রাচীন ভগ্নস্তূপের দেওয়াল। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং সাইকেলের ঘণ্টি। দেখি একটি কমবয়সী পুলিশ দাঁড়িয়ে, 'তোমরা গেটে টিকিট দাওনি!' আবার বোঝাই কেন দিই নি। না দিতেই হবে। তর্কাতর্কি চলছে। একদল ইংরিজিভাষী মেক্সিকো নাগরিক যাচ্ছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছে সব শুনে ব্যাপারটা ওকে বোঝালেন। তখন পুলিশের মাথা ঠান্ডা। রাস্তার এক নম্বর গেটের রাস্তার হদিশ দেখাতে সাইকেল করে সঙ্গে এল। প্রশ্ন করল কোথা থেকে আসা হল, ইন্ডিয়া? কোন শহর, কালকুতা! তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে নিজের পথে ফিরে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল ওর সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি। এদিকে আমরা হেঁটে চলেছি পরম লক্ষ্যের দিকে। গরম প্রচণ্ড। অনন্ত রাস্তা, সামনে পাহাড়। কোথায় সাদা বাড়ির সাদা জানলা! তখন রাগ হচ্ছে সালভাতরের ওপরে, আজটেকদের ওপরে, পুরো দেশটার ওপরে। হাঁপাতে হাঁপাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখি সাদা বাড়ির বারান্দায় থামের নিচে ছায়ায় সালভাতর ঘুম দিচ্ছে আরামে। বকব কি, মায়া লাগল দেখে। একে একে এল লেনা, দেরি করে হান।

দিয়েগো গাড়ি ঘুরিয়ে চলল রেস্তোরাঁর দিকে। পাহাড়, ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর সাজানো খাবার জায়গা। সামনে আজটেক যোদ্ধার সাজে দুই কিশোর অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়ানো। ভেতরে দেখি মেক্সিকান টুপি পরা দুজন বয়স্ক মানুষ মারিম্বা, জলতরঙ্গের মতো দেখতে যন্ত্রে বাজাচ্ছে উচ্ছল সুর, কয়েকজন অতিথি জোড়ায় জোড়ায় নাচছেন তার তালে তালে। টেবিলভর্তি খাবার। নেপালে-ক্যাকটাসের কচি পাতার স্যালাড, গুয়াকোমালে-চটকানো আভোকাডো পিঁয়াজ আর কুচোনো টম্যাটো দেওয়া, তরতিয়া ফ্রিতা-ভাজা রুটি, তামাল দ্য দুলসে ডি পিন-ভুট্টার পাতায় মোড়া ভুট্টা সেদ্ধ, বিনস আর মাংসের

কাবাব, আরস-ভাত, পইও আ লা মেক্সিকানা-মুরগির ঝালঝাল কারি, ফল পায়েসও রেখেছে দেখছি। চিলাকুয়েলেস, গরদিতা চিজ আর ক্রিমে মুখরোচক, মধু আর দুধে সেদ্ধ চটকানো কলা, কলাপাতায় মুড়ে ভাপানো। খেতে সুস্বাদু যদি ক্যালোরির ভয় না থাকে। খাওয়ার মাঝখানে ওই আজটেক পোশাক পরা ছেলে দুটি মার্শাল নাচ শুরু করেছে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য। ওয়েটাররা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। 'ভ্রমণ' পত্রিকার জন্য খাবারের নামগুলি আমার দরকার জানাতে ওরা সহাস্যে এগিয়ে এল। অন্য দেশের পয়সা আছে? বিলি করা হল। এবার বিদায়।

ফেরার পথে আমরা থামলাম আবার জোকালোর উত্তরে বাসিলিকা অব আওয়ার লেডি অব গুয়াদালুপে মন্দিরে। মেক্সিকোর রক্ষাকর্ত্রী দেবী, এক অগাধ দেশপ্রেম আর ধর্মীয় বিশ্বাসের মিলনের প্রতীক তিনি। বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে ছটি মন্দির ও গির্জা। কাহিনী আছে কুমারী মা মেরি এখানে আবির্ভূতা হন। ১৫৩১ সালে ৯ ডিসেম্বর। এক শীতের রাতে গ্রামের ভক্ত চাষী আমেরি ইন্ডিয়ান হুয়ান দিয়েগো গির্জায় যাওয়ার পথে দর্শন পেলেন এক আশ্চর্য দেবীর যাঁর গায়ের রং বাদামি, মাথায় এক রাশ ঘন কালো চুল। পাঁচবার দর্শন দিয়েছেন তিনি। আর্তের ত্রাণকর্ত্রী মা মেরি আদেশ দিলেন এখানে পাহাড়ে গড়ে উঠুক এক ধর্মমন্দির। দিয়েগোর কথায় কান দিলেন না ধর্মযাজকেরা। তাঁদের বিশ্বাস জাগাতে দেবীর আদেশে ক্যাকটাসের বনে আশ্চর্য গোলাপ ফোটালেন দিয়েগো-গোলাপগুচ্ছ হাতে দাঁড়ালেন যাজকদের সামনে-কোথায় গোলাপ! শুধু দিয়েগোর ক্লোকের ভেতরে ফুটে উঠল কুমারী মাতার ছবি। সেই ক্লোক রাখা এখন মন্দিরের বেদীতে। সেখানে আছেন সেই আশ্চর্য দেবীমূর্তি যাঁর গায়ের রং ঈষৎ বাদামি, এ দেশের আদি মানুষের মতোই। ১৫৩৩ সালে তৈরি পুরনো ক্যাথিড্রাল নিচে ডুবছে ধীরে ধীরে মাটির তলায় বয়ে যাওয়া জলধারার কবলে পড়ে মেক্সিকোর বহু প্রাসাদের মতো। তাই ১৯৭৬ সালে এ দেশের নামকরা স্থপতি পেড্রো রামিরেজ ভাস্কেজের ডিজাইনে এই নতুন গির্জা। কী আধুনিক। কী বিশাল! বৈদ্যুতিক সিঁড়ি বেয়ে আমরা একেবারে প্রার্থনা মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। তখন চলছে প্রধান যাজকের প্রার্থনা ও গান। শত শত লোক গলা মেলাচ্ছেন সেই গানে। এক আশ্চর্য অনুভূতি হয় বইকি। রঙিন কাচের জানলায় আঁকা নানা ধর্মীয় ছবি। মার্বেলের অলঙ্কৃত সিঁড়ি উঠে গেছে দুধারে, ঐশ্বর্যের সম্ভারে সাজানো চারদিক। বাইরে খোলা চত্বরে চলছে আরেক আশ্চর্য প্রার্থনা। নাচছে আজটেকের বংশধর ইন্ডিয়ানরা। ঢাকের আওয়াজ দ্রুত থেকে দ্রুততর, বাঁশির সুর, শঙ্খধ্বনি, ধোঁয়া উঠছে হাতের ধুনুচি থেকে, মাথায় পাখির পালক, পুঁতির মালা, রঙিন সাজে সেজে নাচছে ঝুমঝুমি বাজিয়ে গোল হয়ে পুরুষ ও মেয়েরা, এই ওদের প্রার্থনা। ওই গির্জার ভেতরে যে প্রার্থনা সঙ্গীত চলছে তা কি এদের ঐতিহ্যকে ছুঁতে পারছে না, তাই বাইরের খোলা আকাশের নিচে প্রাঙ্গণে ওদের এই আশ্চর্য

প্রার্থনা নাচ ও গান! একটি আমেরি-ইন্ডিয়ান মেয়ের হাতে ধুনুচি থেকে ধূপের ধোঁয়া হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে । সারি দিয়ে মানুষজন দাঁড়িয়ে, ওই পবিত্র ধোঁয়ার আধিব্যাধি দূর হবে এই আশায় । আমিও দাঁড়ালাম । আমার হাত ধরে সে নাচের গোল আসরে নিয়ে গেল, অচেনা ভাষায় গাইছে শ্লোক, ধুনুচি ঘুরিয়ে আমাকে যেন আরতি করছে সে কোন আরোগ্য বিধানে কে জানে । একটু দূরে কৃষ্ণকেশী বাদামি রঙের দেবীমূর্তি উঠোনে বেদীতে রাখা, ফুলের মালায় সাজানো ওদের মতোই দেখতে, গির্জার বেদীর দূরত্বে নয়, একেবারে ওদের বুকের কাছে । একদল বিশ্বাসী হাঁটু ছেঁচড়ে গণ্ডি টেনে চলেছে বেদীর দিকে । এ দেশে শতকরা নব্বই জন রোমান ক্যাথলিক । ১৫১৯-২১ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ী স্প্যানিশ বাহিনী ধ্বংস করেছিল এ দেশের তিন হাজারেরও বেশি বছরের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম, বিশ্বাস, জীবন । প্রোথিত হল নতুন ধর্ম । জোর করে চাপানো হল পুরনো অধিবাসীদের ওপর । অনেক রক্ত ঝরেছে । ইতিহাস তার সাক্ষ্য রেখেছে । আজকের মেক্সিকানরা স্বদেশী ও ইউরোপিয়ান রক্তে মিশে Mestizo, দুই সংস্কৃতি এক ধারায় বইছে । তবু থেকে যায় ধূপের ধোঁয়ার মতো প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, আচার বিচার । Nuestra Senora de Guadalupe বাদামি রঙের কুমারী মেরি যেন দুই বিশ্বাসকে বাঁধলেন এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে । নতুন ধর্ম আর পুরনো আত্মিক বিশ্বাসের মাঝখানে এক ঐক্যের সেতুবন্ধন । মিশ্রিত সমাজে তিনি ঐক্যবদ্ধ প্রতীক । গোটা দেশের রক্ষাকর্ত্রী, ঘন নীল ক্লোকে আবৃত মূর্তি সর্বব্যাপিনী, তাঁর নাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক ভাষণে, সাহিত্যে সবখানে উচ্চারিত । দেবী দর্শন দিয়েছিলেন বলেই যেন সম্ভব হয়েছিল প্রাচীন মানুষের নতুন ধর্মকে গ্রহণ করায় । এখন আমাকে ঘিরে আমেরি ইন্ডিয়ান মেয়েটি ধূপের ধোঁয়ায় গান গেয়ে যে নাচ নেচে চলেছে সে তো এ যুগের নয়, যেন কোনও প্রাচীন অতীত থেকে উৎসারিত তার মন্ত্র উচ্চারণ, যখন সবকিছুর মধ্যেই বিচ্ছুরিত হত এক আদিম ধর্মবিশ্বাস, গাছ, নদী, লতাগুল্ম, উদ্ভিদ, বাতাস, সূর্য, চাঁদ, বৃষ্টি, পশু, পাখি সবার মধ্যেই ঈশ্বরের মুখ । রোদ বেশ চড়া । ধূপের ধোঁয়ায় আরও গরম লাগছে । চারদিকে ভিড় । সব মিলিয়ে ঘোরের মধ্যে আছি মনে হচ্ছে । পুরনো জগতের বিশ্বাস অবচেতনে ভেসে উঠছে, যাদু, মায়াজাল, ম্যাজিক! আমাকে ঘিরে নাচছে প্রাচীন দিনের রঙিন পোশাকে কারা! অচেনা ভাষায় মন্ত্রগান গাইছে কারা জানি না । এরাই কি সেই আজটেক সময়ের ব্রুহো-ওঝা পুরোহিত! কুরান্দেরো-ওঝা চিকিৎসক! নাকাওয়ে ফসলের দেবীর মন্দিরে ভুট্টা উৎসব চলছে যেন, আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে শামুলা, চিয়াপাস টলটেক টিকালো টোটোনাকস, পিউরেপেচা, ওটোমি হুইছল, জাপোটেক আজটেক মায়া যুগের হারিয়ে যাওয়া মানুষের আত্মারা । হঠাৎ থামল ঢাকের দ্রিমিদ্রিমি, বাঁশির ফুঁ, শঙ্খধ্বনি-চোখ খুলে দেখি পূজারিণীর হাত পাতা অঞ্জলির মতো আমার সামনে-পুজোর দক্ষিণা কয়েকটি পেসো নম্র হাতে দিতেও কুণ্ঠা লাগছিল । ততক্ষণে আমার জায়গায় দাঁড়িয়েছে আরেক অপেক্ষমাণ ট্যুরিস্ট ।

তাকে ঘিরে শুরু হবে বৃত্তাকারে অনুষ্ঠান ব্রতনৃত্য। আমাদের ফেরার পালা। নানা পসরা সাজানো দুধারে যে কোনও তীর্থস্থানের মতোই, কুমারী মাতার ছবি, জপের মালা, অশুভ আত্মা তাড়ানোর কবজ মাদুলি, জড়িবুটি, পোপ জঁ পলের চাবির রিং গলিয়ে তৈরি বিশাল মূর্তি পেরিয়ে ফিরে চলেছি চেনা জগতের দিকে। সিঁড়ি ভেঙে উঠছি, গাড়ির দিকে এগবো, দূর থেকে বাঁশি আর শঙ্খধ্বনি অস্পষ্ট ভেসে এল, গির্জার চূড়া তখন বেলাশেষের সূর্যের আলো পড়ে ঝকমক করছে।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

আকাশচূড়ায় অভিযান

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

সারারাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর মেঘলা সকাল হল ধারাখড়কে, উচ্চতা ১৫,০০০ ফুট । স্লিপিং ব্যাগ গুটোতে না গুটোতেই গরম কালো কফির মগ হাতে তাঁবুতে ঢোকে বলবীর । গতকালই আমরা পেরিয়ে এসেছি ভুইন্দার গিরিপথ, যার উচ্চতা ১৬,৭০০ ফুট । অমৃতগঙ্গা উপত্যকার গামসালি গ্রাম থেকে চলা শুরু করে, তৃতীয়দিনে গিরিপথ পেরিয়ে, গতকাল পৌঁছে গেছি ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স-এর এই অন্তিম প্রান্তে । ঠিক এমন করেই ১৯৩১-এর ৯ জুলাই ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের কামেট বিজয়ী দল প্রবেশ করেছিল এই অপূর্ব উপত্যকায় । ফুলের উপত্যকার স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্মাইথ সাহেব নাম দিয়েছিলেন ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স । ভিজে তাঁবু গুটিয়ে হাঁটা শুরু হল । টিপরা হিমবাহের বিপজ্জনক মোরেনের রাজত্ব শেষ করে এক সময় আমরা পৌঁছলাম সবুজ ভুইন্দার উপত্যকার কোলে । অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে আমাদের লক্ষ্য স্কাই পিক ।

১৯৭৮ সালে স্যার এডমন্ড হিলারির নেতৃত্বে ভারত-নিউজিল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত অভিযানের নাম ছিল 'সাগর থেকে আকাশ' (OCEAN TO SKY)/ হলদিয়া থেকে জেটবোটে যাত্রা শুরু করে গঙ্গানদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়াই ছিল সেই অভিযানের প্রথম পর্ব । নদীপথে অভিযানের এই পর্বটি বাধা পায় কর্ণপ্রয়াগের কিছু পরে অলকানন্দার নদীপ্রপাতে । তখন অভিযাত্রীদল নৌকা ছেড়ে গাড়িতে করে প্রথমে আসেন গোবিন্দঘাট । সেখান থেকে হাঁটাপথে পবিত্র তীর্থ হেমকুণ্ড এবং ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স দেখে আবার চলে আসেন বদ্রীনাথ । এখানে হিলারির লক্ষ্য ছিল নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের (৬,৫৯৫ মিটার) উত্তর-পূর্ব গিরিশিরার পড়শী নারায়ণ শৃঙ্গ আরোহণ । কিন্তু নারায়ণ পর্বতে উঠতে তাঁরা ব্যর্থ হন । এবার হিলারির চোখ পড়ে নারায়ণ পর্বতের ঠিক উল্টোদিকের নরপর্বতে । নরপর্বত আরোহণ করতেও তাঁরা ব্যর্থ হন । ইতিমধ্যে স্যার হিলারি আক্রান্ত হন পালমোনারি ইডিমায় । হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেরিলির সামরিক হাসপাতালে । ২৭ অক্টোবর, ১৯৭৮ পিটার হিলারি, গ্রেম ডিংগল এবং মারে জোনস আরোহণ করেন ১৯,২০০ ফুট উচ্চতার একটি অনামা শৃঙ্গে । সুদূর গঙ্গাসাগর থেকে জেটবোটে বয়ে আনা গঙ্গাজল ঢেলে দেন সেই শৃঙ্গের শীর্ষে । যেহেতু

তাঁদের ঐতিহাসিক অভিযানের নাম ছিল সাগর থেকে আকাশ-তাই অনামা শিখরটির নামকরণ হয় স্কাই ।

৪ জুন, ২০০১ । বলবীর বুরকেল এবং আমি পৌঁছলাম বদ্রীনাথ । বদ্রীনাথের উচ্চতা প্রায় ১০,২০০ ফুট । পূর্ব পরিকল্পনামাফিক, দেখা হয়ে গেল অভিযানের বাকি চার সদস্যের সঙ্গে । কলকাতা থেকে ৩১ মে যাত্রা শুরু করে ওরা গতকালই পৌঁছে গেছে এখানে । বদ্রীনাথের বিশাল উপত্যকা, অলকানন্দার গর্জন আর নীলকণ্ঠের অপার্থিব ঝলক দর্শনে সময় কেটে গেল । পরদিনটি পূর্ব পরিকল্পনামাফিক ছিল সমীক্ষা বা রেকি-র দিন । দলের বয়োজ্যেষ্ঠ আকাশদা, বলবীর, আব্বাস এবং আমি বেরোলাম মানচিত্র, কম্পাস এবং দূরবীন যন্ত্রে সজ্জিত হয়ে । দিগন্ত এবং সুব্রত ব্যস্ত হয়ে পড়ল শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ।

মানচিত্র অনুযায়ী, বদ্রীনাথ শহরের ঠিক পূর্বদিকের খাড়া পাহাড়টার মাথা টপকাতে পারলেই পাওয়া যাবে কুবের হিমবাহ । তবুও নিশ্চিত হবার জন্য অনেকটা সময় কাটানো হল মানাগ্রামের মানুষজন এবং ভেড়াওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে । হিমালয়ের দুর্গম পথের হদিশ থাকে ভেড়াওয়ালাদের কাছেই ।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বদ্রীনাথের ঠিক পূর্বদিকের পাহাড়টার ঘাসের ঢাল বেয়ে ওঠা হবে । খোঁজা হবে কুবের হিমবাহে যাবার পথ । মানাগ্রামের বয়স্করা বলেন, কুবের ভাণ্ডার । মার্চা পিতামহেরা বলেন, কুবেরের বিপুল ধনরাশি নাকি ওখানে আছে । ওপথে গেলে কেউ ফেরত আসে না । কিন্তু কুবেরের ধনসম্পদ নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল তার প্রকৃত সম্পদ নরপর্বত এবং স্কাই শৃঙ্গ ।

অলকানন্দা উপত্যকার সমস্ত হিমবাহের ওপর একটি ভূতাত্ত্বিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল 'মাউন্টেনিয়ার্স ইউথ রিং' জার্নালের তৃতীয় সংখ্যায় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই রিপোর্ট থেকেই জানা ছিল কুবেরের অবস্থান ৩০০৪র্৫ অক্ষাংশ এবং ৭৯০৩র্১ দ্রাঘিমাংশে । মূল কুবেরের হিমবাহের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ সাতশো মিটার । হিমবাহটির মুখ অর্থাৎ স্নাউটের উচ্চতা ৪,০০৮ মিটার, অর্থাৎ, তেরো হাজার ফুট । সেই রিপোর্টে আরও বলা ছিল, অসংখ্য চোরা ফাটল বা ক্রিভাসে ঢাকা এই হিমবাহের ঢাল অত্যন্ত খাড়াই এবং হিমবাহ পথে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ হবে খুবই দুরূহ ।

এইভাবেই একটি ভূতাত্ত্বিক রিপোর্ট, কয়েকজন ভেড়াওয়ালার মতামত এবং একটি কনট্যুর মানচিত্রের ফটোকপির ভিত্তিতে আমরা অভিযান শুরু করলাম ।

৬ জুন, ২০০১। বদ্রীনাথের বাজারে আলুর পরোটা খেয়ে আমাদের ট্রেক শুরু হল। মানাগ্রাম যাবার চওড়া পিচের রাস্তা ছেড়ে আমাদের দল উঠতে শুরু করল ঘাসে ঢাকা খাড়া ঢাল বেয়ে। ইন্দো-টিবেট সীমান্ত পুলিশের একদল জওয়ান প্যারেডের ফাঁকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমাদের। পথ বলতে কিছুই নেই। দুহাতে ঘাসের গোছা ধরে, ঘাসের গোড়ায় পা রেখে উঠে চলা। পথ এতটাই খাড়াই যে দুদণ্ড বসে হাঁফ ছাড়াও যায় না। ঘাসের ঢালের মাঝে বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়াল। সেই বিপজ্জনক আলগা পাথুরে এলাকার পরই কিছুটা সমতল। একে একে সবাই পৌঁছে যাই সেই আপাত সমতল ঘাসের জমিতে। ভেড়াওয়ালাদের তৈরি ছোট্ট মন্দির। হাজার ফুটেরও বেশি নিচে দেখি অলকানন্দার রুপোলি স্রোত আর তার পাশে বদ্রীনাথ যেন এক খেলনা শহর।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার উঠে চলা। একের পর এক বিপজ্জনক ঘাসের ঢাল। পাঁচ ঘণ্টা চড়াইয়ের সঙ্গে দারুণ লড়াইয়ের পর আমরা পৌঁছলাম ভেড়াওয়ালাদের রাত কাটাবার এক স্থানে। গাড়োয়ালে এই ধরনের আস্তানাকে বলা হয় খড়ক। এই অদ্ভুত সুন্দর, সবুজ খড়কে বসল আমাদের প্রথম শিবির বা অন্তর্বর্তী শিবির। উচ্চতা ১৩,০০০ ফুট। বদ্রীনাথ থেকে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে তিনজন মালবাহক-রমেশ, সুখদীপ এবং অশোক। ওরা যাবে মূল শিবির পর্যন্ত। চারদিকে রুক্ষ, হলুদ ঘাসের ঢালের মধ্যে একচিলতে সবুজ সমতল। তাতেই পড়েছে আমাদের তিনটি তাঁবু। দলের ওষুধের ভাণ্ডার দিগন্তর কাছে। বলবীর তার নাম দিয়ে ফেলেছে 'ডাক্তার সাব'। তাকে ঘিরে মালবাহকদের 'শিরদর্দের গোলি' নেওয়ার জটলা। রান্নাঘরের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে আকাশদা। আকাশদার হাতে হাতে নানা কাজের জোগানে ব্যস্ত সুব্রত। বলবীর এবং আমি বেরোলাম আগামীকালের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে।

পাহাড় টপকে সূর্যের আলোর আমাদের শিবিরে পৌঁছনোর অনেক আগেই হাঁটা শুরু। যতই ওপরে উঠছি ঘাস কমে আসছে। এখন কেবলই পাথর আর পাথর। মাঝে মাঝে পেরোতে হচ্ছে ঝরনা। এই জলধারাগুলি সবই আসছে কুবের হিমবাহ থেকে। এক জায়গায় থমকে দাঁড়াতেই হয়। ঝরনার ওপর জমে আছে বিশাল বরফের ঢাল। সময় নষ্ট না করে শুরু হয়ে গেল বরফের গায়ে আইস অ্যাক্সের সাহায্যে ধাপ কাটা। এই ঢালে উঠতে হবে প্রায় ত্রিশ ফুট। তারপর আড়াআড়িভাবে ট্রাভার্স করে পৌঁছনো যাবে বরফহীন গিরিশিরায়।

বরফের ঢালের সেই খাড়া অংশে বরফকুঠার গেঁথে দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। বিপজ্জনক সেই ঢালে সাবলীলভাবে উঠে এল সাতান্ন বছরের আকাশদা। এরপর আরও

ঘণ্টাদুয়েক পথ চলার পর দেখা পাওয়া গেল কুবের হিমবাহের হিমপ্রপাতের । একটা বিশাল জলপ্রপাত যেন বিধাতার অঙ্গুলীহেলনে তুষারীভূত হয়েছে । হিমপ্রপাতের দক্ষিণ-পশ্চিমে, নিরাপদ দূরত্বে মূল শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল । আব্বাস এবং দিগন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল তুষার আরোহণের সাজসরঞ্জামগুলোর শেষমুহূর্তের পরীক্ষা নিরীক্ষায় । মানচিত্র এবং কম্পাসের সাহায্যে আমি বুঝে নিতে চাইলাম নিজেদের অবস্থান । ঈগলের চোখে যেন দেখতে পেলাম তিব্বত সীমান্তের মানা গিরিপথের দিক থেকে আসা সরস্বতী নদীর উপত্যকা আর অলকানন্দার হঠাৎ বাঁক নেওয়া ভগীরথ খড়ক হিমবাহের দিকে । তার পাশেই ভগ্ন হিমবাহের অনামা শিখরগুলি । তার ঠিক পশ্চিমেই ধ্যানমগ্ন নীলকণ্ঠ । উর্বশী আর নারায়ণ যেন তার আজানুলম্বিত দুই বাহু । আমাদের সম্মোহিত চোখে নীলকণ্ঠ তখন যেন দেবাদিদেব স্বয়ং । অস্তগামী সূর্য তার সিঁদুররং নীলকণ্ঠে মাখিয়ে বিদায় নিল । উত্তরে সরস্বতী উপত্যকার দিক থেকে দমকা হিমেল হাওয়া আমাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তাঁবুতে । এখানকার উচ্চতা ১৫,৫০০ ফুট ।

পরদিন, বলবীর, আব্বাস এবং আমি রওনা হলাম বেসক্যাম্প পিছনে ফেলে । আজ থেকে আমাদের পায়ে সর্বক্ষণের জন্য ক্লাইম্বিং বুট-কোফলা । বরফের দেওয়াল আর মাঝে মাঝেই পাথরের দেওয়াল । পর্বতারোহণের পরিভাষায় রক ব্যান্ড । ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় চলল শৈলারোহণ । হাতের আইস অ্যাক্স সেখানে বোঝা । চারটি রক ব্যান্ড পার হয়ে মুখোমুখি হলাম একটি খাড়া বরফের দেওয়ালের । বুটের তলায় লাগানো হল ক্র্যাম্পন । শুরু হল এক রোমাঞ্চকর তুষার আরোহণ । হিমপ্রপাতের বিশাল চোরা ফাটলগুলোকে বাঁদিকে রেখে আমরা সোজা উঠতে লাগলাম ওপরের তুষারক্ষেত্রের লক্ষ্যে ।

ঘণ্টাচারেক দুরূহ আরোহণের পর চড়াইয়ের মাত্রা কমতে শুরু করল । ক্রমেই পৌঁছে গেলাম কুবের হিমবাহের বিশাল তুষার ময়দানের পশ্চিম কোণে । সেদিনের মতো যাত্রার শেষ । কিন্তু বিশ্রাম নয় । আইস অ্যাক্সের সাহায্যে বরফের ঢাল কেটে তৈরি করা হল একফালি সমতল জমি । তার ওপরই লাগল আমাদের ছোট্ট নীল তাঁবু । বেলা বারোটার মধ্যেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল । সারা বিকেল, সারা রাত তুষারপাত চলল ঝিরঝির করে । এখানকার উচ্চতা ১৭,৫০০ ফুট ।

পরদিন সকালে বরফ পড়া থেমে গেছে । কিন্তু ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারদিক । আমরা ঠিক কোথায় আছি এবং কোন দিকে যাব তা বোঝার উপায় নেই । তা সত্বেও আমরা আরোহণ শুরু করি । মানচিত্র অনুযায়ী যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে । সেই আন্দাজেই আমাদের উঠে চলা । একে একে পেরিয়ে আসি তিনটি হাম্প, প্রায় সাতশো ফুট । কিন্তু

কুয়াশা কমার লক্ষণ নেই। শেষে দশ ফুট দূরের বস্তুও দেখা যায় না। বিপজ্জনক তুষার প্রান্তরে পদে পদে থাকতে পারে মরণ ফাটল। তাই অন্ধের মতো মৃত্যুর পথে না এগিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অপেক্ষা করার। একঘণ্টা বসে থাকি সেই তুষার প্রান্তরে, কুয়াশা ফিকে হবার আশায়। কুয়াশা আরও গাঢ় হয়। হতাশ হয়ে ধরি ক্যাম্পে ফেরার পথ। উঠে আসার সময় রেখে আসা পায়ের চিহ্নই আমাদের পথ দেখায়। সারা সকাল আর দুপুর কাটে হতাশা আর অনিশ্চয়তায়। বিকেল সাড়ে তিনটেয় পূর্ব আকাশে দেখা দেয় নীল দিগন্ত। সঙ্গে সঙ্গে বলবীর এবং আমি বেরিয়ে পড়ি সমীক্ষায়। কতক্ষণ আবহাওয়া অনুকূল থাকবে জানা নেই। তাই পথ চলি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে। তিনটি বরফের কুঁজ পেরোতেই দেখি পৌঁছে গেছি কুবের হিমবাহের সেই তুষার মালভূমিতে। আমাদের ঠিক পূর্বদিকে নরপর্বত (১৯,৩০০ ফুট) এবং তারই দক্ষিণ-পশ্চিম গিরিশিরায় স্কাই শৃঙ্গ (১৯,২০০ ফুট)। যার ছবিই শুধু দেখেছি এতদিন।

১০ জুন, ক্র্যাম্পনের শরশয্যায় ক্লাইম্বিং বুট চড়িয়ে ধীর স্থির ছন্দে এগিয়ে চলেছি আমরা তিনটি প্রাণী। প্রতিটি পদক্ষেপই মাপা, যন্ত্রবৎ। ক্ষুরধার গিরিশিরার কার্নিশ ভাঙলেই ডানাভাঙা পাখির মতো আছড়ে পড়ব নয় হাজার ফুট নিচে বদ্রীনাথ উপত্যকায়। তাই একটু বাঁদিক ঘেঁসে প্রায় ষাট ডিগ্রি খাড়াই বরফের ঢালে আড়াআড়িভাবে সাবধানী ট্রাভার্স। তারপরই খাড়া দেওয়াল বেয়ে পৌঁছে গেলাম শৃঙ্গের শীর্ষে। উচ্চতা ১৯,২০০ ফুট। আইস অ্যাক্সকে বরফের দেওয়ালে আমূল গেঁথে দিয়ে তার সঙ্গে আরোহণ দড়ি বেঁধে নিজেদের নিরাপত্তা বাড়াই। পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিগন্ত জুড়ে ঝলমল করছে নন্দাদেবী স্যাঙ্কচুয়ারির বিখ্যাত সব শৃঙ্গ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্যাংবাং, কলঙ্ক, দুনাগিরি, নন্দাদেবী, বেথারতোলি। পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিম আকাশ নীলকণ্ঠ, চৌখাম্বা, বালাকুন, নারায়ণ, সতোপন্থের দখলে। ঠিক উত্তরে দু-তিনটি গিরিশিরার মাথা টপকে উঁকি মারছে কামেট। আর একেবারে ঘাড়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে নরপর্বত। তার পায়ের তলায় ঢেউখেলানো, বিশাল, তুষারপ্রান্তর। অজস্র চোরাগোপ্তা মরণ ফাটলের আঁকিবুঁকি তার গায়ে। ওটাই কুবের হিমবাহের উপরিভাগের তুষার ময়দান বা মালভূমি। আমরা উঠে এসেছি ওই পথেই।

আর বেশিক্ষণ নয়, এবার নামতে হবে। পর্বতারোহণে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে নামার সময়। তাই দ্বিগুণ সাবধানতা অবলম্বন করে তিনজন নামতে থাকলাম সেই ধারালো গিরিশিরার ঢাল বেয়ে। অবশেষে একঘণ্টা ধরে শ্বাসরোধকারী অবরোহণের পর পা পড়ল আপাত সমতলভূমিতে। টানটান উত্তেজনা শেষ হয় এতক্ষণে। আনন্দে, গর্বে আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরি। বেসক্যাম্পে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে আর তর সয় না। স্কাই শিখর। ভারতীয় হিসাবে আমরাই

প্রথম স্কাই শিখর স্পর্শ করলাম । শিখর স্পর্শের পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে চলি এক নম্বর শিবিরের পথে । আবহাওয়া আজ বেশ ভালো । তাই শিবির গুটিয়ে আজই নেমে যাব বেসক্যাম্প ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ২০০২

ভ্রমণের ঝঞ্ঝাট

শঙ্খ ঘোষ

বেড়ানোর সময়ে যদি কোনও ঝঞ্ঝাটই না হল, তাহলে সে বেড়ানোটায় আর সুখ কী! পালামৌ গিয়ে বেতলার জঙ্গলে গাড়ির চাকা একেবারে বিগড়ে গেল যখন, তখনই যেন সেরকম এক সুরম্য ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি হলাম সেবার ।

কয়েকদিন হল এসেছি বেতলায় । দশ-বারো দিন থাকব বলে কিছুরই জন্য কোনও তাড়া নেই । বেতলায় বারো দিন? শুনে কারও কারও মুখে ভেসে ওঠে কৌতুকমাখা বিস্ময় । আরও তো কত বেড়াবার জায়গা আছে পড়ে, কে আর এখানে জমে থাকে এতদিন? অবশ্য এ বিস্ময় আর কতটুকুই বা? দীঘায় একবার ছদিনের দিন স্থানীয় এক দোকানি জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন: 'এ কী কাণ্ড, যাননি এখনও আপনারা? করছেন কী এখানে?' কিছুই যে করছি না, সে কথাটা আর কবুল করা গেল না তাঁকে, প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে ফিরে যাব নিশ্চয় শিগগিরই ।

নইহার নামে বেতলার যে হোটেলটায় আছি, কেবলই তার বদল হয়ে যাচ্ছে বাসিন্দা, স্বভাবতই । কিন্তু, একেবারে বারো না হলেও, দিন সাতেকের জন্য সঙ্গী পাওয়া গেল শৈশবে-যৌবনে-বার্ধক্যে মেলানো ছজনের এক ভরাট পরিবারকে, পিপলাই তাঁদের পদবি । মনসামঙ্গলের বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের পর এই দ্বিতীয়বার বোধহয় শুনলাম ওই নাম ।

পরিবারের যিনি প্রধান, পরম সুভাষী আর সুহাস মানুষ তিনি । বয়স অনেক, শারীরিক অসুবিধাও বেশ প্রবল । কিন্তু অপ্রতিহত তাঁর কৌতূহল, অবাধ তার প্রাণোচ্ছলতা, আর প্রায় কিশোরের মতো অদম্য তাঁর বাঘ দেখবার ইচ্ছে । স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ আর নাতনিদের নিয়ে এসেছেন তিনি এখানে বাঘের আশায় আশায় ।

আছে কি সত্যিই বাঘ, এ জঙ্গলে? আমার স্বরে অবিশ্বাসের ইশারা পেয়ে ক্ষুব্ধ বনরক্ষীরা গর্বিতভাবে জানান যে এই তো কদিন আগেই জঙ্গলসীমানায় এক বাছুর মেরে গেল ওরা । বাঘ যদি নেই তো বাছুরটাকে মারল কে? আর সত্যিও, সরকারিভাবে নোটিস বোর্ডে তো ঝুলছে এই খবর যে আমরা ওখানে পৌঁছবার ঠিক বাইশ দিন আগে এক পর্যটকদল এ জঙ্গলে শেষবার দেখে গেছে বাঘ । বাঘদর্শনের শেষ তারিখটা এইভাবে

সবার সামনে ঘোষিত রাখাই নিয়ম । ওই দলটির নাম মুছে কি তবে আমাদের নামটাও উঠে আসতে পারে না ওখানে?

নাম তুলবার সেই সাধনায়, দিনের পর দিন, আমাদের তৎপরতা চলল জঙ্গলপ্রবেশের । কখনও ভোরবেলায়, কখনও বিকেলে । গাড়ি ছাড়া কিংবা হাতি ছাড়া জঙ্গলে ঢোকা নিষেধ । পায়ে হাঁটা নিষেধ । অন্ধকারে ঘোরা নিষেধ । এইসব নিষেধসূত্র মেনে নিয়ে বনবিভাগের গাড়িতে বা হোটেলের গাড়িতে জঙ্গলের এ মুখ ও মুখ ঘুরে বেড়াই আমরা, কখনও কখনও পরিচালকের নির্দেশে নাটকীয় নৈঃশব্দ্য পালন করি, চকিতে চকিতে ঘাড় ঘোরাই ডাইনে-বাঁয়ে, কিন্তু বাঘের কোনও হাওয়াও মেলে না কোথাও । গাড়ি থমকে দিয়ে গাইড মহোদয় কখনও কখনও সুনিশ্চিতভাবে ধুলোর কোনও চিহ্ন দেখিয়ে বলেন: 'আঃ হা, একটু আগেই চলে গেছে, এই দেখুন পায়ের ছাপ ।' সে যে বাঘেরই পায়ের ছাপ, সেকথা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের বাধিত করেন তিনি, আর অনায়াসে সেটা মেনে নিয়ে আমরাও বাধিত করি তাঁকে । ধোঁয়া থেকে যেমন আগুনের ধারণা হয়, ওরকম অলীক পদচিহ্ন থেকে তেমনই বাঘের ধারণা নিয়ে তুষ্ট থাকি আমরা ।

এইরকমেরই এক ভ্রমণকালে, গাছগাছালির গাঢ় গন্ধে যখন বিভোর আমরা জঙ্গলের গভীরে, হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে যায় গাড়ি । তবে কি বাঘ এল? উৎসুক চোখে ঝুঁকে পড়ি সবাই । কিন্তু না, তেমন কিছু নয় । বিকারহীন ড্রাইভারটি শুধু বলেন, 'টায়ার পাংচার! গাড়ি আর যাবে না ।'

'যাবে না? সে কী কথা? যাবে না কেন? আরেকটা টায়ার লাগিয়ে নিন তবে ।' দলের যুবকসঙ্গীটি বলেন ।

'নেই সঙ্গে ।'

'নেই? স্টেপনি না নিয়েই বার করেছেন গাড়ি? এ রকম কেউ করে কখনও? এখন তাহলে কী করব আমরা?

'হাঁটতে হবে । উপায় তো নেই ।'

'হাঁটতে হবে? জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা না নিষেধ?'

'কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তো আরও নিষেধ ।'

বিতণ্ডায় কোনও ফল নেই বুঝে গাড়ি থেকে নামবারই আয়োজন করি একজন-দুজন । সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করি শুধু: 'বেরোবার পথ এখান থেকে ঠিক কতদূর?'

একটুও না ভেবে ড্রাইভার বলে: 'পাঁচ কিলোমিটার ।'

‘পাঁচ? পাঁচ কিলোমিটার এঁরা হাঁটবেন এই জঙ্গলে? এইসব মহিলা আর শিশু?’

সত্যিই তো, ড্রাইভার আর গাইড ছাড়া আমাদের আটজনের দলে তখন তিনজন মহিলা, দুজন শিশু । পাঁচ কিলোমিটার হাঁটবেন কেমন করে এঁরা?

‘আপনারা কেউ কি গিয়ে অন্য গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন না?’

‘সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার । ততক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হবে না । নিয়ম নেই ।’

‘তাহলে?’

শেষপর্যন্ত এই রফা হয় যে ফাটা টায়ারেই কোনওরকমে টেনে টেনে চলবে গাড়ি, কেবল মহিলা আর শিশুদের নিয়ে । আমরা পুরুষেরা শুধু বীরদর্পে অনুসরণ করব তাকে ।

যাতে একেবারে বিপদে না পড়ি তার জন্য ক্ষীণ একটা আয়োজনও ছিল অবশ্য । পথচলতি পাওয়া গেছে একটা ভাঙা সরু ডাল, সম্ভাব্য বাঘের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার অন্তিম উপায় হিসেবে সেটা যেন অবশ্যই ব্যবহার করি, মহিলারা বারংবার বলে দিলেন সেটা । ভাঙা গাড়ির পিছনে পিছনে ভাঙা ডাল হাতে নিয়ে বনের পথে পথে বেশ খুশিভাবেই চলতে থাকি আমরা । খুশি, কেননা নিষেধ ভাঙা গেছে এতক্ষণে । তবে এও ঠিক, এতদিন মনে হচ্ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য যে বাঘ দেখতে পাচ্ছি না আমরা, আর এবার মনে হল আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদেরও দেখতে পাচ্ছে না বাঘ ।

সত্যের খাতিরে অবশ্য বলতে হয় যে পাঁচ কিলোমিটারই হাঁটতে হয়নি শেষপর্যন্ত । খানিক দূর এগিয়ে দেখি দূরে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি । দাঁড়িয়ে কেন? পারছে না আর যেতে? উৎকণ্ঠা নিয়ে কাছে পৌঁছে দেখি ড্রাইভারের মুখে এক হতাশ নম্রতা । বলেন, ‘উঠুন, উঠে আসুন সকলেই ।’ ওই পর্যন্ত যেতে যেতে মহিলারা না কি তাঁকে বোঝাতে পেরেছেন যে ওঁদের নিয়ে যখন চলতে পারছে গাড়ি, বাকি কজনকে তুলে নিলে এমন আর কী হবে!

একেবারে যে কিছু হল না তা নয় । সবাইকে নিয়ে চলতে চলতে গাড়ির চাকা এবার সমূলে গেল ভেঙে । এমনকী তার কিছুটা গেঁথে গেল মাটির মধ্যে, আমাদের কারও কারও মনে এল একটা কর্ণভাব । এবার আর কোনও বিকল্প নেই, হাঁটতেই হবে সবাইকে ।

তবে, খুব বেশি আর বাকিও নেই । ওই দূরে দেখা যায় বেরোবার পথ । বাঘের রাজত্ব ছেড়ে এখন আমরা হরিণদের দেশে এসে পৌঁছে গেছি প্রায় । নানা বিভঙ্গে শয়ে শয়ে হরিণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন চিত্রিত কোনও সীমানারেখার মতো । ওই অচলতা থেকে চকিতে তারা ভেতরকার একটা দৌড় সংগ্রহ করে নেবে এক্ষুনি ।

গাড়ি নিয়ে পরিক্রমা জঙ্গলের একটা শৌখিন চেহারাই শুধু দেখায় । তার ঠিক ঠিক বুকের মধ্যে পৌঁছতে যদি চাই, হাতিই বরং ভালো-মনে হল আমাদের । বিশেষত, সওয়ার নিয়ে চলতে প্রস্তুত, এমন দুটো শিষ্ট হাতি যখন মজুতই ছিল বনবিভাগের হাতে ।

বুনো হাতি অবশ্য চারদিকেই । ঝকমকে বাদামি তাদের গা, দলবল নিয়ে চলবার সময়ে রাজসিক তাদের পা ফেলা, ভ্রামণিকদের দিকে মাঝে মাঝে তাদের সংশয়ভরা অবজ্ঞাভরা চাহনি । এদের সৌন্দর্যে আমাদের মুগ্ধতা দেখে স্থানীয় লোকেরা খুশি হন না অবশ্য, সাতকাহনে তাঁরা শোনান এদের প্রাত্যহিক উৎপাতের খবর, এদের সঙ্গে এখানকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যুদ্ধের কাহিনী । সে যুদ্ধ আমরাও যে একেবার টের পাইনি তা নয় ।

প্রথম সন্ধ্যাতেই অন্ধকারে ফিরছি যখন হোটেলের দিকে, টর্চ হাতে আমাদের দুজনকে খুঁজতে বেরিয়েছেন উদবেগমুখর রায়মশাই, হোটেলের ম্যানেজার । 'কোথায় চলেছেন?' তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ।

'এই যে, আপনারা! ফিরছেন এত অন্ধকারে, টর্চ ছাড়া বেরিয়েছেন কেন?'

'ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি? চুপচাপ কখন হাতি এসে যাবে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে, টেরও তো পাবেন না ।'

'আসে না কি এরকম?'

'প্রায়ই । জানতেই পাবেন দুয়েকদিনের মধ্যে । হয়তো আজ রাতেও হতে পারে ।'

'ক্ষতি কী, আসেই যদি?'

'বলেন কী? ক্ষতি নেই? মেরে দিতে পারে তো ওরা । এই তো সেদিন সকালবেলায় এখানকার এক বউ বাসন মাজছিল ঘাটে । পিছন থেকে হঠাৎ এসে পা দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে তার মাথা ।'

শুনতে শুনতে আমরা ঢুকে যাই হোটেলে । রায়মশাইকে প্রথমে হয়তো একটু বেশিমাত্রায় সতর্ক আর সন্ত্রস্ত বলে ভাবি । তবে দু-চারদিনের মধ্যে এও বুঝতে পারি যে একেবারে নিষ্কারণ নয় তাঁর উদবেগ । অন্তত রাত্রিবেলার ঘুম যে মাঝে মাঝেই টুটে যায় গ্রামবাসীদের চিৎকারে আর টিনের বাজনায় আর পটকা ফাটানোয় আর মশাল জ্বালানোয়, সে অভিজ্ঞতা তো হলই আমাদের কদিন । ধানের খেত পাহারা দিয়ে বসে থাকে অনেকে, কেননা হাতির লোভ ধানখেতে আর বাঁশঝাড়ে, রাত্রিবেলার অন্ধকারে চুপিসারে চোরের

মতো আনাগোনা তাদের। ঘুম ছেড়ে এক রাতে দৌড়ে এসে দেখি সমস্ত দিকে চলছে দৌড়ঝাঁপ। বহুদূর বৃত্ত করে চারদিকটাকে ঘিরে ফেলেছে সবাই উৎকট শব্দে আর আলোয়, দূরবর্তী ও কোণ থেকে এ কোণে হয়তো কেউ খবর পাঠাচ্ছে যে হাতি এসেছে এই দিকেই। কিন্তু কোথায় হাতি? পাঁচিলের এদিক-ওদিক চেষ্টা করে কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে হতাশ আমরা আশ্রয় নিই ঘুমে। পরদিন ভোরবেলায় ততোধিক হতাশ হয়ে শুনতে পাই যে সে না কি চুপ করে লুকিয়ে ছিল একেবারে আমাদের পাঁচিলটারই গা ঘেঁসে, কুলগাছটার নীচে, লতায় পাতায় অন্ধকারে মিশে।

দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে দেখি, জঙ্গলসীমার ঠিক বাইরেই যে দুয়েকটি ঘর দেখেছিলাম কাল, আজ আর তা নেই। 'আরে, ঘরটার কী হল?' আমার এই প্রশ্ন শুনে বাচ্চা একটি ছেলে খুব সহজভাবেই বলে: 'হাতিতে ভেঙে দিয়েছে কাল।' 'তুমি কোথায় থাক?' 'কাল ছিলাম এইখানে, আজ থাকব ওইখানে'-আঙুল তুলে পাশেরই আরেকটা ঘর দেখিয়ে দেয় সে। 'ওটাও যদি ভেঙে দেয় আজ?' শুনে তাকিয়ে থাকে ছেলেটি। তাহলে যে কী করবে, সেটা তার জানা নেই ঠিক।

দিনেরবেলাতেও ক্রুদ্ধ এক বুনো হাতিকে দূর থেকে দেখেছিলাম সূর্যগ্রহণের দিনে, গ্রহণ শেষ হয়ে যাবার মুখে। বেতলার জঙ্গলে কিছু কিছু জায়গা আছে পাথরস্তূপে উঠে যাওয়া ছোট ছোট পাহাড়চুড়োর মতো। ভোরেরবেলাই অন্ধকার হয়ে গিয়ে আবার যখন আবছামতো দেখা দিচ্ছে আলো, আলো-আঁধারি সন্ধ্যা ভেবে বকের দল সবাই যখন উড়ে এসেছে ডালে, কাছাকাছি সব বসে আছে স্তব্ধ, আকস্মিক ওই অন্ধকারে পশুপাখিদের নিত্যদিনের চলন যখন বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই শোনা গেল এক দূরাগত বৃংহিত। 'বৃংহিত' শব্দটা যে এমনভাবে ব্যবহার্য হতে পারবে তা ভাবিইনি কখনও আগে। হোটেলের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জঙ্গলের সেই চুড়োয় মত্ত এক দাপাদাপি, কোনও এক অজ্ঞাতের বিরুদ্ধে আক্রোশে যেন ভেঙে দিচ্ছে কেউ বড় বড় গাছের ডাল, ঘন গাছের বেষ্টন সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছে শুঁড়, আর তারপর পুরোপুরি হাতিটা। কে জানে, হয়তো বা এই হাতিরই মদগর্বিত মন্থর চলা দেখে আপ্লুত ছিলাম কদিন আগেই, হয়তো এইটেই সে।

আর, হয়তো এই চুড়োরই কাছাকাছি উঠে গিয়েছিলাম সেদিন আমরা, পোষা হাতির পিঠে। চার চাকার জন্য তৈরি পথে নয়, সে হাতি চলেছিল, জলাজমি ডিঙিয়ে গাছে-আগাছায় ভরা পথহীন পথে। আমরা এখন অনেকটা উচ্চতায় বসেছি বলে সেসব গাছের শাখাপ্রশাখা কখনও আঘাত করতে চায় মাথায়, সময়মতো নিচু হয়ে যাই চারজনে, এ শাখা ও শাখার মাঝখানে ফুটচারেক লম্বা-চওড়া মাকড়সার জালের ওপর চিকচিক করে ভোরবেলাকার শিশির, হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে হয় যাতে তারা না জাপটে ধরতে পারে

মাথা। কবে কে এসেছিল এ পথে, কবে কোন বিপদ ঘটেছিল, নিচু গলায় মাহুত বলতে থাকে অতীতের সেসব গল্প। নিশ্চিতভাবেই অনেকবার বলা তার সেই গল্পগুলোকে শোনায় যেন স্বতঃস্ফূর্ত, সজীব; আর হাতি উঠতে থাকে চুড়োর দিকে।

সংকীর্ণ সেই পাথুরে পথে একটিমাত্র হাতিরই পদক্ষেপের জায়গা হতে পারে কোনওমতে, সে পথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে উঠে যাচ্ছে সে অবহেলায়। দুলকি চালে দুলতে দুলতে আমরা কখনও আকাশ দেখছি কখনও মাটি। আর, একটা জায়গায় থমকে গিয়ে মাহুত দেখাচ্ছে 'ওই যে একেবারে শেষ পাথরটা, তাকান'। তাকিয়ে দেখি সেখানে স্থির একলা এক ময়ূর, যেন মহাশূন্যতায় দাঁড়ানো। বৃক্ষবিরল সেই জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে মাহুত বলে: 'ওরই ঠিক পিছনে একটা গুহা। সেখানে থাকে বাঘ।'

বাঃ। বাঘ দেখা না হোক, বাঘের ডেরা দেখা হল।

শান্ত হাতি আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলল নীচে। কিন্তু নামবার পথে আরেক তথ্য জেনে প্রায় চমকে উঠি আমরা। বনবিভাগের হাতিদুটোর একটাকে নাকি ওঁরা ডাকেন 'আনারকলি'। 'আর এইটে? যার পিঠে আমরা চলছি?' মৃদুহাস্যে মাহুত বলে, 'এর নাম জুহি চাওলা।'

কী সর্বনাশ! কিন্তু তখন তো আর নেমে পড়বারও কোনও উপায় নেই।

৩

না, বেতলা ছেড়ে যে অন্য কোথাও যাইনি একেবারে, সেটা ঠিক কথা নয়। একদিন এক রাতের জন্য আরও এক জঙ্গলে আমরা গিয়েছিলাম, মারুমার।

নইহারের মালকিন যিনি, পাপড়ি চৌধুরী, তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। অক্টোবরের এক ভোরে সে হোটেলে পৌঁছবার পর বেশ আত্মজনসুলভ ব্যবহার মিলল তাঁর কাছে। অল্প পরেই তিনি ফিরে আসবেন কলকাতায়, তারই মধ্যে বুঝে নিতে ভোলেন না আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, আমাদের পছন্দ-অপছন্দ। 'একেবারে জঙ্গলের ভেতরে একটা রাত কি কাটাতে ভালো লাগবে আপনাদের' এও জানতে চান তিনি। সেইরকমই যে আমাদের আদত ইচ্ছে ছিল, সেটা শুনে রায়মশাইকে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে যান তিনি। আর বলেন আমাদের, 'মারুমারে একটা কটেজ আছে আমাদের, ছোট্ট, হয়তো আপনাদের অসুবিধাই হবে একটু। তবে দেখাশোনা করবার মালীও আছে একজন, সে ব্যবস্থা করে দেবে সব। আপনাদের সুবিধেমতো যে কোনওদিন চলে যাবেন অগ্রিম একটা খবর দিয়ে।'

গেলামও একদিন, আমরা দুজন । নইহারের কর্মীরা গাড়িতে তুলে দিলেন দরকারমতো অনেক সম্ভার, এমনকী রান্নারও সব উপাদান । তরুণ আদিবাসী ড্রাইভার রামদয়াল ছাড়া সঙ্গে থাকে আরেক কর্মী পিন্টু । গাড়ি চলবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ডাইনে বাঁয়ে দ্রষ্টব্যের পরিচয় দিতে থাকে অল্পস্বল্প । দুধারে বনভূমি রেখে পরিচ্ছন্ন বাঁধানো সড়ক চলেছে মাইলের পর মাইল, চোখে এসে লাগে অগাধ শুশ্রূষা । অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট একটা-দুটো বসতি । রাস্তার ওপর দিয়েই কখনও বয়ে গেছে ঝোরা । তেমনই এক ঝোরার ওপর জল ছিটিয়ে গাড়ি পেরোবার সময়ে পিন্টু বলে, এইখানে দেখবেন পর পর দশটা এমন পেরোতে হবে । ঠিক, জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে পেরিয়ে যাই দশটা যেন সমান মাপের ঝোরা, প্রায় সমান সমান দূরত্বে ।

বেতলা আর মারুমারের মধ্যে বড় একটা জনপদের নাম গারু । সেই গারু পেরিয়ে যাবার ঠিক আগেই চোখে পড়ল, উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছে অল্পবয়সী আদিবাসী এক তরুণী । মনে হল গাড়ির দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন ঝিলিক দিচ্ছে । হেঁটে চলা এরকম দু-চারজন মানবমানবী তো সব সময়েই দেখা যায় ধাবমান পথের দুধারে, কিন্তু প্রগাঢ় কালো রঙের ওই মসৃণ মুখমণ্ডল তার রহস্যময় চাহনিতে যেন স্মৃতির মধ্যে গাঁথা হয়ে যায় । ওরকম তাকাতে পারে কেউ?

একটু এগিয়েই আচমকা থেমে যায় গাড়ি । স্বল্পভাষী রামদয়াল নেমে যায় কিছু না বলে । পিছন দিকে কোথায় চলল সে হঠাৎ? তাকিয়ে দেখি সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে দূরে, লজ্জায় কৌতুকে বাসনায় ভরা এক আধো কটাক্ষে সে তাকিয়ে আছে এই দিকে, আর তার সামনে পৌঁছে গিয়ে কিছু হয়তো বলছে রামদয়াল । 'কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে?' অল্প পরে প্রোজ্জ্বল মুখে ফিরে আসে সে গাড়িতে, চলতে শুরু করে গাড়ি, পিছন দিকে মেয়েটিও মিলিয়ে যায় দূরে । আমাদের কৌতূহল অনুমান করে পিন্টু তখন বলে, 'ওর বউ । এইজন্যই বারবার এ পথে আসতে চায় ও ।'

তাই বলো! দৃষ্টিরহস্যের একটা কিনারা হল তবে । বহুস্তরান্বিত ওই কালো চোখের চাওয়া জঙ্গলবাসের একটা উপার্জন হল এবার । নব্যবিবাহিত রামদয়ালের দিকে তাকাতে হবে এবার তবে ভিন্নরকম চোখে ।

জঙ্গলের একেবারে ভেতরে বলতে যা বোঝায়, চৌধুরীদের কটেজটা ঠিক সেরকম নয় । পথের ধারে ছোট্ট এক বাড়ি । পথের ধারেই, তবে সে পথে একটি-দুটি বাস চলাচল ছাড়া আর কিছু নেই, নিঃশব্দ নির্জন সে পড়ে আছে প্রাকৃতিক নিশ্বাসে । সামান্য একটু অবতলে নেমে গাছপালা ঘেরা সুশোভন বাড়ির বারান্দায় বসে শোনা যায় শুধু পাখির স্বর, আর দেখা যায় কেবল সামনেই উঠে যাওয়া উঁচু পাহাড়ের চুড়ো, মেঘমণ্ডনে মসৃণ ।

অনুক্ষণ টের পাওয়া যায় আমরা এখন পাহাড়ের দেশে আছি, সবুজে সবুজে লাবণ্যময় পাহাড় । এগারোটার মধ্যে এসে পৌঁছে গেছি আমরা ।

পিন্টু বলে, 'রান্না হতে হতে আমরা কি তবে সুখা বাঁধে ঘুরে আসব, না কি বিকেলবেলায় যাবেন?'

'কেন । বিকেল কেন, এই তো ঠিক সময় ।'

উঠে পড়ি আবার গাড়িতে । পনেরো কিলোমিটারের মধ্যেই সুপ্রসর এক ঝরনা আছে এদিকে, সুখা বাঁধ তার নাম । সুখা কেন? শুকিয়ে থাকে কি জল? মরা ঝরনা তবে? পরে অবশ্য বোঝা গেল কথাটা ঠিক সুখা নয়, সুগ্গা, ও অঞ্চলের ভাষায় তার মানে নাকি টিয়াপাখি । টিয়ার ঝাঁকে ভরে থাকা পাথর, তার ওপরে ঝাঁপিয়ে নামছে জল ।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার সামনে পৌঁছে বোঝা গেল, ঝরনা কথাটার আর মানে নেই এখানে । জলের তোড় এখানে অনেকটা নদীর চেহারা নিয়েছে, আর এই খরস্রোত থেকেই শেষপর্যন্ত নাকি কোয়েল নদী । বড় ছোট উঁচু নিচু নানা মাপের পাথরখণ্ডের ওপর দিয়ে ছুটছে জল, পায়ের পাতা ভেজা গভীরতা থেকে ডুবজল পর্যন্ত একেক জায়গায় একেক রকম তার ঢল, এই দুপুরে কি তার মধ্যে একটু না দাঁড়ালে চলে? স্নানের জন্য তৈরি হয়ে আসিনি মনে মনে, কিন্তু তাই বলে হাঁটুজল পর্যন্ত চলে যেতে অসুবিধা কী? পিন্টু আর রামদয়াল তাদের ট্রাউজার গুটিয়ে তোলে, এগোতে থাকে সামনে । তাদের অনুসরণ না করে ভিন্নপথে আমি টপকাতে থাকি পাথরের পর পাথর । অভ্যাসবশে দূরের থেকে তর্জন করেন গৃহিণী । সে তো ওঁরা করেই থাকেন, এই বিবেচনায় একটি থেকে অন্য পাথরে লাফ দিয়েছি যখন, সংকীর্ণ আর সংগুপ্ত তার পিচ্ছিলতায় হড়কে গেল পা, জলের তোড়ে চমৎকার এক পতন হল আমার ।

দেহাতি বেশ কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল অনেকের স্নানোৎসব, এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি পিকনিক দল, আমার সেই অনিচ্ছুক অর্ধশয়ান দশা দেখে পরম ফুর্তি হল তাদের । করতালিতে আর হাস্যরোলে মুখর হল তারা । কোনওরকমে উঠে দাঁড়াই আমি । ভিজেই যখন গেছি তখন আর সাবধানতার দরকার কী? উপরন্তু এতগুলি মানুষকে একসঙ্গে খুশি করাও তো কম কথা নয় । অন্য আরেক দিক থেকে তাই পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি আবার । এবং আবারও ঘটে পতন । এবং আরও, আরও একবার ।

পিন্টু আর রামদয়াল তখন ওপাশের বিশাল পাথরখণ্ডের ওপরে দাঁড়ানো, আর সেখানে পৌঁছতে পারলেই না কি অসামান্য দৃশ্য, বলছে তারা । স্মিত মুখে ওপার থেকে তারা

আমাকে নির্দেশ দিতে থাকে কীভাবে আমাকে পা ফেলতে হবে কোথায়। বাঁদিকেই পড়ছি বারবার, তাই কোমর পর্যন্ত বাঁ পাশটা ভিজে গেছে বেশ। 'ওরকম বয়সে এ তো হতেই পারে'-গোছের মুখ করে যৌবনগর্বে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেয় পিন্টু, বলে: 'আপনি ওই পাথরটায় পা রেখে আমার হাতটা ধরুন, আমি নেমে আসছি এইখানে-' আর ওইটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুপুস করে মাথা পর্যন্ত তলিয়ে যায় সে, দূরবর্তী হৈহৈ জেগে ওঠে আবার অট্টরোলে, কোনওমতে তার হাত ধরে টেনে তোলে রামদয়াল, আর স্রোতের মধ্যে আমি আবারও খুঁজতে থাকি কোন পাথরটা পিছল নয় তত!

নিজেদের নিয়ে কৌতুক করতে করতে ঘরে ফেরবার পথটা বেশ ভালোই কাটে আমাদের।

শ্রান্ত গায়ে মালীর হাতের স্বাদু রান্নার ব্যবহার হয় ভালো, তার পরিচর্যার সুদীক্ষিত ভঙ্গি দেখেও চমৎকার লাগছে আমাদের। রোদের চলনের সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার চেয়ারদুটো কোথায় কোথায় সরিয়ে দিতে হবে, কখন আনতে হবে চা, কখন তুলে নিতে হবে চেয়ার আর রেখে যেতে হবে লণ্ঠন, পড়ার জন্য ছোট্ট একটা টেবিল হয়তো, নিজেকে একেবারে প্রচ্ছন্ন রেখে নিঃশব্দে এসব সম্পন্ন করে যায় সে। চৌধুরীদম্পতির এই গল্পের বইয়ের মতো বাড়িটিতে ছোট একখানা আলমারিতে বইও মজুত কয়েকখানা-পর্যটনের, পশুপাখির, চিকিৎসার, আর গল্প-উপন্যাসও দু-চারটে। রামদয়াল গাড়ি নিয়ে আবার চলে গেছে গারুর দিকে, পিন্টুরও কোনও সাড়া নেই আপাতত, বিকেলে আমরা বেরিয়ে পড়ি গাছগাছালির পথে, সরকারি এক বিশ্রামাগার পড়ে আছে এক পাশে আঁটোসাঁটো বন্ধ, কোথাও কেউ নেই। স্তব্ধতার শান্তি যেন মাথার চারদিকে ঘিরে থাকে বলয়ের মতো। ঝপ করে নেমে আসে সন্ধ্যা। কালই এখান থেকে চলে যাব ভেবে মনখারাপ লাগে বেশ।

ফিরতেই হয় তবু। ফেরবার আগে অবশ্য আরও একটা দায়িত্ব থাকে আমাদের। মারুমারে আসব জেনে পাপড়ি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটা ওষুধের কৌটো। ওসব অঞ্চলের মানুষেরা বছর জুড়েই জীর্ণ হয়ে থাকে ম্যালেরিয়ায়, চিকিৎসারও তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই কোথাও। কৌটোর মধ্যে প্যাকেটকরা কিছু ওষুধ, মারুমারে গিয়ে খবর দিলেই দূরদূরান্ত থেকে চলে আসবে সবাই। বলতে হবে তাদের, বারো বছরের চেয়ে বেশি বয়স যে মেয়েদের, এ ওষুধ কেবল তাদেরই জন্য। পঁচিশটা ট্যাবলেট একেক প্যাকেটে, একেকজনকে একেকটি প্যাকেট। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে একটা করে খেতে হবে রোজ।

কথাটা ভুলিনি আমরা। সঙ্গে এনেছি কৌটোগুলো। গাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে খবরও দিয়েছি পাঠিয়ে। সময়মতো একজন-দুজন করে একে একে আসতে থাকে ওরা। কেউ

কাঁধে বয়ে আনছে তার অসাড় ছেলেকে বা মেয়েকে, কেউ-বা নিজেই আসছে ধুঁকতে ধুঁকতে, খোঁড়াচ্ছে-বা কেউ, কারও চোখের অসুখ, কারও গায়ে ঘা, কেউ-বা কেশেই চলেছে অবিরাম। ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ, আসছে তো আসছেই তারা, কিন্তু কী দেব আমরা তাদের হাতে? আমরা তো এনেছি কেবল ম্যালেরিয়া না-হবার ওষুধ! যে অসুখ হয়নি এখনও, তার জন্য ওষুধ খেতে হবে কেন সেটা তাদের বোঝানো বেশ শক্ত হয়ে পড়ে, চিন্তিত অবিশ্বাসী মুখে কেউ কেউ তবু নিয়ে নেয় প্যাকেট, 'বারো বছরের ওপরের মেয়ে' কথাটা শোনে মন দিয়ে, কিন্তু তার পরেও কাতর গলায় জানতে চায়: 'এই ছেলেটার যে গা পুড়ে যাচ্ছে, এর জন্য হবে না কিছু ওষুধ?'

তারা ভেবেছে আমরা ডাক্তার। তারা ভেবেছে শহর থেকে সমস্তরকম রোগহরণের জাদু নিয়ে এসেছি আমরা। বারান্দার অল্প আলোয় বসে আছি আমরা বিকেলবেলা, আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে দেহাতিরা, তাদের পিছনদিকে মেঘমণ্ডিত পাহাড়ের পাল্টে যাচ্ছে রং, নীলচে থেকে ধূসর থেকে কালো। এতগুলি রোগীর সামনে আমাদের অসহায়তার এক পরিহাস্য স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরে যাব এবার কলকাতায়।

আর, কী আশ্চর্য, কলকাতায় ফিরেই গিন্নির শরীরে দেখা দেবে, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া!

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬

সারেঙ্গেটির জঙ্গলে

হরপ্রসাদ মিত্র

উনিশ শতকের শেষের দিক। জার্মানির কাইজার একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন যে তিনি যতদিন ইউরোপের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ততদিনে বজ্জাত ইংরেজ আর মিচকে শয়তান ফরাসিগুলো একটা পুরো মহাদেশ দখল করে বসেছে। ইংরেজের চামচা পর্তুগিজগুলোও বাদ পড়েনি। এখন কী করা? নানা রকম ম্যাপ দেখে পণ্ডিতরা ঠিক করলেন যে সব এখনও যায়নি। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কেনিয়ার তলায় এবং রোডেশিয়ার ওপরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। আবার পশ্চিম উপকূলে, সাউথ আফ্রিকার উত্তরে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে আছে। ব্যস, হয়ে গেল। জার্মানি ওই দুটি অঞ্চলে ঝাণ্ডা গাড়লেন। শুরু হল জার্মান ইস্ট এবং ওয়েস্ট আফ্রিকা।

দখল করার পরে অবশ্য কাইজার ইংরেজ আর ফরাসিদের পুরো বজ্জাতিটা টের পেলেন। তিনি দেখলেন যে পশ্চিম আফ্রিকার দখলি দেশটার প্রায় সবটাই মরুভূমি। চাষবাসের কোনও সুযোগ নেই। নামিবিয়ার (স্বাধীন জার্মান ওয়েস্ট আফ্রিকার নতুন নাম) হীরে এবং সোনার খনির কথা তখনও কেউ জানত না। এদিকে পূর্ব আফ্রিকার সবটাই মালভূমি। গড়পড়তা উচ্চতা সাড়ে চার হাজার ফুটের মতো। সেখানে বন জঙ্গল প্রচুর থাকলেও বন্ধ্যা কাঁকুরে জমি চাষের উপযুক্ত নয়। এই জন্যই ইংরেজ আর ফরাসিগুলো এই অঞ্চলদুটোয় হাত বাড়ায়নি। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। দেশ একটা দখল করা সোজা কিন্তু ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়া অনেক বেশি দুরূহ। যাই হোক জার্মানিকে এই ঝক্কি বেশি দিন সামলাতে হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ক্ষতিপূরণ হিসাবে দুটো দেশই মিত্রশক্তির হাতে এল। পূর্ব উপকূলের অংশটার নতুন নাম হল টাঙানিইকা। ব্রিটিশ কলোনি। পশ্চিমে নাম জার্মান ওয়েস্ট আফ্রিকাই রইল কিন্তু শাসনভার এল সাউথ আফ্রিকার হাতে-লিগ অব নেশনসের প্রতিভূ হিসাবে।

টাঙানিইকা এখনকার তানজানিয়া। লন্ডন থেকে এক দৌড়ে দার এস সালাম হয়ে জাঞ্জিবার। ওখানে তিন রাত কাটিয়ে ছোট প্রোপেলার প্লেনে আরুষা, যাকে তানজানিয়ার সাফারি রাজধানী বলা হয়। সওয়া ঘণ্টার উড়ান বেশ কাটল ১০-১২,০০০ ফুট নিচে জঙ্গল বন পাহাড় দেখতে দেখতে। এক জায়গায় বিরাট এক পাহাড়ের পাশে বিশাল এক

ক্রেটার চোখে পড়ল । পরে জেনেছিলাম যে ইনি হলেন মাউন্ট মেরুর নঙরডোটো ক্রেটার ।

আরূষাতে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্টের তরফ থেকে জেন বলে মেয়েটি । তানজানিয়ান ক্রিশ্চান । চটপটে কাজের মানুষ । হয়তো একটু খরখরি । আমাদের বললে, এখানে যে ড্রাইভার আর গাড়ি তোমাদের দেব, সেই একই ব্যক্তি আগামী সাতদিন তোমাদের সঙ্গে থাকবে । ভ্রমণ শেষে ওকে একটু ভালো করে বকশিশ দিও । বলতে বলতেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির হল । তানজানিয়ান মুসলমান । হাসিমুখ মোটাসোটা দোহারা চেহারা । বয়স গোটা চল্লিশ হবে । ইংরিজি ভালোই বলে । ফিদালি একাধারে ড্রাইভার এবং গাইড । পরে দেখেছিলাম যে জঙ্গল এবং জন্তু সম্বন্ধে ওর বেশ জ্ঞান আছে । গাড়িটা টাটা সুমো জাতীয় । ডিজেল । ফোর হুইল ড্রাইভ । তফাতের মধ্যে গাড়ির মাঝখানে ছাদের একটা অংশ এক ফুট ওপরে তোলা যায় । তাতে করে গাড়ির মেঝেতে দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য আরও ভালো করে দেখা যায় ।

পনেরো কিলোমিটার দূরে মাউন্ট মেরু গেম স্যাঙ্কচুয়ারিতে পৌঁছতে আধঘণ্টার মতো লাগল । এখানে আমরা দুরাত কাটাব, আরূষা তানজানিয়ার বড় শহর হলেও (লোকসংখ্যা দশ লক্ষের ওপর) কোনও ছিরিছাঁদ নেই । এবড়োখেবড়ো রাস্তা । এখানে একটা গম ভাঙার কল ওদিকে কয়েকটা চুন সুরকির দোকান, ইটের পাঁজা । খাপরার চালের পাশেই এক মেটে দোতলা বাড়ি, হলদে রং । ঠিক যেন পূর্ব বিহারের কোনও মফস্বল শহর । এসব পেরিয়ে শহরের সীমানায় এক ঝাঁ চকচকে পেট্রল পাম্পে গাড়ি থামল । পাম্পের সঙ্গেই বিলাতি কেতায় ছিমছাম প্রভিশন স্টোর । সেখানে কিছু সওদা করা গেল । ফিদালি বললে, এই যে রাস্তা দেখছ এমন সুন্দর মসৃণ রাস্তা সারা তানজানিয়াতে আরও গোটা দুই-তিন আছে । বাকি সবই খানা-খন্দওয়ালা কাঁচা রাস্তা । এই রাস্তাটা ওদিকে দার এস সালাম পর্যন্ত চলে গেছে । আরূষা থেকে বাস যায় আট ঘণ্টায় ।

তেত্রিশ একর জমি নিয়ে মাউন্ট মেরু গেম পার্ক প্রায় ঋষির তপোবন, তবে এই তপোবনে ঠান্ডা গরম জলের কল, ফ্লাশ টয়লেট প্রভৃতি সবরকম আধুনিক সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত আছে । পার্কের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে অতিথিদের ছোট ছোট কটেজ । খাবার ঘর, বার, লাইব্রেরি, মাঝখানে বিশাল সব প্রাচীন গাছের তলায় পাথর বাঁধানো চাতালে টেবিল চেয়ার পেতে বসা এবং টুকটাক খাওয়ার বন্দোবস্ত । চাতাল থেকে একটা শুঁড়িরাস্তা ধরে বেড়ার ওপারে গেলে ওদের নিজস্ব একটা চিড়িয়াখানা । নানারকম খাঁচার ভেতরে বেবুন, সজারু, খেঁকশিয়াল, বনবিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরা ঘোরাফেরা করছে । খাঁচাগুলোর এক পাশে একটা বেড়া দেওয়া খোলা জায়াগায় বিরাট এক স্থলচর পাখি ।

স্লেট রঙের পাখির মাথায় লাল ঝুঁটি । চিড়িয়াখানার কর্মচারী বললে 'ক্রেস্টেড ক্রেন' উগান্ডার লোক । আমাদের দেখে পাখিটা কিছুটা গাধার মতো হনক হনক করে চেঁচাতে লাগল । লোকটি বললে, ও ওই রকমই চেঁচিয়ে যাবে যতক্ষণ না ওকে কিছু খেতে দেওয়া হয় ।

ক্যাম্পের বাকি দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে বিল, ঘাসবন, গাছ এবং সেখানে পরিখার ওপারে অনেক জন্তু ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে । হরিণ, মোষ, উটপাখি, জেব্রা নানারকমের জলচর প্রাণী । বিকেলবেলা আমাদের কটেজের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি খোলা জায়গার জন্তুগুলোর মধ্যে হুটোপাটি চেঁচামেচি । পরিখার ধারে গিয়ে দেখি ওপারে একটা লোক দুটো বালতি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে । খাদ্য । একটা বালতি থেকে ছোট ছোট মাছ ছুড়ে দিচ্ছে জলে, পাখিগুলো কপাকপ খাচ্ছে । অন্য বালতিতে ছোলা মটর মুলো প্রভৃতি সবজি । তারও খদ্দের প্রচুর । সকলের মাথা টপকে উটপাখি ছোলা মটর খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে । জেব্রা বা হরিণদের এদিকে মন নেই । ওরা ঘাস, জলজ পাতা খেয়ে চলেছে । এইসব জন্তুদের অনেকে আহত অবস্থায় এখানে আশ্রয় পেয়েছে । কেউ কেউ বা অনাথ-জঙ্গলে থাকলে অন্য জন্তুরা ওদের খেয়ে ফেলবে তাই জায়গাটাকে গেম স্যাঙ্কচুয়ারি বলা হয় ।

আমাদের কটেজের সামনে এক সারি ঝাঁপাল গাছ । এর ডালের সঙ্গে ওর পাতার মেশামিশি । গাছের সারির শেষে অল্প ফাঁকা জায়গা, তার পরেই খাবার ঘরের লাল টালির ছাদ । চেয়ে দেখি শেষ গাছটার মাথা থেকে খাবার ঘরের ছাদ অবধি একটা দড়ি খাটানো । ভাবলাম টিভির তার-টার হবে । একটু পরে দেখি যে গাছের সারির শেষ গাছটা ধরে, কে বা কারা যেন ঝাঁকি দিচ্ছে । ও হরি, এক দল ছোট ছোট বাঁদর, কারোর আবার পেটের সঙ্গে একটা বাচ্চা জড়ানো । এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে পড়ছে । শেষ গাছটায় পৌঁছে ওরা সেই দড়িটা ধরে খাবার ঘরের ছাদে উঠে গেল । ক্যাম্পের একজন বললে যে এই বাঁদরগুলো সারাজীবন গাছের ওপরেই কাটায় । তাই ওদের যাতায়াতের জন্য সারা ক্যাম্প জুড়ে দড়ি ফেলা আছে । হঠাৎ কর্কশ কেকাধ্বনি । একটা ময়ূর লম্বা ল্যাজ দুলিয়ে ত্রস্তপদে উঠোন দিয়ে চলে গেল । পিছনে আরেকটা ময়ূর ধপধপে সাদা । সন্ধ্যাবেলাটা ক্যাম্পেই কাটল ।

পরদিন সকাল নটায় ফিদালি গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল । চলো মাউন্ট মেরু ন্যাশনাল পার্ক দেখিয়ে আনি । মাউন্ট মেরু হল আফ্রিকার পঞ্চম উচ্চতম পাহাড় (৪,৫৬৬ মিটার) কিন্তু এমন মেঘ যে একমাত্র এরোপ্লেন থেকেই ওর মাথাটা চোখে পড়েছিল । আফ্রিকার অন্য অনেক পাহাড়ের মতো দুটি আগ্নেয়গিরি এবং বহুকাল আগে পাহাড়ের একদিক ধসে গিয়ে এক ক্রেটার সৃষ্টি হয়েছিল ।

এই পাহাড়েরই ঢালুতে ১৬৭ স্কোয়্যার কিলোমিটার জমিতে মাউন্ট মেরু ন্যাশনাল পার্ক। জঙ্গলের গেটে ঢোকবার মুখে ছোট্ট একটা মিউজিয়াম। সেখানে মাউন্ট মেরুর ভূ, প্রাণী এবং বৃক্ষতত্ব নিয়ে অনেক ছবি এবং লেখা আছে। দুপুরে বাড়ি ফিরে খাওয়া, নিদ্রা। বিকেলে ক্যাম্পের মধ্যে পায়চারি। জায়গাটা যেন ফুলে ফলে রঙে, রসে টইটম্বুর। কত রকমের পাখি। মৌটুসি, সূর্যসখা আর অনেক ওপরে কালো ক্রসের মতো চিল।

পরদিন ফিদালি সেই সকাল ৯টায় গাড়ি নিয়ে হাজির। বাক্স পেঁটরা বেঁধে গাড়িতে উঠলাম। গন্তব্য নগোরোংগোরো ক্রেটার। ১৮০ কিলোমিটার। ফিদালি বললে যে অর্ধেক পথ মানে মাকুইনি গ্রাম পর্যন্ত এই রকম সুন্দর রাস্তা। তারপরে তানজানিয়ার হাড় ঠোকাঠুকি কাঁচাপথ। এবারে তানজানিয়ার মালভূমি চিরে গাড়ি চলেছে। দুদিকে বর্ধমানের মতো আকাশ জোড়া মাঠ, ধানখেতের বদলে ঘাসের বন। এখন শেষ গ্রীষ্মের প্রভাবে বিবর্ণ রং। দূরে দূরে হরিণের পাল। ফিদালি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, ইমপালা, থমসনস গেজেল, টোপি, স্পটেড ডিয়ার। হঠাৎ একটা কেরানি পাখি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে এগিয়ে এল। চট করে একটা ছবি তুলে নিলাম।

মাকুইনি গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি কাঁচা রাস্তা ধরল। এখানে নগোরোংগোরো ক্রেটারের সংরক্ষিত জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ৮,৩০০, স্কোয়্যার কিলোমিটার। আগে এ সমস্তই সেরেঙ্গেটির অংশ ছিল। এখন নগোরোংগোরোকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জঙ্গল বটে তবে গভীর নয়। বুশল্যান্ড, ঝোপঝাড়, আগাছা মাঝে মাঝে কাঁটাওয়ালা আকাসিয়া গাছ। একটা মোড় ঘুরে দেখি যে টিলার পাশে একটা বাওবাব গাছে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। জন্তু-জানোয়ার এখানে আগের চেয়ে বেশি কিন্তু এত বিশাল জায়গায় সব ছড়ানো ছিটানো। হরিণ, জেব্রা কখনও বা একটা জিরাফ। গাড়ি বাঁদিকে বেঁকে আরেকটা কাঁচা রাস্তা ধরল। লেক মানিয়ারা ন্যাশনাল পার্ক দেখে যাব। এখানেও নানা জন্তু আছে কিন্তু পৃথিবীবিখ্যাত হল এখানকার গাছে চড়া সিংহ। দেখলাম জমি থেকে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে একটা মোটা ডালের ওপর শুয়ে দুই সিংহী রোদ পোয়াচ্ছে। আমাদের দেখে একজন আড়ামোড়া দিয়ে উঠে বসলেন। ওখান থেকে লেকের ধারে যাত্রীদের বিশ্রামস্থল। বেঞ্চিতে বসে সঙ্গে আনা প্যাকড লাঞ্চ খেলাম। খেতে খেতে ফিদালি একটা গল্প বললে। লেক মানিয়ারাতে লোক রাত্রিবাসও করে। ভালো হোটেল আছে। বছর দুই আগে ফিদালি এক বয়স্ক সাহেব-মেমকে নিয়ে লেক মানিয়ারা এসেছিল। লেকের ধারে জায়গাটা সাহেব-মেমের এমন পছন্দ হল যে ওঁরা ঠিক করলেন যে পরদিন ওইখানে বসে ওঁরা প্রাতরাশ করবেন। জায়গাটায় পৌঁছে দেখেন যে দুই কোনায় এক জোড়া করে সিংহ বসে আছে। ওরাও বোধহয় ব্রেকফাস্ট করতে এসেছে। সাহেবদের ব্রেকফাস্ট সেদিন গাড়িতে বসেই খেতে হল।

সিংহীদের রোদ পোয়াবার কথায় বলি যে আমরা তো বিষুব রেখা থেকে তিন ডিগ্রি দক্ষিণে আছি । কিন্তু কোথায় সেই বিষুব রেখায় দীর্ণ দগ্ধ আফ্রিকা? এই উত্তর তানজানিয়ার মালভূমিতে রোদটাই যা গরম । ছায়ায় দাঁড়ালেই গা শিরশির করে ।

ফিদালি একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললে, ওপর দিকে চেয়ে দেখ । দেখি এক বিরাট প্যাঁচা গাছের ডালে বসে গোল গোল চোখে আমাদের দেখছে । হুতুম প্যাঁচা । আমরা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ও অনড় অবস্থায় আমাদের দিকে চেয়ে রইল । লেক মানিয়ারা ছাড়িয়ে চলেছি তো চলেছি । পথ আর ফুরোয় না । মাকুইনিতে সল্টেড চিনাবাদাম কিনেছিলাম । তাই একটা দুটো করে চিবোচ্ছি । ক্রেটার পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল । রিমের মাথায় বৃত্তাকারে ৭৫টা কামরা । প্রত্যেক ঘর থেকেই ৬০০ মিটার নিচে ক্রেটারের জঙ্গল চোখে পড়ে । দিনেরবেলা সেখানে ছাগল ভেড়ার মতো জন্তু চরে বেড়াচ্ছে দেখা যায় । দূরবীন লাগালে বোঝা যায় যে কে হাতি আর কে মোষ । কামরাগুলোর আগে বিরাট রিসেপশন এরিয়া । দোতলায় লাউঞ্জ, তিনতলায় খানা কামরা, সমস্ত কাঠের তৈরি এবং সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশনড, মানে গরম হাওয়া । সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে বাইরে বেশ ঠান্ডা । সুইমিং পুলটাই যা নেই । না হলে সেরেনা লজকে পাঁচতারার হোটেল বলা চলে । হোটেলের সঙ্গে আমাদের আরেকটা সম্বন্ধ আছে । তানজানিয়ার সর্বত্র সেরেনা লজগুলো আগা খাঁর ট্রাস্ট প্রপার্টি । নগোরোংগোরোতে ম্যানেজার এক পাঞ্জাবি ছোকরা । বয়স গোটা ত্রিশ । ফর্সা ধারালো মুখ । একহারা শরীর ।

পরদিন সকালে দুশো মিটার নিচে নগোরোংগোরো ক্রেটারে নামলাম । সরু একহারা রাস্তা । একদিক দিয়ে নামা । অন্যদিকে ওঠা । ক্রেটারের আয়তন ২৬০ বর্গ কিলোমিটার । এরমধ্যে বিস্তৃত জলাশয়, ঘাসবন, আকাসিয়ার জঙ্গল মরুভূমি সব আছে । পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রেটার এটা । বহু জন্তুর বাস এখানে । তার মধ্যে আফ্রিকার কালো গণ্ডার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । বড় বদরাগী জানোয়ার এটি । আমাদের কপালে অবশ্য গণ্ডার ছিল না । জলাশয়ের ওপারে বহুদূরে ছায়ামূর্তির মতো কী একটা চলে গেল । ফিদালি বলল, ওই গণ্ডার যাচ্ছে । সিংহ, নেকড়ে, চিতাবাঘ সবই আছে কিন্তু কেউ বেরোল না । অবশ্য ওদের দিনদুপুরে বেরোবার কথাও নয় । হরিণ, জেব্রা, জিরাফ প্রচুর । ক্রেটারের চারদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল থাকলেও তৃণভোজী জন্তুরা পাহাড় টপকে বাইরে যাতায়াত করে । মাংসভোজীদের কোথাও যেতে হয় না । তাদের খাদ্য ক্রেটারের মধ্যেই বেশি । হাতির সংখ্যা কম । গোনাগুনতি ত্রিশটা । সব মদ্দা হাতি । মেয়ে হাতিরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বাইরে থাকে । ক্রেটারে খাদ্যাভাব ।

ক্রেটারের জঙ্গল ঘুরে এক লেকের ধারে গাড়ি থামল। আরও অনেক গাড়ি সেখানে। সবাই প্যাকড লাঞ্চ খুলে খাওয়াদাওয়া সারবে। ওপরে চক্রকারে চিল ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফিদালি বললে, খাওয়া গাড়ির মধ্যে সারুন। বাইরে চিল ছোঁ মারবে। খাওয়া সেরে গাড়ি থেকে নেমে দেখি একজোড়া সাহেব-মেম বাইরে বেশ টেবিল চেয়ার পেতে খাচ্ছে আর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আর্দালি উইন্ডমিলের মতো দু হাত নেড়ে চিল তাড়াচ্ছে। আরেকটা গাড়ি থেকে সাহেব নেমে একটা পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওপরে ছুড়ে দিচ্ছে চিল ছোঁ মারছে বটে, কিন্তু ধরতে পারছে না। সাহেবকে বললাম যে এসব আফ্রিকান চিল রাগবি খেলতে অভ্যস্ত। ক্রিকেট শেখেনি। একধারে এক বিরাট হাতি, সত্যিই অত বড় হাতি আমি আর কোথাও দেখিনি। তার হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে লেকের তলা থেকে জলজ ঘাস তুলছে আর খেয়ে যাচ্ছে। লোকে যাচ্ছে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে, ফটো তুলছে, ওর দৃকপাত নেই। মাঝে মাঝে পিটপিট করে দুপেয়েগুলোকে দেখে আর খেয়ে যায়। ফিদালির কাছে হস্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হল। হস্তি দুই প্রকার। এক হল সাভানা এলিফ্যান্ট যাদের প্রধান খাদ্য ঘাস। এরা আকৃতিতে বিরাট হয়। ওজন ৫ থেকে ৬ টন। জঙ্গলের হাতি, যারা গাছের ডালপালা খায় তাদের ওজন অনেক কম। তিন সাড়ে তিন টনের মধ্যে। ভাগ্যিস এরা এত ছোট, না হলে ওদের শুঁড়েই জঙ্গল সাফ হয়ে যেত।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা। এবার সেরেঙ্গেটি। পথে ওলডুভাইয়ের খাত দেখে যাব। ফিদালি শুভ সংবাদটা দিল। সেরেঙ্গেটিতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তার মানে এবার ওয়াইল্ডবিস্টরা কেনিয়ার মাসাইমারা পাহাড় থেকে সেরেঙ্গেটির উপত্যকায় নেমে আসবে। ওখানে পৃথিবীর বুক শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে। আবার সেই জঙ্গল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালুতে মাসাইদের ছোট ছোট গ্রাম। সারা নগোরোংগোরো সেরেঙ্গেটি অঞ্চল সংরক্ষিত বন। এখানে মনুষ্য বসবাস, খেতিবাড়ি বা পশুপালনের হুকুম নেই। কেবল মাসাইরা এ হুকুমের বাইরে। মাসাইরা এখানকার ভূমিপুত্র নয়। ওরা নীলোটিক, মানে নীল নদের আশপাশে ওদের দেশ। দু-তিনশো বছর আগে ওদের একটা দল সুদান থেকে দক্ষিণে নেমে আসে এবং উত্তর কেনিয়ার লেক তুরকানা থেকে তানজানিয়ার নগোরোংগোরো পর্যন্ত অর্থাৎ আফ্রিকার গ্রেট রিফট ভ্যালির মধ্যে এবং দুপাশে বসবাস শুরু করে।

মাসাইরা চাষবাষের ধার ধারে না। গোপালন এবং শিকারই ওদের জীবিকা। তিনশো বছরে আফ্রিকায় কত পরিবর্তন হল। ট্রাইবাল চিফদের তাড়িয়ে ইউরোপিয়ানরা জেঁকে বসল। তাদের সঙ্গে এল মিশনারিরা। এক সময় ইউরোপিয়ানরা চলে গেল। আফ্রিকার দেশগুলো একে একে স্বাধীন হল। রেলগাড়ি বসল। কলের জাহাজ, মোটরগাড়ি মায় এরোপ্লেন পর্যন্ত চালু হল। কিন্তু এসব কিছুই মাসাইদের স্পর্শ করেনি। ওরা ক্রিশ্চানও নয় মুসলমানও নয়। ওরা নিজেদের আটবিক ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার সঙ্গে ওদের

সম্পর্ক, হাতের বল্লমে ইস্পাতের ফলা। ইস্পাতের ছুরি। আর টকটকে লাল মোটা সুতির চাদর। যেটা ওদের পুরুষেরা জড়ায়। মেয়েদেরও ওই একই চাদর তবে লালের বদলে লাল আর নীলের চৌখুপি।

নগোরোংগোরো ছাড়িয়ে আধঘণ্টাও হয়নি। পটাং করে গাড়ির তলায় একটা ধাতব আওয়াজ হল। ফিদালি গাড়ি একপাশ করে থামিয়ে নেমে পড়ল। গাড়ির তলায় অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে আমাদের বলল, বিপদ হয়েছে। কী একটা যন্ত্রাংশ ভেঙে গেছে। এখন সেই স্পেয়্যার পার্টসটি এবং একজন মেকানিক চাই। নগোরোংগোরোতে দুইই পাওয়া যেতে পারে, না হলে মাকুইনি থেকে নিয়ে আসতে হবে। এখন উপায়? ফিদালি ততক্ষণে রেডিও টেলিফোনে ওদের আরূষা অফিসের সঙ্গে কথা বলছে। তারা বলল, দাঁড়াও নগোরোংগোরোতে খবর নিই যে ওখান থেকেই বন্দোবস্ত হবে কিনা, না হলে মাকুইনি বা আরূষা থেকে অন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেব। চার থেকে ছ ঘণ্টার ব্যাপার। তবে চিন্তার কারণ নেই। সঙ্গে প্যাকড লাঞ্চ এবং জলও আছে।

গাড়ি থেকে নেমে পথের ধারে একটা পাথরে রোদে বসলাম। কিছুক্ষণ খাতায় সে দিনের কথা লিখলাম। গৃহিণী গাড়িতে বসে ইংরিজি এক নভেল পড়ছেন। ফিদালি জানাল যে নগোরোংগোরোতেই সব পাওয়া গেছে। মেকানিক পথচলতি একটা গাড়ি ধরে এসে পড়ল বলে। পথপানে চেয়ে বসে আছি। কিন্তু মেকানিক আর আসে না। আরূষা থেকে ফোনে খবর এল যে মেকানিক তৈরি হয়ে বসে আছে কিন্তু কোনও গাড়ি পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে হুস হুস করে সব গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ থামে না। জিজ্ঞাসা করে না যে আমরা পথের ধারে বসে আছি কেন? পরে শুনেছিলাম যে যাত্রীদের বলা আছে যে রাস্তায় কোনও কারণে কদাপি থামবে না বা গাড়ি থেকে নামবে না। এদিকে দশটা বেজে গেছে। এমন সময় একটা গাড়ি থেমে পড়ল। ফিদালির মুখে এক গাল হাসি। দেখ এ আমাদের কোম্পানির গাড়ি। অন্য গাড়ি থেকে এক জোড়া সাহেব-মেম নামলেন। পরে জেনেছিলাম যে এঁরা তানজানিয়া এসেছেন মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। দুই ড্রাইভারে কথাবার্তা হল। তারপর নবদম্পতির অনুমোদন নিয়ে অন্য গাড়ি চলে গেল নগোরোংগোরো। মেকানিক নিয়ে আসতে প্রায় চল্লিশ মিনিট। ততক্ষণ সাহেব যুগল অপেক্ষা করলেন। গাড়ি সারিয়ে আমাদের বেরোতে বেরোতে বারোটা বেজে গেল।

তারপর দৌড় দৌড়, পৌনে দুটোর সময় গাড়ি ওলডুভাই খাতের কিনারায় এসে দাঁড়াল। ওলডুভাই পৃথিবীখ্যাত। এখানে ওপর ওপর পাঁচটা স্তরে ৩৫ লক্ষ বছরের মনুষ্য বিবর্তনের ইতিহাস লেখা আছে। আদি মানবের অন্যতম জন্মস্থান এটা। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ইউ এন-এর আনুকূল্যে খোঁড়াখুঁড়ি এখনও চলছে। টিনের চালার তলায় প্যাকড

লাঞ্চ নিয়ে বসা গেল। আরও কয়েকটি দল ছিল। আমরা বসতে না বসতে ওখানকার পুরাতত্ব বিভাগের এক তানজানিয়ান ভদ্রলোক ওলডুভাই খাত সম্বন্ধে দশ মিনিটের এক বক্তৃতা দিলেন ইংরিজিতে। তিনি চলে যাবার পর আমরা খেয়ে নিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল যে খাতের নিচে নেমে আদিম গুহামানবের পায়ের ছাপ দেখে আসব কিন্তু ফিদালি বললে সময় নেই। সন্ধ্যা ছটার মধ্যে সেরেঙ্গেটি না পৌঁছতে পারলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সকাল ছটার আগে সে গেট খুলবে না।

তানজানিয়ার জঙ্গলে আইনকানুন খুব কড়া। সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত বিশেষ অনুমতি ব্যতীত জঙ্গলে ঢোকবার নিয়ম নেই। সে অনুমতি সাতদিন আগে নিতে হয়। কোন রাস্তায় যাবে তার ম্যাপ দিয়ে। বিনা অনুমতিতে জঙ্গলে ঢুকলে বনবিভাগের লোকেদের ওপর ঢালাও হুকুম দেওয়া আছে যে আগে গুলি করে পরে প্রশ্ন করবে-কে? কেন? ইত্যাদি।

সেরেঙ্গেটির দরজায় পৌঁছলাম সাড়ে পাঁচটায়। তখন সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। আমাদের গন্তব্যস্থল মাইগ্রেশন ক্যাম্প তখনও পাঁচ-ছ মাইল। ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন আলো জ্বলে উঠেছে। ক্যাম্পের দরজায় অভ্যর্থনা জানালেন সুমুখী আমেরিকান মেয়েটি। নাম ল্যারি। তারপর আমাদের নির্দিষ্ট ক্যাম্পে নিয়ে চললেন। সঙ্গে একজন আর্দালি মালপত্রের ভার নিল। মাইগ্রেশন ক্যাম্প সত্যি সত্যিই ক্যাম্প। উঁচু পাথরের ভিত। পাথরের মেঝে তার ওপর শতরঞ্চি। ওপরের অংশটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে ক্যানভাস মোড়া, গোলক বসানো পর্দার দরজা, জানলা। সামনের দিকে শোয়া বসার বন্দোবস্ত, পিছনে আরেক প্রস্থ পর্দার আড়ালে শাওয়ার, টয়লেট প্রভৃতি। ঠান্ডা গরম জলের কল, ফ্লাশ টয়লেট-অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নেই।

আর্দালি আমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখছে। ল্যারি পরিচয় করাচ্ছে। এই যে আমাদের মাইগ্রেশন ক্যাম্প-এর চারদিকে কোনও বেড়া নেই। চারদিকে জঙ্গল এবং বুনো জন্তুরা ক্যাম্পে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে রাতে। সকালের আগে এবং সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বেরিয়ো না। যদি বেরোতে হয় যেমন খানা কামরায় যাবার জন্য, তখন এই বাঁশিটা বাজাবে-টেবিলের ওপরে পুলিশের হুইসেলের মতো একটা বাঁশি দেখালেন-আমাদের সশস্ত্র আসকারি এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। অস্ত্র বলতে তীর ধনুক কিন্তু পোশাক পুরো মিলিটারি। পুরো মাইগ্রেশন ক্যাম্পটা একটা টিলার ধার বেয়ে তিন থাকে তৈরি। প্রথম থাকে অফিস, রিসেপশন, বার, লাইব্রেরি-লাইব্রেরির সামনে প্রশস্ত কাঠের পাটাতনে বসলে জঙ্গলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় থাকে খানা কামরা, রান্নাঘর। তৃতীয় থাকে মানে টিলার তলায় একদিকে ২১টি ক্যাম্প অতিথিদের জন্য। অন্যদিকে

কর্মীদের বাড়ি ব্যারাক এবং সকলের শেষে একটি ছোট বাংলো যেখানে ল্যারি এবং তার বালকবন্ধু ইয়েন থাকে। ইয়েন জাম্বিয়ার ইংরেজ। ইয়েনের বন এবং বন্যজন্তুদের সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। এছাড়া স্থায়ী বাসিন্দা হল সামনে ক্ষীণতোয়া গ্রুমেতি নদীর জলাধারে দু-তিনটে হিপো, সারারাত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে। আর ল্যারিদের বাংলোর ওপারে একটা জিরাফ। তাকে সকালের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্যাম্পের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ল্যারি বলে, জিরাফটা মনে করে যে ক্যাম্পটা ওরই বাড়ি। ল্যারিরা ওর আশ্রয়ে আছে। পরে শুনেছিলাম যে নদীর ওপারে একটা কুমির প্রায়ই রোদ পোহায়।

মাইগ্রেশন ক্যাম্পে ফোন নেই, টিভি নেই, খবরের কাগজ নেই, পোস্ট অফিস মাকুইনি। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ কেবলমাত্র রেডিও টেলিফোনে। ইলেক্ট্রিসিটি ওদের নিজেদের জেনারেটরে। কিন্তু রাত এগারোটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত সেটা বন্ধ থাকে। তখন ক্যাম্পের মধ্যে টর্চলাইট ভরসা। এদের খাদ্য, পানীয়, জেনারেটরের জন্য ডিজেল সব আসে আরুষা থেকে। রাত আটটা নাগাদ আসকারিকে নিয়ে আড়াইশো মিটারের মতো পথ হেঁটে খানা কামরায় পৌঁছলাম। এখানে ইয়েনের সঙ্গে পরিচয় হল। সদালাপী মিষ্টভাষী লোকটি। সতেরো বছর এই হোটেল লাইনেই আছে। আফ্রিকার নানা দেশ, নানা জঙ্গল ঘুরেছে। মাইগ্রেশন ক্যাম্প সভ্য জগতের এতটা বাইরে হলেও, বারে মদ্যাদি কম নয়। খাওয়াও বেশ ভালো। মোটামুটি কন্টিনেন্টাল খাওয়া তার সঙ্গে কিছুটা সাউথ আফ্রিকাও মিশে আছে। আসলে এই ক্যাম্পের মালিক হল সাউথ আফ্রিকার BLUES রেস্টুরেন্ট গ্রুপ। এখানকার প্রধান পাচক কেপটাউনে BLUES রেস্টুরেন্টে শিক্ষানবিসি করেছে। খানা কামরা জমজমাট। অন্তত কুড়ি-বাইশ জন পুরুষ মেয়ে বিভিন্ন দলে বসে খাচ্ছে। তার মধ্যে চার জোড়া হনিমুন দম্পতি। খুব ফুর্তি হৈ হল্লা চলছে।

পরদিন সকাল নটায় ব্রেকফাস্ট খেতে এসে দেখি ফিদালি এক ধারে বসে ওর অন্য ড্রাইভার বন্ধুদের সঙ্গে খাচ্ছে। আমাদের দেখে বলল, আমি রেডি, চল বেরিয়ে পড়ি। তানজানিয়ার সীমানায় মাসাইমারা পর্যন্ত যাব। মাইগ্রেশন ক্যাম্প থেকে বেরোতেই বাঁদিকে চেয়ে ফিদালি বলল, সিংহ একটা জানোয়ার মেরেছে দেখছি। কাল অনেক রাতে ওর তর্জন গর্জন শুনেছিলাম। দেখলাম একটু দূরে ঢিপির মতো কী একটা পড়ে আছে। সিংহটাকেও প্রায় রাস্তার ওপরে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে ঝিমোতে দেখা গেল। বিরাট সিংহ। আমাদের দেখে নড়েচড়ে আমাদের দিকে মুখ করে বসল। ফিদালি বললে, ও এখন কোনওদিকে দৃকপাত করবে না। রাতে মহাভোজের পর ওর এখন ঘুমোবার সময়।

সেরেঙ্গেটির জঙ্গল শুরু হল। এর আগে জিম্বাবোয়ের হোয়াঙ্গে ন্যাশনাল পার্কে গেছি। সাউথ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক দেখেছি কিন্তু সেরেঙ্গেটির সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। প্রথমত আয়তন। হোয়াঙ্গে ১৪,৬০০ বর্গ কিলোমিটার এবং ক্রুগারের যে অংশে আমরা গিয়েছিলাম সেটি মোটে বারো হাজার হেক্টর। সেখানে সেরেঙ্গেটি পনেরো হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং ওর সঙ্গে লাগোয়া জঙ্গলগুলি আরও পনেরো হাজার। মোট ত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার বন। তার ওপরে হোয়াঙ্গের চার ভাগের তিন ভাগ কালাহারি মরুভূমি। সর্বত্র জলাভাব। জঙ্গল রক্ষীরা তাই জঙ্গলের কিনারায় জায়গায় জায়গায় ওয়াটার হোল বসিয়েছে। ডিপ টিউবওয়েলে জল তুলে ডোবা ভর্তি করে। জন্তুরা সেখানে ভিড় করে জল খেতে আসে। তখন যত খুশি দেখো। ক্রুগারের ওইটুকু জায়গায় জন্তুর ঘেঁসাঘেঁসি। সিংহগুলো কুকুরের মতো রাস্তায় বসে আছে। সেখানে জন্তু দেখা যেন চিড়িয়াখানায় যাওয়া। তফাত এই যে জঙ্গলে আমরা গাড়ির খাঁচার মধ্যে বসে আছি। জন্তুগুলো বাইরে ছাড়া আছে। সেরেঙ্গেটির ব্যাপার একেবারে আলাদা। এখানে বর্ধমানের ধানখেতের মতো আকাশজোড়া মাঠ। কেবল ধানের বদলে ঘাসের বন, ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে কাঁটাওয়ালা আকাসিয়া গাছ। তারই মধ্যে কাছে দূরে নানারকম জন্তুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। কত রকমের হরিণ, জেব্রা, জিরাফ, বেবুনের দঙ্গল। ওরা, আমরা, ঘাস, গাছেরা সব মিলিয়ে যেন একটা ঐকতান বাদন।

হঠাৎ ফিদালি বলল, ওই দেখ ওয়াইল্ডবিস্টের দল চলেছে। দল না বলে তাকে ঢল বলা উচিত। পাশাপাশি আটটা কি দশটা করে জানোয়ার লাইন করে রাস্তা পেরোচ্ছে। সে লাইনের শুরু বা শেষ নেই। প্রায় আট কিলোমিটার সে লাইন আমাদের গাড়ির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলল, তারপর বেঁকে দিগন্ত রেখায় মিশে গেল। ওয়াইল্ডবিস্ট অদ্ভুতাকৃতি জানোয়ার। অন্য নাম ন্যু। আকারে একটা ছোটখাটো ঘোড়ার মতো, তৃণভোজী। মুখটা গরুর মতো, শরীর হরিণের মতো আবার রামছাগলের মতো দাড়ি এবং বেঁটে বেঁটে শিং আছে। ব্যবহার কলকাতার মিছিলের চেয়ে অনেক ভালো। আমাদের গাড়ি আসতে দেখে কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে আমাদের রাস্তা করে দিল। আমরা চলে যেতেই লাইন আবার বেমালুম জুড়ে গেল।

ওয়াইল্ডবিস্টরা শীতকালটা মানে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কেনিয়ার মাসাইমারা পাহাড়ের জঙ্গলে কাটায়। তখন সেরেঙ্গেটির ঘাস জলের অভাবে পুড়ে হলদে, বাদামি হয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষে ওখানে বৃষ্টি শুরু হয়। ওরা বলে ছোট বৃষ্টি। মানে দিনে তিন-চার ঘণ্টা বৃষ্টি হয়। তখন দু-তিনদিনের মধ্যে সেরেঙ্গেটিতে ঘাস গজিয়ে ওঠে। ঘাসের ফুল হাওয়ায় দোলে। সেই ঘাস খেতে ওয়াইল্ডবিস্টরা মাসাইমারা থেকে দলে দলে নেমে আসে সেরেঙ্গেটিতে। ছোট বৃষ্টির পরে বড় বৃষ্টি, ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত।

তখন ঘাস আরও বড় হয়েছে। কাঁটাওয়ালা আকাসিয়া গাছে সবুজ পাতা। ওয়াইল্ডবিস্টরা মনের আনন্দে চরে বেড়ায়। আর শুধু কি ওয়াইল্ডবিস্ট! ওদের সঙ্গে থাকে জেব্রা, বুনো মোষ, কয়েকটা করে জিরাফ-আর তাদের পিছনে আসে সিংহ, চিতা, হায়না প্রভৃতি মাংসাশী জন্তু এবং আকাশে শকুনের পাল। ওয়াইল্ডবিস্টদের সঙ্গে জেব্রাদের খুব ভাব। সিমবায়োটিক সম্বন্ধ ওদের। জেব্রারা জানে কোথায় জল পাওয়া যাবে। আর ওয়াইল্ডবিস্ট ঘাসের গন্ধ পায়। মে মাসের শেষে এই দঙ্গল আবার মাসাইমারা ফিরে যাবে সেই অক্টোবর পর্যন্ত। প্রায় দশ লক্ষ জন্তু এইভাবে বছরের পর বছর মাসাইমারা আর সেরেঙ্গেটির মধ্যে আনাগোনা করে।

ওয়াইল্ডবিস্টদের আরেকটা মজা আছে। ওদের সকলেরই বাচ্চা হয় ডিসেম্বর মাসে। মানে সেরেঙ্গেটির জঙ্গলে যখন প্রচুর খাবার।

ওয়াইল্ডবিস্টদের ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি। হঠাৎ দেখি প্রায় রাস্তার ওপরে এক দল স্পটেড হায়না কী একটা জন্তুর মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে। হাড় চিবোচ্ছে। দূরে চক্রাকারে বসে এক দল শকুনি। সত্যিই দিনে দুপুরে এত হায়না আর কোথাও দেখিনি। আরেকটু দূরে ফিদালি গাড়ি থামিয়ে বললে, নিচের দিকে চেয়ে দেখ। দেখি মাটির চাপড়ার মতো এক কচ্ছপ খোলার মধ্যে মাথা লুকিয়ে নট নড়ন চড়ন হয়ে আছে। তার খোলা জুড়ে চিতাবাঘের মতো ছাপ। ফিদালি বললে, ইনি হলেন চিতাবাঘ-কচ্ছপ। আমরা একটু স্থির হয়ে দাঁড়াতেই তিনি খোলা থেকে মুখ বার করে চারদিকে দেখে নিলেন এবং গুড়ি গুড়ি রাস্তার পাশে নালার দিকে এগোলেন।

আরও কিছু পরে দূরে একটা পাহাড়ের রেখা দেখে গেল। ফিদালি বলল, ওই হল কেনিয়ার মাসাইমারা। আগে এই রাস্তা সোজা কেনিয়ার মধ্য দিয়ে নাইরোবি পর্যন্ত যেত। রাস্তা এখনও আছে কিন্তু গরিব তানজানিয়ার লোকেরা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কেনিয়ায় গিয়ে ভিড় জমায় বলে কেনিয়ানরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি তানজানিয়ার সীমান্তে পৌঁছল। এরপরে দশ কিলোমিটার নো ম্যানস ল্যান্ড। ওপারে কেনিয়ার সীমান্তরক্ষীরা। তানজানিয়ার দিকে কোনও রক্ষীটক্ষি নেই। ছোট একটা বাংলো বাড়ির মতো। তার একটা ঘরে ইমিগ্রেশন। আরেকটা ঘরে কাস্টমসের অফিস। এখন সব তালা বন্ধ। বাংলোর কম্পাউন্ডে একটা আকাসিয়া গাছের তলায় শতরঞ্চি বিছিয়ে আহারাদির বন্দোবস্ত হল। প্যাকড লাঞ্চ। তা মাইগ্রেশন ক্যাম্প থেকে খাবার খুব ভালো দিয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পরে আবার সেই জঙ্গল ফুঁড়ে মাইগ্রেশন ক্যাম্পে যখন ফিরলাম তখন বেলা চারটে।

পরদিন সকাল নটায় বেরোনো। এদিন উল্টোদিকে যাওয়া গেল। সেরেঙ্গেটির বনাঞ্চলে অনেকগুলো বিভাগ আছে। তার মধ্যে সেরিনারার স্থান সকলের ওপরে। এখানে জন্তু জানোয়ার নানা রকমের তো আছেই। তার ওপরে চিতা নামে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটিকে দেখা যায়।

চিতা, বিড়াল আর কুকুর মেশানো জন্তু। ওজন চিতাবাঘের চেয়ে কম। চোখের দুপাশে দুটো গভীর খাঁজ থাকায় দূর থেকে কুকুরের মতো দেখায়। চিতা-বিড়ালবংশীয় হলেও, পায়ের নখ লুকোতে পারে না এবং কুকুরের মতোই পিছনের পা দুটো মুড়ে বসে সামনের পায়ের ওপর ভর দেয়। পৃথিবীর দ্রুততম জানোয়ার চিতা। শিকার ধরার সময় ওদের গতিবেগ ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছয়। তবে এই বেগ তিনশো মিটারের বেশি রাখতে পারে না। ওই তিনশো মিটারের মধ্যে শিকার ধরল তো ধরল, না হলে ছেড়ে দিয়ে অন্য শিকারের সন্ধানে যাবে।

চিতার দেখা পাওয়া গেল না। ফিদালি বলল, চিতা কি এরকম হুটপাট করে দেখা যায়? সারাদিন এবং কখনও কখনও কয়েকদিন জঙ্গলে ঘুরলে যদি ওদের দর্শন পাওয়া যায়। বাড়ি ফেরার পথে নতুন কিছু আর দেখা হল না। মাইগ্রেশন ক্যাম্পে ঢোকবার আগেই দেখি রাস্তায় একটা সাপ লম্বা হয়ে মরে পড়ে আছে। এক নজর দেখে ফিদালি বলল, বাবা এ যে কালো মাম্বা। কোদালের ফলার মতো চ্যাপ্টা মাথা। তবে প্রমাণ সাইজের নয়। বড় পাজি সাপ। তেড়ে এসে কামড়ায় আর সে কামড় একেবারে যমের পরোয়ানা। কিন্তু এটাকে মারল কে? গাড়ি চাপা পড়েনি। তাহলে থেঁতলো ভেতলো হয়ে যেত। বেজিও নয়। হয়তো কোনও পাখি মেরেছে কিন্তু তুলে নিয়ে যেতে পারেনি।

ক্যাম্পে ঢুকে দেখলাম আরও কয়েকজন ড্রাইভার দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওদের সঙ্গে একটু কথা বলছি হঠাৎ একজন আমার ঘাড়ে চটাস করে চড় মারল। অবাক হয়ে তাকাতেই ও বলল, সেৎসে মাছি। তোমার গায়ে বসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, কামড়ায়নি তো? ও বলল, সেৎসে কামড়ালে এতক্ষণে তুমি তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে। ও মাছির কামড় বোলতার হুলের মতো। আমি প্রশ্ন করি, সেৎসে মাছি চিনি কি করে? ওরা বললে মাছিগুলো আকারে সামান্য বড় হয়, রংটাও আলাদা, তবে অভিজ্ঞতা না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না কোনটা সেৎসে আর কোনটা সাধারণ মাছি। তাহলে উপায়? নিদালি ব্যাধি তো শুনেছি বড় কঠিন ব্যাধি। ওরা বলল, ঘাবড়াবার দরকার নেই। পনেরো লক্ষ মাছির ভেতরে একটা মাছির মুখে ব্যাধির বিষ থাকে। তবে মাছির গায়ে তো লেখা থাকে না কে বিষাক্ত আর কে বিষাক্ত নয়। তাই গায়ে কোনও মাছিই বসতে দেবে না।

ক্যাম্পে খাওয়াদাওয়া করে গাছের ছায়ায় ডেকচেয়ার পেতে বেশ একটা নিটোল নিদ্রা হল । বিকেলে উঠে দেখি যে পাঁচ-ছ হাত দূরে এক জানোয়ার বসে আছে । খরগোশের চেয়ে সামান্য ছোট । মেটে মেটে রং । কাঠবেড়ালির মতো সামনের দু পায়ে বাদামের মতো একটা ছোট ফল ধরে কুট কুট করে খাচ্ছে । লেজ নেই । আমাকে আড়ামোড়া ভেঙে উঠতে দেখে পিট পিট করে তাকাল তারপর তার কাজ সে করে যেতে লাগল । চা নিয়ে যে ওয়েটার আসছিল তাকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে? সে বলল, পাহাড়ে হাইর্যাকস । ওদের একটা দল এই টিলার গর্তে থাকে আর দিনেরবেলা গাছে গাছে ঘুরে ফল পাকড় খায় ।

সেদিন রাতে লোক কম । সেই চারটি হনিমুন কাপল, এক আমেরিকান ভদ্রলোক এবং ইয়েন ল্যারি আর আমরা দুজন । একটা লম্বা টেবিলে এক সঙ্গে বসে খাওয়া হল । কে কি জন্তু দেখেছে তার গল্প । দুটি হনিমুন কাপল চিতার দেখা পেয়েছে । তবে ওরা সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে সন্ধ্যা পাঁচটায় ক্যাম্পে ফিরেছে ।

সে রাতে আমাদের ক্যাম্পের আশপাশে যেন জন্তুদের হাট বসল । হিপোর ঘোঁৎ ঘোঁৎ তো আছেই, জানলার পাশ দিয়ে দুটো হরিণ দৌড়ে গেল । ওদের কিছুতে তাড়া করেছে কি? এক সময়ে জানলায় চোখ লাগিয়ে দেখি অন্ধকারে দুটো বড় বড় চোখ জ্বলছে । কি জন্তু ওটা? দুটো বড় বড় ছায়া হেলতে হেলতে চলে গেল । হাতি । পরদিন সকাল বৃষ্টিভেজা মাটিতে নানা পায়ের দাগ । আসকারি পরিচয় দিচ্ছে । এই বড় বড় ছাপগুলো বন্য মহিষ । ছোট ছাপগুলো জিরাফ । ওমা এই যে দুটো হাতি । হরিণ ওয়াইল্ডবিস্ট আর জেব্রার তো কথাই নেই ।

সেরেঙ্গেটি এবং নগোরোংগোরোর জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার ছাড়াও কত রকমের যে পাখি । রংবেরঙের পাখি । ছোট্ট সানবার্ড থেকে ঈগল অবধি ।

বিলগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্লেমিঙ্গো জলে ভাসছে । খুঁটে খুঁটে পোকামাকড় খাচ্ছে । একটা বন্দুকের আওয়াজ করলে (যদিও সংরক্ষিত জঙ্গলে বন্দুক বারণ) সেই পাখির দল আকাশে উঠবে । ওদের ডানায় লালচে গোলাপি রং চমকায় । জলচর পাখিও অনেক । টিল, করমোর্যান্ট, বিরাট ঠোঁটওয়ালা পেলিক্যান, স্টর্ক, পেন্টেড ক্রেন ।

পরদিন সকালে রওনা । নাইরোবি হয়ে লন্ডন । বেশ গেঁটে যাত্রা । প্রথমে মোটরে সেরেনারা এয়ারস্ট্রিপ । সেখানে ছোট্ট এক ইঞ্জিন প্রোপেলার প্লেনে আরূষা । চল্লিশ মিনিট এয়ারস্ট্রিপে সাতদিনের বন্ধু ফিদালি বিদায় নিল । যাবার সময় আমাদের দুটি লাঞ্চ প্যাকেট দিয়ে গেল । ভাগ্যিস দিয়েছিল, না হলে ওদিন আমাদের দুপুরের খাওয়া জুটত না । তার আগে যখন ক্যাম্প থেকে বেরোই আমাদের রুম বেয়ারা এডওয়ার্ডের চোখে জল ।

বলে, আমার এই ক্যাম্পে পাঁচ বছর হল কিন্তু তোমাদের মতো ভালো লোক কখনওই দেখিনি । আর তোমরা কত দূর দেশে থাক । আরূষা হলেও আমি মাঝে মাঝে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসতাম ।

ভ্রমণ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

এবারের কুম্ভমেলায়

চিন্ময় চক্রবর্তী

এবছরের ১২ এপ্রিল পুণ্য কুম্ভক্ষেত্রে ঘুম ভাঙল মাইকের সরকারি ঘোষণায়-'যমনা বাঈ জিনকী উমর সত্তর, যো জম্মুসে আঁয়ে হ্যাঁয়, আপনে সাথী সে বিছর কর, বহুত থকে হুয়ে খোয়া পায়া কেন্দ্রমে আপনে সাথীকা ইনতেজার কর রহে হ্যাঁয় । সুরেশ, বিক্রম ইয়া উনকা কোই ভি সাথী উনকো ইঁহাসে লে যায়ে' । মিনিটখানেক পরেই আরেকটি ঘোষণায় জানা যায় কেরল থেকে আসা একটি দশ বছরের ছেলের হারিয়ে যাবার কথা । কদিন ধরে সারাদিন, সারারাত সরকারি ঘোষণা কেন্দ্র থেকে এই ধরনের ঘোষণা প্রমাণ করে ভারতের প্রত্যেকটি কোণ থেকে লোক এসেছে কুম্ভমেলায় । শুধু ভারত কেন, আমার সঙ্গে এই দুদিনে পরিচয় হয়েছে জার্মানির উলফগ্যাঙের, লস এঞ্জেলসের স্বামী-স্ত্রী জুটি জন আর নাটালিয়ার, ইটালি থেকে আগত একটি দলের, ইংল্যান্ডের ফটোগ্রাফার স্টুয়ার্টের ।

নারদ-পুরাণে আছে যে ব্যক্তি হরিদ্বারে কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতি ও মেষরাশিস্থ সূর্যযোগে (কুম্ভযোগে) স্নান করে সে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিত্ব ও সূর্যত্ব প্রাপ্ত হয় । এই মহাপুণ্যের লোভেই আপামর ভারতের সাধু-সন্ত আর সাধারণ মানুষেরা কুম্ভযোগে হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নানার্থে আসেন । যেসব উচ্চকোটির সাধকরা মানুষের সামনে আসেন না, তাঁরাও নাকি পূর্ণকুম্ভে স্নান করতে তাঁদের গুপ্ত আবাস ছেড়ে হরিদ্বারে আসেন । আর সাধুসঙ্গ ও স্নানের পুণ্যলাভের আশায় আসেন লাখ লাখ পুণ্যার্থী ।

হরিদ্বার শহরের বাইরে বাস থেমে গেল । আর যাবে না । সরকারি গাড়ি আর রিকশা ছাড়া অন্য যানবাহনের শহরে প্রবেশ নিষেধ । হাজার হাজার যাত্রী বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে হেঁটে চলেছে হরিদ্বার শহর অভিমুখে । আমিও সামিল হই সেই মিছিলে ।

সারা হরিদ্বার বাঁশে বাঁশে ঘেরা আর তাঁবুতে তাঁবুতে ছাওয়া । সব ফাঁকা মাঠে সার সার তাঁবু । হর-কি-পৌড়ির অপর পারে নীলধারা আর চণ্ডী পাহাড়ের দিকটা বাঁশে বাঁশে ব্যারিকেড করা । সব রাস্তাই একমুখী । চারদিকে পুলিশের কড়া পাহারা । রাস্তা একমুখী হওয়াতে যাত্রীদের ব্রহ্মকুণ্ড অঞ্চলে যেতে হাঁটতে হচ্ছে বেশি, কিন্তু উল্টো জনস্রোত না থাকায় ভিড়ের ধাক্কাধাক্কি নেই । প্রতি কুম্ভে এই ধাক্কাধাক্কি আর হুড়োহুড়িতে পদদলিত হয়ে মারা যান বেশ কিছু তীর্থযাত্রী ।

১৯৫৪-র কুম্ভে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে স্নান করাতে গিয়ে প্রশাসন সাধারণ স্নানার্থীদের স্নান কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখে । অধৈর্য স্নানার্থীদের ধাক্কাধাক্কিতে, ভিড়ের চাপে আর পদদলিত হয়ে প্রাণ হারান ১০০০ জন পুণ্যার্থী । ১৯৮৬-র হরিদ্বারেই পূর্ণকুম্ভে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে স্নান করাতে গিয়ে আবার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৫০ জন স্নানার্থী । এইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯৮৯-এর প্রয়াগের কুম্ভেয় ভি আই পি স্নান বন্ধ করা হয় । সেই নিষেধাজ্ঞা এবছরও বহাল ছিল । ভি আই পি স্নানের জন্য ব্রহ্মকুণ্ড অঞ্চলে ছিল নিষিদ্ধ এলাকা ।

১৪ জানুয়ারি, মকরসংক্রান্তি থেকে স্নান শুরু হয় । প্রথম শাহী বা মহাস্নান ছিল ২৫ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রিতে । ওইদিন ব্রহ্মকুণ্ড ও সংলগ্ন অঞ্চলে ২০ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান করেন । দ্বিতীয় শাহী স্নান ২৮ মার্চ মৌনি অমাবস্যায়, ২৫ লক্ষ লোক স্নান করেন । আর তৃতীয় তথা শেষ শাহী স্নান হয় ১৪ এপ্রিল । সংবাদ সংস্থার দেওয়া হিসাব অনুসারে ওইদিন কুম্ভক্ষেত্রে মোট ১ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেন ।

১৩ এপ্রিল রাত বারোটা থেকে লাখ লাখ মানুষের ঢল নামে হরিদ্বারের পথেঘাটে । সবার লক্ষ্য হর-কি-পৌড়ি আর ব্রহ্মকুণ্ড । এত লোকের পক্ষে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সম্ভব নয় । তাই অধিকাংশ স্নানার্থীকেই হর-কি-পৌড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে আসতে দেওয়া হয়নি । ১৩ ও ১৪ তারিখ হরিদ্বারে সমস্ত যানবাহন মায় রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় । হাজার হাজার পুলিশ, র্যাফ, বি এস এফ ও ভলান্টিয়ার পথে নামে ভিড় সামলাতে । সবার উদ্দেশ্য এক, দুর্ঘটনা না ঘটে । কেননা, ২৮ মার্চের স্নান নিয়ে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে সাধু আর পুলিশে । আহত হয়েছে বিস্তর । নিহত একজন পুণ্যার্থী ।

২৮ মার্চ আগে থেকে তৈরি ক্রমানুযায়ী ও প্রথাগত নিয়ম মেনে নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা প্রথমে স্নানে আসেন । তাতে জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীদের গোঁসা হয় । তাঁরা স্নান করতে এসে তাঁদের স্নানের জন্য নির্দিষ্ট সময় যথেষ্ট নয় বলে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে উঠতে অস্বীকার করেন । পুলিশ এসে জোর করে তুলতে গেলে দাঙ্গা বাঁধে । সাধারণ দাঙ্গাকারীদের মতো সন্ন্যাসীরা ভাঙচুর করেন ও অন্য আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দেন । পুলিশ-সাধুতে খণ্ডযুদ্ধ চলে ।

তবে কুম্ভয় প্রথম স্নানের অধিকার নিয়ে এই দাঙ্গা নতুন নয় । ১৭৬০ সালে অর্থাৎ প্রায় ২৩৮ বছর আগে গোস্বামী আর বৈরাগীদের দাঙ্গায় প্রাণ হারান ১৮,০০০ পুণ্যার্থী । ১৭৯৬-এ ৫০০ স্নানার্থীর মৃত্যু হয়, ১৮১৯ সালে মারা যায় ৪৫০ নরনারী ।

এই দাঙ্গার ভয়েই ১৪ এপ্রিল ছিল কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা । ২৮ মার্চের গণ্ডগোলের ফলে আখড়ায় আখড়ায় প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হয় । তাই ১৪ এপ্রিলের স্নানে কোন আখড়া

প্রথম স্নান করবে, পরবর্তী ক্রম কী হবে তার কোনও সর্বসম্মত সূচি তৈরি করা যাচ্ছিল না। অগত্যা প্রশাসন ১৪ এপ্রিলের স্নানই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই অভূতপূর্ব ঘোষণায় হতবাক হয়ে যান স্নানার্থে আসা লাখ লাখ পুণ্যার্থী ও সাধু সম্প্রদায়। এই অচলাবস্থা কাটাতে একটানা বৈঠক চলে সাধুসমাজ আর প্রশাসনের। ১৪ এপ্রিল রাত আড়াইটায় সমঝোতা সূত্র বেরোয়। স্নানের বাধা ওঠে। কিন্তু জুনা আখড়া স্নান বয়কট করেন। আর শেষ মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে সাধুদের বর্ণাঢ্য মিছিলের জৌলুস কমে যায়। এত কম সময়ে সব জোগাড় সম্ভব করে উঠতে পারে না বিভিন্ন আখড়া।

অবশেষে ১৪ এপ্রিল বেলা ১২টা নাগাদ নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা শোভাযাত্রা করে স্নানে আসেন। তারপর মহানির্বাণ ও আনন্দ আখড়ার সন্ন্যাসীরা। যদিও শোভাযাত্রায় ছিল না বাদ্যযন্ত্র, ছিল না জৌলুস, তবু নাগা সন্ন্যাসীদের দর্শনার্থে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে। শেষে স্নানে আসেন বৈরাগী, উদাসীন ও অন্য আখড়ার সাধুরা।

হরিদ্বার স্টেশনের কাছে জুনা আখড়ায় সার সার তাঁবু পড়েছে। হাজার কুড়ি নাগা সন্ন্যাসী এই আখড়ার অন্তর্ভুক্ত। পুণ্যার্থীরা ভিড় করে দর্শনে মত্ত।

বৈরাগ্য আর ত্যাগের মূর্ত প্রতীক নাগা সন্ন্যাসীদের বিলাস-ব্যসন দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। আখড়ায় আখড়ায় নরম দামি কার্পেট পাতা। রঙিন টিভি, টেবিল ফ্যান আর টু-ইন-ওয়ানের ছড়াছড়ি। টেপে ভক্তিগীতি বাজছে। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো গাঁজার কলকে আর বিদেশী সিগারেট। বাবা উদোম হয়ে, সারা গায়ে ভস্ম মেখে, পদ্মাসনে বসে টেবিল ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছেন। দেশী-বিদেশী পুরুষ-মহিলা ভক্তদের আনাগোনা আর উপঢৌকন প্রদান চলছে। বাবা কলকেয় টান মেরে অর্ধ নিমীলিত চক্ষে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। হুঁশ নেই।

১৪ এপ্রিল রাত দুটো। চলেছি হর-কি-পৌড়ির ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। সারাটা রাত ধরে লাখ লাখ যাত্রী চলেছেন ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। এক নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্য-প্রবাহ। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো কালো মাথা। কে নেই সে মহামিছিলে-বুড়ো-বুড়ি, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বাচ্চা, বিদেশী-দেহাতি। মানুষের সে ঢল না দেখলে মনে হবে অবিশ্বাস্য। সমস্ত রাস্তা একমুখী। যে রাস্তায় যাওয়া সে রাস্তায় ফেরা নয়। দুই বিপরীতমুখী জনস্রোত না থাকায় ধাক্কাধাক্কি কম। কিছুদূর অন্তর পুলিশের ব্যারিকেড। যদিও এই মিছিল মোটামুটি মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে, তবুও পুণ্যার্থী মানুষ বড় অবুঝ। সবারই তাড়া ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছনোর। বেলা দশটা থেকে ব্রহ্মকুণ্ডে সাধারণের স্নান নিষিদ্ধ। তখন স্নান করবে সন্ন্যাসীরা। তাই চেষ্টা চলছে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ব্যারিকেডের ফাঁকফোকর দিয়ে

শর্টকাট পথে চলার । ধৈর্য হারিয়ে পুলিশকে বেশ কবার মৃদু লাঠিচার্জ করে ভিড়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে দেখলাম ।

হর-কি-পৌড়ির ওপরে দুটি টাওয়ার করা হয়েছে । একটিতে ভিড়ের ওপর নজর রাখার জন্য বসেছে ক্লোজ সার্কিট টিভি । অন্যটি দেশ-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমের ফটোগ্রাফারদের জন্য সংরক্ষিত । এই টাওয়ারেই জুটে গেল একটু জায়গা । আলোয় আলোয় হর-কি-পৌড়িতে দিন-রাতের পার্থক্য ঘুচে গেছে । দূরে চিল্লা অরণ্যের ওপর শিবালিক পর্বতমালায় সূর্যোদয় হয় । আলতারাঙা ভোরে সূর্যের তির্যক প্রথম রশ্মি এসে পড়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানরত নরনারীর ওপরে ।

বেলা দশটায় বন্ধ হয় সাধারণের স্নান । ব্রহ্মকুণ্ডকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে প্রস্তুত করা হয় সন্ন্যাসীদের শাহী স্নানের জন্য । বেলা বারোটা নাগাদ আসে প্রথম সন্ন্যাসী দল শোভাযাত্রা করে । সে দলে নাগা সন্ন্যাসীদের আধিক্য । ততক্ষণে ব্রহ্মকুণ্ডের এপারে আর চারপাশে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় । নাগাদের পর অন্য সম্প্রদায়ের সাধুরাও একে একে মিছিল করে স্নান করে গেলেন । সাধুদের পিছনে পিছনে একই মিছিলে সামিল গৃহী ভক্তরাও স্নান করে গেলেন । একেকটা আখড়ার স্নানের পর ব্রহ্মকুণ্ড ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে দেওয়া হয় পরের আখড়ার জন্য । সন্ন্যাসীদের এই স্নান পর্ব চলল সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ।

হরিদ্বারে সন্ধে সাতটায় বেশ দিনের আলো । হর-কি-পৌড়ির ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াই ইতস্তত । রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা ভগৎরামের সঙ্গে দেখা । সে এক বিশাল প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিদ্বারের পথেঘাটে । প্ল্যাকার্ডে দহেজ তথা পণবিরোধী স্লোগান । আমেরিকার শিকাগো থেকে মিলার আর তাঁর বান্ধবী শ্যারন এসেছেন সৎগুরুর খোঁজে । আর নিউজিল্যান্ডের মার্গারিটা এসেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে । বিশাল প্ল্যাকার্ড বয়ে একদিনে চষে ফেলেছেন হরিদ্বারের পথঘাট । প্ল্যাকার্ডে তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্বামী জনের ছবি । জন ভারতে এসে নিখোঁজ আজ তিন বছর । কেউ খোঁজ দিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার । ভারতের প্রত্যেক কোণ থেকে এক কোটির ওপর লোক এসেছে হরিদ্বারের কুম্ভে । মার্গারিটার স্থির বিশ্বাস কেউ না কেউ ঠিক খোঁজ দেবে জনের ।

কুম্ভমেলা ভাঙার মুখে । মানুষের ঢল বিপরীতমুখী, রেলস্টেশন আর বাসস্টেশনের দিকে । আমি এসেছিলাম কুম্ভমেলা দেখতে । পুণ্যস্নান করা হয়নি । কিন্তু কুম্ভে হরিদ্বারে এলেই যদি পুণ্য হয়, তবে আমার অর্জিত পুণ্যের পুরোটাই আমি মার্গারিটাকে দিলাম । সার্থক হোক তাঁর অন্বেষণ ।

ভ্রমণ জুলাই, ১৯৯৮

অন. পথের পথিক

বুদ্ধদেব গুহ

জিম করবেট-এর ‘জাঙ্গল লোর’-এ একটি ঘটনার কথা উনি খুব রসিকতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । ওঁদের নৈনিতালের বাড়ি থেকে এক অতিথি নবাগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে উনি কালাধুঙ্গিতে নেমে আসছিলেন । বেরিয়েছিলেন অন্ধকার থাকতে । যদিও পথের পুরোটাই প্রায় উতরাই-এ, তবু অনেকখানি পথ । তখনকার দিনে পথ পিচবাঁধানো ছিল না এবং স্বাভাবিক কারণেই দুর্গমও ছিল । কিন্তু পথপাশের যা সৌন্দর্য-কুমায়ুন হিমালয়ে-উঁচু পাহাড় থেকে নিচের গহন বনবেষ্টিত উপত্যকাতে নেমে আসার সময়ে গাছপালা, অর্কিড, ফুল, লতা, পাখপাখালি এবং প্রভাতী বন্যপ্রাণীর যে বৈচিত্র চোখে পড়ে তা যাঁর চোখ বা কান আছে শুধু তাঁরই জন্যে । শুধু তাঁরই জন্যে ।

চোখ-কান সকলেরই থাকে একজোড়া করে, গর্দভপ্রবর থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরও । কিন্তু আবার থাকেও না ।

সেই কারণেই গলদঘর্ম হয়ে যখন কালাধুঙ্গিতে ওঁরা দুজনে এসে পৌঁছলেন, করবেটসাহেব ভদ্রলোককে (উনি ইচ্ছে করেই অর্বাচীনের নামোল্লেখ করেননি!) জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন লাগল? পথটুকু?

ভদ্রলোক উত্তরে বলেছিলেন, কী বিচ্ছিরি পথ বা ওইরকমই কিছু ।

ওই পথ ধরে, ভীমতালের আশ্চর্য সবুজ জলরাশিকে বাঁপাশে রেখে আমারও নৈনিতাল থেকে কালাধুঙ্গিতে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল একাধিকবার । ওই পথের মতো সুন্দর পথ সত্যিই বেশি নেই । জিম করবেট-এর চোখ দিয়ে দেখে কান দিয়ে শুনেই বলছি । এবং হয়তো নিজের চোখ ও কান দিয়েও । এ সৌন্দর্য সাধারণ পর্যটকের উপলব্ধির নয়, যাঁরা ‘পথ’ বলতে পথের মসৃণতার কথাই শুধু বোঝেন, তাঁদের জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ সৌন্দর্যই নয় ।

যে কথা প্রাঞ্জল করে বলার জন্যে এই উপক্রমণিকা তা এই যে, পথ, কখনওই পথে থাকে না । গন্তব্যও থাকে না গন্তব্যে । পথ ও গন্তব্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে পায়ে বা গাড়ির চাকাতে মাড়িয়ে যাওয়া পথের দুপাশে । গন্তব্যে পৌঁছনো আর ভ্রমণ কখনওই সমার্থক

নয় । বুড়ি-ছোঁয়া আর ভ্রমণার্থীর অন্তরের আনন্দ, যা পথের সৌন্দর্য, শব্দ-গন্ধ এবং শান্ত নির্লিপ্তির ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কখনওই সমার্থক নয় । রবীন্দ্রনাথের গান আছে না? ‘পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে?’-ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকমই । যে ভ্রমণার্থীর অন্তরেই পুষ্প নেই তাঁর ‘ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স’-এ যাওয়ার কোনও মানে নেই ।

আরও একটা কথা । ভ্রমণ ব্যাপারটার পিণ্ডি চটকে দিয়েছেন একধরনের ব্রিটিশ ও আমেরিকান ট্যুরিস্টরা । তাঁদের দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানো, কাঁধে ক্যামেরা-ঝোলানো স্বল্পমেয়াদী কন্ডাক্টেড ট্যুরের মানসিকতা দিয়ে । সারা পৃথিবী এখন অন্ধের মতো এই মানসিকতারই শিকার হয়ে গেছে । যা কিছু দ্রষ্টব্য তার সবকিছুই পাঁচ-দশদিনের পুরিয়াতে ভরে গিলে ফেলা, আর যাই হোক প্রকৃত ভ্রমণার্থীর প্রার্থনার নয় । অমন ট্যুরে স্কাউটিং হতে পারে কিন্তু ভ্রমণ হয় না । এই মানসিকতা অন্ধত্বের সাধনাতেই শেষ হয় ।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দিতে পারি । হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু থেকে ‘পার্ল হারবার’ (যেখানে জাপানিরা বোমা ফেলে আমেরিকাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টেনে নামিয়েছিল) এবং মিস্টার ডোল মান্ডি নামের এক ভদ্রলোকের আদিগন্ত আনারসের বাগান দেখার জন্যে রওয়ানা হয়েছি এক সকালে, ব্রেকফাস্ট সেরে ওয়াইকিকি সমুদ্রতটের হলিডে ইন থেকে । কয়েক মাইল যাবার পরেই ড্রাইভার হঠাৎ বাস থামিয়ে দিলেন এবং গাইড চেঁচিয়ে বলে উঠলেন-লুক! দিস ইজ আ পাইনঅ্যাপল ট্রি ।

চেয়ে দেখি, একটি ডিসিডুয়াস, কিন্তু নাম না-জানা বড় গাছ, আমাদের বছর দশেকের শিমুলের মতো চেহারা তার; এবং তারই পত্রশূন্য ডালে ডালে অগণ্য আনারস বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । এমনভাবে যাতে ওই গাছেরই ফল বলে ভ্রম হয় ।

আর কি তর সয়! হুড়মুড় করে ট্যুরিস্টরা, যাঁদের অধিকাংশই মেইনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য প্রান্ত জাপান থেকে এসেছিলেন, বাস থেকে নেমে স্টিল ক্যামেরা, এবং মুভি ক্যামেরা দিয়ে (তখনকার দিনে ভিডিও ক্যামেরা তেমন আকছার দেখা যেত না, আবিষ্কার হয়েছে কি না তাও বলতে পারব না ।) ছবি তুলতে লাগলেন । আমার একার সাধ্য কী যে তাঁদের থামাই?

অবশ্য থামানো উচিতও ছিল না । এই ট্যুরের উদ্যোক্তরা ইচ্ছে করেই, যাঁরা ট্রপিকাল দেশের গাছ-পাতা ফল-ফুল সম্বন্ধে কিছুমাত্রই জানেন না, তাঁদের বোকা বানিয়ে মজা করা ও মজা দেওয়ার জন্যেই ওই বন্দোবস্ত করেছিলেন । যাঁরা জীবনে আনারস গাছ দেখেননি সে বেচারারা জানবেনই বা কী করে । তাছাড়া বোকা-বনাটাও ভ্রমণের আনন্দের মধ্যে গণ্য । হাওয়াইতে যেতে হলে অবশ্য সেপ্টেম্বরে ‘আলোহা’র সপ্তাহে যাওয়াই ভালো ।

যেখানেই কেউ যাবেন সেখানেই যে ক্যামেরা নিয়ে গাদা-গুচ্ছের ছবি তুলতেই হবে এই Ritual-এর স্বপক্ষে কোনও অকাট্য যুক্তি আছে বলে মনে হয় না । এ বাবদে বাঘা ভ্রমণার্থী এবং সেরা রসিক সৈয়দ মজুতবা আলি সাহেবের সাগরেদ আমি । যাঁরা ওঁর 'দেশে বিদেশে' বইখানি পড়েননি তাঁরা দয়া করে পড়ে নিলে জানতে পারবেন দেশভ্রমণ ব্যাপারটার নিগূঢ় তত্ব । ভ্রমণ ব্যাপারটা যে কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণাও হবে ।

উনি ক্যামেরাতে পুরোপুরি অবিশ্বাসী ছিলেন । লিখেছেন, চোখের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লেন্সে সব জায়গার ছবি তুলে আমি আমার মস্তিষ্কের ডার্করুমে রেখে দিই । তারপর যখন খুশি ডেভেলপ করে নিই নেগেটিভ । তারপর খুশিমতো প্রিন্ট করি, এনলার্জও করি ।

আমারও তাই মত । ফটাফট ছবি না তুলে, সার্বেন্দ্রিয় দিয়ে কোনও বিশেষ স্থান, কোনও বিশেষ ক্ষণ, কোনও বিশেষজনকে সমস্ত ইন্দ্রিয়র শক্তি ও অনুভূতির দ্বারা স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন বন্দী করে রাখা উচিত, যাতে সেই স্থান বা ক্ষণ বা জনকে চিরটাকাল তাদের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-ও স্পর্শসমেত সতেজ সজীব করে রাখা যায় নিজের মনের চোখে, নাকে এবং কানে । ভ্রমণ একটা আর্ট বিশেষ, এক একক তীর্থযাত্রা; সঙ্গে অগণ্য সঙ্গী থাকলেও । ভিড়ের মধ্যেও নির্জনতা খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতাও ভ্রমণার্থীর অবশ্যই থাকা উচিত । না থাকলে, তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত ।

ভ্রমণের আরও একটা মস্ত বড় দিক, নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখা । যূথবদ্ধ, অন্যচালিত হয়ে; নিজের ইচ্ছা ও খুশিকে পদে পদে পদদলিত করলে ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায় ।

এই জীবনের পথের এখনও হয়তো অনেকখানিই বাকি তবু আমার নিজের দেশের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, এবং পুবের প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে পশ্চিমের শেষ প্রান্ত অবধি দেখার সৌভাগ্যই শুধু নয়, বারে বারে, চিরে চিরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বলে মনে করি । কারণ, এ যে স্বদেশ! এমন দেশ আর কোথায় পাব? এ যে জন্মভূমি!

তারই সঙ্গে সৌভাগ্য হয়েছে পশ্চিম গোলার্ধের অধিকাংশ দেশ, জাপান, আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, আফ্রিকা এবং ভারতের মধ্যে ভারত মহাসাগরের সেশেলস দ্বীপপুঞ্জ দেখার, পৃথিবীর ম্যাপে সর্ষে দানার মতো দেখায় যে দ্বীপপুঞ্জ । দ্বীপগুলি এতই ছোট যে সবচেয়ে বড় দ্বীপটি, যে দ্বীপে সেই স্বাধীন দেশের রাজধানী, যার নাম 'মাহে' তারই আয়তন সবসুদ্ধ কুড়ি-পঁচিশ বর্গকিলোমিটার । কিন্তু ছবির মতো । ছবিও নয়; স্বপ্নের মতো । পৃথিবীতে এমন বেলাভূমি বেশি নেই । হাওয়াই

দ্বীপের চারপাশে, আমাদের আন্দামানে, কেরালার কোভালম-এও প্রবালের স্তর আছে কিন্তু প্লেনটা যখন উচ্চতা হারিয়ে ঘুরে ঘুরে নিচে নামে, তখন সেশেলস দ্বীপপুঞ্জকে দেখে মনে হয় স্বপ্নে দেখা কোনও পরীরই দেশ । কত নরম রঙের প্রবালের রঙিন আভা যে জলের নীলকে নানা রঙে আভাসিত করে রাখে তা নিজচোখে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না ।

কোজাগরী পূর্ণিমাতে সুইটজ্যারল্যান্ডের কোনও ছোট্ট গ্রামের পথে রাতের বেলা পায়ে হেঁটে বেরোলে স্যুইস আল্পস-এর বরফঢাকা চুড়োগুলি খুবই সুন্দর সুন্দর লাগে সন্দেহ নেই । সুন্দর লাগে পুব আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমানজারোর বরফাবৃত গোলাকৃতি চেহারাটাও বা দুর্দান্ত মাসাই উপজাতিদের বাস যেখানে, সেই মাউন্ট মেরুকেও-তানজানিয়ার 'আরুশা' শহর থেকে । ওই আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আমাদের বর্ষাকালেই শীতকাল । চমৎকার লাগে আফ্রিকার রুয়েঞ্জোরি রেঞ্জ-এর 'মাউনটেইন অব দ্য মুন' বা 'চাঁদের পাহাড়' । গা-ছমছম করে, কোনও চাঁদের রাতে আফ্রিকার গোরোংগোরো জ্বালামুখের বলয়ের ওপরের সাফারি লজ-এর বারান্দায় কয়েকহাজার ফুট উচ্চতাতে বসে চাঁদের রাতের আলোছায়ার রহস্যে ঘেরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মৃত আগ্নেয়গিরির গর্ভের দিকে চেয়ে থাকতে । গোরোংগোরোর বলয় ঘিরে প্রাগৈতিহাসিক সব অতিকায় বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে আছে-'The Upside Down Trees' এবং সেই জ্বালামুখের গর্ভর মধ্যে পাহাড় আছে । হ্রদ আছে, জঙ্গল আছে, তৃণভূমি আছে, জলের কাছে হলুদরঙা ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া গাছের বন আছে, আর আছে আফ্রিকার প্রায় অধিকাংশ প্রজাতির বন্যপ্রাণীই । হাতি, দু-খড়্গা গণ্ডার, বুনো মোষ, সিংহ, শিকারি চিতা (আমাদের লেপার্ড নয়), জেব্রা, গ্যাজেলস (নানারকম) কিশোরীর স্বপ্নের মতো ফিকে কমলা-রঙা ঠোঁট, আর পা আর পালকেরও ফ্লেমিংগো পাখির দল হ্রদের মধ্যে ।

জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপের পাহাড়ের ওপরে বৌদ্ধ গৃহস্থর নির্জন আবাসে-ঝরনার কুলকুলানির মধ্যে পাথর-ফেলা পায়ে-চলা পথ, সাঁকো-বানানো আর বনসাই করা বাগানের মধ্যে হিমরাতে কিছুক্ষণ বসে থেকে ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়ির উষ্ণ অভ্যন্তরে ঢুকে, বাইরে জুতো খুলে রেখে, ঘরের ভেতরের মাদুরের 'টাটামি' মেঝেতে বসে জাপানি রাইস-ওয়াইন 'সাকে' গরম করে সুন্দর জাপানি ওয়াইন-বোল-এ করে গৃহস্বামীর সঙ্গে পান করাতেও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ।

জাপানের কিছু কোণে এখনও পুরনো, হুবহু আমাদের কীর্তনের সুরের মতো প্রাচীন জাপানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনা যায়-প্রাচীন নাটকে-'কাবুকাজে'-তে । এখনও খুঁজলে খুঁজে পাওয়া যায় সেই জাপানকে যে-জাপানের আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা চিরদিন ছিল । যে-জাপান আমেরিকান-জাপান নয় । শান্ত, নিভৃত, টেনশন-ফ্রি জাপান । তবে আমার দেখা

জাপানের সঙ্গে আজকের জাপানের তুলনা হয়তো চলবে না কারণ আমি জাপানে গেছিলাম প্রায় কুড়ি বছর আগে। যে-জাপানের কথা আমি বলছি তার সঙ্গে কাজ-পাগল বিলাসিতা-পাগল জাপানের কোনও তুলনাই চলে না। পশ্চিমের অনুকরণ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, আজ তা সম্পূর্ণ হয়েছে।

অস্ট্রিয়াতে একটি জেলা আছে, তার নাম টিরল। যদি কখনও যেতে পারেন ওদিকে, তবে টিরল-এ থেকে আসবেন কদিন। শুধুই বুড়ি ছুঁয়ে আসবেন না। আমি টিরলেও গেছিলাম শরৎকালেই। তখন ডরফফেস্ট উৎসবের সময়। গ্রীষ্মে, গরুরা সব চরতে গেছিল পাহাড়ে, বড় বড় শেফার্ড-ডগদের পাহারাদারিতে। শীত নামবে শিগগিরি। 'এল যে শীতের বেলা, বরষ পরে।' তাই গরুদের সব পাহাড় থেকে নামিয়ে আনা হয় তখন। সেই কারণেই গির্জাতে গির্জাতে একটি বিশেষ দিনে প্রার্থনা হয়। বাড়ি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হয়। মার্সিডিজ ও বি এম ডাব্লু গাড়িতে দীর্ঘ সারি বেঁধে, প্রত্যেক গাড়ির বনেটের ওপরে নানাবর্ণের টাটকা ফুলের তোড়া সাজিয়ে রেখে অস্ট্রিয়ানরা চলেছে গির্জাতে উপাসনার জন্যে, দেখতে পাবেন।

নয়তো যেতে পারেন গ্রিস-এর কোনও ছোট্ট দ্বীপে, কদিনের জন্যে। যদি পারেন যেতে। 'জোর্বা দ্য গ্রিক' ছবিটা কি দেখেছেন? অ্যান্থনি কুইন অভিনীত? না দেখলে, জোগাড় করে দেখে নেবেন একবার। পুরো ইউরোপের মধ্যে গ্রিস এক আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র জায়গা। গ্রিসই গ্রিসের তুলনা অথবা গ্রিসে যান সবচেয়ে কম ট্যুরিস্ট পৃথিবীর পূর্বী দেশগুলি থেকে। জানি না কেন। ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানদের মধ্যে যাঁদের নির্জনতাপ্রিয়তা আছে এবং ভাবনাচিন্তা করার প্রবণতা আছে তাঁরা গ্রিসে অনেকেই যান।

গ্রিসেও যদি না যান, তবে আমার মতো যাঁরা হেমিংওয়ের ভক্ত তাঁরা যেতে পারেন ইউনাইটেড স্টেটস-এ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাঁর ঘর ছিল। তিনি তো আর হতভাগ্য বাঙালি লেখক ছিলেন না। যাবেন তাঁর প্রিয় বাড়িটি দেখার জন্যে। যে-বাড়িতে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। যেখানে জীবনের শেষে থিতু হয়েছিলেন। আইডাহো, কেচামের বাড়ি, যুক্তরাষ্ট্রে 'স্নেক' নদী যেখানে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সাপেরই মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। যে-বাড়ির টেরাসে তাঁর প্রিয় বেড়ালদের মধ্যে বসে হেমিংওয়ে মৃত্যুর আগে আগে উদাস চোখে চেয়ে থাকতেন, সেই 'The Topping House-এ।'

এ বাড়িটি এবং পরিবেশ আমার এতই ভালো লেগেছিল যে, আমাদের দেশের বিহারের রাঁচি-পালামৌর সীমান্তে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে জঙ্গল-পাহাড়ঘেরা এবং একটি পাহাড়ি ঝরনার পাড়বসানো যে-বাংলোটি একজন স্কটম্যান-এর কাছ থেকে কিনি ষাটের দশকের শেষে, যে-বাংলোর কথা 'চানঘরে গান'-এ বলেছি সবিস্তারে, তারও নাম রাখি 'The

Topping House' । তখনকার ম্যাকলাস্কিগঞ্জ অন্য ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ছিল । তখনকার আমিও অন্য আমি ছিলাম । তখনও এদেশে মানুষ অনেক কম ছিল, গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি অনেক বেশি ছিল-লোভ; সর্বগ্রাসী লোভ ছিল না । তখন শান্তি ছিল বড় । শান্ত জীবন । সেইসব দিন হারিয়ে গেছে । সেই আমিও হারিয়ে গেছি ।

পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছি বটে, বহুবার; কিন্তু আমার দেশের মতো সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর একটিও দেখলাম না । আমাদের বন-জঙ্গল, আমাদের পাহাড়-নদী, আমাদের পাখি-প্রজাপতি, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শীত-বসন্তের লীলাখেলা-আমাদের দেশের ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা গাছেদের অজানা গন্তব্যে অনুক্ষণ, যুগ-যুগান্ত ধরে হেঁটে চলা-আমাদের কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়, আমাদের গঙ্গা, নর্মদা, তিস্তা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্রর উপত্যকার সৌন্দর্য, আমাদের পূর্বী পাহাড়দের মেঘ-মেঘ, ভেজা-ভেজা, রোম্যান্টিক ব্যক্তিত্ব এসব অন্য দেশ কোথায় পাবে? সুন্দরবনের মতো ভয়াবহ, ভৌতিক, গা-ছমছম করা অথচ এমন সুন্দর Mangrove বনই বা আর কত জায়গাতে আছে?

আমাদের বাঘের মতো সুপুরষ, ব্যক্তিত্বময় প্রাণী, যে-প্রাণী একা একা কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন-মাঝের মিলনকালের সামান্য বিরতি ছাড়া; তেমন প্রাণী তো পৃথিবীর বেশি দেশে নেই! এমন বিচিত্র ও ব্যাপ্ত দর্শনের দেশেই এমন দার্শনিক, দাম্পত্যজীবনের দৈনন্দিনতা ও নিত্য কোলাহল-বর্জিত জীবনের ধারণা-করা জ্ঞানীর উদ্ভব সম্ভব ।

আমাদের দেশের মতো দেশ পৃথিবীতে সত্যিই নেই । এ দেশের সাধারণ মানুষদের মতো মানুষও নেই; শুধু যদি আমাদের নেতারা একটু মানুষের মতো হতেন, যদি রাজনৈতিক দলগুলি একটু দায়িত্ববান হতেন, শিক্ষিত শহুরে আমরা যদি একটু কম লোভী হতাম তবে এই দেশকে ভ্রমণার্থীর স্বর্গ করে গড়ে তুলতে পারতাম ।

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কথা বলার ইচ্ছে রইল আলাদা-আলাদা করে । তবে যে সব পাঠক ট্যুরিস্ট-গাইড বা ট্যুরিস্ট প্যাম্লেট চান তাঁরা আমার সেইসব লেখা পড়ে হতাশ হবেন ।

সবাই যে পথে যান আমি সে পথে কখনওই যাইনি, তাই আমার পাঠকদের জাতও আলাদা । রবার্ট ফ্রস্ট-এর 'The Road Not Taken' কবিতাটি যাঁদের পড়া আছে তাঁরা অবশ্যই জানবেন যে, অন্য পথ বেছে নিয়েছিলাম আমি ।

And that had made all the difference.

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৩

গরুমারা জঙ্গলে

টুটুল রায়

হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিছিয়ে থাকা অরণ্যভূমি ও তার আদিম বাসিন্দাদের অক্ষত রাখার জন্য বেশ কয়েকটি সংরক্ষিত অরণ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, মহানন্দা, চাপড়ামারি ও জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, বক্সা টাইগার রিজার্ভ এবং ডুয়ার্সের একমাত্র জাতীয় উদ্যান গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক।

নেওরা উপত্যকার গভীর জঙ্গল ভেদ করে সামসিং, চালসার পাশ দিয়ে সমতলে নেমেছে চঞ্চলা মূর্তি নদী। তার বেশ কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে বিন্দু, ঝালং হয়ে ভারত-ভুটানের সীমান্ত এঁকে নেমে এসেছে জলঢাকা। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতলে গরুমারা অরণ্যের বিস্তার। অতি বৈচিত্রময় সেই জঙ্গলে হাতি-সমান লম্বা এলিফ্যান্ট গ্রাস-এর তৃণভূমি থেকে শুরু করে নিঃসীম হরজাই জঙ্গল, সর্পিল গতিপথের গণ্ডাখানেক নদী থেকে বনের সীমানায় আকাশের গায়ে হিমালয়ের আভাস-প্রাকৃতিক রূপের সমস্ত রসদই মজুত।

প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের বৈচিত্রে সমৃদ্ধ গরুমারার বনাঞ্চলকে স্বাধীনতার দুবছর পরেই অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। অর্ধশতাব্দী আগে সে জঙ্গলের আয়তন অবশ্য ছিল মাত্রই ২১২৯ একর। আস্তে আস্তে গরুমারা ডুয়ার্সবাসী হাতি, গাউর ও একশৃঙ্গী গণ্ডারের স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অরণ্যভূমিতে উন্নীত হওয়ায় বনদপ্তর ১৯৯২ সালে গরুমারাকে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া স্থির করেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে ৮০ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গলমহল নিয়ে সৃষ্টি হয় রাজ্যের চতুর্থ জাতীয় উদ্যান গরুমারা।

শিলিগুড়ি থেকে কিলোমিটার-ষাটেক দূরে ডুয়ার্সের একটি ছোট্ট শহর চালসা। মহানন্দা অভয়ারণ্যের বুক চিরে, তিস্তা সমেত বিস্তর ছোট-বড় নদী পেরিয়ে, চা-বাগানের আদিগন্ত ঢেউ খেলানো গালচের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে চালসা যাওয়ার রাস্তাটিও ভারি নয়নলোভন। এই চালসা থেকেই ডানদিকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক গিয়েছে লাটাগুড়ি ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের যাত্রাপথও ওইটাই।

চালসা থেকে জাতীয় সড়ক ধরে এগারো কিলোমিটার এগনোর পরে গহন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চার কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় সে রাস্তায়

গাড়ি ছাড়া যাতায়াত নিষেধ। তাই চালসায় বাস থেকে নেমে আমরা একটা অ্যাম্বাসাডর ভাড়া করে নিলাম। আইভিল, বড়দিঘি ইত্যাদি চা-বাগান আর মঙ্গলবাড়ি, বাতাবাড়ির মতো ছোট ছোট জনপদ পেরিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই গাড়ি গিয়ে গরুমারার চেকনাকা ছুঁলো। চওড়া পিচরাস্তার বাঁয়ে গণ্ডার আঁকা একটা বোর্ড বলে দিচ্ছে ডুয়ার্সের একমাত্র জাতীয় উদ্যানের সীমানা এখানেই শুরু।

গরুমারা বনবাংলোয় রাত্রিবাসের ছাড়পত্র জলপাইগুড়ির বনদপ্তর থেকে আগেই জোগাড় করা হয়েছিল। চেকপোস্টে সেটা দেখিয়ে এন্ট্রি করতেই বাঁশ উঠল। শতখানেক মিটার রাস্তার বাঁয়ে সঙ্গ দিল বড়দিঘি চা-বাগান। তার পরেই আমাদের ঘিরে ফেলল নিরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল। বন্যপ্রাণী দেখার আশা-উৎকণ্ঠা নিয়ে মিনিট দশেক না কাটতেই গাড়ি এসে থামল জঙ্গল কেটে তৈরি কিছুটা খোলা চত্বরে। চত্বরের বাঁ-পাশে বনকর্মীদের কাঠের একসার কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের পাশেই পরিখাঘেরা জায়গায় নিশ্চিন্তে ঘাস চিবোচ্ছে দুটি মাঝারি আকারের হস্তিনী। তাদের সামনের পায়ে মোটা শিকলের প্যাঁচ। কোয়ার্টারের উঠোনে শুঁড় নাড়িয়ে দেয়ালা করছে আরেকটি মাস চার-পাঁচের ছোট্ট হাতি। গত জানুয়ারিতে চাপড়ামারির জঙ্গলে মৃতা মায়ের পাশ থেকে উদ্ধারের পরে বনদপ্তর ওকে এখানেই ঠাঁই দিয়েছে। নাম রাখা হয়েছে হিলাবতী।

চত্বরের ডানপাশে জঙ্গল ঘেঁসে গরুমারার সুপ্রাচীন অথচ সুসংস্কৃত বনবাংলো। বন্যদের দৌরাত্ম্য এড়ানোর জন্য বাংলোর তিনদিকে পরিখা কাটা। উত্তরে খাড়া খাদ নেমে যাওয়ায় সেটার আর প্রয়োজন হয়নি। দোতলা বাংলোর নিচে রঙিন টিভি, সুদৃশ্য বেতের সোফা, গ্লাস-টপ ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো লাউঞ্জ-কাম-ডাইনিং। ওপরতলায় দুটি দ্বিশয্যার শয়নকক্ষ। লাগোয়া থ্রি-স্টার হোটেলের উপযোগী চানঘর। সোনায় সোহাগার মতো বাংলোর সদা হাসিখুশি কুক গোপাল।

বাংলোর ঠিক পিছনে এক ঝাঁক লিচুগাছ। বাংলোর চত্বরে প্রতিটি ওদাল, বনকাঁঠাল, টুন, লসুনি ইত্যাদি গাছকে বৈজ্ঞানিক নাম সমেত চিহ্নিত করেছেন বনদপ্তর। গাছের গায়ে লেগে থাকা ডেনড্রোবিয়াম ফারমেরি, লুসিয়া ফিলিফরমিস, ভ্যান্ডা ইত্যাদি অর্কিডগুলিকেও চেনানোর চেষ্টা হয়েছে।

গরুমারা বাংলোর তিনদিক ঘিরে রয়েছে শাল, সেগুন, বহেরা, খয়ের, শিশু, শিমুল ইত্যাদির মিশ্র জঙ্গল। অধিকাংশ গাছের গায়ে লাইকেনস-এর সাদাটে সবুজ ছোপ আর মসের ঝুলন্ত দাড়ি-গোঁফ।

বাংলোর ডানদিক দিয়ে একটা জিপচলা রাস্তা চলে গিয়েছে উত্তর-পুবে, কয়েক ফার্লং দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া মূর্তি নদীর পাড়ে। গরুমারার বীট অফিসার মহেশ রায় সরকার

ওই রাস্তা দিয়েই আমাদের অরণ্য-সন্দর্শনে নিয়ে চললেন । মহেশবাবুর হাতে দোনলা বন্দুক, দৃষ্টি সজাগ । কারণ সাতসকালে বামনি বীট থেকে ফেরার পথে বনরক্ষীরা আশপাশেই নাকি একটি লেপার্ড দেখেছেন । এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের জঙ্গলে লেপার্ডের সংখ্যা আড়াইশো থেকে তিনশো । তার মধ্যে দশ-পনেরো শতাংশের বাসস্থান এই জাতীয় উদ্যান । তবে শিকারের সহজলভ্যতার জন্য তারা গভীর জঙ্গলের চেয়ে অরণ্যসীমান্তে গ্রামগঞ্জ বা চা-বাগানের আশপাশে থাকাই বেশি পছন্দ করে । গরুমারায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই । তবে বন্য বিড়াল প্রজাতির অন্য কয়েক সদস্য ফিশিং ক্যাট, লেপার্ড ক্যাট ইত্যাদি আছে ।

বন্দুকধারী মহেশবাবুর পাশে পাশে মিনিট দশেক হাঁটার পরেই জঙ্গল পাতলা হয়ে এল । এখন বেশ খানিকটা নিচে দেখা যাচ্ছে দু-পাশে দুধসাদা বালির চর ফেলে বয়ে চলা আসমানি রঙের মূর্তি নদী । গ্রীষ্মের শুরুতে পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে তার স্রোত অতি ক্ষীণ । নদীর ও পার থেকেই শুরু হয়েছে পুণ্ডি, মালসা, চেপটি, কাশিয়া ইত্যাদি ঘাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তর । তৃণভূমির শেষে কালচে-সবুজ জমাট বাঁধা জঙ্গলের রেখা ।

মূর্তি নদীর এপারেই রয়েছে খালসদৃশ আরেকটি সরু নদী, ইংডং । এই নদীটিই গরুমারা বনবাংলোর সামনের খাদ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টিতে তার অবস্থাও তথৈবচ । তবু এ নদীর আকর্ষণ অন্যখানে । ইংডংয়ের পাড়েই রাতুলের বাস এবং রাতুলের দৈনন্দিন কাদা-মাখামাখিও তারই গর্ভে । পাঁচটি ছোট বড় হাতির পাশাপাশি গরুমারা একটি গণ্ডারকেও পোষ্য নিয়েছে । সেই যুবক গণ্ডারটিরই আদরের নাম 'রাতুল' ।

বছর কয়েক আগে কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কে বানের তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল দুটি গণ্ডারশিশু । বনকর্মীরা তাদের উদ্ধার করেন । অতঃপর, গণ্ডারের উপযোগী চারণভূমি আছে বলে দুই অনাথের একজনকে আনা হয় গরুমারায়, অন্যজনকে 'মধু' নাম দিয়ে পাঠানো হয় জলদাপাড়ায় ।

রাতুলকে ফের বুনো করে তোলার বিস্তর চেষ্টা বনদপ্তর করেছিলেন কিন্তু বন্য গণ্ডারেরা মানুষের গন্ধমাখা রাতুলকে পরিবারভুক্ত করতে নারাজ হওয়ায় এবং রাতুলও জ্ঞাতিদের প্রতি বিশেষ আসক্তি না দেখানোয় ইংডং আর মূর্তির মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা বৈদ্যুতিক বেড়া দিয়ে ঘিরে তৈরি হয় রাতুল এনক্লেভ । গরুমারার গণ্ডারকুলের দুই দৈত্যাকার দলপতি 'বিগ বস' ও 'মাস্তান' বৈদ্যুতিক শকের পরোয়া না করে সেখানে ঢুকেও রাতুলকে মারধর করায় এখন তার এনক্লেভের পাশে নজর মিনার বসেছে । দোতলা-সমান সেই ওয়াচ টাওয়ারে চড়ে বনরক্ষীরা ২৪ ঘণ্টা রাতুলের পাহারাদারি করেন ।

টনদুয়েক ওজনের গণ্ডারটা বোধহয় কোথাও নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। মহেশবাবু বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কয়েকবার তার নাম ধরে হাঁক পাড়তেই ঝোপঝাড় ঠেলে ধেয়ে এল রাতুল। রাতুলের এনক্লেভে ঘাসজমি নেই, তাই সঙ্গে করে বেশ খানিকটা ঘাস আনা হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক তৃণভোজীটির সামনে সেগুলি ছড়িয়ে দিয়ে রাতুলের পেটের কাছে একটি পুরনো ক্ষতে পরম স্নেহে অ্যান্টিবায়োটিক মলম ঘষতে লাগলেন গরুমারার বাসিন্দাদের পিতৃপ্রতিম বীট অফিসার।

ইতিমধ্যে ছোট্ট হিলাবতীকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে এসেছে তার সর্বক্ষণের কেয়ারটেকার বিমল ভুজেল। আদুরে চেহারার হাতিটা কেমন করে জলকেলি করে দেখতে গিয়েই সাক্ষী হয়ে গেলাম এক অভাবনীয় দৃশ্যের। মূর্তি নদীর ঠিক ওই পারেই বুকসমান ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মাখতে ব্যস্ত দুটি নিখাদ, নির্ভেজাল বন্য হাতি। বিমল জানাল, হাতির পিঠের মোটা চামড়ায় নাকি একরকমের পোকা সংসার বসায়। ধুলোর পাউডার তাদেরই নির্বংশ করার জন্য। দাঁতহীন মাঝারি আকারের হাতি দুটির উদাসীন হাবেভাবে বোঝা গেল গরুমারার বন্য হস্তিকুল মনুষ্যদর্শনে অভ্যস্ত। তাই নদীর এপারে এক পাল উত্তেজিত দর্শকের আস্ফালনেও তাদের বিন্দুমাত্র চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ আশ মিটিয়ে হস্তিদর্শন করে আমরা বনবাংলোর পথ ধরলাম।

জঙ্গলের গহনে না ঢুকেই যাতে নিরাপদ দূরত্বে বসে বন্যজন্তুর দর্শন মেলে সে জন্য গরুমারার বাংলোর হাতায়, খাদের কিনারা ঘেঁসে একটি পর্যবেক্ষণ মঞ্চ বানিয়েছেন বনদপ্তর। মাথার ওপর ছাদ আর চারপাশ রেলিংয়ে ঘেরা আগাগোড়া কাঠের তৈরি মঞ্চটির নাম রাইনো অবজারভেশন পয়েন্ট। এর প্রায় নিচেই রাতুলের এনক্লেভ। অবজার্ভেশন পয়েন্টের গা বেয়ে খাদ নেমে গিয়েছে শ-খানেক ফুট। খাদ যেখানে সমতলে গড়িয়েছে সেখানেই বদ্ধ, সবুজ জলের সর্পিল ইংডং নদী। নদীর ওপারে, জঙ্গলে ঘেরা এক টুকরো তৃণভূমি। খোলা প্রান্তরে বন্যদের আকর্ষণ করে পর্যটকের আশ মেটানোর জন্য ইংডংয়ের পারেই একটি নুনি তৈরি করা হয়েছে। একটি কংক্রিট খণ্ডের ওপর নিয়মিত রাখা হয় পাথুরে নুন আর চিটেগুড়। পরমানন্দে তা-ই চাটতে আসে হরিণ, বাইসন, শুয়োর এমনকী হাতিও।

বন্যপ্রাণী দর্শনের নজরমিনার গরুমারায় আরও দুটো রয়েছে। বনবাংলো থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে, বামনি বীট যাওয়ার রাস্তায় যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার এবং কিলোমিটার তিনেক দূরে জঙ্গলের একেবারে কোরকের মধ্যে গরাতি।

ওয়াচ টাওয়ার শুনলেই যে ছবিটা চোখে ভাসে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার ঠিক তা নয় । বরং অনেকটা রাইনো অবজারভেশন পয়েন্টের মতো খাদের কিনারে কাচের জানলায় ঘেরা একটি কাঠের ঘর । তবে সৌন্দর্য ও লোকেশনের বিচারে অনেক কদম এগিয়ে । হাতির হামলা থেকে বাঁচার জন্য ওয়াচ টাওয়ারের তিনদিক সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া পরিখায় ঘেরা । উত্তরে খাড়া খাদ নেমে গিয়েছে মূর্তি নদীর বিস্তীর্ণ সমতলে । নিচে, নদীর পারের তৃণপ্রান্তরে একটি কৃত্রিম সল্ট লিক বা নুনি । এপাশ ওপাশের জঙ্গল থেকে বেশ কয়েকটি জানোয়ার চলা শুঁড়িপথ গিয়ে সেখানে মিশেছে ।

ওয়াচ টাওয়ারে রয়েছে এক টুকরো ফুলবাগান, জলের ট্যাঙ্ক । বাড়তি সুরক্ষার জন্য পরিখার পাশে কয়েক ফুট পর্যন্ত লোহার শিক শুলের মতো উঁচু করা । তাতেও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি । বছর দুয়েক আগে পরিখা ও শুলো টপকে যাত্রাপ্রসাদের ফাইবার গ্লাসের মূর্তি ভেঙে দিয়ে যায় এক ঈর্ষাকাতর দাঁতাল ।

গরুমারার কিংবদন্তী যাত্রাপ্রসাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে বনদপ্তর জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে আসাম থেকে নিয়ে আসা হয় সুপুরুষ যাত্রাপ্রসাদকে । এখানেই সে ‘কুনকি’ হিসেবে প্রশিক্ষিত হয় । ক্রমে ক্রমে যাত্রা বনবিভাগের বহু অভিযানে তার অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, বহু সঙ্কটে বনরক্ষীদের প্রাণ বাঁচিয়ে নিছক এক পোষা হাতি থেকে গরুমারার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে । তাকে ঘিরে গরুমারার অনেক স্মৃতি, অনেক কাহিনী । জাতীয় উদ্যানের কর্মীরা যাত্রার কর্মজীবনের রজতজয়ন্তী পালনের তোড়জোড়ও শুরু করেছিলেন । এমন সময়ে, ১৯৯৭ সালের ১৪ জুলাই সে মারা যায় । গরুমারার বনবাংলো লাগোয়া চত্বরেই জঙ্গল ঘেঁসে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে ।

এখন গরুমারাতে চারটি কুনকি হাতি রয়েছে, পর্বতপ্রমাণ দুই পুরুষ চন্দ্রচূড় ও জনার্দন এবং দলমা থেকে আসা দুই যুবতী কাবেরী ও শিলাবতী ।

হঠাৎ খেয়াল হয় বিন্দুর শীর্ণস্রোতে কমলা রং, পশ্চিমে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্তাচলে ।

ভ্রমণ জুন, ১৯৯৯

নিশীথ সূর্যের দেশ

প্রতাপকুমার রায়

যাবার উদ্যোগ করেছিলাম গ্রিনল্যান্ড । পৌঁছে গেলাম ল্যাপল্যান্ডে । ঠিক সুকুমার রায়ের গেছো দাদার মতো অনিশ্চিত গন্তব্যে নয় । শেষ মুহূর্তে গ্রিনল্যান্ডের ক্যাঙ্গারলুসুয়ান যাত্রার টিকিট পাওয়া গেল না । তাই আমরা যাত্রা করেছিলাম ল্যাপল্যান্ডের উদ্দেশে । আমাদের দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ।

গত জুলাই মাসের শেষে সেই যাত্রাপথে কোনও রোমাঞ্চ ছিল না । কোপেনহেগেন থেকে আড়াই ঘণ্টায় হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড । সমস্তক্ষণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায়, নিচের কিছুই যখন আর দৃশ্য নয় ।

ল্যাপল্যান্ড একটা ভৌগোলিক ধারণা মাত্র, কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্র নয় । ল্যাপ ভাষা, যার অন্য নাম সামি ভাষা, যারা বলে তাদেরই বলা হয় ল্যাপ বা ল্যাপল্যান্ড-বাসী । নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এই তিন দেশের উত্তরে যে অংশ মাথার মুকুটের মতো, তাকে বলা হয় ল্যাপল্যান্ড । পৃথিবীর উত্তরে প্রায় শেষ বসতি । ল্যাপদের পরে কোথাও কোথাও এসকিমোদের পাওয়া যায়, যারা বাস করে বরফের ইগলুর মধ্যে । ল্যাপেরা চিরকালীন বরফ ঢাকা অঞ্চলে থাকে । দক্ষিণে বরফমুক্ত সমতলেও বাস করে । শীতে পাহাড় থেকে এবং বরফ থেকে নেমে আসে । দক্ষিণের সমতলও তখন বরফে ঢাকা, তবে অনেক উষ্ণ । অর্থাৎ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের বেশি নিচে নয় । ল্যাপল্যান্ড উত্তর-পশ্চিম রাশিয়াকেও ছুঁয়ে আছে । ল্যাপদের ভাষা স্বতন্ত্র । ফিনল্যান্ডের প্রতিবেশী এস্টোনিয়ার ভাষার সঙ্গে তার কিছু মিল আছে ।

ল্যাপল্যান্ডের অনেকখানিই সুমেরু বৃত্তের উত্তরে । সুমেরু বৃত্তরেখার কোনও শারীরিক উপস্থিতি নেই । ৬৬ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরের অংশকে বলা হয় আর্কটিক অঞ্চল । ৬৬ ডিগ্রি অক্ষাংশকে ভৌগোলিকেরা বলেন সুমেরু বৃত্ত ।

যাত্রার প্রথম ধাপে পৌঁছেছি হেলসিঙ্কি । এখান থেকে যাব রোভানিয়েমি । সুমেরু বৃত্তের ঠিক নিচে । বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে গেলেই সুমেরু বৃত্ত ।

সারাদিন ধরে হেলসিঙ্কি থেকে ট্রেনে চললাম । রাত দশটার ফুটফুটে আলোয় রোভানিয়েমি নামলাম । আসলে এই আলো দেখতেই এখানে আসা । সামান্য দেরি হয়ে

গিয়েছে। আর মাত্র সাতদিন আগে এলেই অস্ত-না-যাওয়া সূর্য দেখতে পেতাম। এখন আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের মতো হেলসিঙ্কি সূর্যহীন ছিল, আমরা দেখতে পাইনি। পরিশ্রম কিছু হয়নি তবু সারাদিন রেলযাত্রায় কিঞ্চিৎ ক্লান্ত। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পথে একবারও চোখ বন্ধ করতে পারিনি, করবার ইচ্ছাও হয়নি।

এ কোন দেশে এলাম যেখানে সবুজ ছাড়া রং নেই। আকাশ অবশ্য ধূসর নীল। সাত-আটশো কিলোমিটার পথ কখনও অরণ্য, কখনও তৃণভূমি। খুব বেশি জলাজমি বা জল দেখলাম না প্রথমদিন। শুধুই গাছ দুপাশে, প্রায় বসতিহীন।

ফিনল্যান্ডে তিনভাগের দু-ভাগ অরণ্য। মানুষের বাসমাত্র এক অংশে। বার্চ আর পাইনের অরণ্য। প্রথম দিকটায় সমতল, সেখানে বার্চ বেশি। বার্চের কাণ্ডে সাদা সাদা ছোপ। বোধহয় একেই ইউরোপিয়ান হোয়াইট বার্চ বলে। জঙ্গল দিগন্ত পর্যন্ত। বার্চ পাইনের সারি দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এ দেশের প্রধান উৎপাদন কাঠ এবং কাঠ থেকে উদ্ভূত, যেমন কাগজ। ফিনল্যান্ডের বাৎসরিক রপ্তানির আয়ের চল্লিশ শতাংশ কাঠ এবং কাঠ থেকে উদ্ভূত বস্তু থেকে আসে। তবু কিন্তু এদের বৃক্ষসম্পদ শেষ হয় না। কারণ গাছ যেমন একদিকে কাটা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই রোপণ হচ্ছে। ফলে বৃক্ষসম্পদ প্রায় অটুট থেকে যায়। স্থানে স্থানে বার্চ পাইন স্প্রুসের গাছ এমন সার দিয়ে লাগানো যে মনে হয় এগুলি মানুষ রোপণ করেছে। প্রকৃতির স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে। গাছের তলাগুলোও বেশ পরিষ্কার। লতাগুল্মের জঞ্জাল নেই।

ট্রেন দ্রুত চলেছে। ফিনল্যান্ডের ট্রেন বেশ ভালো। লাইনের ওপর মসৃণ দৌড়চ্ছে। গাড়ি দুলছেও না বিশেষ। রেস্টুরেন্ট গাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট কিনে এনে নিজের আসনে বসে দিব্যি ভোজন হল। এদেশে যে সব কিছুই মহার্ঘ আবার বুঝতে পারলাম।

ক্রমশ নিসর্গ বদলাতে থাকল। সমতল পার হয়ে একটু ওপরে উঠছি। পাশে বার্চের সংখ্যা কমে আসছে, পাইন বা ওই জাতীয় গাছ বাড়ছে। গাছ বদলালেও জঙ্গলের চেহারা বদলাচ্ছে না, নিটোল জঙ্গল। অনেকগুলি লেক দেখা গেল দ্বিপ্রহরের পর। ছোট নদী পার হলাম কয়েকটি। দুপাশে এবার পাহাড় দেখা যেতে লাগল। আমাদের পাশের জঙ্গল ওদিকে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠে পড়েছে। সেখানেও তাই নিখাদ সবুজ। চাষবাসের প্রায় কোনও চিহ্নই দেখছি না। আমার স্ত্রী বললেন, চাষ করবেই বা কে, মানুষই তো দেখছি না।

আমাদের ট্রেনের স্টপেজ নেই বললেই চলে। কোনও বড় স্টেশন পথে পড়ল না। ছোট দুচারটে স্টেশন অবহেলার সঙ্গে পার হয়ে গেল। লক্ষ করে দেখি, কোনও পাহাড়ের

মাথায় বরফের আস্তরণ । এখন মধ্য গ্রীষ্মে বরফ কমে এসেছে, তবু কোথাও বেশ খানিকটা বরফ দেখা গেল ।

যাত্রীদের কারও সঙ্গে পরিচয় হল না । আমরা এসেছি দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ারকারে । বেশি লোকজন নেই । সামান্য কয়েকজন আছেন মাত্র । ওরই মধ্যে রেস্টুরেন্টে কিছু ভিড় ।

এদেশে ধূমপানের বড় অসুবিধা । বোধহয় একটি ছাড়া সব কামরাই ধূমপান-বর্জিত । রেস্টুরেন্টেও ধূমপান অচল । এক সহযাত্রী সিগারেট বার করতে আমার অবাক চোখ দেখে বললেন, তিন কামরা পরে ধূমপানের কামরা, সেখানে যাচ্ছি । কোনও পাবলিক প্লেসে ধূমপান বারণ । ধূমপান করেনও খুব সামান্য মানুষ । সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডেই আপনার অসুবিধা হবে ।

বোধহয় সেই কারণেই সিগারেট দুর্মূল্য এই দেশে । কত দাম ঠিক মনে নেই, আমাদের হিসাবে এক প্যাকেট তিনশো টাকার বেশি ।

ঘটনাটা পরের, তবু এখানেই বলে রাখি । আমাদের হেলসিঙ্কির হোটেল রোভানিয়েমির হোটেল ঠিক করে দিয়েছিল । হোটেলটি একটু নিরিবিলি অঞ্চলে । ভারি সুন্দর । আমাদের নির্দিষ্ট ঘর দেখে আমরা মোহিত । সবে নিশ্চিন্ত আয়েসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, দেখি দেওয়ালে লেখা আছে নোটিস, এ কামরায় ধূমপান বারণ । রিসেপশনে ফোন করতে হল অন্য ঘর দেবার জন্য । পিছনদিকের একটি ঘর পাওয়া গেল । প্রথম ঘরটি এতই ভালো ছিল, এ ঘর পছন্দ হতে চায় না । উপায় নেই । হোটেলের অধিকাংশ ঘরেও ধূমপান বারণ ।

রোভানিয়েমিতে নামলাম যখন, তখন রাত আটটা বাজে । নির্মেঘ আকাশ, পরিচ্ছন্ন দিন । তখনও বেশ দিনের আলো । রোভানিয়েমিকে ফিনরা বলে ল্যাপল্যান্ডের রাজধানী । আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম । সেদিন রবিবার । সব দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় গাড়ি চলাচল নেই, তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে । এমন নীরব নিস্তব্ধ শহর বেশি দেখিনি । মনে হবে শহরবাসীরা বাইরে কোথাও চলে গিয়েছেন । অধিকাংশ বাড়ির জানলা বন্ধ । খাবার দোকান, অর্থাৎ রেস্টুরেন্টগুলি খোলা ছিল । তারই একটায় প্রবেশ করা গেল । সেখানে কবাব পাওয়া যায় দেখে আমার রসনা সজল হয়েছিল । পরে দেখেছি সারা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে কবাবের নামে দোনাকবাবের মাংস বিক্রি হয় । যাঁদের দোনাকবাবের সঙ্গে পরিচয় নেই, তাঁদের জন্য বলে রাখি, মাংসখণ্ডের একটি তাল বানিয়ে, ছোট পাশ বালিশের আকারে ওপরে নিচে শিক বিঁধিয়ে তার ওপর বালিশটি ঘুরতে থাকে । পাশে লম্বালম্বি দাঁড়ানো ইলেক্ট্রিক হিটার । এইভাবেই মশলাহীন মাংস পাক হয় । খদ্দের

এলে ধারালো ছুরি দিয়ে মাংসের ওপরের আস্তরণ থেকে পাতলা করে মাংসের টুকরো কাটা হয়। এক কথায় ঝলসানো মাংস। পিটা ব্রেডের খোলের মধ্যে পুরে সস ও স্যালাড যোগ করে গ্রাহকের জন্য তৈরি হয়। আগে চিকেন দোনাকবাব দেখিনি। ইদানীং পাঁচ-সাত বছর দেখছি চিকেন দোনাকবাবও বিক্রি হচ্ছে। সদ্য ঝলসানো তপ্ত মাংস, সুস্বাদু সস এবং স্যালাডের সঙ্গে লম্বা জড়ানো কাশ্মীরি মরিচ যুক্ত করে পিঁয়াজসহযোগে খেলে ভালোই লাগে। প্রথম প্রথম খুবই ভালো লাগত, এখন অতিপরিচয়ের বিরাগ এসেছে।

রোভানিয়েমির রেস্টুরেন্টে কবাব চাইতে, রুটি এবং মাংসখণ্ডগুলি আলাদা পরিবেশন হল। মাংস সুস্বাদু ছিল না। লঙ্কা অর্থাৎ কাশ্মীরি মরিচের আচার সামান্য ছিল, অনেকবার চেয়েও বেশি পিঁয়াজের স্লাইস আদায় করা গেল না। দাম ভালোই লাগল। কোক বা পেপসি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

দু-বোতল জল নিয়ে ঘরে ফিরব, জল পাওয়া গেল না, কাছেপিঠে কোনও দোকানও নেই যেখানে জলের বোতল পাব। ইউরোপে সর্বত্রই মানুষ বোতলের জল সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। হোটেলে বোতলের জল পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে ছোট এক বোতল জলের দাম আমাদের টাকায় আশি বা নব্বই। রিসেপশনকে জিজ্ঞাসা করতে মহিলাকর্মী অভয় দিলেন, এখানের কলের জল আপনি নির্ভয়ে খেতে পারেন।

জল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শহরটা দেখতে বেরোলাম। ঘুমন্ত, স্তব্ধ শহরের একটা গা চমকানো প্রতিক্রিয়া আছে। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে একটা গাড়ি গেলে চমকে যাচ্ছি। কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলছে না, পর্দাটানা জানলা, হয়তো মানুষ শয্যাগ্রহণ করেছে। কাল সকালেই সবাইকে আবার কাজে যেতে হবে। এদেশে সাতটা বা আটটার মধ্যে, যে প্রতিষ্ঠানে যেমন, কাজে পৌঁছে যেতে হয়। সপ্তাহান্ত ছাড়া মানুষ দীর্ঘকাল ঘুমোতে পারে না।

ছোট জনহীন শহরের শব্দহীন সন্ধ্যার আবছা আলোয় তখন রাত্রি দশটা। বেশ ভালো লাগছিল। পাশেই কেমিয়োকি নদী। নদীর ধারে স্থানে স্থানে বেঞ্চি পাতা। আমরা ছাড়া আর একটিও মানুষ দেখলাম না। কিছুকাল অনির্দেশ ঘোরাঘুরি করে হোটেলের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে তখনও বেশ আলো। আমাদেরও পর্দা টেনে দিতে হল। মাঝরাতে উঠে দেখি, যেমন আলো ছিল তেমনই আলো আকাশে এখনও। মাঝে কখন কিছুক্ষণ অন্ধকার হয়েছিল বুঝতে পারিনি।

যেটুকু দেখেছিলাম সন্ধ্যায়, ল্যাপল্যান্ড বলতে আমার মনে যে ছবি ছিল তার সঙ্গে মিলল না। ইউরোপের আর সব দেশের মতো বাড়িঘর, পানশালা, ভোজনশালা। উঁচু

মাথা বাড়ি নেই রোভানিয়েমির ওই অঞ্চলে । শীতও তেমন নেই যে ল্যাপ-রা চামড়ার পোশাক পরে আসবে । রাইন ডিয়ার নেই, স্লেজের কথা উঠছে না, বরফ অনুপস্থিত ।

সকালে শহরে প্রাণের চিহ্ন দেখা গেল । মানুষজন কয়েকটি । এদেশে পথে চলার লোক নেই । দু-চারটে গাড়ি যাচ্ছে । দোকানগুলি খুলেছে । পথের ধারে ভোজনশালায় প্রাতরাশ পর্ব চলেছে । কোথাও বেশি লোকজন নেই । না থাকবারই কথা । এই শহরের মোট জনসংখ্যা সাতান্ন হাজার । পর্যটক খুব বেশি দেখিনি । ফিনল্যান্ডের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে আসবার আগ্রহ নেই সবার । তবু, আমাদের হোটেলের কর্মী বলল, শীতকালে, যখন বরফে সব ঢেকে যায় তাপাঙ্ক শূন্যর নিচে নামে, তখন বহু পর্যটক আসে । আশপাশের অনুচ্চ পাহাড়গুলি নাকি স্কি করার জন্য প্রশস্ত স্থান । এখন বরফ দেখতে পাচ্ছি শুধু পাহাড়ের মাথায় টুপির মতো । অঙ্গ নিরাভরণ, কোথাও সবুজ ঘাসে ঢাকা, কোথাও ইতস্তত কিছু পাইন স্প্রুস গাছ, হাতুড়ে নাপিতকে দিয়ে চুল কাটলে যেমন হত, তেমনই । কোথাও আবরণ ছাড়া নগ্ন পাথর ।

আমাদের সহযাত্রী বললেন, শীতকালে এই সব পাহাড় তুষারে তৈরি মনে হবে । আমরা চলেছি সান্তাক্লজের গ্রামে, সান্তাক্লজ ভিলেজ । বাসে রোভানিয়েমি থেকে আধঘণ্টার যাত্রা । এখান দিয়ে গিয়েছে সুমেরু বৃত্ত । বৃত্তের থেকে শুরু হয় মেরু অঞ্চলের প্রকৃতি । লাইন দিয়ে অবশ্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না । সান্তাক্লজ ভিলেজ রোভানিয়েমির উপকণ্ঠের গ্রামগুলির মতোই । অবশ্য কাঠের বাড়ি সব । মনে পড়ছে, ইট পাথরের বাড়ি আদৌ দেখিনি এখানে ।

সুমেরু বৃত্ত রেখার ওপরে সান্তাক্লজ ভিলেজ মানুষের তৈরি করা, পর্যটক আকর্ষণের জন্য । প্রবাদ বলে বড়দিন বা ক্রিসমাসের অগ্রদূত সান্তাক্লজ ফিনল্যান্ডের এই অঞ্চলের বাসিন্দা । সাজানো একটা ঘরে শীতকালের মোটা জামা পরে, সান্তাক্লজের প্রচলিত পোশাকে এক বড়সড় মানুষ বসে আছেন । আগন্তুক ছেলেবুড়ো সবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন । তাঁর ছবিও তুলছে একদল পেশাদার ফটোগ্রাফার । অল্প সময়ের মধ্যেই ছবি তৈরি করে বিক্রি হচ্ছে । যথেষ্টই দাম হবে । আমরা খবর নিইনি । ওই ঘরে প্রবেশ করাও সহজ ছিল না । এত ভিড় । এখানে যথেষ্ট পর্যটক দেখলাম । দেশান্তরের পর্যটকেরা সার বেঁধে ল্যাপল্যান্ডের হস্তশিল্প কিনছেন, পিকচার পোস্টকার্ড কিনছেন । ল্যাপল্যান্ডের নিজস্ব শিল্পের আধার হল কাঠ এবং চামড়া । সুন্দর, বিশিষ্ট জিনিস সব । অগ্নিমূল্য । আমার স্ত্রী বললেন, হাত দিও না, ছ্যাঁকা লেগে যাবে ।

এখানে ব্যাকপ্যাকারদের সংখ্যা কম । এই গ্রীষ্মে ইউরোপের সর্বত্র ব্যাকপ্যাকারদের ভিড় দেখে আশ্চর্য হয়েছি । দার্জিলিংয়ের বা অন্য পাহাড়ের কুলিদের ধরনে পিঠে যাবতীয়

মোটঘাট নিয়ে ব্যাকপ্যাকাররা ঘুরে বেড়ান । শুধু, কুলিদের মতো মাথায় দড়ি লাগান না বোঝা বইবার জন্য । সবার সঙ্গেই একটা রবারের সতরঞ্চি রোল করা আছে । প্রয়োজনে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন । সব সময় যে এঁরা যত্রতত্র শয়ন করেন তা নয় । হোটেলের ঘর থেকে ব্যাকপ্যাক নিয়ে বেরুচ্ছে এমন যাত্রী অনেক দেখেছি । আমার মনে হয়েছে সুটকেস বহনের থেকে এই কাজটা অনেক সহজ, আর এখন বোধহয় কিঞ্চিৎ ফ্যাশানের তাগাদাও আছে ।

কয়েকজন জাপানি পর্যটকও দেখলাম । ইউরোপে জাপানি পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে । তাই বহু স্থানে জাপানি ভাষায় লেখা ফোল্ডার ইত্যাদি পাওয়া যায় । বড় দোকানে তো জাপানি ভাষায় লেখা আগেই উপস্থিত হয়েছে ।

সান্তাক্লজ ভিলেজে যত দোকান, ছোট বড়, তেমনই নানা ধরনের, নানা মূল্যের ভোজনশালা । যেন কোনও বড় মেলা বসেছে । শুনলাম, সন্ধ্যাতে আরও জমবে, গানবাজনা হবে । নিকটেই একটি রাইন ডিয়ার ফার্ম আছে । সেখানে রাইন ডিয়ার, মস্ত শিংওলা মস্ত হরিণ, আমাদের বারশিঙার ধরনের, পালন করা হয় । সেখানে ছাড়া আর অন্য কোথাও ল্যাপদের নিত্যসঙ্গী, তাদের ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি রাইন ডিয়ার দেখলাম না । আরও কয়েক কিলোমিটার গেলে হাস্কি বা মেরু প্রদেশের কুকুর দেখা যেত । প্রদর্শনীর মতো । বরফ নেই যে তারা স্লেজ টেনে নিয়ে যাবে ।

বিকেলে শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম । ছোট শহর । নদীর এপার সময় থাকলে হেঁটেই দেখা যায় । লোকসংখ্যা কম, সাতান্ন হাজার, কিন্তু শহরের ঐশ্বর্য কম নয় । শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনেক বহুতল বাড়ি । দামি দোকানপাট, ভোজনশালা । বেশিরভাগই আমাদের আয়ত্তের বাইরে । শহরের একমাত্র পদাতিকের জন্য সংরক্ষিত পথটি বড় সুন্দর । গাছ এবং ফুলে সাজানো শহরের সর্বত্র অবশ্য অজস্র ফুল । সব পার্কই যেন ধনীর পুষ্পোদ্যান । পথের ধারে, বিজলির থামের মাঝখানে থরে থরে ফুলগাছ । এবং সর্বত্র বহু বর্ণের ফুল । এক দোকানদার বলল, এই তো কটি মাস মাত্র সময় । তারপর তো অন্ধকার । চব্বিশ ঘণ্টা ।

শীতকালে সূর্য প্রায় ওঠেই না এদেশে । তবে দিনেরবেলায় একটি বিচ্ছুরিত আলো থাকে, মনে হল আমাদের গোধূলির মতো, সেই আলোতেই জীবনযাত্রা চলে । আবার গ্রীষ্মের অপেক্ষা করে সবাই ।

রোভানিয়েমি ছোট শহর বলে আয়ত্তের মধ্যে । শহরে সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য আর্টিকাম, বা আর্কটিক মিউজিয়াম । নদীর ধারে বিশাল এই মিউজিয়ামটির স্থাপত্যও দেখবার মতো । ছাদ কাচের । স্থপতির নাম ক্লস বোডরুপ । তিনি ফিনল্যান্ডের বিশিষ্ট স্থপতি । তাঁর তৈরি

আরও কয়েকটি অনবদ্য সৌধ আছে রোভানিয়েমিতে । ফিনল্যান্ডের মানুষেরা শুধু নয়, সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়া-বাসীই স্থাপত্যকে জীবনযাত্রার বিশিষ্ট অঙ্গ মনে করেন । কোন অট্টালিকা বা সৌধ কোন খ্যাতনামা স্থপতির কীর্তি, তাঁরা সর্বদা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন ।

শুধু স্থাপত্যের জন্যই নয়, দ্রষ্টব্যের আয়োজনেও আর্টিকাম বিশিষ্ট । আর্টিক অঞ্চলের মানুষদের ইতিহাস, তাদের জীবনধারা এবং তাদের ক্রমবিবর্তন দেখানো হয়েছে এই মিউজিয়ামে । ল্যাপল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন করে কয়েক শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত হয়েছে, তার নানা নিদর্শন রয়েছে এখানে । প্রত্যেক ঘরে কম্পিউটার রাখা আছে । বোতাম টিপে আপনার আগ্রহের বিষয়টি জানালে সে সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যচিত্র ও কথার সাহায্যে বিবৃত হয় । যাযাবর জাতি কেমন নিজের অজ্ঞাতে আধুনিক সভ্যতার আচার অভ্যাসে প্রভাবিত হয়েছে, এই মিউজিয়াম দেখলে সহজে বোঝা যায় ।

রোভানিয়েমির রেলস্টেশন, টাউন হল ইত্যাদির স্থপতি আলভার আলটো । মুদ্রিত প্রচার পুস্তিকায় পড়েছিলাম, ল্যাপল্যান্ডের মানুষদের জীবনযাত্রার মর্যাদা দিয়ে স্টেশনটির রূপ দেওয়া হয়েছে রাইন ডিয়ারের শৃঙ্গের আকারে । তথ্যটা আগে পড়া হয়নি, তাই হরিণের শিঙের রূপ ধরতে পারিনি ।

রোভানিয়েমি থেকে হেলসিঙ্কি ফেরার জন্য রওনা হলাম, তখন বোধহয় বিকেল ছটা বাজে । হেলসিঙ্কি পৌঁছব সকাল আটটা । এবারে রাতে শয়নের কামরা । অতিশুভ্র চাদর বালিশে সাজানো-দুই যাত্রী কামরা । কম্বলের সঙ্গে আরেকটি সাদা চাদর । বিছানা করাই ছিল । কামরা ও সিট নম্বর মিলিয়ে উঠে পড়লাম । স্টেশনে একজনও রেলকর্মী নেই । নামের তালিকাও টাঙানো নেই কোথাও । আমাদের টিকিটেই কামরা ও আসনের নম্বর দেওয়া আছে ।

দিনের আলোয় চেনা পথ দিয়ে চলেছি । কাচের জানলা স্বচ্ছ পরিষ্কার । কোনও কিছু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না । পণ্ডিতেরা বলেন, তুলনা করা গর্হিত কাজ । তবু আমাদের দেশের তুলনা না করে পারি না । আমাদের রেলের কামরার কাচ কেন সর্বদা অস্বচ্ছ নোংরা হয়ে থাকে-একথা স্বাভাবিকভাবেই মনে এল । আমাদের এ সি ফার্স্ট ক্লাস, অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর কামরার জানলাও কখনও পরিচ্ছন্ন দেখিনি । কেন এমন হয় জানি না । আমাদের তো ধোয়া-মোছার লোক অনেক বেশি । তবুও । কেন? আরও একটা কথা মনে হল । আমাদের রেলের কামরার সর্বত্র বৃহৎ লোহার স্ক্রুর মাথা দেখা যায় । এরা কি করে নাটবল্টু মুক্ত করে ভেতরটাও এমন মসৃণ সুন্দর করতে পেরেছে!

রেস্টুরেন্ট কার সঙ্গে ছিল। সেখান থেকেই খাবার আনা হল। অন্ধকার হবার অনেক আগেই আমরা শয্যাগত হয়েছিলাম। সকাল আটটায় হেলসিঙ্কি পৌঁছলাম।

হেলসিঙ্কি থেকে বিকেলেই রওনা হব জাহাজে স্টকহোমের উদ্দেশে। জাহাজে সমুদ্রযাত্রা এই নিবন্ধের পক্ষে অবান্তর। স্টকহোম থেকে আমরা যাব সুইডেন ও নরওয়ের ল্যাপল্যান্ড অঞ্চলে। তবু এই জলযাত্রার বিষয়ে একছত্র বলে নিই।

সিলিয়া কোম্পানির দশতলা একটি জাহাজে উঠতে গিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এত লোক! জাহাজে হাজারখানেক যাত্রী স্টকহোম চলেছেন। সন্ধ্যা ছটায় উঠছি, সকাল দশটায় নামব। অত ভিড়, কিন্তু কী শৃঙ্খলার সঙ্গে সবার জাহাজে ওঠা শুরু হল। কাউন্টারে গিয়ে আমাদের টিকিট দেখাতেই আমাদের কামরার ইলেক্ট্রনিক চাবি দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের ঘর সাততলায়। এসকেলেটর ও সিঁড়ি পার হয়ে, শেষে লিফটে উঠে আমাদের নির্দিষ্ট কামরায় পৌঁছলাম। কামরাটি সুন্দর, সঙ্গে বাথরুম।

চটপট তৈরি হয়ে আমরা ছতলায় চলে গেলাম। সেখানে আট-দশটি ভোজনশালা আর শুল্ক-ছাড় জিনিসের দোকান। সর্বত্র মানুষের ভিড়। নিচের তলায় আরও দোকান এবং ভোজনশালা। যেন বড় কোনও মেলা বসেছে। মেলা শেষ হবার অনেক আগেই আমরা কামরায় ফিরে শয্যাগত হয়েছিলাম।

স্টকহোমে কটা দিন মহানন্দে কাটল। সময়টা ভালো। প্রত্যহ রোদ ওঠে। গা শিরশিরে ঠান্ডা। সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে আমরা নারভিক যাবার রিজার্ভেশন করালাম। রিজার্ভেশনের কর্মীটি সদালাপী মানুষ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় এই এক সুবিধা। প্রায় সবাই ইংরিজি বলতে ও বুঝতে পারেন। ইংরিজি ভাষা স্কুলে অবশ্য-পাঠ্য। রিজার্ভেশনের যুবকটি আমাদের নানা খবর নিলেন। নিজের দেশের অনেক কথা শোনালেন। রিজার্ভেশন করে আমাদের কাগজটা দিলেন। আমাদের যাত্রা পরদিন বিকেলে।

তখন তো জানি না, অত সদালাপের জন্য ঈষৎ অন্যমনস্ক রিজার্ভেশন কর্মী আমাদের ভুল রিজার্ভেশন করেছেন। প্রসঙ্গটা আমাদের ল্যাপল্যান্ডে যাত্রার সঙ্গে না লিখলেও চলত। লিখছি এই জন্য যে, গর্হিত হলেও তুলনা না করে পারছি না।

পরদিন বিকেলে আগেভাগে পৌঁছে আমাদের সংরক্ষিত কামরায় আসন নিলাম। এবারে আমরা স্থান পেয়েছি চারশয্যার কামরায়। কিছুক্ষণ পরে দুটি জার্মান যুবতী পৌঁছল। এবং তারপর আরও দুই ওদেশি যুবক। আমরা অবাক হয়ে ভাবছি এই চারশয্যার কামরায় ছজন কেমন করে থাকবে। আমার স্ত্রী বিভ্রান্ত হয়ে সেই প্রশ্নই তুললেন। আমরা নিশ্চিত জানি, আমরা ছাড়া বাকি চারজনের দুজন অনাধিকার প্রবেশ করেছে। পরস্পরের

টিকিট মিলিয়ে দেখা গেল, আমরা দুজনই এ কামরায় অবাঞ্ছিত আগন্তুক। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমাদের সংরক্ষণ কালকের জন্য, আজকের নয়। মিষ্টভাষী রিজার্ভেশন কর্মী আলাপচারীতে ব্যস্ত থেকে এই ভুলটা করেছে।

দিশাহারা হয়ে পড়লাম। কী করব, কাকে জিজ্ঞাসা করব? যাত্রীরা সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে। প্ল্যাটফর্মে একজনও রেলকর্মী নেই। ট্রেন ছাড়তে এক মিনিট বাকি, নেমে যাব কিনা ভাবছি, জার্মান যুবতীরা আশ্বাস দিল, আপনারা বসুন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। চেকার আসুক।

আমি ধাতস্থ হয়ে বললাম, মা লক্ষ্মীরা, তোমাদের পদতলে বসতে দিও। আমরা বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব, তোমাদের অসুবিধা না হলে।

প্রস্তাবটা অন্য দুজন যুবক যাত্রীর পছন্দ হয়নি, তাদের বিরস মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এমন সময় টিকিট চেকার মহিলা এলেন। আমার মনের মধ্যে আসন্ন ভবিষ্যতের করুণ ছবি পরের পর ফুটে উঠছে। আমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হয়েছে। অনেক অপেক্ষার পর স্টকহোমে ফিরে গিয়েছি, স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে হোটেলে, হোটেলে আবার একদিনের খরচ। তার ওপর আমাদের গন্তব্য নারভিক এবং বোডার হোটেলের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়ে হোটেলে স্থান রিজার্ভেশন করা হয়েছে। হায়, সে সব টাকাও মারা যাবে। তার ওপর আমাদের গন্ধমাদন মোটঘাট আবার কতবার ওঠাতে নামাতে হবে।

এসবের কিছুই হল না। চেকার মহিলা বললেন, আপনারা আপাতত এখানে বসুন। আমি দেখছি কোথাও কিছু খালি আছে কিনা। সংক্ষেপে বলি, শেষ পর্যন্ত আমরা অন্য একটি চারশয্যার কামরায় দুটি বার্থ পেয়েছিলাম।

ভেবেছি, এমন পরিণতি কি এদেশে হত? আমাদের আইনকানুন যে সর্বনেশে।

রাত দশটা পর্যন্ত ছোটবড় স্টেশন পার হতে থাকলাম। এ দিকটায় জনবসতি আছে। মাঝে খেতখামারও দেখা যাচ্ছে। তা বলে পাইন, ফার এবং স্প্রুসের কমতি নেই।

নিদ্রাভঙ্গে দেখি অরণ্য হ্রদ আর তৃণপ্রান্তর। বড় হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। হ্রদের তীরে জনজীবনের আভাস পাচ্ছি। হ্রদের তীরে মাছ ধরার আয়োজন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার প্রিয়তম খাদ্য বোধহয় মাছ। কাঁচা, শুকনো এবং রান্না করা। ট্রেন অতি দ্রুতগতি। আমরা সকাল দশটায় নামব নারভিকে, ৯৫০ মাইলের দূরত্বে।

পাহাড় দেখা যাচ্ছে দুপাশে। বন্য মানুষের মাথায় পালক গোঁজার মতো মাথায় বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও দেখছি হিমবাহ নামতে নামতে অকস্মাৎ থেমে গিয়েছে।

গ্রীষ্মকাল তাই শেষাংশে বরফ গলে গিয়েছে । পাহাড়ের পাশাপাশি, কখনও পাহাড় ভেদ করে টানেলের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে । দিনটা সূর্যালোকে প্রসন্ন ।

আমরা নরওয়ে সুইডেনের ল্যাপল্যান্ডে যাচ্ছি । সুইডেনের উত্তরতম শহর কিরুনা এসে গেল । বড় শহর, নানা শিল্পের অবস্থান এখানে । দুপাশে উচ্চ পর্বতমালা । এই অঞ্চল লৌহ আকরের জন্য খ্যাত । এখান থেকে নারভিকের বন্দর হয়ে লক্ষ লক্ষ টন আকর দেশবিদেশে চালান হয় । কিরুনার কাছেই সুইডেনের উচ্চতম পর্বতশীর্ষ । সঙ্গের অভিযাত্রীরা ট্রেন থেকে বোঁচকা-পিঠে নেমে গেলেন । চূড়ায় উঠতে বুঝি দুদিন লাগবে । তাঁদের উদ্দীপনা কত সহজে আমাদের মনেও সঞ্চারিত হল ।

আর ঘণ্টা দুই পরে আমরা নরওয়ের বন্দর নারভিক পৌঁছব । নারভিকের স্টেশন-বাড়ি ছোট । যাত্রীও খুব বেশি নামল না । হাইকিং আর হিলক্লাইম্বিংয়ের ভক্তেরা কিরুনাতেই নেমে গিয়েছে । আশা করি, তার নারভিকে আসবে । এত সুন্দর শহর আমরা বেশি দেখিনি ।

হোটেলের ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম । আমরা সর্বত্র মধ্যবিত্ত হোটেলে থাকি । এটিও তাই । ঘর অবশ্যই কার্পেটে মোড়া । একপাশে ফায়ারপ্লেস, শীতে আগুন জ্বালাবার জন্য । সেকালের আসবাব, ভেলভেটে মোড়া । ঝালর লাগানো বিছানার চাদর দুগ্ধ ফেননিভ বালিশ-বিছানা, সুন্দর লেস-লাগানো ফুল-ছাপ পর্দা । প্রাচীন একটি আলোস্ট্যান্ড । যেন পঞ্চাশ বছর আগের একটি ঘর এখন এইমাত্র আমাদের জন্যই খোলা হল ।

সঙ্কোচবশে জিজ্ঞাস করতে পারিনি, প্রৌঢ়া যিনি মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, তিনি মালিক, না ম্যানেজার । তিনিই ঘরে এলেন, বললেন, চা, না কফি? এখানে আপনি যখনই চাইবেন চা, কফি অথবা জুস তখনই পাবেন । অনুল্লিখিত ছিল, এটা হোটেলের অতিথিপরায়ণতার অঙ্গ । তার জন্য কোনও মূল্য দিতে হবে না ।

নারভিক পৃথিবীর উত্তরতম রেলস্টেশন । সুমেরু বৃত্তের প্রায় তিনশো কিলোমিটার উত্তরে নারভিকের অবস্থান । সুমেরু বৃত্তের তিনশো কিলোমিটার অভ্যন্তরে । এখানেও বিশেষ ঠান্ডা নেই । পাঁচ-ছ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । চা-পান করেই বেরিয়ে পড়া গেল । দুদিকের পাহাড়ের মাথায় বরফ । সামনের পাহাড় এতক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল । মেঘ সরতেই বিস্তৃত হিমবাহ দেখা দিল । আমাদের সামনেই সমুদ্রের খাঁড়ি ।

নরওয়ে সুইডেনে বলে ফিয়র্ড । সমুদ্র যেখানে স্থলভূমির গভীরে প্রবেশ করেছে ফিয়র্ড বলতে তাই বোঝায় । বড় মানচিত্র দেখলে বুঝতে পারি সমুদ্র কেমন তার সহস্র নখর চিহ্নে স্থলভূমিকে আক্রমণ করেছে । ফিয়র্ডের জল শুধু সমুদ্রের সামনেই সীমিত নয়,

পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, পাশ কাটিয়ে অনেক অভ্যন্তরে চলে গিয়েছে। বহু ফিয়র্ডে জাহাজ চলে। এমনই এক ফিয়র্ডের পাড়ে নারভিক। একদিকে বন্দর। সেই সদাব্যস্ত বন্দর থেকে আকরিক লোহা বিদেশে চালান হয়।

আমরা ফিয়র্ডের অন্য তীরে। সেখান থেকে বন্দর দেখা যায়, ব্যস্ততা বোঝা যায় না, এমন প্রশস্ত ফিয়র্ড। নারভিক শহর ফিয়র্ডের তীরে, স্থলভূমি প্রশস্ত নয়, একটু পরেই পাহাড়ের শুরু। সেই পাহাড়ের গায়ে খাঁজে খাঁজে আমাদের হিল স্টেশনের মতো ছোট বড় বাংলো। সব বাড়িতে ফুল, রাস্তার ধারে ফুল, নানা বর্ণের নানা আকারের। হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে পরিপূর্ণ রৌদ্রে পাহাড়ের শিখরশ্রেণী ঝলসে উঠল।

কিরুনা থেকে নারভিক আসবার পথ একেবারে অন্যরকম। তখন আমরা ক্রমশ পাহাড়ে উঠেছি, যেমন হয় পাহাড়ের ট্রেন, এঁকেবেঁকে, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। একপাশে ভয়ংকর খাদ, অনেক নিচে ফিয়র্ডের জল। পথের ধারে ঝরনা নেমেছে, পাথর পড়বার ভয়ে কোথাও চালা করে দেওয়া হয়েছে, যার তলা দিয়ে ট্রেন নিরাপদে যেতে পারে। এক পাশের পাহাড়ে নগ্ন পাথর, সোজা জল থেকে উঠেছে, বিভীষিকার মতো। ট্রেনের গতি অনেক কমে এসেছে। এমন যাত্রা যে সমতল শহরে শেষ হতে পারে বিশ্বাস হয় না। নারভিকের দীর্ঘ তট ফিয়র্ডের ওপর। ছোট দোকানপাট। এমন একটা রাজপথে টুকিটাকি ভোজনের আয়োজন নেই দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

নিকটের কিয়স্কে কিছু ফাস্ট ফুড ভোজনান্তে আমরা চললাম মাউন্টেন লিফট চড়বার জন্য। ফিয়র্ডের তট থেকে অনেকখানি ওপরে উঠে মাউন্টেন লিফট ধরতে হবে। আমাদের হোটেলের মহিলা বললেন, ট্যাক্সি করে যাওয়াই ভালো। অতটা উঠতে পারবেন না। অগত্যা ট্যাক্সি। মাউন্টেন লিফটের স্টেশনে টিকিটবাবু ছাড়া আর কোনও মানুষ নেই। তিনি টিকিট দিয়ে আমাদের একটা খাঁচায় বসিয়ে দিলেন। প্রায় ৭০০ মিটার ওপরে উঠব, অর্থাৎ দু হাজার ফুটের বেশি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছি, ওই যাত্রায় নিচের টিকিটবাবু ছাড়া ওপরে নিচে কোনও কর্মী নেই। তিনিই সব নিয়ন্ত্রণ করছেন। ওপর থেকে নিচে নামার সময়ও কেউ নেই। খাঁচায় উঠে বসলে স্বয়ংক্রিয় দরজা নিজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং নিচের দিকে চলতে শুরু করে। একটু অস্বস্তি হয় বৈকি।

পাহাড়ের একটা খাঁজে কাঠের মস্ত পাটাতন। রোপওয়ে স্টেশন। হঠাৎ চারদিকের দিগন্ত যেন মুক্ত হয়ে গেল। আমরা হিমবাহের তলদেশে এসে পৌঁছেছি। এখন গ্রীষ্মে হিমবাহগুলি সংকীর্ণ। আমাদের সঙ্গীরা অনায়াসে একটু উঠে হিমবাহে বসে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে লাগলেন। অনেক নিচে ফিয়র্ড। বন্দর দেখা যাচ্ছে শিশুর খেলাঘরের মতো। তিনদিকের পাহাড়ে বরফ। কয়েকজন পিঠে-বোঁচকা যাত্রী হাইকিংয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আর দুই যাত্রী ভারি বোঝা কাঁধে নিয়ে দুহাজার ফুট উঠে এসেছেন । তাঁরা পাহাড়ের বিশুদ্ধ হিমেল হাওয়াতে সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছেন । পুরুষটি যৌবন পার হয়েছেন । পরিচয় হতে বললেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, কিরুনার পাহাড়ে চড়তে এসেছিলেন । একদিনে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটেছেন । এই মাউন্টেন লিফটের চূড়া তো সামান্য ব্যাপার । নস্যি ।

ওপরে একটি সুদৃশ্য ভোজনশালা । গরম চকোলেট পান করে আমরা ক্লান্তি নিরসন করলাম । কিছু টুকিটাকি জিনিস বিক্রি হচ্ছে । ল্যাপদের হাতের কাজ, কাঠ এবং চামড়ার । প্রবল দাম । কিন্তু ল্যাপেরা কোথায়, তাদের সেই চামড়ার পোশাকে রাইন ডিয়ার বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে স্লেজ হাঁকাচ্ছে, তারা কোথায়? এখানেও তারা অনুপস্থিত । আরও দুশো মাইল উত্তরে গেলে তাদের দেখা পাওয়া যেতে পারে । আমাদের সে অভিযানের সাহস নেই, সামর্থ্যও নেই । আমাদের সদ্যলব্ধ বন্ধু দুজন ফিনল্যান্ডের মানুষ । আমরা রোভানিয়েমি গিয়েছি শুনে বললেন, কী রকম মশা পেলেন ওখানে? আমরা আদৌ মশা দেখিনি শুনে আশ্চর্য হলেন । বললেন, এই সময়টা ল্যাপল্যান্ডের জলার বদ্ধ অঞ্চলে প্রচুর মশা হয়, মানুষকে মুখে নেট ঢেকে ঘুরতে হয় ।

মশা নেই কেন আমাদের জানবার আগ্রহ হল না । আমরা ম্যালেরিয়ার ভুক্তভোগী । মশার কথা শুনে চকিত হয়েছিলাম । স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললেন, না, না এ মশায় ম্যালেরিয়া হয় না । কিঞ্চিৎ চুলকোয় এই যা । এরা নিরীহ মশা । কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁরা আবার নামতে শুরু করলেন । আজই যেন অন্য কোন পর্বতশিখরে ওঠবার জন্য ট্রেন ধরতে হবে ।

এঁদের সঙ্গে ফিনল্যান্ড এবং সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভোজন-ধারার বিষয়ে কথা হয়েছিল । বললেন, এ দেশের কাঁচা এবং শুঁটকি মাছের কোনও তুলনা হয় না । তাঁর জিভে জল এসে গিয়েছিল । সশব্দে টেনে নিয়ে বললেন, রাইন ডিয়ার স্টেক খেয়েছেন, ভালো । কিন্তু এদেশের মাছের কাছে কোনও মাংসই দাঁড়াতে পারে না ।

নারভিকে নির্বাধ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনও কাজ ছিল না । কোনও দ্রষ্টব্যে যাবার তাগিদও নেই ।

ফেরার দিন হোটেলের মহিলা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, আবার আসবেন । এবার আপনাদের জন্য আমাদের হনিমুন স্যুট রিজার্ভ থাকবে ।

আমাদের বয়স শুনে তিনি বিশ্বাস করতে চাননি । বললেন, যদি সত্যিই ওই বয়স হয় আপনাদের, হনিমুন স্যুট তো আপনাদেরই জন্য ।

নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ড ঘুরে আমরা সাবেকি পোশাকে ল্যাপদের দেখা পাইনি বটে, কিন্তু এই ভ্রমণে সুখের সীমা ছিল না ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

সবুজ নামদাফাতে

সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিকুম, বকুল, টাটা টি-এর চা-বাগানের বুক চেরা রাস্তা ধরে বাসের চলা তিনসুকিয়ার দিকে । রাস্তা খুবই খারাপ, তবে তা পুষিয়ে দেয় সঙ্গী হয়ে চলা চা-বাগান ও টোকা-মাথায় শ্রমিকের দল । পিছনে ফেলে এসেছি ডিব্রুগড়, এখান থেকে মাত্র ১৬৩ কি-মি দূরেই আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নামদাফা জাতীয় অরণ্যের প্রবেশদ্বার মিয়াও ।

তিনসুকিয়া থেকে ফের বাসযাত্রা, একে একে মার্গারিটা, ডিগবয়, লিডো (এখান থেকে মিয়াও ৫৬ কি-মি), লেথপানি, তিরাপ জাপুন পেরিয়ে বাসের থামা আসাম ও অরুণাচলের সীমান্ত চেকপোস্ট নামচিক-এ । এখানে ইনার লাইন পারমিট পরীক্ষা করা হয় ।

জঙ্গলের বুক চেরা পাকা রাস্তা ধরে বাসের চলা । চারদিক শুনশান, রাস্তার ধারে আকাশ ছোঁয়া বনস্পতির গায়ে লতাগুল্মের বহু পুরনো বাসস্থান । ঘন সবুজের মাঝে ফুটে থাকা দুয়েকটি সাদা ফুলের ঝাড় মনটাকে ছুঁয়ে গেল ।

খারসান, নামপাই পেরিয়ে যখন মিয়াও এল তখন লালচে আকাশের বুকে আঁধারের ছায়া । টিয়ার দল টিঁ টিঁ শব্দে উড়ে গেল ।

মিয়াও জায়গাটি গঞ্জ প্রকৃতির, সরকারি অফিস ও বাংলোর প্রাধান্যই বেশি । ইলেক্ট্রিসিটি আছে । চতুর্দিকে পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত সুন্দরী মিয়াওয়ের বুক চিরে অরণ্য দুহিতা নোয়া ডিহিং নদী বয়ে গেছে ।

থাকার জায়গা বলতে সার্কিট হাউস, পি ডাব্লু ডি বাংলো । এখানে থাকতে গেলে সরকারি আনুকূল্যের প্রয়োজন । ফলে অগতির গতি বাজার থেকে ২ কি-মি দূরবর্তী ট্যুরিস্ট লজ । ঠিক নদীর ধারেই গড়ে ওঠা এই লজের অন্যতম প্লাস পয়েন্ট হল আতিথেয়তা ।

জঙ্গলে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জিপ মেলে বনবিভাগ থেকে । ভাড়া ৩০০ টাকার মধ্যে । তবে তা অধিকাংশ সময় খারাপ থাকার দরুন মিয়াও বাজার থেকে বেশি ভাড়ার প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে প্রায়শই জঙ্গলে ঢুকতে হয় ।

রাতে সবাই ঘুরতে বেরোলাম। চাঁদের আলোর বন্যা চতুর্দিকে। দূরের পাহাড়, গাছের মাথা সাদা হয়ে আছে, নদীর জলে চাঁদের প্লাবন। লজের পিছনের জঙ্গলে চলছে আলো-আঁধারির খেলা। অজানা পাখির ডাক মাঝে মধ্যে কানে আসছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় কম্পমান দেহ নিয়ে ঘরে এলাম।

পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে আমাদের যাত্রা মিয়াও থেকে ২৪ কি-মি দূরত্বে দেবান ফরেস্ট বাংলোতে। সময় লাগে ঘণ্টাদুয়েক। রাস্তা খুবই খারাপ। পথের ওপর দিয়ে মাঝে মধ্যে বহমান পাহাড়ি ঝোরা রাস্তার বুক ভেঙে খাদের দিকে ঝাঁপ দিয়েছে-তার পান্না গলানো জল সাদা ফেনা ছিটিয়ে হারিয়ে গেছে প্রকৃতির মাঝে। এই জল ডিঙিয়ে আমাদের পথ চলা। চতুর্দিকে বিভিন্ন রকম পাখির কলতান। ছোট ছোট পাখি, বাহারি তাদের গায়ের রং। এসে পৌঁছলাম চেকপোস্ট। ডিউটিতে আছেন মণ্ডলবাবু। জঙ্গলের প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে গেট খুলল।

আমরা যাত্রা করলাম উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বনানী নামদাফা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উদ্দেশে। ১৯৮৫ বর্গ কি-মি বনাঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছে এই ব্যাঘ্র প্রকল্প। এক অদ্ভুত জঙ্গল এই নামদাফা। কী বিস্তৃত এর ব্যাপ্তি। প্রায় হাজার ফুট থেকে শুরু করে ১৫০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই জঙ্গলের পরিধি। আসলে ঠিক পাশেই বর্মা সীমান্ত হওয়ার দরুন এখানকার উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে ইন্দো-বার্মিজ প্রজাতির শঙ্করীকৃত সবকিছুর মধ্যেই বৈচিত্র্যের ছটা।

দেবানের পথে নোয়া-ডিহিং বাঁদিকের নিত্যসঙ্গী। চেকপোস্ট থেকে কিছুটা এগিয়ে লঙ্কার খেত চোখে পড়ল। দুয়েকটি গ্রাম পেরিয়েই এসে গেল গিবন পয়েন্ট। এখানে হুলক গিবনের দেখা মেলে। পর্যটকেরা যদি সাহসী হন তবে এখান থেকে ৫ কি-মি দূরবর্তী মতিঝিল সল্টলেকে গিয়ে বন্যপ্রাণীদের দর্শন পেতে পারেন। চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হবে আর যেহেতু ওয়াচ-টাওয়ারটি যথেষ্ট উঁচু নয়, সেহেতু হাতিদের দেখা পেলে মুশকিল হলেও হতে পারে।

বনমধ্যে ট্রপিকাল এভারগ্রিন ফরেস্টের রূপ ও বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতো। ট্রি ফার্ন, বাঁশ, অর্কিড ও বেতের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে নজর বিঘ্নিত হয়। পথিমধ্যে হাতির পায়ের ছাপ ও হঠাৎ উড়ে আসা সাদা টুপি পরা রেড-স্টার্ট পাখি চমক লাগায়।

দেবানে পৌঁছে মন রোমান্টিক হয়ে উঠল। উজ্জ্বল গোলাকৃতি আকারের দ্বিতল বাংলো, পুরোটাই মশারি দিয়ে ঘেরা। একতলায় তিনটি ও দ্বিতলে দুটি ভি আই পি রুম। এছাড়া এখান থেকে সওয়া কি-মি দূরে চারটি স্যুইট বিশিষ্ট ট্রানসিট লজ ও ডর্মিটরিতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। শেষোক্তটিতে থাকার জন্য নিজেদের বিছানাপত্র নিয়ে যেতে হবে।

দেবান বাংলোর সামনে সুন্দরভাবে ছাঁটা ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের বেড়া দেওয়া বিস্তৃত লন । তারপরেই শুরু নদীখাতের বোল্ডারের রাজত্ব । এর মাঝে বয়ে যাওয়া ক্ষীণ কটি নোয়া-ডিহিং বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, শীতকালেও যথেষ্ট খরস্রোতা । দু-দিকের মন মাতাল করা ঘন বনাকীর্ণ পাহাড়ের মাঝ বরাবর কুলকুল শব্দে বাহিতা অরণ্যদুহিতা ডেবান নালা ও নামদাফা নদী সৃষ্টি করেছে এই অপরূপা নোয়া-ডিহিংকে ।

এখানকার ফরেস্টার পাত্রীবাবুর উৎসাহে বাংলোতে মালপত্র রেখে খাওয়া সাঙ্গ করে, দুপুর একটায় রওনা দিলাম দেবান থেকে ১৬ কি-মি দূরে গহীন অরণ্যে বুলবুলিয়া ক্যাম্পে-সালফার স্প্রিংয়ের দিকে ।

প্রথম এক থেকে দেড় কি-মি পথ চলা বোল্ডারের ওপর দিয়ে । তারপর সরকারি পারানির সাহায্যে ঘন কাশবনের মধ্য দিয়ে জঙ্গুলে মেঠো চড়াই বেয়ে আমাদের এগনো । সঙ্গে শুকনো খাবার ও কুকরি হাতে গাইড বাহাদুর । পথিমধ্যে পাহাড়ি ঝোরাখাত চলার গতি নষ্ট করে দেয় । যত এগোচ্ছি বন তত ঘন হচ্ছে । দুপুর আড়াইটে নাগাদ আলোর অভাব বোধ হতে লাগল । দুদিকে জঙ্গল, মাঝে পায়ে হাঁটা সরু পথ । হঠাৎ নাম না-জানা জন্তুর সরে যাওয়া, হুলক গিবনের চিৎকার পরিবেশকে আরও ভয়ানক করে তুলল । তিনটে নাগাদ এল ৬ কি-মি দূরবর্তী হলদিবাড়ি । কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা আরও ৬ কি-মি দূরে হর্নবিল পয়েন্টের দিকে । পথে যেতে অর্জুন, খোকন, হুলক, মেকাই, গর্জন প্রভৃতি বনস্পতি ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে । পচা-গলা পাতায় ভরা পথে পা ডুবে যাচ্ছিল, জোঁক ধরার সম্ভাবনা প্রচুর ।

এই অঞ্চলে বিড়ালধর্মী চার প্রজাতির বাঘ, চিতাবাঘ, স্নো লেপার্ড ও ক্লাউডেড লেপার্ডের বাস । উচ্চতার তারতম্যে প্রাণীকুলের বাসস্থানের রদবদল ঘটে । নিচের ভাগে বার্কিং ডিয়ার, সম্বর, শুয়োর, বাঘ আর হাজার সাতেক ফুট উঁচুতে হিমালয়ের রেডপাণ্ডা, বিন্টুরং ও আরও উঁচুতে লুপ্তপ্রায় তুষার ও মেঘবরণ (ক্লাউডেড) লেপার্ডের দেখা মেলে ।

এছাড়া হাতি, বানর ও বাইসনের দল তো আছেই, তৎসহ হাজারও পাখির কলকাকলি মাতিয়ে রাখে নামদাফার জলসাঘর । রংবেরঙের ধনেশ ছাড়াও কালিজ, ফেজেন্ট, মিনিডেট, সাদা কাক, টিয়া ও হর্নবিলের আড্ডার জেরে জঙ্গল থেকে থেকে চমকে ওঠে । এছাড়া সাপেদের ঐতিহ্যের কথা উহ্যই থাক ।

ভাগ্যে থাকলে বুনো কুকুর, শেয়াল বা হাতির দেখা বা তাদের পদচিহ্ন চোখে পড়তে পারে । সাড়ে চারটের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসাতে টর্চ হাতে পথ চলে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে এসে পৌঁছলাম হর্নবিল । হর্নবিল পয়েন্টের ওয়াচটাওয়ার দেখে আঁতকে উঠলাম । টিনের চালা দেওয়া একটি দু-ফুট উঁচু কুঁড়েঘরবিশেষ । দেওয়ালের বালাই নেই । আমরা

আর যাইনি, তবে এখানে থেকে ৪ কি-মি দূরবর্তী বুলবুলিয়া ও ৩০ কি-মি দূরবর্তী ফার্ম বিচ হাউসে যাওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রথমটির ওয়াচটাওয়ারটির অবস্থা তথৈবচ আর দ্বিতীয়টিতে যেতে গেলে তাঁবু নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

আগুন জ্বলেছে সারারাত। দেওয়ালের অভাব পূর্ণ করেছে সঙ্গে আনা সতরঞ্চি ও কম্বলের দল। সারারাত এই নির্জন নির্বাসনে জন্তুদের পিলে চমকানো ডাক যে মোটেই সুখপ্রদ হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

সকাল হতেই ফেরা দেবানের দিকে। পথে দেখা মিলল হাতি পরিবারের। মহানন্দে কলাগাছ গলাধঃকরণে নিমগ্ন তারা। দুগ্গা বলে স্রেফ পালিয়ে আসা। ফেরার পথে দেখি এক জায়গায় কাশফুল ফুটে রয়েছে, ঘন কাশবনের ওপারে পাহাড়ভেদি নদীর প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস, ঠিক পাশেই দেবান বাংলো, আপাতত এখানেই দু-দিন রাত্রিবাস।

দেবান থেকে মিয়াওতে ফেরার পথে দেখি পথের ওপর পাখিদের সভা বসেছে।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

পঞ্চকেদার

শিবনাথ বসু

কেদারনাথ ছাড়া আরও যে চারটে কেদার আছে অনেকেই তা হয়তো ভালোভাবে জানেন না। এই পঞ্চকেদার হল-কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। দারুণ সুন্দর এই ট্রেকিং রুট। বিশেষ প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র টাকাকড়ি, গরম জামাকাপড় আরেকটা স্লিপিং ব্যাগ জোগাড় হয়ে গেলেই যাওয়া চলে। পাঁচ কেদারে হাঁটাপথ সব মিলিয়ে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার। আমার নিজের মতে, ভারতীয় হিমালয়ে পঞ্চকেদারের জুড়ি মেলা ভার। একসঙ্গে হিমালয়ের ও তীর্থের নানা বৈচিত্র্যের অশেষ সমারোহ এই একই ট্রেকিং রুটে পাওয়া সত্যিই দুর্লভ।

কেদারের কিন্তু দারুণ সব কাহিনী আছে। পৌরাণিক মতে, পঞ্চপাণ্ডব এই পাঁচ কেদারের নির্মাতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা আত্মীয়বন্ধু নিধনের গ্লানিতে প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশে শিবের সঙ্গে দেখা করার সংকল্পে রওনা দিলেন। কিন্তু শিবের দেখা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। শুরু হল পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে মহাদেবের লুকোচুরি খেলা। কাশী, উত্তরকাশী, গুপ্তকাশী হয়ে শিব কেদারের হিমালয়ের কোলে দেখলেন প্রচুর মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। শিব মহিষরূপ ধারণ করে নিশ্চিন্তে ওখানে লুকিয়ে রইলেন। পাণ্ডবরাও শেষে বুঝলেন শিব মহিষরূপী। কিন্তু কেমন করে বুঝবেন স্বয়ং মহাকাল কোনজন। শেষে বুদ্ধি করে ভীম এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মাথায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সন্ধেবেলা মহিষদের ঘরে ফেরার সময়ে দেখা গেল একটা মহিষ ভীমের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলতে চাইছে না। ভীম বুঝলেন এই নিশ্চয়ই মহাদেব। পিছনদিকে তাই জাপটে ধরলেন। পিছনদিক পড়ে রইল। বাকি অংশ উধাও। তাই কেদারনাথের বিগ্রহ মহিষের পশ্চাদ্দেশ। বাকি অংশও এইভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ধরা পড়ল। মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ আর কল্পেশ্বরে জটা। আর মহিষরূপী-মুখ নেপালের পশুপতিনাথে। তাই অনেকে পশুপতিনাথকে ষষ্ঠ কেদারও বলেন। যাইহোক, শেষপর্যন্ত শিব পঞ্চপাণ্ডবের গ্লানি মুক্ত করে বর দিলেন। আর পাণ্ডবরা খুশি মনে এই পাঁচ জায়গায় মন্দির নির্মাণ করলেন। পুজো শুরু হল পঞ্চকেদারের।

সাধারণত কেদারনাথের মন্দির খোলার সময়ে অর্থাৎ মে-জুন মাসে আর আমাদের পুজোর সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্বচ্ছন্দেই পঞ্চকেদার যাওয়া চলে । মে-জুনে অবশ্য বরফ থাকে আর পুজোতে নতুন করে বরফ পড়ার সম্ভাবনা । এবারে পুজো প্রায় অক্টোবরের শেষে । তাই নতুন বরফ পড়া অবশ্যম্ভাবী ।

আমি অবশ্য মন্দির খোলার সময়ে যাব ঠিক করি । সেইমতো দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বারের টিকিট কাটি । এই দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার যাওয়া এক যন্ত্রণা । দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াই প্রায় ২৫০ টাকা হয়ে গেছে । অথচ সুযোগ-সুবিধার কোনওরকম বাড়-বৃদ্ধি নেই । অনেকে দিল্লি হয়ে হরিদ্বার যাওয়া পছন্দ করেন । দিল্লি থেকে মাত্র ঘণ্টাছয়েকের বাস জার্নি । দিল্লির অনেক ভালো ভালো ট্রেনও আছে । আবার অনেকে অমৃতসর মেলে হরিদ্বার যান । মাঝরাতে লাক্সারে নেমে ঘণ্টাদুয়েক স্টেশনে অপেক্ষা করে ভোররাতে হরিদ্বারের বাস ধরলে ঘণ্টাদুয়েকের পথ । হরিদ্বার পৌঁছে দেখি স্টেশনের বাইরে অনেক বেসরকারি বাস রুদ্রপ্রয়াগের পথে যাচ্ছে । সেদিনই ওর থেকে বেশিদূর যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না । আর প্রথমেই হরিদ্বারে বিশ্রাম নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই । তাই দেখেশুনে রুদ্রপ্রয়াগের সুন্দর একটা বাসে উঠে পড়ি । প্রথমদিনেই অনেকটা এগিয়ে থাকা হবে । বাস হৃষিকেশ হয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে । সেই অত্যন্ত চেনা পাহাড়ি পরিবেশ । একরাশ ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর আর মন দুই-ই জুড়োয় । চেনা ঠান্ডা, চেনা রাস্তা, চেনা গন্ধ, চেনা ভালো লাগা নিয়ে অসীম এক তৃপ্তি মনে জমাট বাঁধতে থাকে । কলকাতা থেকে শুকনো কিছু বাদাম, আমসত্ব, কাজু, বিস্কুট ছাড়া আর কিছু আনিনি । এ রাস্তায় খাবার মোটামুটি পাওয়া যাবে । শুধু একটা প্রেসারকুকার সঙ্গে রেখেছি । রুদ্রনাথে অনেক সময় নাকি লাগে । আর তাছাড়া প্রেসারকুকার থাকলে একবার খিচুড়ি অন্তত নিজে করে নিতে পারব যদি ভীষণ দরকার পড়ে । সেইমতো একবারের খিচুড়ির সব কিছু প্রেসারকুকারে কলকাতা থেকে ভরে রেখেছি । সকাল সাড়ে আটটায় বাস ছেড়েছে । আর বিকেল চারটে নাগাদ রুদ্রপ্রয়াগ । অলকানন্দা আর মন্দাকিনী নদীর সঙ্গম । থাকার অনেক জায়গা আছে । গত বছরই নতুন বড় ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে, অলকানন্দা-মন্দাকিনীর সঙ্গমের ধারে । গমগম করছে বাজার এলাকা । গাড়োয়াল বিকাশ নিগমের পুরনো বাংলোও আছে । জায়গা পেলাম না । কারণ মে মাস হল কেদার-বদ্রী যাত্রার সময় । কালীকমলি মন্দির কমিটির ধর্মশালায় উঠলাম । ভালোই । বড় ট্রেক । বড় তীর্থ । তাই মানিয়ে নেওয়ার মন না হলে মুশকিল । এইসব জায়গায় একটু কষ্টকে মানিয়ে নিতেই হয় । এর মধ্যেই এল বৃষ্টি । সজোরে । বেশ লাগছিল সব মিলিয়ে ।

পরদিন ভোরে বাস ধরব এখান থেকে বদ্রীনাথ যাওয়ার । আমরা নামব হেলাং । যোশিমঠের কিছু আগে । হেলাং থেকে কল্পেশ্বরে যাব । আমরা কল্পেশ্বর থেকে পঞ্চকেদার

শুরু করছি। প্রথমে কল্পেশ্বর, তারপর রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ, মদমহেশ্বর শেষে আমাদের চেনা কেদারনাথ। তবে বেশিরভাগ যাত্রীই কেদারনাথ দিয়ে শুরু করেন। তাতে একটু সুবিধা হয়। এখান থেকে মানে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড যাবার প্রচুর বাস আছে। যার যেমন পছন্দ। হেলাংয়ের পথে কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডার ও অলকানন্দা, নন্দপ্রয়াগে মন্দাকিনী আর অলকানন্দার সঙ্গম। আর তাছাড়া অলকানন্দাকে সঙ্গী রেখে পথ চলা। বেলা ১২ নাগাদ হেলাং এল। সকাল সাড়ে ছটায় বাস ছেড়েছে। জানলা দিয়ে আপনি বুঝতেই পারবেন না হেলাং এসে গেছে। তাই কন্ডাক্টরকে অবশ্যই বলে রাখবেন যে হেলাং নামব। বাসস্ট্যান্ডের সামনে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। দোকানের মালিক কিশোর পাহাড়ি, ছেলেটির নাম বংশী। প্রথমে চা খেলাম। বললাম, রুকস্যাকের অদরকারি এই ট্রেকিংয়ের মালপত্রগুলো তুমি একটু রেখে দাও। কল্পেশ্বর ঘুরে কাল ফেরার পথে নিয়ে যাব। আর এখন একটু জমিয়ে খিচুড়ি বানাও চটপট করে। বংশী কাজে লেগে গেল। জানি না, কী পরম নিশ্চিন্তে বেশিরভাগ জিনিসপত্রই দোকানে একটা কাপড়ে বেঁধে রাখলাম। এই বিশ্বাসের নিশ্চিন্তি আছে বলেই এখনও হিমালয় হিমালয়। পাহাড়ি সৌন্দর্য, ওরকম মনোরম ভাবগম্ভীর পরিবেশ ছাড়িয়ে আমার আকর্ষণ মানুষগুলোর প্রতি। এদের সাহচর্যে মনে হয় এখনও আমরা এত কিছুর পরেও মানুষ আছি।

খাওয়া শেষে রওনা হলাম কল্পেশ্বরের পথে। হেলাং থেকে দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। মোটামুটি মাঝারি চড়াই। প্রথমদিন ট্রেকিংয়ের গতি শ্লথ থাকে। তাই আস্তে আস্তেই পথ চলা। পুরো এলাকার নাম উরগম। রাস্তাতে প্রচুর গ্রাম। মাঝে মাঝে ঢেউখেলানো উপত্যকা। সোনালি শস্যভরা খেত। চারপাশে পাহাড়ের শান্ত সৌম্যকান্তি রূপ। কল্পেশ্বরের মন্দিরের লাগোয়া থাকার জায়গা আছে। ১ কিলোমিটার আগে মহাবীর সিংয়ের একটা ছোট্ট অতিথিশালাও আছে। মহাবীর সিংয়ের মাকে বলে ওদের বাড়িতেই উঠি। মাতাজি ভীষণ ভালো। রাতে খেতের কচি মটরশুঁটির ডালনা আর রুটি। সঙ্গে আলুর দম।

খুব ভোরেই রওনা দিই মন্দিরের পথে। মিনিট কুড়ি লাগল। বেশ প্রাচীন মন্দির। চাতাল পেরিয়ে প্রায় একটা গুহার মতো মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ। মহাদেবের জটা। পুরোহিত আর এক বাঙালিবাবা ওখানে থাকেন। প্রবেশমুখেই বাঙালিবাবা গরম গরম এক বাটি কালো চা দিলেন। জাপানি কায়দায় বাটিতে চা। চা খেতে খেতে কল্পেশ্বর শিবের কাহিনী শুনলাম। দুর্বাসা ইন্দ্রকে একটা পারিজাতের মালা উপহার দেন। ইন্দ্র আবার সেই মালা হাতির শুঁড়ে একবার পরিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্বাসা তাই দেখে অত্যন্ত রেগে যান। তাঁর দেওয়া মালাকে অপমান! দুর্বাসার শাপে স্বর্গচ্যুত হলেন ইন্দ্র। এখানে বসে কল্পেশ্বর শিবের আরাধনা করে ইন্দ্র আবার ফিরে পান তাঁর রাজ্য। তাই কল্পেশ্বরকে

সত্যি সত্যি মন থেকে ডাকলে তিনি সবার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন । বেশ অনাড়ম্বর আর আন্তরিকভাবে পুজো হল শিবের । কোনও লোকজন নেই । তাড়া নেই । পুজোর আচার-অনুষ্ঠান ভক্তদের ভালো লাগবে । তারপর কল্পেশ্বর থেকে সোজা হেলাং । যাব রুদ্রনাথের পথে মণ্ডলে । হেলাং থেকে মণ্ডলের বাস ধরব । কিন্তু ঘটনাচক্রে জানতে পারি, রুদ্রনাথে তখন প্রচণ্ড বরফ । আর মন্দির খোলেনি । পঞ্চকেদার ঘুরতে গিয়ে একটা কথা নতুন করে আমরা জানতে পারি । এই প্রসঙ্গে সেটা একটু বলে রাখি । কাগজে কেদার-বদ্রী মন্দির কবে খুলবে তা জানানো হয় । কেদার মন্দির কবে খুলছে জেনেই এই প্রোগ্রামে এসেছি । কিন্তু এখানে এসে দেখি শুধুমাত্র কেদারনাথই খুলেছে । ওখানেই সবচেয়ে বেশি মানুষ যায় বলে শুধু কেদারনাথ খোলার কথাই জানানো হয় । অন্য কেদার দিন-তিথি দেখে তারপর আস্তে আস্তে খোলে । এখন রুদ্রনাথ বন্ধ । তাই চললাম হেলাং থেকে বাসে গুপ্তকাশী হয়ে কুণ্ড । ওখান থেকে একটু দূরে উখিমঠ । উখিমঠ থেকে মদমহেশ্বর । বিকেল নাগাদ এল কুণ্ড । মাথাপিছু পাঁচ টাকা নিয়ে একটা ট্যাক্সি কুণ্ড থেকে উখিমঠ এল । উখিমঠে নীল আকাশের গায়ে দেখি ঝকঝকে সোনালি চৌখাম্বা শিখর । জমকালো সূর্যাস্ত হচ্ছে । শীতকালে উখিমঠেই কেদারনাথ আর মদমহেশ্বর নেমে আসেন । গরমে আবার তাঁদের স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । কেদারনাথকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কিন্তু মদমহেশ্বরকে এখনও নিয়ে যাওয়া হয়নি । আগামীকাল মদমহেশ্বরের ডোলি যাবে ওপরে । উত্তেজনায় শরীর অধীর হয়ে উঠল । ডোলির সঙ্গে যাব । এ যে পরম পুণ্যের ফল ।

মদমহেশ্বরে একটা পোর্টার নেব ঠিক হল । কল্পেশ্বর যাওয়া-আসা যেখানে ১৮ কিলোমিটার সেখানে মদমহেশ্বর ৬০ কিলোমিটার । ৪ দিন লাগবে । মদমহেশ্বরের উচ্চতা ১১,৭৪৪ ফুট । উখিমঠেই পোর্টার মিলল । দৈনিক ৫০ টাকা । সকালে উখিমঠ থেকে ট্যাক্সি করে মনসুনা গ্রাম । মাথাপিছু ট্যাক্সিভাড়া ৫ টাকা । ওখান থেকে হাঁটা শুরু । যাব ১৫ কিলোমিটার দূরে রাঁসিতে । প্রথমে অল্প একটু উতরাই । নদীর সেতু পেরিয়ে চড়াই । এল লেঙ্ক । লেঙ্কের স্কুলবাড়িতে একটু বিশ্রাম, চা খাওয়া । তারপর আবার পথ চলা । রাঁসি পৌঁছে দেখি হইচই ব্যাপার । ডোলি আজ এখানে দেবী রাকেশ্বরী মন্দিরে থাকবে । ডোলি এল । সমস্ত গ্রামেই উৎসবের মেজাজ । সময় ছিল হাতে অনেক । তাই জনার্দন ভাটের দোকানে খাওয়া সেরে এগিয়ে চললাম আরও । রাঁসি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে গৌণ্ডার গ্রাম । ক্ষেত্রপালের মন্দির । এখানে কাল ডোলি থাকবে । ভিড় এড়ানোর জন্য আরও ১ কিলোমিটার দূরে বিকেলের মধ্যেই এসে পৌঁছই বানতলি । দারুণ জায়গা । সবুজের সমারোহ চারদিকে । সবস্বতী আর মদমহেশ্বরের গঙ্গার সঙ্গম । ছোট্ট একটা অতিথিশালা । লোকজনের ভিড় নেই । উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটা নিজস্ব ঘরও আছে অতিথিশালার লাগোয়া । বানতলিতে একদিনের বিশ্রাম । বিশ্রাম নেওয়ার আরেকটা

কারণও ছিল । ডোলি মদমহেশ্বরে না যাওয়া পর্যন্ত মন্দির খুলবে না । অতিথিশালাও খুলবে না । অতএব একদিন আমাদের থামতেই হবে ।

বানতলি থেকে ৪ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে নানুর । থাকার জায়গা বলতে দোকান । প্রয়োজনে থাকা যেতে পারে । তবে বেশ চড়াই । নানুর গ্রামটা বেশ । দোকানের পিছনে বিশাল সবুজ ভ্যালি । চারপাশে তুষারশৃঙ্গ । নানুর থেকে ৫ কিলোমিটার মদমহেশ্বর । দুপুরের খাওয়া সেরে নানুর থেকে সেদিনই মদমহেশ্বর পৌঁছনো যেতে পারে । শেষপর্যন্ত নানুরে ডোলিকে ধরলাম । ডোলির মিছিলে আস্তে আস্তে চলেছি । ঢোলের গুমগুম আওয়াজ । চারপাশে কাঁসর-ঘণ্টা । মদমহেশ্বর ঝলমলে হলুদ কাপড়ে ঢাকা । পূজারীজি ঘোড়ায় চড়ে । নানুর থেকে এই ৫ কিলোমিটার ভালোই চড়াই । প্রথমে রুক্ষ । ঝুরো মাটি । তারপর জঙ্গলের পথ । অবশ্য রাস্তা আছে । রডোডেনড্রন গাছে ভর্তি । লাল, সাদা, গোলাপি । ডোলি মন্দিরে আসার পর মন্দির প্রদক্ষিণ হল । ডোলিকে এদিক-ওদিক হেলানো হল । রাতে পূজারীর কাছে শুনেছিলাম হেলে-দুলে মহাদেব নিজের সম্পত্তি নাকি বুঝে নেন । ইতিমধ্যে বাংলোর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে । বেশ বাংলোটি । দোতলা । সামনে বারান্দা । সারা পথে মোটামুটি খাওয়া-থাকার জায়গা আছে । অথচ সেরকম ভিড় নেই । সৌন্দর্যের দিক থেকে অতুলনীয় । চারপাশ নরম সবুজ । অজস্র ফুলের গাছ । মদমহেশ্বরের ওপরে একটু উঠলে তিনদিকে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ । হঠাৎ হঠাৎ মেঘ । কুয়াশায় সব ঢেকে যাচ্ছে । বয়স যেন কমে গেল । ছেলেমানুষের মতো ওই কুয়াশায়-রোদ্দুরে ক্যামেরা নিয়ে সন্ধে পর্যন্ত ছোটাছুটি করে মন্দিরে যখন পুজো দেখতে গেলাম তখন বেশ শীত করছে । ঠান্ডা ভালোই এখানে । সন্ধ্যায় আরতি দেখার মতো । মদমহেশ্বরে কেদারনাথের মতো ভিড় হয় না । তাই সবকিছু সহজে আরামে উপভোগ করা যায় । পুজো শেষে পূজারীর সঙ্গে অনেক গল্প হল । আর মজার মজার শিবের কাহিনী । এই মন্দিরে প্রচুর দামি সোনা-রুপোর গহনা আছে । কখনও কিছু নষ্ট হয়নি । একবার সরকার ঠিক করেন মন্দিরের সম্পত্তির হিসেব করতে হবে । কিন্তু দেখা যায়, যে কর্মচারী কাজে আসেন পরের দিনই পালিয়ে যান । খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাতে মহাদেব নাকি ত্রিশূল নিয়ে আসেন । রাগী মহাদেবের হুঙ্কার-আমার নিজের সম্পত্তি যদি নিজে রক্ষা করতে না পারি তাহলে তোরা কী করবি । পালা এখান থেকে । শেষপর্যন্ত সরকারি হিসেব আর নেওয়া হয়নি । আরেকটা মজার গল্প আছে । তিব্বতের রাজার গাভী এখানে চরতে আসত । দেখা গেল সবচেয়ে ভালো গাইটির দুধ থাকে না । খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, মদমহেশ্বরে শিবলিঙ্গের কাছে গাভিটি দাঁড়িয়ে । ঝরঝর করে দুধ পড়ছে পাথরের মাথায় । রাজা শিবের কথা জানতেন না । রেগে গিয়ে মারলেন এক লাঠির ঘা । শিবলিঙ্গের মাথা

গেল ফেটে। তাই মদমহেশ্বরে শিবলিঙ্গ ফাটা আর একদিকে হেলানো। যাইহোক, অনুতপ্ত রাজা শেষে অনেক কষ্টে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন।

পরদিন খুব ভোরে ২ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ওপরে উঠলাম। বুড়া মদমহেশ্বর। পাহাড়ের মাথায় বুড়ো শিব। দারুণ মনোরম এক জায়গা। সবুজ কার্পেটে মোড়া চারপাশ। একপাশে জমা একটু জলে পাহাড়ের ছায়া। সোনালি রোদ্দুরে হাত বাড়ালেই চৌখম্বা। নিচে মদমহেশ্বরের অনুপম মায়াবি সবুজ। দেখে সাধ মেটে না। অবশেষে ফেরা। এবারে উখিমঠে নেমে দেউরিয়া তাল দেখে সোজা তুঙ্গনাথ। ফেরার পথে মদমহেশ্বর থেকে সোজা লেঙ্ক। রাতে লেঙ্কে পোস্টমাস্টারের বাড়িতে থেকে পরদিন সোজা মনসুনা হয়ে উখিমঠ।

আজ উখিমঠে থাকব। কাল তুঙ্গনাথ যাব চোপতা হয়ে। দুপুরের খাওয়ার পর অনেকটা সময় ছিল। চললাম দেউরিয়াতাল। এখন অনেকটা পথই ট্যাক্সি যায়। মাত্র ৩ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। ১৫০ টাকায় রফা হল দেউড়িয়া তাল। শেষ ৩ কিলোমিটার ভালোই চড়াই। এক টুকরো ছোট্ট সবুজ উপত্যকা। মাঝ তালে শ্যাওলা সবুজ জল। আর জলে তুষারশৃঙ্গের ছায়া। ঠান্ডা নিরিবিলি বেশ জায়গাটা। পথশ্রমের ক্লান্তি ভুলে বেশ কাটালাম সময়টা। সরকার থেকে দেউরিয়াতালকে একটা ট্যুরিস্ট স্পষ্ট হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা চলছে এখন। উখিমঠ থেকে চোপতা যাবার বাস খুব একটা নেই। সকালে একটা আছে। তারপরেই একটু অনিশ্চিত মনে হল। আমরা ৫ জন। তাই বাসের চেষ্টা না করে ২৫০ টাকায় ট্যাক্সিতেই চোপতা যাব ঠিক করি। খুব ভোরে আলো ফোটার আগেই উখিমঠ ছাড়লাম। ভোরের আলো-অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় ট্যাক্সিতে দারুণ লাগছিল।

চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ মাত্র ৩ কিলোমিটার। চোপতার উচ্চতা প্রায় ৯,৫৫০ ফুট। আর তুঙ্গনাথের ১১,৬৪৪ ফুট। খুব আস্তে হাঁটলে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগবে। চোপতা পর্যন্ত বাস-গাড়ি সব আসছে। তাই যাঁদের পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেক করতে অসুবিধা হয়, তাঁরা শুধু তুঙ্গনাথ আসতে পারেন। অসাধারণ সুন্দর এই তুঙ্গনাথ। পঞ্চকেদারের কোনটা ছেড়ে কোনটা ভালো তুলনা করা মুশকিল। চোপতাতে মঙ্গল সিংহের একটা দোকান আছে। ওখানে খাওয়াদাওয়া আর বিনা পয়সায় থাকা স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে। আর যাঁরা তুঙ্গনাথে থাকবেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের আস্তানা মঙ্গল সিং। প্রচুর বিদেশি এখানে আসে। তাদের India বইতে চোপতায় মঙ্গল সিংয়ের দোকানের কথা লেখা আছে। খাঁটি, সৎ, কর্মঠ পাহাড়ি মানুষ এই মঙ্গল সিং। আমুদেও বটে। বলল, তোমরা তুঙ্গনাথে থাকো। ফেরার সময়ে একদিন এখানে কাটিয়ে যেও। মাত্র দুঘণ্টার রাস্তা। গল্পগুজব করতে

করতে পথ চলা। চারপাশটা অসম্ভব সবুজ। মাঝে মাঝে মেঘ আসছে। সাদা সাদা প্রচুর ভেড়া ওই সবুজের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে যেন একটা বিদেশি গন্ধ। অস্ট্রিয়ার ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে ভীষণ মিল। সেই সবুজ যেন কেউ মুঠো করে তুলে নিয়ে এসেছে। আর দুঘন্টার হাঁটাপথ বলে শরীর-মনে আশ্চর্য এক নিশ্চিন্তি। কেদারনাথ, মদমহেশ্বর আর তুঙ্গনাথের মন্দির দেখতে অনেকটা এক ধরনের। মন্দিরের বাইরে বিরাট এক চাতাল। মন্দিরের গায়ে হর-পার্বতী, গণেশ আর পাথরের ষাঁড়ের প্রচুর মূর্তি। হলুদ-কমলা-চন্দন-আবীরে মাখামাখি। ছবি তুলে ভীষণ সুখ। মন্দিরের ভেতরে অবশ্য ছবি তোলা বারণ। কেদারনাথের মতো হইচই মারামারি করে পুজো নয়। তাই পুজো দিতেও আনন্দ। মন্দিরের সামনের পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে ভীষণ খাদ। ওই উপত্যকার মধ্যে জলভরা মেঘ জমাটবাঁধা। আর সামনে বিশাল হিমালয়ের রেঞ্জ।

একপাশে পাহাড়ের গা দিয়ে মণ্ডলের রাস্তা চলে গেছে। যেখান থেকে রুদ্রনাথের ট্রেকিং শুরু হয়। তাই ইচ্ছে করলে ওই রাস্তা ধরে মণ্ডলও যেতে পারি। তুঙ্গনাথে উঠি বচ্চন সিংয়ের বাড়িতে। ওখানেই খাওয়াদাওয়া। ঘরভাড়া নেই। বেশিরভাগ জায়গাতেই এখানে ঘরভাড়া লাগে না। তবে খেতে হবে। খাওয়া ১০-১২ টাকা। জলখাবার ৬-৮ টাকা। চা ২ টাকা। হালুয়া ৬ টাকা।

সন্ধেবেলা সেদিন এক অপূর্ব সূর্যাস্ত হল। ঘন মেঘ সরিয়ে শুভ্র তুষারশৃঙ্গে সোনালি রং। থোক থোক মেঘের রঙ গোলাপি, কমলা, ধূসর, সাদা। রঙের হোলিখেলায় আকাশে যে কী হচ্ছিল আমার পক্ষে তা বলা অসম্ভব। শুধু মনে হচ্ছিল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে নিশ্চয়ই এখানে।

পরদিন অন্ধকার থাকতে উঠে একটু ওপরে উঠি। প্রায় দেড় কিলোমিটার। চন্দ্রশিলা। যেখানে রামচন্দ্র বসে শিবের তপস্যা করেছিলেন। চন্দ্রশিলা থেকে হিমালয়ের অনেক তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। এমনকী নেপালেরও। শিবলিঙ্গ, কেদারনাথ, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ থেকে শুরু করে অন্নপূর্ণা, ধৌলাগিরি পর্যন্ত। সকালের আলো ফুটতে ঝকঝকে নীল আকাশে চারদিকে শুধুই তুষারশৃঙ্গ। কী অপরূপ বোঝানো ভার। তুঙ্গনাথে এলে চন্দ্রশিলা যেন কখনওই বাদ দেবেন না। তারপর চন্দ্রশিলা থেকে সোজা চোপতা। ছোট্ট শৈলশহর যেন। কিন্তু আধুনিকতার কোনও ছোঁয়া নেই। মঙ্গল সিংয়ের ডেরায় রাত কাটানো। এবার রুদ্রনাথ। সকালে চোপতা থেকে বাস ধরব মণ্ডলের।

এই পাঁচ কেদারের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টকর আর কিছুটা দুর্গম হল রুদ্রনাথ। তাই অনেককে দেখেছি রুদ্রনাথ বাদ দেন তাদের প্রোগ্রাম থেকে। এতে প্রথমত পাঁচ কেদার হয় না, তার চেয়েও বড় কথা, রুদ্রনাথ না দেখলে এই প্রোগ্রামও যেন অসম্পূর্ণ থেকে

যায় । একবার মনের জোর করে বেরিয়ে পড়লে রুদ্রের মোহনরূপ দেখা যাবে, হলফ করে বলা যেতে পারে । রাস্তা থেকে কেউ ফিরে এসেছে এরকম ঘটনা বিরল । যদিও একটা প্রচলিত কথা আছে এখানে, রুদ্রনাথ কা চড়াই জার্মান কা লড়াই ।

রুদ্রনাথ যেতে হলে প্রথমে মণ্ডলে আসতে হবে । মণ্ডল পর্যন্ত বাস আছে । চোপতা থেকে ঘণ্টাদুয়েক লাগল মণ্ডল আসতে । মণ্ডলে আমাদের প্রথম কাজ ছিল একটা পোর্টার জোগাড় করা । কারণ রুদ্রনাথের রাস্তায় একজন পোর্টার-কাম-গাইডের প্রয়োজন হয় । জঙ্গলের রাস্তা । ভুল হলে প্রচণ্ড হয়রানি । প্রথমে আমরা যাব অনসূয়াতে । মণ্ডল থেকে ৬ কিলোমিটার । তারপর অনসূয়া থেকে একদিনে রুদ্রনাথ । ২২ কিলোমিটারের পথ । রাস্তায় থামবার তেমন জায়গা নেই । রুদ্রনাথের উচ্চতা ১১,৫৪০ ফুট । মাঝে ১৪,৫০০ ফুটের নাওলা পাস । অনসূয়ার উচ্চতা হল ৭,২০০ ফুট । অতএব একদিনে প্রচুর চড়াই । রাস্তায় জল পর্যন্ত নেই । জঙ্গলে রাত কাটানোও সম্ভব নয় । একদিনে সন্ধের মধ্যে রুদ্রনাথে পৌঁছতেই হবে । পোর্টার ঠিক হল । এ দুদিনে ১০০ টাকা নেবে । কিছু টুকরো বাজারও সেরে ফেলা হল । যদি রাস্তায় মানে অনসূয়া বা রুদ্রনাথে কিছু না পাই । মণ্ডলে বালখিল্য নদী আর অমরগঙ্গার সঙ্গম । খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বেলাতেই অনসূয়ার পথে পা বাড়ালাম । ৬ কিলোমিটার রাস্তার প্রথম ২ কিলোমিটার সমতল, তারপর ৪ কিলোমিটার চড়াই । অনসূয়ার পরিবেশ সত্যিই আশ্রমের মতো । শান্ত নির্জন তপোবন । দেবী অনসূয়ার মন্দির । থাকার জন্য চটি । একটু নোংরা বটে । তবুও অসুবিধা হয় না । বাসনপত্র ভাড়া পাওয়া যায় রান্নার জন্য । আমাদের পোর্টার রান্নার সব জিনিসপত্র ঠিক করতে লাগল । তৈরি হবে কাল রাস্তার প্যাকেট লাঞ্চ । আমরা এই ফাঁকে একবার দেখে আসব অত্রিমুনির গুহা । ৩ কিলোমিটার দূরে । তবে অনসূয়াতে এসে অত্রিমুনি আর অনসূয়ার গল্প না শুনলে চলবে না । রাম-সীতা অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়ার আশ্রমে এসেছিলেন । শ্রেষ্ঠ সতী হিসেবে পূজিত হন অনসূয়া । সতীত্বের মাহাত্ম্যে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে দেবতার স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের পাঠালেন অনসূয়ার সতীত্বের পরীক্ষা করাতে । ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবতারা এলেন আশ্রমে । অতিথিসেবায় অনসূয়া উদ্বিগ্ন । ব্রাহ্মণরা বললেন, মধ্যাহ্নের খাবার তাঁরা নিয়ে এসেছেন । লোহার গুলি । এগুলিই সিদ্ধ করে খাবেন । অনসূয়াকে বললেন, লোহার গুলিগুলোকে সিদ্ধ করে দিতে । বিপন্ন অনসূয়া অত্রিমুনিকে ডেকে আনলেন । কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিতে সিদ্ধ হল গুলি । দেবতারা ফিরে গেলেন । এতে দেবতার স্ত্রীরা আরও রেগে গেলেন । তাঁদের কথামতো দেবতারা আবার আশ্রমে এলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে । এবারে আবার অন্য আবদার । অনসূয়ার স্তন্যপান করবেন ব্রাহ্মণরা । মাতা আবার স্মরণ করলেন স্বামী অত্রিকে । মুনি এসে কমণ্ডলুর জল ছেটালেন অতিথিদের গায়ে । তিন দেবতা তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে

গেলেন । আর অনসূয়াও যত্নে তাদের স্তন্যপান করালেন । এদিকে দেবতারা স্বর্গে ফিরছেন না । শেষে স্বামীদের খোঁজে আশ্রমে এসে তিনটি শিশু দেখে তারা কান্নায় ভেঙে পড়লেন । শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে অনসূয়ার সতীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে দেবতাদের নিজস্ব অবয়বে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন স্বর্গে তাঁদের স্ত্রীরা । তাই অনসূয়া মর্ত্যে একজন শ্রেষ্ঠ সতী । দয়ার শরীর । স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই । কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা । এত স্নিগ্ধ মেজাজের দম্পতির কী করে দুর্বাসার মতো সন্তান হয় তা ভেবে পাইনা । সেই দুর্বাসা মুনি যিনি কিছু হলেই অভিশাপ দিতেন । যাইহোক, অত্রিমুনির গুহা দেখতে যাওয়া অবশ্যই চাই । এরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা জীবনে কমই আসে । ৩ কিলোমিটার দূরত্বে অত্রিমুনির গুহা । যেখানে মুনি তপস্যা করতেন । পোর্টার-গাইডকে সঙ্গে নিলাম । পথ চিনতে একটু অসুবিধা হতে পারে । এক ঝরনার ধারে নামলাম । প্রচণ্ড তোড়ে জল বইছে । কাঠের গুঁড়ি ফেলা তার ওপরে । শ্যাওলা ধরা । অতিকষ্টে সেই কাঠ পার হয়ে দেখি পাথরের দেওয়ালে লোহার চেন ঝুলছে । চেন ধরে হ্যাঁচকা দিয়ে ওপরে উঠলাম । খাড়া দেওয়ালের একপাশে খরস্রোতা নদী । দেওয়ালে সুড়ঙ্গ । সরীসৃপের মতো বেয়ে বেয়ে এগনো, শুয়ে না এগোলে পাথরের ছাদে পিঠ লাগবে । প্রায় হামাগুড়ি দিতে হয় । এক পাশটা কিন্তু খোলা । হঠাৎ একটু নিচে পড়ে যাওয়া । গুহা । গুহাকে প্রদক্ষিণ না করে ফেরা অসম্ভব । একপাশে বিশাল ঝরনা । ঝরনার ভেতর দিয়ে পথ । দেখি সবাই ঝরনার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । ভয়ে রোমাঞ্চে এগোই । ঝরনা পার হয়ে দেখি খরস্রোতা নদীর ওপারে চলে এসেছি । গায়ে জলের ঝাপটা । অন্য একটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে নদী পেরনো । কী করে যে প্রদক্ষিণ করলাম ঠাহর করতে পারি না । আনন্দে সবাই নাচানাচি করি । দারুণ ।

এরপর ফিরে চলা অনসূয়া আশ্রমে । আজ কিন্তু খুব ভোরে উঠেছি । রুদ্রনাথ পৌঁছতে ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগবে । ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় । জঙ্গল বেশ গভীর । ঝরা পাতায় পা ডুবে যাচ্ছে । বৃষ্টির পর হলে কাদা আর পাতায় চলা বেশ মুশকিল । এক জায়গায় দেখি লেখা আছে, আর জল পাওয়া যাবে না । সবার ওয়াটার বটল ভর্তি । শুধু চড়াই আর চড়াই । একেবারেই উতরাই নেই । এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে । এল হলুদ-বেগুনি ফুলে ভরা এক উপত্যকা । পুষ্প-বাটিকা । একটু বিশ্রাম । জলখাবার খাওয়া । আবার চড়াই । এ যেন অন্তহীন চড়াই । দম ফুরিয়ে আসছে । আর কতদূর কে জানে । শেষপর্যন্ত মনে হল আর পারব না । একটুও শক্তি নেই । হঠাৎ কে যেন বলল, পাস এসে গেছে । আরেকটু উঠলেই টপ । শেষপর্যন্ত টপে এলাম নাওলা পাসের । চোখ জুড়িয়ে গেল । ১৪,৫০০ ফুট । এরপর উতরাই । চারপাশে বরফে মোড়া । ঘড়িতে ৩টে বেজে গেছে । টপের ওপরে বসেই প্যাকেট লাঞ্চ শেষ করলাম । দূরে নীল আকাশের নিচে আমার চেনা

পৃথিবী। চিরতুষারে আবৃত তুষারশৃঙ্গ। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে বরফ ভেঙে মন্দিরের পথে। উতরাই। কিন্তু বরফে হাঁটতে বেশ কষ্ট। পা ডুবে যাচ্ছে মাঝে মাঝে বরফে। সামান্য ওঠা। নামাই বেশি। অবশেষে মন্দিরের রাস্তা। মন্দিরের সামনে নন্দাঘুণ্টি ও পঞ্চচুলিতে রং ধরেছে সন্ধ্যার। পৌঁছতেই এক সাধুবাবা গরম চা আর জল এনে দিলেন। অনেকক্ষণ জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে জল। তারপর চা। পূজারীজি এলেন। আর কেউ নেই। বললেন সন্ধ্যারতি হবে। আগে আরতি দেখুন। তারপর গল্প। আর সাধুবাবাকে বলে দিন রাতে কজনের খিচুড়ি হবে। আমরা প্রেসারকুকারে খিচুড়ির সরঞ্জাম নিয়ে এসেছি বলাতে সাধুবাবা বললেন, তাহলে যখন হোক তোমরা ফুটিয়ে নিও খিচুড়ি। এখন চলো সন্ধ্যারতি দেখি। মন্দিরটা এখানে অন্য কেদারের মতো বড় নয়। গুহারই কিছুটা কেটে তৈরি এই মন্দির। ভেতরে দেখি মহাদেবের কষ্টিপাথরে খোদাই মুখ। মুখে এক বিশাল সরু একজোড়া গোঁফ। রাতে ঘরে খড়ের মেঝেতে শোয়া। সারাদিনের ওই পরিশ্রমের পর তা-ই তখন স্বর্গ।

পরদিন সোজা রুদ্রনাথ থেকে মণ্ডল। মানে একেবারে ৫,০৮৪ ফুট নিচে নামব। একটু বেলাতেই হাঁটতে শুরু করলাম। ২৮ কিলোমিটার। মাঝে দুপুরে রান্না করে খাওয়া। সন্ধ্যায় মণ্ডল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মণ্ডলে একটা ঘর মিলল। সুরিন্দর সিং বিস্তের বাড়ি। ভালোই। মণ্ডলে বেশ গরম লাগছিল। স্নান করে সবাই রাতে বসলাম বালখিল্য নদীর ধারে। কে কেমন হেঁটেছে, কার শরীর কীরকম খারাপ লাগছিল এইসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। এবারে পঞ্চকেদারের শেষ কেদার। আমাদের পরিচিত অত্যন্ত চেনা কেদারনাথ। কাল সকালেই আমরা বাস ধরব এখান থেকে গৌরীকুণ্ডের। আর যাঁরা কেদারনাথ দিয়ে পঞ্চকেদার শুরু করেন তাঁরা ধরবেন এখান থেকে গোপেশ্বরের বাস। গোপেশ্বর থেকে বদ্রীর বাস ধরে হেলাং। তারপর কল্পেশ্বর। আর সময় থাকলে ফেরার সময়ে আবার একবার বদ্রীনাথ। আমাদের বাস সকাল ১১টা নাগাদ। চলো গৌরীকুণ্ড। শেষ কেদার। জয় বাবা কেদারনাথ।

বাসে বেশ ভিড় ছিল। প্রথমে তো সিটই পাওয়া গেল না। বাস চোপতা এল। লাঞ্চ। তারপর যখন গৌরীকুণ্ড এল, তখন প্রায় সন্ধে। যাত্রার সময়। প্রচণ্ড ভিড় গৌরীকুণ্ডে। ভারত সেবাশ্রমের স্টোররুমে মালপত্র রেখে শুধু স্লিপিং ব্যাগ বার করে গৌরীকুণ্ডের গরম জলে স্নান। টিফিন করে অন্ধকারেই হাঁটতে শুরু করি। পুলিশ প্রথমে বারণ করেছিল। উত্তরে বলি, বেশিদূর যাব না। মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলচটিতে রাতের বিশ্রাম। চাঁদের আলোতে হাঁটতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। জঙ্গলচটিতে একটা ফাঁকা আস্তানাতে মানে দোকানে খাওয়া সেরে রাত কাটাই। নিরিবিলি আর পরিচ্ছন্ন রাতটা

কাটে ওই জঙ্গলচটিতে। পরদিন খুব ভোরে রওনা। ৩ কিলোমিটার পরে রামওয়াড়া। চা-পকোড়া খেয়ে এবারে কেদারের চড়াইয়ের পথে। প্রচুর লোকজন। খচ্চর, ডোলি।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই নীল আকাশে কেদারশৃঙ্গ আর নিচে সেই কেদারের মন্দির। মনে পরম এক তৃপ্তি। পঞ্চকেদার দর্শন শেষ হতে চলেছে। এখন প্রচুর থাকার জায়গা কেদারনাথে। দেখেশুনে পছন্দ করে নিলেই হল। ওই ঠান্ডাতে দেখি মন্দাকিনীর জলে স্নান সেরে অনেকে পুজো দিতে চলেছেন। একজন পাণ্ডা ধরে পুজো দিতে গেল আমাদের সবাই। শিবলিঙ্গকে স্পর্শ করে দেখি হাত যেন ঢুকে যাচ্ছে পাথরে। ঘি-সিঁদুরে চপচপ করছে শিবলিঙ্গ। এক আশ্চর্য অনুভূতি। সারাদিন কেদারে এখানে-ওখানে ঘুরে সময় কাটানো। রাতে জ্যোৎস্নায় কেদারশৃঙ্গ। চাঁদের আলোতে চেনা অথচ রহস্যময় কেদার। অপূর্ব। পরদিন সকালে সোজা গৌরীকুণ্ড। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। তাই অগত্যা ট্যাক্সি। ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। ত্রিযুগীনারায়ণ গৌরীকুণ্ড থেকে ১২ কিলোমিটার। আর শোনপ্রয়াগ থেকে ৯ কিলোমিটার। শোনপ্রয়াগে শোন আর মন্দাকিনীর সঙ্গম। ৪০০ টাকায় ট্যাক্সিতে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। আগে ত্রিযুগীনারায়ণ শোনপ্রয়াগ থেকে হাঁটতে হত। এখন পুরোটাই প্রায় ট্যাক্সি যায়। নারায়ণকে সাক্ষী রেখে হর-পার্বতীর এখানে বিয়ে হয়েছিল। মন্দিরের ভেতরে ছাদনাতলা। হর-পার্বতীর মূর্তি। পূজারী প্রচুর হলুদ আর সিঁদুর কপালে মাখিয়ে দিল। তাই মেখে বিকেলের মধ্যেই ফিরলাম রুদ্রপ্রয়াগ। সম্পূর্ণ হল পঞ্চকেদার ট্রেকিং।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সোজা হৃষিকেশে। সন্ধ্যায় ত্রিবেণী ঘাটে প্রদীপ ভাসাতে ভাসাতে মনে হচ্ছিল আমার জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রেক এই পঞ্চকেদার। সোনালি-রূপালি-সবুজে-সুনীলে আঁকা অনবদ্য এই প্রকৃতির সৃষ্টি জীবনে কোনওদিনই ভুলতে পারব মনে হয় না। বুঝতে পারি ডাক এলেই আবার আসব।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

গোঁসাইকুণ্ড

কমলা মুখোপাধ্যায়

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই হয়তো নদীবিহীন কোনও দেশের কথা কল্পনাও করতে পারি না। এই নদীগুলিকেই তো মহাভারতে বলা হয়েছে 'বিশ্বস্য মাতর'। নদীতীরের উভয় কূলেই প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব। কাজেই নদীই সভ্যতার মূল কথা।

গত দশ বছরে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের সময় গঙ্গা প্রবাহপ্রণালীকে নিয়েই যেন ব্যস্ত ছিলাম বেশি। গঙ্গার উৎসমুখ সঠিক কোনটি তা নির্ণয় করতে গিয়ে এত অজস্র নদী ও তাদের উৎসমুখগুলির বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছি, যেন নতুন দৃষ্টিতে নদীগুলিকে দেখতে পেয়েছি। কত অসংখ্য স্রোতস্বিনী এসে গঙ্গাকে সমৃদ্ধ করেছে, তার আর ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেকটি উৎস ও সঙ্গমের কাহিনী একেকটি নতুন ইতিহাস।

এর মধ্যে নেপালের গণ্ডকী নদীপ্রবাহকে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল ১৯৬৯ সালে। গ্রীষ্মকালে মে-জুন মাসে ত্রিশূলীগণ্ডকী ও অক্টোবর মাসে কালীগণ্ডকীতে ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য হওয়াতে নদী উৎসগুলিকে দেখার সুযোগ মিলেছিল। নেপালের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহপ্রণালী (River System)-কর্ণালী সর্ব পশ্চিমে, সপ্তগণ্ডকী মধ্যাঞ্চলে ও সপ্তকোশী পূর্বাঞ্চলে। এর মধ্যে সপ্তগণ্ডকীর অববাহিকা অঞ্চল পশ্চিমে কালীগণ্ডকী থেকে পূর্বে ত্রিশূলীগণ্ডকী অবধি প্রায় ১৪০ মাইল বিস্তৃত! এই দুই প্রবাহিণীর মাঝখানে শ্বেতগণ্ডকী, বুড়িগণ্ডকী, মারসুরান্দী, রাপ্তী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নদী আছে। এই ১৮টি মিলিত স্রোতধারা মহাভারত লেখ পর্বতশ্রেণী পর্বতমালাকে ভেদ করে একটি গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভারতে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। এই সমস্ত স্রোতের মিলনস্থলকে বলে সপ্তগণ্ডকী। এটি একটি দর্শনীয় স্থান। কাঠমান্ডু থেকে নারায়ণগড় অবধি বাসে যাওয়া যায় তবে রাতে থাকতে হয়। গণ্ডকী নদীর রূপ ভারতে কত শান্ত কিন্তু নেপালে তার উৎস মুখগুলি কী ভয়ঙ্করী! কালীগণ্ডকীর উৎসস্থল তিব্বতের দামোদর কুণ্ড-খাম্পাদের অঞ্চল। বিখ্যাত শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণশিলা (Ammonitefossil) এই নদীগর্ভে বা দামোদর কুণ্ডেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এই শালগ্রাম শিলা নারায়ণের প্রতীক। সমস্ত ধর্মীয় ও শুভ কাজে এ ছাড়া ক্রিয়াকলাপ চলে না। এই কারণে কালীগণ্ডকীর দক্ষিণাংশকে বলা হয় নারায়ণী নদী। বিখ্যাত তীর্থস্থান মুক্তিনাথ যা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই পূজিত, তা এই নদীর কাছেই। অন্নপূর্ণা ও ধবলগিরি শৃঙ্গদ্বয়ের মাঝখান

থেকে বয়ে এসেছে এ নদী। কাজেই ওই সমস্ত তুষারাবৃত অঞ্চলের বরফ গলা জল বয়ে নিয়ে এসেছে-একেক জায়গায় নদীর প্রসার ১-২ মাইলের মতো।

সর্বাপেক্ষা পুবের নদী হল ত্রিশূলীগণ্ডকী। এই নদীর উৎস গোঁসাইকুণ্ড, নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে বায়ুপথে ৩৬ মাইল। কালীগণ্ডকী নদীর মতো এর সঙ্গেও একটি ধর্মীয় কাহিনী জড়িত আছে। ফলে এটিও হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে একটি প্রধান তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। গোঁসাইথান পর্বতশৃঙ্গের নিচের ঢালে এই গোঁসাইকুণ্ড হ্রদটি অবস্থিত। এইটি ও আরও ১০-১২টি হ্রদের জল নিয়ে ত্রিশূলীগণ্ডকী নদীর উৎপত্তি। এই নদী ল্যাংটাং হিমল পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং স্থানীয় অধিবাসীরা (গুরুং) তিব্বতী জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল থেকে বাইরঙ্গ গিরিপথ দিয়ে তিব্বতে যাবার একটি দুর্গম গিরিপথ আছে। Seven years in Tibet-এর লেখক জার্মান অভিযাত্রী Heinrich Harrer দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কারাগার থেকে তিব্বতে পালাবার সময় ভারত সীমান্ত থেকে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন এবং তাঁদের স্কেচ, মানচিত্র ও অন্যান্য জরিপগুলিই এখন প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু পথটি খুব দুর্গম বলে সাধারণত এ পথটিতে বেশি চলাচল নেই, সেই কারণেই হয়তো নেপাল সরকার এখানে Checkpost ইত্যাদি রাখেননি।

বিদেশি অভিযাত্রীদের লেখায় প্রথম গোঁসাইকুণ্ড সম্পর্কে খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ Duncan Forbes, Snell Grove ও Oldham-এর বই উল্লেখযোগ্য। গোঁসাই বা গোস্বামী হলেন গবাদি পশুদের রাজ। তাঁরই ত্রিশূল দ্বারা প্রথিত হয়েছে এই কুণ্ড। কাহিনীটি হচ্ছে যে সমুদ্র মন্থনের পরে যে তীব্র বিষ উঠেছিল, পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য মহাদেব তা পান করেন। কিন্তু বিষের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই হ্রদ খনন করে শীতল জলের নিচে শয়ন করেন তীব্র জ্বালা জুড়োবার জন্য। তাঁরা দেখেছেন একটা খুব বড় পাথরের খণ্ড জলের নিচে দেখা যায়। ওইটিই নাকি শিবের শায়িত মূর্তি। অবশ্য তীরেও বেশ কিছু প্রস্তরখণ্ডে সিঁদুর ইত্যাদি লেপা আছে, যেগুলি শিবলিঙ্গ বলে বর্তমানে পূজা পাচ্ছে। পরিষ্কার দিনে গোঁসাইথান শৃঙ্গটিকে কুণ্ড জলে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। ভক্তেরা এবং স্থানীয় লোকরাও বলে থাকে যে গোঁসাইথান শৃঙ্গটি কিছু চ্যাপ্টা-কারণ শিবের অবস্থিতি তো পাহাড়ের ওপর নয়-সেটি কুণ্ডের জলে স্থিত। এর সঙ্গে আরও একটি কাহিনীও জড়িত আছে।

নেপালে বহু জায়গায় শিব ও বিষ্ণু একই মূর্তিতে পূজা পাচ্ছেন যেমন শিউপুরী লেকের কাছে-বুঢ়ানীলকণ্ঠ-আসলে সেটি বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শয়ান মূর্তি কিন্তু নাম বুঢ়ানীলকণ্ঠ। গোঁসাইকুণ্ডের সঙ্গে এ মূর্তির সম্বন্ধ এই যে, গোঁসাইকে দর্শন করতে

লোকেরা যেতে পারে না-কারণ পথ খুব দুর্গম-সুতরাং সকলের দর্শনের জন্য তার জায়গায় এই ২৫ ফুট লম্বা বিষ্ণুমূর্তিকে (বা শিবকে) একটা বড় পুকুর কেটে স্থাপিত করা হয়েছিল । কিন্তু রাজবংশের ওপর কী একটা আদেশ থাকাতে বর্তমান রাজাদের পক্ষে বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্বেও ওই মূর্তি দেখা নিষিদ্ধ । সেজন্য কাঠমান্ডুর উপকণ্ঠে একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে ওই শায়িত বিষ্ণু মূর্তির একটি প্রতিমূর্তি আছে-যা রাজা দর্শন করতে পারেন । মনে হয় এসব কাহিনী পরবর্তীকালে গোঁসাইকুণ্ড ও শিবের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে ।

এ যাত্রায় আমার সঙ্গী হবার জন্য ২ জন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম । একজন শক্ত সমর্থ ও উপযুক্ত পর্বতারোহী কথা দিলেন আমাদের-(অর্থাৎ আমি ও আমার ছাত্রী বি, টি কলেজের অধ্যাপিকা মিনতি বিশ্বাস)-সঙ্গে যাবেন । যাবার দিন দুপুর বেলা তিনি জানালেন-তাঁর পক্ষে অফিসের জরুরি কাজের জন্য তিনি যেতে পারছেন না । আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম । কিন্তু আমার নবীনা সঙ্গিনী অবিচল-তিনি জানালেন, ‘দুজনেই একলা যাব’ কুছ পরোয়া নাই । তাঁর ভরসাতেই আমারও উৎসাহ হল-কারণ সঙ্গীবিহীন তো ওইসব জায়গায় যাওয়া চলে না । এর পরেও দেখেছি তাঁর কী অসাধারণ মনোবল । এইরকম একজন সঙ্গী পেলে যাত্রা সার্থক হয় ।

কলকাতা থেকেই পথঘাটের মোটামুটি খবরাখবর নিয়েছিলাম । বোধনাথ স্তূপের ভারপ্রাপ্ত চিনি লামা এ পথের প্রধান সহায়ক কারণ তিনি ওই অঞ্চলের ধর্মগুরু । তাঁর পূর্ব পুরুষ চিন থেকে এসেছিলেন, এজন্যই ‘চিনি লামা’ বলা হয় তাঁকে । রক্সৌল হয়ে কাঠমান্ডু পৌঁছলাম মে মাসের শেষের দিকের এক বিকেলে । পরদিন সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । ৮৬ বছরের বৃদ্ধ লামা-যৌবনে কলকাতায় ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্র সুরেন্দ্র ঠাকুরকে খুব চিনতেন । কলকাতার বর্তমান খবর জিজ্ঞেস করলেন । বেশ ইংরিজি জানেন । এঁর বসবার কক্ষটিই একটি মিউজিয়াম বিশেষ । প্রকাণ্ড একটা গুরু রিমপোছের (পদ্মসম্ভব) ছবি টাঙানো আছে । ইনিই এই লামা গোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা । তাছাড়া বহুবিধ পিতলের, ব্রোঞ্জের ও তাম্র টাকা । দেওয়ালে টাঙানো সিল্কের বা কাগজের ওপর বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের নানা কাহিনী অঙ্কিত, কবচ, প্লেটও বহু কারুকার্য দেখা গেল । এমনকী আসন গালিচাগুলি, চা খাবার পাত্রগুলিতে বিভিন্ন চিত্র খোদিত করা হয়েছে । আমরা থাকতে থাকতেই, কয়েকজন জার্মান ও সুইডিশ অভিযাত্রী পিতলের বুদ্ধমূর্তি কিনতে এলেন । বোধনাথ স্তূপের চারদিকে যে বসতি, তাতে এঁর বাসস্থান, ল্যাংটাং অঞ্চলের লোকই বেশি এখানে । এঁরা নানাবিধ ধাতুর কাজ করে থাকে । ছোটখাটো একটা বাজারও আছে । ইনি থাকেন ওই অঞ্চলের হেলম্বু জনপদের পাশে মালেমচি গ্রামে । দুজন মেয়ে যাচ্ছি শুনে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ করলেন না-বরঞ্চ সর্বরকম

সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন । কুলি ঠিক করে দিলেন ও কতটুকু জিনিস নিতে হবে তাও বলে দিলেন । কোন জায়গায় জল পাওয়া যায়, গ্রাম আছে, বা গুহা পাওয়া যায়-তার দূরত্ব সমেত লিখে দিলেন । এগুলি এত নির্ভুল ছিল যে গোঁসাইকুণ্ড থেকে ফেরার পরে কাঠমাণ্ডু ট্যুরিস্ট অফিসের লোকরা সে সব নিজেদের বইয়ে ছাপবার জন্য লিখে নিলেন ।

পরদিন অর্থাৎ ২৬ মে ট্যাক্সি নিয়ে-'চিনি লামার' আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলাম । তার স্ত্রী খুব চিন্তান্বিত ছিলেন আমাদের পথের বিপদের কথা ভেবে । চিনি লামা দৈনিক ৯ নেপালি টাকায় দুজন ওই অঞ্চলের লোককে কুলি ও গাইড হিসাবে সঙ্গে দিলেন, ওই অঞ্চলের গ্রামপ্রধানদের কাছে তিব্বতীতে একটা আজ্ঞাপত্র দিয়ে দিলেন ও তাতে নিজের সিলমোহর দিয়ে ছাপ দিয়ে দিলেন । বার্ধক্য সত্বেও দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসে আমাদের আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচন করে ড্রাইভারকে 'সুন্দরীজল' অবধি নিয়ে যেতে বললেন । কুলি দুজনই তিব্বতী, ল্যাংটাং অঞ্চলের লোক-এসেছিল লবণ কিনতে, তাদের ওইভাবে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন । ধর্মগুরুর আদেশ তারা অমান্য করে না-তাই সঙ্গে গেল । এখানে তাদের জিভ বার করে আদেশ গ্রহণ করার রীতি দেখে খুবই কৌতুক অনুভব করলাম । বাস্তবিক এই ধর্মগুরুর সাহায্য না পেলে আমাদের গোঁসাইকুণ্ড যাত্রা কী হত বলা কঠিন কারণ ট্যুরিস্ট অফিসও পথঘাট সম্পর্কে খুব ভালো খোঁজ রাখেন না ।

আমাদের পথপ্রদর্শক দুজন কুলি হল গুরুং জাতি গোষ্ঠীর । বয়ঃজ্যেষ্ঠটির নাম জিৎ বাহাদুর । একজন তো তিব্বতী ছাড়া কিছুই জানে না । অন্যজন কিছুটা হিন্দি বলতে পারে । খুবই সাধারণ গ্রাম্যলোক কিন্তু সরল ও বিশ্বাসী-এই দুটি লোকের ভরসায় আমরা নিশ্চিন্তে রওনা দিলাম । তিব্বতীদের এই পাহাড় অঞ্চলে জীবনযাত্রা অতি কঠোর, যা ফসল ফলায় তাতে সারাবছর চলে না । এইসব অঞ্চলে জমির ওপর কোনও কর নেই । গম, রামদানা, ভাং ও কিছুটা চাল উৎপাদন করে । তবে এরা ভাত খায় না, তা দিয়ে মদ জাতীয় জিনিস তৈরি করে । ওইসব অঞ্চলে চা পাওয়া যায় না, কেউ খায়ও না, শরীর গরম রাখতে এই তাড়িই ভরসা । সেইজন্য মনে চিন্তা ছিল পথের মাঝে এরা মাতাল হয়ে না পড়ে-আর গ্রামবাসীরা তো তাদেরই স্বজন ও জ্ঞাতি! কিন্তু বাস্তবে কোনওরকম বিপদেই পড়তে হয়নি আমাদের । এই সমস্ত এলাকায় বেশ জলাভাব । আমরা মে-র শেষে রওনা হয়ে এখানে এসেছি, বর্ষা এখনও শুরু হয়নি, ঝরনা ও নালাগুলি শুকনো । বর্ষা শুরু হলে এ পথে চলাই যাবে না কাজেই আমাদের যেতে হবে তাড়াতাড়ি ।

সুন্দরীজল হল সমতল প্রান্তরের অন্তিম সীমা-এখান থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতো পথ উঠে গেছে । সুন্দরীজল হল পানীয় জলের জলাধার-এখান থেকেই কাঠমাণ্ডু ও তার ৫ মাইলের মধ্যের অঞ্চলগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় । স্থানটি Protected

Area এখানে। আমাদের কুলিরা তাদের যাত্রাপথের রসদ ইত্যাদি কেনবার জন্য ও কিছুটা বিশ্রাম করার জন্য থামল-অগত্যা আমরাও থামলাম। এই যাবার পথের বৈশিষ্ট্য হল যে ৫ দিনে প্রায় ৩৬ মাইল যেতে হবে-সবটাই খাড়া চড়াই। উতরাই বিশেষ কিছু নেই। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম প্রতিদিন সম্ভব হলে ৯-১০ মাইল করে হাঁটব। সেই অনুসারে বেলা ৯টা নাগাদ রওনা হয়ে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করব এই স্থির হল। উপত্যকার শেষে শিশুপুরী লেখের পার্বত্য অসমান পথ শুরু হল। প্রথমেই বেশ কয়েকটা পাথরের বড় বড় ধাপ পার হতে হল, গ্রামের মধ্যেই আছি, এগুলি আমাদের কুলিদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি। বেলা ১২টার মধ্যে মূলখড়্যা (মূলখড়ক) পার হলাম কিন্তু রাস্তা না বলে পথটিকে পাথরখণ্ডের স্তূপ বলাই উচিত। যে গ্রামগুলি পার হলাম, তাতে বড়জোর ৮-১০ ঘর পরিবার বাস করে। এদের কুটিরগুলি হয় উপত্যকার খেতের পাশে নয়তো চলার রাস্তার পাশে। নিয়মিত পথ বলে কিছু নেই। সকলেই সাবধান করে দিল পথের বিষয়ে-কিন্তু আমরা ভাবলাম এই ৯ মাইল পথ হেসে খেলে চলে যাব। এখন তো সমতল রাস্তা। কিছুদূর যাবার পর এ অঞ্চলের সবচাইতে বড় গ্রাম পাতি-ভান জেঙের প্রান্তে উপস্থিত হলাম। ভানজেং শব্দটির অর্থ হল গিরিপথ। কিন্তু কী ধরনের গিরিপথ তা চলবার আগে ধারণাই করতে পারিনি। অতীতে কোনও পার্বত্য ঝরনা হয়তো কোনওদিন কোনও পথ বেয়ে চলে গিয়েছিল, চারপাশের নরম শিলা গলে মাটির স্তূপ হয়েছে, তার মধ্যে তীক্ষ্ণ সব পাথরখণ্ড গাঁথা-এইভাবে অনেক ওপর থেকে আসা পাহাড়ি ঝরনার স্রোতের পথে-বর্তমান পথের সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পথে জল নেই, সুতরাং ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নিচের মাটির স্তূপে পা ঠেকলে তবেই দাঁড়াতে পারছি, কখনও দু পাশের দেওয়াল ধরে সরু পথের মধ্য দিয়ে চলেছি, কী সাংঘাতিক পথ! এইভাবে এই গিরিবর্ত্মসদৃশ ভানজেং পার হতে আমাদের লাগল প্রায় একঘণ্টা। শুনেছি, চম্বলের ডাকাতরা এইরকম Ravines-এ লুকিয়ে থাকত। এখানকার শিলাচূর্ণ ও মাটির রং গেরুয়া। এইভাবে প্রায় বিকেল 8টের সময় পাতি ভানজেং গ্রামে এসে পৌঁছলাম। অন্য গ্রামগুলির তুলনায় এটি একটু বড় গ্রামই বটে। এর উচ্চতা ৭,০০০ ফুট। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বাঁধানো কুয়া, কয়েকটি মুদির ও চায়ের দোকান, একটি মণি বা বৌদ্ধমন্দির ও পুলিশ চেকপোস্ট আছে। বিশ্রাম নিয়ে চা খাবার সময় একটি দোতলা বাড়ির জানলা খুলে গেল-একজন মোড়ল গোছের লোক জিজ্ঞেস করল-আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি। আমরা কিছু জবাব দেবার আগেই, আমাদের জিৎ বাহাদুর চিনি লামার মোহর দেওয়া চিঠিটি দেখাল এবং নিজেদের ভাষায় কী বলল। ব্যস, জানলা বন্ধ হয়ে গেল-আমাদের পথ মুক্ত হল। মনে মনে চিনি লামার ক্ষমতাকে তারিফ করলাম। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, ৬ মাইল পথ এসে পড়েছি, আর ৩ মাইল পথ দেখতে দেখতে চলে যাব, এই ছিল আমাদের মতলব। কারণ খুব চড়াই যখন শুরু হবে তখন হয়তো ৫

মাইলের বেশি যেতে পারব না। পাতি ভানজেঙের পঞ্চায়েত অফিস থেকে সামনের পথও বেশ সোজা মনে হচ্ছে। পাতি ভানজেঙের পরে আর ইউরোপীয়দের বিনা অনুমতিতে যাবার হুকুম নেই। পথে দেখেছি মাঠেঘাটে বহু হিপি নরনারী উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, রোদ পোহাচ্ছে। আরও আগে যেতে পারবে না বলে কত দুঃখ তাদের! আমাদের কাছে সে সব দুঃখের কাহিনী বলল।

এখান থেকেই ডানদিকে একটা পথ গেছে হেলম্বুতে, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা। উত্তর প্রদেশের একজন মিলিটারি অফিসার ও তাঁর স্ত্রী সেইদিকে রওনা দিলেন। এটাই চিনি লামার পরিবারের বাসস্থান। চা পানের পর ৩ মাইল দূরের চিপলিং গ্রামের দিকে চললাম। পথ প্রথমে সোজা তারপর ঘুরে গিয়েছে, সুতরাং সহজে যাওয়া সম্ভব হল না। পাহাড়ি পথের বাঁক ঘুরে দেখা গেল একটা চড়াই পথ সোজা ওপরে উঠে গেছে। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আর যাওয়া মুশকিল। আমার সঙ্গিনীও ক্লান্ত সুতরাং পথের বাঁকে যে বাড়িটি প্রথম পেলাম, সেখানেই রাত কাটানো স্থির করলাম। কুটিরটি একটি চৌকিদারের বাড়ি, সে তখন ছিল না কিন্তু আমাদের কুলির চেনা। সেই কথাবার্তা বলে বারান্দায় থাকা ঠিক করে ফেলল। বাইরেই উনুন-সেখানেই রান্নাবাড়ি করে রাতের খাওয়া সেরে চারদিকে প্লাস্টিকের চাদর খাটিয়ে ঘর বানানো গেল। বাড়ির মেয়েরা শিশুসহ ভেতরে শুল। কিন্তু সারারাত ধরে লোকের আনাগোনা, চৌকিদারের সঙ্গে কথাবার্তা, চৌকিদারের আদর আপ্যায়ন এসব শুনতে শুনতেই কেটে গেল। ভোরে চৌকিদার সবিনয়ে জানাল আমাদের কী হুকুম হয় খাবার? আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চড়াই বেয়ে উঠে ১ ঘণ্টার মধ্যে চিপলিং গ্রামে পৌঁছলাম। চিপলিং নামটি শুনে সন্দেহ হয় তা শিবলিঙ্গ নামের অপভ্রংশ কিনা-এখানে অনেক নামই ওই ধরনের আছে। চিপলিং থেকে যাবার পথে একটি আমেরিকান অভিযাত্রীদলের সঙ্গে এবড়ো খেবড়ো পথের মধ্যে আলাপ হল। তারা উল্টোদিক থেকে আসছেন। আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সেখান দিয়ে নেমে কাঠমাণ্ডু যাবে। আমাদের দুটি মেয়েকে একলা দেখে খুবই বিস্মিত হল। এরা বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বেলা ১০টা নাগাদ গুলফা ভানজেং গ্রামে পৌঁছলাম। এটিও বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিছু শেরপা পরিবার গোষ্ঠীর মানুষ এখানে থাকে বাকিরা গুরুং গোষ্ঠীর তিব্বতী। এখানে মহিষ চরছে, দুধ দইও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এবারকার যাত্রায় আমরা স্থির করেছিলাম দিনের বেলা চিঁড়ে ও গুড়, দুধ জুটলে দুধ চিঁড়ে খেয়েই থাকব। রাতে শুধু রান্না হবে। এতে সময় অনেকখানি বাঁচবে। এখানে দুধ পাওয়া যেতেই সেই চিঁড়ে দুধ দিয়ে ফলার করা হল। আর কুলিরা এখানে তৈরি ভাত পেয়ে খুশি হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভাত খেল কি তাড়ি খেল জানি না। তবে শেরপা অধিবাসীরা আমাদের ঠাট্টা করে জানাল, 'তোমাদের কুলিরা নেশা না করে থাকতে পারবে না-যতই কেন না তোমরা চা

খাওয়াও!’ প্রত্যেক শেরপা ও স্থানীয় লোকের দুটি করে কুকরি থাকে-একটা বড় । সেটা থাকে খাপের মধ্যে, তা দিয়ে তারা জন্তুজানোয়ার মারে, বনপথ কেটে পরিষ্কার করে । তার খাপটা কাঠের কারুকার্যওয়ালা হয়-দেখতে খুব সুন্দর । সেইসব কাঠের কাজ এখানেই হচ্ছে দেখলাম । আরেকটা ছোট ছুরি থাকে তরকারি, মাংস ইত্যাদি কাটবার জন্য । এগুলি পাহাড়িদের কাছে অতি প্রয়োজনীয়-এ দুটি ছাড়া তারা কখনওই পথ চলে না । আমাদের যাত্রাপথে এগুলি খুবই কাজে লেগেছিল কারণ বহু জায়গায় বন কেটে যেতে হয়েছে ।

এরপর আমরা এলাম বালেমচি বলে একটা গ্রামে-অধিবাসীরা খুবই গরিব কিন্তু যতদূর পারল আদর আপ্যায়ন করল । একটা মাত্র ঘরে এক বুড়ি তার মেয়ে ও নাতনিকে নিয়ে থাকে । জিনিসপত্রে ঠাসা, তার মধ্যেই কোনওমতে একটু জায়গা করে আমাদের শুতে দিল । কুলি দুজন এদের চেনা হলেও বাইরে ভেড়া বা মহিষের ঘরে তাদের শুতে হল । রাতে রোজই বৃষ্টি পড়ত । সেদিনও প্রবল ধারায় বৃষ্টি-বেচারীরা তার মধ্যেই শুল । শুকনো পাতার ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে তাদের শুকনো রাখবার চেষ্টা করলাম । এদিকের গ্রামবাসীরা এত সরল ও সহজ যে ঘরভাড়া বা কাঠের জন্য কখনওই কোনও পয়সা নেবার কথা ভাবেনি । আমরাই দুধের দাম বাবদ বাচ্চাদের কিছু দিয়ে এলাম । মুক্তিনাথের পথের থাকালদের সঙ্গে কী প্রভেদ! থাকালরাও তিব্বতী গোষ্ঠীর-বহুদিন নেপালে আছে, কিন্তু সমস্ত কিছুর জন্যই পয়সা চাই । বেশ ভালো অবস্থা তাদের । শুধু একরাত ঘরে বা বারান্দায় থাকার জন্যই আট আনা করে নিত । এদিককার লোক গরিব, অত ব্যবসা বুদ্ধি মাথায় এখনও ঢোকেনি । দিন চালানোই এদের পক্ষে কঠিন । কিন্তু মনটি সুন্দর আছে । পথে দেখেছি বন থেকে বিশেষ বিশেষ গাছ কেটে করাত দিয়ে চেরা হচ্ছে, গ্রামবাসীরা এগুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ঘর তুলবার জন্য । এসব সরকারি বদান্যতায়ই হচ্ছে । বালেমচি থেকে রাস্তা ক্রমাগত ওপরে উঠছে । ৪-৫টা পাহাড়ের চূড়া পার হলাম-অনেক দূরে ‘মণি’ দেখা গেল-জায়গাটির নাম সৌনেমণি । অর্থাৎ মণিপদ্মে লেখা প্রস্তরের স্তূপ-তার মাথায় নিশান উড়ছে । বহুদূর ও চারদিক থেকে লোকে ওই নিশান দেখে পথের দিশা পায় । এইখানেই কিছু লোকের সঙ্গে দেখা হল । এরা কাঠ আনতে বা শিকার করতে গিয়েছিল, এখন ফেরত আসছে । বিকেল হয়ে গেল । আমরা যাচ্ছি থাটেপটি বলে একটা জায়গায় । সেখানে সরকারি কাঠের ঘর ভেড়াওয়ালাদের জন্য তৈরি করা আছে, সেখানেই রাত কাটাব । বালেমচির পরে আর কোনও গ্রাম নেই, কোনও অস্থায়ী আস্তানাও নেই । এটা আমাদের তৃতীয় রাত । কাঠের বিশ্রামঘরে পৌঁছে অগ্নিকুণ্ডে দুপাশের কাঠের তক্তার ওপর বিছানা করে আরাম করে বসলাম । আমার সঙ্গিনীর একটু গ্যাসট্রিক কষ্ট দেখা দিয়েছে, কুলিরা নিচে ঝরনা থেকে জল আনতে গেল । বেশ

খানিকক্ষণ পরে তারা নিদারুণ খবর শোনাল-ওপরে বা নিচে, সব ঝরনা শুকনো । অর্থাৎ রাতে আর কোথাও জল মিলবে না-শুনে তো মাথায় বজ্রাঘাত হল! সারাদিন হেঁটেছি, Water bottle-এর জল নিঃশেষ । কুলিরা বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারে না । আমাদের অন্তত সারাদিনের পর কিছু খেতে হবে, অন্তত চা তো খেতেই হবে । সঙ্গিনী দিনের বেলা চিঁড়েও খাননি-তাঁকে কোনও গরম পানীয় দিতে হবে, কী হবে উপায়? এমন সময় রোজকার মতো মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল । অমনি যত বাটি, ঘটি, হাঁড়ি গেলাস সব বাইরে রাখা হল-কুলিরা প্লাস্টিকের চাদর মুড়ে চৌব্বাচার মতো করে রাখল জল ধরে রাখবার জন্য । ব্যস জলের ভাবনা ঘুচল । খাওয়াদাওয়া হল-রাত ১টার সময় বৃষ্টি থামল । ওপরের অঞ্চলে রোজই প্রথম রাতে এমন ধারা বৃষ্টি হত । পরদিন ভোরে উঠেই মাইলখানেক গিয়ে একটি সুন্দর ঝরনা পাওয়া গেল-সেখানেই প্রাতঃকৃত্য সারা হল, চা ইত্যাদি খাওয়া হল-এখান থেকে ডানদিকে উঁচু পাহাড় । দূরে রৌদ্রোজ্জ্বল এক উঁচু পর্বতশৃঙ্গ দেখিয়ে আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক জানাল-সূর্যকুণ্ড থেকে একটি ঝরনা ওইখানে এসে পড়েছে । চা খাবার সময় আমাদের সঙ্গে ডাঃ ফ্রেমিন্ড বলে একজন আমেরিকান পক্ষীবিশারদের সঙ্গে দেখা হল । তাঁর সঙ্গে দুজন শেরপা কুলি আছে । তিনি কিছুটা ওপরে কয়েক মাস ধরে আছেন । বিভিন্ন ধরনের পাখি ও তাদের স্বভাব চরিত্র বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন । আমাদের অনভ্যস্ত চোখে তো পাখি প্রায় চোখেই পড়েনি-ইনি নাকি ২৫-৩০ রকম পাখি দেখেছেন । তাঁর কাছেই আমাদের গন্তব্যস্থলের ও হ্রদগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল । তাঁর মতে গোঁসাইকুণ্ডকেই যদিও ত্রিশূলীগণ্ডকীর উৎস বলে ধরা হয়-কিন্তু বিভিন্ন উচ্চতায় প্রায় ১৫-১৬টা হ্রদ আছে-গোঁসাইকুণ্ডই এর মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ । কিন্তু সবচাইতে ওপরের হ্রদটি সূর্যকুণ্ড । সাড়ে ৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, সেখান থেকে জলধারা গোঁসাইকুণ্ডে পড়ছে । এর জল আবার নিচের কুণ্ড বা হ্রদে পড়েছে, এইভাবে হ্রদগুলির জল নিয়েই ত্রিশূলীগণ্ডকী নদীর সৃষ্টি । সূর্যকুণ্ড অতটা উঁচুতে অবস্থিত হওয়াতে, চারপাশের তুষারক্ষেত্র থেকে তুষার গলে জল এখানে আসে ।

পরে জেনেছি ১২,০০০ ফুটের ওপরে বর্তমানে এ অঞ্চলে জলাভাবে কোনও বসতি নেই । বর্ষার সময় কিছু লোক ভেড়া চরাতে আসে বটে কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে ঝরনাগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় কোনও স্থায়ী বসতি বা গ্রাম নেই । পথে দুজন শেরপা ছেলের সঙ্গে দেখা হল-তারা কাঠমান্ডু কতদিনের পথ আমাদের কুলিদের কাছে জানতে চাইল । এখানে মাইলটাইলের কোনও কথা নেই, অমুক গ্রামে কদিনে যাওয়া যাবে, তাই হিসাব করে এরা পথ চলে । তারা জানল দু দিনের মধ্যে তারা কাঠমান্ডু পৌঁছতে পারবে । এরা আসছে গোঁসাইকুণ্ডের পাশের গ্রাম থেকে । এদিন চলার পথে পাঁচ ভাই বলে একটা জায়গা পার হতে হল । এমন খারাপ রাস্তার কথা কল্পনা করা যায় না । কেউ যেন

রসিকতা করে এ নামটি দিয়েছে! পাঁচ ভাই আর কিছু নয় পথ পাঁচবার এক মাইল করে নেমেছে, মাঝের শিলাগুলি নরম বলে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং প্রত্যেকবারই আবার এক মাইল উঠতে হয়েছে। আমাদের দম ফুরিয়ে যাবার জোগাড়। দুপুরে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের সিঁড়ির ধাপে বসে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুলিরা রান্না করে খেয়েছে। আমি যথারীতি চিঁড়ে খেয়েছি। আমার সঙ্গিনীর Gastric pain-এর জন্য অনবরত বমি হচ্ছে। ওষুধ দিয়েছি। তরল পানীয় দিয়ে কিছুতেই তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। অথচ না চলে উপায় নেই। ১৩-১৪,০০০ ফুট ওপরে এসেছি। এরপর আর লোকালয় তো দূরের কথা, একটা মেষপালকদের অস্থায়ী আস্তানা অবধি নেই। বিকেলের দিকে পথ-ভানজেং বলে একটি অর্ধগুহার কাছে এলাম। মাথার ওপর বেশ ছাদের মতো আছে, তিনদিক খোলা-বেশ রাজসিংহাসনের মতো-কিন্তু জল কাছাকাছি নেই বলে আরও একটু এগিয়ে ওই ধরনের একটা পাথুরে আচ্ছাদন জোগাড় করা গেল। সেখানে মাটির তলা থেকে স্বল্প ধারায় জল আসছে। সেদিন বিকেল থেকেই আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ কুলি জিৎ বাহাদুর একটু যেন আনমনা। কারও অপেক্ষায় আছে ব্যাপারটা শেষে বোঝা গেল। সন্ধে ৬টার মধ্যে খাওয়া সেরে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় দেশি গাদা বন্দুক নিয়ে এক শিকারির আগমন। কী শিকার করবে? আমাদের নয়তো? এখন বেশ উঁচু পাহাড়ের গায়ে এসে পড়েছি, চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী। মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে নিচের উপত্যকায়। জনপ্রাণী নেই, আমরা দুজন ও তিনজন তিব্বতী যাদের সঙ্গে পরিচয় এই যাত্রাপথেই যেটুকু। বয়ঃকনিষ্ঠ কুলি বরাবরই চুপচাপ। হিন্দি বোঝে না-তার সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। কোনওমতে তিনদিক খোলা সেই গুহার মধ্যে লাঠি পুঁতে প্লাস্টিকের চাদর টাঙিয়ে ঘর বানানো গেল। মাঝখানে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। রাত ৯টায় বৃষ্টি শুরু হল-কী বজ্রপাতের শব্দ। অগ্নিকুণ্ডের অপরদিকে ওরা তিনজন-শুয়ে। যত রাত বাড়তে লাগল শীতের প্রকোপ তত বেশি। ১,৫০০ ফুট ওপরে এসেছি। সেদিন আমার সঙ্গিনীর কিছুই খাওয়া হয়নি। আমারও চিন্তায় ভাবনায় শরীর ভালো নেই। যদি কিছু অঘটন ঘটে, কুলিরা যদি মেরে ফেলে টাকা পয়সার জন্য! তবে কী হবে? মিনতির অভিভাবকরাই বা কী বলবেন এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য! হঠাৎ রাত ১টার সময় ঠান্ডায় তন্দ্রা ভেঙে কী সব শুনতে পেলাম। Sleeping bag থেকে মুখ তুলে দেখি-কুলিরা উঠে বসেছে। তাদেরও শীত করছে। কথাবার্তা শুরু করলাম-৫ দিনের দিন পৌঁছে, চিনি লামাকে ৪ পাঠাতে হবে এসব অনেক আজগুবি কথা বললাম। ওরা নাকি ভূত দেখে এখানে মাঝে মাঝে। যাহোক আগুন জ্বালিয়ে আবার শোওয়া গেল। এসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাতে ঘুম হল না। বলাই বাহুল্য। চতুর্থ দিনের রাতের অভিজ্ঞতা অতীব ক্লান্তিকর বিভ্রান্তিকর তো বটেই। পরদিন সূর্যকুণ্ড-সবচাইতে উঁচু বিন্দুতে উঠতে হবে ও নেমে গোঁসাইকুণ্ডে যেতে হবে-রাতে বিশ্রামের কত দরকার ছিল! তা আর হল না।

পরদিন সকালে উঠেই রওনা-আজ গোঁসাইকুণ্ডে পৌঁছে রাতে সেখানে থাকব । কিন্তু আজকের পথের কঠিনতা ও উচ্চতা সবচাইতে বেশি-১৭,০০০ ফুট উচ্চে উঠতে হবে । একটু এগিয়েই দেখা গেল মাঝের পাহাড়টা ভেঙে গেছে, বেশ খানিকটা ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে নামতে হবে ও আবার ততখানি উঠতে হবে-প্রাণান্তকর পরিশ্রম! খানিকটা ওঠার পর সামনে এক অপরূপ মহিমময় দৃশ্য দেখলাম । বহু উঁচু থেকে এক জলস্রোত সূর্য কিরণে স্নাত হয়ে প্রবলবেগে ও শব্দে নিচে নেমে আসছে আর তার কর্ণবিদারী শব্দে কোনও কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না । ক্রমশ পথ উঁচুতে যাচ্ছে । রাস্তা বলে কোনও জিনিস নেই, কেবল পর্বত ও গড়িয়ে পড়া পাথরের খণ্ড, পাঁচ-ছটা করে ধারালো কোণ বার করে চলবার গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে । আমার কাপড় 'হকি সুর' কোনা কেটে গেল এমন সাংঘাতিক এসব প্রস্তরখণ্ডের তীক্ষ্ণতা । বেলা ৯-১০টা নাগাদ সামনের পর্বতস্তূপ থেকে একদল লোক আসছেন দেখা গেল । একজন মোহন্ত বা ধর্মগুরু কয়েকজন স্ত্রীলোক ও কয়েকজন শিষ্য তাঁদের জিনিসপত্র লোটা কম্বল নিয়ে সকালে গোঁসাইকুণ্ড থেকে রওনা দিয়েছেন । আসামের কোনও এক আশ্রমের সাধুবাবা, শিষ্যশিষ্যা নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন । বেশ আনন্দেই আছেন । আমাদের কাছে, পথঘাট জেনে নিলেন, অতজন রাতে কোথায় থাকবেন-সে বিষয়েও নিশ্চিত হয়ে নিলেন-কারণ সেদিন গ্রাম পাওয়া মুশকিল । আমাদের পথের হদিশ দিয়ে দিলেন-সূর্যকুণ্ডের পর মাটি বরফে ঢাকা । সে জায়গাটি সাবধানে যেতে হবে-তাও কুলিদের বিশেষভাবে বলে দিলেন । বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীর, ধুতি চাদর ও সাধারণ পাম্পসু পরে এক হাতে ছাতা অন্য হাতে একটা পোঁটলা নিয়ে অনায়াসে ও অক্লেশে নামছেন । তাঁদের সহজভাব দেখে নিজেদেরও আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ।

দূরে বরফ বিছানো সবুজ ভূমি-আমাদের কুলি ও পথপ্রদর্শক জানাল, ওই বরফের পাশেই সূর্যকুণ্ড, তার পাশ দিয়েই পথ নেমে গেছে গোঁসাইকুণ্ডে । বেলা ১২টার মধ্যে পৌঁছে যাব । কিন্তু কী সাংঘাতিক চড়াই, পদে পদে অসমান তীক্ষ্ণ পাথরগুলি খোঁচা মারছে । ওপরে উঠছি, আর পিছনে ফিরে দেখছি মিনতি আসতে পারছে কিনা । সে গত দুদিন কিছুই খায়নি । দেখছি ধীরে ধীরে আসছে সে । একজন কুলিকে তার সঙ্গে থাকতে বললাম । কুলিরা খিদে সহ্য করতে পারে না-১১টার সময়েই রান্না করে খেয়ে নিল । তাদের রান্না খাওয়ার ব্যাপারটা খুবই সহজ । আটা গুলে গরম জলে ঢেলে দিল, একটু লবণ দিল-বেশ একটা বড় আটার কাই হয়ে গেল । আর আলু ও পেঁয়াজ বা শাক যাই জোটে, তা তেল মশলা দিয়ে একটা ঝোল বানিয়ে নিল । আমরা ডাল বা ডিম দিয়ে দেখেছি, সেগুলি খায় বটে কিন্তু তা ওদের পক্ষে বিলাস সামগ্রী বা শখের খাওয়া । বাসন মেলে তো ভালো, না হলে এক গুচ্ছ পাতা পেড়ে ধুয়ে নিয়ে তার ওপর ওই কাই রাখবে ।

ঝোল দিয়ে ৪-৫ মিনিটের মধ্যে ওইসব উদরস্থ করে পেট ভরাবে, তবে তারা চলতে পারবে। খালি পেটে তাদের চলা হয় না। কখনও কখনও আটার কাইটা শক্ত করে নাড়ু বানিয়ে নেয়-পথে যদি খিদে পায়, তবে তা খায়। চা খায় বটে, তাও আমরা খাই বলে। এত গরিব এরা এর বেশি খাবার জোটানো অসম্ভব। দিবারাত্র পরিশ্রম করে বলতে হয়। এই যে আমাদের কুলিগিরি করে ১০০-১৫০ টাকা পাবে-তাতেই এদের অনেক কিছু বাড়তি জিনিস কেনা হবে। সেইজন্যই এসেছে এরা।

তাদের খাওয়া হলেও আমার সেদিন খাওয়া হল না। খানিকটা আমার সঙ্গিনীর না খাওয়ার জন্য। ভাবছি, আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়। আর কখনও এমন দুঃসাহস করব না। বেশ উঁচুতে পৌঁছে দেখি মিনতি বা অন্য কুলি কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এত শ্রান্ত যে আবার পিছিয়ে নেমে কী হয়েছে দেখব,-সে শক্তিটুকুও নেই। এখনও দুরন্ত চড়াই ওঠা বাকি। কাজেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখি নিচের কুলি ওপরের কুলিকে ডাকছে। তারও খানিক পরে দেখি তারা মিনতিকে পিঠে করে নিয়ে আসছে। বেলা তখন ২টো বেজে গেছে। সূর্যকুণ্ডে ৪টের মধ্যে না পৌঁছতে পারলে গোঁসাইকুণ্ডে পৌঁছনো অসম্ভব। কাছে এসে তারা আমার কাছ থেকে চাদর চেয়ে নিয়ে মিনতিকে পিঠের সঙ্গে বাঁধল-অপর কুলি দুজনের মাল বহন করল। এইভাবে মাল ও মানুষকে বদলাবদলি করে নিয়ে তারা যাত্রাপথ পাড়ি দিল। নিচে গিয়ে অন্য লোক আনা যায় কিনা বলাতে, তারা জানাল তাতে দেরি হবে। আমি শুধু জানালাম টাকা পয়সার জন্য ভাবনা কোরনা-এখন নিরাপদে পৌঁছে দাও। এইভাবে বেলা ৪টের সময় সূর্যকুণ্ডের পাশে অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিন্দুতে (১৬,৭৪৬ ফুট) পৌঁছলাম। বিকেল হলেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় এসব অঞ্চল। তবু তার মধ্যেই দেখলাম চারপাশের বরফ গড়িয়ে এসে সূর্যকুণ্ডের টলটলে স্ফটিকের মতো জলে পড়ছে। তার পাশ দিয়েই পথ গেছে নিচে। উঁচু থেকে গোঁসাইকুণ্ড হ্রদটি বেশ দেখা যাচ্ছে। নিচু পথে এসে মিনতি জানাল সে এখন স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে-সুতরাং সেই তুষারাবৃত প্রান্তর দিয়ে দুজনে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চললাম। বাস্তবিক তার মনোবলের তুলনা হয় না। আর মাইল দুই গেলেই গোঁসাইকুণ্ড-(১৫,০০০ ফুট) দূরে দেখা যাচ্ছে। সারাদিন রৌদ্রতাপে বরফ গলে গলে জল হয়ে গেছে, পা কেবলই ডুবে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না। অবশেষে বেশ অন্ধকার নেমে এল, আমরাও হ্রদের পাশে সরকারি চটিতে (যা তখনও অর্ধসমাপ্ত) এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার মুষলধারে বৃষ্টি, অর্ধেক ছাদে কাঠ লাগানো হয়েছে, বাকি অর্ধেকে তখনও লাগানো হয়নি। মাস দুয়েক পরে এখানকার মেলা ও তীর্থযাত্রীদের জন্য এসব চটি তৈরি হচ্ছে। সেদিন রান্নার ভার সম্পূর্ণ কুলিদের ওপর দিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমরা ছাড়াও সরকারি ঠিকাদার নিযুক্ত সাত জন কুলি সেখানে ছিল-সুতরাং ওই অর্ধসমাপ্ত ঘরে গাদাগাদি করে

কোনওমতে রাত কাটানো, খাওয়া, সবই করতে হল। মিনতি জানাল, তার হাঁটতে বেশি দেরি হচ্ছিল, সেজন্য সেদিন যদি গোঁসাইকুণ্ডে না পৌঁছতে পারি তাই সে নিজেই তাকে পিঠে তুলে নিতে প্রস্তাব করেছিল বিশেষ কোনও অসুস্থতার জন্য নয়। রাতে শুয়ে ভাবছি- যে আগের রাতে এই কুলিদেরই সন্দেহ করেছি, এমনই আমরা সভ্য ও শিক্ষিত জাতি। ওরা না থাকলে কী হত?

এই অঞ্চলের তিনটি শৃঙ্গের মধ্যে ল্যাংটাং শিখরটি আগেই ছেড়ে এসেছি, সকালের পরিষ্কার আলোয় গোঁসাইথান শৃঙ্গকে হ্রদের জলে দেখা গেল। হ্রদের আকার প্রায় ত্রিকোণ-স্বচ্ছ ঠান্ডা জল-কয়েক দিকের কিনারায় পাথরখণ্ডগুলি সিঁদুর দিয়ে লেপা। ফুল বেলপাতা পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডটি দেখলাম না। তীরের পাথরগুলিকে লিঙ্গের মতো করে তৈরি করেছে বোঝা যায়। আমরাও শ্রদ্ধা ভক্তি জানিয়ে স্নান করে রওনা দিলাম। এরই এক কোণ থেকে জল চুঁয়ে চুঁয়ে নিচের হ্রদে পড়ছে। এখানকার কুণ্ডগুলির মধ্যে দুধকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ও সর্বশেষ নাগকুণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত- প্রত্যেকটি পাশাপাশি কিন্তু সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে অবস্থিত।

কুণ্ডগুলির সবগুলিতে যেতে পারলে হয়তো দোরজে লাকপার চেহারা দেখা যেত-কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায় জানি না। এরপরে ফেরার পালা। এবার শুধু উতরাই। কিন্তু গোঁসাইকুণ্ড বেশ নিচে হওয়াতে বেশ খানিকটা পাথুরে পথ ধরে উঠতে হল। বাঁদিকে বিভিন্ন কুণ্ডগুলিকে দেখতে দেখতে চললাম-ক্রমশ পর্বতের ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে নিচের দিক অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার নামার পালা। ত্রিশূলীবাজার ৫৩ মাইল দূরে। সেখান থেকে বাসে ৪৬ মাইল যেতে হবে কাঠমান্ডুতে। এখানকার পথটি উঁচুতে হলেও সমতল। সুতরাং এ পথের কোনও বিশেষ বর্ণনা দেব না। পথে অজস্র ফুল, বনের সমারোহ, লোকজন বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে, কাঠ কাটছে। এর সবচেয়ে কাছের গ্রাম ধুনজে। প্রায় ১৭ মাইল। অতদূরে যাওয়া কুলিদের অনিচ্ছা। বৃষ্টিপাত হওয়া সত্বেও একদিনেই ধুনজে গ্রামে পৌঁছতে হবে সেইরকম ইচ্ছা ছিল। এইভাবে বিকেলে চা খেয়ে হাঁটা শুরু করলাম-দূরে পাহাড়ের নিচে বর্ধিষ্ণু ধুনজে গ্রামটিকে দেখা যাচ্ছে। আমরা যে পাহাড়ের দিকে আছি তার মাঝে ত্রিশূলীগণ্ডকী। তার ওপারে পর্বতের সানুদেশে ধুনজে গ্রামটিকে ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। দ্রুত চলতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ উঁচু জায়গাটি শেষ হয়ে গেল-সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত বনরাজিমালার মধ্য দিয়ে একটি উতরাই পথ নিচে নামতে শুরু করল। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, জায়গাটি একটু ভিজে কিন্তু অসংখ্য ফুলের ও লাতার সুগন্ধে জায়গাটি ভরপুর-টুপটাপ করে জলকণার সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, ধাপে ধাপে কেবলই নেমে যাচ্ছি। কুলিরা দ্রুত চলেছে, কারণ সেদিন তাদের খাওয়া হয়নি। বেলা ৫টা বেজে গেছে। ঘণ্টাখানেক শুধু নেমেই চলেছি চারদিকে গাছপালা লতার আবেষ্টনীতে

অন্ধকার কিছুই প্রায় দেখা যায় না-মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে চলেছি । প্রায় ২-৩ হাজার ফুট একনাগাড়ে নেমে একটা সমভূমির মতো জায়গায় পড়লাম-ডানদিকে ধুনজে গ্রাম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । বেশ বড় গ্রাম । অনেক দোতলা বাড়িও দেখা যাচ্ছে । কিন্তু কুলিরা বাঁদিকের পর্বতটা দেখিয়ে জানাল সমস্ত পাহাড়টি ঘুরে ঘুরে নেমে যেতে হবে । সেখানে ত্রিশূলীগণ্ডকীর ওপর পুল পার হয়ে মাইল খানেক গিয়ে ধুনজে গ্রাম । এরা এদিককার লোক নয় তাই খুবই অচেনা অজানা এদের । একটু বিরক্তও হয়েছে একদিনে এতটা আসার জন্য । যাহোক আমরা ভাবলাম উতরাই পথে নিশ্চয়ই নেমে যেতে পারব । কিন্তু একটা পুরো পাহাড় কেটে বনপথ, কেবল ঘুরে ঘুরে চলেছি । ৭টা বেজে যায়-কাঠ সংগ্রহকারীরা চলে গেছে । গভীর বন-শুধু পথের রেখা দেখে চলেছি । মাঝে মাঝে পথে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে-অন্ধকার নেমে আসছে । কোথা থেকে কুলিদের ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছি । একেক জায়গায় পথ হারিয়ে ফেলছি কারণ ২-৩টে পথ বার হয়ে গেছে । অবশেষে তাদের গলার স্বর শুনে দেখি পথের ডানদিকে পার্বত্য আচ্ছাদন দেখে ও জলের ধারা দেখে, সেইখানেই রাতের আস্তানা পেতেছে । তাদের কুকরি দিয়ে জঙ্গল সাফ করে একটা বেদি মতো জায়গায় আমাদের বিছানা পেতেছে, অন্যদিকে পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে নিজেদের খাবার তৈরি করেছে । শীত একেবারেই করছে না । তাতেই বুঝলাম অনেকখানি নেমে এসেছি । সেদিন খুব ভালো করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হল, আমার সঙ্গিনীর শরীর সুস্থ হয়েছে । অনেক রাত জেগে মোমবাতি জ্বেলে আমাদের ডায়েরি লেখা হল । মাঝরাতে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলে পর অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা ভরে গেল । অস্পষ্ট আলোয় ধুনজে গ্রাম দূরে দেখা যাচ্ছে । রাতের নৈঃশব্দে বহু নিচে প্রবহমানা ত্রিশূলীগণ্ডকীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে । ঘন জঙ্গল । চারদিকে জনপ্রাণী নেই । আমরা যেন মর্ত্যলোক ছেড়ে অপার্থিব স্বর্গলোকের পথে আরোহণ করেছি । মনটা আনন্দে ভরা-এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে সেদিন প্রায় না ঘুমিয়েই কাটালাম ।

পরদিন ভোরে আলো ফুটতেই পাহাড়িপথ বেয়ে নামছি । মাঝে মাঝে পথ এত সঙ্কীর্ণ যে রাতে আসা বোধহয় সম্ভবই হত না । নিচে খরস্রোতা নদী, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি কারণ কোনও রেলিং বা ওই ধরনের কিছুই নেই । এইভাবে সকাল ৮টা নাগাদ ত্রিশূলীগণ্ডকীর জলস্রোতের কাছে এসে পৌঁছলাম । কী স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জলের ধারা! তখনই স্নান করে ফেলে ভেড়াওয়ালাদের আস্তানা থেকে চা খেয়ে পুল পার হয়ে ওপারে গেলাম । কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবার এখানে আছে, তাছাড়া নদীর জলকে বিভিন্ন দিকে খেতের দিকে নেওয়া হয়েছে । এখান থেকে আবার চড়াই পথ ১,৫০০ ফুটের মতো উঠতে হল । খেতের মধ্যে চাষ হচ্ছে, পাশেই বাড়ি । এইভাবে ২ মাইল পথ উঠে ধুনজে গ্রামে পৌঁছলাম । বেশ বড় গ্রাম, পুলিশ ফাঁড়ি আছে, বড় গেট সামনে । প্রাথমিক

বিদ্যালয়, দোকান ঘর কিছুরই অভাব নেই-অনেক লোক থাকে । নেপালের পুরনো গ্রামগুলির মতোই ঘনবসতি । নেই শুধু মমতা । কিন্তু না পাওয়া গেল দুধ বা জল অথবা বিশ্রাম করার আস্তানা । পুলিশরা স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে ক্যারাম খেলছে । তাদের জানালাম একটা পঞ্চায়েতের ঘর খুলে দিতে, কোনও উত্তর পেলাম না । এমন ব্যবহার পাব আশা করিনি । অতএব সেদিন দুপুরে যে বিশ্রাম ভোগ করব মনে করেছিলাম তা আর হল না । স্বাগতম লেখা gate দিয়ে বার হয়ে পথের ধারে ঝরনার পাশে বসে আমাদের রান্না খাওয়া সারা হল । দিন পরিষ্কার-নিচে নামছি, বৃষ্টির উৎপাত নেই, শীতও কম । বেলা ১২টা নাগাদ আবার রওনা হওয়া গেল । কঞ্চি খেতের পাশ দিয়ে পথ, মাঝে মাঝে লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে । প্রতি গ্রামেই ঢোকার পথে মণিপাথর অর্থাৎ পাথরে 'ওম মণি পদ্মে হুঁ' কথাটি তিব্বতীতে খোদাই করা আছে । গুরু রিম্পোচে বা বুদ্ধ অবতারের কোনও মূর্তি কুলুঙ্গীতে রাখা আছে । কোথাও রাস্তার মাঝে দড়ি দিয়ে আটকানো-মুরগির পালক ইত্যাদি ছড়ানো । মুরগি বলি দিয়ে পূজা হয় । অন্তত ভূত প্রেত যাতে না ঢোকে গ্রামে তার জন্য এই ব্যবস্থা । সেদিন সন্ধেবেলা বেশ বড় একটি গ্রাম ধারাং পৌঁছলাম । এসব গ্রামে স্কুল পঞ্চায়েত ঘর প্রভৃতি আছে । কুলিদের এক বন্ধু জুটল, তার ঘরে ভালো খেতে পাওয়া যাবে ও জলও কাছে বলে সেইখানেই থাকা গেল ।

এতদিন গ্রাম্য লোকদের ব্যবহার একটু rough বা অমার্জিত হলেও তারা সরল ও অকপট ছিল-ধুনজে গ্রামের অপেক্ষাকৃত ধনী লোকদের ব্যবহার কি বিপরীত? আমরা মুক্ত প্রকৃতির কোলে বসে বিশ্রাম ও রান্নাখাওয়া সারলাম । দিন পরিষ্কার । মৃদু মন্দ বাতাস চারদিকে ঢেউ খেলানো উপত্যকা, গাছে গাছে সাদা অর্কিড ও অন্যান্য নাম না জানা ফুল ও পাখির কূজনে আমরা মুগ্ধ । মানুষের চাইতে প্রকৃতির আশ্রয়ই ঢের শ্রেয় । যাইহোক এবার পথে শাক সবজি, আলু ও ডিম কিছুটা পাওয়া গেল । ধারাং গ্রাম থেকে বেত্রবতী কতদূর কেউ বলতে পারে না । কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম তিনদিনে ত্রিশূলীবাজার পৌঁছব-সেটা এখান থেকে প্রায় ২৮ মাইল । তিনদিনে না হোক রওনা তো হওয়া যাক যতদিনে পৌঁছই । ধারাং গ্রাম থেকে সীমান্তের রসুয়াগড় ঘাটি ৪ দিনের পথ-আগে নেপাল ও তিব্বতের ওই সীমানা দিয়ে লবণ ও পশম আদানপ্রদান হত-বর্তমানে ওইসব পথ বন্ধ । ভোরে ধারাং থেকে রওনা হয়ে একটা মস্ত পাথরের খণ্ডকে বেষ্টন করে এক পাকদণ্ডী বেয়ে পথকে অনেক সংক্ষেপ করা গেল । দুপুরে এক জায়গায় থামলাম খাবার জন্য । প্রখর রোদ চারদিকে, এ সময়ে খুবই জলকষ্ট এখানে । চটির লোকেরা কিছুটা সাহায্য করতে সেখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার করা গেল । জায়গাটির নাম মণি গ্রাম, সেখান থেকে বেত্রবতী মাত্র তিন মাইল । এখানে বেত্রবতী নদী এসে ত্রিশূলীগণ্ডকীর সঙ্গে মিশেছে ।

উতরাই পথ হলে কী হবে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না-পাথুরে পথ, বৃষ্টিতে মাটি পাথর ধসে পড়েছে। মাটির রং গৈরিক। তবে এদিকের চড়াই বা উতরাই দুয়েরই Slope ধীরে ধীরে হয়েছে, কাঠমান্ডু থেকে অত খাড়া পথ নয়। দূর থেকে বেত্রবতী, ভৈঁসে, ত্রিশূলীবাজার-ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। বেত্রবতী বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। স্কুল, পঞ্চায়েত সবই আছে, একজন শিক্ষক জানালেন, সমতল পথ, তাই আজই চেষ্টা করলে ত্রিশূলীবাজার পৌঁছতে পারি। অতএব তাড়াতাড়ি পুল পার হয়ে ভৈঁসে গ্রামে আসা গেল। তখন বিকেল ৪টে। মণি গ্রামের মতো এটাও বিভিন্ন উপত্যকা থেকে আসার কেন্দ্রস্থল। কাঠের ব্যবসাই প্রধান-অন্য দোকানপাটও আছে। এখান থেকে ত্রিশূলী প্রজেক্টের কাজকর্ম দেখা গেল। নদীকে বাঁধ দিয়ে লকগেট দিয়ে জলকে একদিকে প্রবাহিত করা হয়েছে-সুন্দর পরিষ্কার পথ। কুলিদের একদিন রোজ মারা যাবে, তাদের প্রবল আপত্তি যেতে। আমরা তবু আধা অন্ধকারে রওনা দিলাম। বেশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে গিয়েও আমরা সন্ধে ৭টার সময় ত্রিশূলীবাজারের রাস্তায় এসে পড়লাম। এখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে ভারতের অর্থানুকূল্যে। এখানে আমেরিকান মিশনের কর্মীরা স্কুল হাসপাতাল চালাচ্ছেন। রাস্তার নিচে পুরনো ত্রিশূলীবাজারে এসে পৌঁছলাম। এ জায়গাটি পুরনো গ্রাম যেমন নেপালি গ্রাম হয় সেরকম। বাজারের দুপাশেই বাড়ি। সেখানেই ব্যবসায়ীরা পরিবারসমেত থাকেন। প্রাচীন নেওয়ার জাতিই এখানকার বেশিরভাগ ব্যবসা পরিচালনা করেন। হঠাৎ তামাকের আড়তে দুই-তিনজন জন মুসলমানের সঙ্গেও দেখা হল যা নাকি নেপালে বিরল। দুয়েক জন তিব্বতী হোটেল খুলেছেন। কোথায় থাকব জিজ্ঞেস করাতে সকলে একবাক্যে জানাল রামমন্দিরে বা স্কুলে। বিদ্যালয়ের পাশেই রামমন্দির-জায়গাটি এত সুন্দর যে সেখানেই থাকা মনস্থ করলাম। পূজারীকে বলতেই মন্দিরের প্রাঙ্গণটি ছেড়ে দিলেন, খাবার জল ইত্যাদি দিয়ে জানালেন-যেখানে ইচ্ছা থাক। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত নদীতীর পরিষ্কার। বট গাছগুলির নিচে প্রশস্ত বাঁধানো বেদি। পাশে ত্রিশূলীগণ্ডকী বিপুল বেগে বয়ে যাচ্ছে। বাঁধানো ঘাট নেই বটে কিন্তু বিরাট পাথর ফেলে ফেলে ঘাট করা হয়েছে। নদীর অপর দিকে উঁচু পর্বত। আমাদের প্রধান কুলি জিৎ বাহাদুর জানাল, ওই পাহাড়ের ওপর দিয়েই কাল ভোরে ওরা বাড়ি চলে যাবে-গোঁসাইকুণ্ডের রাস্তায়। পায়ে ফোস্কা পড়ছে, সে ব্যথা ভুলে নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম-সেখান থেকে উঠতে আর মন চায় না। এটাই কী সেই পুরাকালের মুনিদের আশ্রম! রাতে বাঁধানো বেদিতেই শোব ঠিক করা হল। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি, তাই দিয়ে রান্না করা হল। মন্দিরের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি অসংখ্য জুঁই ও বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত প্রাঙ্গণ সুরভিত, এত ফুলের গাছ একসঙ্গে আর কখনও দেখিনি। কখন যেন সেই ফুলের গন্ধের ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে দেখি পূজারিণীরা ফুল তুলে মালা গেঁথে ফেলেছেন-তবুও গাছের ফুলের সংখ্যা কমেনি। এছাড়া জবা, রক্তকরবী ইত্যাদি অন্যান্য

ফুলের গাছও আছে। যাত্রীরা এসে বৌদ্ধ প্রথায় একটি স্তম্ভে ফুল চড়াচ্ছেন ও মন্দির পরিক্রমা করে ভেতরে ঢুকছেন। ভেতরে রামসীতার মূর্তি, খুব বেশি প্রাচীন নয়। পূজারী নেপালি তবে হিন্দু। নেপালে রামের মন্দির খুবই বিরল। তবে পরে দেখলাম হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই এ মন্দিরে সমানভাবে পূজা দিচ্ছেন। বাজারে গিয়ে টাকা ভাঙাতে গেলাম। শনিবার নেপালে বন্ধ-অতএব টাকা ভাঙাতে কিছু জিনিসপত্র কাপড় ও নেপালি চাদর কেনা হল। তখনই 'করুণাময়' মূর্তির (বুদ্ধের এক অবতার) পূজা হচ্ছে দেখতে পেলাম। অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও একজন পূজারী ও পূজারিণী (বৌদ্ধ)। দুটি আলাদা পাত্রে পূজার সামগ্রী রয়েছে। এত রকমের উপাচার (অন্তত ২০-২৫ রকম) যে গোনা যায় না। বৌদ্ধ বা লামাধর্মের বজ্র, কাপড়, ঘি, দই, তেল, ফুল, সলতে, অসংখ্য পাথর, শঙ্খ-সবই রয়েছে। করুণাময় মূর্তিতে বুদ্ধমূর্তির ছাপ, বেশ প্রাচীন মূর্তি। নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সহাবস্থান ঘটেছে সর্বত্র, কেউ কাউকে সরাতে পারেনি-কিন্তু একটি অন্যটিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছে, এখানেও তার নিদর্শন দেখা গেল। বাজারটি ওপর থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। যেখানে সব চাইতে নিচু, সেখানেই বাসরাস্তা শুরু। সকালে যখন বাজারে যাচ্ছি ওপর থেকে নদীর জল এনে ফেলা হচ্ছে-ওপর থেকে নিচে জলের স্রোত আসছে, চলাই মুশকিল। বেশ ঘিঞ্জি শহর। কুলিরা টাকা ও বকশিস নিয়ে চলে গেল-আমরাও বাসরাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। ৪৬ মাইল, তবে কাঠমাণ্ডু। তারপর কলকাতা। ২১ মে রওনা হয়ে জুনের ৩-৪ তারিখেই ফিরেছি। যেতে ৫ দিন, নামতে ৩ দিন-মোট ৮ দিন লেগেছে। ৩৬ মাইল ও ৫২ মাইল পথ হেঁটেছি। আসার সময় অত তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়েছিল বটে, তবে মনে হয় আমরা যে পথে এসেছি সেটাই ভালো। প্রথমে উঠে পরে নামাই ক্লান্তির দিক থেকে সুবিধাজনক। রুক্ষ কর্কশ পথ। কিন্তু সেই কঠোর দৃশ্যাবলীকেও মাধুর্যমণ্ডিত করেছে ত্রিশূলীগণ্ডকী। বিশেষ করে রামমন্দিরের পাশের সেই অপূর্ব স্থানটি অত ক্লান্তির পরে মনোরম বিশ্রামস্থল হয়ে উঠেছিল।

ভ্রমণ মে ও জুন, ২০০২

অমরক. ক

হীরক নন্দী

আশ্চর্য জায়গা অমরকণ্টক । ধর্ম আর নিসর্গের এত পরিচ্ছন্ন সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না । তীর্থযাত্রীর ভিড়ে মিশে থাকে নিছক সাধারণ পর্যটক, যাঁরা খোলা আলো বাতাস আর নির্জনতার প্রত্যাশী । বিস্তর জনসমাগম, তবু অমরকণ্টক যেন নিরিবিলি; প্রশান্তি তার সর্বাঙ্গে ।

নর্মদার উৎসকে জড়িয়ে অমরকণ্টকের খ্যাতি । একই পাহাড়ের দুদিকে জন্ম নিয়েছে এক নদী আরেক নদ-নর্মদা আর শোন । প্রচলিত লোককথায় নর্মদা শিবের কন্যা । শোন-এর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিকঠাক । নর্মদার সাজসজ্জার ভার যার ওপরে, সেই নাপিতকন্যা মুগ্ধ হল শোনের পৌরুষে । নর্মদার রূপ ধরে হাজির হল বিয়ের মণ্ডপে । খবর এল নর্মদার কাছে । মানিনী নর্মদা ঘুরে বইল পশ্চিমে । কপিলমুনি আটকাতে চাইলেন । নর্মদা বাধা মানল না । পাথরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে গেল ভারতের পশ্চিমতটে । যেখানে কপিল বাধা দিলেন, সেখানে কপিলধারা প্রপাত । নর্মদার আছড়ে পড়া আজও বাধাহীন । সে আজও চিরকুমারী । বিয়ে ভেঙে গেল । শোন রইল চিরকুমার, বয়ে গেল উত্তরের পথে । এরকম হাজারটা উপকথা জড়িয়ে আছে অমরকণ্টকের প্রতিটি কুণ্ডে, প্রতিটি ধ্বংসস্তূপে ।

শোন আর নর্মদা ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট জলধারার উদগমস্থল এই অমরকণ্টকের পাহাড় । সবই উঠে এসেছে কোনও না কোনও কুণ্ডের মুখ থেকে । নর্মদার কুণ্ড ঘিরে বিখ্যাত নর্মদা মন্দির । পুরনো কালের মন্দির, যেন তকতক করছে সময়োপযোগী সংস্কারে । যদিও ধরা হয় নর্মদার আসল উদগম মাই কি বোগিয়া-র (মায়ের বাগান) কুণ্ড, তবু মন্দিরের কুণ্ডকে ঘিরেই মায়ের অর্চনা । ধর্মস্থান হিসেবে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, পাপীদের যখন তখন কাদাজলে আছাড় খাওয়ার সেরকম ব্যবস্থা নেই । মন্দিরের সামনে পাথরের ছোট্ট হাতি, তাতে মুণ্ডহীন সওয়ার । হাতির চার পায়ের ফাঁকে সওয়া বর্গফুট জায়গা । মাটিতে সাষ্টাঙ্গ শুয়ে যদি ওই ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া যায়, প্রমাণ হয় যে এই জন্মে কোনও পাপ নেই । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় একটু গায়ে গতরে লোকেদের হেয় করতেই বুঝি এই ব্যবস্থা । কিন্তু ঘটনাটা যে আদপে তা নয় সেটা সম্যক বুঝলাম যখন এক বিশালবপু মহিলা অনায়াসে গলে গিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি তুলসীপাতা । এটাও

খেয়াল করলাম, অনেকে মাথা ঢুকিয়ে একটু আধটু হাঁচড় পাঁচড় করে ফিরে আসেন। উল্টো কথাটাও চালু আছে কিনা, যে ঘোর পাপী সে আটকেই থাকবে। এই ঘোর কলিতে, কে আর ঝুঁকি নেয়!

শোনা যায় খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে রেওয়ার মহারাজা গুলাব সিং নর্মদা মন্দির তৈরি করেন। সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে পারিনি, অন্তত গাইডেরা তাই বলে। একই সময়ের তৈরি কিছু মন্দির আছে রাস্তার ওপাশে, মূল মন্দিরের দক্ষিণে। সেগুলোর ভগ্নদশা, কিন্তু একটা বিষয়ে বেশ আগ্রহ পেলাম। মন্দিরগুলোর স্থাপত্য যেন এককেটার এককেরকম। কেউ যেন মনস্থির করতে চেয়েছে ঠিক কী ধাঁচে আরও বড় কিছু গড়বে। নর্মদার মন্দির থেকে শোনমুড়া যাওয়ার পথে আরও একটা চমক। একটা মন্দির তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের। তৈরি করছে এখানকার এক তান্ত্রিক সম্প্রদায়। যতদূর শুনলাম ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। অদ্ভুত তোরণদ্বার, যার চারদিকে চারটে মুখ। নির্মীয়মাণ মন্দিরে জীবজন্তুর প্রতিরূপ। আধুনিক কিন্তু সামান্য বিভ্রান্তিকর। যেদিন শেষ হবে, একটা কৌতূহল বাড়বে অমরকণ্টকে।

নর্মদা মন্দির থেকে মাই কি বোগিয়া আর শোনমুড়া হাঁটাপথ। শোনমুড়ায় শোন নদের উদগমকুণ্ড। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও চোখে, সাদামাটা একটা বাঁধানো জলভরা চৌবাচ্চা। শোন নদের ফিনফিনে ধারা কিছুটা গড়িয়ে গেছে পাথর বেয়ে। তারপরে ছিটকে পড়েছে অনেকটা তলার উপত্যকায়। প্রপাত হিসেবে নিতান্ত নগণ্য কারণ এই শীতের শেষে জলের যা পরিমাণ তাতে ঘণ্টায় একটা বালতি ভরবে কিনা সন্দেহ। তবে উপত্যকার দৃশ্য যথেষ্ট মনোরম। এখানে হনুমান অজস্র। জিনিসপত্র ছেড়ে দুপা হাঁটলেই ঝামেলা। এমনিতে আঁচড়-কামড় দেয় না; তাড়া দিলে পালায়। এদের উপস্থিতি যেন প্রাণবন্ত করে রেখেছে জায়গাটা।

মাই কি বোগিয়া নর্মদা পরিক্রমার শেষ বিন্দু। বহু পুণ্যার্থী পায়ে হেঁটে নর্মদার উৎস থেকে মোহনা আবার মোহনা থেকে উৎস পর্যন্ত পরিক্রমা করে ঘুরে আসেন। পরিক্রমাকারীরা ভিক্ষে করে খান, যেখানে পারেন থাকেন, পরস্পরকে দেখলেই নর্মদা আর শিবের নাম নিয়ে সম্ভাষণ করেন, পরিক্রমার শেষে কেউ ফেরেন সংসারে, কেউ হেঁটে যান নতুন তীর্থের সন্ধানে। এই পরিক্রমাকারীদের জন্যই অমরকণ্টকে সাধুসমাগম নিত্য ঘটনা। মাই কি বোগিয়া প্রদক্ষিণরত পুণ্যার্থীদের শুরুও বটে আবার শেষও বটে। বোগিয়া অর্থে বাগিচা-বাগান। এখানে জঙ্গলের মধ্যে একটু ভেজা স্যাঁতসেতে মাটিতে এক ধরনের উদ্ভিদ হয়। বড় বড় পাতা থাকে, ৩-৪ ফুট উঁচু, বোধহয় কোনও ধরনের ঘাস বা গুল্ম। স্থানীয় নাম গুল্বকাবলি। এখানকার এক সাধু এই গুল্বকাবলির ফুল থেকে কোনও

পদ্ধতিতে আরক বানিয়ে চোখের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করেন । দূর-দূরান্তের লোকেরাও নাকি আসে । স্থানীয় লোকেরা বলে এই গুল্মকাবলি এই নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও হয় না । এই রহস্য যে কোনও উদ্ভিদবিদ হয়তো অনায়াসে উদ্ধার করে দেবেন । সাধারণ মানুষ গবেষণার ধার ধারে না । তারা আসে বিশ্বাসে, আর সেই বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে গজিয়ে চলেছে মাই কি বোগিয়ার পবিত্র আর্দ্র মাটিতে ।

অমরকণ্টকের পশ্চিমপ্রান্তে নর্মদার পথ ধরে কপিলধারা জলপ্রপাত । প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু প্রপাত সরাসরি ধাক্কা খেয়েছে নিচের পাথরে । বর্ষাকালে মোটামুটি ভালোই জল থাকে, গরমকালে একেবারেই ঝিরঝিরে । জায়গাটা বেশ সুন্দর । পর্যটনের সৌজন্যে বেশ কিছু আবর্জনা জমেছে তলার পাথরের ফাঁকে ফাঁকে । অন্তত পরের বর্ষা পর্যন্ত ওই পাপের বোঝা সইতে হবে নর্মদাকে । কপিলধারায় বেশ কিছু সাধু, উপকথা, পাখি আর বানর আছে । প্রপাতের ওপরে পায়ের ছাপ ফেলে গেছেন ভীম আর অর্জুন, একেবারেই অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে । একটা ছোট গুহা আছে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে । এখানে নদী দু-তিনটে ভাগ হয়ে কুড়ি ফুট মতো ঝাঁপ খেয়েছে । এরই নাম দুগ্ধধারা । পাশের গুহায় নাকি একসময়ে বাঘ থাকত, এখন দেবতা আর সাধুরা । আশপাশে বেশ জঙ্গল । এখানকার জঙ্গল থেকে খুব বেশি রকমের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ হয় । কপিলধারায় আর অমরকণ্টকে একেক জায়গায় কুড়ি-পঁচিশ রকমের লতা, পাতা, শিকড়-বাকড় সাজিয়ে বসতে দেখেছি । আয়ুর্বেদে নয়তো হাতুড়ি-বেদে কাজে লাগে এইসব । এগুলো নিয়ে ভালোমতো গবেষণা হয়নি আমাদের দেশে । যেদিন বিদেশিরা এসে শুঁকে দেখবে, সেদিন আমরা ঝাঁপাব ।

অমরকণ্টক থেকে কপিলধারা রাস্তাটা খুব সুন্দর । সেই নর্মদা মন্দিরের গা থেকে পশ্চিম বরাবর নিচু টিলায় শালের জঙ্গল, সবুজ আর হলুদে এখন একেবারে মাখামাখি । ফেব্রুয়ারি-মার্চে এই সবুজ-হলুদের খেলাটাই চলে । কদিন বাদে হলুদটা যখন কিছুটা আত্মগরিমায় ভুগবে, হঠাৎ সাতদিনের বর্ষায় সব ধুয়েমুছে আবার সবুজ । নর্মদায় ছোট্ট একটা বাঁধ দিয়ে জল ধরা আছে অনেকটা । সেই জলের আধখানায় ছায়া পড়েছে ওই সব আশ্চর্য রঙের । কপিলধারার আগে রাস্তার উত্তর দিকটা ধরে পাইন বন, আবার বাঁহাতে বেশ কিছুটা ইউক্যালিপটাস । পুরো ছবিটা যেন সাজানো বলে মনে হয় । এই দিকটা খুব শান্ত, নিরিবিলি; অথচ কয়েক পা হাঁটলেই অমরকণ্টকের প্রাণকেন্দ্র-থানা, বাসস্ট্যান্ড, আধুনিক হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, অভাব নেই কিছুরই । মন্দিরের একদম গায়ে লাগানো অংশটা ছেড়ে দিলে আশপাশটা প্রায় ছবির মতো । শিবরাত্রিতে আর বৈশাখী পূর্ণিমায় বড় মেলা বসে এখানে । তখন হয়তো কিছুটা হট্টগোল হয়, অন্যসময়ে একেবারেই শান্ত পীড়াহীন ।

নর্মদার বাঁধের জলটা লম্বালম্বি ছড়ানো । নর্মদা মন্দিরের খুব কাছ থেকে কল্যাণ আশ্রমের কাছাকাছি প্রায় আধ কিলোমিটার । জলে প্যাডেল বোট আর হাতে টানা নৌকা চালানোর ব্যবস্থা আছে, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত । রাস্তা থেকে হঠাৎই জলের ওপরে দেখি পাখির ঝাঁক । কাছে যেতে দেখলাম প্রায় হাজার দেড়েক পাখি । অধিকাংশই ছোট সরাল (লেসার হুইলসিং টিল) আর সামান্য কিছু কটন টিল । এরা স্থানীয়পরিযায়ী । রাতের বেলায় আশপাশে উড়ে যায় পেটের ধান্দায়, আবার সকাল থেকে এই বাঁধের জলে বিশ্রাম । খুব তাড়াহুড়ো করে ভয় না দেখালে প্যাডেল বোটে চেপে বেশ কাছাকাছি যাওয়া যায় । ধর্মস্থানে কেউ এদের উত্যক্ত করে না, তাই এরাও বেশ সহনশীল । আমাদের ধর্মে সহাবস্থান আর সংরক্ষণ এই দুটো জিনিস সহজাত । যারা ধর্মটার অণুমাত্রও অনুভব করে, তাদের বাকিটুকু আর বোঝাতে হয় না ।

অমরকণ্টক থেকে কেওঞ্চির পথে পাঁচ কিলোমিটার পিছিয়ে এসে কবীর চবুতরা । খুব যে দর্শনীয় জায়গা তা নয় । কথিত যে ভক্ত কবীর এইখানে বসে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন । এখানেও দেখলাম সেই গুল্বকাবলির ঝাড় । তিনটে কুণ্ড, আর আশ্রমের কুটির ছাড়া কিছু নেই । নির্জনতা আছে, আর সেই সঙ্গে বনভূমির সাধারণ নিসর্গ । এখানেও সেই একই নিসর্গ আর ধর্ম, যা ছড়িয়ে আছে অমরকণ্টকের আনাচে কানাচে, তপোভূমি নর্মদায় ।

প্রয়োজনীয় তথ্য

অক্ষাংশ-২২০৪র্৪ উঃ

দ্রাঘিমাংশ-৮১০৫র্৪ পুঃ

উচ্চতা-১,০৬৫ মিটার

জলবায়ু-বর্ষা : জুনের মাঝামাঝি-সেপ্টেম্বর, শীত: অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি, গ্রীষ্ম: মার্চ-জুনের মাঝামাঝি

তাপমান-গ্রীষ্মকাল: সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শীতকাল: সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সড়ক যোগাযোগ: বিলাসপুর থেকে অমরকণ্টক কেওঞ্চি হয়ে ১২৩ কিলোমিটার । জব্বলপুর থেকে অমরকণ্টক ডিনডোরি হয়ে ২৩৫ কিলোমিটার । শাহডোল থেকে অমরকণ্টক ১২৫ কিলোমিটার । পেণ্ড্রা রোড থেকে অমরকণ্টক কেওঞ্চি হয়ে ৪৫

কিলোমিটার। অমরকণ্টক থেকে যে যে জায়গার সরাসরি বাস যোগাযোগ আছে: কাটনি, জব্বলপুর, সিউনি, বিলাসপুর, পেণ্ড্রা রোড, ডিণ্ডোরি, রায়পুর, শাহডোল, মনেন্দ্রগড়। বিলাসপুর-এলাহাবাদ ও রায়পুর-এলাহাবাদ এই দুটো রুটের নৈশবাস নিয়মিত অমরকন্টকের ওপর দিয়ে চলাচল করে।

রেল যোগাযোগ : নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন বিলাসপুর-কাটনি শাখার পেণ্ড্রা রোড। কলকাতা থেকে অমরকণ্টক যাওয়ার সহজতম উপায় মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর) ধরে বিলাসপুরে নেমে গাড়ি ভাড়া করে অমরকণ্টক অথবা বিলাসপুর থেকে নর্মদা এক্সপ্রেস ধরে পেণ্ড্রা রোড স্টেশনে নেমে বাসে বা গাড়িতে অমরকণ্টক। মুম্বই মেল সাধারণত সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে বিলাসপুর পৌঁছয়, নর্মদা এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল নটায় বিলাসপুর থেকেই। নর্মদা এক্সপ্রেস ধরে পেণ্ড্রা রোড হয়ে গেল, দুপুর দুটো-আড়াইটের মধ্যে অমরকণ্টক পৌঁছনো সম্ভব। বিলাসপুর থেকে গাড়ি নিলে গাড়িভাড়া ডিজেল গাড়ির ক্ষেত্রে সাড়ে তিন টাকা প্রতি কিলোমিটার আর পেট্রোল হলে ৫ টাকা প্রতি কিলোমিটার। রাতে গাড়ি ধরে রাখলে ১৫০ টাকা অতিরিক্ত প্রতি রাতের জন্য। এছাড়া অন্যভাবেও ভাড়া নেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ডিজেল বা পেট্রোল গাড়ি প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা জ্বালানি খরচ। রাতের অতিরিক্ত চার্জ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হয়তো বেশিদিনের জন্য ভাড়া করলে বা বেশি চাহিদার সময় না গেলে ভাড়ার হার সামান্য কম বেশি হবে।

থাকার জায়গা : অমরকণ্টকে থাকার জায়গার অভাব নেই। সবথেকে ভালো ব্যবস্থা মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম-এর হলিডে হোমস-এ। এছাড়া ট্যুরিস্ট কটেজ, বেশ কিছু রেস্টহাউস, যথেষ্ট সংখ্যায় ধর্মশালা ইত্যাদি আছে। খাওয়ার কোথাওই বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনও জায়গায় মোটামুটি ভালো খাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু নিরামিষ খাবার বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ ধর্মশালাতেই কোনও নির্দিষ্ট ভাড়া নেই। থাকার খরচ বাবদ যে কোনও মূল্যের অনুদান গ্রহণ করা হয়।

ভ্রমণ এপ্রিল, ১৯৯৭

আদিম ডুয়ার্সের আধুনিক রূপকথা

সূর্য ঘোষ

ডুয়ার্স পরিক্রমা শুরু নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন বা শিলিগুড়ি থেকে । অকৃপণ প্রকৃতি এখানে বিছিয়ে রেখেছে সবুজ চাদর । সমান করে কাটা মায়াময় চায়ের বাগান, যত্রতত্র খরস্রোতা পাহাড়ি নদী বা ঝোরা, অসমতল ছোট ছোট টিলা, কখনও বা পাহাড়ি দিগন্ত, আকাশছোঁয়া ক্লাইম্যাক্স শাল-সেগুনে ঢাকা কখনও রোদ-ঢোকে-না এমন গা-ছমছমে জঙ্গল, হঠাৎ অনেক উঁচু থেকে দেখা বার্ডস-আই-ভিউ-এর মতো সবুজ উপত্যকা-সব মিলিয়ে ডুয়ার্স এক অনন্য অভিজ্ঞতা । হিমালয়ান ফুট হিলস, ন্যাশনাল পার্ক, অভয়ারণ্য, নদী, ঝরনা, উপত্যকা, মাইল মাইল জোড়া চা-বাগিচা, চতুর্দিকে নীল পাহাড়ের বেষ্টনী, দারুণ রৌদ্রের দিনে ঝকঝকে তুষারচূড়া-বৈচিত্র্যে যেন অনিঃশেষ । একশৃঙ্গী গণ্ডারের প্রিয় বিচরণভূমি গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে বাইসন, হাতি, হরিণের মতো তৃণভোজীদের পাশাপাশি আছে অজস্র পাখির ঝাঁক । আছে মাংসাশী লেপার্ডের দল ।

কীভাবে যাবেন: যাওয়া খুব সহজ । যাব মনে করলেই হল । নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার সাতশো উপায় । দার্জিলিং মেল, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তা-তোর্সা, কামরূপ । রকেট বাসও প্রচুর । ভূটান সরকার, সিকিম সরকার, নানা প্রাইভেট বাস । কলকাতা থেকে ১৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি । তারপর উঠতে হবে বাসে । ৫-৬ জনের দল হলে এবং ৫-৬ দিনের যাত্রা হলে একটা অ্যাম্বাসাডর বা মারুতি ভ্যান ভাড়া করে নেওয়া ভালো । দিনপ্রতি ৬০০ টাকায় তেনজিং নোরগে টার্মিনালের কাছ থেকে ভাড়া পাওয়া যায় । তেল-মবিল আলাদা । ট্যুর সার্কিট হতে পারে এরকম: প্রথমদিন যাত্রা শুরু, দ্বিতীয়দিন শিলিগুড়ি থেকে সামসিং বা সুনতালেখোলা, সেখানে রাত্রিবাস । তৃতীয়দিন গরুমারা, চালসা বা লাটাগুড়িতে রাত্রিবাস । চতুর্থদিনও তাই । জায়গা পেলে কেউ থাকতে পারেন মূর্তি বনবাংলোতেও, জীবন সার্থক হয়ে যাবে । পঞ্চমদিন চাপড়ামারি দেখে চলে যাওয়া উচিত ঝালং হয়ে বিন্দু । পঞ্চমদিন বিন্দুতে রাত্রিবাস । ষষ্ঠদিন ফেরার পথে রাত্রিবাস ঝালং-এ । সপ্তমদিন ঝালং থেকে শিলিগুড়ি হয়ে অষ্টমদিনে কলকাতায় ফেরা । সবক্ষেত্রেই একটা কি দুটো দিন ছেঁটে ফেলার সুযোগ আছে ।

শিলিগুড়ি থেকে সেবক রোড, করোনেশন ব্রিজ, মংপং, ডামডিম, মালবাজার হয়ে চালসা পর্যন্ত যেতেই হবে। শিলিগুড়ি থেকে চালসার দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। চালসা হয়ে কেউ কেউ চলে যেতে পারেন গরুমারা বা লাটাগুড়ি। যাঁরা সামসিং যাবেন, তাঁদের চলে যেতে হবে অন্য রাস্তায়। চালসা হিলটপে সিনক্লেয়ার্স রিসর্টকে পাশে ফেলে মেটেলি হয়ে সামসিংয়ের রাস্তা। শিলিগুড়ি থেকে রোজ বাস ছাড়ছে সামসিংয়ের। বিধান রোডের ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে। সকাল সাতটায়, দুপুর দুটোয়। দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। বাসে চার, গাড়িপথে তিনঘণ্টা।

সামসিং-সুনতালেখোলা

যে রাস্তা দিয়ে চালসা হিলটপে এসে পৌঁছেছি, সেই রাস্তা ধরেই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে পড়বে মেটেলি। দুপাশে অপূর্ব সব চা-বাগান-ইনডং, থার্বো। মেটেলিতে চা খেয়ে উঠুন সামসিং। পাহাড় কেটে পাকদণ্ডী রাস্তা। বিকেলের মরা রোদে একটু যেন হিমেল হাওয়া। সামসিং বনবাংলোর অবস্থান দুর্দান্ত। চারদিকে লোমশ ভালুকের মতো পথজুড়ে পাহাড়। ওপাশের পাহাড়ে রোদ পড়েছে, দেখে একটাই কথা মনে হচ্ছে-'হাউ গ্রিন ইজ মাই ভ্যালি।' সঙ্গে চলেছে মূর্তি নদী। বনবাংলো ছাড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে একটা খোলা জায়গা। ওখানে এখন রোপওয়ে করে মৌচুকি থেকে কাঠ আসে। মৌচুকি পর্যন্ত যাওয়ার উপায় ট্রেকিং। শুনেছি সে নাকি এক রূপকথার জঙ্গল। নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের একটা অংশ পড়েছে এখানে। বেশ কিছুটা গড়াড়িয়ে নেমে একটা পাথরসঙ্কুল পাহাড়ি নদী। তারই পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'সুনতালেখোলা ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প।' বেশ ঘন জঙ্গল, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগবে। গেট দিয়ে ঢুকে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি কাঠের কটেজ। একটা ছাতার তলায় গোল হয়ে বসে কয়েকটি কলেজের ছেলেমেয়ে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে, পৃথিবীর এক কিনারে, পাহাড়ের কোলে নদীর বেষ্টনে ঘিরে রাখা নিরালা জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলতে হবে তৎক্ষণাৎ। শিলিগুড়ি থেকে সামসিং পর্যন্ত তো বাসই আসছে, তারপর ২ কিলোমিটার অরণ্যপথে হাঁটা। অজস্র পাখির কলতান আর নদীর প্রবহমানতার গান ছাড়া যেখানে কোনও শব্দ নেই। অরূপরাজ্যে একটা রাত কাটাতেই হবে, দুরাত কাটাতে পারলে আরও ভালো। এখান থেকে ফেরার পথে দেখেছি সন্ধে নেমে এলো, কিন্তু অন্ধকার নয়। প্রায় পূর্ণপ্রকাশিত চাঁদের আলোয় ভাসছে পাহাড়, চা-বাগান। সামসিং বনবাংলোও ভারি চমৎকার। চারদিকে পাহাড়। বুনো জন্তুর জন্য চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। বুকিং পেলে একটা রাত এই স্বপ্ন-আবাসে কাটানোও উচিত হবে।

চুকচুকি

সুনতালেখোলা থেকে চালসা ফিরতে ১৬ কিলোমিটার। পরদিন থাকতে হবে গরুমারা বা লাটাগুড়ি। গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক আর চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি দেখতে হলে ডে-ভিজিট পাস নিতে হয় লাটাগুড়ি থেকে। লাটাগুড়িতেই আছে গরুমারা প্রকৃতি পরিচয় কেন্দ্র বা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। সেখান থেকে ইস্যু করা হয় এই ডে-ভিজিট পাস। গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে ঢোকার রাস্তাও বাঁয়ে রেখে গাড়ি ছুটবে, আলো-ফুটি-ফুটি ভোরে দুপাশে জঙ্গলের মহীরুহদের দেখে কিছুটা আঁচ পাবেন অন্দরমহল কীরকম আদিম। লাটাগুড়ি পৌঁছে দেখি গাড়ির মেলা। হতাশ হতে হল। আমরা পৌঁছেছি পৌনে ৬টায়। তখন ৬টা থেকে ৮টার শিফটে ঢোকার পাস তো নেই-ই, ৮টা থেকে ১০টার সেকেন্ড শিফটেরও পাস নেই। বিষণ্ণমনে ফিরছি। অদূরেই দেখি রেঞ্জ অফিস। যা থাকে কপালে, সেই ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে রেঞ্জ অফিসারকে অনুরোধ করি, কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। অমায়িক ভদ্রলোক গরুমারা রেঞ্জের অফিসার বিমল দেবনাথ। বললেন, 'আলাদা বা স্পেশ্যাল পারমিশন দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আপনারা 'ভ্রমণ'-এর লেখক, ফটোগ্রাফার-জঙ্গল দেখাবার কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হয়। এক কাজ করুন। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন। আমি তৈরি হয়ে রাউন্ডে যাব। আপনারা আমার সঙ্গে, আমার জিপে চড়ে জঙ্গলে যাবেন।' আর আমাদের পায় কে! এ তো মণিকাঞ্চন যোগ! রেঞ্জ অফিসারের জিপ লাটাগুড়ি পেরিয়ে গিয়ে আরেকটা জায়গা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। এখানে হয়েছে একটা নতুন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র-চুকচুকি। জিপে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ডরাও আছেন। চুকচুকি ওয়াচ টাওয়ারের সামনে প্রথম জিপ থামল। এবছর ১০ অক্টোবর উদ্বোধন হয়েছে এই ওয়াচ টাওয়ারের। কাঠের তৈরি চমৎকার প্যাগোডা-টাইপ ওয়াচ-টাওয়ার। বাইরেটা সবুজ, ভেতরটা উড-গ্লো। তিনতলা সমান উঁচু চুকচুকি পক্ষী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। সামনেই একটা সরু ফিতের মতো জলাশয়। তার পাশে ঘাসভূমি, শুনলাম 'সল্ট লিক'ও করা হয়েছে যাতে জানোয়াররা নুন চাটতে আসে। 'পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসে, একটু এগিয়ে যান, কিছু পাখি এসেছে, দেখতে পাবেন,' বললেন বিমলবাবু। বেশ সুন্দর পায়ে চলা রাস্তা ওয়াচ টাওয়ারের ডানপাশে। সামান্য এগিয়ে বেঞ্চ। বসে বসেই দেখা গেল বেশ কিছু পানকৌড়ি। তাদের ওপাশে আরেকটা ঝাঁক। এসে গেছে হুইসলিং টিল। হিমালয় থেকে সরালের ঝাঁকই প্রথম নেমে আসে। শীতে নিশ্চয় আরও পাখি আসবে। উল্টোদিকের সল্ট লিকে নুন চাটতে আসবে হরিণ, বাইসন, গণ্ডার। একটু অভ্যস্ত হতে হবে তাদের। মাছরাঙা প্রচুর। নীল ঝলক ঝিকিয়ে উঠছে রোদ্দুরে।

চুকচুকি পক্ষী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রকে ভালোবেসে ফেলতেই হবে । প্রথম দর্শনেই প্রেম । গরাতি এখন বন্ধ আছে ।

যাত্রাপ্রসাদ

চুকচুকি থেকে রেঞ্জারের জিপে চড়ে এলাম গরুমারা বনবাংলো । বাংলোর সামনেই রাইনো পয়েন্ট । সামনে ঘোলা জলে লাল ইনডং নদী । উল্টোদিকে ঘাসভূমি । বিশাল সমতল ঘাসভূমি গণ্ডার, বাইসনদের প্রিয় রম্যভূমি । পাকিডার্ম-রা এরকম জায়গাই ভালোবাসে । রাইনো পয়েন্ট থেকে যাত্রাপ্রসাদে ।

যাত্রাপ্রসাদে বসে চোখ ভরে যাবে । উল্টোদিকে অদ্ভুতভাবে যেন বাতাসিয়া লুপের মতো বেন্ড নিয়েছে মূর্তি নদী । তার ওপাশে বিস্তীর্ণ ঘাসভূমি । এখানে সকাল ৬টার ট্রিপে এলে প্রায়শই একশৃঙ্গী গণ্ডার দেখা যায় । অপূর্ব, মায়াবী এই বনাঞ্চল । রোদ্দুর ঝিমঝিম করছে । দূরের পাহাড় যেন মায়ার আবেশে সবেষ্টনে ঘিরে রেখেছে এই সবুজ বনাঞ্চলকে । কোথাও কোনও শব্দ নেই । সবকটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে রাখুন । ভুলেও ধূমপান করবেন না । যখন-তখন তাঁরা দেখা দিতে পারেন । বাইসন, গণ্ডার, হাতি-পাকিডার্মদের দলবল । নিঃশব্দ বনভূমি, নিস্তব্ধ নদী । হঠাৎই ঠিক ডানদিকে গাছের ওপর দূরবীনে ধরা পড়ল একটি শ্যেনপক্ষী । শ্যেনদৃষ্টিতে সে বহতা জলের দিকে নজর রাখছে । অর্জুনের পাখির চোখ দেখার মতোই এই শ্যেনপক্ষী জলে মাছের আনাগোনা দেখছে । তুলবে একটাকে । ভালো করে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল ক্রেস্টেড সারপেন্ট ঈগল ।

গরুমারা জঙ্গলের মধ্যে তো গাড়িতে ঘুরতে ভেতরে চোখ চলে না! সবুজ মহীরুহরা জঙ্গল আঁধার করে নিথর দাঁড়িয়ে । আকাশছোঁয়া শাল-সেগুনের সমাহার । মধ্যে এত বেশি ঘন আন্ডারগ্রোথ বা স্ট্রে ভেজিটেশন, যে চোখ চলে না । কাজেই চুকচুকি, রাইনো পয়েন্ট আর যাত্রাপ্রসাদ-এই তিন ওয়াচ টাওয়ারে এসেই শুধু দেখা যাবে প্রসারিত বনভূমি, প্রশস্ত আকাশ । সম্ভব হলে একটা গোটা দিন-সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত-চুপ করে বসে থাকুন যাত্রাপ্রসাদে । বন্যজন্তু দর্শন না-ই বা হল, প্রকৃতিই তো বনলক্ষ্মীর ডালা ভরে রেখেছে । নদীর ওই অসম্ভব বাঁক ভাবা যায় না! যাত্রাপ্রসাদের পাশেই একটা গাছে বনবিভাগের সতর্কবাণী-‘এই স্থান অতিক্রম করে পর্যটকরা ভেতরে ঢুকবেন না ।’ আকাশছোঁয়া মহীরুহ-ঘেরা জঙ্গলে আর পায়ে হেঁটে ঢোকা হল না । রেঞ্জার সাহেব আমাদের যাত্রাপ্রসাদে রেখে বন্দুকধারী বনকর্মীদের নিয়ে ভেতরে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন । ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পর । তখনও শ্যেনপক্ষী বসে । উনিও আমাদের সঙ্গে

একমত হলেন পাখিটি ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগলই । বললেন, 'বাব্বা! ভেতরে গিয়েই আমরা একশৃঙ্গীর মুখোমুখি!'

ফেরার পথে হঠাৎ দেখা রাজ বসুর সঙ্গে । হেল্প ট্যুরিজমের সর্বজনপ্রিয় কর্ণধার । 'ভ্রমণ'-অনুরাগী রাজ বলল, 'চলো আমাদের ক্যাম্পে । ট্রাইবাল ড্যান্স দেখাব ।' ওর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম । গরুমারা-চালসার মাঝামাঝি গরুমারা জাঙ্গল ক্যাম্প করেছে হেল্প । সেটা ছাড়িয়ে একটা ওরাওঁ গ্রামে । চার্চ-সংলগ্ন মাঠে আদিবাসীদের নাচের আয়োজন । সেখানে এক চমক । দেখি সুচিত্রা মিত্র বসে । প্রবাদপ্রতিম এই রবীন্দ্রগায়িকা ওরাওঁ শিল্পীদের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গেয়ে শোনাচ্ছেন । 'ভ্রমণ' থেকে এসেছি শুনে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত । চিরপরিচিত মন্দ্র গলায় বললেন, 'চমৎকার কাগজ । দারুণ মানুষ তোমাদের সম্পাদক । আমার ছোট ভায়ের মতো । এতো সুন্দর কাগজ করেছেন, ভাবাই যায় না ।' আমরাও উদ্বেলিত । ট্রাইবাল-ড্যান্স হল, ওরাওঁ শিল্পীরা নাচলেন-গাইলেন । সুচিত্রা মিত্রের উদাত্ত গলায় 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' শুনতে শুনতে গরুমারা ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল মধুরেণ সমাপয়েৎ-এ ।

পাখির রাজ্য চাপড়ামারি

গরুমারা থেকে চালসা হয়ে চাপড়ামারি যাওয়া যায় । কিন্তু কখনও তা করবেন না । নিজস্ব যান ভাড়া করে যেতে হবে মূর্তি, খুনিয়া মোড় হয়ে । গরুমারা থেকে চালসা ফেরার পথে বেশ কিছুদূর এসে ডানদিকে চলে গেছে মূর্তি-র রাস্তা । সেই রাস্তা ধরে সামান্য এগোলেই মূর্তি বনবাংলো । রিভারবেডে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো নুড়ি-পাথর । তারপর প্রবহমান ফেনায়িত স্রোতস্বিনী । চারদিক জঙ্গল-পাহাড়ে ঢাকা । মূর্তি নদীর ওপর একটা সেতু । তার ওপাশে ঘন জঙ্গল । নদীর তীরে দাঁড়িয়ে হু-শ করে কেটে যায় সময় । বাংলোর ব্যালকনিতে বসে থাকতে পারলে তো অর্ধেক নয়, পূর্ণ রাজত্ব । সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত-মূর্তি থেকে দুটোই দেখবার জিনিস । পূর্বরাগ বা অস্তরাগের খুনখারাপি রঙে রাঙানো আকাশ, জলে সেই লাল সিঁদুরখেলার প্রতিফলন, চারদিকের ঘনসবুজ পাহাড়-জঙ্গল-সব মিলিয়ে মূর্তি যেন স্ব-মহিমায় স্বমূর্ত । বাংলো-বুকিং না মিললেও একটা ডে-স্পেন্ড করে যাওয়া উচিত হবে এইখানে । সকালে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উড়তে থাকে টিয়া-চন্দনার ঝাঁক, নদীর বুকে দেখা মিলতে পারে দুয়েকটি রিভার-টার্ন-এর । প্রচুর পাখি এ জঙ্গলে । তেমনই তাদের সমস্বর কলকাকলি । ব্রিজ থেকে দাঁড়িয়ে নদীর বাঁক দেখতে দেখতে ক্যামেরাধারীদের হাত নিশপিশ করবেই । ব্রিজের ওপাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল । সেই জঙ্গল

চিরে গাড়ি ছুটবে । এ জঙ্গলেই আমরা দেখলাম হলুদ রঙের বাঁকানো ঠোঁটের তিনটি ধনেশ পাখি । ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দেখতে পারেন আপনারাও ।

গরুমারার জঙ্গল ভয় উদ্রেককারী । মূর্তির জঙ্গল রহস্যময় । কেউ যেন সবুজ কাজল পরিয়ে দিল চোখে । দুপাশে রূপসী জঙ্গল, পথচিরে পিচরাস্তা । জঙ্গলে জঙ্গলে পথ পেরিয়ে খুনিয়া মোড় হয়ে আবার জঙ্গলে । এই জঙ্গল চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির ফ্রিনজ এরিয়া । বেশ কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে চাপড়ামারির রাস্তা । চাপড়ামারিতে ভিউ পয়েন্ট একটাই আর সেটা ঠিক বনবাংলোর সামনে । গরুমারার মতোই ছিমছাম দোতলা বনবাংলো । তার কম্পাউন্ডে বসে থাকতে হবে । বসে দেখতে হবে সামনে অনতিদূরে একটি ওয়াটার-হোল । পাশে স্যালাইন ট্রেল । ওখানেই নুন চাটতে, জল খেতে জানোয়ারের আনাগোনা ।

বনবাংলোর চৌহদ্দিটি বেশ । চমৎকার কেয়ারি করা বাগান । নানা সুদৃশ্য গাছ মাটিতে, টবেও । জঙ্গলের গহনে এই বাংলোর অবস্থান । চতুর্দিকে অসম্ভব ঘন অরণ্য এবং সেখানে পর্যটকের প্রবেশ নিষেধ । পাখিদের স্বর্গরাজ্য বোধহয় চাপড়ামারি । ওয়াটার-হোলের আশপাশে গলা উঁচু করে বসে আছে অনেক লার্জ ইগ্রেট । তাই বলে শুধু বকের কলোনিই নয়, চতুর্দিকে উঁচু গাছে গাছে নানারকমের পাখি ডাকছে । ডাক না বলে গানই বলা ভালো । মিষ্টি শিসেলা গান । ফরফর করে উড়ে এ-গাছ সে-গাছ করছে জাঙ্গল ব্যাবলারের দল । টিয়ার ঝাঁকও দেখতে পাবেন । ভাগ্য ভালো ছিল তাই দুটো গ্রিন পিজিয়ন (হরিয়াল) দেখতে পেলাম । চৌকিদার জানাল, কাল রাতে ওয়াটার-হোলে গণ্ডার এসেছিল । শুনশান, নিস্তব্ধ এক আদিম জঙ্গল ছেড়ে এগিয়ে চলুন ঝালংয়ের দিকে ।

দেশ যেখানে শেষ

চাপড়ামারি থেকে ঝালং যাওয়ার রাস্তাটা একদম আলাদা । মংপং-ডামডিম-মাল-চালসা-গরুমারা-লাটাগুড়ি, চেনা ডুয়ার্সের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই । দুপাশে জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা । মাঝেমধ্যে ছোট ছোট গোর্খা গ্রাম । দেশলাই বাক্সের মতো ছোট ছোট ঘরবাড়ি । যত ছোট বাড়িই হোক, বাড়ির সামনে একচিলতে বাগান । সেখানে রকমারি রংবাহারি ফুল ।

গাঁদা-জবায় বেশিরভাগই উজ্জ্বল লাল-হলুদ জার্সি । আরও নানারকম, নানা রঙের লতানো গাছ, ফুলের জলসা । এইসব সাতসতেরো দেখতে দেখতে হঠাৎ গাড়ি উঠবে পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে অনেক ওপরে । পাহাড়ের প্রায় মাথায় উঠে গাড়ি থামল । এখান থেকে অনেক নিচে স্পষ্ট দেখা যায় ঝালং উপত্যকা । ওই স্থানে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ । সবুজ

উপত্যকার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে জলঢাকা নদী । বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মকাণ্ডের পাশে পিকচার-পোস্টকার্ডের মতো একটুকরো পাহাড়ি জনপদ-ঝালং, নদীর ওপারেই ভুটান । জলঢাকা নদীই সীমান্তনির্দেশ, দেশ এখানে শেষ । চোখজুড়োনো সবুজে মনরাঙানো সুন্দর । এখানে, এই হিলটপে একটা রিসর্ট হলে জমে যাবে । গাড়ি আবার গড়্গড়িয়ে নামল । অসম্ভব বর্ণময় ঝালং বনবাংলো । ঘর মাত্র দুটি । দৈনিক ভাড়া ৪০০ টাকা । কিন্তু বাংলোর সন্নিহিত বাগানটা দেখবার মতো । লাল, নীল, হলুদ, সাদা জানা-অজানা ফুল । সবুজ, মেরুন-নানারঙের পাতাবাহারি গাছ । বাংলোর ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাথরভরা এক নৃত্যপর নদী, নাম তার রংবু । নদীর কলতানে, নদীর নাচ-গানে ঘুম ভাঙানোর, ঘুম পাড়ানোর মূর্ছনা ।

ছোট্ট দোকানে মোমো আর চা খেয়ে নিজের খুশিমতো ঘুরে বেড়ানো যাবে এদিক-সেদিক । শহরটা ছোট আর ঘিঞ্জি । আশপাশে ঘোরাঘুরি করাই ভালো । জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ দেখে কেউ ফিরে যাবেন, কেউ দুদণ্ড বিশ্রাম নেবেন নদীতীরে । যাঁর বুকিং আছে তিনি থাকবেন । ঝালং থেকে আবার একটা পাহাড়ে ১৮ কিলোমিটার চড়াই উঠে বিন্দু । মধ্যিখানে পড়ে প্যারেন নামে খুব সুন্দর একটা জায়গা । জলঢাকা নদীর ওপারে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে । ওসব ভুটানের, ভারতের নয় । দেশের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন আপনি । এখানে যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের কালো ছায়াও নেই । এত সুন্দর এই পৃথিবী, এত সবুজ এই উপত্যকা, এত অতিথি-বৎসল হাস্যমুখ রংবেরঙের পোশাক পরা মানুষজন-তবুও মানুষ যুদ্ধ করে?

ভ্রমণ ডিসেম্বর, ২০০১

পার্বতী উপত্যকায় সার পাস

বিদ্যুৎ দে

হিমাচলে পার্বতী উপত্যকায় সার পাসের লক্ষ্যে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম এবছরের জুন মাসে । সার-এর অর্থ কুণ্ড বা তালাও । পাস গিরিবর্ত্ম । এই ১৩,৮০০ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ২৭০ ডিগ্রি কোণ জুড়ে দেখা যায় বরফাবৃত পর্বতমালা । এপথের একেক দিনের সৌন্দর্য একেক রকম । বৈচিত্রময় সুন্দরের আকর্ষণে চেপে বসেছিলাম হিমগিরি এক্সপ্রেসে । প্রায় বত্রিশ ঘণ্টার রেল সফর শেষে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট । ৩০০০ টাকার চুক্তি টাটা সুমোর সঙ্গে । পৌঁছে দেবে ৩৮৪ কিলোমিটার দূরের কাসোলে । জেলা সদর কুলুর ১০ কিলোমিটার আগে ভুন্টার । বিপাশা নদীর সঙ্গ ছেড়ে পথ ডাইনে । এবার পার্বতী নদীর ধারে ধারে পথ । শিখ তীর্থক্ষেত্র মণিকরণের ৪ কিলোমিটার আগে কাসোল গ্রামে পৌঁছলাম প্রায় রাত নটায় ।

খরব পেলাম অতিরিক্ত তুষারপাত ও ঝোড়ো আবহাওয়ার জন্য একটি দল সার পাস অতিক্রম করতে না পেরে ফিরে এসেছে আজ । সারা রাতের অবিরাম বৃষ্টি দুশ্চিন্তা বাড়াল । এই ৫২০০ ফুট উচ্চতায় বৃষ্টি মানেই অধিক উচ্চতায় তুষারপাত । তখন ক্যাম্প খাড়া রাখাই মুশকিল । নতুন বরফে পাস দুর্গমতর হবে । আরও চিন্তার কারণ আমাদের দলে আছে পঞ্চাশোর্ধ্ব যুবা, মহিলা ও পাহাড়ে প্রথম এমন পর্বতপ্রেমী ।

পরদিন সকাল । অবিশ্রান্ত বর্ষণে সব কিছু যেন ঘষা কাচের আড়ালে । পার্বতীর গর্জন আর ফুঁসে ওঠা স্রোত ভয়ঙ্কর । পলি শিটের মোড়কে হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে দুরু দুরু বুকে পা বাড়ালাম পথে ।

গন্তব্য এপথের অন্তিম গ্রাম গ্রহণ । উচ্চতা ৭৭০০ ফুট । দূরত্ব মাত্র ৯ কিলোমিটার । বাসরাস্তা ছেড়ে গ্রহণ নালা পার হয়ে এগিয়ে চলি । আজ আর কাছছাড়া হবে না এই সুন্দর নালাটা । কিন্তু যে শীর্ণকায় গ্রহণ নালা সুবোধ বালকের মতো পার্বতীর বুকে আশ্রয় নিয়েছে এই কাসোলেই, তার আজ এ কী উদ্দামতা । যেন পার্বতীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে চাইছে । পাহাড় ধোয়া জলে তার স্বচ্ছ জল কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত । উৎপাটিত বৃক্ষকে অবহেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । বোল্ডারকে গড়িয়ে নিয়ে চলেছে তীব্র স্রোত । মামুলি এক নালার এ প্রলয়নৃত্য সত্যি দুর্লভ । শুধু তাই নয় অসাধারণ রংবেরঙের ঝরনাধারা এ

নালার সঙ্গীসাথী। একটি শীর্ণ জলপ্রপাত প্রায় কয়েকশো ফুট উচ্চতা থেকে দীর্ঘ ওড়নার মতো নেমে এসেছে পাহাড়ের সবুজ কালো গা বেয়ে। দুপাশে পাইন দেওদারের গহীন অরণ্য বর্ষার মেঘ মেখে কেমন এক আবছা জগৎ সৃষ্টি করেছে। এ অভয়ারণ্যের নাম কানাওয়ার। কস্তুরী মৃগ, পাহাড়ি ছাগল, কালো ভালুক ইত্যাদির অভয় আশ্রয়। মোনাল, ফেজ্যান্ট ইত্যাদি পাখিরা ছাড়াও আছে নানারকমের ফুল ও প্রজাপতি। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বর্ণময় স্নেক লিলি ও ঘিয়ে রঙের নাগমণি। ঠিক যেন সাপের ফণা। কখনও পথের দুপাশে খাড়া রুক্ষ পাহাড়ের পাঁচিল। আবার বাঁকের প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশ। দূরে সারিবদ্ধ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধোঁয়ার মতো মেঘেরা হামাগুড়ি দেয়। কোথাও একফালি সবুজ তৃণক্ষেত্র। সেখানে মস, ফার্ন ও আগাছার দখলে চলে যাওয়া ভগ্নপ্রায় কাঠের ঘর। যেন ডাইনি বুড়ির গোপন ডেরা। তারপর যব, গম, ভুট্টার আলবাঁধা ধাপ ধাপ জমি। মাত্র সাড়ে তিনঘণ্টায় এসে পড়ি গ্রহণ গ্রামের মুঠির মধ্যে।

খান চল্লিশেক ঘরের ছোট্ট গ্রাম। কাঠের বরগা ও পাথরের স্তর সাজিয়ে দেওয়াল। স্লেট পাথরের ঢালু চাল। দু-তিনতলা বাড়ির তিনদিক মোড়া প্রশস্ত ঝোলা বারান্দা। হাতে টানা তাঁতে চাদর ও কার্পেট বোনার সরঞ্জাম। অদূরে ছোট্ট সুন্দর চারচালা মন্দির। চারপাশ গভীর সবুজ পাহাড় দিয়ে মোড়া। গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহজ সরল বন্ধুত্ব ও আতিথ্যলাভ। রাতে হিমাচলি লোকসঙ্গীত ও নৃত্য।

আবার দুঃসংবাদ রেডিওর খবরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কিন্নর ও গাড়োয়ালের বহু স্থানে। এদিকে পরবর্তী ক্যাম্পে যাবার পুল জলের তোড়ে ভেসে গেছে। বিকেলে বৃষ্টিটা থেমেছিল হয়তো দম নেবার জন্য। রাতে আবার শুরু হল।

পরদিন উপনিষদের মন্ত্রোচ্চারণে ঘুম ভাঙল। এক সদস্য উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন। আমরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ি ঝলমলে রোদ্দুরে। খবর আসে নালার ওপর গাছের গুঁড়ি পাতা গেছে। তাড়াতাড়ি গোছগাছ ও খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ি পথে। আজকের লক্ষ্য বরাথাচ। উচ্চতা ৮৯০০ ফুট। দূরত্ব ১০ কিলোমিটার।

গ্রামকে বিদায় জানিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে ছোট্ট একটা ঝোরা পার হলাম পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। নালার উঁচু পাড়ে বনবিভাগের সাদামাটা বাংলো। বাঁপাশে খাড়া পাহাড়ের ঢাল উঠে গেছে অনেক ওপরে। ডাইনে হলুদ-সবুজ খেতজমি। তারও পরে গ্রহণ নালার গভীর খাত। ওপারের পাহাড় কালচে সবুজ আর ঘন নীলে মাখামাখি। ধোঁয়ার মতো মেঘেরা বসে আছে পাহাড়ের গায়ে। একটু এগোতেই জমির সীমানা শেষ। আর কোনও মানুষের দেখা পাওয়া যাবে না এপথে। একমাত্র যাযাবর পশুপালক হয়তো মিলতে পারে। ঠিকানাবিহীন সুন্দরের দেশের প্রবেশদ্বারে লাল রঙের ফুলের তোরণ আমাদের স্বাগত

জানায় । গোলাপের গন্ধভরা বাতাস । পথের ওপর, পাহাড়ের ঢালে কত অসংখ্য ছোট ছোট ফুল । এই বৃষ্টি শেষের ঝলমলে রোদে সবকিছু ঝকঝক করছে ।

গ্রহণ নালার ধার বরাবর চড়াই উৎরাই পথ । কোথাও দুপাশে খাড়া পাহাড় । পথ ক্রমশ সরু হতে থাকে । একটা বাঁকের পর দেখি পথরেখা পাথরের ফাটলে গিয়ে মিশেছে । তাতে জুতোর ইঞ্চি দুয়েক ধরতে পারে কোনওরকমে । নিচে নালার তীব্র স্রোত । প্রায় ফুট পঞ্চাশেক বিপজ্জনক অংশ সাবধানে পার হয়ে আসি । কানে আসে প্রবল গর্জন । পাহাড়ের ফাঁকে জলীয় বাষ্পের ধূমরাশি । একটা ছোট্ট হালকা রামধনু ভেসে আছে শূন্যে । একটু এগোতেই জলপ্রপাতের পূর্ণ রূপ ধরা দেয় ।

প্রায় তিরিশ ফুট উচ্চতা থেকে বিপুল জলরাশি সমন্তরাল পথে সবেগে আছড়ে পড়ছে নিচে । প্রখর সূর্যালোকে তার রং দুধের মতো সাদা । নিচের কুণ্ডের জল যেন টগবগ করে ফুটছে । তার জলবিন্দু উড়ে আসে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মতো । বাঁয়ে হেলানো বোল্ডার । ঠিক যেন এক দৈত্যের মাথার খুলি । পাশে বেতাল গুহার প্রবেশদ্বার । ভেতরে বালির গদিপাতা বিছানা । অনায়াসে দশজনের আস্তানা হতে পারে । তবে কতটা নিরাপদ তা জানা নেই ।

পায়ে পায়ে প্রপাতের শীর্ষে । বুনো আগাছার ঝোপ পার হয়ে নতুন গাছ পাতা পুল । দুটি গুঁড়ির মধ্যে পাথরের স্ল্যাব পাতা । মিনিট পনেরো বাদেই আরেক ভয়ঙ্কর প্রপাতের মুখোমুখি । ঠাস বুনোট সবুজের ফাঁক দিয়ে তার যতটুকু অবয়ব চোখে পড়ছে তা প্রায় একশো ফুটের মতো । দৃষ্টির আড়ালে আরও কতটা আছে কে জানে । সে প্রপাতের দুটি ধারা । একটি নেমেছে ডাইনের সবুজ ফুঁড়ে । অন্যটি গুহার অন্দর থেকে । গুহার পিঠ যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক কাছিমের খোল । গুহার অন্ধকারে আরও একটা ছোট্ট প্রপাত । এ দুই সম্মিলিত ধারা নেমেছে অর্ধবৃত্তাকার খাড়া পথে । স্তর স্তর পাথরের ভাঁজে সমান্তরাল দাগ । প্রপাতের বুকে খয়েরি একজোড়া পাখি ওড়াওড়ি করে । এমন অপূর্ব জলপ্রপাতের জন্য হাজার মাইলও পার হওয়া যায় অনায়াসে ।

প্রপাতের শব্দ পিছনে ফেলে হালকা চড়াই । সামনে ত্রিভুজাকৃতি ঢাল, ঘন ঝোপঝাড় । শীর্ষদেশে নীল আকাশ । আঁকাবাঁকা পথে উঠে যাওয়া । হঠাৎ বাঁদিকে মোচড় খেয়ে একটা চড়াই বেয়ে পথ যেখানে পৌঁছে দিল সে ভারি অদ্ভুত স্থান । ঠিক যেন এক নাকের প্রান্তভাগ । গিরিশিরার ঢাল এখানে শেষ । তারপর অতল খাদ । অন্যপাশ দিয়ে বরাবর নেমে চলি । উৎরাই গিয়ে পড়ে এক জোড়া ঝোরার সঙ্গমের বুকে । আশ মিটিয়ে স্নান । প্যাকেট লাঞ্চ সাবাড় । ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে । দ্রুত পায়ে পাহাড় ভাঙি । সূর্যের স্পর্শ না পাওয়া এক অরণ্যের মধ্যে পাইন দেওদার বৃক্ষেরা বয়সের ভারে ভূমিশয্যা নিয়েছে ।

গুঁড়ির কাঠ ঝুরো বালির মতো খসে পড়ে। চড়াইয়ের প্রান্তে দেখি ঝলমলে নীল আকাশ। বিকেলের সোনা রোদ মাখা বরাথাচের প্রান্তরে এসে পড়ি মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে।

ঝোলাঝুলি রেখে স্যুপের মগ হাতে বসি ঝুলন্ত পাথরের টেবিলের ওপর। নিচে অনামী ঝোরা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক টুকরো বরফাবৃত শৃঙ্গ। সূর্যাস্তের রঙে সোনালি। সামনে আড়াল করা রুক্ষ বাদামি পাহাড়। খাঁজে খাঁজে হিমবাহের ঢাল। নিচের ঘন সবুজের মধ্যে টুকরো টুকরো জলপ্রপাত। সেই ধারাই নেমে এসেছে এখানে। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে। কিন্তু স্তর স্তর মেঘের ফাঁকে সূর্যরশ্মির অপূর্ব বিচ্ছুরণ। ওপরের স্তরের মেঘ তরল লোহার মতো লাল। নিচের মেঘ অন্ধকার। সাড়ে সাতটায় সন্ধে নামে। ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত ধেয়ে আসে পাহাড়ের ফাঁক বেয়ে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে তাঁবুর অন্দরে।

পদযাত্রার তৃতীয় সকাল। ঝলমলে রোদ, নীল আকাশে পেঁজা তুলোর স্তূপ ভাসে। বরাথাচের পিছনের ঘন জঙ্গলে খাড়া পাহাড়ের মধ্যে পথরেখা ঢুকে পড়েছে। টানা চড়াই। পাহাড়ের বুক বেয়ে শুধুই ওপরে ওঠা। দৃষ্টি রোধ করা ঘন জঙ্গল। তার ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে সরু ঝরনা আর টুকরো টুকরো হিমবাহ চোখে পড়ে। তাই দেখে বুঝতে পারি কতটা উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। চড়াইয়ের তীব্রতায় মন বাঁধা পড়ে থাকে পরবর্তী পা রাখার লক্ষ্যে। একটা পাহাড় ডিঙিয়ে আবার একটা। এভাবে প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা পর বিশাল এক সবুজ প্রান্তর। অসংখ্য ফুলের সমারোহ। চারপাশে ছড়ানো ছেটানো বোল্ডার আর ছোট বড় টিলা। তারই একটায় একদল পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া রাজসিক মেজাজে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমরাও বসে পড়ি জলখাবার নিয়ে।

দূরে খাদের ওপারে ধূসর আবছা পাহাড়। ডাইনে এ পাহাড়ের নিচ থেকে উঠে আসা পাইনের বন। যেন অসংখ্য আকাশমুখি বর্শা। পিছনের পাহাড়ের ঢালে তাদের সীমানা শেষ। গুল্মঝোপের পর তৃণভূমির ঢাল। সেখানে সরু সুতোর মতো পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে রুক্ষ পাহাড় চূড়ায়। ওপারেই আমাদের উচ্চতম ক্যাম্প নাগারু। ঠিক সার পাসের নিচে। বাঁয়ের পাহাড়ের পিছন দিয়ে যমদূতের মতো কালো মেঘ উঠে আসে। তার তাড়ায় দৌড়েও নিস্তার পাই না। প্রবল ধারাপাত পলিশিটের ওপর। সাবুদানার মতো বরফ পড়ে। পথের দখল নেয় জলধারা। সহজ রাস্তা হয়ে ওঠে দুর্গম। এভাবে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটানা আধঘণ্টা চড়াই ভেঙে উঠে এলাম এক বৃত্তাকার সমতলে। বৃষ্টি কমলেও ঘন সাদা ধোঁয়ায় সবকিছু আবছা।

একঘণ্টা মেঘের ঘেরাটোপে বন্দী থাকার পর ঝলমলে রোদে সবকিছু পরিষ্কার। ভেসে ওঠে অপূর্ব নিসর্গ। প্রায় বৃত্তাকার মিংথাচের অর্ধেকটা ঘিরে পাহাড়ের সুষম ঢাল।

বেঁটেখাটো পাইন দেওদার। ওপরের রুক্ষ পাথরের ফাঁকে বরফের ছেঁড়া স্তর। তার পিছনে উঁকি দিচ্ছে স্থায়ী বরফে মোড়া ধরাথাচ পর্বতচূড়া। ঠিক এর উল্টোপিঠ স্পর্শ করে আছে সার পাসকে। মিংথাচের অপর অংশে খাদ নেমে গেছে গভীর জঙ্গলে। প্রায় আধ কিলোমিটার ব্যাসের এই প্রায় সমতল তৃণক্ষেত্রের বুক জুড়ে রংবেরঙের ফুলের আসর। সরু সরু নালার আলপনা। কোনও নালার জলের রং তামাটে, পাথরেও তার আস্তরণ। আকরিক বাহিত জলের জন্যই হয়তো। অদূরে একটা ঢিবির ওপর বসি। নানা পাখির সুরেলা ডাক। দূরে অথচ স্পষ্ট। ছড়িয়ে থাকা মরা গাছের কঙ্কালে অপূর্ব সব ভাস্কর্য।

অভিযানের চতুর্থ সকাল। নির্মল আকাশ। পূর্বদিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে এলাম শীর্ষে। ডাইনের গিরিশিরা বেয়ে ওপরে উঠি। রজতশুভ্র গিরিশিখরেরা প্রকাশিত হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর গিরিশিরা মিশে যায় আরেক পাহাড়ের বুকে। আর কোনও গাছপালা নেই। নেই লতাগুল্মের ঝাড়। এরপর শুধু সবুজ আর সবুজ। আর তারার মতো উজ্জ্বল রঙিন ফুল। সবুজের বুকে হলদে রঙে আঁকা পথরেখা বরাবর এগিয়ে চলি। সামনে উন্মুক্ত আকাশ। আরও ঘণ্টাদেড়েক পর বহু বহু নিচে দেখি ছোট্ট গ্রহণ গ্রাম।

দুটো সোনালি চিল পাক খেয়ে যায় বার বার। শেষ আধঘণ্টা বেশ কষ্টকর চড়াই। পাথরের ধাপ বেয়ে শীর্ষের ডাইনে ঘুরতেই চোখে পড়ল সবুজ মাঠ। তার ঢাল গিয়ে ছুঁয়েছে সার পাসের পদপ্রান্ত। তারপরই বরফের রাজত্ব শুরু। অনেক নিচে সুতোর মতো পার্বতী নদী। পাড়ে পাড়ে বাসরাস্তা, বিন্দু বিন্দু ঘরবাড়ি। এখানে জলের অভাব। তাই আধ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট্ট গ্লেসিয়ারে গিয়ে বরফগলা জল বয়ে আনতে হয়।

হঠাৎ নাগারুর দখল নিল মেঘ। চারদিক অন্ধকার। তোড়ে শুরু হল শিলাবৃষ্টি। নরম সবুজ ভূমি ঢাকা পড়ে গেল তিন চার ইঞ্চি বরফের কার্পেটে। সঙ্গে প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়ার দাপট। ঘণ্টাদুয়েক বাদে ছেঁড়া ছেঁড়া রোদ। ঠিক পাসের মাথার ওপর বিশাল রামধনু।

এই ১২,৫০০ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে এক বিরল দৃশ্য দেখি। প্রায় ১৮০ ডিগ্রি কোণ জুড়ে শ্বেতশুভ্র পর্বতমালার সারি। দক্ষিণের আকাশে ঘন কালো মেঘ। উত্তরের আকাশ নির্মল নীল। পূর্বে পাসের ওপর রামধনু। পশ্চিমাকাশে অপূর্ব সূর্যাস্ত। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মির অসাধারণ বিচ্ছুরণ। সোনালি আলোক রশ্মি স্পট লাইটের মতো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন দেবতারা আশীর্বাদ করছেন আমাদের। গনগনে লাল সূর্য মেঘের ফাঁকফোকর গলে নামতে নামতে ধৌলাধার পর্বতশ্রেণীর পিছনে ডুব দিল।

মাঝরাত থেকে কিচেন টেন্ট ব্যস্ত। সাড়ে চারটেতে বেড টি হাজির। গাইডের তাড়ায় সাড়ে পাঁচটায় সবাই প্রস্তুত। আকাশের রং সবে ফিকে হচ্ছে। কোথাও এক কণা মেঘ নেই। কাল রাতে যে পর্বতশৃঙ্গদের চাঁদ-তারার আলোয় জ্বলতে দেখেছি, আজ তাদের

গায়ে নরম নীল আলো । একের পর এক শীর্ষ সোনালি আলোর স্পর্শে জেগে উঠছে । পাহাড়ের আড়াল থেকে আলোক স্তম্ভ এসে ধুয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের গা ।

মালবাহকেরা একটা ত্রিভুজাকৃতি পাথরকে প্রণাম করতে বলে । ইনি নাগারু দেবতা, সন্তুষ্ট না হলে পাস পার হওয়া অসম্ভব । পাথরে সিঁদুর দিয়ে আঁকা ত্রিশূল ও ডম্বরু । ওদের কাছে নাগারুদেবের উপাখ্যান শুনি । বহুদিন আগে এখানে ক্যাম্প স্থাপন করা যাচ্ছিল না । বারবার তুষারঝড়ে তাঁবু উড়ে যাচ্ছিল । তখন মালবাহকরা এই পাথরকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করেন । প্রকৃতি শান্ত হয় ।

সশ্রদ্ধচিত্তে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে শুরু হল আমাদের চূড়ান্ত অভীষ্টের পথে অভিযান । আজ ১৩০০ ফুট টানা চড়াই ভেঙে উঠতে হবে, ১৩,৮০০ ফুট উচ্চতার সার পাসের শীর্ষে । তারপর চড়াই থেকে মুক্তি । তৃণভূমির সহজ ঢাল বেয়ে এগোতে থাকি । দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয় ধরাথাচ শৃঙ্গের প্রায় পুরোটাই । ডাইনের তৃণক্ষেত্রটা যেন হঠাৎ ভেঙে পড়েছে কয়েক হাজার ফুট নিচে । সেখানে মিংথাচ ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড । মেঘহীন নীল আকাশে চকচকে উড়োজাহাজ । দিল্লি-চণ্ডিগড়-লে রুটের বিমান ।

ভোর সাড়ে ছটায় স্পর্শ করলাম বরফের সীমানা । পাথরের খাঁজে খাঁজে জমাট বরফ । পা ঠুকে ঠুকে সমতল গ্রিপ তৈরি করে উঠতে হচ্ছে । ঢাল প্রায় ৬০ ডিগ্রি । এঁকেবেঁকে এমনভাবে উঠছি যাতে পথের দৈর্ঘ্য বাড়ছে কিন্তু ঢালের তীব্রতা কমে যাচ্ছে । কপাল ভালো যে নতুন বরফ পড়েনি বিশেষ । সেক্ষেত্রে নতুন করে পথ তৈরি করতে হত । পাথরের খাঁজগুলোর সাহায্যও পাওয়া যেত না ।

ঠিক আটটায় উঠে এলাম সার পাসের শীর্ষে । বিশাল সমতল প্রান্তর জুড়ে শুধু বরফ আর বরফ । কোথাও কালো পাথরের ঢিবি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে । কোথাও অল্প অল্প সবুজ তৃণক্ষেত্র নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে । আর ২৭০ ডিগ্রি কোণ জুড়ে শিবালিক পর্বতমালার চিরতুষারাবৃত সব পর্বতশৃঙ্গ । গাইড পরিচয় দেয় তাদের । সবচেয়ে কাছের শৃঙ্গের নাম ধরাথাচ । যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে । তার পিছনে রোবক গাই, ধুকপুক গ্লেসিয়ার, আলিরত্না, আলিরত্নি । এই দুই পর্বতশৃঙ্গ বহু পর্বতারোহীকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে আজও অজেয় । কিঞ্চিৎ হলুদাভ ত্রিভুজাকৃতি শিখরের নাম টাইগার টিথ । ঠিক ওর পিছনেই লাহুল স্পিতি । তারপর ইন্দ্রাসন । ঠিক যেন ইন্দ্রের সিংহাসন । অন্য নামে দেওটিব্বা । উচ্চতা প্রায় ১৯,০০০ ফুট । আরও বাঁয়ে পর পর কাছাকাছি তিনটি পর্বতচূড়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর । এরকম পর পর পর্বতশিখরাদি ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে ধৌলাধার শ্রেণীর সঙ্গে মিশে গেছে । যার নিচে ডালহৌসি চাম্বার অবস্থান । এছাড়াও দেওটিব্বার পাশে আছে হোয়াইট শেল, পীনপার্বতী ও ক্ষীরগঙ্গা । সেখানে প্রতিবছর

ট্রেকিং ও অভিযান হয় বেশ কয়েকটা। আকাশের রং ঘন নীল। এক চিলতে মেঘ নেই কোথাও। সমগ্র দিগন্ত জুড়ে হালকা রামধনুর মতো রং। এমন দেখিনি কখনও। পাথরের আড়াল খুঁজে ধূপ জ্বেলে গ্লুকোজ ও বিস্কুট দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। সকলে বিনম্র চিত্তে সুন্দরের প্রতি প্রণাম জানাই। নিচের দিকে একটা ছোট্ট জলের কুণ্ড। জল প্রায় নেই বললেই চলে। ওমপ্রকাশ বলে, এই জলাশয়ের নামেই এই পাসের নাম সার পাস। আরও জানায়, হিমাচলে সমতল তৃণভূমি হল থাচ। গাড়োয়ালে যাকে বলে বুগিয়াল, আর কিন্নরে নাম কান্ডা।

প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে পাসকে উপভোগ করি। তারপর গাইডের তাড়ায় নেমে চলি নিচে। ৪৫ ডিগ্রি ঘাসের ঢাল বেয়ে নেমে জলের ধারা পেরিয়ে পথের ওপর বিশাল এক গ্লেসিয়ার। ধরাথাচ শীর্ষ থেকে একটানা নেমে গেছে প্রায় হাজার ফুট নিচে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে প্রায় ৩০০ ফুট চওড়া বরফের স্ল্যাব পেরিয়ে শুরু হল বোল্ডার অঞ্চল। তারপর পথ রোধ করা রুক্ষ বাদামি পাহাড়। প্রায় আধঘণ্টা এঁকেবেঁকে দুরন্ত চড়াই ভেঙে উঠে এলাম সঙ্কীর্ণ গিরিশিরার ওপর। বাঁদিকের শিখরে জাতীয় পতাকা টাঙিয়েছে পোর্টাররা। ডাইনের গিরিশিরা স্পর্শ করেছে রোবাক গাই চূড়ার বরফঢালা বুক। এই হল সার পাসের শেষ সীমানা। এরপর একটানে নেমে যেতে হবে ১৩,৮০০ ফুট থেকে ১১,০০০ ফুটে, বিসকারি থাচে। গিরিশিরার অন্যদিকটা গোল বাটির মতো নেমে গেছে নিচে। ওমপ্রকাশ জানায়, অন্যান্য বছর এই বেসিনটা বরফে ভর্তি থাকে। তখন স্লাইড করে এই ৪ কিলোমিটার পথ পার হওয়া যায় মাত্র ১০ মিনিটে। এখন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে আশপাশের পাহাড়ে প্রচুর ব্লাস্টিং হচ্ছে। তারপর থেকেই এখানে বরফের মাত্রা কমে গেছে।

বেলা বারোটায় নামতে শুরু করলাম। ঝোপ ও গুল্মের মধ্য দিয়ে পথ। ওপর থেকে নামাটা যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল নামতে গিয়ে আর ততটা কঠিন মনে হল না। একটা গ্লেসিয়ারের স্নাউট থেকে দেখি ঝরনাধারা বেরিয়েছে। সবুজ প্রান্তরের অন্তে রডোডেনড্রনের বন। বেঁটে বেঁটে গাছের গুঁড়িগুলো সব মাটির সমান্তরাল। গাছে শুকনো গোলাপি ফুল। জলের ধারা গড়িয়ে যে পথ তৈরি হয়েছে সেই শুকনো মাটি পাথরের পথে নেমে চলেছি। একটানা নামতে নামতে হাঁটু ধরে আসে। ভেড়া ছাগলের দল, মেষপালকের পাথুরে আস্তানা ছাড়িয়ে প্রায় আড়াইটে নাগাদ আমাদের আস্তানায় পৌঁছে গেলাম। দেখি বিসকারি থাচে কাচ্চা বাচ্চা সহ মুক্ত ঘোড়ারা চরে বেড়াচ্ছে।

পদযাত্রার পঞ্চম সকাল, পীনপার্বতী শিখরের পাশ দিয়ে অপূর্ব সূর্যোদয়। ডাইনে বাসুকিনাগ। এখান থেকে ক্রিভাসগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাশে ক্ষীরগঙ্গা, তার পিছনে

আছে পার্বতীর উৎস মানতালাও । পীনপার্বতীর বাঁদিকে হোয়াইট শেল ও দেওটিব্বা । তারপরের চূড়ারা পাহাড়ের আড়ালে ।

বেলা দশটায় হাঁটা শুরু । অভিযানের অন্তিম তাঁবু পড়বে বন্দকথাচে । দূরত্ব ১২ কিলোমিটার । উচ্চতা ৭৬০০ ফুট । আজকের প্রায় পুরো পথ জুড়েই বিসকারির ঘন জঙ্গল । নানান প্রজাতির গাছের মধ্যে ভুজগাছ অন্যতম । এখানে প্রচুর ভালুক ও লঙ্গুর আছে । পথ বেশ সঙ্কীর্ণ । টানা উৎরাইয়ের মাঝে মাঝেই ঝোরা । পার হবার পর অল্প চড়াই, পায়ে বেশ আরাম জোগাচ্ছে । আরেকটা ভয়ঙ্কর ঝোরার মুখোমুখি হলাম । খুব সঙ্কীর্ণ অঞ্চলটা পার হবার জন্য পঞ্চাশ ফুট মতো দড়ি ঝোলাতে হল সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে । ঝোরার ঠিক ওপরে একটা গুহা । ওমপ্রকাশের কথায় ওটা ভালুকের আস্তানা । জঙ্গলের মাঝে মাঝে সুন্দর সবুজ মাঠ । শুয়ে বসে বিশ্রাম নেবার আদর্শ স্থান ।

পথের পাশের ঢালু জমিতে স্ট্রবেরির ঝোপ । ছোট ছোট লাল রসালো স্ট্রবেরিতে পকেট ভর্তি । এ জঙ্গলে দেখি করাতের কোপে বহু বৃক্ষ ধরাশায়ী । নালার বুকে বহুমূল্য গুঁড়ির স্তূপ । গাছের কোটরে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছে ভেতরে ভেতরে । মানুষের এ ধ্বংসলীলায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । বাঁয়ের ঢালু পথ নেমে গেছে পুলগাঁও । আর সোজা চড়াই পথের প্রান্তে সবুজ মাঠ । অনেকগুলো মোষ চরে বেড়াচ্ছে মহানন্দে । পলিশিট ঢাকা পাথর সাজানো দেওয়ালে মেষপালকদের অস্থায়ী আবাস । দেওদার পাতার গদিতে প্রায় দশজনের ঢালা বিছানা । ওঁরা প্রায় ছমাস এখানেই থাকে । দুধ পাঠায় পুলগাঁও ও মণিকরণে । তারপর দলবল সহ এক মাস ধরে হেঁটে ফিরে যাবে লুধিয়ানা ।

আজই অনায়াসে পুলগাঁও হয়ে বারসোনি রোডে নেমে যাওয়া যেত । কিন্তু বেলা তিনটেতে শেষ বাস ছেড়ে যায়, সেই কারণে ও পীনপার্বতী, বাসুকিনাগ, হোয়াইট শেল ও দেওটিব্বাকে আরও কাছ থেকে আরও একদিন উপভোগ করার লোভে এই বন্দকথাচে তাঁবু ফেলা হল ।

পদযাত্রার শেষ ভোরে পীনপার্বতীর শির ছুঁয়ে সূর্যকিরণ সরাসরি এসে পড়ে তাঁবুর মধ্যে । প্রথম বাস ছাড়বে বেলা ১১টায়, তারমধ্যে ৭ কিলোমিটার দূরের বারসোনি রোড পৌঁছতে হবে আমাদের । তাই তাড়াতাড়ি গোছগাছ সেরে সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে পড়ি পথে ।

একটানা ঢালু পথ । মাথার ওপর জঙ্গলের চাঁদোয়া । মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাঠ, মেঘ রোদ্দুরের খেলা, বনবিভাগের ঘেরা চত্বরে নতুন গাছের চারা, এসব পেরিয়ে মাটি, পাথর আর শিকড়ের মুঠিতে ধরা সিঁড়িতে পা ফেলে এগিয়ে চলি । কোথাও ঝোরার পাশ দিয়ে পথ । কোথাও ভেঙে পড়া পাইন গতি রোধ করছে । এভাবে নামতে নামতে সাড়ে নটায়

ছোট্ট সুন্দর পুলগাঁও। দু-তিনতলা রংবেরঙের বাড়ি। ট্যুরিস্ট লজ। গ্রাম ছাড়িয়ে পার্বতীর ওপর কাঠের সেতু। ওপরের দিকে তোষনালার সঙ্গে পার্বতীর মিতালি। উঠে এলাম বারসোনি রোড। পথের অন্তিম প্রান্ত থেকে বাস ধরে ১২ কিলোমিটার দূরে পৌনে এক ঘণ্টায় মণিকরণ।

উষ্ণ কুণ্ডে স্নান। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে দূর। মণিকরণ থেকে বাস ধরে রওনা হলাম কুলু অভিমুখে।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

মিয়ানমার, ইরাবতীর সঙ্গে

পবিত্র সরকার

ভ্রমণকাহিনীর শিরোনাম 'মিয়ানমার' দিয়েই মনে হল, আমি কি পাগল, সাতদিনে একটা দেশ দেখা যায় নাকি? হয় পাগল, না হয় প্রতারক-পাঠককে সম্পূর্ণ ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছি যে দেখো, কেমন দিব্যি একটা দেশ দেখে এলাম । এই কথা লিখতে লিখতে মনে পড়ল, আরে! আমাদের জীবনপঞ্জিতেও তো আমরা এভাবে প্রতারণা করি, আর লোকে সেটা মেনেও নেয় । সেখানে 'আদার কান্ট্রিজ ভিজিটেড' বলে একটা সূত্র থাকে, তাতে আমরা কেউ লিখি ষোল-সতেরোটা দেশের নাম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিম ভাই হয়তো লেখেন বাহাত্তরটা দেশের নাম । তাঁর মতো বিশ্বপথিক মানুষ পশ্চিমবাংলায় আছে কি না সন্দেহ । কাজেই ঠিক আছে, মিয়ানমারই থাকবে এ লেখার শিরোনাম । তবে 'ইরাবতীর সঙ্গে' কথাটা জুড়ে দিয়ে একটু বিনয়ের সুযোগ রাখছি ।

আসলে ঘটনাটা ঘটেছে ৪ থেকে ১১ জুলাই, ২০০১ সালে । কিন্তু প্রায় ছ মাস আগে থেকে আমাদের 'বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ' বা 'বঙ্গীয় উদ্যোগ' সভার সভাপতি শ্রীঅমিয় গুপ্ত বলেছিলেন, তৈরি হোন, মিয়ানমারে (মায়ানমার নয়, ওরা নিজেরা মিয়ানমারই বলে) যেতে হবে । যা আগে ছিল ব্রহ্মদেশ বা বার্মা তা-ই যে ১৯৮৯ সালে ওখানকার সামরিক শাসকেরা মিয়ানমার নাম দিয়েছে তা আমরা জানি । বাঙালিদের সঙ্গে চাকরি ও ব্যবসাসূত্রে ব্রিটিশ আমলে (১৮৮৫-১৯৪৭) বার্মার একটা গভীর যোগ গড়ে উঠেছিল, আমরা যারা শরৎচন্দ্র পড়েছি, কিংবা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্যাস-তারা সবাই জানি । ১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারি তারিখে বার্মা স্বাধীন হল । তারপর থেকে দফায় দফায় বাঙালিদের চলে আসতে হয়েছে-সে ইতিহাসে আর যাব না । কিন্তু এ দেশে যেতে হবে, সেটা ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ হল । এর আগে ১৯৯৯-এর মে মাসে ওই অমিয়দার উদ্যোগেই গিয়েছিলাম পাকিস্তান-সেও কম রোমাঞ্চকর ব্যাপার নয় । 'ভ্রমণ'-এর পাঠকদের সে কথা জানানো হয়নি । আর জানাতে পারব বলে মনে হয় না । স্মৃতিতে, মানে টাকমাথা ও পাকা চুলের দুর্বল হয়ে আসা স্মৃতিতে, অনেক ফাঁকফোকর ও ফুটো তৈরি হয়ে গেছে, তা লিখতে গেলে বেশ জল মেশাতে হবে । দরকার নেই, এরকম অনেক ভ্রমণকাহিনী আমার লেখা হয় না । তবে একেবারে না লিখে পার পাব-'ভ্রমণ'-

সম্পাদকের কাছ থেকে সে-ভরসা এখনও পাইনি । যাই হোক, মিয়ানমারের কথাও লেখা হত না, যদি না আমার অর্ধাঙ্গিনী (এবং এ যাত্রায় ভ্রমণসঙ্গিনী) শ্রীমতী মৈত্রেয়ী সরকার তাঁর বার্মামুলুকের ফাইল-ফোল্ডারটা এগিয়ে দিতেন । তাতে তাঁর নিজের নোট, বিশ্বকোষ থেকে জেরক্স করে আনা মিয়ানমারের বিবরণ, ম্যাপ, ছবি-কার্ড, পর্যটন-কোম্পানির নানা বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি হাতের কাজে সাজিয়ে দিতেন । ফলে এ ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছুটা তাঁরও লেখা বলে ধরতে হবে ।

২

দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আই সি ৭২৭ বিমান উড়ল বেলা পৌনে দুটোয় । তার আগে ভিসা-পাসপোর্ট চেক-ইন এবং কাস্টমস-ইমিগ্রেশন পর্ব অত্যন্ত মসৃণভাবে সমাধা হয়ে গেছে । অমিয়দা কোনও একটি ইওরোপীয় দেশের সাম্মানিক বাণিজ্যদূত বা কনসাল, ফলে একজন বিশাল গুম্ভধারী (এরকম পুরুষ্টু এবং বক্র-প্রলম্বিত অভিজাত গোঁফ বাঙালিদের মধ্যে আজকাল দেখি না, সে বড় দুঃখের কথা) এসে সমস্ত প্রক্রিয়াটা নিমেষের মধ্যে সেরে দিলেন, আমাদের লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার মতো সুখকর কাজগুলি করতে হল না । এমনিতেই জুলাইয়ের ভ্যাপসা গরম, দমদমের বাতানুকূল ব্যবস্থা এমন কিছু দাপটে চলছিল না । এর মধ্যে যে কেচ্ছাটা হল তা আমাদের পারিবারিক সংকট । শেষ মুহূর্তে দেখি হাতের ছোট ক্যামেরার ব্যাটারি প্রাণত্যাগ করেছে । আমারই দোষ, যথেষ্ট আগে এসব খেয়াল করা আমার অভ্যেসে নেই । আমি বাড়ির ভদ্রমহিলাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, দমদমে কিনে নেব । কিন্তু দমদমে কাস্টমস পেরিয়ে যে দোকান পেলাম তাতে সবই ডলারে কিনতে হয়, আর তার চাইতেও বড় কথা, তাতে ব্যাটারি বিক্রি হয় না, আস্ত ক্যামেরা আছে । দুটোর কোনওটাই আমার অনুকূলে গেল না । আমার একটা পুরনো আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরা সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু সেটাও আয়ুর শেষে এসে পৌঁছেছে, সব সময় হুকুম মতো কাজ করে না । ফলে একটু মনোকষ্ট নিয়ে প্লেনে উঠতে হল ।

তবে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন অনেক বাঘা বাঘা লোক । তাঁদের মধ্যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও হৃদয়ের কাটা-ছেঁড়ায় সুদক্ষ ডাঃ শৈবাল গুপ্ত ক্যামেরা নিপুণও বটে, তিনি নিশ্চয় আমাদেরও দুয়েকটা ছবি তুলবেন দলের মধ্যে । যাচ্ছেন মিহিজামের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরও কাঁধে ক্যামেরা দেখে আশান্বিত হলাম । দুজনেই সস্ত্রীক যাচ্ছেন । অমিয়দা আর অলকা বউদি তো আছেনই । যাচ্ছেন শিল্পী

শুভাপ্রসন্ন, যিনি আগের দিনই মার্কিন দেশ থেকে ভারতের মাটিতে পা ছুঁইয়েছেন, চোখ থেকে এখনও পৃথিবীর ও প্রান্তের ঘুম কাটেনি । আছেন বিখ্যাত অপরাধ-মামলার আইনজীবী সুশান্ত দত্ত আর তাঁর স্ত্রী শিবানী-যে আমার যাদবপুরের ছাত্রী ছিল । সুশান্ত নিজেকে 'ক্রিমিনাল ল-ইয়ার' কথাটা বলে 'ক্রিমিনাল' কথাটার ওপর জোর দেন, অর্থাৎ তিনিই যে অপরাধী সেটা বলবার চেষ্টা করেন । সৌগত রায়, যাঁর পরিচয় দেবার দরকার আছে বলে মনে করি না । শিল্পপতি সমীর ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা । বিস্ক ফার্ম-এর ভারি হাসিখুশি মালিক কে ডি পাল । নিক্কো করপোরেশনের সহ চেয়ারম্যান ডঃ অভিজিৎ সেন । বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বন্ধুবর দিলীপ সিংহ । সাংসদ ও দুঁদে ব্যারিস্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ শকুন্তলা-আর কত নাম করব । এইসব সাংঘাতিক লোকদের মাঝখানে গেলে আমারই মাথা তাজঝিম মাজঝিম করতে থাকে, পাঠকদের কথা তো ছেড়েই দিলাম ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা হঠাৎ মিয়ানমার অভিযানে কেন? 'বঙ্গীয় উদ্যোগ'-এর বিষয়টা তাহলে পাঠকদের একটু বলি । দেশে দেশে নেতারা যান, আমলারা যান-তাদের করমর্দন হয়, বিমানবন্দরে গার্ড অব অনার হয়, লিমুজিনে চড়ে তাঁরা গাড়ির মিছিল পিছনে লেজুড় করে বেরিয়ে যান-সে এক রকমের যাওয়া । সে এক রকমের কূটনীতি, তার নাম ট্র্যাক ওয়ান ডিপ্লোমেসি । আর আমাদের মতো সাধারণ লোকের কিছু ভি আই পি (তার মধ্যে আমার মতো ওঁছারাও আছে) অন্য দেশে গিয়ে বুদ্ধিজীবী নেতা, সাংস্কৃতিক লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে এক ধরনের জনতা-জনতায় বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করে, তার নাম ট্র্যাক টু ডিপ্লোমেসি । আমরা মানুষজনের সঙ্গে মিশি, তাদের কথা শুনি, ফলে দেশটার ভেতরকার কণ্ঠস্বর একটু শুনতে পাই । 'বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ' এই কাজটা দু-তিন বছর হল শুরু করেছে । এই কর্মেই আমরা পাকিস্তান গিয়েছিলাম, আবার এই লক্ষ্যেই মিয়ানমার । পাকিস্তান যাওয়ার ব্যাপারটা চেপে যেতে চাই আরও একটা কারণে-আমরা ফেরার পরেই কারগিলের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল । সেবার নওয়াজ শরিফ ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর আবাসে বসে ঝাড়া দেড়ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন, আমার ধুতি-পাঞ্জাবির (তাই পরে গিয়েছিলাম) প্রশংসা করলেন । বললেন, যুদ্ধ চালালে দুটো দেশই একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে । পাকিস্তান একটু আগে, কারণ পাকিস্তানের অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়; আর ভারত কিছুটা পরে, কারণ ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি এখনও অনেক শক্তসমর্থ । ফলে শান্তির দিকে ভারত যদি এক পা এগোয় তো পাকিস্তান-অর্থাৎ নওয়াজ শরিফ তিন পা এগিয়ে যাবে । ও মা, যখন নওয়াজ শরিফ এসব কথা বলছেন তখন তিনি জানেনই না যে তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে কিছু না জানিয়ে কারগিলের মহড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে । ও সব লাহোর চুক্তি-টুক্তি গোল্লায় দেওয়ার পাকা ব্যবস্থা করছে ।

বুড়ো বয়সের এই হল সমস্যা। মিয়ানমারের প্লেনে উঠেছি, হঠাৎ পাকিস্তানের কথা বকতে শুরু করলাম। নাঃ, দীর্ঘশ্বাস চেপে বর্তমানে ফিরে আসি। রেঙ্গুন বা ইয়াঙ্গন আর কতই বা দূরে, দেড়ঘণ্টার রাস্তা। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি পেরিয়ে প্লেন যখন কোনাকুনি মিয়ানমারের সীমানায় ঢুকল, তখন একটু-আধটু পাহাড়ি এলাকা দ্রুত পেরিয়ে মাটির চেহারা যা চোখে পড়ল তার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ বা বাংলাদেশের বিশেষ অমিল নেই।

কিন্তু মাটির আগে আকাশের কথা একটু বলি। প্লেন থেকে আকাশ ছাড়া আর কীই-বা তেমন করে দেখা যায়? অনেকেই মনে করে আকাশে অত কী দেখার আছে, আকাশ তো সেই একঘেয়ে নীল, আর মাঝে মাঝে ওই মেঘ, যার মধ্যে প্লেন ঢুকে পড়লে মাঝে-মধ্যে তাকে লাফঝাঁপ করতে হয়, আমাদের প্রাণে প্রচুর ধুকপুকুনি জাগিয়ে। তা নয়, মেঘ আর নীল আকাশের কত খেলা দেখা যায় ওই ওপরে উঠলে। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রচুর খোপ কাটা কাটা জলে ডোবা ধানখেত, মাঝে মাঝে ঘন সবুজ দ্বীপের মতো গাছপালা ঘেরা গ্রামের গুচ্ছ। কখনও মেঘের প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে, কখনও সাদা মেঘের মধ্যে নীল আকাশের হ্রদ, কখনও ভেড়ার পাল বা উড়ন্ত হাঁসের দলের মতো মেঘ, কখনও ছায়াপথের মতো, তা দেখেই সময় কেটে যায়। ইয়াঙ্গনের কাছাকাছি জমি বাংলাদেশের মতোই সমতল, ধানখেত পরিকীর্ণ, বর্ষায় জল ধরে রেখেছে তারা, তারপরেই কে একজন বলল, 'ওই দেখা যায় ইরাবতী!'

হ্যাঁ, তাই তো বটে। ওই তো দেখি মিয়ানমারের সেই প্রাণধারা, ভারতের যেমন গঙ্গা, কিংবা তার চেয়েও বেশি। দেশের একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে দেশটাকে প্রায় সমান দুভাগে ভাগ করে ইয়াঙ্গনের কিছু দূরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে ওই নদী। ক্রমশ প্রশস্ত হয়েছে, নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। সমুদ্রের মুখে তৈরি করেছে অসংখ্য ব-দ্বীপ। প্লেন থেকে সেগুলোকে দেখলে মনে হয় কত সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জলে শুধু চোখমুখ ভাসিয়ে শুয়ে আছে। ইরাবতীকে ওরা বলে 'অইয়্যরাওয়াডি' বা ওইরকম কিছু, কিন্তু আমরা ওরকম ভয়ঙ্কর নামে তাকে ডাকতে চাই না। প্লেন ক্রমশ নামছে, নদীর জল কখনও সূর্যের ছিন্ন আলোয় ঝলসে উঠছে কখনও বা তাতে মেঘের ছায়া, এবং একটু পরেই প্লেন প্রায় নির্জন ইয়াঙ্গন বন্দরে নেমে টারম্যাকে দৌড় শুরু করল। আমরা পেরিয়ে গেলাম শোয়েডাগন প্যাগোডার সোনালি তোরণের মতো মস্ত তোরণ, তাই যেন মিয়ানমারে আমাদের অভ্যর্থনার প্রতীক। ঘুরে-ফিরে একটু হাওয়া খেয়ে প্লেন ওই তোরণের সামনেই এসে থামল।

অবাক কাণ্ড, প্লেনে আমাদের দলটা ছাড়া নামল খুব কম যাত্রী। অথচ প্লেনভর্তি ছিল ভারতীয়। না, তারা সব ব্যাংকক যাবে, বোঝা গেল। মিয়ানমারে খুব কম যায়। কেন

যায় না জানি না, অথচ এখানে দেখার জিনিস খুব কম নেই । হয়তো মিলিটারি শাসনের ব্যাপারটাতে একটু ভয় পায়, কিংবা ভিসা-টিসার ব্যাপারে ঝামেলা আছে-দিল্লিতে পাঠাতে হয় পাসপোর্ট । কিন্তু আজকাল তো ট্র্যাভেল এজেন্টরাই সব করে দেয় ।

এত বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এয়ারপোর্ট, একপাশে সুন্দর সাজানো দোকানে লুঙ্গি ও ব্লাউজ বা শার্ট পরা সুবেশা মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ক্রেতা নেই । আমাদের একটু দেরি হল, কারণ আমাদের বিদেশি ডলারের বদলে এফ ই সি অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ কারেন্সি নিতে হল-এক ডলার হল এক এফ ই সি; না হলে মিয়ানমারে ঢোকা যাবে না, অন্তত দুশো এফ ই সি নিতেই হবে । এর মধ্যে 'ট্যুর মান্দালয়' কোম্পানির প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে কথা বলে সব নির্দেশ দিয়েছে, তারাই আমাদের মিয়ানমার ভ্রমণের দায়িত্বে । তারাই আমাদের মালপত্র গুছিয়ে বিনা ঝামেলায় কাস্টমস ইমিগ্রেশন পার করে নিয়ে চমৎকার এক বিশাল এয়ারকন্ডিশন্ড বাসে তুলে দিল ।

৩

বাস থেকে ইয়াঙ্গন একনজরে দেখে বেশ ভালোই তো লাগল । দুপাশে প্রচুর গাছপালা, চওড়া রাস্তা, রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় কলকাতার তুলনায় যথেষ্ট কম । গাছপালার আড়ালে শহরের দারিদ্র্যের চেহারা চোখে পড়ে না, মনে হয় সবই বেশ সাজানো গোছানো । 'জো', আসলে বোধহয় 'চো', সে আমাদের গাইড, বাসের মধ্যেই মিয়ানমারের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বেশ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল । বলল, 'দেখো আমরা দুটো প্রাচীন আর মস্ত দেশ চিন আর ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝখানে স্যান্ডউইচের মতো পড়েছি, ফলে আমাদের সংস্কৃতি দুয়ের মিশ্রণ । আমরা ধর্ম নিয়েছি ভারত থেকে, সেইসঙ্গে আরও অনেক কিছু-আমাদের নাচগান ইত্যাদির সঙ্গেও ভারতীয় নাচগানের মিল আছে । খাবারদাবারও অনেকটা ভারতীয় ।'

আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা যে 'ঙাপ্পি' না 'নাপ্পি' কী খাও, সেটা কী জিনিস?' তাঁর নিশ্চয়ই সুকুমার রায়ের 'খাই খাই'-এ 'বার্মার নাপ্পিতে বাপ রে কী গন্ধ' লাইনটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল ।

জো একটু হেসে বলল, 'তোমরা শুঁটকি মাছ খাও তো-এও একরকমের শুঁটকি মাছের ব্যঞ্জন, মূলত চিংড়ি মাছের । তবে এটাকে একেবারে আঠা ধরনের করে ফেলা হয়, যাতে মাখনের মতো পাউরুটি ইত্যাদিতে লাগিয়ে খাওয়া যায় ।

এটা শুনে আমাদের মধ্যে অনেকে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, আবার কেউ কেউ আনন্দে খুব আশান্বিত হয়ে উঠলেন। এই শেষ দলের মধ্যে, বলতে লজ্জা নেই, এই লেখকও ছিল।

যাই হোক জো বলে চলল, 'আর চিনাদের কাছ থেকে আমরা নিয়েছি পোশাক। শরীরের ওপরের দিকে আমরা একটা খাটো কলারের শার্ট পরি। এটা ব্রিটিশ শাসনের 'দান' বলতে পার। তারা পরবে পুরো কলারের শার্ট, আমরা পরাধীন প্রজারা পরব আধা কলারের শার্ট-এই ছিল অনুশাসন। তার ওপরে যে অনেকগুলো বোতামওয়ালা জ্যাকেট, তা চিনাদের মতো। তলায় পরার লোঙ্গি (আমরা বাংলায় যেটাকে লুঙ্গি করে নিয়েছি)-সম্ভবত ভারত থেকেই, বৌদ্ধ শ্রমণদের পোশাক থেকে। তবে আমাদের স্থাপত্যে, বিশেষত মন্দিরস্থাপত্যে, চিনা প্রভাব প্রচুর-সে তোমাদের সব জায়গায় চোখে পড়বে।'

এয়ারপোর্ট শহরের উত্তরে, আমাদের গন্তব্য সামিট পার্ক ভিউ হোটেল শহরের দক্ষিণে, কিন্তু শহরকেন্দ্রের ঠিক উত্তরে। ফলে অনেকটাই রাস্তা। যেতে যেতে বাঁদিকে অনেকক্ষণ ধরে চলল ইনইয়া লেক, জো সেটা আমাদের দেখাল। শহরের একেবারে মাঝখানে এতবড় লেক খুব কম আছে। অবশ্য ইয়াঙ্গন শহরটা নানাভাবে জলধারার প্রসাদপুষ্ট। অন্তত চার-পাঁচটি উপনদী-শাখানদী তাকে ঘিরে রেখেছে। মূল নদী ইয়াঙ্গন, তাতে এসে মিশেছে হ্লাং আর পান হ্লাং নদী, ইয়াঙ্গন নদী গিয়ে মিশেছে বাগো নদীতে, তাতে মিশেছে পাজুন দাউং খাল-কী নেই। আরও লেক আছে শহরের মধ্যে। খানিক পরেই বাঁদিকে এসে গেল বড় প্রাঙ্গণ, তার মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে শোয়েডাগন প্যাগোডায় যাবার প্রশস্ত সিঁড়িপথ, আর প্রখর উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত শোয়েডাগন প্যাগোডা তার স্বর্ণিল মহিমা নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এইসব দেখতে দেখতে হোটেলে এসে গেলাম। দিব্যি হোটেল, অর্থাৎ বিদেশি পাঁচতারা হোটেল যেমন হয়। বিশাল লবি, তাতে দারুণ সোফা-সন্নিবেশ, গাছপালা, এক জায়গায় উঁচু জায়গায় বসে এক শিল্পী মস্ত একটা জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে, এক কোণে বর্মি হস্তশিল্পী কাপড় বুনছে, মণিমুক্তো হিরে-জহরতের দোকান (যা আমাদের বাইরে থেকে দেখেই সুখ), বিশাল রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। এসব দেখার বিশেষ সময় ছিল না, কারণ ওদেশের ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী মহোদয় শ্রী খিন মাউং উইন আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন, সাতটা নাগাদ তৈরি হয়ে আমাদের নিচে নামতে হবে। আমরা 'শুভেচ্ছা সফর'-এ এসেছি, ফলে এসব আমাদের কপালে জুটবেই।

নেমন্তন্নটা ছিল একটা অদ্ভুত জায়গায়। আগে সেটা ছিল রাজপ্রাসাদ, নাম কারাওয়েইক প্রাসাদ, কিন্তু এখন সেটাকে মস্ত একটা হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সে হতেই পারে, আমাদের দেশেও জয়পুরে উদয়পুরে তা হয়েছে। কিন্তু এ প্রাসাদটির নির্মাণকলা বড় বিচিত্র। যেন দুটি দৃঢ়সংকল্প হাঁস পাশাপাশি সাঁতার দিচ্ছে-পুরো প্রাসাদটা মস্ত একটা প্যাগোডার ধরনে তাদের পিঠের ওপর স্থাপিত, আসলে আরও দক্ষিণে কান দ জি লেকের ওপরে তৈরি এই হংসপ্রাসাদ, যেন দুটি 'হংসপঙ্খী' নৌকোর ওপরে। সওয়া সাতটা নাগাদ আমরা যখন পৌঁছলাম তখন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মস্ত মস্ত ছাতা নিয়ে প্রহরীরা সব তৈরি ছিল, আমাদের নিরাপদে একটি চিনা স্থাপত্যে নির্মিত হলে তারা পৌঁছে দিল। ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সহকর্মীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে অভ্যর্থনা করলেন। সেটাই এখানকার প্রথা, ভারি সুন্দর প্রথা। হলের প্রান্তে স্টেজ, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ফলে সাজানো আসনে আমরা বসে গেলাম, মুখরোচক স্ন্যাক্স ও পানীয় নিয়ে পরিবেশকরা ঘোরাফেরা করতে লাগল। অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল।

মিয়ানমারের নাচ কিছুটা মণিপুরীর মতো, কিছুটা তাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার নাচের শৈলী মিলিয়ে তৈরি। ঢিলে ও লম্বা হাতা জামা পুরুষ ও নারী উভয়েই পরে, নিচে লুঙ্গি। কিন্তু মেয়েদের লুঙ্গি (আমার স্ত্রীর কথায় 'মেখলা') থেকে একটা লম্বা কাপড়ের trail বা ল্যাজের মতো বেরিয়ে থাকে, সেটা পা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে বলিদ্বীপের ধরনেই চমৎকার কমনীয় নাচ নাচে, চোখমুখের চমৎকার ভঙ্গি করে। আখ্যান মূলত ভারতীয়, রাবণের (এরা বলে দশগিরি) সীতাকে ভোলানোর চেষ্টা এবং সীতার প্রত্যাখ্যান। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজপুত্রের প্রেমিকার কাছে প্রত্যাবর্তন দেখানো হল দুটি নাচে। দেখলাম মিয়ানমারের চমৎকার পুতুলনাচ, তার ঠিক পাশে মানুষের নাচ, পুতুলের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি নকল করে। দুটি লোকনৃত্যও ছিল, একটি কায়িন উপজাতির। আরেকটিতে নারীসঙ্গবিলাসী গুম্ফধারী এক রসিকের চমৎকার হাস্যোদ্রেকী কুশলী নাচ দেখলাম, যাতে ছাতা নিয়ে নানারকম কসরত ছিল। সবই হৃদ্য ও উপভোগ্য। বড় করতাল, গলায় ঝোলানো ছোট ধামসার মতো বাদ্যযন্ত্র, হার্প জাতীয় বীণা, মৃদঙ্গ, মাদলের মতো দেখতে ঢোল, সানাই, কর্নেট এবং শিঙা ধরনের যন্ত্র, কাঠের (বাঁশের) টুকরো দিয়ে তৈরি বড় জাইলোফোন-কী ছিল না সে নাচে? মৈত্রেয়ী লক্ষ্য করেছেন, জাইলোফোনে প্রথম যে সুরটি বাজানো হল তা অনেকটা আমাদের ভূপালি ঠাটের।

দর্শক আসনের পিছনে সাজানো ছিল খাবার জন্য চেয়ার, মাঝখানে ফুল সাজানো সাদা চাদরে ঢাকা বড় বড় গোল টেবিল। প্রত্যেকের নাম লেখা ছোট টিকিট ছিল সামনে, ফলে কে কোথায় বসবে সব নির্দিষ্ট ছিল। সমস্ত পদ টেবিলে সাজানো। শুধু সাদা বাসমতীর সুগন্ধি ধোঁয়া-ওঠা ভাত। পরিবেশকেরা প্লেটে পরিবেশন করেই দিচ্ছিল। দুরকম স্যালাড, একটা চিংড়ির সঙ্গে আধসেদ্ধ সবজির। সুপ এল, আমাদের মশলা দেওয়া দিশি সম্বরের

মতোই লাগল তা । এখানেও চিকেন, বালাচাও নামে চিংড়ির শুঁটকি, প্রজাপতির মতো করে কাটা চিংড়ি, ম্যাকারেল মাছ (আমার পাশের এক মিয়ানমারি অধ্যাপক সেটা আমাকে ইলিশ বলে ভজাবার চেষ্টা করেছিলেন), তারপরে এই সময়ের নানা ফলের-পেঁপে, তরমুজ, খরমুজা, আমের ডেসার্ট । প্রচুর খাওয়া, শেষে আবার সেই লাইনবন্দী করমর্দন এবং নিরতিশয় তৃপ্ত, আনন্দিত ও ক্লান্ত হয়ে হোটেলে এসে ঘুমোনো । প্রথমদিনটা এভাবেই গেল ।

৪

দ্বিতীয়দিন বিকেল থেকে যা শুরু হল তা ঠিক ভ্রমণকাহিনীর অংশ নয়-ওই 'ট্র্যাক টু' কূটনীতির অংশ । কিন্তু সকালের কথাটা তো বলে নিতেই হবে, কারণ তার কেন্দ্রে আছে শোয়েডাগন প্যাগোডা । হোটেল থেকে মাত্র দু ব্লকের মতো সেই সোনালি দৈবী প্রসাদ, কিন্তু ট্যুর মান্দালয় কোম্পানির বাতানুকূলিত বাস থাকতে আমরা হাঁটতে যাব কোন দুঃখে । সোনালি-সবুজ ত্রিকোণাকার চিনা ধরনের অলংকৃত গেটে আমাদের সিঁড়ি ঠেঙিয়েও উঠতে হল না । বাস গিয়ে দাঁড়াল এমন এক বাড়ির সামনে যেখানে স্বয়ং প্রধান পুরোহিত এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, একটা বসবার ঘরে নিয়ে সোফায় বসালেন যত্ন করে । সেখানে জুতো-চটি চপ্পল রেখে যেতে হবে । তাঁকে অনুসরণ করে বারান্দার দুপাশে সাজানো স্যুভেনিরের দোকানকে এড়িয়ে আমরা একটা বিশাল লিফটে উঠলাম-তা আমাদের প্রায় তিনতলা উঁচুতে মন্দিরের সমতলে নিয়ে পৌঁছে দিল ।

তারপর যাতে ঢুকলাম তাকে একটা বেষ্টিত প্যাগোডা-নগরী বলা চলে । মাঝখানে বিশাল শোয়েডাগন । চারপাশে আরও অনেক ছোট বড় প্যাগোডা, অজস্র বুদ্ধমূর্তি সাজানো । খানিকটা দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের ধরনে পরিক্রমা করার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ । সব দিকেই একটি করে তোরণ, তাতে আবার নতুন নতুন বুদ্ধ । এক মন্দিরে একটি জেড পাথরের এক মস্ত বুদ্ধকে দেখলাম । আরও অজস্র বুদ্ধ প্যাগোডার গায়ে গায়ে বসানো, তার পাশেই নলমুখ থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে, আর মিয়ানমারি মহিলারা অনবরত সেই খুদে বুদ্ধের মাথায় জল ঢালছে । একেক বুদ্ধ একেক বারের-কেউ সোমবারের, কেউ অন্য কোনও বারের । যার যে বারে জন্মদিন, সে সেইবারের বুদ্ধের মাথায় জল ঢালবে । বুধবারের নাকি আবার দুটি বুদ্ধ আছে, বেলা বারোটার আগেকার একজন, পরের একজন । বুঝুন ঠ্যালা । বুধবারের এই স্পেশ্যাল সম্মান কেন, তা আর জেনে নেওয়া হয়নি ।

সমস্ত প্যাগোডাগুলি-অতিকায় শোয়েডাগন এবং তার বহুতর সন্তানসন্ততি-সবই সোনায় সোনাকার যাকে বলে, তারা মস্ত এক আকাশখণ্ডকে স্বর্ণিল করে রেখেছে । হবে না কেন, 'শোয়ে' মানেই তো সোনা । 'ডাগন' অবশ্য ইয়াঙ্গনের পুরনো নাম । এতে নাকি গৌতম বুদ্ধের চারটি দেহচিহ্ন আছে । শোয়েডাগন বলতে আমরা যে মস্ত বিরাট প্যাগোডাকে বুঝি, তার উচ্চতা ৩২৬ ফুট, তার গায়ে নাকি ৩৫০০০ সোনার পাত লাগানো আছে সাড়ে সাত টন মোট সোনা আছে তাতে । সে কত শত কোটি টাকার ব্যাপার আপনারা হিসাব করুন গিয়ে ।

এখানেই একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম । মেয়েরা, বিশেষত অল্পবয়সীরা, গালে কী একটা গুঁড়ো মতো প্রলেপ লাগিয়েছে । পুরো গাল ঢেকে নয়, খানিকটা অংশ মাত্র । এ কি চন্দনের তিলকজাতীয় কিছু নাকি? না, পুরোহিত বললেন, ও এক ধরনের সোনাঝুরি কাঠের গুঁড়ো, রোদের জন্য মেয়েরা গালে মাখে । একথা শুনে আমাদের কয়েকজন আস্ত আস্ত সোনাঝুরির চ্যালাকাঠ কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল । অনেক কষ্টে তাদের নিরস্ত করা গেছে ।

আমি নিজে যে খুব ভক্তিপ্রাণ লোক তা নই, এটা আমার বন্ধুরা জানেন । কিন্তু হাজার হাজার মানুষের এই বিনম্র ভক্তির মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে তা আমি প্রায়ই অনুভব করি । আবার কখনও কখনও ভয়ও পাই, কারণ এই ভক্তি কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হয়ে আঘাত করতে পারে । তবু বুদ্ধদেব আমার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয়, কারণ পৃথিবীতে ইনিই একমাত্র ধর্মগুরু যিনি ঈশ্বরহীন এক সদ্ধর্ম প্রচার করেন, ঈশ্বরের স্থানচ্যুতি ঘটান 'নির্বাণে'র লক্ষ্য দিয়ে । এ ধর্মের আরাধ্য ওই 'নির্বাণ', কোনও ঈশ্বর নন । মিয়ানমারের বৌদ্ধরা থেরবাদী বৌদ্ধ, তা হীনযানের একটা রূপ । ফলে এখানকার ধর্ম নানা উটকো দেবদেবীর ভিড়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি । বুদ্ধই সর্বত্র মহিমময় হয়ে বিরাজ করছেন ।

পরে এদেশের প্রাচীন রাজধানী বাগান-এ আমাদের গাইড প্যাগোডা আর মন্দির বা টেম্পলের মধ্যে তফাত কী, তা বুঝিয়ে দিয়েছিল । প্যাগোডা আসলে স্তূপ, তা এক কঠিন ছিদ্রহীন স্থাপত্য । নিচে কয়েকটি নীরন্ধ্র গোল চাতাল যেন একটির পর আরেকটি বসানো, ক্রমশ ছোট হয়ে উঠেছে । গাইডের মতে, তা আমাদের ছটি রিপুর প্রতীক । তার ওপরে যেন একটি মস্ত ঘণ্টা উপুড় করে বসানো । ঘণ্টার হাতলটা যেন মিনারের চুড়োর মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে । মন্দির হল যাতে গর্ভগৃহ, দেবতা, ঢোকবার বেরোবার রাস্তা সবই আছে ।

শোয়েডাগনের সেই প্যাগোডা শহর পরিক্রমা করতে করতে আমাদের দলটা থেকে আমরা দুয়েকজন ছিটকে গিয়েছিলাম বলে বেশ একটু অস্থায়ী উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল ।

যাই হোক, শোয়েডাগন দেখে মিয়ানমারের অর্ধেকটা দেখা হয়ে গেল বলে মনে হল। অবশ্য এ যে কী বিষম ভ্রান্তি, তা দুদিন পরেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এখন তার কথা বলছি না।

প্যাগোডা-পরিক্রমার পর জাতীয় জাদুঘর, তাও আমাদের হোটেলের খুব কাছেই। ভালো লাগল দেখে যে, জাদুঘরের প্রদর্শিকা মেয়েরা মাথায় পরে ছিল নাগকেশরের ফুল। জাতীয় জাদুঘরে আবার মিয়ানমারের ইতিহাসের নানা অধ্যায় আমাদের চোখের সামনে খণ্ড খণ্ডভাবে উদ্ভাসিত হল। মান্দালয়ের যে রাজপ্রাসাদ জাপানি বোমায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার দুটি সোনার অলংকরণ করা বিশাল দরজা আছে একেবারে একতলাতেই, আছে সোনার সিংহাসন,-সত্যি সিংহচিহ্নিত আসন, আছে রাজা ও রানিদের, মন্ত্রীদের মূর্তি, আছে রাজারানিদের রুপোর খাট, রুপোর মাদুর, পালকি, আসবাব। দেখে মনে হল এদের আরামের ধারণাটা আমাদের চেয়ে একটু অন্যরকম ছিল, তা সত্বেও মোটামুটি সুখেই ছিল এরা। আমার বেইজিংয়ের রাজপ্রাসাদের কথা মনে পড়ছিল। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে তার কম্পাউন্ডের ধারে স্যুভেনিরের দোকানে বেশ কিছু কেনাকাটা করল আমাদের দল।

তিনটে নাগাদ বিদেশমন্ত্রকে যাবার কথা ছিল, মিয়ানমারের বিদেশ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে। সে মন্ত্রকে তাঁরা ভিডিও প্রদর্শনে তাঁদের দেশের ড্রাগ ও উপজাতি সমস্যার কথা বললেন, বললেন কীভাবে তাঁরা (সামরিক শাসকেরা) সাফল্য লাভ করেছেন। সে তো তাঁরা বলবেনই। সাফল্য যে তাঁরা লাভ করেননি তাও তো নয়। বাইরে থেকে মিয়ানমারের শহর-বাজার বেশ ঝকঝকেই দেখায়। তবু আমাদের বাসের গাইডের কথাবার্তায় একটু জ্বালা বেরিয়ে আসে। যেভাবে ১৯৮৯-এ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নেত্রী সু চি (মিয়ানমারের সর্বশ্রদ্ধেয় নেতা জেনারেল আউং সানের মেয়ে) ও তাঁর দলের সাফল্যকে উড়িয়ে দিয়ে সামরিক শাসকেরা 'স্টেট ল অ্যান্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল' বা SLORC নাম দিয়ে প্রশাসন দখল করেছিল তা মিয়ানমারের বহু গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ মেনে নিতে পারেনি। সু চি-র দল NLD বা ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি সে নির্বাচনে একাই শতকরা ৬০ ভাগ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু তার পরেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। তার পিছনে কাদের হাত ছিল সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। যাই হোক, এই সামরিক শাসকেরা তা দমন করে খুবই কৃতিত্ব দেখায়। এঁদের আরও কৃতিত্ব এঁরা দাবি করেন ড্রাগ উৎপাদন আর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আর উপজাতি বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে। তা প্রশংসাও পেয়েছে, ড্রাগ মাফিয়াদের সর্দার খুন সা এঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ইউনেস্কোর টাকায় এরা একটি বিশাল ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শশালাও বানিয়েছে। সেটি দেখারও আমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু আমি তাতে যাবার উৎসাহ পাইনি। সামরিক শাসক গোষ্ঠী এখন নিজেদের SLORC

নাম বদলে SPDC অর্থাৎ স্টেট পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নাম নিয়েছে । এই নামকরণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কী ভাবছে তা জানি না ।

বস্তুত পক্ষে আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের খোলাখুলি আলোচনার কোনও বড় সুযোগ ছিল না । এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার শুনলাম জো-র মুখে । মোবাইল টেলিফোন সেনাদলের লোকেরাই বিক্রি করে, একেকটার জন্য পনেরো-ষোল হাজার 'চাৎ' (মিয়ানমারের মুদ্রা, ইংরিজি বানান Kyat) দাম নেয় । প্রায় আমাদের টাকারই মতো তার দাম । আর তাতে বিদেশের লাইন পাওয়া যায় না, কোনও মিয়ানমারের নাগরিক সোজাসুজি বিদেশে টেলিফোন করতে পারে না, এইরকমই একটা ধারণা দিল সে । আর রাস্তাতেও আমাদের দেশের মতো কোনও STD/PCO বুথ নেই । আমরা দেশে যে কটা ফোন করেছি সব হোটেল থেকে, ডলারে, প্রচুর বেশি খরচ দিয়ে । চার্জ দু ডলার সত্তর সেন্ট উঠল তো হোটেল বলল তিন ডলার দাও । ওদিকে প্রচুর কম্পিউটারের ব্যবহার চালু হয়েছে, কিন্তু ইন্টারনেট ও ই-মেলের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ।

যাই হোক বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা সামরিক প্রশাসক জানালেন, তাঁরা ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়াতে খুবই আগ্রহী । তাঁরা আমাদের আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি, তাঁদের সৌজন্য ও আতিথেয়তারও কোনও তুলনা নেই । কিন্তু যখন জানি যে জননেত্রী সু চি-কে তাঁরা ইয়াঙ্গনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইউনিভার্সিটি অ্যাভেনিউর বাড়িতে গৃহবন্দী করে রেখেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমরা আর এঁদের 'অতিথি' এবং 'বন্ধু' থাকব না তখন মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতি থেকেই যায় ।

পাঁচই শিক্ষা দপ্তরে যাই আমরা, আর ছ তারিখে আমাদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার ছিল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে । তাঁর অফিস সংগতভাবেই আকাদেমি অব মিউজিক অ্যান্ড ডান্সের প্রাঙ্গণে, সেগুন কাঠে তৈরি একটি প্রাচীন প্রাসাদে । মন্ত্রীমশাইয়ের নাম হলোর সিখু, জানি না এর মানে কী । তাঁর ঘরে ভারি সুন্দর ছবি আছে প্রাচীন রাজধানী বাগানের, আর সিংহের মুখওয়ালা চারটি পায়ার স্ট্যান্ডে রাখা আছে একটি ছোট সিঁদুরে রঙের নৌকো, তা আসলে একটি অর্ধচন্দ্রাকার চিনা হার্প । মন্ত্রীমশাই প্রখ্যাত কবি এবং লেখক, বয়স সত্তরের ওপরে । তিনি মিয়ানমারের ইতিহাসের ওপর প্রায় একটি ক্লাস লেকচার দিলেন আমাদের সুবোধ্য ছাত্রছাত্রী পেয়ে, খাওয়াদাওয়া এবং চিনা চায়ের সুন্দর আতিথ্যও ছিল । ইংরিজিতে দোভাষীর সাহায্য নিতে হল তাঁকে । দোভাষী তাঁর দীর্ঘ বায়োডাটাও জানালেন আমাদের, এবং কোথায় কোন পুরস্কার পেয়েছেন তা বারবার করে শোনালেন । আন্তর্জাতিক নানা তুচ্ছ পুরস্কার, যা 'তুমি আমাকে একটা পুরস্কার দাও, আমি তার বদলে

তোমাকে একটা দেব’-এই শর্তে দেওয়া হয়ে থাকে, তার উল্লেখ বারবার করাতে আমাদের একটু হাসি পাচ্ছিল ।

তবে মিয়ানমারের মানুষের শতকরা ৮৫ ভাগ সাক্ষর-সে একটা কৃতিত্বের কথা বৈকি, যেখানে আমাদের হার ৬৪ শতাংশ! আর ও দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাই সরকারি, সে অর্থে কোনও প্রাইভেট স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই । সবই সরকারি সাহায্যের শিক্ষালয় । স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়ে মোট ১২ বছর, প্রাথমিকে পাঁচ, মধ্য স্কুলে চার, আর উঁচু স্কুলে তিন । তার পর জাতীয় স্তরে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা পেরিয়ে, ছাত্রছাত্রীরা ১২৫টা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকে । সাধারণ স্কুলের সংখ্যা ৩৮,০০০, তার অর্ধেকই হাই স্কুল । প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই কম্পিউটার আছে, তা প্রতিবেশীরাই দেয় । তারপর অবশ্য জানা গেল কোথাও কোথাও প্রাইভেট মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হয়েছে, তার প্রচুর মাইনে । তবে তারা ডিগ্রি দেয় না, ডিপ্লোমা আর ‘বাখালারিয়াত’ প্রোগ্রাম চালায় । প্রচুর, প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ছেলেমেয়ে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে । এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা চুক্তি আছে, চুক্তি আছে আমাদের ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও । ইংরিজি কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকেই পড়ানো হয়, কিন্তু সাধারণ লোক ইংরিজি তেমন ব্যবহার করেন না, শিক্ষামন্ত্রী নিজেও করলেন না ।

আমার স্ত্রীর নোটে দেখেছি পাঁচ জুলাই গুরুপূর্ণিমা ছিল । আসলে বর্ষা আমাদের তাড়া করছে, ফলে আকাশের দিকে অভিমানে তাকাতে ইচ্ছে হয় না । কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়লে মেঘ-পালানো নীল শূন্য সমুদ্রে সেই সোনালি উপগ্রহকে দেখে চমক লেগে যায় । যাই হোক, সে সব দেখে বিকেলে আমরা গেলাম স্থানীয় বাঙালি দুর্গাবাড়িতে । এখানে একাধিক বিগ্রহ আছে । কিন্তু বাড়িটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, আলোও কম । আমাদের মধ্যে যাঁরা ভক্তিপ্রাণ তাঁরা পুজো এবং দক্ষিণা দিলেন । দুর্গাবাড়ির পুরুতঠাকুর সম্ভবত নোয়াখালি অঞ্চলের লোক । তিনি এতগুলি বাঙালিকে দেখে খুব খুশি হলেন বলাই বাহুল্য । বললেন, এখনও ইয়াঙ্গনে প্রায় তিনশো ঘর বাঙালি থাকেন, বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে আছেন । দুয়েকটি মিয়ানমারি মহিলাকেও এসে পুজো দিতে দেখলাম । পুরুতমশাই জানালেন, তাঁরাও প্রচুর সংখ্যায় আসেন-মূল মন্দিরের পাশের একটি কুলুঙ্গিতে বুদ্ধমূর্তিও পূজা পান ।

সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে । সেখানে ছাদের ওপর রামকৃষ্ণ-সরদার মন্দির । বেশ কিছু ভক্ত এসেছেন সন্ধ্যার আরতি ও উপাসনার জন্য । সেখানেই শুনলাম আজ গুরুপূর্ণিমা । পূর্ণিমা ব্যাপারটা প্রাকৃতিক, আর তার আগের গুরু বিশেষণটা সাংস্কৃতিক । এইভাবেই প্রকৃতিকে আমরা সংস্কৃতির মধ্যে নিয়ে আসি । সেদিন হালুয়া, খিচুড়ি আর

পায়েস প্রসাদ হয়েছিল । সন্ন্যাসীদের ঘণ্টাবাদ্য সহকারে রামকৃষ্ণ-বন্দনাগানে আমাদের অনেকেই গলা মেলালেন । এখানেও পাশের একটি ঘরে বুদ্ধমূর্তি ফুল দিয়ে সাজানো, নিত্যপূজা হয় বোঝাই গেল ।

তারপর ইয়াঙ্গন বন্দরে, ইংরিজিতে যাকে বলে 'ওয়াটারফ্রন্ট' । এখানে আসার পথে মৈত্রেয়ী এক মহিলার কাছ থেকে কিনেছেন সোনালি দোলনচাঁপার সুগন্ধি কয়েকটি মালা, তা মুহূর্তেই কয়েকজনের খোঁপায় গিয়ে শোভা পেতে লাগল । প্রচুর নদী-সমুদ্রের বাতাস, পূর্ণিমা-উদ্ভাসিত সন্ধ্যা, প্রশস্ত জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা কজন হাওয়া আর জ্যোৎস্নায় ভাসছি, নদীতে অজস্র নৌকো, মোটরবোট, লঞ্চ, ছোট জাহাজ নানা গতিতে চলাফেরা করছে, ওপারের আলো দেখছি, পাশের সাদা রঙের মস্ত রেস্তোরাঁয় উজ্জ্বল দোতলায় ক্ষুধাতৃষ্ণাময় জনতার ভিড়, তার মধ্যে দলের অনুরোধে গলা থেকে গান বেরিয়ে এল 'সন্ধ্যা হল গো মা', আর 'ও অকূলের কূল ।'

এভাবেই পূর্ণিমার দিনটা শেষ হল বলতে পারলে বেশ রোম্যান্টিক হত । কিন্তু আরও কিছু ঘটনা বাকি ছিল ।

আমাদের বাস আমাদের নামিয়ে দিল 'ওরিয়েন্টাল হোটেলে'-সেই চাইনিজ রেস্তোরাঁয় আমরা ক-জন ডিনার খাব ঠিক ছিল । ডঃ পি ব্যানার্জি ও বউদি, ডঃ অভিজিৎ সেন, মালহোত্রা দম্পতি (মিঃ মালহোত্রা বিড়লাদের প্রতিষ্ঠানে আছেন), শকুন্তলা আর আমরা দুজন । খাওয়া-দাওয়া, চিনে চা এইসব দিয়ে চমৎকার উদযাপন হল, কিন্তু শুরু হল তুমুল বৃষ্টি । হোটেল খুব দূরে নয়, দু ব্লকের মতো, কিন্তু ও বৃষ্টিতে এক-পা এগোলেই হাড় অব্দি ভিজে যাব । বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণ নেই, হোটেলে ফিরব কী করে? হোটেলের একজন বয়কে দুটো ট্যাক্সি ধরতে বললাম । সে দৌড়ে ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল । তার পরে সে যা কাণ্ড করতে লাগল তাতে আমরা তাজ্জব । প্রথমে এসে বলল, ট্যাক্সি ৫০০ চাৎ চাইছে, তার পরে আবার ঘুরে এসে বলল, না ৭০০ চাতের কমে যাবে না, আবার ঘুরে এসে বলল, স্যার এ ৮০০ চাৎ ছাড়া কিছুতেই যাবে না । শুনে রেগেমেগে হোটেলে ফোন করলাম, তারা তৎক্ষণাৎ একটা ছোট বাস পাঠিয়ে আমাদের তুলে নিয়ে গেল । ট্যাক্সির নিলাম-ডাকার ফাঁদে আর পড়তে হল না ।

হোটেলও অবশ্য বিনি-মাগনায় আমাদের উবগার করেনি, তারাও ৮০০ চাৎ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়েছিল । তাতে আমরা একটু মনে দুঃখ পেয়েছিলাম ।

সব বড় বিদেশি হোটেলের মতোই এখানেও বুফে ব্রেকফাস্ট-প্রচুর পদ, রুটি, ফলপাকুড়, ভাত মাংস, ওমলেট পোচ, ফলের রস, দুধ দই-কী নেই । যে যত খুশি, যতবার পার নাও আর খাও । তারপর চা কফি ।

৬ জুলাই ব্রেকফাস্টের পরে পুরুষদের দলটা গেলাম মিয়ানমারি চেম্বার অব কমার্সে। সেখানে প্রথাগত অভ্যর্থনা বক্তৃতা, শুভেচ্ছা বিনিময়, উপহার আদানপ্রদান (এসব ব্যাপারে অমিয়দার খুব নজর)। এসবের পর ডঃ অভিজিৎ সেন মিয়ানমার ও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন, ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করে। কীভাবে কত দিকে দু দেশের বাণিজ্য বাড়তে পারে তার সুন্দর একটি রূপরেখা তৈরি করে দিলেন তিনি।

ওদিকে মেয়েরা গিয়েছিল কমিটি অব উইমেনস অ্যাফেয়ার্সে অর্থাৎ বলতে পারি নারী মন্ত্রকে। সেখানে মিয়ানমারের সমাজে আগের মতোই নারীদের প্রাধান্য আছে কিনা প্রশ্ন করা হয়েছিল। মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের জবাবে তাঁরা জানালেন, ঘরে হাট-বাজারে এখনও তাই। আমরাও তা দেখলাম। স্কটস মার্কেট নামে যে বিখ্যাত বাজারে আমাদের প্রায়ই যেতে হয়েছে তাতে অধিকাংশ দোকানি মহিলা, না হয় পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও আছে। তার পাশে রাস্তার ফুটপাথে মহিলারাই নানা সবজি আর শাক নিয়ে বসেছে, নিম্নাঙ্গে পোশাকহীন শিশুপুত্র তাদের পাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে মণিপুরের সঙ্গে মিয়ানমারের মিল আছে, স্কটস মার্কেট দেখলে ইম্ফলের 'ইমা মার্কেটের' কথা মনে পড়ে। যদিও প্রথমটা অনেক সমৃদ্ধ, সংগঠিত ও সাজানো। কিন্তু এও বোঝা গেল যে, সামরিক প্রশাসনে মেয়েদের ভূমিকা তত ব্যাপক নয়, তা হওয়া সম্ভবও নয়। তবে শিশুর স্বাভাবিক অভিভাবক মা-বাবা দুজনেই। এখন পরিবারে পুরুষ-মহিলা সমান কাজ করে। আগে পুরুষদের অলস বলে অখ্যাতি ছিল।

সাত তারিখ সকালে দলের আগ্রহী অংশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ দেখতে গেল-সেটা ইয়াঙ্গনের শহরতলির মধ্যে পড়ে। মহিলারা আবার গেলেন স্কটস মার্কেটে। সেখানে শুঁটকি মাছ থেকে সোনাদানা, রুবি (চুনি), স্যাফায়ার (নীলা), হিরে, জেডপাথর, জামাকাপড়, রঙিন পাথরের গুঁড়ো বসিয়ে তারই রঙে তৈরি ছবি, টি-শার্ট-সবই পাওয়া যায়। আমরা ছিলাম দরিদ্রতম দম্পতি, ফলে আমাদের কেনার সুখের চেয়ে দেখার সুখটাই মূলত বেছে নিতে হয়েছিল।

বিকেলে আমন্ত্রণ ছিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মিউজিয়ামে। সেখানে ওখানকার ফিল্মের জনপ্রিয় পুরস্কারধন্য নায়ক-নায়িকারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন দু পাশে দাঁড়িয়ে, সেটা একটা বলবার মতো ব্যাপার। তবে একগাদা বক্তৃতায় জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদানের পর দেখা গেল এরা কেউ সত্যজিৎ রায়ের নাম শোনেনি, তিনি কী ধরনের ছবি করতেন তাও জানে না। মিয়ানমারের ছবি একটা যুগের সোভিয়েত ছবির মতো খুব বীরত্বপূর্ণ ও নাটকীয় হয় তা বোঝা গেল, স্বদেশের আর সমাজের জন্য সবাই প্রাণ দেয়, প্রেমিকা প্রেমিককে 'যাও

বীর, অনন্তধামে যাও' বলে চোখের জলে বিদায় দিয়ে নিজে নার্স হয়ে দেশের কাজে নেমে পড়ে-এই নিয়ে সব গল্প । তবে মিউজিয়ামটি দেখে ভালো লাগল । পুরনো দিনের নানা ক্যামেরা, এডিটিংয়ের যন্ত্রপাতি, রিফ্লেক্টর এবং সাদা-কালো ও রঙিন অজস্র স্টিল ছবি দেখে ভালো লাগল ।

রাতে ছিল জম্পেশ খাওয়াদাওয়া-ভারতীয় দূতাবাসে । পুরনো রাষ্ট্রদূত সবে অন্যত্র বদলি হয়েছেন । শার্জ দ' ফেয়ার অশোক তোমর এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী মুক্তা ডি তোমর আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন । মুক্তা ডি যে একেবারে উল্টোডাঙা অঞ্চলের বাঙালি মেয়ে লোরেটো কলেজে পড়া মুক্তা দত্ত সেটা আবিষ্কার করে বেশ ভালো লাগল । স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুদর্শন । পরে তোমর সাহেব কথাপ্রসঙ্গে নিজেকে নিয়ে চমৎকার ঠাট্টা করলেন, বললেন, মুক্তা আই এফ এস (ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস) করে যখন দিল্লিতে চাণক্যপুরীর বিদেশ মন্ত্রকে যোগ দেয় এবং বছরখানেকের মধ্যে তোমর তাকে বিবাহ প্রস্তাব দেন তখন সবাই তাকে 'বেবি-স্ন্যাচার' অর্থাৎ 'বাচ্চা মেয়ে লুট করা ডাকাত' জাতীয় কিছু একটা বলেছিল । আমাদের মনে হল রূপে গুণে আর হৃদ্য জনসংযোগে এরা পরস্পরের যোগ্য অংশীদার ।

বুফে টেবিল উপাদেয় নানা ব্যঞ্জনে সাজানো । নারকোল-ছোলার ডাল, আলু-তরকারি, বিনসের একটা ভাজা ধরনের তরকারি, ডিমের ডালনা, গা-মাখা ঝোল সহ মাংসের কিমা, মুরগির ঝোল, বাসমতী (হায় বাসমতী, তুমি এখন কাদের? আমাদের না আমেরিকার?) ভাত আর নান, সেইসঙ্গে মাশরুম, পনির আর নানা সবজির একটা স্বাদু তরকারি, চাটনি, পায়েস ।

প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে খেতে খেতে ভারতীয়, মিয়ানমারি-নানা মানুষের সঙ্গে আলাপ হল । আগে আলাপ হওয়া ইয়াঙ্গন বিশ্ববিদালয়ের দুজন অধ্যাপক, একজন বর্ষীয়ান মিয়ানমারি, যিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবেও কাজ করেছেন, জানালেন তিনি শিবপুর বি ই কলেজের ছাত্র ছিলেন । বর্মি পোশাক পরে কালো কোট গায়ে এসেছেন বাঙালি অ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত । তাঁর গল্পটা দুঃখের এবং মজার । এখানকার নাগরিক তিনি, কিন্তু নাগরিকত্ব দেবার আগে এখানকার সরকার তাকে হুকুম দেয়, 'তোমার নাম বদলাতে হবে । ভারতীয় হিন্দু নাম বদলে মিয়ানমারি নাম নিতে হবে ।'

দাশগুপ্ত সরকারকে খুব একটা উকিলি প্যাঁচে ফেলে বললেন, 'আমার নাম তো বদলাতেই পারি, কিন্তু আমার বাবার নাম তো বদলাতে পারব না । আর বাবা দাশগুপ্ত, আর ছেলের নাম 'মং থাই' বা ওইরকম কিছু-এ ব্যাখ্যা করতে করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে

যাবে, তোমাদের নথিপত্রেও তালগোল পাকিয়ে যাবে । কাজেই বাপু, এ নিয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করো না ।'

সরকার বেকায়দায় পড়ে চুপ করে গেল ।

হাসি-গল্পে রাত হয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু পরদিন ভোরে বাগান রওনা হতে হবে, তাই নটা নাগাদ সকলে বিদায় নিলাম ।

৫

বাগান যে আমরা আদৌ গিয়ে উঠতে পারব সেটা আগে ভাবা যায়নি । আমাদের মূল ভ্রমণসূচিতে তা ছিল না, মিয়ানমার সরকার আমাদের ইয়াঙ্গন আর মান্দালয় সফরই অনুমোদন করেছিলেন । ব্যাপারটা যে হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সৌগত রায়ের । সৌগত ডাকাবুকো ছেলে, চমৎকার কথা বলে তার ওপর-সে পাঁচ তারিখে বিদেশ মন্ত্রকের বৈঠকে বলেই বসল, 'ইয়োর এক্সসেলেন্সি, আমরা অনেক আশা নিয়ে এসেছি, যদি আপনি দয়া করে আমাদের বাগান দেখার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব ।' ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আবেদন মঞ্জুর । এর আগে পাকিস্তানেও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবদার করে সে আমাদের মারি হিল স্টেশন বেড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ।

ফলে সকাল আটটায় আমরা এয়ার মান্দালয়ের ছোট্ট প্লেনে চড়ে বসলাম ইয়াঙ্গন এয়ারপোর্ট থেকে । প্রায় পঞ্চাশজনের মতো যাত্রী নেয়, খানিকটা রেলগাড়ির একটা এ সি কামরার মতো, নাকি তার চেয়েও ছোট । বাগানে যেতে মাত্র আধঘণ্টা লাগল । একটু পরেই ছোট্ট বাগান বিমানবন্দরে এসে নামলাম । প্রচুর হাওয়া সেই বন্দরে, নামতে গিয়ে সৌগতর নতুন কেনা ঘাসের টুপি উড়ে গেল, বিমানের একজন স্টুয়ার্ড পড়িমড়ি করে দৌড়ে গিয়ে টারম্যাক থেকে সেটি কুড়িয়ে আনলেন । আমরা কাজুবাদাম গাছের সারির মধ্য দিয়ে টার্মিনালে পৌঁছলাম, আবার টার্মিনাল থেকে বেরলাম রক্তকরবী গাছের সারির মধ্য দিয়ে । এখানেও সেই একইরকম এ সি বাস অপেক্ষা করছিল ।

বাগান (আগের নাম পাগান) একটা আশ্চর্য জায়গা । প্রাক্তন বার্মার ঐতিহাসিক রাজধানী । ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নর্মান আক্রমণের আগেই-অনুব্রত (Anawrahta) নামে রাজা ইরাবতীর ধারে এই সুন্দর নগরীতে রাজ্য স্থাপন করে, উপজাতি-বিভক্ত ব্রহ্মদেশে ঐক্য স্থাপন করেন । তিনি ছিলেন বর্মি, কারণ বর্মিরাই প্রায় ৭০ শতাংশ । সে রাজবংশ প্রায় ২৫০ বছর ধরে চলে । এ শহর যা আমরা দেখলাম তা পুরনো বাগান বটে, আবার নতুন বাগানও । নতুন বাগান মানে কী?

নতুন বাগান মানে হল পুরনো বাগান থেকে ইউনেস্কো সমস্ত জনবসতি উঠিয়ে দিয়ে অন্য একটা এলাকায় তাদের বসিয়েছে, ফলে পুরনো বাগানে আর জনবসতি নেই, যদিও চাষবাসের কিছু খেত রয়েছে সেখানে দিশি লাঙল-বলদ নিয়ে চাষবাসও হচ্ছে দেখা গেল । আছে নদীর ধারে কয়েকটি অত্যাধুনিক রিসর্ট এবং রেস্তোরাঁ । কিন্তু মানুষের ঘরবাড়ি নেই । যে দিকে তাকান, বিশাল সবুজ প্রান্তর জুড়ে শুধু মন্দির আর প্যাগোডা । প্যাগোডা হল গোলাকৃতি, ক্রমশ সরু হয়ে ওপরে উঠে-যাওয়া একেবারে নীরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র স্তূপ, আর মন্দিরগুলি আরেকটু কারুকার্যময়, তাদের একাধিক চুড়ো, আর তাদের ভেতরে বুদ্ধ ও অন্যদের মূর্তি আছে, দরজা দিয়ে ঢোকা এবং বেরনো যায় । প্যাগোডার ভেতরে ঢোকার প্রশ্নই নেই । তবে প্রায়ই প্যাগোডার সামনে বা চারদিকে একাধিক মন্দির খাড়া করে তাতে বুদ্ধের মূর্তি পূজা করা হয়, কিন্তু মূল প্যাগোডা তা থেকে বিচ্ছিন্ন । শ্রেণির প্যাগোডাকে থাই ভাষায় বলে সিডি (চৈত্য), বর্মি ভাষায় সেডি । ঘণীভূত প্যাগোডা মূলত পরিক্রমা করতে হয়, মন্দিরে তোরণ দিয়ে খানিকটা ঢুকে বৃত্তাকার চত্বরে পৌঁছতে হয় । তবে চত্বরের বাইরে ভেতরে দুজায়গাতেই প্রচুর দোকান বসে যায় ।

হোটেলে যাবার পথে একটি বড়সড় প্যাগোডা আর বুদ্ধশিষ্য আনন্দের নামে চিহ্নিত একটি বড় মন্দির দেখা হল । তারপরে হোটেলে যাবার পথে শুধুই প্যাগোডা আর মন্দির । বিয়াল্লিশ বর্গ কিলোমিটার সবুজ অঞ্চল পুষ্ট হয়েছে ইরাবতীর জলধারায়, সেই অঞ্চলের বুক জুড়ে প্রায় চারশো নির্মাণ । যদিও লোকমুখে 'চল্লিশ লক্ষ প্যাগোডা'র শহর, এবং পৃথিবীর অন্যতম 'আশ্চর্য' বলে এ শহর বিখ্যাত । প্যাগোডা ও মন্দিরগুলির কোনওটি প্রাচীন জীর্ণতা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনওটির, বিশেষত মন্দিরের মধ্যে নতুন রং ও কারিগরি জুড়েছে, যার ফল খুব ভালো দাঁড়িয়েছে বলে মনে হল না । কিন্তু ইরাবতীর পারে এই বিশাল শ্যামল ক্ষেত্রে এত প্যাগোডা ও মন্দিরের উপস্থিতি, এবং জনবসতির সম্পূর্ণ অভাব আমাদের এরকমই মনে করতে বাধ্য করে যে, আমরা ঠিক মানুষের পৃথিবীতে নেই, অন্য কোনও জগতে, হয়তো অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছি । দূরে পাহাড়ের সীমানা দেখছি বটে, কিন্তু এ প্রান্তরে শুধুই অতীতের সাক্ষ্য, বর্তমান যেন থেকেও নেই । হ্যাঁ, আছে বটে রক্তকরবী গাছের সার দেওয়া পিচের রাস্তা, আছে মাঝে মধ্যে এয়ারকন্ডিশন্ড বাস, টাটা সুমো ধরনের ভ্যান আর সাধারণ গাড়ির যাতায়াত । সেই সঙ্গে টাঙা ধরনের গাড়িও চলছে, তা এই অতীতপুরীর অতীত-চেহারাটাকে আরেকটু বর্ণাঢ্য করছে, এছাড়া আছে সমস্ত ধর্মস্থানে অনিবার্য নানা কাঠ পাথর ইত্যাদির কারুকার্যময় সামগ্রীর দোকান, তাতে সাজানো শিল্পীদের আঁকা প্যাগোডা-মন্দিরের ছবি, স্থানীয় প্যাগোডার ছাপ লাগানো টি শার্ট । এখানকার একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রচুর শিল্পী নিজেদের আঁকা ওই ধরনের ছবি সাজিয়ে বসে যায় জনপ্রিয় প্যাগোডা বা মন্দিরের

সামনে, বলে আমার নিজস্ব ছবি কেনো, বাগানের একটা শ্রেষ্ঠ স্মৃতি নিয়ে যাও তোমার বাড়িতে । কিছু ছেলে-ছোকরা পাশে এসে গোপন কথা বলার ধরনে ফিসফিস করে খবরের কাগজে মোড়া নানা পাথরের মূর্তি খুলে দেখায়, সেগুলি মঙ্গোলীয় ধরনের বুদ্ধ, বা হাতি ইত্যাদির মূর্তি । অবশ্য বুদ্ধ সম্ভবত মূলত মঙ্গোলীয়ই ছিলেন, নেপালে তাঁর জন্ম । আর সেসব দোকানে সাজানো আছে প্রচুর গালা বা ল্যাকারের তৈরি বাটি বাক্স চা-কোস্টার কৌটো ইত্যাদি । কিছু ভিক্ষার্থী ছেলেমেয়েও জুটে যায়, আমাদের মতো গরিব দেশে এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু তারা তুলনায় ভদ্র ।

দুপুরে খাওয়া হল ইরাবতীর ধারে চমৎকার একটি চিনা রেস্তোরাঁয় । তাতে খাওয়া উত্তম ছিল (কিন্তু কী কারণে জানি না, পরে সেদিন দুয়েকজনের পেট বিদ্রোহ করেছিল), তবে ইরাবতীর একেবারে ধারে, একদিকে সবুজ অরণ্যশোভাতে হাওয়ার দুলুনি আর অন্যদিকে সাজানো বাগানের মাঝখানে, চারদিক খোলা মস্ত খড়ের চালাঘরের নিচে লম্বা কাঠের টেবিলে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই লেগেছিল আমার ।

আমাদের হোটেলটিও (বাগান থান্দে হোটেল) ছিল রিসর্ট ধরনের, অসংখ্য ছোট ছোট কটেজে সাজানো এবং প্রত্যেকটি কুটিরে এয়ারকন্ডিশনিং সহ একেবারে পাঁচতারা ব্যবস্থা । কয়েকটি ছিল একেবারে ইরাবতীর ধারে, বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলেই সামনে উঠোনের তলায় ইরাবতীর ঢেউ এসে ভাঙছে । উঠোনটা যেন একটা বাঁধের মতো-আর প্রশস্ত ইরাবতী বর্ষার বিপুল ঘোলাজল নিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে, ওপারে ছায়াময় পাহাড়ের কোলে জনবসতির ছড়ানো-ছিটানো চিহ্ন । লঞ্চ, মোটরবোট, নৌকো চলেছে, কোনও নৌকোয় পুরুষ হাল ধরে, তার স্ত্রী তিনকোনা পালের প্রান্ত ধরে বাতাসের গতি সামলে নৌকোর অগ্রগতি বজায় রাখার চেষ্টা করছে । ইরাবতীর ধারের কটেজ আমরা পাইনি, কিন্তু সাজানো দোলনাওয়ালা লন ও ফুলবাগানের মধ্যে আমাদের ছোট্ট কটেজটিও বেশ মনোরম ছিল ।

বিকেলে আবার বেরনো হল । গাইড প্রথমে নিয়ে গেল গালার জিনিসপত্র তৈরির দোকানে । সেখানে কারখানায় কারিগররা বসে একেবারে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত গালার জিনিসপত্র কীভাবে তৈরি হয় তা দেখাবার ব্যবস্থা রেখেছে, খানিকটা আধুনিক কারখানার অ্যাসেমব্লি লাইনের ধরনে । আমি এ পর্যন্ত জানতাম যে, গালার পাত্রগুলির ভিত্তি হল কাঠ বা 'পাপিয়ের মাশে' বা কাগজমণ্ড । কিন্তু এখানে এসে আমার এই জ্ঞান হল যে, অতি পাতলা করে ছিলে নেওয়া বাঁশের ফিতে জুড়ে বা পেঁচিয়ে বাক্স, কৌটো সবই তৈরি হচ্ছে, আর তারই ওপর থাকছে গালার চমৎকার সব কারুকৃতি । দেখে অবাক হতে হয় ।

বাগানের গালার কাজ খুবই বিখ্যাত। তাই এখানকার গালার জিনিস একেবারে 'আসল' বলে গণ্য। আমরা অবশ্য বাইরে থেকে আসল-নকল কিছুই ধরতে পারব না।

যাই হোক, এদের কারখানার লাগোয়াই মস্ত দোকান-তাতে সেলফে সেলফে অজস্র নানা সাইজের ল্যাকারের দ্রব্য সাজানো, গরিবের ছোট বাটি আর টি-কোস্টার থেকে বড়লোকের সিন্দুক বা ভাঁজ করা স্ক্রিন পর্যন্ত আছে। সেখানে আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, আমরা গরিবের এলাকায় ঘোরাঘুরি করছি, অন্যরা উদ্দাম টানাপোড়েনে ব্যস্ত। শুভাপ্রসন্ন একটা আস্ত তোরঙ্গ কিনে ফেললেন। তাঁর দেখার চোখ আছে, আরেকটা জিনিস পছন্দ হলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও তা কেনা থেকে আটকানো যাবে না। এ আমরা পাকিস্তানেও দেখেছি। অবশ্যই তিনি যা কেনেন তা কেনবারই মতো।

এর মধ্যে ছায়া নামছে দেখে কেনাকাটার উৎসাহ আপাতত স্থগিত রেখে, কিন্তু প্রচুর প্যাকেট বগলদাবা করে আমাদের দলটা আবার বাগান দেখতে বেরিয়ে পড়ল। দোকানে এসেছিলাম 'নিউ বাগানে', আর ফিরে যাচ্ছি প্রাচীন বাগানে। সেখানে একটি উঁচু প্যাগোডার বড় বড় সিঁড়ি ঠেঙিয়ে চারতলায় উঠে অসামান্য এক সূর্যাস্ত দেখলাম। মেঘলা মেঘলা আকাশ, তার মধ্য থেকে ধূসর উজ্জ্বল সূর্যের আলো নানা ভাগে ও স্তরে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বাগানের দিগন্তে এসে পড়ছে, অন্যদিকে ম্লানমন্থর ইরাবতীর বুকে গিয়ে তার শেষ আভাটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এইরকম দৃশ্য যে কোনওদিন দেখতে পাব তা জন্মকাল থেকে ভাবা যায়নি, দেখতে পেলাম বলে জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে ইরাবতীর ধারে হোটেলেরই একটা চেয়ার সাজানো পার্কে বসে রাত পর্যন্ত নদীর ছলাৎ ছলাৎ শুনলাম। রাতে ডিনারের সময় ডাইনিং হলেই একপাশে স্টেজ করে আমাদের নানা পুতুলনাচ দেখানো হল। বর্মি পুতুলনাচও খুব বিখ্যাত।

৬

বাগান থেকে মান্দালয়ও আধঘণ্টার উড়ান। পরদিন সকাল আটটার ফ্লাইটে, ওই একই ধরনের প্লেনে, আমরা মান্দালয় গিয়ে নামলাম। ওরা অনেকে বলে মান্দালে। মান্দালয় এয়ারপোর্ট থেকে শহর অনেকটা দূর। যেতে যেতে প্রচুর ধানখেত ছাড়িয়ে গেলাম, ছোট ছোট জনবসতি, আর তাতে একাধিক প্যাগোডা। একটি-দুটি তো দিগন্তে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এয়ারপোর্টের রাস্তা থেকে মান্দালয়-ইয়াঙ্গন হাইওয়েতে পড়লাম। তখন গাইড বলল, বাসে ইয়াঙ্গন থেকে আসতে লাগে পনেরো-ষোল ঘণ্টা, ট্রেনেও প্রায় তাই। যেতে যেতে আমরা রেললাইনও পেরিয়ে গেলাম। একটু ডাইনে স্টেশন দেখা গেল। তার

একপাশে অসংখ্য বিশাল সেগুন কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাখা আছে । সেগুলি ট্রেনে ইয়াঙ্গন যাবে, সেখান থেকে বিদেশে । বার্মা 'টিক' বা মিয়ানমারের সেগুনকাঠের গুণ কে না জানে । এ লাইনটা লিখতে লিখতেই মনে পড়ে গেল বুদ্ধদেব বসুর মজার কবিতায় ঢাকা শহরের বর্ণনার একটা লাইন-'ফাগুনের গুণে সেগুনবাগানে আগুনে বেগুন পোড়ে ।' দেখুন, এতে 'বাগান'ও আছে, সেগুনও আছে । কিন্তু বুদ্ধদেব মিয়ানমারের কথা ঠিক তখন ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না ।

বুদ্ধদেব থেকে বৌদ্ধদের কথায় চলে আসা সহজ । বাসের জানলা দিয়ে আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, যা ইয়াঙ্গনে তেমনভাবে দেখিনি । সকালের রোদের মধ্যে লাইন করে গাঢ় লাল/ মেরুন পট্টবস্ত্র পরা অজস্র খুদে খুদে ন্যাড়া মাথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বেরিয়েছে । তাদের প্রত্যেকের কোলে একটা হাতল-লাগানো চকচকে পালিশ করা কাঠের হাঁড়ি । তারা 'মাধুকরী'তে বেরিয়েছে । ইয়াঙ্গনে আমাদের গাইড বলেছিল, প্রতিটি মিয়ানমারি ছেলেকে জীবনে অন্তত সাতদিনের জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতে হয় । কেউ কেউ একাধিকবার এবং বেশি দিনের জন্যও হতে পারে । সেখানে তারা পঞ্চবুদ্ধের উপাসনা করতে শেখে । পঞ্চবুদ্ধ হলেন মা-বাবা, শিক্ষক, শ্রমণ, ধর্মগ্রন্থ এবং স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ । সন্ন্যাসী তখন তারা কোনও-না-কোনও প্যাগোডার আশ্রমে চলে আসে, মস্তক মুণ্ডন করে, এবং রোজ সকালে ভিক্ষে করে সেদিনকার খাদ্য সংগ্রহ করে । অনেক গৃহস্থ এদের জন্য আলাদা করে রান্না করে রাখে, ভাত ও অন্যান্য তরকারি । এরা এলে কোলের এই পাত্রে তা ঢেলে দেয় । এটা বিশ্বাসী গৃহস্থদের কাছে একটা পরম পুণ্যের কাজ । সকালের উজ্জ্বল রৌদ্রস্নাত রাস্তায় এই বালক সন্ন্যাসীরা তাদের পোশকের গাঢ় রঙের ঢেউ খেলিয়ে চলেছে, অনেকের মুখের দুষ্টুমি ধর্মের শাসনে ঢাকা পড়েনি, কেউ সামনের জনকে ঠেলা দিচ্ছে, লাইন ভেঙে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, সঙ্গে মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী এসব দেখেও দেখছেন না ।

মান্দালয়ে এসে প্রথমে যে বড় কাজ হল, সেটা খাওয়াদাওয়া । আবার এক চিনা রেস্তোরাঁয়, নাম 'গোল্ডেন ডাক' । এটি রাজপ্রাসাদ-পরিখার একেবারে ধারেই । তিনতলায় কাচে ঘেরা ডাইনিং হলে বসে পুরো রাজপ্রাসাদের মুখোমুখি হয়ে খাওয়াদাওয়া ভালোই হল । খাদ্যবস্তুর বর্ণনা করে আর পাঠকদের জিভে জল আনতে চাই না । তারপর বিদেশি মুদ্রা-বিনিময় হল একটা ব্যাঙ্কে গিয়ে ।

মিয়ানমারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম এই মুদ্রাবিনিময়ের ব্যাপারে । ইয়াঙ্গনে দশ ডলার বা দশ এফ ই সি-র বদলে আমরা পেয়েছিলাম ৫০০ চাৎ । বাগানে হঠাৎ থান্দে হোটেল ৪০০ দিতে চাইল, অনেক দরাদরি করে ৪৫০তে উঠল । মান্দালয়ে ৪৫০-এর বেশি পাওয়া গেল না । একই দেশে নানা জায়গায় ডলার বা এফ ই সি-র নানারকম

দর দেখে বোঝা গেল সামরিক প্রশাসনের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছয় না । আরও একটা জিনিস দেখলাম । আমাদের যা কিছু বিনিময় হয়েছে সবই কাগজের মুদ্রায় । ধাতুর কোনও মুদ্রা আমাদের হাতে আসেনি ।

মান্দালয়ের হোটেলটিও বেশ ভালো, নাম 'সোয়ান হোটেল' । সেখানে এসে দুপুরে একটু বিশ্রামের পর বিকেলে বেরিয়ে পড়া গেল । প্রথমে যাবার কথা ছিল মণিমুক্তোর দোকানে, কিন্তু প্রাসাদ বন্ধ হয়ে যাবে বলে তাদের বলা হল আমরা ফেরার সময় আসব । 'আমরা' কথাটা গৌরবার্থে, এক্ষেত্রে অন্যদের আগ্রহ আর সামর্থ্যের সঙ্গে আমাদের ওসবের তুলনাই হয় না ।

মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদটি প্রায় চার বর্গমাইল এক বর্গক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত । তাকে চারদিকে ঘিরে আছে ছোট্ট নদীর মতো স্বচ্ছ জলের একটি পরিখা । চিনদেশে, এমনকী মণিপুরে (ইম্ফলে) এ ধরনের প্রাসাদ পরিকল্পনা আমরা দেখেছি । মূল প্রাসাদটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি বোমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় । ইউনেস্কোর সহায়তায় এই নতুন সোনালি প্রাসাদ আবার তৈরি হয়েছে, আকাশ ফুঁড়ে সূর্যকে বলবার চেষ্টা করছে, 'দেখো, আমিও তোমার চেয়ে কম উজ্জ্বল নই ।' প্রাসাদটি অনেকটা চিনা প্যাভেলিয়নের ধরনে পরপর কয়েকটি প্যাগোডা জুড়ে তৈরি । কিন্তু এ প্যাগোডা বাটি ওল্টানো কঠিন স্তূপ নয়, বরং পাইন গাছের ছড়ানো ডালের মতো একাধিক কাঠের ছাদ জুড়ে তৈরি । তাদের সোনালি শীর্ষ আকাশে সদর্পে মাথা তুলেছে । প্রথমটিতে ছিল সেই বিখ্যাত সোনার দরজাওয়ালা সিংহাসন, যেটি আমরা ইয়াঙ্গনের জাদুঘরে দেখেছি । এখানে তার একটি অনুরূপ তৈরি করা হয়েছে, সেটিও সোনার রঙে ঝলমল করছে । প্রথম প্যাগোডাটিতে রাজা দরবার বসাতেন । তারপর দু-তিনটি প্যাগোডা পার হয়ে সেই বিখ্যাত আরশি প্রাসাদ বা Glass Palace, অমিতাভ ঘোষের ইংরিজি উপন্যাসে যার বিবরণ আছে । গ্লাস প্যালেস মানে কাঠের জাফরি ও অন্যান্য আসবাবের গায়ে অসংখ্য আয়নার টুকরো লাগানো, মোগলদের শিশমহলের মতো । কাঠের জাফরির খাটো বেড়া দেওয়া থামওয়ালা হলঘর, শেষদিকে আবার রাজসিংহাসন । কিন্তু সবই শূন্য । রাজারা উধাও হয়ে গেছে, প্রাসাদে তাদের কোনও জীবিত স্মৃতি নেই-এ শুধু ট্যুরিস্টদের জন্য সাজিয়ে রাখা খেলনা-প্রাসাদ । আমরা ঘোরাঘুরি করলাম, লনে দাঁড়িয়ে নানাভাবে প্যাগোডা-শীর্ষ আর নিজেদের ছবি তুললাম, কিন্তু মন ভরল না ।

এই প্রাসাদের বিশাল সীমানার এক কোণে ইংরেজরা বানিয়েছিল মান্দালয়ের বিখ্যাত জেলখানা, যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র কিছুদিন বন্দী ছিলেন । প্রাসাদ থেকে সেটা দেখা গেল না, কিন্তু বিকেলে মান্দালয় পাহাড়ে উঠে তার জরাজীর্ণ টিনের ছাদ দূর থেকে

দূরবীন দিয়ে দেখেছি । এখন অবশ্য সম্পূর্ণ অন্যদিকে বিশাল কংক্রিট কারাগার তৈরি হয়েছে, পুরনো জেলখানা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ।

এরপর আমরা গেলাম এক বৌদ্ধ মঠে যার নাম ইনকম্প্যারেবল মনাস্ট্রি বা অতুলনীয় সংঘারাম । এখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে প্রায় চারশো ভিক্ষু শিক্ষাদীক্ষা নেয়, রাষ্ট্র তাদের সাহায্য করে । তার পাশেই গোল্ড প্যালেস মিউজিয়াম-প্রাচীন রাজধানী থেকে এই কাঠের খোদাই করা আসল প্রাসাদটি এখানে তুলে এনে রাখা হয়েছিল । প্রাসাদটি দোতলা, কিন্তু একতলা মূলত ভিত, থাম বসানো । আমাদের জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল । অসামান্য সব কাঠের প্যানেল ও কারুকার্য । তার কিছু কিছু ক্ষয় হয়ে এসেছে, মনে হল নতুন যুগের প্যানেলও কিছু বসেছে । এই প্রাসাদ ও মঠ সংঘারামগুলিতে চিনা স্থাপত্যকলার প্রভাব সবচেয়ে বেশি । তবু কোনও কোনও ছোট প্যানেলে হাতি বা হাঁসের ডিজাইন দেখে অজন্তার কথা মনে পড়ছিল ।

সেখান থেকে মান্দালয়ের বিখ্যাত মহামুনি প্যাগোডায় যাবার পথে বাস আমাদের এমন এক পাড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল যেখানে শ্বেতপাথরে শুধু মূর্তি খোদা হয়, মূলত বুদ্ধমূর্তি । সে এক বিশাল পাড়া । রাস্তার দুধারে নানা আয়তন ও আকারের বুদ্ধ বসে আছেন, সকলেরই ঘাড় খাটো, মুখটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের-অর্থাৎ নাকের তলার দিকটা চওড়া, চোখদুটি ছোট ও বাঁকা, সেই অবস্থায় অর্ধনিমীলিত, কিন্তু মুখে আশ্চর্য প্রশান্তি । কোনও বিশাল বুদ্ধকে কাঠের খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে, জাহাজে দূর দেশে কোথাও পাঠানো হবে । এখান থেকে চিন, জাপান, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-সমস্ত পৃথিবীতেই বুদ্ধমূর্তি যায় । আমার নিজের অবশ্য এখানকার মূর্তিকলা শিল্প হিসাবে খুব একটা আহামরি লাগল না । খানিকটা চিৎপুরের জয়পুরী কারিগরদের শ্বেতপাথরের মূর্তিকলার কথা মনে পড়ছিল ।

মহা মিয়াৎ মুনি প্যাগোডা দক্ষিণ মান্দালয়ের বিশাল তীর্থস্থান-গেটটিই প্যাগোডার মতো, তার বাইরে মস্ত নীল জলের সরোবর, সেটি আবার দুদিকে ছোট ছোট প্যাগোডা দিয়ে ঘেরা । এসব দেখে আমাদের বাগানের সেই গাইডটির কথা মনে পড়ছিল-'ওনলি প্যাগোডা, প্যাগোডা, প্যাগোডা!' প্যাগোডার ভেতরেও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তার সঙ্গে লাগানো বুদ্ধের বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি-আরাকান থেকে আনা । আরাকানের নাম এখন রাখিন । মূর্তি ব্রোঞ্জের হলে কী হবে, ভক্ত আর পুণ্যার্থীদের দেওয়া ছোট ছোট সোনার পাতা গায়ে চেপে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে সে মূর্তির মূল সৌন্দর্য আর নেই, তাঁর হাত বুক ইত্যাদি বেঢপ দেখায়, মনে হয় তাঁর কোনও বিশ্রী অঙ্গবিকৃতির অসুখ হয়েছে । সোনার পাতায় মুড়ে বুদ্ধের মূল্য বেড়েছে কি না জানি না, কিন্তু সৌন্দর্য বেশ নষ্ট হয়েছে । এ হল ভক্তের স্বার্থপর ভক্তির অত্যাচার, যা প্রায়ই আরাধ্য দেবতাকে অসুবিধায় ফেলে ।

এর আগেই বোধহয় আমরা গিয়েছিলাম একটি লোকশিল্পের কারখানায়, যেখানে পুতুলনাচের পুতুল থেকে আরম্ভ করে কাঠের কাজ, দামি পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ছবি, গালার জিনিস-আরও অজস্র দ্রষ্টব্য (এবং ক্রেতব্য) সাজানো ছিল । যাঁরা কেনবার তাঁরা কিনলেন, আমরা দেখে তৃপ্ত বা অতৃপ্ত হলাম । সোক্রাতেসের মতো যে বলব 'দেখো, কত জিনিস ছাড়াই আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে'-এই অহংকার করার মতো সাহস নেই । এই ভোগবাদের দিনে মনে হয় আমাদের জন্য না হোক, সন্তানদের জন্য দুটো-একটা দ্রব্য নিতে পারলে হত । কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক । পরে সিল্ক বোনবার কারখানায় গিয়েও এমন কথাই মনে হয়েছিল । সেখানে লম্বা হলঘরে অসংখ্য তাঁত সাজানো, তাতে নানা রঙের সুতো, সুতোয় রং করার সরঞ্জাম, কীভাবে সে সুতো গেঁথে অসাধারণ নকশার মসৃণ কাপড় তৈরি হচ্ছে সবই দেখা গেল । তবে কারখানা-ঘরের প্রান্তে দোকানে গিয়েই আবার 'এসবে কী হবে, এ জীবন কি শুধু ভোগের জন্য'-এইসব দার্শনিকতায় ডুবে যেতে হল । অবশ্য একেবারে কিছুই কিনিনি তা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে । নিজের জন্য একটা সুতির বর্মি জ্যাকেট সঙ্গী ভদ্রমহিলা জোর করে কিনতে বাধ্য করলেন ।

সবচেয়ে ভালো লাগল মান্দালয় পাহাড়ে চড়ে । দিনের শেষে ছিল সেই যাত্রা । পাদদেশে দুটি বিশাল সাদা চিনা ধরনের সিংহের কাছে আমাদের বড় বাস গিয়ে থামল । এরপর ছোট বাসে পাহাড়ে উঠব । নাহলে দুই সিংহের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, সে প্রায় সতেরোশো ধাপ । আমার মতো পেসমেকার বসানো লোকের পক্ষে উচিত নয় অত সিঁড়ি ভাঙা ।

কিন্তু বাস গিয়ে যেখানে শেষ দাঁড়াল সেটা পাহাড়ের আরেকটা ধাপ । সেখান থেকে উঠতে হবে এসকেলেটর বা চলন্ত সিঁড়িতে । আমরা তথাকথিত 'ভি আই পি' বলে সামরিক শাসকেরা আমাদের জন্য সেটি চালু রেখেছিলেন, ফলে মস্ত উঁচু পাহাড়শীর্ষে আমরা প্রায় এক নিমেষে উঠে গেলাম । এখানে শ্বেতবস্ত্রধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন । সেখানে আমাদের দল কিছু অর্ঘ্য দিল, বুদ্ধমূর্তির সামনে সাজানো শূন্য ফুলদানিতে ফুলের তোড়াগুলি সাজিয়ে রাখা হল-সেই পুষ্পস্তবকে পামের পাতার সঙ্গে দোলনচাঁপার ডাল ও স্তবকও ছিল-সেগুলো আমাদের প্রত্যেকের হাতে সন্ন্যাসীরা একটা করে দিয়েছিলেন । সৌগত রায় আমাদের সকলের পক্ষ থেকে বৌদ্ধমন্দিরে কিছু প্রণামী দিলেন, আর আমরা-ভিক্ষু সন্ন্যাসী এবং ছাপোষা গৃহস্থরা একসঙ্গে সমস্বরে প্রার্থনা করলাম 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' । মুহূর্তের জন্য হলেও একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি হল । মূল মন্দিরের বাইরে-শোয়েডাগনে প্রথম দেখা, সাতটি 'বারের' প্রতীকী মূর্তি (বুদ্ধের মতোই)-বুধবারের দুবেলার জন্য আবার দুটি, অর্থাৎ মোট আটটি মূর্তি । আমাদের মহিলারা এবং অধিকাংশ

ছেলেরাও মূর্তির মাথায় জল ঢাললেন । তবে কেবল নিজের 'জন্মবারে'র উদ্দেশ্যে নয়, সব'বার' সন্তুষ্ট করা হল । তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ, এবং সবশেষে প্রশস্ত বারান্দায় সোফায় বসিয়ে সবাইকে খাদ্য ও (নির্দোষ) পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা (এটা সামরিক শাসনকর্তাদের তরফে আয়োজিত) । স্বাগত ও ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা-সবই চমৎকার হল ।

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগল এই স্বর্গলোক থেকে পুরো মান্দালয়, আর দূরে পশ্চিমে বন্যা জলে বন্ধ বিস্তারিত ইরাবতীকে দেখতে । এখানেও বিকেল হয়ে আসছে, আকাশে ধূসর মেঘের নানা পরত, তারই মধ্যে অনুজ্জ্বল সূর্যালোক খানিকটা নিস্তেজ হয়ে নিভে আসছে, আর ইরাবতী তার নানা ডালপালা নিয়ে নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বহু জনপদ এই বর্ষায় প্লাবিত করে বয়ে চলেছে । কত হাজার বছর ধরে সে এমনভাবে বইছে কে জানে? আমাদের সামনে ছড়ানো পুরো মান্দালয় শহর । ওই যে দূরে প্রাসাদ, তার উত্তর-পশ্চিম কোণেই সম্ভবত পুরনো জেলখানার লম্বা টিনের চালা দেখা যাচ্ছে । ডানদিকে নতুন জেলখানা গড়ে উঠেছে তাও দেখালেন এক সন্ন্যাসী । এ শহরে বেশি হাইরাইজ বাড়ি নেই, প্রচুর গাছপালা, আমার খানিকটা জাপানের কিয়োতো শহরের কথা মনে এল ।

এখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না । আবার এসকেলেটর ধরে নেমে, আরও প্যাগোডা, তার একটাতে তো সাতশো পঁয়ত্রিশটা মন্দির । তার প্রত্যেকটার প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের একটা করে পাতা লেখা আছে পালি ভাষায়, কিন্তু বর্মি অক্ষরে । ওরা বলে 'পৃথিবীর বৃহত্তম পুথি' এটা । মনে পড়ল কোরিয়ার বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দিরেও এই ত্রিপিটক ছিল কাঠের ফলকে খোদাই ।

সেই যে মণিমুক্তা এবং উপহার সামগ্রীর দোকান-তারা আমাদের ফিরতে দেরি দেখে হতাশ হয়ে দোকানে প্রায় তালা লাগাতে যাচ্ছিল । আমাদের বাস গিয়ে দাঁড়াতেই আবার হৈ হৈ করে মেয়েরা তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে দোকান জমজমাট করে ফেলল । এতে যে তাদের প্রতীক্ষা আর পরিশ্রম বৃথা হয়েছিল তা বলা যাবে না । বিক্রিবাটা ভালোই হল ।

৭

পরদিন আবার সেই ছোট প্লেনে ইয়াঙ্গন । এবারও একটু সকাল সকাল, যাতে একটা পুরো দিন ইয়াঙ্গনে পাই । সাক্ষাৎকার আছে সামরিক প্রশাসনের সবচেয়ে শক্তিমান সেনাপতি জেনারেল আবেলের সঙ্গে । সেইসঙ্গে ইয়াঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার শিক্ষক-প্রক্ষিণের কাণ্ড কারখানা দেখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কুলে ইউনিফর্ম পরা

ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে ঢুকে তাদের সন্ত্রস্ত মুখ-টেপা হাসি ও সৌজন্য দেখে গবেষণাকেন্দ্রে পদার্পণ ও প্রদক্ষিণ এসব ছিল । সবই হল । এসব নিছক সরকারি দায়, তবে তারই মধ্যে ইয়াঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছপালা আর বাগান সাজানো সবুজ প্রাঙ্গণে তুমুল বৃষ্টি নেমে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটু বৈচিত্র্য এনেছিল । সামরিক প্রশাসনের ভবনে জেনারেল আবেলও খুব খাতির করলেন, বললেন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বাড়াতে তিনিও খুব আগ্রহী । তারপরে আরেকবার সেই স্কট মার্কেটে যাওয়া হল, অনেকে হুমড়ি খেয়ে সোনার গয়না, কারুময় স্ক্রিন, পাথরের গাছ, চুনিপাথর, টি-শার্ট থেকে চিংড়ি-শুঁটকির প্যাকেট ইত্যাদি কিনলেন, আমরাও তলার দিকে যোগ দিলাম ।

১০ জুলাই তারিখে দুটি বাঙালি ছেলে, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় আর দেবাশিস ঘোষ আমাদের সেই হংসপ্রাসাদের কাছে রয়্যাল প্যালেস হোটেল নামে একটি বিখ্যাত চিনা রেস্তোরাঁয় অসাধারণ একটি লাঞ্চ খাইয়েছিল, সে কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে । বিদেশে এমন আন্তরিকতা দুর্লভ । ছেলেদুটি মনেপ্রাণে বাঙালি, এত উঁচু পদে আছে তবু তাদের মমতা ও বিনয় দেখবার মতো ।

রাতে ছিল ইয়াঙ্গনের ভারতীয় গোষ্ঠীর ডিনার, আমাদের সেই সামিট পার্ক ভিউ হোটেলেই । প্রায় তিনশো ভারতীয়, শার্জ দ' ফেয়ার আর তার স্ত্রী মুক্তা, আরও প্রচুর বাঙালি-দেবাশিস তার স্ত্রী ও শিশুপুত্র সহ-সবাই এসে হোটেলের টেবিল-চেয়ার সাজানো হলঘর জমজমাট করে তুলল । ভারতীয় গোষ্ঠীর সংগঠক নরেশকুমার দিনোদিয়া সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন, বক্তৃতা প্রতি-বক্তৃতা হল, এমনকী একটি বিদেশি লোকসংগীতও হল ।

আর খাবারদাবারের বিবরণ দিয়ে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না । ফেরার আগের দিন মিয়ানমারের ভারতীয়দের এই বিদায় ভোজ আমাদের সকলেরই মনকে ছুঁয়ে গেল ।

ফেরার দিন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আকাশে মেঘ দেখে ফিরে এলাম । হোটেলের বাগানে নাগকেশর (স্থানীয় নাম 'কাঙ্কা') গাছে সবুজ পাতার ওপরে সরু নতুন লালপাতার আস্তরণ পড়েছে, এক গাছের চুড়োয় যেন গজিয়ে গেছে অন্য একটা ফুল গাছ । এইসব দেখে ঘরে ফিরে টিভিতে ইভানোসেভিচ ও র্যাফটারের পুরনো উইম্বলডন ফাইন্যাল দেখছি । আজ বিকেলে ফেরার ফ্লাইট । এখান থেকে ওই একই ফ্লাইট ব্যাংকক যাবে, তারপর সন্ধে কলকাতা ফিরবে । এ যেন তালতলা দিয়ে খোদার হাট ।

সে যা হয় হবে । আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা গোছানো শেষ । এবার আমরা একটু কফি খাব ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

. পসী রিশপ

হীরক নন্দী

খাদের ধার ধরে তরতর করে উঠে চলেছে নাসি । পিছন থেকে বাবা ডেকেছে 'আস্তে চলো নাসি, চোখের বাইরে যেও না', নাসির বিকার নেই । না থেমেই বলল, 'আমি ফার্স্ট হব ।' বেগতিক দেখে বললাম, 'নাসি, যারা ফার্স্ট হয় তারা পিছনের লোকেদের পথ দেখিয়ে চলে । তুমি চলে গেলে আমাদের গাইড করবে কে?' এবারে কাজ হল কিছুটা । নেপোলিয়ানের মতো পিছনে হাত দুটো জড়ো করে নাসি ঘুরে দাঁড়াল । বলল, 'আমি সামনের গাইড, বাবা পিছনের গাইড' । যা বলে তাই সই, কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ের খাদের ধারে ধারে মেঘের মতো গা ভাসিয়ে চলা, পা ফসকালে কম করেও এক-দেড়শো ফুট । আসলে নাসির ধৈর্যহানির কারণ আছে কিছুটা । টিফিন দাঁড়ার মাথায় উঠতে গাঁয়ের লোকেরা যে পথটা ব্যবহার করে, সেটা প্রায় সরাসরি মইয়ের মতো ওপরে গেছে । আমরা শহরের লোক, পাকদণ্ডীর পথে ঘুরে ঘুরে হেঁটে চলেছি । সামনে ছ বছরের নাসি ওরফে অহনা পাল আর পিছনে তার বাবা । নাসি পর্বতকন্যা, রিশপ গ্রামের মেয়ে । অতটা গড়িমসি আর দুপা গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের নামে হাঁফ ছাড়া তার সইবে কেন!

নাসি বা তার বাবা, খুব স্বাভাবিকভাবেই কেউই আদতে গাইড নয়, ওর বাবা বরং পথিকৃৎ । ১৯৯৮ সালের নাম না-জানা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম রিশপে যখন প্রথম ট্যুরিস্টের পা পড়ে, তারা আশ্রয় পেয়েছিল পালবাবুরই জমিতে দুটো অস্থায়ী তাঁবুতে । ডুয়ার্সের নতুন আকর্ষণ লাভা তখন সবে সেজে উঠেছে । পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের থাকার জায়গাগুলো ছাড়া উঁকি মেরেছে হাতে গোনা কিছু বেসরকারি হোটেল । পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিনকে দিন । কিন্তু একটা সফল পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট যোগ্যতা সত্বেও একটা বিষয়ে লাভার সামান্য একটু অভাব ছিল । লাভার জনবসতির মধ্যে থেকে দার্জিলিং জেলার পর্যটনের যেটা অমোঘ আকর্ষণ সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না । অবশ্য লাভা থেকে সামান্য পুবদিকে সরতে থাকলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা সবান্ধবে একটু একটু করে ধরা দিতে থাকে, তবু ঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে বা চৌকাঠ পেরোলেই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে হাতের সামনে পাওয়ার যে পূর্ণতা, সেটুকু বিলোতে লাভা বরাবরই অক্ষম । যাদের পায়ে কিছুটা জোর আছে, তাদের

আরেকটা উপায় ছিল লাভা থেকে সাড়ে তিন-চার কিলোমিটার হাঁটাপথে টিফিন দাঁড়ার মাথায় চড়া, যদিও কম লোকেই সে পথে পা বাড়াত ।

নাসির বাবা পালবাবু তখন লাভায় একটা গেস্টহাউস চালান । শিলিগুড়ির পর্যটন সংস্থা হেল্প ট্যুরিজম-এর উৎসাহ আর আগ্রহে ওই সংস্থারই সঞ্জীব সাহার সঙ্গে একদিন ভরা বাদলের মরসুমে দুজনে গিয়ে হাজির হলেন টিফিন দাঁড়ার উত্তর-উত্তর পূর্ব ঢালের ছোট গ্রাম রিশপে । রিশপের ওপারে তখন সাদায় সাদা, ঘন মেঘে কাঞ্চনজঙ্ঘা তো দূরে থাক সামনের গ্রামগুলো পর্যন্ত ভালোমতো চোখে পড়ে না । তবু জায়গাটা মনে ধরল দুজনেরই । বিদ্যুৎ নেই, জলও পর্যাপ্ত নয় । যেটা ছিল তা হল মেঘ কাটলেই কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিপূর্ণ আশ্বাস, যে মুখে একবার তাকালে অতি বড় যাযাবরেরও সর্বশান্তি । তখন ১৯৯৮ সালের বর্ষার মাঝামাঝি । দু-তিন মাসের মধ্যেই তাঁবু ফেলার বন্দোবস্ত হল পালবাবুর টুকরো জমিতে । পুজো নাগাদ প্রথম ট্যুরিস্টের দল দুদিনের সংসার পাতল রিশপে । দেখাদেখি এগিয়ে এলেন গ্রামের অন্যান্য লোকেরা । পরের বছরের মধ্যেই গড়ে উঠল তিনটে স্থায়ী আস্তানা, পালবাবুর গা ঘেঁসে সুনাখারে, সামান্য নিচে নেমে কাঞ্চনভিউ ট্যুরিস্ট লজ আর পালবাবুর নতুন দুটো ছোট্ট বাড়ি । গ্রামে ইকো ট্যুরিজম কমিটি হল, এই নতুন জীবিকার সঙ্গে ভালোভাবে গ্রামের জীবনযাত্রাকে জড়িয়ে নিতে । ২০০১ সালের মধ্যে যোগ হল আরও দুটো নতুন রিসর্ট-লাভা অঞ্চলের গাবলু শেরপা আর পাসাং ওংমু-র উদ্যোগে নেওড়া ভ্যালি রিসর্ট, আর দ্বিতীয়টা কাঞ্চনভিউ-এর মালিক তরন গুরুং-এর ছোট ছেলের নিজস্ব হোটেল হেমলক । হেল্প ট্যুরিজম-এর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে বাণিজ্যিক সহায়তার হাত বাড়াল লিঙ্ক ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস, খোরলো ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস, অন্বেষা গেস্টহাউস আর ‘সবুজের সন্ধানে’র মতো কিছু পর্যটন সংস্থা । সবাই সম্মিলিতভাবে না চললেও, উদ্দেশ্যটা মোটামুটি একই পথে চলেছে । এর মধ্যে থেকে ইকো ট্যুরিজমটা বড় হয়ে উঠবে তখনই যখন রিশপের ভাবী উন্নতির সিংহভাগটা গ্রামবাসীদের সংসারেই যাবে, আর সেটা পরিবেশের কোনওরকম অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন না করেই ।

নাসি এখনও বকবক করতে করতে আগে আগেই চলেছে । টিফিন দাঁড়ায় ওঠার জন্য গ্রামের লোকেরা তাদের নিজস্ব পথে ২০-২৫ মিনিট সময় নেয় । আমাদের মতো শহুরে পায়ে ঘুরপথে সেটা এক ঘণ্টা । এই সংক্ষিপ্ত ট্রেক রুটটায় বেশ জংলী জংলী ভাব আছে । প্রথম অংশটায় পাঁচমিশেলি পাহাড়ি জঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগটায় ধুপিগাছের বনসৃজন । ধুপি জঙ্গল আমাদের দেশের নিজস্বতা নয়, কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর । যে কোনও একটা গাছকে আলাদা করে দেখলে, ঘোর গ্রীষ্মকালেও ক্রিসমাসের কথাই মনে পড়বে । ধুপি জঙ্গলের একটা বিশেষ চরিত্র হল নিচটা প্রায় পরিষ্কার, আর ছায়া ছায়া অন্ধকার । দ্বিতীয়

বিশেষত্বটা হল, গাছের জীবনীশক্তির তারতম্যে রঙের প্রভেদ । একরাশ সবুজ গাছের পটভূমিতে দু-চারটে আধমরা গাছ জঙ্গলটাকে পুরো ক্যানভাস বানিয়ে রাখে । নিতান্ত খিদেতেষ্টার মুখে বা পায়ে ফোস্কা না পড়লে ধুপি জঙ্গলে হেঁটে বেড়ানোটা বেশ সুন্দর অভিজ্ঞতা । টিফিন দাঁড়ার চুড়োর চারপাশটা ঘিরে থাকা এই ধুপিবনটুকু পেরিয়ে হঠাৎই একটা দেড়মানুষ উঁচু চারচৌকো বাঁধানো চত্বর । সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ তুললে পায়ের কাছে আধখানা সিকিম আর দুচোখের সোজাসুজি কাঞ্চনজঙ্ঘার আকাশভরা লাবণ্য । ব্রেকফাস্ট সেরে ওইটুকু উঠতে যেহেতু প্রায় দুপুর করেছি, কাঞ্চনজঙ্ঘা ইতিমধ্যেই প্রায় আধখানা ঘোমটা টেনে ঘুরে বসেছে । দিনটা পয়লা জানুয়ারি, তাই আশপাশের গ্রাম থেকে বেশ কিছু ছোট ছোট দলে তরুণ-তরুণীরা কোঁচড়ে টিফিন বেঁধে সময় কাটাতে ওপরে এসেছে । ঠিক এই কারণেই জায়গাটার নাম টিফিন দাঁড়া কিনা, সেটা প্রশ্ন করেও সদুত্তর পাইনি । এরকমও হতে পারে হয়তো সঠিক লোককে জিজ্ঞাসা করিনি ।

রিশপ শব্দটার মানে সম্বন্ধে কিন্তু স্থানীয় একজন কিছুটা আভাস দিয়েছেন । এখানকার ভাষায় 'রি' অর্থে পাহাড়ের চূড়া আর 'শপ' মানে প্রাচীন গাছ । সব মিলিয়ে বড় বড় পুরনো গাছে ঘেরা পাহাড়ের চূড়া । সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে পারিনি, কিন্তু বিশ্বাস করে আশপাশের চেহারা থেকে বেশ সমর্থন পেলাম । এই অঞ্চলটা এখনও অনেকটাই অস্পৃষ্ট নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের সঙ্গে পাশাপাশি লেগে আছে । রিশপের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকের পাহাড়গুলো প্রায় পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা । আশপাশেও বসতির ফাঁকে ফাঁকে গভীর জঙ্গল-কোথাও প্রাকৃতিক স্বাভাবিক বন, কোথাও বা মানুষের হাতে তৈরি ছকে বাঁধা সরলবর্গীয় অরণ্য । দার্জিলিং অঞ্চলের মতো বেশিরভাগটাই প্রায় নেড়া পাহাড় নয়, এখানে জঙ্গলটাই এখনও বলবান । তবে উত্তরের নিচু পাহাড়গুলোতে আবার শুধুই জনবসতি, পেডং আর রেনকের পরিচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি । পিছনে আরও দূরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিকিমের ভূখণ্ড, পিছোতে পিছোতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছে সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার পদপ্রান্তে । উত্তর-পূর্বদিকে চোখে পড়ে নাথুলার প্রবাদপ্রতিম গিরিবর্ত্মের খাঁজ, তারও ডাইনে জেলেপলা । আর ওরই সামান্য তলায় যেখানে গোলমতো পাহাড়টার মাথায় একটা পতাকা পতপত করে উড়ছে, ওখানে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম আর ভুটান, এই তিন ভূখণ্ডের ত্রিবেণী । তারই গা ঘেঁসে নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের শীর্ষবিন্দু, রেচিলা ডান্ডার গর্বোদ্ধত শিখর যা ওই দুর্গম মহারণ্যের জাগ্রত প্রহরী ।

রিশপ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকের একটা ফাঁক দিয়ে লাভার গুম্ভাটা চোখে পড়ে । লাভার উচ্চতা ২,১৮৪ মিটার, মানে সাত হাজার দুশো ফুটের সামান্য কম । রিশপ আরও অন্তত পাঁচ-ছশো ফুট ওপরে । লাভা থেকে রিশপ আসার হাঁটাপথটা ৪ কিলোমিটার মতো । কিন্তু গাড়িতে আসতে গেলে আসতে হয় কালিম্পংয়ের পথে ছ মাইল

ঘুরে মোট ১১ কিলোমিটার পথ । এই গাড়ির রাস্তাটা যেখানে রিশপে ঢুকেছে সেখানে পরপর পাঁচটা রিসর্ট আর তার মালিকদের বসবাসের বাড়ি ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই । গ্রামের অন্যান্য বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়ে অনেকটা ওপরে নিচে দূরে দূরে ছড়ানো । গ্রামের মধ্যে গাড়ি চলার রাস্তা নেই, শুধুই হাঁটাপথ । শান্ত গ্রাম, গ্রামের গরুগুলো পর্যন্ত অচেনা মানুষ দেখলে ভয়ে ভয়ে খাদের ধারে নেমে গিয়ে পাশ দিয়ে দেয় । গ্রামের জমিতে ধাপচাষ, কখনও ভুট্টা কখনও আলু কি অন্যান্য সবজি । কোথাও বা দু-চারটে শীর্ণ আপেল কি নাসপাতি গাছ । অসংখ্য ছোট ছোট পাখি । গ্রামে কোলাহল বলতে ভোরবেলায় তাদের কলকাকলি, সেও ৩০-৪০ ফুট গাছের মাথা থেকে ।

রিশপের সময়মতো চলতে গেলে রাতের খাওয়াটা আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে চুকে যায় । বাইরে এসে বসলে দুরন্ত হিম । এই জানুয়ারির শুরুতে রাতের শিশির জমে যায় ঘাসপাতায় । সকালে যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না, সেখানে গুঁড়ো ময়দার মতো অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে মাটিতে, কখনও বা আবার সন্ধে পর্যন্ত । রাতের আকাশ মোহময় পরিষ্কার । সিকিমের লোকালয়ে ঝলমল করে বিদ্যুতের বিন্দু বিন্দু আলো । মনে হয় যেন আকাশ জোড়া ছায়াপথের ছায়া পড়েছে উত্তরের পাহাড় ঘেঁসা এক অলীক জলাশয়ে । রেচিলার জঙ্গল উজিয়ে থালার মতো চাঁদ ওঠে আদিগন্ত প্লাবিত করে । নতুন সাজে সেজে ওঠে তাপসী রিশপ-নির্জনতাই যার একমাত্র বিনোদন ।

ভ্রমণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২

হিমবাহের জন্মভূমিতে

শেখর ভট্টাচার্য

ভরসা একটাই, গাড়িটা ফোর হুইল ড্রাইভ । না হলে এতক্ষণে বোধহয় পিছনে গড়াতে শুরু করতাম । এইবার খানিকটা সমতল । ওটাই বুঝি 'গোয়িং টু দি সান' মাউন্টেন? তবে তো আসল জায়গাতেই এসে পড়েছি-লোগন পাস, গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্ক ।

যাত্রা করেছিলাম গতকাল সন্ধে আটটায় সল্টলেক সিটি থেকে । আমাদের সাতজনের দলে তিনজন দক্ষ ড্রাইভার-তাই চিন্তা কী! অতিকায় সাবার্বান গাড়ি ছুটেছে একনাগাড়ে প্রায় সাতশো মাইল । চলে এসেছি আমেরিকার মনটানা রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে আন্তর্জাতিক শান্তি উদ্যান হিমবাহের জন্মভূমিতে ।

নামটি গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্ক হলেও জ্যান্ত হিমবাহের আখড়া নয় এটি মোটেও । প্লেয়িস্টোসিন যুগে হিমবাহের রমরমা ছিল এখানে । মহাশিল্পীর খেয়ালে সেই সমস্ত হিমবাহই রূপ দিয়েছে এখানকার ভূপ্রকৃতিকে ।

ওয়েস্ট গ্লেসিয়ারে বাঁয়ে একটা জব্বর মোড় নিতে হল । একটা বিরাট তোরণের ভেতর দিয়ে যখন ঢুকছি পার্কের সীমানার মধ্যে তখন বুকটা হঠাৎ দুরুদুরু করতে লাগল । তবে কি আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে! মার্কিনি জাতীয় সড়ক-২-কে ডাইনে ছেড়ে, 'গোয়িং টু দি সান রোড'-কে একটুখানি ছুঁয়ে এসে দাঁড়ালাম পার্কের সদর দপ্তর আপগারে । রেঞ্জার যখন হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন পার্কের নিজস্ব মানচিত্র আর ক্যাম্পসাইটের প্রবেশাধিকারপত্র তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না এমন স্বর্গীয় জায়গায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য আমার সত্যি হয়েছে বলে ।

গত এক সপ্তাহ ধরে ইন্টারনেট তোলপাড় করে এত তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম যে মনে হচ্ছিল না গিয়েই পৌঁছে গেছি আমার স্বপ্নের গন্তব্যে । কিন্তু আজ সত্যি যখন এসে গিয়েছি এখানে তখন বুঝতে পারছি আমাদের জ্ঞেয় অনুভূতির ওপারে অজ্ঞেয় পুরুষ এত রূপ রস শব্দ গন্ধ দিয়ে এই পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছেন যে যতক্ষণ না তাঁর সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করছি ততক্ষণ তার স্বরূপ বোঝার উপায় নেই ।

১৯৩২ সালে প্রায় দশ লক্ষ একর জমি নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই জাতীয় উদ্যান । কানাডার অ্যালবার্টা প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়াটারটন ন্যাশনাল পার্কের প্রায় ৭৪ হাজার

একর এলাকাও এই পার্কে সামিল হয়েছে । হিমবাহ চলার পথে এক বিশেষ রূপ দিয়ে যায় ভূ-প্রকৃতিকে । উচ্চবচ ড্রামলিন, এস্কার আর ঘন সবুজাভ নীল হ্রদগুলি স্মরণ করায় সে কথা । দুর্গম এই জাতীয় উদ্যানে বরফ গলে অনেক দেরিতে । জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাওয়াই শীতকাতুরে বাঙালির পক্ষে অনুকূল ।

অনেক দুর্লভ প্রাণী ও উদ্ভিদের সংগ্রহশালা বলা যায় এই উদ্যানকে । গ্রিজলি ভালুক, ধূসর নেকড়ে আর ঈগল হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ।

এ তো গেল তথ্যের কচকচি । আসল কথা হল, যেই যাত্রা শুরু করলাম 'গোয়িং টু দি সান রোড' ধরে লেক ম্যাকডোনাল্ডকে বাঁয়ে রেখে পূর্বমুখে সোজা সেন্ট মেরির উদ্দেশে, তখুনি মনে পড়ে গেল নগাধিরাজ হিমালয়কে । তফাতটা খালি ব্যবস্থাপনায় । হৃষীকেশের বাসস্ট্যান্ডে এক্কেবারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে জনস্রোতে নাকাল হওয়া আর সুপরিকল্পিত পারিপাট্যের মার্কিনি রকি মাউন্টেনে বেশ একটা ফারাক আছে । ভারতীয় হিসাবে বুকে একটা ব্যথা জাগে-সব থেকেও আমাদের কিছুই নেই ।

হঠাৎ ব্রেক কষতে হল । সামনে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে । একপাল এল্ক নাকি দেখা গেছে রাস্তার ধারেই । দূরবীন হাতে আমিও ব্যর্থ চেষ্টা করি তাদের খুঁজে পাওয়ার । আবার চলতে শুরু করি । রেঞ্জার বলে দিয়েছিলেন ক্যাম্পসাইটে না পৌঁছে আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের চেষ্টা না করতে । গোয়িং টু দি সান রোড দৈর্ঘ্যে মাত্র ৫২ মাইল হতে পারে কিন্তু বাস্তবে দু ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে এইটুকু পথ পেরোতে । দুর্গম এই পথ; কিন্তু পথের ধারে রূপের ডালি সাজিয়ে রেখে প্রকৃতিদেবীই সব হিসাবের কড়ি লুকিয়ে ফেলেন-দেরি হয় তাতেই ।

লালমুখো এক কাঠবেড়ালী । একলাফে গাছ থেকে নেমে সটান আমার কাছে চলে এল । নিশ্চিন্তে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দেখে গেল খাবারদাবার আছে কিনা । খাবার দেওয়া বারণ । অ্যালপাইন প্রকৃতির বনজ প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা দণ্ডনীয় অপরাধ । এটা হল লোগান পাস । এই পথের উচ্চতম অংশ । চারধারে তুষারমৌলি শৃঙ্গরাজি । মধ্যে ঘাসের গালিচায় বসে মনটানার বাঙালি । খনিবিদ্যার উচ্চশিক্ষা নিতে এসে পথের নেশায় বেরিয়ে পড়েছি অধরাকে ধরতে । সঙ্গে ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল ছাত্র ছয়টি । বাক্যালাপ হয় আবার ইংরিজিতে!

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পথের ডানদিকে দেখা গেল সেন্ট মেরি লেক । পথপার্শ্বের ঘন সবুজ আবরণের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে উঁকি দিতে লাগল ট্রিপল ডিভাইডের শৃঙ্গ ।

এই তো এসে পড়েছি! বাঁয়ে ওটাই তো ক্যাম্পসাইট। একেবারে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু মুশকিল আবার ওটাই। গ্রিজলি ভালুকরা ভুলে যায় যে ওটা তাদের পথের মধ্যে পড়ে না। বজ্জাত কালো ভালুকরা আবার ভেবেই নেয় মানুষের খাদ্যে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার-আর তাতেই বাধে সংঘর্ষ। ক্যাম্পসাইটের কঠিন অনুশাসনে বারংবার বলা আছে, খাদ্যের ব্যাপারে সাবধানতার কথা। কোথাও যেন এতটুকু উচ্ছিষ্ট পড়ে না থাকে; রাতের পরিধেয় বস্ত্রে যেন খাবারের গন্ধ না থাকে; আরও কত কী! কিন্তু বাপু রাতে যদি অন্ধকারে তিনি না দেখতে পেয়ে আমার তাঁবুটিতে হোঁচট খান-তবে কী হবে?

পরের কথা পরে। এখন আলো থাকতে থাকতে দৌড় লাগাতে হবে মেনি গ্লেসিয়ার উপত্যকার দিকে। তাঁবু খাড়া হল; একটা করে স্যান্ডউইচ পেটে পড়ল, আবার সেই সেভি সাবার্বান গাড়ি দুদ্দাড় করে ছুটল।

মেনি গ্লেসিয়ার পার্কের অন্য জায়গাগুলোর থেকে বেশ বিচ্ছিন্ন আর প্রকৃতির আরও যেন অন্তঃপুরে। অনেকগুলো হিমবাহজাত হ্রদ আছে এই উপত্যকায় আর আছে গ্রিজলি ভালুকের নিকট সান্নিধ্য। দূর থেকে একজন একটু দর্শন দিলেন; তবে কাছে এলেন না।

দুধসাদা নৌকো যাচ্ছিল দিনের শেষ ফেরিটা দিতে। সাত ভারতীয়ের বিজাতীয় আর্তরবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তবেই না সম্ভব হল আমাদের গ্লেসিয়ার লেকে জলযাত্রা। এটা সুইফ্‌ট কারেন্ট লেক। জলের রং যে এত সুন্দর হয় জানা ছিল না। এ যেন আকাশ ধরা পড়ে গেছে মর্তের ছলনায়। বোটের চালিকা হলেন মনটানারই এক হাসিখুশি তরুণী। বুঝিয়ে বলছিলেন কেন লেক জোসেফিন আরও ঘন নীল সুইফ্‌ট কারেন্ট লেকের থেকে। গ্লেসিয়ার ফ্লাওয়ার কেমন করে নীল করে তোলে জলের রং।

রাতের অন্ধকার নামে এখানে প্রায় দশটায়। সুতরাং অসুবিধা কী? মোটরবোটের পালা শেষ হতেই দাঁড় হাতে ক্যানুতে। প্রকৃতিতে মিশে যাই।

রাতে বুকটা যে একটু দুরুদুরু করেনি তা বলতে পারি না; তবে ভালুক আসেনি। তাই পরদিন সকাল দশটা নাগাদ রেঞ্জার অফিসে একগাল হাসি দিয়ে দ্বিতীয়দিনের যাত্রাটাও শুরু করলাম নির্বিঘ্নে। আজকের তালিকায় দুটি গন্তব্য-হিডন লেক আর লেক কিন্টলা।

হিডন লেক যেতে হয় হাঁটাপথে লোগান পাস থেকে। তাই ফের চলেছি পশ্চিমে-আবার সেই 'সূর্যমুখী' পথে।

ক্লেমেন্টস মাউন্টেনের পায়ের তলা দিয়ে 'তাইরে নাইরে না' করে চলেছি। অল্প চড়াই। হঠাৎ চুপচাপ! সবাই চুপ! বন্যপ্রাণী দেখা গেছে। যদিও দেশে ফিরলে লোকে বলবে

'ছাগল দেখে ফিরে এলি?' কিন্তু সত্যিই নাকি সংবেদনশীল এই অ্যালপাইন প্রকৃতিতে পাহাড়ি বন্য ছাগলের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আপগার থেকে লেক কিন্টলা ৩০ মাইল হল পাথুরে রুক্ষ পথ। আমেরিকার মোমের মতো মসৃণ রাজপথ নয়।

সত্যি এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। বাঁধাপথের বাইরে অকৃত্রিম আদিম বন্যতা। আদিম অরণ্য, অফুরন্ত প্রাণ, আদিম আমেরিকার সভ্যতার চিহ্ন ছড়ানো এখানে ওখানে। লেক কিন্টলার জনহীন তীরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল সভ্যতার প্রথম সোপানে।

কিন্তু এই স্বর্গের রাজ্যে থাকার মেয়াদ শুধু আজকের রাতটুকু। ফিসক্রিক ক্যাম্পসাইটে অত্যুচ্চ বনস্পতিদের মধ্যে রাতটুকুও কেমন যেন সুখস্বপ্নের মতো ফুরিয়ে গেল। আবার জাতীয় সড়ক-২-আবার বিউট, আবার সল্টলেক সিটি ফিরে চলা চিরব্যস্ত মানব সভ্যতার দৈনন্দিনতায়।

গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্ক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও মানচিত্র পাওয়া যাবে www.nps.gov/glac থেকে অথবা টেলিফোনে (৪০৬) ৮৮৮-৭৮০০ থেকে। ঠিকানা: গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্ক, পোস্টবক্স-১২৮, ওয়েস্ট গ্লেসিয়ার, এম টি ৫৯ ৯৩৬, ইউ এস এ।

নিকটতম বড় শহর মিসুলা প্রায় ১৮০ মাইল। মিসুলা থেকে সল্টলেক সিটি এবং লস এঞ্জেলেসের নিয়মিত বিমান যোগাযোগ আছে।

ভ্রমণ জুলাই, ২০০২

ভাবা জোত পেরিয়ে কিন্নর থেকে স্পিতি

অনিন্দ্য মজুমদার

রাহুল সংকৃত্যায়ন তাঁর ‘কিন্নর দেশে’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘(বাঙতু থেকে) কিছুক্ষণ চলার পরে বাঁদিক থেকে ভাবা-র খদ্দ গর্জন করতে করতে এসে শতদ্রুর বুকে আছড়ে পড়ল । এই খদ্দের পাশে দু-তিনটি গ্রাম আছে । এর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু ক্ষেতখামার পেরিয়ে স্পিতি পর্যন্ত পৌঁছনো যায় । লোকের যাতায়াতও কিছু আছে এ পথে । এমনিতে স্পিতি যাবার কোনও বড় রাস্তা নেই এ পথে’ । সেই সূত্র ধরেই আমরা খুঁজে বের করি ভাবা জোত বা গিরিপথ । সঠিক অর্থে অবশ্য হাঁটতে হাঁটতে কিছু ‘খেত-খামার পেরিয়ে’ নয়, দিন পাঁচ-ছয়েক গিরিপথ পেরিয়ে স্পিতি পৌঁছনো যায় এই ভাবা উপত্যকা ধরে । মরু হিমালয় স্পিতির সঙ্গে কিন্নরের সংযোগকারী এই ভাবা জোত (৪৬৭০ মিটার) স্থানীয়দের কাছে বেশ জনপ্রিয় । অথচ ট্রেকাররা বিশেষত ভারতীয় ট্রেকাররা এ পথে আসেন না বললেই চলে ।

রাহুলের সময় ঘোড়ার পিঠে বা পায়ে হেঁটে কিন্নর দেশ ভ্রমণ করতে হত । বর্তমানে অবশ্য গাড়ির রাস্তা তৈরি হয়েছে । তাই কলকাতা থেকে কালকা হয়ে সেখান থেকে সরাসরি বাসে পৌঁছে যাওয়া যায় ভাবা উপত্যকার কাফনু গ্রামে । আমরা অবশ্য এসেছিলাম অন্যভাবে । গাড়োয়াল হিমালয়ের ধৌলা থেকে পায়ে পায়ে রূপিন ঘাটি অতিক্রম করে পৌঁছলাম কিন্নরের সাংলা । দু-চারদিনে কিন্নর দর্শন সেরে বাস ধরে ওয়াংতু হয়ে চলে আসি ভাবানগর । জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কল্যাণে ভাবানগর এক ব্যস্ত শহর । তাই প্রথম সুযোগেই বাস ধরে চম্পট দিই কাফনুর দিকে । আবার ওয়াংতুতে ফিরে আসতে হয় হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে । তারপর জাতীয় সড়ক ছেড়ে লোহার ব্রিজে শতদ্রু পার হওয়া । ওপারের পাহাড়ের গা বেয়ে বাস এগিয়ে চলে । রাস্তা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু মসৃণ পিচে মোড়া । ঢুকে পড়ি ভাবা নদীর উপত্যকায় । একে অনেকে ওয়াঙ্গার নদীও বলেন । পথে বেশি জনবসতি চোখে পড়ে না । তার মধ্যে কোটগাঁও বেশ জমজমাট জায়গা । এখানকার ভাবা মহেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত । কোটগাঁওতে গাড়ি দাঁড়াতেই হৈ হৈ করে বাচ্চা ছেলেরা বাসভর্তি করে ফেলে । কী ব্যাপার? না, কোটগাঁওয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হচ্ছে । খেলা শেষ, এখন ঘরে ফেরার ভিড় ।

কাফনু (২৪৪০ মিটার) পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে যায়। ছোট্ট জায়গা। দিনে খানপাঁচেক বাস চলাচল করে। একটিমাত্র খাবারের দোকান গড়ে উঠেছে বাসআড্ডার পাশে, কিন্তু থাকার হোটেল নেই। প্রয়োজনবোধে রেস্তোরাঁর মালকিন তাঁর বাড়তি ঘরে মেহমানদের আশ্রয় দেন। এখন সেগুলি কয়েকজন বস্ত্রবিক্রেতার দখলে, সুতরাং আমরা এই অচেনা স্থানে নিরাশ্রয়। স্থানীয়রা বুদ্ধি দেন বাঁধের ধারে তাঁবু গেড়ে থাকতে। গ্রামের মধ্যে এভাবে তাঁবু করে থাকাটা আমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু রাত নামার আগে তো একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করে নিতেই হবে। ক্যাম্পসাইট দেখতে এগোই। পথে পড়ে কাফনু থানা। কি মনে হল, থানায় ঢুকে গেলাম সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। জীবনে প্রথম এভাবে কোনও থানায় হাজির হলাম। হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে থানা বলতে যে ভীতিপ্রদ ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে কাফনু থানার কোনও মিল নেই। হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের পোস্টারে সজ্জিত অফিসঘরটি তো রীতিমতো আকর্ষণীয়! পুলিশকর্মীরাও খুব খোলামেলা। আমাদের অসুবিধার কথা শুনে এক সদাশয় ব্যক্তি নিজের থেকে রেস্তোরাঁর মালকিনকে আমাদের হয়ে অনুরোধ করলেন। পুলিশি অনুরোধ এড়াতে না পেরে মালকিন আমাদের জন্য তার স্টোররুমটি বরাদ্দ করলেন। ঘরটি একটু ছোট, অন্ধকারও বটে। তবে এমনিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রেস্তোরাঁটি সাধারণ। নিমকি, গজা, অল্প কিছু মিষ্টি-তালাবন্ধ কাচের বাক্সে বন্দী। না হলে নাকি স্থানীয় খদ্দেররা বিনা পয়সায় খেয়ে নেবে! দোকানের একমাত্র কর্মী 'ছোটু' প্রবল উৎসাহে খদ্দেরদের চা দিয়ে বেড়াচ্ছে। লোক মন্দ হয়নি। তাদেরই একজন পদম সিং নেগি। পদম ঘোড়াওয়ালা, বাড়ি ইয়াংপা-টু গ্রামে। ষোলটা ঘোড়ার মালিক, তার একটা আবার রামপুরের লাভি মেলায় কিন্নর-সেরা শিরোপা পেয়েছে। ঠিক হল পদম দুটি ঘোড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে ভাবা জোত পার হয়ে স্পিতি যাবে। পরদিন কলকাতা থেকে আমাদের এক বন্ধুর দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তাই ঠিক হল আগামী পরশু আমরা পদযাত্রা শুরু করব।

পরদিন সকালবেলা ঘরে এসে চা দিয়ে যায় ছোটু। ওর আসল নাম মীরচাঁদ। কুলুতে ঘর, জীবিকার খাতিরে কিন্নরের এই অজগাঁয়ে পড়ে আছে। আমাদের চা খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই পদম এসে যায়। একবার থানায় যাই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে। তারপর বাঁধ দর্শন। ভাবা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল অংশটি ভাবানগরে অবস্থিত। কাফনুতে ভাবা নদীকে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। ফলে একটা কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। রঙিন রেলিংয়ে ঘেরা জলাশয়। একদিকে সার সার গাছের হাল্কা জঙ্গল। ভালোই লাগে ঘুরতে। পদযাত্রা পর্বের জন্য বাজারহাট করার দরকার ছিল। কাফনুর বাজারটি ছোট, তবে প্রয়োজনীয় খাবারদাবার জুটে গেল, যদিও বাছাবাছির সুযোগ নেই

বিশেষ। মুশকিল হল কেরোসিন তেলের জোগান নেই আপাতত কাফনুতে। শেষে বাস ধরে ছোট্টুর সঙ্গী কপিল নিচের দিকে চলে গেল কেরোসিন আনতে। প্রথমে কোটগাঁও, সেখানে না পেয়ে ভাবানগর, তারপর আরও নিচে জিওরি থেকে তেল সংগ্রহ করে ফিরল সে। তেল জুটল বটে, কিন্তু যাতায়াতে প্রচুর খরচ হয়ে গেল।

৫ জুন কলকাতা থেকে বন্ধু শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। সুতরাং পদম, কপিলকে নিয়ে আমরা দলে পাঁচজন। সকাল সকাল পদম ওর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এসেছে। দুটি ঘোড়া, কালু ও তাসি, আমাদের মাল বইবে। এছাড়া পদম সঙ্গে এনেছে কিন্নর-সেরা শেরুকে। শেরু অবশ্য ঘোড়াদের গাইড, অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মাল বইবে না। মালপত্র ঘোড়াদের পিঠে চাপিয়ে আমরা ঝাড়া হাত-পায়ে চলি। ভাবা নদীর ডানতীর ধরে উত্তর দিকে চলা। পথের পাশে খেত, একটি বৌদ্ধমন্দির।

শেষ গ্রাম হোমতি পেরিয়ে নদী পার হতে হয়। নদীর পাশে পথ, পথের পাশে খেত, কাজের ফাঁকে গ্রামের মেয়েরা আড়চোখে দেখে নেয় পথচলতি পথিকদের। চড়াই পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাই হোমতি (২৮৪০ মিটার)। দু-তিনটে কুঁড়েঘর, কয়েকটা খেত। ভাবা উপত্যকার গ্রামবাসীরা এখানে চাষবাস করেন। আমরা এখন ভাবা-রূপী অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছি। বনপরীর মতো কয়েকটি মেয়ে ঘোড়া নিয়ে বন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। শালতি চলেছে তারা। মেয়েরা পদমকে অনুরোধ করে ওদের ঘোড়াগুলিকে থাচে (বুগিয়ালে) ছেড়ে দিতে। হিমালয়ে এটা প্রচলিত পদ্ধতি। গ্রামে বসিয়ে ঘোড়াকে খাওয়ানোয় খরচ আছে। তার থেকে বরং পাহাড়ে ছেড়ে দাও, প্রয়োজনে নামিয়ে আনলেই হবে।

হোমতি থেকে শালতি মোটামুটি সমতল পথ। তারপর আবার নেমে যাওয়া নদীর পাশে। কোনও কারণে জল বেড়ে গেলে, পথ বোধহয় ডুবে যাবে! একটা সরু জলধারা পার হতে হয়। নালার ওপরে গাছের গুঁড়ির সেতু। ছায়ামোড়া জঙ্গল, পথের ওপর ঝরাপাতা, মাঝে মধ্যে পাখির সুরেলা ডাক। কিন্নরের এই অঞ্চলের শ্যামলতা মনকে স্নিগ্ধ করে। গিয়ের, ডাঙ্গারে হয়ে পৌঁছলাম মুলিং (৩২৬০ মিটার)। সুন্দর বা অপূর্ব নয়, স্বপ্নালু বললে হয়তো মুলিংকে খানিকটা বোঝানো যেতে পারে। সবুজ ঘাসের মখমলে মোড়া এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। তার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে সর্পিল ভাবা, নদীর ওধারে পাইনের জঙ্গল। কাছে-দূরের পাহাড়চূড়ায় বরফের প্রলেপ। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ভাসছে মুলিং।

পরদিনের লক্ষ্য কারা। দূরত্ব বেশি নয়। তাই দেরি করে পথে নামি। উচ্চতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাছের সংখ্যা কমে আসছে। পশ্চিমদিক থেকে একটা নদী এসে মিশেছে

ভাবায় । ওই নদী ধরে ওয়াশিলিং যাওয়া যায় । সেখান থেকে সাকারোগ খাগো (৫১০০ মিটার) পেরিয়ে স্পিতির পিন উপত্যকায় পৌঁছনো যায় । সঙ্গমস্থলের নাম নিগুলা । ভাবা নদী পেরিয়ে তার ডানতীরে আসতে হল । অসুবিধার কিছু নেই, কারণ পাথরের প্রাকৃতিক সেতু রয়েছে । নদীর ডানতীর ধরে চড়াই ভাঙা । গাছপালা আর নেই, শুধু চোখ ধাঁধানো লাল লাল ছোট ছোট ফুল । দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই কারা (৩৭৭০ মিটার) । চওড়া উপত্যকা, ঈষৎ ঢেউখেলানো । চারদিক উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা । পাহাড়ের ঢালে ঘোড়ার দল চড়ে বেড়াচ্ছে । ওদের কয়েকটির মালিক আমাদের পদম সিং, মালিককে তারা চিনতে পারে বলে মনে হয় না । পদমও জানায় এভাবে ছেড়ে রাখলে ঘোড়া 'জানোয়ার' (অর্থাৎ বন্য) হয়ে যায় । তখন আর মানুষকে মানতে চায় না । কারা জায়গাটা অদ্ভুত । অসংখ্য শীর্ণকায় জলধারা জলাভূমির মতো স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছে চারধার । নদীর ধারে আমাদের তাঁবু পড়ে । পিঠের থেকে মাল নামিয়ে আমাদের অশ্ববাহিনী যোগ দেয় ঘোড়ার দলে । কপিল রান্নার বন্দোবস্ত করে, আমরা বেরিয়ে পড়ি কারা দর্শনে । আজ হাতে অফুরন্ত সময় । চাইলে হয়তো আরও এগিয়ে ফুসতিরাং পৌঁছনো যেত । কিন্তু অপ্রয়োজনে এভাবে দৌড়তে দৌড়তে ট্রেক করার মধ্যে আনন্দ পাই না । তাড়াহুড়োতে অনেক কিছু অদেখা থেকে যায়, যেমন কারাহ্রদ । আগেই বলেছি কারা একটু ঢেউখেলানো উঁচু নিচু । এমনই এক ঢেউয়ের পিছনে হঠাৎ চোখে পড়ল কাকচক্ষু জলাশয় । তার বুকে বরফচূড়ার কাঁপা কাঁপা প্রতিচ্ছবি । কারায় না থেকে এগিয়ে গেলে হয়তো খেয়াল করতাম না এই কৃষ্ণকালো সুন্দরীকে ।

নিচের দিক থেকে কয়েকটা লোক উঠে আসছে, সঙ্গে ছোট ছোট ঘোড়া । কাছে এলে দেখি ঘোড়া নয়, খোতে অর্থাৎ স্পিতি ভাষায় গাধা । লোকগুলি পিন উপত্যকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে । সেখানে কাঠের খুব অভাব, তাই তারা কিন্নর থেকে গাছ কেটে খোতের পিঠে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যাচ্ছে । এভাবে গাছ কাটা বেআইনি, কিন্তু গরজ বড় বালাই । শুনে মজা লাগল যে গিরিপথের ওপর বরফ বেশি থাকলে, এই বেঁটে বেঁটে গাধাগুলির বুক অবধি বরফে ডুবে যায় । তখন তারা কাঠ বইবে কি, তাদেরই কোলে তুলে বরফ পার করিয়ে দিতে হয় ।

ইতিমধ্যে খাবার তৈরি । খেতে খেতে বৃষ্টি এসে যায় । তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র তাঁবুতে ঢোকাচ্ছি, হঠাৎ চোখ চলে যায় আকাশের দিকে, দেখি, মেঘের পর্দা ভেদ করে একফালি রোদ পড়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টিকণার গায়ে । আর চারদিক আলো করে রামধনু উঠেছে আকাশে । প্রায় মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা আর তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাবা নদী ।

পরদিন গন্তব্য ফুসতিরাং । দূরত্ব বেশি নয় । তবে দেরি করা ঠিক হবে না, কারণ পথে নদী পার হতে হয় । স্পিতিবাসীরা খোতে নিয়ে অনেক ভোরে বেরিয়ে পড়েছে, আমাদের মুশকিল হয় শেরুকে নিয়ে । পদম ওর বল্গা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে । কিছু মালও চাপানো হয়েছে শেরুর পিঠে । নদী পার হওয়াটা যত ঝামেলার ভেবেছিলাম তেমন কিছু নয় । নদী এখানে বহুধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে । কয়েকটাকে পাথরের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যাই । শেষ রক্ষা অবশ্য হল না, জুতো খুলে জলে পা ছোঁয়াতেই হল । নদী পেরিয়ে অল্প বিশ্রাম । পূর্বদিক থেকে একটা নদী মিশেছে ভাবায় । এই নদী ধরে গেলে একটি গিরিপথ পেরিয়ে স্পিতির পিন উপত্যকায় পৌঁছনো যায় ।

এগিয়ে চলি ভাবা নদীর বামতীর ধরে । পথের ধারে, স্থানে স্থানে, হলুদ ফুলের কেয়ারি, সংকীর্ণ গর্জ, হাল্কা চড়াই । দূর থেকে দেখা যায় ফুসতিরাংকে । কারার তুলনায় জায়গাটি (৩৯৫০ মিটার) বড্ড বেশি রুক্ষ । গর্জের মধ্যে হওয়ার জন্য ছায়াছন্ন এবং ঠান্ডা । এরকম চাপা জায়গায় মনও যেন গুমোট হয়ে যায় । কিন্তু জোতের আগে আর তৃণভূমি নেই, তাই ঘোড়া নিয়ে আজ এগনো যাবে না ।

পরদিন ৮ জুন, রাত না পোহাতেই তোড়জোড় শুরু করি । দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে আজ-গাড়োয়াল, কিন্নরের পর স্পিতির মাটি স্পর্শ করব । হিমালয় পেরিয়ে পৌঁছব ট্রান্স হিমালয় অঞ্চলে । গোছগাছ করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যাই । অসহ্য ঠান্ডায় হাত পা যেন বিকল হয়ে গেছে । সারা গায়ে উলের মোটা মোটা পোশাক চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ি । আজ প্রথম থেকে টানা চড়াই, কিছুক্ষণ চলার পর দর দর করে ঘামতে শুরু করি । ভাবা নদীর একটি শাখা ধরে উত্তরদিকে চলেছি আমরা । অপরটি ধরে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে নিমিশ খাগো (৪৯৫০ মিটার) পেরিয়ে পিন উপত্যকায় পৌঁছনো যায় । অর্থাৎ কিন্নরের ভাবা উপত্যকা থেকে স্পিতির পিন উপত্যকায় যাবার জন্য চারটি গিরিপথ আছে (পশ্চিমদিক থেকে)-সাকারোগ খাগো, নিমিশ খাগো, ভাবা জোত ও তথাকথিত তারি খাগো । এদের মধ্যে ভাবা জোত সবচেয়ে জনপ্রিয় । অন্যগুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাহাড়ি সঙ্গী খুঁজতে হতে পারে ।

স্ক্রি জোনের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ উঠে গেছে । টানা চড়াই, মাঝে মাঝে বিপজ্জনকভাবে সংকীর্ণ পথ । এই চড়াইয়ে ঘোড়া বেশি মাল বইতে পারে না । তাই, তাসি-কালুর পিঠ থেকে মাল কমিয়ে শেরুর ঘাড়ে চড়িয়েছে পদম । চড়াই শেষে পাথর বিছানো অঞ্চল । একপাশে কিছু পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছে । সম্ভবত, আমাদের স্পিতির বন্ধুরা গতকাল এখানে রাত কাটিয়েছেন ।

পাথরের পরে বরফ মোড়া অঞ্চল শুরু হল । কিছু কিছু জায়গায় বরফের ছোট ছোট ঢিপি, তাদের মাথায় পাথর, পোশাকি ভাষায় যাকে বলে 'গ্লেসিয়াল টেবিল' । নির্ঘাৎ আমরা কোনও হিমবাহের ওপর দিয়ে হাঁটছি, কিন্তু এত বরফে তার হদিশ করা মুশকিল । ঝকঝকে নীল আকাশ, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া । চারদিকে বরফের চোখধাঁধানো ঝলকানি । ছোট ছোট চড়াই, মাঝে মধ্যে একটু নেমে আসা । হাঁটু ডোবা বরফে সাবধানে চলতে হয় । নাহলে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় । গিরিশিরার ওপর থেকে প্রদীপ হাত নাড়ে । উঠে আসি, এবং দেখি এটা গিরিপথ নয় । দূরে দেখা যাচ্ছে পতাকা উড়ছে । ওটাই ভাবা জোত (৪৬৭০ মিটার) । অর্থাৎ আরও খানিকটা এগোতে হবে আমাদের । মোটামুটি সমতল, তবে বরফের প্রাচুর্য চলার গতিকে শ্লথ করে দেয় । পথের ডানহাতে বরফের সরে মোড়া নীল জলকুণ্ড । এগিয়ে চলি । রোদ পড়েছে বরফের ওপর । বরফ গলতে শুরু করেছে আর নরম বরফে পা ডুবে যায় ঘোড়ার । হঠাৎ দেখি কোমর পর্যন্ত বরফে ঢুকে গেছে প্রদীপ । নরম বরফ, তার মধ্যে ও উঠে আসার চেষ্টা করে । ওদিকে, অন্য পাশ দিয়ে পদম ঘোড়াদের নিয়ে যায় । শেরু, তাসিকে নিয়ে অসুবিধা হয় না, মুশকিল হল কালুকে নিয়ে । যে কোনও কারণেই হোক, কালু আর এগোতে চায় না-রীতিমতো বিদ্রোহ । সে বড় বিপজ্জনক অবস্থা । একদিকে বরফের ফাঁদে আটকে আছে প্রদীপ, অন্যদিকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পদমদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছে কালু । কোন দিকে ছুটে কার ঘাড়ে পড়বে কোনও ঠিক নেই । শেষে তার পিঠের মাল আমরা ভাগ করে নিলাম । ব্যস, তাতেই শান্ত হল কালু । বীরের মতো সে উঠে আসে ভাবা জোতের ওপরে । গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জের ওপরে ভাবা জোত অবস্থিত । বহু শতাব্দী ধরে কিন্নরবাসী ও স্পিতিবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই গিরিপথ । সাধারণ গ্রামবাসী, ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি বহু মানুষ যাতায়াত করতেন এই পথ ধরে । বর্তমানকালে সামদো হয়ে গাড়ির রাস্তা তৈরি হওয়ার ফলে হাঁটাপথের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেছে, তবু প্রাচীনকালের সেই ফ্লেভার যেন অনুভূত হয় চলতে চলতে ।

ভাবা জোতে পৌঁছে অবশ্য সকল অনুভূতিকে ছাপিয়ে গেল কনকনে ঠান্ডা । এত তীব্র, ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি হইনি কোনও গিরিপথের মাথায় । এত ঠান্ডা সহ্য করা দায় । গিরিপথের একদিকে কেয়ার্ন, কয়েকটা ধর্মীয় পতাকা উড়ছে । তার তলায় নমো নমো করে পুজো সেরে তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করি । আমাদের পিছনে পড়ে রইল শ্যামলসুন্দর কিন্নর, সামনে ঊষরভূমি স্পিতি । বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে বরফের রাজ্য, তার পিছনে বাদামি পাহাড় । বরফের বুক ছুঁয়ে হাওয়া বইবার একটা অদ্ভুত শন শন আওয়াজ । টানা উতরাই, কয়েকটা জায়গায় ঢাল বেশ খাড়াই । সেক্ষেত্রে স্রেফ বসে বসে নেমে আসি । ঘোড়াগুলি কী করে নামল, সেটাই আশ্চর্য । বলতে ভুলে গেছি, কালুর মাল আবার তার

পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীরবেই মাল বইছে সে। প্রদীপের বরফে আটকে যাওয়া দেখে বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল।

আবার গ্লেসিয়াল টেবিল। বরফ কখনও শক্ত, কখনও নরম। অবশেষে বরফাঞ্চল শেষ হল। বরফ গলে একটি সরু নদীর সৃষ্টি হয়েছে। তার পাশে একটু বিশ্রাম, হাল্কা খাওয়া। তারপর আবার চলা শুরু। আমাদের পাশে নদী, নদীর বুকে ছোট বড় বরফখণ্ড ভাসছে। স্পিতি আমাদের কাছে নতুন। তাই হয়তো সব কিছুতে বিস্ময় জাগে। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশ, তার বুকে রাজহাঁসের মতো ধবধবে সাদা মেঘ, চারপাশে রুক্ষ পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছ নেই, বরফ নেই-যেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আছে শুধু অন্তরের রং-বাদামি, বেগুনি, লালচে; কত রঙের যে পাহাড় হতে পারে!

ফুসতিরাং থেকে বলদার বেশ লম্বা পথ। নদীর ডানতীর দিয়ে পথ। ভাবা জোতের মূল তুষারক্ষেত্রটি এখনও ছড়ানো ছিটানো, ছোট-মাঝারি আইসপ্যাচ পার হতে হচ্ছে। বরফে হাঁটতে প্রথম প্রথম মজা লাগলেও ক্রমশ ব্যাপারটা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। মনঃসংযোগ হারালে পিছলে পড়ার ভয়, বরফে পা ঢুকে যাওয়ার ভয়। চলেছি তো চলেছি। পদমরা অনেক এগিয়ে গেছে, কালো কালো পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে ওদের। বাঁদিক থেকে একটা নদী এসে মিশেছে আমাদের সঙ্গিনী নদীর সঙ্গে। সাকারোগ খাগো বা নিমিশ খাগো পেরিয়ে এলে ওই নদীর পার দিয়ে পথ আসত। আরও এগোলে বামদিক থেকে আরও একটি নদী এসে মিশল আমাদের সঙ্গিনীর সঙ্গে। কুলু উপত্যকা থেকে পিন পার্বতী গিরিপথ (৫৩১৯ মিটার) পেরিয়ে এলে এই নদীটির ধার দিয়ে আসতে হত। এই তিনটি নদী মিলিত হয়ে পিন নদীর সৃষ্টি করেছে। অবশেষে আমরা পিন উপত্যকায়। পিন ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে তুষারচিতা, আইবেক্স, ভরাল, তুষার মোরগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর বসবাস, যদিও তাদের কেউ আমাদের দর্শন দেয়নি, তাদের দেখা না পেলেও না হয় চলবে, কিন্তু পদমরা কোথায় গেল? দুপাশের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পিন নদী সোজা বয়ে যাচ্ছে, ফলে উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত সরাসরি দেখা যায়। অথচ পদমদের দেখা নেই। পিন নদীর ডানতীর ঘাসে মোড়া সমতল। অবশেষে এক সময় তাঁবুর দর্শন পেলাম। বলদার (৩৮৪০ মিটার) জায়গাটির সৌন্দর্য রেখাপাত করার মতো কিছু নয়। তবে সারাদিনের চড়াই-উতরাই, বরফ পেরনোর পর মনে একটা আশ্রয়ের নিরাপত্তা এনে দেয়।

পরদিন পিন নদীর ডানতীর ধরে যেতে হবে আমাদের, পৌঁছতে হবে ফারকা। পথে দুটো নালা পার হতে হয়; প্রথমটিতে সেতু থাকলেও দ্বিতীয়টির সেতু জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একটু চিন্তায় থাকি। পথে দেখা হল মুদ গ্রামের কয়েকটি লোকের সঙ্গে। খোতে,

ইয়াক নিয়ে তারা চলেছে ভাবা জোত পেরিয়ে কিন্নরে, ওরা জানাল, জল বেড়ে যাওয়ায় ওদের আসতে অসুবিধা হয়েছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নদী পার হওয়ার জন্য রোপ বের করে রাখি, কার্যক্ষেত্রে অবশ্য তার প্রয়োজন হল না। হাঁটু জল, কিন্তু স্রোত খুব। জলে ডোবা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে চলা। জলের তোড়ে ভেসে চলা নুড়িপাথর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। তবু যে খুব একটা অসুবিধা হল না তার কারণ পদম-কপিলের সাহায্য। ওদের হাত ধরে নদী পার হলাম নিশ্চিন্তে।

নদী পেরিয়ে চলি। চওড়া উপত্যকার মাঝে মাঝে হলুদ রঙা ফুলের মেলা। মোটামুটি সমতল পথ, মাঝে মধ্যে হাল্কা চড়াই উতরাই। আমাদের বামে, রাস্তা থেকে খানিকটা নিচে, পিন নদী বয়ে যাচ্ছে। পিন বললেই মনে এসে যায় রূপিনের কথা, যার তীর ধরে গাড়োয়ালের ধৌলা থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হয়েছিল। তবে সে যাত্রায় যেভাবে রূপিন নদীর পাশে পাশে হাঁটার সুযোগ হয়েছিল, সেভাবে কিন্তু পিনকে পাচ্ছি না। মনের দুঃখ ঘোচাতে পথ যেন নেমে এল পিনের ধারে। মুদ গ্রামের আরও কয়েকজন চলেছে ভাবা জোতের দিকে রাস্তা মেরামত করতে। কাঠ জোগাড় করতে পিন উপত্যকার লোকজনকে প্রায়ই ভাবা গিরিপথ পেরিয়ে কিন্নরে যেতে হয়। তাই পথঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তারা নিজের কাঁধে নিয়েছে। তবে পিন নদীর বামতীর ধরে গাড়ি চলার উপযুক্ত রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। কয়েক বছর বাদে হয়তো বাসে করে পৌঁছনো যাবে কাফনু থেকে গুলিং।

আবার হাল্কা চড়াই। পথে চড়াই-উতরাই বেশি না থাকলেও হাওয়া আমাদের নাজেহাল করে ছাড়ে। ভাবা জোতের মতো নয় ঠিকই, কিন্তু হাওয়ার তীব্রতা স্পিতির প্রায় সর্বত্র অনুভূত হয়। হাওয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচতে স্থানীয় মহিলারা কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখেন। দেখাদেখি আমরাও। এক সময় পৌঁছে গেলাম ফারকা গ্রামে (৩৭০০ মিটার), গ্রাম মানে চার-পাঁচটা বাড়ি। বরং নদীর ওপারে মুদ গ্রাম অনেক জমজমাট। গুম্ফা, বাড়ি, এমনকী হোটেল অবধি আছে। আমরা অবশ্য তাঁবুতে থাকার পক্ষপাতী। তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলি স্পিতির সেতু পেরিয়ে নদীর ওপারে যেতে ভয় পায়। সরু একটা জলধারার পাশে ক্যাম্পসাইট। কাছেই বিশাল মাঠ। তার মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে গ্রামের ইয়াক, ঘোড়া, ভেড়া, খোতে আর চোবু (এক জাতীয় ছোট ছাগল)। তাঁবু খাটিয়ে বেরিয়ে পড়ি মুদ দর্শনে। কপিল আমাদের সঙ্গী হয়, পদম ব্যস্ত থাকে ঘোড়াদের নিয়ে।

রুক্ষ পাহাড়ের মাঝে চোখ জুড়ানো মরূদ্যান এই মুদ গ্রাম। এত সবুজ ভাবা জোত অতিক্রম করার পর চোখে পড়েনি। গ্রামের পা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে শ্যাওলা সবুজ পিন নদী। নদী পার হওয়ার জন্য সেতু রয়েছে। বেশ শক্তপোক্ত তবে চলার তালে দোলে। আর এই

দোলার ভয়ে কিন্নরের ঘোড়া স্পিতির সেতু পার হতে চায় না। নদী পেরিয়ে হাল্কা চড়াই ভেঙে পৌঁছে যাই মুদ গ্রামে। সাদা সাদা বাড়িঘর। প্রার্থনা পতাকা, চোর্তেন। কড়াইশুঁটির খেতে কাজে ব্যস্ত মেয়েরা। গ্রাম পেরিয়ে গুম্ভা, মাঝে একটা নালা পড়ে, তার পাশে এসে দেখি সাঁকো নেই। নেই মানে সকালে ছিল, কিছুক্ষণ আগে জল বেড়ে যাওয়ায় ভেসে গেছে। ফলে আমাদের গুম্ভা দর্শনের ওখানেই ইতি। আমাদের না হয় গুম্ভা দর্শন হল না, কিন্তু গ্রামের যে সব লোকজন নালার ওপারে কাজে গিয়েছিল, তাদের কী হবে? এধরনের ঘটনার সঙ্গে তারা অভ্যস্ত মনে হল। বেশিরভাগই পাথরের ওপর দিয়ে বড় বড় লাফ মেরে পার হয়ে এল। মুশকিল এক বৃদ্ধাকে নিয়ে, তাঁর পক্ষে লাফ দেওয়া সম্ভব নয়। শেষে একটা খোতে জোগাড় করে তার ওপরে ওঁকে চড়িয়ে দেওয়া হল। এক বুক জলে হিমসিম খেয়ে তাঁরা পার হলেন।

গ্রামের অন্যদিকে চোমোদের (মহিলা লামা) গুম্ভা। চোমোরা সব গ্রামে গেছেন, এক বয়স্কা মহিলা আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। দুখাং বা মূল উপাসনাগৃহ দোতলায়। অন্ধকার সরু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। জাঁকজমকহীন সাধারণ ব্যবস্থা। তাড়াতাড়ি দেখে নিই। গ্রাম দেখা সেরে আবার ফারকায় ফেরা। সন্ধে নেমে আসে। পদম চলে যায় মাঠ থেকে শেরুদের নিয়ে আসতে। কপিল রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আজ ট্রেকের শেষ রাত। লক্ষ তারার চাঁদোয়ার নিচে বসে আমাদের রোমন্থন চলে। হঠাৎ উদ্বিগ্ন মুখে পদম ফিরে এল, সঙ্গে শেরুরা কেউ নেই। ‘সাব, শেরুর সঙ্গে স্থানীয় ঘোড়াদের লড়াই শুরু হয়েছে’। ঘটনাটা আর তার ফলাফল অনুধাবন করতে সময় লাগল, তারপর বুঝলাম পাশের মাঠে শেরুর সঙ্গে এখানকার স্থানীয় ঘোড়াদের নেতার লড়াই শুরু হয়েছে। এ লড়াই বড় ভয়ানক হয়, অনেকক্ষেত্রে ঘোড়া মারাও যেতে পারে। স্পিতির ঘোড়া মারা গেলে মুদ গ্রামের লোকেরা পদমকে ছাড়বে না, আর শেরুর কিছু হলে পদমের অনেক ক্ষতি হবে। শেরুকে লড়াই থেকে আলাদা করতে পারলে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই পদমদের সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকার রাত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার ডাক আর খুরের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। কিছুই দেখা যায় না। তবু তারই মধ্যে পদমরা ঠিক ঘোড়ার পালের কাছে পৌঁছে যায়, পিছু পিছু আমরা। কুড়ি-পঁচিশটা ঘোড়া। টর্চের আলোয় চোখ জ্বলজ্বল করছে সবার। লড়াই থামিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে মনে হয় যেন এ জগতের প্রাণী নয় তারা। পদমরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায়। আমাদের দায়িত্ব শেরুর চোখে আলো ফেলে তাকে বিভ্রান্ত করে রাখা। আচমকা, একটা ঘোড়া নড়ে উঠল; তারপর সবাই মিলে এক দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে, আমাদের টর্চের নাগালের অনেক বাইরে।

পরদিন ভোরবেলা উঠে দেখি পদম তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘোড়াদের খোঁজে। ফারকা গ্রামের কয়েকটি বাচ্চা পিঠে ঝুড়ি নিয়ে মাটি থেকে কীসব কুড়োচ্ছে। কাছে এলে জানলাম মাঠে ঘাটে গোবর জোগাড় করছে তারা, জ্বালানি হবে। কালকে ঘোড়ার লড়াইয়ের খবর তারা জানে না। ওদিকে শেরুকে না পাওয়া গেলে আমাদের খুব অসুবিধা হবে, আজ আদৌ বের হতে পারব কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখি দিগন্তে শেরু। পদম আর কপিল সহজেই গ্রেপ্তার করে নেয় রণক্লান্ত শেরুকে। রাতে উদ্বিগ্ন থাকলেও এখন খুব খুশি পদম।

এবার আমরা রওনা দিতে পারি। আজ যাব গুলিং (৩৪৫০ মিটার)। অনেকে ভোরবেলা ফারকা ছেড়ে দুপুরের মধ্যে মিক্কিম পৌঁছে, দুপুর এগারোটার বাসে সোজা চলা যায় কাজা। আমাদের অত তাড়া নেই। হাল্কা চড়াই-উতরাই পথ। পথের ধারে দুয়েকটা খেত। তারপর সটান নেমে আসি নদীর ধারে। পাথরে মোড়া চওড়া নদীখাত। আরেকটা নদীর সামনে এসে দাঁড়াই। নাম কোটকি নালা। যথারীতি নদীতে সেতু নেই। কোটকি নালা বেশ চওড়া নদী, কিন্তু পার হতে আমাদের কোনও অসুবিধা হল না। নদী পার হয়ে হয়ে আমাদের বোধহয় অভ্যাস হয়ে গেছে। নদীর ওপারে তিলিং গ্রাম। এই গ্রাম থেকে কোটকি নালা ধরে লারসা ওয়ে গিরিপথ (৫২০০ মিটার) পেরিয়ে কিন্নরে যাওয়া যায়। আরও এগিয়ে তান্নাম, একটি বাড়ি নিয়েই গ্রাম। বাড়ির মালিক আমাদের পূর্বপরিচিত। কিন্নর থেকে কাঠ কেটে ফেরার সময় কারাতে আলাপ হয়েছিল। আবার চলা, নদীর ওপারে গাড়ির রাস্তা তৈরি হচ্ছে। দূর থেকে দেখা যায় সগনম। ক্রমে সে বড় হতে থাকে। পিন নদী ও পীরহিও নদীর সঙ্গমস্থিত এই জনপদটিতে থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। সঙ্গমের অপর পারে মিক্কিম। আমাদের রাস্তা থেকে খার গ্রাম হয়ে যেতে হয় ওখানে। সেদিকে না গিয়ে, আমরা সোজা চলি। একসময় দূরে দেখা যায় গুলিং গ্রাম। ট্রেকিংয়ের শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছি আমরা। নেমে আসতে হয় পিন নদীর পারে। নদী পার হওয়ার জন্য স্টিলের ব্রিজ আছে, কিন্তু শেরুরা তাতেও নারাজ, সুতরাং বাকি অংশটুকু নিজেদেরই মাল বয়ে নিয়ে যেতে হয়। গুলিংয়ে থাকার হোটেল মাত্র একখানি। সস্তায় রাজকীয় ব্যবস্থা। মালপত্র পৌঁছে দিয়ে পদমরা ফিরে যায়। হোটেল লাগোয়া রেস্তোরাঁয় খাবার বানাতে বলে ছাদে চলে আসি। ছাদের ওপরে ধর্মীয় পতাকা আর ডিশ অ্যান্টেনার অদ্ভুত মেলবন্ধন। চারদিকে উঁচু উঁচু বাদামি পাহাড়। ওধারে বয়ে যাচ্ছে পূর্ণ যৌবনা পিন। দূরে, তার বুকের ওপর একটা ব্রিজের আবছা আদল। সেখান থেকে পাঁচটি ছায়ামূর্তি ফিরে যাচ্ছে মুদের দিকে। এবার পদমদের ঘরে ফেরার পালা, আমাদেরও।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

হরপ্রসাদ মিত্র

ওদেশি বান্টু ভাষায় মোসি-ওয়া-তানিয়া । শব্দটির অর্থ হল স্মোক দ্যাট থান্ডারস, বজ্র আরাবী ধূম্রপুঞ্জ । অখ্যাত-নামা কোন সে কবি, কবে এই অত্যন্ত সমীচীন নামটি রেখেছিলেন-তার খবর আজ কেউ রাখে না । তাই, বাকি পৃথিবীতে জাম্বেজি জলপ্রপাতের ভয়াল মহিমা পরিচিত হল অন্য এক নামে, সে নাম তখনকার রীতি অনুযায়ী লিভিং স্টোন দিয়েছিলেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামে ।

মিশনারি পরিব্রাজক লিভিং স্টোনের মনে দুটি সাধ ছিল । এক, আফ্রিকার ধর্মহীন (লিভিং স্টোনের মতে) মানুষগুলোকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করবেন । দুই, নীলনদের উৎস খুঁজে বার করবেন । দুটোর কোনওটাই মেটেনি । সুদীর্ঘ কর্মজীবনে মাত্র একজন নেটিভকে তিনি নিজধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন । এই লোকটি ছিল তাঁর খাস নফর । এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই নফরটি তার নিজধর্মে ফিরে যায় । আর নীলনদের উৎস তাঁকে বারবার বিভ্রান্ত করে । আসল উৎসে তিনি পৌঁছতে পারেননি । তবুও জলপ্রপাতে নিবদ্ধ দৃষ্টি লিভিং স্টোনের সুবিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে ওই অবিশ্রান্ত প্রবহমান জলধারার অবিরাম বজ্র নির্ঘোষে, ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শীকরকণায় প্রতিফলিত রামধনুতে তিনি তাঁর আবিষ্কারক জীবনের অন্যতম সার্থকতা লাভ করেছিলেন ।

নায়াগ্রায় জলপ্রবাহ ভিক্টোরিয়া ফলস থেকে পাঁচগুণ বেশি । ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার সীমান্তে ইগুয়াসু ফলস বিস্তৃতিতে প্রায় তিনগুণ । কিন্তু পতনের গভীরতায় এবং অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রস্থে এরা কেউই ভিক্টোরিয়া ফলসের ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না । নাতিপ্রশস্ত খাদের এপারে দাঁড়িয়ে, ওপারের ১.৭ কিলোমিটার চওড়া মুক্তধারার ৯০ থেকে ১০৭ মিটার খাড়া পাহাড়ের নিচে লাফিয়ে পড়া দেখতে দেখতে মনে হয় যে, এ গম্ভীর সৌন্দর্য পৃথিবীতে অতুলনীয় । ভাসারির বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে: সৌন্দর্য তাকেই বলব, যাতে কিছু যোগ করাও যায় না বা যা থেকে কিছু বাদ দেওয়াও চলে না ।

উনিশ শতকের শেষ থেকেই ভিক্টোরিয়া ফলস-এ পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয় । প্রথম স্যুভেনিরের দোকান খোলে ১৯০৩ সালে । প্রায় সেই সময়েই এখানে বেড়াতে এসেছিলেন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড । তাঁর জন্য ফলসের ধার ঘেঁসে তৈরি হয়েছিল

সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ফলস হোটেল । হোটেলটি আজও ভিক্টোরিয়া ফলস শহরের মধ্যমণি । সুদূর কেপটাউন থেকে দু রাত তিনদিন ধরে ব্লু ট্রেন এসে থামত হোটেলের লাগোয়া স্টেশনে । হোটেল থেকে ফলস পর্যন্ত ৩০০ মিটারের মতো রাস্তা হেঁটে যেতে রাজন্যবর্গের কষ্ট হবে বলে আলাদা একটি সরু রেললাইন বসানো হয়েছিল । এই লাইনটি এখন নেই কিন্তু তার বদলে বড় লাইনের ট্রেনে চড়ে জাম্বেজির খাদ পেরিয়ে ওপারে জাম্বিয়া ঘুরে আসতে পারেন । ওপারে প্রথম শহর এবং স্টেশনের নামও লিভিং স্টোন । ১০ কিলোমিটারের মতো রাস্তা ।

অধুনা আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং উড়োজাহাজের উৎপাতে সেকালের নিয়মিত ব্লু ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে । তবে লাইন পাতা আছে এবং তার ওপর দিয়ে অন্য লোকাল ট্রেন এবং মালগাড়ি যাতায়াত করে । আর, কখনও কখনও ভ্রমণরসিকেরা কেপটাউন থেকে পুরো একটা ব্লু ট্রেন ভাড়া করে ভিক্টোরিয়া ফলস দেখতে আসেন ।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়েকটি ট্যুরিস্ট বাস ছাড়া এখন প্রায় সব পর্যটকই উড়ে আসেন । তবে এঁদের পর্যটক না বলে দর্শক বলাই ভালো । মেয়াদ একদিন, বড় জোর দুদিন । এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল । সেইদিন সকালেই তিনি অকল্যান্ড থেকে উড়ে এসেছেন । সন্ধ্যাবেলা অন্য প্লেন ধরে ইজিপ্টে আসোয়ানের পথে পাড়ি দেবেন । লক্ষ আবু সিম্বেলের মন্দির । আমরা হোয়াঙ্গো ন্যাশনাল পার্ক থেকে ৩৫ মিনিট উড়ে ভিক্টোরিয়া ফলস পৌঁছলাম এক দুপুরবেলায় । আমাদের সময় তৃতীয়দিনের বিকেল পর্যন্ত । এয়ারপোর্টের কোলাহল ছাড়িয়ে বেরোতেই কানে এল প্রত্যাশিত গুম গুম আওয়াজ । গাছপালার আড়াল ফুঁড়ে চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত পালকের ঝাড়, যেন আকাশের মেঘ নারদমুনির জটাজালের মতো চূড়ার আকৃতিতে মাটিতে নেমে এসেছে । আসলে মেঘ নিচে নেমে আসেনি । বরং প্রপাতের তলা থেকে জলকণাবাহী বাতাস মেঘের মতো আকাশে উঠে গেছে । এই অদ্ভুত দর্শন মেঘ উচ্চতায় প্রায় ৫০০ মিটার । ৬০ কিলোমিটার দূর থেকে এটা চোখে পড়ে ।

আমাদের হোটেল ইলালা লজ, এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচ-ছ কিলোমিটার । প্রপাতের নিকটতম হোটেল এটা, যদিও গাছের বেড়া থাকার দরুন প্রপাত এখান থেকে দেখা যায় না । হোটেলের পিছনে সবুজ লন-তার ওপারে ফুলের কেয়ারি, গুল্ম ঝোপের বেষ্টনী । হোটেল চৌহদ্দির পরেই মুক্তভূমি । ওদেশি ভাষায় বুশ ল্যান্ড, জাম্বেজি ন্যাশনাল পার্কের শুরু । রিসেপশন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সারি সারি একতলার ঘর । তার একটা আমাদের । ঘরের পিছন দিকটা পুরো কাচের, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর মতো । এক পাল্লা স্লাইডিং দরজা খুলতেই লন-এ এসে দাঁড়ালাম । তার আগে, স্নানাগারের দরজায় বিজ্ঞপ্তি দেখেছি:

স্লাইডিং দরজা সর্বদা বন্ধ রাখবেন । বেবুনরা অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু প্রাণী । আপনার অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তো হাঁটকাবেই -এমনকী ঘড়ি ক্যামেরা প্রভৃতি মহার্ঘ জিনিস চিবিয়ে দেখতে পারে ।

স্লাইডিং দরজা টেনে দিয়ে একটা চেয়ার পেতে বসলাম । প্রথমে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে এল একটা ওয়ার্ট হগ । শুয়োরের মতো দেখতে এবং প্রায় ওই সাইজেরই জানোয়ার । কেবল মুখটা একটু চ্যাটালো । দুই কষে দুটি দাঁত বেরিয়ে আছে । সারা মুখ ভর্তি বড় বড় আঁচিলের মতো । কুৎসিত জন্তুটা হোঁদল কুতকুত-এর মতো মিষ্টি । সে একটা চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঢুকল গোটা দুই বেজি । সুট সাট করে এ কোণ ও কোণ দেখে, গোটা দুই ডিগবাজি খেয়ে তারা পালাল । এবার বেবুনরা । বাবা, কয়েকটি মা, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে একটা দঙ্গল । ওরা বেশ জম্পেশ হয়ে বসল । এ গাছের পাতা, ও গাছের কুলের মতো ছোট ছোট ফল, মাটিতে কয়েকটা পোকামাকড়-মুখ চলছে তো চলছেই । এছাড়া নানা রকমের পাখির কিচির মিচির তো আছেই । ঘরে বসেই বেশ সময় কাটছিল কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, আর দেরি করা যায় না । তিনটের সময় ট্যুর কোম্পানির লোক আসবে আমাদের জাম্বেজি সানডাউনার ক্রুইজে নিয়ে যাবার জন্য ।

সানডাউনার ক্রুইজ-রেন ফরেস্ট

এ হোটেল সে হোটেল থেকে যাত্রী তুলতে তুলতে নদীর ধারে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় পৌনে চারটে । প্রপাতের কয়েক কিলোমিটার আগে কূলে কূলে ভরা জাম্বেজি এখানে প্রায় তিন কিলোমিটার চওড়া । নদীর মধ্যে বড় বড় চর মাথা তুলেছে-আগাছা জঙ্গলে ভর্তি । মানুষের বসতি নেই । এপার ঘেঁসা চরগুলি জিম্বাবোয়ের, ওপারের চরের মালিকানা জাম্বিয়ার । নদীর জলে গায়ে গা লাগিয়ে পাঁচ-ছটা মোটরলঞ্চ বাঁধা । আকারে মোটামুটি এক । কমবেশি বারো মিটার লম্বা, চার মিটার চওড়া-চ্যাপ্টা গোছের খোল যাতে অল্প জলে চলতে পারে । জনা চল্লিশ যাত্রী নেয় । মাল্লা লস্কর নিয়ে আরও পাঁচ-ছজন । ওপরে ছাদ আছে বটে কিন্তু তার সব দিক খোলা, রেলিং দিয়ে ঘেরা । একতলা লঞ্চের সব দিকেই অতিথিদের বসবার জায়গা, কেবল সামনে একটু জায়গা পাইলটের এবং পিছনে কয়েকটি সিন্দুক নিয়ে পানীয়ের বন্দোবস্ত । লঞ্চের মাঝখানে দুটো টেবিলে সাজানো নানা রকম টুকটাক খাবার । ইঞ্জিনটাকে ওরা খোলের ভেতর চাপা দিয়ে রেখেছে ।

এতক্ষণে নৌকা বেশ ভরে উঠেছে । পাঁচমিশালি দল । তরুণ-তরুণী থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সব বয়সের এবং নানা দেশের লোক আছে । পাঁচ-ছজনের একটা ছোট্ট দলকে মনে হল যে ওরা সবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে । ওদের প্রতাপ সকলের চেয়ে বেশি ।

হাসি গল্প গান চেঁচামেচিতে স্টিমারের একটা কোণ মাতিয়ে রেখেছে । কৃষ্ণকায় বলতে আমরা দুটি প্রাণী । এ বদর বদরের দেশ নয় । নদীতে ঝড় তুফানের ভয়ও নেই । ঠং ঠং করে একটানা ঘণ্টা বাজল, দুজন মাল্লা কাছির বেড় খুলে স্টিমারে লাফিয়ে পড়লেন । স্টিমার বুড়বুড়ি কেটে পিছু হটতে লাগল । মোটামুটি পঞ্চাশ গজ । তারপরই মুখ ঘুরিয়ে নাক বরাবর এগিয়ে চলল-এপারে জিম্বাবোয়ের কূল ঘেঁসে । নদীর কিনারায় দুশো কোটি বছরের পুরনো লাভা ব্যাসাল্টের অগ্ন্যুৎগার, জলজ শৈবাল লতা গুল্মের আস্তরণে নিবিড় সবুজ, কিছুটা তৃণভূমি । সেখান থেকে চোখ তুললেই, আকাশছোঁয়া বনস্পতির পাহারা । নদীর জলধারায় এবং জলপ্রপাতের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় এই লাভা ব্যাসাল্ট আগ্নেয় পাথরে খরার রাজ্যে একটি রেন ফরেস্ট গড়ে উঠেছে-ডুমুর, মেহগনি, মিল্কউড, এবোনি, ডেটপাম সুবিশাল মহীরুহ শ্রেণীর মাথায় মাথায় লিয়ানা, ল্যান্টানা লতাগ্রন্থীর জটাজাল । নিচে ঝোপঝাড়, বাঁশ, ম্যানগ্রোভ -দিনমানেও অন্ধকার । বনের প্রসার হয়তো নদীর ধারে ধারে এক বা দুই কিলোমিটার কিন্তু ভেতরে ঢুকে পড়লে মনে হবে দিকহারা কঙ্গোর বেসিনে ঘুরে বেড়াচ্ছি । জন্তু-জানোয়ারও অঢেল । হাতি, চিতা, মোষ, বেবুন তো আছেই, সিংহও কখনও কখনও এসে পড়ে । এছাড়া নানা রকমের হরিণ, হায়না, বাঁদর, খেঁকশিয়ালের ছড়াছড়ি । আর আছে নদীর জলে-ডাঙায় মুক্তদন্ত কুমিরের দল ।

এতক্ষণে লঞ্চের ভেতরে হাসি গল্প গান আড্ডা জমে উঠেছে । পিছনের দিকে ফটাফট বোতল খোলা হচ্ছে । হাতে হাতে পানীয় সরবরাহ করছেন মাল্লার দল । জিন বিয়ার অরেঞ্জ কোক যার যা চাই । কোনও কার্পণ্য নেই -একটা গ্লাস খালি হতে না হতে, আরেকটি এসে যাচ্ছে । পানীয়ের দাম টিকিটের সঙ্গেই ধরা আছে । তারপর কে একটা পেল আর কে তিনটে পেল তার হিসেব আবার কে করে । লঞ্চ অন্য পারে লিভিং স্টোন দ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে মাঝ নদীতে এসে পড়ল । হঠাৎ সবাই হুড়মুড় করে একদিকে ভিড়ল । কী, না-তিনটে জলহস্তী সন্ধ্যার ঝোঁকে নদী ছেড়ে হেলতে দুলতে ডাঙায় উঠল । এখন সারা রাত ওরা চরের ঘাস গাছপালা খাবে । ওপারে জাম্বিয়ার তটরেখায় তিনটে হাতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে, তার অনেকটা পিছনে পটে আঁকা ছবির মতো একটি জিরাফের কৌতূহলী উৎকণ্ঠিত মুখ, গ্রীবাভঙ্গি । পানীয়ের সঙ্গে খাদ্যেরও সদ্ব্যবহার হচ্ছে । বেশ জমে উঠেছে পার্টি । চারদিকে নদীর জলে আরও অনেক স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা । একতলা দুতলা । কখনও কখনও বাক্য ছোড়াছুড়ি, কুশল বিনিময়ও হচ্ছে । বেপরোয়া একটা স্পিডবোট, সকলের পাশ দিয়ে এবং পাশ কাটিয়ে গোঁ করে বেরিয়ে গেল । উন্মুক্ত দেহ ছেলেটির দৃঢ়বদ্ধ হাতে স্টীয়ারিং, মেয়েটি এবং তার চুল ছেলেটির গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ।

এবার ফেরার পালা । মাঝ দরিয়ায় ঘুরে বোট মন্থর গতিতে চলেছে । নিচে জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি । হৈ হুল্লোড় স্তিমিত । পিছনে সমস্ত আকাশ জুড়ে সূর্য ডুবছে । নিরক্ষরেখাস্থিত আফ্রিকার সন্ধ্যাকাশে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে যে রং ফুটে ওঠে পৃথিবীতে কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই । আকাশের আলো দ্রুত কমে আসছে । মনে হয় কেউ যেন স্লাইডিং সুইচ ঘুরিয়ে হাজার বাতির প্রভা কমিয়ে আনছে । মৃদু থেকে মৃদুতর । তবু আকাশে এখনও পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নিজ নিজ আশ্রয়ে আর জলের ভেতর থেকে চলন্ত লাল পাথরের ঢিপির মতো জলহস্তীরা ডাঙায় উঠে আসছে । জ্বলন্ত লোহার ভাঁটার মতো সূর্য নেমে এসেছে অরণ্য রেখায়-সবুজ গাছের মাথায় লাল আলো ছড়িয়ে পড়ল । সূর্য নেমে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে বনানীর গভীরে, তবু ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে খণ্ড খণ্ড সূর্য দেখছি-তার দীপ্তিতে ওই দিকটা এখনও ঝলমল করছে । বাকি সব অন্ধকার । দূরে ভিক্টোরিয়া ফলস শহরের আলোগুলো জ্বলে উঠল ।

মঙ্গোলিয়ান হটপট

রাতের খাওয়াটা বেশ মজার হল । আমাদের হোটেল সদ্য একটা ওপেন এয়ার রেস্টুরেন্ট খুলেছে । খোলা আকাশের তলায় ছাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটিতে সারি সারি টেবিল চেয়ার পাতা এবং তারই একটা কোণে রান্নার বন্দোবস্ত । পাঁচ ফুট ব্যাস এবং এক ইঞ্চি পুরু একটি তাওয়া গ্যাস রিং-এর ওপরে বসানো আছে । গোল টুপি পরা পাচক কাঠের খুন্তি হাতে সেখানে তৈরি । তাওয়া থেকে অল্প দূরে দুটি কোণের দেওয়াল ঘেঁসে সারি সারি দেরাজ, শেলফ, আলমারি -কিছু খোলা আবার কোনওটা কাচের ঢাকার ভেতর ঠান্ডা রাখা । এইগুলি হল কাঁচা খাবারের আধার । তার মধ্যে নেই এমন জিনিস নেই । মাছ, মাংস, সবজি, ন্যুডলস, নানা রকমের শাক, চিনাদের তোফু, শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, স্কুইড -মানে দস্তুরমতো একটা সুপার বাজার । খরিদ্দারদের হাতে একটা করে প্লাস্টিকের ডাব্বা এবং তাঁরা ঘুরে ঘুরে তাঁদের পছন্দমতো খাদ্যসামগ্রী ডাব্বাজাত করছেন । তারপর ভর্তি ডাব্বাটি তাওয়ার পাশে পাচকের হাতে দিয়ে নিজের টেবিলে গিয়ে বসতে পারেন বা দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন পাচক কী করে । পাচক পুরো ডাব্বাটি গরম তাওয়ার একপাশে ঢেলে কাঠের খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করবেন, কখনও বা টিপে দেখবেন কতদূর এগোল, এমন ছয়-আটটি ডাব্বার মাল তিনি তাওয়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাকাচ্ছেন । তৈরি হলে সেটি প্লেটে করে পরিবেশন করা অন্য লোকের কাজ । ব্যাপারটা দেখতে বেশ জাঁকালো হলেও, খেতে অতটা ভালো লাগল না । তবে সেটা মূলত আমার দোষ । কিসের সঙ্গে কী যায় এবং কোন জিনিস কতক্ষণ তাওয়ায় থাকলে আমার ভালো লাগবে -এসব বিষয়ে

কোনও জ্ঞান না থাকায় আমি ঠিকমতো জোগান দিতে পারিনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখলাম অনেক বিবেচনা করে জিনিস ডাব্বায় তুলছেন এবং কোন জিনিস কতক্ষণ পাক হবে তা নিয়ে পাচকের সঙ্গে বিদগ্ধ আলোচনা করছেন। তাঁরা নিশ্চয় ভালোই খেলেন। এই রান্নাটি কিন্তু জিম্বাবোয়ের নিজস্ব নয়। পরে কেউ কেউ বলেছেন যে পদ্ধতিটি মঙ্গোলিয়ার আমদানি। নাম মঙ্গোলিয়ান হটপট। কোথায় মঙ্গোলিয়া আর কোথায় জিম্বাবোয়ে। পৃথিবী যদি কখনও এক হয় তো, খাদ্যসূত্রেই হতে পারবে।

প্রপাতের পথে

পরদিন সকালে জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া। ব্রেকফাস্ট শেষ করে নটা নাগাদ গাইডের সঙ্গে বেরোলাম। এ বেড়ানোটা পুরোপুরিই পায়ে হেঁটে এবং গাইড না নিলেও চলে। তবে গাইড থাকলে সে অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলি সহজে দেখিয়ে দেয় এবং পথ থেকে বিপথে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখে। ট্যুর শুরু হয় আমাদের হোটেল থেকে ৩০০ মিটারের মতো দূরে লিভিং স্টোনের স্ট্যাচুর তলা থেকে। উল্টোদিকে খাদের ওপারে ডেভিলস ক্যাটারাক্ট সতেরশো মিটার চওড়া প্রপাতের পশ্চিমদিক এবং প্রপাতের নিম্নতম অংশ-উচ্চতা মোটে ৭০ মিটার। পুবদিক ঘেঁসে উচ্চতম অংশ রেনবো পয়েন্টে প্রপাতের জল ১০৮ মিটার নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ডেভিলস ক্যাটারাক্ট নিচু হলেও এখানে মস্ত সুবিধা এই যে লিভিং স্টোনের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে সরু পাকদণ্ডীর মতো সিঁড়ি বেয়ে খাদের ভেতরে অনেক দূর নিচে নেমে যাওয়া যায় এবং সেখান থেকে ওপরে তাকিয়ে সেই সুবিপুল জলস্রোতের অবিশ্রান্ত সংঘাত বুকের ধুকধুকি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। ডেভিলস ক্যাটারাক্টের পাশেই লিভিং স্টোন আইল্যান্ড-এখানে দাঁড়িয়ে লিভিং স্টোন প্রথম এই প্রপাত দেখেন এবং একটা বুলেটে সুতো বেঁধে খাদের গভীরতা মাপেন। গাইড বলল, বিকেলবেলা এখানে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় এপার ওপার রামধনু ফুটে থাকে।

খাদ থেকে উঠে এসে খাদের ধারে ধারে পুবমুখো এগনো। ডানদিকে গাছপালা জঙ্গল মহীরুহের দল, বাঁদিকে ৩০ থেকে ৬০ মিটার চওড়া খাদের ওপারে জাম্বেজির বিপুল জলধারা কোথাও কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে, কোথাও সাদা ফেনায় টগবগ করে খাদের গভীরে লাফিয়ে পড়ছে। তার অবিরাম বজ্রনির্ঘোষ আর ঝাপটা হাওয়ায় জলকণা এসে কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দেয়। গাইড বলল, তবু তো এখন এই অক্টোবর মাসে নদীতে জল অর্ধেকেরও কম। মে-জুন মাসে এলে ওয়াটারপ্রুফে সারা অঙ্গ না মুড়ে এরাস্তা দিয়ে চলতে পারতেন না। অবশ্য এক হিসাবে অক্টোবর-নভেম্বর ভালো। মে-জুন মাসে-

প্রপাতের ওপরের মেঘ এত গভীর হয় যে অনেক সময়ে খাদের এপার থেকে ওপারে প্রপাতটাই দেখা যায় না ।

এপথের সব জায়গা থেকেই জলপ্রপাত দেখা যায় এবং তার শব্দ শোনা যায় । তবু যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং হয়তো বা তাদের বোঝানোর জন্য সারা পথে পনেরোটি পয়েন্ট চিহ্নিত করা আছে । লিভিং স্টোন স্ট্যাচু এক নম্বর, সিঁড়ির তলায় দুই আর এই যেখান থেকে বিকেলে রামধনু দেখা যায় সেটি তিন নম্বর । তারপর চার পাঁচ ছয় সাত এমন কিছু ব্যাপার নয় কিন্তু আট নম্বরে একটু ঘুরে দাঁড়াতে হবে । প্রপাতের প্রধান ধারার মুখোমুখি । মনে মনে হৃষীকেশ স্বর্গদ্বারের গঙ্গার কথা ভাবুন । ওই রকম তোড়েই জলস্রোত বেরিয়ে আসছে । কিন্তু ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়িয়ে চলছে না । পাহাড়ের মাথা থেকে সমস্তটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নব্বই মিটার গভীর খাদে । আর সেই জলের ওপর সূর্যের আলোয় কত রঙের খেলা । এরপর ওপারের পাহাড় অর্ধবৃত্তাকারে একটু ভেতরে ঢুকে গেছে । ১৪ নম্বর পয়েন্ট থেকে দেখতে হয় জলধারার ঘোড়ার খুরের মতো আকৃতি । এবং এখান থেকেই দেখা যায় প্রপাতের গভীরতম অংশে (১০৮ মিটার) এপার ওপার জোড়া বিরাট চওড়া রামধনু । রেনবো ফলস । প্রপাতের জিম্বাবোয়ে অংশ শেষ হয়ে আসছে । ১৫ নম্বর পয়েন্ট থেকে দেখা যাবে জাম্বিয়ায় প্রপাতের বাকি অংশটা । ইস্টার্ন ক্যাটারাক্ট । তবে বছরের এ সময়ে ওখানে জল নেই । খাড়া পাহাড় নিরম্বু দাঁড়িয়ে আছে । ১৫ নম্বর পয়েন্টের পাশেই বিপজ্জনক কোণ । এখানে পাহাড় একটু এগিয়ে গিয়ে খোলা রকের মতো হয়েছে । রেলিংয়ের বন্দোবস্ত নেই । এপাথর ওপাথর ধরে রকের প্রান্তে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যেতে পারে । ১০৫ মিটার নিচে সরু নির্গমনের পথে জাম্বেজির জল মাথা কুটছে, ফুটছে । নাম ফুটন্ত কড়াই ।

হোয়াইট ওয়াটার র্যাফটিং

এইখানেই আমরা প্রপাত দর্শন শেষ করে হোটেলের পথ ধরলাম । গেট দিয়ে বেরোবার আগে গাইড আমাদের দেখাল যে অনেক নিচে নদীখাতের একটা মোড়ের মাথায় সারি সারি খেলনার মতো হাওয়া ভরা রবারের ডিঙি সাজানো আছে । ওইখান থেকেই শুরু হয় ভিক্টোরিয়া ফলসের বিখ্যাত হোয়াইট ওয়াটার র্যাফটিং । দুঃসাহসীদের দল ওইসব ভেলায় চড়ে প্রপাতোত্তর জাম্বেজির আটটা খাদ এবং উনিশটা র্যাপিড পেরিয়ে ভীমবেগে চলে যায় আঠারো থেকে বাইশ কিলোমিটার রাস্তা -যেখানে নদী আবার শান্ত হয়েছে । এদের সঙ্গে অবশ্য অভিজ্ঞ গাইড থাকে কিন্তু তবুও ভেবে দেখুন তো দুধারে খাড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ গভীরে জলে পাথরে লুটোপুটি খেতে খেতে হৃৎপিণ্ড কখনও কখনও কি গলার কাছে উঠে

আসে না! র্যাপিডগুলোর নামও বড় মজার । টার্মিনেটার, ঘোস্ট রাইডার, কমার্শিয়াল সুইসাইড, ডিপ থ্রোট ইত্যাদি । এদের মধ্যে ৯ নম্বর র্যাপিড কমার্শিয়াল সুইসাইড সকলের চেয়ে কঠিন । কেউ কেউ নৌকা কাঁধে করে ঘুরে যান । সকাল আটটা নাগাদ শুরু করে বিকেল চারটের মধ্যে র্যাফটিং শেষ হবে । মাঝখানে ঘণ্টা দুই দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বিশ্রাম নদীর কূলে বসে । পথে একজন র্যাফট গাইডকে বললাম, যে বড় ইচ্ছে করছে তোমাদের ভেলায় চড়তে । সে আমাকে এক নজর দেখে বলল, তোমাকে চড়তে দেবে না । মানে, বুড়ো মেরে কে খুনের দায়ে পড়তে চায়? প্রপাতের গণ্ডির মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম লিভিং স্টোনের পাশ দিয়ে । বেরোলাম অন্যদিকে, প্রায় এক কিলোমিটার দূরে-গাইড আমাদের নিয়ে গেল ফলস ক্র্যাফট ভিলেজ দেখাতে ।

ক্র্যাফট ভিলেজ

ব্রিটিশ সাহেব সিরিল ফরেস্ট জিম্বাবোয়ের সরকারি ভ্রমণ সংস্থা ইউ টি সির কর্তা ছিলেন । সে হল ১৯৭০ সাল । তখন থেকেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেরী দুজন মিলে আঞ্চলিক গাইয়ে বাজিয়েদের জোগাড় করে লোকসঙ্গীত নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করতেন । কয়েক বছর পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকার লোককৃষ্টি কলার চর্চাতেই পুরোপুরি সময় দিলেন এবং সেই সঙ্গে ভিক্টোরিয়া ফলস শহরের মধ্যে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুললেন যেখানে সাদা মানুষ আসার আগেকার গ্রাম্যজীবন দেখানো হবে । পরিতাপের বিষয় এই যে গ্রামটি তৈরি করার সময়ে ১৯৮২ সালে ফরেস্ট সাহেব বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান । কিন্তু স্ত্রী মেরী ফরেস্টের হাতে তাঁর সৃষ্টি বেঁচে আছে । আমরা যখন গ্রামে পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে । গ্রাম কর্মমুখর । কোথাও হাতে ঘোরানো জাঁতায় গম ভাঙা হচ্ছে, কোথাও তাঁত বসেছে, বিরাট কমিউনিটি রান্নাঘরে রান্না হচ্ছে -একদিকে খোঁয়াড়ের মধ্যে কতকগুলো ছাগল । একচালা কুঁড়ে ঘরগুলোর গোল ছাদ, কাঠের দেওয়াল । একটা কুঁড়ে আবার খুঁটির ওপরে মাটি থেকে এক মাথা উঁচুতে । বুনো জন্তুর ভয়ে গ্রামের লোকেরা এইরকম শূন্যে ঘর বাঁধত । পুরুত, মুচি, নাপিত-গ্রামে সব আছে এমনকী একজন মেডিসিন ম্যান ও ফরচুন টেলার তাদের জন্য আলাদা করা কুঁড়েতে বসে আছে । দশ জিম্বাবোয়েন ডলার মানে আমাদের পনেরো টাকার বিনিময়ে সে আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বলল । এর পদ্ধতিটি কিছু নতুন । আপনার হাতের মুঠোয় আটটা চতুষ্কোণ কাঠের শলা ধরিয়ে দিয়ে বলবে শলাগুলোকে নিচে পশুচর্মের ওপর ঘুরিয়ে ফেলতে । তারপর শলাগুলির অবস্থান অনুধাবন করে সে মিনিট তিনেক কিছু বলবে

দুর্বোধ্য ইংরিজিতে । প্রতিপ্রশ্ন করে লাভ নেই । জবাব পাবেন না এবং ততক্ষণে আরেকজন অনুসন্ধিৎসু ঘরের দরজায় অপেক্ষা করছেন ।

ক্র্যাফট ভিলেজের বেড়ার বাইরেই বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে লোকসঙ্গীত নৃত্য প্রদর্শনীর জায়গা । কুশীলব ওই ভিলেজের লোকেরাই-তা প্রায় ৪০-৫০ জনের দল-ছেলেমেয়ে বুড়ো বাচ্চা মিলিয়ে । সন্ধ্যাবেলা দেখতে গেলাম । জোরালো আলোর তলায় তিন চতুর্থাংশ বৃত্তাকারে গ্যালারি । চারশো লোক অক্লেশে বসতে পারে । যাত্রার আসরের মতো । স্টেজ নেই । মাঝখানে সমান জমিতে আসর । ট্যুরিস্ট ভোলানো এরকম শো পৃথিবীর নানা জায়গায় হয় । কাজেই খুব একটা উৎসাহ নিয়ে দেখতে যাইনি । কিন্তু শো আরম্ভ হতেই বুঝতে পারলাম যে এটা একটা জোড়াতাড়া দেওয়া হাতুড়ে জলসা নয় । এর পিছনে অনেক প্রস্তুতি, অনেক পরিশ্রম এবং পেশাদার পরিচালনা আছে । দেড় ঘণ্টা সময় যেন ফুঁ-এ উড়ে গেল । কোথাও লয় ঢিলে হল না । কোথাও মনে হল না, অনেক হয়েছে এবার থামলে হয় । প্রোগ্রামগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় । নৃত্য ও গীত, কোরাস গান ও জিমন্যাস্টিক্স । প্রতিটি অঙ্ক স্বয়ংসম্পূর্ণ । নাচে সবাই মুখোশ পরা-মুখোশের মাধ্যমে বোঝা যায় যে সে মানুষ না দেবতা না ভূত । আবার কচ্ছপ ও জেলের গল্পে মানুষটা পুরো একটা কচ্ছপের খোলা পরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল । কোরাস গান সবই প্রায় মেয়েদের । ঘরের নানা কাজ করতে করতে তারা গান গাইছে । গানের ভাষা কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ওদের হাত পায়ের ভঙ্গি থেকে বেশ বুঝতে পারলাম যে কুয়ো থেকে জল তুলছে বা বাড়ির পাশে পগার থেকে ছাঁকনি জালে মাছ ধরছে । জিমন্যাস্টিক্সের মধ্যে লম্বা লম্বা রণপা চড়ে একটা দল এল, তাদের মুখে বীভৎস মুখোশ । একটা ছেলে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটা মাথা কাটা তালগাছের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা খেলা দেখাল । আমি তো বলব কেবল ভিক্টোরিয়া ফলস টাউন কেন -আমাদের কলকাতা দিল্লিতেও এমন শো হলে দেখতে যেতাম ।

ভিক্টোরিয়া ফলস হোটেলে চা পান

পৃথিবীর সব মানুষকে চা অথবা কফিতে ভাগ করলে চায়ের দল অনেক ভারি হবে । আবার চা খাবার চল পৃথিবীর প্রায় সব দেশে থাকলেও, দুটি মাত্র দেশ এই চা খাওয়াটিকে একটা অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে । ইংল্যান্ড এবং জাপান । জাপানের অনুষ্ঠানটি আচারভিত্তিক-তার নিয়ম-কানুন বেশ কড়া । ইংল্যান্ডে বৈকালিক চা পান একান্ত সামাজিক ব্যাপার । লন থাকলে লনে, না হলে বাড়ির ভেতরেই চেয়ার টেবিল সাজিয়ে আরাম করে বসা-স্যান্ডউইচ, বিশেষ করে শশার স্যান্ডউইচ, কেক-বিস্কুট, মাফিন বা ফালা

ফালা করে কাটা সেদ্ধ ডিম সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে চা পান, গল্পগুজব আড্ডা। আজকাল এই মনোহর প্রথাটি লোপ পেতে বসেছে, কিন্তু ভিক্টোরিয়া ফলস হোটেল এখনও তাদের হোটেলের পিছনে সুবিশাল লনে প্রতি বিকেলে এই চা পানের আয়োজন করে। এখানে চা খেতে খেতে দেখা যায় বাষ্পোজ্জ্বল মেঘের ওপরে রামধনুর রং। ছোট ছোট পাখিগুলো এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে লাফালাফি করছে। একটু অন্যমনস্ক হলে সামনে রাখা কেকের প্লেটেও একটা ঠোক্কর দিয়ে যাবে। দু-চারটে কাঠবেড়ালির ব্যস্তসমস্ত আনাগোনা, রংবেরঙের প্রজাপতি। ওদের যেন কোনও কাজ নেই। মৌমাছিও দু-চারটে আছে। চা খাওয়া শেষ হলে বাঁধানো রাস্তা ধরে চলুন প্রপাতের সামনে যেখানে অতিকায় ফড়িংয়ের মতো রেল ব্রিজটা এপার থেকে ওপারে পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর সেইখানেই দেখুন ১১১ মিটার উচ্চতা থেকে পৃথিবীর গভীরতম বুঙ্গি লাফ।

ব্রিজের ধার থেকে কোমর থেকে দু-পা পর্যন্ত পেঁচিয়ে বেঁধে এবং তাতে রবারের দড়ি লাগিয়ে দুঃসাহসীর দল লাফিয়ে পড়ে নিচে নদীর খাদ লক্ষ্য করে। নদীতে পৌঁছবার আগেই স্থিতিস্থাপক রবারের দড়িতে টান পড়ে এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য মানুষটি ইয়ো ইয়োর মতো ওপর-নিচ করতে থাকে। সে স্থির হলে তাকে কপিকলের সাহায্যে ব্রিজের গায়ে লাগানো প্ল্যাটফর্মে টেনে তোলা হয়। ছেলেমেয়ে দু-দলই বুঙ্গি লাফ খেতে যায়। কেউ কেউ তো ওপরে উঠে আরেকবার লাফায়। এইখানে বলে রাখি যে আমি বুঙ্গি লাফ দেবার কথা ভাবিনি।

দেবদূতদের আকাশপথ

ভিক্টোরিয়া ফলসে দু-রাত কেটে গেল। পরের দিন বিকেলে ঘরে ফেরা। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে শহরে ইতস্তত বেড়ালাম। ক্র্যাফট ভিলেজের স্যুভেনিরের দোকানে হাবিজাবি কিছু কেনা হল। তারপর হোটেলে ফিরে ওদের স্যুইমিং পুলের ধারে বসে ঠান্ডা হাওয়ায় খুব সস্তা ঠান্ডা বিয়ার খাওয়া গেল। আর খেলাম ওদেশি খানা সাডজা-সাদা মকাই চূর্ণের মণ্ডর সঙ্গে চিকেন স্টু। ওদের নুনে জারানো শুঁটকি মাংস বিলটং একটু চেখে দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পাওয়া গেল না। ওইখানে বসেই আরেকটি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল-কে কী দেখেছে তাই নিয়ে গল্প। বিকেলে চলে যাব শুনে ওরা বলল, তোমরা দেবদূতের পথে একবার উড়ে আসবে না। ভিক্টোরিয়া ফলস দেখে লিভিং স্টোন নাকি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, এই অপূর্ব শোভা দেবদূতরাও নিশ্চয় উড়ে যাবার পথে চেয়ে দেখেন।

এই বাক্যটিকে কাজে লাগিয়ে এখানকার এক ভ্রমণ সংস্থা আকাশ থেকে ভিক্টোরিয়া ফলস দেখার বন্দোবস্ত করেছেন । নাম ফ্লাইট অব দ্য এঞ্জেলস । প্রথমে ছোট প্লেন যাত্রীদের নিয়ে এক চক্কর উড়ে আসত ২৫ মিনিটে । এখন হেলিকপ্টার আরও ভালো করে দেখায়, ১৫ মিনিট । কিন্তু তখন বেলা প্রায় দুটো-আর আমাদের হোটেল থেকে চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে বেরোতে হবে । এত তাড়াতাড়ি কী দেবদূতদের রাস্তায় বেড়ানোর বন্দোবস্ত করা যাবে! হোটেলকে বলতে ব্যবস্থা হয়ে গেল । হোটেল থেকে হেলি-স্টেশন দশ মিনিটের রাস্তা এবং প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর হেলিকপ্টার নামছে এবং দশ মিনিটে যাত্রী বোঝাই করে আবার উড়ছে । প্রতি খেপে সাতজন যাত্রী পাইলটকে নিয়ে । একজন পাইলটের পাশে । তিনজন তার পিছনের সারিতে । তার পিছনে ২ জন । পাইলটের পাশে জায়গা পেয়ে আমি খুব খুশি । ঠিক যেন পুরনো বাড়ির জানলার ধাপিতে বসে আছি আর জানলাটা পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে ।

মহাকাশযানে চড়ে যাঁরা পৃথিবী পরিক্রমা করেন তাঁরা পৃথিবীর খুঁটিনাটি কিছুই দেখতে পান না-কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলকে একসঙ্গে দেখার বিস্ময়ও কিছু কম নয় । আমাদেরও সেই অবস্থা । শূন্য থেকে প্রপাতের গাম্ভীর্য, ধ্বনি কিছুই বোঝা যায় না কিন্তু সমস্ত নদী এবং তার অববাহিকা যেন ছবির মতো চোখের সামনে বিছিয়ে আছে । দেখছি কেমন করে তিন কিলোমিটারের চেয়ে বেশি চওড়া বিস্তৃত-অঞ্চলা নদীটা আস্তে আস্তে গাছকোমর বেঁধে দেড় কিলোমিটার প্রপাতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । তারপর খাদের পর খাদ ভেঙে সুদূর সমুদ্রযাত্রা । জাম্বেজির খাদগুলো বড় মজার । ভাঁজ করা জানলার মতো, প্রতিটি ভাঁজ পরের ভাঁজের সঙ্গে জোড়া, যার অতল গভীরে নদীর মুক্তধারা এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে । পর পর আটটি ভাঁজ গুনে নেওয়া যায় । নবম ভাঁজটি এখন তৈরি হচ্ছে লিভিং স্টোনের সামনে, যাকে ডেভিলস ক্যাটারাক্ট বলা হয় । প্রপাতের ওপর দিয়ে ওড়বার সময় ছড়ানো পালকের ওপর রামধনু রঙের খেলা কাছ থেকে দেখলাম । আরও লক্ষ করলাম যে মাটি থেকে যে মেঘের পুঞ্জ আকাশ ছোঁয়া মনে হয়, তার মাথা আর আকাশের মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে । প্রপাত পেরিয়ে হেলিকপ্টার কিছুটা নেমে এল । প্রাকপ্রপাত নদীর বিস্তৃতি, তার দুধারে বড় বড় গাছগুলো । এক জায়গায় কয়েকটা হাতি জলে নেমেছে দেখতে দেখতে কপ্টার পাক খেয়ে ডেরার দিকে ফিরে চলল ।

বৃহৎ বৃক্ষ

কপ্টার স্টেশন থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভ্যানের ড্রাইভারের কাছে দুঃখ করছিলাম যে দ্য বিগ ট্রি বা বৃহৎ গাছটি দেখা হল না । ওদেশি ড্রাইভার বেশ মাই ডিয়ার লোক, বলল-সে কী! চলো এখনই দেখিয়ে আনি । আমি বললাম, আর সময় কই । আমাদের যে

হোটেলে পৌঁছেই প্লেন ধরতে দৌড়াতে হবে-আরে যথেষ্ট সময় আছে । আর আমিই তো তোমাদের এয়ারপোর্ট নিয়ে যাব । তারপর জাম্বেজি ড্রাইভ ধরে দৌড় দৌড় দৌড় । পাঁচ-ছ কিলোমিটারের মাথায় এই সুবিশাল বাওবাব গাছ যার গোড়ার বেড় কুড়ি মিটারের মতো । বয়স আনুমানিক ১৫০০ বছর । তবু বাওবাবদের কুলে এঁকে বড় জোর নব যুবক বলা যায়-কারণ কুলবৃদ্ধদের মধ্যে ৩০ মিটার বেড় এবং ৩০০০ বছর বয়সও পাওয়া যাবে । এই গরমকালে রিক্তপত্র, গুঁড়ি গুঁড়ি ডালওয়ালা বাওবাব গাছ দেখলে মনে হয় যেন গাছটাকে কেউ উল্টো করে পুঁতে দিয়েছে-মূল কাণ্ডটি মাটির তলায়-আর শুকনো ধুলো রঙের শিকড়গুলো আকাশে আঁকুপাঁকু করছে । এদেশে একটা গল্পও চলিত আছে যে বাওবাবদের আদি পুরুষের ওপর চটে গিয়ে বদরাগী কোনও দানো গাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে তুলেছিল । পরে রাগ পড়ে গেলে সে গাছটাকে আবার পুঁতে দেয় । কিন্তু দানো হলেও ভূত তো । গাছটাকে পোঁতে উল্টো করে । ফলে ডালপালা যায় মাটির নিচে আর শিকড়গুলো ওপরে দুলতে থাকে । যাক বিগ ট্রি দেখা হল । জগদ্বিখ্যাত বাওবাব গাছও এই প্রথম দেখলাম । জনান্তিকে জানিয়ে রাখি যে বাওবাব গাছ কলকাতার চিড়িয়াখানায় কয়েকটি আছে । রবীন্দ্র সরোবরেও একটি আছে বলে শুনেছি ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ১৯৯৯

বক্সা দুর্গ

টুটুল রায়

আমরা বক্সা গিয়েছিলাম প্রায় অচেনা রাস্তায় । আসামগামী জাতীয় সড়কে শামুকতলা । তার পাশেই শ্রীনাথপুর চা-বাগান হয়ে যাওয়া সেই রাস্তা অনেক বেশি অরণ্যময় । গতানুগতিক রাস্তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ।

শিলিগুড়ি থেকে রওনা হতেই দেরি হয়েছিল । ভাঙাচোরা জাতীয় সড়ক বেয়ে দমনপুর মোড়ে পৌঁছতেই বেলা গড়াল । ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরপাড়া জলদাপাড়ার প্রবেশদ্বার মাদারিহাট ও হাসিমারা পার হয়ে দমনপুর মোড় । সেখান থেকে ডাইনে গিয়েছে আলিপুরদুয়ারের রাস্তা । বাঁয়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে বক্সা পাহাড়ের পদতলে সান্ত্রাবাড়ি । আলিপুরদুয়ারে বাজারহাট সেরে বনদপ্তরের অফিস থেকে বুকিংয়ের কাগজ নিয়ে দমনপুর চৌরাস্তায় এসে উত্তরে রাজাভাতখাওয়ার বদলে আমরা রওনা হলাম পূর্বে শামুকতলার দিকে । জাতীয় সড়ক গিয়েছে বক্সা সংরক্ষিত অরণ্যের সীমান্ত ছুঁয়ে । তবে এখানে জঙ্গল তেমন ঘন নয় । শামুকতলা, বারোবিশার রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে আমাদের গাড়ি জাতীয় সড়ক পিছনে ফেলে বাঁয়ে ঘুরল । এখন পিচরাস্তা সরু হয়ে এসেছে । বিচ্ছিন্ন জঙ্গলের মাঝে মাঝে ধান, ভুট্টার খেত । উত্তরে কিছুদূরেই ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যরেখা । কিছুক্ষণের মধ্যে চেকো বীটের চেকনাকা পেরিয়ে আমরা জঙ্গলে প্রবিষ্ট হলাম । তারপর উত্তর থেকে ফের পুবমুখো হলাম গদাধর বীটের উদ্দেশে । পিচরাস্তার দুপাশেই এখন গহন জঙ্গল । মাথার ওপরেও অরণ্যের শামিয়ানা । কিছুটা যেতেই পথে পড়ল বালা নদী । নিঝুম নিঃসীম অরণ্যে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে শঙ্খিনী নদীটি । তার ওপর কাঠের তক্তা পাতা সঙ্কীর্ণ সেতু । উত্তরে জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে ভুটান পাহাড়ের নীলাভ তরঙ্গ ।

নদী পেরিয়ে জঙ্গল মাড়িয়ে আরও কিলোমিটার দুয়েক যাওয়ার পরেই পাওয়া গেল গদাধর বিট অফিস । অফিসের এ পাশে জঙ্গল শেষ । ও প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে শ্রীনাথপুরের আদিগন্ত চা-বাগান । সেই বাগানের পূর্বের সীমানা এঁকেছে রায়ডাক নদী, উত্তরের দিগন্তে কৃষ্ণনীল পর্বতশ্রেণীর আবছা অবয়ব ।

বিট অফিসে যাত্রাপথের হদিশ জেনে নিয়ে এবার আমরা চললাম জয়ন্তীর পথে । এখন জঙ্গল আরও ঘন । শতাব্দী-প্রাচীন মহীরুহের জটলা আর নিচে ঝোপঝাড়ের ভিড়ে

জঙ্গলের ভেতর বেশি দূর দৃষ্টি চলে না । রাস্তাও আর মসৃণ নয় । মাঝে মাঝেই পাথর বিছানো কজওয়েের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনার স্রোত । জয়ন্তীর কিছুটা আগেই পথে পড়ল বিশালাকার এক ওয়াচটাওয়ার । '২৩ মাইল' নামের সেই ওয়াচটাওয়ারের আগাগোড়াই অরণ্যের রঙে চিত্রিত । দোতলা টাওয়ারের একতলায় বনরক্ষীদের সাময়িক বসবাসের বন্দোবস্ত । ওপরে বসার ব্যবস্থা । চারপাশে ঝিমঝিম করছে বক্সার জীববৈচিত্র্যে ভরপুর জঙ্গলমহল ।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র ও রাজ্যের দ্বিতীয় টাইগার রিজার্ভ বক্সা অরণ্যের আয়তন ৭৫৮.৮২ বর্গ কিলোমিটার । পাহাড় ও পাহাড়তলিতে বিছিয়ে থাকা এই নিবিড় অরণ্যে ৩৩টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও রয়েছে হাতি হরিণ চিতাবাঘ গোল্ডেন ক্যাট হিমালয়ান জায়ান্ট স্কুইরেলের মতো বিরল প্রাণীকুল এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখি । আছে একশো ঊনপঞ্চাশ প্রজাতির বৃক্ষ, প্রায় সওয়া দুশো প্রজাতির লতাগুল্ম, শ-খানেক প্রজাতির ঘাস, আট রকমের বেত, ছয় রকমের বাঁশ ও একশো বত্রিশ প্রজাতির অর্কিড । তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিকে আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি পুষ্পিত হতে, প্রাচীন বৃক্ষের মস আচ্ছাদিত কাণ্ড থেকে ঝুলে থাকতে ।

২৩ মাইল ওয়াচটাওয়ার পিছনে ফেলে জয়ন্তী ও বক্সা মোড় হয়ে গাড়ি যখন সান্ত্রাবাড়িতে পৌঁছে যাত্রায় খান্তি দিল সূর্যদেব তার বেশ কিছুক্ষণ আগেই অস্তাচলে গিয়েছেন । আসন্ন সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে পাহাড় অরণ্য আরও রহস্যময় লাগছে । বনদপ্তরের অফিসকাছারি আর গোটা বিশেক কাঠের কুঁড়ে নিয়ে সান্ত্রাবাড়ির পরিসর বেশ ছোট্ট । বনদপ্তরের কাজকর্ম আর অল্পস্বল্প চাষবাস করেই স্থানীয় ডুকপা ভুটিয়া ও রাজবংশীরা জীবিকা নির্বাহ করেন । তবে এই শান্ত কোলাহলহীন বনবস্তিটিরই চরিত্র একেবারে বদলে যায় কমলালেবুর মরসুমে । তখন সংলগ্ন ভুটানের বিভিন্ন বাগান থেকে টন টন কমলালেবু এনে জমা করা হয় সান্ত্রাবাড়ির বস্তিতে । অরণ্যের সীমান্তেই বসে যায় অস্থায়ী আড়ৎ, হাটবাজার । ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যাপারী আর কমলা বেচতে নামা পাহাড়িয়াদের দরদামে সরগরম হয়ে ওঠে নিঝুম জনপদটি ।

ছোট্ট বিট অফিসের ঠিক পিছন থেকেই বক্সা পাহাড়ের উত্থান শুরু । ওই পাহাড়ের গা বেয়েই উঠে গিয়েছে আমাদের গন্তব্য বক্সাদুয়ারের পাকদণ্ডী । পাহাড়ে ইতিমধ্যেই অন্ধকার ছেয়েছে । পথ অরণ্যসঙ্কুল, অচেনাও । তাই বিট অফিসারই উদ্যোগ নিয়ে দুজন স্থানীয় তরুণকে আমাদের সঙ্গে দিলেন । রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি তারা পিঠে বাঁধা বেতের ডোকোয় আমাদের মালপত্রও ভরে ফেলল ।

শ-পাঁচেক ফুট উচ্চতার সান্ত্রাবাড়ি থেকে আড়াই হাজার ফুট উচ্চতার বক্সাদুয়ারের দূরত্ব চার কিলোমিটার । পথ আগাগোড়াই চড়াই । কোথাও কোথাও সেই চড়াইয়ের মাত্রা বেশ দুরূহ । পাহাড় বেয়ে নেমে আসা একের পর এক লাগামহীন ঝোরা রাস্তা ভেঙেচুড়ে বক্সা-যাত্রা আরও শক্ত করে তুলছিল । তবে, ইতিমধ্যে পুবের আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ উদ্ভাসিত হয়েছে । মিশ্র পার্বত্য অরণ্যের চন্দ্রাতপের ফাঁকফোকর বেয়ে চুঁইয়ে নামছে চন্দ্রালোকের রুপোলি স্রোত । বাতাস মুখর হয়ে রয়েছে বিভিন্ন রাতচরা পাখির ডাক আর ঝিঁঝির নিরবচ্ছিন্ন ঐকতানে ।

গায়ে জ্যোৎস্না মেখে পাখির ডাকে কান ভরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সদরবাজার গ্রামে পৌঁছলাম । পাহাড়ের কাঁধে স্লেটের চাল আর পাথরের দেওয়াল গাঁথা দশ-বারো ঘরের ছোট্ট গ্রাম । সন্ধ্যা সাতটা নাগাদই সেখানে ঘুম নেমেছে । গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই সামনে উদ্ভাসিত হল ইতিহাসগন্ধী বক্সা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ । তিনদিক ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়শ্রেণীতে ঘেরা এক চিলতে সমতলের ওপর ছড়িয়ে থাকা দুর্গের কঙ্কালটিকে সেই চন্দ্রালোকিত শরৎ-সন্ধ্যায় বড় মায়াময় দেখাচ্ছিল ।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্বে ভুটান ও আসামের সীমান্তে সিনচু লা পাহাড় । সেই পাহাড়ের দক্ষিণে বক্সা এলাকা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভুটানরাজদেরই দখলে ছিল । ১৮৬৪ সালের ৭ ডিসেম্বর, দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী বক্সা দুর্গের দখল নেয় । দুর্গ বলতে তখন ছিল গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা এক চৌহদ্দি ও একটি সেকেলে চিনা কামান । ভুটানিরা সে সবই ফেলে পুনাখা রোড দিয়ে পালিয়েছিল । পরের বছর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভুটানের 'সিনচু লা চুক্তি' হওয়ার পরে পার্বত্য এলাকা আগলাতে বক্সাদুয়ারে স্থায়ী সেনানিবাস গড়ে তোলেন ইংরেজরা । দুর্গ ঘিরে থাকা তিনদিকের পাহাড়ে বসানো হয় নর্থ-ইস্ট পিকেট, ম্যাগডালা পিকেট ও কনিকাল হিল পিকেট নামের তিনটি সেনাচৌকি । বাহিনীর প্রয়োজনে ব্যারাক ছাড়াও গড়ে তোলা হয় অফিসারদের পরিদর্শন বাংলো 'লাল বাংলা', ডাকঘর, স্কুল ইত্যাদি । দুর্গ সীমান্তের বাইরে বসে সদরবাজার । দুর্গের সামনে দিয়ে প্রবাহিত বক্সা ঝোরার দুটি প্রবাহই তখন জলের প্রয়োজন মেটাত । সেই জলধারা একইভাবে বইছে, বাকি সবটাই স্মৃতি ।

১৯৩০ সালে দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার জেরে বিপ্লবীদের কারারুদ্ধ রাখার জন্য সেনানিবাসটি সংস্কার করে ডিটেনশন ক্যাম্প খোলা হয় । সেই সময় অনুশীলন সমিতির ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যুগান্তর দলের সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের হেমচন্দ্র ঘোষ সহ অনেকেরই ঠিকানা হয়েছিল বক্সার বন্দীনিবাস । স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জেরে ফের বক্সায় আটক

হয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরভেজ শাহিদি এবং আরও অনেকে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেনানিবাসটি ব্যবহৃত হয়েছিল চিনের তিব্বত দখলের জেরে দেশ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের শিবির হিসাবে। এরপর থেকেই অরক্ষিত সেনানিবাসটির টিনের চাল, অন্যান্য আসবাবপত্র, জলের পাইপ ইত্যাদি লুটপাট হয়ে যায় ১৯৭৭ সালে। ১৯৮১ সালের ১১ মে বক্সা দুর্গের ধ্বংসাবশেষকে ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের মর্যাদা দেন সরকার।

রোদ ঝকঝকে সকালে ঘুম ভেঙে বক্সার অরণ্যময় রূপ আবার নতুন করে মনকে বিবশ করল। আমরা রয়েছি বনবিভাগের ডর্মিটরিতে। আদতে এটা ছিল বক্সা জেলের ডেপুটি জেলারের আবাস। আমাদের ডাইনে পাহাড়ের ঢালে কাঁটাতারে ঘেরা বিশাল চত্বরে বক্সার বনবাংলো। অবিকল গরুমারা চাপড়ামারির বনবিশ্রামাগারের আদলে তৈরি কাঠের বারান্দায় ঘেরা, দোতলা। ঢালু টিনের চাল ফুঁড়ে উঁকি দিচ্ছে সিটিং রুমের ফায়ারপ্লেসের চিমনি। ডর্মিটরিটি সাদামাটা, বাহুল্যবর্জিত। তবে পরিবেশ ও প্রতিবেশের গুণে বাংলোর চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে।

সাহেবি আমলের মোটা দেওয়াল, অ্যাসবেস্টসের চালের একতলা ডর্মিটরির সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া এক টুকরো সমতলভূমি। কিছুটা নিচে বক্সা ঝোরার জলতরঙ্গ। পিছনে অরণ্যের ঠাসবুনোট। বাঁয়ে কিছুটা দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গের পাথুরে অবশেষ। তার পায়ের কাছেই বেশ বড়সড় একটি মাঠ। চতুর্দিকে পাহাড়ের দেওয়াল তোলা ডিম্বাকৃতি মাঠটি প্রথম দর্শনেই কোনও প্রাচীন অ্যাম্পিথিয়েটারকে মনে পড়িয়ে দেয়। মাঠ পেরিয়ে দুর্গের মাথা ছাড়িয়ে দক্ষিণে দৃষ্টিগোচর হয় ডুয়ার্সের দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। কালচে সবুজ অরণ্যের মাঝে অজস্র নদীরেখার গেরুয়া আঁকিবুঁকি।

মাঠটি থেকেই দুর্গের সিঁড়ি উঠেছে। সিঁড়ির পাশেই ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য স্মারকস্তম্ভ। তার ওপরে খোদিত বক্সায় কারারুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশে ১৯৩৯ সালে কবিগুরুর লেখা ‘প্রত্যাভিনন্দন’ কবিতাটি। দুর্গের চত্বরে পা ফেলতেই অতীতের মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চে গা শিরশিরিয়ে উঠল। আয়তক্ষেত্রাকার সমতলের ওপর ছাদহীন সার-সার ঘর দাঁড়িয়ে। নীল নির্মেঘ আকাশ আর সবুজ অরণ্যের পটভূমিকায় যেন একদল গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। নোনা ধরে, বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে অধিকাংশ ঘরের দেওয়ালও আর অক্ষত নেই। শুধু আট নম্বর সেলটি এখনও প্রায় অবিকৃত। সেই সেলের ফায়ারপ্লেসে শেষ কবে আগুন জ্বলেছিল কে জানে!

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০০

সিন্ধু নদের ধারে

রতনলাল বিশ্বাস

জাঁসকার উপত্যকার সদর পদুম থেকে শুরু হবে আমাদের এই পর্বের পদযাত্রা অভিযান। এখান থেকে লে যাব। পদুম থেকে হাঁটাপথে লে যাবার প্রচলিত পথ হল লামায়ুরু হয়ে। লামায়ুরু পর্যন্ত হাঁটাপথ। তারপর লে যেতে হয় গাড়ি চেপে। এপথে বহু বিদেশি অভিযাত্রীদের যাতায়াত আছে। এছাড়াও পদুম থেকে সরাসরি পায়ে হেঁটে লে যাবার আরও একটি পথ আছে। যে পথে বছরে দু-তিনটির বেশি অভিযান সংগঠিত হয় না। আঞ্চলিক লোকজনের চলাফেরাও কদাচিৎ। দুটি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে পৌঁছতে হবে মারখা উপত্যকায়। তারপর মারখা থেকে প্রচলিত পথে লে পৌঁছে যাওয়া। জাংলা থেকে মারখা পর্যন্ত কোথাও কোনও বসতি নেই। তবে এপথটি মোটেই দুর্গম নয়, নদী পারাপারই হল দুর্গমতার কারণ। হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে ১১৮ বার খরস্রোতা নদীনালা পেরোতে হবে। লাফিয়ে পেরোতে হবে আরও বহু নালা। কোথাও পুল নেই। কোথাও নদী পেরোতে হবে এক কোমর জল ভেঙে। বিশেষ করে খুরনা নদীর গভীরতা ও খরস্রোত ফিরিয়ে দেয় বহু অভিযাত্রীকে। গিরিখাত গভীরে প্রবাহিত নদীনালা ধরেই চলার পথ। আকাশচুম্বি রুক্ষ খাড়া-পাহাড়ের গভীরে এ এক বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর পদযাত্রা। এ পথের বিবরণ পেয়েছি সামান্য কিছু লেখায়। এক অন্য স্বাদের ট্রেকিং করার জন্য এই টুকরো টুকরো বিবরণই আমাকে উৎসাহিত করেছিল। এককথায় বলা যায়, এই অভিযানটি হল গভীর গিরিখাতের মাঝে জলে জলে পথ চলা।

আমরা পদুমে পৌঁছেছি লাহুলের মায়ার উপত্যকা থেকে। উদয়পুর থেকে গ্রেট হিমালয় বিভাজিকা গিরিশিরার ওপর অবস্থিত কাংলা পেরিয়ে ৯ দিনের হাঁটাপথে এখানে এসেছি। মানালি থেকে লে ও কারগিল হয়ে বাসে পদুম আসা যায়। আবার শ্রীনগর থেকেও কারগিল হয়ে এখানে আসা যায়। পদুম থেকে মালপত্র বইবার জন্য ঘোড়া চাই। আর চাই পথ দেখাবার জন্য অভিজ্ঞ ঘোড়াওয়ালা। পদুমে ঘোড়া-ওয়ালাদের আড্ডায় পৌঁছে যাই। কারগিল সহ কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতার জন্য পদুমে খুবই কম পর্যটক এসেছে। অনেক ঘোড়াওয়ালাই সঙ্গী হতে রাজি। কিন্তু ওই পথে লে যেতে রাজি নয়। সকলের ভয় হল নদীর জল। কেউ বলে বড় নদীতে জলের গভীরতা কোমর পর্যন্ত।

আবার কেউ জানাল কোমর নয়, নদীর গভীরতা, এক বুক । শোনাল কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা । ঘোড়া-ওয়ালাদের খোঁজ করতে করতে এগিয়ে চলি মসজিদের দিকে । পথে দেখা হল লামজুমের সঙ্গে । ওর বাড়ি পিদমো গ্রামে । ঘোড়া নিয়ে ফিরে চলেছে গ্রামের পথে । বহু বছর আগে ও একবার এপথে গিয়েছিল । যাই হোক পথ চিনতে ওর কোনও অসুবিধা হবে না । সকলে জলের ভয় দেখালেও ও রাজি হয়ে যায় । দুটো শর্ত রাখল । প্রথমত, এক কোমরের বেশি জল হলে ফিরে আসবে । দ্বিতীয়ত, এখন ঘোড়ার ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ২০০ টাকা হলেও এই অপ্রচলিত ও বিপজ্জনক পথে ওকে দিতে হবে ৩০০ টাকা করে । আমরা এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম । ওরা যাবে দুজন । লামজুম তাসি ও আনচু লামা । ওদের তাঁবু, পথের খাবার ও অন্যান্য মালপত্র বইবার জন্য ওরা সঙ্গে নেবে আরও একটি ঘোড়া । পদুম থেকে প্রয়োজনীয় মালপত্র কেনা হল । প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই এখানে পাওয়া যায় । যদিও জিনিসপত্রের দাম বড্ড বেশি ।

পরদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় রওনা হলাম । চারদিকটা মেঘে ঢাকা । পাহাড়ের রঙ বড্ড ধূসর । পদুম জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট বসতি । তোনডে হয়ে অর্থাৎ জাঁসকার নদীর জনতট ধরে জাংলা পর্যন্ত গাড়িপথ আছে । কারসা হয়েও গাড়ি চলে যায় রিনামা পর্যন্ত । আমরা যাব হাঁটাপথে । আনচুর বাড়ি পিসু গ্রামে । তাই তোনডে হয়ে জাংলা নয় । ওরা পিসু হয়ে জাংলা যাবে । এপথে দূরত্ব কম । পুতুল পুতুল চেহারা নিয়ে শিশুরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে । লজেন্স দিতেই খুব খুশি । সমতল পথ ধরে চলে এলাম জাঁসকার বা স্টুড নদীর ধারে । আজ ১৫ আগস্ট, ২০০০ । গোলমালের আশঙ্কায় গোটা পদুম জুড়ে রয়েছে চরম সতর্কতা । সদাসর্তক জওয়ানরা স্টেনগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে । নদীর বামতটে একটু দূরে পাহাড়ের ঢালে সাদা রঙের বহু ঘরবাড়ি নিয়ে প্রসিদ্ধ কারসা গুম্ভা । জাঁসকায় উপত্যকায় গেলুক পা গোষ্ঠীর বৌদ্ধদের এটাই সবচেয়ে বড় গুম্ভা । করেসাকে বাঁদিকে রেখে সমতল ধূসর পথে এগিয়ে চলি । পথে ওঠানামা খুবই কম । ধু-ধু প্রান্তর । এপথেই লামায়ুরু যাওয়া যায় । পথে দেখা হল কয়েকজন বিদেশি পদযাত্রীর সঙ্গে । নেপালে এমনই কোনও পদযাত্রী দলের সঙ্গে দেখা হলে সকলেই বলে ওঠে ‘নমস্তে’ । এখানে সেটা পালটে যায় । একটু মুচকি হেসে বলে ‘জুলে’ । দুপুরে পৌঁছলাম রিনামা গ্রামে । ঘরবাড়ি ও খেত নদীর ধারে । পথের বামপাশের পাহাড়টি অসাধারণ । ভাঁজে ভাঁজে পাথর সাজিয়ে খাড়া পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে । একই ধরনের পথ ধরে নদীকে ডানপাশে রেখে এগিয়ে চলি । জাঁসকার নদী বয়ে চলেছে উত্তরদিকে । এ নদী আরও উত্তরে এক গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে চুলুং হয়ে নিমোর কাছে মিলিত হয়েছে সিন্ধুনদের সঙ্গে । জাঁসকার উপত্যকায় সংগৃহীত সব জলই এ নদী পৌঁছে দেয় সিন্ধু নদে । উঠে এলাম এক ধূসর সমতল প্রান্তরে । দূরে নদীর ওপারে দেখা যায়

তোনডে ও জাংলা জনপদ। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরপর চোর্তেন রয়েছে। পদুম থেকে গাড়িপথে তোনডে হয়ে জাংলার দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। আর এপথে পদুম থেকে ২৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পিসু পৌঁছুতেই সন্ধ্যা নেমে এল। আনচুর বাড়িতেই ঢুকে পড়লাম। দোতলা বাড়ি। সব ঘরই দোতলায়। মাথা নিচু করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম আধো অন্ধকারের মাঝে, খাঁজকাটা কাঠের সাহায্যে দোতলায় উঠে পড়লাম। আনচুর বাবা পিসু গুম্ভার প্রধান লামা। নিয়ামা পা গোষ্ঠীর বৌদ্ধদের এই গুম্ভাটি চোমো অর্থাৎ মেয়ে সন্ন্যাসীদের জন্য। দেশের নানা প্রান্তে যাবার সুযোগ হয়েছে ওর বাবার। চিন যখন লাসার পোতালা গুম্ভা ও প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল তখন দলাই লামাকে রক্ষা করার জন্য উনি লড়াই করেছিলেন। উনুনের পাশেই বসে পড়লাম সকলে। ওদের রাতের খাবার হল নমকিন চা, সাম্পা ছাতু ও আটার গোলা সেদ্ধ অর্থাৎ থুপ্পা। একসঙ্গে পান করে পরপর কয়েক কাপ চা।

পরদিন বেরনোর তাড়া নেই। নদীর ওপারে জাংলা গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়। এক রুক্ষ পাহাড়ের কোলে পিসু গ্রাম। গ্রামে অল্প কয়েকটি পরিবারের বসবাস। নদীর ধারে অনেকটা এলাকা জুড়ে গ্রামের খেত। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা নালায় জল খুবই কম। তাই চাষবাসও ভালো হচ্ছে না। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের চোর্তেনটিকে ডানদিকে রেখে নেমে এলাম খেতের মাঝে। হাল্কা সোনালি সবুজ রঙের খেত। জাংলা গ্রামটি সরাসরি পিসুর উলটো দিকে অর্থাৎ নদীর ওপারে। কিন্তু নদীর ওপরে ব্রিজে অনেকটা ঘুরপথে পৌঁছতে হবে। জাঁসকার নদীর ওপর পুল পেরিয়ে উঠে এলাম মোটর পথের ওপর। চওড়া রাস্তা ধরে উত্তরদিকে এগিয়ে চলি। নদীতটে সুন্দর জলাভূমি। ওখানকার ঘন ঘাসের মাঝে চরছে গাধা বা খোতের দল। ডানদিক থেকে নেমে এসেছে জুমলাং নালা। নালাটি পেরিয়ে কয়েক পা উঠতেই দেখা গেল জাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। নদী থেকে অনেকটা সরে এসেছি। পরপর কয়েকটি চোর্তেন পেরিয়ে উঠে এলাম জাংলা গ্রামে (৪৪৬১ মিটার)। ডানদিকে একটা পাহাড়ের ওপরে রয়েছে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। গ্রামের মাঝে আছে বড় বড় উইলো ও পপলার গাছ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ৭০টি ঘরবাড়ি। লোকজন খুবই কম। অনেকেই গিয়েছে খেতে কাজ করতে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে পি ডাব্লু ডি বিশ্রামগৃহ। তারই পাশে ছোট্ট এক গুম্ভায় বসবাস করছেন কয়েকজন লামা। জাংলার উত্তর প্রান্তে রয়েছে আরও একটি মেয়েদের গুম্ভা। আমরা এগিয়ে চলি গ্রামের মধ্য দিয়ে। গ্রামের মাঝখানে রাজবাড়ি। খুবই সাদামাটা একটা বড় বাড়ি। বাড়িতে এখনও রাজবংশের লোকজনেরা বসবাস করছেন। বাড়ির সামনে প্রাচীরে ঘেরা খানিকটা ফাঁকা জায়গা। এখানে পূর্বে বিচারসভা বসত। আমরা এখানেই তাঁবু টাঙালাম। জাংলাকে ভালো করে দেখা ও জানার কৌতূহল বহুদিনের। রাজবাড়ি শুনসান। বিকেলে উঠে

এলাম উত্তরদিকের গুম্ভার। গুম্ভায় ২০ জন চোমো বা মেয়ে সন্ন্যাসীর বসবাস। প্রায় সকলেই জাংলা বা কাছাকাছি গ্রামের মেয়ে। ৮ বছরের বালিকা থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধাও রয়েছেন। দুজন চোমো আমাদের নিয়ে এল গুম্ভার দোতলার একটা ঘরে। বসতে দিল মোটা কার্পেটের ওপরে। সামনে নিচু জলচৌকি। কাপে কাপে নমকিন চা এল। আদর আপ্যায়নে কোনও ঘাটতি নেই। ঘুরে ঘুরে গুম্ভাটি দেখাল। পুরনো অর্থাৎ মূল গুম্ভাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু নতুন বাড়িটি কাচে ঘেরা। সবার মাঝে অবলোকেশ্বরের মূর্তি। এই ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দিরটিকে ঘিরে চোমোদের থাকার জন্য কয়েকটি ঘর রয়েছে। গুম্ভার ওপর থেকে জাংলা গ্রামটিকে দারুণ লাগল। দেখা যায় জাঁসকার নদীর প্রবাহ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। গেলুক পা গোষ্ঠীর গুম্ভাবাসিনীদের মাসে একবার করে ন্যাড়া হতে হয়। সেদিন চলেছে সেই চুল কাটার পালা। একে অপরের চুল কেটে দিচ্ছে। গ্রামে বাড়ির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। তবে থাকা খাওয়া এখানেই। বাবা-মা বৃদ্ধ হলে এবং যদি অন্যান্য সন্তানরা কাছে না থাকে তখন এরাই বাবা-মার পাশে দাঁড়ায়। জাংলা ও পিসু ছাড়াও জাঁসকার উপত্যকায় চোমোদের জন্য আরও কয়েকটি গুম্ভা আছে। ফিরে চলি গ্রামের পথে। সঙ্গে চলেছে দুটি চোমো মেয়ে।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। ততক্ষণে রানি খামারবাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। রানি পদ্মা পরমাসুন্দরী। সুন্দর বেশভূষা। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে নারাজ। রাজবাড়ির লোকজনেরা আমাদের দূর থেকে দেখে। ছাদের ওপরে পায়চারি করছেন রাজার বোন। সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল স্কুলশিক্ষক চিলিং পানচেকে। জাংলা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম ওর সঙ্গে গল্প করে। জাংলা একসময় আলাদা স্বাধীন দেশ ছিল। এর অধীনে ছিল আরও চারটি গ্রাম পিসু, পিদমো, ছাজার ও হানামুর। এই দেশটি কখনও স্বতন্ত্র, কখনও পদুমের সঙ্গে, আবার কখনও ছিল লাদাখের অধীনে। এই ছোট্ট স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। বালতিস্থানের আক্রমণ, তিব্বতীদের আক্রমণ, মগ ও মোগলদের অনুপ্রবেশ, ডোডরাদের অধীনে যাওয়া ও সর্বোপরি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া লাদাখের এই শত শত বছরের পালাবদলের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাংলার ইতিহাসও।

গ্রামের দক্ষিণদিকে টিলা পাহাড়টির শীর্ষে ছিল মূল রাজপ্রাসাদ। তারই নিচে ছিল পরপর দুটি প্রাচীর। প্রাচীরের দরজা বন্ধ করলে বাইরের সঙ্গে এদের কোনও যোগাযোগ থাকত না। দুশো বছর আগে জলের অভাবে ওই পাহাড় থেকে সকলে নেমে এসেছিল পাহাড়ের ঢালে। বর্তমানের রাজবাড়িটির বয়স প্রায় দুশো বছর। প্রজারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করল। শুরু হল চাষবাস। রাজার কোনও সৈন্য ছিল না তবুও প্রজারা রাজাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করত। টিলা পাহাড়টির ওপরে পুরনো রাজপ্রাসাদটির কিছুটা অংশ

বর্তমান । ওখানে পূজার্চনা করার জন্য বৌদ্ধ পুরোহিত থাকতেন । এখনও ওখানে প্রতিদিন পূজার্চনা হয় । তবে কেউই থাকে না ।

এখনকার অবস্থা অন্যরকম । গ্রামে তিনবর্ণের লোকজনের বসবাস । রাজবংশ উচ্চবর্ণ, লোহার নিম্নবর্ণ আর বাকিরা সকলে মধ্যবর্ণ আমজনতা । রাজপরিবারের সকলকে এখনও গ্রামের সকলে শ্রদ্ধা করে । এখনও সমাজের উচ্চ আসনে বসায় । কিন্তু রাজবংশের হাতে এখন কোনও ক্ষমতা নেই । গ্রামপ্রধান অর্থাৎ নাম্বারদারই গ্রামের কর্তা । এখনও রাজা ও রানি আছেন । বর্তমান রাজা নিমা নরবু উচ্চশিক্ষিত ও লে শহরে কর্মরত সরকারি অফিসার । ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে লে শহরে । রানি পদ্মা ছোট মেয়েকে নিয়ে এখানেই রয়েছেন । গ্রামের খেতখামার দেখাশোনা করেন । ফসল কাটার মরসুম । তাই প্রতিদিনই যেতে হয় খামার-বাড়িতে । রাজবাড়ির দুটি ভাগ । এক অংশে থাকেন রাজা নরবু আরেক অংশে বসবাস করছেন রাজার বোন । বোনের বিয়ে হয়েছে পদুমের রাজা রিং জাং দাওয়ার সঙ্গে । বোন থাকে এখানে । আর পদুম রাজা থাকেন পদুমে । এরা গেলুক পা কিন্তু পদুম রাজা ড্রুগ পার গোষ্ঠীর ।

এখন জাংলার সব গ্রামই জাঁসকার মহকুমা ও কারগিল জেলার অন্তর্গত । এখানে সরকারি স্কুল আছে । সরকারি স্কুলে লেখাপড়ার মাধ্যম উর্দু । ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান বিষয়ও পড়তে হয় উর্দুতে । পাঁচ হাজার বর্গ কিলোমিটার পরিমিত জাঁসকার উপত্যকার সদর পদুম ছাড়া জাঁসকার উপত্যকার অবশিষ্ট ২৪টি গ্রামের প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । বৌদ্ধরা চাইছে কারগিল জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাদাখ হিল কাউন্সিলের অধীনে যেতে । এরা এদের শিক্ষার মাধ্যম চায় হিন্দি । একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে পদুম থেকে জাংলা, দুমদাং ও চুলুং হয়ে লে পর্যন্ত । এই পথটি জাঁসকার নদীর ধারে ধারে পৌঁছে যাবে নিমোর কাছে । পদুম থেকে দুমদাং এবং লে থেকে চুলুং পর্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু দুমদাং থেকে চুলুং জাঁসকারের অন্তর্গত এই ৬০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ এখনও শুরু হয়নি । লে থেকে চুলুং পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে । কিন্তু পদুম থেকে দুমদাং পর্যন্ত বাস চলে না । প্রাইভেট গাড়ি করে ওপথে যাওয়া যায় । এ রাস্তাটি সম্পূর্ণ হলে মাত্র দেড়শো কিলোমিটার পথে কোনও গিরিবর্ত্ম অতিক্রম না করেই সহজে পদুম থেকে লে একদিনে পৌঁছনো যাবে । সারা বছরই এপথে গাড়ি চলাচল করতে পারবে । এখন পদুম থেকে লে যেতে হয় কারগিল হয়ে ৪৭৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে । অতিক্রম করতে হয় পেনজি লা, নামিক লা ও কেটু লা গিরিবর্ত্ম । শীতকালে এপথে গাড়ি চলাচল করে না । তাই জাঁসকারের স্বার্থে এই সবকটি পথ তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হোক এখানকার অধিবাসীদের এটাই দাবি । লে জেলা তার অংশ সম্পূর্ণ করলেও কারগিল জেলা তার অংশে কাজ করছে খুবই ঢিমেতালে ।

ভোর হতেই রাজবাড়ির উঠোনে রোদ পোয়াতে এসেছে শিশুর দল । ওদের লজেন্স চাই । রাজবাড়ির ঝুল বারান্দায় শিশু রাজকন্যা দাঁড়িয়ে আছে । ওর নিচে নামা বারণ । ওখান থেকে হাত পাতে লজেন্সের জন্য । রানি ভোরে চলে গেছেন খামারবাড়িতে । শিশুদেরকে তুষ্ট করে ১৭ আগস্ট জাংলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম । গ্রামের ঘরবাড়ি ও গুম্ভা ছাড়িয়ে উঠে এলাম রাজপ্রাসাদের কাছে । ডানদিকে পড়ে রইল অক্ষত দেবালয় নিয়ে ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ । উঠে এলাম জুমলাং চু-র ডানপাশের পাহাড়ের ঢালে । নালাটি নেমে এসেছে এক গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে । প্রথমদিনই নদী পেরোতে হবে প্রায় ২৫ বার । নেমে এলাম নদীর ধারে । ঢুকে পড়েছি গিরিখাতের মাঝে । দুপাশে রুক্ষ খাড়া পাহাড় । কোথাও পাহাড় ঝুঁকে পড়েছে নদীর ওপরে । নদী নেমে আসে আঁকাবাঁকা পথে । নালাটি কখনও স্পর্শ করে ডানদিকের খাড়া পাহাড়কে । আবার পরক্ষণেই ধাক্কা খায় বাঁদিকের পাহাড়ে । শুরু হল কাকচক্ষু ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে বারবার নদী পেরিয়ে পথ চলা । গিরিখাতের মাঝে নদীতটে অল্প অল্প ঝোপঝাড় । এই সব গাছের সরু ডাল সংগ্রহ করছিল দুটি ছেলে । বনমধ্যে হঠাৎ-ই দেখা হয়ে যায় । লাঠির মতো এই ডালগুলি প্রচণ্ড শক্ত । জাঁসকার উপত্যকায় প্রায় সব বাড়ির সমতল ছাদ তৈরি হয় মাটি পাথর দিয়ে । সেই পুরু মাটি পাথরের নিচে এগুলিকে গায়ে গায়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় বড় বড় কিছু কড়ি-বরগার ওপরে । চলার পথ কখনও পাহাড়ের ঢালে সংকীর্ণ পথ ধরে । কখনও নদীতটে নুড়ির মাঝে আবার কখনও নদীর জলে জলে । ক্রমে উপত্যকাটি প্রসারিত হয় । রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়ে ঘেরা প্রসারিত উপত্যকার নদীতট গাছপালায় পরিপূর্ণ । দুটি নালার মিলন হয়েছে এখানে । জায়গাটির নাম সামদো । মূল নালাটি এসেছে ডানদিক থেকে । আমাদের পথ বাঁদিকে । দেখা হল তিনজন বিদেশি অভিযাত্রীর সঙ্গে । ওরা এসেছে জার্মান থেকে । ওরা ফিরে চলেছে জাংলা অভিমুখে । ওদের এপথে লে যাবার পরিকল্পনা ছিল । বহু চেষ্টা করেও খুরনা নদীর কাছে পৌঁছতে পারেনি । তিলুত সামদোর কাছাকাছি পৌঁছে জুমলিং চু পেরোতে পারেনি । প্রবল খরস্রোত ও এক কোমর জলের গভীরতা ওদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে । ওদের এক কোমরের অর্থ আমারতো আরও বেশি । কয়েকদিন আগে একই কারণে ফিরে এসেছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটি দল । আমরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম । তবে কি আমাদেরও খুরনা চু ফিরিয়ে দেবে । লামজুম ভরসা দেয় । ও জানাল, আগামী দুদিন যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবেই নদী অতিক্রম সম্ভব হবে । পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ভালো আবহাওয়াই আমাদের কাম্য থাকে । আর এখানে আমাদের কাম্য হবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ । এই মরু পাহাড়ের দেশে রোদের তাপমাত্রা বড্ড বেশি । রোদের তাপেই বরফ গলে । বাড়ে নদীর জল । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বরফ কম গলবে আর নদীতে জলও থাকবে কম । জার্মান দলটিকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চলি । মনে সবসময় একটা সংশয় রয়েছে । জানি না যে শেষ পর্যন্ত

এপথে পৌঁছতে পারব কিনা। ছোট্ট এক নালা ধরে ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাই লারসা। পরদিন অতিক্রম করতে হবে দারছার লা। এখানে একটা ঘর আছে। দারছার পর্যন্ত পরবর্তী পথে কোথাও জল নেই। ঘোড়ার জন্য ঘাসও পাওয়া যাবে না। তাই এখানেই সেদিনের চলার বিরতি। নালাটির দুপাশে ঘন গাছপালা। ১৫-২০ ফুট উঁচু গাছও এখানে দেখা যায়। এই অঞ্চলে আইবেক্স ও তুষারচিতা আছে। আইবেক্স দেখতে পেলেও তুষারচিতা দেখার সৌভাগ্য হল না।

পরদিন সাতসকালেই দারছার লার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। একটা শুকিয়ে যাওয়া নালা ধরে ওঠার পথ। পাথরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। উঠতে হবে অনেকটা উঁচুতে। ঝুরঝুরে পাথরে পরিপূর্ণ পাহাড়ের ঢাল ধরে উঠে এলাম খাড়া পাহাড়ের ঢালে। পাথরের দেওয়ালে ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঢালটি যথেষ্ট বিপজ্জনক। সংকীর্ণ পথে পা রাখতে হয় সন্তর্পণে। এভাবেই উঠে এলাম দারছার লার ওপরে (উচ্চতা ৫২০০ মিটার)। চোর্তেনের ওপর উড়ছে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো। প্রবল বেগে হাওয়া বইছে। যেন ঝড় উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেখা যায় একের পর এক গিরিশ্রেণী, এদের পিছনে একসারি তুষারাবৃত পর্বতমালা। পূর্বদিকে ডানদিকের পাহাড়ের মাথায় বরফ। ওখান থেকে একটা নালা নেমেছে। নালাটি ঢুকে পড়েছে রুক্ষ গিরিখাতের মধ্যে। উত্তরদিকে প্রবাহিত ওই নালাটি ধরেই আমাদের নেমে যেতে হবে। ট্রান্স হিমালয়ের মাঝে তিব্বতীয় মালভূমির ওপর এমনই কোনও গিরিবর্ত্মের ওপর দাঁড়িয়ে সর্বদাই মনে হয় যেন পৃথিবীর ছাদে পৌঁছে গেছি। ঢাল বেয়ে সরাসরি নেমে চলি সেই নালা অভিমুখে। মাঝে মাঝে একরাশ ঝুরো পাথর নিয়ে নেমে যেতে হয় অনেকটা নিচে। জনমানবহীন প্রান্তর। কোথাও কোনও গাছপালা নেই। জুমলিং চু নালাটি ধরে ক্রমে ঢুকে পড়লাম গিরিখাতের গভীরে। লাফিয়ে লাফিয়ে নালা পেরিয়ে পথ চলি। নদীতটে নুড়ির ওপর দিয়ে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই। স্বচ্ছ জলরাশি নিয়ে কুলকুল শব্দে নালাটি বয়ে চলেছে। জলের নিচে নানা রঙের নুড়ি পাথর। হঠাৎ-ই নালাটি লুকিয়ে পড়ল নুড়ির মাঝে। নানা আকৃতি নিয়ে আকাশচুম্বি রুক্ষ পাহাড় হেলে আছে নালার ওপরে। অন্তর্হিত নালাটি আবার বেরিয়ে পড়ল। এ বড় মজার ব্যাপার। এই আছে এই নেই। নালাটি বয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথে। ডানদিক থেকে নেমে এসেছে আরও দুটি জলধারা। জল বাড়ল মূল নালাটির। তখন পা ভিজিয়ে নদী পেরোতে হয় বারবার। একসময় নালাটির ধারে চলার মতো আর কোনও জায়গা নেই। বামদিকের পাহাড়ের ঢালে অস্পষ্ট পথরেখা দেখা যায়। খাড়া পাহাড়ের ঢালে ধসের মধ্য দিয়ে চার হাত-পায়ে চলতে হল। এপথে সারা বছরে অল্প কয়েকজন লোক চলাচল করে। আঞ্চলিক লোকজন এপথে লে যায় কদাচিৎ। ওরা যায় অক্টোবর

মাসে বা শীতকালে। অক্টোবর মাসে জল খুবই কম থাকে কিন্তু খুব ঠান্ডা। শীতকালই স্থানীয়দের কাছে আদর্শ সময়। নদীর জল তখন শক্ত বরফ। আর সেই বরফের ওপর দিয়ে স্থানীয়রা সহজে এপথে জাংলা থেকে তিনদিনে লে পৌঁছে যায়। তখন এখানকার তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের অনেক অনেক নিচে। ধারাবাহিক রুক্ষতার মাঝে হঠাৎ-ই দেখতে পাই কিছু বেগুনি রঙের ডেলকেনিয়াম ফুল। নেমে এলাম নদীতটের নুড়িপাথরের মাঝে। প্রায়শই পা ভিজিয়ে পথ চলা। তবুও ভালো লাগে। চুপচাকে মালপত্র ও ঘোড়া রেখে উঠে এসেছে লামজুম ও আনচু। ওরা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে। এখনও যেতে হবে অনেকটা পথ। ওদের সঙ্গে চলতে থাকি। ওদেরকে পেয়ে নির্জন গিরিখাতের মাঝে ভরসা পাই। সামনে নদীর দুধারে পথ আগলে দুটি খাড়া পাহাড়। পাথরের রং গেরুয়া। দুটি পাহাড়ের মাঝে ব্যবধান মাত্র ৫-৭ ফুট। ওপরের দিকে আরও কাছাকাছি। খাড়া দেওয়ালে পা রাখার জায়গা নেই। নালার ধারে চলার মতো জায়গা নেই। ভাবি এর মধ্য দিয়ে যাব কীভাবে। যেতে হবে জলে জলে। জলে নেমে পড়লাম। হিমশীতল জলের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নামতে থাকি। অসহনীয় ঠান্ডায় পা জমে যাবার উপক্রম। দুদিকে আকাশচুম্বি দেওয়াল। যেন একটা টানেলের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়েছি। আধো অন্ধকার টানেলের মধ্যে আমাদের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়। প্রায় ৫০ মিটার এভাবে চলার পর জল থেকে উঠে এলাম। আরও খানিকটা এগিয়ে উপত্যকাটি চওড়া। বদ্ধ গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম এক উন্মুক্ত প্রান্তে। বাঁদিক থেকে নেমেছে আরও একটি নালা। সঙ্গমস্থলের পাশে অনেকটা এলাকা জুড়ে ঘাসে ঢাকা ময়দান। এখানে মিলিত হয়েছে দুটি উপত্যকা। আমাদের দেখতে পেয়ে দলে দলে আইবেক্স দ্রুত উঠে যায় দূরে পাহাড়ের ঢালে। সেই সবুজ গালিচার ওপর আমাদের তাঁবু পড়ল। সামনে এক অদ্ভুত আকারের সুচালো পাহাড়। সন্ধ্যার পর হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। এমনই এক নির্জন প্রান্তে আকাশভরা তারার মাঝে আমরা কজন। জায়গাটির নাম চুপচাক।

চুপচাকের সকালটা বিকেলের মতোই সুন্দর। তীব্র ঠান্ডায় শরীরের আড়ষ্টতা কাটিয়ে বেরতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। ঢুকে পড়লাম গিরিখাতের মাঝে। দুপাশের পাহাড় ভেঙে ভেঙে পাথর জমেছে নদীর ধারে। আকাশচুম্বি পাহাড়গুলি দেখে মনে হয় এখনই ভেঙে ঘাড়ে পড়বে। বড় বড় পাথরের মধ্য দিয়ে জুমলিং নালা তার পথ করে বয়ে চলেছে প্রবল হর্ষে। সকালে নদীর জল অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অনেক বেশি ঠান্ডা। ট্রান্স হিমালয় এবং ইনার হিমালয়ের মাঝে রুক্ষ মরু পাহাড়ের দেশে বহু পথ পেরিয়েছি কিন্তু এমনটি কখনও পাইনি। পথের দুর্গমতা, গভীর গিরিখাত, নানা রঙের সুউচ্চ পাহাড়-এ যেন অন্য জগত। ক্রমে ডানদিকে বাঁক নিতেই আরও একটি খরস্রোতা নালা। দুয়ে মিলে বাড়ে জুমলিং নালার জল, বাড়ে নদীগহ্বরের প্রসারতা। ওপরে পর্বতগাত্র রুক্ষ কিন্তু খুবই

বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারই পদতলে নদীতটে প্রচুর গাছপালা জন্মেছে। যতই নেমে চলেছি ততই গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। পথ কোথাও স্পষ্ট আবার কোথাও অস্পষ্ট। কখনও সেই সহজ ও স্পষ্ট পথ ধরে যেতে যেতে পথ যায় হারিয়ে। তখনই নেমে আসি জলের পাশে। লামজুমরা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেছে। ভেজা বালিতে ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে পথ খুঁজি। বেলা বাড়তেই বেড়ে যায় নদীর জল। এখন আর একা একা নদী পেরনো যাচ্ছে না। পেরোতে হয় একসঙ্গে। বারবার নদী পেরনোর জন্য চলার গতিও কমে যায়। নদীর পাড়ে ঘন ঝোপজঙ্গল। গাছের ডালপালায় বারবার পিঠের ব্যাগ আটকে যায়। দ্রুত নামার চেষ্টা করেও চলার গতি বাড়ে না। লামজুম বলে দিয়েছিল যে ওরা অপেক্ষা করবে খুরনা নদীর ধারে। আজই খুরনা চু একবার পেরিয়ে পৌঁছতে হবে তিলুত সামদো। জল ও ক্যাম্প করার জায়গা সর্বত্রই পাওয়া যায় কিন্তু একমাত্র তিলুত সামদোতেই ঘোড়ার জন্য সামান্য ঘাস পাওয়া যাবে। দুপুর গড়িয়ে গেল। বাড়তে থাকে নদীর জল। বিকেলে কীভাবে খুরনা চু পার হব সেই দুশ্চিন্তাই বারবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

হাত ধরাধরি করে বারবার নদী পেরিয়ে নুড়ি পাথর ও ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি। সবে বিকেল তিনটে। দেখি আনচু ও লামজুম রয়েছে আমাদের অপেক্ষায়। লামজুম জানাল যে খুরনা নদীর পাশে পৌঁছতে আরও ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। বিকেলে খুরনা চু পেরনো সম্ভব হবে না। এখানে সামান্য ঘাস পাওয়া গেছে। ওরা এখানে থাকতে চায়। ওর মতে মত দিলাম। লামজুম খুবই বিচক্ষণ। নদীপাড়ে বনমধ্যে তাঁবু টাঙানো হল। এরই মধ্যে লামজুমের সঙ্গে আনচুর প্রচণ্ড তর্ক বেধেছে। আনচু লামা পরিবারের ছেলে। ও জীব হত্যাকে মেনে নিতে পারছে না। এ অঞ্চলে প্রচুর বনমুরগি বিচরণ করছে। লামজুমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও নিশানাও অব্যর্থ। এরই মধ্যে একটা বনমুরগি মেরেছে। আরও মারতে চাইছে। সন্ধ্যার সময় নালার জল পান করে ওরা দ্রুত পালাতে পারছে না। কিন্তু আনচু মারতে দেবে না। ওর যুক্তি হল 'এই বনের প্রাণীদের জীবনধারণের জন্য আমরা তো কিছুই করিনি তবে ওকে মারার অধিকার আমাদের কখনই জন্মায় না। আর ওরা তো আমাদের কোনও অপকার করছে না।' লামজুম মুরগি মারা থেকে বিরত হয়। বনের শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দীপঙ্কর ও শান্তি আলুর পরোটা বানাচ্ছে। এতদিন হাঁটার পরও দলে রান্না খাওয়ার পরিপাটিতে কোনও ভাটা পরেনি। সন্ধ্যার পর জুমলিং চু হল আরও খরস্রোতা। আমরা ঘুরে বেড়াই নদীর ধারে ধারে।

২০ আগস্ট খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। জলে পা রাখতেই তীব্র ঠান্ডায় পা কেটে যাবার উপক্রম। যথারীতি নদী পেরোতে হয় বারবার। নুড়ি ও ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলেছি। বাঁদিকে পাশাপাশি কয়েকটা গুহা রয়েছে। এ জায়গাটির নাম সাংকোংমা।

বাঁদিকে পরপর কয়েকটি আকাশচুম্বি পাহাড় । ওদের মাথায় এখনও ভোরের আলোর ছোঁয়া লাগেনি । রোদ পড়েছে ওদের পিছনে আর একটি পাহাড়ের শীর্ষে । দূর থেকে মনে হয় অন্ধকারের মাঝে একটা মশাল জ্বলছে । দাঁড়িয়ে পড়ল লামজুমরা । ডানপাশে খাড়া পাহাড়ের ঢালে একটা গুহা দেখতে পেলাম । ওটাই লিঙ্গম গুহা । লামজুম সেই খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওখানে উঠে পড়ল গিরগিটির মতো । আনচু পাড়ল না । গুহামধ্যে আছে প্রায় ৭ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ পাথর । দড়ির সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে ওখানে পৌঁছনো সম্ভব নয় । এ এক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । ওখানে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হল না । তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে খুরনা নদীর ধারে । বেলা বাড়লেই বেড়ে যাবে নদীর জল । দূর থেকে প্রণাম করে দ্রুত নামতে থাকি । ডানদিক থেকে নেমেছে আরও একটি নালা । হিমবাহ থেকে এই ধারাটি নেমেছে প্রচুর ঘোলাটে জল নিয়ে । এর দুপাশে পরপর অদ্ভুত আকারের খাড়া পাহাড় । দারছার লার পর জুমলিং চু আমাদের সঙ্গী ছিল । প্রাণচঞ্চলা নদী আমাদের পথ দেখিয়েছে । হিমবাহ থেকে নেমে আসা ঘোলা জলে রং পাল্টাল জুমলিংয়ের । নদী হল প্রচণ্ড খরস্রোতা । স্রোতের তোড়ে জলের সঙ্গে নেমে আসে ছোট ছোট পাথর । জুমলিং চু এখন ভয়ংকর । এখান থেকেই ফিরে গিয়েছে জার্মান অভিযাত্রী দলটি । ফিরে গিয়েছে সামরিক বাহিনীর দলটিও । পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণ করে জলে নেমে পড়লাম । দীপঙ্কর উচ্চস্বরে দেবদেবীর নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল । সেই সমবেত চিৎকারে নিস্তব্ধ পাহাড় জেগে উঠেছে । তীব্র খরস্রোতের মাঝে জলের গভীরতাও হাঁটু ছাড়িয়ে যায় । পার হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরি । আমরা নিশ্চয়ই খুরনা চুয়ের ধারে পৌঁছতে পারব । আমাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল । নুড়ি ও বেলাভূমির মধ্য দিয়ে চলতে থাকি । জুমলিং শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পড়েছে । পর পর আরও কয়েকবার এ নদী পেরোতে হল । এক সময় বেরিয়ে এলাম জুমলিং উপত্যকা থেকে । দুটো খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নেমেছে ঝরনা ধারায় । যেন একটা ফটক । জুমলিং চু নেমে গেছে বাঁদিকে । এ নদী মিলিত হয়েছে খুরনা চুয়ের সঙ্গে । ডানদিকে বয়ে চলেছে প্রশস্ত নদী খুরনা চু । এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদী এটাই । দূরে একটা উঁচু জায়গা থেকে চিৎকার করে উঠল আনচু ও লামজুম । ওরা নদীর ওপারে । মনের মধ্যে এক দারুণ উত্তেজনা । মালপত্র ও ঘোড়া রেখে ওরা নদীর জলে নেমে পড়ল । জলের স্রোতে নিজেদেরকে সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে । নদী পেরিয়ে ওরা এল আমাদের সাহায্য করতে । দুপাশে ওরা দুজন আর মাঝে আমরা পাঁচজন । সকলে সকলের হাত ধরলাম শক্ত করে । আগে পিছনে নয় । পাশাপাশি জলে নেমে পড়লাম । বহুদূর থেকে অসংখ্য ছোটবড় নদীনালাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এসেছে এই নদী । দীপঙ্করের জয়ধ্বনির সঙ্গে গলা মেলাই আমরা সকলে । জনমানবহীন নির্জনতার মাঝে সমবেত জয়ধ্বনির রোল উঠল । জল ঠান্ডা হলেও হিমশীতল নয় । তাই অনেকক্ষণ

জলে থাকলেও অসুবিধা হল না। তাছাড়া গত কয়েকদিন পায়ের সহনশীলতাও বেড়ে গেছে। তীব্র স্রোতের মুখে গুটি গুটি এগিয়ে চলি। জল ক্রমে হাঁটু পেরিয়ে আমার কোমর ছুঁইছুই। দলে অন্য সকলের তুলনায় আমিই দুর্বল। ওরা আমায় রেখেছে মাঝখানে। উঠে এলাম খুরনা চুয়ের ডানপাশে তিলুত সামদোয়। সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এখানে সবচেয়ে জল কম থাকে। তাই আজ আরও কয়েকবার এ নদী অতিক্রম করতে হবে। তিলুত সামদো পৌঁছে সকলেই আনন্দিত। আমরা খুরনা চু অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছি। নদীর উজানে যেতে হবে। চলার দিক পরিবর্তন। পূর্বমুখী পথ ছেড়ে চলি দক্ষিণদিকে। ডানতটের পাহাড়ের ঢালে একটা পথ ছিল। সে পথ নেমে গেছে নদীগর্ভে। নেমে পড়লাম নদীতটে। জলে জলে খানিকটা এগিয়ে উঠে এলাম পাহাড়ের ঢালে। পাথরের ঢালে ছোট ছোট পাথর গড়াচ্ছে অনবরত। তারই মধ্য দিয়ে সামনে না এগিয়ে পাথরের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলাম নদীর ধারে। কোথাও কোনও পথ নেই। তাই যেনতেনপ্রকারে এগিয়ে চলা। নদীভীতি অনেকটাই কেটে গেছে। এরই মধ্যে খুরনা নদীকে পাঁচবার পেরিয়েছি। দুপুর একটার মধ্যেই চলার বিরতি। নদীতটে একটুকরো বেলাভূমির ওপরে আমাদের তাঁবু পড়ল। দেখতে দেখতে নদীর জল বাড়ল অনেকটা। পরদিন কমপক্ষে আরও চারবার খুরনা চু পার হতে পারলেই আমাদের মুক্তি। লামজুম শোনাল কয়েক বছর আগের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা। খুরনা চু পেরিয়ে এমনই এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল দুজন নেপালি মালবাহক। ওরা যাচ্ছিল লে। এখানকার পথের ভয়াবয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বৃষ্টি শুরু হল। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নদীর জল অসম্ভবভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনে খাড়া পাহাড় ও সামনে ভয়ংকর নদী তখন ফুঁসছিল। একসময় তীব্র ঠান্ডায় ও অনাহারে ওরা মারা গিয়েছিল।

পরদিন ভোরে গত বিকেলের তুলনায় নদীতে জল অনেকটাই কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে জলের তাপমাত্রা। হাঁটার শুরুতেই ঠাণ্ডা জলে নেমে পড়লাম। নদী পেরিয়ে নুড়ির ওপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়েই আটকে যাই। নদীর প্রবাহ ধাক্কা খেয়েছে কাড়া পাহাড়ের গায়ে। আমরাও নিরুপায় হয়ে নেমে পড়লাম বরফগলা জলে। এমন ঠান্ডা জলে চওড়া নদী পেরনো এক অসহনীয় কষ্ট। বার তিনেক পেরনোর পর একটা পথের হদিশ পেলাম। উঠে এলাম অনেকটা উঁচুতে। ওপর থেকে গিরিখাতের গভীরে প্রবাহিত খুরচা চু-কে দারুণ লাগে। রুক্ষ পাহাড় কেটে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে খুরনা চু। নেমে আসতে হল নদীর ধারে। যথারীতি হাত ধরাধরি করে পৌঁছে গেলাম নদীর ডানতটে। লামজুম জানাল, এ নদীকে আর পেরোতে হবে না। এ তো বড় আনন্দের খবর। খুরনা নদীকে মোট নয়বার পেরোতে হল। এখানে একটা চোর্তেন আছে। জায়গাটির নাম খুরনা সামদো। ছোট্ট এক নালা মিশেছে খুরনা চুয়ের সঙ্গে। খুরনা নদী নেমে এসেছে দক্ষিণপূর্ব

দিক থেকে । এ নদী ধরে একটা পথ আছে । ওপথে লে-মানালি হাইওয়ের ওপরে অবস্থিত সারচু অথবা পাং পৌঁছনো যায় । ওপথেও খুরনা চু-সহ নদীনালা পেরোতে হবে বহুবার ।

খুরনা সামদো থেকে আমরা চলি উত্তর দিকে । গিরিখাতের গভীরে প্রশস্ত নদীতট । নুড়ি, বেলাভূমি ও ঝোপঝাড়ের মাঝে এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে এক ছোট্ট জলধারা । দুপাশে বিচিত্র আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানা রঙের পাহাড় । কোথাও সেইসব রুক্ষ পাহাড়গুলির রূপ খুবই ভয়ংকর । প্রতিনিয়ত পাথর ভেঙে পড়ছে নদীগর্ভে । এরই মধ্য দিয়ে যেতে হয় সাবধানে । নালার পাশে ভিজে বালির ওপর সর্বত্রই রয়েছে অসংখ্য জীবজন্তুর পায়ের ছাপ । আইবেক্স ও তুষারচিতার পায়ের ছাপই বেশি । প্রশস্ত নদীগর্ভের দুপাশের পাহাড় দূরে চলে যায় । প্রসারিত হয় উপত্যকাটি । বহুপথ পেরিয়ে ধীরে ধীরে আমরা উঠে এলাম অনেকটা ওপরে । ডানদিকে হাতের নাগালে রয়েছে দুটি তুষারাবৃত পর্বতচূড়া । নদী সংলগ্ন পাহাড়ের ঢাল সবুজ ঘাসে ঢেকে আছে । এক-দেড় ফুট উঁচু ঘাস ও গুল্মে ছেয়ে আছে বিস্তীর্ণ এলাকা । আমরা সেই সবুজ গালিচার ওপর তাঁবু টাঙালাম । এ জায়গাটির নাম রুবরাং । ঘোড়া তিনটে মহানন্দে ঘাস খেতে খেতে পৌঁছে গেছে দূরে পাহাড়ের ঢালে । জাঁসকার উপত্যকায় এর আগেও দুবার এসেছি । পৌঁছেছিলাম এর প্রত্যন্ত প্রান্তরে । কিন্তু কোথাও এত সুন্দর চারণভূমি দেখিনি । রুবরাং লা অতিক্রমের জন্য এখানে মূল শিবির স্থাপন করতে হবে । আবার এটাই জালুং লার মূলশিবির । রুবরাং লা অতিক্রম করে পৌঁছনো যায় মারখা গ্রামে ও জালুং লা (৫ উচ্চতা ৫১৯৮ মিটার) পেরিয়ে লাংটাং চু ধরে নিমালিং হয়ে পৌঁছনো যায় হেমিস গুম্ভায় ।

পরদিন এক সুন্দর সকালে হাঁটা শুরু হল চারণভূমির মধ্য দিয়ে । খানিকটা এগিয়ে শুরু হল রুক্ষ পাহাড়, ডানদিকে নদীগর্ভ পেরিয়ে একটা পথ উঠে গেছে জালুং গিরিবর্ত্ম অভিমুখে । আমরা চলি বাঁদিকে । মাটি পাথরের রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত । এই অঞ্চলে প্রচুর পায়রা আছে । সরাসরি বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা শুকনো নালার মাঝে । দুপাশ থেকে একই ধরনের শুকনো নালা মিশেছে এর সঙ্গে । ডানদিক, বাঁদিক ও সামনে কিছুই দেখা যায় না । এলাম রুবরাং লার শীর্ষে (উচ্চতা ৫০২০ মিটার) । উঠে এসেছি জাঁসকার গিরিশিরার ওপরে । সামনে মারখা উপত্যকা । দূরে দেখা যায় স্টক-মাসো গিরিশ্রেণীর ওপরে কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতচূড়া ।

নীল আকাশের বুকে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে ধূসর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত নামতে থাকি । নেমে এলাম একটা নালার ধারে । ছোট্ট সেই নালা ধরেই চলার পথ । দুপাশের রুক্ষ খাড়া পাহাড়গুলি খুব বেশি উঁচু নয় । জলধারাটি হঠাৎ-ই লুকিয়ে পড়ল ।

সেই শুকনো বেলাভূমি ও নুড়ি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দ্রুত নামতে থাকি । চারচাম চু নদীগর্ভের পাশে এমন কিছু খাড়া পাহাড় দেখা যায় যেগুলিকে দেখে মনে হয় এগুলি নদীবক্ষ থেকে সরাসরি উঠেছে আলাদাভাবে । এগুলিকে বলা হয় স্তূপ পাহাড় । আর এই উপত্যকাটি হল গ্রস্ত উপত্যকা । ক্রমে বালি ও নুড়ি পরিপূর্ণ নদীখাত আরও বেশি চওড়া হয় । সামনে পোড়ামাটি রঙের বিশালাকার পাহাড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে হল । নদীতট থেকে এর উচ্চতা হাজার ফুট ছাড়িয়ে যাবে । সকলেই সেদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি । খাড়া দেওয়ালের গায়ের পাথরে নানা কারুকার্য । মনে হয় পাহাড় বেয়ে উঠছে ডাইনোসর কিংবা রাজা বসেছেন রাজ সিংহাসনে । এ পাহাড়টি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । কখনও মনে হয় আমরা হেঁটে চলেছি চিনের প্রাচীরের পাশে পাশে । এর পাশে পাশে প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর পাহাড়টি শেষ হল । বহু পথ পেরিয়েও হিমালুংয়ের দেখা নেই । মনে হচ্ছে উত্তরমুখী এই উপত্যকাটি ধাক্কা খেয়েছে উত্তর দিকে একটা পাহাড়ের গায়ে । ওখানেই আছে মারখা নদী । বাঁদিক থেকে নেমে এসেছে একটা নালা । ঘণ্টা চারেক হাঁটার পর জল পাওয়া গেল । নদীগহ্বর ক্রমে ছোট হয়ে এল । দুপাশের দুটি উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছলাম হিমালুং । পথের পাশে এক প্রকাণ্ড পাথরের ওপর প্রার্থনা পতাকা বলে দেয় আমরা ঢুকে পড়েছি মারখা উপত্যকায় । সামনে মারখা নদী । ওপারে মারখা উপত্যকার মাঝে প্রচলিত ট্রেকিং পথ । জাংলা থেকে অপ্রচলিত জনমানবহীন পথে যে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম ছয় দিনের সেই পথ চলা এখানে শেষ হল ।

পশ্চিমদিকে মারখা গ্রাম । গ্রামের খেত ও লোকজনের চলাফেরা দেখা যায় । আমরা চলেছি লোকালয়ের মাঝে । নেমে এলাম নদীর ধারে । নদীর পাশে পৌঁছে আরেক বিপত্তি । নদীর ওপরের পুলটি ভেসে গেছে । ভেবেছিলাম আর বোধহয় জলে নামতে হবে না । আবার হাত ধরাধরি করে জলে নেমে পড়লাম । তীব্র খরস্রোত, এবড়োখেবড়ো পাথর ও জলের গভীরতা কোমর ছুঁইছুঁই । নদী পেরোতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হল । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । শক্ত সমর্থ ধনঞ্জয় জলে পড়ে গলে । সর্বস্ব ভিজিয়ে উঠে এল জল থেকে । প্রসারিত উপত্যকা । পরপর কয়েকটি চোর্তেন পেরিয়ে গ্রামের শুরু । চারদিকে রুক্ষ বাদামি রঙের পাহাড় আর নদীতীরে গ্রামের মাঝে সবুজের সমারোহ । গ্রামের আগেই একটা সুন্দর মাঠ । সেই ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠে আমাদের তাঁবু পড়ল ।

মারখা গ্রামের (উচ্চতা ৩৮১৩ মিটার) উত্তর দিকে স্টক পর্বতশ্রেণী । এখান থেকে নেমে এসেছে গেনেপা চু । মিশেছে মারখা নদীর সঙ্গে । সমতল ছাদবিশিষ্ট প্রায় একই ধরনের দোতলা ঘরবাড়ি । নালাটির দুপাশে যবখেতে ঘন সবুজের ছোঁয়া । শস্যশ্যামলা মারখা গ্রাম । মারখা গুম্ভাটি গ্রামের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরে । লে-স্থিত স্পিতুক

গুম্ভা থেকে মারখা উপত্যকা হয়ে হেমিস গুম্ভা পর্যন্ত এই ট্রেকরুটটি বহুল প্রচলিত পথ। বহু বিদেশি পদযাত্রীরা এপথে ট্রেক করেন। পরদিন গ্রামের খেত ও ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে নেমে এলাম নদীর ধারে। পশ্চিমমুখী নদীর ধারে রয়েছে সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। কিছুদিন আগে লে সহ এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল। বেড়ে গিয়েছিল নদীর জল। তখন মারখা নদীর ওপর বহু ব্রিজ ভেসে যায়। যথারীতি নদীর জলে নেমে পড়লাম। নদী পেরিয়ে একটা সুন্দর বনাঞ্চলকে বাঁদিকে রেখে জলকাদার মাঝে এগিয়ে চলি। আরও একবার নদী পেরিয়ে উঠে এলাম এক গুম্ভার কাছে। ছালাক গ্রামের মাঝে সুন্দর খেত। কিন্তু গ্রামে কোথাও কোনও লোকজনের দেখা নেই। পথে বহু বিদেশি পদযাত্রীর দেখা পেলাম। মালপত্রসমেত দলে দলে ঘোড়া ও খচ্চর চলেছে। লে, মানালি, কাঠমান্ডু ও দিল্লিস্থিত এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই ট্রেকিং প্রোগ্রাম। নদীতটে প্রায় সর্বত্রই সরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সুন্দর বনানী। সেই বনের মাঝে চলার পথ। এপথে চলতে দারুণ লাগে। বনমধ্যে পাখির কলরব শুনি। গাছের ছায়া পড়েছে নদীর জলে। পথের ডানপাশে পাহাড়ের ঢাল রুক্ষ ধূসরবর্ণ আর বাঁদিকে গভীর বন। জাঁসকার গিরিশিরা ও স্টক মাসো গিরিশিরার মাঝে অবস্থিত মারখা উপত্যকাটি। প্রচুর গাছপালা এই আপাত রুক্ষ মারখা উপত্যকাকে পালটে দিয়েছে। দেখতে পাই অসংখ্য চির ফেজেন্ট পাখি। এইসব দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই স্কিউ গ্রামে। গ্রামের খেত, ঘরবাড়ি ও সারি সারি পপলার গাছ রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শস্যশ্যামলা গ্রামের মাঝে বহু লম্বা গাছও দেখা যায়। দেড়-দুই ফুট ব্যাসের গুঁড়িযুক্ত গাছ মারখা উপত্যকায় এখন আর কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। গ্রামের কোনও বাড়িতেই লোকজন নেই। অনেকটা এলাকা জুড়ে স্কিউ গ্রাম। গ্রামের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছতেই আধঘণ্টা সময় লাগল। পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে কয়েকটি বাড়ি, হোটেল, ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ও গুম্ভা। পশ্চিমমুখী মূল পথটি ধরে মারখা নদীর ধারে ধারে পৌঁছনো যায় লামায়ুরু হয়ে চুলুং। একদিনের হাঁটাপথ। চুলুং থেকে লে বাসপথ। এপথে প্রতি রবিবার বাস পাওয়া যায়। আমরা উত্তরমুখী চড়াই পথে ঢুকে পড়লাম গিরিখাতের মাঝে। সিংড়ি নালা ধরে অল্প অল্প চড়াই পথ। নালার দুপাশে প্রচুর গাছপালা। সিংগা গ্রামের কাছেই এক জলাভূমির ধারে আমাদের তাঁবু পড়ল। মারখা থেকে প্রায় ১০ ঘণ্টা হেঁটে অনেকটা পথ পেরিয়েছি।

সারারাত ঝোড়ো হাওয়ার পর সকালটা শান্ত। ভোর হতেই গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লাম। একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁসে কয়েকটি সুন্দর ঘরবাড়ি। পথের পাশে সাদাকাপড়ে তৈরি তাঁবু টাঙিয়ে বসেছে খাবারের দোকান। চা, চার্ড, ঠান্ডা পানীয় ও বিয়ার পাওয়া যায় সর্বত্রই। অল্প অল্প চড়াই পথ। অনেকটা দূর থেকেই গানজা লাকে দেখা যায়। উল্টোদিক থেকে আগত পদযাত্রীরা দলে দলে গিরিবর্ত্মটি অতিক্রম করে দ্রুত নেমে

আসছে । ওরা ওপারের মূল শিবির ইউরুচে থেকে বেরিয়েছি ভোররাতে । আমরা ঘণ্টা চারেক ওঠার পর পাসের ওপর (উচ্চতা ৪৯৪০ মিটার) পৌঁছে যাই । স্টক গিরিশ্রেণীর ওপরে গানজা লার অবস্থান । দক্ষিণদিকে দেখা যায় মারখা উপত্যকা সহ জাঁসকার গিরিশ্রেণী আর উত্তরদিকে রয়েছে মধ্য সিন্ধু উপত্যকা সহ লাদাখ গিরিশ্রেণী । উত্তর-পূর্বদিকে স্টক গিরিশ্রেণীর ওপরে দেখতে পাই কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতচূড়া ।

গানজা লা থেকে নেমে যেতে হবে সিন্ধু নদের ধারে । আমাদের চলার শব্দে ছুটে পালায় মারমটের দল, দ্রুত লুকিয়ে পড়ে গর্তের মধ্যে । খাড়া উতরাই পথ ধরে নেমে এলাম ইউরুচে । গিরিখাতের মাঝে সোনালি সবুজ যব খেতের মাঝে দুটো সুন্দর বাড়ি নিয়ে একটা ছোট্ট গ্রাম । পুল পেরিয়ে চলে এলাম নালাটির ডানতটে । শস্যশ্যামলা রুমবক গ্রাম । এখানে ঘোড়ার জন্য ঘাস পাওয়া যাবে । তাই আমাদের তাঁবু পড়ল রুমবক নালার পাশে । গ্রামের ঘরবাড়ি অনেকটা ভেতরে । লে থেকে গাড়িপথে স্টক গ্রামে আসা যায় । আর সেই স্টক গ্রাম থেকে নামলিং লা (৪৫৭০ মিটার) পেরিয়ে একটি ট্রেক রুট পরচা কাংরি শৃঙ্গটিকে বাঁদিকে রেখে নেমে এসেছে রুমবক গ্রামে । দিনের শেষে আকাশের বুকে টুকরো টুকরো মেঘে দারুণ রং ধরেছে ।

পরদিন হাঁটা শুরু করে চলে এলাম নালার পাশে । বার দুয়েক নালাটিকে পেরোতে হল পা ভিজিয়ে । দ্রুত নেমে এলাম জিনচেন গ্রামে । নদীতটে বড় বড় পপলার গাছ, সবুজ ঘাস ও ছোট এক জলধারা নিয়ে জিনচেনের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডটি অপূর্ব । তারই পাশে শস্যশ্যামলা খেত । গ্রাম ছাড়িয়ে নেমে এলাম মোটরপথে । এপথে গাড়ি চলাচল এখনও শুরু হয়নি । সেই মোটরপথ ধরে উত্তরদিকে বেশ খানিকটা চলার পর পশ্চিমগামী নদী দেখতে পেয়ে বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না যে এরই নাম সিন্ধু নদ বা সিংঘে চু । সিন্ধু দর্শনে সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে যায় । প্রচুর জল নিয়ে গিরিখাতের মাঝে সিন্ধু এখানে বয়ে চলেছে পাকিস্তানের দিকে । পথ পূর্বদিকে বাঁক নেয় । ধূসর রুক্ষ প্রান্তরের মাঝে পথ চলা । নদীর ওপারে পাকাসড়ক, ঘন পপলার গাছে সাজানো ঘরবাড়ি ও জওয়ানদের ছাউনি দেখতে পাই । এখানে নদীর ওপরে কোনও পুল নেই । যেতে হবে ফাং বা স্পিতুক । আমরা যাব স্পিতুক (উচ্চতা ৩২৮৪ মিটার) । পথে জলের অভাবে আরও বেশি কষ্ট দেয় । নদীর ধারে গ্রামের মাঝে মেঠো পথ ধরে দুপুরের পর পৌঁছে যাই সিন্ধুর ধারে । ওপারে অল্প দূরে স্পিতুক গুম্ভা । অনেকটা বিস্তার নিয়ে সিন্ধু বয়ে চলেছে । পদুম থেকে ১৫ আগস্ট যে হাঁটা শুরু করেছিলাম ১১ দিন পর সেই পথ চলা এখানে শেষ হল । লে থেকে মানালি হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায় ।

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

মেঘালয়ের দাউকি

সুমিত মুখোপাধ্যায়

মেঘালয়ে খাসি পাহাড়ের একদম দক্ষিণপ্রান্তে দাউকির কাছে বাংলাদেশ সীমান্তের চেকপোস্ট তামাবিল । একটা পূর্তবিভাগের বাংলো আছে আর আছে একটা গা এলানো নদী । শিলং পাহাড়ের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে কদিন আদিগন্ত সবুজ সমতল দেখা যাবে । উপরি পাওনা হতে পারে টাটকা মাছ কিংবা বিখ্যাত কমলালেবু-সময় অনুসারে ।

ফেব্রুয়ারির ঠান্ডা ভোরে সোজা শিলংয়ের বড়বাজার অঞ্চলে চেরাপুঞ্জি বাসস্ট্যান্ডে । ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাউকির মিনিবাস ছাড়ে । তাছাড়া আছে ছোট গাড়ি-শেয়ারে দশ-বারোজন । পাঁচ-ছ জনের দল হলে একটা ট্যাক্সি নেওয়া ভালো । মাথাপিছু ৬০ থেকে ৮০ টাকা পড়বে ।

প্রথমটা সেই চেনা চেরাপুঞ্জির রাস্তা । আসলে এটাই দাউকি রোড বা শিলহেট রোড অর্থাৎ চল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়ক । খাসি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী স্বদেশী অধ্যায়ের স্বাক্ষর । ব্রিটিশদের পছন্দ করা শিলং শহর এবং আরও উত্তরের সুফলা আসামের সঙ্গে বাংলার শ্রীহট্ট বা শিলহেট শহরকে সড়কপথে জোড়ার প্রয়োজন হয়েছিল রাজ্য বিস্তারের জন্যই । বাধ সাধলেন তখনকার খাসি নেতা উ তিরৎ সিং । শেষপর্যন্ত রক্ত ঝরিয়ে বাধ্য হয়ে শর্তসাপেক্ষে সড়কটি বানাবার চুক্তি হয়ে গেল । সেটা মোটামুটি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ । তৈরি হল উত্তরপূর্ব ভারতের প্রথম এই রাজপথটি । এখন আর গুয়াহাটি থেকে সরাসরি কোনও যাত্রীবাহন চলে না । শিলং থেকে দাউকি ৮৩ কিলোমিটার রাস্তা । শিলহেট শহর কেটে গিয়ে পড়েছে ওপারে ।

প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার চলার পর চেরাপুঞ্জির রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিয়ে উঠে পড়ল একটা সাবেকী লোহার ব্রিজে । এরপর আরও কিছুটা চড়াই ভাঙা । কিছুটা রাস্তা বেশ বিপজ্জনক । কোথাও বাঁদিকে কোথাও ডানদিকে গভীর খাদ । মাঝখানে সরু গিরিশিরা ধরে বুক দুরদুরে রাস্তা । এই জায়গাটায় আমরা আসলে শিলং মালভূমির সবচেয়ে উঁচু মূল মধ্যশিরাকে পেরিয়ে এলাম । জায়গাটা শিলং শহর থেকে আরও হাজার ফুট ওপরে । মাঝে দুটো বড় গ্রাম পেলাম-লাই লিংকোট আর লিংকারডেম । আমাদের গাড়ি প্রথমটাতে চা খাওয়ার সময় দিয়েছিল । সকালের ঠান্ডা হাওয়া আর মিষ্টি রোদের

মধ্যে কং (দিদি)-এর দোকানে শা শাও (লিকার চা) আর জিংবাম (ভাজাভুজি) খাওয়া হল। শেষে কংকে 'খুবলেই ম' বা ধন্যবাদ জানিয়ে আবার রওনা। খাসি ভাষা খুব প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য মনখামের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। যদিও এদের নিজস্ব কোনও লিপি না থাকায় ইংরিজি বা রোমান হরফকেই সম্বল করেছে।

এবার ঢালুপথে আরও বিশ কিলোমিটার মতো নামার পর এল বড়সড় এক জনপদ। জাতীয় সড়কের দুধারেই অনেক দোকানপাট, লোকজন। কারণ এটাই পিনুরসলা গ্রাম এবং ওই একই নামের ব্লকের সদর। এই পিনুরসলা ব্লকের একদম দক্ষিণপ্রান্তেই রয়েছে দাউকি। পিনুরসলা গ্রামের আরেক বিশেষত্ব হল এর অবস্থান। চেরাপুঞ্জি ও মৌসিনরামের একই সরলরেখায় মাত্র ২৫ কিলোমিটার পূর্বে। অর্থাৎ বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। আলাদা করে মেপে দেখা হয়নি তাই এর গুরুত্ব কম।

সময়টা শীত-বসন্তের দোটানায় তাই মেঘের দেশেই মেঘেদের এখনও শীতঘুম ভাঙেনি। অবশ্য রাস্তার পাশের খাদগুলোতে ধবধবে বিড়ালছানার মতো ছোট ছোট মেঘেদের রোদ পোয়াতে দেখেছিলাম। গাড়ির মধ্যে আমরা ছাড়া সবাই স্থানীয় খাসি অথবা জয়ন্তীয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ওদের নিজস্ব চেহারা, ভাষা ও পোশাক নিয়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। মার্বেনিয়াং-এর সঙ্গে ভাব জমালাম ইংরিজিতে। উনি শিলংয়ে চাকরি করেন এবং দাউকির কাছে একটা গ্রামে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের ছোট কন্যাকে বিবাহের কারণে রীতি অনুসারে একাধারে ঘরজামাই এবং স্থাবর-সম্পত্তির মালিক। বাড়ি ফিরছেন দাউকির বার্ষিক নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য। আমরাও ওঁর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম সঙ্গে এক টুকরো পান-সুপারি-চুন। অতিথিদের ওইটুকু নেওয়া একান্ত কর্তব্য। না নিলে ওঁকে অপমানিত করা হয়।

বেলা প্রায় সাড়ে নটায় রাস্তার ডানদিকে একটা বড় নদী এবং সামনেই রুপোলি লোহার ঝোলা ব্রিজ। খাড়া নদীর পাড় এবং পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ মাখানো। ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকে মোড় নিতেই দাউকি। এপারটা কিন্তু জয়ন্তীয়া হিলস জেলার আমলা রেম ব্লক। ছোট্ট জনপদ দাউকি রাস্তার বাঁদিকটায় পাহাড়ের ঢালের ওপর। ডানদিকে ওই পাহাড়ি ওয়া উম ঙট নদী পথশ্রান্তের মতো গা এলিয়ে চওড়া হয়ে শুয়ে আছে। বুকের ওপর অসংখ্য ছোট ছোট নৌকো। ওপারে বালির চরে বাংলাদেশের ট্রাকগুলো বালি তুলছে। মেঘালয়ের নদী বালি-পাথর এনেছে বাংলাদেশের জন্য। কারণ ওপারে বালি-পাথরের খুবই আকাল।

ছোট্ট বাজারের মধ্যে গাড়ি থামল। পাশেই একটু উঁচু জমিতে আমাদের আশ্রয়। পূর্তদপ্তরের বিশ্রামগৃহ। বাংলোয় খাবার ব্যবস্থা নেই। বাজারে অবশ্য একদম বাঙালি

খাবার মাছ-ভাত। এখানে খাসিরা অনেকেই বাংলা বলে। এছাড়া স্থানীয় বাঙালির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এ হল শিলহেট জেলার বাংলা। কান পেতে শুনলে ক্রমশ সরল হয়।

বিকেলের দিকে এই গ্রামের মোড়ল বা হেডম্যানের সঙ্গে গল্প করতে গেলাম। এই পুরনো দাউকি বাজার অঞ্চলটা ওঁদেরই জমিতে। একটা প্রাচীন কালীমন্দির এখনও আছে। এখানকার সবচেয়ে বড় জমিদার রঙ্কসাই পরিবারের সদস্য। ওঁদের পরিবারই বহুবছর ধরে এখানকার নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। অবশ্য মেলা আর খোলামেলা লটারি, জুয়া খেলার মাধ্যমে আমদানিও হয়। এখানকার অদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং হালহকিকৎ শুনলাম ওঁর কাছে। মাঝখানে দু-বার চা ও একগাদা পান-সুপারির আপ্যায়ন ছিল। দুঃখ করে বললেন, যদিওবা অল্পকিছু কমলালেবুর ব্যবসা এখনও আছে কিন্তু দেশভাগের পরে পান-সুপারির কারবারটা অনেকটা মার খেয়েছে। সেকালের বিখ্যাত শিলহেটের কমলালেবু আসলে এই খাসি পাহাড়ের ফল।

পরদিন হাটবারে ভাগ্যক্রমে সেই বিখ্যাত কমলার দেখা পেলাম। ওঁদের মতে, এর মধ্যেও সবার ওপরে ওয়াখেন গ্রামের লেবু-পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি লেবু। এবার ফসল কম তাই একগণ্ডা ওয়াখেন কমলা কিনতে হল পঁচিশ টাকায়। সন্ধ্যায় বাংলোর অধিকর্তা সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মজুমদার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হল। উনি শিলংয়ের বাঙালি। সব বন্দোবস্ত করে চৌকিদারকে বলে রাখলেন কাল সকালে আমাদের মও জাপলেন যাবার রাস্তা চিনিয়ে দিতে।

মেঘালয়ের আনাচেকানাচে লুকিয়ে আছে অনেক প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং সবকিছুর মধ্যেই জড়িয়ে আছে দারুণ সব লোকগাথা-প্রবাদ আর সংস্কার। সকালে জলখাবার খেয়ে হাঁটা লাগালাম ফিরতি পথে সেই ব্রিজটা পেরিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার মতো। রাস্তার ডানদিকে পাহাড়ে চড়ার একটা সরু হাঁটাপথ। শুকনো পাতা মাড়িয়ে হালকা জঙ্গলের মধ্যে চড়াই। হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিতেই ঢুকে পড়লাম একটা প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গপথের মধ্যে। ওপারে আলোয় বেরিয়ে কয়েকটা খাড়া ধাপ। আরও কুড়ি-পঁচিশ পা হাঁটতেই একটা কালো পাথরের চওড়া চাতাল। বাঁদিকটায় প্রায় ২৫ ফুটের খাড়া দেওয়াল। নির্দেশ অনুযায়ী ওই দেওয়ালের ওপরে উঠতে পারলে সামনে দারুণ দৃশ্য। একটা মোটা লতানে গাছের কাণ্ড দু-হাতে ধরে পাথরের গায়ে ধাপে ধাপে পা দিয়ে শৈলারোহণের মজা নেওয়া যায়।

ওপরে উঠলে প্রথমেই মাথাটা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক। একে মও জাপলেনের মাথায় স্বল্প পরিসর। সামনে মহাশূন্য অর্থাৎ অনেক নিচে দাউকি শহর এবং উম ঙট নদী আর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চোখ জুড়নো দৃশ্য। আক্ষরিক অর্থে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখা।

দাউকির লোকজনের মুখে মুখে এই বিশাল ঝুলন্ত পাথরটির কথা শোনা যায় । চিরায়ত খাসি সমাজে প্রকৃতি পুজোর রেওয়াজ । এদের ভগবান থাকেন নানান পাথরে, গাছে, গুহায় । এই পঞ্চাশ ফুট উঁচু ডিম্বাকৃতি বিশাল পাথরটি আগে নাকি ছিল শিলংয়ের কাছেই সিমত গ্রামে ।

ওখানকার গ্রামবাসীদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এই প্রস্তরদেবতা রাজি হয়েছিলেন ওই পাহাড়ি গ্রামটাকে সমতলের মতো বানিয়ে দেবেন । তবে একটা শর্ত । চাই একজোড়া পাঁঠা-একটা নিকষ কালো আর একটা নিখুঁত সাদা । দুর্ভাগ্যক্রমে নিখুঁত সাদা পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না । এদিকে সময় উত্তীর্ণ হল এবং প্রস্তরদেব রাগ করে সটান চলে গেলেন একদম শিলহেটের জাফলং গ্রামে । ওখানকার গ্রামবাসীরা এককথায় দুটো পছন্দসই পাঁঠা বলি দিয়ে ওঁকে তুষ্ট করলেন । প্রস্তরদেবও তখন কথা রাখলেন । তৈরি করে দিলেন এক শস্য-শ্যামল সমতল শ্রীহট্ট । এরপর মও জাপলেনের ইচ্ছা হল এমন এক জায়গায় অধিষ্ঠিত হতে যেখান থেকে তিনি নিজের এই অপূর্ব সৃষ্টিকে সবসময় দু-চোখ ভরে দেখতে পাবেন । এগিয়ে এল একপাল অনুগত ইঁদুর । তৈরি করে দিল বিশাল এক কলাগাছের ভেলা । তারপর নদীর উজান ভেঙে সবাই মিলে মও জাপলেনকে বসিয়ে দিল দাউকির খাড়া পাহাড়ের গায়ে । এখনও বিশাল জাপলেন ঠিক যেন উঁচু অট্টালিকার এক মনোরম বারান্দায় বসে বাংলাদেশের শ্রীহট্টের দিকে তাকিয়ে আছেন । মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছেও পাহাড়ের এই অংশটি পুণ্যতীর্থ । কোনও এক সময়ে এক বিখ্যাত মোল্লা সাহেব এখানেই দেহরক্ষা করেছিলেন । সেজন্য উরস উৎসবের সময় দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই আসেন মোল্লার মাজারে স্মৃতি তর্পণ করতে ।

নিচে নেমে এসে সোজা নদীর ধারে । ছোট ছোট নৌকোগুলো কপোতাক্ষ নদীর জলে ছপছপে দাঁড় ফেলে ভেসে বেড়াচ্ছে । এক খাসি মাঝিভাইকে রাজি করিয়ে চড়ে বসলাম নৌকোয় । শীতকালে জল কম তাই স্রোত বেশি নেই । প্রায় চার কিলোমিটার নদীর ভেতরে নৌকোয় যাওয়া যায় বিশাল গ্রাম দারাং পর্যন্ত ।

শেষদিন, হাতে একটা বেলা বাকি । তাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে তামাবিল চেকপোস্ট দেখতে যাওয়া হল । কয়লার ট্রাকের আনাগোনায় এই তিন কিলোমিটার পথও বেশ দুর্গম মনে হয় । তা সত্বেও দূর থেকে দেখা বাংলাদেশের মাটি একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে গেল । হয়তো নাড়ির টান । দাউকিতে দু-রাত্তির কাটিয়ে ফেরার পথে সেই আদিপ্রস্তরদেবকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম । ওঁর বারান্দায় আবার ওঠবার ইচ্ছেটাও গোপন রাখিনি ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ২০০১

আমাদের ছোট নদী : লিডার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে একটা ছোট্ট স্বপ্নের কথা বলি । প্রতিদিনই আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি, অধিকাংশ স্বপ্নই পরে আর মনে থাকে না, ধূপের গন্ধের মতো মিলিয়ে যায় । কোনও কোনওটি সকালে জেগে ওঠার পরেও কিছুক্ষণ মনে থাকে, দুয়েকটা বেশ স্থায়ী দাগ রেখে যায় স্মৃতিতে । এই স্বপ্নটা বেশ মনে আছে ।

আমি একটি নদীতে নামছি একটু একটু করে । প্রথমে হাঁটু জল, তারপর কোমর পর্যন্ত, তারপর বুক, আমি কিছুই পরে নেই, একেবারে নগ্ন । দিনেরবেলা নয়, রাত্তিরবেলা, আকাশে চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে । তারপর দেখলাম দূরে বড় বড় পাহাড়, রাত্তিরবেলাও জ্যোৎস্নায় চকচক করছে শিখরের তুষার । সাঁতার কাটার বদলে আমি আস্তে আস্তে ডুবে গেলাম সেই নদীর গভীরে, তারপরই দূরে কামানের গোলার মতো কিসের প্রচণ্ড শব্দ হল ।

ব্যস, এখানেই স্বপ্নের শেষ ।

স্বপ্নের অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন । অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না । একেকটা স্বপ্ন নিজের কাছেই একটা বাঁধা হয়ে থাকে । কলকাতা শহরে, বিছানায় শুয়ে হঠাৎ আমি একটা নদীতে ডুব দেওয়ার স্বপ্ন দেখলাম কেন? দিনেরবেলা নানান কাজে ব্যস্ত থেকে আমি তো কোনও নদীর কথা একবারও চিন্তা করিনি । তাহলে কি এটা কোনও প্রতীক? এ আমার মৃত্যু-বাসনা? কিন্তু কোনও নদীতে ডুবে মরা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় । পূর্ববঙ্গে জন্ম, আমি বেশ ভালোই সাঁতার জানি ।

তাহলে কি অতৃপ্ত বাসনা? তাই-ই বা কী করে হবে, আমি জীবনে বহুবার বহু নদীতে ডুব দিয়েছি, এমনকী বিশ্ববিখ্যাত নদী ড্যানিয়ুবেও সাঁতার কেটেছি ।

সে যাই হোক, স্বপ্নের ব্যাখ্যা থাক । স্বপ্নে আমি কোন নদীটাকে দেখলাম? রাত্তিরবেলা কোনও পাহাড় ঘেরা নদীতে কখনও স্নান করিনি, সুতরাং এটা আমার পূর্ব স্মৃতি হতে পারে না ।

স্বপ্নে অবশ্য আমরা অনেক অদৃষ্টপূর্ব জায়গা দেখি । মনে মনে অনেক নতুন দৃশ্য তৈরি করি । তবু অনেক ভেবে ভেবে একদিন মনে হল, আমার স্বপ্নে দেখা নদীটি একেবারে কল্পিত নয়, অনেকটা পহেলগাঁও-এর লিদার নদীর মতো ।

লিদার বা লিদ্দার বা লিডার নদীটি অনেকের কাছেই পরিচিত । কাশ্মীরের ভ্রমণকারীরা সকলেই পহেলগাঁও যান । আর অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের বারবার এই নদীকে প্রত্যক্ষ করতে হয় । কাশ্মীর বাঙালিদের খুবই প্রিয় জায়গা, এখন কয়েক বছর ধরে অবশ্য সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক, কখন উগ্রপন্থীদের গুলিতে প্রাণটি যাবে তার ঠিক নেই । আবার কবে ওই স্বর্গসম উপত্যকায় সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যাবে কে জানে! তাই লিদার নদী তীরের একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখতে ইচ্ছে হল । এর সঙ্গে আমার ওই স্বপ্নের অবশ্য কোনও যোগ নেই । লিদার নদীর জলে যেমন তীব্র স্রোত, তেমনই ঠান্ডার কামড়, ওখানে স্নান করতে কখনও ইচ্ছেও হয়নি ।

পহেলগাঁওতে আমি গেছি দুবার ।

প্রথমবার গিয়েছিলাম বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে, সব মিলিয়ে বোধহয় পঞ্চাশজন, সকলেরই পরনে খাঁকি হাফ প্যান্ট ও সাদা শার্ট । দলবেঁধে ঘোরার মজা আছে ঠিকই, অনেক হৈ চৈ ও আমোদ হয়, কিন্তু নিসর্গ উপভোগ করা যায় না । সেবারে রিজার্ভ বাসে করে ঘোরা, চেঁচিয়ে গান গাওয়া, লুকিয়ে চুরিয়ে ব্র্যান্ডি পান, এই সবই মনে আছে, নদীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের স্মৃতি নেই ।

দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে, তিনজনের ছোট্ট দল, কোনও কারণে সেবার পহেলগাঁওতে তখন ভিড়ও ছিল না । ঠিকই করেছিলাম, ওখানে নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটাব ।

পহেলগাঁওতে প্রচুর হোটেল আছে, আমাদের সাধ হল তাঁবুতে থাকার । হোটেলের ঘর অনেক আরামদায়ক, কিন্তু স্বাতী অতি রোমান্টিক, তাঁবুতে রাত্তিরযাপনই তার বেশি পছন্দ । আমাদের ছেলে পুপলুর তখন ছ-সাত বছর বয়স । তার কাছেও তাঁবুতে থাকা বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো ।

অনেক তাঁবু ভাড়া পাওয়া যায় । দোকানের লোকরাই তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে যায়, একখানা শোবার ঘর, ছোট্ট রান্না ঘর, পিছনে বাথরুম, বিছানা, বালিশ, চাদর, থালা-গ্লাস, চায়ের কাপ-ডিশ, সব কিছুর জন্যই আলাদা-আলাদা ভাড়া । আমরা অবশ্য রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যাইনি । দুবেলা খেয়ে আসতাম শহরের দোকান থেকে । রাত্তিরবেলা খেয়েদেয়ে তাঁবুতে ফেরাটাই ছিল সবচেয়ে কষ্টের । পহেলগাঁও দিনেরবেলা চমৎকার, সন্ধের পর

থেকেই খুব শীত পড়তে শুরু করে, রাত আটটা-নটার সময়ই বাইরে থাকলে ঠান্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় । হু হু হু হু করতে করতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান একসঙ্গে দৌড় লাগাতাম তাঁবুর দিকে ।

তাঁবুতে ফেরার পরেও কনকনে বিছানায় শোওয়াও যেন এক শান্তি । বিছানা গরম করার জন্য তার ওপর আমরা লাফালাফি করতাম কিছুক্ষণ ।

একটা ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হত । পহেলগাঁও আসবার আগে শ্রীনগরের অদূরে নাগিন হ্রদের এক বজরাতেও আমরা কাটিয়েছি কয়েকটি দিন । সেখানে একদিন পুপলুকে প্রায় অবধারিত মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কোনওক্রমে । আশপাশের কয়েকটি বজরায় থাকত কিছু সাহেব-মেম । তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পুপলুর ভাব হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে খেলা করত । এক বজরা থেকে আরেক বজরায় লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে পুপলু হঠাৎ জলে পড়ে যায় । একে তো জল দারুণ ঠান্ডা, তাছাড়া তলাটা ঝাঁঝিতে ভরা । ওই ঝাঁঝিতে পা জড়িয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকে না । আমি আর স্বাতী তখন বজরার ছাদে বসে এক ফেরিওয়ালার কাছে রংবেরঙের পাথর যাচাই করছি । চ্যাঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখি পুপলু জলের মধ্যে খাবি খাচ্ছে । দুয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু করতে না পারলে তার বাঁচার আশা নেই । আমি উঠে দাঁড়িয়ে লাফাবার জন্য গায়ের কোট খুলে ফেললাম । যদিও এক ঝলকের জন্য মনে হল, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে আমি নিজেই ঝাঁঝির মধ্যে গেঁথে যাব, পুপলুকে তো ধরতে পারবই না । নিজেকে বাঁচানোই তখন কঠিন হবে । তবু, নিজের সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য কিছু একটা তো করতেই হবে, সে সময় যুক্তিবোধ কাজ করে না । আমি লাফ মারার জন্য উদ্যত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এ শিকারাওয়ালা এসে ঝুঁকে পুপলুর চুলের মুঠি ধরে তুলে এনে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিল ।

পহেলগাঁওতে এসে সেইজন্যই সে দুরন্ত বালককে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয় । কোনওক্রমে লিদার নদীর জলে পড়লে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না । নদীর মধ্যে বড় বড় পাথর, তীব্র স্রোত, স্রোতের টানে কোনও পাথরে গিয়ে পড়লেই মাথাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ।

তবু, রাত্তিরবেলা তাঁবুতে শুয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে নদীর অবিরাম কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাওয়াও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ।

লিদার নদীটি তেমন কিছু বড় নয়, যদিও দুটি নদী মিলে এখানে একটি নদী হয়েছে । কোলহাই হিমবাহ আর শেষনাগ থেকে বয়ে এসেছে দুটি ধারা, পাহাড় থেকে নেমে এসে

মিলিত হয়েছে এই উপত্যকায় । অনেকে বলে লিদারের আদি নাম নীলগঙ্গা । পহেলগাঁও থেকে অনন্তনাগ পর্যন্ত বয়ে গিয়ে এই নদী মিশে গেছে ঝিলম নদীতে ।

আমরা দিন চারেক চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম পহেলগাঁওতে । অধিকাংশ সময় বসে থাকতাম নদীর ধারে । তাঁবুতে কিছু রান্না না করলেও চা তৈরির ব্যবস্থা ছিল, ফ্লাস্কে ভরা থাকত চা । পুপলু আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে পাথর নিয়ে খেলা করত । অবিরাম ঘোরাঘুরি কিংবা দর্শনীয় স্থানে যাবার ব্যাকুলতার বদলে কোনও একটা জায়গায় স্থির হলে কয়েকদিন বসে থাকলেই সেই জায়গাটির সৌন্দর্য সঠিক উপলব্ধি করা যায় ।

আরও কয়েকদিন হয়তো থাকতাম, কিন্তু অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেল । সুন্দরের লীলাভূমিতে বেশি মানুষের ভিড় আমার পছন্দ হয় না, তীর্থ দর্শনেরও কোনও লোভ নেই । অনেকেই হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবে না, একবার পূর্ণকুম্ভের স্নানের সময় আমি এলাহাবাদের সঙ্গমের কাছে এক তাঁবুতে টানা চোদ্দ দিন ছিলাম, কিন্তু একবারও নদীতে নেমে স্নান করিনি । ওই ধরনের পুণ্য অর্জনে আমি বিশ্বাস করি না । যে-কোনও নদীতে ডুব দিলেই পুণ্য হতে পারে, শুধু শুধু এক লক্ষ মানুষের সঙ্গে গাদাগাদি করে ওই সঙ্গমে গিয়ে ডুব দিতে হবে কেন?

অমরনাথের পথে, চন্দনবাড়ি পর্যন্ত আমরা ঘোড়ায় চেপে ঘুরে এসেছি একদিন । পুপলুর রোমাঞ্চটাই আমরা উপভোগ করেছি বেশি । ওই বয়েসের ছেলেরা ঘোড়ায় চাপলেই নিজেকে রাজপুত্র বা সেনাপতি-পুত্র বলে ভাবে । হাতে থাকে কাল্পনিক তলোয়ার । পুপলু তখন রবীন্দ্রনাথের ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটা মুখস্থ বলতে পারত ।

চন্দনবাড়ির কাছে দেখেছি, লিদার নদীর জল প্রায় দুধের মতো সাদা । নদীর সঙ্গে আমরা নারীর তুলনা দিতেই পছন্দ করি । কিন্তু লিদার নদীকে দেখে আমার দুর্দান্ত প্রাণশক্তি-সম্পন্ন এক কিশোর বলে মনে হয়েছে ।

একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল । দুপুরবেলা নদীর ধারে একটা পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি আমি । রোদ্দুর একেবারে নরম মখমলের মতো । এক সময় শন শন করে হাওয়া বইতে লাগল । শীত সব সময় বাতাসের সওয়ার হয়ে আসে । বরফ পড়লেও তেমন শীত করে না, বাতাস বইলেই কাঁপুনি শুরু হয় ।

বেশি গরম জামা আনিনি, সব রয়েছে তাঁবুর মধ্যে । সেখান থেকে সোয়েটার-শাল নিয়ে আসার জন্য স্বাতী উঠে দাঁড়িয়েই, এই এই বলে চিৎকার করে উঠল ।

স্বাতীর গলায় জড়ানো ছিল একটা চিত্র-বিচিত্র সিল্কের স্কার্ফ, সেটা হাওয়ায় উড়ে গেছে ।

পাছে পুপলু সেটা ধরতে যায়, তাই এক হাতে তাকে নিষেধ করে আমি ছুটে গেলাম। স্কার্ফটা সুতো কাটা ঘুড়ির মতো দুলতে দুলতে উড়ছে। স্কুল বয়সে আমার খুব ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা ছিল, রাস্তায় অনেকবার ভো-কাট্টা ঘুড়ি ধরার জন্য ছুটেছি। তখন দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না, অনেক ছেলে এই অবস্থায় গাড়ি চাপা পড়ে, আমারও দুয়েকবার সেরকম সম্ভাবনা হয়েছিল।

এবারেও সেরকম হল। স্কার্ফটা যে নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে আমি তা খেয়াল করলাম না। আমার চোখ ওপর দিকে। পিছন থেকে স্বাতী এবং আরও কয়েকজন লোক চিৎকার করছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আমি পড়লাম জলে।

না, ততটা জলে নয়, যাতে স্রোতে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কেউ এসে ধরবার আগেই আমি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম। তবে, অন্ধের মতো ওইভাবে ছুটলে, পাথরে ধাক্কা না খেলে, আমার কপালে ঘোর বিপদ ছিল। স্কার্ফটা জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

পাথরটাই আমাকে বাঁচাল? কিংবা নদী। আমি জানি, কোনও নদীই কোনওদিন আমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে না।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬

লাসা

সমীর রায়

নদী .য ঠান্ডায় জমে গিয়ে ফুটবলের মাঠ হয়ে যেতে পারে, লাসা শহরে না এলে এ অভিজ্ঞতা হয়তো কোনদিনই হত না। শহরের নামে নদী, নাকি নদীর নামেই শহর, এ তথ্য তিব্বতের রাজধানীতে আমাকে কেউ দিতে পারেননি। তবে নদীর সঙ্গে শহরের একাত্মীকরণ দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

লাসা নদী বয়ে গেছে লাসা শহরের প্রায় শরীর বিদীর্ণ করে। তখন জানুয়ারির শীত। নদীর ধার বরাবর সারি সারি পাতাহীন গাছ। পাতা না থাকলেও কয়েকটিতে আবার নানা রঙের মরসুমি ফুল ফুটেছে। তাদের ওপর চড়া রোদের ছটা। ওই একই রোদ নদীর জমে থাকা বরফের ওপরেও। সেই রোদ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বরফ থেকে। ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। কোথাও আবার বরফের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে রামধনুর রঙের বাহার। সেই রঙের ওপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে মাঝপথেই শিলুয়েট হয়ে যাচ্ছে তারা। যেন রঘু রাইয়ের বাওল বয়সের ছবি।

পাতাহীন গাছের ডালে সারি দিয়ে বসে আছে এক দঙ্গল চড়াইপাখি। দেখতে অবিকল কলকাতার চড়াইপাখির মতো। বারো হাজার ফুট উঁচু তিব্বতের এই শহরেও একইরকম ছটফটানি ওদের। অত ঠান্ডাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও। ডাল থেকে ডানা মেলে নদীর মধ্যে চলে যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে আবার ফিরে আসছে ডালে।

নদীর ঠিক মধ্যিখানে ঝকঝকে বরফের ওপর দু'ধারে দুটি গোলপোস্ট পুঁতে একদল শিশু ফুটবল খেলায় মত্ত। স্কেটিং শু নয়, সাধারণ বুট জুতো পরেই খেলছে। দূর থেকে রেফারির বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, অনেক-অনেক বছর আগে রাশিয়া থেকে কলকাতার গড়ের মাঠে খেলা দেখাতে এসেছিল 'হলিডে অন আইস'। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জমানো হয়েছিল বরফ। অথচ লাসা নদীর এমন বরফ হয়ে যাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। এই সময়ে লাসার মানুষ নদী পারাপার করেন সাইকেলে চেপে। এখন লাসা নদীর ওপর মোটর সাইকেলের রেস হয়। নদীর ধারে, যেখানে বরফের আস্তরণ একটু পাতলা, মাইগ্রেটেরি হাঁসেরা সেখানে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে-ঠুকরে বরফ ভাঙছে। সম্ভবত জ্যান্ত মাছ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। তিব্বতী মেয়েরা বরফের ওপর ঘুরে

ঘুরে রোদে চুল শুকোচ্ছে। রক্তিম পোশাকে এক বৃদ্ধ লামা নদীর ওপাড় থেকে এপারে আসছেন ধর্মচক্র ঘোরাতে ঘোরাতে। গায়ে এক ফোঁটাও গরমজামা নেই। অনেক দূরে লাসা ব্রিজের তলা দিয়ে এক ঘোড়সওয়ারকে দুলকি চালে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। এখানকার ঘোড়ারাও বরফের ওপর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। শীতে যেন এখানে বসন্তের চাঞ্চল্য।

এত শীতেও ইওরোপ থেকে লাসা শহরে বেড়াতে এসেছে বেলগ্রেডের মেয়ে রাইসা। আলাপ সেই চেংডু শহরে। জিন জিয়াং হোটেলের ফুটপাতে আর্ট স্কুলের ছেলেমেয়েদের আঁকা পেইন্টিং কিনছিল। ওইসব শিল্পী ছেলেমেয়েদের কিন্তু একটাই বৈশিষ্ট্য। আর্ট স্কুলে পড়েও কিন্তু বিমূর্ত ছবি আঁকতে শেখেনি ওরা। ওই ফুটপাতে বসেও ছবি আঁকছে অবিরাম। এবং যা আঁকছে তার সবকটিই বিশুদ্ধ চাইনিজ পেইন্টিং। বাড়ির ঠাকুরঘরে চন্দন ঘষার পিঁড়ির সঙ্গে যে মোটা চন্দন কাঠটি থাকে, সেইরকম একটি বস্তুকে জলে ভিজিয়ে কাগজের ওপর পাকা হাতে রেখা টানছে তারা। কোনওটি হয়ে যাচ্ছে ইয়াক, কোনওটি গোম্ভা, কিংবা দাড়িওয়ালা কোনও বৃদ্ধ, ছেলেবেলায় ইতিহাসের পাতায় তৈমুরলঙের যেমন ছবি দেখেছি।

মেনল্যান্ড চায়নার চেংডু শহর থেকে আমি আর রাইসা একই বিমানে লাসা এসেছি। রাইসা খেতে ভালোবাসে খুব। শুধু খাওয়াই নয়, মদ্যপানেও ওর যথেষ্ট আসক্তি। তবে আসক্তি না বলে আগ্রহ বলাই ভালো। কারণ কোথাকার খাবার কেমন খেতে, কোন মদে নেশা বেশি হয়, এসব নিয়েই ওর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। লাসায় এসে পর্যন্ত ও খুঁজে বেড়াচ্ছে মাওতাই। এটা নাকি এক ধরনের ঘাস থেকে তৈরি মদ। চেংডুর জিন জিয়াং হোটেলে আমাকে একদিন লাল রঙের একটা মদ খাইয়েছিল। ওটা নাকি ওয়াইন, অথচ ভাত থেকে তৈরি। আমার ধারণা ছিল আঙুর ছাড়া ওয়াইন হয় না। রাইসাও সেটাই জানত। কিন্তু ভাত থেকে তৈরি লাল মদ আমরা ওই দেখলাম। মদের নাম শাওসিং।

খাবার নিয়েও রাইসার উৎপাত অনেক। লাসায় আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেটি হলিডে ইন গোষ্ঠীর। এই হোটেলে খাবার নিয়ে আমার সমস্যা হত খুব। বছর দুয়েক আগেও লাসায় এসে এই একই হোটেলে ছিলাম আমি। তখন আমার খাওয়ার মতো একটি জিনিসই পেতাম মেনুকার্ডে। চিকেন স্যান্ডউইচ। সঙ্গে প্রায় কিলোখানেক কাঁচা গাজরের কুচি। ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত ওই একটি পদ দিয়েই খাওয়া শেষ করতে হত আমাকে। পেট ভরানোর জন্য কাঁচা গাজরগুলোও চেটেপুটে খেয়ে নিতাম। আর গরুর মতো ওই কাঁচা গাজর খেয়ে খেয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হত না।

এবছর এসে দেখছি আমার খাওয়ার উপযোগী আরও একটি পদ রয়েছে এখানে । ইয়াকের মাংসের টিকিয়া দিয়ে মিট বার্গার । কিন্তু সেখানেও রসিকতা অনেক । অর্ডার দেওয়ার সময়ে বলে দিতে হবে আমি গ্রিলড মিট চাই, না সান-ড্রায়েড । তিব্বতীরা রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া কাঁচা ইয়াকের মাংস খেতে খুব ভালোবাসে । সেই মাংস দিয়ে তৈরি বার্গারও পরিবেশন করা হয় এখানে । আমি অবশ্য অর্ডার দিতাম গ্রিলড মিটের । কারণ গরম থাকার ফলে চোখ-কান বুজে গিলে ফেলতাম তাড়াতাড়ি । গাজরের বদলে এই পদের সঙ্গে একগাদা কাঁচা বাঁধাকপির কুচো । নাকে গন্ধ লাগলে মুখের মধ্যে ঠুসে দিতাম এক গোছা ওই কাঁচা বাঁধাকপি ।

রাইসা কিন্তু খেত রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া কাঁচা ইয়াকের মাংস । নতুন জায়গায় এসে নতুন খাবার খেতেই নাকি ওর মজা । মেনু থেকে উদ্ভট সব খাবার বেছে নিয়ে অর্ডার দিত ও । মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হত যে আমার খাবারটা হাতে নিয়ে আমি অন্য টেবিলে গিয়ে বসতাম । ওর পছন্দ করা খাবারের বিটকেল গন্ধ আমি সহ্য করতে পারতাম না । ব্রেকফাস্টে ও প্রায়ই খেত হাঁসের পা-ভাজা । আঙুলসুদ্ধ হাঁসের পাগুলো পাম তেলে ভাজা । আমার সামনে বসে কচকচিয়ে খেত ও । আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিতাম ।

একদিন ডিনারে বসে রাইসা আমাকে বলল, 'আজ যে খাবারটার অর্ডার দিয়েছি সেটা মিং সম্রাটেরা খেতেন । এমন চমৎকার ইনগ্রেডিয়েন্ট বিশ্বের খুব কম খাবারেই পেয়েছি আমি । তুমিও আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো । অবশ্য তুমি তো আবার ইন্ডিয়ান পন্ডিত ।'

আমার খাওয়াদাওয়ার ন্যাটা দেখে রাইসা আমার নাম দিয়েছিল ইন্ডিয়ান পণ্ডিত ।

ভারতীয় এই পণ্ডিতদের সঙ্গে কিন্তু হিমালয়ের একেবারে রক্তের সম্পর্ক । আসলে এই পণ্ডিতেরা হলেন কাশ্মীরি হিন্দু । কিংবা এককালে রাজপুতানা থেকে আগত কুমায়ুনের ভোটিয়ারা । তিব্বতীদের সঙ্গে এঁদের ছিল চমৎকার সম্পর্ক । কয়েকশো বছর আগে থেকেই অন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে তিব্বতীদের সঙ্গে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তার মূল অংশীদার ছিলেন এঁরাই । তিব্বত যখন সকলের জন্য নিষিদ্ধ, তখন ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র এই ভোটিয়া তথা পণ্ডিতদেরই ছিল সেখানে অবাধ গতিবিধি । এমনই একজন পণ্ডিত হলেন নয়ন সিং রাওয়াত । ব্রিটিশ আমলে এঁদের কাজ ছিল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পক্ষে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গোপন জরিপের কাজ চালানো । এক অর্থে গুপ্তচরের কাজ করতেন তাঁরা । তিব্বত তখন নিষিদ্ধ দেশ । বিভিন্ন ছদ্মবেশে তিব্বতে ঢুকে এঁরা ওইসব এলাকার মানচিত্র তৈরি করতেন ।

তিব্বতের এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে নয়ন সিংকে পাঠানো হয়নি । নয়ন সিংয়ের জন্ম ১৮২১ সালে । মানস সরোবর থেকে শুরু করে লাসা পর্যন্ত, এমনকী ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলেও অভিযান চালিয়ে ছিলেন নয়ন সিং । তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন । উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কৈলাস ও মানস সরোবর' গ্রন্থে এব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া আছে । উমাপ্রসাদ লিখেছেন, রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়েছিল কিষেণ সিং রাওয়াতকে । আসলে কিন্তু রায় বাহাদুর পেয়েছিলেন নয়ন সিং । শুধু রায় বাহাদুরই নয়, ১৮৭৭ সালে অর্থাৎ যে বছর রানি ভিক্টোরিয়া 'এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া' হলেন, সেই বছরেই নয়ন সিংকে দেওয়া হয়েছিল 'কম্প্যানিয়ন অফ দি নিউ অর্ডার অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' নামক তকমা । এছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'পেট্রন্স গোল্ড মেডাল' । তাঁর জন্মস্থান মিলাম গ্রামে তাঁকে জায়গীর দেওয়া হয় । নয়ন সিংয়ের মৃত্যু হয় ১৮৯৫ সালে ।

উমাপ্রসাদের গ্রন্থে এমন তথ্যের অসম্পূর্ণতা আরও অনেক । মানস সরোবরের প্রথম ব্রিটিশ আবিষ্কারক হিসেবে তিনি মুরক্রফেটর নাম উল্লেখ করেছেন । কিন্তু ওই অভিযানে তাঁর সহযাত্রীটিকে তিনি শুধু 'সঙ্গী' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন । সম্ভবত ওই সঙ্গীটির নাম তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি । তিনি বোধহয় জানতেন না যে ওই সঙ্গীটিও ছিলেন বিখ্যাত এক সৈনিক এবং অভিযাত্রী । ১৮০৮ সালে উইলিয়াম ওয়েবের সঙ্গে একটি অভিযানে গিয়ে তিনি নদীর উৎস খুঁজে বার করেছিলেন । এই 'সঙ্গী'-র নাম ছিল হায়দার জং হিয়ারসে ।

হায়দার জং-এর পরিচিতি ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিসেবে । তাঁর পিতা ছিলেন খাঁটি সাহেব । কিন্তু তিনি দুটি বিবাহ করেছিলেন । তাঁর খাঁটি মেমসাহেব স্ত্রী থাকতেন ইংলন্ডে । কিন্তু ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করতে এসে তিনি ভারতীয় এক জাঠ রমণীকে বিবাহ করেন । হায়দার জংয়ের জন্ম ওই জাঠ রমণীর গর্ভে । সেকালে ভারতবষের সামন্ত রাজারা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে চাকরি দিতেন গোরা সাহেবদের । হায়দার জং-এর প্রথম চাকরি ওই ভাড়াটে সৈন্য হিসেবেই, এক মারাঠা রাজার কাছে, জেনারেল পেরনের অধীনে । কিছুকাল মধ্যপ্রদেশের সিন্ধিয়া পরিবারেও কাজ করেছিলেন তিনি । বিয়ে করেছিলেন ক্যাম্বের রাজকুমারী জুহুর-উল-মিসাকে । তাঁর জায়গীর ছিল বেরিলিতে ।

১৮১২ সালের মে মাসে মুরক্রফট এবং হায়দার জং ভোটিয়া বণিকের ছদ্মবেশে তিব্বতের পথে রওয়ানা হন । তাঁরা তিব্বতে ঢোকেন নিতি গিরিপথ পার হয়ে । তারপর

গার্টোক হয়ে দারচেনের মধ্য দিয়ে ঘুরপথে মানস সরোবরে পৌঁছন আগস্ট মাসে। হায়দার জং এবং মুরক্রফটই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, মানস সরোবর কোনও নদীর উৎস নয়। মানুষের এতদিনের ধারণা ভুল।

উমাপ্রসাদ জাপানি পরিব্রাজক একাই কাওয়াগুচির মানস সরোবর অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, কলকাতা থেকে দার্জিলিং হয়ে কাওয়াগুচি মানস সরোবর রওয়ানা হন। কিন্তু একাই কাওয়াগুচি কলকাতা থেকে কেন দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সে তথ্য সম্ভবত উমাপ্রসাদ জানতেন না। কাওয়াগুচি আসলে ছিলেন পরিব্রাজক, অভিযাত্রী নয়। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন বৌদ্ধগয়া দর্শন করতে। সেখান থেকেই খবর পেয়ে তিনি দার্জিলিং গিয়েছিলেন গুরুর সন্ধানে। দার্জিলিং শহরে তখন থাকতেন বিখ্যাত বাঙালি টিবেটোলজিস্ট শরৎচন্দ্র দাশ। দীর্ঘ ১৩ মাস দার্জিলিং শহরে বসে শরৎচন্দ্রের অধীনে তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির তালিম নিয়েছিলেন তিনি। তারপর মূলত শরৎচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই তিনি মানস সরোবরের পথে রওনা হন। এটা ১৮৯৯ সালের কথা। মানস সরোবর থেকে কাওয়াগুচি পৌঁছে যান লাসা শহরে। তিব্বতে দীর্ঘ ২ বছর কাটিয়েছিলেন তিনি। ১৯০১ সালে তিব্বত থেকে ফেরার সময়ে কাওয়াগুচি আবার আসেন দার্জিলিং শহরে, শরৎচন্দ্রের অধীনে তাঁর তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির তালিম শেষ করতে। সেবারেও দীর্ঘকাল দার্জিলিং শহরে কাটান তিনি। কারণ যতদূর জানা যায়, ১৯০৩ সালের আগে কাওয়াগুচি জাপানে ফিরে যাননি। কাওয়াগুচির প্রসঙ্গ এনেও উমাপ্রসাদ এতবড় একটা বাঙালি মহিমার কথা এড়িয়ে গেলেন কীকরে জানি না! আসলে উমাপ্রসাদ এসব খবর জানতেন না। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথির ভাণ্ডারে তিনি এসব তথ্য খুঁজে পাননি।

শরৎচন্দ্র দাশ যে তখন কত বিখ্যাত তার একটা চমৎকার উদাহরণ দিই। রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের 'কিম' গ্রন্থে একটি বাঙালি চরিত্র হল বাবু-গুপ্তচর হরিচন্দর মুখার্জি। হরিচন্দর ছিলেন কিম্বাল ও'হারার গুরু। গুরুর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিম্বালও ভেবেছিলেন তিব্বতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজকে কিছুটা সাহায্য করবেন। প্রায় কাওয়াগুচির ঘটনার মতো। রুডইয়ার্ড কিপলিং বহু জায়গায় স্বীকারও করে গেছেন যে তিনি হরিচন্দরের চরিত্রটি এঁকেছিলেন বাবু শরৎচন্দ্র দাশের কথা ভেবেই। সেটা ১৯০০ সাল।

যাকগে, ইতিহাস আওড়াতে গিয়ে রাইসা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। রাইসার সঙ্গে সেদিনের ডিনার খাওয়ার কথা বলি। কিছুক্ষণ পরে একটি বিশাল চিনেমাটির বাটিতে খাবারটি পরিবেশন করা হল। বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে বাটির মধ্যে

কী আছে দেখতে গেলাম। রাইসা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, চায়ের লিকারের মধ্যে পনেরোটি কচি হাঁসের মুণ্ডু সিদ্ধ করা। আমি হতবাক। হাঁসের শুধু মুণ্ডুই নয়, ঠোঁটগুলিও যেমন থাকে ঠিক তেমনই। আর ওপরে কর্পূরের গুঁড়ো ছড়ানো। এমন বিদঘুটে খাবার আমি জীবনে কখনও দেখিনি। চায়ের লিকারের সঙ্গে হাঁসের মুণ্ডুর কী সম্পর্ক সেটাও বুঝলাম না। রাইসা আমাকে ভাগ দিতে যাচ্ছিল। আমি হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। আমার তখন প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। খাবারের নাম নাকি জাংচা ইয়াসি। মনে মনে ভাবলাম, মিং সম্রাটেরা সম্ভবত বনমানুষের স্পিসিস ছিলেন। রাইসাও তাই।

রাইসা যে প্রকৃত অর্থে মনুষ্য নয় সেটা আরও বেশি করে বুঝেছিলাম ওর সঙ্গে পোতালা প্রাসাদ দেখতে গিয়ে। পোতালা প্রাসাদে পৌঁছতে হয় প্রায় হাজারখানেক সিঁড়ি ভেঙে। ছোটবেলা থেকেই বড় বড় অভিযাত্রীদের কাছ থেকে শিখেছি, উঁচুতে উঠতে হয় ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতে নিতে। আমিও তাই করছিলাম। রাইসা কিন্তু সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল প্রায় একশো মিটার দৌড়ের স্পিডে। বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে পিছন ফিরে আমাকে একবার ঠাট্টা করে আবার দৌড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেল রাইসা। আমার সঙ্গে ওর আবার দেখা হল প্রায় দেড় ঘন্টা পরে, দলাই লামার ঘরের নিচের উঠোনে। ও তখন ছবি তুলতে ব্যস্ত। এমন প্রাণশক্তি বোধহয় বনমানুষেরও হয় না। উঠোনে প্রায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রাইসা তখন ওপরে দলাই লামার ঘরের বারান্দার ছবি তুলছে, যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দলাই লামা সকলকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন।

আমি আর রাইসা লাসার বারখোর বাজারে গিয়েছিলাম, এখনও সেখানে টাটকা শিকার করা বাঘের ছাল বিক্রি হয় কিনা দেখতে। সেই বাজারে একগাদা বড় বড় পুঁতির মালা কিনে গলায় পরে ফেলল রাইসা। মাথায় টিকলির মতো ঝুলিয়ে নিল প্রায় পিংপং বলের আকারের একটা সবুজ পুঁতি। তারপর হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল মাটিতে। বলল, বারখোর বাজার থেকে জোখং মন্দির পর্যন্ত দণ্ডি কেটে যেতে চায় ও। তিব্বতীরা যদি কয়েকশো কিলোমিটার ধরে এইভাবে জোখং মন্দিরে আসতে পারে তাহলে ওই বা পারবে না কেন। বোঝ ঠ্যালা! ওর যাবতীয় ব্যাগ এবং রুকস্যাক তখন আমার ঘাড়ে। রাইসা দণ্ডি কাটছে। আমি প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতো গুটিগুটি পিছনে হাঁটছি। কাণ্ড দেখে স্থানীয় তিব্বতীরা জড়ো হয়ে গেল সেখানে। তাদের মুখে খিলখিল হাসি। সেই জনতাও পিছু নিল আমাদের। একজন বয়স্ক তিব্বতী কী এক মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিল। সেও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

শেষবারের মতো দণ্ডি কেটে রাইসা যখন জোখং মন্দিরের চৌকাঠ পার হল, সমবেত জনতা তখন সজোরে হাততালি দিতে শুরু করেছে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করল রাইসাও। ও প্রচণ্ড উত্তেজিত। আমি শুধু ওর মুখের দিকে তাকালাম। সারা মুখে ধুলোর আস্তরণ। চুলের সামনের দিকটায় কে যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে খানিকটা। ভুরু দুটো মনে হচ্ছে যেন ধুলো দিয়েই তৈরি। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে ওর নাকের। যেন জোকারের মতো নাকের ওপর একটা ধুলোবালির বল বসিলে দিয়েছে কেউ। জনতার দিকে তাকিয়ে রাইসা বলল, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। জনতার আবার হাততালি। এটা ও লাসায় এসে শিখেছে। কিন্তু ওর সাহেবি উচ্চারণে কথাটা শোনাল অনেকটা এইরকম: অং মানিপাডমে টুঁন।

জোখং মন্দিরের ভেতরে ঢুকলে গা শিউরে ওঠে। সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেন বিশালকায় এক গুহা। আলো বলতে শুধু শত শত চর্বির প্রদীপ। চতুর্দিকে চাপা স্বরের মন্ত্রপাঠ। কেউ প্রদক্ষিণ করছেন। কেউ চর্বির বাতি জ্বালছেন। কেউ কেউ সাষ্টাঙ্গে মাটিতে শুয়ে। পুরো মধ্যযুগীয় পরিবেশ। বৌদ্ধভিক্ষু হতে গেলে এই মন্দিরে এসেই সর্বস্ব দান করে দিতে হয়। এই মন্দির থেকেই দেওয়া হয় ভিক্ষাপাত্র। সেই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষুকের জীবন শুরু করতে হয় সর্বপ্রথম এই মন্দিরের সামনে বসে ভিক্ষা করে। সম্যক কৃচ্ছসাধন।

পুরনো লাসা শহরে এখনও খচ্চরে টানা কাঠের চাকা লাগানো মালগাড়ি চলে। সহিসের পোশাক এবং চেহারা দেখলে মনে হবে এইমাত্র কাওয়াগুচির সঙ্গে দর কষাকষি করে এল। সেই দুশো বছরের ট্র্যাডিশন এখনও অটুট। মালবোঝাই ইয়াককে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিব্বতী শিশু। তিব্বতী রমণীর সারা গায়ে লর্ড ক্লাইভের আমলের অলঙ্কার। এসব দৃশ্য এখনও কিছু কিছু চোখে পড়ে লাসা শহরে।

১৯৫২ সাল তিব্বতের ইতিহাসে অভিশাপের বছর। ওই বছরেই তিব্বত চলে গেল চিনের অধীনে। ওই বছরেই মারা গেলেন আরেক বিখ্যাত তিব্বত-অভিযাত্রী সোয়েন হেডিন। ওই বছরেই ভারতীয়দের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল তিব্বতের দরজা। লাসা, কৈলাস কিংবা মানস সরোবর বাঙালির কাছে হয়ে গেল অতীতের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পুনরায় বাস্তব হতে সময় লেগে গেল প্রায় তিরিশ বছর। ১৯৮০ সালে চিন সরকার ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য আবার খুলে দিলেন দরজা। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ২০ জনের একটি তীর্থযাত্রীর দল লিপুলেখ দিয়ে মানস সরোবরে পৌঁছলেন। ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন আরেক পণ্ডিত, কিষেণ সিংয়ের নাতি এস সি রাওয়াত। কালক্রমে বাঙালিদেরও উৎসাহ বেড়ে গেল। নেপাল-চিন সীমান্ত

দিয়ে না হেঁটে জাপানি জিপে চড়ে কৈলাস ও মানস পৌঁছে গেলেন কয়েকশো বাঙালি । সেই ট্র্যাডিশন এখনও চলছে । এই বছরেও ওই পথে তীর্থ করে এসেছেন প্রায় চল্লিশজন বাঙালি । লাসাতেও পৌঁছেছেন কয়েকজন । শিগার, শিগাৎসে এবং গিয়ান্তসে হয়ে ।

আমি আর রাইসা লাসা থেকে ঝাংমু এসেছিলাম ওই একই পথে, জাপানি জিপে চড়ে । রাইসাকে নিয়ে পথে আরও কত কাণ্ড ঘটেছিল সে আরেক ইতিহাস । রাইসার হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে । কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকতে চায় না, রাইসার মতো এমন বিচিত্র মেমসাহেব বউদের সাহেবরা সামলায় কী করে? যাদু জানে বোধহয় । কী জানি!

ভ্রমণ অক্টোবর, ২০০১

২ ন. র লোভালোয়া স্ট্রিট

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মালাকফ, লোভালোয়া

আমি, শিপ্রা আর আমার বন্ধু মারী ক্রিস্টিন টেলিফোনে অনেকক্ষণ আপনার কথা বলাবলি করেছি, সামনের শনিবার আমরা নৈশভোজেও মিলিত হব ।

আমার বাড়িতে থাকার ব্যাপারে আপনি একেবারেই ভাববেন না, কেননা সবকিছুই আপনার জন্য একদম ঠিকঠাক থাকবে । এক শয্যার ঘর, সহজ স্বাভাবিক খাবার, শান্ত ফ্ল্যাট, মেট্রোর কাছেই । আমরা, মানে আমার দুই ছেলে (২০ এবং ২২) আর আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি । -শ্রদ্ধা সহ, মোনিক ক্রুফের

প্যারিসের লাগোয়া শহর লোভালোয়া থেকে ফ্যাক্সে পাঠানো এই চিঠির লেখিকা মোনিক ক্রুফের মারী ক্রিস্টিনের বন্ধু, মারী ক্রিস্টিন শিপ্রা ঘোষের বন্ধু, শিপ্রা ঘোষ আমার মেয়ে মৈত্রেয়ীর 'মাদাম ঘোষ' । তাঁর উদ্যোগেই আমার এই থাকার ব্যবস্থা ।

মৈত্রেয়ী ফরাসি ভাষায় কী একটা বাহাদুরি দেখিয়ে আলিয়াঁস ফ্রঁসেজ আর এয়ার ফ্রান্সের নেমন্তন্নে প্যারিস গিয়েছিল, সেই সূত্রে মালাকফের মাদাম ঘোষের সঙ্গে তার দহরম মহরম । এবার মৈত্রেয়ীর সূত্রে, আমি প্যারিস যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে তাঁর মালাকফের বাড়িতে প্রথম দিনই ডালভাতের নেমন্তন্ন করে দিলেন । মালাকফ থেকে মঁপারনাসে এসে আমাকে মালাকফে নিয়ে যাবেন । সেখানে মধ্যাহ্নভোজের পর আমাকে পৌঁছে দেবেন লোভালোয়ায় মোনিকের বাড়িতে । ভোজনের চেয়েও ভোজনান্তের এই দক্ষিণাটিতেই আমার বেশি লোভ ছিল । কেননা কোথায় মালাকফ, কোথায় লোভালোয়া, কোথায় বা লোভালোয়ায় ক্রুফেরের নিবাস, সে-বিষয়ে আমি বেশ ধন্দে ছিলাম ।

চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার ফ্রান্সের বাসে মঁপারনাস পৌঁছে বাসস্টপে একমাত্র বাঙালি মহিলা দেখে মালাকফের মাদাম ঘোষকে আমার আর খুঁজে ফিরতে হল না ।

আমি এর আগে কখনও প্যারিসের বাইরে কোথাও যাইনি । যতবারই শিল্প-সাহিত্য-স্বাধীনতার এই দেশে এসেছি, প্রত্যেকবারই শুধু প্যারিসেই ঘুরেছি, তাও আবার দিনের

বেশিরভাগ সময় কেটেছে লা ফিগারো, ল্য মঁদ, ল্য পারিসিয়ঁ প্রভৃতি খবরের কাগজের অফিসে, কখনও-বা সংবাদপত্রের আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর-তখনকার International Federation of Newspaper Publishers, সংক্ষেপে FIEJ বা এখনকার World Association of Newspapers, সংক্ষেপে WAN-এ । যাক, সে অন্য প্রসঙ্গ ।

মালাকফে এসে প্রথমেই আমার ভালো লাগল, এখানে প্যারিসের মতো লোকজন গাড়ি-ঘোড়া দোকান-বাজারের ভিড় নেই! অথচ মঁপারনাস থেকে মাত্রই আধ ঘণ্টার রাস্তা ।

মাদাম ঘোষের বাড়ি যেতে বাসরাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে হয় সরু মতো ছোট একটা বাঁধানো পথে, সেই পথের ওপরেই বাড়ির গেট, পথটি যেন একটা ব্যক্তিগত চিঠির মতো নির্জন ।

মাদাম ঘোষ বাগানমুখী একটা ঘর দেখিয়ে আমাকে বললেন, এই আপনার শোবার ঘর, একটু অসুবিধা হয়তো হবে, কিন্তু জানলা দিয়ে চাঁদ দেখতে পাবেন ।

ওই জানলা দিয়েই বাগান দেখিয়ে বললেন, ওখানে বেড়াবেন, চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, যত খুশি বই পড়বেন, যখন ইচ্ছে লিখবেন ।

আমার পাশের ঘরেই থাকেন বিশালকায় এক মার্কিন মহিলা । সদ্য ইস্তাম্বুল থেকে ঘুরে এসেছেন ।

বাগানটা বাড়িটার মতোই চওড়া, কিন্তু লম্বায় চার-পাঁচ গুণ বড় । লেটুস লঙ্কা আলু পেঁয়াজের সবুজ পাতায় স্নিগ্ধ হয়ে আছে । এত লেটুস গাছ এর আগে কখনও দেখিনি । আরেকটি সতেজ সবুজ বড় বড় পাতার গাছও খুব হয়েছে, কাঁচা কুমড়োর মতো ফসল ফলে আছে, শুনলাম এগুলো আমাদের কুমড়োরই খানিকটা ফরাসি সংস্করণ । নাম কুর্জেৎ । ফলের গাছও অনেক । একটা ন্যাসপাতি গাছ কচি কচি ন্যাসপাতিতে ভরা । আগস্টের শেষে পাকবে ।

বাগানের অর্ধেক মাদাম ঘোষের, বাকি অর্ধেক নিচতলার ফরাসি দম্পতির । এত রকম সবজি, এত ফল, খাবার লোক কই? তার ওপর, নিচের দম্পতিটি আগামী সপ্তাহে তাঁদের দুটি পুত্র-কন্যা সহ দেশের বাড়ি যাচ্ছেন নিজেদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন করতে । ফিরতে মাস পাঁচেক দেরি হবে । ওই সময় তাঁদের পরিবারে একটি নতুন সদস্য আসবার কথা, বর-কনের ইচ্ছে সেটিকে একেবারে কোলে নিয়ে ফেরেন ।

ফলে আমি রোজই প্রচুর পরিমাণে লেটুস বা স্যালাদ পাতা খেতাম । ছড়ানো বাঁধাকপির মতো, বড় বড় পাতার আস্ত একেকটা গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়ে রান্নাঘরের সিঙ্কে

কল খুলে রেখে দিলে সব মাটি ধুয়ে যায় । এমন বাগান-তাজা স্যালাদ পাতা প্রবাসে আমার ভাগ্যে ছিল আমি স্বপ্নেও ভাবিনি । তার ওপর কুচো চিংড়ি দিয়ে কুর্জেতের তরকারি!

আমার যেদিন এখানে আসবার কথা ছিল, আমি এসেছি তার দুসপ্তাহ পরে । মোনিক ইতিমধ্যে বাইরে গেছেন । ফিরবেন আগামী সপ্তাহে । অতএব এই এক সপ্তাহ এখানেই নাকি আমার থাকার ব্যবস্থা ।

এমনও হয় নাকি? তাছাড়া আমি এখানে থাকব কী হিসাবে?

'আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসাবে ।'

মাদাম ঘোষের এই চটজলদি উত্তরে সম্মতি জানানো আমার পক্ষে কঠিন, অসম্মত হওয়া আরও কঠিন । আতিথ্য ও সম্মান এভাবে দায়ে পড়েও জোটে কে জানত!

রূপবতী মেছুনি

যে দেশেই যাই, সেখানকার গ্রাম আর হাটবাজারে না ঘুরলে আমার মন ভরে না । শুনে মাদাম ঘোষ প্রথমেই আমাকে নিয়ে গেলেন কাছেই একটা মার্শে বা বাজারে । মাছ-মাংস, শাক-সবজি, মশলা-মনোহারী, ফুল-ফল, জামা-কাপড়, ঘর-গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে । সবই ঢাকা বাজারে আলাদা আলাদা স্টলে । মাছের স্টলের পাশেই বইয়ের স্টল । আর মেছুনির কথা আর কী বলব, মনে হয় রোজই একবার মাছ কিনতে যাই ।

কুড়ি-পঁচিশটা সার্ডিন মাছের ভাগা ১০ ফ্রাঁ, আমি একটু এগোতেই পরমাসুন্দরী মৎস্যকন্যা বলল, দুভাগাই নিয়ে যান না, দাম কম দেবেন ।

এই মার্শে সকাল আটটায় বসে, ভাঙে দুপুর একটায় । বেলা যত বাড়ে জিনিসপত্রের দামও তত কমতে থাকে । অবিক্রিত জিনিস ফেরত নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেচে দিয়ে যা পাওয়া যায় তাই লাভ । একদিন তো হাট ভাঙার মুখে ফরাসি ১০ টাকায় চোদ্দটা দেড়বিঘতি সোনার বরণ কলা পাওয়া গেল । এক ঝুড়ি ক্যাপসিকামই হোক কিংবা গরুর শিঙের মতো এক ঝুড়ি প্যাপরিকা বা ঝুড়িভর্তি চকচকে বেগুন-সবই লোকেরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে দশ-দশ টাকায় । এ যেন যা নেবে তা দশ টাকা! আভোকাডো, ফরাসিতে আভোকা (Avocat) অনেকটা ছোট আকারের মেটে আলুর মতো, কাঁচা খেতে হয়, কালো রঙের খোসা ছাড়িয়ে নিলেই মাখনের মতো নরম পদার্থটি আলাদা বা স্যালাদের সঙ্গে অতি সুস্বাদু, ঢেলে বিক্রি হচ্ছে ।

সপ্তাহে দুদিন হাট । রবিবার আর বুধবার । যে কদিন গেছি, রোজই দেখেছি, হাটে ঢোকবার মুখে কয়েকজন আফ্রিকান মেয়ে-পুরুষ তাঁদের দেশের হস্তশিল্প নিয়ে বসে আছেন । কুচকুচে কালো ওইসব দারুমূর্তি দেখতে দেখতে চোখে ঘোর লেগে যায় ।

এক রবিবার আরও অবাক ব্যাপার । মূর্তি দেখে, রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখি কনের সাজে এক অপরূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় নারী, তার পাশেই আরেক অপরূপ শ্বেতাঙ্গিনী, এঁরও কনের সাজ । দুজনের সঙ্গে অল্প কয়েকজন আত্মীয়স্বজন, মনে হয় সকলেই সামনের গির্জা থেকে বেরিয়ে গাড়ির অপেক্ষা করছেন । আমার সঙ্গে সেদিন ক্যামেরা ছিল না বলে মানবসমাজের একটা আশ্চর্য সুন্দর ছবি আমি চিরকালের মতো হারালাম ।

বনের ধারে গ্রাম

গ্রামটির নামই 'বনের ধারে' (La Lisi'ere des bois) । গার দ্য লেস্ত (Gare De L'est) বা পুবের ইস্টিশন থেকে সকাল ৮-২৮-এর ট্রেনে গেলাম থ্রোয়া (Throyes), প্যারিস থেকে ১৭০ কিলোমিটার । কথামতো স্টেশনে হাজির জিল আর তার বড় মেয়ে, তাঁদের গাড়ি নিয়ে । জিল প্যারিসের কাছেই একটা স্কুলে ইতিহাস পড়ান, প্যারিসেও তাঁদের বাড়ি আছে-পোঁ দ্য স্যাংক্লু (Pont De St. Cloud) অর্থাৎ সাধু মেঘের জায়গায় ।

জিলের বউ রোজি বাংলাদেশী মেয়ে । নদীর দেশের শ্যামলা মেয়ে ফরাসি স্বামী শাশুড়ি নিয়ে দিব্যি সুখে ঘরকন্যা করছেন । ছেলেমেয়েরাও ভাষায় চেহারায় ফরাসি, শুধু বড় মেয়ে বাঙালি, রোজির প্রথম পক্ষের সন্তান ।

থ্রোয়া থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে 'বনের ধারে' গ্রামে জিল-রোজিদের খামার বাড়ি । জিল আর রোজি তাঁদের ছটি ছেলেমেয়ে আর ছেলেমেয়েদের ৮২ বছর বয়স্কা ঠাকুমাকে নিয়ে এখন মাসদুয়েক এখানে থাকবেন । আমি এঁদের অতিথি । আজকের দিনটা এঁদের সঙ্গে কাটাব ।

প্রথমে হাটদর্শন, তারপরই এই শ্যাম্পেন অঞ্চলের গ্রামে জিল-রোজিদের আতিথ্য-বলাবাহুল্য এ-ও মাদাম ঘোষের উদ্যোগে ।

জিলের বড় মেয়ে সবে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে, সে আর তার বাবা আমাকে থ্রোয়ায় দ্বাদশ শতকের একটা সুন্দর গির্জায় নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠাভরে তার স্থাপত্য ভাস্কর্য ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব শোনাল । এটি থ্রোয়ার সবচেয়ে প্রাচীন গির্জা, নাম ম্যাদলিনের গির্জা । এখান থেকে বেরিয়ে ক্রমে গোটা থ্রোয়া শহরটা ঘুরে দেখাল । ভারি নিরিবিলি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অথচ প্রাচীনতার ঘ্রাণটিও মুছে যায়নি ।

জিলদের গ্রামের বাড়ি অনেকটা জায়গা নিয়ে, বেশ ছড়ানো-ছিটানো । বড় বাগান, ছোট সবজি খেত, তারপর খোলা প্রান্তর, গাছপালা ও গভীর বন । আদিতে এটা ছিল একটা আস্তাবল । জিলের ঠাকুরদা এটা কিনে বাসগৃহে রূপান্তর করেন । ঠাকুরদার পর বাবা, বাবার পর জিল নিজেও সেই রূপান্তরের কাজ করে চলেছে ।

জিলের মা এই বয়সেও নিজের হাতে খেত পরিচর্যা করেন । আমাকে তাঁর সবজি খেতে ডেকে নিয়ে নানারকম শাক-সবজি ফলানোর কথা শোনাতে লাগলেন । তাঁর কোদাল ও নিড়ানি চালানো দেখে আমি হতবাক । আমিও শেষ পর্যন্ত হাত না লাগিয়ে পারলাম না ।

আলু গাছের গোড়ার মাটি আলগা করতে করতে বললেন, শীতকালে সব যখন বরফে ঢেকে যায়, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি সবাই যখন প্যারিসে, এত বড় বাড়িতে তখন আমি একাই থাকি । অবশ্য আমার ছোট ছেলে এখানেই থাকে, তার আবার থ্রোয়াতে দোকান, থ্রোয়ার নিজস্ব জিনিসপত্র কেনাবেচা করে । এই বাড়ির ওই দিকটায় সে থাকে ।

ঠাকুমা কথা বলছিলেন ফরাসিতে, কোথাও কোথাও আমি বুঝতে পারছি না দেখে ঠাকুমার বড় নাতনি আমাকে বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল ।

বাড়ি দেখে মুগ্ধ তো হয়েই ছিলাম, তার ওপর এঁদের আদর-আপ্যায়নের যেন সীমা নেই । চারদিকে গাছপালা, বাড়ির কোনও কোনও ঘর আস্তাবলের আদলেই সাজানো, অবিভক্ত বাংলার গ্রামের বাড়ির উত্তরের ভিটে দক্ষিণের ভিটের মতো ছড়ানো বাড়ি, মস্ত উঠোন, তার মধ্যেই টেবিল চেয়ার সাজিয়ে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা ।

খাওয়ার পর ফলন্ত পীচগাছের তলায় রঙিন খাটিয়া পেতে আমার বিশ্রামের আয়োজন করা হয়েছে । চিত হয়ে শুয়ে গাছের পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে টলটলে নীল আকাশ দেখতে দেখতে ভাবি, আকাশ যেমন সব দেশের ওপরেই আকাশ, মানুষের হৃদয়-মনও তেমনই সব দেশেই এক । তা না হলে গতকালও যাঁদের চিনতাম না, আজ তাঁদের বাড়িতে এমন আনন্দে আমার কাটছে কীভাবে?

সবচেয়ে ছোট ছেলেটা ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, খাটিয়ার তলায় ঢুকে সে তার ছোট্ট মাথা দিয়ে আমার পিঠে ঢুঁ মারছে । একেক বার ঢুঁ দিচ্ছে আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করছে, বোধহয় ভাবছে আমি চমকে লাফিয়ে উঠব । আসলে সারাদিন সংকোচে দূরে থেকেছে, অন্যান্য ভাইবোনদের মতো আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি, এখন আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা ।

বিকেলে জিল আমাদের গাড়ি করে ছেড়ে এল বনে ঢোকবার মুখে । রাস্তায় খেলাধুলা করে খালি গায়ে ঘরে ফিরছে গাঁয়ের মানুষ । আরেক দল যুবক ও মাঝবয়সী পুরুষ লোহার বল ছুড়ে ছুড়ে খেলছে ।

ছোট দুই মেয়ে আর সবচেয়ে ছোট ছেলেকে নিয়ে রোজি চলেছে আমাকে বন দেখাতে ।

ঘণ্টাখানেক বাদেই সেই আদি-অন্তহীন অরণ্যে আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম । যাই হোক বার কতক দিক বদলে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই লোহার বল খেলার জায়গায় ফিরে এলাম, জিল এখানেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ।

শেষ বেলার ভূরিভোজনের পর আবার সন্ধের মুখে নৈশাহার । এবেলা বাড়ির বাগানে গর্ত করে উনুন বানিয়ে কাঠের আগুনে রান্না, আমি তবু নিরুপায়, কিন্তু না খেলে নাকি চলবেই না । এখনই খিদে না হলে, বেশ তো, আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলেই মুশকিল আসান!

তাছাড়া রোজি শাদা ঘোড়া, হীরু ডাকাত, পাখির খাতার লেখককে এভাবে যেতে দেবেই বা কেন? এসব বই রোজির অনেকবার করে পড়া ।

আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম । এত দূরের দেশে এসব অকিঞ্চিৎকর বই আসবে কোত্থেকে, পড়বেই বা কে?

এও সেই মালাকফের মাদাম ঘোষের কারসাজি । তিনিই রোজিকে বই দিয়েছেন । রোজি এমনিতেও বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠিকা, সতীনাথ ভাদুড়ির ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ তার সবচেয়ে প্রিয় বাংলা উপন্যাস ।

থ্রোয়া থেকে ‘বনের ধারে’ গাঁয়ে যাবার সময় সূর্যমুখী খেত চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল । মাঝে মাঝেই গম খেত, তার মধ্যেই হঠাৎ ল্যাভেন্ডারের খেত ।

যাবার সময় দেখতে দেখতে গেছি, ফেরার পথেও চোখ সরাতে পারি না । জিল বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছে, ট্রেন ধরাতে হবে, যদিও নিতান্ত অনিচ্ছায় । ঘড়িতে বোধহয় রাত আটটা, আকাশে তখনও আলো, সূর্যমুখী ল্যাভেন্ডার তেমনই আনন্দের রঙে রাঙা, এবার একটু যেন বিষাদও মিশে আছে ।

বির হাকিম আর আইফেল টাওয়ার

শুনলাম অপেরার কাছেই একটা ব্যাঙ্কে ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙালে একটু বেশি ফ্রাঁ পাওয়া যায় ।

চেক ভাঙিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই আনন্দে মন ভরে গেল । ফ্রাঁ কম পেলাম, না বেশি পেলাম, আমার মন তখন সে হিসাব মেলাতে রাজি নয় ।

ব্যাঙ্কের সামনেই বিখ্যাত অপেরা, সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে আছে এই দুনিয়ার প্রায় সব দেশের জনমানব । অপেরার সামনে রাস্তা ছোঁয়া সুদীর্ঘ কাফে দ্য লা পে (Cafe De la Paix) বা শান্তির কফিখানা । ফুটপাতেই একটা টেবিল দখল করে এক কাপ কফি নিয়ে বসলাম । সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে দেশ-দেশান্তরের, ধর্ম-ধর্মান্তরের, ভাষা-ভাষান্তরের, পোশাক-পোশাকান্তরের শুধু মানুষ আর মানুষ । ছোট্ট এক পেয়ালা কফির দাম ২০-২৫ ফ্রাঁ, আমাদের পক্ষে বেশ দামিই, কিন্তু সামনের চলমান মানবমেলার ছবিটি আরও মূল্যবান ।

একদিন শাঁজে লিঁজে থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম প্লাস দ্য লা কনকর্দ । আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পালে রইয়াল ম্যুজে দ্যু লুভর, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের লুভর মিউজিয়াম । প্লাস দ্য লা কনকর্দে ওবেলিস্ক বা মিশরী মিনারের নিচেই গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল ষোড়শ লুই আর তাঁর রানি মারী আঁতোয়ানেতের ।

প্যারিস এমনই একটা শহর যেখানে দিনের পর দিন একা একা ঘুরে বেড়ালেও শহর কখনও শেষ হয়ে যায় না, বরং যেন পরতে পরতে আরও খুলে যায় । আমি তাই কাজে-অকাজে পথে পথে ঘুরে বেড়াই । রাতে মোনিকের বাড়িতে, আমার ঘরের বইয়ের সংগ্রহ থেকে বেছে বেছে ইংরিজি বইগুলো পড়ি ।

মাদাম ঘোষ একদিন দুপুরে আমাকে নিয়ে গেলেন মঁমার্ত্র, বাজিলিক দ্য সাক্রে-ক্যর অর্থাৎ পবিত্র হৃদয় গির্জায় । তার কাছেই সালভাদোর দালির মিউজিয়াম-এসপাস মঁমার্ত্র । দালির মূল ছবি ও ভাস্কর্য দেখে সারা বেলা কাটাতে চাইলেও সেটা এখানে আর কিছুমাত্র অসম্ভব নয় ।

পরদিন নিজের কাজকর্ম শিকেয় তুলে মেট্রোর লাইন বদলে বদলে আমাকে প্রায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ত্রোকাদেরো (Trocadero), পাসি (Passy) হয়ে বির হাকিম (Bir Hakeim)-এ । এই মেট্রো স্টেশন থেকে সামান্য হাঁটলেই আইফেল টাওয়ার । চত্বরে মানুষের মেলা বসেছে, বলা যায় যৌবনের মেলা ।

বেলারুশের সারসতুল্য একদল বালিকাকে দেখে তাদের ছবি তোলবার জন্য ভাব জমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার দরকার হল না, তাছাড়া আমার স্বনিযুক্তা দোভাষীর

ফরাসি এদের কাছে অচল, এদের রুশ ভাষাও আমাদের অবোধ্য।

ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার ভঙ্গি করতেই মেয়েরা পরমানন্দে সারি দিয়ে বসল, দাঁড়াল, নাচের ভঙ্গিতে দুজন দুদিকে পেখমের মতো পোশাকের প্রান্ত মেলে ধরল। আমরাও তাদের সঙ্গে ছবি তোলালাম। অনেক চেষ্টায় একটি মেয়ের ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বুঝলাম এরা সবাই সামারে প্যারিসে বেড়াতে এসেছে, কালই দেশে ফিরে যাবে।

তুর ইফেল বা আইফেল টাওয়ারেরও ছবি তুললাম। টাওয়ারের গায়ে বড় বড় আলোর অক্ষরে প্রতিদিন লিখে দেওয়া হয় ২০০০ সালের ঠিক কতদিন আর বাকি।

ফেরার পথে আবার সেই বির হাকিম, পাসি, ত্রোকাদেরো। ঠিক করলাম, একদিন পাসিতে নেমে বালজাকের বাড়ি যাব।

রূপসীদের রান্না

মাদাম ঘোষ ফরাসিদের কাউকে ইংরিজি, কাউকে হিন্দি, কাউকে ওড়িয়া শেখান। ফরাসিদের বাড়িতে সারাদিন বেবি সিটিং করেন। নিজের বাড়িতে বিদেশিনীদের ভারতীয় রান্নার ক্লাস নেন। ক্লাসের শেষে সারা দিনের পক্ক অর্ধপক্ক সুপক্ক ব্যঞ্জন সকলে মিলে আস্বাদ করেন, সেটাই শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সেদিনের মধ্যাহ্নভোজ।

এরকম একটি মধ্যাহ্নভোজে আমারও নিমন্ত্রণ মেলে। ততদিনে আমি লোভালোয়ায় উঠে গেছি।

সেদিন আমার অফিসের কাজে সারাদিন প্যারিসেই কাটল। মালাকফে পৌঁছলাম সন্ধে ছটা নাগাদ। ঘরে ঢুকে শুনলাম আমার জন্য সবাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সবে খেয়ে উঠেছেন।

তবে আমার জন্যও খাবার রাখা আছে, কেবল বেগুন ভাজা আর চাটনি বাদে। ও দুটি পদ রান্নার ছাত্রীরা অমৃতজ্ঞানে নিঃশেষ করেছেন।

এঁদের সবাই ফরাসি, একজন শুধু আফগানিস্তানি, সেই কাবুলি মহিলার স্বামী অবশ্য ফরাসি।

অম্বিকা বলে একটি মেয়েকে দেখলাম, তার পূর্বজীবনের নাম মেরী, নিজেই ভারতীয় নাম নিয়েছে, মেয়েটি ভারতীয় রান্না শেখে, হিন্দি শেখে, আঠেরো বছর ভরতনাট্যম

শিখেছে। একদিন প্যারিসে তার নাচ দেখে অবাক হয়েছি। আরও অবাক ব্যাপার, এঁরা সবাই প্রবল ভারতভক্ত!

পরেও অনেক ফরাসি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যাঁরা ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় রান্না শিখছেন, ভারতে আসবার জন্য ব্যাকুল, ভারত যেন তাঁদের নতুন কোনও পথ দেখাবে!

জুন মাসের ২৭ তারিখে, শনিবার সন্ধ্যায় গেলাম ফরাসিদের গলায় বাংলা হিন্দি গান শুনতে। প্যারিসের বাঙালি শিল্পী ও সফল ব্যবসায়ী সম্বিত সেনগুপ্তের স্ত্রী, সুগায়িকা ও সঙ্গীতশিক্ষয়িত্রী কাকলির পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান হয়েছিল প্যারিসের আফগানিস্তান কেন্দ্রে, ঠিকানাটি বাংলা করলে দাঁড়ায় ১৬ নম্বর সোনার হাতের পথ, প্যারিস-৭৫০১১। কাকলি ও তাঁর বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ও হিন্দি গান শুনে সহসা মনে বিভ্রম জাগে- প্যারিসেই আছি তো!

ভরতনাট্যমের অম্বিকা গাইল-কাঁহা ছুপে ঘনশ্যাম-শ্যাম রে! তবলায় তারই প্রাক্তন স্বামী। আরেকটি মেয়ে গাইল-রিনিঝিনি রিনিঝিনি নূপুর বাজে। মেয়েটির নাম সাবিন। স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ, সুরে বসানো গলা। শুনলাম আট বছর গান শিখছে কাকলির কাছে। একটি ছেলে গাইল নজরুলগীতি-গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা... । খোদ প্যারিসে গুরু ও শিষ্য-শিষ্যাদের সমবেত কণ্ঠে তা তা থৈ থৈ শুনতে শুনতে সুদূর প্রবাসে আমারও মন নেচে ওঠে। কাকলির এই কৃতিত্ব স্বচক্ষে দেখা ও স্বকর্ণে শোনা আমার এবারের প্যারিস ভ্রমণের একটা বড় অভিজ্ঞতা।

মোনিকের বাড়িতে ডিনারে আলাপ হয়েছিল মোনিকের বন্ধু মারী ক্রিস্টিনের সঙ্গে। ইনি মাদাম ঘোষেরও বন্ধু। প্রথম আলাপেই আমাকে বললেন, আমাকে মারী ক্রিস্টিন না বলে মারী কৃষ্ণও বলতে পারেন। বছরে একবার অন্তত মাস দুয়েকের জন্য ইনি ত্রিচুর আসেন কথাকলি শিখতে।

ভরতনাট্যমের অম্বিকা হিন্দি শেখার সময় কোনও শব্দে হ থাকলে, বার কতক হরিনাম নিয়ে জিভটা শানিয়ে নেয়।

লোভালোয়ায় সেই ডিনারেই মোনিকের আরেক বন্ধু এক ফরাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি বিশেষ করে আমার জন্যই একটি নিরামিষ ফরাসি পদ রেঁধেছিলেন। তাঁর ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তিনি আমাকে ভারত সম্পর্কে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের কথা শোনালেন।

পরদিন সাত সকালেই তাঁর টেলিফোন। কী ব্যাপার, না দুপুরে তার বাড়িতে আমার মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন। এরকম ব্যাকুল নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য? আরও ভারতকথা শোনা ও শোনানো। ছেলেটা ভারত বলতে পাগল! এটা মোনিকের টীকা, তাঁরই ভাষ্য।

তবে লোভালোয়ার কথায় প্রথমেই বলতে হয় লোভালোয়ায় আমার প্রথম রাতটির কথা।

২

লোভালোয়া যাত্রা

আজ লোভালোয়া যাব, টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকা হয়েছে। মোনিকের সঙ্গেও ফোনে কথা হয়েছে-রাত নটায় সে নিজে বা তার ছেলে বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে এসে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে।

ট্যাক্সি এল প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে, তখন নটা বাজতে অল্পই বাকি। ট্যাক্সি বলতে ঝকঝকে মার্সিডিজ বেঞ্জ। ড্রাইভার দরজা খুলে বেরিয়ে এল, কৃষ্ণবর্ণ দশাসই চেহারা, হেসে হেসে দেরি হওয়ার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, বাপরে, তারই কী আওয়াজ!

মিটারে এখনই ৭৭ ফ্রাঁ উঠে গেছে, তা বাড়ি খুঁজে না পেলে গাড়ি তো আর বিনা তেলে বিনা মিটারে বাড়ি খুঁজতে পারে না! গলার আওয়াজ শুনি আর মনে হয় সে তো ঠিকই, কিন্তু মাদাম ঘোষ সেকথা শুনবেন না। ড্রাইভারকে ফরাসিতে প্রচুর বকাবকি করে তাকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিলেন, লোভালোয়ায় পৌঁছে মিটারে যত ফ্রাঁ উঠবে তার থেকে সে ৪০ ফ্রাঁ কম নেবে।

মাদাম ঘোষ আর আমার সঙ্গে এলেন না, তাঁর ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে, কোরন্ত্যাঁ সেলতোঁ থেকে মালাকফের ক্লো মোন্তোলো আসার বাসও বন্ধ হয়ে যাবে, তাছাড়া তার দরকারও নেই, ভয়ের তো কিছু নেই-ই, মোনিকও আমাকে স্বাগত জানাতে নিচে নেমে এসে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন!

এগারোটা নাগাদ সম্পূর্ণ জনহীন একটা রাস্তায় মস্ত এক বহুতল বাড়ির সামনে আমাকে ও আমার বাক্সটি নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার সামনে এসে বলল, এবার অনুগ্রহ করে টাকাটা দিয়ে দিন মসিয়।

মিটারে ১৬০ ফ্রাঁ উঠেছে, তার মানে দিতে হবে ১২০ ফ্রাঁ। রাস্তার আবছা আলোয় টাকা গুনছি, হঠাৎ দেখি লোকটা ঝুঁকে পড়ে ফ্রাঁর নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তেই লোকটা বলল, তুমি ভাবছ তোমার ফ্রাঁ আমি গিলে খেয়ে নেব, আমি দেখছি ১৬০ ফ্রাঁ গুনতে তোমার কতক্ষণ লাগে! স্কুলে অঙ্কে তো বেশ কাঁচাই ছিলে মনে হয় । আচ্ছা এই নাও, ঘুরে দাঁড়াচ্ছি! বলে সে সত্যিই ছোটদের খেলার ভঙ্গিতে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল । আমি ১২০ ফ্রাঁ গুনে লোকটার হাতে দিতেই টাকাটা পার্সে পুরে 'বননুই' (Bonne nuit) বা গুড নাইট বলে প্রায় চোখের পলকে চলে গেল ।

৪০ ফ্রাঁর মূল্য

মোনিকের বাড়ি এখানে কোথায়? কোনও বাড়ির সামনেই কেউ দাঁড়িয়ে নেই! এই রাস্তাটাই কি রু্য মরিস রাভেল? দু-নম্বরটাই বা কোথায়?

আমাকে নামিয়েছে রাস্তার এক মাথায়, সেখান থেকে রাস্তার ওমাথা পর্যন্ত চোখ বুলোই, ফুটপাত ঘেঁসে শুধু পর পর গাড়ি পার্ক করা, কোথাও একটা লোকও চোখে পড়ল না ।

সামনেই একটা সতেরো তলা বাড়ি, কিন্তু খোঁজখবর নেবার উপায় নেই, বাড়িটি সবদিক দিয়েই রুদ্ধ, রাস্তাটিও যেন বোবা ও কালা, সম্পূর্ণ স্তব্ধ ও জনহীন । ভাগ্যক্রমে কাউকে যদি এ-বাড়িতে ঢুকতে বা বেরতে দেখা যায়, বা রাস্তায় কোনও গাড়ি থামে কিংবা পথিকের উদয় হয়-এইসব ভেবে নিষ্ফল প্রতীক্ষা করতে থাকি । আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না যে দৈত্যাকার ড্রাইভার ভাড়া কেটে নেওয়ার শোধ তুলতে আমাকে ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেছে!

হঠাৎই গাড়ির মৃদু শব্দ, গাড়িটা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল । ভাগ্য ভালো, খানিকদূর গিয়ে গাড়িটা থামল, দূর থেকে রাস্তার আবছা আলোয় মনে হল, গাড়ির চালক খুব সম্ভব গাড়িটা পার্ক করছেন । অগত্যা নির্জন ফুটপাতে বাক্সটা ফেলে রেখেই আমি দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাই, ভদ্রলোক ততক্ষণে গাড়ি পার্ক করে যেদিক দিয়ে এসেছেন তার উল্টো দিকে চলে যাচ্ছেন । গাড়ি যখন এখানে লাগিয়েছেন তখন এপাড়ার বাসিন্দা না হয়েই যান না! আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে সিল ভু প্লে, এক্সক্যুজে মোয়া ইত্যাদি বলে আমার সমস্যাটা বিবৃত করলাম ।

মোনিকের ঠিকানাটা রাস্তার প্রয়োজনে আলাদা একটা কাগজেও লিখে রেখেছিলাম, ভাগ্যিস ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে ফেরত নিয়েছি, সেটাই এখন এই ভদ্রলোকের সামনে মেলে ধরলাম । পকেট থেকে লাইটার বের করে তার আলোয় ঠিকানাটা দেখে নিয়ে ভদ্রলোক কিছুটা এগিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোধহয় বাড়ির নম্বর দেখলেন । এভাবে একেকটা বাড়ির সামনে গিয়ে কী দেখেন আর আরও এগিয়ে যান । শেষ পর্যন্ত

রাস্তার ওমাথা পর্যন্ত গিয়ে সোজা আমার কাছে ফিরে এসে এই প্রথম আমার সঙ্গে কথা বললেন, গলার স্বর একেবারে নিস্তরঙ্গ, বললেন, এই নম্বরের বাড়ি এই রাস্তায় নেই, যদিও রাস্তার নামটা ঠিক আছে।

দিন কখন শেষ হয়ে গেছে, এখন আর বোঁ জুর (Bon jour) বলা যায় না, হাতঘড়িতে রাত সওয়া এগারোটা। বোঁ সোয়ার (Bon soir) বলব, না বননুই-মাথায় আসছে না, বোধহয় দুটোই বললাম, এমনকী মেরসি বকু (Merci Beaucoup), ওরভোয়ার (Au revoir), আ-বিয়াঁতো (A\ bien-tôt) বলছি শুনতে পেলাম, যার অর্থ আবার দেখা হবে অথবা বিদায়, তদবধি অনেক ধন্যবাদ, ইত্যাদি। ভদ্রলোক আরও এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একটা দোকান বা টেলিফোন বুথ বা একজন লোক এখানে স্বপ্নের অতীত, মাদাম ঘোষ কেন যে ৪০ ফ্রাঁ বাঁচাতে গেলেন! সামান্য কটা ফ্রাঁয়ের মূল্য আমাকে এভাবে দিতে হবে কে ভেবেছিল!

প্রথম বাড়ির নম্বরই ২

হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক ফিরে আসছেন, হ্যাঁ তিনিই। কিন্তু আমাকে কিছু না বলে আমার সামনের সতেরো তলা বাড়িটার গায়ে ঝুঁকে কী দেখলেন, তারপর আমার কাছে এসে বিনা বাক্যে আমার বিরাট বাক্সটা এক হাতে তুলে নিয়ে বাড়িটার ভারি কাচের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং আমার প্রতি তাঁর দ্বিতীয় বাক্য-আমি খুবই দুঃখিত, এই সারির এক নম্বর বাড়িটার নম্বরই কী করে দুই হল কে জানে! বলে মোনিকের ফ্ল্যাটের বোধহয় ইন্টারকমের বোতাম টিপে দিতেই অলক্ষ কোনও স্পিকারে শুনলাম-নিশ্চয়ই মিঃ চক্রবর্তী?

আমিও একটা অদৃশ্য, আনুমানিক স্পিকারের দিকে ঝুঁকে বললাম, হ্যাঁ, একটু বেশি রাত হয়ে গেল।

‘নো প্রবলেম, তোমার সামনের দরজাটা খুলে দিচ্ছি, ভেতরে ঢুকে লিফটের সামনে অপেক্ষা করো, গ্রেগোয়া যাচ্ছে।’

বলা মাত্রই খটাং করে সামনের কাচের পাল্লাটি নিজে থেকেই খুলে গেল।

মোনিকের ফ্ল্যাট চার তলায়, তার ছোট ছেলে এসে আমাকে নিয়ে গেল। বেশ রোগাই বলা যায়, ফর্সা মুখে ব্রণর দাগ, ভারি শান্ত, কথাও বলে খুব কম। পরে দেখেছি মা যখন এক-আধ গ্লাস ওয়াইন খেয়ে যে কোনও সামান্য কথাতেই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার জোগাড়, তখন গ্রেগোয়া আস্তে করে উঠে গিয়ে মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে দুহাতের তালু দিয়ে

মায়ের গালে আলতো চাটি মারতে মারতে বলে-'মা, ওমা, এবার একটু হাসি থামাও দেখি, একটু শান্ত হও, আরে, হাসতে হাসতে পড়ে যাবে যে, মা, ওমা-।'

গ্রেগোয়া চায় তার দাদাও এসে তার সঙ্গে হাত মেলাক । জঁ য়্যুগো (Jean Hugo) ভাইয়ের থেকে লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য, দুহাতে সস্নেহে সকৌতুকে মাকে জাপটে ধরে, ব্যস, ব্যস, এবার একটু থামো দেখি ।

মোনিক একদিন এরকম বাঁধভাঙা হাসির মধ্যেই কোনওক্রমে বলল, আমি আবার-দাঁড়া, দ্যাখ, আর-একটা, আবার একটা বিয়ে আমি করবই, তখন দেখিস তোদের কী হয়?

'শান্ত হও, শান্ত হও, হাসিটা থামাও, এত হাসলে বিয়ে করবে কী করে?'

এবার দ্বিগুণ বেগে হাসি, হাসতে হাসতে মোনিকের চোখে জল, দুহাতে পেট টিপে ধরেছে ।

গ্রেগোয়াকে দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে পৌঁছে দিয়ে বোধহয় ওর ঘরে সেঁধিয়েছে, জঁ য়্যুগোকে তো দেখিইনি । মোনিক আমাকে আমার পরিপাটি সাজানো-গোছানো ঘরটি দেখিয়ে তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দরজার বাইরেই একটি সাদা ও একটি ভীমদর্শন কালো বিড়াল চকিতে চোখের কোনা দিয়ে নির্দেশ করে খুব নিচু স্বরে বলল, তোমার ঘরের দরজা কিন্তু সবসময় বন্ধ রাখবে, না হলে বিড়াল দুটো ঢুকে পড়বেই । ধানের ছড়াগুলোর ওপর ও-দুটোর বড্ড লোভ ।

লেখার টেবিলে মাটির সরায় প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কয়েকটা ধানের ছড়া কেন অত যত্ন করে রাখা আছে জিজ্ঞেস করা হল না ।

মোনিক খুব কথা বলে, কাজও করে দ্রুত হাতে, আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে সকালের চা ও ব্রেকফাস্টের সাজ-সরঞ্জাম কোনটা কোথায় আছে, চা-কফি জ্যাম-পাউরুটি কোথায় কী পাব, সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরামর্শ দিল । আমি বাঙালিসুলভ কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আরেক ছেলেকে দেখছি না তো, সে কোথায়?

'কেউ জানে না! বেঁচে আছে কি না তাও বলা যায় না । আজই আমি একটা গাড়ি কিনেছি, ডেলিভারি নেওয়া পর্যন্ত আমি গাড়িটা দেখেছি, তারপরই জঁ য়্যুগো গাড়ি নিয়ে চরতে বেরিয়েছে । প্যারিসে আছে না অন্য কোথাও চলে গেছে, নাকি হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে সেটা শুধু সে-ই বলতে পারে ।'

ডোরবেল বাজল। মোনিক দরজা খুলে দিতেই ভেতরে এল সুদর্শন এক তরুণ, তার নীল চোখ, এ-ই জঁ য়্যুগো।

মোনিক প্রথমে খুব একদফা ছেলেকে বকল, তারপর বলল, চাবি তুলে রাখছ কেন, চলো অমরকে নিয়ে এক চক্কর প্যারিস ঘুরিয়ে আনি।

অমরেন্দ্র উচ্চারণের অসুবিধা বলে আমাকে অমর বলে ডাকা হবে! সেকথা ছেলেকে ও আমাকে জানিয়ে দিয়ে মোনিক এবার আমাকেই বলল, তুমি আমাদের পক্ষে খুব লাকি, আজই তুমি এলে আর আজই আমাদের নতুন গাড়ি হল। চলো, অন্তত ত্যুর ইফেল দেখে আসবে! রাত তো মোটে ১টা!

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে মোনিকই একটু আগে অনেক দূরে আলোয় সাজানো আইফেল টাওয়ার দেখিয়েছিল আমাকে। এখন রাতদুপুরে এই ফরাসি পরিবারের সঙ্গে একেবারে কাছে গিয়ে আইফেল টাওয়ার দেখার কথা ভেবে মন বেশ চাঙা হয়ে উঠল, লোভালোয়ায় প্রথম পদক্ষেপের ঝিম ধরা অভিজ্ঞতার পর এই নিমন্ত্রণের বোধহয় দরকারও ছিল।

পরে বুঝেছিলাম, এ হল মোনিকের পরার্থপরতার একটি ধরন। কারও মনে কোনও কারণে বা অকারণে কোনওরকম ভার জমলে মোনিক তার মুখ দেখে তা টের পাবে, আর এই টের পাওয়াটা সে তাকে একেবারেই জানতে দেবে না, তার বদলে আহত বা বিষণ্ণজনের মনোভাব লাঘব করতে কিছু করবার চেষ্টা করবে।

জঁ য়্যুগো গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে বসেছি আমি, মোনিক পিছনে। গ্রেগোয়া বাড়ি আছে না বেরিয়েছে জানি না।

বিছানায় ও গালে জাতীয় পতাকা

রাতের আলো, ঝলমল প্যারিস এভাবে আগে কখনও ঘুরে দেখিনি, এত রাতেও প্রচুর গাড়ির ভিড়ে আইফেল টাওয়ারের খুব একটা কাছে ঘেঁসা গেল না।

এর কয়েকদিন পরে আরও আলো, আরও ভিড়, আরও উল্লাস দেখেছি প্যারিসে, সেদিন রাতে আমরা মোনিকের বাড়ি থেকে হেঁটে গিয়েছিলাম শাঁজেলিজে, পুরো ফরাসি জাতটাই সেদিন রাস্তায় নেমে এসেছিল মনে হয়, তারিখটা ছিল ১২ জুলাই, সেদিনই ফ্রান্স ফুটবলে বিশ্বকাপ জিতেছে!

১২ জুলাই সন্ধেয় বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরের কার্পেট, বিছানা সব ঝকঝক তকতক করছে। বিছানার ওপর আমার একটা হাতাকাটা সাদা গেঞ্জি, একটা ফুলহাতা

নীল গেঞ্জি আর বোধহয় মোনিকেরই একটা লাল শিফন জাতীয় কাপড় পেতে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা করে রেখেছে । আরেকটা শক্ত কাগজ গোল করে কাটা, তাতে লেখা Coupe du Monde. Football Juillet '98.

ফ্রান্স ব্রাজিলকে এক গোল দিতেই গ্রেগোয়ার ঘর থেকে আর্তনাদের মতো চিৎকার ভেসে এল, সে ঘরে গ্রেগোয়া তার এক বন্ধুকে নিয়ে খেলা দেখছিল । আমি জঁ য়্যুগোর ঘরে আলাদা টিভির সামনে বসে আছি, বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখবার জন্য জঁ য়্যুগো আজ তার ঘরটা বড় টিভি সুদ্ধ আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছে, সে গেছে তার বন্ধুদের সঙ্গে, গ্রেগোয়ার আর্তনাদ শুনে ভাবলাম তবে কি আমারই চোখের ভুল, গোলটা আসলে ফ্রান্সই খেয়েছে?

দ্বিতীয় গোলে আরও উচ্চ আর্তনাদ শুনে নিশ্চিন্ত হলাম, এ তাহলে গ্রেগোয়ার বিজয় উল্লাস!

তৃতীয় গোলের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি, আশপাশের সব বহুতল বাড়িতে সকলেই ফ্ল্যাট থেকে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে থালা বাটি কুকার কাঁটা-চামচ ফ্রাই প্যানের কাঁসরঘণ্টা বাজাচ্ছে!

গ্রেগোয়া সবান্ধব সচিৎকার লাফিয়ে উঠল, মোনিক চিলচিৎকার সহ লাফাচ্ছে, এক দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে খানিকটা টুথপেস্ট দুগালে লাগিয়ে এল, তারপর তার শোয়ার-বসার ঘর থেকে লাল লিপস্টিক নিয়ে সাদা টুথপেস্টের পাশে ভালো করে ঘসে দিল তারপর গালে নীল নেল পালিশ লাগিয়ে দুগালেই ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা এঁকে ফেলল । তারপর জোড় পায়ে আরেকবার লাফিয়ে উঠে বলল-চলো শাঁজেলিজে!

এ তো পায়ে হেঁটে চলা নয়, রাস্তার জনস্রোতে ভেসে যাওয়া । স্রোতের কুটোর মতো হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম শাঁজেলিজে । আর্ক দ্য ত্রিওম্ভ ছাড়িয়ে । কান ফাটানো মুহুর্মুহু গাড়ির হর্ন, প্রত্যেক ছুটন্ত গাড়ির দুপাশের জানলা দিয়ে কোমর থেকে বুক-মাথা বের করে রেখেছে ছেলেমেয়েরা, গাড়ির ভেতরে শুধু পা থেকে কোমর পর্যন্ত ।

চলছে নাচ গান দৌড়াদৌড়ি, রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল, আনন্দের বন্যা । ফুটপাতে গাছের নিচে, বেঞ্চে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা । ওরই মধ্যে মোনিক একবার আমার কানে প্রায় মুখ লাগিয়ে বলল, ফুটবল আমার একদম ভালো লাগে না!

আমি তো অবাক! এত আনন্দ, এত লম্ফঝম্প কেন তাহলে! রাত দুপুরে হেঁটে হেঁটে শাঁজেলিজে যাওয়াই বা কেন? এতটা রাস্তা ফিরতেও হবে হেঁটে, আমার তো এখনই পা ব্যথা করছে!

গাড়ির হর্ন, লোকের উল্লাস, চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে কথা শোনা যায় না । মোনিক তবু গ্রেগোয়ার কান বাঁচিয়ে আমার কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, আনন্দ করছি কাল অফিস ছুটি পাওয়া যাবে বলে!

কুকুরের নাম ওসলো

তারপর বাড়ি ফিরে বলল, কাল ছুটি, পরশু ছুটি, পরশু ১৪ জুলাই আমাদের জুর নাশিয়নাল (Jour National), আর ১৫ই-তোমার মনে আছে তো? ঠিক বেলা পাঁচটায় বেরব, প্যারিস থেকে একশো কিলোমিটার যেতে হবে, তুমি গ্রাম ভালোবাসো, গ্রামের মধ্যে চাইলে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াবে, আমি আর জঁ য়্যুগো ততক্ষণ বাচ্চাটার নানা অভ্যাসের বিষয়ে যত পারি শুনে নেব । তারপর, উঃ, কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার! ল্যাব্রাডর গোল্ডেন রিট্রিভার! ভাবো তো! প্রেসিডেন্ট মিতেরোঁরও ছিল এই ল্যাব্রাডর! গোল্ডেন রিট্রিভার! সবে দুমাস ছাড়িয়েছে, এতদিন নিয়ে আসিনি কেন বলো তো! দুমাস পর্যন্ত এরা মায়ের দুধ খায় ।

মোনিকের টেবিলে ল্যাব্রাডরের ওপর দুখানা মোটামোটা বই দেখেছি, অফিস থেকে ফিরে যখনই একটু ফাঁক পায়, পড়ে ।

ফ্রান্সের জাতীয় দিবসে মোনিক আর জঁ য়্যুগো নিজেদের গাড়িতে আমাকে শার্ত্র (Chartre) নিয়ে গেল । প্যারিস থেকে দূরত্ব একশো কিলোমিটার, কিন্তু আমাদের সেদিনের সঙ্গী মোনিকের এক প্রতিবেশিনীর নির্দেশমতো চলতে গিয়ে জঁ য়্যুগো রাস্তা ভুল করে সম্পূর্ণ অন্যদিকে গিয়ে যাওয়া-আসায় প্রায় আরও একশো কিলোমিটার ঘুরিয়ে আনল, প্যারিস শহরের বাইরে টানা নীল আর সবুজের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালোই লাগল ।

স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ধর্মতত্ব-ইতিহাস ও নিসর্গ-গুণে শার্ত্র একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা । দ্বাদশ শতাব্দীর এই বিরাট ক্যাথিড্রাল সারা দিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মতো । ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, ধর্মতত্ব ও তার ইতিহাসের দিক থেকে, তাছাড়া স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের তো একেবারে ভূরিভোজ! পুরো জায়গাটিই ভারি সুন্দর ।

শুধু ফ্রান্স নয়, পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটকদের দেখলাম ভারি নিঃশব্দে খুব আগ্রহ নিয়ে ভক্তিভরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন । ক্যাথিড্রাল চত্বর ছাড়িয়ে প্রাচীন এই অঞ্চলের সেকেলে অলিগলিতে পর্যটকদের জন্য অনেকগুলো রেস্তোরাঁও রমরম করে চলছে । তারই একটাতে আমাদের মধ্যাহ্নভোজ সারা হল ।

জাতীয় দিবস উপলক্ষে সকালের আকাশে ঝাঁকঝাঁক বিমানের কসরত দেখতে দেখতে গেছি, রাতে লোভালোয়া ফিরে এখানকার মেরি (Mairie) বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রাঙ্গণে দেখলাম বাজি পোড়ানো। আকাশভরা আলোর খেলা।

কাল বিকেল পাঁচটায় মোনিকরা যাবে কুকুরছানা আনতে। আমাকে সঙ্গে যেতেই হবে। মনে আছে তো? তোমার বাপু সময়ের বোধটা একটু কম, ঠিক সাড়ে চারটেয় ফিরে আসা চাই। মনে থাকে যেন। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় রওনা। ওর কী নাম রেখেছি জানো? ওসলো।

ফ্রান্সে প্রতি বছর কুকুরের নামের আদ্য অক্ষর বদলায়। ৯৮-এ আদ্য অক্ষর ধার্য হয়েছে 'ও'।

ওসলো খুবই চেনা নাম, ও হো, মনে পড়েছে-নরওয়ের রাজধানী।

ডাকাতে শুঁড়িখানায়

একদিন মোনিক তার বোন ক্যারলের বাড়ি ডিনারের নেমন্তন্নে নিয়ে গেল আমাকে। সেই তাদের নতুন গাড়িতে, গাড়ি চালাচ্ছেও যথারীতি জঁ য়্যুগো, তার পাশে বসেছে তার ছোট ভাই গ্রেগোয়া। এদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক বাংলার গ্রামে ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্কের মতো।

ক্যারলদের বাড়ি শোয়েজি লো বোয়াতে। লোভালোয়া থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার। রাস্তার নাম প্রথম অ্যালবার্ট সরবনি। ক্যারল আর তার স্বামী জ্যাক সোলেবু, তাদের দুই মেয়ে এমোলিন আর অ্যানায়েল-এই হল মোনিকের বোনের সংসার, য়্যুগো-গ্রেগোয়াদের মাসির বাড়ি। অনেকদিন পর বোধহয় চার ভাই-বোন একসঙ্গে হয়েছে, ফলে পরস্পরের গালে চুমুর খুব ঘটা! কথারও খই ফুটছে।

একে তো গ্রামীণ পরিবেশ, তার ওপর এমোলিন আর অ্যানায়েলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল। এরা যে অনেকক্ষণ ধরে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেটা কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। মুখে আনন্দের ভাব আর এদের আন্তরিক ব্যবহারই সব কথা বলে দেয়!

অ্যানায়েলের বয়েস সাত-আট বছর। সে তার মাসির কাছে শুনেছে একজন কবিকে নাকি মাসি আজ তাদের বাড়িতে নিয়ে আসছেন, সম্মিলিত প্রথম আলাপের পর প্রথম সুযোগেই সে তাই আমাকে তার পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর তার খাতা খুলে চারটে কবিতা শুনিয়ে দিল, সবই সদ্য রচিত। ক্ষুদে এই ফরাসি কবির সঙ্গে ইংরিজি-

ফরাসি জগাখিচুড়ি ভাষায় বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দিতে পেরে আনন্দ হল । সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর কয়েকটি ছড়াও তাকে ভাঙা ফরাসিতে শুনিয়ে দিলাম ।

কোনও ঘর নিচুতে, কোনও ঘর উঁচুতে, সিঁড়ি বেয়ে এই উঠছি, এই নামছি, এক জায়গায় সরু একটা মই লাগানো, তার মাথায় নতুন একটা মস্ত বড় ঘর । দেওয়ালের গায়ে সদ্য ফোটানো জানলা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বনজঙ্গল দেখা যায় । অ্যানায়েলের সঙ্গে আমার চুক্তি হল, শীতকালে এ ঘরে বসে আমি অনেক কবিতা লিখব । ও-ও লিখবে । আমরা দুজনে মিলেই কবিতা লিখব ।

এর সঙ্গে আমি যোগ করলাম-কবিতা লিখব আর জানলা দিয়ে নীল আকাশ আর সবুজ বন দেখব ।

অ্যানায়েল সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল, শীতকালে তো নীল আকাশ পাবে না, আর সবকিছু বরফে ঢাকা পড়ে যাবে ।

পুরো বাড়িটাই প্রায় দেখা হয়ে গেল, কিন্তু জ্যাক অর্থাৎ সোলেবু সাহেব কোথায়? তাকে তো দেখছি না!

ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পিছন দিকে, খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, এখানেই আজ ডিনারের টেবিল সাজানো হয়েছে । মোনিক যেরকম উচ্ছ্বাস নিয়ে ডিনারের কথা বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম অনেক লোকজন থাকবে, এখন দেখছি অতিথি বলতে, মোনিকরা ছাড়া, শুধু আমি!

একটু দূরে পায়ের কাছে বড় একটা কাঠের পাটাতন নড়তে শুরু করেছে । কী ব্যাপার, একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে আছি ।

আস্তে আস্তে পাটাতনের একদিক উঁচু হল আর সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল মানুষের একটা মাথা, ক্রমে গোটা একটা মানুষ । তার দুহাতে দুটি ওয়াইনের বোতল, অতি সন্তর্পণে ধরা । এভাবেই ভূগর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন গৃহকর্তা জ্যাক । অতিথির জন্য ভূগর্ভ থেকে অনেক দিনের পুরনো মদ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তিনি ।

ক্যারলদের বাড়িতে কয়েক রকম চিজের মধ্যে একটি চিজ আমার খুব ভালো লেগেছে শুনে য়্যুগো আমার প্লেটে ওই চিজ অনেকটা তুলে দিল । দেশে ফেরার সময় যাতে নিয়ে যেতে পারি সেজন্য নামটাও আমাকে লিখে দিয়েছে । চিজটার নাম ক্যামেঁবে (Camenbert), একটা ওয়াইনের নামও লিখে দিয়েছে-কালভাদো (Calvados), এটা ওই চিজটার সঙ্গেই গ্রহণীয়, না যে সুরাটি ওর মেসো ভূগর্ভ থেকে বের করেছিলেন, তারই নাম, ভুলে গেছি ।

খাওয়াদাওয়ার পর জ্যাক বাজাল বেহালা আর সেই বাজনার সঙ্গে মোনিক আর ক্যারল দুই বোন হাত ধরে কোমর ধরে একটার পর একটা নাচল। এর কয়েকটি নাচ বেশ লম্ভঝম্ভময়। বড় মেয়ের বয়স সতেরো, বাবার বেহালার পর সে পিয়ানো বাজাল।

হঠাৎ দেখি, জ্যাকের কনুইয়ে রং লেগে আছে, কনুইয়েও জাতীয় পতাকা এঁকেছিল নাকি?

আসলে তা নয়, সে নাকি সারা দুপুর বাড়ির এখানে-ওখানে রং করছিল, বাড়িটা বহু দিনের পুরনো, প্রায় একশো বছর হতে চলল, বাড়ির মেরামতি, অদলবদল, রং করারও তাই শেষ নেই, সে নিজে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর এই কাজ করছে, কাজটা সে কখনও মিস্ত্রির হাতে ছাড়ে না, একে তো শতাব্দী-প্রাচীন বাড়ি, তার ওপর এটা আবার ছিল ডাকাতদের শুঁড়িখানা, খুব নামকরা ডাকাতের দল ছিল এই অঞ্চলে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তারা ডাকাতি করতে যাবার আগে এই শুঁড়িখানায় বসে নেশা করত।

মাত্র একশো বছরের ব্যবধানে সেই বাড়িতেই একটি ফরাসি বালিকা আমাকে স্বরচিত কবিতা শোনাল। ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এই ঘটনাটি উল্লিখিত হোক বা না হোক, আমার কাছে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

মোনিকের বাড়িতে প্রথম সকাল

চা কফি দুধ চিনি কোনটা কোথায় থাকে, মরক্কোর মধু, ইস্তাম্বুলের আচার, আফগানিস্তানের মেওয়া, আফ্রিকার অমুক, বাগদাদের তমুক, কোথাকার মুখশুদ্ধি-কাবার্ড, ফ্রিজ খুলে খুলে মোনিক আমাকে প্রথম রাতেই সব দেখিয়ে দিয়েছিল। ক্যাবিনেটের কোন তাকে বাসনপত্র, কোথায় কাঁটা-চামচ সবই বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সকাল আটটায় মোনিক অফিসে যায়, ফেরে রাত আটটায়, আমার ব্রেকফাস্টের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেজন্যই তার এই শিক্ষকতা।

সকালে দরজায় মৃদু টোকার শব্দে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখি সেই কালো বিড়াল, ভেতরে ঢোকবার জন্য মুখিয়ে আছে! এ যে মানুষের মতো বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত করে, মোনিক সেকথা আমাকে কাল বলেনি তো!

দরজা যতটুকু খুলেছিলাম সেই ফাঁক দিয়েই বিড়াল প্রায় আমার পায়ে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রথম সুযোগেই এক লাফে সোজা টেবিলের ওপর! মোনিকের ধানের ছড়া লুট হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি বুক দিয়ে সেই কবেকার কোন দেশের মৃত্তিকাস্মৃতিবহ ধান রক্ষা করলাম।

বাঘের ক্ষিপ্রতা আর শিয়ালের ধূর্ততা মিলিয়ে বোধহয় বিধাতা বিড়াল সৃষ্টি করেন । আমি যত তাকে ঘর থেকে বের করতে চাই, সে ততই খাটের নিচে, আলমারির মাথায় বা আর কোনও দুর্গম কোণে পালিয়ে যায় ।

অগত্যা ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে সাহায্যের জন্য আমি গলা তুলে মোনিক, গ্রেগোয়া, জঁ য়্যুগোর নাম ধরে ডাকতে থাকি । তিনজনের একজনও সাড়া দিল না, তার মানে তিনজনই বেরিয়ে গেছে ।

গৃহকর্ত্রীর আদরের ধান বাঁচাতে তারই আদরের বিড়ালের সঙ্গে গলদঘর্ম লড়াই মোটেই কিছু বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার নয়, বেশ বিরক্তিকর । শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে, চায়ের জন্য তৃষিত হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ইলেক্ট্রিক কেটলিতে জল ভরে স্যুইচ অন করে দিই । ড্রয়ারে অনেকরকম টি ব্যাগ । ইংল্যান্ডেরই দুরকম-একটা সুগন্ধী মশলাদার, অন্যটা লেমন । কানাডার না অস্ট্রেলিয়ার পিপারমেন্ট চা, চিন বা জাপানের হার্বাল টি, একটা কৌটোয় দেখলাম খোলা চা পাতা, যেন কাকের বাসা সামান্য গুঁড়ো করা । আরেকটা নকশাদার কৌটোয় কোন এক দেশের শুকনো শিকড়-বাকড়, বেশ জট পাকানো, গন্ধটা চেনা-চেনা, তবু চিনতে পারলাম না ।

জল ফুটে গেছে, আমিও তৈরি, কিন্তু পেয়ালা কোথায়? কোন কাবার্ডের কোন তাকে থাকে কাপ-ডিশ? বাইরে থেকে সব একইরকম পালিশ করা! আন্দাজে আন্দাজে, আশায় আশায় অনেক খুঁজলাম কিন্তু পেয়ালা অধরাই রয়ে গেল । কাজ চালানোর মতো একটা বাটি বা গেলাসও পাওয়া গেল না ।

রান্নাঘরেই ছোট একটা পাথরের টেবিলে রোজকার খাওয়ার ব্যবস্থা । টেবিলের ওপর দেওয়াল ঘেঁসে রাখা আছে লাঠির মতো লম্বা ও শক্ত পাউরুটি, এদেশে বলে বাগেট । মরক্কো বা মেক্সিকোর মধু বা ইথিওপিয়া কি ইন্দোনেশিয়ার জ্যাম-জেলি যা পাই তাই মাখিয়ে দুয়েক টুকরো বাগেট দিয়ে বিনা চায়েই প্রাতরাশ সারব ভেবে ফ্রিজ খুলে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে সুদৃশ্য একটা কৌটো চোখে পড়ল । জ্যাম বা জেলি হলে আজকের মতো এটা দিয়েই ব্রেকফাস্ট করা যাবে । কৌটোটা বাইরে এনে দেখি তার গায়ে হৃষ্টপুষ্ট ভারি সুন্দর একটা বিড়ালের ছবি । ফরাসি ভাষার কিঞ্চিৎ পাঠোদ্ধারেই বোঝা গেল এটা বিড়ালের একটি সুষম খাদ্য, এমন সুস্বাদু যে দেওয়া মাত্র খেয়ে নেবে, আর তেমনই স্বাস্থ্যকর ।

একটা পাত্রে মধু পেলাম, বালির মতো দানা দানা । এত গাঢ় যে চামচে করে তুলতে সামান্য জোর খাটাতে হয় ।

মধু নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে দেখি বাগেটের গা ঘেঁসে সাদা বিড়ালটি থাবা বাড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তার চমৎকার লেজটি একবার বাঁয়ে টেবিলের ওপর আরেকবার ডাইনে পাউরুটির ওপর আলতোভাবে পড়ছে উঠছে, তার চোখদুটি সোজা আমার দুচোখে।

আমি মধুর পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছি, বিড়ালটা একবার মাত্র কথা বলল, একটি মাত্র শব্দ-ম্যাঁও!

সকলের বসবার ও মোনিকের শোয়া-বসার ঘরের টেবিলে মোনিকের একটা চিরকুট পেলাম, তাতে প্রথমে আমার নাম লেখা তারপর লোভালোয়া থেকে মেট্রোর বিভিন্ন লাইন ও বাসের নম্বর লেখা । সবশেষে রাতে ডিনারে দেখা হবার আশা প্রকাশ । সঙ্গে লোভালোয়ার একটা ছাপানো ম্যাপ জেমস ক্লিপ দিয়ে সাঁটা ।

নির্জন নিঃস্তব্ধ বাড়িতে নির্বাক সময় কাটাতে কাটাতে মনের মধ্যে আত্মমগ্নতা আসে, হঠাৎ ডোর বেল শুনে চমকে উঠি । প্রথমে সাড়া দিই না, একটু পরে আবার বেল বাজতে গলা বেশ চড়িয়ে বলি, এখন দরজা খোলা যাবে না, আপনি যেই হোন, রাত আটটার পরে আসুন ।

দরজার বাইরে থেকে কিছুটা রাগী গলায় লম্বা লম্বা ফরাসি বাক্য বর্ষিত হল, আমার সামান্য ফরাসি জ্ঞানে আমি তার কোনও অর্থই করতে পারলাম না ।

রাতে জানা গেল রান্নাঘরে জলের লাইনে কিছু মেরামতি করতে এসেছিল, তার আসার কথাও ছিল, একটা কাগজে এসব কথা লিখে লেটার বক্সে রেখে গেছে, তাতেই সব জানা গেল ।

চান-টান করে বাথটব ধুয়ে দিয়ে, পেপার ন্যাপকিন দিয়ে বেসিন শুকনো করে মুছে, নিজে তৈরি হয়ে একই সঙ্গে আচমকা ঠান্ডা হাওয়া ও আকস্মিক বৃষ্টি ঠেকাতে জ্যাকেট চড়িয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্নভোজের সন্ধানে ।

রাতে মোনিককে বাড়িতে ফোন করে বললাম, বোঁ সোয়ার, আমার জন্য আজ আর ডিনার রেখো না, আমি বাইরে থেকে খেয়ে ফিরব । মেরসি বকু, ওরভোয়ার, আ বিয়াঁতো।

‘না, না, না, সে হয় না, জঁ য়্যুগো তোমার জন্য আজ একটা ভারতীয় পদ রেঁধেছে, মাছের কারি । নটার মধ্যে চলে এসো, আমি তোমার জন্য একটা ওয়াইন এনেছি-ঠিক নটায়, ভুলো না যেন!’

বুলংবনের ময়ূর

প্যারিসে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বিশেষ উপদেষ্টা বিকাশচন্দ্র সান্যাল ও তাঁর স্ত্রী লেখিকা প্রীতি সান্যাল একদিন নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। ডান হাতের ব্যাপার ছাড়াও সেদিনের বড় আকর্ষণ ছিল তাঁদের কম্বোজ ভ্রমণ তথা আঙ্কোরভাট দর্শনের টাটকা অভিজ্ঞতা শোনা।

কৈশোরে প্রবোধ বাগচীর আঙ্কোরভাট দর্শনের, অথবা প্রায় আবিষ্কারের, বিবরণ পড়ে মোহিত হয়েছিলাম, তারপর গত বছর অমিতাভ ঘোষের নতুন বইয়ে কম্বোডিয়ার পুরনো দিনের কথা, এমনকী ১৯০৬ সালে কম্বোডিয়ার রাজার রাজনর্তকী গোষ্ঠী নিয়ে প্যারিসে যাওয়ার বিবরণ পড়ে কম্বোডিয়া বা আমাদের কম্বোজ ও সেখানকার আঙ্কোরভাট মন্দিরের বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। অতএব নিমন্ত্রণ নির্দ্বিধায় গৃহীত হল এবং সেদিন সন্ধ্যার আহার, পানীয়, শ্রবণীয়-সবই অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

প্রীতি সান্যাল গাড়ি যত ভালো চালান, রাস্তা বোধহয় তত ভালো চেনেন না। অথবা গাড়ি চালাতে চালাতে কবিতা বলেন বলে রাস্তা ভুল হয়ে যায়। তাড়া না থাকলে তাতে বেশ মজাই হয়। সেদিন লোভালোয়ায় মরিস রাভেল সাহেবের রাস্তা যখন খুঁজে পাওয়া গেল তখন বোধহয় রাত বারোটা। তখনই ঠিক হল, তিনি আমাকে রবিবার সকালে বুলঙের বন দেখতে নিয়ে যাবেন।

বোয়া দ্য বুলং (Bois De Boulong) বা প্রচলিত উচ্চারণে বোয়াদ্বুলং, বাংলায় বুলঙের বন বা বুলংবন। প্যারিস শহরের কাছেই ওরকম সাজানো গোছানো অরণ্য, হ্রদ, ওরকম বিরাট এলাকা জুড়ে অনাবিল অক্ষুণ্ণ প্রকৃতি-ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে দেখতে দেখতে আমি মনে মনে মেনে নিলাম যে ঠিক এরকমটা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন, সামর্থ্যের কথা আর তুললাম না। জনসাধারণের দৈনন্দিন বেড়াবার জায়গা অথচ যেন কণ্বমুনি-শকুন্তলার তপোবন। তপোবনের হরিণের মতোই কয়েকটা ময়ূর আমার একেবারে সামনে চলে এল। আমি তাদের আরও কাছে ডাকতে তারা একেবারে আমার বাড়ানো হাতের আঙুল ছুঁয়ে দেয় আর কি!

ভারতে ও নেপালে খ্যাত-অখ্যাত নানা অরণ্যে প্রান্তরে আমি অনেক বনময়ূর দেখেছি, কিন্তু মানুষের এত কাছে, প্রায় আলিঙ্গনের মধ্যে অন্য কোনও ময়ূরকে আমি কখনও দেখিনি। ক্যামেরার ক্লিক শব্দে পিছন ফিরে দেখি প্রীতি ছবি তুলেছেন, তার মুখে উত্তেজনা। বললেন, একটা মহা মুহূর্তের দারুণ ছবি হবে! ছবিটা-কে জানে, হয়তো দারুণই হত, সারা দিন বুলংবনের আরও অনেক ছবিই তিনি তুলেছেন, কিন্তু যতই ছবি

তোলা হোক ফিল্ম আর ফুরোয় না, কী ব্যাপার? দেখতে গিয়ে দেখা গেল, ফিল্ম একবারও ঘোরেইনি, তার মানে ঠিকমতো লোড করাই হয়নি।

সেদিন আমিও ক্যামেরা নিয়ে বেরইনি, পরে আরেকদিন ক্যামেরা কাঁধে বুলংবনে সারা দিন ঘুরলাম, ঝোপ থেকে চুপি চুপি, কিছুটা সন্ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এল খরগোশ, জল ছেড়ে গাছের নিচে উঠে এসে ডানা ঝাড়ল কালো হাঁসের দল, আশ্চর্য সব রঙের পাখিরা এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে উড়ে গেল, কিন্তু সেদিনের সেই ময়ূরদের কাউকে কোথাও দেখা গেল না।

কয়েক দিন পর একদিন সকালে গেলাম ফনতেন ব্লো। প্যারিস থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে ফনতেন ব্লোতে ফ্রান্সসম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের বিশাল রাজপ্রাসাদটি নেপোলিয়ানের স্মৃতিপ্রাসাদ হিসাবেই বেশি পরিচিত। একদিকে ঘরে ঘরে সেই ইতিহাসচিহ্ন, আরেক দিকে প্রাসাদসংলগ্ন, জলাশয়স্নিগ্ধ, অরণ্যবেষ্টিত উদ্যান। সেদিন আবার মুহুর্মুহু মৃদুমন্দ বৃষ্টির দিন। সেদিন ইতিহাসে-প্রকৃতিতে একাকার একটি দিনযাপনের স্মৃতি নিয়ে লোভালোয়ায় ফিরে এসেছিলাম। সেদিনও সাথী ও সারথী ছিলেন প্রীতি।

মাদাম ঘোষের তুর্কি নাচ

মাদাম ঘোষের বড় ছেলে সমুদ্রবিদ, গোয়ায় তার সামুদ্রিক চাকরি। মেজ ছেলে আমেরিকায়, একমাত্র মেয়ে সুইজারল্যান্ডে পি এইচ ডি করছে, ছোট ছেলে বুডঢা হঠাৎ আমেরিকায় চাকরি পেয়েছে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে যাবে, মা যাবেন তাকে লন্ডনের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে। সেখান থেকেই যাবে নিউইয়র্ক।

বুডঢা ভারি বন্ধুবৎসল। কয়েকদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে কোন একটা দ্বীপ থেকে ঘুরে এল। বাড়িতে সর্বদাই বন্ধুসমাগম। রাতে কখনও কখনও মেঝের ওপর বিয়ে বাড়ির মতো লম্বা টানা বিছানা পড়ে।

যাবার আগে এক বোতল ওয়াইন আর সালমন মাছের ঝোল-ভাত দিয়ে আমরা বিদায়ভোজ সারলাম।

একবার প্যারিসে একটা কম্পিউটার সংস্থায় চাকরি করার সময় বুডঢা ও তার বস নিজেদের কর্মস্থলে একদল ডাকাতের হাতে বন্দী হয়। দুজনের হাত পা মুখ বেঁধে ডাকাতরা টাকাপয়সা ও অনেকগুলো কম্পিউটার নিয়ে চলে যায়। বসই কারখানার মালিক, জাতে তুর্কি, পৈতৃক বাড়ি ইস্তাম্বুলে। এই ডাকাতির পর কারখানা বেচে দিয়ে

দেশে চলে যায় । এখনও প্রতি বছর প্যারিসে এলে সেই তুর্কি ছেলেটি আর তার মা বুডঢাদের ইস্তাম্বুলে যাবার নেমন্তন্ন করে ।

মাদাম ঘোষ সম্ভবত আমার সম্পর্কেও ওদের কাছে সাতকাহন বলে থাকবেন । আমি কলকাতায় ফিরে আসার অনেকদিন পরে, এই তো গত মাসেই একদিন মালাকফ থেকে টেলিফোন এল-এখনই প্যারিসে যেতে হবে, কেননা এ সপ্তাহেই ইস্তাম্বুল না গেলেই নয়, তার কারণ ইস্তাম্বুলিরা গত সপ্তাহে প্যারিসে এসেছেন, এ সপ্তাহেই ফিরে যাবেন, আমাদেরও সেখানে নেমন্তন্ন, ইস্তাম্বুলে এঁদের মস্ত বড় বাড়ি, যতদিন খুশি থাকা যাবে, কাল রাতে খুব করে বলেছে, আমাদেরও বলতে বলেছে, সেইজন্যই এই ফোন, অতএব প্যারিসে এক্ষুনি চলে আসছি নিশ্চয়ই?

খোদ প্যারিসে ফরাসি পরিবারে বেবি সীটিং করে আর ফরাসিদের ইংরিজি হিন্দি ওড়িয়ার শিক্ষকতা করে মাদাম ঘোষের এরকম অনেক বন্ধুবান্ধব লাভ হয়েছে । অতীতে তিনি দার্জিলিং আর কাশ্মীরের স্কুলেও পড়িয়েছেন দীর্ঘকাল । ফলে বছরের নানা সময় নানা জায়গায় তাঁর বেড়িয়ে যাবার নেমন্তন্ন মেলে, তার দুয়েকটি আমাকেও তিনি দিতে চান । ইস্তাম্বুলের আমন্ত্রণ এইরকমই একটি ।

উঠল বাই তো তুর্কি যাই! এরকম পক্ষীজীবন কে না চায়? কিন্তু পাই কী করে?

ছেলেকে গার দু নর বা উত্তরের স্টেশন থেকে লন্ডনের ট্রেনে তুলে দিয়ে সেই যে মুখ ফেরালেন, আর পিছনে তাকালেন না, চোখে এক ফোঁটা জল নেই, যেন নীরব কান্নার প্রস্তরমূর্তি ।

পরদিন আমাকে নিয়ে গেলেন প্যারিসের একটা অসামান্য নার্সারিতে । বিচিত্র সব লতাগুল্ম আর পত্রপুষ্প চিরকালই আমার কাছে এক বিস্ময় । এখানেই আমি প্রথম পতঙ্গভুক উদ্ভিদ দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি ।

আরেকদিন মাদাম ঘোষ নিয়ে গেলেন প্যারিসের একটি পটারি প্রদর্শনীতে । চোখ জুড়িয়ে গেল । ঘুরে ঘুরে একেকটি পাত্রের আকার দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কোন ছেলেবেলায় জয়নগর-মজিলপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের বাড়িতে মৌর্যযুগের পটারির সৌন্দর্য আর জ্যামিতিক শুদ্ধতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম ।

প্যারিসে দু-দশদিনের জন্য এসে ভিনদেশী কেউ এ শহরের সব মিউজিয়াম আর এক্সিবিশন দেখে শেষ করেছে এরকম কারও দেখা পাওয়া বোধহয় সম্ভবই নয় । কত যে মিউজিয়াম আর কত যে প্রদর্শনী আর কত যে অনুষ্ঠান-তার যেন আর লেখা-জোখা নেই, সব নিয়ে প্যারিস সব সময় জেগে আছে ।

আরও কদিন পর মাদাম ঘোষ নিজেই লন্ডনে যাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। মেজ ছেলে অফিসের কাজে লন্ডনে আসছে, সময় কম, ফলে এবার আর প্যারিসে আসা হবে না, অতএব ছেলে বউ নাতিকে দেখতে তাঁকেই লন্ডনে যেতে হবে।

কিছুদিন পর মাদাম ঘোষের ফেরার সময় হয়েছে অনুমান করে আমি ফোন করতেই জানা গেল ভিসার গোলমালে তাঁর লন্ডনে যাওয়াই হয়নি। মন তাই খুবই খারাপ। তবে খুশির খবর, কটক থেকে তাঁর ভাই ও ভ্রাতৃবধূ এসেছেন।

পর্তুগিজ নাচের হাতছানি

রবিবার মোনিকের পুরোপুরি গৃহকর্মের দিন। কাচাকাচি ধোয়া-মোছা ধুলো ঝাড়া ইস্তিরি করা সাপ্তাহিক বাজার করা-সব সময় একটা না একটা চলছেই। তারই মধ্যে চলছে উজবেকিস্তান, উরুগুয়ে, আরব, আফ্রিকা, আমাজন, আন্দালুশিয়া বা আর কোনও দেশ বা প্রদেশের লোকসঙ্গীত। কাজে মগ্ন, আবার গানও শুনছে মন দিয়ে, গান থেমে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে ক্যাসেট বদলে দিয়ে যায়। এত দেশের এত রকম জাতি-উপজাতির এত রকম ভাষা ও সুরের লোকসঙ্গীত শুনতে শুনতে মনে হয় এতদিন এই পৃথিবীর এইসব মনুষ্যগোষ্ঠীর এমন প্রাণের গান না শুনে জীবন আমার কাটছিল কীভাবে?

মোনিক আমার ঘর থেকে আমার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, হাত-মোছা মাথা-মোছা ও স্নানের তোয়ালে ও টার্কিশের দস্তানা বা গঁ (Gant) নিয়ে যায়, ছাড়া কাপড়ের বাক্স থেকে তুলে নেয় আমার জামা-কাপড়।

আমার প্রতিবারের আপত্তি সত্ত্বেও আমার সারা সপ্তাহের রুমাল, মোজা ও অন্যান্য অন্তর্বাসও সে কাচতে নিয়ে যায়। আমি যতই কেন আপত্তি করি, যতই বলি এগুলো আমি নিজেই কেচে নিতে পারব, তার একই উত্তর-ওতে আমার কাজের ব্যাঘাত হবে।

কাচার পরে এর প্রত্যেকটি জিনিস মোনিক নিজের হাতে ইস্তিরি করে। তার মধ্যে হঠাৎ কখনও পিয়ানোয় বসে। তার কাজে সশ্রম নিষ্ঠা আর সঙ্গীতে সক্রিয় অনুরাগ রীতিমতো শ্রদ্ধার বস্তু।

সে তুলনায় মোনিকের রান্নাঘর আমার কাছে বেশ বিভ্রান্তিকর। খাবার-দাবার কোনটা কোথায় গৃহকর্ত্রীর স্নেহে যত্নে আত্মগোপন করে আছে আমার পক্ষে তার হদিশ পাওয়া কঠিন।

একদিন এরকম অনাহারে দুপুর তিনটে বাজিয়ে অন্নসূত্র আবিষ্কারের নিষ্ফল সাধনা ভঙ্গ করে আমি পথে বেরই। রেস্তোরাঁর মধ্যাহ্নভোজের সময় পার, অতএব বাড়ি থেকে

বেরিয়ে সবচেয়ে কাছের চিনে দোকানেই ঢুকে পড়ি।

মেনু চিনে ভাষায়, ওয়েটাররাও চিনে ভাষী, আমার পক্ষে সঠিক খাদ্য নির্বাচন করা ভারি শক্ত হয়ে দাঁড়াল, যদি বা আন্দাজে কোনও পদ ভাবি সেটা ভাষায় প্রকাশ করার সব চেষ্টাই বিফলে যায়।

রেস্তোরাঁ দুপুরের মতো বন্ধ হবার মুখে, সব টেবিল খালি। কেবল আমার দুটি টেবিল পরে একটি টেবিলে একজন মহিলা বসে আইসক্রিম খাচ্ছেন। তিনি হঠাৎ আমার টেবিলের সামনে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বললেন, আপনি কোনটা চাইছেন আমাকে বলুন, আমি এদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কোনটা চাই তাই কি জানি? যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই এমনও তো হতে পারে। আমার সমস্যা শুনে মহিলা মেনুর দুয়েকটি পদ আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একটা রাইস সস সহযোগে মাছ। রাইসের ছোঁয়া যখন আছে, সঙ্গে আবার মাছ, আর কিছু না ভেবে আমি ওই পদটিই বাছলাম।

এক দানা ভাতও নেই, শুধু একটা জলীয় পদার্থ, সেটাই নিশ্চয় রাইস সস, তার মধ্যে বড় একটা মাছের টুকরো-এই হল ৪৮ ফ্রাঁ মূল্যের একটি চিনা ব্যঞ্জন।

খিদের মুখে এক টুকরো মুখে দিয়েই হাতের আড়াল দিয়ে কাগজের ন্যাপকিনে ফেলে দিতে হল-নিমপাতার মতো তেতো।

আমার দুর্দশায় আমার চেয়ে সেই পরোপকারী মহিলাই বোধহয় বেশি দুঃখ পেয়েছেন, আমি আইসক্রিম খাই না শুনে আরও দুঃখিত হলেন, অগত্যা এক কাপ কফির নিমন্ত্রণ আমাকে স্বীকার করতেই হল।

কফি খেতে খেতেই তিনি আমাকে, আমি ভারত থেকে এসেছি শুনে, বললেন, আপনি পর্তুগিজ নাচ ভালোবাসেন? আজ সন্ধ্যায় আসুন না-এটা শুধুই পর্তুগিজ নাচের আসর! এই লোভালোয়াতেই!

আমি বললাম, আমার বোধহয় সন্ধেবেলা একটা কাজ আছে। কটার সময় আপনাদের অনুষ্ঠান?

একটা কাগজে নিজের টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে বললেন, রাত নটা থেকে শুরু। আমাকে আটটার মধ্যে ফোনে জানিয়ে দিলেই হবে। আমি পর্তুগিজ নাচ খুব ভালোবাসি। আপনারও হয়তো ভালো লাগবে, চলে আসুন। আমার নাম মারিয়া জোসে।

প্যারিসের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত থেকে লোভালোয়া-পেরে (Levallois-Perret)-র শুরু। মোনিকদের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোজা নিচের দিকে তাকালেই একটা রাস্তা, তার ওপারে প্যারিস, এপারে লোভালোয়া। এখানকার মেট্রো স্টেশনের নাম পর্ত দ্য শামপেরে (Porte De Champeret), বাংলায় বলা যায় শামপেরের দরজা। মোনিকদের বাড়ি থেকে মেট্রোর দিকে যেতে পথে বড় একটা গির্জা পড়ে, ফেরার সময় মেট্রো স্টেশন থেকে ওপরে উঠেই সেই গির্জা। গির্জার সামনের রাস্তার নাম দেখে আমার বুক জুড়িয়ে গেল-অ্যাভেনিউ স্তেফান মালার্মে (Ste'phane Mallarme')। মালার্মের নামের নিচেই লেখা Poet 1842-1898।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ৯৪ নম্বর বাসের টার্মিনাস। তার কিছু আগে একটা রাস্তায় আমি অনেকদিন অকারণ হেঁটেছি, তার কারণ রাস্তাটার নাম রুয ভিকতর য়্যুগো (Rue Victor Hugo)।

জোসে মারিয়াকে কফির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভিকতর য়্যুগো সরণিতে মনে মনে 'লে মিজারেবল' (Les Mise' rables)-এর কথা নাড়াচাড়া করতে করতে ৯৪ নম্বর বাসের টার্মিনাসে এসে দেখি মারিয়া আগে থেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাস টার্মিনাস সেই চিনা রেস্তোরাঁ থেকে মাত্রই কয়েক কদম। আমি সময় কাটাবার জন্য, আর সামান্য কিছু খাদ্যের সন্ধানে, অভ্যাসবশত ভিকতর য়্যুগো সরণি ঘুরে এখানে এসেছি। মুখোমুখি হতে দুজনেই হাসলাম, কেননা হাসতেই হয়। বাস আসতে উঠেও পড়লাম। কথায় কথায় জানা গেল, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মেক-আপের সাজ-সরঞ্জামের দোকানে যাচ্ছে মারিয়া, খুব পুরনো আর বড় সেই দোকান, মেক-আপের জিনিসপত্র কিনতে মারিয়া সেখানে নিয়মিত যায়, শিল্পীদের মেক-আপ লাগানোই তার পেশা। আমি চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারি, দোকানটা বহুকালের পুরনো, ফরাসি বিপ্লবেরও আগেকার।

গেট দিয়ে ঢুকে, উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির উঠোনের মতো একটা মস্ত বড় চত্বর পেরিয়ে একটা হলঘরে এসে পৌঁছলাম। সামান্য স্যাঁতসেতে, লম্বা টানা কাউন্টারের ওপারে কয়েকজন পুরুষ-মহিলা বিক্রয়কর্মী তুলি হাতে কাউন্টারের এপারের কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ কয়েকজন সদ্য ও মধ্য তরুণীর মুখে কুমোরটুলির চক্ষুদানরত শিল্পীদের মতো অত্যন্ত সন্তর্পণে তুলি বুলোচ্ছে, কোথাও একটা তিল পতনের শব্দও নেই।

একেকটা নতুন নতুন বা আগের চেয়ে উন্নত প্রসাধন সামগ্রীর প্রয়োগ ও সুফল গালে গলায় কপালে নাকের ডগায় যাচাই করে মারিয়া বেশ কয়েকটি জিনিস কিনে নিল।

তারপর আমাকে মেয়েদের একটা চমৎকার ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার স্ত্রীকে আমার উপহার।

আমার নিরবচ্ছিন্ন না-না, সে হয় না ইত্যাদি শুনে মারিয়া বলল, এটা একটা সামান্য জিনিস, মেয়েদের একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া কিছু নয়, এটা নিয়ে আবার কথা হয় নাকি!

অগত্যা ব্যাগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পর্তুগিজ নাচে যোগ দিচ্ছি কিনা তা ফোনে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি উল্টো দিকে রওনা হলাম। আমার ফোন পেলে মারিয়া আমাকে রাস্তা বুঝিয়ে দেবে।

কালো মানুষের পক্ষে

সন্ধেবেলা গেলাম প্লাস দিতালি (Place d'Italie)-তে বাংলাদেশের প্যারিস প্রবাসী শিল্পী সাহাবুদ্দিনের বাড়ি। সেখানে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। ফরাসি টিভিতে সেদিন বিশ্বকাপ ফুটবলে নাইজেরিয়া-ডেনমার্কের খেলা চলছিল। সাহাবুদ্দিন মনে হয় পারলে শুধু শুভকামনা আর শুদ্ধ উত্তেজনা দিয়েই কালোদের জিতিয়ে দেন। কখন নাইজেরিয়ার গোল দেবার সম্ভাবনা, কখন-বা তাদের গোল খাবার আশঙ্কা, টিভির পর্দায় না তাকিয়ে শুধু সাহাবুদ্দিনের মুখ চোখ দেখেই বলে দেওয়া যায়। এমনকী সম্ভাবনাটা ক্ষীণ না প্রবল, আশঙ্কা সামান্য না সীমাহীন তাও শিল্পীর মুখের রংবদল থেকে বোঝা যায়। কিছুক্ষণ পর আমিও কেন জানি না নাইজেরিয়ার দলেই ভিড়ে গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাইজেরিয়াকে বাঁচানো গেল না।

শিল্পী সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে অকাল-প্রয়াত শিল্পী, আমাদের দুজনেরই প্রিয়, পূর্ণেন্দু পত্রীর স্মৃতিচারণা করে মন ভরে উঠল।

খেলার মাঠে পরাজয়ের দুঃখও ভুলে গেলাম সাহাবুদ্দিনের স্ত্রী আনার হাতের অতি সুস্বাদু রান্না খেয়ে। তাঁদের মেয়েদুটির সঙ্গেও চমৎকার সময় কাটল তাদের ছবি দেখে। রাতে আরেকদিনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বিদায় নিলাম।

দেখা হয় নাই

একদিন গেলাম বাস্তিই (Bastille)। রাস্তার মাঝখানে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের জুলাইমিনার (Colonne de Juillet), বাস্তিই দুর্গ পতনের স্মরণস্তম্ভ। তার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। স্তম্ভের গায়ে-লেখা নামগুলি শুনলাম ফরাসি বিপ্লবের

স্মরণীয়দের নাম। কাছেই বাস্তিইয়ের অপেরা, প্যারিসের অপেরা হাউসের চেয়ে ছোট, প্রাচীনের পাশে আধুনিক স্থাপত্যের সংযোজন।

রোজই ঘুম থেকে উঠে ভাবি, ভের্সাই (Versailles) যাব। মঁপারনাস (Montparnasse) থেকে ট্রেনে ঘণ্টা খানেকের পথ, খুব সকালে বেরিয়ে সারাদিন ধরে রাজপ্রাসাদ, রাজার মহল, রানির মহল দেখে সন্ধ্যায় সুরধ্বনিময় জলের ফোয়ারা, আলোর আলপনা উপভোগ করে রাতে ফিরে আসব। ফ্রান্সের রাজা-রানি, বিশেষ করে রাজা ষোড়শ লুই আর রানি আঁতোয়ানেতের ভের্সাইয়ের বাসগৃহ দেখার আগ্রহ আমার অনেকদিনের। বছর বারো আগে রাশিয়ায় রুশ সম্রাটদের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে ঘুরতে ঘুরতে আমার হঠাৎ ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই আর রানি আঁতোয়ানেতের কথা মনে পড়েছিল।

ভের্সাইয়ে যাবার কথা ভাবতাম আরও একটি বড় আকর্ষণে। আমাদের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্যারিস থেকে ভের্সাইয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এখানে কবির জীবনের একটি প্রবল পর্ব কাটে। আমার মনের কোণে সঙ্গোপনে মহাকবির স্মৃতিচিহ্নময় বাড়িটি দেখার খুব ইচ্ছা। কৈশোরে অনেকদিন ভেবেছি, ভের্সাইয়ের যে বাড়িতে বসে মাইকেল কবিতা লিখতেন, বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখতেন, সেই বাড়িতে আমি একদিন সারাদিন শুধু চুপ করে বসে থাকব। মনে মনে ভয়ও আছে, হয়তো তাঁর অনেক স্মৃতিই মুছে গেছে, সেখানকার লোকেরা হয়তো এই বাঙালি কবির নামও শোনেনি। বছর দশেক আগে একবার জার্মানির মারবুর্গে বিশ্ববিখ্যাত রূপকথাকার গ্রিম ভাইদের এক অস্থায়ী আবাস খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম, স্থানীয় বাসিন্দারা কেউই জানে না কোন বাড়িতে গ্রিম ভাইয়েরা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক সুবেশ দম্পতিকে যখন এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি ও যথারীতি তাদের অজ্ঞতার কথা শুনছি তখন হঠাৎই তাদের মাথার ওপর দিয়ে রাস্তার গায়েই একটা পুরানো দোতলা বাড়ির দেওয়ালে আমার চোখ আটকে গেল। সেখানে স্পষ্ট অক্ষরে গ্রিমদের নাম লেখা আছে। যে বছরটি তাঁরা এখানে ছিলেন সেই বছরটির উল্লেখ করে লেখা আছে-হিয়ার লিভড গ্রিম ব্রাদার্স, অথচ ওখানকার লোকেরা কেউ তা জানে না। শুধু পথচারীরাই নয়, স্থানীয় দোকানদাররাও কেউ জানে না।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এক-দেড়শো কিলোমিটার দূরে অজানা শহরে গ্রিম ভাইদের স্মৃতিচিহ্ন যেমন খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করেছিলাম, তেমনই হয়তো মাইকেলের মর্মস্পর্শী প্রবাসজীবনের স্মৃতিজড়িত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কফিখানা, পানশালা খুঁজে বার করতে পারব।

ভের্সাই শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না । যাওয়া হল না আরও অনেক জায়গায় । দুবছর আগে সদা-ভ্রমণোন্মুখ, আজকাল পত্রিকার প্রধান সম্পাদক প্রতাপকুমার রায়ের সঙ্গে যখন লুভর (Louvre) মিউজিয়ামে শিল্পের ইতিহাস আর ইতিহাসের শিল্প দেখে বেড়াচ্ছিলাম, তখন অনেক অদেখার দুঃখেও মনকে শান্ত করেছিলাম এই বলে যে পরে যদি আবার এই ইউরোপীয় শিল্পের মহাতীর্থে আসবার সুযোগ পাই, দর্শন শুরু করব আরও সকালে এবং পরপর কয়েকটা দিন শুধু লুভর দেখেই কাটাব । এবার সেই লুভরও যাওয়া হল না । পরে কলকাতায় ফিরে মৈত্রেয়ীর মুখে যখন শুনলাম খুব সস্তায় একটা টিকিট কাটা যায় যা দিয়ে প্যারিসের সব কটি যাদুঘরে যতবার খুশি যাওয়া যায়, তখন আমার দুঃখ আরও বেড়ে গেল । মৈত্রেয়ী দিনের পর দিন ওইসব মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে দুচোখ ভরে দেখেছে আর খাতার পাতা ভরে নোট করেছে, কলকাতায় ফিরেই ওকে যেতে হয়েছিল হায়দ্রাবাদে ফরাসি লেখাপড়ার কাজে, ফিরে এসে খাতাটি আর খুঁজে পায়নি ।

ভের্সাই বা লুভর বা আরও অনেক বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বা গন্তব্য এযাত্রা বাদ গেল তার কারণ দিনের কাজকর্ম মিটিয়ে খালি হতে হতে দিনও শেষ হয়ে যায়, তখন কোথাও আর যাত্রা শুরু বা দর্শন আরম্ভ করার সময় থাকে না । এইসব দিনে আমি সন্ধেবেলা শাঁজেলিজে (Champs-Elyse' es) গিয়ে ফুটপাতের কাফেতে এক কাপ কফি বা এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে বসে থাকি । বিশ্বকাপের খেলায় যেদিন যে দেশ জেতে সেদিন সে দেশের মানুষ ফুটপাত জয়োল্লাসে ভাসিয়ে, স্বদেশী গান-বাজনায় পুরো রাস্তা মাতিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে যায়, সে এক ভারি আনন্দের দৃশ্য । কখনও আবার তারা কাফেতেই বসে পড়ে, বসে-দাঁড়িয়ে চলতে থাকে গান-বাজনা, সমবেত নাচ । বিশ্বকাপ ফুটবলের দৌলতে শাঁজেলিজেতে বসেই আমার অনেক দেশের গান-বাজনা শোনা হয়ে গেল ।

এরমধ্যে একদিন, যখন মালাকফে ছিলাম, টেলিফোনে আমাকে নেমন্তন্ন করলেন দীর্ঘদিনের ফরাসিদেশপ্রবাসী অসীম রায় ও তাঁর বন্ধু ও বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । এঁরা দুজন এবং এঁদের আরেক বন্ধু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আবাল্য সুহৃদ ভাস্কর দত্ত গাড়িতে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে সবে অসীম রায়ের গৃহে ফিরেছেন, ভাস্কর সেদিনই লন্ডন চলে যাবেন, তিন বন্ধুর জমাটি আড্ডা চলছে, সেখানে সামিল হবার ডাক পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হল, কিন্তু আমার সেদিন মালাকফ ছেড়ে যাবার উপায় নেই, ফ্রান্সের এক গ্রামে এক মেষপালকের বাড়িতে আমার কিছুদিন থাকার কথা, তাদের গ্রামে তাদের মতোই জীবনযাপন করব, ব্যবস্থা করে দেবে ওই বাড়িরই একটি মেয়ে, সে ওই মেষপালক ছেলেটির দিদি, মেয়েটির সঙ্গে মাদাম ঘোষের অনেকদিনের চেনাশোনা, সে প্যারিসের হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে, আজ আসবে কতদূর কী হল জানাতে ।

আমি তাই নিরুপায় হয়ে যেতে পারছি না, ফোনেই সবিনয়ে জানাই, ওঁদের পক্ষে যদি এখানে আসা সম্ভব হয় তাহলে এই বাগানে বসে দুয়েক গ্লাস ফরাসি ওয়াইন ও দুয়েক ঘণ্টা বাঙালি আড্ডা চলতে পারে ।

অসীম রায় বললেন, বাগান তো আমার বাড়িতেও আছে, চলে আসুন, বেশ বড় বাগান ।

হঠাৎ ভাস্কর দত্তের গলা-চলে আসুন তো, কেন এত হেনস্থা করছেন ভাই?

এর ঠিক আট মাস পরে বন্ধুদের সবাইকে চরম হেনস্থা করে ভাস্কর তাঁর দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুনীল ও অসীমের সঙ্গে মানালিতে বেড়াতে গিয়ে প্রায় চোখের পলকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ।

তিন বন্ধুর আড্ডায় আমার যাওয়া হল না, প্যারিসের কত কী আমার দেখা হল না, এদিকে নিস (Nice) যাবার সময় হয়ে গেল ।

যেতে নাহি দিব

ওসলো আসার পর থেকেই বিড়াল দুটি সর্বদাই টেবিলের ওপর, আলমারির মাথায় উঠে বসে থাকে, ওসলোর ভয়ে নিতান্ত দায়ে না পড়লে নিচে নামে না । এদের মধ্যে কালো বার্মিজ বিড়াল ইয়োফি (Yofi, হিব্রু শব্দ, অর্থ O.K., well, good) খুব বুদ্ধিমান, উঁচু থেকেই ওসলোর ঘুমের গভীরতা যাচাই করে, নিশ্চিন্ত হলে তবেই খেতে-টেতে নামে । শ্বেতাঙ্গটির নাম ফাফা (Fafa), যার অর্থ 'কিছুই না' । নামের মানেটি যেমন, বুদ্ধিতেও তেমনই, ফাঁপা, সে প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার ওসলোর তাড়া খেয়েছে ।

অনেক সময়ই বাড়িতে আমার সঙ্গী বলতে এই ওসলো, ইয়োফি আর ফাফা ।

নিস যাবার দিন, নিসের বিমান ধরব বলে খুব নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ ওসলো টের পেয়ে গেল । ধন্য এদের কান আর নাক! দৌড়ে এসে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জুতো কামড়ে, ব্যাগ ধরে টানাটানি করে, সে এক মর্মান্তিক অবস্থা । কিছুতেই তাকে আর থামাতে পারি না, অবিশ্রাম লম্ভঝম্ভ আর তর্জন গর্জন, মাঝে মাঝে কুঁই কুঁই করে কান্না ।

এদিকে প্লেনের সময় হয়ে যাচ্ছে, আমি যতবারই দরজা খুলতে যাই, সেই ছ-ইঞ্চি ফাঁকে ওসলো তার মাথা গলিয়ে দেয়, সে আমার সঙ্গেই বেরোবে, কাঁধে ও হাতে ব্যাগ নিয়ে আমি যতদূর পারি তাকে টেনে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে আনি । আবার বেরব

বলে যেই দরজা খুলতে যাই সেও অমনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়, দরজার ফাঁকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে তার মাথাটা গলিয়ে দেয়, এটা যে তার পক্ষে কত বিপজ্জনক তা যেন তার জানবার বা দেখবার কথাই না, বা সে সময় তার নেই ।

গ্রেগোয়া, জাঁ য়্যুগো, মোনিক যে যার কর্মস্থলে, এদিকে ওসলো যেন তার সর্বশক্তি দিয়ে সর্বস্ব পণ করে আমার সঙ্গে আসবেই, কখনও আমাকে সগর্জনে বকছে, কখনও কুঁই কুঁই করে কাঁদছে, কিছুতেই আমাকে ছেড়ে থাকবে না!

অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে এক ফাঁকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই ওসলো দরজার ফাঁকে গলা বাড়িয়ে দিল । করিডরের আলোর সুইচ তখনও টিপতে পারিনি, দরজার ফাঁকে ওসলোর গলা, কিছুতেই সে গলা ভেতরে নেবে না, শেষ পর্যন্ত ব্যাগ নামিয়ে রেখে এক হাতে খুব জোরে বিদ্যুৎগতিতে তার মুখ ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আরেক হাতে নিমেষে দরজা টেনে দিলাম ।

প্লেন থেকে নিচে ঝাপসা স্থলভূমি ও তার ওপরে হালকা মেঘের আস্তরণের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বার বার মনে পড়ছিল একটি স্বর্ণবর্ণ অবোধ শিশুর মুখ, যে আমাকে ছেড়ে থাকতে চায়নি । একটু পরেই নিচে ভূমধ্যসাগরের নীল আর তার কিনার জুড়ে নিস দেখতে পেলাম ।

৩

জগৎপারাবারের তীরে

ফ্রান্সের বিখ্যাত দক্ষিণদেশ কোৎ দাজুর (Côte d'Azur)-এর মাঝামাঝি জায়গায় সুন্দর সমুদ্রশহর নিস প্রধানত পর্যটকদের জন্যই, ফলে প্রচুর হোটেল । একশো-দেড়শো ফ্রাঁ থেকে এক-দেড় হাজার ফ্রাঁ-সব রকম দামের ঘর পাওয়া যায় । ট্যুরিস্ট আসারও যেন বিরাম নেই । সকাল থেকে রাত সারা পৃথিবী থেকেই লোকে বেড়াতে আসছে । তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের এই সৈকতাঞ্চল পৃথিবীর ধনীদের বা ধনিকশ্রেষ্ঠদের আরাম আয়েসের জায়গা হিসাবেই বেশি পরিচিত । ইউরোপের একটা ভ্রমণগাইড বইয়ে পর্যটকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে-৩৭ নম্বর প্রমনাদ দে আঙ্গলে (Promenade des Anglais)-তে বিখ্যাত নেগ্রেসকো (Hôtel Negresco) হোটেলে এক কাপ কফি খাওয়ার জন্য একবার যাওয়া উচিত, ওটি অন্তত চোখের দেখাও দেখা দরকার । রানি এলিজাবেথ,

ওয়াল্ট ডিজনি প্রমুখ মহামানুষেরা নিসে এলে এই হোটেলেই থেকেছেন । এখানকার একটা ডিলাক্স ডাবলরুমের ভাড়া সাড়ে তিনশো মার্কিন ডলার । এটা ৯৪ সালের হিসেব ।

নিসের সমুদ্রতীরে বালুকার বদলে নুড়িপাথর । সেখানে শয়ে শয়ে শায়িত নরনারী, অধিকাংশই নারী, সকলেই রৌদ্রস্নানরত । মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সমুদ্রস্নান করছে । পরমুহূর্তেই চিৎ বা উপুড় হয়ে সমবেত রৌদ্রস্নান । লোকালয়ে এরকম দৃশ্য দেখা যায় না বলে হঠাৎ মনে হয়, কোনও অলৌকিক জগতে এসে পড়েছি! ওই তো, জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা!

রৌদ্রস্নানার্থীদের পোশাকের সামান্য দুয়েকটি টুকরোর বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, কেননা পুরো পোশাকটির আশ্চর্য বাহার বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই । ওই আশ্চর্য পোশাক পৃথিবীর কোনও ডিজাইনার বা দর্জি-ই বানাতে পারবে না, এ পারে শুধু মহাবিশ্বের কবি ও ঈশ্বর, আমাদের বাউলগানের সেই একজনা, মনুষ্যের জন্মমুহূর্তে ।

সৈকতের সমান্তরাল বাঁধানো উঁচু রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, এক জায়গায় বেশ খানিকটা জায়গায় বালির গদি, চারপাশ রেলিং দিয়ে ঘেরা, সেখানে লেখা আছে-এটা শুধুই ছোটদের জন্য ।

বহু বিখ্যাত লেখক-শিল্পীদের নিসের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের কথা অনেকেই জানেন । পিকাসো, মাতিস, শাগাল তো কোৎ দাজুরে বসবাসও করেছেন । এঁদের মিউজিয়ামগুলি এখানকার আদরের ধন ।

ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র মোনাকো নিস থেকে ২২ কিলোমিটার । নিসে এলে মোনাকো মন্টিকার্লো আসাই যেন নিয়ম । মোনাকোয় প্রিন্সের প্রাসাদে রোজ দুপুর বারোটায় আনুষ্ঠানিক প্রহরী পরিবর্তন দেখতে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে । মোনাকোর প্রিন্সের নাম রেনোয়া । রাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রও নয়, মোনাকোয় আছে প্রিন্সিপ্যালিটি ।

নিস থেকে সকাল নটায় বেরিয়ে একবেলার একটি প্যাকেজ ট্যুরে মোনাকো মন্টিকার্লো ছাড়াও ঘুরে এলাম এজে (Eze) নামে প্রাচীন একটি গ্রাম । এজের বিখ্যাত পারফিউম কারখানায় নানা সুগন্ধীর ইতিহাস শুনে, সুগন্ধী তৈরির পদ্ধতি দেখে, গন্ধ বিচার করে সম্পূর্ণ নিখরচায় প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়, আবার সামান্য বা অসামান্য খরচে বিখ্যাত গন্ধদ্রব্য সংগ্রহও করা যায় । এক ইতালীয় ভদ্রলোককে দেখলাম সঙ্গের দুই কিশোরী কন্যার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে বহু সুগন্ধী ক্রয় করলেন । মনে হয়, ভদ্রলোক বিপত্নীক অথবা অতি সম্প্রতি স্ত্রী এঁকে ছেড়ে গিয়েছেন, এখন দুই কন্যার মন মায়ের দিক থেকে ফিরিয়ে আনতে তাদের প্রভূত গন্ধ উপহার দিচ্ছেন ।

একটা বই পড়ে ভেবে রেখেছিলাম নিস থেকে ট্রেনে এদিক ওদিক ঘুরব । হয়তো কান (Cannes) চলে যাব, মোনাকো-মন্টিকার্লোও ট্রেনেই যাব । শেষ পর্যন্ত ট্রেনে চড়াই হল না, একবেলার প্যাকেজ ট্যুরের শেষ গন্তব্য মন্টিকার্লো দেখে বেলাবেলি নিসে ফিরে এলাম । মন্টিকার্লো দুপুরের চেয়ে রাতে এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে ধনী ও বিলাসী ও জুয়াড়িদের পক্ষে অধিক রোমাঞ্চকর ।

রাত দশটা নাগাদ নিসে হোটেলের ছোট লাউঞ্জে বসে রাস্তার লোক দেখতে দেখতে ভাবছি এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লে হয়, রিসেপশানের লোকটি বলল, আমার দেশ যে শ্রীলঙ্কায় সে আমার মুখ দেখেই তা বুঝেছে । তার বাবা অনেকদিন শ্রীলঙ্কায় ছিলেন । তাঁর ছিল সেমি প্রেশাস স্টোন কেনাবেচার ব্যবসা, সে নিজেও একবার বাবার সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় গেছে, সে খুব অবাক হয়ে গেছে-আমি এই চমৎকার সন্ধ্যায় ডিসকোথেকে না গিয়ে হোটেলে বসে আছি! মাত্র তিন মিনিট হেঁটে গেলেই একটা খুব ভালো ডিসকোথেক । কোনও এন্ট্রি ফিও নেই । যান না, এক প্রস্থ নেচে আসুন, ভালো ঘুম হবে ।

ঘুমের আশায় নয়, এমনিই চলে গেলাম সেই ডিসকোথেকে । এন্ট্রি ফি না থাকলেও কুড়ি ফ্রাঁ দিতে হল, বিনিময়ে নাকি এক গ্লাস ওয়াইন দেবে ।

ভেতরে ঢুকে দেখি মস্ত বড় জায়গা । কমবয়েসী ছেলেমেয়ে গিজগিজ করছে । একজায়গায় দেখলাম পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে হাতে-মুখে রং লাগাচ্ছে । একটি ছেলে আমাকে বসতে দিয়ে বলল, তোমার মুখে রং লাগিয়ে দেব?

আমি মৃদু হেসে জানালাম, রং দেখতে ভালোবাসি, মাখতে নয় ।

তাহলে আমার মুখে রং দিয়ে কিছু এঁকে দাও । বলে একটা আঠেরো-কুড়ি বছরের মেয়ে তার মুখ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ।

আমি অন্যদের দেখাদেখি প্রথমে তার একটা হাতে ও পরে গালে ও কপালে টিউব বদলে বদলে কয়েকটা রং লাগিয়ে কিছু একটা আঁকতে চেষ্টা করলাম । হঠাৎ ভাবনা হল, আঁকাটা একেবারে বিদঘুটে হয়ে যাচ্ছে না তো?

ক্রমেই আরও ছেলেমেয়ে ঢুকছে, একটু পরে কান ফাটানো বুক কাঁপানো বাজনা আর আলোর কুহেলি শুরু হতেই হলভর্তি ছেলেমেয়ে নাচতে শুরু করল, আমার মনে হল হয়তো সাত-আটশো ছেলেমেয়ে এখানে নাচছে । যারা রং দিয়ে সেজেছে, তারা টেবিল ছেড়ে নাচতে যাবার সময় আমাকেও নাচের নিমন্ত্রণ জানাল । আমি ধন্যবাদ জানিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের ব্যথার কথা বললাম ।

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দিন দশেক আগে আমার হাত ফসকে আমারই ভারি স্যুটকেস পড়ে আঙুলটা বিষিয়ে গেছে, পুরো নখটাই একেবারে নীল হয়ে আছে । আমার এক সময়ের প্রিয় কবি স্যাঁ জাঁ পার্সের 'আনাবেজ' (Anabase) কবিতায় একটা লাইন পড়েছিলাম, আমার দুর্বল বাংলায় সেটা এইরকম-এক টুকরো আকাশ নীল হয়ে ওঠে আমাদের নখের ঢালুতে (Un peu de ciel blueit au versant de nos ongles) । নোবেলজয়ী ফরাসি কবির সেই পংক্তিটি ফরাসি দেশে এসে আমারই জীবনে ফলে গেল!

যাই হোক ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে বসে বসে ঘণ্টাখানেক ছেলেমেয়েদের উদ্দাম নাচ দেখে হোটেলে ফিরে এলাম ।

মহাশূন্যে স্নেহস্পর্শ

পরদিন নিসকে বিদায় জানালাম । সমুদ্রশহর নিসের বিমানবন্দরটিও সমুদ্রের গায়েই । প্লেন ওপরে উঠতেই নীল সমুদ্রও ক্রমে মিলিয়ে গেল । যেন সমুদ্র নেই, পৃথিবী নেই, মর্ত*্যলোক সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে, শুধু মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছি । তারই মধ্যে প্রথম মেঘের টুকরো দেখেই মনে পড়ল একটু পরেই ওসলোর সঙ্গে দেখা হবে ।

লোভালোয়ায় পৌঁছলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ, তখন নীল আকাশে ঝকমকে রোদ, এদেশে যাকে বলে রৌদ্রঝলমল সুন্দর একটি দিন ।

দুপ্রস্থ দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকে একটু অবাকই হলাম, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই । তবে কি ওসলো হাসপাতালে, নাকি ওকে আর সামলাতে না পেরে ওর গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে! অথবা, কিছুদিন ধরেই যেমন কথা হচ্ছিল, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কোনও ল্যাব্রাডর-প্রেমিককে সারমেয় সম্প্রদান করা হয়ে গেছে! কুকুর পোষার জন্য পাগল হয়েছিল, কুকুর পুষতে গিয়ে কদিনেই পাগল মোনিক রাগের মাথায় এসব বললেও সে প্রাণে ধরে তার ওসলোকে ত্যাগ করতে পারবে বলে মনে হয় না । তিতিবিরক্ত হয়ে যদি বা সে-চেষ্টা করেও, জাঁ য়্যুগো থাকতে তা নিশ্চয় হবার নয় । জাঁ য়্যুগো মাকে শাসিয়ে রেখেছে, ওসলোকে এবাড়ি থেকে কেউ তাড়াবার চেষ্টা করলে সে নিজেই গৃহত্যাগ করে ওসলোকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবে ।

আমার ঘরের দরজায় চাবি থাকে না, খোলা-বন্ধের সময় শুধু একটা শব্দ হয় । দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেছি, হঠাৎ জাঁ য়্যুগোর ঘরে কিসের শব্দ, কেউ যেন জিনিসপত্র আনাড়ি হাতে নাড়াচাড়া করছে । আজ শনিবার, ছুটির দিন, হয়তো য়্যুগোই এখনও ঘরে বসে আছে, দিনের আলো নিভলে নাচতে যাবে, আমি একটু গলা তুলে বললাম, নিস জায়গাটা

ভারি চমৎকার জাঁ য়্যুগো! আমাদের ভুটানের মতো, ছোট্ট অথচ স্বাধীন দেশ! তবে ভুটান হল পাহাড়ের গায়ে আর নিস সমুদ্রের ধারে।

য়্যুগোর ঘরের দরজা খোলা কিন্তু কোনও উত্তর নেই, শুধু সেই জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ।

এগিয়ে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি-ওসলো। তার মানে আমি যে ফিরেছি সে জানে, শব্দ করে আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে, তবু নিজে থেকে কাছে আসবে না!

যে ওসলো আমাকে এক-আধবেলা না দেখলে বাড়িফেরা মাত্র আমার গায়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একসা করে, আনন্দে উল্লাসে লন্ডভন্ড করে ঝড় বইয়ে দেয়, সেই ওসলো আমি তিনদিন পর বাড়ি ফেরা সত্বেও একবারও কাছে এল না, একবার ডাকল না পর্যন্ত! তবে কি খুব বেশি অসুস্থ? মেঝেতে পেট বুক গলা ঠেকিয়ে শুয়ে আছে। চোখ বুজে ছিল, আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে, চোখ খুলতেই আমার সঙ্গে খুব শান্ত চোখাচোখি হল। আমি তার মাথায় হাত বোলাতে গেছি, হঠাৎ সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাতে আমাকে আঁকড়ে, ল্যাজ নাড়িয়ে যা শুরু করল তাকে ভালোবাসার বসন্তোৎসব বলব, নাকি কালবৈশাখী বলাই উচিত, বুঝতে পারলাম না। ওসলোকে নিয়ে আমার ঘরে ফিরে এলাম, এতক্ষণে চোখে পড়ল দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা-

Welcome Amar!

I'm absent till about 7.00 pm.

Help yourself in Fridge:

– Apple Juice

– Libanon Food

et....

See you

Monique

এই ঘটনার পর ওসলোর সঙ্গে আমার সখ্য এমনই পর্যায়ে পৌঁছল যে আমাকে আমার ঘরের বাইরে পেলে আর ছাড়তে চায় না। একদিন সকালে, তখনও কলকাতায় আমাদের অফিস খোলেনি, আমি টেলিফোনে বাড়িতে আমার সহকারী সম্পাদক মহাশ্বেতাকে

শারদীয় ‘ভ্রমণ’-এর ক্রোড়পত্র বিষয়ে দুয়েকটি পরিকল্পনার কথা বলছি, ভারতে টেলি ধর্মঘটের জন্য আগের দিন সারাদিন প্যারিসের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছোট বড় নানা পোস্ট অফিস থেকে ফ্যাক্স পাঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আজ ফোনে কাজ সারছি, কখনও আমার পায়ের কাছে লেপটে থাকা, কখনও আমার কোমর পর্যন্ত আঁকড়ে ধরায় ব্যস্ত ওসলোর নিজের প্রতি সেই অমনোযোগ সহ্য হচ্ছিল না, সে অর্ধেক গুটনো নখে ও দুয়েকটি কচি দাঁতে আলতোভাবে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলল। আমি ফোনে কথা বলতে বলতেই ‘উঃ আ! আঁচড়াসনি কামড়াসনি’, করছি শুনে মহাশ্বেতা বেশ অবাক হয়ে বলল, কুকুর কামড়াচ্ছে কলকাতায়, আমাকে, আর তুমি প্যারিসে বসে উঃ আঃ করছ, কী ব্যাপার!

তার মানে? কুকুর তো আমাকেই কামড়াচ্ছে, প্যারিসের কুকুর প্যারিসেই কামড়াচ্ছে, উঃ আঃ তাই প্যারিসে বসেই করছি!

জানা গেল, আমাদের বাড়িতেও একটা সারমেয় শাবক এসেছে।

শুনে মোনিকের খুব আনন্দ। এক পাক ঘুরে নিয়ে বলল, তুমি ফিরে গিয়ে ওসলোকে ভুলে যেও না, ওদের দুজনের ব্যাপারে আমরা খুব ঘন ঘন ফ্যাক্স বিনিময় করব।

কলকাতায় ফিরে, ছ মাস পর, মোনিকের ফ্যাক্স পেলাম-

প্রিয় অমর,

আমার প্রতিদিনের জীবনটা কেমন তুমি জানো, তার আর কোথাও কোনও বদল নেই। সব সময়ই আমি খুব বেশি ব্যস্ত। তোমাদের ল্যাব্রাডর কেমন আছে? ওসলো ভারি সুন্দর হয়েছে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা খারাপ কাজ করে, কার্পেট চেয়ার টেবিল সোফা খেয়ে ফেলে। কিন্তু যাই বলো, আমরা তাকে ভালোবাসি।

শতাব্দীর শেষ বছরটি তোমার ও বাড়ির সকলের খুব সুখে কাটুক।

ইতি

মোনিক

এদিকে আমার বার্লিন যাবার সময় হয়ে গেছে। মোনিকেরা তিনজন অফিসে। ঘরের তিনজন, ওসলো, ইয়োফি আর ফাফার কাছে বিদায় নেওয়া দরকার। মাদাম ঘোষ কলকাতা অথবা কটকে। সঙ্গে নিয়ে গেছেন তাঁর বন্ধু সোলভেগকে, ইনি লুক্সেমবুর্গ বাগানে (Jardin du Luxembourg) সেনেটে কাজ করেন, নিস থেকে লোভালোয়ায়

ফিরে কলকাতার টেলিফোনে শুনলাম এঁরা কলকাতায় আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন। তারপর কলকাতায় কটকে ছুটি কাটিয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসার আগে আরেকবার যখন আমাদের বাড়িতে এলেন আমি ততদিনে বার্লিন মিউনিখ ভিয়েনা হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি, মাদাম ঘোষের সঙ্গে আপাতত শেষবার আর সোলভেগের সঙ্গে সেই প্রথমবার আমার দেখা হল, আমাদের খাবারের টেবিলে। সোলভেগ শুনলাম আগেও অনেকবার ভারতে ঘুরে গেছেন, কেদার-বদ্রী গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী লাদাখ হিমাচল তাঁর ঘোরা হয়ে গেছে। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক খেতে খেতে তিনি তাঁর ভারতভ্রমণের আরও নানা উচ্চাশার কথা শোনালেন।

ওসলো, ইয়োফি, ফাফার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার্লিনের প্লেন ধরতে আমি শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে যাবার জন্য এয়ার ফ্রাঁসের বাসে চড়ে বসলাম।

তখন কি আর জানতাম, বার্লিনে মিউনিখে আমার ভবিষ্যতের অনেক বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে।

ভ্রমণ এপ্রিল থেকে জুন, ১৯৯৯

অযোধ্যা পাহাড়

বিশ্বদীপ দত্ত

পশ্চিমের বিহার থেকে ভাসতে ভাসতে পুরুলিয়া জেলায় ঢুকে এসেছে কিছুটা পাহাড়ের ঢেউ। তারই জঙ্গলে আদিবাসীদের শিকার উৎসবের পুণ্যভূমি অযোধ্যাবুরু। হাজার দুয়েক ফুট উঁচু সেই পাহাড়ের ওপরটা প্রায় সমতল। হালকা ঢেউ খেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ, শস্যখেত, মাঝে মাঝে কয়েক ঘর কুটির নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম, আর এদিকে ওদিকে আরও উঁচু কয়েকটা পাহাড়চুড়ো। থাকার জন্য পর্যটন বিভাগের লজ আছে সেখানে। আগে কেবল ডর্মিটরি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা ছিল। হাঁটাপথে পাহাড়ে চড়ে রাত কাটাতে যেতেন অভিযানপ্রিয় তরুণদের দল। এখন মাত্র ৫০ টাকা ভাড়ায় দুজন করে থাকার জন্য কটেজ হয়েছে। আরও ভালো ব্যবস্থায় থাকার মতো বাংলো করেছেন এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন। বাসও গিয়ে পৌঁছচ্ছে এখন পাহাড়ের ওপরে। পুরুলিয়া শহর থেকে বাসে চড়ে বা জিপ ভাড়া করে নির্জন পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আজকাল অযোধ্যাবুরু যাচ্ছেন শৌখিন পর্যটকেরাও। এক দম্পতিকে দেখলাম মোটর সাইকেল নিয়েই পাহাড়ে উঠেছেন।

সকালটা ময়ূর পাহাড়ে কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ফুলডি গ্রামের দিকে। ময়ূর পাহাড় মাত্র পনেরো মিনিট লাগে হেঁটে উঠতে। ওপর থেকে ভারি সুন্দর দেখায় দূরের পাহাড়ের সারি, নিচের সবুজ শস্যখেতের মধ্যে লাল টালির চালের ঘরবাড়ি। আর কিছুটা হেঁটে চাডড়ি পাহাড়েও ওঠার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাপারমবেড়া গ্রামের লোকেরা জুতো পায়ে দিয়ে চাডড়িতে যেতে নিষেধ করলেন। সেই পাহাড়কে দেবতা বলে পুজো করেন তাঁরা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বামনি ফলস দেখতে যাবার কথা। বামনি ঝরনা ট্যুরিস্ট লজ থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে শর্টকাটে হেঁটে ঘণ্টা খানেকে পৌঁছনো যায় সেখানে। তবে লোকালয়ের বাইরে সেদিকটা নাকি বিকেলের পর বিপজ্জনক হতে পারে। যাওয়া ভালো সকালবেলাতে। কিন্তু ট্যুরিস্ট লজের ডর্মিটরির ছেলেদের দলটা ঝরনা দেখতে রওনা দিল দুপুরের পরেই। বলে গেল-জঙ্গলই নেই, তো জংলি জানোয়ার আসবে কোথা থেকে!

জঙ্গল নেই এটা ঠিক নয় । আগের তুলনায় গাছ কমে গেছে অনেক । জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পথঘাট, পাহাড়ের নিচে বিশাল অঞ্চল জুড়ে অফিস আর প্রোজেক্টের স্টাফ কোয়ার্টার্স তৈরি করতে গাছ কাটা হয়েছে প্রচুর । গরিব মানুষও অভাবের তাড়নায় গাছ কেটে ফেলেন রুজি জোগাড়ের চেষ্টায় । ফলে গাছ কমছে নানাভাবেই । আবার নতুন গাছও লাগানো হয়েছে । বেশ ঘন জঙ্গলই রয়েছে পাহাড়ের ঢালে দিকে দিকে । দেখা যায় নিচ থেকে ওপরে উঠে আসার পথে । শাল, সেগুন, মহুয়া, শিমুল, কুসুম, পলাশ গাছ রয়েছে অজস্র । বসন্তে পলাশ ফুল লাল করে তোলে সমস্ত অঞ্চল । বন্যপ্রাণীও কম নয় । পাখি আর সরীসৃপ অসংখ্য । হরিণ, খরগোশ, সজারু, হনুমান বিপজ্জনক নয় কিন্তু নিরালা অরণ্যে ভয়ের কারণ হাতি, ভাল্লুক, বুনোশুয়োর । চিতাবাঘও আছে কাছাকাছি জঙ্গলে । বুনো হাতির জন্যই বেশি চিন্তা । আগের দিনই শুনে এসেছি পাহাড় থেকে হাতির পাল নামছে নিচের লহরিয়া, কুদনা গ্রামে । পাহাড়ের ওপরের ধানখেতগুলোতেও গাছের ওপর মাচাবাঁধা হয়েছে রাতের পাহারার জন্য । সন্ধের অন্ধকারে গ্রামের পথে যেতে বড় গাছের ছায়া দেখে হঠাৎ চমকে উঠছে লোকে হাতি দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ।

দলমা থেকে এদিকের পাহাড়তলির সমস্ত গ্রামেই ধানপাকার সময় হাতি নেমে আসা প্রতিবছরের সমস্যা । ভালুক চলে আসে পথের ধারে মহুয়া গাছ থেকে ঝরে পড়া মহুয়া খেতে । তীরধনুক, বল্লম, টাঙ্গি এদিকের বাসিন্দাদের চিরকালের অস্ত্র । বন্দুকও রাখা হয় এখন অনেক গ্রামে । খেতের পাশে উঁচু মাচা বেঁধে রাতের দিকে পাহারায় বসে গ্রামের লোক । দূর থেকে হাতি আসতে দেখলে ঢোল-ধামসা বাজিয়ে হইচই করে চেষ্টা করে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে । বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজও করা হয় । তবে অনেক সময়ই যথেষ্ট হয় না পাহারা ব্যবস্থা । হাতি এসে লণ্ডভণ্ড করে যায়, এমনকী বাড়ির কলাবাগানও ।

বন্যপ্রাণী-শিকার আইন করে বন্ধ করা হয়েছে । যদিও বৈশাখ মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে আদিবাসীদের শিকার উৎসবে প্রাণী-হত্যায় বাধা নেই । অন্য সময়ে শিকার হয় লুকিয়ে চুরিয়ে । খরগোশ, সজারু ছাড়াও মাংসের জন্য মারা হয় হরিণ, বুনোশুয়োর । আমলকী, বহেরা খেতে ভালোবাসে হরিণ । জঙ্গলে গাছের নিচে ঝরে পড়া বহেরা খেতে হরিণ আসবেই, তখন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তীরধনুক নিয়ে হরিণ শিকার রোমাঞ্চকর বলে জানালেন গ্রামের যুবক । শিকার উৎসবে তিনি প্রতিবছরই কিছু না কিছু শিকার পেয়ে আসছেন । আদিজনের সমাজে এটা অত্যন্ত সম্মানজনক ঘটনা । উৎসবের রাতে চাঁদের আলোয় শিকারের আশায় ধনুক-কুঠার-বল্লম হাতে পাহাড়ে ছুটে বেড়ায় হাজার হাজার মানুষ । বাংলা-বিহারের দূরদূরান্তের গ্রামগুলো থেকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে আদিবাসী তরুণরা জমা হয় দলে দলে । এমনকী দলবেঁধে তরুণরা আসেন দূর মেদিনীপুরের গ্রামগুলো থেকেও । শিকার উৎসবে যোগ না দিলে ছেলে সাবালক হয় না

বলে মনে করে আদিবাসী সমাজ। সারাবছর তারা অপেক্ষায় থাকে বছরের সেই সময়টার জন্য।

ভাবছিলাম শিকার উৎসবের সময় একবার অযোধ্যায় আসব। আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন স্থানীয় যাঁদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে তাঁরা প্রত্যেকেই। অজিত মাহাতো নিজে শিকার না করলেও দেখতে যান প্রত্যেকবারই। বলছিলেন সারা রাত ধরে শিকারের পিছনে ছোটার উন্মাদনার গল্প। বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কীভাবে জাল পেতে জঙ্গল ঘিরে শিকার তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। পাহাড় জুড়ে সেই উন্মাদনার ছবি তুলে রাখতে পারলে খুবই আকর্ষণীয় হবে। যদি আমি আসতে রাজি থাকি তবে আমার জন্য অস্ত্র জোগাড় করে রাখবেন বলে জানালেন অজিত। অস্ত্র দিয়ে কী হবে! আমি তো শিকার করতে যাব না, যাব ক্যামেরা নিয়ে! কথা শুনে অজিত অবাক। শিকার উৎসবে কেউ অস্ত্র ছাড়া যায় না কি! একটা জানোয়ার তাড়া করলে নিজেকে বাঁচাতে তো হবে। আর, সারা পাহাড় যখন মাতাল হয়ে শিকারের পিছনে ছুটছে তখন একজন লোক খালি হাতে ঘুরছে এটা দেখাবেই বা কেমন!

সন্দেহ নেই সেটা খুবই বাজে দেখাবে। আপনি যে দেখতে যান সে কি অস্ত্র হাতে নিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম অজিতকে। সে তো বটেই। খাটের নিচ থেকে একটা প্রকাণ্ড কুঠার টেনে বের করল অজিত। এছাড়া আরও আছে। কিছু না কিছু সঙ্গে রাখতেই হয়। প্রয়োজনে ঘাও মারতে হয় তা দিয়ে। তাড়া খাওয়া বুনোশুয়োর বড় ভয়ংকর। সোজা ছুটে এসে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ভারি শরীর দিয়ে। তারপর কামড়ে হাঁটু গুঁড়ো করে দেয়। শুয়োর কামড়ায় বলে কখনও শুনিনি। দুপাশের ধারাল দাঁত দিয়ে পেট ফুটো করে দেয় বলেই জানতাম। তাও করে, বলল অজিত। সঙ্গে কামড়ও দেবেই। আর সেটা সবসময়ই হাঁটু বা কনুইয়ের জোড়া হাড়ে। একটা কামড়ে ধরাশায়ী প্রতিপক্ষের হাঁটু পুরোপুরি গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যায়। আর সারিয়ে তোলা যায় না।

এবছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন কয়েক আগেই অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরের হাসপাতালে ডাক্তারের পদের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন কাজল রায়। বলছিলেন শিকার উৎসবের আগে তাঁর আতঙ্কে দিন কাটানোর গল্প। আতঙ্ক কীসের, বুঝতে পারছিলাম না আমি। হাসলেন কাজলবাবু। তেমন কিছু নেই ঠিকই। কিন্তু শহর ছেড়ে পাহাড়ের অপরিচিত পরিবেশে নতুন এসে একটু ভয় লাগে। প্রথমদিন এসে পৌঁছেছিলাম বিকেলবেলা। হাসপাতালের বিশাল কোয়ার্টার। একটা ঘর ঝেড়ে মুছে রাত কাটানোর মতো করে তুললাম। বাথরুমটা খুলতেই ভেঙে পড়ল বেসিন আর আয়না। সারারাত অন্ধকারে খুটখাট শব্দ। টর্চ জ্বেলে কখনও দেখছি বাইরে দিয়ে কুকুর চলে যাচ্ছে, কখনওবা জানালার কাচে

গঙ্গাফোড়িং ফর ফর করছে । মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীতে মানুষ আমি একা । কখন ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না । ভোরবেলা উঠে দেখি চারদিক সবুজে সবুজ । আস্তে আস্তে ভালো লাগল জায়গাটাকে । তবে শিকার উৎসবের সম্বন্ধে শুনেছিলাম রাতভর মহুয়া হাড়িয়া খেয়ে সবাই শিকারের পিছনে ছোটে । অন্ধকারে হঠাৎ ছুড়ে দেওয়া তীর-বল্লমে বা শিকার ভাগাভাগির সময় নিজেদেরই অস্ত্রে আহত হয়ে যায় শিকারীরা । ভাবছিলাম রাতে মুমূর্ষু রোগী নিয়ে যদি হাসপাতালে চড়াও হয় দলে দলে লোক, সামলাতে পারব তো সব দিক! স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলেই আতঙ্কিত হয়ে ছিলাম প্রথম প্রথম, বললেন ডাক্তার । এখন সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয় ।

পাহাড়ের হাসপাতালে ডাক্তারবাবু থিতু হয়েছেন এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা । প্রায় হাজার কুড়ি লোক নির্ভর করে সেই হাসপাতালের ওপর । এবং ওষুধপত্রও রয়েছে যথেষ্ট বলে জানালেন কাজল রায় । সমস্যা শুধু কাজের পরে সময় কাটানো । ভ্রমণকারীরা আসলে ভালো লাগে । খাবারের হোটেলে আড্ডা জমে তাদের সঙ্গে । আরেকটা সুখবর, এবছর নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ আশা করা যায় চালু হয়ে যাবে অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরে টাউন লাইব্রেরি । পত্রপত্রিকা রাখা হবে নানারকম । স্থানীয়দের তো বটেই, ভ্রমণকারীদেরও অবসর কাটানোর জন্য ব্যবস্থা হল একটা, ডাক্তারবাবু বললেন ।

অযোধ্যা পাহাড়ে কয়েক দিনের জন্য এলে সবটাই নিশ্চিন্ত অবসর । খাওয়া-দাওয়া রাস্তার ধারে হোটেলে । ট্যুরিস্ট লজে খাবারের ব্যবস্থা নেই । মিনিটখানেক হাঁটলেই পথের পাশে সাধারণ মানের দুটো হোটেল । একটু ভেতরে রয়েছে আরেকটা । তারই কোনও একটা পছন্দ করে নিচ্ছেন পর্যটকরা । দুপুরে সন্ধ্যায় সেখানেও একদলের সঙ্গে অন্য দলের আড্ডা । হিল টপ রেস্টুরেন্টের মালিক অখিল সিং সর্দারকে সবাই ডাকে উকিল সিং বলে । দিনে দিনে অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটক বাড়ছে বলে জানালেন উকিল সিং । ইলেক্ট্রিক লাইট না থাকার জন্য আগে একটু অসুবিধাজনক ছিল । ট্যুরিস্ট লজে সোলার লাইট থাকলেও সবসময় জ্বলত না । এখন ইলেক্ট্রিক লাইন এসে গেছে । এ সি রুমেরও ব্যবস্থা করেছেন কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তাদের নীহারিকা লজে । এছাড়া বীরবিরশা ক্লাবের ঘরেও থাকে অনেক পর্যটক দল । সম্প্রতি কৃত্তিবাস মাহাতো তাঁর আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করেছেন । সি এ ডি এ-র লজের পিছনের রাস্তায় ছোট্ট সেই আশ্রমের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভগবতী মূর্তি । তার পাশে ধ্যানকক্ষ । ঢোকার মুখে লেখা রয়েছে 'অযোধ্যা বিশ্বাশ্রম প্রারম্ভ পরিশ্রম' । উঠোনের একদিকে খড়ের ছাউনির মাটির ঘরে কাঠের বাঙ্ক করে থাকার ব্যবস্থা । পরিচ্ছন্ন উঠোনে গাছের ছায়ায় পরিবেশ সুন্দর । ইলেক্ট্রিক লাইটও রয়েছে আশ্রমে । পিছন দিকে ছাউনি দেওয়া সিমেন্টের মঞ্চে বসার জন্য বেঞ্চ পাতা আছে । চারপাশে স্তূপ করে রাখা নানা বনজ ছত্রাক । ঘর সাজানোর জন্য

জঙ্গল খুঁজে সংগ্রহ করা হয় সেসব । সোনালি রঙের ফুলের মতো দেখতে বুড়ি লাটের ছাতি জাপানে চালান যায় গোল্ডেন মাশরুম নামে । কাঠের বাড়ির কড়িকাঠের শোভা বাড়ায় তারা । এছাড়া স্পঞ্জ মাশরুম কাঠছাতি, শুকনো পদ্ম পরাগ, আসন ফল, ভালুকশুক্তির বীজ, আমড়ার আঁটিও চালান যাচ্ছে শহরে । কলকাতার দুর্গাপুজো প্যান্ডেল সাজানোতেও তাদের চাহিদা আছে বলে জানালেন কৃত্তিবাসবাবু ।

বিশ্বাশ্রম ছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রম আছে অযোধ্যা পাহাড়ে । সংঘের ঘনিষ্ঠ না হলে সাধারণত থাকার জায়গা পাওয়া যায় না সেখানে । হয়েছে নতুন রামমন্দিরও । খুশি খুশি মুখে সেদিক থেকে বেড়িয়ে ফিরছে পর্যটকের দল । তবে জঙ্গলের মধ্যে থাকার ইচ্ছে নিয়ে যাঁরা ট্যুরিস্ট লজে এসেছিলেন তাঁরা কিছুটা নিরাশ । দিব্যি জঙ্গল ছিল আসার পথে সিরকাবাদে, পাহাড়ের ওপরে উঠতেই জঙ্গল উধাও-দুঃখ জানাল একটা দল । বলল, ফরেস্ট লজের দিকটায় তবু জঙ্গল জঙ্গল ভাব আছে ।

ফরেস্ট লজ আছে পাহাড়ে, আর নিচের সিরকাবাদে । পুরুলিয়া ফরেস্ট অফিস থেকে বুক করে এলে থাকা যায় সেখানে । তবে থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য আর নিরাপদ পরিবেশে থেকে কাছাকাছি জঙ্গল ঘুরে দেখার জন্য পাহাড়ের ওপরটাই ভালো । ট্রেক করে যাঁরা পাহাড়ে উঠতে চান তাঁদেরও ওপরে জায়গা পাওয়া দরকার । মালভূমির মতো পাহাড়ের ওপরটায় জঙ্গল না থাকলেও সবুজের অভাব নেই । তারমধ্যে লালমাটির পথের ধারে লাল রঙের কুটিরে গ্রামগুলোও আকর্ষণীয় ।

টালিতে ছাওয়া মাটির বাড়িগুলোকে রং করা শুরু হয় বর্ষার পরে দুর্গাপুজোর সময়ে । দেওয়ালের নিচের দিকে সাধারণত লেপে দেওয়া হয় লাল মাটি । ওপরের অর্ধেকে হলুদ, নীলচে বা সাদা খড়িমাটি বুলিয়ে দুই রঙে ভাগ করে ফেলা হয় বাইরের দেওয়ালগুলোকে । কালো রংও ব্যবহার করেন অনেকে । ওপরের অংশে নুইয়ে পড়া ধানের ছড়ার মতো গোল গোল টানে রং বুলিয়ে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে কোনও কোনও বাড়িতে । কালীপুজোর মধ্যে রং দেওয়া শেষ করা নিয়ম । তারপরেই আদিবাসীদের বাঁধনা উৎসব । সে সময় গিয়ে দেখি রং মেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গ্রামের প্রতিটা বাড়ি । সবুজ ধানখেতের পাশে গাছপালায় ঘেরা গ্রামে নিকনো উঠোনের বাড়িগুলোতে এমন শান্তিময় পরিচ্ছন্নভাব যে দেখে পবিত্রতা শব্দটা মনে পড়ে যায় ।

নতুন ফসলের সঙ্গে এসে পড়ে একের পর এক লোক উৎসবের পালা । কালীপুজোর দুদিন পরে বাঁধনা উৎসব । পাহাড়ের নিচে কিশোরভারতী আশ্রম-বিদ্যালয়ে দেখা হল বাঁধনা পরবের অহীরা গানের ওস্তাদ আমিন মাহাতোর সঙ্গে । একই নামে গ্রামে আরেকজন আছেন বলে সবাই ছোট আমিন বলে ডাকে তাঁকে । সেদিন কালীপুজোর রাতে

তাঁদের গান গেয়ে গরু-মহিষকে জাগানোর অনুষ্ঠান । সারা রাত ধরে মাদল-ধামসা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘোরা হবে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে, জানালেন ছোট আমিন । সকাল থেকে গরুদের স্নান করিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে । সন্ধ্যার আগে তেল মাখানো হচ্ছে শিঙে । শুকনো খড়বিচালির সঙ্গে গরুকে আজ অন্তত একমুঠো কচি ঘাস খেতে দিতেই হবে । ভগবান আজ দেখতে আসেন সারা বছর খাটালেও ঠিকমতো যত্ন করা হচ্ছে কিনা গরুদের । সূর্যাস্তে তাদের গোয়ালে তোলার সময় কাঁচিদুয়ারি অনুষ্ঠান । দরজার দুপাশে মরদা ঘাসের গাছি বেঁধে সাজানো হয়েছে গোয়াল । আলপনা দেওয়া হয়েছে উঠোনে । চালের গুঁড়ো মেখে চ্যাপটা করে তৈরি হয়েছে প্রদীপ । শালপাতার ওপর সেই প্রদীপ সাজিয়ে দেওয়া হয় দরজার দুপাশে । গোয়ালে আজ প্রদীপ জ্বলবে সারা রাত । অহীরা গায়কের দল গেলে পিঠে খাইয়ে দক্ষিণা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন গৃহস্বামী । নাচ-গান হই-হুল্লোড়ে ঘুম থেকে জাগানো হবে গরুদের । পরদিন অমাবস্যা ছাড়ার পর গোবর্ধন পুজো শুরু । পুজো হবে গড়য়া-শালুক ফুল দিয়ে । মুরগি-ছাগলও কাটা হয় সেই উপলক্ষে । আর তারপর দিন বাঁধনা উৎসবের তুমুল হুল্লোড় । গরুদের সেদিন সাজানো হয় গায়ে চিত্র-বিচিত্র রং মাখিয়ে । মাথায় জড়িয়ে দেওয়া হয় সুন্দর ঘাসের মালা । রঙিন ফিতে বেলুন ঝুলিয়েও সাজানো হয় আজকাল । তারপর গরুকে খুঁটিতে বেঁধে চারপাশ থেকে মাদল-ধামসা বাজিয়ে হইচই করে খেপিয়ে তোলা হবে তাকে । প্রচণ্ড রেগে শিং বাগিয়ে তেড়ে আসবে গরু । কিন্তু খুঁটিতে বাঁধা বলে পালাতে পারবে না । ঘিরে ধরে নেচে নেচে সমানে বিরক্ত করা হবে তাকে, কিন্তু বারে বারে তেড়ে এসেও সে গুঁতো দিতে পারবে না । উল্লাসে ফেটে পড়বে দর্শকদল । দেখ, কেমন বেঁধেছি তোকে, কেমন বশ মানিয়েছি ।

সহজ সরল লোক-উৎসবগুলোতে যোগ দেয় সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে । অভাব অনটনে নিত্যদিনের দুর্দশাময় জীবনে গ্রামীণ পরব বয়ে আনে নির্মল আনন্দ । ফসল ভালো হলে উৎসব আরও বর্ণাঢ্য । চড়া রঙের ব্যবহার তাদের বেশভূষায়, উৎসবের উপকরণ সজ্জায় । আর নানা চাপের মধ্যে থেকেও তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাচ, গান আজও সজীব । কিছুদিন পরেই পৌষসংক্রান্তির দিন পাহাড়ের নিচে টুর্গা বাঁধের ধারে বসবে টুসু মেলা । ফসলের দেবতা টুসু । উর্বরতার আশায়, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় সেদিন মেয়েরা টুসু গান গেয়ে রঙিন চৌডাল ভাসায় জলে । পাহাড়ের ওপরে থেকে টুর্গা বাঁধে ভাসান দেখে ফিরতে হলে সঙ্গে জিপ থাকা দরকার । নিচে কাছাকাছি থাকার জায়গা বাগমুণ্ডিতে, অযোধ্যা মোড়ের কাছে সেচ দপ্তরের বাংলো । আগে পুরুলিয়া থেকে বুকিং করা থাকলে সেখানে থাকা যেতে পারে দুয়েক রাত । তাহলে দেখে নেওয়া যায় বাগমুণ্ডি মোড় থেকে ২ কিলোমিটার দূরে মুখোশ শিল্পের জন্য বিখ্যাত চড়িদা গ্রামটাও । পুরুলিয়ার জনপ্রিয় ছো-নাচের জন্য প্রথম পদ্মশ্রী পাওয়া শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার বাড়ি এই গ্রামে । ছো-নাচের মুখোশ শিল্পের জন্যও

নানা খেতাব পেয়েছেন গ্রামের অনেক শিল্পী । মুখোশ কিনে নিয়ে যাওয়া যায় স্মারক হিসেবে । সেই সঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে পৌষসংক্রান্তির পরদিন মাঠাপাহাড়ে মারাংবুরু বাবার পুজোর উৎসব । বাবার থানে বলি দেওয়া হয় অসংখ্য ছাগল পাঁঠা পায়রা । মেলা বসে পাহাড়ের নিচে । সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের স্রোতে ঝুমুর গান আর ধামসা-মাদলের সঙ্গে সাঁওতালি নাচে মেলা হয়ে ওঠে সরগরম ।

মাঘ মাসের প্রথমদিনে উৎসবের সময় ছাড়া মাঠাপাহাড় কোলাহল শূন্য । স্থানীয় কাঠুরে ছাড়া কদাচিৎ চোখে পড়ে বাবার থানে বা পাশের কালীমন্দিরে পুজো দিতে যাওয়া দুয়েকজন পদযাত্রীকে । খুবই কঠিন চড়াই পেরিয়ে পৌঁছতে হয় পাহাড়ের ওপরে মন্দিরে । সময় লাগে ঘণ্টা দেড়েক । অভিযান প্রিয় তরুণরা চলেন পথ ছেড়ে পাহাড় বেয়ে । বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার মতো এই পাহাড়ও পর্বতারোহণ শিক্ষার জন্য জনপ্রিয় হয়েছে । পুরুলিয়া থেকে বাগমুণ্ডি যেতে ১০ কিলোমিটার আগে মাঠা মোড় । থাকার জন্য মোড় থেকে আধ কিলোমিটার দূরে রাস্তার ধারে ফরেস্ট লজ আছে । বুকিং হয় পুরুলিয়া থেকে । গ্রামের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েও থাকেন অনেকে । খাওয়া-দাওয়া আর থাকার ব্যবস্থার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে মাঠা মোড়ের কাছে ত্রিপুরারি দাসের চায়ের দোকানে ।

পুরুলিয়ার ছো-নাচ দেখতে হলে যেতে হবে চৈত্র মাসে গাজনের পরে । অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে লহরিয়া বাবার মন্দিরের কাছেও চৈত্রসংক্রান্তিতে বসে জাঁকালো গাজনের মেলা । পুরুলিয়ার পাথুরে মাটিতে তখন আগুনের হলকা । সে কারণে পাহাড় জঙ্গল ঘুরে দেখতে আগ্রহীরা পছন্দ করেন শীতকালটাই ।

কাছাকাছি তৈরি হয়ে উঠছে আরেক দ্রষ্টব্য, পাখি পাহাড় । মাঠার কাছে এক ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক খোদাই করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন শিল্পী চিত্ত দে । বনদপ্তর থেকে অনুমতি পাওয়ার পর তৈরি হয়েছে ফাউন্ডেশন-ফ্লাইট টু হারমনি । কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র চিত্ত দে-র ছবি ‘ফ্লাইট টু হারমনি’ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল ১৯৯০-৯১ সালে । বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভেচ্ছায় শিল্পী পাহাড়ে খোদাই কাজ শুরু করেছেন বছর দুয়েক আগে । পাহাড়ের নিচে তাঁর ক্যাম্পে কাজ শিখে দড়িতে ঝুলে পাহাড় কাটছেন কাছাকাছি গ্রামের বেশ কিছু তরুণ । আলাপ হল ঈশ্বরচন্দ্র, আশুতোষ, সনাতন, উপেনচন্দ্র মাহাতোদের সঙ্গে । এমন ৩০-৩২ জন ছেলে কাজ করছে বলে জানালেন শিল্পী । কোনওদিন ছেনি হাতুড়ি ধরার অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের । এখন ক্রমশই পাথর খোদাইতে দক্ষ হয়ে উঠছে তারা । পাহাড়ের গায়ে ফুটে উঠছে একের পর এক পাখির প্রতিকৃতি । সবে প্রথম পর্যায়ের কাজ চলছে । রেখাচিত্রের মতো ফুটে উঠেছে কিছু উড়ন্ত পাখি । ৪০-৫০ ফুট ডানামেলা বিশাল

পাখিগুলোকে ছোট ছোট দেখায় নিচ থেকে । পাহাড় জুড়ে এমনই অসংখ্য পাখির মিলিত ঝাঁক খোদাই হয়ে থাকবে ঐক্যের প্রতীক হয়ে । শিল্পীর স্বপ্ন স্থায়ী হবে পাহাড়ে ।

দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিকল্পনা । তবে কাজ চলছে পুরোদমে । রোমান্টিক যে-কোনও পর্যটককে আলোড়িত করবে এই অভিযান । পুরুলিয়া থেকে বাগমুণ্ডি যেতে মাঠার ৩ কিলোমিটার আগে ভুচুংডি মোড়ে বাস থেকে নেমে মাত্র ১ কিলোমিটার হাঁটাপথে যাওয়া যায় পাখি পাহাড়ে । গাড়ি চলে যেতে পারে পাহাড়ের নিচে ক্যাম্প পর্যন্তই । তবে শাল সেগুন পলাশের বনের পাশ দিয়ে লাল মাটির পথ ধরে পাহাড় লক্ষ করে হেঁটে চলাও মনোরম । ডানদিকে খেত পার হয়ে গ্রাম । আর সামনে দেখা যায় পাহাড়ের নিচে হলুদ রঙের বাড়ি, শিল্পীর আস্তানা ।

অযোধ্যা পাহাড়ে গেলে দেখে আসা যায় কাছাকাছি এসব জায়গাও । তবে বাসে বাসে ঘুরে দেখতে চাইলে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে হাতে সময় থাকা চাই কয়েকটা দিন । দুদিক দিয়ে ওঠা যায় অযোধ্যা পাহাড়ে । পুবদিক থেকে পথ এসেছে সিরকাবাদ হয়ে । আর পশ্চিমে পথ এসেছে বাগমুণ্ডি থেকে । পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ পথিক আর তুষার নামে দুটো বাস যায় সিরকাবাদ হয়ে অযোধ্যা পাহাড় । পৌঁছতে সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক । দুটো বাসই রাতে পাহাড়ে থেকে পরদিন সকালে সাড়ে সাতটা থেকে নটার মধ্যে রওনা হয়ে ফিরে আসে সিরকাবাদ দিয়েই পুরুলিয়াতে । বাগমুণ্ডির দিক দিয়ে পাহাড়ে বাস সার্ভিস নেই । তবে পুরুলিয়া থেকে বলরামপুর হয়ে বাগমুণ্ডি যাচ্ছে বাস দুই-আড়াই ঘণ্টায় । সেখান থেকে হাঁটাপথে বা জিপ ভাড়া করে ১৪ কিলোমিটার পথে উঠে আসা যায় পাহাড়ে ।

কলকাতা থেকে সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস ছাড়া কয়েকটা প্রাইভেট বাস যাচ্ছে সারা রাতের জার্নিতে পুরুলিয়া । তবে হাওড়া থেকে রাতের ট্রেন আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারই সুবিধাজনক । সেই ট্রেনে পুরুলিয়া বা আরও এগিয়ে বলরামপুরে নেমে বাস ধরে চলে আসা যায় বাগমুণ্ডি । বাগমুণ্ডি থেকে পাহাড়ে উঠতে ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে জিপ ভাড়া করা যায় । ৪৫০-৫০০ টাকায় বলরামপুর থেকেই জিপ নিয়ে নিলে আসার পথে দেখে নেওয়া যায় পাখি পাহাড় আর চড়িদা গ্রাম । বাসে এলে বলরামপুর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ভুচুংডি মোড়ে নেমে হেঁটে পাখি পাহাড় দেখে ভুচুংডি থেকে ৩ কিলোমিটার এগিয়ে মাঠা বনবাংলোতে এক রাত থেকে যেতে পারলে ভালো হয় । মাঠা পাহাড়ের ওপরে উঠতে চাইলে আরও এক রাত থেকে যেতে হতে পারে । পরদিন সকালে বাগমুণ্ডি ছাড়িয়ে চড়িদায় নেমে মুখোশ শিল্প দেখে আবার বাগমুণ্ডিতে এসে যাওয়া যায় অযোধ্যা পাহাড়ে ।

বাগমুণ্ডির ১ কিলোমিটার আগে অযোধ্যা মোড় থেকে সেচ বাংলো পার হয়ে পথ চলেছে পাহাড়ের দিকে । কিশোরভারতী আশ্রম-বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে প্রোজেক্ট এরিয়ার মধ্য দিয়ে পাহাড়ে চড়া শুরু । নিচে দেখা যায় পাহাড়-ঘেরা টুরগা ড্যাম । তারপর পথের পাশে তুন্ড্রা ঝরনা । আরও দেড় কিলোমিটার পরে পথের ডানদিকে নেমে বামনি ঝরনা । ঝরনার আগে ওয়াচ টাওয়ারও হয়েছে সেখানে । অযোধ্যার ২ কিলোমিটার আগে জামঘটুতে রেশম চাষ হচ্ছে । চলার পথে দেখে নেওয়া যায় সেই সেরিকালচার ফার্মও । আর তারপর অযোধ্যায় রাত কাটিয়ে সকালের বাস ধরে সিরকাবাদ হয়ে ফিরে আসা যায় পুরুলিয়ায় ।

পুরুলিয়া থেকে সরাসরি কলকাতা ফেরার ট্রেন আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার বা সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস, প্রাইভেট বাস, সবই ছাড়ে রাতে । দিনেরবেলা ট্রেন বদল করে দুর্গাপুর, বর্ধমান হয়ে ফিরে আসা যেতে পারে সেই রাতেই । বাস বদল করে করে বাঁকুড়া, দুর্গাপুর হয়েও আসা যায় । একই যাত্রায় জুড়ে নেওয়া যেতে পারে বাঁকুড়ার খাতরা থেকে ঝিলিমিলি হয়ে মুকুটমণিপুর ভ্রমণও ।

অথবা যাওয়ার সময় সিরকাবাদ দিয়ে পাহাড়ে উঠে ফেরা যায় বাগমুণ্ডি হয়েও । পুরুলিয়া থেকে সে পথে বাস যাচ্ছে বিকেলে । জিপ ভাড়া করা যায় শ-চারেক টাকায় । সেক্ষেত্রে সঙ্গে মালপত্র কম থাকলে ফেরার সময় পায়ে হেঁটে বাগমুণ্ডি নেমে আসা যায় শর্টকাটে ঘণ্টা দুয়েকে । পথ দেখানোর জন্য গাইড পাওয়া যায় অযোধ্যা পাহাড়ে ৪০-৫০ টাকায় । এর আগে ময়ূর পাহাড়, চাডড়ি পাহাড় বেড়াবার জন্য গাইড নিয়ে থাকলে, ফেরার জন্য বলে রাখা যায় তাকেই । শর্টকাটে বাগমুণ্ডি চলার সময় সে দেখিয়ে দেবে সীতার বুরবুরি, শালগাছে সীতার চুল, বনবাসকালে সীতা বিশ্রাম নিয়েছিলেন যে পাথরে বসে, আর সীতার তৃষ্ণা মেটাতে তীর মেরে ভূমিভেদ করে রামচন্দ্র যেখানে জল বের করেছিলেন, সেই সীতাকুণ্ড । তারপর আরও এগিয়ে বামনি আর তুন্ড্রা ঝরনা । কিন্তু ঝরনায় বেশিক্ষণ সময় কাটানো উচিত হবে না, কারণ বাগমুণ্ডি থেকে পুরুলিয়া ফেরার বাস কমে যেতে থাকে দুপুরের পর থেকে । সকাল থেকে বারোটা পর্যন্ত মোটামুটি ৪০ মিনিট পর পর পাওয়া যায় বাস । শেষ বাস যায় সাধারণত বিকেল চারটে নাগাদ । ফেরার পথে হাওড়া আসার জন্য আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ধরা যেতে পারে বলরামপুর থেকে । সুইসা গিয়ে ধরা যেতে পারে রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেস । অথবা বলরামপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে জামসেদপুর গিয়ে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ধরে হাওড়া ফিরে আসা যেতে পারে সেই রাতেই ।

থাকার জায়গা

ট্যুরিস্ট হস্টেল

ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২, বি বা দী বাগ, কলকাতা-৭০০ ০০১

%২২৪৮-৮২৭১

নীহারিকা লজে (পুলিশ ক্যাম্পের পাশে) স্পট বুকিং হয় । যোগাযোগ:

প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর, ডব্লু বি সি এ ডি সি

অযোধ্যা হিলস প্রোজেক্ট, ভিলেজ ১

পোস্ট: অযোধ্যা, ডিস্ট্রিক্ট: পুরুলিয়া

অথবা,

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, কলকাতা-৭০০ ০১৩

কৃত্তিবাস মাহাতোর আশ্রমে ৪টে ঘরে ১৫টা বাঙ্ক আছে (নির্দিষ্ট ভাড়া নেই । স্বেচ্ছায় আশ্রমে কিছু দান করা নিয়ম) ।

ভ্রমণ জানুয়ারি, ১৯৯৯